সচিত্র মাসিক পত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৩৯—আষাঢ়, ১৩৪০

সম্পাদক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা

২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট

বার্ষিক মূল্য—৬৷৷০

বিষয়-সূচী

(মাঘ ১৩৩৯—আষাঢ় ১৩৪০)

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণপৃষ্ঠ)

জননী

শিল্পী—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাঘ, ১৩৩৯

বিচিত্রা
ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঊর্ম্মিমালা

যদিও অনেকদিন পরে হঠাৎ ঊর্ম্মি ছাড়া পেয়ে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, তবু হঠাৎ এক একদিন মনে পড়ত ওর জীবনের কঠিন দায়িত্ব। ও তো স্বাধীন নয়, ও যে বাঁধা ওর ব্রতের সঙ্গে। তারি সঙ্গে মিলিয়ে যে বাঁধন ওকে ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে বেঁধেচে তার অনুশাসন আছে ওর পরে। ওর দৈনিক কর্ত্তব্যের খুঁটিনাটি সেই তো স্থির করে দিয়েচে। ওর জীবনের পরে তার চিরকালের অধিকার একথা ঊর্ম্মি কোনোমতে অস্বীকার করতে পারে না। যখন নীরদ উপস্থিত ছিল স্বীকার করা সহজ ছিল, জোর পেত মনে। এখন ওর ইচ্ছে একেবারেই বিমুখ হয়ে গেছে অথচ কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাড়া দিচ্চে। কর্ত্তব্যবুদ্ধির অত্যাচারেই মন আরো যাচ্চে বিগড়িয়ে। নিজের অপরাধ ক্ষমা করা কঠিন হয়ে উঠল বলেই অপরাধ প্রশ্রয় পেতে লাগল। বেদনায় আফিমের প্রলেপ দেবার জন্যে শশাঙ্কের সঙ্গে খেলায় আমোদে নিজেকে সর্ব্বক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বলে, যখন সময় আসবে তখন আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে, এখন যে কয়দিন ছুটি ওসব কথা থাক। আবার হঠাৎ এক একদিন মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বই খাতা ট্রাঙ্কের থেকে বের করে' তার উপরে মাথা গুঁজে বসে। তখন শশাঙ্কর পালা। বইগুলো টেনে নিয়ে পুনরায় বাক্সজাত করে' সেই বাক্সর উপর সে চেপে বসে। ঊর্ম্মি বলে, "শশাঙ্কদা, ভারি অন্যায়। আমার সময় নষ্ট কোরো না।"

শশাঙ্ক বলে, "তোমার সময় নষ্ট করতে গেলে আমারো সময় নষ্ট। অতএব শোধবোধ।"

তারপরে খানিকক্ষণ কাড়াকাড়ির চেষ্টা করে' অবশেষে ঊর্ম্মি হার মানে। সেটা যে ওর পক্ষে নিতান্ত আপত্তিজনক তা মনে হয় না। এই রকম বাধা পেলেও কর্ত্তব্যবুদ্ধির পীড়ন দিন পাঁচ ছয় একাদিক্রমে চলে, তারপরে আবার তার জোর কমে যায়। বলে, "শশাঙ্কদা, আমাকে দুর্ব্বল মনে কোরো না। মনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করেই রেখেচি।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ এখানে ডিগ্রি নিয়ে য়ুরোপে যাব ডাক্তারি শিখতে।"

"তারপরে?"

"তারপরে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে তার ভার নেব।"

"আর কার ভার নেবে ? ঐ যে নীরদ মুখুজ্জে বলে একটা ইনসাফারেব্‌ল্‌"—

শশাঙ্কের মুখ চাপা দিয়ে উর্ম্মি বলে "চুপ করো। এই সব কথা বলো যদি তোমার সঙ্গে একেবারে ঝগড়া হয়ে যাবে।"

নিজেকে উর্ম্মি খুব কঠিন করে বলে, সত্য হতে হবে আমাকে, সত্য হতে হবে। নীরদের সঙ্গে ওর যে সম্বন্ধ বাবা স্বয়ং স্থির করে দিয়েচেন তার প্রতি খাঁটি না হতে পারাকে ও অসতীত্ব বলে মনে করে।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, অপর পক্ষ থেকে কোনো জোর পায় না। উর্ম্মি যেন এমন একটি গাছ যা মাটিকে আঁকড়ে আছে কিন্তু আকাশের আলো থেকে বঞ্চিত, পাতাগুলো পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে। এক এক সময় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, মনে মনে ভাবে, এ মানুষটা চিঠির মতো চিঠি লিখতে পারে না কেন ?

উর্ম্মি অনেক কাল কনভেণ্টে পড়েচে। আর কিছু না হোক ইংরেজিতে ওর বিদ্যে পাকা। সে কথা নীরদের জানা ছিল। সেই জন্যেই, ইংরেজি লিখে নীরদ ওকে অভিভূত করবে এই ছিল তার পণ। বাংলায় চিঠি লিখলে বিপদ বাঁচত কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বেচারা জানে না যে সে ইংরেজি জানে না। ভারী ভারী শব্দ জুটিয়ে এনে, পুঁথিগত দীর্ঘপ্রস্থ বচন যোজনা করে ওর বাক্যগুলোকে করে তুলতো বস্তা বোঝাই গোরুর গাড়ির মতো। উর্ম্মির হাসি আস্‌ত, কিন্তু হাসতে সে লজ্জা পেত, নিজেকে তিরস্কার করে বল্‌ত বাঙালীর ইংরেজিতে ত্রুটি হলে তা নিয়ে দোষ ধরা স্নবিশ্‌।

দেশে থাক্‌তে মোকাবিলায় যখন নীরদ ক্ষণে ক্ষণে সদুপদেশ দিয়েচে তখন ওর রকম-সকমে সেগুলো গভীর হয়ে উঠেচে গৌরবে। যতটা কানে শোনা যেত তার চেয়ে আন্দাজে তার ওজন হত বেশি। কিন্তু লম্বা চিঠিতে আন্দাজের জায়গা থাকে না। কোমর-বাঁধা ভারী ভারী কথা হাল্‌কা হয়ে যায়, মোটা মোটা আওয়াজেই ধরা পড়ে বলবার বিষয়ের কম্‌তি।

নীরদের যে ভাবটা কাছে থাকতে ও সয়ে গিয়েছিল—সেইটে দূরের থেকে ওকে সব চেয়ে বাজে। লোকটা একেবারেই হাসতে জানে না। চিঠিতে সব চেয়ে প্রকাশ পায় সেই অভাবটা। এই নিয়ে শশাঙ্কের সঙ্গে তুলনা ওর মনে আপনিই এসে পড়ে।

তুলনার একটা উপলক্ষ্য এই সেদিন হঠাৎ ঘটেচে। কাপড় খুঁজতে গিয়ে বাক্সের তলা থেকে বেরোলো পশমে-বোনা একপাটি অসমাপ্ত জুতো। মনে পড়ে গেল চার বছর আগেকার কথা। তখন হেমন্ত ছিল বেঁচে। ওরা সকলে মিলে গিয়েছিল দার্জ্জিলিঙে। আমোদের অন্ত ছিল না। হেমন্তে আর শশাঙ্কে মিলে ঠাট্টাতামাসার পাগ্‌লা-ঝোরা বইয়ে দিয়েছিল। উর্ম্মি তার এক মাসির কাছ থেকে পশমের কাজ নতুন শিখেচে। জন্মদিনে দাদাকে দেবে বলে একজোড়া জুতো বুনছিল। তা নিয়ে শশাঙ্ক ওকে কেবলি ঠাট্টা করত, বলত, "দাদাকে আর যাই দাও, জুতো নয়, ভগবান মনু বলেচেন ওতে গুরুজনের অসম্মান হয়।" উর্ম্মি কটাক্ষ করে বলেছিল, "ভগবান মনু তবে কাকে প্রয়োগ করতে বলেন।"

শশাঙ্ক গম্ভীর মুখে বল্‌লে, "অসম্মানের সনাতন অধিকার ভগ্নীপতির। আমার পাওনা আছে। সেটা সুদে ভারী হয়ে উঠল।"

"মনে তো পড়চে না।"

"পড়বার কথা নয়। তখন ছিলে নিতান্ত নাবালিকা। সেই কারণেই তোমার দিদির সঙ্গে শুভলগ্নে যেদিন এই সৌভাগ্যবানের বিবাহ হয়, সেদিন বাসর রজনীর কর্ণধারপদ গ্রহণ করতে পারো নি। আজ সেই কোমল করপল্লবের অরচিত কানমলাটাই রূপ গ্রহণ করচে সেই করপল্লবরচিত জুতোযুগলে। ওটার প্রতি আমার দাবী রইল জানিয়ে রেখে দিলুম।"

দাবী শোধ হয়নি, সে জুতো যথাসময়ে প্রণামীরূপে নিবেদিত হয়েছিল দাদার চরণে। তারপর কিছুকাল পরে শশাঙ্কর কাছ থেকে ঊর্মি একখানি চিঠি পেল। পেয়ে খুব হেসেচে সে। সেই চিঠি আজও তার বাক্সে আছে। আজ খুলে সে আবার পড়লে :—

"কাল তো তুমি চলে গেলে। তোমার স্মৃতি পুরাতন হতে না হতে তোমার নামে একটা কলঙ্ক রটনা হয়েচে সেটা তোমার কাছে গোপন করা অকর্ত্তব্য মনে করি।

আমার পায়ে একজোড়া তালতলীয় চটি অনেকেই লক্ষ্য করেচে। কিন্তু তার চেয়ে লক্ষ্য করেচে তার ছিদ্রভেদ করে আমার চরণনখরপংক্তি মেঘমুক্ত চন্দ্রমালার মতো। (ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল দ্রষ্টব্য। উপমার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ ঘটলে তোমার দিদির কাছে মীমাংসনীয়।) আজ সকালে আমার আপিসের বৃন্দাবন নন্দী যখন আমার সপাদুক চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলে তখন আমার পদমর্য্যাদায় যে বিদীর্ণতা প্রকাশ পেয়েচে তারি অগৌরব মনে আন্দোলিত হোলো। সেবককে জিজ্ঞাসা করলেম, "মহেশ, আমার সেই অন্য নূতন চটি জোড়াটা গতিলাভ করেচে অন্য কোন্ অনধিকারীর শ্রীচরণে।" সে মাথা চুলকিয়ে বল্‌লে, "ও বাড়ির উর্ম্মি মাসিদের সঙ্গে আপনিও যখন দার্জ্জিলিঙ যান সেই সময়ে চটিজোড়াটাও গিয়েছিল। আপনি ফিরে এসেচেন সেই সঙ্গে ফিরে এসেচে তার এক পাটি, আর এক পাটি—"তার মুখ লাল হয়ে উঠল। আমি এক ধমক দিয়ে বল্‌লুম, "বাস্, চুপ্।" সেখানে অন্য অনেক লোক ছিল। চটিজুতো-হরণ হীনকার্য্য। কিন্তু মানুষের মন দুর্ব্বল, লোভ দুর্দ্দম, এমন কাজ করে ফেলে, ঈশ্বর বোধ করি ক্ষমা করেন। তবু অপহরণ কাজে বুদ্ধির পরিচয় থাকলে দুষ্কার্য্যের গ্লানি অনেকটা কাটে। কিন্তু একপাটি চটি !!! ধিক্ !!!

যে এ কাজ করেচে, যথাসাধ্য তার নাম আমি উহ্য রেখেচি। সে যদি তার স্বভাবসিদ্ধ মুখরতার সঙ্গে এই নিয়ে অনর্থক চেঁচামেচি করে তাহলে কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে যাবে। চটি নিয়ে চটাচটি সেইখানেই খাটে যেখানে মন খাঁটি। মহেশের মতো নিন্দুকের মুখবন্ধ এখনি করতে পারো একজোড়া শিল্পকার্য্যখচিত চটির সাহায্যে। যেমন তার আস্পর্দ্ধা। পায়ের মাপ এই সঙ্গে পাঠাচ্চি।"

চিঠিখানা পেয়ে ঊর্ম্মি স্মিতমুখে পশমের জুতো বুনতে বসেছিল কিন্তু শেষ করেনি। পশমের কাজে আর তার উৎসাহ ছিল না। আজ এটা আবিষ্কার করে স্থির করলে এই অসমাপ্ত জুতোটাই দেবে শশাঙ্ককে সেই দার্জ্জিলিং যাত্রার সাম্বাৎসরিক দিনে। সেদিন আর কয়েক সপ্তাহ পরেই আসচে। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল—হায়রে কোথায় সেই হাস্যোজ্জ্বল আকাশে হাল্কাপাখায় উড়ে-যাওয়া দিনগুলি! এখন থেকে সামনে প্রসারিত নিরবকাশ কর্ত্তব্যকঠোর মরুজীবন।

আজ ২৬শে ফাল্গুন। হোলিখেলার দিন। মফস্বলের কাজে এ খেলায় শশাঙ্কের সময় ছিল না, এদিনের কথা তারা ভুলেই গেছে। ঊর্ম্মি আজ তার শয্যাগত দিদির পায়ে আবিরের টিপ দিয়ে প্রণাম করেচে। তারপরে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলে শশাঙ্ক আপিস ঘরের ডেস্কে ঝুঁকে পড়ে একমনে কাজ করচে। পিছন থেকে গিয়ে দিলে তার মাথায় আবির মাখিয়ে, রাঙিয়ে উঠল তার কাগজপত্র। মাতামাতির পালা পড়ে গেল। ডেস্কে ছিল দোয়াতে লাল কালী, শশাঙ্ক দিলে ঊর্ম্মির সাড়িতে ঢেলে। হাত চেপে ধরে তার আঁচল থেকে ফাগ কেড়ে নিয়ে ঊর্ম্মির মুখে দিলে ঘষে, তারপরে দৌড়াদৌড়ি ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি। বেলা যায় চলে, স্নানাহারের সময় যায় পিছিয়ে, ঊর্ম্মির উচ্চহাসির স্বরোচ্ছ্বাসে সমস্ত বাড়ি মুখরিত। শেষকালে শশাঙ্কের অস্বাস্থ্য আশঙ্কায় দূতের পরে দূত পাঠিয়ে শর্ম্মিলা এদের নিবৃত্ত করলে।

দিন গেছে। রাত্রি হয়েচে অনেক। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখাজাল ছাড়িয়ে পূর্ণ চাঁদ উঠেচে অনাবৃত আকাশে। হঠাৎ ফাল্গুনের দম্‌কা হাওয়ায় ঝরঝর শব্দে দোলাদুলি করে উঠচে বাগানের সমস্ত গাছপালা, তলাকার ছায়ার জাল তার সঙ্গে যোগ দিয়েচে। জানলার কাছে ঊর্ম্মি চুপ করে বসে। ঘুম আসচে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয়নি। আমের বোলের গন্ধে মন উঠেচে ভরে। আজ বসন্তে মাধবীলতার মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা সেই বেদনা যেন ঊর্ম্মির সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎসুক করেচে। পাশের নাবার ঘরে গিয়ে মাথা ধুয়ে নিলে, গা মুছলে ভিজে তোয়ালে দিয়ে। বিছানায় শুয়ে এ পাশ ও পাশ করতে করতে কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নজড়িত ঘুমে আবিষ্ট হয়ে পড়ল।

রাত্রি তিনটের সময় ঘুম ভেঙেচে। চাঁদ তখন জানলার সামনে নেই। ঘরে অন্ধকার, বাইরে আলোয় ছায়ায় জড়িত সুপারি গাছের বীথিকা। ঊর্ম্মির বুক ফেটে কান্না এল, কিছুতে থামতে চায় না। উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। প্রাণের এই কান্না, ভাষায় এর শব্দ নেই, অর্থ নেই। প্রশ্ন করলে ও কি বলতে পারে কোথা থেকে এই বেদনার জোয়ার উদ্বেলিত হয়ে ওঠে ওর দেহে মনে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনের কর্ম্মতালিকা, রাত্রের সুখনিদ্রা।

সকালে ঊর্ম্মি যখন ঘুম ভেঙে উঠল তখন ঘরের মধ্যে রৌদ্র এসে পড়েচে। সকাল বেলাকার কাজে ফাঁক পড়ল, ক্লান্তির কথা মনে করে শর্ম্মিলা ওকে ক্ষমা করেচে। কিসের অনুতাপে ঊর্ম্মি আজ অবসন্ন। কেন মনে হচ্চে ওর হার হতে চলল। দিদিকে গিয়ে বললে, "দিদি, আমি তো তোমার কোনো কাজ করতেই পারিনে—বলো তো বাড়ি ফিরে যাই।"

আজ তো শর্ম্মিলা বলতে পারলে না, "না যাস নে।" বললে, "আচ্ছা যা তুই। তোর পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্চে। যখন মাঝে মাঝে সময় পাবি দেখে শুনে যাস্।"

শশাঙ্ক তখন কাজে বেরিয়ে গেছে। সেই অবকাশে সেই দিনই ঊর্ম্মি বাড়ি চলে গেল।

শশাঙ্ক সেদিন যান্ত্রিক ছবি আঁকার এক সেট সরঞ্জাম কিনে বাড়ি ফিরলে। ঊর্ম্মিকে দেবে, কথা ছিল তাকে এই বিদ্যেটা শেখাবে। ফিরে এসে তাকে যথাস্থানে না দেখতে পেয়ে শর্ম্মিলার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, "ঊর্ম্মি গেল কোথায়?"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "এখানে তার পড়াশুনোর অসুবিধে হচ্চে বলে সে বাড়ি চলে গেছে।"

"কিছুদিন অসুবিধে করবে বলে সে তো প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। অসুবিধের কথা হঠাৎ আজই মনে উঠল কেন?"

কথার সুর শুনে শর্ম্মিলা বুঝ্‌লে শশাঙ্ক তাকেই সন্দেহ করচে। সে সম্বন্ধে কোনো বৃথা তর্ক না করে বল্‌লে, "আমার নাম করে তুমি তাকে ডেকে নিয়ে এসো, নিশ্চয় কোনো আপত্তি করবে না।"

উর্ম্মি বাড়িতে ফিরে এসে দেখলে অনেকদিন পরে বিলেত থেকে ওর নামে নীরদের চিঠি এসে অপেক্ষা করচে। ভয়ে খুলতেই পারছিল না। মনে জানে নিজের তরফে অপরাধ জমা হয়ে উঠেচে। নিয়মভঙ্গের কৈফিয়ৎ স্বরূপ এর আগে দিদির রোগের উল্লেখ করেছিল। কিছুদিন থেকে কৈফিয়ৎটা প্রায় এসেচে মিথ্যে হয়ে। শশাঙ্ক বিশেষ জিদ করে শর্ম্মিলার জন্যে দিনে একজন রাত্রে একজন নার্স নিযুক্ত করে দিয়েচে। ডাক্তারের বিধানমতে রোগীর ঘরে সর্ব্বদা আত্মীয়দের আনাগোনা তারা রোধ করে। উর্ম্মি মনে জানে নীরদ দিদির রোগের কৈফিয়ৎটাকেও গুরুতর মনে করবে না, বল্‌বে,—"ওটা কোনো কাজের কথা নয়।" বস্তুতই কাজের কথা নয়। আমাকে তো দরকার হচ্চে না। অনুতপ্তচিত্তে স্থির করলে এবারে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইব। বলব আর কখনো ত্রুটি হবে না, কিছুতে নিয়ম ভঙ্গ করব না।

চিঠি খোলবার আগে অনেকদিন পরে আবার বের করলে সেই ফোটোগ্রাফখানা। টেবিলের উপর রেখে দিলে। জানে, ঐ ছবিটা দেখলে শশাঙ্ক খুব বিদ্রূপ করবে। তবু উর্ম্মি কিছুতেই কুণ্ঠিত হবে না তার বিদ্রূপে; এই তার প্রায়শ্চিত্ত। নীরদের সঙ্গে ওর বিবাহ হবে, এই প্রসঙ্গটা দিদিদের বাড়িতে ও চাপা দিত। অন্যেরাও তুলত না কেননা এ প্রসঙ্গটা ওখানকার সকলের অপ্রিয়। আজ হাত মুঠো করে উর্ম্মি স্থির করলে—ওর সকল ব্যবহারেই এই সংবাদটা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করবে। কিছুদিন থেকে লুকিয়ে রেখেছিল এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আঙটি। সেটা বের করে পরলে। আঙটিটা নিতান্তই কম দামের,—নীরদ আপন অনেস্‌ট্‌ গরিবিয়ানার গর্ব্বের দ্বারাই ঐ সস্তা আঙটির দাম হীরের চেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভাবখানা এই যে, "আঙটির দামেই আমার দাম নয়, আমার দামেই আঙটির দাম।"

নিজেকে যথাসাধ্য শোধন করে নিয়ে উর্ম্মি অতি ধীরে লেফাফাটা খুললে।

চিঠিখানা পড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ইচ্ছা করল নাচতে, কিন্তু নাচ ওর অভ্যেস নেই। সেতারটা ছিল বিছানার উপর, সেটা তুলে নিয়ে সুর না বেঁধেই ঝনাঝন্ ঝঙ্কার দিয়ে যা-তা বাজাতে লাগল।

ঠিক এমন সময়ে শশাঙ্ক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপারখানা কী? বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল বুঝি?"

"হাঁ শশাঙ্কদা, স্থির হয়ে গেছে।"

"কিছুতেই নড়চড় হবে না ?"

"কিছুতেই না।"

"তাহলে এই বেলা সানাই বায়না দিই, আর ভীমনাগের সন্দেশ ?"

"তোমাকে কোনো চেষ্টা করতে হবে না।"

"নিজেই সব করবে ? ধন্য বীরাঙ্গনা। আর কনেকে আশীর্ব্বাদ ?"

"সে আশীর্ব্বাদের টাকাটা আমার নিজের পকেট থেকেই গেছে।"

"মাছের তেলেই মাছভাজা ? ভালো বোঝা গেল না।"

"এই নাও বুঝে দেখ।"

বলে চিঠিখানা ওর হাতে দিলে।

পড়ে শশাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠল। লিখচে, যে-রিসার্চ্চের দুরূহ কাজে নীরদ আত্মনিবেদন করতে চায়, ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয়। সেই জন্যেই ওর জীবনে আর একটা মস্ত স্যাক্রিফাইস মেনে নিতে হোলো। ঊর্ম্মির সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করলে উপায় নেই। একজন য়ুরোপীয় মহিলা ওকে বিবাহ ক'রে ওর কাজে আত্মদান করতে সম্মত। কিন্তু কাজটা সেই একই, ভারতবর্ষেই করা হোক্ আর এখানেই। রাজারামবাবু যে কাজের জন্য অর্থ দিতে চেয়েছিলেন, তার কিয়দংশ সেখানে নিযুক্ত করলে অন্যায় হবে না। তাতে মৃতব্যক্তির পরে সম্মান করাই হবে।"

শশাঙ্ক বল্‌লে, "জীবিত ব্যক্তিটাকে কিছু কিছু দিয়ে যদি সেই দূরদেশেই দীর্ঘকাল জিইয়ে রাখতে পারো তো মন্দ হয় না। টাকা বন্ধ করলে পাছে ক্ষিদের জ্বালায় মরীয়া হয়ে এখানে দৌড়ে আসে এই ভয় আছে।"

ঊর্ম্মি হেসে বল্‌লে, "সে ভয় যদি তোমার মনে থাকে, টাকা তুমিই দিয়ো, আমি এক পয়সাও দেব না।"

শশাঙ্ক বল্‌লে, "আবার তো মন বদল হবে না ? মানিনীর অভিমান তো অটল থাক্‌বে ?"

"বদল হলে তোমার তাতে কী শশাঙ্কদা ?"

"প্রশ্নের সত্য উত্তর দিলে অহঙ্কার বেড়ে যাবে, অতএব তোমার হিতের জন্যে চুপ করে রইলুম। কিন্তু ভাবচি, লোকটার গণ্ডদেশ তো কম নয়, ইংরেজিতে যাকে বলে চীক্।"

ঊর্ম্মির মনের মধ্যে থেকে প্রকাণ্ড একটা ভার নেমে গেল—বহুদিনের ভার। মুক্তির আনন্দে ও কী যে করবে তা ভেবে পাচ্চে না। ওর সেই কাজের ফর্দ্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে। গলিতে ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছিল, জান্‌লা থেকে আঙটিটা ছুঁড়ে ফেললে তার দিকে।

জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "এই পেন্সিলের দাগ দেওয়া মোটা বইগুলো কি কোনো ফেরিওয়ালা কিনবে ?"

"নাই যদি কেনে, তার কন্সাফলটা কী আগে শুনি।"

"যদি ওর মধ্যে সাবেককালের ভূতটা বাসা করে। মাঝে মাঝে অর্দ্ধেক রাত্রে তর্জ্জনী তুলে আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়।"

"সে আশঙ্কা যদি থাকে হুকারের অপেক্ষা করব না আমি নিজেই কিনব।"

"কিনে কী করবে?"

"হিন্দুশাস্ত্রমতে অন্ত্যেষ্টিসৎকার। গয়া পর্য্যন্ত যেতে রাজি, তাতে যদি তোমার মন সান্ত্বনা পায়।"

"না, অতটা বাড়াবাড়ি সইবে না।"

"আচ্ছা, আমার লাইব্রেরির কোণে পিরামিড বানিয়ে ওদের মামি করে রেখে দেব।"

"আজ কিন্তু তুমি কাজে বেরোতে পাবে না।"

"সমস্ত দিন?"

"সমস্ত দনই।"

"কী করতে হবে?"

"মোটরে করে উধাও হয়ে যাব।"

"দিদির কাছে ছুটি নিয়ে এসো গে।"

"না, ফিরে এসে দিদিকে বলব, তখন খুব বকুনি খাব। সে বকুনি সইবে।"

"আচ্ছা, আমিও তোমার দিদির বকুনি হজম করতে রাজি, টায়ার যদি ফাটে দুঃখিত হব না, ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে ছুটো চারটে মানুষ চাপা দিয়ে একেবারে জেলখানা পর্য্যন্ত পৌঁছতে আপত্তি নেই কিন্তু তিন সত্যি দাও যে মোটর রথযাত্রা সাঙ্গ করে আমাদেরি বাড়িতে তুমি ফিরে আসবে।"

"আসব, আসব, আসব।"

মোটরযাত্রার শেষে ভবানীপুরের বাড়িতে দুজনে এল, কিন্তু ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইলের বেগ রক্ত থেকে এখনো কিছুতেই থামতে চায় না। সংসারের সমস্ত দাবি সমস্ত ভয় লজ্জা এই বেগের কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

কয়দিন শশাঙ্কের সব কাজ গেল ঘুলিয়ে। মনের ভিতরে ভিতরে সে বুঝেচে যে, এটা ভালো হচ্চে না। কাজের ক্ষতি খুব গুরুতর হওয়াও অসম্ভব নয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুর্ভাবনায় দুঃসম্ভাবনাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে। কিন্তু পরের দিনে আবার সে স্বাধিকারপ্রমত্ত, মেঘদূতের যক্ষের মতন। মদ একবার খেলে তার পরিতাপ ঢাকতে আবার খেতে হয়।

শশাঙ্ক

কিছুকাল এই রকম যায়। লাগল চোখে ঘোর, মন উঠল আবিল হয়ে।

নিজেকে সুস্পষ্ট বুঝতে ঊর্ম্মির সময় লেগেচে, কিন্তু একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বুঝলে।

মথুরদাদাকে ঊর্ম্মি কী জানি কেন ভয় করত, এড়িয়ে বেড়াত তাকে। সেদিন মথুর সকালে দিদির ঘরে এসে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত কাটিয়ে গেল।

তারপরে দিদি ঊর্ম্মিকে ডেকে পাঠালে। মুখ তার কঠোর অথচ শান্ত। বল্‌লে, "প্রতিদিন ওর কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কী কাণ্ড করেছিস্ জানিস্ তা?"

ঊর্ম্মি ভয় পেয়ে গেল। বল্‌লে, "কী হয়েচে দিদি?" দিদি বল্‌লে, "মথুরদাদা জানিয়ে গেল, কিছুদিন ধরে তোর ভগ্নীপতি নিজে কাজ একেবারে দেখেননি। জহরলালের উপরে ভার দিয়েছিলেন সে মালমসলায় দুহাত চালিয়ে চুরি করেচে, বড়ো বড়ো গুদামঘরের ছাদ একেবারে ঝাঁঝরা, সেদিনকার বৃষ্টিতে ধরা পড়েচে, মাল যাচ্চে নষ্ট হয়ে। আমাদের কোম্পানির মস্ত নাম, তাই ওরা পরীক্ষা করেনি, এখন মস্ত অখ্যাতি এবং লোকসানের দায় পড়েচে ঘাড়ে। মথুরদাদা স্বতন্ত্র হবেন।"

ঊর্ম্মির বুক ধক্ করে উঠ্‌ল, মুখ হয়ে গেল পাঁশের মতো। এক মুহূর্ত্তে বিদ্যুতের আলোয় আপন মনের প্রচ্ছন্ন রহস্য প্রকাশ পেলে। স্পষ্ট বুঝলে, কখন অজ্ঞাতসারে তার মনের ভিতরটা উঠেছিল মাতাল হয়ে,—ভালোমন্দ কিছুই বিচার করতে পারেনি। শশাঙ্কর কাজটাই যেন ছিল তার প্রতিযোগী, তারি সঙ্গে ওর আড়াআড়ি। কাজের থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সর্ব্বদা সম্পূর্ণ কাছে পাবার জন্যে ঊর্ম্মি কেবল ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট করত। কতদিন এমন ঘটেচে, শশাঙ্ক যখন স্নানে, এমন সময় কাজের কথা নিয়ে লোক এসেচে; ঊর্ম্মি কিছু না ভেবে বলে পাঠিয়েচে, "বল্‌গে এখন দেখা হবে না।"

ভয়, পাচে স্নান করে এসেই শশাঙ্ক আর অবকাশ না পায়, পাছে এমন করে কাজে জড়িয়ে পড়ে যে, ঊর্ম্মির দিনটা হয় ব্যর্থ। তার দুরন্ত নেশার সাংঘাতিক ছবিটা সম্পূর্ণ চোখে জেগে উঠ্‌ল। তৎক্ষণাৎ দিদির পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়্‌ল। বারবার করে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌ল "তাড়িয়ে দাও তোমাদের ঘর থেকে আমাকে। এখনি দূর করে তাড়িয়ে দাও।"

আজ দিদি নিশ্চিত স্থির করে বসেছিল কিছুতেই ঊর্ম্মিকে ক্ষমা করবেনা। মন গেল গলে।

আস্তে আস্তে ঊর্ম্মিলার মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌লে,—"কিছু ভাবিস্‌নে, যা হয় একটা উপায় হবে।"

ঊর্ম্মি উঠে বস্‌ল। বল্‌লে, "দিদি, তোমাদেরই বা কেন লোকসান হবে। আমারো তো টাকা আছে।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "পাগল হয়েচিস্? আমার বুঝি কিছু নেই। মথুরদাদাকে বলেচি, এই নিয়ে তিনি যেন কিছু গোল না করেন। লোকসান আমি পুরিয়ে দেব। আর তোকেও বল্‌চি আমি যে কিছু জান্‌তে পেরেচি এ কথা যেন তোর ভগ্নীপতি না টের পান্।"

"মাপ করো, দিদি, আমাকে মাপ করো" এই বলে ঊর্ম্মি আবার দিদির পায়ের উপর পড়ে মাথা ঠুক্‌তে লাগ্‌ল।

শর্ম্মিলা চোখের জল মুছে ক্লান্ত সুরে বল্‌লে, "কে কাকে মাপ করবে বোন্? সংসারটা বড়ো জটিল। যা মনে করি, তা হয়না, যার জন্যে প্রাণপণ করি তা যায় ফেঁসে।"

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারস্য-ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ তেহেরানে জনসভায় আমার প্রথম বক্তৃতা। খানিকটা আমি ইংরেজিতে বলি, তারপরে তার তর্জ্জমা হয় পারসিকে, এই রকম দু-রঙা দু-টুকরো তালি দেওয়া আমার বক্তৃতা।

আমি যা বলেছিলেম তার মোট কথাটা হচ্ছে এই যে প্রকৃতির শক্তি-ভাণ্ডারের দ্বার য়ুরোপ উদ্ঘাটন করে প্রাণ-যাত্রাকে নানাদিক থেকে ঐশ্বর্য্যশালী করে তুলেচে। এই শক্তির প্রভাবে আজকের দিনে তারা দিগ্বিজয়ী। আমরা প্রাচ্য জাতিরা বস্তুজগতে এই শক্তি-সাধনায় শৈথিল্য করেচি, তার ফলে আমাদের দুর্ব্বলতা সমাজের সকল বিভাগেই ব্যাপ্ত। এই সাধনার দীক্ষা য়ুরোপের কাছ থেকে আমাদের নিতান্তই নেওয়া চাই।

তেহেরানের প্রসিদ্ধ তোরণ

কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র বস্তুগত ঐশ্বর্য্যে মানুষের পরিত্রাণ নেই তার প্রমাণ আজ য়ুরোপে মার-মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দিল। পরস্পর ঈর্ষা বিদ্বেষে এবং বিজ্ঞানবাহিনী হিংস্রতার বিভীষিকায় য়ুরোপীয় সভ্যতায় আজ ভূমিকম্প লেগেচে। য়ুরোপ দেবতার অস্ত্র পেয়েচে কিন্তু সেই সঙ্গে দেবতার চিত্ত পায়নি। এই রকম দুর্য্যোগেই "বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে।" দেখা যাচ্চে য়ুরোপ নিজের মৃত্যুশেল আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্যের সঙ্গে তৈরি করে তুলচে। এসিয়াকে আজ ভার নিতে হবে মানুষের মধ্যে এই দেবত্বকে সম্পূর্ণ করে তুলতে, কর্ম্ম-শক্তিকে ও ধর্ম্মশক্তিকে এক করে দিয়ে। পারস্যে আজ নূতন করে জাতি-রচনার কাজ আরম্ভ হয়েচে আমার সৌভাগ্য এই যে, এই নবসৃষ্টির যুগে অতিথিরূপে আমি পারস্যে উপস্থিত, আমি আশা করে এসেচি এখানে সৃষ্টির যে সংকলন দেখব তার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ণ-মিলনের রূপ আছে।

অতীতকালে একদা এসিয়ার সৃষ্টির-যুগ প্রবল শক্তিতে দেখা দিয়েছিল। তখন পারস্য ভারত চীন নিজ নিজ জ্যোতিতে দীপ্যমান হয়ে একটি সম্মিলিত মহাদেশীয় সভ্যতার বিস্তার করেছিল। তখন এসিয়ায় মহতী বাণীর
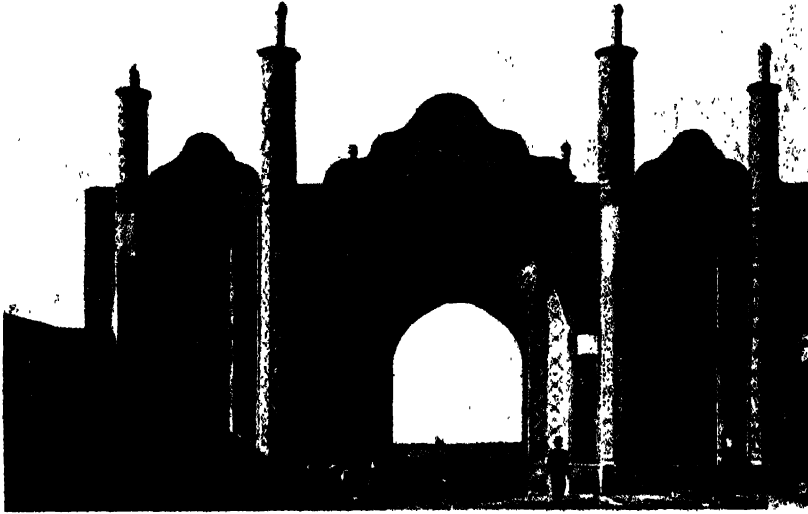
উদ্ভব হয়েছিল এবং মহতী কীর্ত্তির। তখন মাঝে মাঝে এসিয়ার চিত্তে যেন কোটালের বান ডেকে এসেচে, তখন তার বিস্তার ঐশ্বর্য্য বহু বাধা অতিক্রম করে বহুকাল ধরে বহুদূর দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।
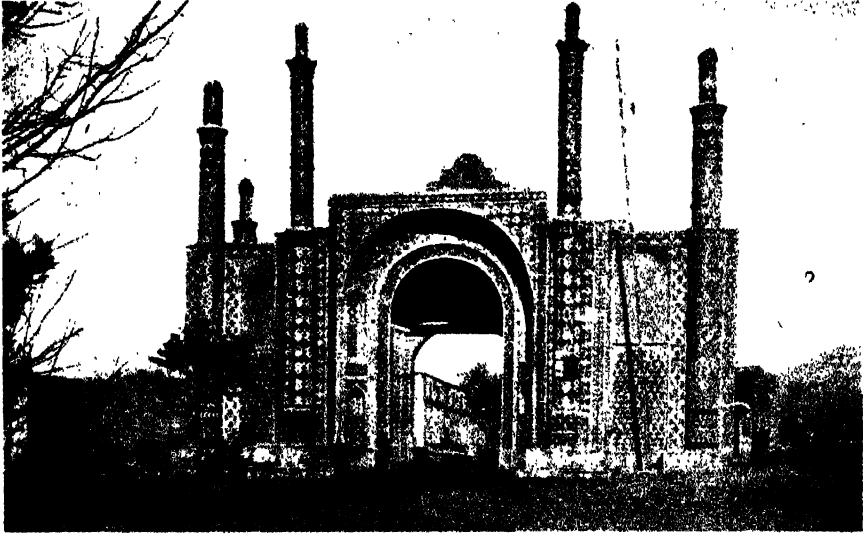
তেহেরানের একটি তোরণ

রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনায় সমাগত তেহেরানের সাহিত্যিকবৃন্দ

তারপর এল দুর্দ্দিন, ঐশ্বর্য্য বিনিময়ের বাণিজ্যপথ ক্রমে লুপ্ত হয়ে এল। যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, বিশ্বনাশা বর্ব্বরতার নিষ্ঠুর আক্রমণে এসিয়ার মহাদেশীয় বন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর থেকে এসিয়াকে আর মানবিক মহাদেশ বলতে পারিনে—আজ এ কেবল ভৌগোলিক মহাদেশ।

রবীন্দ্রনাথ ও তেহেরানের কয়েকটি বিশিষ্ট অধিবাসী

১। ডনাবে দস্তি (পার্লামেন্টের সভ্য), ২। আগা আসাদি

(ইনি বিশেষভাবে তেহেরানে রবীন্দ্রনাথের পরিচর্য্যার ভার লইয়াছিলেন)

সেই প্রাচীন যুগের গৌরবকাহিনীর স্বপ্নমাত্র নিয়ে অতি দীর্ঘকাল আমাদের দীনভাবে কাটল। আজ এই মহাদেশের নাড়ীতে নাড়ীতে পুনর্যৌবনের বেগ যেন আবার স্পন্দিত হয়ে উঠেচে। ভারতবর্ষের কবিকে আজ ইরাণ যে আহ্বান করেচে এ একটি সুলক্ষণ; এতে প্রমাণ হয় যে এসিয়ায় আত্মপ্রকাশের দায়িত্ববোধ দেশের সীমানাকে অতিক্রম করে দূরে বিস্তীর্ণ হচ্চে।

এ-কথা বাহুল্য, যে, এসিয়ার প্রত্যেক দেশ আপন শক্তি, প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে আপন ঐতিহাসিক সমস্যা স্বয়ং সমাধান করবে, কিন্তু আপন উন্নতির পথে তারা প্রত্যেকে যে-প্রদীপ নিয়ে চলবে, তার আলোক পরস্পর সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানজ্যোতির সমবায় সাধন করবে। চিত্তের প্রকাশ যখন আমাদের থাকে না তখন আমরা আলোকহীন তারার মতো, অন্য জ্যোতিষ্কের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ অবরুদ্ধ। চিত্তের আলো যখন জ্বলে তখনি মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা সত্য হয়ে ওঠে। তাই আজ আমি এই কামনা ঘোষণা করি যে আমাদের মধ্যে সাধনার মিলন ঘটুক। এবং সেই মিলনে প্রাচ্য মহাদেশে মহতী শক্তিতে জেগে উঠুক তার সাহিত্য, তার কলা, তার নূতন নিরাময় সমাজনীতি, তার অন্ধসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি, তার আত্মশক্তিতে অবসাদহীন শ্রদ্ধা।

আমি আপন দুর্ব্বল দেহের অনুনয় অস্বীকার করে এই দেশে এসেচি তার সর্ব্বপ্রধান কারণটি বক্তৃতার উপসংহারে

জানিয়ে যেতে চাই। মানবিকতার দিক থেকে যা কিছু শ্রেষ্ঠ পূর্ব-মহাদেশের আমরা স্বভাবতই তার কাছে মাথা নত করি, যান্ত্রিকতায় যা সুনিপুণ তার কাছে নয়। নিজেকে জয় করে যিনি আপন ভাগ্যের উপর জয়ী হন, তাঁকেই আমরা বীর বলে স্বীকার করি। বর্ত্তমান পারস্য-রাজের চরিত-কথা আমার আপন দেশের প্রান্তে বসেও শুনেচি এবং সেই সঙ্গে দেখতে পেয়েচি দূরে দিক্‌সীমায় নবপ্রভাতের কেন এমন মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তাঁর চরিত্র আমাদের সকলেরই পক্ষে সম্পদ,—বীরশক্তিতে তাঁর স্বজাতির মধ্যে তিনি যে প্রাণসঞ্চার করচেন তা দূর থেকেও আমাদের উদ্বোধনের সহায়তা করবে তাতে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের হয়ে, এসিয়ার হয়ে আমি তাঁকে অভিবাদন করি এবং তাঁর করস্পর্শের স্মৃতি আমার দেশে বহন করে নিয়ে যাই।
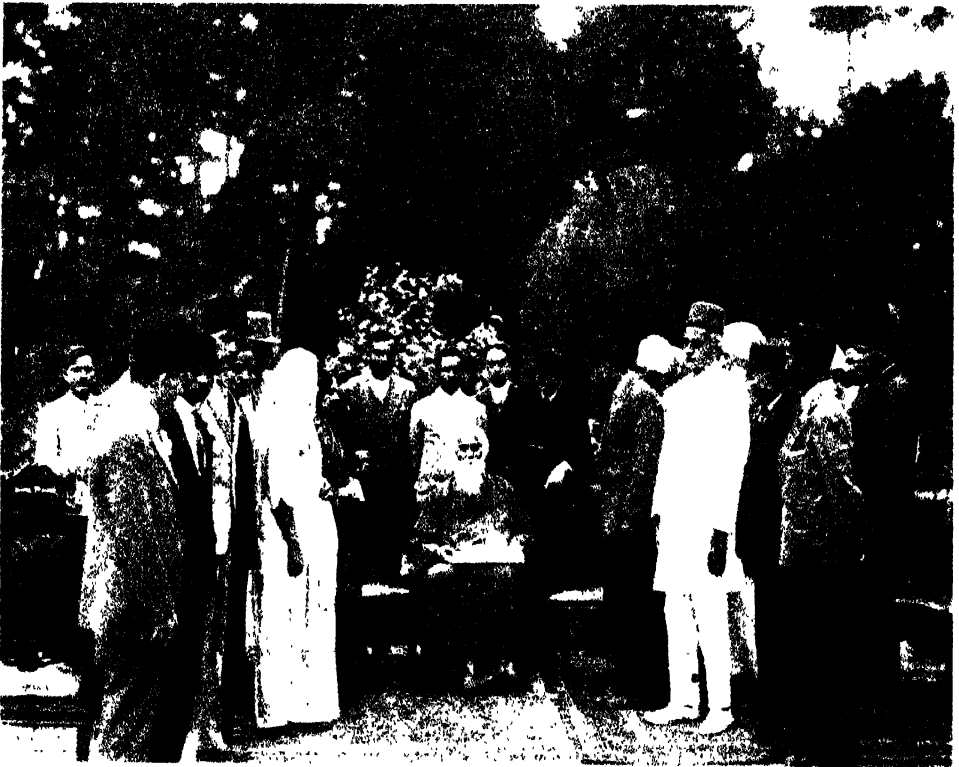
রবীন্দ্রনাথ ও তেহেরানের ভারতীয় সম্প্রদায়

সূচনা। বুঝেচি এসিয়ার কোনো স্থানে যথার্থ একজন লোকনেতারূপে স্বজাতির ভাগ্যনেতার অভ্যুদয় হয়েচে, তিনি জানেন কী করে বর্ত্তমান যুগের আত্মরক্ষণ-উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কী করে প্রতিকূল শক্তিকে নিরস্ত্র করতে হবে, বিদেশ থেকে যে-সর্ব্বগ্রাসী লোভের চক্রবাত্যা নিষ্ঠুর বলে এসিয়াকে চারিদিকে আঘাত করতে উদ্যত কী করে তাকে প্রতিহত করা সম্ভব। এসিয়ার যে-অংশেই থাকি না

সভা ভঙ্গ হলে আমাদের নিয়ে গেল এখানকার একজন সঙ্গীতগুণীর বাড়িতে। ছোটো একটি গলির ধারে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলুম। শান-বাঁধানো চৌকো উঠোন, তারি মধ্যে একটুখানি জলাশয়, গোলাপ ধরেচে গাছে, ছোটো ছোটো টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। সামনে দালান, সেখানে বাজিয়ের দল অপেক্ষা করচে; বাজনার মধ্যে একটি তার যন্ত্র, একটি বাঁশি, বাকি অনেকগুলি বেহালা। আমরা

তেহেরানে আর্মেনিয়ান্ কনসালের সম্বর্দ্ধনাসভায় রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী

তেহারানে সর্ব্বসাধারণের উদ্যান

সেথানে আসন নিলে পর প্রধান গুণী বল্‌লেন, আমি জানি আপনি ইচ্ছা করেন দেশপ্রচলিত কলাবিদ্যার স্বরূপ নষ্ট না হয়। আমরাও তাই চাই। সঙ্গীতের স্বদেশী স্বকীয়তা রক্ষা করে আমরা তার সঙ্গে য়ুরোপীয় স্বরসঙ্গতিতত্ত্ব যোগ করতে চেষ্টা করি।

আমি বল্‌লুম, ইতিহাসে দেখা যায় পারসিকদের গ্রহণ

করবার প্রবলশক্তি আছে। এসিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্যভাবের মিশ্রণ চলচে। এই মিশ্রণে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই মিলনের প্রথম অবস্থায় লুপ্ত হয়ে ফলের মধ্যে রসের বিশিষ্টতা জন্মে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এটা ঘটচে, সঙ্গীতেও কেন ঘটবে না তা বুঝি নে। যে-চিত্তের মধ্যে দিয়ে এই মিলন সম্ভবপর হয়

তেহেরানে আধুনিক স্থাপ

তোপখানে—তেহেরান
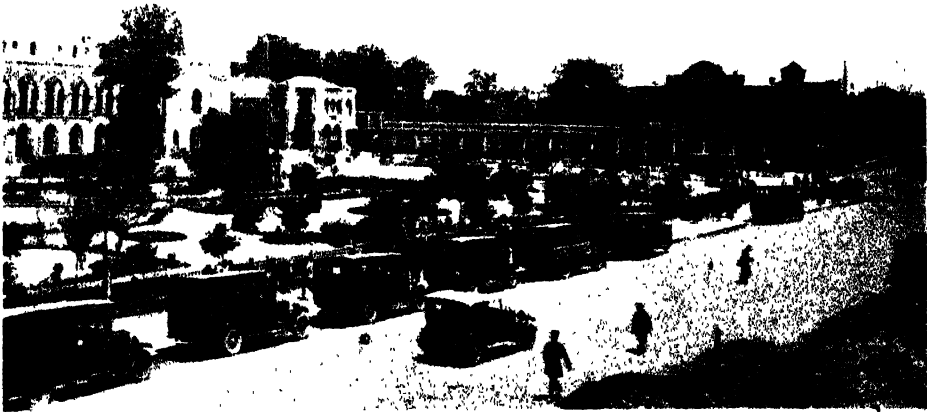
দুই ধারার রঙের তফাৎটা থেকে যদি, অনুকরণের জোরটা মরে না। কিন্তু আন্তরিক মিলন ক্রমে ঘটে যদি সে মিলনে প্রাণশক্তি থাকে—কলমের গাছের মতো নূতনে পুরাতনে ভেদ আমরা সেই চিত্তের অপেক্ষা করচি, য়ুরোপীয় সাহিত্যচর্চ্চা প্রাচ্য শিক্ষিতসমাজে যে-পরিমাণে অনেকদিন ধরে অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েচে য়ুরোপীয় সঙ্গীতচর্চ্চাও যদি তেমনি হোত

তাহলে নিঃসন্দেহই প্রাচ্যসঙ্গীতে রস-প্রকাশের একটি নূতন শক্তি সঞ্চার হোত। য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলায় প্রাচ্য-চিত্র-কলার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েচে এ তো দেখা গেছে; এতে তার আত্মতা পরাভূত হয় না, বিচিত্রতর প্রবল-তর হয়।

তারপরে তিনি একলা একটি সুর তাঁর তারযন্ত্রে বাজালেন। সেটি বিশুদ্ধ ভৈরবী,

তেহেরানে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে শিশুপরিবৃত রবীন্দ্রনাথ

তেহেরান সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথ—এই সভায় রবীন্দ্রনাথকে পারস্যের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ অভিনন্দিত করেন ও রবীন্দ্রনাথ আর্টের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন

উপস্থিত সকলেরই সেটি অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করল। ইনি বললেন, জানি, এরকম স্বর আমাদেরকে একভাবে মুগ্ধ করে, "কিন্তু অন্যরকম জিনিষটারও বিশেষ মূল্য আছে। সঙ্গীতে ইনি যে নূতন বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন করচেন ক্রমে হয়তো কলারাজ্যে তা লাভের সামগ্রী হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের রাগরাগিণী স্বরসঙ্গীতকে স্বীকার করেও আত্মরক্ষা করতে
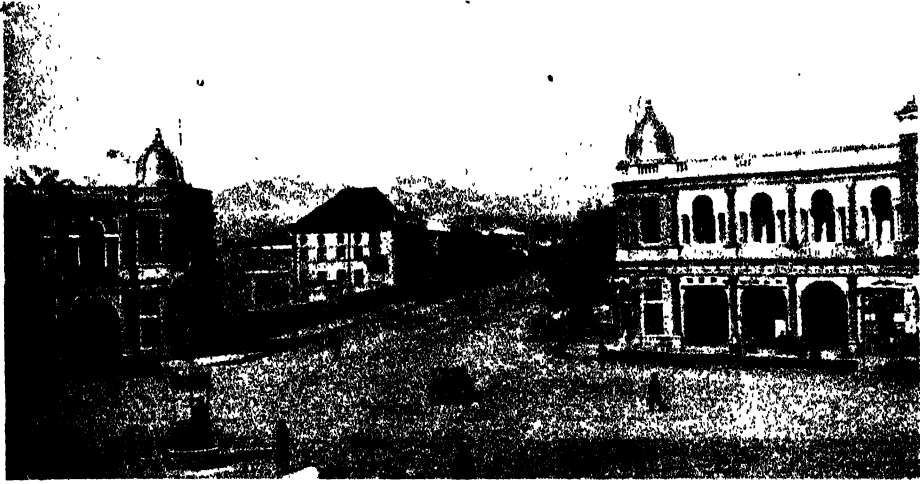
তেহেরানের একটি পথ

তেহেরানের একটি রাজপথ

পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা জন্মিয়ে দিয়ে একটার খাতিরে অন্যকে বর্জ্জন করা নিজের লোকসান করা।

কী জানি, লোকটির যদি শক্তি থাকে তবে পারসিক একেবারেই পারে না এ কথা জোর করে কে বলতে পারে। সৃষ্টির শক্তি কী লীলা করতে সমর্থ কোনো একটা বাঁধা নিয়মের দ্বারা আমরা আগে হতে তার সীমা নির্ণয় করতে

পারি নে। কিন্তু সৃষ্টিতে নূতন রূপের প্রবর্ত্তন বিশেষ শক্তি-মান প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য, আনাড়ির বা মাঝারি লোকের কর্ম্ম নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যেমন, তেমনি তার সঙ্গীতেরও মস্ত একটা সম্পদ আছে। সে যদি আমরা বুঝতে না পারি তবে সে আমাদের বোধশক্তিরই দৈন্য; যদি তাকে গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব হয় তবে তার দ্বারা আভিজাত্যের প্রমাণ হয় না।

তেহেরানের রাজপথে একটি বড়ো দোকান

আজ ছয়ই মে। য়ুরোপীয় পঞ্জিকার মতে আজ আমার জন্মদিন। আমার পারসিক বন্ধুরা এই দিনের উপর সকালবেলা থেকে পুষ্পবৃষ্টি করচেন। আমার চারিদিক ভরে গেছে নানাবর্ণের বসন্তের ফুলে, বিশেষত গোলাপে। উপহারও আসচে নানারকমের। এখানকার গবর্মেণ্ট থেকে একটি পদক ও সেই সঙ্গে একটি ফর্ম্মান পেয়েছি। বন্ধুদের বললুম, আমি প্রথম জন্মেচি নিজের দেশে, সেদিন কেবল আত্মীয়েরা আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তারপরে তোমরা যেদিন আমাকে স্বীকার করে নিলে আমার সেদিনকার জন্ম সর্ব্বদেশের,—আমি দ্বিজ।

তেহেরানের বাজারের এক কোণে

অপরাহ্ণে শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর বাড়িতে চায়ের মজলিশে নিমন্ত্রণ ছিল। সে সভায় এ দেশের প্রধানগণ ও বিদেশের রাষ্ট্রপ্রতিনিধি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একজন পারসিক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে কথা উঠল, বহুকাল থেকে বারম্বার বিদেশী আক্রমণকারীদের—বিশেষত মোগল ও আফগানদের—হাত থেকে অতি নিষ্ঠুর আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও পারস্য যে আপন প্রতিভাকে সজীব রেখেচে

এ অতি আশ্চর্য্য। তিনি বল্‌লেন,—সমস্ত জাতিকে আশ্রয় করে পারস্যে সে ভাষা ও সাহিত্য বহমান তারি ধারাবাহিকতা পারস্যকে বাঁচিয়ে রেখেচে। অনাবৃষ্টির রুদ্রতা যখন তাকে বাইরে থেকে পুড়িয়েচে তখন তার অন্তরের সম্বল ছিল তার আপন নদী। এতে শুধু যে পারস্যের আত্মস্বরূপকে রক্ষা করেচে তা নয়, যারা পারস্যকে মারতে এসেছিল তারাই পারস্যের কাছ থেকে নূতন প্রাণ পেলে—আরব থেকে আরম্ভ করে মোগল পর্য্যন্ত।

আরবরা তুর্কিরা মোগলরা এসেছিল দানশূন্য হস্তে, কেবলমাত্র অস্ত্র নিয়ে। আরব পারস্যকে ধর্ম্ম দিয়েচে কিন্তু পারস্য আরবকে দিয়েচে আপন নানাবিদ্যা ও শিল্পসম্পন্ন সভ্যতা। ইস্লামকে পারস্য ঐশ্বর্য্যশালী করে তুলেচে।

তেহেরানের একটি বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ

আমার জন্মদিনে এখানকার বহুলোকের কাছ থেকে আমি যে বহু সমাদর পেয়েচি একত্রে তার উত্তর দেবার জন্যে একটি কবিতা রচনা করেছিলুম। এখানকার মজ্‌লিশ ভাঙবার পূর্ব্বে সেটা আমি সকলকে শোনালুম। ইংরেজি তর্জ্জমা সমেত আমার কবিতাটি এইখানে পেশ করা গেল।

ইরান, তোমার যত বুল্‌বুল্‌,
তোমার কাননে যত আছে ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি'
শুনালো তাহারে অভিনন্দন বাণী॥
ইরান, তোমার বীর সন্তান
প্রণয় অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি' নিয়েছে তাহারে চিনে॥

ইরান, তোমার সম্মান-মালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হোলো কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক,—
ইরানের জয় হোক্‌॥

তেহেরানের একটি মসজিদ

Iran, all the roses in thy garden
and all their lover birds
have acclaimed the birthday
of the poet of a far away shore
and mingled their voices in a pœan of
rejoicing.

Iran, thy brave sons have brought
their priceless gifts of friendship
on this birthday of the poet of a far
away shore,
for they have known him in their
hearts as their own.
Iran, crowned with a new glory
by the honour from thy hand
this birthday of the poet of a far
away shore
finds its fulfilment.
And in return I bind this wreath of
my verse
on thy forehead, and cry :
Victory to Iran !

৭ মে। আজ সকালে প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। প্রকাণ্ড বড়ো বৈঠকখানা, স্ফটিকে মণ্ডিত, কিছু কিছু জীর্ণ হয়েচে। মন্ত্রী বৃদ্ধ ; আমারি সমবয়সী। আমি তাঁকে বললুম ভারতবর্ষের আবহাওয়া আমাদের জীবনযাত্রার উপরে এখানকার চেয়ে অনেক বেশি মাশুল চড়িয়েচে। তিনি বল্‌লেন বয়সের উপর কালের দাবী তত বেশি লোকসান করে না যেমন করে আহারে ব্যবহারে অনিয়ম অসংযম। সাবেককালে আমাদের জীবনযাপনের অভ্যাসগুলি ছিল আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই, এখন বিদেশী নতুন অভ্যাস এসে অসামঞ্জস্য ঘটিয়েচে। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই।

ঘরে কার্পেট পাতা আমাদের চিরকালের অভ্যাস, তারি সঙ্গে জুড়ি অভ্যাস হচ্চে জুতো খুলে ঘরে ঢোকা। আজকাল য়ুরোপীয় প্রথামতো পথের জুতোটাকে ধূলোসুদ্ধ ঘরের মধ্যে টেনে আনি। কার্পেট হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর। আগে কার্পেট-পাতা মেঝের উপর বসতুম, এখন সোফা কেদারার খাতিরে বহুমূল্য বহুবিচিত্র কার্পেটের অর্থ ও সম্মান দিলুম পদদলিত করে।

এখান থেকে গেলেম পার্লামেণ্টের সভানায়কের

বাড়িতে। এঁরা চিন্তাশীল শিক্ষিত অভিজ্ঞ লোক, এঁদের সঙ্গে কথা কইবার বিষয় অনেক আছে কিন্তু কথা চলে না। তর্জ্জমার ভিতর দিয়ে আলাপ করা পায়ে পায়ে কোদালি দিয়ে পথ কেটে চলার মতো। যিনি আমার কালকেকার কবিতা পারসিক ভাষা ও ছন্দে তর্জ্জমা করেচেন তাঁর সঙ্গে

তেহেরানে মসজিদে কারুকার্য্য

দেখা হোলো। লোকটি হাসিখুসি, গোলগাল, হৃদ্যতায় সমুচ্ছ্বসিত। কবিতা আবৃত্তি করেন প্রবল কণ্ঠে, প্রবল উৎসাহে দেহচালনা করেন। এখান থেকে চলে আসবার সময় সভাপতি মশায় অতি সুন্দর, লিপিনৈপুণ্যে লিখিত কবি আনওয়ারির রচিত একখানি কাব্যগ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন।

রাত্রে গেলেম থিয়েটারে অভিনয় দেখতে। নাটক ও নাট্যাভিনয় পারস্যে হালের আমদানি। এখনো লোকের মনে ভালো করে বসে নি। তাই সমস্ত ব্যাপারটা কাঁচা রকমের ঠেকল। শাহ্‌নামা থেকে নাটকের গল্পটি নেওয়া। আমাদের দেশের নাটকের মতো প্রায়ই মাঝে মাঝে গান, এবং বোধ করি দেশাভিমানের উচ্ছ্বাস। মেয়েদের ভূমিকা অধিকাংশই মুসলমান মেয়েরা নিয়েচে দেখে বিস্ময় বোধ হোলো।

অপরাহ্নে জরথুস্ত্রীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপনের অনুষ্ঠান। সেখান থেকে কর্ত্তব্য সেরে ফিরে যখন এলুম তখন আমাদের বাগানে গাছের তলায় একটি জলাশয়ের চারধারে বৃহৎ জনতা অপেক্ষা করচে। এখানকার সাহিত্যসভার নিমন্ত্রণে সকলে আহূত। আমার তরফে ছিল সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে ইংরেজিতে বক্তৃতার ধারা, আর এঁদের তরফে ছিল তারই মাঝে মাঝে এপারে ওপারে পারসিক ভাষার সাঁকো বেঁধে দেওয়া।

যতই এখানে আমার দিন শেষ হয়ে আসচে ততই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ও অভ্যাগতের ভিড় দুর্ভেদ্য হয়ে এল। আমার অবকাশটুকু ঘিরে সপ্তরথীর শরবর্ষণ চলচে। প্রতিদিনের বিবরণ লিখে যাবো দিনের মধ্যে এমন ফাঁক পাইনে। ঘটনাগুলো একটার উপর আর একটা চাপা পড়ে' পিণ্ড পাকিয়ে ভেসে চলে যায়, তাদের চেহারা মনে থাকে না।

এখানকার যাঁরা মনীষী তাঁদের মননশক্তির স্বকীয় বিশেষত্ব এবং আধুনিক যুগের সঙ্গে তার সঙ্গতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা করবার উপায় আমার নেই, কারণ এঁদের ভাষা আমি জানিনে। তার উদ্ভাবনা হয়তো কোথাও না কোথাও দেখা দিয়েচে, হয়তো চিন্তা ও রচনার কাজ আরম্ভ হয়ে থাকবে। এ-কথা মনে রাখতে হবে কিছুকাল পূর্ব্বে বাংলাদেশে যখন রামমোহন রায়ের আবির্ভাব সেই সময়ে পারস্যে বাহাই ধর্ম্মমত প্রাণান্তিক উৎপীড়নের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার অতি কঠোর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে এই ধর্ম্ম আধুনিক যুগের সর্ব্বজনীনতার

বাণী ঘোষণা করেচে। এ কথনোই সম্ভবপর হোত না যদি সম্পূর্ণভাবে এ জাতির মন সনাতনী জড়তার পাথর-চাপা মন হোত। প্রাচীনকালের শাসনে রুদ্ধবুদ্ধি রুদ্ধকণ্ঠ এই দেশ বাধাবন্ধনমুক্ত হয়ে চিত্তসম্পদশালী হয়ে উঠবে তার লক্ষণ চারদিকে যেন অনুভব করতে পারচি। আজ দশ বৎসরের মধ্যে পারস্য অচল প্রথার অন্ধতা থেকে যে এতদূর মুক্তিলাভ করেচে এবং নূতন যুগের কঠিন সমস্যাগুলি সমাধান করবার জন্যে এতটা দূর তার আধুনিক অধ্যবসায়, তার কারণ তার মন স্বভাবতই মননশীল—পারস্যের ইতিহাসে পূর্ব্বেও তার প্রমাণ হয়েচে।

অধ্যাপক ব্রাউন বলেচেন, জরথুস্ত্র এবং বাহাই মত-প্রবর্ত্তক বাব-এর মাঝখানে অন্তত ২৫ শতাব্দীর ব্যবধান। ইতিমধ্যকালের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য যে পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়েচে তার থেকে দেখা যায় এই সদাসচেষ্ট অবিরাম মননশীল পারসিক চিত্ত মানবজীবন ও মানবভাগ্যের সার্থকতার মহাসমস্যা ভেদ করবার জন্যে নিরন্তর চেষ্টা করেচে।

তেহেরান

পথিকের মতো পথ চল্‌তে চল্‌তে আমি আজ এখানকার ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেচি। সম্পূর্ণ করে কিছু দেখবার সময় নেই। আমার মনে যে ধারণাগুলো হচ্চে সে দ্রুত আভাসের ধারণা। বিচার করে উপলব্ধি নয়, কেবলমাত্র মানসিক হাত বুলিয়ে যাবার অনুভূতি। এই যেমন, সেদিন একজন মানুষের সঙ্গে হঠাৎ অল্পক্ষণের আলাপ হোলো। একটা ছায়াছবি মনে রয়ে গেল সেটা নিমেষকালের আলোতে তোলা। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ গাণিতিক। সৌম্য তাঁর মূর্ত্তি, মুখে স্বচ্ছচিত্তের প্রকাশ। এঁর বেশ মোল্লার, কিন্তু এঁর বুদ্ধি সংস্কারমোহমুক্ত, ইনি আধুনিক অথচ চিরকালের পারসিক। ক্ষণকালের দেখাতেই এই মানুষের মধ্যে আমি পারস্যের আত্মসমাহিত স্বপ্রকৃতিস্থ মূর্ত্তি দেখলুম, যে-পারস্যে একদা আবিসেন্না ছিলেন বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের অদ্বিতীয় সাধক, এবং জালালউদ্দিন গভীরতম আত্মোপলব্ধিকে সরসতম সঙ্গীতে প্রবাহিত করেছিলেন। অধ্যাপক ফেরুগির কথা পূর্ব্বেই বলেচি। তিনিও আমার মনে একটি চিত্র এঁকে দিয়েচেন, সে চিত্রও চিন্তবান পারসিকের। অর্থাৎ এঁর স্বদেশীয় স্বভাব বিদেশীর কাছেও সহজে প্রকাশমান। যে মানুষ সঙ্কীর্ণভাবে একান্তভাবে স্বাদেশিকতার মধ্যে বদ্ধ, তিনি স্বদেশকে প্রকাশ করেন না—কেননা মূর্ত্তি আপন দেশের মাটিতে গড়া হলেও যে আলো তাঁকে প্রকাশ করবে সে আলো যে সার্ব্বভৌমিক।
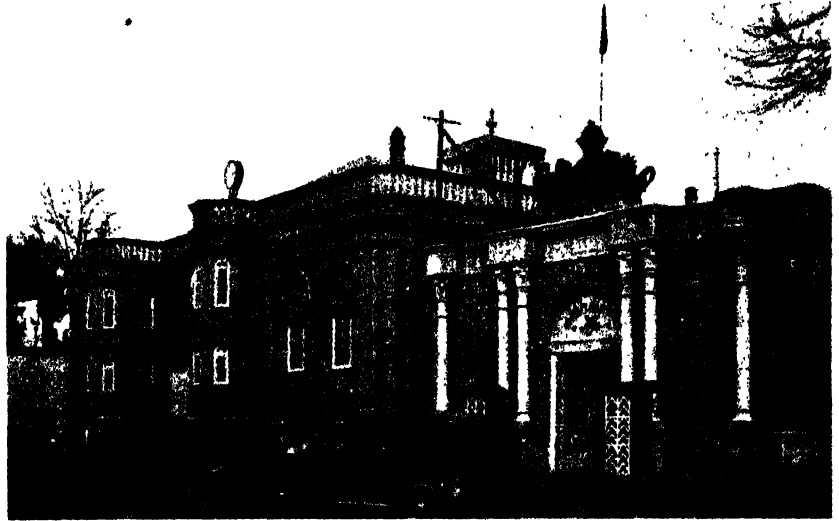
আর একটি মানুষের চেহারায় পারস্যের আর একটি প্রবল রূপ আমার মনে অঙ্কিত হয়ে গেছে। ইনি রাজার সভামন্ত্রী তেমুর্ত্তাশ্‌। আধুনিক কাল বিষম জোরের সঙ্গে এসিয়ার দ্বারে ধাক্কা মেরেচে, এই মানুষ তেমনি জোরের সঙ্গেই তাকে দিয়েচেন সাড়া। দৈবনির্ভরের সাধু-বিশেষণধারী নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে পুরুষকারের আত্মপ্রভাব প্রচারের ভার নিয়েচেন ইনি।

ইনি জানেন বহুকাল থেকে শাস্ত্র ও লোকাচারের মোহে মূর্চ্ছিত আমাদের প্রাচ্য দেশ। মানুষের বুদ্ধি ইচ্ছা-পূর্ব্বক নিজেকে অশ্রদ্ধা করে খর্ব্ব করে রেখেচে, সেই জন্যেই চারদিক থেকেই আমাদের এমন পরাভব, এত অপমান। উজ্জ্বল এঁর মুখশ্রী, বলিষ্ঠ এঁর বাহু, অপ্রতিহত এঁর উদ্যম। দেখে আনন্দ হয়, বুঝতে পারি পারস্যকে তার আত্মগত দুর্ব্বলতা থেকে রক্ষা করবার দীপ্যমান ধীশক্তি এঁর। অন্তরের মূঢ়তা বাহিরের শত্রুর সর্ব্বপ্রধান সহায়। তাই আজ যাঁরা পারস্যের ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁদের সতর্কতা দুদিক থেকেই উদ্যত। হালের মাঝি বাহিরের ঢেউয়ের উপর ঝিঁকে মারচে আবার সংস্কারকর্ত্তা লেগে আছে খোলের ছিদ্র মেরামতের কাজে। যাঁরা সব চেয়ে দুর্জ্জয় আত্মরিপুকে বশে আনবার ভার নিয়েচেন তাঁদের মধ্যে প্রধান একজন এই তেমুর্ত্তাশ। সেদিন তিনি আমাকে সগর্ব্বে বললেন পারস্যের ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করবার ভার নিয়েচি আমরা, অর্থাৎ ভূতকালের আঁচল-ধরা হয়ে আমরা ঝিমিয়ে থাকতে চাইনে। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে ভূতের পা উল্টো দিকে। আজ এসিয়ার এই পিছন-ফেরা পা আজও যাদের উল্টো পথ নির্দ্দেশ করে তাদের মধ্যে সব চেয়ে অধম হচ্চি আমরা। জাগ্রতবুদ্ধি অবিচলিত-সঙ্কল্প এই তেজস্বী পুরুষকে দেখে মনে মনে এঁকে নমস্কার করেচি, বলেচি, তোমাদের মতো মানুষের জন্যেই ভারতবর্ষ অপেক্ষা করে আছে কেননা চিত্তের স্বাধীনতাই ন্যাশনাল স্বাধীনতার বাহন।

তেহেরান থেকে বিদায় নেবার দিন এল। আজ এখানকার রাজসরকার আমাকে জানিয়েচেন শান্তিনিকেতনে তাঁরা পারসিক বিদ্যার আসন প্রতিষ্ঠা করবেন। এই সুযোগে তাঁদের—এই অতিথিকে উপলক্ষ্য করে পারস্যের সঙ্গে ভারতের যোগ স্থাপন হবে।

প্রধান মন্ত্রীবর্গ আজ এসে আমাকে বিদায় দিলেন।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নূতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যা চিরন্তন তা পুরাতন নয়; নূতন ক'রে তাকে যখন দেখি তখনি তাকে সত্য ক'রে দেখি। এই আজকের প্রভাতে আমরা যা দেখ্‌ছি সেই বিশ্বসৃষ্টি কত যুগ ধরে' আছে, প্রত্যেক প্রভাতে তাকে নূতন ক'রে পাই, অনাদিকালের দান প্রতি মুহূর্ত্তেই সদ্য দান। কালকেকার ক্ষয় আজ কোথায় অন্তর্হিত, জড়তা বিলুপ্ত, প্রকাশ পাচ্ছে চিরনবীন। চিরন্তনকে নূতন ক'রে দেখ্‌তে পেলেই চিত্তের অবসাদ ঘোচে।

আমাদের এখানে আমরা যদি কোনো ব্রত নিয়ে থাকি তার অন্তরে যদি কোনো চিরসত্য থাকে তাকেও আজ আমাদের নূতন ক'রে দেখ্‌তে হবে। যেন এইমাত্র তাকে গ্রহণ করলুম। ব্যবহারের দ্বারা ক্রমশ তার নবীনতা আমরা ভুলে যাই, তার বাহ্যাবরণ হয়ে যায় ছিন্ন, মলিন। এমন সময়ে সেই উৎসব আসে যা আমাদের শুভসংকল্পের প্রথম দিনের অক্ষুণ্ণ সতেজ মূর্ত্তিকে সাম্‌নে এনে ধরে। সেইদিন্‌কার আশা-সমুৎসুক চোখের প্রথম দেখাকে আমাদের চোখে আনে। বস্তুত সেই প্রথম দেখাইতো আজও চলে আস্‌চে। সেই দৃশ্যের উপরে যদি ধুলা পড়ে থাকে সেই ধূলাটাতো সত্য নয়। সত্যের পরিচয় যে চিরদিনই প্রথম পরিচয়। কিন্তু এই পরিচয়কে শক্তির দ্বারা সার্থক করতে হয়, অলসভাবে জড়বুদ্ধি ভীরু তাকে পায়না।

আজ সকালে আলোকে বাতাসে তরুলতায় যে-রূপটি দেখ্‌তে পাচ্ছি—এর কিছুই তো সহজে হয়নি। বাইরে এর প্রকাশ সহজ, সুন্দর, কিন্তু এর অন্তরে কত সংগ্রাম, জড়তার সঙ্গে জরার সঙ্গে। এমন ফুল নেই যার পিছনে প্রয়াসের ইতিহাস নেই; প্রত্যেক গাছপালার মধ্যে প্রাণের সঙ্গে অপ্রাণের দ্বন্দ্বই সুন্দরের রূপ প্রকাশ করচে, সেখানে যে শান্তিকে দেখচি সে তো অক্লান্ত সাধনার শান্তি। এই শান্তি আপন অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাইরে দেখায় না, কম তাকে অন্তরালে আত্মসাৎ ক'রে রাখার মধ্যেই যথার্থ বীর্য্যের পরিচয়। যে-গৌরব আপনার মধ্যে আপনাকে ধরে' রাখ্‌তে পারে না তাকে বলে অহঙ্কার, সেই তো দুর্ব্বলতা। সত্যকে নূতন করে পাওয়ার সঙ্গেই শক্তিকে নূতন ক'রে পাই। যে-সত্যকে পুরাতন বলে' অভ্যস্তভাবে স্বীকার ক'রে নিই, তাকে আমরা হারাই অথচ জানিইনে হারিয়েচি। কেননা শক্তির দ্বারা প্রতিক্ষণে সত্যকে জয় না করলে সত্য ধরা দেয় না। যে-জাতি নূতন ক'রে দেখ্‌তে শিখ্‌লে না, সে কেবল অভ্যাসে আসক্ত হয়ে থাকে, সেই জীর্ণ অভ্যাসের রন্ধ্রগুলো দিয়ে সত্য স্খলিত হয়ে পড়ে কখন্ তার অগোচরে। আমরা যাকে যুগ বলি সে শুধু মানবের ইতিহাসেই আছে এইটিই মানবের বিশেষত্ব। পশুপক্ষী হাজার বছর আগেও যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে, একটানা রাস্তায় তারা

চলেচে। মানুষের ইতিহাসে বারে বারে চিরসত্য নবীকৃত হয়, বেশ পরিবর্ত্তন করে। সেই নবীকরণের পিছনে বিপ্লব, কঠিন অধ্যবসায়, দুঃসহ দুঃখ। পুরাণে আছে যজ্ঞের হোমশিখা থেকে কৃষ্ণা উঠেছিলেন। উৎসবের দিনে যদি আমাদের সম্বৎসর কালের যজ্ঞশিখা থেকে চিরসত্যের নবোদ্ভূত মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই তবেই উৎসব সার্থক হয়। সত্যকে এই রকম নূতন ক'রে যেদিন দেখি সেইদিন যেখানে লজ্জা পাবার সেখানে লজ্জা পাব যেখানে সাহস পাবার সেখানে সাহস পাব। নূতন ক'রে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে ও হৃদয়ে তাকে স্বীকার করতে পারব। যে-সত্যকে আমরা সহজে মেনে নিই সহজেই তার বিকার ঘটে; দুঃসাধ্য সাধনাই সত্যের বাহন। যিনি ভীষণম্ ভীষণানাম্ আজ আমাদের উৎসবের মধ্যে সেই রুদ্রের শৃঙ্গধ্বনি আমরা যেন শুন্‌তে পাই। বাঁশি বাজিয়ে গান গেয়ে নয়, জয়যাত্রার ভেরীধ্বনি আজ আমাদের অন্তরে বেজে উঠুক্—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত এই বাণী আজ উৎসবের দিনে আমাদের অন্তরের কেন্দ্রে ধ্বনিত হয়ে উঠুক্। ৭ই পৌষ ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতনে বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন। পুলিনবিহারী সেন কর্ত্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা-কর্ত্তৃক সংশোধিত।

আশীর্ব্বাদ

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ

প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক প্রথম সোপান
দ্বিতীয় পঞ্চাশ তাহে গৌরবে করুক অভ্যুত্থান

২ পৌষ
১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ

তোমার মুখর দিন, হে দিনেন্দ্র, লইয়াছে তুলি'
আপনার দিগ্ দিগন্তে রবির সঙ্গীতরশ্মিগুলি
প্রহর করিয়া পূর্ণ। মেঘে মেঘে তারি লিপি লিখে
বিরহ মিলন বাণী পাঠাইলে বহু দূর দিকে
উদার তোমার দান। রবিকর করি মর্ম্মগত
বনস্পতি আপনার পত্রপুষ্পে করে পরিণত,
তাহারি নৈবেদ্য দিয়ে বসন্তের রচে আরাধনা
নিত্যোৎসব সমারোহে। সেই মতো তোমার সাধনা।
রবির সম্পদ হোতো নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।
সুরে সুরে রূপ নিল তোমা পরে স্নেহ সুগভীর,
রবির সঙ্গীতগুলি আশীর্ব্বাদ রহিল রবির।

২ পৌষ
১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ।

সামাজিক বিচার *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাদ আছে, "কথায় চিঁড়ে ভেজে না". তেমনি কথার কৌশলে অসম্মান অপ্রমাণ হয় না। কুকুরকে স্পর্শ করি, মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলি। বিড়াল ইঁদুর খায়, উচ্ছিষ্ট খেয়ে আসে, খেয়ে আচমন করে না, তদবস্থায় ব্রাহ্মণীর কোলে এসে বস্‌লে গৃহকর্ম্ম অশুচি হয় না। মাছ নানা মলিন দ্রব্য খেয়ে থাকে, সেই মাছকে উদরস্থ করেন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তাতে দেহে দোষ-স্পর্শ হয় না। মেথরের বৃত্তিতে যে মলিনতা, সে মলিনতা প্রতিক্ষণ আমাদের প্রত্যেকের দেহে। মা করে থাকেন মেথরের কাজ, তার দ্বারা তাঁর প্রতি ভক্তির সঞ্চার হয়। পঙ্কের মধ্যে নেমে মেছুনী মাছ ধরে, তাই বলে সকল অবস্থাতেই সে পঙ্কিল, এমন কথা বলা চলে না। পঙ্ক যেই সে ধৌত ক'রে আসে, অমনি অন্যের সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। যাকে আমরা হীনবৃত্তি বলি, সে আমাদের প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত আবশ্যকতা অনুসারে সেই সকল কাজ আমাদের প্রত্যেকেরই করা উচিত ছিল, আমাদের হয়ে যারা সেই দায় গ্রহণ করে, তাদের ঘৃণা করার মত ঘৃণ্যতা আর নেই। উচ্চবর্ণের মানুষ যে সব দুষ্কৃতি ক'রে থাকে, তার দ্বারা তাদের চরিত্র কলুষিত হলেও দেব-মন্দিরে তাদের অবাধ প্রবেশ এবং যদি ধনী হয় ও পদস্থ হয়, তবে তাদের সঙ্গ ও প্রসাদ আমরা আগ্রহের সহিত কামনা করি। দেহের কলুষ জলে ধুলে যায়, মনের কলুষ কোন বাহ্য স্নানে দূর হয় মনে করা মূঢ়তা। এই রকমের কলুষিত স্পর্শ আমাদের ঘরে বাইরে। দেহের কলুষকেই সমাজে প্রাধান্য দেওয়া সঙ্গত যদি মনে করা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, মলিন রোগে রক্তদূষিত ব্রাহ্মণকে কি সমাজ থেকে ও মন্দির থেকে নির্ব্বাসিত করবার বিধি আছে? যদি থাকে, সে বিধি কি পালিত হয়? তারা তো চরিত্রের মলিনতা আপন দূষিত দেহেই বহন ক'রে থাকে। দেহ বা চরিত্র যার কলুষিত, ঘৃণা ক'রে সেই সকল ব্যক্তিবিশেষকে দূরে বর্জ্জন করলে দোষ দিতে পারিনে, কিন্তু কোন সমগ্র জাতকে অবজ্ঞা করবার স্পর্দ্ধা দেবতা ক্ষমা করেন না, ভারতবর্ষকেও তিনি ক্ষমা করেন নি। জন্মগত অনধিকারকে যদি আমরা স্বীকার করি, তবে ইংরেজ যদি মনে করে, জন্মগত শ্রেষ্ঠতাবশতঃই ভারতশাসনে তাদের শাশ্বত অধিকার এবং জন্মগত নিকৃষ্টতাবশতঃই তাদের দাসত্ব নতশিরে চিরদিন আমাদের স্বীকার্য্য, তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকাই আমাদের শ্রেয়ঃ হয়। কোন জাতির হীনতা জন্মগত ও নিত্য, এ কথা মনে করাকে আমি অমার্জ্জনীয় অধর্ম্ম জ্ঞান করি। খৃষ্টান-শাস্ত্রে চির-নরক বাসের কল্পনা যেমন গর্হিত, কোন জাতিকে সমাজে চির-নারকী ক'রে রাখাও তেমনি নিষ্ঠুর অন্যায়।

* শ্রীযুক্ত মতি-লাল রায়কে লিখিত পত্র, গত পৌষের "প্রবর্ত্তক" হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব

১৩

এক সকালে স্বামিজী আনন্দ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে রতন জানিত না আমাকে আসিয়া বিষণ্ণ-মুখে খবর দিল, বাবু, গঙ্গামাটির সেই সাধুটা এসে হাজির হয়েছে। বলিহারি তাকে, খুঁজে-খুঁজে বার করেছে তো?

রতন সর্ব্বপ্রকার সাধু-সজ্জনকেই সন্দেহের চোখে দেখে, রাজলক্ষ্মীর গুরুদেবটিকে ত সে দুচক্ষে দেখিতে পারে না, বলিল, দেখুন এ আবার মাকে কি মৎলব দেয়। টাকা বার করে নেবার কত ফন্দিই যে এই ধার্ম্মিক ব্যাটারা জানে।

হাসিয়া বলিলাম, আনন্দ বড় লোকের ছেলে, ডাক্তারি পাশ করেছে, তার নিজের টাকার দরকার নেই।

—হুঁঃ—বড়লোকের ছেলে। টাকা থাকলে নাকি কেউ আবার এ-পথে যায়! এই বলিয়া সে তাহার সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়া চলিয়া গেল। রতনের আসল আপত্তি এইখানে, মায়ের টাকা কেহ বার করিয়া লইবার সে ঘোরতর বিরুদ্ধে। অবশ্য, তাহার নিজের কথা স্বতন্ত্র।

বজ্রানন্দ আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল, কহিল, আর একবার এলুম দাদা। খবর সব ভালো ত? দিদি কই?

—বোধ হয় পূজোয় বসেছেন, সংবাদ পাননি নিশ্চয়ই।

—তবে সংবাদটা নিজেই দিই গে। পূজো করা পালিয়ে যাবে না, এখন একবার রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পূজোর ঘরটা কোন দিকে দাদা? নাপতে ব্যাটা গেল কোথায়,—চায়ের একটু জল চড়িয়ে দিক না।

পূজার ঘরটা দেখাইয়া দিলাম। আনন্দ রতনের উদ্দেশ্যে একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া সেই দিকে প্রস্থান করিল।

মিনিট দুই পরে উভয়ে আসিয়াই উপস্থিত হইল, আনন্দ কহিল, দিদি, গোটা পাঁচেক টাকা দিন, চা খেয়ে একবার শিয়ালদার বাজারটা ঘুরে আসিগে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কাছেই যে একটা ভালো বাজার আছে আনন্দ, অতদূরে যেতে হবে কেন? আর তুমিই বা যাবে কিসের জন্যে, রতন যাক্ না।

—কে রতন? ও ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই দিদি, আমি এসেচি বলেই হয়ত ও বেছে-বেছে পচামাছ কিনে আন্‌বে,—বলিয়াই হঠাৎ দেখিল রতন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া, জিভ্ কাটিয়া বলিল, রতন, দোষ নিওনা বাবা, আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ও-পাড়ায় গেছো,—ডেকে সাড়া পাইনি কিনা।

রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, আমিও না হাসিয়া পারিলাম না। রতন কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিল না, গম্ভীর মুখে বলিল, আমি বাজারে যাচ্চি মা, কিষণ চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে। বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, রতনের সঙ্গে আনন্দর বুঝি বনে না?

আনন্দ বলিল, ওকে দোষ দিতে পারিনে দিদি। ও আপনার হিতৈষী,—বাজে লোকজন ঘেঁস্‌তে দিতে চায়না। কিন্তু আজ ওর সঙ্গ নিতে হবে, নইলে খাওয়াটা ভাল হবে না। বহুদিন উপবাসী।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া ডাকিয়া বলিল, রতন, আর গোটা কয়েক টাকা নিয়ে যা বাবা, বড় দেখে

একটা রুই মাছ আনতে হবে কিন্তু। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মুখ হাত ধুয়ে এসোগে ভাই, আমি চা তৈরি করে আন্‌চি। এই বলিয়া সেও নীচে নামিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, দাদা, হঠাৎ তলব হোলো কেন?

—সে কৈফিয়ৎ কি আমার দেবার আনন্দ?

আনন্দ সহাস্যে কহিল, দাদার দেখচি এখনো সেই ভাব—রাগ পড়েনি। আবার গা ঢাকা দেবার মৎলব নেই তো? সেবার গঙ্গামাটিতে কি হাঙ্গামাতেই ফেলেছিলেন। এদিকে দেশশুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন, ওদিকে বাড়ীর কর্ত্তা নিরুদ্দেশ। মাঝখানে আমি,—নতুন লোক,—এদিকে ছুটি, ওদিকে ছুটি, দিদি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন, রতন লোক তাড়াবার উদ্যুগ করলে,—সে কি বিভ্রাট। আচ্ছা মানুষ আপনি।

আমিও হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, রাগ এবারে পড়ে গেছে। ভয় নেই।

আনন্দ বলিল, ভরসাও নেই। আপনাদের মতো নিঃসঙ্গ, একাকী লোকদের আমি ভয় করি। কেন যে নিজেকে সংসারে জড়াতে দিলেন তাই আমি অনেক সময়ে ভাবি।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট! মুখে বলিলাম, আমাকে দেখচি তাহলে ভোলোনি, মাঝে মাঝে মনে করতে?

আনন্দ বলিল, না দাদা, আপনাকে ভোলাও শক্ত, বোঝাও শক্ত, মায়া কাটানো আরো শক্ত। বিশ্বাস না হয় বলুন, দিদিকে ডেকে সাক্ষী মানি। আপনার সঙ্গে পরিচয় তো মাত্র দু-তিন দিনের, কিন্তু সেদিন যে দিদির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও কাঁদতে বসিনি—সেটা নিতান্তই সন্ন্যাসী ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব'লে।

বলিলাম, সেটা বোধ হয় দিদির খাতিরে। তাঁর অনুরোধেই ত এতদূরে এলে।

আনন্দ কহিল, নেহাৎ মিথ্যে নয় দাদা। ওঁর অনুরোধ ত অনুরোধ নয় যেন মায়ের ডাক। পা আপনি চলতে সুরু করে। কত ঘরেই তো আশ্রয় নিই কিন্তু ঠিক এমনটি আর দেখিনে। আপনিও তো শুনেচি অনেক ঘুরেছেন কোথাও দেখেছেন এঁর মতো আর একটি?

বলিলাম, অনেক,—অনেক।

রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই সে আমার কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল, চায়ের বাটিটা আনন্দর কাছে রাখিয়া দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি অনেক গা?

আনন্দ বোধ করি একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল: আমি বলিলাম, তোমার গুণের কথা। উনি সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন বলেই আমি সজোরে তার প্রতিবাদ করছিলাম।

আনন্দ চায়ের বাটিটা মুখে তুলিতেছিল হাসির নাড়ায় খানিকটা চা মাটিতে পড়িয়া গেল রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল।

আনন্দ বলিল, দাদা, আপনার উপস্থিত বুদ্ধিটা অদ্ভুত। ঠিক উল্টোটি চক্ষের পলকে মাথায় এলো কি করে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আশ্চর্য্য কি আনন্দ? নিজের মনের কথা চাপতে চাপতে আর গল্প বানিয়ে বলতে বলতে এ বিদ্যেয় উনি একেবারে মহামহোপাধ্যায় হয়ে গেছেন।

বলিলাম, আমাকে তাহলে তুমি বিশ্বাস করো না?

—একটুও না।

আনন্দ হাসিয়া কহিল, বানিয়ে বলার বিদ্যেয় আপনিও কম নয় দিদি। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন একটুও না।

রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জ্বলে-পুড়ে শিখতে হয়েছে ভাই। তুমি কিন্তু আর দেরি কোরোনা, চা খেয়ে স্নান করে নাও, কাল গাড়ীতে তোমার যে খাওয়া হয়নি তা' বেশ জানি। ওর মুখে আমার সুখ্যাতি শুনতে গেলে তোমার সমস্ত দিনে কুলোবে না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, আপনাদের মতো এমন দুটি লোক সংসারে বিরল। ভগবান আশ্চর্য্য মিল করে আপনাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

—তার নমুনা দেখ্‌লে তো?

—নমুনা সেই প্রথম দিনে সাঁইথিয়া ষ্টেশনে গাছতলাতেই দেখেছিলুম। তারপরে আর একটিও কখনো চোখে পড়লো না।

—কথাগুলো ওঁর উপস্থিতিতেই যদি বল্‌তে আনন্দ!

আনন্দ কাজের লোক, কাজের উদ্যম ও শক্তি তাহার বিপুল। তাহাকে কাছে পাইয়া রাজলক্ষ্মীর আনন্দের সীমা নাই। দিনে-রাতে খাওয়ার আয়োজন ত প্রায় ভয়ের কোঠায় গিয়া ঠেকিল। অবিশ্রাম দুজনের কত পরামর্শই যে হয় তাহার সব গুলা জানিনা, শুধু কানে আসিয়াছে যে গঙ্গামাটিতে একটা ছেলেদের ও একটা মেয়েদের ইস্কুল খোলা হইবে। ওখানে বিস্তর গরিব এবং ছোট-জাতের লোকের বাস, উপলক্ষ্য বোধ করি তাহারাই। শুনিতেছি একটা চিকিৎসার ব্যাপারও চলিবে। এই সকল বিষয়ে কোনদিন আমার কিছুমাত্র পটুতা নাই। পরোপকারের বাসনা আছে কিন্তু শক্তি নাই, কোন-কিছু একটা খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে ভাবিলেও আমার শ্রান্ত মন আজ নয় কাল করিয়া দিন পিছাইতে চায়। তাহাদের নূতন উদ্যোগে মাঝে মাঝে আনন্দ আমাকে টানিতে গেছে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বাধা দিয়া বলিয়াছে, ওঁকে আর জড়িয়োনা আনন্দ, তোমার সমস্ত সঙ্কল্প পণ্ড হয়ে যাবে।

শুনিলে প্রতিবাদ করিতেই হয়, বলিলাম, এই যে সেদিন বললে আমার অনেক কাজ, এখন থেকে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে!

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, আমার ঘাট হয়েছে গোঁসাই, এমন কথা আর কখনো মুখে আনবো না।

—তবে কি কোনদিন কিছুই করবোনা?

—কেন করবেনা? কেবল অসুখ-বিসুখ করে আমাকে ভয়ে আধ-মরা করে তুলোনা তাতেই তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বো।

আনন্দ কহিল, দিদি, সত্যিই ওঁকে আপনি অকেজো করে তুলবেন।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আমাকে করতে হবেনা ভাই, যে-বিধাতা ওঁকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই সে ব্যবস্থা করে রেখেছেন,—কোথাও ত্রুটি রাখেন নি।

আনন্দ হাসিতে লাগিল, রাজলক্ষ্মী বলিল, তার ওপর এক গোণক্কার পোড়ামুখো এম্‌নি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে উনি বাড়ীর বার হলে আমার বুক টিপ্‌-টিপ্‌ করে,—যতক্ষণ না ফেরেন কিছুতে মন দিতে পারিনে।

—এর মধ্যে আবার গোণক্কার জুটলো কোথা থেকে? কি বললে সে?

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, আমার হাত দেখে সে বললে, মস্ত ফাঁড়া,—জীবন-মরণের সমস্যা।

—দিদি, এসব আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি বলিলাম, হাঁ করেন, আলবৎ করেন। তোমার দিদি বলেন ফাঁড়া বলে কি পৃথিবীতে কথা নেই? কারও কখনো কি বিপদ ঘটেনা?

আনন্দ হাসিয়া কহিল, ঘটতে পারে, কিন্তু হাতগুণে বলবে কি করে দিদি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা জানিনে ভাই, শুধু আমার ভরসা আমার মতো ভাগ্যবতী যে তাকে কখনো ভগবান এত বড় দুঃখে ডোবাবেন না।

আনন্দ শুদ্ধ-মুখে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া অন্য কথা পাড়িল।

ইতিমধ্যে বাড়ীর লেখা-পড়া, বিলি-ব্যবস্থার কাজ চলিতে লাগিল, রাশীকৃত ইঁট-কাঠ চুণ-সুরকি দরজা-জানালা আসিয়া পড়িল,—পুরাতন গৃহটিকে রাজলক্ষ্মী নূতন করিয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

সেদিন বৈকালে আনন্দ কহিল, দাদা চলুন একটু ঘুরে আসিগে।

ইদানিং আমার বাহির হইবার প্রস্তাবেই রাজলক্ষ্মী অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকে, কহিল, ঘুরে আসতে আসতেই যে রাত হয়ে যাবে আনন্দ, ঠাণ্ডা লাগবেনা?

আনন্দ বলিল, গরমে লোকে সারা হচ্চে দিদি, ঠাণ্ডা কোথায়?

আজ আমার নিজের শরীরটাও বেশ ভালোছিলনা, বলিলাম, ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই নিশ্চয়ই কিন্তু আজ উঠ্‌তেও তেমন ইচ্ছে হচ্ছেনা আনন্দ।

আনন্দ বলিল, ওটা জড়তা। সন্ধ্যেটা ঘরে বসে থাকলে অনিচ্ছে আরো চেপে ধরবে,—উঠে পড়ুন।

রাজলক্ষ্মী ইহার সমাধান করিতে কহিল, তার চেয়ে

একটা কাজ করিনে আনন্দ। ক্ষিতীশ পরশু আমাকে একটি ভালো হারমোনিয়ম কিনে দিয়ে গেছে এখনো সেটা দেখবার সময় পাইনি। আমি দু'টো ঠাকুরদের নাম করি, তোমরা দুজনে বসে শোনো,—সন্ধ্যাটা কেটে যাবে। এই বলিয়া সে রতনকে ডাকিয়া বাক্সটা আনিতে কহিল।

আনন্দ বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরদের নাম মানে কি গান নাকি দিদি?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া সায় দিল। দিদির কি এ বিদ্যেও আসে না কি?

—সামান্য একটুখানি। তারপরে আমাকে দেখাইয়া কহিল, ছেলেবেলায় ওঁর কাছেই হাতে খড়ি।

আনন্দ খুসি হইয়া বলিল, দাদাটি দেখ্‌ছি বর্ণ-চোরা আম, বাইরে থেকে ধরবার জো নেই।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, কিন্তু আমি সরল মনে তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। কারণ, আনন্দ বুঝিবে না কিছুই, আমার আপত্তিকে ওস্তাদের বিনয়-বাক্য কল্পনা করিয়া ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করিতে থাকিবে, এবং হয়ত বা শেষে রাগ করিয়া বসিবে। পুত্র-শোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের দুর্য্যোধনের গানটা জানি, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর পরে এ আসরে সেটা মানান্-সই হইবে না।

হারমোনিয়ম আসিলে প্রথমে সচরাচর প্রচলিত দুই একটা 'ঠাকুরদের' গান গাহিয়া রাজলক্ষ্মী বৈষ্ণব-পদাবলী আরম্ভ করিল, শুনিয়া মনে হইল সেদিন মুরারিপুর আখড়াতেও বোধ করি এমনটি শুনি নাই। আনন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল, আমাকে দেখাইয়া মুগ্ধ-চিত্তে কহিল, একি সমস্তই ওঁর কাছে শেখা দিদি?

—সমস্তই কি কেউ একজনের কাছে শেখে আনন্দ?

—সে ঠিক। তারপরে সে আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, দাদা, এবার কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ করতে হবে। দিদি একটু ক্লান্ত।

—না হে, আমার শরীর ভালো নেই।

—শরীরের জন্যে আমি দায়ী, অতিথির অনুরোধ রাখবেন না?

—রাখবার জো নেই হে, শরীর বড়ো খারাপ।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু সামলাইতে পারিল না হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। আনন্দ ব্যাপারটা এবারে বুঝিল, কহিল, দিদি, তবে বলুন কার কাছে এত শিখলেন?

আমি বলিলাম, যাঁরা অর্থের পরিবর্ত্তে বিদ্যা দান করেন তাঁদের কাছে। আমার কাছে নয় হে, দাদা কখনো এ বিদ্যের ধার দিয়েও চলেননি।

আনন্দ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমিও সামান্য কিছু জানি দিদি, কিন্তু বেশি শেখবার সময় পাইনি। সুযোগ যদি হলো এবার আপনার শিষ্যত্ব নিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করবো। কিন্তু আজ কি এখানেই থেমে যাবেন, আর কিছু শোনাবেন না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আজ তো সময় নেই ভাই, তোমাদের খাবার তৈরি করতে হবে যে।

আনন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তা জানি। সংসারের ভার যাঁদের ওপর সময় তাঁদের কম। কিন্তু বয়সে আমি ছোট, আপনার ছোট ভাই,—আমাকে শেখাতে হবে। অপরিচিত স্থানে একলা যখন সময় কাটতে চাইবে না তখন এই দয়া আপনার স্মরণ করবো।

রাজলক্ষ্মী স্নেহে বিগলিত হইয়া কহিল, তুমি ডাক্তার, বিদেশে তোমার এই স্বাস্থ্য-হীন দাদাটির প্রতি দৃষ্টি রেখো ভাই, আমি যতটুকু জানি তোমাকে আদর করে শেখাবো।

—কিন্তু এ ছাড়া আপনার কি আর চিন্তা নেই দিদি?

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল, আনন্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, দাদার মতো ভাগ্য সহসা চোখে পড়ে না।

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, এমন অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিই কি সহসা চোখে পড়ে আনন্দ? ভগবান তাদের হাল ধরবার মজবুত লোক দেন, নইলে তারা অকূলে ভেসে যায়,—কোনকালে ঘাটে ভিড়তে পারে না। এম্‌নি করেই সংসারে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় তারা, কথাটা মিলিয়ে দেখো প্রমাণ পাবে।

রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল,—তাহার অনেক কাজ।

ইহার দিনকয়েকের মধ্যেই বাড়ীর কাজ সুরু হইল, রাজলক্ষ্মী জিনিস-পত্র একটা ঘরে বন্ধ করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। বাড়ীর ভার রহিল বুড়ো তুলসীদাসের পরে।

যাবার দিনে রাজলক্ষ্মী আমার হাতে একখানা পোষ্টকার্ড দিয়া বলিল, আমার চার-পাতা জোড়া চিঠির এই জবাব এলো,—পড়ে ছাখো। বলিয়া চলিয়া গেল।

মেয়েলি অক্ষরে গুটী দুই তিন ছত্রের লেখা। কমললতা লিখিয়াছে,—সুখেই আছি বোন্। যাঁদের সেবায় আপনাকে নিবেদন করেছি আমাকে ভালো রাখার দায় যে তাঁদের ভাই। প্রার্থনা করি তোমরা কুশলে থাকো। বড়-গোঁসাইজি তাঁর আনন্দময়ীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ইতি—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণাশ্রিতা, কমল-লতা।

সে আমার নাম উল্লেখও করে নাই। কিন্তু এই কয়টি অক্ষরের আড়ালে কত কথাই না তাহার রহিয়া গেল। খুঁজিয়া দেখিলাম এক ফোঁটা চোখের জলের দাগ কি কোথাও পড়ে নাই? কিন্তু কোন চিহ্নই চোখে পড়িল না।

চিঠিখানা হাতে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। জানালার বাহিরে রৌদ্র-দীপ্ত নীলাভ আকাশ, প্রতিবেশী-গৃহের একজোড়া নারিকেল বৃক্ষের পাতার ফাঁক দিয়া কতকটা অংশ তাহার দেখা যায়, সেখানে অকস্মাৎ দুটি মুখ পাশাপাশি যেন ভাসিয়া আসিল। একটি আমার রাজলক্ষ্মীর,—পরিপূর্ণ কল্যাণী মূর্ত্তি; অপরটি কমল-লতার। অপরিস্ফুট, অজানা,—যেন স্বপ্নে দেখা ছবি।

রতন আসিয়া ধ্যান ভাঙিয়া দিল, বলিল, স্নানের সময় হয়েছে বাবু, মা বলে দিলেন।

স্নানের সময়টুকুও উত্তীর্ণ হইবার যো নাই।

আবার একদিন সকলে গঙ্গামাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেবারে আনন্দ ছিল অনাহূত অতিথি, এবারে সে আমন্ত্রিত বান্ধব। বাড়ীতে ভিড় ধরে না, গ্রামের আত্মীয় অনাত্মীয় কতলোকেই যে আমাদের দেখিতে আসিয়াছে, সকলের মুখেই প্রসন্ন হাসি ও কুশল প্রশ্ন। রাজলক্ষ্মী কুশারি-গৃহিণীকে প্রণাম করিল, সুনন্দা রান্নাঘরে কাজে নিযুক্ত ছিল বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, দাদা, আপনার শরীরটাতো তেমন ভালো দেখাচ্চে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ভালো আর কবে দেখায় ভাই? আমিতো পারলুম না, এবার তোমরা যদি পারো এই আশাতেই তোমাদের কাছে এনে ফেল্‌লুম।

আমার বিগত দিনের অস্বাস্থ্যের কথা বড়গিন্নীর বোধ হয় মনে পড়িল, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে ভরসা দিয়া কহিলেন, ভয় নেই মা, এ দেশের জল-হাওয়ায় উনি দুদিনেই সেরে উঠবেন।

অথচ, নিজে ভাবিয়া পাইলাম না কি আমার হইয়াছে এবং কিসের জন্যই বা এত দুশ্চিন্তা।

অতঃপর নানাবিধ কাজের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে সুরু হইল। পোড়ামাটি ক্রয় করার কথাবার্ত্তা দাম দস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থানান্বেষণ প্রভৃতি কিছুতেই কাহারো আলস্য রহিল না।

শুধু আমিই কেবল মনের মধ্যে উৎসাহ বোধ করি না। হয়ত, এ আমার স্বভাব, হয়ত বা ইহা আর-কিছু-একটা যাহা দৃষ্টির অগোচরে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত প্রাণ-শক্তির মূলোচ্ছেদ করিতেছে। একটা সুবিধা হইয়াছিল আমার ঔদাস্যে কেহ বিস্মিত হয় না, যেন আমার কাছে অন্য কিছু প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। আমি দুর্ব্বল, আমি অসুস্থ, আমি কখন্ আছি কখন্ নাই। অথচ, কোন অসুখ নাই, খাই-দাই থাকি। আনন্দ তাহার ডাক্তারি বিদ্যা লইয়া মাঝে মাঝে আমাকে নাড়া-চাড়া দিবার চেষ্টা করিলেই রাজলক্ষ্মী সস্নেহ অনুযোগে বাধা দিয়া বলে, ওঁকে টানাটানি করে কাজ নেই ভাই, কি হতে কি হবে তখন আমাদেরই ভুগে মরতে হবে।

আনন্দ বলে, যে-ব্যবস্থা করচেন ভোগার মাত্রা তাতে বাড়বে বই কমবে না দিদি। এ আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

রাজলক্ষ্মী সহজেই স্বীকার লইয়া বলে, যে আমি জানি আনন্দ, ভগবান আমার জন্মকালে এ দুঃখ কপালে লিখে রেখেছেন।

ইহার পরে আর তর্ক চলে না।

দিন কাটে কখনো বই পড়িয়া, কখনো নিজের বিগত-কাহিনী খাতায় লিখিয়া, কখনো বা শূন্য মাঠে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়া। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে কর্ম্মের প্রেরণা আমাতে নাই; লড়াই করিয়া, হুটোপুটি করিয়া, সংসারে দশজনের ঘাড়ে চড়িয়া বসার সাধ্যও নাই সঙ্কল্পও নাই। সহজে যাহা পাই তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানি। বাড়ী ঘর টাকাকড়ি বিষয়-আশয়, মান-সম্ভ্রম এ সকল আমার কাছে ছায়াময়। অপরের দেখাদেখি নিজের জড়ত্বকে যদি বা কখনো কর্ত্তব্য-বুদ্ধির তাড়নায় সচেতন করিতে যাই, অচির-কাল মধ্যেই দেখি আবার সে চোখ বুজিয়া ঢুলিতেছে,—শত ঠেলা-ঠেলিতেও আর গা নাড়িতে চাহে না। শুধু দেখি একটা বিষয়ে তন্দ্রাতুর মন কলরবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে, সে ঐ মুরারীপুরের দশটা দিনের স্মৃতির আলোড়নে। ঠিক যেন কানে শুনিতে পাই বৈষ্ণবী কমল-লতার সস্নেহ অনুরোধ—নতুন-গোঁসাই, এইটি করে দাওনা ভাই!—ঐ যা:—সব নষ্ট করে দিলে? আমার ঘাট হয়েছে গো, তোমায় কাজ করতে বলে,—নাও ওঠো? পদ্মা পোড়ামুখী গেল কোথায়, একটু জল চড়িয়ে দিক্‌না, চা খাবার যে তোমার সময় হয়েছে গোঁসাই।

সেদিন পাত্রগুলি সে নিজে ধুইয়া রাখিত পাছে ভাঙে। আজ তাহাদের প্রয়োজন গেছে ফুরাইয়া, তথাপি, কখনো কাজে লাগার আশায় কি জানি সেগুলি সে যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে কি না।

জানি সে পালাই পালাই করিতেছে। হেতু জানি না, তবু মনে সন্দেহ নাই মুরারিপুর আশ্রমে দিন তাহার প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। হয়ত, একদিন এই খবরটাই অকস্মাৎ আসিয়া পৌঁছিবে। নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল পথে-পথে সে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে মনে করিলেই, চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিশাহারা মন সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে। সকলের সকল শুভ-চিন্তায় অবিশ্রাম কর্ম্মে নিযুক্ত,—কল্যাণ যেন তাহার দুই হাতের দশ অঙ্গুলি দিয়া অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সুপ্রসন্ন মুখে শান্তি ও পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ ছায়া; করুণায়, মমতায়, হৃদয়-যমুনা কূলে কূলে পূর্ণ,—নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের সর্ব্বব্যাপী মহিমায় আমার চিত্ত-লোকে সে যে-আসনে অধিষ্ঠিত তাহার তুলনা করিতে পারি এমন কিছুই জানি না।

বিদুষী সুনন্দার দুর্নিবার্য্য প্রভাব স্বল্পকালের জন্যও যে তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, ইহারই দুঃসহ পরিতাপে পুনরায় আপন সত্তাকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে। একটা কথা সে আজও আমাকে কানে কানে বলে, তুমি কম নও গো, কম নও। তোমার চলে যাবার পথ চেয়ে সর্ব্বস্ব যে আমার চোখের পলকে ছুটে পালাবে এ কে জানতো বলো? উঃ—সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভাবলেও ভয় হয় সে দিনগুলো আমার কেটেছিল কি করে? দম বন্ধ হয়ে মরে যাইনি এই আশ্চর্য্যি। আমি উত্তর দিতে পারি না শুধু নীরবে চাহিয়া থাকি।

আমার সম্বন্ধে আর তাহার ত্রুটি ধরিবার জো নাই। শতকর্ম্মের মধ্যেও শতবার অলক্ষ্যে আসিয়া দেখিয়া যায়। কখনো হঠাৎ আসিয়া কাছে বসে, হাতের বইটা সরাইয়া দিয়া বলে, চোখ বুজে একটুখানি শুয়ে পড়তো, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। অতো পড়লে চোখ ব্যথা করবে যে!

আনন্দ আসিয়া বাহির হইতে বলে, একটা কথা জেনে নেবার আছে—আসতে পারি কি?

রাজলক্ষ্মী বলে, পারো। তোমার কোথায় আসতে মানা আনন্দ?

আনন্দ ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলে, এই অসময়ে দিদি কি ওঁকে ঘুম পাড়াচ্ছেন নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া জবাব দেয়, তোমার লোকসানটা হলো কি? না ঘুমোলেও তো তোমার পাঠশালার বাছুরের পাল চরাতে যাবেন না।

—দিদি দেখচি ওঁকে মাটি করবেন।

—নইলে নিজে যে মাটি হই। নির্ভাবনায় কাজ-কর্ম্ম করতে পারিনে।

—আপনারা দুজনেই ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবেন, এই বলিয়া আনন্দ বাহির হইয়া যায়।

ইস্কুল তৈরির কাজে আনন্দর নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসৎ নাই, সম্পত্তি খরিদের হাঙ্গামায় রাজলক্ষ্মী গলদঘর্ম্ম, এমনি

সময়ে কলিকাতার বাড়ী ঘুরিয়া বহু ডাকঘরের ছাপ-ছোপ পিঠে লইয়া বহু বিলম্বে নবীনের সাংঘাতিক চিঠি আসিয়া পৌঁছিল,—গহর মৃত্যু শয্যায়। শুধু আমারই পথ চাহিয়া আজও সে বাঁচিয়া আছে। খবরটা আমাকে যেন শূল দিয়া বিঁধিল। ভগিনীর বাটি হইতে সে কবে ফিরিয়াছে জানিনা। সে যে এতদূর পীড়িত তাহাও শুনি নাই,—শুনিবার বিশেষ চেষ্টাও করি নাই—আজ আসিয়াছে একেবারে শেষ সম্বাদ। দিন ছয়েক পূর্ব্বের চিঠি, এখনো বাঁচিয়া আছে কি না তাই বা কে জানে? তার করিয়া খবর পাবার ব্যবস্থা এদেশেও নাই সে দেশেও নাই। এ চিন্তা বৃথা। চিঠি পড়িয়া রাজলক্ষ্মী মাথায় হাত দিল,—তোমাকে যেতে হবে তো!

হাঁ।

চলো আমিও সঙ্গে যাই।

—সে কি হয়? তাদের এ বিপদের মাঝে তুমি যাবে কোথায়।

প্রস্তাবটা যে অসঙ্গত সে নিজেই বুঝিল, মুরারিপুর আখড়ার কথা আর সে মুখে আনিতে পারিল না, বলিল, রতনের কাল থেকে জ্বর সঙ্গে যাবে কে? আনন্দকে বলবো?

—না। আমার তল্পি বইবার লোক সে নয়।

—তবে কিষণ সঙ্গে যাক?

—তা' যাক, কিন্তু প্রয়োজন ছিল না।

—গিয়ে রোজ চিঠি দেবে বলো?

—সময় পেলে দেবো।

—না, সে শুনবো না। একদিন চিঠি না পেলে আমি নিজে যাবো তুমি যতই রাগ করো।

অগত্যা রাজি হইতে হইল, এবং প্রত্যহ সংবাদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই দিনই বাহির হইয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখিলাম দুশ্চিন্তায় রাজলক্ষ্মীর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেছে, সে চোখ মুছিয়া শেষবারের মতো সাবধান করিয়া কহিল, শরীরে অবহেলা করবে না বলো?

—না গো, না।

—ফিরতে একটা দিনও বেশি দেরি করবেনা বলো?

—না, তাও করবোনা।

অবশেষে গরুর গাড়ী রেল ষ্টেসনের উদ্দেশে যাত্রা সুরু করিল।

আষাঢ়ের এক অপরাহ্ন বেলায় গহরদের বাটীর সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার সাড়া পাইয়া নবীন বাহিরে আসিয়া আমার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষের প্রবল কণ্ঠের এক বুক ফাটা কান্নায় শোকের একটা নূতন মূর্ত্তি চোখে দেখিতে পাইলাম। সে যেমন গভীর, তেমনি বৃহৎ ও তেমনি সত্য। গহরের মা নাই, ভগ্নি নাই, কন্যা নাই, জায়া নাই, অশ্রু-জলের মালা পরাইয়া এই সঙ্গীহীন মানুষটিকে সেদিন বিদায় দিতে কেহ ছিল না, তবু মনে হয় তাহাকে সজ্জাহীন, ভূষণহীন কাঙাল-বেশে যাইতে হয় নাই, তাহার লোকান্তরের যাত্রা-পথে শেষ পাথেয় নবীন একাকী দুহাত ভরিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।

বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর কবে মারা গেল নবীন?

—পরশু। কাল সকালে আমরা তাঁকে মাটি দিয়ে এসেছি।

—মাটি কোথায় দিলে?

—নদীর তীরে, আম বাগানে। তিনিই বলেছিলেন।

নবীন বলিতে লাগিল, মামাতো বোনের বাড়ী থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলেন, সে জ্বর আর সারলো না।

—চিকিৎসা হয়েছিল?

—এখানে যা হবার সমস্তই হয়েছিল,—কিছুতে কিছু হলো না। বাবু নিজেই সব জানতে পেরেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আখড়ার বড় গোঁসাইজী আসতেন?

নবীন কহিল, মাঝে মাঝে। নবদ্বীপ থেকে তাঁর গুরুদেব এসেছেন তাই রোজ আসতে সময় পেতেন না। আর একজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করিতে লাগিল, তবু সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রশ্ন করিলাম, ওখান থেকে আর কেউ আসতো না নবীন?

নবীন বলিল, হাঁ, কমল-লতা।

—তিনি কবে এসেছিলেন?

নবীন বলিল, রোজ। শেষ তিন দিন তিনি খাননি, শোননি, বাবুর বিছানা ছেড়ে একটিবার ওঠেন নি। আর প্রশ্ন করিলাম না চুপ করিয়া রহিলাম। নবীন জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন এখন,—আখড়ায়?

—হাঁ।

—একটু দাঁড়ান, বলিয়া সে ভিতরে গিয়া একটা টিনের বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া আমার কাছে দিয়া বলিল, এটা আপনাকে দিতে তিনি বলে গেছেন।

—কি আছে এতে নবীন?

খুলে দেখুন, বলিয়া সে আমার হাতে চাবি দিল। খুলিয়া দেখিলাম দড়ি দিয়া বাঁধা তাহার কবিতার খাতাগুলা। উপরে লিখিয়াছে শ্রীকান্ত, রামায়ণ শেষ করার সময় হলোনা। বড়-গোঁসাইকে দিও, তিনি যেন মঠে রেখে দেন নষ্ট না হয়। দ্বিতীয়টি লাল শালুতে বাঁধা ছোট পুঁটুলি। খুলিয়া দেখিলাম নানা মূল্যের এক তাড়া নোট, এবং আমাকে লেখা আর একখানি পত্র। সে লিখিয়াছে,—ভাই শ্রীকান্ত, আমি বোধ হয় বাঁচবো না। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানিনে। যদি না হয় নবীনের হাতে বাক্সটি রেখে গেলাম, নিও। টাকাগুলি তোমার হাতে দিলাম কমল-লতার যদি কাজে লাগে দিও। না নিলে যা ইচ্ছে হয় করো। আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। গহর।

দানের গর্ব্ব নাই, কাকুতি-মিনতিও নাই। শুধু মৃত্যু আসন্ন জানিয়া এই গুটি কয়েক কথায় বাল্যবন্ধুর শুভকামনা করিয়া তাহার শেষ নিবেদন রাখিয়া গেছে। ভয় নাই, ক্ষোভ নাই. উচ্ছ্বসিত হা-হুতাশে মৃত্যুকে সে প্রতিবাদ করে নাই। সে কবি, মুসলমান ফকির বংশের রক্ত তাহার শিরায়,—শান্ত মনে এই শেষ রচনাটুকু সে তাহার বাল্যবন্ধুর উদ্দেশে লিখিয়া গেছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত চোখের জল আমার পড়ে নাই, কিন্তু আর তাহারা নিষেধ মানিল না, বড় বড় ফোঁটায় চোখের কোণ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনমান তখন সমাপ্তির দিকে, পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপিয়া একটা কালো মেঘের স্তর উঠিতেছে উপরে, তাহারই কোন একটা সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথে অস্তোন্মুখ সূর্য্য-রশ্মি রাঙা হইয়া আসিয়া পড়িল প্রাচীর সংলগ্ন সেই শুষ্ক-প্রায় আম গাছটার মাথায়। ইহারই শাখা জড়াইয়া উঠিয়াছিল গহরের মাধবী ও মালতী লতার কুঞ্জ। সেদিন শুধু কুঁড়ি ধরিয়াছিল, ইহারই গুটি কয়েক আমাকে সে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল কেবল কাঠ-পিঁপড়ার ভয়ে পারে নাই। আজ তাহাতে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল, কত ঝরিয়াছে তলায়, কত বাতাসে উড়িয়া ছড়াইয়াছে আশে পাশে,—ইহারই কতকগুলি কুড়াইয়া লইলাম বাল্যবন্ধুর স্বহস্তের শেষ দান মনে করিয়া।

নবীন বলিল, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসিগে।

বলিলাম, নবীন, বাইরের ঘরটা একবার খুলে দাওনা দেখি।

নবীন ঘর খুলিয়া দিল। আজও রহিয়াছে সেই বিছানাটি তক্তপোষের একধারে গুটানো, একটি ছোট পেন্সিল, কয়েক টুকরা ছেঁড়া কাগজ,—এই ঘরে গহর সুর করিয়া শুনাইয়াছিল তাহার স্বরচিত কবিতা—বন্দিনী সীতার দুঃখের কাহিনী। এই গৃহে কতবার আসিয়াছি কতদিন খাইয়াছি শুইয়াছি, উপদ্রব করিয়া গেছি, সেদিন হাসিমুখে যাহারা চাহিয়াছিল আজ তাহাদের কেহ জীবিত নাই। আজ সমস্ত আসা-যাওয়া শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

পথে নবীনের মুখে শুনিলাম এমনি একটি ছোট নোটের পুঁটুলি তাহার ছেলেদের হাতেও গহর দিয়া গেছে। অবশিষ্ট বিষয় সম্পত্তি যাহা রহিল পাইবে তাহার মামাতো ভাই-বোনেরা।

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম মস্ত ভিড়। গুরুদেবের শিষ্য-শিষ্যা অনেকে সঙ্গে আসিয়াছে, বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে, এবং হাব-ভাবে তাহাদের শীঘ্র বিদায় লওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বৈষ্ণব সেবাদি বিধিমতেই চলিতেছে অনুমান করিলাম।

দ্বারিকাদাস আমাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আমার আগমনের হেতু তিনি জানেন। গহরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মুখে কেমন যেন একটা বিব্রত, উদ্‌ভ্রান্ত ভাব,—পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই। আন্দাজ করিলাম হয়ত এতদিন ধরিয়া এতগুলি বৈষ্ণব পরিচর্য্যায় তিনি ক্লান্ত, বিপর্য্যস্ত, নিশ্চিন্ত হইয়া আলাপ করিবার সময় নাই।

খবর পাইয়া পদ্মা আসিল, আজ তাহার মুখেও হাসি নাই, যেন সঙ্কুচিত,—পলাইতে পারিলে বাঁচে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমল-লতা দিদি এখন বড় ব্যস্ত, না পদ্মা?

—না, ডেকে দেবো দিদিকে? বলিয়াই চলিয়া গেল। এ সমস্তই আজ এমন অপ্রত্যাশিত, খাপছাড়া যে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। একটু পরে কমল-লতা আসিয়া নমস্কার করিল, বলিল, এসো গোঁসাই, আমার ঘরে গিয়ে বসবে চলো।

আমার বিছানা প্রভৃতি ষ্টেশনে রাখিয়া শুধু ব্যাগটাই সঙ্গে আনিয়াছিলাম, আর ছিল গহরের সেই বাক্সটা আমার চাকরের মাথায়। কমল-লতার ঘরে আসিয়া সেগুলা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, একটু সাবধানে রেখে দাও, বাক্সটায় অনেক গুলো টাকা আছে।

কমল-লতা বলিল, জানি। তারপরে খাটের নীচে সেগুলো রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা খাওয়া হয়নি বোধহয়?

—না।

—কখন এলে?

—বিকাল বেলা।

—যাই, তৈরি করে আনিগে, বলিয়া চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া উঠিয়া গেল।

পদ্মা মুখ-হাত ধোয়ার জল দিয়া চলিয়া গেল, দাঁড়াইলনা।

আবার মনে হইল ব্যাপার কি!

খানিক পরে কমল-লতা চা লইয়া আসিল, আর কিছু ফল-মূল-মিষ্টান্ন,—ও-বেলার ঠাকুরের প্রসাদ। বহুক্ষণ অভুক্ত,—অবিলম্বে বসিয়া গেলাম।

অনতিবিলম্বে ঠাকুরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের শব্দ আসিয়া পৌঁছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, কই, তুমি গেলেনা?

—না, আমার বারণ।

—বারণ? তোমার? তার মানে?

কমল-লতা ম্লান হাসিয়া কহিল, বারণ মানে বারণ গোঁসাই। অর্থাৎ, ঠাকুর-ঘরে যাওয়া আমার নিষেধ।

আহারে রুচি চলিয়া গেল,—বারণ করলে কে?

—বড় গোঁসাইজির গুরুদেব। আর তাঁর সঙ্গে এসেছেন যাঁরা,—তাঁরা।

—কি বলেন তাঁরা?

—বলেন আমি অশুচি, আমার সেবায় ঠাকুর কলুষিত হন।

—অশুচি তুমি! বিদ্যুদ্বেগে একটা কথা মনে জাগিল,—সন্দেহ কি গহরকে নিয়ে?

—হাঁ, তাই।

কিছুই জানিনা, তবু অসংশয়ে বলিয়া উঠিলাম, এ মিথ্যে,—এ অসম্ভব!

—অসম্ভব কেন গোঁসাই?

—তা জানিনে কমল-লতা, কিন্তু এতবড় মিথ্যে আর নেই। মনে হয়, মানুষের সমাজে এ তোমার মৃত্যু-পথ-যাত্রী বন্ধুর ঐকান্তিক সেবার শেষ পুরস্কার।

তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বলিল, আর আমার দুঃখ নেই। ঠাকুর অন্তর্যামী, তাঁর কাছে তো ভয় ছিলনা, ছিল শুধু তোমাকে। আজ আমি নির্ভয় হয়ে বাঁচলুম গোঁসাই।

—সংসারে এত লোকের মাঝে তোমার ভয় ছিল শুধু আমাকে? আর কাউকে নয়?

—না, আর কাউকে না। শুধু তোমাকে।

ইহার পরে দুজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। একসময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়-গোঁসাইজি কি বলেন?

কমল-লতা কহিল, তাঁর তো কোন উপায় নেই। নইলে কোন বৈষ্ণবই যে এ মঠে আর আসবেনা। একটু পরে বলিল, এখানে থাকা চলবেনা, একদিন আমাকে যেতে হবে তা জানতুম, শুধু এমনি করে যে যেতে হবে তা' ভাবিনি

গোঁসাই। কেবল কষ্ট হয় পদ্মার কথা মনে করে। ছেলে মানুষ, তার কোথাও কেউ নেই—বড় গোঁসাই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাকে নবদ্বীপে, দিদি চলে গেলে সে বড্ড কাঁদবে। যদি পারো তাকে একটু দেখো। এখানে থাকতে যদি না চায় আমার নাম করে তাকে রাজুকে দিয়ে দিও,—ওর যা ভালো সে তা' করবেই করবে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই টাকাগুলো কি হবে? নেবেনা?

—না। আমি ভিখিরী, টাকা কি করবো বলোত?

—তবু যদি কখনো কাজে লাগে—।

কমল-লতা এবার হাসিয়া বলিল, টাকা আমারোত একদিন অনেকছিল গো, কি কাজে লাগ্‌লো? তবু যদি কখনো দরকার হয় তুমি আছো কি করতে? তখন তোমার কাছে চেয়ে নেবো—গহরের টাকা নিতে যাবো কেন?

এ কথায় কি যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না শুধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে পুনশ্চ কহিল, না গোঁসাই, আমার টাকা চাইনে, যাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেচি তিনি আমাকে ফেলবেন না। যেখানেই যাই সব অভাব তিনিই পূর্ণ করে দেবেন। লক্ষ্মীটি, আমার জন্যে ভেবোনা।

পদ্মা ঘরে আসিয়া বলিল, নতুন-গোঁসাইয়ের জন্যে প্রসাদ কি এ ঘরেই আনবো দিদি?

—হাঁ, এখানেই নিয়ে এসো। চাকরটিকে দিলে?

—হাঁ, দিয়েছি।

তবু পদ্মা যায়না, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি খাবেনা দিদি?

—খাবো রে পোড়ারমুখী খাবো। তুই যখন আছিস তখন না খেয়ে কি দিদির নিস্তার আছে?

পদ্মা চলিয়া গেল।

সকালে উঠিয়া কমল-লতাকে দেখিতে পাইলামনা, পদ্মার মুখে শুনিলাম সে বিকালে আসে। সারাদিন কোথায় থাকে কেহ জানেনা। তবু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলামনা, রাত্রের কথা স্মরণ করিয়া কেবলি ভয় হইতে লাগিল পাছে সে চলিয়া গিয়া থাকে, আর দেখা না হয়।

বড়-গোঁসাইজির ঘরে গেলাম। খাতাগুলি রাখিয়া বলিলাম, গহরের রামায়ণ। তার ইচ্ছে এগুলি মঠে থাকে।

দ্বারিকাদাস হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, তাই হবে নতুন-গোঁসাই। যেখানে মঠের সব গ্রন্থ থাকে তার সঙ্গেই এটি তুলে রাখবো।

মিনিট দুই নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলাম, তার সম্বন্ধে কমল-লতার অপবাদ তুমি বিশ্বাস করো গোঁসাই?

দ্বারিকাদাস মুখ তুলিয়া কহিলেন, আমি? কখনো না।

—তবু তো তাকে চলে যেতে হচ্চে?

—আমাকেও যেতে হবে গোঁসাই। নির্দোষীকে দূর করে যদি নিজে থাকি তবে মিথ্যেই এ পথে এসেছিলাম, মিথ্যেই এতদিন তাঁর নাম নিয়েছি।

—তবে কেনই বা তাকে যেতে হবে? মঠের কর্ত্তা তো তুমি,—তুমি তো তাকে রাখতে পারো?

—গুরু! গুরু! গুরু! বলিয়া দ্বারিকাদাস অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। বুঝিলাম গুরুর আদেশ ইহার অন্যথা নাই।

—আজ আমি চলে যাচ্চি গোঁসাই, বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিবার কালে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন দেখি, চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, আমাকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন, আমিও প্রতি-নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ক্রমে অপরাহ্ন বেলা সায়াহ্নে গড়াইয়া পড়িল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি আসিল কিন্তু কমল-লতার দেখা নাই। নবীনের লোক আসিয়া উপস্থিত আমাকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিবে, ব্যাগ মাথায় লইয়া কিষণ ছটফট করিতেছে—সময় আর নাই,—কিন্তু কমল-লতা ফিরলনা। পদ্মার বিশ্বাস সে আর একটু পরেই আসিবে, কিন্তু আমার সন্দেহ ক্রমশঃ প্রত্যয়ে দাঁড়াইল। সে আসিবেনা। শেষ বিদায়ের কঠোর পরীক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়া সে পূর্ব্বাহ্নেই পলায়ন করিয়াছে, দ্বিতীয় বস্ত্রটুকুও সঙ্গে লয় নাই। কাল আত্মপরিচয় দিয়াছিল ভিক্ষুক বলিয়া, আজ সেই পরিচয়ই সে অক্ষুণ্ণ রাখিল।

যাবার সময়ে পদ্মা কাঁদিতে লাগিল। আমার ঠিকানা দিয়া বলিলাম, দিদি বলেছে আমাকে চিঠি লিখ্‌তে,—তোমার যা ইচ্ছে তাই আমাকে লিখে জানিও পদ্মা।

—কিন্তু আমি তো ভাল লিখতে জানিনে গোঁসাই।

—তুমি যাই লিখবে আমি তাই পড়ে নেব।

—দিদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

—আবার দেখা হবে পদ্মা, আজ আমি যাই, বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

১৪

সমস্ত পথ চোখ যাহাকে অন্ধকারেও খুঁজিতেছিল তাহার দেখা পাইলাম রেলওয়ে ষ্টেশনে। লোকের ভিড় হইতে দূরে দাঁড়াইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল, একখানি টিকিট কিনে দিতে হবে গোঁসাই—

—সত্যিই কি তবে সকলকে ছেড়ে চল্‌লে?

—এ ছাড়া তো আর উপায় নেই।

—কষ্ট হয় না কমল-লতা?

—এ কথা কেন জিজ্ঞেসা করো গোঁসাই, জানো ত সব।

—কোথায় যাবে?

—যাবো বৃন্দাবনে। কিন্তু অতো দূরের টিকিট চাইনে—তুমি কাছাকাছি কোন-একটা যায়গার কিনে দাও।

—অর্থাৎ, আমার ঋণ যত কম হয়। তারপরে সুরু হবে পরের কাছে ভিক্ষে যতদিন না পথ শেষ হয়। এই তো?

—ভিক্ষে কি এই প্রথম সুরু হবে গোঁসাই? আর কি কখনো করিনি?

চুপ করিয়া রহিলাম। সে আমার পানে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল, কহিল, দাও বৃন্দাবনেরই টিকিট কিনে।

—তবে চলো একসঙ্গেই যাই?

—তোমারো কি ঐ এক পথ নাকি?

বলিলাম, না, এক নয়, তবু যতটুকু এক করে নিতে পারি।

গাড়ী আসিলে দুজনে উঠিয়া বসিলাম। পাশের বেঞ্চে নিজের হাতে তাহার বিছানা করিয়া দিলাম।

কমল-লতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—ওকি কোরচো গোঁসাই?

—করচি যা' কখনো কারো জন্যে করিনি,—চিরদিন মনে থাকবে বলে।

—সত্যিই কি মনে রাখতে চাও?

—সত্যিই মনে রাখতে চাই কমল-লতা। তুমি ছাড়া যে-কথা আর কেউ জানবে না।

—কিন্তু আমার যে অপরাধ হবে গোঁসাই?

—না, কোন অপরাধ হবে না,—তুমি বোসো।

কমল-লতা বসিল, কিন্তু বড় সঙ্কোচের সহিত। গাড়ী চলিতে লাগিল কত গ্রাম, কত নগর, কত প্রান্তর পার হইয়া,—অদূরে বসিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার জীবনের কত কাহিনীই বলিতে লাগিল। তাহার পথে পথে বেড়ানোর কথা, তাহার মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন রাধাকুণ্ড বাসের কথা, কত তীর্থ ভ্রমণের গল্প, শেষে দ্বারিকা দাসের আশ্রয়ে মুরারিপুর আশ্রমে আসা। আমার মনে পড়িয়া গেল ঐ লোকটির বিদায়-কালের কথাগুলি, বলিলাম জানো কমল-লতা, বড় গোঁসাই তোমার কলঙ্ক বিশ্বাস করেন না।

—করেন না?

—একেবারে না। আমার আসবার সময়ে তাঁর চোখে জল পড়তে লাগলো, বল্‌লেন, নির্দ্দোষীকে দূর করে যদি নিজে থাকি নতুন গোঁসাই, মিথ্যে তাঁর নাম নেওয়া, মিথ্যে আমার এ-পথে আসা। মঠে তিনিও থাকবেন না কমল-লতা, এমন নিষ্পাপ মধুর আশ্রমটি একেবারে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে।

—না যাবে না, একটা কোন পথ ঠাকুর নিশ্চয় দেখিয়ে দেবেন।

—যদি কখনো তোমার ডাক পড়ে ফিরে যাবে সেখানে?

—না।

—যদি তাঁরা অনুতপ্ত হয়ে তোমাকে ফিরে চান?

—তবুও না।

একটু পরে কি ভাবিয়া কহিল, শুধু যাবো যদি তুমি যেতে বলো। আর কারো কথায় না।

—কিন্তু কোথায় তোমার দেখা পাবো?

এ প্রশ্নের সে উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে ডাকিলাম, কমল-লতা? সাড়া আসিল না, চাহিয়া দেখিলাম সে গাড়ীর এককোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়াছে। সারাদিনের শ্রান্তিতে ঘুমাইয়া

পড়িয়াছে ভাবিয়া তুলিতে ইচ্ছা হইল না। তারপরে নিজেও যে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানিনা, হঠাৎ এক সময়ে কানে গেল,—নতুন-গোঁসাই ?

চাহিয়া দেখি সে আমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছে। কহিল, ওঠো, তোমার সাঁইথিয়ায় গাড়ী দাঁড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম, পাশের কামরায় কিষণ ছিল ডাকিয়া তুলিতে সে আসিয়া ব্যাগ নামাইল, বিছানা বাঁধিতে গিয়া দেখা গেল যে-দু'একখানায় তাহার শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম সে তাহা ইতিপূর্ব্বেই ভাঁজ করিয়া আমার বেঞ্চের একধারে রাখিয়াছে। কহিলাম, এ টুকুও তুমি ফিরিয়ে দিলে,—নিলে না ?

—কতবার ওঠা-নামা করতে হবে এ-বোঝা বইবে কে ?

—দ্বিতীয় বস্ত্রটিও সঙ্গে আনোনি,—সেও কি বোঝা ? দেবো দু'একটা বার করে ?

—বেশ যা হোক তুমি। তোমার কাপড় ভিখিরীর গায়ে মানাবে কেন ?

বলিলাম, কাপড় মানাবেনা, কিন্তু ভিখিরীকেও খেতে হয়। পৌঁছতে আরো দুদিন লাগবে, গাড়ীতে খাবে কি ? যে খাবারগুলো আমার সঙ্গে আছে তাও কি ফেলে দিয়ে যাবো,—তুমি ছোঁবে না ?

কমল-লতা এবার হাসিয়া বলিল,—ইস্ রাগ ছাখো ! ওগো, ছোঁবো গো ছোঁবো, থাক্ ও-সব, তুমি চলে গেলে আমি পেট ভরে গিলবো।

সময় শেষ হইতেছে, আমার নামিবার মুখে কহিল, একটু দাঁড়াও তো গোঁসাই, কেউ নেই আজ লুকিয়ে তোমায় একটা প্রণাম করে নিই. এই বলিয়া হেঁট হইয়া আজ সে আমার পায়ের ধূলা লইল।

প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি তখনো পোহায় নাই. নীচে ও উপরের অন্ধকার স্তরে একটা ভাগাভাগি সুরু হইয়াছে, আকাশের এক প্রান্তে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ শীর্ণ-শশী অপর প্রান্তে উষার আগমনী। সেদিনের কথা মনে পড়িল যেদিন ঠাকুরের ফুল তুলিতে এম্‌নি সময়ে তাহার সাথী হইয়াছিলাম। আর আজ ?

বাঁশী বাজাইয়া সবুজ আলোর লণ্ঠন নাড়িয়া গার্ড সাহেব যাত্রার সঙ্কেত করিল। কমল-লতা জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া এই প্রথম আমার হাত ধরিল, কণ্ঠে কি যে মিনতির সুর তাহা বুঝাইব কি করিয়া, বলিল, তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি,—আজ একটি কথা রাখবে ?

হাঁ রাখবো, বলিয়া চাহিয়া রহিলাম—

বলিতে তাহার এক মুহূর্ত্ত বাধিল, তারপরে কহিল, আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদ-পদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও,—নির্ভয় হও। আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ করোনা গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তাহার সেই হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমল-লতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক,—আমার বলে আর তোমাকে আমি অসম্মান করবোনা।

হাত ছাড়িয়া দিলাম, গাড়ী দূর হইতে দূরে চলিল, গবাক্ষ-পথে তাহার আনত মুখের পরে ষ্টেশনের সারি সারি আলো কয়েকবার আসিয়া পড়িয়া আবার সমস্ত অন্ধকারে মিলাইল। শুধু মনে হইল হাত তুলিয়া সে যেন আমাকে শেষ নমস্কার জানাইল।

সমাপ্ত

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়; ২৫শে পৌষ ১৩৩৯ ॥ রাত্রি ১১টা ॥

আগামী মাস হইতে শরৎচন্দ্রের আর একখানি সুবৃহৎ নূতন উপন্যাস "বিপ্রদাস" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

অসমাপ্ত

শ্রীমতী প্রকৃতি ঘোষ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২১

চৈত্র মাসের শেষাশেষি পরীক্ষা দিয়ে দাদা বাড়ী এল একদিন বিকেল বেলা। চেহারা দেখে আমরা সবাই অবাক্! মাথা থেকে পা অবধি ধুলোয় ভর্ত্তি, মুখে কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে! মা বল্লে "গাড়ী আস্‌বার সময় হয়নি এখনো, তুই কি করে এলি।" দাদা বল্লে "হেঁটে, সকালে বেরিয়েছি, রাস্তায় আবার জুতো ছোট হ'য়ে ফোস্কা পড়ল, পথে গোটাকতক চকোলেট্ আর বিস্কুট্ খেয়ে এসেছি।" মা বল্লেন "যা, যা, স্নান করে আয়, আমি খাবার করে দিচ্ছি এখুনি।"

সন্ধ্যের সময় দাদা আমাকে তার একটু পা টিপে দিতে বললে। আমার ভারি আনন্দ হোল, দাদা কখন পায়ে হাত দিতে দিত না, যদি জোর করে দিতুম তবে বড় রেগে যেত। একটু পরেই দাদা ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

পোষ মাসে ঠাকুমা মারা যান, ঠাকুমার কাজের সময় ছোট্‌দিকে আনা হয়। দাদা বাড়ী আসাতে আমাদের চার ভাই-বোনের হাসি গল্প ও ছেলেমানুষী ঝগড়াতে বাড়ী আবার আগের মত ভরে উঠ্‌ল। তার উপর ছোট্‌দির ছেলেকে নিয়ে যখন কাড়াকাড়ি সুরু হোত তখন বেচারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠ্‌তো। রোজ সন্ধ্যের সময় উঠোনে আমাদের চারজনে ছোট্ট একটি সভা বস্‌তো। কত রকমের কথায় নিমিষের মত সময় চলে যেত। একদিন কথা উঠ্‌ল কে কি স্বপ্ন দেখে। দিদি বল্‌লে প্রথমে, "আমি বেশীর ভাগ তোদেরই স্বপ্ন দেখি—" ছোট্‌দি বল্লে—"আমার বেশীর ভাগই স্বপ্ন ঘুম ভাঙ্গলে মনে থাকে না—।" দাদা বল্লে "আমি বেশীর ভাগ নিজের স্বপ্ন দেখি—" আমি বল্লুম —"আমি দেখি দাদা আর আমি কত সব অদ্ভুত নতুন ধরণের দেশে বেড়াচ্ছি, আমার সব স্বপ্ন গল্পের মত।" তারপর একটু চুপ করে বল্লুম "দেখ কাল একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি, যেন কোন্ পার্ব্বত্য দেশে গেছি, তখনো যেন দাস প্রথা উঠে যায়নি, যে দেশে গেছি সে দেশের মেয়েদের অবিকল গোলাপ ফুলের মত রং আর ভারি চমৎকার মুখ চোখ, কিন্তু পুরুষদের চেহারা তেমন ভাল না—" দাদা বাধা দিয়ে বল্লে "আচ্ছা তুই পরে বল্‌বি আগে আমি একটা গল্প বলে নিই, মা তুমিও শুনবে এস, সকলে মন দিয়ে শোন।" দাদা বল্‌তে আরম্ভ করলে :—

সে আজ বহুদিন হ'ল; কপালে তখন সবে উষার আলো এসে পড়্‌ছে।

বেশ মনে পড়ে সেই দিনটা। আমি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে—"নাগা সিকি" তখন সবে ছাড়্‌ছে তীরের উপর সাদা রুমাল মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে—আর ক্বচিৎ দু'একটি মেয়ের মুখ।—

—ক্রমে মাঝ সাগরে এসে পড়লাম—সবুজে আভা জল—দু' এক ঝাঁক flying fish—নীল আকাশ—জাহাজের শব্দ—।

দিনের পর দিন কেটে যায়—সমুদ্রের বুকে আমাদের জাহাজ তা'র বুকে গুটিকয়েক মানব-শিশু; সাগর শান্ত—আকাশ সাদা ছেঁড়া মেঘে মাঝে মাঝে ঢাকা।

সাংহাই; নামা গেল। রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে দেখি—ময়লা কাফে—ময়লা লোক। কিন্তু এই অপরিচ্ছন্নতা ডুবিয়ে দিয়ে হঠাৎ একদল ছেলে মেয়ে—পথের উপর দেখা দেয়—চেহারা তাদের সুন্দর নয় এটা ভুলে যাই তাদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখ দেখে; ছুটোছুটী দাপাদাপি কর্‌তে কর্‌তে বাঁকের ওধারে তারা মিলিয়ে গেল।—আবার সেই ময়লা গলি—আবার সেই কোলাহলময় জেটীঘাট।

—জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে চীনের তটরেখা মিলিয়ে যা'চ্ছে—আর জেগে উঠ্‌ছে—কন্‌ফুশিয়সের গুরুগম্ভীর বাণী।—ঐ মিলিয়ে গেল—আফিম্ ফুলের মাদকতা মিলিয়ে গেল।—Sun-yat-sen—পাঁচরঙা পতাকা।

—দূরে জাপানের কোন এক পাহাড়ের চুড়ো দেখা গেল, আমরা এগিয়ে চল্‌লাম।

ইয়োকোহামা।—যাত্রীরা নেমে গেল। তাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবর্গ এসেছে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে। ধীরে ধীরে ঘাট শূন্য হ'য়ে পড়ে। সন্ধ্যা হয় হয়। এক পরিচিত বাঙালীর আশ্রয়ে যাই।

—সকাল বেলায় বেড়াতে বেরিয়ে দেখ্‌লাম ইয়োকোহামায় রাস্তা দোকান ইত্যাদি।

সরু রাস্তা চলে গিয়েছে—মাঝে ট্রাম লাইন দুধারে কাঠের বাড়ী—মনে হয় যেন রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়েছে। —দোকান যেমন—মাঝারি সহরে হয় তেমনি আর কি—আর notice boardগুলির উপর জাপানী, চীনা ও ইংরাজি হরফ।

বন্ধুবর আমায় এক জাপানী ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। আমার চোখে বাড়ীটী বড় সুন্দর লাগ্‌ল—ছোট বাগানের মধ্যে অজস্র চন্দ্রমল্লিকা—আর একপাশে একটি চেরীফুলের গাছ—পুষ্পিত।

আলাপ করে' বুঝলাম যে জাপানীরা বাস্তবিকই ভদ্রলোক। ঘরে একখানি ছবি দেখলাম—একটা সাদা হাঁস পড়ে যাচ্ছে—বুকে তার রক্তাক্ত তীর বেঁধা।

জাপানের পার্কগুলি দেখবার মত। গাছপালা লতাপাতায় মিলে একটা গাঢ় সবুজ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে—তা'র মাঝে একটি পুকুর তাতে পদ্ম ফুটে রয়েছে—ছেলেরা বিচিত্র পোষাক পরে' ছুটে ছুটে খেলা করছে। পুকুরের পাড়ের একটু দূরেই একটী জাপানী মেয়েকে দেখলাম—and she impressed me. গাঢ় সবুজ বনানীর মাঝে তা'র চেরী রঙা পোষাক—তা'র টুকটুকে ঠোঁট সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় তনু—গভীর নীল চোখ—সব মিলে যেন একটা মায়ার সৃষ্টি করে।—জাপানীদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান আছে।

কিয়াতো। একটু পুরাণো পুরাণো ভাব। ক্ষমতা হারিয়ে মিকোদা এখানে কতকাল কাটিয়েছেন—তার ঠিক নেই। বৌদ্ধ মন্দির দেখলাম—অনেকটা বর্ম্মার pagodaর মত। পুরোহিতদের মুণ্ডিত মস্তক, শান্তোজ্জ্বল দীপ্তি, জাফ্‌রাণ্‌ রঙা বহির্ব্বাস।

টোকিও। বিংশ-শতাব্দীর মধ্যে যে এসেছে বেশ বোঝা যায়। রাস্তাগুলি বেশ চওড়া—একটা parkএ এসে পড়্‌লাম। বন্ধু দেখিয়ে দিলেন সামনেই Government house। সাদা রংয়ের বেশ লাগল। রাস্তা দিয়ে লোকজন ছুটে যাচ্ছে কিন্তু তত গোলমাল নেই।

বেড়াতে বেড়াতে পাড়াগাঁয়ে এসে পড়্‌লাম। মাঠের পর মাঠ—শেষে দূর দিক্‌চক্রবাল। রাস্তার দু'পাশে গাছ-পালা বেশ একটা আপন আপন ভাব লাগল।

জাপানের ভূমিকম্পের কথা অনেক রকমে জান্‌তে পেরেছি। আজ সেই আগ্নেয় গিরির পদতলে। খানিকটা ওঠা গেল। রাত হ'য়ে এসেছে। আমরা "ফুজিসান" পাহাড়ের গা বেয়ে উঠ্‌ছি—আর দলে দলে tourist নেমে যাচ্ছে। চাঁদ উঠ্‌ল তত উজ্জ্বল নয়—আমরা থেমে পড়লুম পিছনে গাঢ় অন্ধকার—পায়ের তলায় চাঁদের আলো—দূরে দূরে গ্রামের দীপ দেখা যাচ্ছে—কথাবার্ত্তা আপ্‌না হতেই বন্ধ হ'ল। —শুধু আলো আর আঁধার তারি মাঝে দু'টী বিদেশী।

—রাত অনেক হোল আমরা এক গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। বুড়ো কর্ত্তা অনেক গল্পই করলে বল্‌লে—বৌদ্ধশ্রমণদের কথা—সামুরাইদের কথা—জাপান যুদ্ধের কথা—তার চোখে দেখ্‌লাম একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি। রাত গভীর হোল—চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে—চেরী ফুলের স্তবকে—চন্দ্রমল্লিকার দলে—নিঃসাড় বহিঃপ্রকৃতির মাঝে—"ফুজিসান" পর্ব্বত কালো মাথা আকাশের গায়ে তুলে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে।—

* * * *

তারপর আসবার সময় প্রকৃতির জন্যে জাপানের খেল্‌না কিনলুম—আমি বাধা দিয়ে বল্‌লুম—"আমার জন্যে! আমি? আমি আবার কোথা থেকে এলাম, ওঃ বুঝেছি গল্পটা আগাগোড়া তোমার নিজের বানানো। এতক্ষণ ধরে আমাদের ভোগা দিলে।" দাদা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে "নারে, না, আমি ভোগা দিইনি, আমার তৈরিও নয়, হয়েছিল কি জানিস্‌ এক রাত্রে জাপানের একখানা বইত পড়্‌তে পড়্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যা বল্লাম ঠিক্‌ তাই স্বপ্ন দেখ্‌লুম, অবশ্য দু'এক জায়গা'য় আমার কল্পনা আছে।', আমি অবাক হ'য়ে বল্লাম "কিন্তু দাদা তুমি তো pagoda দেখনি।" দাদা বল্লে "pagodaর বর্ণনা আমি পড়েছি, শুনেছি; স্বপ্নে আমি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া, পৃথিবীর কত দেশ ঘুরে এসেছি, আমি বড় হয়ে এদেশে থাক্‌বোনা, ওদেশে গিয়ে থাক্‌বো।" আমি বল্লুম "দাদা তুমি কি এখন আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছ যে আমার জন্যে খেল্‌না কিন্‌লে।" দাদা বল্লে "তা' আমি কি করবো স্বপ্নে যা' দেখেছি তাই বলেছি।"

(ক্রমশঃ)

প্রকৃতি ঘোষ

শিল্পী ও মডেল

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম্-এ

নমস্কার !...ধন্যবাদ !—

আবার সন্ধ্যার
ধূলিম্লান, দীপস্নিগ্ধ, ঈষৎ আঁধার
ছিনাইয়া নিল তারে। আবার দূরের
ধূসর তাম্রাভ পথে তাহার পায়ের
মৃদু চিহ্ন হইল অঙ্কিত। শেষ দেখা
ফুরাইল আজিকার।...
আমি হেথা একা।...

আকাশের মসীলিপ্ত গাঢ় নিলীমার
মাঝে ধীরে ফুটিছে তারকা। আজিকার
মনোরম জ্যোৎস্নারাশি রজত-ধারায়
ছড়িয়ে পড়িবে পথে, পাদপ লতায়
গৃহচূড়ে, প্রাচীরের গায়ে। নিশি শেষে
মুক্ত বাতায়ন দিয়ে পড়িবে তা' এসে
আমার শয্যার পরে।...বিনিদ্র-নয়নে
কাটাব রজনী আমি স্মৃতিতপ্ত মনে।
সে আমার কর্ম্মময় দিবস ব্যাপিয়া
চোখের সমুখে ছিল। ঈষৎ হাসিয়া
বসেছিল আপনার আসনের পরে,
স্থির-নেত্রে, মোহন ভঙ্গীতে, গর্ব্বভরে,
সৌন্দর্য্যের আভিজাত্যে স্বভাব-উন্নত
শির যার বসে সে যেরূপে। বাণাহত
হরিণের মত ত্রস্ত অন্ধ চিত মোর
চেয়েছিল প্রাণপনে পাতি রেখা ডোর
পত্রেতে ফলাতে ওই অঙ্গের গরিমা।

সে শুধুই বসে ছিল—রূপের প্রতিমা !—
আপনার ভাবে ভোলা, নিজেতে তন্ময় !
ভাবে নাই সেথা বক্ষরক্ত বিনিময়
করি' কেহ আপনার লেখনীর আগে
নিতেছিল হরি'—তার স্নিগ্ধ গ্রীবাভাগে
বেণীর কোমল স্পর্শ, নয়ন কোনের
মোহময় স্বপন আবেশ ; অধরের
পুষ্পিত রেখার মাঝে মিশ্র হাসি বাথা ;
নাসিকার প্রাণস্পর্শী তীক্ষ্ণ কোমলতা ;
বাহুর উন্মুক্ত আভা, কণ্ঠের কুঞ্চন ;
বক্ষ মাঝে বসনের বন্ধুর বেষ্টন ;
কটি হ'তে পদতলে, ভাঁজে ভাঁজে বাঁধা
অঙ্গের অস্ফুট কান্তি, সযতনে সাধা
সুমধুর রাগিণীর মত। ভাবে নি সে
তারে দিয়ে রূপরাশি, ক্রুরভাবে পিষে
নিয়েছে বিধাতা মোর শান্তি প্রাণ হ'তে ;
ভরেছে জীবন মম পরতে পরতে

মর্ম্মন্তুদ বেদনার কালো ছায়া দিয়ে।
তাই কর্ম্মশেষে উঠি' ক্লান্ত হাসি নিয়ে,
আঁচলটি তুলি' কাঁধে, 'নমস্কার' বলে
আপন আবাস পানে যায় ধীরে চলে।

——০——

পর্য্যায়কে সাজিয়ে তোলবার যে একটা চেষ্টা সেইটিই আর্টের উৎকর্ষের দিক। আর্টের সৃষ্টির মূলে থাকবে একটা প্রকাশের আনন্দ; একটা বিশেষ আর্টিষ্টিক্-অনুভূতি, একটা অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষা সেই চির-সুন্দরকে বাইরে ফুটিয়ে তোলবার। ভারতীয় আর্ট তাই মানবধর্ম্মী আর এর মাঝে "Abstract ideas of Hindu Philosophy" হ'য়ে উঠেছে - materialised." সুন্দরের আবাহন না থাক্‌লে একটা গোটা জাতের শিল্পলীলা এমন ক'রে শুধু দেবদেবীদের মূর্ত্তিতে ভ'রে উঠে কী? যাই-ই হ'ক, এই যে প্রকাশের প্রেরণা, এই যে আকাঙ্ক্ষা একে ঠিক নাম দিতে গেলে, ব'লতে হয় খেয়াল। অতএব দেখা যাচ্ছে আর্ট সৃষ্টির অতি-আরম্ভে থাক্‌বে একটা খেয়াল। খেয়ালটা হ'চ্ছে শারীরিক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আমাদের চির-সক্রিয় মনের একটা বিশেষ বাহ্যিক পরিবেশের মধ্যে প্রকাশ-পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের আনন্দ-খেয়াল এই ভাবেই তাঁর চিত্র-সৃষ্টির মূলে ধরা প'ড়ে গেছে। তাজের সৃষ্টির প্রারম্ভেও ছিল সাজাহাঁর ওই রকম একটি খেয়াল। মমতাজকে হারিয়ে তিনি যখন হ'য়ে উঠ্‌লেন সম্পূর্ণ দৈহিক কার্যশূন্য অথচ মনটা মমতাজের বিরহে 'বেদনা উজ্জ্বল' সেই সময় তাঁর বেদনা-পাগল প্রাণের সুষ্ঠু-খেয়ালে তাজের অপরূপ মর্ম্মর-লেখা পরিকল্পিত হ'য়ে গেল। পরিকল্পনায় এই রূপটিই ছিল না, এ রূপটি দিয়েছে আর্টের উৎকর্ষের দিক। তিনি ভেবেছিলেন "এমন কিছু ক'রবো যাতে ক'রে আমার প্রেম, আমার ভাব-ব্যাকুল প্রাণের খেয়াল চিরন্তন হ'য়ে 'কালের কপোলতলে' ফুটে থাকবে।" এই যে 'এমন কিছু' একে রূপ দিয়েছে, আজকের এই স্বপ্ন-মায়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে আর্টের উৎকর্ষের পরম পরিণতির দিক। সৃষ্টিতে থাকে প্রাণের আনন্দ আর কৃষ্টিতে থাকে মনের আর চোখের তৃপ্তি। মনে আর প্রাণে একটা বিভেদ আছে। মন অতি মাত্রায় বৈষয়িক, সে বোঝে কেমন ক'রে "থলি থালি" আঁকড়ে নিয়ে "হিসাবের খাতায়" ঝুঁকে থাকতে হয়। সেখানে আর্টের দাম আছে বন্দনা নেই। তাই আর্টকে,—সুন্দরকে ভালোবাসতে যেয়ে সে আবার হঠাৎ ফিরে দাঁড়ায় আর বলে—"সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে' যায়। আর নয়, যাও তুমি চলে' যাও—নইলে বিপদ ঘটবে।"—রক্তকরবী। এই যে "বিপদের আশঙ্কায় মনটা দুলে উঠল' একি বিষয়কে হারিয়ে ফেলবার ভয়েই নয়? সে বরণ ক'রতে যেয়েও পিছিয়ে এল' কারণ "It is Art that brings joy and sorrow into the realistic mind."—কিন্তু প্রাণে আছে আর্টকে চিরন্তন করে দেবার একটা বিশিষ্ট প্রেরণা। আর্টের জন্ম তাই রক্ত-মাংস-সম্পুট মনে নয়, একেবারে করুণ কোমল প্রাণের সদরে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে আছে ওই প্রাণের নিবিড় নাড়ী-যোগ; তাই তাতে চোখের পরিতৃপ্তি হয় না, হয় প্রাণের-দোলায় অশ্রান্তভাবে দোলা। হৃদয়-দোলায় দোলার আকাঙ্ক্ষা মানুষের অতি স্বাভাবিক। তাই-ই যদি না হবে তবে বাদল-মেঘের সজল-অভিসারের দিনে 'নীপশাখে ঝুলনা' বেঁধে ঝুলতে কিম্বা মধুর মাধবী সন্ধ্যায় সেই শ্যামল বসন্তকে ডেকে 'হৃদয়-দোলায় দোলা' দেবার ইচ্ছা জেগে ওঠে কেন?

আর্ট আর বিজ্ঞানে যেমন একটা দূরত্ব র'য়ে গেছে—আর্টের কৃষ্টিতে আর সৃষ্টিতেও তেমনি একাত্মকতা নেই। বিজ্ঞান চোখে আঙুল দিয়ে সব দেখিয়ে দেয় আর আর্ট হৃদয়-বীণায় সঙ্গীত ঝঙ্কার তোলে; সেখানে বোঝবার চাইতে বাজবার মূল্য অনেক বেশী—"The arts, as regards teachableness, differ from the Sciences in this, that their power is founded not merely on facts which can be communicated, but on dispositions which require to be created." —Ruskin. এই "Dispositions create" করবার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের যথেষ্টই আছে। সৃষ্টি আর কৃষ্টির বিভিন্নতা ত আগেই দেখিয়েছি।

এখন রবীন্দ্রনাথের ছবির অন্যান্য দিকগুলি এবং সেই সঙ্গে তাঁর মনের বিভিন্ন ধারার একটা গুপ্ত-সংযোগ কেমন ক'রে ঘটেছে তাই-ই দেখিয়ে আমার প্রবন্ধ শেষ ক'রবো।

এই অঙ্কন-ব্যাপারে তাঁর মনের দু'টি দিকের বিকাশ সবচেয়ে বেশী। প্রথমে, তাঁর চির-সৌন্দর্য্য পিপাসু মনের একটা বিশেষ প্রকাশ হ'য়েছে এগুলির মাঝ দিয়ে; আর

দ্বিতীয় বিভাগে পাওয়া যায় তাঁর চিরানন্দময় প্রাণের, চিরন্তনী সবুজ প্রাণ-বীথির মাধবী মঞ্জরীর একটি দরদ-ভরা মঞ্জু-কাকলী!

মূর্ত্তি পূজার মাঝে পূজারীর মনের যে ধারাটি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে রবীন্দ্র-চিত্রেও তার অস্তিত্ব বেশ অনুভব করা যায়। পুরোহিত পূজায় বসেন,—দৃষ্টির সম্মুখে মাটিতে-গড়া পুতুল। অরসিকের মনে শুধু এই কথাটাই বারে বারে জাগে—"মিথ্যা, মিথ্যা, মূকের পূজা মিথ্যা।" পূজাকে যাঁরা শুধু মুক্তির পথ বলেই মনে ক'রে বসে আছেন, বৈষয়িকতায় যাঁরা "রক্তকরবীর" জালের ওপারের রাজাকেও ছাড়িয়ে উঠেছেন তাঁরাই শুধু ওকথা কইতে পারেন। তাঁরা পূজার বাহ্যিক উপকরণটুকু দেখেই তৃপ্ত; তারপরও যে কিছু থাকতে পারে কিম্বা আছে এ তাঁদের মনেও আসে না। মাটির পুতুলের মাঝ দিয়ে পুরোহিত কী শুধুই মুক্তি চায়? —না। সে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে মহীয়ান্ এক সৌন্দর্য্যের বন্দনা-গান করে। সৌন্দর্য্যের সাধনা, কিম্বা প্রাণের উদ্বোধন শিল্পীপ্রাণের পরম পরিণতি! রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলিতেও ওই পুরোহিতের মতই একটি রূপ-উদ্বেল মন আপনার অতি-অজানাতেই এসে ধরা প'ড়ে গেছে। যে অনুপমের সাথে তাঁর চোখের পরিচয় হয় নাই অথচ যাঁর পায়ের ধ্বনি অহরহ কানে বেজেছে—যাঁকে ইঙ্গিত ক'রে একদিন বলেছিলেন:—

'আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনি খানি।'—গীতাঞ্জলী

সেই তাঁরই অস্পষ্টতার, অচেনা-ভাবের আজ পূর্ণ প্রকাশ হ'য়েছে এই চিত্রগুলির মাঝ দিয়ে; তাই এগুলি শুধু "কালীর-আঁচড়" নয়। তিনি একদিন তাঁর "উড়ে-যাওয়া" গানে যা শুনতে চেয়েছিলেন এরা তাঁকে তাই-ই শোনায়—সেই:—

"..............................
সমুদ্র তীরের তান অজ্ঞাত রাজার
অগম্য রাজ্যের যত অপরূপ কথা,
সীমাশূন্য নির্জ্জনের অপূর্ব্ব বারতা।"—নৈবেদ্য

কিন্তু পুরোহিতের সাথে এক জায়গায় তফাৎ তাঁর র'য়ে গেছে। একজন আগাগোড়া সুন্দর ক'রে তাঁর সুন্দরের অভিবন্দনমালা সাজিয়েছেন—কিম্বা চেষ্টা অন্ততঃ ক রেছেন; আর একজন সেই বাইরের সৌন্দর্য্যকে দিয়েছেন নির্ব্বাসন। নেহাৎ সহজভাবেই তার সাজসজ্জার দিকগুলি ভরিয়ে দিয়েছেন। আভরণে তাদের দৈন্য প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সার্থকতার মহিমা তাদের অভিনবত্ব দিয়েছে, অন্তরের অভিব্যক্তি তাই ব্যাহত হয় নাই। কতকগুলি "Canon of Polyclets" কে "fetish" ক'রে নিয়ে নিজের সৌন্দর্য্য-পূজার প্রাণ-ধারাকে হত্যা ক'রে ফেলেন নাই। তিনি স্রষ্টা, তিনি দার্শনিক। গাম্ভীর্য্যের মাঝে যার জন্ম, অনন্তের মাঝে যার গভীর জাগরণ-প্রশস্তি সে কি তবে সবটুকুই ভুলে ভরা? তা' শুধু নিগূঢ় অন্তরের শান্ত, সৌম্য একটি অভিনব অভিব্যক্তির অপরিসীম সুপ্রকাশ। সাধারণ সবাই canon দেখেই বলে—'এ আবার কী ছবি, ভূতের মত?' এই শ্রেণীর সকলের সংজ্ঞা দিতে গেলে শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন মহাশয়ের মতে মত দিয়ে ব'লতে হয়:—"মানুষের ছবি, পশু পক্ষীর প্রতিকৃতি বা ফুল ফলের চেহারা এ-সব হচ্ছে শিল্পীর রস-বিন্যাসের আধার ও উপকরণ; এ-সবের ভিতর দিয়ে রসব্যঞ্জনা লীলায়িত হয় ব'লে তার আকারগত ঐক্যকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধ'রে রাখার উৎসাহ অরসিকের পক্ষেই সম্ভব।"

এরপর দ্বিতীয়ধারায় আছে তাঁর দরদের আর আনন্দের ছায়া। দরদ তাঁর এত গভীর যে, সামান্য "কাটাকুটীর" নীরবভাষা তাঁকে পাগল ক'রেছে,—তিনি তাদের অ-পূর্ব্ব-কল্পিত একটি রূপে রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছেন আর তারা আমাদের কল্পলোকের অতিথি হ'য়েও আজ বাস্তবে, চোখের সামনে অতি আপনজনের মতই এসে প'ড়েছে। রূপে তারা শ্রীর দাবী ক'রতে পারে না, কিন্তু তারা "বিশ্ব-বাউলের একতারাতে" যে সুর বেজে ওঠে তাহাই শোনায়। তাঁরই ভাষায়:—

"...........তবুও তাহারা
প্রাণের বিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি' দেয় সুর।"—বলাকা (ছবি)

এইখানেই তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গীর বিশেষত্ব। এদের ভিতর বাইরের রূপটির চেয়ে অন্তরের আন্তরিকতা অনবদ্য, সুন্দর! সব জিনিসের বাইরের রূপটাই যে 'সবখানি' নয়, একথাটাই এখানে বেশী ক'রে মনে জাগে। Ruskin-এর কথাটাই

"The picture which has the nobler and more numerous ideas, however awkwardly expressed, is a greater and a better picture than that which has the less noble and less numerous ideas, however beautifully expressed."—Modern Painters.

তাই বড় সত্যি ব'লে মনে হয়। তিনি কবিতার একটি লাইনে যেমন একটি বিপুল বিশ্বকে প্রকাশ ক'রে দিতে পারেন, এই রেখা-কবিতাগুলিতেও তেমনি সৌন্দর্য্য-সাগরের সবটুকু সঙ্গীত শুনিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ছবি তাই 'For art's Sake' নয়—এ একেবারে মর্ম্মমণিমঞ্জুষার সোণালী আবরণে গড়া। এই প্রকাশটিরই প্রতীক্ষা তিনি বোধ হয় একদিন ক'রেছিলেন, কিন্তু তা "আভাসেই," মৃদু "কঙ্কণ কিঙ্কিনি"তে মিলিয়ে গিয়েছিল—

"প্রভাতের আলোকে…
ফোটে নাই প্রকাশে,—"

আর আজ সে তমিস্রা কেটে গেছে। সেদিনের বলা কথা-গুলি তাঁর :—

"জীবনের শেষ দানে
জীবনের শেষ গানে,
হে দেবতা, তাই আজি
দিব তব সকাশে,
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে।"—গীতাঞ্জলি

আজ সত্যিই সার্থক হ'য়েছে। অঞ্জলি তাঁর পূর্ণ ক'রে যে উপহার দিয়েছেন তার মূল্য শুধু কথার মারপ্যাঁচে হয় না, হয় হৃদয়ের আনন্দ পরিতৃপ্তিতে। সেদিনের অস্পষ্টতার কুহেলী—আঁধার "শিশিরঘাতে" মিলিয়ে গেছে। কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—এই-ই যেন তাঁর "শেষ দান" না হয়!

আগেই ত ব'লেছি তাঁর 'আনন্দ' এর মাঝে মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রেছে। আনন্দ তিনি এত পেয়েছেন যে, নিজেই এক জায়গায় ব'লেছেন—"রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে প'ড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গিয়েছে। কোনকালে যে কবিতা লিখতুম সে কথা ভুলে গিয়েছি।" অন্তর যেখানে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মিলিয়ে গেছে সেখানে সবটুকু থাকার পর'ও একটা বিরাট রিক্ততা মাথানাড়া দিয়ে ওঠে। রবীন্দ্র-অঙ্কনে তাঁর সবটুকুই অন্তর পবিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। "বাণীর-কবিতা" "রেখার-কবিতার" কাছে পরাজিতা!

এই সঙ্গে তাঁর দু'খানি ছবির গূঢ়মর্ম্ম (আমি যা' বুঝেছি) অনবগুণ্ঠিত ক'রে দিলে—অপ্রাসঙ্গিক নেহাৎ হবে না বোধ হয়। একখানি তাঁর আঁকা নারীমূর্ত্তি। এর দৃষ্টির মাঝে সেই স্বপ্নময়ী, কুহকিনী নারীটির ইঙ্গিত অনুভব ক'রতে পারি,—যার উদ্দেশ্যে কবি 'নিরুদ্দেশ' কোন এক অজানা 'যাত্রা'-পথে ছুটে বেরিয়ে প'ড়েছিলেন আর শ্রান্ত-হৃদয়ে তৃষাতুর আর্ত্তকণ্ঠে যা'কে উদ্দেশে আহ্বান ক'রে ব'লে উঠেছিলেন :—

"—বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি।"
কহিবেনা কথা, দেখিতে পাবো না
নীরব হাসি।"—সোণারতরী

অপরখানিও একটি নারী-মূর্ত্তি—কলসী-কক্ষা। এই ছবিখানির অনেকের কাছে ব্যাখ্যা শুনেছি; সকলেই রায় দিয়েছেন—"কাঠের পুতুল।" বলবার কিছু নেই কারণ অমনি মতামত দেবার অধিকার চিত্রকর নিজেই দিয়েছেন; মানেটা খুসীমত করা যেতে পারে। তবে এতটা সহজ এ নয়। যেটা যত সোজা দেখতে—সেটা তত কঠিন বুঝতে। এটা স্বাভাবিক একটা ধর্ম্ম। এই ছবিখানির ভিতর দিয়ে তিনি সেই সহর-প্রবাসিনী পল্লীবালাটির মুক্তিবুভুক্ষু আত্মাকে রূপ দিয়েছেন। সহরের ইঁট-কাঠের বন্দীশালায় বন্ধ থেকে আত্মা যার একেবারে শুকিয়ে উঠেছে, মন যার একটু

শ্যাম-শ্রীর জন্য তৃষ্ণার্ত্ত এ তারই মূর্ত্তি। সে তার নিত্য-দিনের নদীর ধারে গিয়ে জল আনাকে ভোলেনি; তাই বুঝি বড় করুণ সুরেই ব'লছে—"বেলা-যে প'ড়ে এলো, জলকে চল্!"—তিনি ব'লেছেন তাঁর ছবিগুলি সব 'নির্ব্বাক'; কিন্তু এখানি দেখে সত্যিই ব'লতে হয় এরা "নির্ব্বাকের বাণীর" পরিপূর্ণ, মুখর আশীর্ব্বাদ। "Art has a language of its own'"—এটুকুর সত্যতা এরই মাঝে পাই।

শেষ পর্য্যন্ত ব'লে রাখছি যে এখানা রবীন্দ্রনাথের ছবির একটা গুরুভীর সমালোচনা নয়—এখানে শুধু তাঁর ছবির নিগূঢ়-মর্ম্মটুকুর পরিচয় দেবার চেষ্টা ক'রেছি; ব্যাখ্যাও করি নাই। যাদের "কাজ প্রকাশ করা, ব্যাখ্যা করা নয়"—তাদের ব্যাখ্যা ক'রতে যাওয়ার মত ধৃষ্টতা নাই।

তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে একদিন যে কথাটি ব'লেছিলাম আজ তাঁর এই শুভ-জন্ম-বাসরে দাঁড়িয়ে তারই পুনরুক্তি ক'রে তাঁর উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পাঠাচ্ছি—

'হে আমার অন্তরতম-সুদূর!

তোমায় আমি বুঝেছি ব'ল্‌লেও ভুল বলি', বুঝি নাই ব'ল্‌লেও মিছে বলি'!

চির-রহস্যের দেবতা আমার, অন্তরের সবটুকু মৌনতার শান্ত-প্রকাশে তোমায় অভিনন্দিত করি!' *

অনিলকুমার চক্রবর্ত্তী

* কুচবিহার সাহিত্য সভা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত 'রবীন্দ্র জয়ন্তী" উৎসবে পঠিত

ভবিষ্যতের দল

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ওই যে এল স্রোতের জলে জীবন নদীর কূলে'
ওরা ভবিষ্যতের দল,
ভাঙন দিনে বাহির হোলো সকল বাঁধন খুলে,
ওরা কোথায় ছিল বল্!
অতীত টাকে কাঁদিয়ে ওরা আনলো হেথায় হাসি,
কাজলা মেঘে সন্ধ্যা সেথায় ছড়ায় আঁধার রাশি,
এই সকালে ফুটলো ওদের কমল কুঁড়ির দল
মায়ের চরণ তল।
ঘুমিয়েছিল শিশির পরে নিশির কোলের মাঝে,
জানতো কিনা ওরাই জানে আস্‌বে মোদের কাছে?
মায়ের মরু জুড়িয়ে দিয়ে হবে আশার স্থল
ওরা ঢাল্‌বে ফটিক্ জল।
আন্‌বে ওরা নতুন দিনের মুক্ত হওয়ার বাণী,
ভোগবতীরে পাতাল হ'তে তুল্‌বে ধনুক টানি,
আধমরাদের জাগবে সাড়া ওদের এতই বল
ওরা ভবিষ্যতের দল!

জগদ্দলের পাথর গলে' পড়্‌বে তুষার চল্
ওদের কিছুই নাহি ছল্।
সোণার ফসল ফল্‌বে ওদের লাঙল দেবার ফলে,
পাপের ধুলো ধুইয়ে দেবে ওদের সাধন বলে
মরা গাঙের নিরাশ প্রাণে তুল্‌বে কলোল-কল্
দুকূল করবে টলমল্।

মোদের গলায় যে সুর সকল আস্‌ছে না হায় সেধে,
ওরাই তাদের রূপ দেবে যে সুর বাহারে বেঁধে,—
বেদন্ যেথায় ভিড় করেছে ভাস্‌ছে চোখের জল
ব্যথায় জল্‌ছে বুকের তল্
ঘুচিয়ে দেবে শীতল করে' ভবিষ্যতের দল।

দুই নারী

শ্রীলীলাময় রায়

লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্সের প্রশস্ত ভোজনাগারে দে সরকার সুধীকে ও মৃণালকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে। অতি সাদাসিধে ব্যাপার। যে আস্‌ছে সে একগ্লাস দুধ কিম্বা একটা আপেল কিনে একটু জায়গা করে কোথাও বসে যাচ্ছে। টেবিল ক্লথ বিহীন লম্বা সরু টেবিল। চেয়ারও তেমনি রুক্ষ। হৈ হৈ করে কত ছেলে ও কত মেয়ে খাচ্ছে এবং আড্ডা দিচ্ছে। কারুর কারুর খাওয়া সারা হয়ে গেছে। একটি খাটো সবুজ ফ্রক পরা, ছেলেদের মত করে চুল-ছাঁটা, রোগা ছিপ ছিপে গড়ন, সুশ্রী মেয়ে একটা খালি টেবিলের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছে। তাকে ঘিরে বসেছে ও দাঁড়িয়েছে গুটি ছয় সাত নানান রঙের সুটপরা, নানা আকার ও আকৃতির তরুণ। প্রায় সকলেই সিগ্রেট টান্‌ছে, মেয়েটিও।

দে সরকার দুই হাতে করে খাবার বয়ে নিয়ে এল। সুধীকে বল্ল, "নিন্ আমার হর্লিক্স্ ও মধু।" মৃণালকে বল্ল, "আপনি অবশ্য শাক্ত।"

মৃণালই কথাটা পাড়্ল। বল্ল, "এমন জান্‌লে আমি অন্য কোথাও ভর্ত্তি হতুম না, অন্য বিদ্যা শিখ্‌তুম না। দে সরকার, আপনাকে সাবাস।"

দে সরকারের পরিপাটীরূপে কামান মসৃণ গাল বুদ্বুদের মত গোল হয়ে চক্‌চক্ করতে লাগ্ল। তার রিমলেস্ চশমা ঝক্‌ঝক্ করে উঠ্ল। সে হৃষ্ট হয়ে বল্ল, "তবে? আমার স্কুল কি যেমন তেমন প্রতিষ্ঠান? এই বা দেখ্‌লেন কি? চলুন আপনাকে আমার প্রিয় অধ্যাপিকার ক্লাসে নিয়ে যাই। বক্তৃতা শুনবেন না প্রেমে পড়্‌বেন তাই বসে বসে নিরীক্ষণ করব।" তৎক্ষণাৎ নিজের উক্তিকে সংশোধন করে বল্ল, "হয়ত অধ্যাপিকার প্রতি অবিচার করলুম। তিনি বাস্তবিকই বিবেকী। সমস্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ান। তবে আমাদের স্কুলের ট্রাডিশন হল আলাদা। আমরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নই, আমরা সকলে সকলের সহাধ্যায়ী। আমাদের চিন্তা ও বাক্য স্বাধীন, আমাদের কার্য্যের উপর কেউ পাহারা বসায় না। কার চরিত্র কেমন তা নিয়ে কারুর মাথা ব্যথা নেই। আমাদের একমাত্র দায়িত্ব আমরা মানুষের সমাজ রাষ্ট্র ও আর্থিক ব্যবস্থা (economic system) সম্বন্ধে কোনো প্রকার পোষা ধারণা কিম্বা বাঁধা বুলি নিয়ে অগ্রসর হব না; বৈজ্ঞানিকের মত মনটাকে নিরাসক্ত ও নির্দ্দয় করে কঠোর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হব।"

সুধী বল্ল, "সামাজিক ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি কার্য্যকরী হবে? ইকনমিক্স্ বলে একটা শাস্ত্র বানিয়েছেন আপনারা, কিন্তু ও কি কখনো গণিতের মত বিশুদ্ধ এবং নির্ভুল হতে পার্‌বে? ধরুন আজ থেকে বিশ বছর পরে সূর্য্যগ্রহণ হবে বল্‌তে পারা যেমন জ্যোতির্ব্বিদের পক্ষে সম্ভবপর, তেমনি দুবছর পরে বাজার দর কি রকম হবে বল্‌তে পারা কি অর্থনীতি নিপুণের পক্ষে সম্ভবপর হবে মনে করেন?"

দে সরকার পকেট থেকে সিগ্রেটের কেস্ বার করে সুধী মৃণালের সাম্‌নে ধর্‌ল। মৃণাল একটি নিল।

দে সরকার ধোঁয়া ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে সুধীর প্রশ্নের জবাব দিল। বল্ল, "পঞ্চাশ বছর পরে সম্ভবপর হওয়া সম্ভবপর। এই ত সবে আমাদের শাস্ত্রের উদ্ভব। এর সঙ্গে যে সকল শাস্ত্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সেগুলিও সদ্যোজাত। মানুষের মন, মনের নিমগ্ন প্রদেশ, যূথ মনের ব্যবহার, পৃথিবীর ধন সম্পদ, উর্ব্বরতা, কয়লা গ্যাস তড়িৎ ইত্যাদি শক্তি, এমনি কত বিষয়ে [illegible] চূড়ান্ত হয়নি।

হয়ত সূচনা হয়নি। পৃথিবীর সব দেশে ভাল রকম সেন্‌সাস নেওয়া হয় না, সে সব দেশের তথ্যতালিকায় গলদ যতদিন থাকবে ততদিন বাণিজ্যসংক্রান্ত কোনো ব্যাধির ডায়গ্নসিস হবে না, দাওয়াইয়ের যা ব্যবস্থা হবে তা হাতুড়ের মত। তা বলে আমরা আপনার যোগী ঋষির মত ধ্যানাসনে বসে শিবনেত্র হব নাকি?" দে সরকার হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল।

সুধী তর্ক করতে আসেনি। আধুনিকতার এই প্রখ্যাত পাঠ সম্বন্ধে সে দূর থেকে অনেক শুনেছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে সিড্‌নি ও বিয়াট্রিস্ ওয়েব প্রভৃতি ফেবিয়ান (Fabian) সোশ্যালিষ্টগণের উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা হয়। ফেবিয়ানগণ স্বদেশের যন্ত্র কর্তৃক বিশৃঙ্খলিত অথচ চির-অভ্যস্ত চিন্তা ও চির-প্রচলিত বিশ্বাস কর্তৃক শৃঙ্খলিত সমাজকে ধীরে ধীরে পুনর্গঠিত করে তোলবার আয়োজন করেন। তাঁদের আয়োজনের এটিও একটি অঙ্গ। সমাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফল এই বৃক্ষের বিশেষত্ব। আধুনিক আদম এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করছেন।

সুধীকে নিরুত্তর দেখে দে সরকার আর কিছু বলবে এমন সময় তার দুজন সহপাঠী তার পাশে এসে দাঁড়াল। জান জাওর্‌স্কি, জাতে পোল্। য়াকোব হোল্‌ষ্টাইন, জাতে জার্ম্মান ইহুদি। প্রথম জন শালপ্রাংশু, বিশালকায়, হ্রস্বদৃষ্টি, তাম্রাভ-কেশ। দ্বিতীয় জন 'প্রমাণ-সাইজ', উন্নতনাসিক, প্রশস্তললাট, কৃষ্ণকেশ। দে সরকার চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্ল, "তোমরা দাঁড়িয়ে থাকলে যে! বস, বস। পরিচয় করিয়ে দিই। এঁর পিতৃদত্ত নাম দুরুচ্চারণীয়, আমরা এঁকে ডাকি নর্থ পোল বলে। মালিনোস্কির কি যেন হন। আর ইনি আমাদের ভাবীযুগের সুপার-ব্যাঙ্কার। সারা পৃথিবীর ব্যাঙ্কগুলাকে ইনি একসূত্রে গাঁথবেন ও সেই মালা নিজের গলায় পরবেন। দেখ হোল্‌ষ্টাইন, যতবার তোমার দর্শনলাভ করি ততবার অনুপ্রাণিত হই। আর কিছু না হয়ে উঠতে পারি ত তোমার বস্‌ওয়েল হব।"

হোল্‌ষ্টাইন সুধীর দিকে চেয়ে বল্ল, "মসিয়োঁ সারকারের মস্ত গুণ তিনি নিজের পরিকল্পনাকে পরের বলে চালাতে সিদ্ধহস্ত। কোনো দিন যা আমি ভাবতে পারিনি ও বিশ্বাস করতে পারিনে তাই উনি আমাকে দিয়ে করাবেন, আমাকে দিয়ে হওয়াবেন। সেইজন্য আমার মনে হয় দ্য সারকারের মুখে আপনার পরিচয় না নিয়ে আপনার নিজ মুখেই নেওয়া সমীচীন।"

সুধী হেসে বল্ল, "দে সরকারের উপর নির্ভর করলে আপনি আমাকে মিষ্টিক্ বলে জানতেন। আমি বিশেষ কিছু নই, তবে একটা অভিধা না হলে যদি পরিচয়ের অসুবিধা হয় তবে আমি দ্রষ্টা।"

মৃণালের প্রতি লক্ষ করে নর্থ পোল বল্ল, "আর আপনি?"

মৃণাল সলজ্জভাবে বল্ল, "আমার মত নগণ্য মানুষের পরিচয়? শিখছি রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ারিং। দেশে একটা মোটা মাইনের চাকরি পাবার আশা নিয়ে এদেশে আসা। দে সরকার আমার এর বেশী কি পরিচয় দেবে জানতে ইচ্ছা করে।"

দে সরকার এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে বল্ল, "তুমি মার্টিন কোম্পানীর রেল লাইনে পাঞ্জাব মেল চালাবে।"

মৃণাল ও সুধীকে হেসে উঠতে দেখে নর্থ পোল ও হোল্‌ষ্টাইন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। দে সরকার যখন তাদের খাতিরে ইঙ্গিতটাকে পরিস্ফুট করল তখন তারাও হাসিতে যোগ দিল।

২

ভিড় দেখলে ভিড় বাড়ে। দে সরকারকে ঘিরে চার-জন যুবক খুব হাসছে। ব্যাপার কি? সেই যে টেবিলের উপর সমাসীন তরুণীটি সে তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হল। স্কুলের এমন কোনো ছাত্র ছাত্রী নেই যাদের সঙ্গে তার যাকে বলে মাথা-নোয়ান পরিচয় (nodding acquaintance) নেই। নাম হয়ত জানে না অধিকাংশের, কিন্তু মেশে সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে। সুকুমার বালকের মত চেহারা ও চাল; গোপালের মত যার কাছে যা পায় তা খায়; অচেনা মানুষকে বলে গুড্ মর্ণিং। সরলতা তার স্বভাবসিদ্ধ, কি, একটা ভাণ, তা বলবার উপায় নেই; কারণ সে কথা বলে অতি অল্প। তার প্রধান গুণ সে

অপরকে কথা বলায়। সে যখনি যেখানে বসে সেখানটা হয়ে ওঠে তার সালোঁ। এক এক করে কত ছেলে জড় হয়; যে কয়জন মেয়ের স্বভাবে ঈর্ষা নেই তারাও। অনর জন্‌সন্ (Honor Johnson) ওরফে জনি কাউকে ডাকে না; কারুর দিকে চেয়ে চোখ ঠারে না, আঙ্গুল দিয়ে ইসারা করে না—কিছু না। ওার যে চেয়ারটায় বা যে টেবিলটাতে বস্‌বার খেয়াল হল সেটাতে সে যেই বসেছে অমনি একটি না একটি ছেলে ঐখান দিয়ে যেতে যেতে তার মাথা নোয়ান দেখে ও গুড্ মর্ণিং শুনে একটু আলাপ করবে ভেবে এক মিনিটের জন্য থাম্‌ল। অমনি আরো তিনদিক থেকে তিনজন এসে হাজির। প্রথম জনের মুখের কথা থাক্‌ল মুখে। অনর ওরফে জনি বল্ল, গুড্ মর্ণিং। এবং কেমন নম্র মধুর ভাবে মাথা নোয়াল! সকলে করে হৈ হৈ; সে থাকে স্থির অচপল। কেউ সিগ্‌রেট্ বাড়িয়ে দেয়; সে কোমলকণ্ঠে বিনীতভাবে বলে থ্যাঙ্কস্ ভেরি মাচ্। অমনি পাঁচজন একসঙ্গে দেশলাই জ্বালায়। সে যার প্রতি প্রসন্ন হয় সেই মনে মনে বলে থ্যাঙ্কস্ ভেরি মাচ্।

পর্ব্বত মহম্মদের কাছে উপস্থিত হবে দে সরকার কল্পনা করতে পারে নি। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সত্যি সত্যি অনর। দে সরকার লাফ দিয়ে উঠ্‌ল। অনর ডান হাতটি তুলে হাতের ভাষায় বল্ল, থাক্। পাত্রগুলো ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে টেবিলের এক ধারে আসন নিল। দে সরকার তবু দাঁড়িয়েই থাক্‌ল। বস্‌বার কথা তার মনে হল না। ওদিকে তার চেয়ারখানা কে একজন বাজেয়াপ্ত কর্‌ল, সে টেরই পেল না। আর একজন বল্ল, সিট্ ডাউন, ওল্ড চ্যাপ্, সি-ট্ ডাউন। তার কথা শুনে দে সরকারের যে দশা হল তা লিখে কাজ নেই। সুধী ও অনর ছাড়া সকলেই তাকে গড়াগড়ি যেতে দেখে পাঁচ মিনিট ধরে হাততালি দিল। কেউ কেউ হাস্‌তে হাস্‌তে গড়াগড়ি যাবে মনে হল। ইংরেজের ছেলে rag যখন করে তখন একেবারে নিষ্ঠুর। কেউ শিষ্ দেয় কেউ শেয়াল ডাকে কেউ চায়ের পেয়ালা ছুঁড়ে মারে। তবে যাকে rag করা হল সে যদি বীরের মত সহিষ্ণু হয় তবে তার জয়ধ্বনিও করে। ছেলেদের ragএর চোটে কত দোকানদারের কপাট ভেঙেছে, কত পাহারাওয়ালার মাথা ফেটেছে। পুসিফুট জনসন বেচারার ত একটা চোখই গেল লণ্ডনের ছেলেদের ঢিল লেগে।

যা হোক দে সরকার তার চোখ কান হাত পা গুলা আস্ত আছে দেখে আশ্বস্ত হল এবং চোখের জল মোছ্‌বার চেষ্টা না করে দাঁত বার করে হাসি ফোটাল। সুধী তাকে জোর করে নিজের আসনে বসালে সে ক্রমে ক্রমে নিশ্বাস ফিরে পেল।

দে সরকারের পার্টি আর জম্‌ল না। মার্টিন কোম্পানীর মজা ভুলে হোলষ্টাইন ও নর্থ পোল সমাগত জনতার সঙ্গে খেলাধূলার প্রসঙ্গে মজে গেল। সকার (ফুটবল) খেলায় স্কটলণ্ড ইংলণ্ডকে চার গোলে হারিয়ে "কাঠের চামচ" নিয়ে গেছে। চল্লিশ বছর পরে স্কটলণ্ড এতগুলি গোল শোধ দিয়ে ইংলণ্ডের উপর শোধ তুল্ল। উপস্থিত মণ্ডলীর মধ্যে স্কচ্ যারা ছিল তাড়া তুড়ি দিল। তখন ইংরেজ যারা ছিল তারা শ্লেষাত্মক সুরে স্কটলণ্ডের প্রিয় সঙ্গীত Annie Laurie গেয়ে উঠ্‌ল :—

"And for bonnie Annie Laurie I'd lay me doon and dee.'

এতে স্কচ্‌রা কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে সমানে যোগ দিল।

"Like dew on the gowan lying
Is the fa' o' her fairy feet,
And like winds in summer sighing
Her voice is soft and sweet.
Her voice is soft and sweet,
And dark blue is he e'e,
And for bonie Annie Laurie
I'd lay me doon and dee."

৩

নিজের পার্টিতে পরের হাস্যাস্পদ হয়ে উপেক্ষিত ভাবে বসে থাকা দে সরকারের অসহ্য বোধ হল। সে অনরকে উদ্দেশ করে 'এক্‌স্‌কিউস্ আস্' বলে সুধী ও মৃণালকে নিয়ে প্রস্থান কর্‌ল। পাছে তার মনে আঘাত লাগে ভেবে সুধী বা মৃণাল তাকে তার লাঞ্ছনার সমব্যথা জানাল না।

ঘটনাটা চাপা দেবার জন্য মৃণাল বল্ল, "কো-এডুকেশনের আনন্দ অন্য কিছুতে নেই।"

দে সরকার উৎসাহিত হয়ে সমর্থনসূচক প্রশ্ন কর্‌ল, "নেই ত? কেমন?"

সুধী মৃদু হেসে বল্ল, "তার চেয়ে বড় আনন্দ সেল্‌ফ্‌ এডুকেশনের।" রঙ্গ করে বল্ল, "লোকে কি 'এডুকেশন' চায় হে! লোকে চায় 'কো'।" তারপর গম্ভীর হয়ে বল্ল, "ব্যাপকভাবে বল্‌তে গেলে দল বেঁধে পড়্‌তে বসাটাই অদ্ভুত, সেটা স্ত্রী-পুরুষেই হোক আর পুরুষে পুরুষেই হোক। কবিরা এক জোট হয়ে কবিতা লেখে না, চিত্রীরা ছবি আঁকে একা একা, গান যদিও অনেকে মিলে হয় তবু উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত নিঃসঙ্গ সাধনাসাপেক্ষ। শিক্ষার জন্য ক্লাস ঘরে দল পাকান তাই আমি অতি ক্লেশে স্বীকার করেছি—স্কুল জীবনে গুরুজনের নির্ব্বন্ধে, কলেজ জীবনে বাদলের আগ্রহে।"

দে সরকার বাদলের নাম শুনে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "বাদলের কি খবর?"

সুধী বিষণ্ণ সুরে বল্ল, "বেঁচে আছে, ওর বেশী ত জানিনে।"

"কোথায় আছে, কি কর্‌ছে, কবে দেখা হবে এ সব?"

"ঐ যে বল্লুম।"

দে সরকার ব্যঙ্গ করে বল্ল, "ডুবে ডুবে জল খাবার খবর বন্ধুকে জানায় না? বিলেত দেশটা এমনি, মশাই, কা তব কান্তা কস্তে বন্ধুঃ। সেদিন বিভূতি নাগের সঙ্গে শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরী য়্যাভিনিউতে দেখা। বন্ধুনী সমভিব্যাহারে ম্যাটিনিতে যাচ্ছে। একজন কাল মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, এটা জান্‌লে পাছে তার বন্ধুনী তাকে অবজ্ঞা করে কিম্বা অন্যমনস্ক পথিকদের দৃষ্টি তার রঙের প্রতি একটু বেশী রকম আকৃষ্ট হয়, সেই ভয়ে সে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।"

সুধী দৃঢ়তার সহিত বল্ল, "কিন্তু বাদল অমন নয়।"

এর পরে অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা কইলনা। স্কুল অফ্‌ ইকনমিক্‌সের নানা তল পরিক্রমা করে ছাত্র ছাত্রীর ভিড় কাটিয়ে তারা রাস্তার দিকে পা বাড়াবে এমন সময় বিপরীত অভিমুখ থেকে যাকে আস্‌তে দেখা গেল তার নাম নাটালী। জাতি রাশিয়ান। রুশবিপ্লবের সময় তার পিতামাতা ইংলণ্ডে পালিয়ে আসেন। বছর দশেক ইংলণ্ডে বাস করে সে প্রায় ইংরেজ হয়ে গেছে। তার ঢেউ খেলান চুল মাথার পিছনে ঝুঁটি করে বাঁধা, ছোট্ট ঝুঁটি। তার চোখের পাতা স্বভাবত স্ফীত। তার চিবুকের নীচে আর এক প্রস্থ চিবুক (double chin)। সে স্থূলকায়া হলেও তার মুখের লাবণ্য ও তার ব্যবহারের সৌজন্য চোখ ও মন কাড়ে। সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির এবং তার বয়সও পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হবে। অনরের মত জনপ্রিয় নয়, কিন্তু একটি ছোট সীমার মধ্যে মিশ্‌তে ত্রুটী করে না। তার মণ্ডলীর মানুষ তারই মত সীরিয়াস।

নাটালীকে লক্ষ করে দে সরকার দু পা পিছিয়ে গেল এবং চক্ষু নত কর্‌ল। নাটালী এক সেকেণ্ড থেমে তাকে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ল। তারপর ঈষৎ দ্রুত পদে স্কুলের পর্চ-এ উঠে লিফ্‌টের অপেক্ষা কর্‌ল। ঘটনাটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে মৃণাল একেবারেই টের পেল না। কিন্তু সুধীর নজর এড়াল না। মৃণালকে কিংস্‌ ওয়ের বাসে তুলে দিয়ে অল্ড্‌উইচ টিউব ষ্টেশনে সুধীকে তুলে দিতে যাবার সময় দে সরকার নিজের থেকে সুধীকে বল্ল, "বাদলকে সঙ্গে করে খিচুড়ি খাওয়ার গল্প মনে পড়ে?"

"পড়ে।" সুধী বাদলের কথা স্মরণ কর্‌তে কর্‌তে গাঢ়স্বরে বল্ল।

"পদ্মর কাহিনী বলে যার কাহিনী বল্‌বার সময় হল না এই সেই নাটালী। বড্ড মন কেমন কর্‌ছে, ভাই চক্রবর্ত্তী।"

সুধী সান্ত্বনা দিয়ে বল্ল, "মন কেমন করার চিকিৎসা নেই। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির মত সহ্য কর্‌তে হবে, ভাই দে সরকার।"

এই বলে সুধী নিজেকেও সান্ত্বনা দিল।

দে সরকার বল্ল, "একজন মানুষ আর এক জন মানুষের জীবনটাকেই একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে পরিণত কর্‌তে পারে কেমন করে? বায়োলজি বা সাইকোলজিতে এর উত্তর নেই। অনেক খুঁজেছি। আধুনিক মানবের পক্ষে এ এক অমীমাংসিত রহস্য। এবং যা অমীমাংসিত তা পরাভব কর। ভগবানের কাছে পরাজিত হয়েছি, প্রেমের কাছেও। উভয়কেই মেনে নিতে হচ্ছে অবাধের মত।"

সুধী নরম সুরে বল্ল, "মানুষকে অপরাজেয় হতেই হবে এমন কোনো কথা আছে কি? আর পরাজয়ে কি কেবলই গ্লানি? আত্ম সমর্পণের পরমা তৃপ্তি যে মানব অভিজ্ঞতার একটা বড় উপাদান ভাই দে সরকার।"

দে সরকার কৌতুকের হাসি হেসে উঠ্‌ল। "আবার মিষ্টিসিস্‌ম্‌? মিষ্টিক সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। আমি চাই ব্যাধির চিকিৎসা। সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির—সামাজিক মানসিক কায়িক। ক্যান্‌সার রিসার্চ চলেছে, প্রেমের রিসার্চও চলুক।"

তারা হাস্‌তে হাস্‌তে লিফ্‌ট্‌ দিয়ে মাটীর নীচের সুড়ঙ্গে নেমে গেল।

লীলাময় রায়

মহামানব রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুখরঞ্জন রায় এম্-এ

মহামানব রবীন্দ্রনাথের ধ্যানমূর্ত্তি হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া লৌকিকভাবে তাঁহাকে বিচার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই মনে পড়ে তাঁহার কবি-কীর্ত্তির কথা। একদা কিশোর কবির যে কবিত্ব-নির্ঝর নিজ মনোগহনরূপ পাষাণ-কারায় আবদ্ধ ছিল তাহা কি করিয়া কারামুক্ত হইয়া মহাভিনিষ্ক্রমণের কলস্বনে মুখরিত হইয়া নানা আগন্তুক ধারায় পুষ্ট হইয়া পারে পারে জীবনকে জাগাইয়া তুলিয়া এবং সুশ্যামল যৌবনকে বিকশিত করিয়া সারা দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে এবং ক্রমে দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত করিয়া মহাসাগরে গিয়া মিলিয়াছে—জগতের কাব্য-ইতিহাসে সে এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার। একটি মাত্র কবি-জীবনে মানব-জীবনের সমগ্র পর্দ্দায় অঙ্গুলি-চালনা করিয়া তাহা হইতে ভুবন-ভুলানো সঙ্গীত ফুটাইয়া তোলা একটা চরম সারস্বত বিস্ময়। সম্পূর্ণ আত্মমোহাবিষ্টতা হইতে আরম্ভ করিয়া বহিঃপ্রকৃতির প্রেমে কবি-চিত্তকে ওতপ্রোতভাবে নিমজ্জিত করিয়া, সেই বহিঃপ্রকৃতির ঘনফল যে নারী তার প্রেমে নিজকে হারাইয়া ফেলিয়া সমগ্র দেশের সহিত একাত্মবুদ্ধি লাভ করিয়া ধ্যানতন্ময় দেশ প্রেমে আসিয়া পৌঁছানো, এবং তাহারো সীমা ছাড়াইয়া বিশ্ব এবং বিশ্বাতীতের প্রেমে কবি-চিত্তের এই যে উন্নতির ইতিহাস তাহা দ্বিতীয় একটি কবি-জীবনে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চেষ্টাকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা চলে—গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য ও নাট্যকাব্য। এর প্রত্যেক বিভাগেই কবির বিশিষ্ট অর্জ্জন এবং জগৎ-সাহিত্যে তাঁহার দানের খবর পাওয়া যায়। তাঁর সাধারণ প্রেমের গানগুলির অতুলনীয় মাধুর্য্য, তাঁর দেশপ্রেমের গানের নিরবচ্ছিন্ন তন্ময়তা, বিশেষতঃ তাঁর ভগবৎপ্রেমের গানের সুদূর-প্রসারী রহস্যময়তা ও সূক্ষ্মানুভূতি জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর গীতি-কবিতাগুলির বিশেষত্বের কথা ভাবিলে মনে হয় এগুলির মধ্যে কবিত্ব ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। প্রকৃতির ভিতর দিয়া ভগবানকে ভালোবাসার মধ্যেও অধ্যাত্ম ও কাব্যরাজ্যে এই মরমী কবির অনন্যসুলভ স্বাতন্ত্র্যকেই সূচিত করিতেছে।—

> তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
> ব'লেছে গান গাহিবারে॥
> ফুলে ফুলে তারায় তারায়,
> ব'লেছে সে কোন্ ইসারায়,
> দিবস রাতির মাঝ কিনারায়
> ধূসর আলোর অন্ধকারে॥

অহঙ্কার, পাপের বোধ, দুঃখ, বিস্ময়, দেহজীবনের নানা দুর্নিবার বাধা, জ্ঞানাভিমানের বাধা ও কর্ম্মাভিমানের বাধার তীক্ষ্ণ অনুভূতি এই আত্মযুদ্ধপরায়ণ কবি-সাধকের সাধনাকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। সাধন-প্রবাহ-পথের এই যে উপল-ব্যথা তাহাই পদে পদে পরমাশ্চর্য্য সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, নিবিড় ব্যথা মর্ম্মান্ত পুলকে ফাটিয়া পড়িয়াছে। দুঃখ চরমে ঠেকিয়া পরম সুখ ও সার্থকতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়াছে।

> এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো।
> তোমার পায়ে এসে ঠেক্‌ল শেষে সকল সুখের সার হলো।
> এতদিনে নয়ন ধারা
> বয়েছে বাঁধন হারা,
> কেন বয় পাইনি যে তার কূলকিনারা,
> আজ গাঁথ্‌লে কে সেই অশ্রুমালা, তোমার গলায় হার হলো।

সাধনের এক পারে বিরহ ও দুঃখ, বাধা ও ব্যথা; অন্য পারে মিলন ও সুখ কিন্তু এই দুয়ের মাঝে যোগ

রহিয়াছে, প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্রকলার গায়ে গায়ে পূর্ণচন্দ্রের আভাসের মত নিবিড় বিরহের মাঝেই মিলনের সার্থকতা বিরাজ করিতেছে এবং তা করিতেছে বলিয়াই বিরহ এমন সুদুঃসহ হইয়া দেখা না দিয়া সঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিতে পারিয়াছে। কবির এই অধ্যাত্ম সাধনার একদিকে বৈচিত্র্যের স্বাদ, অন্যদিকে একের অনুভূতি; একদিকে বিশ্ববোধ, অন্যদিকে আত্মবোধ, একদিকে বাহিরের কর্ম্মে বহির্জ্জগতের বিপদে ভগবানের সাধনা, অন্যদিকে আত্মায় তাঁর নিবিড় উপভোগ। কবি সেই বাহিরের ডাক যখন শোনেন তখনি গাহিয়া উঠেন—

"তোমার ভুবন জোড়া আননখানি
হৃদয় মাঝে বিছাও আনি।"

গাহিয়া উঠেন—

"ঐ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজলো ভেরী, বাজলো ভেরী।
কখন আমার খুলবে দুয়ার নাইক দেরি, নাইক দেরি॥
তোমার তো নয় ঘরের মেলা
কোণের খেলা গো,
তোমার সঙ্গে বিষম রঙ্গে জগৎ জুড়ে ফেরাফেরী॥"

কিন্তু আবার যখন ঘরে ডাক পড়ে তখন কবি বুঝিতে পারেন এই বাহির ও ঘর, এই বৈচিত্র্য ও এক একই জিনিষের দুই দিক; তখনই তিনি বলেন—

'কুড়িয়ে আনা ছড়িয়ে ফেলা
এই কি তোমার একই খেলা,
লাগাও ধাঁধা পরে পরে এই আঁধারে এই আলোতে।"

এই যে অংশের মাঝে সম্পূর্ণের উপলব্ধি, বাধার মাঝে [illegible]প্তির স্বাদ, বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একের সন্ধান, এই বাহির ও ঘর, বিশ্ব ও বিশেষ; এই যে বিশ্ববোধ ও [illegible]বোধ—এই দুইয়ের সংঘাত ও মিলনে রবীন্দ্রনাথের [illegible]ধ্যাত্ম-গীতি এমন বিচিত্র এবং অন্যান্য ভারতীয় সাধকদের [illegible]গীতি হইতে এমন স্বতন্ত্র হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে;
সৃষ্টি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে
বাজে ফুলে বাজে কাঁটায়,
আলো ছায়ায় জোয়ার ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ঐ যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে।
তালে তালে সাঁঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
শাদা কালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ ছন্দে নানান্ রং জাগে॥
এই তালে তোর গান বেঁধে নে,
কান্না-হাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে॥"

এই যে দ্বন্দ্বের ছন্দ, সংঘাতের সৌন্দর্য্য তাহাতে এবং অপূর্ব্ব দার্শনিকতা ও কবিত্বের সঙ্গে অধ্যাত্মোপলব্ধির আশ্চর্য্য সমন্বয়ে অধ্যাত্ম-গীতিতে কবির এই অন্যনিরপেক্ষ বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মোপলব্ধির সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রগীতির নিবিড় মিলনানন্দটুকু নাই, প্রাচ্য সুফী বৈষ্ণব সাহিত্যেও তেমনি তার সংঘাতের ছন্দ, তার দ্বন্দ্বের সৌন্দর্য্য নাই, এই দুইয়ের মিশ্রণে রবীন্দ্র-গীতি জগৎ-গীতি-সাহিত্যে অপূর্ব্ব।

কবি রবীন্দ্রনাথ ভাবের দিক দিয়া দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার যে আশ্চর্য্য সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, কাব্য-রীতির দিক দিয়াও তাঁহার সেই অপূর্ব্ব সমন্বয়-শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা হইতেই সঙ্গীতের সাধনা করিয়া আসিতেছেন। বৃদ্ধবয়সে সেদিন তিনি চিত্রকর রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগৎকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কাব্যরীতির সঙ্গে সঙ্গীত ও চিত্ররীতির মিশ্রণে তিনি প্রথম যৌবন হইতেই যে অপূর্ব্ব কাব্যসম্ভার সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন তাহা ভাবের দিক দিয়া যেমন রীতির দিক দিয়াও তেমনি বিশ্বের চির-বিস্ময়ের বিষয়।

এই কবির চিত্তে চির-যৌবন গাঁথা হইয়া আছে। এ বয়সেও তাঁহাতে কিছুমাত্র জরার স্পর্শে লাগে নাই।—

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে॥,
তাইতো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে;
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে,
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে॥

তিনি নিত্য নব পথে চলিতেছেন, প্রত্যেক পথের মোড়ে আসিয়া তিনি নূতন বনবীথির সৌন্দর্য্য মানবের চক্ষে খুলিয়া দিতেছেন, দীর্ঘ পথে কবির অনুসরণকারীদের মনে কিছু

মাত্র ক্লান্তির আবেশ লাগিতে না লাগিতেই তাহাদের মনে তিনি নবীন চেতনা নবীন সাড়া জাগাইয়া তুলিতেছেন; আমরা কবির সঙ্গে সঙ্গে যতই অগ্রসর হইতেছি ততই তাঁহার মনের পরিধি বিস্তৃততর হইয়া সুদূরে সরিয়া পড়িতেছে;—কাজেই কাহারো পক্ষে এ পর্য্যন্ত এ কথা বলা সম্ভব হইবে না—রবীন্দ্রনাথকে দেখা শেষ করিয়াছি; রবীন্দ্রনাথ যে পথে চলিতেছেন সে পথের যেমন "অন্ত নাই গো অন্ত নাই," রবীন্দ্রনাথকে দেখারও তেমনি অন্ত নাই গো অন্ত নাই। রবীন্দ্রনাথের মনের এই চির-ফাল্গুন তাঁর কাব্যে এবং জীবনে চিরন্তন গতিতে প্রকটিত হইয়াছে। এই কোথায়ও না পৌঁছিয়া চিরকাল পথে চলার ভাবের মধ্যে যে অনন্তের অভিসারের ভাব সূচিত হয় গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলে সে ভাব আর থাকে না, অনন্ত যাত্রার অনন্তত্ব টুকুই ঘুচিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের সমুচ্চ জ্যোতির্লোক হইতে একটু নামিয়া আসিয়া আমরা তাঁর খণ্ডকাব্যের রাজ্যে প্রবেশ করি। এখানে আসিয়া দেখি আলোকের অঙ্গুলির মত যে জ্যোতিঃশিখাটি সুদূরের রহস্য বিদ্ধ করিতে ছুটিয়াছিল তাহা সংহত হইয়া আসিয়া মর্ত্ত্য-মানবের মনের দুয়ারে ঘা দিয়াছে, স্থূল পৃথিবীর উপর অপূর্ব্ব আলোকপাত করিয়াছে, মানব-হৃদয়কে লোভনীয় করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যে আলোক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইয়া সুদূরের পারে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা এখন নিকটকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে, মানব-মনকে আপনার কাছে পরিচিত করাইয়াছে; কখনো বা সে আলোক গলিয়া জমিয়া গিয়া মানব-হৃদয়ের চিরন্তন পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছে, কখনো বা আরো শক্ত হইয়া মানবকে কঠিন মৃত্তিকার স্পর্শ দিয়াছে। এটাই হলো প্রকৃত কবিতার রাজ্য। এখানে কথা আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়াছে, সুদূরাভিসারী সুরকে সীমার মধ্যে বাঁধিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিত্ব-খ্যাতি এই রাজ্যের অর্জ্জন লইয়াই। গানের সুরের সঙ্গে আরো কিছু বেশী কথার খাদ মিশাইয়া তিনি "সোনারতরী," "নিরুদ্দেশযাত্রী," "হৃদয়-যমুনা" প্রভৃতি শত শত কবিতা লিখিয়াছেন। এগুলি হলো তাঁর গান এবং নিছক কবিতার মধ্যবর্ত্তী যোগ-সূত্র। নিছক কবিতার ক্ষেত্র হইতে শত শত কবিত বিশ্বের বিস্মিত দরবারের কাছে উপস্থিত করা যাইতে পা[illegible] এবং অনেকগুলি হইয়াছেও। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ," "সুরদাসে প্রার্থনা," "বৈষ্ণব কবিতা," "যেতে নাহি দিব," "সমুদ্রে প্রতি," "মানস-সুন্দরী," "পুরস্কার," "বসুন্ধরা," "উর্ব্বশী, "স্বর্গ হইতে বিদায়," "পতিতা," "বলাকা," "সাজাহান, "চঞ্চলা," "ছবি," "তপোভঙ্গ," "আহ্বান," "লিপি, "ক্ষণিকা,—আর কত নাম করিব—এ তালিকা ইচ্ছাম[illegible] বাড়াইয়া নেওয়া চলে—এগুলির মূল্য অনেকের কাছে তাঁ গীতি কবিতার চাইতেও বেশী।

কবিতার রাজ্য হইতে কবির নাট্যকাব্যের রাজ্যে প্রবে[illegible] করিয়া দেখি কবি বস্তুর বন্ধন আরো বেশী মানি[illegible] লইয়াছেন। এখানেই অনেকের মতে তাঁর কাব্য-প্রচেষ্টা সব চেয়ে ঘনফল প্রকাশ পাইয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিসর্জ্জন প্রভৃতি এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জিনিষ। এই রাজ্যের এক প্রা[illegible] রহিয়াছে প্রাচীনপন্থী passion drama—'রাজা ও রাণী' অন্য প্রান্তে রহিয়াছে আধুনিকতম মেটারলিঙ্কীয় রূপক-নাট্যে চরম অভিব্যক্তি এবং পরম সারস্বত প্রয়াস—'রাজা'। মেটা[illegible] লিঙ্কের মধ্যে যে অনিশ্চিত কুহেলি-স্ফুট কল্পনার বা মানসত সুড়সুড়ি বা intellectual titillation আছে সেটাকে প্রাচ্য নিশ্চিত প্রত্যয় ও সুপরিস্ফুট তাত্ত্বিকতার ভিত দিয়া ঢোকাইয়া দৈনন্দিন বস্তুর বিষয়ের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনা রূপক-নাট্যের যে রূপ দিয়াছেন তার মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট এবং শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবন ও তত্ত্বকে বি[illegible] মিশ্রণে মিশাইয়া 'রাজা ও রাণী' হইতে 'রক্তকরবী' পর্য্য নাট্যসৃষ্টিগুলি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। 'রাজা ও রাণী'তে তত্ত্ব মাথা তুলিতে পারে নাই, কিন্তু রূপক নাট্যগুলি[illegible] জীবনই তত্ত্বের আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। জীবন ও তত্ত্বে সংযত মিশ্রণে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে 'বিসর্জ্জন' 'চিত্রাঙ্গদা', বিশেষতঃ 'চিত্রাঙ্গদায়' জীবনের সত্য ও সৌন্দর্য্যে যে অনবদ্য প্রকাশ দেখি তাহার তুলনা পাওয়া ভা[illegible] 'চিত্রাঙ্গদা'র সহিত Keats এর Lamiaর তুলনার ক[illegible] মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা'র শ্রেষ্ঠত্ব বুঝি[illegible] কাহারো বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কবির অগণ্য ভক্তরাজির মধ্যে রুচিভেদে কেহ কেহ তাঁর গীতিকবিতাগুলিকেই বেশী ভালোবাসেন, কেহ ভালোবাসেন তাঁর নিছক কবিতাগুলিকে, কেহ বা ভালোবাসেন তাঁর নাট্যকাব্যগুলিকে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন বর্ত্তমান লেখকের কাছে রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনীর" কবিতাগুলিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। দেশের সাধারণ পাঠক সমাজের অনেকে দ্বিজেন্দ্রলালের এই মত পোষণ করেন। কিন্তু কবির প্রকৃত গুণগ্রাহীরা তাহা মনে করেন না। "কথা ও কাহিনীর" গাথাগুলির বিশেষত্ব হইয়াছে, তাহাদের আত্ম-নিরপেক্ষ বস্তু বিষয়। কিন্তু গীতি-ধর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব মনে রাখিলে এই সম্পূর্ণ আত্মনিরেপক্ষতার মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অর্জ্জনের সন্ধান মিলিতে পারে বলিয়া কেহ ভাবিতে পারেন না। গীতি-কাব্যোচিত আত্মমগ্নতা ও বহির্বস্তুর মিলনক্ষেত্রেই এই নাট্য বিভাগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য-চেষ্টা হইতে আরো এক ধাপ নীচে আসিয়া আমরা তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের রাজ্যে প্রবেশ করি। তাঁহার এক একটি ছোট-গল্প বস্তু দেহধারী গদ্যে রচিত এক একটি গীতি-কবিতা। মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্ম সুকুমার অথচ সুগভীর এক একটি অনুভবকে কেন্দ্র করিয়া এগুলি আশ্চর্য্য কল্পনাশক্তি ও সমবেদনার রঙে রঞ্জিত হইয়া বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার "অতিথি", "মেঘ ও রৌদ্র", "ক্ষুধিত পাষাণ", "একরাত্রি", "পোষ্ট-মাষ্টার", প্রভৃতি বহু ছোট-গল্প চিরকাল অনতিক্রান্ত হইয়া থাকিবে। ছোট-গল্পের রাজা রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃততর উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাহার কথাসাহিত্যিক প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। বাংলার কথাসাহিত্যে দৈনন্দিন জীবনের ছোট খাটো ঘটনা ও গৃহচিত্রের ভিতর দিয়া হৃদয় ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ধারার তিনি প্রবর্ত্তক এবং এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। এই গৃহ-চিত্রণ এবং হৃদয়-বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের শক্তিশালী উত্তরাধিকারী জুটিয়াছে, কিন্তু সমস্ত হৃদয়ের সংঘাতকে একটা মানসত্তার মেরুদণ্ডে বিধৃত করিয়া উপস্থিত করা এবং কখনো বা (যেমন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে) সমস্তটাকে একটা বিগ্রহ-পন্থার (symbolism) জ্যোতির্গোলকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখানোর মনোরীতি এবং শিল্প-ভঙ্গী শুধু একা রবীন্দ্রনাথকে দিয়াই সম্ভব। 'চোখের বালি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'নৌকাডুবি' ও 'গোরার' ভিতর দিয়া ঘরে বাইরে পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পাঠকগণকে উচ্চ হইতে উচ্চতর কথা-সাহিত্যিক শিখরে নিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে উপন্যাসের গৃহ-চিত্রণ এবং ছন্দ-বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাই বিভিন্ন চরিত্রের ভিতর দিয়া একটা আদর্শের সংঘাত, একটা মানস তৃপ্তি ও সুদূর বিসর্পিত ব্যঞ্জনা, একটা গীতিকাব্যোচিত একমুখিতা ও মহাকাব্যোচিত মর্য্যাদা ও গৌরব—যাহাতে এই রচনা সত্য শিব সুন্দরের একটি অনবদ্য সৃষ্টি এবং বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের মুকুট-মণি হইয়া দেখা দিয়াছে। তা'ছাড়া এই সৃষ্টিগুলিতে—বিশেষতঃ 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আর্ট ও আধ্যাত্মিকতার এমনি আশ্চর্য্য সমন্বয় সাধন করিয়াছেন যাহাতে আর্ট সম্বন্ধে মানুষের বহুদিন পোষিত ধারণা বদলাইয়া যাইতে পারে, যাহাতে আর্ট আধ্যাত্মিক হইয়া দেখা দিয়াছে এবং আধ্যাত্মিকতাও আর্টের ভিতর দিয়া নবরূপ গ্রহণ করিয়াছে, যাহাতে নিছক আর্টের পূজারিগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ আর্টের সম্ভাবনীয়তাকে বহুগুণ বাড়াইয়া দিয়াছেন, তার পরিধিকে দুর্লক্ষ্য সীমায় প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। এই আর্ট ও আধ্যাত্মিকতার মিলন-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরেশ নলিনাক্ষের মত কয়েকটি চরিত্র বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে ভারতের বিশেষ দান বলিয়া উপস্থিত করিবার জিনিষ, George Eliotএর Rufus Lyon কিম্বা Browning এর Pipe এর চাইতে তাদের গৌরব বেশী ছাড়া কম নহে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশক্তির এক প্রান্তে রহিয়াছে তাঁর গান ও গীতি কবিতা, আর অন্য প্রান্তে রহিয়াছে তাঁর উপন্যাসগুলি। গীতি কবিতা হইতেছে এই সৃষ্টি মহীরুহের ফুল, খণ্ড কবিতা ও নাট্যকাব্য শাখাপ্রশাখা, গল্প ও উপন্যাস হইতেছে ইহার কাণ্ড। নীচের কাণ্ডটিই উপরের ফুলটিকে আকাশে ধরিয়া রাখিয়াছে, নহিলে সে ফুল আকাশ কুসুমে পর্য্যবসিত হইতে পারিত, পর্য্যবসিত হইতে পারিত একটি কায়াহীন মায়াময় নিরুপাখ্যে। নীচ হইতে উপরে একই

রসের ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নীচ এবং উপরের মধ্যে রহিয়াছে একই প্রাণের যোগ। কোনো একটা দিককে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন না। শুধু গীতিকবিতা লিখিলে মানব-মনের উপর তিনি যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা করিতেন কি না সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই আশ্চর্য্য সৃষ্টির ইতিহাসের মধ্যে দেখাইয়াছেন সম্পূর্ণ আত্মমগ্নতা (Pure subjectivism) হইতে কি করিয়া তিনি আত্ম-নিরপেক্ষ বস্তু বিষয়ের দিকে নামিয়া আসিতে পারেন, তিনি দেখাইয়াছেন কবিতার ভাবগত ও তত্ত্বগত সাধনা যেমন তাঁকে দিয়া সম্ভব, রক্ত-মাংসময় শরীরী চরিত্র-মূর্ত্তি অঙ্কনও তাঁকে দিয়া তেমনি সম্ভব। তিনি দেখাইয়াছেন একই জীবনে দেশ এবং বিদেশের বহু সাহিত্য সাধক এবং সারস্বত ধারাকে আত্মস্থ করিয়া আপন বিশিষ্টতাকে জগৎ-সাহিত্যের সামনে কি করিয়া উপস্থিত করিতে হয়। পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—"একা রবীন্দ্রনাথের জীবনে বাংলা সাহিত্য যৌবনের উদ্দামতা ও বিচিত্র বর্ণচ্ছটা হইতে যাত্রা করিয়া প্রৌঢ়ের সবলশুভ্রতা এবং বিরলবর্ণ বিবৃতির ভিতর দিয়া গিয়া সান্ধ্য আকাশের স্বর্ণ মেঘের আড়াল হইতে অজানার ডাক শুনিতে পাইয়াছে। একা রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর এবং বিংশ শতাব্দীর এই কয় বৎসরের জগৎ-সাহিত্যের বিচিত্র ধারাকে বাংলা সাহিত্যের ধারার সঙ্গে আনিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন, এবং বাংলার ক্ষেত্রকে বিশ্বসাহিত্যের ভক্তজনের নিকট এক চরিত্র সঙ্গমতীর্থে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। গত পঁচিশ বৎসরে শেলির বায়বীয় আকাশাভিযান ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শান্ত সরল অন্তর্মুখীনতা, কীট্‌সের রস-ঢল-ঢল, বর্ণ-বিলাস ও গ্যেটে ব্রাউনিঙের মানসতা, জর্জ্জ এলিয়টের বিশ্লেষণী প্রতিভা ও গোতিয়ে ফ্লোবেয়ারের সূক্ষ্ম শিল্পকলা, ইবসেনের বীজ কৌশল ও টলষ্টয়ের নীতিনিষ্ঠা, হথর্ণের অপূর্ব্ব রহস্যময়তা ও মেটারলিঙ্কের অলৌকিক রূপকজাল, পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতের ছায়াময় অনিশ্চয়তা ও প্রাচ্য সুফী বৈষ্ণবের স্থির ধ্যানী উপনিষদ ঋষির শান্ত সংযত ব্রাহ্মী-ধ্যান ও ভাগবত "হৃদয়-যমুনা বৈষ্ণবী আনন্দ-নৃত্য তিনি বাংলা সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি কাব্যে কল্পপন্থী (romantic) এবং শেষে অধ্যালোকপন্থী (mystic); কথাসাহিত্যে বস্তুপন্থী (realistic), শ্রেয়ঃপন্থী (idealistic) এবং ভূতালোকপন্থী। কাব্যে তিনি বস্তু-সম্পর্ক-বিহীনতার অপবাদে শ্রেণী বিশেষের নিকট হইতে গালি খাইয়া থাকেন, আবার কথাসাহিত্যে অতি বাস্তবতার অপবাদেও তিনি অনেকের নিকট রেহাই পাইতেছেন না। নানা বিরুদ্ধতার সমবায়ে, নানা বৈচিত্র্যের মিশ্রণে রবীন্দ্র-সাহিত্য জগৎ-সাহিত্যে অপূর্ব্ব এবং অতুল্য।"

কিন্তু কবি ও শিল্পীর সৃষ্টিপ্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথই সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ নহেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি তেমনি তিনি এ যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিকও বটেন। তাঁহার এই অসামান্য মনীষা প্রধানতঃ তাঁর বাংলা ও ইংরাজী গদ্য রচনাবলী—তাঁর প্রবন্ধরাজিকে অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সব প্রবন্ধরাজির মধ্যে তিনি রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি জীবনের সমগ্র বিভাগে আশ্চর্য্য মৌলিক ও অনন্যসুলভ চিন্তারাজি ছড়াইয়া দিয়া দেশ বিদেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনকে নানাদিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন এবং পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে সহায়তা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চেষ্টাকে যে বিপুল মহীরুহের সঙ্গে তুলনা করিয়াছি এই প্রবন্ধরাজিকে মর্ত্ত্যভূমি হইতে রসপায়ী তার বিচিত্র শিকড়জাল বলিয়া মনে করা চলে। যে লোকশিক্ষক এবং চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে এবং সবুজপত্রী যুগের গল্পে আর্টের অন্তরালে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তিনিই এই সব প্রবন্ধাবলীতে দার্শনিকতার প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে অনাবৃত-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শুধু চিন্তা নয়, বহুদিন হইতে তাঁর জীবনে চিন্তা ও কাজ হাতধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তাই করেন নাই, তিনি বাংলাদেশে অভিনব শিক্ষাধারার প্রবর্ত্তকও বটেন। দেশের রাজনৈতিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তারাজিই যে শুধু তাঁর দেওয়া তা নয়, তিনি প্রকাশ্যভাবেও দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে স্বদেশীযুগে একবার নামিয়াছেন এবং

• এগুলি হলে.

দেশসেবায় তাঁর অখণ্ড পূর্ণপরিণত মানবতার আদর্শটিকে শান্তিনিকেতনে এবং শ্রীনিকেতনে রূপ দিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎভাবে বাংলাদেশের এবং পরোক্ষভাবে সমগ্র ভারতের জীবনের নানাবিভাগে সবুজ-তরুণের জন্মদাতা। দেশের জীবনের নানাবিভাগে অন্ধ আচারের যে অত্যাচার, যা মানুষের বুদ্ধিকে নিগড়িত ও আত্মাকে নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছে, যা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীন মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে সব চেয়ে বড় বাধা তার বিরুদ্ধে এমন বিপুল এমন সমগ্রভাবে বিদ্রোহ প্রচার রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। তিনি বর্ত্তমান বাংলার চিন্তাধারা ও মনীষাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যেমন তাকে নূতনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি বর্ত্তমান বাংলার ভাষায় ও ভঙ্গীতে, শিষ্টাচারে ও বেশভূষায়, শিল্পে ও সাহিত্যে, চলনে ও বলনে তাঁরই সৌন্দর্য্যবোধ জয়যুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কাব্যে ও জীবনে আনন্দের উপাসক। তিনি একদিক দিয়া যেমন কাব্য-সৃষ্টি করিয়া নির্জীব ও নিরানন্দ দেশকে প্রাণ ও আনন্দ-ধারায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন তেমনি অন্যদিকে তাঁর সমগ্র জীবনটিকেও একটি অখণ্ড কবিতার মত বিস্মিত-ভুবনের দৃষ্টির সম্মুখে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছেন। তিনি বিশ্বভুবনের কাছে যে প্রেম ও মিলনের বাণী লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাহার হৃদয়-দ্বারে তাহা ঘা দিতে সুরু করিয়াছে; বিশ্বের মনীষার কাছে সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার, কৃষ্টির সহিত কৃষ্টির, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগের যে নিগূঢ় দার্শনিক ভিত্তি নিয়া তিনি উপস্থিত করিয়াছেন (যেমন তাঁর Creative unity প্রভৃতি গ্রন্থে) তার ফল ফলিবার বেশী বিলম্ব নাই। কিন্তু একদিকে তাঁর কণ্ঠ বিশ্বমিলনের গানে যেমন উদ্গীত হইয়া উঠিয়াছে, একদিকে তাঁর বাণী যেমন বিশ্বাতীতের মধ্যে সমগ্রবিশ্বের ঐক্যের কথা প্রচার করিয়াছে, তেমনি অন্য দিকে সেই কণ্ঠই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার সঞ্চিত আবিলতা ও কলুষের আবর্জ্জনাস্তূপের উপর বজ্রনির্ঘোষে ফাটিয়া পড়িয়াছে, একদিকে তাঁর নয়নে যেমন প্রেমের আহ্বান, অন্যদিকে তাঁর হাতে হিংস্র স্বার্থলোলুপ যন্ত্রচালিত সভ্যতার উপর ধৃত তেমনি অমোঘ ন্যায়ের দণ্ড। বিশ্বসভ্যতার এই বিরাট পুরুষের বাণী শুনিয়া কেহ অভিভূত হইয়াছে, কেহ মাথায় হাত দিয়া চিন্তায় বসিয়াছে, কেহ বা ক্ষেপিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাকে আর অস্বীকার করিয়া ঠেলিয়া দিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা দেশে দেশে পর্ব্বত-চূড়ার মতন এরি মধ্যে এই প্রাচ্য সূর্য্যের আলোক মাথায় ধারণ করিয়াছেন, এরি মধ্যে তাঁরা বুঝিয়াছেন—সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে এত বড় বিরাট স্বপ্ন আর কোনো মানব দেখেন নাই, এত বড় বিরাট স্বপ্নকে নিজ জীবনে এবং জীবনের কার্য্যে এত বড় বিরাট রূপও আর কেহ দেন নাই। বহু-বিচিত্র সৃষ্টি-প্রতিভার সঙ্গে অপূর্ব্ব দার্শনিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও কর্ম্মশক্তির যিনি সমন্বয় করিয়াছেন, যিনি একাধারে প্রেমিক, জ্ঞানী ও কর্ম্মী যিনি ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হইয়াও দরিদ্র জনসাধারণকে ভুলিতে পারেন নাই, যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনের শ্রেষ্ঠ ফল, সভ্যতার সম্পদকে অস্বীকার করিয়া নয় তাকে আত্মসাৎ করিয়াই যিনি সমগ্রতার সাধনায় নিযুক্ত, যিনি আপন জীবনে আনন্দ ও নিষ্ঠাকে সম্ভোগ ও ত্যাগকে ঐশ্বর্য্য ও রিক্ততাকে এমন অপূর্ব্ব উদ্বাহ-বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন, যিনি যুগ-বাণীতে অভিভূত না হইয়া মানবের চিরন্তনী বাণীকে এমন বিপুল বীর্য্যের সহিত ঘোষণা করিয়া চলিয়াছেন, যিনি আপন জীবনের মধ্যে জগৎবাসীকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন—বিশ্বেতিহাসের সেই পূর্ণ-পরিণত মানব বাংলাদেশের হৃদয় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছেন। কাজেই তিনি বিশ্বের হইলেও বাংলারই অন্তরতম নিকটতম। বর্ত্তমান বাংলা তাঁরই সৃষ্টি। বাংলার রক্তের মধ্যে তাঁরই রাগিণী, বাংলার কণ্ঠে তাঁরই সুর; বাংলার মস্তিষ্কে তাঁরই চিন্তা, বাংলার হৃদয়ে তাঁরই প্রীতি, রাষ্ট্রগুরুর প্রভাব বাহিরে। চিন্তা ও প্রীতির গুরুর প্রভাব খাদ্য জল বায়ুর মত ভিতরে গিয়া জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিলেও তাহা অনেক সময় চোখে দেখা যায় না। সজ্ঞানভাবে সেই প্রভাবকে অনুভব করাই জাতীয় আত্মপরিচয় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র পথ। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে পড়া এবং বোঝা উচ্চতম শিক্ষার মাপকাঠি স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্র-নাথকে আয়ত্ত করার নামান্তর উচ্চতম শিক্ষা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। এ্যাডিসন-সহচর সুলেখক ষ্টীলের একটি উক্তি ইংরাজী-সাহিত্যে প্রবচনের মত হইয়া গিয়াছে—একটি মহীয়সী নারী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—To love her is a liberal education। এই উক্তিটি একটু বদ্‌লাইয়া আমরা এই মহা-নর সম্বন্ধে বলিতে পারি—To read Tagore is a liberal education। বাংলা-দেশ রবীন্দ্রনাথকে পড়ুক এবং বুঝুক, সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে রবীন্দ্র-পরিষদ স্থাপিত হউক, তাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে চিন্তা এবং আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃকই অনুপ্রাণিত বিচিত্র কর্ম্মচেষ্টা যুক্ত হইয়া উঠুক। বাংলার আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের তাই পথ।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

খুকী

শ্রীসুবোধ বসু

ভোরবেলাটা বর্ষার জন্য ঘুমাইবার মতো। বেশ একটু শীত-শীত, আর জল-পড়ার শব্দ যেন ঘুম-পাড়ানী গান। কিন্তু অরসিক লোকও, পৃথিবীতে আছে। এই তো আমাদের নবীন অধ্যাপক অতীন্দ্রকুমার রায় এরই মধ্যে তন্দ্রা ছাড়িয়া পিশামশায়ের মস্ত বড় ষ্টাডিটাতে বিজলী আলো জ্বালাইয়া সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার উপর বইয়ের গাদা সাজাইয়া বসিয়াছে। একটা সোফাও ছিল, তাহাতে হেলান দিয়া পড়িলে কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যে চেয়ারটায় চাপিয়া বসিয়াছে তাতে গদীর লেশমাত্র নাই। ভাবখানা এই যে পড়াশুনা আরামের জিনিষ নয়। চোখে চশমা, হাতে লাল-নীল পেন্সিল, ভ্রূ কুঞ্চিত। টুক্‌রা কাগজ-পত্র বাতাসে উড়িয়া যাইতে চায় তাহাদের নিবৃত্ত করিতে হয়, বিদ্যুতের ঝল্‌সানি চশমার কাচে আসিয়া প্রতিফলিত হয় তাতে ব্যাঘাত। বই-ঢাকা দেওয়ালগুলি মাঝে মাঝে আকর্ষণ করে। কিন্তু ঘুম হার মানিয়াছে।

মস্ত বড় ষ্টাডি। একটা সুদীর্ঘ হল-ঘরের প্রায় সবটাই বইয়ের সেল্‌ফ্‌-এ ভরা। অতীনের পিশামশায় যে পড়িবার জন্যই লাইব্রেরী করিয়াছিলেন তা নয়। টাকার অভাব ছিল না, লাইব্রেরী করাতে সম্মান আছে, অতএব বইয়ের পর বই আসিয়া ঘরটাকে ভরিয়া ফেলে। এষ্টেটের ম্যানেজার লেখা-পড়া জানা লোক ছিলেন। অনেকটা তার জন্যই লাইব্রেরীটা একটা বহু-দামী যা-তা হইতে পারে নাই। পিশেমশায় বাঁচিয়া থাকিতে এটা বিশেষ ব্যবহৃত হইত না। এখন এটাই অতীনের একমাত্র গন্তব্য জায়গা হইয়া উঠিয়াছে।

হয়তো আটটা বাজিয়াছে। নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া চায়ের ট্রে নিয়া বয় উপস্থিত। অতীন তখন এরোপ্লেনের বেগে ছাপা হরফের উপর দিয়া চলিয়াছে।

থক্‌—থক্‌,—লোকটা কাশিল। ফল হইল না। নাক-টানাও ব্যর্থ হইল। পা ঘষিলেও শব্দ হয় না,—কার্পেটে মোড়া ফ্লোর্‌।

বয় চন্দ্রবংশীয়। বদন-মণ্ডল চাঁদের মত,—নাক-টাকের বালাই নাই, গহ্বর আছে। কারো কাণের কাছে নাক লইয়া গেলে যে সে ব্যক্তি নিঃশ্বাসের শব্দে চমকিয়া উঠিবে সে পথও বন্ধ। মহা মুস্কিক! সে বেচারী নিরুপায়। কথা বলা বেয়াদপী হইবে,—বিশেষ এই পড়ার ঘরে।

পড়িতে পড়িতে অতীন একবার ভাবনা-ভরা চোখে সুমুখের বইয়ের র‍্যাকের দিকে চাহিল। বয় ভাবিল এই তাহার সুযোগ। তাড়াতাড়ি গিয়া দৃষ্টিপথে যেই দাঁড়াইয়াছে অতীনের চোখ তখন আবার বইয়ে।

আর কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে। চা তো ঠাণ্ডা হইবার জোগাড়।

বাবুজী!

সাড়া নাই। আরো জোরে,—বাবুজী। হথৈবচ। সজোরে কহিল, বাবুজী, চা লে আয়া।

অতীন চমকাইয়া উঠিল। গেল, গেল। প্রাচীন ঈজিপ্ট সম্বন্ধে যে থিওরি গড়িয়া তুলিতেছিল একটা অর্ব্বাচীনের নির্ব্বোধ আহ্বানে মাকড়ুশার জালের মত ছিঁড়িয়া গেল। সে হতাশায় প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল, গেট্‌ আউট্‌ ইউ ফুল,—ভাগো।

চা বাবুজী।

তোর মুণ্ডু বাবুজী। লে যাও তোম্‌রা চা,—কোন্‌ মাঙ্গা। মা-জী ভেজ্‌ দিয়া।

আউর বাদ্‌ মত্‌ করো। নিকালো। At once!

অপ্রসন্ন মুখে চন্দ্রবংশীয় জ্যোতিষ্ক বাহির হইয়া গেল। অতীন রাগে প্রায় গজ্‌গজ্‌ করিতেছে। একটা উঁচু

গৈরিকবর্ণ পানীয়ের জন্য তার কতটা ক্ষতিই না আজ হইল। বেশ, আজ সে বই ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে চা আর জীবনে সে খাইবে না। তারপর বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছিন্ন-সূত্রের মেরামতির কাজে লাগিয়া গেল। কতটা সভ্যতা যে সাহারায় চাপা পড়িয়াছে তার ঠিক নাই। হাইরোগ্লিপিকে তার যে সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—এমন সময় আবার ব্যাঘাত।

অতীন ভাবিল এবার আর সহ্য করা যায় না। চন্দ্র-বংশীয়ের লেপা-পোছা মুখে এইবার একখানা বই ছুঁড়িয়া না সতর্ক করিলে চলিবে না। বইখানা দৃঢ় করিয়া ধরিয়া ক্রুদ্ধমুখে পিছনে ফিরিয়া,—ও পিসিমা, তুমি?

পিসিমা প্রৌঢ়া বিধবা। মুখে স্নেহভারের সাথে একটু দৃঢ়তাও যেন অলক্ষ্যে মিশানো। স্নিগ্ধ দুটী চোখ।

চা'র কি হলো?

চা খাওয়া বাদ দিলাম,—সকাল বেলায় শুধু শুধু অনেকটা সময় নষ্ট।

পিসিমা কোনো জবাব দিলেনা না। ডাকিলেন বীরসিং।

পলায়িত বীরসিং চা লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল ও ট্রেটা রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। পিসিমা পট্ হইতে পেয়ালায় চা ঢালিয়া কহিলেন, তোরা কি আমাকে সন্ধ্যা আহ্নিকও করতে দিবিনে?

কেন, আমি আবার কি করলুম?

এই তো বাবু চা খাবেন না, দিন-রাত্রি শুধু বই পড়্‌বেন। অর্দ্ধেক নাম জপ না হ'তেই উঠে এলাম।—পিসিমা খাবার ও চা অতীনের কাছে আগাইয়া দিলেন।

উপায় নাই। পড়া বন্ধই রাখিতে হইবে। তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিলেই পিসীমাকে শীগ্‌গির বিদায় করা যায়।

চা খাবিনে নাকি?

অতীন প্রায় প্রতিজ্ঞার কথাটাই আবার জানাইয়া দিতে-ছিল। মধ্য-পথে সংবরণ করিয়া কহিল, চা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় অপকারী।

খাওয়া অনেকক্ষণ শেষ। পিসীমার কিন্তু নড়িবার নামটুকুও নাই। যত রাজ্যের যত অদরকারী কথা। তোদের একটু আধটু জমিদারী দেখা উচিত। মেয়ে মানুষ আমি আর কত পারি। কেবল কর্ম্মচারীর উপর ভরসা করেই কি আর থাকা যায়।

নিশ্চয়ই পিসিমা।

কবে যাবি বল তো, আমি দেওয়ানজীকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

কবে? তা পিসিমা এই থিসিস্‌টা শেষ হওয়ার আগে তো আর—

পিসিমা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, পোড়া কপাল, আমি ভাবলাম বুঝি সুবুদ্ধি এসেচে। তা ওসব দিয়ে আর কি হবে বল তো, বিদ্যে তো আর কম হয়নি। তোকে তো আর টাকা কামাই করতে হবে না। আমার যা আছে তাই দিয়েই তোর তিন জন্ম চলে যাবে

অতীন কহিল, কিন্তু একটা ডক্টোরেট্—

পিসিমা কহিল, কেন পয়সা দিলেও উপাধি পাওয়া যায় না নাকি? এই তো উনি সাহেব-সুবো খাইয়েই তো—

শেষ করিবার আগেই অতীন কহিল, ঠিক জানি না। এমেরিকাতে খরচ-টরচ করলে পাওয়া যেতেও পারে।

তবে? তবে আর কি? কত টাকা দিলে হবে বল।

অতীন আশান্বিতা পিসিমাকে হতাশ করিল। কিন্তু পিসিমা তেমনি বসিয়া।

অতীন কহিল, তবে পিসিমা, এখন একটু পড়াশুনা করা যাক্।

পিসিমা কহিল, থাম্‌রে বাপু, দুদণ্ড কাজের কথা বলতে দে। সারাক্ষণ শুধু পড়া-পড়া।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া অতীন কহিল—বলো, শীগ্‌গির সেরে নাও। কি করতে হবে?

পিসিমা কহিল, বিয়ে।

বিয়ে? কে বিয়ে কর্‌বে?

ছেলের ছিরি দেখ না, কে বিয়ে কর্‌বে। আর কতকাল আইবুড়ো হয়ে থাকবি শুনি?

অতীন বারকয়েক ঢোক গিলিল। পিসিমা একটা সর্ব্বনাশা ব্যাপার ডাকিয়া আনিতেছে দেখা যায়। কহিল, কিন্তু থিসিস্‌টা-

রাখ্ তোর ফিসিস্ ফিসিস্,—মাথামুণ্ড। মেয়েও আমি ঠিক করে রেখেচি।

অতীন কহিল, তা পিসিমা, এতো তাড়াতাড়ি কি। ডক্টোরেটটা পকেটে পুরে' তখন যত আনো বিয়ে করে' ফেলবো।

আর পনেরো দিন পরেই আমি বিয়ে দিচ্ছি, এই কথাটাই বলতে এলুম।

পনেরো দিন পরে! অতীনের চোখ দুটী বড় হইয়া উঠিল। সত্রাসে কহিল, কৈ, আমি তো সে খবর জানতুম না। তখনই তো আমরা হিষ্টরিক্যাল এক্স্‌কার্সনে যাচ্ছি। প্রত্নতত্ত্ব -

পিসিমা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, কোথাও যাওয়া টাওয়া হবে না।

হাঁা, ঠিক কথা, তখন আমার এক বন্ধুর বিয়ে, সেখানে না গিয়ে পারি না।

পারতেই হবে।

ওঃ পিসিমা তুমি কি ভুল করেছিলে দেখো। আমার জন্ম মাসে বিয়ে হবে কি করে?

তোর জন্ম মাস? সে তো অঘ্রাণে।

হতাশ হইয়া অতীন শূন্যে ঘুঁষি ছুড়িল।

পিসিমা কহিল, আমি অনেকদিন অপেক্ষা করেছি, আর একটুও দেবী আমি করতে পারব না। মেয়ে আমি ঠিক করেছি, দিন পনেরো পরে ভালো দিনও আছে।

অতীন কহিল, কিন্তু পিসিমা—

পিসিমা কহিলেন, কিন্তু টিন্তু নেই।

সর্ব্বনাশ। অতীন মানস-চক্ষে দেখিল তাহার শত-শ্রমের শত-অনুসন্ধান একটা চটুল চপল মেয়ে আসিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। পড়ার সময় আসিয়া ইয়ার্কি শুরু করে... কাণ্ডজ্ঞানহীনার মত সব সময়ই তার খিলখিল হাসি। নিঃশব্দে হাঁটিতেও পারে না,—চুড়িবালার শব্দ। তার চিন্তার গভীরতাকে যদি একটু সন্ধান দিতেও পারে! একটা চঞ্চল, অগভীর ফাজিল-গোছের জীব আসিয়া তাহার অবস্থা রীতিমত কাহিল করিয়া তুলিল। কিন্তু সর্ব্বনাশটা এড়ান যায় কি করিয়া?

কহিল পিসিমা, তুমি কি আমাকে যার তার সাথে ধ'রে বিয়ে দিতে চাও নাকি?

পিসিমা হাসিয়া কহিলেন, যার তার সাথে কি রকম? বড় ঘরের মেয়ে, লেখা পড়া শিখেচে। দেখতে যেন প্রতিমা। এত বছর ধরে' পাশাপাশি রয়েচি। কর্ত্তারও সাধ ছিল ওদের সাথে সম্বন্ধ করতে।

এ পর্য্যন্ত শুধু ভূমিকাই। এইবার কোন্ পরিচয় না জানি প্রকাশ হয়। বাহিরে কাহার পদ-শব্দ হইল। সাথে সাথে একটা মেয়েলীগলা,—মোক্ষদা, পিসিমা কৈ রে? অতীনদা নিশ্চয়ই পড়ছে।

পিসি তাড়াতাড়ি কহিলেন, ঐ সে এসেছে। খুকীকে পছন্দ হয় তো।

খুকীকে পছন্দ! অতীনের চোখ বিস্ফারিত। খুকী তাহাদের প্রতিবেশীর মেয়ে, অতীনের ছাত্রী-গোছের। অতীন তোত্‌লাইয়া উঠিল, ত—তুমি কি বলছ পিসিমা।

বলছি ওর সাথে তোর বিয়ে আমি দেবই।

খুট্—দরজা খোলার শব্দ হইল। সাথে-সাথে বছর আঠারোর একজন তন্বী মেয়ে ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেছিল, পিসীমা বাধা দিয়া কহিল, তুই বসবার ঘরে একটু ব'স গিয়ে খুকী, আমি আসছি।

খুকী বিস্মিত হইয়া তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া ভঙ্গীভরে বেণী দোলাইয়া চলিয়া গেল।

পিসীমা কহিল, আমি আজ পাকা কথা দিচ্ছি ওদের।

অতীন ব্যস্ত হইয়া কহিয়া উঠিল, না না না না না—

কি আপত্তিটা শুনি?

বিয়েটা পিসিমা, আমি নাই কর্‌লাম।

পিসীমা গম্ভীরস্বরে কহিলেন, তবে তুই পুষ্যি রাখতে আমাকে বাধ্যই করাচ্ছিস।

পুষ্যি! অতীনের মন তখন ঈজিপ্ট হইতে সড়াক্ করিয়া একেবারে কলিকাতায় চলিয়া আসিল। পুষ্যি অর্থাৎ পিসিমার অগাধ টাকা একটা অর্ব্বাচীন লম্পটের হাতে চলিয়া যাওয়া! সমস্ত সম্পত্তি ধূলার মত উড়িয়া যাইবে। তবে উড়িয়া যাইবে বলিয়াই যে তাহার সব আক্ষেপ তাহা নহে। কত সম্পত্তি তো কত লোক উড়াইতেছে। ব্যাপার

এই যে পিসিমা পুষ্যি নিলে তাহার ডক্টোরেট্ আর মন্দার বাজারে তাকে এমন হালে পোষণ করিতে পারিবে না। অতীন কথনো উচ্চ বিষয় ছাড়া চিন্তা করে না। কিন্তু এইবার হীন টাকা পয়সা ভাবাইয়া তুলিল।

কহিল, পিসীমা, আমিও ক'দিন ধরে বিয়ের কথা ভাবছিলাম।

তবে যে বল্‌লি বিয়েই করবি না।

অতীন থতমত খাইয়া গেল। তাও তো বটে। তখন দুই কুল রক্ষা হয় কি করিয়া?

কহিল, না, বলছিলাম খুকীকে আমি বিয়ে করতে পারবনা।

কেন শুনি?

খুকী, পিসিমা? নাম শুন্‌লেই আমার হাসি পায়। খুকীকে আবার বিয়ে করবো কি, তাকে হাত ঘুরোতে শেখাতে পারি।

যা-যা ফাজ্‌লামো করিস্ না। ওকে তো আবার কত পড়াস্ দেখি।

পড়া শেখাই বলেই আবার বিয়ে করতে হবে নাকি। খুকী,—রাম রাম, কি নাম। তা পিসীমা তুমি পুষ্যি রাখো আর নাই রাখো খুকী-টুকী আমি বিয়ে করতে পারবনা। যার তার সঙ্গে তুমি আমায় জোর করে বিয়ে দেবে নাকি?

পিসীমা হয়তো বা বুঝিলেন, বোধ হয় পছন্দ হয় নাই, তাই আপত্তি। তবে পীড়াপীড়ি করা চলে না।

কহিলেন, ওকে পছন্দ হয় না বুঝি?

একটুও না।

কলেজে ঐ যে মেয়েটা সঙ্গে পড়ত তাকেই বুঝি পছন্দ?

অতীন কোনদিনই সহাধ্যায়িনীদের পছন্দ অপছন্দের কথা ভাবে নাই। কম্পিটিশনের কথাই ভাবিয়াছে। মেয়েদের এগজামিনাররা নম্বর বেশী দেয়। কিন্তু বর্ত্তমান বিপদ কাটাইতে পারিলে সে বাঁচে। কহিল, হুঁ।

পিসিমা কহিল, বেশ, তবে তার বাপের কাছেই কথা পাঠাই। নাম আর ঠিকানা দে।

অতীন যেন বিপদের কাঁটা-বনে পড়িয়াছে। এখান ছাড়ায় তো আরেক জায়গায় জড়াইয়া পড়ে। তাড়াতাড়িতে কি বলিলে ঠিক হয় ভাবিতে পারিল না। কহিল, না পিসিমা, সে তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমিই ব্যবস্থা করব।

পিসিমা অতীনের দিকে চাহিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। তারপর গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বেশ, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু একুশে আষাঢ় আমার দিন ঠিক রইল। সেদিন বিয়ে না হয় তো বাইশেই আমি পুষ্যি নেব,—পিসতুত ছোট দেওরের ছেলেকে। আমার কথার নড়চড় নেই।

পিসিমা তখন ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

অতীন তখন প্রমাদ গণিল। সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এখন সে করে কি! ঈজিপ্ট্ উড়িয়া গেল, রোমান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত—গ্রীসের সিটী-ষ্টেটে আগুন লাগিয়াছে,—মহম্মদ শা গজনী আসিয়া ভারতবর্ষ লুঠ করিল। চারিদিকে হতাশার আর্ত্তনাদ! চালাকি নয়, পিসিমার সম্পত্তির আয় বছরে হাজার সত্তর—ব্যাঙ্কে কম কোন্ পাঁচ-সাত লাখ টাকা না আছে। সোনার দীপ্তির কাছে ডক্টোরেট্ ক্রমেই নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে।

খুট্—দরজা খুলিয়া গেল। পরক্ষণে মূর্ত্তিমতী বিভীষিকার মত,—আঠারো বছরের খুকী।

অতীন যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে এই খুকীটাই আব্দার করিয়া পিসিমার মন গলাইয়াছে; রাক্ষুসী সর্ব্বনাশ করিবার আর জায়গা পাইল না! আর ইহাকেই অতীন অত যত্ন করিয়া কলেজের পড়া বলিয়া দিত! অতীনের মনে হইল নিমকহারামীতে এটা বিভীষণকেও হার মানাইয়াছে। হতচ্ছাড়ী কোথাকার! নিজের তো কোনো লাভই করিতে পারিল না,—মাঝখান হইতে তার অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

খুকী তো আর ছোট্ট খুকী নয় যে অতীনদাকে ভয় করিবে। নাচিতে নাচিতে সে আসিয়া টেবিলের কতগুলি বই একধারে ঠেলিয়া দিল। তারপর সেখানটায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, ভারী একটা মজা হয়েছে কাল ক্লাসে।

বৈজ্ঞানিকরা আকর্ষণকারী পাথরের কথাই শুধু বলিয়াছে। বিকর্ষণকারী কত কিছু যে আছে, তার খবর রাখে না।

অতীনের মুখ চট্ করিয়া অন্যদিকে ফিরিয়া গেল। কর গোণা সুরু হইয়াছে, খৃষ্ট-জন্মের কয় বছর আগে মিশরীয় সভ্যতার সূত্রপাত তাই এক দুই করিয়া গুণিতে আরম্ভ করিয়াছে বা!

শুন্‌ছো অতীনদা?

অতীনদা মোটেই শুনিতেছে না। কুড়ি পর্য্যন্ত যাইয়া আবার ফিরিয়া ফিরিয়া গুণিতে লাগিল।

খুকী কহিল, ওকি সন্ধ্যা জপ করছ নাকি?

ওসব পরিহাসের কোনো জবাব দিলে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তাই অতীন দুই হাতে কর গুণিতে থাকে।

খুকী পরিহাস-তরলকণ্ঠে কহিল, ওরেঃ বাবা, কি মনোযোগ। তারপর গা ঠেলিয়া কহিল, শোনই না অতীনদা, কী ব্যাপারই হয়েছে—।

অতীন ওদিকে মুখ রাখিয়াই সংক্ষেপে কহিল, কাজের সময় গোল ক'রো না।

ওঃ কি কাজই করছিলে দরজা ফাঁক করে আমি আর দেখিনি বুঝি? পাগলার মত তো হাওয়ায় হাত পা ছুঁড়ছিলে। আচ্ছা এইটে কি অতীনদা? 'জমিদারী হইতে বার্ষিক হাজার সত্তর, ব্যাঙ্ক হইতে ইণ্টারেষ্ট'—টেবিলের উপর হইতে লাল নীল পেন্সিলে লেখা একটা কাগজ খুকী চোখের সামনে উঠাইয়া ধরিল।

অতীন চট্ করিয়া ফিরিল,—ঝট্ করিয়া কাগজটাতে টান্—তারপরই সেটা একেবারে অতীনের পকেটে। কহিল ঈজিপ্টের এক জমিদারের বাৎসরিক আয়ের হিসাব।

খুকী কহিল, প্রাচীন ঈজিপ্টে ব্যাঙ্কও ছিল বুঝি?

অতীন জবাব দিল, বিস্তর। কিন্তু এবার তুমি যাও তো।

খুকীর যাইবার বিশেষ ইচ্ছা দেখা গেল না। পা নাড়াইতে নাড়াইতে সে কহিল, একটা প্রশ্ন আমাদের হিষ্ট্রীর পেপারে আস্‌বে,—বলে দাও না। রোম-সাম্রাজ্য পতনের কারণ কি? অতীন হয়ত তখন ঈজিপ্টের ব্যাঙ্ক-ডিপসিটের পরিমাণ ঠিক করিতেছিল, কিম্বা তখন চেক্ চলিত কি না তাহাও ভাবিতে পারে। বিরক্তভাবে খুকীকে কহিল, জানিনা।

জানো না? বলো কি? আমাদের হিষ্ট্রির প্রফেসার যে বল্লে, ও যে জানেনা সে একটা গাধা। তুমিও তো প্রফেসার।

রাগিয়া অতীন কহিল, তুমি যাবে কিনা শুনি?

বাঃ, আমাকে পড়াবেনা বুঝি?

আমি তো আর তোমার মাষ্টার নই। মাইনে দাও আমাকে?

কত করে দিতে হবে বলো।

অতীন তখন রাগে প্রায় ফুলিতেছে। কহিল, পেটে যত শয়তানী বুদ্ধি, এদিকে কথায় খুব।

বিস্মিত হইয়া খুকী কহিল, বাঃরে, আমি কি করলুম।

অতীন রাগিয়া কহিল, নেকী, জানেনা যেন। যাও, এখন পথ দেখ।

এই অকারণ রূঢ়তায় খুকী একেবারে অপ্রতিভ হইয়া গেল। অতীনদা এমন হইয়া উঠিয়াছে কেন? কোথায় কোন অন্যায় করিয়াছে বলিয়া তো তাহার মনে পড়ে না। একটু অপেক্ষা করিয়া খুকী যখন দেখিল অতীনের রাগ পড়ে না তখন মুখখানা কালী করিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

উঃ, পাজীটাকে বিদায় করিয়া অতীন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে! চালাকির আর জায়গা পায়না! অতীন ভাবিতে লাগিল।...

খুকী নামটা অবশ্যই বিশ্রী,—তা বলিয়া খুকী তো আর সত্যই খুকী নয়। আর সত্য কথা বলিতে কি খুকীকে দেখিতে মন্দ না! খুকীর চোখ দুটী ভারী দুষ্টুর মতো,— দেখায় কিন্তু ভালো। ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় খুকীর বেণীটা দুলিয়াছিল কিন্তু চমৎকার! আর খুকীর চলার ছন্দ,—দূর ছাই, ওসব সে ভাবিতে যায় কেন? ভাবিবার মত পিসীমার উত্তরাধিকারের কথা। পিসীমা যা জেদী লোক বিয়ে না করিলে ঠিক পুষ্যিই রাখিয়া বসিবেন; সেটা অবশ্যই আর হইতে দেওয়া যায় না। ভাবিয়া দেখিলে ডক্টোরেটের চাইতে পিসীমার উত্তরাধিকার অনেক লোভনীয়। অতএব বিয়ে একটা এড়ান যায় না।

বিয়ে! যাক্, উপায় যখন নাই তখন চোখ মুখ বুজিয়া একটা করিয়া ফেলিতেই হইবে। আর ঐ—ঐ খুকীকে

করিলেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু এইখানেই আবার গণ্ডগোল। নিজেই সে সে-সুযোগ হারাইয়াছে। পিসিমাকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছে যে খুকীকে মরিয়া গেলেও বিয়ে করিতে পারিবেনা। শুধু তাই নয়। ইহাও বলিয়াছে এক ভূতপূর্ব্ব সহাধ্যায়িনীর প্রতি সে অনুরক্ত—তাকেই বিবাহ করিবে। এখন উপায়? ব্যাপারটা এখন আর সোজায় মিটিবেনা। ঈজিপ্ট ছাড়িয়া অতীন বিয়ের কথা ভাবিতে বসিল।

ভাবিতে ভাবিতে তিনচারদিন কাটিয়া গেল।

সেদিন রাত গোটানয়েকের সময় অতীন বাড়ি ফিরিতেই পিসীমা ডাকিয়া পাঠাইলেন। তোর সঙ্গে পড়ত যে মেয়েটা আজ বিকেলে এসেছিল।

হুঁ।

একটু আগেই তুই বেরিয়ে গিছ্‌লি, বল্লুম। তা মেয়েটা দেখতে তোমার বিশেষ ভালো নয় কিন্তু বাপু,—তোমার কি যে পছন্দ তা তুমিই জানো। হ্যাঁ, তবে লেখা-পড়া জানে।

অতীন বেচারী ক্রমশই অগাধ জলে গিয়া পড়িতেছে। কখন সে দায় এড়াইবার জন্য কি সামান্য বলিয়াছিল তাহারই ঠেলায় হড়হড়্‌ করিয়া পিছ্‌লাইয়া চলিয়াছে।

পিসীমা কহিলেন, ওকে বল্লুম অতীনের তোমাকে বড় পছন্দ,—তোমাকে না হ'লে কাউকে বিয়েই করবেনা। শুনে মেয়েটা লজ্জায় মাথা নীচু করলে। শত হোক বাঙালীর মেয়ে তো!

এতক্ষণ পরে অতীনের মস্তিষ্কে সড়াক্‌ করিয়া এক ঝলক রক্ত গিয়া পৌঁছিল। এই মেনী মিত্তিরকে বিবাহ করিবে সে! সর্ব্বনাশ হইয়াছে তা হইলেই। রঙ তাহার চাইতেও তিন পোচ্‌ ময়লা। নাকটাকে আর যাহাই হোক উন্নত বলা যায় না। চোখদুটা মিট্‌মিট্‌ করে। বেশীক্ষণ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে,—তা যাক্‌। মেনী মিত্তির মোটরে চড়িয়া কারণে অকারণে বহুদিন হইতেই বই চাহিতে উপস্থিত হইত। অতীনের প্রথমে সন্দেহ করিবার কোনো হেতু হয় নাই। কিন্তু কলেজ-জীবন শেষে যখন আসা তাহার বন্ধ [illegible] একটু শঙ্কা হইত বৈকি। কিন্তু ওরে বাবা, মেনী মিত্তির ঘাড়ে চাপিলেই গিয়াছে!

পিসিমা কহিল তোর যখন ওকে পছন্দ তখন আর আমার আপত্তি নাই। কাল সন্ধ্যায় ওকে আর ওর ছোট ভাইকে এখানে চা খেতে নিমন্ত্রণ করে দিয়েচি। তা তোর ওপর ওর শ্রদ্ধা আছে খুব। এতক্ষণ ধরে তোর কি প্রশংসাই করে গেল! লেখা-পড়ার বিষয়ে,—আমি কি অতশত বুঝি,—কিন্তু বাপু—

শেষ করিতে না দিয়া অতীন কহিল, পিসিমা?

কি রে?

না।

অতীনের মাথা ঠিক নাই। মেনী মিত্তির ঝুলিল বুঝি গলায়! সহাধ্যায়িনীরূপে তার উপর অতীনের কোনো বিরাগই ছিল না। কিন্তু ঐ মেনী মিত্তির কালো বরণ, ছোট চোখ, উঁচু দাঁত আর বিবর্দ্ধমান কলেবর লইয়া তাহার প্রিয়া হইতে ধাইয়া আসিলে তবেই অতীন গিয়াছে!

পিসিমা কহিলেন, ওদের বাড়ির ঠিকানা রেখেচি।—কালই ওর বাবার কাছে লোক পাঠাব।

সর্ব্বনাশ!

কি করা বা বলা ঠিক হইবে ভাবিয়া উঠিতে না পারিয়া অতীন অকস্মাৎ উঠিয়া দরজা দিয়া সরিয়া পড়িল।

কী রাগই তাহার হইল মেনী মিত্তিরের উপর! সেদিন পিসীমাকে যা-তা বলিয়া যে জট পাকাইয়াছে তাহারই সমাধানের চেষ্টা করিতেছিল, আর এরই মধ্যে মেনীর ও বাড়িতে আসার কোন্‌ ঠেকা! এতদিন পরে অতীনের মনে হইল যে এতদিন মেনী মিত্তিরকে আমল দেওয়াই অন্যায় হইয়াছে। যত অশান্তির কারণ মেয়ে মানুষগুলি! না হইলে আজ ও ফ্যাসাদ্‌ আর বাধিত না।

আচ্ছা মেনী মিত্তিরের সাথে যদি তার বিয়ে হয়? চুল নাই বলিয়া সব সময় খোঁপা করিয়া থাকে। স্বল্প চুল ফুলিয়া থাকিবে বলিয়া রোজ সাবান দেয়। কক্ষণো তেল দেয়না,—গন্ধতেল। দাঁত বাহির হইবার ভয়ে বিশেষ হাসে না। খুকীটা যেমন ফাজিল, ইয়ার্কি করিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়ায়, মেনী তার ঠিক উল্টা। গম্ভীর চালে পা ফেলে, ওজন করিয়া কথা কয়,—আচার্য্য আচার্য্য ভাব। তা পড়াশুনায় ভালো মেয়ে বটে,—ইতিহাসে ফার্ষ্ট ক্লাস্‌। কিন্তু কথা

হইতেছে কিনা, আর abstraction ভালো লাগেনা, কি রকম ভালো লাগে ঠিক বুঝান যায় না,—তবে, হাঁা, অনেকটা ঐ-ঐ খুকীর ধরণের। ভঙ্গীভরে নাচিয়া চলা, ফাজলামিও নেহাৎ মন্দ লাগেনা,—আর বেণীর দোলন্,—রঙটা ফর্সা,—আর—

খাবার সময় পিসিমা কাছে আসিয়া বসিলেন।

তা ভালই হয়েছে, পণ্ডিতের জন্ম পণ্ডিতানী আসচে।

অতীনের গ্রাসটা গলা দিয়া সরিতেছেনা। জল খাইতে হইল।

পিসিমা কহিলেন, রঙটা কিন্তু একটু বেশী—

অতীন কহিল, হুঁ।

আচ্ছা সামনের দাঁত ছ'টো একটু উঁচু না কিরে,—ঠিক বুঝা যায় না।

খাইয়া নিজের ঘরে গিয়া ইতিহাসের বই কোলে টানিয়া লইয়া অতীন বিবাহের কথা ভাবিতে লাগিল। খুকী কদিন,—অর্থাৎ সেদিনের পর আর পড়িতে আসে নাই। খুকীকে পড়াইতে বেশ ভালো। খুকীর বেণীটা বেশ। খুকী একটু ফ্লার্ট ধরণের,—কিন্তু একটুও ফ্লার্ট না হইলে মেয়েদের ভালো লাগেনা। খুকীর চলা ·

কাল ভোরেই পিসিমা মেনী মিত্তিরদের বাড়ি লোক পাঠাইবে। এবং লোক পাঠাইলে আর রক্ষা নাই। এত টাকা তারা কি আর ছাড়িতে পারে!—প্রাণপণ করিয়া তাকে আঁকড়াইয়া ধরিবে। মেনীর সঙ্গে যেন বিবাহ হইয়া গেল। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। মেনীকে বলিল, একটা গান করো। মেনী কহিল, গান তো জানিনা, গলা খারাপ। বরঞ্চ এসো, এসিরিয়ান্ ইতিহাসের আলোচনা করা যাক্। কিম্বা মেগাস্থিনিসের কথা। অতীন কহিল, একটা কবিতা। মেনী বলে, কবিতা মুখস্ত নাই। ইতিহাস মুখস্ত করিয়া আর সময় ছিল কোথায়। মেনী রঙীন শাড়ি পরেনা, কারণ রঙীন শাড়ি তার বয়সোচিত নহে। মেনী পড়ার টেবিলে উঠিয়া বসিয়া পা নাচাইতে নাচাইতে পড়ার বিঘ্ন করে না। আর তার বেণী কোথায় যে তুলিবে? আর মেনী যে রেটে ফুলিতেছে তাহাতে বছর খানেকের মধ্যে—কথাটা কল্পনা করিতেই অতীন শিহরিয়া উঠিল। চিন্তার সূতা ছিঁড়িল—কিন্তু মাথা তখন গরম হইয়া উঠিয়াছে।

কাল ভোরেই পিসীমার লোক যাইবে ও-বাড়িতে। তখন আর বলিবার কিছু থাকিবে না। ঢাক বাজিবে, ঢোল বাজিবে, শানাই, বাজী, রাঙা-চেলী,—তারপর মিটমিটে চোখের সাথে—ওরে বাপ রে—।

রাত তখন বারোটা। অতীন লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। আর কায়দায় কাজ নাই,—এখান হইতে ছাড়া পাইলে বাঁচিয়া যায়!

দরজায় ধাক্কা দিয়া ডাকিল, পিসিমা, পিসিমা ঘুমিয়েছ?

নিজেরই হাসি পাইল। রাত বারোটায় যেন পিসিমা সচরাচরই জাগিয়া থাকেন।

খট্ খট্, ঠক্-ঠক্।

পিসিমা জাগিয়া উঠিলেন। ভিতর হইতে কহিলেন, কে?

আমি অতীন্।

পিসিমা দরজা খুলিয়া কহিলেন, এত রাত্তিরে কেন? অসুখ টমুক করেনি তো?

না।

তবে?

পিসিমা।

কি?

বলছিলাম গিয়ে, মেনী মিত্তিরকে বিয়ে করতে পারব না।

পিসিমা বিস্ময়ের সুরে কহিলেন, বলিস্ কি রে। তার কাছে যে আমি এক রকম কথাই পেড়েছি। আর সে রাজী হয়ে খুসী হয়ে গেছে। না না, এখন আর বদ্‌লানো চলে না।

অতীন প্রমাদ গণিল। কহিল পিসিমা, তোমার কাছে আমি মিথ্যে বলেছি। ওকে আমি কোনো দিনই বিয়ে করতে চাইনি।

চাস্‌নি কি রকম? ওর জন্তই তো খুকীকে বিয়ে করলি না,—কি চমৎকার লক্ষী মেয়েই না—

অতীন্ তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, তোমার কথার অবাধ্য আমি হবো না পিসিমা,—খুকীকেই না হয়—

পিসীমা যেন অবাক্ হইয়া গেলেন। কহিলেন, না না সে আর হয় না। খুকীদের তো আমি স্পষ্টই না করে দিয়েছি। আর এই মেয়েটীকে কথা দিয়ে আমি আর ফেরাতে পারব না।

কিন্তু পিসীমা,—

না না আর আমার বাধ্য হ'তে হবে না। খুকীকে দরকার নেই, এই মেয়েটীকে বিয়ে করতে ইচ্ছে, তাই কর।

অতীন্ হতাশায় বসিয়া পড়িল। তারপর প্রতিবাদের মত করিয়া কহিল, না পিসিমা, ওকে আমার একটু ভালো লাগেনা,—একটুও না।

পিসীমা কহিলেন, মহামুস্কিলে ফেললি তুই আমাকে। এখন আমি কি করি বল তো?

অতীন্ কহিল, খুকীকেই আমি বিয়ে করতে রাজী।

পিসীমা অন্ধকারে একটু মৃদু হাসিয়া লইলেন। তারপর গম্ভীরভাবে কহিলেন,—তা এখন আর হয় না। খুকীর অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে। কাল ওরা পাকা দেখে গেল।

এক মুহূর্ত্তে অতীন্ উঠিয়া দাঁড়াইল। গেল সব আশা শেষ হইয়া। ব্যর্থ হইল তার জীবন। তাহার যৌবন-বনে খুকীর বেণী আর কখনো দুলিবেনা। খুকী যেন সাত রাজ্যের ধন মাণিক,—তাকে পাওয়া জন্মজন্মান্তরের পুণ্যের ফল। তাহাকেই সে হেলায় হারাইয়াছে। হতাশায় বেদনায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। খুকী,—কবে তার যৌবনের মধ্যাক্ষণে গিয়া আসন পাতিয়াছিল পাঠমগ্ন অধ্যাপক তাহা জানিতে পারে নাই। জানিতে পারিল আজ নিবিড় করিয়া,—চিরবিচ্ছেদের অন্ধকার পটে। খুকীকে হারাইলে যে তার অতটা ক্ষতি হইবে একটু আগেও সে তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। খুকী অবচেতন ভাবে তার কল্পনায় মিশিয়াছিল। পিসীমা বুঝিলেন, তার চাহনির ভাষা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অতীন উঠিয়া গেল।

পিসীমা মুচকিয়া হাসিতেছিলেন। পিছন হইতে ডাকিলেন, অতীন্।

কি পিসীমা?

শোন্।

অতীন্ ফিরিয়া আসিল।

পিসীমা কহিলেন, লক্ষ্মীছাড়া, তোর জব্দ হওয়াই উচিত ছিল এমনি করে। রাজকন্যার মতো মেয়ে,—তাকে বিয়ে করবেন না।

অতীন কহিল, কি বলছ পিসীমা?

পিসীমা সস্নেহে কহিলেন, খুকীর সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব। তোর কলেজের মেয়ে টেয়ে কেউ আসে নি। এসেছিল সন্ধ্যাবেলায় বাসন্তী-রঙা শাড়ি পরে খুকী, যেন জগদ্ধাত্রী। তাকেই আমি আশীর্ব্বাদ করেছি।

অতীন্ কথা বলিতে পারিল না, বাহিরে চলিয়া আসিল। দেখিল তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

সুবোধ বসু
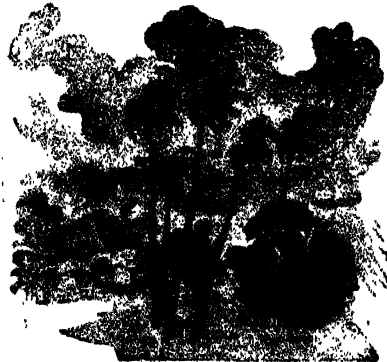
ভ্রাতৃ বিরোধে আওরংজীব

অধ্যাপক---শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু, এম্-এ

(প্রথম পর্য্যায়)

(১)

১৬৫৭ সালের ৭ই মার্চ্চ তারিখে ভারতসম্রাট সাহজাহানের শাসন-কাল ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া একত্রিশ বৎসরএ পড়িল। তাঁহার সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। সম্রাটের প্রভূত ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিদেশী ভারত-ভ্রমণকারীদিগের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে, বুখারা ও পারস্য, তুর্কী ও আরবের রাজদূত বা ফ্রান্স ও ইতালীদেশের ভ্রমণকারীরা সম্রাটের ময়ূর-সিংহাসন, কহিনুর বা অন্যান্য হীরকগুলির দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত। সম্রাটের নির্ম্মিত শ্বেতপ্রস্তরের অট্টালিকা সমূহ যুগপৎ মার্জ্জিত পরিকল্পনা ও বিপুল অর্থব্যয়ের নিদর্শন স্বরূপ আজিও দণ্ডায়মান। ঐশ্বর্য্যে ও সমারোহে মুঘল দরবারের সম্ভ্রান্ত ওমরাহেরা অন্যান্য দেশের নৃপতিবৃন্দের গৌরবরশ্মি নিষ্প্রভ করিয়াছিল। সম্রাট সাহজাহানের ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন বাদশাহের আমলে সাম্রাজ্যের সীমা এতদূর বিস্তারলাভ করে নাই। দেশে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করিতেছিল; সমগ্র ভারতে সম্রাটের দরবারই একমাত্র বুদ্ধি ও জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। কৃষককুল শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। প্রজার অভিযোগে অনেক সময়ে পীড়নকারী শাসনকর্ত্তারা তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হইত। রাজ্যের চারিদিকেই ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের আতিশয্য দেখা যাইত; দয়ার্দ্রচিত্ত ও প্রবীণ সম্রাট সাহজাহান একদল দক্ষ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজ্যের গরিমা বর্দ্ধনকারী শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিগণ বা সেনানায়কেরা একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সকল কর্ম্মচারীদের মৃত্যুর পর, তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিতে পারে এমন লোক আর সম্রাটের সন্ধানে আসিল না। সম্রাটের বয়ঃক্রম সাতষট্টি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। সাহজাহান ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিলেন!

(২)

সম্রাট সাহজাহানের চারিটি পুত্র ছিল; সকলেরই তখন প্রৌঢ়াবস্থা। অনেকেই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা সেনাপতি-রূপে কার্য্য করিয়া বহুদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাহজাদাদের মধ্যে পবিত্র ভ্রাতৃস্নেহ ছিল না। বিশেষ দারা ও আওরংজীবের মধ্যে বিরোধ এতই তীব্র ছিল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা এতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে যে, সমগ্র রাজ্যের মধ্যে ইহা আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং এই দুই ভাইএর মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে হইলে, আওরংজীবকে সাহজাদা দারা বা সম্রাটদরবার হইতে বহুদূরে সরাইয়া রাখিতে হয়। চারি ভাইএর মধ্যে জ্যেষ্ঠ দারাই যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ইহা সম্রাট স্পষ্টই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ও সিংহাসন অধিরোহন সময়ে গোলযোগ নিরাকরণের উদ্দেশ্যে সম্রাট গত কয়েক বৎসর হইতেই সাহজাদা দারাকে নিজের নিকটে রাখিয়াছিলেন। সুতরাং, দারার অধীনস্থ প্রদেশগুলি তাঁহার প্রতিনিধিরাই শাসন করিত। সাহজাদা রাজসমুচিত মর্য্যাদা ও অধিকার ভোগ করিতেন। সম্রাটের নিকট কোন সংবাদ পৌঁছাইবার অগ্রে সকলকেই দারার মধ্যস্থতার জন্য, হয় তাঁহাকে অর্থ দিতে হইত, নয় অনুনয় করিতে হইত।

দারার বয়স সে সময়ে বিয়াল্লিশ বৎসর। তিনি প্রপিতামহ সম্রাট আকবরেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতবাদতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া সাহজাদা ইহুদীদিগের ধর্ম্মপুস্তক ও বাইবেলের "নবসংহিতা", মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী এবং হিন্দুদিগের "বেদান্ত" পাঠ করেন। প্রকৃত ধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি বা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের ঐক্য বাহির করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুযোগী লালদাস ও মুসলমান ফকীর সরমদের নিকট তিনি সমানভাবে জ্ঞান আহরণ করিতেন এবং মনোযোগী ছাত্রের মত তাঁহাদের পদতলে উপবিষ্ট থাকিতেন। কিন্তু, তিনি এইরূপ করিলেও, তাঁহাকে স্বধর্ম্মত্যাগী বলা চলে না। তিনি মুসলমান ফকীরদের এক জীবনী সঙ্কলন করেন এবং মিঞা মীর নামে এক ফকীরের নিকট দীক্ষিত হ'ন। পুণ্যশীলা সম্রাটনন্দিনী জাহানারা দারাকে নিজের দীক্ষা-গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দারা স্বপ্রণীত এক ধর্ম্মপুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি ইসলাম ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করেন নাই বরং এই ধর্ম্মের সুফী সম্প্রদায়ের মতের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। যাহাহউক, হিন্দুধর্ম্মের উপর অনুরাগ থাকায়, গোঁড়া ইসলাম ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা হওয়া বা অপর ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের একত্র করা দারার পক্ষে কোনরূপেই সম্ভবপর ছিল না।

পিতার অত্যধিক অপত্যস্নেহই দারার ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। সাহজাদা অধিকাংশ সময়ই সম্রাট-দরবারে কালাতিপাত করিতেন। কান্দাহার অবরোধ (তৃতীয়বার) সময় ব্যতিরেকে তিনি কখনও সৈন্য পরিচালন বা কোন প্রদেশ শাসন করেন নাই। সুতরাং যুদ্ধবিদ্যায় বা শাসনকার্য্যে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সেইজন্য, সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন জনিত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে তিনি আওরংজীবের সমকক্ষ ছিলেন না। অতুলনীয় ধন সম্পদ ও ক্ষমতা তাঁহাকে মিতাচারী বা সংযমী হইতে দেয় নাই; অযথা স্তুতিবাদ তাঁহার স্বাভাবিক গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্য বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তাঁহার লোক চিনিবার ক্ষমতা ছিল না। বিপদকালে লোকের উপর প্রভুত্ব করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। বহু কাল সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ায় তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন কূট-কৌশল, বা কোন সাহসিক বা পরিশ্রমজনক কর্ম্ম তিনি করিতে পারিতেন না। প্রয়োজন হইলে চেষ্টা বা সহিষ্ণুতার গুণে পরাজয়ের সমূহ আশঙ্কা সত্ত্বেও জয় লাভ করিবার শক্তির পরিচয় তিনি দিতে পারেন নাই। প্রকৃত সেনানায়কের ধৈর্য্য ও বিচার ক্ষমতা তাঁহার না থাকিলেও, সাহজাদা অনুরক্ত স্বামী, স্নেহপরায়ণ পিতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

৩

দিল্লীতে অবস্থান সময়ে সম্রাট সাহজাহানের হঠাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ দেখা দিল (সেপ্টেম্বর, ১৬৫৭)। এক সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত রাজবৈদ্যেরা যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াও রোগের প্রকোপ কমাইতে পারিল না। দরবারের দৈনিক কাজকর্ম্ম বন্ধ হইল। যাহা হউক, ক্রমে পীড়ার কিছু উপশম হইলে, সম্রাট তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রীর সমাধির নিকট ইহলীলা শেষ করিবার জন্য আগ্রায় রওনা হইলেন।

সম্রাটের অসুস্থাবস্থায় দারা সর্ব্বদা শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া সতর্কতার সহিত রোগীর শুশ্রূষা করিতেন। কিন্তু, সিংহাসন লাভের জন্য তিনি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। পীড়ার প্রথমাবস্থায় নিজের আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ হইয়া, সম্রাট মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি কতকগুলি বিশ্বস্ত সভাসদ ও প্রধান কর্ম্মচারী নিজের নিকট আহ্বান করিয়া তাহাদের সম্মুখে নিজের উইল প্রস্তুত করাইলেন এবং আদেশ করিলেন যে সাহজাদা দারাই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্রাট, সুতরাং, তাঁহারা যেন এখন হইতেই তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলেন। সাহজাদা স্বীয় ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিলেও, স্বয়ং সিংহাসন গ্রহণ না করিয়া পিতার নামে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে থাকিলেন। আওরংজীবের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মীরজুমলাকে মন্ত্রীর পদ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল; আর, মহাব্বৎ খাঁ প্রভৃতি অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীদের নিজের নিজের সৈন্য লইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে দিল্লীতে আসিতে বলা হইল।

কিছুদিন পরে, সাহজাহান অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ হইলে, যে সকল প্রয়োজনীয় কথা এতদিন তাঁহাকে বলা না, সেগুলি তখন তাঁহাকে বলা হইল। ওদিকে

দ্বিতীয় সাহজাদা সুজা নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করিয়া বঙ্গদেশ হইতে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সম্রাটের আজ্ঞামত বাইশ হাজার সৈন্য দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান সুকো ও মিরজা রাজা জয়সিং এর অধীনে সুজার বিরুদ্ধে পাঠান হইল (নভেম্বর, ১৬৫৭)। ইহার পরেই গুর্জ্জর হইতে অপর এক দুঃসংবাদ পৌছিল। ঐ প্রদেশে কনিষ্ঠ সাহজাদা মোরাদ স্বয়ং সম্রাট হইয়া আওরংজীবের সহিত যোগদান করিয়াছেন (ডিসেম্বর)। সুতরাং, দুইটি বাহিনী মালব অভিমুখে পাঠান হইল। উদ্দেশ্য, একটি সৈন্য আওরংজীবকে বাধা দিবে, ও অপরটি, গুর্জ্জর হইতে মোরাদকে বিতাড়িত করিবে। মারওয়ার অধিপতি যশোবন্ত সিং প্রথম দলটির, আর, গুর্জ্জরের শাসনকর্ত্তা কাশিম খাঁ দ্বিতীয় দলটির নায়ক নিযুক্ত হইলেন। সেনাপতি-দের উপর আজ্ঞা হইল, বিদ্রোহী সাহাজাদাদের যাহাতে কোনরূপে জীবনের অনিষ্ট না হয় ইহা তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সম্ভব হইলে, প্রথমে মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে স্ব স্ব প্রদেশে পাঠাইতে হইবে। তবে, মিষ্ট কথায় কোন ফল না হইলে যেন শক্তি প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাহাদের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ না করা হয়।

সম্রাটের পীড়ার সময়ে, প্রথম প্রথম সাহজাদা দারা তাঁহার দু'এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছাড়া অপর কাহাকেও পিতার নিকট যাইতে দিতেন না। ইহা ছাড়া, তিনি নদীর খেয়াঘাটগুলির উপরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ, গুর্জ্জর এবং দাক্ষিণাত্যে অপরাপর সাহাজাদাদের নিকট প্রেরিত চিঠিপত্র বা সংবাদবাহক তিনি আটক করিতেন। সম্রাট-দরবারে গুর্জ্জর বা দাক্ষিণাত্যের যে প্রতিনিধি থাকিত, পাছে তাহারা নিজেদের প্রভুর নিকট গোপনে কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রেরণ করে, সেইজন্য দারা তাহাদের উপর কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দারার এই সতর্কতার ফলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট বেশী হইল। সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ হওয়ায় দেশান্তরের রাজারা ও সাধারণ লোকে মনে করিল যে, সাজাহান আর জীবিত নাই ও সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন লইয়া এক তুমুল ব্যাপার চলিতেছে। দুষ্টের দল চারিদিকে গোলমাল সৃষ্টি করিল; সুবিধা দেখিয়া কৃষকেরা কর দিতে অসম্মত হইল। ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব প্রতিপক্ষের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করিল। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত দেখিয়া সম্রাট কর্ম্মচারীরা উৎকণ্ঠিত হইল। বহুস্থানে শাসন ব্যবস্থা তিরোহিত হইল।

সম্রাট সুস্থ হইয়াছেন এই সম্বন্ধে সাহজাহানের নিজের হাতে লেখা ও তাঁহার শীল অঙ্কিত এক এক চিঠি সাহাজাদারা পাইয়া মনে করিলেন, যে হাতের লেখা নকল করিতে সিদ্ধহস্ত দারারই ইহা এক কৌশল, আর, মৃত সম্রাটের শীলও দারার হস্তগত! সেইজন্য, তিন সাহজাদা সুজা, আওরংজীব ও মোরাদ, মিষ্ট কথায় চিঠির দ্বারা সম্রাটকে জানাইলেন যে, নানাবিধ ভীতিপ্রদ জনরবে তাঁহাদের চিত্ত বিচলিত, আর, পিতাকে স্বচক্ষে দেখিয়া, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের জন্যই, তাঁহারা আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সুতরাং, তাঁহাদের এই ব্যবহারের জন্য সম্রাট যেন মনে না করেন যে, সাহাজাদাদের পিতৃ-ভক্তির অভাব হইয়াছে।

৪

সাহজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র মহম্মদ মোরাদ বক্স সম্রাট বংশের এক কুলাঙ্গার। বাল্খ, দাক্ষিণাত্য ও গুর্জ্জর সকল প্রদেশেই তাঁহাকে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু কোথাও তিনি কৃতকার্য্য হ'ন নাই। বয়স বৃদ্ধির সহিত তাঁহার স্বভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি অলস, নির্ব্বোধ ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। নিজের উদ্দাম প্রবৃত্তি দমন করিবার বা নিজের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্ণয় করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিলনা। কিন্তু, তিনি সাধারণ সৈনিকের মত নির্ভীক ছিলেন। রণক্ষেত্রে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ তৈমুরের সমরস্পৃহা তাঁহার রক্ত গরম করিয়া দিত; তখন দুর্দ্দমনীয় বিক্রমে তিনি শত্রুর সম্মুখীন হইতেন। চারিপার্শ্বে অনুষ্ঠিত ভীষণ নরহত্যার মধ্যে হত্যাজনিত দুর্দ্দমনীয় উল্লাস ব্যতিরেকে অপরাপর কোমল হৃদয়-বৃত্তি তখন তাঁহার লোপ পাইত। কিন্তু, যতই সাহসী তিনি হউন না কেন, যুদ্ধ কৌশল জানা না থাকায়, তাঁহার সে সাহস কার্য্যকর হইতে পারে নাই।

মোরাদ কিরূপ অপদার্থ ইহা সম্রাট অবগত ছিলেন। সেইজন্য, বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্যই, সম্রাট আলি নাকি নামে জনৈক সুদক্ষ ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে সাহজাদার প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলি নাকির নির্দ্দোষ ও সতর্ক শাসন ব্যবস্থার জন্য সাহজাদার তোষামদকারীরা তাঁহার উপর বিরক্ত ছিল। সাহজাদার এক প্রিয় খোজা সর্ব্বজন ঘৃণিত এই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিল। আলি নাকি মোরাদের পক্ষ ছাড়িয়া দারার পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক এইরূপ স্বীকারোক্তিপূর্ণ একখানি পত্র তাহার নামে জাল করা হইল। ঠিক হইল, এই জাল পত্র লইয়া যাওয়ার ছলে, পত্রবাহক মোরাদের রক্ষীর নিকট নিজেকে ধরা দিবে, ও তাহার উপর বলপ্রয়োগ করা হইলেও চিঠিটি কাহার দ্বারা লিখিত—এ কথা সে প্রকাশ করিবে না। সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে, সাহাজাদা মোরাদ নিজের প্রমোদোদ্যানে বয়স্যদের বৈঠকে মদ্যপানহেতু উন্মত্ত অবস্থায় আছেন এমন সময় সেই পত্রটি তাঁহার নিকট পৌঁছিল। একে ত' কদর্য্য ক্রীড়াকৌতুকে রত থাকায় মোরাদের গত রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, তাহার উপর, এই পত্র পাঠ করায় তাঁহার সমস্ত শরীর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আলি নাকিকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। পরে আলি নাকিকে তাঁহার নিকট আনা হইলে, তিনি রোষে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার শরীরে নিজের বর্শা প্রবেশ করাইয়া দিলেন। এইরূপে, আলি নাকির জীবনলীলা সাঙ্গ হইল।

মোরাদ বহুসৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার এখন অর্থের প্রয়োজন হইল। সেইজন্য, সমৃদ্ধ সুরত বন্দর হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিলেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে ছয় হাজার পদাতিক পাঠাইলেন। মোরাদের সৈন্য সহরটি লুঠ করিল ও ক্রমে সুরত দুর্গ অধিকার করিল। সহরের দুই শ্রেষ্ঠ ধনীর নিকট হইতে ঋণ বলিয়া বলপ্রয়োগে পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় করা হইল। ইহা ছাড়া, কতকগুলি কামান ও সঞ্চিত ধনরত্ন তাহারা হস্তগত করিল।

ইতিমধ্যে সাহজাহানের মারাত্মক পীড়ার সংবাদে, দুই ভ্রাতা, মোরাদ ও আওরংজীব, বিশ্বাসী দূতের সাহায্যে মধ্যে পত্রের আদান প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সাহজাদা সুজাকেও তাঁদের সহিত যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু সুজা বহুদূরে অবস্থান করায় তাঁহার সহিত কোন চুক্তি হইতে পারিল না। যাহাহউক, মোরাদ ও আওরংজীবের মধ্যে একটা আপোষ বন্দোবস্ত হইল। আগাগোড়াই মোরাদ আওরংজীবের পরিচালনে কাজ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বড়ই বাস্তবাগীশ। সুরত সহর জয় করিবার পর, মোরাদ, মরউঅজউদ্দীন নাম লইয়া সম্রাট হইয়া বসিলেন। মোরাদ কর্ত্তৃক লিখিত একাধিক পত্রে তাঁহার কোপন স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আর, আওরংজীবের চিঠিগুলিতে, তিনি কিরূপ সন্দিগ্ধমনা ছিলেন ইহাই জানা যায়। তবে, এই সময়ে তাঁহার কোন উৎকণ্ঠা হইয়াছিল কি না, ইহা জানা যায় না।

মোরাদ প্রস্তাব করিলেন, দারাকে শক্তি সঞ্চয় করিতে দেওয়া হইবে না এবং তিনি নিকটে ও দূরে অবস্থিত সম্রাট পক্ষীয় সেনানায়কদিগকে নিজের পক্ষে আনিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে হইবে। চতুর আওরংজীবের মত হইল, প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিয়া নিজেদের স্কন্ধে অপরাধ লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়; যে পর্য্যন্ত না সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ সঠিক পাওয়া যাইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের অপেক্ষা করাই উচিত; আর, ইতিমধ্যে, বন্ধুতার ভাণ করিয়া দারাকে পত্র লেখা হউক। আওরংজীব ইহাও ইঙ্গিত করিলেন যে, দারাকে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিতে হইলে, পারসিকদের দ্বারা মুঘল রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ আফগানিস্থান আক্রমণ করান প্রয়োজন। সুতরাং, এই উদ্দেশ্যে, মোরাদ সাহজাহানের মৃত্যু সম্বন্ধীয় জনরব পারস্যের সম্রাটকে জানাইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। পারস্যের সম্রাট এ সম্বন্ধে সঠিক না জানিয়া কিছু করিবেন না স্থির করিলেন; তিনি সৈন্য পাঠাইতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

ওদিকে, আওরংজীবের সহিত মোরাদের সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করা সম্বন্ধে একটি চুক্তি হইল। আওরংজীব কোরান স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি সর্ত্ত ভঙ্গ করিবেন না। স্থির হইল,

(১) পাঞ্জাব, আফগানিস্থান, কাশ্মীর ও সিন্ধু প্রদেশ

মোরাদের অংশে পড়িবে এবং তিনি এই প্রদেশগুলির স্বাধীন রাজা বলিয়া বিবেচিত হইবেন। মুঘল সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ আওরংজীব পাইবেন।

(২) মোরাদ যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ পাইবেন, আর অবশিষ্টাংশ আওরংজীব লইবেন।

সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গেল (ফেব্রুয়ারী, ১৬৫৮)। পরে, মোরাদ আহমদাবাদ হইতে রওনা হইয়া (এপ্রেল), মালব প্রদেশের দিপালপুর নামক স্থানে আওরংজীবের সহিত মিলিত হইলেন।

৫

বিজাপুর যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার সময় (অক্টোবর, ১৬৫৭) হইতে সিংহাসন দাবী করার জন্য হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা করিবার দিন (জানুয়ারী, ১৬৫৮) পর্যন্ত, আওরংজীব দারুণ উদ্বেগে কালক্ষেপ করেন। নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত ঘটনাগুলির প্রবল বেগ প্রতিরোধ করার সাধ্য তাঁহার ছিল না।

তাঁহার অবস্থা প্রত্যহ সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িতেছিল। তিনি ভবিষ্যৎ দেখিয়া নিরাশ হইলেন। কিন্তু তিনি যে উপায়ে সমস্ত বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ হ'ন তাহা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে হয় ও, তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার কি ধীরতা ও বুদ্ধিমত্তা, লোককে বশীভূত করিবার কি ক্ষমতা ও রাজনীতি সম্পর্কীয় কি চাতুর্য্য!

সংবাদ পৌঁছিল, দিল্লীশ্বর বিজাপুরীদের সহিত সন্ধি করিতে ও দাক্ষিণাত্য হইতে সমস্ত সৈন্য ফিরাইয়া লইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয় সবই বিফল হইল। আওরংজীবের উদ্দেশ্য সফল হইতে আর বিলম্ব নাই এমন সময় নির্ম্মম ভাগ্য তাঁহাকে বাধা দিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, আওরংজীব স্থির করিলেন যে, বিজাপুরীরা নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বে বা সম্রাটের শাসন ব্যবস্থার দুর্ব্বলতা ও বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধীয় সংবাদ তাঁহাদিগের শ্রুতিগোচর হইবার পূর্ব্বে সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী তাহাদিগকে দিয়া কার্য্য করাইতে হইবে।

আওরংজীবের মনে হইল, পুনরায় বিজাপুরের সম্মুখীন হওয়া বা দক্ষিণে সৈন্যচালন করা মূর্খতার পরিচায়ক। কাল বিলম্বে অনিষ্টের সম্ভাবনা। সিংহাসন লাভ করিতে হইলে যে পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহাকে শীঘ্রই ঠিক করিতে হয়। সিংহাসনের একজন উত্তরাধিকারী বলিয়া নিজেকে প্রচার করিতে বা হিন্দুস্থানে রওনা হইতে আওরংজীব যতই বিলম্ব করিবেন, দারার উদ্দেশ্য ততই সিদ্ধ হইবে। তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে প্রধান প্রধান সেনানায়কদের আহ্বান করিবার সুযোগ পাইবেন ও দূরের ও নিকটের লোকজন বা প্রধান কর্ম্মচারীদের নিজের পক্ষভুক্ত করিবার অবসর পাইবেন, আর শক্তিসঞ্চয় করিয়া আওরংজীবের উদ্দেশ্য বিফল করিতে তাঁহার কোনই কষ্ট হইবে না। কিন্তু আওরংজীব যদি সৈন্য একত্র করিয়া প্রকাশ্যে সিংহাসন প্রার্থী হ'ন, ও উত্তরদিকে রওনা হইয়া দিল্লীশ্বরের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেন, তাহা হইলে তিনি কেবল যে দারাকে সময় থাকিতে বাধা দিবেন এমন নয়, অনেক উচ্চাভিলাষী ভাগ্যান্বেষিদের স্বপক্ষে আনিতে পারিবেন। অথচ, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে গেলে, তাঁহাকে পেরেন্দা দুর্গ বা বিজাপুরীদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকা আদায় করিবার সকল আশা ত্যাগ করিতে হয়, ও সেই অবসরে দাক্ষিণাত্যের অপরাপর শত্রুরা আবার শক্তিশালী হইয়া উঠে। যাহাহউক দাক্ষিণাত্যের ভরসা ছাড়িয়া দিয়া উত্তর ভারতে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, আওরংজীব তাঁহার সমস্ত সম্বল ও শক্তি নিয়োগ করিলেন।

আওরংজীব কল্যাণী হইতে যাত্রা করিয়া (অক্টোবর ১৬৫৭), বিদার পৌঁছিলেন। দুর্গটির জীর্ণসংস্কার হইলে এই স্থানে সৈন্য সমাবেশ ও রসদ সংগ্রহ করা হইল। পরে, সেখান হইতে বাহির হইয়া সাহজাদা আওরঙ্গাবাদ পৌঁছিলেন। তিনি বিদার পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণী রাজ্যগুলি আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। সকলে মনে করিল, মুঘলেরা নিজেদের বিজিত প্রদেশ রাখিতে না পারিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। ইতি মধ্যে আওরংজীব সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে পেরেন্দা দুর্গ অধিকার করিবার জন্য মীরজুমলাকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সেনাপতি ব্যর্থকাম হইয়া আওরঙ্গাবাদ ফিরিলেন (জানুয়ারী, ১৬৫৮)।

ওদিকে, আওরংজীব যথারীতি সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। যাহাতে দারা ও দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত পর

কর্ম্মচারীদের মধ্যে পত্র ব্যবহার না হয়, এই উদ্দেশ্যে আওরংজীব এক সৈন্য পাঠাইয়া নদীর খেয়াঘাটগুলি অধিকার করিলেন। আওরংজীব কি ব্যবস্থা করেন জানিবার জন্য জনসাধারণ সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। এই অবস্থায় নিজের মতি গতি স্থির রাখা কঠিন। সম্রাটের দরবার হইতে নানাবিধ প্রতিকূল সংবাদ আসিতেছিল। সম্রাট সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার কোনই উপায় ছিল না। আওরংজীব কয়েক সপ্তাহ উৎকণ্ঠায় কাল কাটাইলেন। আর তাঁহার অনুচরবর্গের অবস্থাও তদনুরূপ।

আওরংজীব প্রথম হইতেই স্থির করিলেন যে, বাদশাহের মৃত্যু সংবাদ যতদিন না সঠিক জানা যাইতেছে ততদিন তিনি বিদ্রোহ করিবেন না। কিন্তু, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তিনি ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিলেন না। দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে দারার কি ইচ্ছা তাহা স্পষ্টই জানা গিয়াছে। এখন, দারার উদ্দেশ্য আওরংজীব ও মোরাদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া তোলা। এই কারণে, মোরাদকে গুর্জ্জরের শাসনকর্ত্তার পদ হইতে চ্যুত করা হইল; বেরার প্রদেশটি আওরংজীবের নিকট হইতে ফিরাইয়া লইয়া মোরাদকে দেওয়া হইল হতভাগ্য সাহজাহান দারা হস্তে ক্রীড়ণক; সম্রাটের নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি নাই। দারার ইচ্ছামত সকল ব্যবস্থা হইতেছে। ওদিকে, সাহজাদা দারা, আওরংজীব ও মোরাদের বিপক্ষে দক্ষিণে তুই সৈন্য পাঠাইয়া, আওরংজীবের পৃষ্ঠপোষক সায়েস্তা খাঁকে মালব হইতে সম্রাট দরবারে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিলেন; আর, আওরংজীবের পক্ষত্যাগ করিয়া দিল্লীশ্বরের দরবারে পৌছাইবার জন্য মীরজুমলার নিকটও এক আজ্ঞাপত্র পাঠান হইল। পত্রে ইহাও লেখা ছিল যে, সেনাপতি সম্রাটের আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য না করিলে তাঁহাকে বিদ্রোহীদের দলভুক্ত করা হইবে। আওরংজীবের অপরাপর কর্ম্মচারীগণও এই মর্ম্মে এক একখানি পত্র পাইলেন।

৬

সিংহাসন অধিকার করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট অবসর। আওরংজীব শীঘ্রই নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনি প্রথমে, মীরজুমলাকে দৌলতাবাদ দুর্গে বন্দী করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও কামান ক্রোক করা হইয়াছে এই ভাণ করিলেন। প্রকাশ্যে বলা হইল, সম্রাটের বিরুদ্ধে তুই দক্ষিণি রাজার সহিত ষড়যন্ত্র করা অপরাধে সেনাপতির তুই দুর্গতি! ইহার পর সাহজাদা, সম্রাট ও তাঁহার নূতন উজীর-জাফর খাঁকে পত্রদ্বারা জানাইলেন যে, সম্রাট সম্বন্ধে নানাবিধ পীড়া-দায়ক গোপন আলোচনা শ্রবণ করিয়া তিনি ব্যথিত ও বিচলিত, সুতরাং, তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের পক্ষে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে দারার হস্ত হইতে উদ্ধার সাধন করা ও দেশটিকে আতঙ্ক, বিশৃঙ্খলা ও বিঘ্ন হইতে রক্ষা করা ন্যায়ানুগত।

যুদ্ধে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্য অবশিষ্ট অর্থ পাঠাইবার জন্য গোলকোণ্ডার রাজার নিকট পত্র পাঠান হইল। আর, তাঁহাকে জানান হইল যে, আওরংজীবের দাক্ষিণাত্যে অনুপস্থিত থাকা সময়ে, তিনি মুঘলদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেন কোন কার্য্য না করেন। ওদিকে, বিজাপুরের রাজমাতা বড়িসাহেবার নিকটও বন্ধুজনোচিত পত্র ও উপহার সামগ্রী পাঠান হইল। তিনি যাহাতে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রেরণে বিলম্ব না করেন এবং আওরংজীবের অনুপস্থিতিতে বিজাপুরীদের শান্ত ও সংযত রাখেন, তাঁহাকে সেইরূপ অনুরোধ করা হইল। ইহা ছাড়া বিজাপুরের নিকট এক খুব লোভনীয় প্রস্তাব করা হইল। বিজাপুরের রাজা আওরংজীবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলে, সাহজাদা পূর্ব্বে বিজাপুরের নিকট হইতে গৃহীত পেরান্দা দুর্গ ও ইহার অধীনস্থ দেশ কোঁকন ও ওয়াঙ্গীমহল, তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবেন; তবে, বিজাপুরের মৃত রাজাকে অর্পিত কর্ণাটক এবার মুঘলেরা নিজেরাই রাখিবেন। আর, প্রতিশ্রুত দেয় অর্থের মধ্যে ত্রিশ লক্ষ টাকা বিজাপুর রাজাকে দিতে হইবে না। এবং তিনি যদি নিজের রাজ্যে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি করিতে পারেন ও "শিবাকে" (শিবাজী) সেথান হইতে দূরীভূত করিতে সক্ষম হ'ন, তাহা হইলে বাণগঙ্গা নদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ তিনি পাইবেন।

ইতিমধ্যে আওরংজীব খুব শীঘ্র অথচ গোপনে রাজধানীর সম্রান্ত ওমরাহদিগের ও প্রাদেশিক (বিশেষ করিয়া মালওয়ার)

পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন সম্রাট সাহজাহানের চারি পুত্রের মধ্যে আওরংজীবই সামর্থ্য ও কার্য্যদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রত্যেক স্বার্থান্বেষী আমীর ওমরাহ বা কর্ম্মচারী বুঝিতে পারিল যে, আওরংজীবই ভবিষ্যতে সম্রাট হইবেন; সুতরাং, তাহারা, নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিবার জন্য, সাহজাদাকে সাহায্য করিবে মনস্থ করিল ও গোপনে তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইল।

করণীয় ব্যবস্থা শীঘ্রই নিষ্পন্ন হইল। নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। গোলাবারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য মসলা খরিদ করা হইল। দাক্ষিণাত্যের দুর্গগুলি হইতে বারুদ প্রভৃতি দিল্লীতে প্রেরিত হইল। আর, মীরজুমলার কামানশ্রেণী ও তাঁহার অধীনস্থ ইংরাজ ও ফরাসী গোলান্দাজ ব্যতিরেকে ত্রিশ হাজার নির্ব্বাচিত সৈন্য সংগ্রহ হইল।

আওরংজীবের নিকট সিপাহী বা যুদ্ধের সরঞ্জাম অপেক্ষা পদস্থ কর্ম্মচারীর সংখ্যাই অধিক ছিল। দাক্ষিণাত্য শাসন কালীন তিনি জনকয়েক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই সাহাজাদাকে স্নেহের চক্ষে দেখিত। সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃ বিরোধ সময়ে ইহারা তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করে।

তাঁহার অনুপস্থিতিতেও যাহাতে তাঁহার অধিকার দাক্ষিণাত্যে অক্ষুণ্ণ থাকে এই উদ্দেশ্যে, সেই প্রদেশ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, আওরংজীব কয়েকটি ব্যবস্থা করিলেন। রাজকার্য্য পরিচালন জন্য তাঁহার পুত্র সাহজাদা মুঅজ্জম এর অধীনে দুই পদস্থ কর্ম্মচারী ও বড় একদল সৈন্য আওরঙ্গাবাদে রাখিলেন। আর, নিকটবর্ত্তী দৌলতাবাদ দুর্গে আওরংজীবের পুরমহিলারা প্রেরিত হইলেন।

সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া আওরংজীব আওরঙ্গাবাদ হইতে যাত্রা করিলেন (ফেব্রুয়ারী ১৬৫৮)। বুরহানপুর পৌছিয়া অন্যান্য আয়োজন করিতে তাঁহার একমাস সময় লাগিল। আওরংজীবের বৃদ্ধ শ্বশুর সাহনওয়াজ খাঁ সম্রাট সাহজাহানের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন; সেই কারণে, আওরংজীব বুরহানপুর হইতে রওনা হইয়া খাঁ সাহেবকে কারারুদ্ধ করিলেন। পরে, নর্ম্মদা নদী পার হইয়া উজ্জয়িনী যাইবার পথে তাঁহার নিকট সংবাদ পৌছিল যে, উজ্জয়িনীর ২৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত দিপালপুরের নিকট সাহজাদা মোরাদ তাঁহার সৈন্য লইয়া পৌছিয়াছেন। তখন, দুই সহোদর দিপালপুরের পুষ্করিণীর নিকট উভয়ের সৈন্য একত্র করিলেন (১৫ এপ্রেল, ১৬৫৮)। সংবাদ আসিল, যশোবন্ত সিংহ মুঘল বাহিনী লইয়া যে স্থানে দুই সাহাজাদা অবস্থান করিতেছিলেন তাহার সম্মুখে মাত্র দুই দিনের পথে ছাউনী করিয়াছেন। চম্বলনদীর এক শাখা গম্ভীরার পশ্চিমকূলে দুই সাহাজাদা তখন নিজেদের সৈন্য সমাবেশ করিলেন। পরদিন (১৬ এপ্রেল) মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন লইয়া প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কমলকৃষ্ণ বসু

ভূমিকম্প

শ্রীবিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ

আন্দামান দ্বীপের বেতার অফিস খবর পেলেন ২৯শে ফেব্রুয়ারী স্যাণ্ডুইচ্ দ্বীপে বিরাট্ অধিবেশন হবে। প্রত্যেক বছর পৃথিবীতে যে লক্ষ লক্ষ জীব সর্পাঘাতে মারা যায়, তার প্রতিবিধান করা চাই-ই।

জগৎবিখ্যাত ফুচোর পোর্সেলিন কারখানার মালিক শ্রীযুত টুসাং রকেট মনোপ্লেনে উড়ে আসবেন, অধিবেশনের শ্রোতা হতে।

কর্সিকা থেকেই সুদূর ম্যাডাগাস্কারে টেলিফোন্ চলে গেল—সকলকে জানিয়ে দেওয়া হোক্ অধিবেশনের কথা। দেখতে দেখতে সে বার্ত্তা রটে গেল পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত। দলে দলে, পালে পালে, ট্রেণে, জাহাজে, পায়ে হেঁটে, আকাশে উড়ে, ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসতে লাগল—হৈ হৈ, রৈ রৈ কাণ্ড।

২৯শে ফেব্রুয়ারী; বেলা তিনটে ছাপান্ন মিনিট। লোকে লোকে আর তিল ধারণের স্থান নাই, সভা আরম্ভ হয় হয়। পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা এসেছেন, বৈজ্ঞানিক মহলও বাদ যান নি। কেবল সভাপতির আসার অপেক্ষা। তিনটে উণষাট—এখনও শ্রীযুত টুসাংএর দেখা নাই। চারটে সতেরো মিনিটে সভা বসবে—শ্রোতা কই?

সকলে মহাব্যস্ত—কি করা যায়? জাপানী বৈজ্ঞানিক [illegible]কাশি পরামর্শ দিলেন টেলিভিসন খাটিয়ে দেখা যাক শ্রীযুত টুসাং কি করছেন। যেই কথা, সেই কাজ। টেলিভিসন খাটান হল। কল টিপ্‌তেই পর্দায় ফুটে উঠল টুসাং বিলাতী সোফায় শুয়ে গুড়গুড়ি মুখে ঘুমোচ্ছেন। সর্বনাশ—জাগাও, জাগাও। ফুচোর বেতার অফিসে কোঁ কোঁ শব্দের চোটে কাণ ঝালাপালা; একই কথা পঞ্চাশবার—টুসাং জাগো, জাগো!

দুপুরে একটু বেশী চাট্‌নি খাওয়া হয়েছিল বলে গা গড়িয়ে নিতে গিয়ে টুসাং ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, নইলে এটা কি ভদ্রলোকের ঘুমোবার সময়?

হট্টগোলে ঘুম ভেঙ্গে গেল; তুড়ি দিয়ে টুসাং উঠে বস্‌লেন—তাইত! একটু দেরী হয়ে গিয়েছে। আবার দাড়ী না কামিয়ে, স্নান না করে ত আর সভায় যাওয়া যায় না। বেতার টেলিফোন তুলে নিয়ে টুসাং বললেন—স্যাণ্ডু, হেলো, হেলো—টুসাং; আর দশ মিনিট।

তোমরা হেসো না। ভেবো না যে স্যাণ্ডুইচ্ থেকে ফুচো—সে ত প্রায় পনের হাজার মাইল। দশ মিনিটে লোকে আসে যায় কি করে? কিন্তু এত আর আজকালকার কথা নয়। এ অধিবেশন যখন হয়েছিল বা হবে তখন মিনিটে দু'হাজার মাইল করে স্বচ্ছন্দে চলা যেতে পারবে বা পারত।

টুসাং দাড়ী কামালেন, স্নান করলেন, একটু জলযোগ করে, লম্বা পাইপ্ মুখে দিয়ে বিমানে উঠলেন। অটোমেটিক বিমান—চাকা ঘুরিয়ে দিলেন—ষ্ট্র্যাটোস্ ফিয়ার! এ ত আর আজকালকার কলকব্জা নয় যে ভোঁ ভোঁ করে শব্দ হবে। সব কাজ এরা করে অতি নিস্তব্ধে, অতি সঙ্গোপনে।

নিঃশব্দে বিমান উল্কাবেগে ছুটল, নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত, দেশ-বিদেশ, ঘর-বাড়ী ডিঙ্গিয়ে, ষ্ট্র্যাটোস্ ফিয়ারে পড়েই মিনিটে দু'হাজার সাড়ে তিনশ' মাইল বেগে—টুসাং একটু জোরেই কল ছেড়েছিলেন।

টুসাং বসে ধূমপান করছেন। দেখতে দেখতে রথ ফুচো থেকে সুদূর স্যাণ্ডুইচে এসে হাজির—অধিবেশন গৃহের ছাদের ওপরেই। ঘড়ি খুলে রেখে, নিশ্চিন্ত মনে জুতোর তলায় ঠুঁকে পাইপ্‌টা ঝেড়ে নিয়ে টুসাং নেমে গেলেন

সভাগৃহে ; জনতা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল—সভা আরম্ভসূচক ইলেক্‌ট্রিক্ বাzার বেজে উঠল—বাzzz !

করতালি প্রকম্পিত সভাগৃহের মাঝখানে প্রথমেই উঠে দাঁড়ালেন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি শেঠজী হনুমান প্রসাদ ডালমিয়া। শেঠজীর কপালে ফোঁটা, মাথায় পাগড়ী, কাণে মুক্তার ড্রপ্। সামনের একটা দাঁত সোনা বাঁধান। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, তাই ভুঁড়িটি ছোট্ট তরমুজের মত। গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, ধুতিটি শিখিবাহন কার্ত্তিকের মতন কোঁচা গুঁজে পরা, পায়ে কালো পাম্প্। চোখ দুটি হাসি-হাসি, মুখে জরদা-সুর্ত্তির খোশ্‌বো, দাড়ী কামানো, গোঁফ আছে।

অনেকক্ষণ ধরে বিনিয়ে বিনিয়ে মিঠে সুরে শেঠজী বললেন যে সর্প মানুষের প্রকাণ্ড শত্রু। সর্পাঘাতে ভারতবর্ষে প্রত্যেক বছর বহু লক্ষ লোক মরতে বাধ্য হয়। যা হয় একটা উপায় করা উচিত।

শেঠজী বসে পড়তেই ইংলণ্ডের প্রতিনিধি মিষ্টার ফক্স্ উঠে দাঁড়ালেন। ফক্সের চেহারা পাতলা, ছিপ্‌ছিপে, চোখ দুটি নীল। মাথায় হাল্‌কা, কটাচুল, দাড়ী গোঁফ কামানো। একবার সমস্ত সভাগৃহটি দেখে নিয়ে, ঘাড় দুটি তুলে, কোটের বোতামগুলি খুলে, আবার এঁটে নিয়ে, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখ ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপ্‌তে টিপ্‌তে মিষ্টার ফক্স্ বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

ফক্স্ বললেন, "ইংরাজ জগতের অধীশ্বর, সপ্তসমুদ্রের রাণী ; তার রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না। এই জগতে যা কিছু মহান্, যা কিছু অদ্বিতীয়, যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, সব তারই কীর্ত্তি। তার রাজধানী জগতের বিপণিক্ষেত্র, তার নীতিবিদ্ জগৎপূজ্য, তার সেনানী বিশ্ব-বিজয়ী। এই সভা আহূত হয়েছে তারই উৎসাহে, তারই অক্লান্ত পরিশ্রমে, কিন্তু মহান্ বলে সে এর গৌরব আকাঙ্ক্ষা করে না।

কিসে মানবজাতির উপকার হতে পারে, সেই চিন্তায় তার মন আকুল। সর্পাঘাতে লোকে যে প্রাণ হারায় এ ব্যথা তার বুকে যত বাজে, তত কি আর কারও বুকে বাজতে পারে? এ পাপ দমন করতে হবেই। ইংরাজের বাহুবলের কাছে সকলে মাথা নত করেছে, সামান্য সর্প, সে কি আর করবে না? কিন্তু সর্পের উৎপাত দমন করতে হলে চাই—সকলের সহযোগিতা। ইংরাজের মতানুবর্ত্তী হয়ে যদি সকল দেশের সকল জাতি চলতে পারে তবেই এ আপদ্ দূর হওয়া সম্ভব।"

চারিধার হাততালিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠ্‌ল।

ইংরাজের পরই ফরাসী প্রতিনিধি উঠলেন। হাসি-হাসি মুখখানি, অনেকটা হরতনের মত। দাড়ী আছে, ছোট করে কাটা, গোঁফও বর্ত্তমান। চোখ দুটির তারা ঘন কালো, দাঁতগুলি ধব্‌ধবে সাদা। তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, "ফরাসী জাতি সকলকেই বন্ধুভাবে অভিবাদন করে, কিন্তু একথা কি কেউ কখনও ভুলবে যে ফরাসী দেশেই সভ্যতার প্রথম উদয় হয়েছিল। জ্ঞানের বাতি যে দেশে প্রথম জ্বলেছিল, কাব্য-কলা, সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসের আদি জননী, বিজ্ঞানের ধাত্রী ফরাসীভূমি চিরদিন সকলের পূজিতা, চিরদিন সকলের পূজা পাবেও। বাহুবল যে শুধু অন্যজাতির আছে তা' নয়, ফরাসী সৈনিকের বিক্রমও বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু সে যুদ্ধ করে বীরের মত, জয়-পরাজয়ে তার লক্ষ্য থাকে না। বলের সঙ্গে ছলের মিলননীতি ফরাসী জাতি জানে না। ফরাসী সৈনিক যা জয় করে, বাহুবলেই করে থাকে, চৌর্য্যনীতি অবলম্বন করে না। সর্পের উৎপাত দমন করতে ফরাসী জাতি প্রস্তুত। মানবের কল্যাণে সকলের প্রথমে সে-ই আগুয়ান্।"

তারপর উঠলেন আমেরিকার প্রতিনিধি। তাঁর চেহারার বর্ণনা করবার বিশেষ কিছুই নাই। ইংরাজের আত্মীয়ের যেমন হওয়া উচিত, তেমনই। তিনি বলতে লাগলেন—"জগতে আমেরিকাই আজ শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত; তার কারণ আর কিছুই নয়, আমেরিকার অধিবাসী সময়ের কদর জানে। বৃথা বাগাড়ম্বর না করে যদি অর্থোপার্জ্জনের দিকে মনোনিবেশ করা যায়, তা' হলেই পৃথিবীর উন্নতি হবে, নচেৎ নয়। সর্প—ও কি একটা উৎপাত? আমেরিকা ইচ্ছা করলে, কিঞ্চিৎ অর্থ খরচ করে সমস্ত শান্ত করে দিতে পারে।"

তিনি থামতেই জার্ম্মানীর নেতা জনরিস্ উঠে দাঁড়ালেন। বলিষ্ঠ চেহারা, মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। তাঁকে

দেখেই মনে হয় এইবার যা হয় একটা কিছু হয়ে যাবেই। তিনি বললেন—"বৃথা এ রকম গণ্ডগোলে কাজ পণ্ড হবার সম্ভাবনাই অধিক। সর্পের উৎপাত কি করে দূর করা যায়, আপাততঃ সে চিন্তায় মাথা না ঘামিয়ে চেষ্টা করা যাক কি উপায়ে সর্পদষ্ট মানুষ বাঁচে। যদি সর্পের দংশনে মানুষের ইহলীলা আর সাঙ্গ না হয়, তা' হলে সর্প দংশন করলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু যদি সর্পদষ্টকে রক্ষা করতে হয়, তা' হলে জার্ম্মানীর শরণ নিতে হবে, কারণ যেদিন পৃথিবীতে সভ্যতার প্রথম আলোক সম্পাত হয়েছিল সেইদিন থেকে জার্ম্মানী জাতি বৈজ্ঞানিকের জাতি আর যতদিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকবে, ততদিন বিজ্ঞানের হোমানল একমাত্র জার্ম্মানীতেই প্রজ্জ্বলিত থাকবে।"

এমনি করে একজনের পর একজন উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে লাগলেন। সভাগৃহ হাততালির ধ্বনিতে বার বার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ইংরাজী ভাষার দমকের পাশে ফরাসী ভাষার অনুনাসিক স্বর, জার্ম্মানীর রুক্ষ আয়োয়াজের সঙ্গে ভারতের মিঠে বুলি মিশে অপরূপ রসের সৃষ্টি করে ফেললে। সকলের বক্তৃতা শেষ হলে সভাপতি টুসাং নিজের মন্তব্য প্রকাশ করতে উঠলেন।

বললেন, "আজকের এই সভা সফল হয়েছে; আমি সকলকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু আমার মনে হয় যে কিছু একটা করবার আগে একবার বেতারে সাপদের জিজ্ঞাসা করা যাক যে তারা মানুষ কামড়ান বন্ধ করতে রাজী আছে কিনা। অবশ্য মানুষের পরিবর্ত্তে তাদের অন্য কিছু কামড়াতে দিতে হবে। সর্পজাতি যদি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করতে স্বীকৃত হয়, ভালোই, না হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।"

সভাপতির এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদী সম্মত হল। করতালির অট্টরোলে সভাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠল।

মানুষ ত আর সাপের ভাষা জানে না। কিন্তু একথাটা তখন তাড়াতাড়িতে কারও মনে ছিল না। এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ এইটুকু কাজে যে মানুষ ঠকে যাবে তা' হতে পারে না কাজেই ভয়ানক গবেষণা হতে লাগল কি করে সাপ-জাতিকে জিজ্ঞাসা করা যায় তারা মানুষ কামড়ান বন্ধ করতে প্রস্তুত আছে কিনা।

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড হয়ে গেল। নইলে ফলাফল কি হত কে জানে! সাপের দেশে কি করে এ খবর গেল জানি না, কিন্তু যেমন করেই হোক্, সাপ-পুলিশ খবর পেয়ে গেল যে পৃথিবীতে বিরাট্ অধিবেশন বসেছে সর্প-জাতিকে জব্দ করতে।

অতএব সঙ্গে সঙ্গে হিস্ হিস্ শব্দে পাতালপুরীর অন্ধকার ভীষণ হয়ে উঠল। চারিধার থেকে দলে দলে সাপ এসে জমা হতে লাগল মন্ত্রণা গৃহে কী করা যাবে! লাল সাপ, কালো সাপ, সবুজে সাপ, হলদে সাপ, নীল সাপ—অজগর, কেউটে, ভাইপার, পাইথন্, গোখরো, র‍্যাটল্, ঢোঁড়া, হেলে, লাউডগা, দু-মুখো, চ্যাম্‌না—আরও কত; নাম তার কে জানে? কারও জিভ দুটো, কারও একটা, কারও তিনটে। কেউ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে গুড়গুড়ির নলের মত, চলেছে চুপি চুপি খস্‌খস্ করে; কেউ কুণ্ডলী করে আছে সহরের রাস্তায় জল দেওয়ার পাইপের মত; চলেছে ঝুমঝুমি বাজিয়ে হাড়ে হাড়ে। কেউ মাত্র লাউ এর ডগার মত মোটা কেউ বা এত মোটা যে সাতজন লোক হাত-ধরাধরি করেও তাকে ঘিরে ধরতে পারে না।

হিস্ হিস্ হিস্! তোমার কাণে, আমার কাণে, আর সব মানুষের কাণে-ই শুধু হিস্ হিস্ হিস্। কিন্তু তা-ই সাপের ভাষা। সেই ভাষাতেই লক্ষ লক্ষ সাপ পরামর্শ করতে লাগল—কি করা যায়—কি করা যায়! বৈঠক বসেছে নাগরাজ বাসুকীকে ঘিরে—যা হয় একটা ঠিক করে ফেলতে হবে-ই।

নাগরাজ বাসুকীর একটুখানি পরিচয় দেওয়া দরকার। বাসুকী সাপদের রাজা। তাঁর মাথায় ফণা যে কতগুলো, তা' কেউ জানে না। কেউ বলে পাঁচ, কেউ বলে পাঁচ শ', কেউ বলে পাঁচ হাজার। রাজা কি না, তাই তাঁর চারিধারে একটা জ্যোতি ঘিরে আছে—রং তার ফিকে সবুজে। সেটা তাঁর জ্যোতিও হতে পারে অথবা তাঁর মাথার মণির ছটাও হতে পারে। বাসুকীর প্রত্যেকটি ফণায় একটি করে

মাণিক বসান। সাত রাজার ধন এক একটি মাণিক—সে মাণিক কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না—বাসুকী ত আর কখনও সে মণি মাথা থেকে খোলেন না।

বাসুকীর এত খাতির কেন জানো? তিনি আমাদের এই পৃথিবীটা মাথায় করে ধরে রেখেছেন—মাথা একেবারে সোজা করে। যদি একটু খানি মাথা হেলে যায় অমনি আমরা গড়িয়ে পড়ব।

এ হেন বাসুকীর চারিধারে সভা বসেছে। তিনি কিছুই বলছেন না। তাঁর মন্ত্রী, পরিষদ হিস্ হিস্ করে বক্তৃতা করছে, আলোচনা করছে—তিনি এক মনে শুনছেন।

বৃদ্ধ সাপ মন্ত্রী বললেন যে পৃথিবীতে মানুষ যতই সভা-সমিতি করুক না কেন সর্প জাতি কখনও মানুষ কামড়ান বন্ধ করবে না। কেন করবে? আবহমান কাল ধরে তারা পুরুষানুক্রমে মানুষ কামড়ে আসছে আর আজ হঠাৎ কামড়ান বন্ধ করলেই হল?

তাঁকে বাধা দিয়ে একটি তরুণ সাপ হিস্ হিস্ করে উঠল—"বৃদ্ধের বচন শুনে যদি রাজ্য চলে তা'হলে তার চলাই হবে না। চিরকাল সাপ মানুষ কামড়ে এসেছে বলে যে চিরকাল তাকে মানুষ কামড়াতে হবেই এমন কি মানে আছে? মানুষের চামড়া এমন মোলায়েম কিছু নয় যে কামড়ে দাঁতের সুখ হবে; তার রক্তও এমন সুস্বাদু নয়—তার চেয়ে দুধ কলা অনেক ভালো। আবার কামড়েও রক্ষা নাই। সময়ে সময়ে কামড়াতে গিয়ে প্রাণটা রেখে আসতে হয় পৃথিবীতে। যদি মানুষ জাতি ভালো রকম অন্য কিছু কামড়াতে দিয়ে সন্ধি করতে চায়, তা'হলে মানুষ কামড়ান বন্ধ করতে আপত্তি কিসের?"

সভার মত সাপের সভায় কোনই হট্টগোল হল না। দুটি সাপের বক্তৃতা শেষ হল, নাগরাজ বাসুকী এবার মন্তব্য প্রকাশ করবেন। বাসুকী বললেন—"সাপ চিরদিন মানুষ কামড়ে এসেছে, কামড়াচ্ছে, আর কামড়াবেও। কেন? সে প্রশ্ন করা মিথ্যা। বাতাস বয় কেন? বাঁদর দাঁত দেখায় কেন? মানুষ বাজে বক্তৃতা করে কেন? এর একটি মাত্র উত্তর—যার যেমন স্বভাব। সাপের স্বভাব মানুষ কামড়ান, অতএব সে মানুষ কামড়াবেই।

আর তা'ছাড়া—কামড়াবেই বা না কেন? মানুষ যখন কিছু করতে চায়, কারও অনুমতির অপেক্ষা রাখে কি? যত রকম পাখী আছে, কারও ডিম, কারও ছানা, ধরে ধরে খায়। যত রকম জন্তু আছে সকলকেই হজম করে। গাছ-পালা, যাবতীয় সৃষ্টি দাঁতে কেটে পরখ করে দেখতে চায়। সাপ তবে মানুষ কামড়াবে না কেন?"

এই বলতে বলতে বাসুকী গরম হয়ে উঠলেন। তাঁর মণিগুলো ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল—মনে হল যেন গঙ্গার বুকে ষ্টীমার সার্চ লাইট্ জেলেছে। তাঁর ফণাগুলি দুলে উঠল। তিনি বললেন, "না না, কখনই না। মানুষের সঙ্গে সাপ সন্ধি করবে না। কিছুতেই না—এ অসম্ভব।"

রাগে তাঁর গা দুলে উঠল, তিনি রাগে আত্মহারা হয়ে মাথা নেড়ে বললেন "না, না।"

বাসুকী মাথা নাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরে বসুমতী নড়ে উঠল। মানুষ, সামান্য মানুষ ভাব্‌ল—ভূমিকম্প হল। কিন্তু তার কারণ কি কেউ জানে?

সেই হল সব চেয়ে বড় ভূমিকম্প—যা হয়েছে, বা হবে।

শ্রীবিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ

ছন্দসূত্র-গ্রন্থি

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক

আশ্বিনের 'বিচিত্রায়' শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ছন্দধন্ধের নিরসন' পড়িলাম। ঐ প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য বোধ হয় ইহাই যে প্রবোধচন্দ্র সেন ও আমি ছন্দের মাত্রা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছি, এবং অমূল্যবাবু এ বিষয়ে একটি অভ্রান্তসূত্র বয়ন করিয়াছেন। সেটি এই—

[২৮] "উচ্চারণের রীতি বজায় রাখিয়া ছন্দের pattern বা আদর্শ অনুসারেই অক্ষরের মাত্রা স্থির হইয়া থাকে।

...প্রত্যেক অক্ষরই একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইবে, শুধু শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইবে। ছন্দের খাতিরে গোটা শব্দ না ভাঙিয়া উপরে লিখিত নিয়মে সর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ করিবার জন্য অক্ষরের দীর্ঘীকরণ বা হ্রস্বীকরণ করা হইয়া থাকে।...একই পর্ব্বের মধ্যে উপর্য্যুপরি দুইটির বেশী যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণ চলে না, এবং পর্ব্বের মধ্যে প্রবল স্বরাঘাত না থাকিলে শব্দের অন্তস্থ হলন্ত অক্ষরের হ্রস্বীকরণ চলে না।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯, ১ম সংখ্যা, ৪৪ পৃষ্ঠা)

সূত্রটি টীকা সমেত কিঞ্চিৎ জটিল দেখাইলেও ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ফাঁক বন্ধ করিবার প্রয়াস হইয়াছে। অমূল্যবাবুর 'হ্রস্বীকরণ' ও 'দীর্ঘীকরণ' প্রবোধবাবুর 'অযুগ্মধ্বনি' ও 'যুগ্মধ্বনি'র-ই নামান্তর মাত্র।

যাহাহউক, "একই পর্ব্বে উপর্য্যুপরি দুইটির অধিক closed syllableর হ্রস্বীকরণ চলিবে না"—এই উপ-সূত্রের উপর নির্ভর করিয়াই অমূল্যবাবু 'স্বরাঘাত-প্রধান' ছন্দের মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং 'বাপ্ বল্লেন', 'একলাটেই'—ইত্যাদি পর্ব্বে ৪ মাত্রার হিসাব মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহা তিনি স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন, কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান লেখকের ধন্ধ-নিরসন হয় নাই। কয়েকটি প্রশ্ন এখনো মনে জাগিতেছে।

যথা—

১। শেষ বসন্তের সন্ধ্যা হাওয়া শস্য-শূন্য মাঠে (রবীন্দ্রনাথ)

এই পংক্তির প্রথমপর্ব্বে কয় মাত্রা? অমূল্যবাবুর সূত্রানুসারে ইহাতে শেষ্ (ব)সন্ তের্—এই তিনটি closed syllable পাই, ইহাদের উপর্য্যুপরি দুইটির বেশী হ্রস্বীকরণ চলিবে না। অতএব এই তিনটি যৌগিক অক্ষরে আমরা পাই ৪ মাত্রা এবং তৎসঙ্গে একটি অতিরিক্ত মাত্রা ব,—অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ৫ মাত্রা। তবে কি ছন্দঃ-পতন ঘটিয়াছে, কারণ এ ছন্দের প্রতি পর্ব্বে ত চার unit থাকিবে?

সত্যেন্দ্রদত্তের লেখাতেও এরূপ পর্ব্ব পাওয়া যায়:—

সন্ধ্যা-রাতের <u>অন্ধকার আজ</u> জোনাক-পোকায় স্পন্দমান।
<u>শের আফগানের</u> বিবি তুমি হ'লে অনিচ্ছায় কাঁদি।
(কবর-ই-নূরজাহান)

এই সকল পর্ব্বের unit মাপিবার সূত্র কি?

২। সত্যেন্দ্রদত্ত ত স্বরবৃত্ত বা 'স্বরাঘাত-প্রধান' ছন্দে অনেকগুলি গুরুগম্ভীর কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি ত কোন পর্ব্বেই তিন সিলেব্‌ল্ অথবা তিনটিমাত্র closed syllable ব্যবহার করেন নাই; প্রত্যেক পর্ব্বে ৪ সিলেব্‌ল্ ব্যবহার করিয়াছেন। তিন সিলেব্‌ল্‌কে আবৃত্তির ঝোঁকে টানিয়া ৪ সিলেব্‌ল্-এর পরিমাণ দিবার কোন সুযোগই তিনি পাঠককে দেন নাই। কেন?

৩। সত্যেন্দ্রদত্তের 'সিংহল'-শীর্ষক কবিতাটি কোন্ ছন্দে লিখিত? 'স্বরাঘাত-প্রধান' ছন্দে নয় কি? এ-কবিতার প্রতিপর্ব্বে ৩টি closed syllable আছে, তাহাদের যদি ৪ মাত্রা গণনা করি ত এ কবিতাটি অন্যান্য 'স্বরাঘাত-প্রধান'

ছন্দেরই অনুরূপ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রবোধচন্দ্র সেনের নিয়মানুসারে—

—(ওই) সিন্ধুর টিপ্ | সিংহল দ্বীপ | কাঞ্চনময় | দেশ !

(ওই) চন্দন যার | অঙ্গের বাস, | তাম্বুল-বন | কেশ !

—এইভাবে তিন সিলেব্‌ল্‌-এর পর্ব্বে বিশ্লেষণ চলে, এবং প্রত্যেক পূর্ণ পর্ব্বেই ৬ মাত্রা আছে; দুইটি 'প্রতিসম' পংক্তির পরিমাণ-ও সমান। ইহাকেই তিনি 'স্বরমাত্রিক' ছন্দ বলেন। অমূল্যবাবু ইহাকে কী-প্রধান ছন্দ বলিবেন বা ইহার পর্ব্বের মাত্রা গণনা করিবেন কি-ভাবে? তিনি কি নিরুপায় হইয়া ইহাকে 'ধ্বনি-প্রধান' বলিবেন?

'এক লগ্নেই' আর 'সিন্ধুর টিপ্'—এই উভয় পর্ব্বে কোন পার্থক্য আছে কি না?

'কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ।'

'শিবঠাকুরের বিয়ে হবে, তিন কন্যে দান।'

এই পংক্তি-দ্বয়ের ছন্দে পার্থক্য-নির্ণয়ের সূত্র কি?

আমার মতে অমূল্যবাবুর সূত্রে আরও কিছু amendment আবশ্যক। অর্থাৎ 'স্বরাঘাত-প্রধান' ছন্দের পর্ব্বে তিনটি closed syllable থাকিলে তাহার একটিকে দীর্ঘ করিয়া চারিমাত্রা গণনা করিলেই মাত্রাগণনার একমেবাদ্বিতীয়ম্ সূত্রটি আবিষ্কার করিয়াছি, এরূপ বলা চলে না। স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রত্যেক পর্ব্বেই যদি এইরূপ তিনটিমাত্র 'যৌগিক অক্ষর' থাকে ত তাহাতে ঐ ছন্দের স্বরূপ পাওয়া যায় না। ৪টি স্বরের অর্থাৎ ৪ সিলেব্‌ল্‌-এর পর্ব্ব থাকা একান্ত আবশ্যক। সুরের টানে এ ছন্দের প্রতি পর্ব্ব ওজনে ছয়মাত্রার সমান,—শুধু এই জন্যই তিনটি closed syllable কেও টানিয়া ৪ মাত্রা (?) ধরা চলে। অতএব অমূল্যবাবুর ছন্দসূত্র পড়িয়াও আমার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিতে কিছুমাত্র আগ্রহ জন্মে নাই।

বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্।—এই লাইনে—ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—এই তিনটিমাত্র সিলেব্‌ল্‌-এই আবৃত্তির সুরে ছয় সিলেব্‌ল্‌-এর সময় লাগে, আমি এ-কথাই স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য শেষ বিভাগে ৪+২ এইভাবেই ছয় ৬ গণিয়াছিলাম। অর্থাৎ ঐ লাইনের ছন্দোলিপি করিবার সময় আমি মোটেই ভুলি নাই যে, এ ছন্দের প্রতি পর্ব্বে ৪ মাত্রা থাকে। ইহা অমূল্যবাবুর অমূলক আশঙ্কা মাত্র।

৪। 'বাংলাছন্দের মূল সূত্র'-শীর্ষক প্রবন্ধের (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯, ১ম) ৪৬ দৃষ্টান্তের প্রতি অমূল্যবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি দুইটি লাইন ভুল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'দুটি চক্ষু ছলছল করে' (কথা ও কাহিনী, ৮ম পুনর্মুদ্রণ, ১৩৩২)-এর স্থলে—'দুটি চক্ষু ছল্ ছল্ করে' উদ্ধৃত হইয়াছে। এই 'ছল্ ছল্' এতে তিনি ৪ মাত্রা পাইলেন কোন্ সূত্রানুসারে? 'ছলছল'-তে কিন্তু প্রবোধবাবুর সূত্রানুসারে ঠিক ৪ সিলেব্‌ল্‌ পাওয়া যায়।

তারপর—'জয় রাণা রামসিঙের জয়'—এর স্থলে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন—'জয় রাণা রামসিংহের জয়'। জয়ধ্বনি হিসাবে এ লাইনে 'জয়', 'রাম' 'জয়' এই তিন সিলেব্‌ল্‌-এ প্লুতস্বরের উচ্চারণ আছে, অর্থাৎ স্বরের দীর্ঘীকরণ ঘটিয়াছে।

রাম সি ঙের—এইভাবে unit বিশ্লেষণ হইবে। কিন্তু অমূল্যবাবু গোঁজামিল দিয়া 'রাম'-কে হ্রস্বীকৃত যৌগিক অক্ষর ও সিং-কে দীর্ঘীকৃত যৌগিক অক্ষর ধরিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি কি কবিতা-আবৃত্তির অক্ষমতাই প্রকাশ করেন নাই?

রবীন্দ্রনাথ 'রামসিংহের' এরস্থলে 'রামসিঙের', এবং 'ছল্‌ছল্'-এর স্থলে 'ছলছল' কেন ছাপাইলেন, ইহা জানিতে কৌতূহল হয়।

৫। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার (১৩৩৯, ১ম) ৪২ পৃষ্ঠায় অমূল্যবাবু লিখিয়াছেন,—"স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে শুধু ৪ মাত্রার পর্ব্বই ব্যবহৃত হইতে পারে।

[দৃঃ ২৮] জল পড়ে | পাতা নড়ে ॥

[দৃঃ ২৯] কালো জল | লাল ফল ॥

[দৃঃ ৩২] খনা ডেকে | বলে যান,

রোদে ধান | ছায়ায় পান ॥—"

এগুলিকেও কি তিনি 'স্বরাঘাত-প্রধান' ছন্দের নিয়মিত (regular) পর্ব্ব বলেন? না, তিনি পাঠকমণ্ডলীর সঙ্গে রসিকতা করিয়াছেন?

পরিশেষে বক্তব্য এই : অমূল্যবাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক বাংলা-ছন্দ নিয়া অনেকদিন যাবৎ (?) বহু মূল্যবান্ গবেষণা করিতেছেন। তাঁহার সহিত তর্ক করিবার অধিকার হয়ত আমার নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহার সূত্র-গ্রন্থি যেন ছন্দ-সরস্বতীর গলায় ফাঁস জড়াইতেছে। তাই এই অখ্যাতনামা নিরীহ পাঠক সত্যই কিছু ধাঁধায় পড়িয়াছে।

অমূল্যবাবু এক স্থলে লিখিতেছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯, ১ম, ৬০ পৃঃ)—"বহুকাল হইতে বাঙালীর কান ঐ সমস্ত কবিতার ছন্দে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। বাংলা-ছন্দের জগতে তাহাদেরও কোন একটা স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে।" আমার মতে এই কানের তৃপ্তিলাভ করাটাই ছন্দ-শুদ্ধির একমাত্র আদর্শ নয়। এদেশে এখনো এমন অনেক পুরোহিত-পণ্ডিত আছেন যাঁহারা সর্ব্বজাতীয় ছন্দের কবিতাকেই চণ্ডীপাঠ বা সত্যপীরের ছড়ার সুরে পড়িয়া ফেলিবেন, এবং সে পাঠ শত শত পল্লীরমণীর কানে তৃপ্তির অমৃতধারা ঢালিয়া দিবে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তীযুগে বাংলা-সাহিত্যে এমন অনেক কবিতা লেখা হইয়াছিল, যাহাদের ছন্দ আধুনিকের মতে অশুদ্ধ, কিন্তু তৎকালীন পাঠকের তাহাতে কিছুমাত্র অরুচি ছিল না। বাংলাছন্দ এখন একটি সম্পূর্ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছে। রুচির ও শ্রুতবোধের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে।

আয় আয় সই জল আনিগে জল আনিগে চল।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ।

—এই সকল লাইন ছড়ার সুরে সুচ্ছন্দ শুনাইলেও ছন্দের আদর্শে এখন ইহাদের স্থান নাই। এই জন্যই বোধ করি সত্যেন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত ছন্দের ঠিক পরিপূর্ণ মূর্ত্তিটিরই চিরকাল সেবা করিয়াছেন। তিনি কোনখানেই একটি পর্ব্বে কেবল তিনটি closed syllable বা তিনটি স্বর প্রয়োগ করেন নাই, অন্ততঃ আমার চোখে ত পড়ে নাই। রবীন্দ্রনাথ যে-সকল ছড়া-কবিতা বা গাথা-কবিতা (যথা—ছেলেবেলার গান, নিষ্কৃতি, মুক্তি, প্রভৃতি) লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন কোন পর্ব্বে তিনটি closed syllable ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ, ছড়া-কবিতায় সুরের টানে ছন্দ বজায় থাকে, আর গাথা-কবিতায় গদ্য-ধরণে আবৃত্তির ঝোঁকে ছন্দ বজায় থাকে। কিন্তু তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দে যে-সকল ভাবময় গম্ভীর কবিতা লিখিয়াছেন (যথা 'পূরবী'তে-প্রবাহিনী, বিরহিণী, স্বপ্ন, আশঙ্কা, তারা, প্রভৃতি), তাহাদের কোনখানেই এইরূপ পর্ব্ব ব্যবহার করেন নাই। কারণ, এগুলি শুধু কবিতার ছন্দেই আবৃত্ত হয়, কোন ছড়ার সুরে বা অভিনয়ের ভঙ্গীতে আবৃত্ত হয় না। এই সকল কবিতাতেই বর্ত্তমান স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এবং ইহারা বাংলা-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ্।

শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

আশঙ্কা

শ্রীমতী আশালতা দেবী

সেভেন্‌টিনই ল্যান্সডাউন রোডে ছোট একখানা দোতালা বাড়ী। অমলের মামার বাড়ী।

পাটনা কলেজের মেস থেকে ফোর্থ ইয়ার এগ্‌জামিন দিয়ে, সে কলকাতায় একটু বেড়াতে এবং বৈচিত্র্যের আস্বাদ পেতে এসেচে। অমল আধুনিক এবং আর্টিষ্টিক এই দু'য়ের সমন্বয়। ওর পরিচ্ছদ ওরই একান্ত সৃষ্টি। ঢিলে গোছের দুগ্ধশুভ্র কাবুলি সল্‌ওয়াচ এবং একজোড়া সুরুচি-সম্মত শ্লিপার ওর ঘরে বাইরের ড্রেস।

আধুনিক যুগের তরুণ যেমন ও-ও তেমনি—কোন জিনিষ তর্ক না করে মেনে নিতে রাজী নয়। এবং যে বিষয়ে নিজের স্বাদ নেই সে বিষয়ে অপরের যে কিছু অর্জ্জন করা অভিজ্ঞতা থাকতে পারে তা স্বীকার করবে না। বাইরের কথাবার্ত্তায় একরোখা তার্কিক। কিন্তু যা বলছিলুম ও আর্টিষ্টিক এবং আধুনিকের সমন্বয়। বাইরে থেকে তাকে যা মনে হয় সেটা ওর আধুনিকতার পরিচয়। অথচ ও নির্জ্জনতা ভালোবাসে। কোনদিন পড়াশোনার ফাঁকে ওদের বাড়ীর ছাদ থেকে জ্যোৎস্না-স্নাত গঙ্গার যে একটুকরো তার চোখে পড়েচে ও তাতে দাঁড়িয়ে আবিষ্ট হয়েচে এবং নিত্য-নৈমিত্তিক বেড-টিকে উপেক্ষা করে যদি কোনদিন সকালে উঠেচে, তবে প্রভাত বেলায় পরমবিস্ময় ওর দেহ মনকে আপ্লুত করেছে। অমলের সঙ্গে এসেছে সুনীল, ওর গভীর বন্ধু। দুই বন্ধুতে মিলে ক'দিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে একটু বেশী রাত করে দোতালা বাসে চড়ল ক'লকাতার এধার থেকে ওধার, বালীর ব্রীজ থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রায় সমস্ত দেখা শেষ করেচে। ওদের মতে জু দেখবার মত বয়স আর ওদের নেই।

এমন সময়ে সুনীল এক সোমবার সকালে এসে বলল "অমল তোর বিছানায় বসে পান করবার চা' নে। (সুনীল প্রতিজ্ঞা করেছিল পারতপক্ষে সে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবে না) আমি চাকরের হাত থেকে উদ্ধার করে নিজে করলুম। কিন্তু কি বলতে এই সকাল বেলায় তোর ঘুম ভাঙ্গালুম? বলব কি? মাসীমা কেমন করে খবর পেয়েচেন আমি কলকাতায় এসেছি, তারপর বাকীটা আন্দাজ কর। ওখানে না উঠে কেন অন্য জায়গায় থেকেচি এ অপরাধের কৈফিয়ৎ কি? কাল রাতে তাঁর একখানা চিঠি পেয়েচি অনুযোগে ভরা। তুই রোজ একবার করে টুথব্রাশ গোলমাল করতে আমাকে এক জায়গায় টেনে আনলি—ওদিকে ওঁর রাগ ভাঙ্গাতে আমার এক যুগ যাবে"। অমল ধীরে সুস্থে চা খেতে খেতে বলল "মাসীমা তোমার ঠিকানা আবিষ্কার করলেন কি করে?" সুনীল একটু এদিক ওদিক চেয়ে একটু কাশবার পর উত্তর দিল "রাগ করিসনে এ একটা আকস্মিক যোগাযোগের ফল।"

অমল বলল "সুনীল তুই আর স্মার্ট হতে যাসনে, এ একটা 'এ্যাকসিডেণ্টাল' ব্যাপার বলতে কি পারতিসনে? তোর জন্যে কি আমাকে আবার নতুন করে বাঙ্গলা শিখতে হবে।"

সুনীল বলল "খুব শেখ্, বাঙালীর ছেলে হয়ে ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখতে লজ্জা করে কি? করে না ত? কিন্তু সেটা বলি। পরশু রাতে 'চলচ্চিত্র' দেখতে গেলুম (সুনীল সিনেমা কিংবা বায়স্কোপ কিছুতেই বলবে না কি করা যায়?) সেখানে আমার মাসতুত ভাই এবং বোন সুধীর ও সুচরিতার সঙ্গে দেখা, কি করব চেপে ধরলে।"

অমল বলল "তাই সাত সকালে এক পেয়ালা উৎকোচ দিয়ে বিচ্ছেদের বার্ত্তা শোনাতে এসেচ। বেশ

করেছ। আচ্ছা আমিও যাব মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু এ বেলায় ত হতে পারে না।"

সুনীল প্রশ্ন করল 'কেন হতে পারে না'? অমল একটু আশ্চর্য্যসুরে বলল 'ক'টা বেজেছে বলত?'

"সাড়ে সাতটা"।

'তবে'?

'তবে কি?' "এখন আমার হাই উঠচে অথচ তুই না বকিয়ে ছাড়বিনে। বেশ নিরুদ্বেগে জিজ্ঞেস করলি 'তবে কি?' এই তবের উত্তরে আমাকে কতটা বলতে হবে শোন— এর পর ভালো করে আমার বিছানা থেকে উঠতে সাতটা পঞ্চাশ হবে, হবে ত? তারপর টুথব্রাশ মিলিয়ে খুঁজে বার করতে স্নান করতে সল্‌ওয়ার ভাঁজ ঠিক করে পরতে প্রায় ন'টা বাজবে কিনা? তারপর আর একবার চা খেতে ক'টা বাজবে? you can imagine, আচ্ছা এর পর অত বেলাতে যেয়ে কি করব?"

সুনীল একটু হেসে ডি'লামেয়ারের একখানা কবিতা বার করে, পুবদিকের জানালাটা খুলে দিয়ে পড়তে বসল। সে সকালে ওঠে এবং সকালে ওঠার আনুষঙ্গিক প্রাতঃকৃত্য শেষ করতে ওর বন্ধুর চেয়ে একশগুণ চটপটে কিন্তু হ'লে হবে কি তার মাসীমা অমলেরও মাসীমা অন্ততঃ সে তাই মনে করে, অমলও ত করে, দু'জনের একসঙ্গে যাওয়াই ভালো। তা ছাড়া একটু মৌলিক হবার চেষ্টা করা ছাড়া সুনীলের আর বিশেষ কোন মতামত নেই। অমল যা বলে সে তাই করে। খানিকটা ভালোবাসায় খানিকটা ওর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে।

পাঁচটার সময় ওরা দুই বন্ধুতে বার হোল চুয়াত্তর পালিত ষ্ট্রীটের অভিমুখে। সুনীলের মেসোমশায়ের বেশ বড় বাড়ী তিতলা অবধি। সাজান গোজান। একেবারে সাহেবী ফ্যাশানের নয় অথচ হালআমলের রুচি অনুসারে। মাসীমা খুব সামাজিক এবং স্নেহশীলা। সাদাসিধে একখানা [illegible] শাড়ী এবং একজোড়া চটি পায়ে দিয়ে যাবতীয় [illegible] করে বেড়াচ্ছেন। ওদের দু'জনকে দেখে এবং অমলের পরিচয় পেয়ে ভদ্রমহিলা নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাদের প্রণামের বদলে বহু মিষ্টালাপ করতে করতে তাদের সঙ্গে নিয়ে ছাদে চল্‌লেন। সেখানে খোলার মাঝে বেশ হাওয়া দিচ্ছে এবং বিকেল বেলার সূর্য্যের সোণালী আলোয় টবের রজনীগন্ধা এবং বেলফুলের গন্ধে সেখানে দু'দণ্ড বসতে ইচ্ছা করচে, বসে এমন কথা বলতে ইচ্ছে করচে যার গভীরতা আছে। চায়ের সরঞ্জাম সাজানো ছিল, মাসীমা চা ভিজতে দিলেন এবং চাকরকে পাঠালেন সুধীর ও সুচরিতাকে ডেকে আনতে। সুনীলকে প্রশ্ন করলেন তার বন্ধু চা খায় কি না। সুনীল উত্তর করল আমার বন্ধু যাকে বলে একটি খাশ্‌ 'চাতাল'। শুনে মাসীমা হাসলেন। এবং অমল নার্ভাসের মত পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমাটা একবার মুছলে এবং মুছে আবার পরলে। ইতিমধ্যে সুধীর এবং সুচরিতা এসে পড়েচে। সুধীর থার্ড ইয়ারে পড়ে, এদের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। সে ঢুকেই 'আরে এই যে সুনীলদা, এতদিন পরে দেখা করবার অবসর মিল্‌ল' বলে সুনীল এবং সেই সূত্রে অমলের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলে। সুচরিতা চায়ের টেবিলের পুরোভাগে একখানা চেয়ারে বসল, তার মা তাকে চা তৈরী করবার ভার দিয়ে জলখাবার গুছিয়ে পাঠাতে নীচে নেমে গেলেন।

অমল কাপ দুই চা নিঃশেষ করে যখন তৃতীয় পেয়ালা হাতে নিয়েচে সুধীর প্রশ্ন করল "অমলদা, এত চা খান কেন?"

অমল বলল "এ সম্বন্ধে আমার গোটাকতক ভারি ব্যক্তিগত মতামত আছে। চা কোকো কিংবা কফি খাওয়া অন্য অনেক খাওয়ার চেয়ে ঢের বেশী স্পিরিচুয়াল। এদের আস্বাদ আছে অথচ খাওয়ার যে স্থূলতা তা নেই। এই সোণালী আলোয় এক পেয়ালা সোণালী চা খেতে খেতে রোঁপার প্রাৎসিয়ার কথা অনায়াসে ভাবতে পারো কোথাও বাধবে না। কিন্তু লুচির টুকরো এবং মাংসের হাড় আয়ত্ত করতে করতে ও কিছুতেই হয় না। তখন খাওয়াটাই একান্ত বাস্তব হয়ে মনকে ব্যাপৃত রাখে।" সুনীল বলল "কিন্তু খাওয়াটা অসুন্দর হতে পারে

অথচ লেশমাত্র অবাস্তব নয়। বলত সুধীর?" অমল বল্‌ল "যা তা নয় কিন্তু—খাওয়ার সচেতনতাটা এত স্থূল যে, যে কোন প্রকারে তাকে যতটা চাপা দেওয়া যায় ততই ভালো। এই জন্যে য়ুরোপের খাওয়ার ঢংটা আমার এত ভালো লাগে—তাড়াতাড়ি নেই, গোলমাল নেই, হাস্যে, গল্পে, ফুলে, সুগন্ধে খাদ্যের সজ্জায় তারা এর স্থূল দিকটাকে যতদূর অবধি পারা যায় বিলুপ্ত করতে চেয়েছে।"

সুচরিতা বলল "সুনীলদা সেদিন বায়োস্কোপের একটা ছবিতে দেখেছিলেম এক অখ্যাতনামা খাবারের দোকানে এক বুড়ো কিছু খাবার কিনে ঠোঙ্গায় করে খাচ্ছে, সাধারণ ছবি কিন্তু সেইদিন ওর দৃশ্য দেখে মনে হো'ল ওর ওই তাড়াতাড়ি খাওয়া, মাছি এবং শত নোংরামীর মাঝেও কেবল কিছু একটা খাওয়ার দারুণ সম্ভোগ মুখে চোখে কি উৎকট হ'য়ে ফুটেছে, সেদিন আমার মনে হ'য়েছিল মেয়েরা যে খাবার কাছে বসে সে কি খাওয়ার স্থূল দিকটাই পরিহার কর্ত্তে নয়? কেবল নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে খাচ্ছি এর চেয়ে কারো তৃপ্তির জন্যে খাচ্ছি এইটেই কি একটা আবরণ টেনে দেয় না?"

সুধীর বলল "সুচি ত হবেই, কিন্তু আপনি এত সুকুমার রুচির হয়ে আর্টস্ নিলেন না কেন? বি-এস্‌সি কি করে পড়লেন? কোনদিন অ্যাসিড নাইট্রিকের ফুটকি পড়ে আপনার ঝোলা পাঞ্জাবীর হাতা পুড়ে যায় নি?"

অমল হেসে বলল "ঠিক বলেচ আমার অনেক পাঞ্জাবী আর অনেক সলওয়ারের পায়ের দিকে অ্যাসিড পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে তবু আমি পারত পক্ষে আস্তিন গোটাইনে।"

সুধীর বলল "বেশী সুকুমার হওয়া মেয়েদেরই সাজে। পারবে ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাশ সহ্য করতে? আমি ত বলেছিলুম সুচিকে সায়ান্স নে, তা ওর শোনা হো'ল না

সুচরিতা চায়ের পেয়ালা থেকে মুখ তুলে সচকিত হয়ে তাকালে। মেয়েটি আয়ের চেয়ে ভালো দেখতে, রোগা গড়নের। সাদা শাড়ী এবং রঙীন ব্লাউজ গায়ে দিয়েছে। বোধ হয় বাড়ীর ড্রেস এর চেয়ে conspicuous হওয়া উচিত নয় আগেই ভেবে রেখেছিল। অমল তার দিকে চেয়ে বলল "আপনি বুঝি আর্টস্ নিয়েচেন? কেন? আমার মনে হয় মেয়েদের সায়ান্স পড়া এবং ম্যাথামাটিক্স অনার্স্ নেওয়া সব চেয়ে ভালো।"

সুচরিতা চামচ দিয়ে চিনি নাড়তে নাড়তে কি বলবে উত্তরে ভাবছিল। কিছুক্ষণ পরে কোমল স্বরে বলল "আমার সাহিত্যের ওপর তৃষ্ণা বেশী। মনে করেচি বি-এতে ইংরেজী অনার্স নেব।"

অমল বলল "একটা কথা বলব কিছু মনে করবেন না ত? ও উত্তরটা হো'ল ভেবে বলা, আসল উত্তর হচ্ছে বি-এস-সিতে সায়ান্সের কোন একটা সাবজেক্‌ট্ অনার্স্ নিয়ে খুব ভালো রেজাল্ট্ করতে হ'লে যতটা বেশীর ভাগ খাটতে হবে তা'তে আপনাদের—মেয়েদের চেহারা খারাপ হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েচে। কিন্তু তা যে ভুল ধারণা একথা প্রমাণ করবার ভার আপনারা নেবেন না? আপনারও এই unscientific আশঙ্কা রয়েচে নাকি?"

সুধীর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে অমলের দিকে চেয়ে রইল। সুচরিতার মুখ একটু বেশী আনত এবং বেশী লাল হয়ে উঠেচে সেটা নত মুখ সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে। সুনীল ওর বন্ধুকে জানে তাই বলল জানিস সুচি ওর নিজের চেহারা খারাপ হবার ভয় কত বেশী—গঙ্গায় সাঁতার কেটে এসে বাথরুমের দরজা আধ ঘণ্টা বন্ধ রাখে, ভিতরে যে কি করে—সাবান মাখা ছাড়া আর যে কিছু করে না তাতে আর সন্দেহ নেই। ওর ড্রেসিং টেবিল মেয়েদের সজ্জার উপকরণকে লজ্জা দিয়েচে। হেন ক্রীম এবং হেন স্নো নেই যা ওর টেবিলে পাবিনে। নতুন নতুন পাউডার নিয়ে ও এক সপ্তাহে একবার এক্‌সপেরিমেণ্ট করে।"

সুচরিতা বলল "যদিচ আমি তোমার বন্ধুর ড্রেসিং টেবিল খানাতল্লাসী করতে যাচ্ছিনে কিন্তু মতের সঙ্গে তাঁর আচরণ মেলে না জেনে অবাক হচ্ছি

সুচরিতার দিকে চেয়ে অমল বলল "আর এক পেয়ালা চা দিন না—কিন্তু মতটা কি দিলুম শুনি? মেয়েদের সায়ান্স পড়া উচিত—হ্যাঁ নিঃসন্দেহই উচিত, তাই বলে আমি টয়লেট ব্যবহার করব না? সুনীলের দিকে চেয়ে বলল

আমি কতক্ষণ সাঁতার কাটি এবং ক' রকম এক্সারসাইজ করি সেটা আমি কতক্ষণ সাবান মাখি এবং ক'রকম ক্রীম মাখি এর সঙ্গেই তোর বলা উচিত ছিল। হঁ্যা দেখুন আমার একটা ভারি প্রিয় থিওরি আছে যারা afford করতে পারে তাদের অন্ততঃ পক্ষে মাসে দশটাকা টয়লেটে খরচ করা উচিত।"

সুধীর বলল—তবে?

অমল—তবে কি?

সুধীর—তবে মেয়েদের চেহারা ভালো রাখার চেষ্টা আরো কত দরকারী।

অমল—"এক ইঞ্চিও বেশী নয়। আমাদের চেহারা ভালো রাখা যতখানি দরকার মেয়েদেরও ততটা দরকার। কিন্তু শুধু ক্রীম ব্যবহার করলেই যে চেহারা ভালো রাখার অপরিসীম দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না একথা আপনাদের বোঝাবার ভার নেবে কে?"

সুনীল বলল "জানিস সুচি ও সলওয়ার ভাঁজ ঠিক করে পড়তে তোদের শাড়ী পড়ার চেয়ে বেশী সময় দেয়। কিন্তু ওর এক্সারসাইজ করার সময় রোজ weight তোলা একশ পাউণ্ড ছাড়িয়ে গেছে।"

অমল বলল "মেয়েদের মনে একটা ভাব বদ্ধমূল হয়েচে, আমরা জামার বোতাম লাগাতে পারিনে, খুব খেটে বাড়ী এলেম বোতাম খোলা এলোমেলো। জামা কাপড় ঘর্ম্ম সিক্ত। এই হোল আমাদের আদর্শ বেশ—এই রকম করে ভাবতে শেখা এ যেন ও'দের একটা বাতিক। তারপর স্নান [illegible] বা করলুম সাবান কি মাখে, ঘটি দুই এমনই জল। [illegible] টয়লেট ব্যবহার করা এদেশে হাস্যকর।" [illegible] হো হো করে হেসে উঠল। অমল বলল—"কিন্তু আমি [illegible] একটা আঁক নিয়ে বসি, মনে করেছ যাবর? [illegible] ভুলবই। আমার ছোট বোন মৃণালিকা [illegible] আমার ভাবুক করতে আসে আমি ওর [illegible] বোতাম সেলাই করে নিই।"

[illegible] জিজ্ঞেস করল "আপনার বোন কি রকম? [illegible] সঙ্গে তাঁর মেলে?"

[illegible] মিলবে না কেন? কেবল একটা মিল তাকে আমি বলি সাধারণ ভাবে মেয়েরা এবং বিশেষ করে তুই শাড়ী এবং ব্লাউজের ম্যাচকরা নিয়ে আর রঙ ঘেঁটে কিছু সময় কাটাস তা আমি ভারি পছন্দ করি। সলওয়ার আর নাগরা ম্যাচ করতে আমারও কিছু কম সময় যায় না। কিন্তু বেশভূষা সমাপন হয়ে গেলে আবার তার জের টানিস কেন? আমার সাজসজ্জা শেষ হয়ে গেল, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলুম, ফিজিক্সের একখানা বই টেনে নিলুম কিংবা ডি'লা মেয়ার বা রবার্ট ব্রীজেস্-এর একখানা কবিতা বার করলুম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার ভিতর ডুবে গেলুম, তখন আমার মনের অলিগলি খুঁজলেও, নাগরার রঙ কিংবা স্নো এর ভাবনার মেঘবাষ্প খুঁজে পাবিনে—"

সুনীল বলল অথচ মেয়েরা যখন খুব মন দিয়ে ওথেলোর ব্যথা পড়চে কিংবা এমন কথা ভাবচে, যা ভাবতে যেয়ে তাদের চোখের ঘুম গেছে মুছে—সে অবস্থাতেও ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়বে নাকের ওপরকার পাউডার মুছল কি না? কিন্তু সুচিভাই তুই রাগ করিস নে। তোরা আজকালকার মেয়ে, তোদের সামনে যদি সব কথাই না বলতে পারব তবে তোরা আজকালকার মেয়ে হলি কেন?

সুচরিতা একটু হেসে বলল "মা কি আজ সারাদিন বসে খাবার করচেন, আমি দেখে আসি।" সে নীচে নেমে গেল। সুনীল একটু ভেবে বলল "সুচি বোধ হয় রাগ করেচে"।

অমল বলল 'most unscientific রাগ। কেবল মেয়েদের পক্ষেই এ সম্ভব'।

সুধীর বলল 'অমলদা আপনার টয়লেটের থিওরি আমাকে মুগ্ধ করেচে।'

অমল—'করবেই। পরিচ্ছন্ন সুগন্ধ দেহ যে কোন শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের চেয়ে একতিল কম নয়। কিন্তু আজ উঠি কি বল! নীচে মাসীমার সঙ্গে দেখা করব। সুনীলকে যখন তোমরা বাজেয়াপ্ত করে রাখলে তখন প্রায় আসবই।'

৩

অমল চলে গেলে সুচরিতা ফুলদানির একগোছা পাতা নাড়তে নাড়তে বলল সুনীলদা তোমার বন্ধু outrageous এর চেয়ে ভাল বিশেষণ আপাততঃ আমি খুঁজে পাচ্ছিনে।

সুনীল—আমার সেই outrageous বন্ধু যদি তোদের বন্ধু না'ও হতে পারে তাতে তার লেশমাত্র ক্ষতি নেই। কিন্তু ওকথা এখন থাক। আজ ম্যাডান-এ এমিলি জেনিংস্ রয়েচে Betrayal ছবিতে যাবিত চল।

সুচরিতা—তোমার বন্ধু যাবেন না?

সুনীল—না, সে সিনেমা. দেখতে ভালবাসেনা তত। সে হয়ত একলা ওদের ছাদে পাইচারী করচে।

সুচরিতা—তিনি বুঝি একলা থাকতে ভালোবাসেন?

সুনাল—না ওর জীবনের আদর্শ হচ্ছে সমন্বয়ের আদর্শ। ও একলা থাকতে অত্যন্ত ভালোবাসে এবং সজনতাও বিশেষ উপভোগ করে তাই ও বলে মেয়েদের সায়ান্স পড়া উচিত কিংবা এমন কোন জিনিষে ঔৎসুক্য যা নিরতিশয় 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট', তাহলে মেয়েদের অনুভূতিপ্রবণ মনোবেগ এতে করে ভাবসামঞ্জস্য পেতে পারে। এর পর তাদের আলোচনা বন্ধ হ'ল। সুচরিতা তৈরী হতে উঠে গেল।

ফিরবার পথে তখন বারটা কুড়ি মিনিট, কলকাতার রাস্তা কিছু জনবিরল। ওরা তিন জন দোতালা বাসের সামনের দিকে বসে, খুব হাওয়া দিচ্ছে। সুধীর বলল্— 'বেশ লাগছে। সুচি আজ এত সিরিয়াস কেন?'

সুনীল বলল—সুচি তুই যদি আজ সন্ধ্যের কথাবার্ত্তায় কিছু রাগ করেচিস, তবে ভয়ানক ভুল করেছিস। ও মেয়েদের যথার্থ শ্রদ্ধা করে তাই শুধু চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আর হাত থেকে রুমাল পড়ে গেলে কুড়িয়ে দিয়ে সম্মান দেখাতে চায়না। ও বলে মেয়েদের সামনে কথাবার্ত্তায় আমাদের সত্য পরিচয়কে কিছু প্রচ্ছন্ন করে, একটা স্বভাববিরুদ্ধ অতি কোমলতা আনা নিষ্প্রয়োজন। এতে যদি ওরা আঘাত পায় ভালোই। আঘাত না পেলে কেউ ঘাতসহ হয় না। সত্যকে সমস্ত বাহুল্য এবং বিনয় বর্জ্জন না করে দেখলে কেউ স্বাভাবিক হয় না। মনে পড়ে গত বছর ওর ছোট বোন মন্দালিকার জন্মতিথিতে তার বন্ধু এবং বন্ধুনীরা উপহার দিয়েছিল কেউ রুমাল কেউ এসেন্স বড় জোর কেহবা বাংলা সচিত্র 'মেঘদুত'। কিন্তু ও দিয়েছিল দু'খানা বই H. G. Wells এর "The work wealth and happiness of mankind" আর "The Soviet fine-yearplan". সোভিয়েট রাশিয়ার নামে ওর উচ্ছ্বাসের আর অবধি পাইনে।

সুনীল একটা গানের এক লাইন গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে নিজের ঘরে এসে ঢুকল সুচরিতা একটা ছোট সোরাই এবং কাঁচের গ্লাস টি প'য়ের উপর রেখে, আর কিছু দরকার আছে কিনা জিজ্ঞেস করল। সুনীল বল্ল "সুচি ভারি একলা লাগছে, আমার যে বন্ধুকে তোর মনে লাগল না তার কথা কেবলই মনে পড়চে।" সুচরিতা হেসে বল্ল "এইত ঘণ্টা তিন চার তাঁকে ছেড়েচ এর মধ্যেই এত।" সুনীল—"তাতে কি? কিন্তু তাও নয়। সারাদিনের ভিতর দু'বার নিজেকে একান্ত একলা বলে মনে হয়, খুব সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠেই এবং সারাদিনের পর সারাদিনের কোলাহল, সারাদিনের সঙ্গ, এদের কাছ থেকে মনকে আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যখন ঘুমের কাছে সরে যেতে হয়। নয় কি?

সুচরিতা— জানিনে সুনীল দা, জীবনের প্রত্যেক কথা নিয়ে সাইকলজি চর্চ্চা করতে তোমাদের মত পারিনে। কিন্তু আমি একটা লাইব্রেরী থেকে বই নিই, কাল সেখান থেকে আমায় গুটি তিন চার বই এনে দিতে হবে।

সুনীল--আচ্ছা নাম বল। সুচরিতা বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করেছিল। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বল্ল কাল তোমার নিকট এনে দেব।

সুনীল আর সুধীর স্নান করে এসে গল্প করছিল, অমল এসে পড়ল। সুধীর লাফিয়ে উঠে বল্ল অমলদা কাল রাত্রিতে কেবল তোমার কথা মনে পড়েছে। অমল হেসে একটা বেতের চেয়ার টেনে বস্‌ল, বল্ল মনে পড়েছে ত? তা পড়বে। সুধীর জানিস আমি যখন ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়তুম তখন সপ্তাহে চোদ্দখানা করে চিঠি পেতুম। কাদের জানিস? ক্লাসের বন্ধুদের। তাদের সঙ্গে রোজ দেখা হো'ত অথচ তারা রোজ চিঠি লিখত। তা'ও আবার তুমি কেমন আছ? আমি ভাল আছি, soundএর বইটা পাঠিয়ে দিও, অমুক প্রফেসরের নোটটা তোমার খাতা দেখে লিখে নেব, এমন

সোজা চিঠি নয়। ভয়ানক দুর্ব্বার চিঠি, কি রকম কোটেশনে ভরা জানিস কি? "প্রিয় তোমার নিজ হাতে কি দিব দান "প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবি করে—" এই গোছের।

সুধীর—তা অমলদা তাদের দোষ কি তোমার ব্যক্তিত্বের একটা ভয়ানক আকর্ষণ রয়েচে।

অমল—মাথা রয়েচে, তা নয়-আমি দেখতে ভারি সুন্দর রে, আর এই কথাটা তখন করেছিলুম প্রথম আবিষ্কার তার উপর যাদের কাছে প্রথম আবৃত্তি পেলুম তাদের মোহ অটুট রাখতে, তাদের কেবল মিষ্টি কথা বলেচি এত বলেছি, যে চিঠির সংখ্যা আর রূপ ক্রমশঃ Furious হয়ে উঠতে লাগল।

সুধীর ভয়ানক হাসতে লাগল—"সত্যি অমলদা তোমার দেহের সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই। কিন্তু তুমি বড় outrageous কথা বল, আর এই রকম করে কথা বলতে মেয়েদের সামনেও তোমার যদি এতটুকু বাধে। আচ্ছা অমলদা তুমি যে এত সুন্দর এ নিয়ে তোমার মনে গর্ব্ব হয় না?"

অমল—না গর্ব্ব হয় না কিন্তু বড্ড ভাবনা হয়। সুধীর আশ্চর্য্য হয়ে বলল "ভাবনা? কিসের ভাবনা?" অমল—কি করে আরও সুন্দর হব। সুধীর—ও এই ভাবনা, কিন্তু ও ভাবনার উপায় ত তুমি বার করেচ অমলদা, প্রত্যেক মাসে টয়লেটের পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে চল। অমল—শুধু টয়লেটে শাণায় নারে। তুই জানিসনে কিন্তু আমি জানি সৌন্দর্য্যের দায়িত্ব স্বীকার করে নেওয়া মানে হচ্ছে কি করে আরও সুন্দর হব তার সাধনা অহর্নিশি বহন করা। যে সুন্দর তার সংযম কত বেশী বলত? সুধীর হেসে বলল—তুমি যে কত বড় সংযমী তা'ত সবাই জানে। আটটায় ওঠ, দিনান্তে আট পেয়ালা চা খাও। আরও কি কি কর জানতে বাকী নেই। অমলও হেসে বলল—বাকী নেই ত, যাক একটা দিকে নিশ্চিন্ত হলুম। সুচরিতার ছোট বোন সুধীরা একটা ভাঁজ করা কাগজ এনে সুনীলের হাতে দিয়ে বলল "দিদি বয়ের নাম লিখে পাঠিয়েচে বিকেল বেলায় ঠিক নিয়ে আসবে।" সুধীর জিজ্ঞেস করল—"দিদি কি করচে?" 'চপ ভাজছে' অমল বলল 'আজ আমায় খেতে বলবে ত হে?' সুনীল কাগজের ভাঁজ খুলে পড়ছিল মুখ তুলে বলল 'সুচি কি বই আনতে দিয়েছে দেখে ভারি অবাক লাগছে, Maurice Hindus এর 'Broken earth' 'Red Bread'—সুধীর বলল—ও যে দেখছি বড় আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি এখন সোভিয়েট রাশিয়া নিয়ে কোন বই পড়ি নি। অমল বলল—পড়িস নি, তবে পড়েচিস কি? সুধীরা তাদের খেতে ডাকায় তিনজনে খেতে উঠল। খাবার ঘরে মাসীমা পাখা হাতে করে বসেছিলেন, তিনজনে তাঁর সঙ্গে শিষ্টালাপ করল। সুচরিতারও দেখা মিলল সে পরিবেষন করছিল। কয়েক মিনিট পর সুচরিতাকে তাঁর পরিত্যক্ত স্থানে বসিয়ে তার মা উঠে গেলেন জরুরী একটা গৃহকর্ম্ম শেষ করতে। সুচরিতার বই চাওয়ার প্রসঙ্গ ধরে তাদের কথাবার্ত্তার মোড় ফিরল।

অমল বলল—রাশিয়া একটি মাত্র দেশ যেখানে মেয়েরা অননুকরণীয়। তারা সৃষ্টিছাড়া দৃষ্টান্ত। তারা কারো অনুকরণ করে নি এবং এখন পর্য্যন্ত তাদের কেউ অনুকরণ করচে না। রাশিয়া একটি মোটে দেশ যেখানে মেয়েদের কোন প্রকার কাজের জন্যই কেউ অনুপযুক্ত মনে করবে না এবং তারা সকল রকম কাজের দায়িত্ব সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে বহন করচে। তাদের মন স্বাধীন অথচ দেহ পরাধীন এমন অর্দ্ধেক স্বাধীনতার ভূত সেখানে কোথাও পাবে না।

পরাধীনতার বোঝা একমাত্র তাদের দেশের মেয়েদের মাথার থেকেই নেমে গেছে। এর পর রাশিয়ার রাষ্ট্রবিধি এবং সমাজবিধি নিয়ে তাদের আরও কিছু আলোচনা চলল। সুধীর বলল মা উঠে গেছেন তাই, তা নইলে তোমরা এমন নির্ব্বিবাদে রাশিয়ার আলোচনা করতে পারতে না। বাধত। সুচরিতা বলল—মা কেন উঠে গেছেন এবং কেন প্রায়ই তাঁর উঠে যাবার প্রয়োজন এত বেশী হয়ে পড়চে বলত? নিশ্চয়ই তোমাদের রাশিয়ার আলোচনার সুযোগ করে দিতে নয়।

সুধীর নির্লিপ্তভাবে বলল—কেন আবার? কাজের মানুষ একটা না একটা কাজ লেগেই রয়েচে। ইতিমধ্যে আমরা যত খুসী Shocking কথা বলে নিতে পারি শক্ পাবার কেউ নেই। সুচরিতা অন্য দিকে চেয়ে হাসি চেপে বলল তাই হবে বোধ করি। আপাততঃ তোমাদের সৌভাগ্যকে

আমি অভিনন্দন করচি। অমল ভয়ানক কম খায়। তার খাওয়া ওদের চেয়ে অনেক আগে শেষ হয়ে গেল। হাতে জল তুলে দিতে সুচরিতা উঠে দাঁড়াল, অমল হাত ধুতে ধুতে মৃদু স্বরে বলল মা কেন উঠে যান তার কারণ অনেককে জিজ্ঞেস করলেও যাকে বোঝাতে চেয়েছেন সে কি কিছু বোঝে নি। কিন্তু এইত চাই। 'আপনারা এ যুগের মেয়ে। ওযুগের কোন কৌশল আপনাদের বন্দিনী করতে পারবে না। এবং সমস্ত কল আমাদের কাছে ব্যর্থ হবে। সুচরিতার মুখ লাল হয়ে উঠল। পান পাঠিয়ে দেবার ছুতো করে সে সেখান থেকে উঠে চলে গেলে।

৫

সেদিন দুপুর বেলায় মেঘ করেচে, রৌদ্রের দীপ্তি নেই। মেঘাস্তরণের স্নিগ্ধ অন্ধকারে জানালা খুলে দিয়ে সুচরিতা একখানা বই পড়ছিল। প্রায় পড়ছিল না ভাবছিলই বেশী। অমলের কথা মনে পড়ায় মনে হোল আজকের আসন্ন মেঘের এই নিবিড়তা নিশ্চয়ই সে নিঃশেষে উপভোগ করচে। অমলকে দেখে অনেক ভেবেচে। তার দেহ মনের প্রাচুর্য্য যে তার সংযমের এ পিঠমাত্র সেকথা কেমন করে তার নিশ্চয় মনে হয়েচে। অমল নিজেকে ছাড়া সমস্ত দিয়ে কাউকে কোন দিন চাইবে কি না! কে জানে। চাইবে বোধ হয় কেহ যদি তাকে জয় করে। কিন্তু ক'দিন ত তার সঙ্গে আলাপ হয়েচে এর মধ্যে সে ওর রুচির মাঝে নিজের রুচিকে মিশিয়ে ফেল্‌ল কেন? সোভিয়েট রাশিয়ার বিষয়ে তার বই পড়তে এত ঔৎসুক্য কেন? নিশ্চয়ই সেও অমলের মত ওদের চেষ্টাকে অভিনন্দন করে। কিন্তু করে কি? এই ত সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি পড়েছিল' পড়ে ও সম্বন্ধে আরও রাশি রাশি বই পড়বার আগ্রহ হোয়েছিল কি? মোটেই হয় নাই।

কিন্তু রাশিয়ার মেয়েদের নামে অমল অত উচ্ছ্বসিত কেন? সুচরিতা ত পড়ে শুনে সিদ্ধান্ত করেচে ওদের কীর্ত্তিতে এবং আচরণে স্ত্রী জাতিটাই যে নিরভিমান adapt করতে পারে এই কথাই বেশী করে প্রমাণ হয়েচে। ওদের দেশের মেয়েদের জীবনে এখন বিলাস নেই, আরাম নেই প্রাচুর্য্যের সৌরভ নেই, অবকাশের বিরল মাধুর্য্য নেই। গৃহ জীবনে ত এ সমস্ত অসুবিধে সকলকে হাসিয়েচে। কি করবে ওরা! ওদের সারা শক্তি তাই দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করেচে কেউ কি বলতে পারে যদি কোন দিন কমিউনিষ্টিক-ষ্টেট যথেষ্ট সম্পদশালী হয়, তাদের মেয়েরা জানালা খুলে বসে দু'দণ্ড শেলী কিংবা অ্যালডু হাক্সলে পড়বে না? (ওদের দু'জনের লেখা সুচরিতা বড্ড পড়ে) কিংবা কাজ কর্ম্মে একটু ঢিলে হয়ে কোনদিন সূর্য্যাস্তের দিকে মোহাবিষ্ট হয়ে চাইবে না? সুচরিতা যদি রাশিয়ায় জন্মাত স্বতঃসিদ্ধ সে ঠিক রাশিয়ার মেয়ের মতই হো'ত—সুচরিতা কক্ষণো হো'ত না। তখন অমল বিশেষ করে তাকে না হো'ক অনেকের সঙ্গে এককরেও তার কথার গুণগান করত। এবং অনেক নির্জ্জন মুহূর্ত্ত তাদের কথা প'ড়ে কাটাত। কিন্তু সেদিন তাকে বন্দিনী হতে বারণ করে আর্টিষ্টিক ভাষায় অমল তাকে উপহাস করল—প্রায় উপহাসই বইকি। অথচ মা যে কেন উঠে যেতে চাচ্ছেন তাঁর মনের কথার আভাস সেই বা কেন আলজ্জতার সকল সীমা লঙ্ঘন করে বলতে গেল। একটু ভেবে দেখল ওটাও অমলের রুচির সঙ্গে তার রুচি মিশিয়ে ফেলা ছাড়া আর কিছু নয়। অমল ওই রকম outrageously কথা বলে তার শোধ নিতে যেয়ে সে যথেষ্ট outrageous করে কথা বলতে গিয়েছিল। ওর চেয়ারের পাশে একটা টি-পয়ে গুটি কতক রজনীগন্ধা ছিল। অন্য-মনস্ক মনে কখন একটা ফুল তার হাতে এসে গেছে। তার হাল্কা চিন্তার ছোট ছোট টুকরো আপন মনে ভেসে চলেছিল, এমন সময় সুনীল এসে বল্‌ল সুচি অমল এসেছে আমার ঘরে রয়েচে, তাকে এক পেয়ালা চা করে দে।

দুপুর বেলায় বেয়ারা বাড়ী থাকে না। অগত্যা চা তৈরী করে পেয়ালা হাতে সুচরিতা যখন সুনীলের ঘরে ঢুকল তখন সমস্ত মেঘের সমারোহকে প্রশান্ত করে বেশ জোরে বৃষ্টি এসেছে। অমল একে একে জানালার শার্সীগুলো খুলছিল, এতে বৃষ্টির ছাঁটে অর্দ্ধেক মেজে ভিজে গেল, সুনীল বারণ করল না কারণ ও জানে সে বারণ শুনবে না। অমল চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বলল, বৃষ্টির মাঝে একপেয়ালা চা এর চেয়ে আর বেশী আমি কখন কিছু চাইনে। সুচরিতা

চলে যাচ্ছিল, অমল বলল একটু বসুন না। আমার জন্য এত কষ্ট করে এই দুপুর বেলায় চা তৈরী করলেন।

সুচরিতা—কষ্ট আর কি?

অমল—আপনি আমার ওপর রাগ করে রয়েছেন, কিন্তু আপনি ত বেশ মজার লোক, আপনার মা নিজের খেয়াল অনুসারে একটা কথা মন গড়া করে নিয়ে রোজ তাতে পালিশ দিচ্ছেন তাতে প্রমাণটা কি হয়েছে শুনি? নিজের মনকে অন্যের ব্যবহার দিয়ে বিকৃত করতে আছে কি? নিজের ওপরই বা আপনার এত কম বিশ্বাস কেন? সবারই সব রকম মনে করা দিয়ে আপনার মন গড়া হয়নি। আপনার যা খুসী তাই করবেন, তাতে বাইরে থেকে যদিচ কিছু কম প্রশংসা পান ভিতরে তার ক্ষতিপূরণ পাবেন। নিশ্চয়ই পাবেন।

সুচরিতার হাসি পেল। আর কেউ যদি বলত, হয়ত মনে হোতে পারত ultra-modernism সম্বন্ধে একটা লেকচার শোনাচ্ছে। কিন্তু অমলের সৌন্দর্য্যময় ব্যক্তিত্ব ওর স্বাতন্ত্র্যবোধ একদিকে যেমন দীপ্ত তেমনই ওর গভীর সরলতা এখনও ছেলে মানুষের মত। যে বলছে তার মুখের প্রত্যেকটি রেখার সহিত যখন সমস্ত বলাটা মিশে যায় তখন কণামাত্র অসত্যকে সে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে চলে। অস্বাভাবিকের লেশকে টিকতে দেয় না।

সুচরিতা হেসে বলল—আমরা এযুগে জন্মালে কি হবে, ও যুগের আওতায় বেড়ে উঠেচি তাই বোধ করি সামঞ্জস্য হচ্ছে না।

অমল গম্ভীর চিন্তিত হয়ে উঠল, মাথা নেড়ে বলল—তাই বটে, আপনাদের দোষ কি? আমাদের মা এবং আমাদের মধ্যে এক যুগের ব্যবধান দাঁড়িয়ে গেছে। এবং মেয়েদের বেলায় মায়ের আওতা ছেড়ে বেড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আপনি, আপনার মেয়েকে এমন বিপদে ফেলবেন না যেন কক্ষণো। তার অতি চিন্তিত বিজ্ঞপ্রায় সমাধান শুনে সুনীল ভয়ানক হাসতে লাগল। সুচরিতা হাসি চাপতে না পেরে উঠে গেল।

৬

এর দিন দুই পর অমল চলে গেছে। সুনীল তাদের পূজোর ছুটির বাকী কয়েকটা দিন কলকাতায় থেকে যাবে বলে ওর সঙ্গে গেল না। সেদিন ডাকে সুনীলের নামে অমলের একখানা চিঠি এসেছে। সুনীল একবার দাঁড়িয়ে একবার ইজি চেয়ারে শুয়ে নানারকম করে চিঠিখানা বারকতক পড়েচে। এইবার সুধীর ও সুচরিতাকে ডেকে শোনাতে বসল। তার একান্ত ভালোবাসার ভিতর দিয়ে তার বন্ধুর কথা অহর্নিশি শুনে শুনে সুধীর আর সুচরিতাও তাদের বন্ধুত্বের অংশ পেতে উৎসুক হোত। অমল লিখেছে—

বন্ধুহে—

এখানে ঘনঘোর বর্ষা পড়েচে। তুমি ভাবচ আমি কি করছি, হয়ত মেঘ দেখে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' খুলে বসেচি। কিন্তু তা নয়। ফ্রেঞ্চের কঞ্জুগেসন্ মুখস্থ করছি। ইউরোপ যাবার আগে ফ্রেঞ্চখানা আমাকে ভালো করে শিখতেই হবে। জানালা দিয়ে প্রচুর বৃষ্টির ছাঁট আসচে এবং মেঘের ঘনস্তূপ চোখে পড়চে। কিন্তু কি হয়েছে জান, একটা নীরস বস্তু পড়চি বলে বর্ষার আবেশ আমাকে লেশমাত্র কম মুগ্ধ করচে না। আমার মনে হয় জীবনে সামঞ্জস্যের চেয়ে বড়ো আনন্দ আর কিছু নেই। কঠিনের সঙ্গে কোমল, কাজের সঙ্গে বিশ্রাম এবং সৌন্দর্য্যের সঙ্গে প্র্যাক্টিক্যালকে মেশাতেই হবে। আমের মাঝখানে শক্ত আঁটি রয়েচে বলেই, সরস এবং কোমল বস্তু ওর চারিদিকে আশ্রয় করে ওকে একটা সম্পূর্ণ ফলের আকার দিয়েছে। আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যপিপাসার যে আকুলতা বর্ষার মেঘে, নির্জ্জন আলোক সিক্ত গঙ্গার দৃশ্যে ক্ষণে ক্ষণে মথিত হয়ে উঠচে, তাকে কি কেবলই হৃদয়াবেগের বেদীতে বসিয়ে কর্ম্মহীন স্বপ্ন দিয়ে ধূপ দেব? তা যদি দিই তবে সে ধূপের বাষ্পে জীবন হবে নিষ্ফল, স্বপ্ন যাবে দু'দিনে আবেশের ভিতর মিলিয়ে। আমার কাছে কাজ এবং স্বপ্ন একই জিনিষের এপিঠ ওপিঠ। বর্ষা দেখে কেবলই যদি 'উত্তর মেঘ' আওড়াই তবে তরলতাকে আরও তরল করব। তাই বর্ষার আবেগকে মনের মাঝে প্রগাঢ় করে আশ্রয় দিতে তোমাকে চিঠিখানা লিখে রেখে আমি কঞ্জুগেসন মুখস্থ করব। এমন কি A. G. Wells এর currency র ওপর অধ্যায় খানাও খুলে বসতে পারি। আমার মনে হয়, আমরা কেন ব্রতযাপনের মত করে দিনযাপন করিনে, তা যদি করতুম

তবে একেবারে সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থানে যেয়ে প্রবেশ কর্ত্তেম। কারণ সৌন্দর্য্যই হোল সামঞ্জস্য এবং সংযমের পরিণয়। বাইরে থেকে মনে কর আমি অফুরন্ত বেড-টি খাই, বেশ-ভূষায় প্রগল্‌ভ্‌ কিন্তু আমার মানসিক জীবনকে কি দেখেচ? আমার মন নিরবচ্ছিন্ন একক। সঙ্গহীন শূন্যতায় সে ধ্যান করচে। যদি প্রশ্ন কর কার? সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একান্ত তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে প্রতিনিয়ত অজস্র করে যা পাচ্ছি, কি করে তার ঋণ শোধ করব। কি করে করব? এর একমাত্র উত্তর আমার কাছে আছে, দেহে এবং মনে ও চিন্তায় আরও সুন্দর হ'য়ে। আমার ধ্যান তাবই।" সুধীর বিস্মিত হয়ে শুনছিল, কিছুক্ষণ পর একটু হেসে বলল এ বয়সে আমরা যা ধ্যান করচি অমলদা তার কাছ দিয়েও ঘেঁষেনা। সুনীল বল্‌ল তাই আমার মনে হয় যখন ঘেঁষবে তখন ওর যা আছে সমস্ত নিয়ে যাবে।

তারপর দিন আর একবার পড়তে যেয়ে অমলের চিঠি-খানা কেতাবের টেবিলে খুঁজে পাওয়া গেলনা। বেয়ারাকে ডেকে সুনীল সন্ধানের চেষ্টা করেচে। কিন্তু তার গোলমাল কথার থেকে যেটুকু আবিষ্কার করা গেল তাতে ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া বিচিত্র নয়।

সুনীল নিরস্ত হয়ে এমনই উত্তর লিখতে বসল। দিন কুড়ি পরে সুনীল তার সুটকেস্‌ গোছাচ্ছিল, কাল যাবে। সুধীর নির্বাতিশয় উত্তেজিত হয়ে একখানা খবরের কাগজ হাতে করে ঢুকল। সুনীলদা তোমাদের পরীক্ষার রেজাল্ট বার হয়েচে তুমি ফার্ষ্ট ডিভিশনে, কিন্তু অমলদা কি হয়েচে জানো কি? বি-এ, বি-এস-সি, মিলিয়ে ফার্ষ্ট। আচ্ছা কি করে হোল? আমিত ধারণাও করতে পারিনে যে অত কাব্য করে চিঠি লেখে সে হয় ফার্ষ্ট। আচ্ছা অমলদা নোট মুখস্থ করত? বলনা কোন সাবজেক্টে করত কি? সুনীল তার প্রচুর প্রশ্নের উত্তরে হাতের কাপড়গুলো নির্দ্দয়ভাবে মাটির ওপর ফেলে দিল। অত্যন্ত আনন্দের উত্তেজনায় টুথব্রাস রাখা আর সার্ট ভাঁজ করা তার কাছে যারপর নাই অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছিল। সুচরিতা ঘরে ঢুকে মাটিতে কাপড় জামার স্তূপের কাছে বসে বল্‌ল 'সুনীলদা তুমি কষ্ট করে সুট কেশ গোছাচ্ছ, আমাকে ডাকতে নেই কি ভাই? সুনীল তার হাত থেকে ওসব কেড়ে নিয়ে বল্‌ল, সুচি এখন ও থাক, তুই শীগগীর চা কর। সুচরিতার অবাক মুখের দিকে চেয়ে আবার বল্‌ল জানিসনে বুঝি কিরকম সুখবরটাই না আছে, অমল য়ুনিভার্সিটিতে ফার্ষ্ট হয়েচে। ও যদি এখানে থাকত সবচেয়ে প্রথমে বলত 'সুচরিতা এক পেয়ালা চা করে খাওয়াও।' সুচরিতা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, অমল তাই বলত কি? বলত হয়ত। "ও ত এখানে নেই তাই আমরা তিন জনে গোল হয়ে বসে ওকে উদ্দেশ্য করে চা খাব।" সুধীর বল্‌ল 'The idea' দেখচিস সুচি অমলদার কাছে থেকে ও কি রকম brilliant হয়েচে? সুনীল হেসে বলল আমার যে কালে ভদ্রে একটু প্রশংসা করবি তাও পুরো করবিনে।

৭

সুনীল চলে গেছে। তার যাবার পর প্রায় মাসখানেক হোল। আজ সুধীরকে একটা চিঠি লিখেচে সে অমলের কথায় ভর্ত্তি। অমল এই সামনের ভাদ্র মাসে বিলেত যাচ্ছে দু'সপ্তাহের মধ্যেই তারা কলকাতা আসবে।

সুচরিতার নির্জ্জনতার ওপর আসক্তি যেন কিছু বেড়েচে। ও যখন আজকাল চা তৈরী করে তার রঙ হয় সোণার মত। চায়ের টেবিলে অজস্র কম্‌প্লিমেন্ট পায় অথচ নিঃশব্দে থাকে। তার পড়ার ঘরের সজ্জা বিরল সৌন্দর্য্যে এত চমৎকার হয়েচে। কেবল বই রাখবার জন্য একটা মাঝারি গোছের টেবিল এবং বাকী সবটা মুড়ে একটা সাধাসিধে সতরঞ্জ বিছানো। মাটিতে বসেই সে পড়াশোনা করে।

সেদিন বিকেলের দিকে তখনো সূর্য্য পুরোপুরি অস্ত যায়নি সুচরিতা পশ্চিমের দিকের জানালার কাছে নতজানু হয়ে বসেছিল, সূর্য্যাস্ত দেখছিল কি? ওর জানালা দিয়ে পার্কের সবুজ গাছপালার অনেকখানি চোখে পড়ছিল এবং রাস্তার পাশ দিয়ে ইলেকট্রিকের যে তার গিয়েছে তার থেকে কিছুকাল পূর্ব্বের বৃষ্টিবিন্দু ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ছিল। হাতে ছিল তার গুটিকতক সদ্যঃ ফোটা বেলফুল।

হঠাৎ নীচের তলা থেকে সুনীলের গলার আওয়াজে মাসীমা, মাসীমা ডাক শোনা গেল। সুচরিতা হাতের

জলভারনম্র ফুলগুলি বিশেষ করে শেলীর কাব্যগ্রন্থের ওপর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মাসীমা ইতিমধ্যে সুনীলকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে এবং সুচরিতার ঘরের দ্বারপ্রান্তে অমল দাঁড়িয়ে রয়েচে দেখতে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। সুচরিতাকে দেখে বললেন, ওদের নিয়ে বসাগে আমি এক্ষণি আসচি। তিনজনে এসে সুচরিতার ঘরেই বসল। অমলকে অত্যন্ত রোগা দেখাচ্ছে।

সুচরিতা প্রশ্ন করল "আপনার শরীর কি সুস্থ নেই?" সুনীল বলল ওর বেশ পাকা করে ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'য়েছিল, বৃষ্টি দেখে যে ঘরের ভিতর ছটফট করে কিছুতেই থাকতে পারে না তার যা হওয়া উচিত তাই হয়েচে। অমল বলল "সুনীল ওনিয়ে ত বার দশেক বকেছিস আর না। কিন্তু আপনাকেও ত বিশেষ ভালো দেখাচ্ছে না।" সুচরিতা বাইরের দিকে চেয়ে ছিল বলল "না আমার কিছু হয় নি।" "তা ছাড়া আপনার ঘরের সোফা চৌকি টিপয় ওরা সব গেল কোথায়? মুনিঋষির আশ্রম বানিয়ে তুলেচেন যে দেখছি। কিন্তু দেখুন মজা আপনার পড়ার ঘরে এসে মনে হচ্ছে ঠিক যেন আমার ঘরটিতে ঢুকেছি। আমার ঘর ঠিক এমনই। এর চেয়ে একটিও বেশী জিনিষ নেই।" সুনীল টেবিলের ওপর একখানা কেতাব দেখছিল। হঠাৎ একখানা চিঠি দেখে বলল "অমলের চিঠি যে দেখচি, কবে লিখেছে? তারপর পড়তে যেয়ে রেখে দিয়ে বলল না অমলের চিঠি ত নয়, সুচি তোর কোন এক বন্ধুনীকে লিখেছিস। কিন্তু হোল কি করে? আমি শুধু প্রশ্ন করব হোল কি করে?" সুচরিতা বলল "সুনীলদা কি বলছ লেশমাত্র বুঝতে পারচিনে।" "বুঝতে পারবার কথাও নয়। অমলের হাতের লেখার মত, তোর লেখা অবিকল এক চো'ল কি করে? দূর থেকে দেখে আমি ওর চিঠি মনে করেছিলুম। সুচরিতা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে র'ইল। তার লেখা যে এই কমাসে অমলের লেখায় রূপান্তরিত হয়েচে তা কি সে জানে? সত্যিই জানি না ত। অমলের দিকে চেয়ে দেখল সে নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে আছে। অমল উঠে পড়ে বলল, "সুনীল সোমবারে ত আমাকে বম্বে যেতে হবে। কিন্তু শরীরের ক্লান্তি যে এখন গেল না। পোষাক আর কেতাব আর খুঁটিনাটি যা কিনতে হবে সব করে দিস্। আমি আর পারব না" সুচরিতা বলল "আমার একটা কথা শুনবেন?"

"বলুন?" "অত চা খাবেন না, আর বৃষ্টির ছুঁট গায়ে লাগাবেন না বেশী।" "কিন্তু ও যে আমার পক্ষে শাস্তি।" "আপনার মন যে দেহকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, দেহ কি আপনার মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারছে? বিশ্ববিধানে সামঞ্জস্য করে বেড়াচ্চেন আর নিজের জীবনে এত বড়ো অসামঞ্জস্য।"

তাই ত সামঞ্জস্য! অমল গভীর চিন্তিত হয়ে উঠল। "যা বললেন তা কি সত্যি?" "সত্যি কি না আয়নার কাছে দু'মিনিট দাঁড়ান। আমার বলবার প্রয়োজন হবে না।" "আপনি যা বললেন পালন করতে খুব চেষ্টা করব। কিন্তু এ দেশ ছেড়ে যদিও বহুদিনের জন্যে যাচ্ছি, আজ আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে।" অমল দরজার কাছ অবধি গিয়েছিল ফিরে দাঁড়াল। তার ক্লান্ত পাণ্ডুর মুখ হাসিতে দীপ্ত হয়ে উঠেচে। "কেন জানেন! আজকাল দেখছি আপনি আমার সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা বলছেন। আচ্ছা মনে করুন ত এর আগে এ জিনিষ কত চেয়েছি তবু পাই নিই। না পেয়ে মন খারাপ হয়েছে, রাগের মাথায় লেক্‌চার দিয়েছি তবু পাইনি। এখন হয়ত মনে করেচেন এ'ত চলেই যাবে মিথ্যে এর মন খারাপ করে কিই'বা আর হবে?" সুচরিতা আস্তে আস্তে বলল আপনার মন খারাপ হ'লে সহ্য করতে পারি কিন্তু দেহ খারাপ হ'লে বোধ হয় পারি নে।" ইতিমধ্যে সুধীর ম্যাচ ফেরত বাড়ীতে পা দিয়েই সুনীলের কাছে অমলের আসার কথা শুনে বজ্রবেগে তার অভিমুখে আসছিল। তার হাত ধরে অজস্র কথার স্রোতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে যেতে অমল যেটুকু উদ্ধার করতে পারল তা এই যে শ্রীগঙ্গীর ছাদে চলুন সেখানে টেবিল পেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে মা বসে আছেন। এবং সুনীলদা এর ভেতরই বেশ আসর জমিয়ে সিঙ্গাড়ায় কামড় দিয়েচেন।

সোমবারের বম্বে মেলে অমল চলে যাবে। তার বাবা ও ছোট বোন মল্লালিকা কলকাতায় এসেচে তাকে ট্রেণে তুলে দিতে। বিকেলের দিকে ট্রেণ তাই ন'টার সময় ওরা দু'জনে এ বাড়ীতে দেখা করতে এসেচে। অমল আজ

অনেকদিনের মত শেষবার লুটিয়ে কাপড় পরেচে। ঢিলে পাঞ্জাবী গায়ে দিয়েছে। আর সকাল থেকে জলে ভরা হাওয়া দিয়ে শীত শীত করচে বলে কমলালেবুর রঙের একটা শাল গায়ে জড়িয়েছে। সুচরিতার মা বাড়ীতে ছিলেন না মার্কেটে গিয়েছিলেন কয়েকটা জিনিষ কিনতে। সুচরিতার দেখা পাওয়া গেল তার পড়ার ঘরের এক কোণে। সুধীরকে সঙ্গে নিয়ে সুনীল ওর বন্ধুর জুতো কেনার কাজ সারতে গেল। ওকে সেধে ছিল সঙ্গে যাবার জন্যে বিশেষ করে সুধীর —এতখানি রাস্তা অমলের সাথে গল্প করতে করতে যাবার প্রলোভন দুরন্ত, কিন্তু ওকে পাওয়া গেল না। দুজনে চুপ করে বসে রয়েচে ঘড়ীতে দশটা বাজল।

অমল জিজ্ঞেস করল "সুচরিতা আমাকে কিছু বলবে?" সুচরিতা চোখ নামিয়ে বসেছিল কিছু কি সে বলবে?

অমল বলল "তোমাকে একদিন আমি দেখেচি, এবারে যেদিন আমি প্রথম এসেছিলেম। ক্লান্ত শরীর নীচে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল, সুনীলকে পিছনে ফেলে আগেই উঠে এলুম। তোমার এই ঘরের ওই জানালার কাছে নতজানু হয়ে তুমি, হাতে, বেলফুল। অর্দ্ধেক ভেজান দুয়ার দিয়ে তোমাকে দেখা যাচ্ছিল। আমি নিঃশব্দে ছিলুম জানতাম শব্দ করলে 'সে তোমাকে' দেখতে পাবনা। তুমি আর কিছু বো'লোনা তোমার সমস্ত বলা সেদিন আমি শুনতে পেয়েছি। সুচরিতা, অজস্র সঙ্গের মাঝেও যে একা তার একাকীত্বকে তুমি ভাঙ্গলে কেন? তোমাকে সেদিন যে দেখেছি তারপর কিছুতেই আমি একা থাকতে পারচিনে।"

সুচরিতা অস্ফুট স্বরে বলল "কিন্তু আমাকে ত' তুমি ভুলে যাবে।" "তার উত্তর আজ দেবনা। কিন্তু বল আমাকে আমি ভুলে গেলেই কি তুমি একেবারে হারিয়ে যাবে? তোমার প্রতিদিনের জীবনে এমন কিছু সৃষ্টি করে চল যার দাম আমাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলেছে এমন কি তোমার সুখদুঃখকেও ছাড়িয়েচে। আমি যদি ভুলে যাই, তোমার যদি আর মনে না'ও পড়ে, আমাদের 'একান্ত ব্যক্তিগত জীবন যদি বিলীন হয়ে যায় তবু সমস্তকে ছাপিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে। থাকবে না কি?"

অমলের সুমুখে রবীন্দ্রনাথের মানসী খোলা ছিল। হাওয়ায় তার পাতা ওড়াতে ওড়াতে "আশঙ্কা" কবিতায় এসে থামল। একজায়গায় দাগ দেওয়া ছিল।

"সকল গান, সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি-ঠাঁই।
সকল পেয়ে তবুও যদি
তৃপ্তি নাহি মেলে,
তবুও যদি চলিয়া যাও
আমারে পাছে ফেলে
নিমেষে সব শূন্য হবে
তোমারি এই আসন ভবে
চিহ্নসম কেবল রবে
মৃত্যু রেখা কালো—"

অমল চিহ্ন দেওয়া এই ক'টি লাইন জোরে পড়ল। "সুচরিতা কবির ভাষাকে নিজের মনের ব্যথা দিয়ে চিহ্ন দিয়েচ। একি তোমার আশঙ্কা? কিন্তু কে বললে তোমাকে যে এই সত্য। আমি যদি ভুলে যাই তবে তুমি কি অন্ধকারে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে? তাকি হয়? আমারও যে এই সকলের চেয়ে বড় আশঙ্কা। তোমার মধ্যে সেদিন আমি একমুহূর্ত্তের মধ্যে যাকে দেখেছি, সেকি সব আমার জন্যে? তাকি হতে পারে? সে আমার চেয়ে ঢের বড়। সে আমার মনে রাখা না রাখাকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গেছে। তোমার মধ্যে যা আছে, তাকে তুমি জাগাবে না কি? আমি হয়ত কেবল তার উপলক্ষ্য মাত্র।"

সুচরিতা বলল "এইবার তুমি চুপ কর। তুমি যদি উপলক্ষ্য হও, তবে লক্ষ্য পাব কোথা? আমি অনন্ত ভবিষ্যতের আস্বাদ পেতে চাইনে। তোমার মুখে ওসব বড় বড় কথা শুনতেও আমার ইচ্ছে করেনা। আমার ছোট কথা শোন। চা খেওনা বেশী। রাত্রিতে তোমার ঘুম দরকার একথা তোমার চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পেরেচি। যতখুশী এমার্সনের 'transcendentalism পড় এবং রাসেলের Mysticism and logic পড় কেবল বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগতে লাগাতে পোড়না। জান তুমি অনিয়ম করলেই ইনফ্লুয়েঞ্জা আবার relapse করে। জানোনা? এত জান আর এই দারুণ সত্যটা জাননা।"

গেটের কাছে মোটরের অধীর হর্ণ শোনা গেল। অমল উঠে দাঁড়াল দুয়ারের কাছে এসে একবার মাত্র ওদের পরস্পরের হাত আবদ্ধ হয়ে গেল।

সুচরিতা ওর চোখের দিকে চেয়ে বলল "আমাকে' কি তুমি ভুলে যাবে?'

অমল তার করতলে আবদ্ধ করপল্লবের ওপর একটুখানি চাপদিয়ে তখনই তা ছেড়ে দিয়ে, আস্তে আস্তে বলল "একথার জবাব কি দু'মিনিটে দেওয়া যায়? কতক্ষণ সময় লাগে বলত! সমস্ত জীবন ধরেই কি এর উত্তর তোমাকে আমার জোগাতে হবে না?" সিঁড়ীতে দু'চার জোড়া ব্যগ্র পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।

শ্রীআশালতা দেবী

বৰ্ত্তমান কালের প্রত্নতত্ত্ব চর্চ্চা

রায় বাহাদুর—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ, ডি-লিট্

ইংরেজাধিকারের প্রথম যুগে যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের প্রথম চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের শীর্ষ স্থানীয় রাজা রাজেন্দ্র লাল। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ইংরেজগণের কোন দান আমাদের পক্ষে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ? তবে উত্তরে বলিব—রেল গাড়ী নহে, বিজলী বার্ত্তা নহে, বাষ্পীয় পোত নহে—টেলি ফোঁ, বা এরিওপ্লেন নহে, মুদ্রাযন্ত্র নহে। এ সকল বাহ্য আসবাব এবং যানাদিদ্বারা আমাদের ভোগ বিলাস ও গতি-বিধির সুবিধা হইয়াছে-তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু "ইহা বাহ্য আরো কহ"—ভিতরকার লাভ আমাদের কি হইয়াছে? আমরা বাঙ্গালীরা কি বাষ্পীয় পোত নির্ম্মাণ করিয়া বিলাতী জাহাজ নির্ম্মাতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিয়াছি। কিন্তু এক সময়ে চট্টগ্রাম তমলুক ও সপ্তগ্রামে বাঙ্গালীরা যে বাণিজ্যতরী নির্ম্মাণ করিত তাহা জগতের বিস্ময় ছিল। আমরা বৈজ্ঞানিক নিত্য নব আবিষ্কারের মধ্যে একবারে নিশ্চেষ্ট জড়ভরত হইয়া আছি। হাঁ করিয়া বিলাতি বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা গুলি দেখিয়া যাদুবিদ্যার দ্বারা এই সকল সৃষ্ট হইয়াছে—ভারতবর্ষের পনের আনী লোক বিমূঢ় হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া মিউজিয়ামের নাম দিয়াছে—'যাদুঘর'। এই নামকরণটি এদেশীয় লোকের একবারে পশুবৎ বিমূঢ় হইয়া যাওয়ার নিদর্শন। সিনেমা, গ্রামোফোন প্রভৃতি দেখিবার জন্য যখন সহস্র সহস্র লোক ধাবিত হয়—তখন আমার ঘৃণা হয় যে এদেশের লোকের তো এই সকল ব্যাপারে কোন কৃতিত্বই নাই। যাহারা কৃতী, তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠা ও অর্থসংগ্রহ। আমাদিগকে ভেড়া বানাইয়া তাঁহারাই তো মজা দেখিতেছেন ও গরীব দেশ হইতে দুই হাতে পয়সা কুড়াইতেছেন। পূর্ব্বে যে যাত্রা হইত, কবির লড়াই হইত, কীর্ত্তন হইত—তাহার সবটুকু খ্যাতি অখ্যাতি যে বাঙ্গালীরই ছিল। দেশীয় মৌলিকত্ব একবারে গিয়াছে। যাহারা মসলিন তৈরী করিত সেই অজ্ঞ ও মূর্খ তন্তুবায়দের দেশের শিক্ষিত লোকেরা মোটা খদ্দর বানাইয়া 'বাহাবা' লইতেছেন। একমাত্র জগদীশ চন্দ্র ও প্রফুল্ল চন্দ্র এ দেশের বিজ্ঞান মন্দিরে দুইটি মেটে দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন, নতুবা "পরদীপমালা নগরে নগরে। তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

বৈজ্ঞানিক দান এদেশে ইংরেজদের প্রধান দান নহে, উহা আমাদিগের বিমূঢ়তাকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে মাত্র। ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে জাপান এই বিষয়ে য়ুরোপের নিকট হইতে প্রকৃতই এই দান পাইয়াছে, ৪।৫ বৎসরের মধ্যে আফগানিস্থান এই দান গ্রহণ করিয়াছে। আজ ১৭৫ বৎসরের মধ্যে এশিয়ার মধ্যমণি ভারতবর্ষ সেরূপ কিছু পাইল না। আমরা কি কাবুলীওয়ালাদের অপেক্ষাও বর্ব্বর?

সুতরাং ইংরেজের নিকট আমাদের ঋণ সে দিক দিয়া নহে। তথাপি ইংরেজ আমাদের এই যুগের গুরু। এই কয়েক শতাব্দী যাবৎ আমরা অন্ধ ছিলাম—ইঁহারা আমাদের চক্ষু দান করিয়াছেন। এ দান বড় সামান্য দান নহে, যেহেতু মানবের পক্ষে চক্ষুর মত ধন নাই, সেই ধনে ইংরেজেরা আমাদিগকে ধনী করিয়াছেন। আমরা জানিতাম না যে এ দেশে অশোক নামে এক রাজা ছিলেন, এই বাঙ্গলা দেশে যে পাল রাজারা রাজত্ব করিতেন, এমন কি দীপঙ্করের মত দেবকল্প ব্যক্তি যে বিক্রমপুরে জন্মিয়াছিলেন,—বুদ্ধদেব যে কপিলাবস্তুর রাজকুমার এ সকল কথাও আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। খাড়িমণ্ডলের জটার দেউল নালেন্দা ও বিক্রমশীলার অদ্ভুত কারুকার্য্য, এ সমস্ত হয়ত নিকটবর্ত্তী স্থানেই ছিল কিন্তু তাহা দেখিবার চক্ষু আমাদের ছিল না। দেশের ইতিহাস দেশীয় ভাষায় দেশীয় অক্ষরে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ

লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সেগুলি পড়িবার প্রবৃত্তি ও শক্তি আমরা উভয়ই হারাইয়াছিলাম। অন্ধ যেরূপ স্বীয় যষ্টিখানির উপর নিঃসহায়ভাবে নির্ভর করে, আমরা নিজের শক্তির উপর তেমনই বিশ্বাস হারাইয়া দৈব ও অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম। একদিকে পৈতা হাতে লইয়া অভিশাপে জগতকে পোড়াইয়া ফেলিবার স্পর্দ্ধা করিতাম, অপর দিকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা কিছু অপূর্ব্ব বা আশ্চর্য্যরূপে সম্পাদন করিয়াছেন তাহাই বিশ্বকর্ম্মার হাতের কাজ এই ব্যাখ্যা করিয়া মানুষের অকর্ম্মণ্যতা ও দেবতাদের গৌরব ঘোষণা করিতাম।

ইংরেজেরা সোনার কাঠি ছোয়াইয়া আমাদের চক্ষে দৃষ্টি দান করিলেন। কূপের দর্দ্দুর দরিয়ার সন্ধান পাইল, অকস্মাৎ সমস্ত ভারতবর্ষের মানচিত্র তাহার বিরাট অতীত ঐশ্বর্য্য লইয়া ঝলমল করিয়া আমাদের চক্ষের সামনে দাঁড়াইল। অনাথ বালক তাহার হারানো মাতাকে ফিরিয়া পাইল—এদানের ঋণ অপরিশোধনীয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যাঁহারা ইংরেজীর প্রভাবে প্রথম চক্ষু উন্মীলন করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র। বঙ্কিমবাবু ঝুড়ি ও খন্তি হাতে নিজে এই ক্ষেত্রে নামেন নাই, কিন্তু তাঁহার প্রেরণা বহু বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তিকে এক্ষেত্রে উদ্বোধিত করিয়াছে। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্র নাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নিখিল নাথ রায় প্রভৃতি সকলেই অল্প বিস্তর সেই প্রেরণার ফল স্বরূপ। ইঁহারা যে পরিশ্রমে এই কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। দীঘাপাতিয়ার কুমার প্রাতঃস্মরণীয় শরৎ কুমার রায় বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্বের সন্ধানে অর্থ ও শ্রম অকুণ্ঠিত ভাবে ব্যয় করিতেছেন। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে শয্যা বিলাস ত্যাগ করিয়া পাঠাগারে নিশি যাপন করিয়া থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হেমচন্দ্র চৌধুরী, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচি, রাধাকুমুদ ও রাধাকমল প্রভৃতি বহু তরুণ পণ্ডিত প্রবীণোচিত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

আজ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" * নামক পুস্তকখানি হাতে লইয়া এতগুলি কথা বলিবার প্রবৃত্তি হইল। কলিটি দেখিয়া যেরূপ ফুলটি কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করা যায়, এই তরুণ অধ্যবসায়শীল লেখকের বইখানি পড়িয়া তেমনই একটি পরিণতির আশা পাইলাম। ব্রজেন্দ্র বাবু উপাধানে শির রাখিয়া আকাশের তারা, দক্ষিণা হাওয়া বা মলয় সমীরের বার্ত্তা ছন্দোবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে জানান নাই, অথবা ইংরেজী গল্প হইতে প্লট চুরি করিয়া সস্তা দরের ভাষা পেলবের জোরে শীলতার আবরণ নির্লজ্জভাবে খুলিয়া ফেলিয়া নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখান নাই। তিনি কোন ডাক্তার উপাধিগ্রস্ত অধ্যাপকের মত ২৫ বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাস ভাষার জোরে ফেনাইয়া ধাউস ঘুড়ির মত উড়াইয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন নাই। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের ১০০ বৎসর পূর্ব্বের একটা ছিন্ন পত্রের সন্ধান দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে রীতিমত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তিনি এক অক্ষৌহিণী লেখকের ভিড় ঠেলিয়া তরুণ বয়সে আসিয়া পুরোভাগে দাঁড়াইয়াছেন। এই পুস্তকখানিতে দেশের সাময়িক বহু মূল্যবান কথা আছে, যাহার স্মৃতি বাঙ্গালী পাঠকের মনে জাগাইয়া দিয়া লেখক আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বাঙ্গালীর একশত বৎসরের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, সাহিত্য ও সমাজের যদি একখানি নিখুঁৎ ছবি আপনারা দেখিতে চাহেন, তবে এই বহিখানি পাঠ করুন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে নূতন হলধর আসিয়াছেন, তাঁহার হাতের ফসল, যাহার নমুনা পাইতেছি, তাহাতে বহু আশা মনে হইতেছে। ইঁহার পার্শ্বে আর একজন লাঙ্গল লইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অক্লান্তকর্ম্মা, প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারে নিবেদিত জীবন, সংসারের সর্ব্ব প্রকার আকর্ষণে বিমুখ নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, ব্রজেন্দ্রবাবুর সহায়তা করিতেছেন। উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফলে অনেক কিছু পাইব বলিয়া আমরা আশা করি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

* সংবাদপত্রে সে কালের কথা (১ম খণ্ড)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। মূল্য ২।০। কলিকাতা ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির হইতে প্রকাশিত।

দুঃসাহস

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য এম্-বি

আমার একজন ছেলেবেলাকার অন্তরঙ্গ বন্ধু আছেন। তিনি এখন বিদেশেই থাকেন। কালেভদ্রে এক আধবার দেখা দেন,—তখন আমার প্রাণে যেন উৎসব লেগে যায়। কত নূতন খবর, কত পুরাণো স্মৃতি, কত কথাই হয়! সেদিন এই বন্ধুর কাছে এক মজার গল্প শুনলাম।

অনেককাল পরে সেদিন তিনি এসেছেন। কি কথায় কথায় বিবাহের সুখের থেকে ক্রমে সৌন্দর্য্য বোধের কথা এসে পড়েছে। বিবাহ করে আমরা যে সুখের সরঞ্জাম বাঁধি, সুখ তাতে কৈ মেলে? টাট্‌কা ফুলের তোড়ার মত প্রথম দিন-কতক লাগে ভাল, তারপর থেকে কেবল বাসি ফুলের বোঝা টেনে বেড়ানো।

আমি বলছিলাম—আমার কথাটাই দেখ। বিয়ের প্রথম অবস্থায় কত কাব্যই করা গেছে! এখন কোথায় বা সৌন্দর্য্যবোধ, কোথায় বা সেই প্রেম! টাকার টানাটানি আর খুকীর সর্দ্দি ছাড়া পরস্পরে বলবার আর কোনো কথাই থাকে না। আসলে সৌন্দর্য্যবোধই বল আর প্রেমই বল, ও সব মাত্র আধঘণ্টার মোহ, নূতন পুতুল পেলে ছেলেদের যা হয়। পাঁচজনে মিলে জিনিষটাকে অযথাই বড় করে তুলেছে

বন্ধু বল্লেন—"তুমি একেবারে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চলে গেছে। সৌন্দর্য্যবোধ আর প্রেম আর স্বামী-স্ত্রী-প্রণয় সব এক করে ফেল্‌লে। নিছক সৌন্দর্য্য কি তুমি উপভোগ কর না? সৌন্দর্য্য দেখ দূর থেকে। স্ত্রীটিকে তো দখল করে বসেছ,—চসমা জোড়াটার মত নিত্য তাঁকে ব্যবহার কর,—তাঁর মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখতে পাবে কেন? যাকে ধরে এনে গৃহিণী করেছ,—সে আর এখন কবির উর্ব্বশী নয়,—তার মধ্যে রমণীটিকে খুঁজে পাবে না। দূর থেকে শোনা বাঁশীর আওয়াজের মত, বন থেকে আসা কাঁঠালি চাঁপার গন্ধের মত রমণী-সৌন্দর্য্য দূরের অস্পষ্টতার মধ্য দিয়েই উপভোগ করতে হয়। ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনবার নয়,—ছুঁতে গেলেই তার ডেলিকেসি নষ্ট হয়। একটা উপমা দিয়ে বলি। মনে কর পথে যেতে যেতে বাতাসে পেলে আম্রমুকুলের গন্ধ। মনটা গন্ধে ভরে গেল, চেয়ে দেখলে বাগানের গাছে আমের মঞ্জরী ভরা। ছাতার বাঁট দিয়ে কয়েকটা মঞ্জরী ছিঁড়ে নাও। আশা কর যে গন্ধটা অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যাবে। কিন্তু তা হয় কি? তেমন গন্ধটি এতে পাওয়া যায় না। যিনি বাগানের মালিক তিনি হয় তো এ-গন্ধ পেয়েও পান না। ওটুকু পথিকেরই পাওনা। ঐ রকম গন্ধই বল আর সৌন্দর্য্যই বল,—সংসারে এ জিনিষ যথেষ্টই আছে। তবে সকলের নজরে পড়ে না,—পথে যেতে যেতে ক্ষণিকের জন্য যে যতটুকু পেয়ে যায় তার ততটুকুই লাভ।"

আমি হেসে ফেল্‌লাম। বলালম, এ তো গেল সৌন্দর্য্যের উপমা। আর প্রেমের উপমাটা কি? দুটো তো আলাদা বলছিলে।

বন্ধু বল্লেন,—"প্রেমের আর উপমা নয়,—ওর বেলা উপলব্ধি। তুমি যে দাম্পত্য প্রেমের কথা তুলেছিলে ওটা শেষ পর্য্যন্ত হচ্ছে প্রয়োজনের প্রেম,—ইচ্ছা করলে বরাবর মধুর এবং মজবুত করে রাখা যায়। কিন্তু মেয়ে-পুরুষের মধ্যে বিশেষ করে এক এক জনের বিশেষ করে অপর এক জনের প্রতি যে অতি প্রবল একটা আকর্ষণ, যেটা কাব্যের কাব্যের প্রেম বলে উড়িয়ে দাও,—ওটা মানুষের মধ্যে সত্যই আছে। সে বড় ভয়ানক জিনিষ! আমি এক রকম ভাবে তার কিছু আস্বাদ পেয়ে গেছি।"

কি রকম ব্যাপারটা শোনবার জন্য আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম। বন্ধু বলতে লাগলেন—

"তুমি তো জান যেখানে আমি থাকি সে দেশে বাঙালীর বড় প্রাধান্য। উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, বড়লোক, বেশীর ভাগ সবই বাঙালী। এঁরা একটা কলোনি করে সেখানে থাকেন আর নিজেদের মধ্যে রীতিমত একটা বুর্জোয়া ব্যূহ রচনা করেন। প্রবাসী বাঙালীর এটা দস্তুর। এঁদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা এতটা বেশী যে, দেশে থেকে সে কথা তোমরা ভাবতেই পার না। যে মেয়েটির কথা বল্‌বো তিনি এই দলের একজন। নাম আরতি দেবী,—লোকে বলে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি।"

আমি বল্লাম—নামটি বেশ। কিন্তু পরস্ত্রী নিয়ে গল্প করা কি ভাল?

বন্ধু। না হে গল্প নয়—এটা peculiarly সত্যিকার রোমান্স; সবটা আগে বলি শোনো।

"আমাদের ওখানে মেয়েদের এক ইস্কুল আছে,—অর্থাভাবে সেটা ভাল রকম চলে না। এক সময় সকলের এ-দিকে দৃষ্টি পড়্‌ল। পরামর্শ করে স্থির হোলো, এর উন্নতির জন্য কিছু টাকার জোগাড় করা দরকার। কিন্তু চাঁদার খাতা নিয়ে ফিরলে দরকার মত টাকা আদায় না হতে পারে। চাঁদার উপর জোর চলে না, উদারতাও সকলের সমান নয়। তার চেয়ে একটা charity performance করা যাক্,—সব ঘরের মেয়েরা তাতে যোগ দেবেন, টিকিটের দামও বেশী করে ধার্য্য করা হবে। সকলেই এতে খুসী হয়ে লাগবে, আর এই উত্তেজনার ভিতর দিয়ে বড় লোকদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করার সুবিধা হবে। পাঁচমিশালী প্রোগ্রাম তৈরী হোলো,—গান, বাজনা, আবৃত্তি, ম্যাজিক—যাতে সকলেই আপন-আপন কৃতিত্ব দেখাবার সুবিধা পায়।

নবীন উদ্যমে মহলা চলতে লাগ্‌ল। আমি হলাম জোগাড়ে দলের পাণ্ডা,—অর্থাৎ যারা অভিনয় করবে না, আয়োজন করবে। প্রত্যহ সভা সরগরম, ছেলে মেয়ের বেজায় ভিড়। মেয়েরা মহলা দিতে লাগলেন,—বুড়োরা বসে বসে খুঁৎ বিচার করতে লাগলেন। এই সব মেয়েদের মধ্যে একজনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। ইনিই আরতি। শুনলাম ইনি একজন ধনী লোকের কন্যা এবং একজন মানী লোকের নব-বিবাহিতা স্ত্রী। উচ্চ শিক্ষিতা এবং একেবারে আধুনিক। বেশভূষায় দুরন্ত অথচ ব্যবহারে নম্র। তাঁর রূপের বর্ণনার কিছু দরকার নেই,—কারণ সকলের চোখ ত সমান নয়। এর পর যদি কখনও তাঁর দেখা পাও, হয়'তো বলবে,—"এঃ, এর আবার এত ব্যাখ্যা।" মাজা ঘসা ফিটফাট্ বাঙালীর মেয়ে যেমন দেখতে হয়, মনে কর। কারও মতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যায়, কারও মতে হয় তো ফর্সা। কিন্তু মুখের ওপর কি যে অনুপম—সেটা জ্যোতিঃ বল্‌ব কি মায় বল্‌ব বুঝতে পারছি না,—তাঁকে দেখবা মাত্রই সেটুকু আমার চোখে লাগ্‌ত। রূপ হিসাবে তোমার আমার স্ত্রীর চেয়ে বেশী সুন্দরী নয়। কিন্তু সৌন্দর্য্যের এমন জীবন্ত মূর্ত্তি আর দেখি নি। চুপ করে থাকলে চোখে পড়ে না, কিন্তু একটু কথা কইলে বা হাসলে এই সৌন্দর্য্য মুখর হয়ে একেবারে ঝলমল্ করে ওঠে। চোখ দুটি সর্ব্বদাই চঞ্চল, আর হাসিটাই তাঁর চাঞ্চল্যের ভাষা। আমি যে এত সুন্দর দেখেছিলাম, তা বোধ হয় এই হাসিটুকুর জন্য। আমার মনে হোতো মানুষের মুখে যে রূপ, হাসিটাই তার সুষমা; যে মুখে হাসি নেই সে মুখে প্রাণ নেই।

আমি দূর থেকেই তাঁকে দেখতাম। এক একবার মনে হয়েছে কাছে গিয়ে আলাপ করি, কিন্তু তখনই আবার পেছিয়ে যেতাম। ভাবতাম, কাজ কি ঘেঁটিয়ে!

তুমি তো জান, মডার্ণ মেয়েদের আমি ভয় করি। তারা মূর্খ নয়, রীতিমত শিক্ষা পায়। কিন্তু শিক্ষা জিনিষটাকে তারা এমন সম্পদ বলে মনে করে যেটা বুঝি নগদ টাকার মত সর্ব্বদা পকেটে নিয়েই ঘুরতে হয় এবং পাঁচজনের কাছে যখন তখন সেগুলো ঝণাৎ করে বাজিয়ে দিয়ে গৌরব অনুভব করার সুযোগ খোঁজে। বাঙালী মেয়েদের নিজস্ব যেটুকু সলজ্জ নম্রতা,—যেটাকে আমরা বোধ হয় লক্ষ্মীশ্রী বলি,—সেটুকু এদের মধ্যে বড় দেখাই যায় না। এদের রকম-সকম আর হীল্‌তোলা জুতা পায়ে খট্ খট্ করে চলা,—এর প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আছে। সেই জন্যই হোক কিংবা বড় লোকের মেয়ে বলেই হোক,—আমি তখন তাঁর কাছে ঘেঁষি নি।

তাঁর ছিল গানের পালা। প্রথম যে দিন তিনি হার্মোনিয়মে বসেই মুখ টিপে হেসে আরম্ভ করলেন—"আমি চিনি গো চিনি তোমারে",—তখনই আমি অবাক হয়ে গেলাম। কি চমৎকার গলা! এখানকার ভিতর এমন গলা আর কারো নেই। হাস্‌তে হাস্‌তে এমন জোর গলায় এমন মিষ্ট সুর! সেই অতি পুরানো গান, যা আমরা যা তা করে গেয়ে, বেড়াই তার মধ্যে এমন নূতনতর মিষ্টতা ঢেলে দেওয়া যায়! সেদিন মনে হোলো মানুষের মধ্যে কি অপরূপ সব জিনিষ থাকে,—গানের ভিতর দিয়ে তার কি অদ্ভুত পরিচয়ই পাওয়া যায়! আমাকে ভুবন ভ্রমণ করতেও হোলো না, কারো দ্বারে অতিথিও হলাম না—কিন্তু যে তৃপ্তি আমি সারাজীবন ঘুরেও পেতাম না, আশার অতিরিক্তরূপে তা এমন করে এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজ আমি পেয়ে গেলাম। মনে হোলো, এর চেয়ে বেশী প্রসাদ লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। গানের কথার সঙ্গে, সুরের সঙ্গে, আমার মনের সঙ্গে এক আশ্চর্য্য মিল হয়ে কি এক ঝঙ্কার উঠ্‌তো—আমি তো গান শুনতাম না, সেই ঝঙ্কারটাই শুনতাম।

গান থামবার পরই সেখান থেকে সরে যেতাম,—কিন্তু আমার কানের মধ্যে, মাথার মধ্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঝিন্‌ঝিনি লেগে থাক্‌ত। পরের দিন আবার কখন সেই গান হবে তারই প্রতীক্ষায় থাকতাম। আবার সেই গান সুরু হোতো, আবার আমি এককোণে চুপ করে দাঁড়াতাম। এই রকম দিনের পর দিন সেই গান আর সেই মুখ আমার মনের ভিতর প্রত্যহ একই ভাবের ছাপ দিয়ে দিয়ে, ছাপ দিয়ে দিয়ে আমদের একটা সুস্পষ্ট মূর্ত্তি গড়ে তুল্‌লো,—সেটা এমনিই স্পষ্ট যে জীবন আমার সুদীর্ঘ হলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁর দাগ থেকে যাবে।

কয়েকদিন ধরে রিহার্স্যাল চললো, তার পর একদিন অভিনয় হয়ে গেল। টাকা বেশ উঠলো, স্কুলের একটা সুব্যবস্থা হোলো, হিসাব নিকাশ মিটে গেল। তারপর আমার যে যার কাজে মন দিল।

মেয়েটির কথা অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মনে ছিল। সেই গানটা থেকে থেকে মনে পড়্‌ত,—মধ্যে মধ্যে গানটা গুন্ গুন্ করে তাঁর মত সুরে গাইবার চেষ্টা করতাম। তারপর কাজের ভিড়ে কখন এক সময় কথাটা ভুলেই গেলাম।

পূরা উদ্যমে আবার নিজের উন্নতির চেষ্টা, নানা রকমে কেবলই উঁচুদিকে ঠেলে ওঠবার প্রয়াস,—যেমন চলে তেমনি চলতে থাক্‌লো। অর্থাৎ আনন্দ তাতে কিছুই পাচ্ছি না, পাবার ফুরসৎও রাখছিনা, নিত্য কেবল জোগাড় করেই চলেছি। আশা করছি একদিন নিশ্চয় এই জোগাড়ের শেষ এবং ভোগের সুরু হবে। আশাটা যে বৃথা তাও জানছি। কিন্তু এর মধ্যে একটা "তবু" এসে চাকাটার দম ফুরোতে দিচ্ছে না কখনো।"

বন্ধু একটু চুপ করাতে আমি বল্লাম - যেমনি তোমার গানের মোহ লেগেছিল, তেমনি তার প্রতিক্রিয়া হোলো এই ফিলজফি। বিদেশে হঠাৎ একটা ভাল মুখ দেখলে কি একটা ভাল গান শুনলে এরকম হয়ে থাকে। তা হোক এ কেবল ক্ষণিকের মোহ। স্থায়ীও হয় না, দোষেরও কিছু নেই।

বন্ধু একটু বিমনা হয়ে বল্লেন—"মোহটা ঠিক কিসের জানিনা, বোধ হয় গানেরও এবং হাসিরও। ওরকম হাসি না থাকলে ও গানের কিছু মানেই হোতো না। কিন্তু এর পর অনেক কথা আছে, বলি শোনো।"

"সেই ঘটনার পর চার পাঁচ বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে সেই মেয়েটির খবর পাইও নি, নিইও নি। কাজের দরকারে নানা দেশে দেশে ঘুরে আবার কিছুদিন স্থির হয়ে বসা গেছে। হঠাৎ একদিন শুনলাম মেয়েস্কুলে আবার এক গণ্ডগোল। ভাল হেড্ মিস্ট্রেস্ যিনি ছিলেন তিনি ছেড়ে গেছেন। এখানে ভাল কোয়ার্টার্স নেই, থাকবার জায়গা না করে দিলে তিনি ফিরে আসতে চান না। তাই কথা উঠেছে, আবার কিছু টাকা তুলে একটা ঘর খাড়া করে দিতে হবে। অতএব আবার সেই আগের মত একটা অভিনয়ের আয়োজন করা হোক। আমার তখন বয়সটা একটু বেড়েছে, কাজেই উৎসাহও কমেছে। এবার আমি আর ও ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিলাম না, বাইরে বাইরে থাকলাম। আবার প্রোগ্রাম তৈরী হোলো এবং রিহার্স্যালের বন্দোবস্ত হতে লাগ্‌ল।

দলে দলে মেয়েরা আসতে লাগ্‌ল, কিন্তু আরতি দেবীকে দেখতে পেলাম না। শুনলাম তাঁর একটি মেয়ে হয়েছে, এখন আর আসরে নামতে রাজী নন্। এবার গানও তেমন জম্‌ছিল না।

কিছু দিন পরে হঠাৎ একদিন দেখি তিনি এসেছেন একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে, সঙ্গে তাঁর স্বামী; হাসিমুখে একধারে দাঁড়িয়ে রিহার্সাল দেখছেন।

আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি, হঠাৎ তিনি তা দেখতে পেলেন। আমাকে দেখেই, যেন কতদিনের চেনা এমনি ভাবে হেসে আমাকে নমস্কার করলেন। নিতান্ত পরিচিতের মত বল্লেন,—"এই যে, ভাল তো?" আমি অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি নমস্কার করলাম। বল্লাম—"হাঁ, ভালই আছি। আপনি ভাল তো?"

মনে করলাম, খুব তো ভাল,—যেচে আলাপ করতে দ্বিধা করেন না! কিন্তু তখনই দেখি, একেবারে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, স্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন। আর ফিরে চাইলেন না। এইমাত্র যে আমার সঙ্গে কথা কয়েছেন তার কোনো লক্ষণই নেই। ব্যবহারটা বড় অদ্ভুত ঠেক্‌লো। যেন তাঁর জাহাজের সার্চ্চলাইটটা আমার ওপর ফেলে আমাকে একঝলক দেখে নিয়েই আবার অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। আমার চোখে ধাঁধা দেওয়াই কি মৎলব? কিংবা তিনি আমার পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থাকেন,—সেই দূরত্ব কতখানি তাই কি এরকম ভাবে আমাকে জানিয়ে দিলেন? অস্পষ্ট ভাবে এই কথাই আমার তখন মনে হয়েছিল। একটু ব্যথা তো পেলামই।

তবু পাশ থেকে এক একবার চেয়ে চেয়ে তাঁকে দেখলাম। মুখটা একটু বদলে গেছে,—একটু ভারী ভারী। লালিত্য কিছু কমেছে—শাড়ীর জমকটা বেড়েছে। হাসিটা কিন্তু ঠিক আছে।

অভিনয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা প্রথমে তাঁকে লক্ষ্য করে নি,—আমিই তাঁদের দেখিয়ে দিয়ে চুপি চুপি একটু উস্কে দিলাম। তখন তাঁরা ধরে বস্‌লেন, তাঁকে গাইতেই হবে। তিনি তাতে রাজী হন্ না, হাসি দিয়ে কথাটা উড়িয়ে দিতে চান। দলের মধ্যে যিনি সব চেয়ে প্রবীণ মাতব্বর, তিনি ওঁর স্বামীকে বল্লেন, এবার একজনেরও গান ভাল হচ্ছে না, একটু সাহায্য না করলে এবার মান থাকে না। স্বামী তখন বল্লেন, এত লোকের অনুরোধ ঠেলে ফেলা ভাল নয়। অতএব তিনি রাজী হলেন—"কিন্তু একটি মাত্র গাইবো।" প্রবীণ ভদ্রলোক বল্লেন,--"তাই যথেষ্ট। রিহার্সালটা তবে আজ থেকে হোক্।"

হার্ম্মোনিয়মে গিয়ে তিনি বসলেন,—ঠিক আগের মতই। গান সুরু হোলো। গলার সুর তেমনি সতেজ। একমাথা চুল নিয়ে খুকীটি পাশে দাঁড়িয়ে মায়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। আমার মধ্যে সেই পুরানো ঝঙ্কার বাজতে লাগলো,—সেই পুরানো ছবি।

এবার প্রত্যহ তিনি আসতেন না। মাঝে মাঝে আসতেন, গানটি গেয়ে চলে যেতেন। তারপর একদিন এবারকার পালাও আড়ম্বরের সঙ্গে শেষ হয়ে গেল।

আবার সব চুপ চাপ। নিত্যকালের একঘেয়ে গরুর গাড়ী আবার নিজের চালে চলতে থাক্‌ল। কোন গোল নেই, কাজকর্ম্ম নিয়মিত করতে লাগলাম। ও কথা চাপাই পড়ে গেল।

কেন জানি না এর পর হঠাৎ একদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে আরতি দেবীকে অতি নিকটে পেলাম অত্যন্ত পরিচিতের মত,—তাঁর দেহের স্পর্শ পর্য্যন্ত অনুভব করলাম। তার বিবরণ বলা একটু মুস্কিল। এমন দুএকটা স্বপ্ন আমরা মাঝে মাঝে দেখি—কি রকম জান? দামী আতরের গন্ধ কাপড়ে যেমন সাবান দিয়ে কেচে ফেলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত লেগে থাকে, এগুলো তেমনি অনেক দিন পর্য্যন্ত কিছুতেই মন থেকে ছাড়তে চায় না। স্বপ্নের কথাগুলো শীঘ্রই গুলিয়ে যায়,--তার ভাবটাই কেবল মনের মধ্যে গোলমাল করতে থাকে। মোটামুটি মনে আছে, আমি যেন কোথায় গিয়েছি, সেখানে প্রায়ই যেয়ে থাকি। সেখানে অনেক লোক,—আরতি দেবীও তার মধ্যে একজন। কতলোকের সঙ্গে কত কি কথা কইলাম। শেষে একজায়গায় দেখি, আরতি দেবী নিবিষ্ট ভাবে কি বই পড়ছেন। আমি পিছনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বইখানা দেখতে

লাগলাম। বিনা কারণেই তাঁর মুখটা আমার দিকে একটু ফিরে গেল,—নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে আমার চিবুকটা তাঁর ঘাড়ের কাছে একটু ঠেকে গেল। তাতে যেন বিচলিত হবার কিছু নেই,—এ-রকম যেন ঠেকেই থাকে,—বইখানাই তখন লক্ষ্যের বিষয়, মুখটা সরিয়ে নেবার কোনো ব্যস্ততা নেই। কতক্ষণের পর এমনিই আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। তারপরই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মুখে তখনো সেই উষ্ণস্পর্শ লেগে রয়েছে,—সেই চুলের মিষ্ট সুরভিতে আমার নাক ভরে রয়েছে।

ঘুমের স্বপ্ন ছুটে গেল কিন্তু এর পর আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। সেই স্পর্শের অনুভূতিটা,—সেটা কিছুতেই মন থেকে যেতে চায় না। কয়েকদিন আমি এই নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়ালাম। স্বপ্নের মধ্যে এমন এক নতুন জিনিষের খবর পেয়েছি, যা আমি কখনও প্রত্যক্ষ করি নি। এ-রকম স্বপ্ন নিয়ে আমি কি করবো, কিছুই ঠিক করতে পারি না। যা আমি কখনও কল্পনা করি নি সে রকম স্বপ্ন আমি কেন দেখলাম? স্পর্শের মধ্যে দিয়ে এ আবার কি নূতন রকমের মোহ? আমার মনের সেই চাপা দেওয়া ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্বপ্নের ধাক্কা লেগে যবনিকা গেল ছিঁড়ে, মন উঠল ক্ষেপে।

ছেলেবেলায় আমার এক একটা অসমসাহসিকতার ঝোঁক উঠতো, সে কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে। একবার ঝোঁকের মাথায় তেড়ে গিয়ে হেডমাষ্টারের হাত থেকে বেত কেড়ে নিয়েছিলাম। সেই রকমের একটা ঝোঁক এখন আবার আমার মাথায় এল। চলবার যেন একটা নতুন রাস্তা পেয়ে গেছি। দুর্ভেদ্য আড়ালের ওপারে কোন্ মিষ্টতার আধার আছে,—যতই কঠিন হোক, আমি তার সামনে গিয়ে একবার দেখতে চাই।

প্রথমে ভাবলাম, কোনো ছুতায় তাঁর সঙ্গে আগে আলাপ জমিয়ে তুলি, তার পর দেখা যাবে। কিন্তু তাতে কেমন ঘৃণা বোধ হোলো। মিথ্যা অভিনয়ের ভান করা আমার পোষাবে না। হৃদয়ের যেটা আকাঙ্ক্ষা, ফাঁকির ভিতর দিয়ে তা সফল করতে চাই না। সোজা কথাই সকলের চেয়ে ভাল। আমি একেবারে স্থির করে ফেললাম, যেমন করে হোক তাঁর কাছে একবার দাঁড়িয়ে আমার সব কথাগুলো তাঁকে বলতেই হবে। হবে না-ই বা কেন? রোমান্সের কথা কতই তো শোনা যায়! নেহাৎ তো আর সেকেলে মেয়ে নয়!”

এই পর্য্যন্ত শুনে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বল্লাম,—তোমার আবার এ সব কি পাগলামি? এ রকম স্বভাব তো তোমার ছিল না? কিসে তোমার এত দুঃসাহস হোলো জানি না। যাই হোক্ তার পর কি কাণ্ড বাধালে শুনি।

বন্ধু বল্লেন—“তুমি যে মন নিয়ে এ কথা বলচ, আমার মনের অবস্থা তখন সে রকম নয়। আমি তখন ঝোঁকের মাথায় চলেছি। বোধ হয় মনে মনে কিছু একটা আশা জেগেছিল যেন ওখানে আমার মনের কথার কিছু একটা জবাব পাওয়া যাবে। তাই হয় তো এ সঙ্কল্প করতে বাধলো না।

যাই হোক, কয়েক দিন ধরে সন্ধান নিতে লাগলাম কখন তাঁকে একলা পাওয়া যেতে পারে। আমি এটা অনেকবার লক্ষ্য করে দেখেছি যে যখনই কিছু একটা পাবার জন্য দৃঢ় কামনা করি তখনই কোনো না কোনো রকমে তার একটা সুযোগ জুটে যায়। খোঁজ করতে করতে জানলাম যে দুপুর বেলাটা তিনি বাড়ীতে একা থাকেন। তাঁর স্বামী যান আদালতে, খুকী ঘুমিয়ে থাকে, চাকররা বিশ্রাম করে,—তিনি দিনে সেলাই টেলাই করেন। বুঝলাম, এই উপযুক্ত সময়।

একদিন কাজ কামাই করলাম। নিয়মিত সময়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রথমে সটান সহরের বাইরে গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গাছতলায় বসলাম। উদ্দেশ্য, বেলা আর একটু বাড়ুক, দুপুরটা একটু নিস্তব্ধ হয়ে আসুক, আমিও একটু তৈরী হয়ে নিই।

এই মাঠটা সাধারণের বেড়াবার জায়গা, তখন একেবারে নির্জ্জন। দু'একটা পাখী ডাকছে, দু'একটা গরু চরছে, জোর হাওয়া বইছে—তার কোনো দিগ্বিদিক নেই। চুপ করে বসে বেশ আরাম পেলাম। আমার আজ ছুটি,—, আমার খেয়ালকে আজ যেমন খুসী মুক্ত করে দেবার অবকাশ

পেয়েছি,—দৈনিকের ভাবনা আজ নেই। কি চমৎকার এই দুপুর বেলাকার মাঠ! যতদূর দৃষ্টি যায় ঘাসের সবুজ বিছিয়ে রয়েছে, গাছের মাথায় সবুজ আরো ঘন, রৌদ্রের তেজ তাঁর ওপর পড়ে যেন স্তিমিত হয়ে গেছে। একলা মাঠের এ স্তব্ধ শান্তি,—এ কি কারো চোখে পড়ে না? আমি ভাবলাম, আর কখনও যে এমন করে কাজ পালিয়ে এখানে আসি নি, সে আমি বড়ই ভুল করেছি। কে জান্‌তো যে খোলা মাঠে বসলে এমন করে মন খুলে যায়। কত চিন্তাই আমার মনের ভিতর দিয়ে ভেসে যেতে লাগ্‌ল! আসন্ন ঘটনার নানারকম কল্পনা, তার সঙ্গে মিশিয়ে আমার অতীতের স্মৃতি, আবার ভবিষ্যতের স্বপ্ন, কত এলোমেলো কথা! আর তারই সঙ্গে চোখের সাম্‌নে ছড়ানো,—নির্জ্জন মাঠভরা সেই অপরূপ মরীচিকা!

বসে বসে প্রায় দুটো বাজ্‌লো, তখন আমি উঠে পড়লাম। মনে জোর করে সোজা আমার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হলাম। ফটক খোলা রয়েছে, সেখানে কাকেও দেখলাম না। ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকলাম; বাগানে একজন মালি কাজ করছে আমায় দেখে বল্লে,—"কি বাবু?" আমি সপ্রতিভ ভাবে বল্লাম—"মেম সাহেব কোথা?" সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে—"ঐ বারান্দার পাশের ঘরে দেখুন।" বিদেশে বাঙালীর বাড়ীতে বাঙালীর অবারিত দ্বার। আমি তার নির্দ্দেশমত বারান্দায় গিয়ে দেখি ঘরের ভিতর আরতি দেবী ইজিচেয়ারে বসে একমনে সেলাইয়ের কাজ করছেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইলেন,—আমায় দেখে বল্লেন—"কি চান?"

"আপনার সঙ্গে কিছু দরকার আছে।"

"ভিতরে আসুন।" আমি ঘরের ভিতর গেলাম।

সেই আরতি দেবী,—এত কাছে! বেশভূষার এখন পারিপাট্য নেই, সাদা কাপড় সহজভাবে পরা, চুলগুলো এলোমেলো, দৃষ্টিতে কৌতুহল। তখন ইনি ঘরের মানুষ, দেখতে যেন অন্য রকম।

আমি চুপ করে আছি দেখে তিনি বল্লেন,—"কৈ, কিছু তো বলছেন না? আমারই কাছে আপনার দরকার? বলুন না!"

আমি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। বল্লাম—"হাঁ, আপনার কাছেই দরকার। কিন্তু তার আগে আমার পরিচয়টা দিই। অনেকবার আমাকে দেখেছেন, কিন্তু হয় তো ঠিক চেনেন না। আমি কিন্তু অনেকদিন থেকেই আপনাকে চিনি।"

তিনি একটু হেসে বল্লেন—"আমিও আপনাকে জানি। গানের রিহার্সালের সময় অনেকবার দেখেছি আপনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গান শুনতেন। আপনি গান শুনতে ভালবাসেন। তা ছাড়া আপনি কি করেন, কোথায় থাকেন, সে খবরও জানি।"

একটু আশ্চর্য্য হলাম। খুব চালাক বটে। কিন্তু কথা তো আমাকে বলতেই হবে, দম্‌লে চলবে না। একেবারেই মরিয়া হয়ে বল্লাম—"ভালই হোলো, আমার কথাটা অনেক সহজ করে দিলেন। গোড়ায় কি বল্‌ব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যাক্‌, তা, সেই কথাই আপনাকে বলতে এসেছিলাম। আপনার গান এতই ভাল লেগেছিল যে আজও তা ভুলতে পারি নি। আপনার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।"

আমার কথা শুন্‌তে শুনতে তাঁর মুখটা বেশ শক্ত হয়ে গেল। "এ সব আপনি কি বলছেন?"

আমি।—"নির্লজ্জের মত বলছি বটে কিন্তু মিথ্যা কিছুই বলছি না। এমন কি গত রিহার্সালের পর সেদিন আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি। সেইটা বলতেই ছুটে এসেছি। না এসে পারলাম না।"

স্বপ্নের ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে দিলাম।

চুপ করে শুনে শুনে শেষে যেন তিনি অবাক্ হয়ে বল্লেন—"আপনার এ সব বলার উদ্দেশ্য কি?"

আমি। কোনো বদ উদ্দেশ্য নিশ্চয় নেই, শুধু নিজের মনকে একটু শান্ত করা। আপনার কাছে এসেছি, কথা কয়ে আমার আশা মিটিয়ে চলে যাব। ভয় করবার কিছু নেই।"

তিনি বেজায় গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"বাজে কথা শোনবার আমার ফুরসৎ নেই। জয়োয়ান চাকর এখানে অনেক আছে। আপনি এখান থেকে চলে যান।"

আমি নিস্পরোয়া ভাবে বল্লাম—"আচ্ছা, তাই ভাল। আমাকে চাকর দিয়ে অপমান করুন, না হয় পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিন। তাতেও বুঝবো আমার অসমসাহসিকতার যা হোক একটা ফল পেলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার কিছু মন্দ অভিপ্রায় নেই।"

তিনি। "অভিপ্রায় বোঝা গেছে। আমাকে আপনি ভুল বুঝেছেন। এখন মানে মানে ফিরে যান।"

আমি। "ফেরবার উপায় নেই। যা বলবার তা আমাকে বলতেই হবে, আর আপনাকে তা শুনতেই হবে।"

বিরক্ত হয়ে' তিনি বল্লেন—"এ কি অন্যায় কথা! আপনি ভদ্রলোক, সমাজে মান সম্ভ্রম আছে. নিতান্ত কম বয়সও নয়,—আপনার একি প্রবৃত্তি? আমি পরস্ত্রী, দুপুর বেলা ঘরে একা রয়েছি, হঠাৎ আপনি চোরের মত এসে এ রকম ভাবে এই সব কথা বলে যাবেন?"

আমি।—"দেখুন, এ-যে কত বড় অন্যায় তা আমি জানি। কিন্তু যে আগ্রহ আমাকে এখানে ঠেলে এনেছে সেটা আমার পক্ষে অদম্য।"

তিনি।—"তাতে আমার কি? ও-সব আমি শুনতে চাই না। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এমন আগ্রহই বা আপনার হয় কেন?"

আমি।—"তা জানি না। তবে এতে আমার কোনো হাত নেই। যেমন করেই হোক আমি মনে মনে জেনেছি যে আপনাকে আমার ভয় করবার কিছু নেই,—বরং আপনার কাছে অভয় পাব। বোধ হয় আপনার হাসিই আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কত দিন আমার দিকে চেয়েও আপনি হাসতেন।"

এইবার তিনি একটু হাসলেন দেখলাম। বল্লেন,—'ওটা আমার একটা স্বভাব। সে তো আর বন্ধ করা যায় না। কিন্তু হাসলেই যদি আপনারা তার একটা মানে খুঁজে বের করতে থাকেন' তা হলে এবার থেকে সমাজে যাতায়াত আমার বন্ধ করতে হয় দেখছি।"

বোধ হয় তখন তাঁর একটু আত্মশ্লাঘা এসেছে। এইবার আমি বল্লাম—"আপনি এতক্ষণ রাগই করছেন, আমার অন্যায়-ই কেবল দেখছেন। কিন্তু আমার দিক থেকেও কথাটা একবার ভাবুন। আপনার সঙ্গে দেখা হবার কতদিন পরে আজ হঠাৎ মরিয়া হয়ে ছুটে এসেছি কেন? আপনার মধ্যে আজ এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছি যা আমার পক্ষে সঞ্জীবনীর মত। কথাটা স্বার্থ পরের মতই শোনাচ্ছে,—কিন্তু আমি যা চাই তাতে আপনার কি ক্ষতি? আমি তো এখনই চলে যাব, আর আস্‌বো না। কেউ জানবে না, শুনবে না,—আপনি শুধু আমার প্রতি একটু প্রসন্ন হোন্, এতে কার কি ক্ষতি হতে পারে? আমার আপনাকে ভাল লেগেছে,—এই কি একটা অপরাধ? আমি সরল ভাষায় তাই আপনাকে বলছি,—তাতেই কি যত দোষ?"

এতগুলো কথা আমি বল্লাম,—কিন্তু বদলে পেলাম একটু বিদ্রূপের হাসি। একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে তিনি বল্লেন—"না, না,—দোষ কিসের! তা বেশ তো,—বলা তো হোলো,—আর কি চান?"

আমি আগ্রহ নিয়ে বল্লাম—"আর তো কিছুই চাই না। মনে যত যত কথা জমেছে,—যে আশা জেগেছে,—সেগুলো মিটিয়ে যেতে চাই।"

ইতিমধ্যে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। সেই রকম বিদ্রূপের টানেই বল্লেন—"অর্থাৎ বসে বসে একটু ভাব করতে চান,—এই তো? তা হয় না মশাই। একজন অপরিচিত লোক এসে আমার গুণগান করতে থাকবে, আর আমি মুগ্ধ হয়ে তাই শুনতে থাকবো, এতটা হতে পারছে না। বুঝতে পারলেন না? বুঝতে শক্ত ঠেকছে কি?"

শক্তই ঠেক্‌ছিল বটে! কি কঠিন মেয়ে! আমার এবার লজ্জা করতে লাগ্‌ল। পা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছিল। তবু বল্লাম—"দেখুন, সত্যই কি তা অসম্ভব? মানুষ যদি মানুষের কাছে স্নেহ চায়, তাতে অন্যায় কি আছে? অবশ্য চাইলেই সব্‌কিছু মেলে না, ভিখারীকে লোকে ঘৃণাও তো করে। আমি যতটুকু ইচ্ছা নিয়ে এসেছি, আমার মুখে হয় তো তার চেয়ে বেশী কিছু চিহ্ন প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে,—হয় তো তাই দেখে আপনার ঘৃণা হচ্ছে। কিন্তু তা যদি না হয়,—আমায় যদি বুঝতে পেরে থাকেন, তবে এমন করে আমাকে ফেরাবেন না। আজ ফিরিয়ে দিলে চিরজীবনে সে লজ্জা আমার ঘুচবে না।"

হাতেও সেই বিদ্রূপ। এতটুকু দরদ হোলো না। বল্লেন—"এতক্ষণে লজ্জার কথাটা মনে হোলো বুঝি? এই মোটা কথাটা তো প্রথমে ভাবলেই ভাল হোতো!"

আমার উদ্যম আর থাকল না। মন জাগাতে পারলাম না। আর কত বলব? হতাশ হয়ে শেষে বল্লাম—"তবে চলেই যাই। আপনি আমায় বুঝতে পারলেন না। সোজাসুজি বলা আমার ঠিক হয় নি। হৃদয়ের কথা আপনার কাছে তুচ্ছ। নীতিজ্ঞানটাই বড়। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আর এক দিক দিয়ে ভেবে দেখুন,—যদি কোনো শিশুকে দেখে আপনার মনে স্নেহ হয়, একবার তাকে নিতে ইচ্ছা হয়, আর আপনি যদি প্রত্যাখ্যাত হ'ন—তবে আপনার মনটা কেমন হয়? জানবেন, স্নেহের প্রত্যাখ্যান মাত্রেই ঐ রকম লাগে। তবে এ কথা এখন বলাই ভুল। আপনার কাছে সে ভালবাসার দাম নেই। আমার আগ্রহ যতই হোক, আপনার কাছে তার সাড়া পাওয়া যাবে না। সে হৃদয়ই আপনার নেই।"

এর পর চলেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখলাম তিনি হাসছেন। হাসির যেন কিছু বাড়াবাড়ি। দেখে একটু থেমে গেলাম। হাসতে হাসতে তিনি বল্লেন—বেশ বক্তৃতাও জানেন দেখছি। আচ্ছা একটু দাঁড়ান,—আগে দেখে আসি আমার খুকী জেগেছে কি না"—"বলেই তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে চলে গেলেন।'

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে গেছে, চিন্তা করবারও শক্তি নেই। আবার কেন থাকতে বলা? আরও কি অপমানের বাকী আছে?

একটু পরেই তিনি ফিরলেন। বলতে বলতে এলেন—"একটা ভুল ধারণা নিয়ে যাবেন,—একি, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না?"

আবার বসলাম। তিনিও একটা চেয়ার টেনে বসলেন। বেশ স্থির হয়ে বসে টেবিলের ওপর হাত রেখে,—যেন আমাকে কিছু জ্ঞান দিয়ে দিচ্ছেন,—এমনি ভাবে থেমে থেমে বল্লেন—"দেখুন, আপনার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, মিছে বকাই সার হবে।" আপনি কেন এসেছেন তা জানি। কিন্তু—আচ্ছা, রোজ রোজ মানুষ দেখে দেখে কতদিনে যে মন আপনার হয়েছে, তাতে কি এটুকু বোঝেন নি যে, মন বহুদূরে যায়, বাস্তবিক আমাদের ততটা আবার কিছু দরকার নেই? আপনার স্বপ্নই বলুন আর কল্পনাই বলুন, এ-রকম করে তা প্রকাশ করে কিছু লাভ হয় না। সকলকেই তো দেখতে পান, কেউ কারো মনের কথা মুখে বলে না। ছোট ছেলেরা মুখ দিয়ে সব বলে ফেলে,—তাই তার নাম ছেলেমানুষি। একটু বড় হলেই তা থেমে যায়। সংসারে থাকার এ-একটা নিয়ম আছে।"

আমি।—"নিয়মের কি ব্যতিক্রম হয় না? দেখেছেন তো, লেখকেরা কত কথাই লেখে!"

তিনি। "ও, নভেল পড়েন বুঝি? মনের সব সত্য কথাই বুঝি তারা লেখে? তাদের ঘটনাও যেমন তৈরী করা, কল্পনাও তেমনি তৈরী করা। কিন্তু আপনার এটা তো শুধু ব্যতিক্রম বলা চলে না। তার চেয়ে ঢের বেশী,—বলা উচিত মাথা খারাপ। আপনি রাগ করবেন না, আপনার একটু চোখ খোলা দরকার।"

আমার একটু রাগই হোলো। বল্লাম—"তার চেয়ে মাথা ঘুরে যাওয়া বলুন।"

তিনি।—"আচ্ছা তাই হোলো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যার কাছে এলেন, তাকে চেনেন না, কি চাইবেন জানেন না, অথচ ছুটলেন শুধু একটা অনিশ্চিতের সন্ধানে?"

আমি।—"হাঁ। ঠিকই বলেছেন। হঠাৎ একটা টান পড়েছে, সেই টানে চলে এসেছি। মনে একটা যে অভাব দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা দাবী জোর [illegible]। আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে, সত্য করে আমি যা চাইব, নিশ্চয় করে আমি তা পাবোই।"

তাঁর চোখে একটা দীপ্তি দেখলাম। [illegible] দিয়ে বল্লেন—"ভুল ধারণা। আপনি [illegible] দেখেন নি। যে চাওয়াটা আপনার ভিতর [illegible] আছে এ-রকম ভাবে তা চাওয়ার [illegible] তাও দেওয়া যায় না।"

আমি ভাবলাম, [illegible]
যায় একটু [illegible]
"[illegible]

"কক্ষণো না।" যেমন করে লোকে বাজী রেখে বলে সেইভাবে বল্লেন—"আচ্ছা দেখাই যাক্। আপনার কতদূর দৌড় তা আমার জানতে বাকি নেই। আচ্ছা বেশ, আমি এই চোখ বুজে বসলাম। লজ্জা পেতে হবে না, আপনার যা খুসী তাই করুন।"—এই বলে চেয়ার থেকে ঝুঁকে দু হাতের মধ্যে মাথাটি কাৎ করে সুন্দর ভঙ্গীতে টেবিলের উপর শুয়ে চোখ দুটি বন্ধ করলেন। চঞ্চল চোখের পাতা স্থির হতে না পেরে টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। ঠোঁটের কোণে দুষ্টামি মাখা চাপা হাসি।

ঘাড় বাঁকানোটি কি সুন্দর! কাঁধের কাছটা দেখতে এমন নরম। খানিকটা কোমলতা যেন টেবিলের ওপর খোলা পড়ে র'য়েছে। এদের মনটাই কি কখনো কখনো পিছনে এসে কাঁধের কাছে জমাট বেঁধে থাকে? আমার বড় মায়া লাগল। এ শুধু দেখাই যায়, কিন্তু ছোঁয়া কি যায়? এই বিশ্বাস কি ভাঙতেই পারা যায়? আমি চুপ করে চেয়েই থাকলাম। চাইতে চাইতে সেই ফুল,—সেই গন্ধ,—সেই স্বপ্ন,—সেই গান,—হঠাৎ চমকে দেখি তিনি আমার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলছেন—"কি হোলো?"

আমার তখন জবাব দেবার কি আছে?

আবার তিনি বল্লেন—"দেখছেন তো, স্বপ্নে যা পারেন, কাজে তা পারেন না!"

আস্তে আস্তে বল্লাম,—"এতদূর সত্যই ভাবি নি।"

তাঁরই জিৎ,—সেজন্য বেজায় খুসী। হেসে হেসে বল্লেন—"জানি,—আপনি পারবেন না।"

আমি মুখ চুন করে বল্লাম—"মিছামিছি কোন রকমে এসে কি-এক কাণ্ড বাধালাম। কেনই যে এমন ছুটে ছুটে এলাম তা নিজেই কি বুঝেছি?"

হাতের কাঁচিতে সেলাইয়ের কাজটা টেনে নিয়ে মেয়েটি [illegible] বল্লেন—"মিছামিছি [illegible] না। আমার [illegible] উঠেছিল, আপনি [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এলেন [illegible] যদি [illegible] না [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অর্থাৎ তাঁরও আছে। কথাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মাথা তুলে দেখি তিনি হেঁট হয়ে সেলাইয়ের সূতাগুলো কাঁচি দিয়ে কাটছেন। তাঁর সেই নমিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তখন আমি দেখতে পেলাম তাঁর ভিতরকার হৃদয়টি,—যেখান থেকে সেই অপরূপ গানের সুরটি তৈয়ারী হয়ে আসে,—"আমি চিনি গো চিনি তোমারে।"

তা হ'লে এই দেখতেই আমি ছুটেছিলাম?

একটু চুপ করে বসে থেকে শেষে বল্লাম,—"তা হলে আসি?"

হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে তিনি বল্লেন—"হাঁ, যান্ যান্, বাড়ী যান। বকে বকে আপনার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

এও কি আবার ঠাট্টা না কি? ভাল করে চেয়ে দেখলাম, চোখে ছলনার চিহ্নমাত্র নেই,—মুখে কেমন একটা ভালমানুষি বিহ্বলতার হাসি।

চিনতে আর বাকি রইল না। দূর থেকে দেখলে কতই প্রহেলিকা, কিন্তু কাছে এসে দেখলে মেয়েদের, সেই এক কথা। সেই একই ধরণের সূক্ষ্ম নজর, সেই অতি পুরাণো মমতাবোধ। কাঠিন্যের সঙ্গেও ওদের করুণা মেশানো থাকে। মেয়ে মানুষ চিরকালই সেই মেয়ে মানুষ।

অজানার উদ্দেশে যে আকুলতা আমাকে পেয়ে বসেছিল, তা একেবারে গেল ঘুচে। বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আর অবশ্য যাই নি। কিন্তু একটা বিনা সম্পর্কের আত্মীয়তা হয়ে গেছে মনে মনে। কোথাও দেখা হলেই নমস্কার করি। তখনই তিনি হাসেন তাঁর সেই হাসি। তখনই বুঝতে পারি মনের মধ্যে একটা স্পর্শ পেয়ে গেলাম। গানের সুরটা মনে পড়ে যায়।"

বন্ধুর গল্পটা যেমনই হোক, তাঁর সেই আমের মুকুলের উপমাটা এইবার আমি বুঝতে পেরেছি। এ সম্বন্ধে আরও একটা উপমা দেওয়া যায়। অপর লোকে চুরুট-সিগারেট খেলে তার গন্ধটা যেমন লাগে, নিজে খেলে সে জিনিষটি পাওয়া যায় না। এই উপমাটা আজকাল অনেকে দিয়ে [illegible]। আজকাল অনেকেই জানছেন যে, চুরুট এবং নেশার [illegible] [illegible] না শিখলে জানা যায় না।

পশুপতি ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠান

শ্রীসতীশ রায়

রবীন্দ্রনাথের ভাবময় জীবনের অমৃতফল তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ ও চিত্রলেখাগুলি। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে শিল্পী বিচিত্র রূপে আপনাকে দান করে চলেছেন অক্লান্তভাবে। শুধু বাংলা দেশকে নয়, ভূগোলের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী পৃথিবীর সকলকে।

এই ভাবুক কবিটিকে আমরা চিনি, পরিচয় পাই তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে। নিজ সত্ত্বার সত্য পরিচয়কে তিনি গোপন করেন নি কোনখানে।

সব দেশের বড় কবি ও চিন্তাশীলেরা পৃথিবীকে বড় আদর্শ দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব হ'চ্ছে রচনার মধ্যে বড় আদর্শ প্রচার করে তিনি ক্ষান্ত হ'ন নি, জীবনের কাজের মধ্যে সেগুলিকে সর্ব্ব প্রযত্নে রূপ দিতে চেয়েছেন নানা বাধা বিপত্তি ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও।

ইংরাজি ১৯০৭ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর অভিভাষণটি 'স্বদেশী সমাজ' গ্রন্থে আছে। ১০৪ পৃষ্ঠায় কবির মনে দেশ সেবার যে আদর্শ ছিল তা' প্রকাশ পেতে দেখি। কবি বলছেন, "তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর, শিক্ষা দাও, কৃষি শিল্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর। এ কর্ম্মে খ্যাতির আশা করিও না। এমন কি গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটি মাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া এই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।"

ইং ১৯০৭ সালে কবি যা বক্তৃতায় প্রচার করেছিলেন ১৯২২ সালে জীবনের কাজে তা প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হ'লেন।

১৯২১ সালে কবির ৬০ বৎসর বয়সের সময় তিনি যখন ইংলণ্ড ফ্রান্স, সুইডেন, জার্ম্মনী প্রভৃতি য়ুরোপের অধিকাংশ দেশ দেশান্তরে ঘুরে তাঁর বোলপুর শান্তি-নিকেতনের নবস্থাপিত বিশ্বভারতী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে ফিরছিলেন তখন একদিন শুনতে পেলেন যে বোলপুরের সুরুল গ্রামে লর্ড এস্. পি. সিংহের সাবেকী ধাঁচে গড়া বিস্তৃত বাড়ী এবং তৎসংলগ্ন বিস্তৃত জায়গা জমি হাত-বদল হ'বার উপক্রম হ'য়েছে। তখন তাঁর মনে হ'ল যে এইটিকে কেন্দ্র করে একটি আদর্শ পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠান গড়া চলতে পারে।

কেনা সম্বন্ধে তাঁকে মনস্থির করে ফেলতে হ'ল অল্প দিনের মধ্যে। সুরুলের অনতিদূরবর্তী গ্রাম রায়পুরের লর্ড সিংহও তখন ছিলেন ইংলণ্ডে। তাঁকে কবি নিজের অভিপ্রায় জানাতে তিনি রাজি হ'য়ে গেলেন। বাড়ী ও জমির যে দাম উঠ্‌ল তা নিতান্ত [illegible] [illegible] কবির আর্থিক অবস্থার পক্ষে অনুকূল ছিল না। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বিষয় মনে [illegible]

[illegible] রাজি হ'য়ে গেলেন।

[illegible]

[illegible]

কথা। এই কুঠীটিকে কেন্দ্র করে তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা চল্‌ত নীল, রেশম এবং আরো কত কি জিনিষের।

ইংরাজ বণিকদের সেই সব বিস্তৃত পাঁচিল-ঘেরা ব্যবসা-কুঠী সমূহের ভগ্নাবশেষ আজো জঙ্গল-ঢাকা অবস্থায় শ্রীনিকেতনের অদূরে পড়ে রয়েছে। শেষ কুঠীয়াল মিঃ চীপের নামে এখনো তা' চীপ সাহেবের কুঠী বলে বিখ্যাত। "সে-জায়গাটার Interest এখন ঐতিহাসিক।" আজকের শ্রীনিকেতনের কোনো শ্রী তখন ছিল না। বিস্তর ঝোপ-ঝাড়, আগাছা, অদরকারী গাছের জঙ্গলে, ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নাবশেষ ইমারতে জায়গাটা ছিল একেবারে পরিপূর্ণ। শিয়াল, খেঁকশিয়াল ও নানারকম বিষধর সাপের আড্ডা ছিল। গো বাঘাও যে দু'একটা দেখা যেত না এমন না। গ্রামের লোকে ভয়ে রাত্রে দূরের কথা, দিনেই কুঠীতে ঢুক্‌তে সাহস পেত না। আজ যার নাম হ'য়েছে শ্রীনিকেতন, তখন গাঁয়ের লোক তা'কে বলত সুরুলবন।

এমনি জায়গায় বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠানের প্রথম কাজ আরম্ভ হ'ল ইং ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের অনু-মোদনে শান্তিনিকেতনের কয়েকটি উৎসাহী ছাত্রকে সঙ্গে করে যে উৎসাহী আদর্শবাদী ইংরাজ বন্ধুটি এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম কর্ম্ম পরিচালক রূপে সুরুলে এসে পল্লী সংগঠনের সূত্রপাত করলেন তাঁর নাম শ্রীযুক্ত এল্‌-কে-এলম্‌হার্ষ্ট। শান্তি-নিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের মাঝে আছে দেড় মাইল ব্যাপী [illegible] উন্মুক্ত প্রান্তর। কটিকয়েক কুটীর বুকে করে [illegible] একটি ছবির মত সাঁওতাল পল্লী মাঝে মাঝে প্রান্তরের [illegible] [illegible] ভঙ্গ করছে। বর্ষার [illegible] উঁচু [illegible] [illegible] ও মুড়ি দিয়ে [illegible] [illegible] 'খোয়াই'য়ের সৃষ্টি হ'য়েছে।

[illegible]

কাটারি কুড়ুল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র গড়ত। গ্রামে তখন যেমন ছিল লোকজন, তেমনি তাদের খাটবার ক্ষমতা,—আত্মনির্ভরশীলতা। এখনো গ্রামে গ্রামে পড়ে রয়েছে আগেকার বসতির সাক্ষী অসংখ্য ভাঙা বাড়ী। ম্যালেরিয়া, কলেরায় গাঁ উজাড় হ'য়ে শূন্যপ্রায় হ'য়ে এসে ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই পানীয় জলের অভাব। যারা পেরেছে তারা সহরে পালিয়ে বেঁচেছে।

বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভের পূর্ব্বে শ্রীনিকেতনের আশেপাশের চারিদিককার গ্রামের অবস্থা ছিল এমনি শোচনীয়।

গ্রামগুলিতে জলনিকাশের ব্যবস্থা ছিল না। যেখানে সেখানে বর্ষার জল জমে তার মধ্যে এবং অগভীর ডোবার জলে মশারা নির্ব্বিবাদে বংশবৃদ্ধি করে পল্লীবাসীদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার বিষ বিস্তার করত। গ্রামের রাস্তাগুলো গরুর গাড়ীর চাকায় ঘসা লেগে ক্ষয়ে গিয়ে হ'য়ে পড়েছিল অনেকটা অগভীর খাতের মত। তার মধ্যে বর্ষাকালে জলে জমে নালার সৃষ্টি করত, এবং লোক চলাচলের অযোগ্য হ'য়ে পড়ত।

পল্লীবাসীদের দৃষ্টি মোটেই সেদিকে পড়ত না। তারা যা' তা' করে নিতান্ত তামসিক ভাবে কাটিয়ে দিত দিনের পর দিন। প্রায় কোনো গ্রামেই পাঠশালার বালাই ছিল না। সামান্য লিখ্‌তে পড়তে জানত গ্রামের খুব অল্প লোকেই। বৃহৎ পৃথিবীর কোন্‌ খানে যে কি উন্নতি হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো খোঁজ খবর রাখা ত দূরের কথা। কোনো শিল্প কাজ শেখবার ব্যবস্থা ছিল না। গ্রামে তাঁতি হয়ত ছিল, কিন্তু তাঁত বুন্‌তে ভুলে গিয়েছিল। চাষারা ভাগাড়ের মরা গরুর ছাল ছাড়িয়ে নিয়েই নিশ্চিন্ত—সেই চামড়াকে শোধন করে যে নানা রকম কারুকার্য্যময় শিল্পকার্য্য হ'তে পারে তা ভাবতেই পারত না।

কামোর গ্রামে ছিল বটে কিন্তু সেই মামুলী ধরণে গরুর গাড়ীর চাকা করতেই তাদের সমস্ত বিদ্যেবুদ্ধি খরচ হ'য়ে যেত,—আর বেশীদূর এগোত না। কুমোরও হাঁড়ি কলসী ছাড়া আর কিছু গড়তে জানত না। বীরভূমের আলম [illegible] [illegible] গালা গালিয়ে তাতে বিচিত্র রং করে কত

ফুলুরির অবিকল নকল গড়তে পারে স্থানীয় গালা-শিল্পীরা। সেগুলো স্বভাবের সৃষ্টির এত কাছে যায় যে সত্যিকারের ফল বলে ভ্রম হয়। এমন কি ভাঙা কাঁচা আম থেকে আঠা গড়িয়ে পড়ছে—এতটা খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত। বাদাম কিস্‌মিস পেস্তা প্রভৃতি মেওয়া থালায় সাজিয়ে দিলে সেগুলো যে গালার তৈরী—তা কেউ বল্‌তে পারে না।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম ভাগে ওলন্দাজরা যখন ব্যবসা বাণিজ্যের জন্ম এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে—তখন তারা এই কুটীর শিল্পটি এদের দিয়ে যায়। তারপর বংশ পরম্পরায় একদল শিল্পী চলে আসছে যারা এই সুন্দর কুটীর শিল্পটি অবলম্বন করে জীবিকানির্ব্বাহ করে। কিন্তু শিল্পের সৃজন প্রতিভার কাজ; বংশগত ব্যবস্থা হ'লে কৃত্রিমতা বশত তার অবনতি ঘটে। তখন তাতে আর নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় থাকে না। এখানেও তাই ঘটেছিল। সেই একঘেঁয়ে খেলনা গড়ার ভিতরেই ওদের সেই গালার শিল্প সীমাবদ্ধ ছিল এতদিন।

বীরভূম জেলা আগে চীপ্ সাহেবের কুঠীর আমলে রেশমের ব্যবসার জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার শাল গাছে, কুলগাছে, তুঁতে গাছে নানা জাতের গুটিপোকা মেলে প্রচুর। তাদের গুটিগুলো যে এমন দামী, তার থেকে যে অত্যন্ত মজবুত এবং মূল্যবান সোনার রংয়ের সূতো পাওয়া যায় দরিদ্রপল্লীবাসী তা' ভুলেই গিয়েছিল। এমনি যখন শান্তিনিকেতনের নিকটবর্ত্তী বোলপুরের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্রামগুলি দিনের পর দিন ধ্বংসপথের যাত্রী হয়ে চলেছিল তখন দরদী কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল। তিনি আর প্রতিবেশীর এ দুর্দ্দশা দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারলেন না।

১৯০৭ সালে "স্বদেশী সমাজের" ৯৫ পাতায় "পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর" বক্তৃতায় দেখিতে পাই কবি পল্লী সংগঠনের প্রণালী প্রচার করছেন,—"দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্ম্মের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্য্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন তবেই স্বায়ত্ত শাসনের চর্চ্চা দেশের সর্ব্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্ম্মগোলা সমবেত পণ্য ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্ম ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে, সেখানে কর্ম্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইবে।" কবি যা বক্তৃতায় প্রচার করেছিলেন, তাকে রূপ নিতে দেখি ইং ১৯২২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে।

সফলতার পথে বাধা ছিল অনেক। কারণ মনের আদর্শ উচ্চ এবং উৎসাহ অশেষ থাকলেও মূলধন ছিল সামান্ম এবং আজকের মত উৎসাহী কর্ম্মীদলও তখন জোটেনি। তাই আজকের মত এত ব্যাপকভাবে প্রথমে কাজ আরম্ভ হ'তে পারে নি।

কিন্তু কোনো মহৎ কাজে বোধ হয় সাহায্য আসে ওপর থেকে। কবির এই পল্লী কল্যাণ কামনাকে রূপ দেবার জন্মে বিত্ত আসতে লাগল বিদেশ থেকে। আমেরিকার কোটিপতি মিঃ স্ট্রেট নামে একজন বিশ্ববন্ধু ধনীর বিধবা পত্নী মিসেস স্ট্রেট (পরে মিসেস এলমহার্ষ্ট) এই প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ব্যয় নির্ব্বাহ করতে সুরু করলেন।

সুদূর সাগর পারের এক আদর্শবাদী যুবক ইংরাজ বন্ধু এলেন তাঁর আশ্চর্য্য কর্ম্মক্ষমতা এবং অপরিশ্রান্ত উৎসাহ নিয়ে। এসেই তিনি কবির আদর্শ অনুযায়ী তাঁর পরামর্শ নিয়ে সুরুল গ্রামের এই নবক্রীত ভবন-সংলগ্ন ভূমিতে কৃষিকেন্দ্র স্থাপিত করলেন। তাঁর নাম মিঃ এল-কে-এলমহার্ষ্ট। সর্ব্বপ্রথমে ৯টি ছাত্র ও ৩জন কর্ম্মী নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন হয়। পূর্ব্বেই বলেছি শ্রীনিকেতন তখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ক্রমে ক্রমে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। এবং দুই একটি করে বাড়ী উঠতে আরম্ভ করে।

আগামী ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠান ১১ বছরে পড়বে। এই

১১ বছরের মধ্যে, বোলপুর সুরুল গ্রামের এক পাশে পুরাতন ছাঁদে গড়া এই সুবৃহৎ তিন তলা বাড়ীটিকে কেন্দ্র করে, বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর সুন্দরভাবে সাজানো অনেকগুলো নূতন বাংলো বাড়ী দেখতে দেখতে গড়ে উঠেছে।

প্রথমে কৃষি ও ছুতোরি নিয়ে কাজ সুরু হয় ক্রমশঃ শ্রীনিকেতনের কাজের প্রসার ঘটে। তখন ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদের তাঁতের কাজ, গো পালন, পক্ষীরক্ষণ, কর্ম্মকার-বৃত্তি, চর্ম্মকারবৃত্তি শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

রাশিয়ার অমর ঔপন্যাসিক কাউন্টলিও টলষ্টয় যেমন কৃষিকর্ম্মকেই মানুষের জীবিকা উপার্জ্জনের স্বাভাবিক উপায় মনে করতেন এবং ধনীর সন্তান হয়েও নিজের হাতে কৃষিকর্ম্ম করতে লজ্জা পেতেন না, এবং সহরের কলকারখানার কাজ মানুষের স্বাস্থ্য ও নৈতিক অবনতির কারণ বলে প্রচার করতেন তেমনি কবি রবীন্দ্রনাথ তা' ঠিক প্রচার না করলেও তাঁর জীবনের.. কাজে তা' প্রকাশ করেছেন দেখতে পাই।

১৯০৬ সালে তিনি নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্রকে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা শিখবার জন্যে। যে ভারতের শতকরা ৯৯ জন কৃষিজীবি, তার আর্থিক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব কৃষির মধ্য দিয়েই। কিন্তু যেভাবে এদেশে এখন কৃষিকর্ম্ম চল্‌ছে সেভাবে নয়—উন্নততর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুমোদিত উপায়ে। রাশিয়ায় যার সফলতার সম্ভাবনা নিয়ে এখন, পরীক্ষা চলছে, সেই Collective farm ও সমবায় সমিতি সম্বন্ধে কবি ইং ১৯০৭ সালে "স্বদেশ সমাজে" লিখেছেন ১০৪ পাতায় :—

"পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন একক ভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামী ও মজুরী করিয়া মরিতে হইবে। য়ুরোপ আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইতেছে—নিতান্ত দারিদ্র্যবশতঃ সে সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না—অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক একটি মণ্ডলী অথবা এক একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের সমস্ত উৎপন্ন ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামী কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বই লোকসান হয় না। পাটের ক্ষেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে—গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গো-পালন ও মাখন, ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।"

শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ-গুলিতে অনেকটা এই ভাবেরই পরীক্ষা চল্‌ছে—সে আমরা ক্রমশঃ দেখব। শ্রীনিকেতন বিশ্বভারতীর যা' কিছু কর্ম্ম প্রচেষ্টা সব কিছুই পল্লীসেবাকে কেন্দ্র করে। পল্লীসেবার ভিতর শিক্ষা, শিল্প এবং কৃষী প্রধান।

১৩১১ সালে প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজ" গ্রন্থে "সফলতার সদুপায়" নির্দ্দেশ করেছেন,—"সর্ব্ব প্রযত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্ত্তকার্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গলকর্ম্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন।" কবির বহু বৎসর পূর্ব্বের দেখা স্বপ্ন আজ শ্রীনিকেতনের কাজে সফলতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করছে। উপরোক্ত বিভাগগুলির কার্য্য যা-তে প্রতিবেশী গ্রামবাসীদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রচার করতে পারা যায় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা চলতে থাকে। আর সেই চেষ্টাকে সফল করে তুলবার জন্য পল্লীসেবা বিভাগ স্থাপিত হয়।

পল্লীসেবা করতে গিয়ে দেখা গেল যে শ্রীনিকেতনের আশে পাশের গ্রামবাসীরা নানা ব্যাধিক্লিষ্ট। বিশেষ করে গ্রামগুলো ম্যালেরিয়াতে দিন দিন প্রায় জনশূন্য হয়ে উঠছে।

সেই জন্যে শীঘ্র চারপাশের গ্রামবাসীদের জন্যে শ্রীনিকেতনে চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এবং কিছুদিনের মধ্যে সেখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনও করা হ'ল। মিস্ গ্রীণ নাম্নী জনৈকা সেবাভিজ্ঞা ইংরাজ মহিলা অনেকদিন এই বিভাগের কার্য্যে সাহায্য করেন। সেই থেকে শ্রীনিকেতনে এখন পর্য্যন্ত এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের কাজটি চলে আসছে।

বৎসর দুই এই ভাবে কাজ চলবার পর শ্রীনিকেতনের প্রথম কার্য্য পরিচালক মিঃ এলমহার্ষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন ভ্রমণে গমন করেন। তখন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক ৺সন্তোষচন্দ্র মজুমদার শ্রীনিকেতনের কার্য্য পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি বিভিন্ন পল্লীর ৬টি ছেলেকে নিয়ে আধুনিক প্রণালী অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষাদান সম্বন্ধে নানা পরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন। এই নবস্থাপিত শিক্ষাকেন্দ্রের নাম দেওয়া হয় "শিক্ষাসত্র।"

এইরূপে কিছুকাল নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠানটি একটু একটু করে গড়ে উঠ্‌তে থাকে। ইতিমধ্যে অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র মজুমদার অকালে হৃদ্‌রোগে ইহলোক ত্যাগ করেন, এবং মিঃ কে- কাসাহারারও মৃত্যু ঘটে। সহসা দুইজন বিশিষ্ট কর্ম্মীর এই অকাল মৃত্যুতে যথাক্রমে শ্রীনিকেতনের শিক্ষা-বিভাগ ও ছুতোরের কাজ এবং সব্জীবাগান বিভাগের বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল। তখন শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদলাল শ্রীনিকেতনে কর্ম্ম-কর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন। মাঝে শ্রীনিকেতনের পূর্ব্বতন কার্য্য পরিচালক মিঃ এলমহার্ষ্ট চীন থেকে ফিরে এসে কয়েক মাসের জন্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেছিলেন।

তারপর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কবি-পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ যখন বিলেত থেকে ফিরে এলেন তখন শ্রীনিকেতনের কার্য্যভার তাঁর উপর দেওয়া হল।

বর্ত্তমানে শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবা, শিক্ষা, কারুশিল্প, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং কৃষি, এই পাঁচটি বিভাগ আছে। এই পাঁচটি কার্য্য বিভাগ নিয়েই মোটামুটি "বিশ্ব-ভারতীর পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠান"। আজকাল উপরোক্ত বিভাগ পাঁচটিতে নিম্নলিখিত কাজগুলো পরিচালনা করবার চেষ্টা হ'চ্ছে।

পল্লীসেবা

১। শ্রীনিকেতনের চারিপাশের গ্রামগুলির অধিবাসীদের নিয়ে সংঘবদ্ধ করা ও তাদের সম্মিলিত করে গ্রামে গ্রামে পল্লীসংগঠন সমিতি গঠন করা।

২। শ্রীনিকেতনের চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্মীদের দ্বারা পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতি চেষ্টা।

৩। গ্রামে গ্রামে ঋণদান সমিতি গঠন করে গ্রাম-বাসীদের ঋণমুক্ত করে ধীরে ধীরে তাদের আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করা।

৪। বিভিন্ন গ্রামের বালকদলকে নিয়ে "ব্রতী বালকদল" গঠন করা ও তাদের স্বাস্থ্য, নিয়মপালন, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দিয়ে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি দ্বারা কর্ম্মঠ করে তুলে দেশের ও দশের নানা জনহিতকর সমাজ সেবার উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার ব্যবস্থা করা।

৫। ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর অতীত ও বর্ত্তমানের প্রকৃত অবস্থা জান্‌বার জন্য "পল্লীতথ্য" সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকা।

৬। গ্রামে গ্রামে শিল্প ও কৃষির উন্নতি চেষ্টা করা।

শিক্ষা

১। শিক্ষাসত্র বা Experimental School.—এই বিভাগে শ্রীনিকেতনের আশে পাশে গ্রামের ছেলেদের লেখাপড়া ও নানা দেশবিদেশের নানা বিষয়ের খবর জানানোর সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা আছে যার দ্বারা এই সব গ্রামের ছেলেরা ভবিষ্যতে গ্রামে বসেই চাষ বাস করার অবকাশে যে কোনো একটি ব্যবসার দ্বারা স্বাধীনভাবে পল্লীসমাজের একজন বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যক্তিরূপে জীবিকা অর্জ্জন করতে সক্ষম হবে।

এইজন্যে তাঁতের কাজ, ছুতোরের কাজ চর্ম্মকার বৃত্তি, কর্ম্মকার বৃত্তি, বই বাঁধানো, গালার রং করা, নানা রকম সুন্দর সুন্দর শিল্প-সামগ্রী প্রস্তুতবিধি বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপন রুচি এবং স্বাধীন মনোবৃত্তি অনুযায়ী যে কোনো ছেলে যে কোনো বিষয় শিখতে পারে। দূর গ্রামবাসী ছাত্রদের আহার্য্য চাউল ছাড়া আর কিছু দিতে

হয় না। তাদের থাকবার থাবার ও শিখবার সমস্ত ব্যয়ভার প্রতিষ্ঠান বহন করে।

২। নৈশ বিদ্যালয়—শ্রমজীবি, দরিদ্র যুবক ও বয়স্কদের শিক্ষার জন্যে গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হ'য়েছে।

৩। পল্লীর বয়স্ক অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য পল্লী পাঠাগার স্থাপন, ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতা, জনসভা, কথকতা সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।

৪। গ্রামের মহিলাদের শিক্ষা—মহিলা শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে পল্লীর মহিলাদের শিক্ষার জন্য "মহিলা সমিতি" গঠন করা হয়েছে। সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সূচীশিল্পকর্ম্ম, আসন বয়ন প্রভৃতি লাভজনক শিক্ষা দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে সপ্তাহে দুই দিন করে শিক্ষয়িত্রী গ্রামে গ্রামে গিয়ে থাকেন।

৫। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষাধীনে শ্রীনিকেতনে একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। নিকটস্থ গ্রামের ছোট মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম সুকুমার শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

৬। রসায়নাগার, মানমন্দির, পুস্তকালয়—এ ছাড়া উন্নততর কৃষিবিভাগের ছাত্রদের জন্যে রসায়নাগার, পুস্তকালয় ও মানমন্দিরে উপযুক্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

বিদেশের ও স্থানীয় ছাত্রদের জন্য তাঁতের কাজ, ছুতোরের কাজ, চর্ম্মকার বৃত্তি, কর্ম্মকার বৃত্তি, গালার কাজ, বই বাঁধাই কাজ প্রভৃতি নানা লাভজনক শিল্প ব্যবসায় উপযুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রামের মেয়েদের মধ্যেও বয়নশিল্প শিক্ষা বিস্তার করিয়া আসন, সতরঞ্চি, শাড়ী প্রভৃতি বুনিতে উৎসাহ দিয়া সুতা বিতরণ করিয়া তাহাদের অবসর সময়ে উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়।

২। গালা শিল্প, মৃণ্ময় শিল্প, বই বাঁধাই। কবির পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর অধ্যক্ষতায় ও একজন মহিলা চিত্রশিল্পীর সাহায্যে এই তিনটি কারুশিল্প ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে।

৩। বয়ন ও রঞ্জন শিল্প—তাঁতে কাপড়, চাদর, আসন, পরদা, সতরঞ্চি প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামবাসী ছাত্রদের বুনতে শেখানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ে নানা রকম রং করা ও বিচিত্র ছাপ দেওয়ার পদ্ধতি (calico printing) শেখানো হয়।

৪। রেশম শিল্প—রেশমের জন্য কেমন করে গুটিপোকা প্রতিপালন করতে হয় এবং কি উপায়ে সেই গুটি থেকে রেশম-সূতা বের করে নেওয়া যায় অভিজ্ঞ কর্ম্মীর সাহায্যে সে শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা আছে।

৫। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক—গ্রামে গ্রামে সমিতি গঠন করে অল্প সুদে সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কুসীদজীবিদের কবল থেকে গরীব চাষাদের রক্ষা করা এর একটি উদ্দেশ্য।

কৃষি

১। কৃষি—একজন বহুদর্শী কৃষি অধ্যাপক শস্য ও সব্জী উৎপাদন, জমিতে সার দেওয়া, জমির উৎকর্ষ সাধন করা প্রভৃতি বিষয়ে দেশ বিদেশের ছাত্রদের নিয়ে অধ্যাপনা করে থাকেন ও হাতে কলমে শিক্ষা দেন।

বিলিতি কলের লাঙল দিয়ে প্রতিষ্ঠানের বহু শত বিঘা জমী এককালে চাষ দেওয়ার প্রথা অনুসৃত হয়।

২। পশুপালন—কৃষি বিভাগের আর একটি অঙ্গ গো ছাগ মহিষাদি পশুপালন। শ্রীনিকেতনে উপযুক্ত কর্ম্মীর তত্ত্বাবধানে গ্রামবাসীদের ও উন্নততর ছাত্রদের সে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। গো মহিষ ছাগের পরিত্যক্ত মলমূত্রকে জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কেমন করে সার রূপে ব্যবহার করতে হয় তা' শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই পশুগুলিকে উপযুক্ত যত্ন ও বিশেষ বিশেষ খাদ্যদানের ব্যবস্থা করে তা'দের দুগ্ধ দানের শক্তির উৎকর্ষ সাধনের উপায়ও শিক্ষাদানের অন্তর্গত।

৩। পক্ষী পালন—মুরগী পেরু পালনও কৃষি বিভাগের মধ্যে। চট্টগ্রামের মুরগী এবং প্রচুর ডিম্ব দানে সক্ষম বিলাতী হোয়াইট লেগ হর্ণ মুরগী স্থানীয় আবহাওয়ার পক্ষে

উপযুক্ত কিনা এই বিভাগে তার পরীক্ষা চল্‌ছে। শিক্ষিত কর্ম্মীর তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে তাদের কিরূপ খাদ্য প্রদান ও অবস্থান প্রণালী অবলম্বন করা যেতে পারে তা' শিক্ষানবীশদের শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে আর গ্রামবাসীদের মধ্যে এই উন্নততর জাতীয় মুরগীর ডিম্ব বিতরণ করে বিভিন্ন গ্রামগুলোতে তাদের বংশ বিস্তারে সাহায্য করা হচ্ছে। গ্রামের দেশীয় মোরগগুলির পরিবর্ত্তে এই দুই উন্নত জাতীয় মোরগ বিতরণ করে ভবিষ্যত বংশ যাতে আকারে বড় হয় এবং বেশী পরিমাণ ডিম্ব প্রদান শক্তির অধিকারী হয় এমন শঙ্কর জাতীয় মুরগী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীবৃন্দ গ্রামবাসীদের কোনো অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হলে, সানন্দে তাদের ক্রিয়াকর্ম্মে যোগ দিয়ে থাকেন ও সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে আহার করেন।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরার' ২১৩ পৃষ্ঠায় আছে, "একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়—মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম্ম না বলে কি বলব? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনই পৃথিবীতে বড় হ'তে পারে না—অন্যের অবজ্ঞা তাদের সইতেই হবে।" এমনি করে indirect wayতে গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা এবং অস্পৃশ্যতা পাপের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীরা। এই উদাহরণ দেখে অনেক গ্রামবাসীর মতের পরিবর্ত্তন হতে দেখা গেছে। আগামী ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠান ১১ বছরে পড়বে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী এর জন্মদিন। এই বিশেষ দিনে সুরুলে একটি বিরাট মেলা হয়। এ মেলায় স্থানীয় আশেপাশের গ্রামবাসীরা দলে দলে যোগ দিয়ে কি কি আনন্দ ও শিক্ষা পেতে পারেন তাহা কবি কল্পনা করেছিলেন ইং ১৯০৭ সালে "স্বদেশ সমাজে" ৮ পৃষ্ঠায়। "দেশী ধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা গান, আমোদ আহ্লাদে দেশের লোক দূর দূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষি দ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভাল কথক, কীর্ত্তন, গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা কিছু বলিবার কথা আছে যাহা কিছু সুখ দুঃখের পরামর্শ আছে—তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলায় আলোচনা করা হইত।"

শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠানের জন্মদিনে কবির দেশহিতকর্ম্মের অনুরাগী ভক্তবৃন্দ অনেকে দূরদূরান্তর থেকে বোলপুরে বিশ্বভারতীতে তীর্থযাত্রা করে' বহু দ্রষ্টব্য বিষয় দেখে প্রচুর আনন্দ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফেরেন।"

সতীশ রায়

জ্ঞান-দা

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

১

প্রথম আলাপের পর দিন হইতে জ্ঞানেন্দ্র সরকার আমাদের নিকট জ্ঞান-দা নামেই অভিহিত হন। বয়সে যে লোকটি আমাদের চেয়ে ছোট, এ কথা বলিলে মিথ্যা হয়, তবে কথাগুলি ছিল তাঁ'র বড়ই। পৃথিবীর বর্ব্বর-মানুষের যুগ হইতে সুসভ্য মনুষ্য জাতির ইতিহাসটি ধারাবাহিক ভাবে তাঁ'র ওষ্ঠপুট দিয়া তুব্ড়ির মত যেমন করিয়া ফুল কাটিয়া পড়িত, তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই। তাই মাঝে মাঝে একটু কৌতুক করিয়া বলিতাম,—'না, জ্ঞানেন্দ্র নামটি আপনার ব্যর্থ হয়নি জ্ঞান্-দা সত্যি যাকে বলে জ্ঞান্ সমুদ্র, আপনিও ঠিক তাই,'—কথা শুনিয়া জ্ঞান্-দা অম্নি ফিক্ করিয়া হাসিতেন, তারপর যথাসম্ভব গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিতেন, —'তা' সন্ধান একটু রাখ্তে হয় বৈ কি দাদা; দিন রাত্রি শুধু আইন আর মক্কেল নিয়ে ভুলে থাক্‌লেই ত আর সভ্য জগতের পরিচয় জানা চলে না, মাথাটাকে একটু খাটাতে হয় বৈ কি দাদা—' জ্ঞান-দার কথাটা আমরা রৈ-রৈ করিয়া সমর্থন করিতাম,—আসলে জ্ঞান্-দা আমাদের এ কৌতুক বুঝিতেন না।

জ্ঞান্-দার বাল্যের ইতিহাস আমরা জানি না, তবে জ্ঞান্-দা যেদিন প্রথম চাপ্‌কান আঁটিয়া আমাদের কোর্টে 'প্র্যাক্‌টিস্' করিতে আসেন, সেই দিনই হয়, আমাদের সহিত পরিচয়। শুনিলাম, অদৃষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য জ্ঞান্-দাকে ইতিপূর্ব্বে তিন-চারিটি আদালত ঘুরিতে হইয়াছে, কিন্তু বিধি বাম, জ্ঞান্-দা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, তাই এইখানে আসিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিবার ইচ্ছা! আমরা সেদিন বলিয়াছিলাম,—'এখানকার অবস্থা ত তেমন সুবিধে নয়, মশায়; দেখ্‌তেই পাচ্ছেন, ঘরের খাচ্ছি আর বনের মোষ তাড়াচ্ছি, তবে যদি backing আর সেই সঙ্গে নিজের কিছু parts থাকে, তা হ'লে হয়ত·

জ্ঞান্-দা বাম হস্তের তর্জ্জনী ঘুরাইয়া উত্তর দেন—'হাঁ, ঐ parts জিনিষটা আছে ব'লে এখনও impatient হ'য়ে উঠিনি ম'শায়,···আচ্ছা, দেখাই যাক্ না···'

জ্ঞান্-দার কথার আর আমরা উত্তর দিই নাই,—শুধু সেই দিন হইতে আমরা তাঁহাকে দেখিয়াই আসিতেছি।'

তিরিশের কোটায় পা দিতে না দিতেই জ্ঞান্-দার মাথার কেন্দ্রস্থলে নদীর চড়ার মত একটি টাক গজাইয়া ওঠে, কারণ জিজ্ঞাসা করায় জ্ঞান-দা উত্তর দিয়াছিলেন 'সারা দুনিয়ার খবরগুলো এরই ভেতরে গজ্ গজ্ করছে দাদা,··· এখানে কি আর চুলের রাজ্য টিক্‌তে পারে—' হয়ত হবেও, কিন্তু এর জন্য দাদাকে কোন দিন দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখি নাই!

জ্ঞান্-দা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কোর্টে আসিতেন, আমরা দেখিতাম, আদালত প্রাঙ্গণের বহু শাখা প্রশাখা সমন্বিত বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া জ্ঞান-দা দুই চারিজন লোকের সহিত ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছেন,—আশ-পাশের দুই একজন দাদার কীটদষ্ট চাপকানের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। দাদার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই!

সেদিন দেখি, দাদার চৌদিকে মস্ত ভিড়! ভিড়ের মধ্যে দাদা কণ্ঠস্বরের পর্দ্দাকে অসম্ভব রকম চড়াইয়া তুলিয়াছেন। ব্যাপারটি কি জানিবার জন্য দৃশ্যক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময়ে দেখি, ভিড় ভাঙিয়া যাইতেছে; আর তা'রই ভিতর হইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম-দাদা উদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে আমাদেরই দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

মুখের দিকে চাহিতেই দাদা হাসিয়া বলিলেন—'ইচ্ছে করলে আর কি না হয় ম'শায়,·· practice,···ও একটা trifling matter ছাড়া ত আর কিছুই নয়···'

কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে আমাদের বিলম্ব ঘটিল না;—বুঝিলাম, দাদার বক্তৃতার চার এতদিন পরে মক্কেল মৎস্য-কুলকে সত্যসত্যই মজাইয়া তুলিয়াছে, এখন বঁড়্শী-যন্ত্রে পটাপট্ গাঁথিয়া তুলিতেই যেটুকু দেরী!

বলিলাম,—'দাদা, ঠিক্ মতলব বাৎলেছেন আপনি, দিন কয়েক ঐ ঘণ্টাখানেক ক'রে বক্তৃতা দিলেই আর দেখ্তে হবে না,···দু দিনেই একেবারে roaring practice,'

দাদার মুখের হাসি আর ধরে না,—পকেট হইতে একটি আনি বাহির করিয়া টাট্কা কয়েক খিলি পান খাওয়াইয়া দাদা আমাদের আপ্যায়িত করিলেন।

কিন্তু ইহাতেও দাদার অদৃষ্টলক্ষ্মী মুখ ফিরাইল না; প্রত্যহ রিক্তপকেটে কোর্টে গিয়া রিক্তপকেটেই দাদা নীড়ে ফিরিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায়। বাড়ী ফিরিবার মুখে সেদিন ইচ্ছা হইল জ্ঞান্-দার বাসাটা একবার ঘুরিয়া যাই।

ছোট্ট বারান্দা,—বারান্দা পার হইয়া দালান। দালানের মধ্য-স্থলে হাতল-খসা এক চেয়ারে বসিয়া জ্ঞান্-দা কালি-পড়া এক আলোর সাহায্যে নিজের দক্ষিণ করতলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একদৃষ্টে কি দেখিতেছেন। টেবিলের একেবারে কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, জ্ঞান্-দার তবু ভ্রূক্ষেপ নাই, ভাবিলাম লোকটির হঠাৎ সমাধি হইল নাকি!

সহসা দৃষ্টি পড়িতেই জ্ঞান্-দা একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—'ভয় নেই দাদা,···আমি···আমি; কি দেখ্ছিলেন, অমন ক'রে বলুন ত'—

জ্ঞান্-দা আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করিতেন,—বলিলেন 'ও সব কিছু বুঝ্বে না বিজন,' এবং একটু থামিয়াই হাত-খানি একেবারে প্রসারিত করিয়া বলিলেন—'দেখ্তে পাচ্ছ, এই লম্বা দাগ্টা,...এই যে এখানে এসে মিলিয়ে গেছে,...দেখেছ?'

'হাঁ···হাঁ,···এতো আমারও হাতে রয়েছে দাদা···'

জ্ঞান্-দার গুম্ফের পাশে এক ঝিলিক হাসি ফুটিয়া উঠিল, ···বলিলেন—'কই, দেখি তোমার হাত,···হাঁ, আছে বটে, ···তবে এমন কিছু নয়···কিন্তু আমারটা যা' আছে—' বলিয়া দাদা মাথা দোলাইয়া চক্ষু দুইটি একবার মুদ্রিত করিলেন।

'···কি আছে দাদা--'

জ্ঞান্-দা এবার উৎসাহিত হইয়া বলিলেন,—'শোন, এই লম্বা দাগ্টাকে বলে 'ফেট্-লাইন'···আর এই যে দেখ্ছ,··· এর নাম হ'চ্ছে 'হেড্ লাইন;' 'ফেট্লাইন' যখন 'হেড্-লাইনকে' 'ক্রস্' ক'রে 'জুপিটারে' এসে পৌঁছুবে, তখন আর কিছু দেখ্তে হবে না ভায়া,···রাতারাতি কিছু বড় রকমের একটা হ'য়ে উঠ্বো। বেশী নয়···আর দুটো বছর···বড় জোর তাই—'

হাসিয়া বলিলাম—'দাদা, সব দিকেই একেবারে square দেখ্ছি,...জ্যোতিষও তা' হ'লে শিখেছেন?'

'শিখিনি? ··আর একটা বছর পড়্তে পার্লেই ত একেবারে জ্যোতিষার্ণব হ'য়ে যেতাম,···কিন্তু patience··· patience নেই ভায়া; নকুড় জ্যোতিষার্ণবের নাম শুনেছ ত?···কল্কাতার?'

'হাঁ-হাঁ শুনেছি বটে,···নকুড় ভট্চাজ ত···বিখ্যাত জ্যোতিষী বটে...' দাদা হাসিতে লাগিলেন, 'তাঁরই কাছে শিখেছিলাম, বলিয়াই নিজের দক্ষিণ করতলটির উপরে দাদা চকিতে একবার দৃষ্টি ফিরাইলেন।

মিনিট কয়েক পরে উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দাদা বাধা দিলেন, 'এত শীগ্গির আমি ছেড়ে দেব না ভায়া, এসেছ যখন, একটু জলযোগ ক'রে যেতেই হবে,···'

হাসিয়া বলিলাম—'সে কি দাদা?'

'কিছু নয়, কোন দিন ত আর এ মুখো হবানা, ওরে ও ক্যাব্লা—'

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে বছর নয়েকের একটি ছেলে আসিয়া হাজির। মুখের কাঠামো দেখিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইল না

যে এটি জ্ঞান্-দারই নিজস্ব। কেবলরাম আসিতেই জ্ঞান-দা তা'র হাতে একটি আনি গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—'যা শীগ গির চার পয়সার গরম মুড়ি কিনে আন্ দেখি, এক্ষুণি আস্‌বি—'

আনি হাতে কেবলরাম হইল অদৃশ্য'—তা'রপর মিনিট কয়েক চুপ্ চাপ।

জ্ঞান্ দা বাহিরের দিকে চাহিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গানের একটা কলি ভাঁজিতে লাগিলেন, আমি ইত্যবসরে ঘরের ভিতরটি চট্ করিয়া এক নজর দেখিয়া লইলাম।

আলো-বাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে ঘর, দরজামাত্র একটি, জান্‌লার ব্যবস্থা নাই, মেঝের উপর ছেঁড়া কাগজ আর আবর্জ্জনার স্তূপ,—একটি বিশ্রী 'গ্যাস্' ঘরটিকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। বাহিরের ঘর হইতে অন্দরের দিকেও নজর চলে। অন্দরেও বাহিরের অনুরূপ একটি আলো জ্বলিতেছে, ম্লান আলোকে কক্ষতল করুণ। রান্না-ঘরের দাওয়ার উপর দিয়া একটি নারী ক্ষিপ্রগতিতে চলিয়া গেল। পলকের জন্য তা'র মুখখানি আমার দৃষ্টিগোচর হইল। সুন্দর অথচ শীর্ণ একখানি মুখ, সে মুখের কৈশোর শ্রী এখনও তেমন ম্লান হয় নাই। বুঝিলাম, ইনিই জ্ঞান্ দার অর্দ্ধাঙ্গিনী।

স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতেছি, এমন সময় কেবলরাম আসিয়া দাঁড়াইল।

'এত দেরী যে হাঁরে, কই মুড়ি কই?—' জ্ঞান্-দা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কেবলরামের মুখ শুষ্ক, চক্ষু দু'টি ছল্ ছল্ করিতেছে। কয়েক মুহূর্ত্ত তার মুখ হইতে কোন কথাই ফুটিল না। বুঝিলাম, একটা কিছু কাণ্ড হইয়া গেছে। জ্ঞান্-দা এবার ভ্রূকুটি করিতেই সে যাহা ব্যক্ত করিল, সংক্ষেপে তা এই—

নসীময়রার দোকানে আজ তিনমাস যাবৎ জ্ঞান্ দার পাঁচ আনা পয়সা বাকী, চাহিয়া চাহিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে নসী পাওনার আশায় জলাঞ্জলি দেয়, আজ কেবলরামকে কাছে পাইয়া তাহার সমস্ত কথাই মনে হয়, এবং জ্ঞান্-দার উদ্দেশে যাহা কিছু মুখে আসে নিঃশেষে সমস্তই সে বর্ষণ করে;—শুধু তাহাই নয়, যৎকিঞ্চিৎ লাভজ্ঞানে আনিটি বেপরোয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া নসী কেবলরামকে সরাসরি বিদায় দিয়াছে, এবং শেষে নাকি এটুকু বলিতেও ভুল করে নাই,—'মোক্তার বলিয়া জ্ঞান-দাকে নসী যেটুক রেয়াৎ করিয়াছে তাহাই যথেষ্ট,—অন্যের বেলায় হইলে সেটুকুও চলিত না!

ব্যাপার শুনিয়া আমি ত অবাক্। জ্ঞান্-দার মুখ দিয়া বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। উদাস অসহায় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তা'রপর বিদ্যুৎ গতিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন 'একটু ব'স বিজন, আমি একবার ভেতর থেকে আসি'

জ্ঞান্-দা হইলেন অদৃশ্য। কয়েক মুহূর্ত্তপরে জ্ঞান্ দা আবার প্রবেশ করিলেন। একখানি রেকাবীতে কয়েক চির পেঁপে আর একটি বেল, টেবিলের উপর রেকাবীটি রাখিয়া দিয়া জ্ঞান দা বলিলেন,—'খাও তোমার গরীব দাদার যা' জুটেছে তাই এনেছে ভাই, তা'র ত আর সঙ্কোচ নেই.'

জ্ঞান্ দা হাসিতে লাগিলেন।

পাকা পেঁপে কয়খানি উদরস্থ করিবার পূর্ব্বে কেবলরামের মুখের উপর আমার একবার দৃষ্টি পড়িল। ছেলেটি বেশ নম্র ও ধীর।

বলিলাম,—'কেবল, তুমি দুখানা নেও না '

কেবল ঘাড় বাঁকাইয়া জ্ঞান্ দার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল 'না'

'আঃ তা' কি হয়' জোর করিয়াই দু টুক্‌রা পেঁপে আমি কেবলরামের হাতের ভিতর গুঁজিয়া দিলাম।

'যা দিকিনি বাড়ীর ভেতর, তুখিলি পান যদি পাস,…ও ক্যাব্‌লা…'—জ্ঞান্ দা বলিলেন।

কেবলরাম পেঁপে মুখে পুরিয়া বাড়ীর ভেতর চলিয়া গেল।

সংসারের ধার জ্ঞান দা কোন দিন ধারেন না, তা জানি। মোক্তারী চাপ্‌কানের বদলে বৈরাগীর ঝুলি কাঁধে জ্ঞান দা যদি সারিন্দা বাজাইয়া পথে পথে গান গাহিয়া বেড়াইতেন, তবেই হয়ত শুনাইত ভাল। কিন্তু জ্ঞান-দা তাহা করেন নাই!

জ্ঞান-দা খুব বড় কথা তুলিয়াছিলেন।

'এডিসান খুব বুড়ো হ'য়ে গেছে বিজন, বেচারা হয়ত আর বেশীদিন টিক্‌বেনা, যা' হ'ক লোকটা খুব দিয়ে গেল কিন্তু—'

পেঁপে কয়খানি উদরস্থ করিয়া আমি তখন গ্লাসের জলে মুখ ধুইতেছি, জ্ঞান-দার কথাটা সমর্থন করিয়া বলিলাম' তা' ঠিক—

'ঠিক নয়?'—জ্ঞান্‌দা দৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া টেবিলের উপর একটি টোকা মারিলেন।

কিন্তু সহসা কেবলরামের আবির্ভাব হইতেই এডিসান্‌ বেচারা ফাঁপরে পড়িয়া গেল।

'মা বল্‌লে, পান ত কোনদিন আনোনা তুমি আজ কোত্থেকে জুটবে?'

কথাটায় জ্ঞান্‌দার হুঁস হইয়াছিল। কেবলরামের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমি বলিলাম—'থাক্‌..থাক্‌···পান আমি বড় একটা খাইনে জ্ঞান-দা···'

প্রসঙ্গটি পুনরায় সুরু হওয়ার উপক্রম, কেবলরাম বলিল—'মা বল্‌লে ঘরে আজ চাল বাড়ন্ত···কাল ত আর আনোনি···'

তাও ত, হায়রে এডিসন্‌। জ্ঞান-দা এবার বিরক্ত হইয়া উঠিলেন,—বলিলেন—'যা ঘরে গিয়ে বস্‌গে দিকি, আমি আস্‌ছি···তোদের নিয়ে আর পারা যায় না বাপু...'

এবারও হয়ত এডিসনের না হয় আইন্‌ষ্টানেরই আবির্ভাব ঘটিত,—কিন্তু আমি তাহাতে বাধা দিলাম।

বলিলাম,—'জ্ঞান্‌-দা, বৌদির গল্প ত করলেন না ক—'

জ্ঞান্‌-দা হাসিয়া খুন,- বলিলেন—'বৌ...তোমার বৌদি?···খাসা মানুষ বিজন, চলনা, একবার আলাপ করিয়ে দিই,···কিন্তু বিষম মুস্কিলে পড়্‌বে ভায়া। তন্ন তন্ন ক'রে সংসারের খবরটি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন···তখন তোমার তিষ্ঠুনোই হ'য়ে উঠ্‌বে দায়। সেদিন, অপরেশ বাবুর বউ এসেছিল,...আলাপ জমল,...লাউ আর পুঁই-শাকের কথা নিয়ে। উঠানের 'বান্‌'টা দেখিয়ে তোমার বৌদি বল্‌লেন 'দেখেছ বউ, লাউগাছটা কেমন 'চিক্‌নাই' মেরে উঠেছে, তিনটে লাউ ঠিক এম্‌নি ডাগর হ'য়ে উঠেছিল, ক'দিন ধ'রে বেশ ক্ল'রে খেলাম; এখন ঝুল্‌ছে দুটো, আর ক'টা 'জালি'ও পড়েছে, তোমাদের এদিন একটা দেব বউ, নিয়ে যেও, পুঁই-শাক্‌ খাও ত নিয়ে যেওনা; আর, হাঁ,—তোমাদের বাড়ীতে লঙ্কার চারা আছে?···কাল দুটো দিওনা বউ···, উঠনে পুঁতে দেব, সব জিনিষ কি আর কিনে পারা যায় বউ।' অপরেশ বাবুর বৌ হালফ্যাশানের মেয়ে, বাড়ী ফির্‌বার আগে আমাকে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—'বৌদি, খাসা মানুষ মোক্তার বাবু, এখন থেকে মাঝে মাঝে আপনাদের বাড়ী এক একবার ক'রে আস্‌ব'—সেই থেকে তোমার বৌদির সঙ্গে ওঁর ভাব.···চলনা, আলাপ করিয়ে দিই,···আমার ত আর কোন সঙ্কোচ নেই ভায়া'—জ্ঞান্‌দা আমার সম্মতির আশায় উন্মুখ হইয়া উঠিলেন।

হাসিয়া বলিলাম,—'তা বটে, তবে আজ নয় দাদা, আর একদিন, তার পরেই বলিলাম্‌ বৌদি তা হলে খুব কাজের মানুষ দাদা, সংসারের ভাবনা আপনাকে বোধ করি ভাব্‌তে হয় না?

'···ভাব্‌তে ত হয়না, আমার কথা ত আর তোমার বৌদি কোনদিন বুঝ্‌লেন না; শোন তবে, সেদিন রবিবাবুর 'সোণার তরীতে' পড়্‌ছি:—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা ব'সে আছি নাহি ভরষা।
রাশি রাশি হ'ল ভারা ধান কাটা হ'ল সারা
ভরা নদী ক্ষুর ধার খর পরসা
কূলে একা ব'সে আছি নাহি ভরষা।

তোমার বৌদি বারান্দায় ব'সে আনাজ কুটছিলেন, আমার অবৃত্তির সুর শুনে কাছে এসে বল্‌লেন—'ওকি পড়্‌ছ গা? রামায়ণ না মহাভারত?'

হেসে বল্‌লাম—'রামায়ণও না, মহাভারতও না; রবিবাবুর কবিতা; রবিবাবুর নাম শুনেছ ত···সকলের সেরা কবি?' এতেই লেগে গেল বিভ্রাট। তোমার বৌদি অগ্নিমূর্ত্ত হ'য়ে বল্‌লেন—'কে রবি বাবু? সেরা কবিয়াল সে কেন হবে গা? সেরা কবিয়াল ত আমার ন জ্যাঠা... চণ্ডী মুখ্যোজী? বলি, তা'র কবিতা বুঝি শোননি তুমি?' আপত্তি করলে ব্যাপার দাঁড়ায় গুরুতর, তাই তোমার বৌদির কাছে মান্‌তে হ'ল হার।···তবু তোমার বৌদির মনটা খুব সাদা ভায়া, কোন গোল নেই, উনি বক্‌লে আমাকে থাক্‌তে হয় চুপ,···কিন্তু, আমি বক্‌লে একেবারে উনি হেসেই কুটি

কুটি ; বলেন—'যে লোকের দিনরাতের হুঁস নেই, খেতে হবে কি নাইতে হবে ঠিক নেই, তা'র আবার বকুনি, হাসিও পায়···'বলিতে বলিতে জ্ঞান্-দা হাসিতে লাগিলেন।

অদ্ভুত এই সংসারটি ;—ভাবিলাম, বৌদি না থাকিলে জ্ঞান্-দার হইত কি !

একটু থামিয়া জ্ঞান্-দা বলিলেন—'একটা জিনিষের জন্যে তোমার বৌদি মাঝে মাঝে খুঁত খুঁত করেন বিজন....এমন কিছু নয়, দুগাছা সোণার রুলি, নাড়া হাত,···সবাই নাকি নিন্দে করে, ব'লেছি, দেব তোমাকে, এত তাড়া কিসের 'প্র্যাক্‌টিস্'টা আমার জমেই উঠুক না···'

মনে মনে কি ভাবিলাম জানি না, প্রকাশ্যে কিন্তু কোন কিছু আর ব্যক্ত করিলাম না।

রাত্রি হইয়া আসিয়াছিল ;—কালি-পড়া আলোটা বৃদ্ধের স্তিমিত দৃষ্টির মত তখনও একই ভাবে জ্বলিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম,—'দাদা আজ তাহ'লে—'

'·· আস্‌বে ?...কিন্তু ছাড়্‌তে তোমাকে ইচ্ছে করেনা বিজন ; আচ্ছা, যাবেই যখন, তখন আর কি বল্‌ব ? তবে মাঝে মাঝে এক একবার এসে দেখা ক'রে যেও ভাই, তোমার সঙ্গে আমার মনের বেশ মিল হ'য়েছে কিনা—'

'...হাঁ, আস্‌ব বৈকি' চট্‌পট্ বাহির হইয়া পড়িলাম,—জ্ঞান-দা নিভৃতকক্ষের মধ্যে বসিয়া কি একটা গানের সুর ভাঁজিতে লাগিলেন।

৩

কয়েকটি মাস কাটিয়া গেছে—

উপায়ের দিক একরূপ শূন্য হইলেও,— জ্ঞানদার মুখের হাসিটি ঠিক পূর্ব্বেরই মত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। প্রত্যহ চাপকান আঁটিয়া কোর্টে আসা—বটবৃক্ষতলে বায়ু সেবনের সহিত বিচরণ করা—ও মাঝে মাঝে বার লাইব্রেরীর বার্দ্ধক্যজীর্ণ হাতলহীন চেয়ারে বসিয়া সমব্যবসায়ীদের সহিত সভ্যজগতের বড় বড় তত্ত্ব আলোচনা করা জ্ঞানদার বেশ মজ্জাগত হইয়া গেছে ; প্র্যাক্‌টিস্ তাহার হইবে কিনা জানিনা ;—হওয়ার আশাও হয়ত সুদূর পরাহত, কিন্তু জ্ঞান-দার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কোনরূপে দিনগুলি তাঁহার কাটিয়া গেলেই হইল।

এই কয়টি মাসের মধ্যে জ্ঞান-দার সহিত আমার আলাপটাও বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কথায় কথায় সেদিন বলিলাম,—'জ্ঞান-দা, দিনরাত ত এখন সভ্যজগতের আলোচনা ক'রেই কাটিয়ে দিচ্ছেন,—পরে কি কর্‌বেন শুনি ?'

'জ্ঞান-দা হাসিয়া উত্তর দিলেন—'পরে ? কেন দিন কি আমার কাটবেনা ভায়া, এখন যেমন কাট্‌ছে·· পরেও আমার তেম্‌নি কাটবে বিজন,—'বলিয়াই জ্ঞান-দা ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহার দক্ষিণ করতল আমার চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বলিলেন—'দেখ্‌ছ ত,—'ফেট্‌লাইন' আর 'জুপিটারে' আস্‌তে দেরী নেই···দেখেছ ?'

কি দেখিলাম জানিনা, জ্ঞান-দার প্রসারিত করতলের দিকে চাহিয়া আমি নিঃশব্দে শুধু বসিয়া আছি, হয়ত মনের হাসিটি তখন আমার উদ্গম হইয়াই উঠিয়াছিল।

'তা' ব'লে মানুষের পায়ের তলায় নিজের ব্যক্তিত্বকে কোন দিন বিসর্জ্জন দিতে যাব না ভায়া, উঃ স্বাধীন ব্যবসা করতে এসে মানুষকে হীন হ'তে দেখে বড় দুঃখ হয় বিজন ; ভাবি, মানুষের এত অধঃপতন হয় ? দেখ্‌ছনা, আমাদের ভামিনী বাবুকে,···হুজুর বল্‌তে অজ্ঞান···; দেখেছ ত ? বলিয়াই হোহো শব্দে জ্ঞান-দা হাসিয়া উঠিলেন।

কথাগুলির কোন উত্তর দিলাম না। কিন্তু ইহার পর একটি দিনের ব্যাপারেই জ্ঞান-দার উপর আমার অন্তরের শ্রদ্ধাটা নিবিড় হইয়া উঠিল।

সেদিন বারলাইব্রেরীতে বসিয়া বসিয়া একখানি আইন পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতেছি, এমন সময়ে দেখি, জ্ঞান-দা আদালত প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে কি নিরীক্ষণ করিতেছেন। অদূরে একটি বিধবা মেয়ে তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় এক শিশুকে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। বিধবাটির পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ, বয়স তেমন বেশী নয় ;—কিন্তু অভাব যন্ত্রণা এমনি ভাবে তাহাকে পিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে,—যে তা'র মুখের দিকে চাহিলে করুণা হয়। মেয়েটির হাতে একটি নারিকেলের মালাই,—ছেলেটি বাঁ হাতে মায়ের ডানহাত খানি ধরিয়া প্রত্যেকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেছে। ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া কেহ ভ্রূকুটি

করিতেছে, কেহ বা বিরক্তির সুরে বলিতেছে—'এখানে বাপু তোর জন্যে ত আর দানসত্র খুলে বসিনি; কেন, গেরস্থর বাড়ী আছে, সেখানে যা'না বাপু,···এটা কোর্ট।' ছেলেটি মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবার অন্যত্র চেষ্টা দেখিতেছে।

একদৃষ্টে জ্ঞান-দা অনেকক্ষণ ধরিয়া এই দৃশ্যই দেখিতেছিলেন। দেখিয়া দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—এদিক ওদিক চাহিয়া জ্ঞান-দা ছেলেটিকে একবার হাত ইসারা করিলেন। ছেলেটি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে জ্ঞান-দা কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন; তা'রপর পকেটের ভিতর হইতে একটি চক্‌চকে পদার্থ বাহির করিয়া ছেলেটির হাতের ভিতর গুঁজিয়া দিয়া জ্ঞান দা ধীরে ধীরে সেখান হইতে পাশ কাটাইলেন।

দৃশ্য আর কেহ দেখিল কিনা জানিনা,—আমার চ'খ দুটিকে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারিল না।

জ্ঞান-দা আমার কাছে আসিয়া বসিলে মৃদুকণ্ঠে শুধাইলাম—'ওটা কি দিলেন জ্ঞান-দা?'

···'কোন্ টা··?—জ্ঞান-দা একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন।

হাসিয়া উঠিলাম—'আমি কি আর নাই দেখেছি জ্ঞান-দা আমার চ'খে আপনি ধুলো দিতে পার্‌বেন না ক—'

জ্ঞানদার চক্ষুঃ দুইটি নিমেষে করুণ হইয়া উঠিল,—একটু থামিয়া বলিলেন, 'চুপ, কিছু বল্‌তে নেই বিজন;··· ওদের কথা বল্‌ছ,···ওরা বড্ড গরীব ভাই, খেতে পায়না... কেউ কি ওদের দিকে চায়?··চায়না'—তারপর আমার পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিলেন—'হাঁ, আজ একটা কাজ করতে পার্‌বেনা ভাই? তোমার বৌদির আজ তিন দিন থেকে জ্বর, বেচারা প'ড়েই আছে শুধু···চ'খ পর্য্যন্ত তোলেনি বিজন, মনে ক'রেছিলাম কি, নরেন বাবুকে একবার নিয়ে যাব, কিন্তু টাকা··টাকা যে আজ পাইনি ভাই—'

দেখিলাম, জ্ঞান-দার চক্ষুঃ দু'টি শুকাইয়া উঠিয়াছে। পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া জ্ঞানদার হাতের ভিতর গুঁজিয়া দিয়া বলিলাম—'বৌদিকে আজ দেখ্‌তে যাব দাদা—'

'···যাবে···যেও ভাই, তোমাকে দেখে আজ খুসীই হবে সে···অনেকদিন ত আর যাওনি—' কৃতজ্ঞতায় জ্ঞানদার চক্ষু দু'টি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

কি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইব,—জ্ঞানদা বলিলেন—'এই রবিবারে কিন্তু সে কাজটা সেরে নিতে হবে বিজন···'

সাশ্চর্য্যে শুধাইলাম—'কোন্‌টা জ্ঞানদা?'

'আরে আম্‌-দার সেই চৌধুরীদের ইতিহাস, দুজনে হেঁটেই পাড়ি মার্‌ব,·· চার মাইলের রাস্তার বেশী ত আর নয়, গাঁয়ের বুড়োদের জিজ্ঞাসা ক'রে ইতিহাসটা আমাকে লিখতেই হবে ভাই, ঢের জিনিষ পাওয়া যাবে···মনে থাক্‌বে ত?'

অন্তরের হাসিকে আর কেমন করিয়াই বা রোধ করি?

হাসিতে হাসিতে বলিলাম—'জ্ঞান্‌দা, মাথাটা আপনার খারাপ হয়েছে দেখ্‌ছি···'

'আমার,···পাগল আর বলি কা'কে? এ মাথা কি আর খারাপ হয় বিজন? হবার নয় ভাই···'

জ্ঞানদা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

৪

প্রবল জ্বরের প্রকোপ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে বৌদির ঠিক তিন সপ্তাহ লাগিল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান্‌দার অনেকগুলি মুদ্রা ব্যয় হইয়া গেল। এই মুদ্রাগুলির জন্য জ্ঞান্‌দাকে আমার উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছিল;— কেন জানিনা, জ্ঞান্‌দাকে আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই।

কথা প্রসঙ্গে জ্ঞান্‌দা সেদিন বলিলেন—'তুমি আমার জন্য অনেক ক'রেছ ভাই, এর বিনিময়ে তোমায় আমি কিই বা করতে পারি...'

জ্ঞান্‌দার চক্ষু দু'টি ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল।

বলিলাম 'কিই বা আমি ক'রেছি জ্ঞান্‌দা—'

'তুমি! অনেক ক'রেছ বিজন, অসময়ে অনেক ক'রেছ; আজকের দিনে কেউ বা এমন করে বল··

বলিবার মত কিছুই আর আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। নীরবে বসিয়া রহিলাম।

জ্ঞানদা বলিলেন—'লিখতে ইচ্ছে করে বিজন, এক এক সময় মনে হয় মানুষের অন্তরের দুঃখ কষ্টটাকে চরিত্রের মধ্য দিয়ে হুবহু ফুটিয়ে তুলি ;—কিন্তু…'

হাসিয়া বলিলাম—'তা'তে কি আর মানুষের দুঃখকষ্ট ঘুচবে দাদা ?'

'ঘুচবেনা বটে,…কিন্তু সেই দুঃখের ছবিগুলো চ'খে দেখে মানুষ একটু আরামও পেতে পারে,…আমার নিজের জীবনটা আমি একদিন লিখব বিজন…' —বলিয়া জ্ঞানদা তাঁর গভীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটি বাহিরের আকাশের দিকে স্থির রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

নিস্তব্ধ কক্ষে আমরা দুইটী প্রাণী। একটি অখণ্ড নীরবতা এই ছোট্ট আবেষ্টনটিকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। স্তব্ধ আকাশে এক একটি করিয়া তারা ফুটিতেছে। সহসা দৃষ্টি ফিরাতেই দেখি, জ্ঞানদার টেবিলের উপর প্রত্যহের সেই কালি-পড়া আলোকটি কখন কে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। সেই অস্ফুট ম্লান আলোক শিখাটি,… মনে হইল, ইহা যেন সংক্ষুব্ধ বাস্তব রাজ্যের একটি সংগ্রামক্ষত আত্মা ;—মৃত্যু-পাণ্ডুর ছায়া কবে ইহার জ্যোতিঃ-সম্পদকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়াছে।

পকেট হইতে একটি বিড়ি বাহির করিয়া দেশ্‌লায়ের কাঠি-সংযোগে ধরাইয়া লইয়া জ্ঞানদা মুহুর্মুহু কয়েকটি টান দিলেন ; তারপর মেঝের উপর সেটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন —'কাল তাহ'লে এস বিজন, ছুটির দিনটা একটু আলাপ-আলোচনায় কাটানো যাবে বুঝলে ত…?'

অন্যমনস্কের ন্যায় উত্তর দিলাম—'আচ্ছা—'

জ্ঞানদা পুনরায় কি বলিবার উপক্রম করিতেছেন,—এমন সময়, সেখানে যে আসিয়া দাঁড়াইল—সে কেবলরাম।

কেবলরাম বলিল—'আজ ক্ষিতীশবাবু এসেছিল বাবা…'

'…এসেছিল…কেন ?'

'এসেছিল ভাড়া নিতে,—তিন মাসের নাকি ঘর ভাড়া বাকী,…এক পয়সা ত আর দাওনি…'

জ্ঞানদার চ'খে মুখে একটি বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল, —বলিলেন '—আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা ; সে হবে'খন ;… বলবারও আর সময় পাস্‌নে বাপু ?'

কেবলরাম মুখ কাঁচু মাচু করিয়া চলিয়া গেল। ভিতরে বৌদির কণ্ঠস্বরটা এই সময়ে হঠাৎ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল! কেন যে, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না।

জ্ঞানদার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেদিন ঘরেই ফিরিলাম।

পরদিন সকালে জ্ঞানদার বাসায় আসিতেই—যে দৃশ্য আমি দেখিতে পাইলাম,—তাহাতে দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পাইল।

ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া এক ভদ্রলোক অনর্গল বকিয়া চলিয়াছেন, আর জ্ঞানদা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া ভদ্রলোক কণ্ঠস্বরের পর্দাকে আরও একটু চড়াইয়া দিলেন, এবং চ'খ মুখ রাঙা করিয়া বলিলেন—তা' হ'লে আজই আমি নোটিশ দিচ্ছি, তিন তিনটি মাসের ঘর ভাড়া বাকী মশায়, আর কাঁহাতক বরদাস্ত হয় বলুন ত ?'

বুঝিতে বিলম্ব হইল না, ইনিই স্বয়ং ক্ষিতীশবাবু। কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না,—আমার দৃষ্টিটি তখন জ্ঞানদার মুখের উপর। সেই নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প একখানি মুখ,—স্তিমিত দু'টি চক্ষু কেমন নিরুদ্বেগ—,অথচ সে দুটি চ'খ আমার নিকট কেমন করুণ বলিয়াই মনে হইল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না।

বলিলাম—'জ্ঞান-দা বাকী কত ?'

জ্ঞান-দা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ক্ষিতীশবাবু বলিয়া উঠিলেন 'পনের টাকা মশায়, তিন মাসের…'

'আচ্ছা, কাল আপনি পাবেন, ঠিক এমনি সময়ে আস্‌বেন এখানে, আমিই তার দায়িত্ব নিচ্ছি বুঝেছেন·'

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে বার কয়েক চাহিয়া, সহাস্য দৃষ্টিতে সেখান হইতে পাশ কাটাইলেন।

চেয়ারে বসিতে যাইতেছি,—এমন সময় দরজার আড়াল হইতে ডাক পড়িল—'একটু শুনে যাও ত বিজন…'

কণ্ঠস্বর বৌদির,—বৌদি যে এমন সময়ে ডাকিবেন, তা' আমি ভাবি নাই, দাদার চেয়ে দিদিকেই আমার ভয় ছিল বেশী।

কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম,—দেখিলাম, বৌদির মুখখানি স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে।

'কি বল্‌ছ বৌদি—'

বৌদি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—'কেন তুমি দিন দিন এমন হ'চ্ছ বলত'? এতে ওঁর প্রশ্রয় কতখানি বেড়ে উঠ্‌ছে জানো?"

'কা'র...দাদার? প্রশ্রয় আর এমন কি বাড়ছে বৌদি, ওঁর অভাব এখন, ভাই হ'য়ে সেটা যদি না দেখি···'

বৌদির দু'টি চ'খ, নিমেষে জলে পূরিয়া উঠিল,—বলিলেন'···না, অত দেখে তোমার কাজ নেই বাপু···, অভাব ত আমাদের একদিনকার নয় বিজন,—'

দেখিলাম, বৌদি তর্ তর্ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। আমি নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পুনরায় বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিতেই দেখিলাম,—জ্ঞান্-দা তখনও চেয়ারের উপর বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—'চল, আম-দায়ে পাড়ি দিই, চৌধুরীদের ইতিহাসটা আমাকে লিখ্‌তেই হবে ভাই, সেইজন্যে তোমাকে সকাল সকাল আস্‌তে ব'লেছি, নাও, এখানেই দু'টো চট্‌পট্ খেয়ে নাও দিকি,···না লিখ্‌লে আমার ঘুম হবে না বিজন···'

জ্ঞান্-দা উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

কোথায় আম্‌দা, আর কোথায় বা চৌধুরীদের ইতিহাস। গ্রীষ্মের খর-রৌদ্রে এই দীর্ঘ চারি মাইল পথ পদব্রজে পাড়ি দিয়া চৌধুরী বংশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিতে যাওয়া,—যে কতখানি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, তাহা উপলব্ধি করিতে আমার বিলম্ব ঘটিল না। কিন্তু জ্ঞান্‌দাকে আর নিরস্ত করি,—কিরূপে?

উর্ব্বর মস্তিষ্কে এক বুদ্ধি গজাইয়া উঠিল। বলিলাম,—'জ্ঞানদা,—এই শুধু? চৌধুরীদের ইতিহাস নিয়ে আপনার ঘুম হ'চ্ছে না?'

জ্ঞানদা কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন! হাসিয়া বলিলাম '···চৌধুরীদের ইতিহাস আমি আগা গোড়া জানি;—এ নিয়ে ঘুমের ব্যাঘাত ক'রে দরকার নেই দাদা!'

জ্ঞান্‌দা রাঙ্গা হইয়া উঠিলেন, '···বল কি, জানো তুমি?'

'জানি দাদা,···শুন্‌বেন 'খন—'

জ্ঞান্-দা হয়ত নিশ্চিন্ত হইলেন। আমি ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সকালের আলোয় চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল,—পথের উপর কিন্তু জনস্রোত! বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে এই সংসারটিও একবার আমার চ'খের উপর দুলিয়া উঠিল। ইহারই একটি কোণে আমার বৌদি তাঁ'র প্রতিদিনের তুচ্ছ খুঁটি নাটি লইয়া ব্যস্ত আছেন,—কেবলরাম নিত্য অভ্যাসের মত আজও তার সকালের পাঠে তন্ময়;—আর জ্ঞান্-দা,···জ্ঞান্-দা তাঁহার দক্ষিণ করতলটি টেবিলের উপর ন্যস্ত করিয়া একদৃষ্টে কি দেখিতেছেন! মনে মনে ভাবিলাম, এই রূঢ় বাস্তবময়ী ধরিত্রী জ্ঞান্‌দাকে আর কতদিন ক্ষমা করিবেন কে জানে!

কুড়নচন্দ্র সাহা

য়ুরোপীয়ানা

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

শেক্সপীয়রের জন্মস্থানে উৎসব চ'লেছে—১০ই সেপ্টেম্বর অবধি চ'লবে। পুরাতন নাট্যমঞ্চ আগুনে নষ্ট হ'য়ে গেছে, তার জায়গায় এক নূতন ইমারত তৈরী হ'য়েছে—শেক্সপীয়র মেমোরিয়্যাল থিয়েটার। তারই গৃহদ্বার উন্মোচন উপলক্ষ্যে জুলাই মাস থেকে উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। উৎসব আর কিছুই নয়—শেক্সপীয়রের কতকগুলি নাটকের অভিনয়।

অভিনয়ের কথা পরে হবে। এই ইমারতের কথা কিছু বলা দরকার। এই ইমারত এক মহিলা স্থপতির পরিকল্পনা—কিসের জোরে যে সেটা নির্ব্বাচন সমিতির দ্বারা অনুমোদিত হ'য়েছিল, তা' তাঁরাই ব'লতে পারেন। এখানকার কেউই তা' জানে না। গাড়ীতে এক অধ্যাপক ভদ্রলোক একটু "কিন্তু" ভাব প্রকাশ ক'রেছিলেন; ব'লেছিলেন, বাইরে থেকে ওটা গুদাম ঘরের মতন দেখ্‌তে হ'লেও ভিতরটাতে অনেক কিছু ভাল দেখতে পাওয়া যাবে। ভিতরটা বেশ Comfortable, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। আর্টে সারল্য একটা খুব বিশেষ গুণ বটে, কিন্তু সরল রেখা সব সময় নয়। সাধারণ শিক্ষিত ইংরাজ একজনও দেখলুম না যে এই হাল ফ্যাশনের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনটীকে মনে মনে প্রীতি বা গর্ব্বের চক্ষে দেখে। বিদেশীর কাছে অবশ্য মানতে চায় না, কিন্তু ওই সংকোচ ভাবটা ঢাকতেও পারে না।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

এই পদ্ধতিটা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে প'ড়েছে লণ্ডনের সহরতলীতে। সেখানে যত নূতন সিনেমাগৃহ তৈরী হ'চ্ছে, সবই এই পদ্ধতিতে। তবে লণ্ডনের বহির্ভুক্ত সহরতলাগুলি একটু সৃষ্টিছাড়া রকমের—সব বিষয়েই। কিন্তু এই সৃষ্টিছাড়াত্বটা তারা হজম ক'রতে পারেনি, তাই একটু বেশী self-conscious. লণ্ডনের সহরতলী শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে যেমনি ভাল, মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তেমনি খারাপ। পরিষ্কার জনবিরল রাস্তা, রাস্তার দুধারে একই প্যাটার্ণের বাড়ী, সামনে-পিছনে একই রকমের বাগান, প্রত্যেক

গৃহস্থেরই অবস্থা ভাল ; অবস্থা ভাল না হ'লে এ সব জায়গায় থাকা অসম্ভব। কিন্তু আর্থিক অবস্থা সকলের প্রায় সমান হ'লেও, কালাচারের দিক থেকে অনেক তফাৎ আছে। এরা যাদের lower middle class এর মধ্যে ফেলে, তাদের ধরণ ধারণ এরা এক রকম আয়ত্ত ক'রে নেয়, কিন্তু তাদের আভ্যন্তরিক রুচির সঙ্গে পরিচিত হ'তে এদের দু'চার পুরুষ কেটে যায়। এদের অদ্ভুতত্ব এই সময়টার মধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রকট হয়। এদের বাসভবন এবং আসবাবপত্র

ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডে শেক্সপীয়রের মর্ম্মর মূর্ত্তি
(বাম দিকে টুপি হাতে কবি কান্তিচন্দ্র)

আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হ'লেই, তারা এই সব সহরতলীতে এসে বাস করে। তারা Upper middle classকে গালাগালি দিতেও ছাড়বে না, আর তাদের শ্রেণীতে উন্নীত হবার চেষ্টাও ছাড়বে না। উচ্চশ্রেণীর বাহ্য সব এক ছাঁচে ঢালা। এদের বৈঠকখানায় পিয়ানো থাকা চাই, কিন্তু তা' নীরব এবং গ্রামোফোন অতিমাত্রায় সরব। বই-এর আলমারির চাবি কখনো খোলা হয় না, এবং রেডিওর চাবি কখনো বন্ধ হয় না। সপ্তাহের মধ্যে একদিন

এরা স্নান ক'রবেই, সেটা নূতন বাড়ীতে স্নানের ঘর আছে ব'লে এবং বৎসরের মধ্যে এক পক্ষ সমুদ্রের ধারে কাটাবেই এই ত্রিশঙ্কু-ধামের অধিবাসীদের সমস্তই কাটাছাঁটা কেতা দুরস্ত হওয়া চাই, অতএব এদের 'রুচির পরিচয় যে
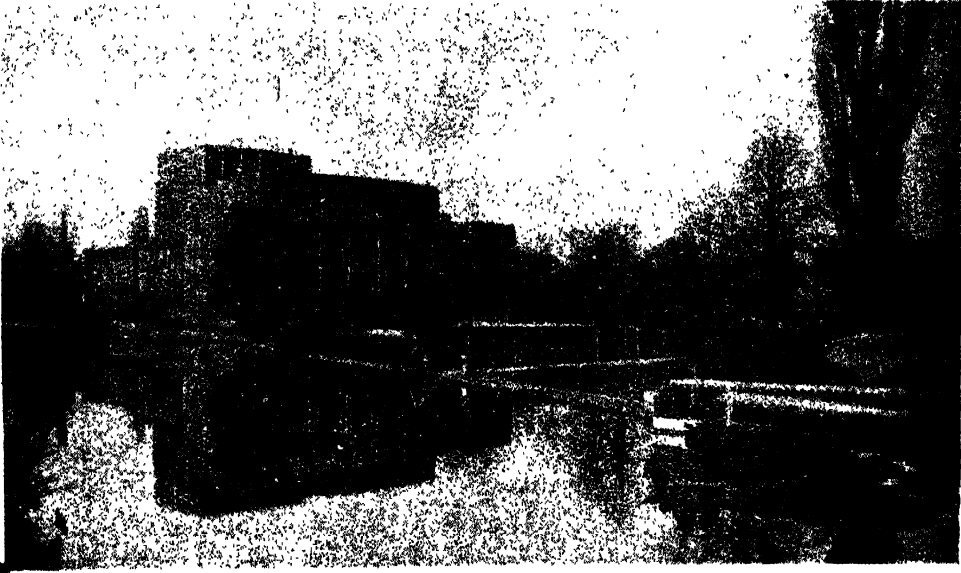
ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড-অন্‌-অ্যাভন্‌—নিউ শেক্সপীয়র মেমোরিয়াল থিয়েটার

The Foyer Shakespeare Memorial Theatre

পুরাতন অভ্যাসের ফলে। উচ্চ শ্রেণীদের নকলে এরা স্নানাহার করে, কিন্তু তা' কেবল জাহাজে এবং সমুদ্রের ধারে। বাড়ীর বাগানে ক'রলেই মহাভারত অশুদ্ধ হবে। সিনেমাগৃহ স্থাপত্যে প্রকট হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, কেননা এরাই হ'ল সিনেমার পরিপোষক।

কিন্তু Straford থেকে অনেক দূরে এসে প'ড়েছি।

শেক্সপীয়র অভিনয়ে ভিড় দেখে মনে হয়, উচ্চঅঙ্গের নাট্যকলার আদর এদের মধ্যে কিছুমাত্র কমেনি—যদিও এক হিসাবে এটা Noel Cowardএর যুগ বলা যেতে পারে। মোটের উপর ব'ললে, Stratfordএ যারা অভিনয় ক'রছিল, তারা যে খুব একটা ভাল দল, তা' নয়। প্রকৃত শেক্সপীয়র অভিনয় দেখতে হ'লে Guilgude এবং Sibyl Thorndykeএর অভিনয় দেখতে হয়। কিন্তু তাঁদের দর্শন শীতের আগে পাওয়া যাবে না। যাই হোক, এখানকার অভিনয় দেখে মনে হয় যে অভিনয়ের সাধারণ আদর্শটা অভিনেতারা খুব ভাল ক'রেই আয়ত্ত করেছে। তাতে ক'রে অভিনেতার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠবার সুযোগ অনেক কমে গেছে বটে—দু'তিনজন ছাড়া এখন উচ্চাঙ্গের অভিনেতা আর নেই ব'ললেই হয়—তেমনি সাধারণ অভিনেতাদের মধ্যে নিতান্ত বাজে কেউ নেই এবং মেকি একেবারেই অচল হয়েছে। এখন পাব্লিক স্কুল এবং য়ুনিভার্সিটী ফেরৎ যুবকরা এবং ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়েরা ষ্টেজে যোগদান ক'রতে ইতস্ততঃ করে না। তার ফলে নাট্যকলার স্থান অনেকটা উঁচুতে উঠে গেছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে ব্যবসার যোগ থাকায় জিনিসটা যে একটা বিশেষ রূপ নিয়েছে তার উল্লেখ করা দরকার।

সেক্সপীয়র লণ্ডনে প্রতিদিন অভিনীত হয় না। প্রতিদিন যে সব নাটক অভিনীত হয়, তা এদের সামাজিক অথবা পারিবারিক সমস্যা নিয়ে। অধিকাংশেরই সাহিত্যিক মূল্য কিছু নেই—অবশ্য Bernard Shaw, Galsworthy প্রভৃতির নাটক ছাড়া। আজকাল Priestleyকেও এই শ্রেণীতে ফেলবার চেষ্টা হ'চ্ছে, কিন্তু সেটা সফল হবে ব'লে মনে হয় না। যাই হোক্, এই সব নাটক অভিনয়ে যদি দুটো একটা sex-appeal-কর দৃশ্য না থাকে—এমন কি গল্স্‌ওয়ার্দির নাটকেও—তবে তা' ব্যবসার দিক থেকে সাফল্য মণ্ডিত হয় না। যেমন শোবার ঘরের দৃশ্য—নায়িকার অথবা উপনায়িকার গাত্রাবরণ যতটা উন্মুক্ত ক'রে দেখাতে পারা যায় কিম্বা ওই রকম একটা কিছু। কথাবার্ত্তার মধ্যেও গুপ্ত ইঙ্গিত থাকলে আরও ভাল। এটা যে সব সময়ে নাট্যকারের দোষ তা' নয়—এর জন্যে দায়ী হ'চ্ছে প্রযোজক এবং প্রযোজক মহাশয়ের একটা চোখ থাকে সুষ্ঠু অভিনয়ের দিকে আর একটা চোখ থাকে টিকিট

ষ্ট্রাটফোর্ড অন্-অ্যাভন্—শেক্সপীয়রের জন্ম-গৃহ

ঘরের দিকে। থিয়েটারের অভিনয়ের—যেমন variety show প্রভৃতির—একমাত্র উদ্দেশ্য হ'চ্ছে নারীদেহ আইন বাঁচিয়ে যতটা উন্মুক্ত ক'রে দেখান যায় তাই দেখানো এবং অঙ্গভঙ্গী ও কথাবার্ত্তায় আদিরস অকৃত্রিম ভাবে পরিস্ফুট করা। রেজি বলে, এই sex-appeal হ'চ্ছে যুদ্ধ-পরের আমদানী—জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স থেকে। জার্ম্মাণীর কথা জানিনা, কিন্তু ফ্রান্স এ সব পরিবেশন করে বিদেশীর জন্যে, বিশেষ ক'রে ইংরাজীভাষী আমেরিকানদের জন্যে। কিন্তু মুখগুলো। বাস্তবিক এখানে প্রৌঢ়া-যুবতী ভদ্র-ইতর নির্ব্বিশেষে শতকরা পঞ্চাশ জন নারীর মুখে গোঁফ-দাড়ির আভাষ পরিস্ফুট—রোমাভাষ নয়, রীতিমত কেশাভাষ। রেজি ব'ললে, এটাও যুদ্ধ-পরের আমদানী। কিন্তু' কোথা থেকে? রেজি এই সূত্রে দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব—বিশেষ ক'রে (Freud) ফ্রয়েড-তত্ত্বের আমদানী ক'রে যে সব কথা ব'ললে তা' আমার বিশেষ বোধগম্য হ'লনা। বোধ হয় তার নিজেরও হয়নি। (Eve) ঈভ্ তাঁর দেহ সে কালের
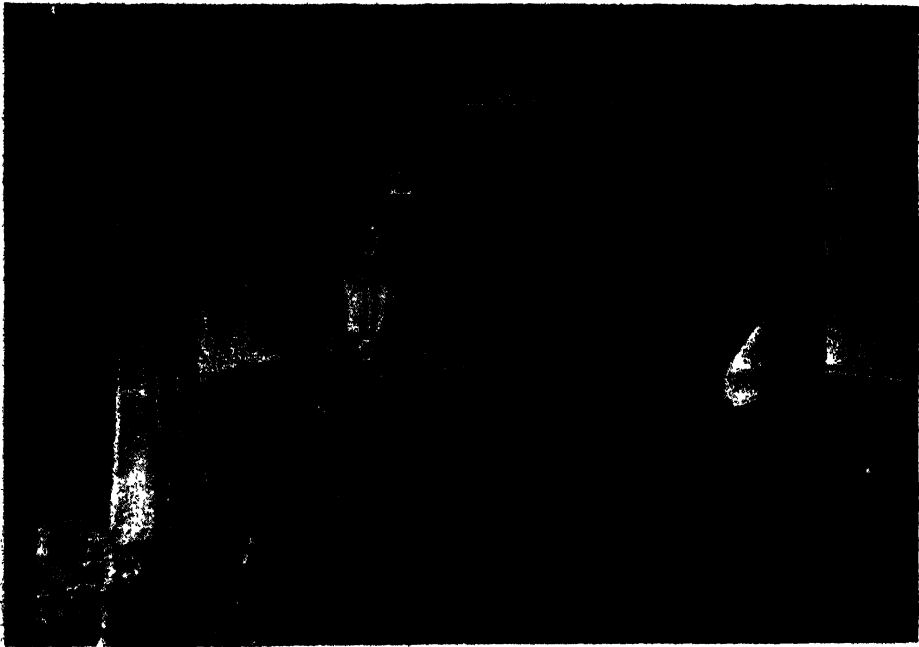
ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন্-অ্যাভন্—সেক্সপীয়রের জন্ম-কক্ষ

ইংলণ্ডে এর শিকড় এ রকম প্রকাণ্ডে গাঁথল কি ক'রে? ইংরাজদের ভণ্ড ব'লে একটা বদনাম আছে। এটা কি সেই বদনামটা খ'সে পড়বার একটা নিদর্শন? তা' যদি হয়, তা'হলে খুব ভালই ব'লতে হবে। কিন্তু তা'হলেও মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের সমস্যার সমাধান হয় না। অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও এখানে একটা কথার উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারা গেল না। ইংলণ্ডের পুরুষ শ্রেণী গুম্ফশ্মশ্রু বিবর্জিত। কিন্তু সেই গুম্ফশ্মশ্রু এখন আশ্রয় [illegible] নারীর কোমল fig-leaf-এ-ই আবৃত করুন বা একালের Sun-bathing costune-এ-ই শোভিত করুন তাতে আদমের কোনও আপত্তি থাকতে পারে না; কিন্তু ঈভ্ যদি গুম্ফশ্মশ্রু দিয়ে তাঁর মুখের সৌকুমার্য্য ঢাকতে চেষ্টা করেন্ এবং তাতে বেচারা আদম যদি আপত্তি তোলে, তা' হলে সেটা কি খুব দোষের? তবে আদম যদি তার কারণ খুঁজতে গিয়ে ঈভের নিষিদ্ধ ফল সেবনের কথা উল্লেখ করে, তা' হলে সেটা [illegible] বিষয়ীভূত হ'য়ে উঠ্‌বে। অতএব, ও কথা
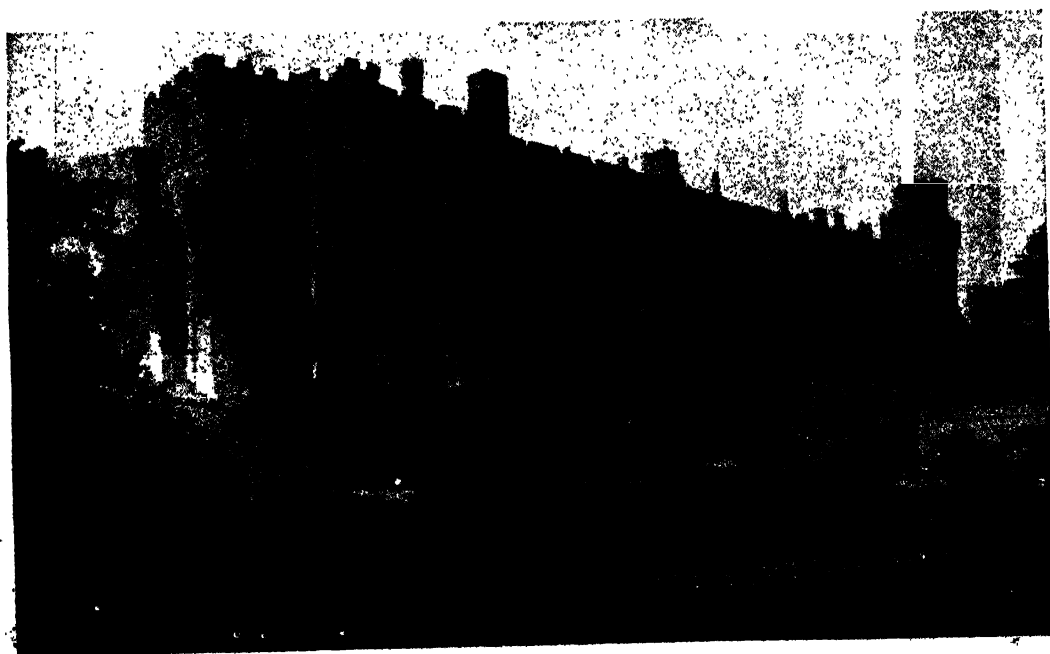
আসলের মধ্যে আছে দু'একটা ওকের কড়ি কাঠ। আর সব অনেক অদল বদল হ'য়ে গেছে। এখানে কবির নাটকের কতকগুলো পুরাতন সংস্করণ ছাড়া আর যা' সব দলিল দস্তাবেজ আছে, তার কোনো সাহিত্যিক মূল্য নাই, ঐতিহাসিক মূল্যও আছে কিনা সন্দেহ।

কাছাকাছি দর্শনীয় আরও আছে। কিছু দূরে Shottery নামক গ্রামে কবিপ্রিয়া অ্যান্ হ্যাথওয়ের পল্লী ভবন—খড়ে ছাওয়া কুটীর—কবির বাসভবনের মতই পুরাতন ঠাটে রক্ষিত আছে। আরও দূরে ইতিহাস-বিশ্রুত Warwick Castle এবং আরও দূরে স্মৃতি-বিজড়িত Kenilworth-এর ভগ্নাবশেষ। মেঘে ঢাকা অপরাহ্নে প্রিয়-প্রতীক্ষমানা নারীর অন্তিম আর্ত্তনাদ আজও ভিত্তি গহ্বর মুখরিত করে তোলে। বাইরে যে প্রতিধ্বনি শোনা যায়, তাতো উন্মুখ যাত্রীদলের প্রতিদিনকার কণ্ঠ-নিঃসৃত ধ্বনি নয়, ও, একটি বিশেষ দিনের হতাশ-বেদনার শব্দময়ী রূপ।

ছোট্ট ছবির মত Stratford সহরটী শীর্ণকায়া Avon-এর ক্রোড়ে বেষ্টিত। রাজহংস সেবিত এভনের স্রোত পরিষ্কার শ্রী ম্র দিনে নৌ-বিহার রত তরুণ তরুণীর কলহাস্যে মুখরিত হয়ে ওঠে। নৌকা বেয়ে একটু দূরে গেলেই ঘন নিবিষ্ট জলজ পাদপের বনের মধ্যে পড়া যায়। নৌকার গতির সঙ্গে তাদের বিরোধ নাই, শীর্ণ প্রশাখা যাত্রীর মুখে চোখে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দেয়। নদী তীরে গুটী কয়েক কুটীর—সৌখীনের গ্রীষ্মাবাস। আরও দূরে, দুধারে ঘাসে ঢাকা উঁচু নীচু মাঠ। তিনশো বছর আগেও কি এই রকম ছিল, কে জানে। তবে সে সময় কবি ছিলেন, এভন ছিল, এবং এভনে মরালও ছিল, এটা নিঃসন্দেহ।

ওয়ারউইক্ কাসল্

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

অর্থনীতির ধারা

ডাঃ যোগীশচন্দ্র সিংহ এম-এ, পি-এইচ-ডি

এই সম্মেলনের অর্থনীতি শাখার সভাপতির পদ গ্রহণ ক'রতে আহ্বান ক'রে আপনারা আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন এবং তা'র জন্যে আপনাদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ শুধু কথার কথা নয়; কারণ বাংলা সাহিত্যে আমার অধিকার কতটুকু তা' আপনাদের অবিদিত নাই। তবু আমাকে এই সাহিত্য সম্মেলনের একটি শাখার সভাপতি করাতে আপনাদের প্রীতির এবং সহৃদয়তার পরিচয় পাচ্ছি এবং এই ভরসাতেই আপনাদের সঙ্গে অর্থনীতি সম্বন্ধে আজ একটু আলোচনা ক'রতে অগ্রসর হ'য়েছি।

বাস্তবিক এখন এই আলোচনার সময় এসেছে। বর্ত্তমান দারুণ অর্থসঙ্কটের মধ্যে প'ড়ে সকলেরই মনে এই একই প্রশ্ন উঠ্‌ছে, এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? মনে হ'চ্ছে যে অর্থনীতির কোন্ নিয়ম উল্লঙ্ঘন ক'রে এই সঙ্কট উপস্থিত হ'য়েছে? এতদিন ধ'রে অর্থনীতির যে বিশাল সৌধ রচনা করা হ'য়েছে তা'র কি কোনও ভিত্তিই নাই? তাই ব'ল্‌ছিলাম এখন এমন একটি সময় এসেছে যখন অর্থনীতির ইতিহাসের পুনরালোচনা প্রয়োজন; প্রত্যেকটি সূত্রের পুনর্ব্বিচার দরকার; নূতন অবস্থাতে পুরাতন তথ্যগুলির নূতন মূল্য নির্দ্ধারণ আবশ্যক।

অর্থনৈতিক সমস্যা মানুষের চিরদিনই আছে। যেদিন থেকে মানুষের অন্নবস্ত্র সংস্থানের চেষ্টা আরম্ভ হ'ল, সেই দিন থেকেই এই সমস্যার উদ্ভব হ'য়েছে। কিন্তু অর্থনীতি শাস্ত্রের উৎপত্তি বেশী দিনের কথা নয়। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেই দর্শন, গণিত, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ ঘ'টেছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক মতগুলি বিশেষ পরিস্ফুট হ'তে পারে নি। এর প্রধান কারণ উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভাব। তখন ব্যবসাবাণিজ্যে এখনকার মত জটিলতা আসে নি। ধনতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হ'তে তখনও অনেক দেরী। টাকার প্রচলনও তেমন ছিল না; সাধারণতঃ দ্রব্যে দ্রব্যেই বিনিময় চ'ল্‌ত। টাকার দাম বাড়াকমায় বর্ত্তমান যুগে যে সমস্ত উৎপাতের সৃষ্টি হ'য়েছে, তা' নিয়ে হিন্দু মনীষীগণের মাথা ঘামা'বার বিশেষ দরকার হয়নি। অবশ্য প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক মতবাদ কিছুই ছিল না, একথা ব'ল্‌ছি না। শুধু এইটে ব'ল্‌তে চাই যে ঐ মতগুলির উপরে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের প্রভাব এত বেশী ছিল যে ওগুলি তেমন পরিপুষ্টি লাভ ক'রতে পারে নি। বৈদিক যুগে দ্রব্য বিনিময়ের উপরে রাজশক্তি কোনও হস্তক্ষেপ ক'রতেন না বটে, কিন্তু কৌটিল্য ও মনুর সময়ে এ ব্যবস্থা আর চ'লল না। তখন অনেক দরকারী জিনিষের দাম রাজাই ঠিক ক'রে দিতেন। টান যোগানের ফলেই ওটা হ'বে এই ব'লে আর ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু শুক্রনীতিতে আমরা দেখ্‌তে পাই যে জিনিষের দাম "সুলভাসুলভ" এবং "অগুণতাগুণসংশ্রয়" এই দুইয়ের উপরে নির্ভর করে। সে যাই হো'কনা কেন, এই মতটাই সেকালে বেশী প্রচলিত ছিল যে প্রত্যেক জিনিষেরই একটি ন্যায্য দাম আছে, যেটা শুধু প্রতিযোগিতা দ্বারাই ঠিক করা যায় না। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা বোঝা যাবে। সুদের ব্যাপার নিয়ে তর্ক বিতর্ক অনেক দিন ধ'রে চ'লেছিল। গরীব খাতকের কাছে সুদ নেওয়া অন্যায় এইভাবে প্রণোদিত হ'য়ে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা প্রথমে সুদ নিষেধ ক'রেছিলেন। কিন্তু পরে যখন দেখ্‌লেন যে সুদ বন্ধ ক'রলে ব্যবসা বাণিজ্যও বন্ধ হ'য়ে যায়, তখন তাঁরা সুদের ন্যায্য হার বেঁধে দিলেন। এটি পাকাপাকী ঠিক হয়ে গেল খৃষ্ট জন্মাবার অন্ততঃ চারশ বছর আগে, কারণ আমরা বশিষ্ঠের ধর্ম্মসূত্রে দেখ্‌তে পাই সুদের হার তখন ছিল বৎসরে শতকরা ১৫৲।

প্রাচীন ভারতে অর্থ-নৈতিক গবেষণার যে অন্তরায়ের কথা ব'ললাম সেগুলি প্রাচীন গ্রীসে, প্রাচীন রোমে, এমন কি ইউরোপের মধ্যযুগে পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পরন্ত খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদের চেষ্টায় ইউরোপের মধ্যযুগে অর্থ-নৈতিক জীবনের উপরে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের প্রভাব আরও বেড়েই চ'লেছিল। * এই প্রভাব ক'মতে সুরু হ'লো ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে। সেই সময়েই অর্থনীতির প্রথম উন্মেষ। সে সময়ে ইউরোপকে "ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া" গড়া হ'চ্ছিল। প্রোটেষ্টান্ট মত, ধর্ম্মে এনে দিল ব্যক্তিস্ববাদ (individualism); তার ফলে কর্ম্মে হ'ল ব্যক্তিগত সম্পত্তির (private property) গোড়া-পত্তন। লুথার, জুইংগ্লি, ক্যালভিন্ এঁরা সব এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ ক'রলেন যে, রাজা অত্যাচারী হ'লেও প্রজাদের তাঁকে মানা উচিত। এটা না হলে সামন্ততন্ত্র (feudalism) গিয়ে রাজতন্ত্রের (monarchy) প্রতিষ্ঠা এত শীগ্‌গীর এত সুদৃঢ় হ'তে পারত না। অন্য দিকে আবার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শক্তি সংহত ক'রে জাতীয় শক্তির বৃদ্ধির জন্যে নানা চেষ্টা সুরু হ'তে লাগ্‌ল। কলম্বাস, ভাস্কোডিগামা, ম্যাগিল্যান অজানা দেশ, অচেনা পথ আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লেন। ব্যবসা বাণিজ্য সুদূর বিস্তৃত হ'ল এবং হু হু ক'রে বেড়ে চ'ল্‌ল। এটা সম্ভবপর হ'লো আমেরিকা থেকে লুঠ ক'রে আনা সোনারূপোর জন্যে। অন্য দিকে আবার এতে অর্থনৈতিক জগতে একটা প্রচণ্ড উলোট পালোট সুরু হ'লো। দ্রব্যে দ্রব্যে বিনিময় বন্ধ হ'তে লাগ্‌ল। টাকার প্রচলন বেশী হ'ল, এবং তার ফলে জিনিষপত্রের দাম ক্রমশঃ বাড়্‌তে লাগ্‌ল। স্পেনে এটা সর্ব্বপ্রথম সুরু হয়। কারণ লুঠের মাল সেখানেই জ'মেছিল বেশী। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ থেকে বেড়ে বেড়ে জিনিষের দাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষে প্রায় পাঁচগুণ দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড কেউ বাদ যায়নি। কেবল সেখানে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে দাম বাড়া সুরু হ'ল। এর ফলে ব্যবসায়ীদের মুনাফার হার খুবই বেড়ে গেল। কারণ জিনিষের দাম বাড়ার সঙ্গে খরচা সেই অনুপাতে বাড়ে না,—তখনও না এবং এখনও না। ধনতন্ত্রের সূচনা এর আগেই হ'য়েছিল বটে কিন্তু ব্যবসায়ীদের এই প্রচুর লাভেই সেটা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। অর্থনীতি থেকে ধর্ম্মের প্রভাব মুছে গিয়ে নানা অন্যায়, নানা অধর্ম্ম হ'তে লাগ্‌ল। কার্ল মার্ক্‌সের কথাতেই বলি—*

"ধনতন্ত্রমতে উৎপাদনের রক্তিম ঊষার প্রারম্ভে কি কি ছিল? মার্কিন দেশে সোনা রূপোর আবিষ্কার, সেখানকার আদিম অধিবাসীদের কাউকে কাউকে নিধন, কাউকে কাউকে দাসত্বনিগড়ে বন্ধন এবং কাউকে কাউকে খনিতে জীবন্ত সমাধি করা হ'য়েছিল। পূর্ব্ব ভারতদ্বীপপুঞ্জে জয় ও লুণ্ঠন, আফ্রিকা মহাদেশকে কালচামড়াদের সুবৃহৎ খাঁচায় পরিণত করা এবং সেখানে লাভের লোভে তাদের শীকার করা চলেছিল।"

এই সঙ্গে ইউরোপে ছোট বড় নানা রকম পরিবর্ত্তন ঘটল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পীরা আর তাদের সামান্য মূলধন দিয়ে বিপুল বাণিজ্যের সম্ভার যোগাতে পার্‌ল না। মহাজনের কাছ থেকে দাদন নেওয়ার ফলে মহাজনের আধিপত্য স্থাপিত হ'ল। সামন্তদের সৈন্যদের চাক্‌রাণ জমির বদলে রাজার সৈন্যদের বেতন দেওয়া সুরু হ'ল। এই রকম নানা প্রকারে টাকা প্রচলনের ফলে ধাতুমুদ্রার প্রয়োজন বাড়্‌ল,—কারণ তখন নোট আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু ইউরোপে ত আর সোনা রূপোর খনি ছিল না। সেইজন্যে দেশের সোনা রূপো যা'তে বিদেশে না যায় এবং বিদেশের সোনা রূপো যা'তে দেশে আসে, এর জন্যে বিপুল চেষ্টা হতে লাগ্‌ল। প্রথমটাতে যখন তেমন সাফল্য দেখা গেল না, তখন দ্বিতীয়টাতে দেশের সমস্ত চিন্তা ও উদ্যম নিয়োজিত হ'ল। দেশের কাঁচা মালের রপ্তানী বন্ধ ক'রে

* প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দার্শনিকদের আপত্তি সত্ত্বেও সুদ নেওয়ার প্রথা পুরাকালে বন্ধ হয় নি। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই ধর্ম্মযাজকদের চেষ্টায় সুদ নেওয়া ইউরোপে আইনতঃ বন্ধ হ'য়েছিল।

* "The discovery of gold and silver in America, the extirpation, enslavement and entombment in mines of the aboriginal population, the beginning of the conquest and looting of the East Indies, the turning of Africa into a warren for the commercial hunting of blackskins signalised the rosy dawn of the era of capitalist production."

এবং স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি ক'রে, বিদেশী শিল্পদ্রব্যের আমদানী কমানর এবং স্বদেশী শিল্পদ্রব্যের রপ্তানী বাড়ানর প্রয়াস চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। উদ্দেশ্য এই যে বিদেশের কাছে দেনা কম হয় এবং পাওনা বেশী হয়। এই রকম ক'রে, স্বদেশের শিল্প ও বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত ক'রে দেশে সোণা রূপোর পরিমাণ বাড়ানর নাম বণিক্‌তন্ত্র (mercantilism) এই নীতিই সর্ব্বপ্রথম অর্থনীতি (Art of Economics). এর মূলে ছিল অত্যগ্র জাতীয়তাবোধ (nationalism)। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এই মনোভাব ছিল না। সুতরাং বণিকতন্ত্র এদেশে প্রচারিত হ'তে পারেনি। বিশেষতঃ আমাদের দেশে বরাবরই আমদানী কম এবং রপ্তানী বেশী ছিল। অবাধ বহির্বাণিজ্যের ফলে আমাদের দেশে প্রচুর সোণা রূপো প্রতি বৎসরই আস্‌ত। অন্য দিকে আবার সেই সোণা রূপোর বেশীর ভাগই অলঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত হ'ত, মুদ্রার প্রচলন তেমন বাড়েনি। ঠিক আগের মতই দ্রব্যে দ্রব্যে বিনিময় চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। সুতরাং যে যে কারণে ইউরোপে বণিকতন্ত্রের উদ্ভব হ'য়েছিল তার কোনটাই এদেশে তখন ছিল না।

ইউরোপেও এই তন্ত্র বেশী দিন টেঁকেনি। এর ফলে কিছু কতক দেশ সমৃদ্ধিশালী হ'য়েছিল,—সোণা রূপোর আমদানীর জন্যে নয়, শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের ফলে। কিন্তু যখন নিয়ন্ত্রণের ফলে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতি হ'তে লাগ্‌ল তখন এই তন্ত্রের আদরও ক'মে গেল।—অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসী প্রকৃতিতন্ত্রীরা (Physiocrats) বণিক-তন্ত্রের দোষগুলি সুস্পষ্ট ভাবে দেখালেন। এবং ব'ল্লেন যে অর্থনৈতিক ঘটনা (phenomena) অর্থনৈতিক সূত্রেই (laws) নিয়মিত; ধর্ম্মের দ্বারা নয়, রাজনীতির দ্বারা নয়। ইহাই অর্থবিজ্ঞানের (science of Economics) সূত্রপাত। প্রকৃতিতন্ত্রীদের সব কথা আলোচনা করা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়।

তাঁদের দুটী মতবাদের উল্লেখ না ক'র্‌লে চলে না, একটি ব্যক্তিগত সম্পত্তির (private property) সমর্থন এবং অন্যটি স্বাতন্ত্র্যবাদ (laissez faire.) প্রোটেষ্টাণ্ট যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের (individualism) কথা পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে। অর্থাৎ কিনা প্রত্যেকেরই নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে চলার জন্মগত অধিকার আছে। এখন বলা হ'ল তার সেই প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারুর নেই। সেই হস্তক্ষেপে কোনও কল্যাণ নেই। অতএব এই স্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিত্ববাদেরই রূপান্তর মাত্র। এর ফলে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি পাকা হ'ল, অন্য দিকে আবার জাতীয়তাবোধে ভাঙ্গন ধ'রল, আর আন্তর্জাতিক বোধের (cosmopolitanism) আরম্ভ হ'ল।

এই নূতন ভাবধারা ইংল্যাণ্ডেও প্রবাহিত হ'ল এবং বণিক-তন্ত্রের অধঃপতন চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। এমন সময়ে এ্যাডাম স্মিথ সাহেব স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতার (system of natural liberty) জয়গান আরম্ভ ক'র্‌লেন। তিনি ব'ল্‌লেন যে প্রত্যেক মানুষই যদি স্বার্থ প্রণোদিত হ'য়ে কাজ করে, তাহ'লে তাতেই দেশের স্বার্থ সংরক্ষিত হ'বে। ব্যষ্টির স্বার্থ এবং সমষ্টির স্বার্থ একই, এই মূলনীতির উপরেই স্মিথ সাহেবের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনিও স্বীকার ক'রেছেন যে কোনও কোনও স্থলে ব্যক্তিগত স্বার্থ রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা সংযত করা দরকার। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবোধ (economic nationalism) যে কিছুই নয় এ কথাও তিনি বলেন নি। তবে এটা ঠিক যে তাঁর অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক মতবাদ (economic cosmopolitanism) প্রচারের ফলেই তাঁর মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ইংল্যাণ্ডে অবাধ বহির্বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। তার কিছুদিন আগে থেকেই ইংল্যাণ্ডে শ্রমশিল্পের বিপ্লব (industrial revolution) আরম্ভ হ'য়েছিল। ধনতন্ত্রের মূলনীতি প্রতিযোগিতা এবং স্বাতন্ত্র্যবাদ। এদের সম্বন্ধে কোনও বিচার বিতর্ক তখন একেবারে বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। কারণ উৎপাদন তখন এমন সবেগে চ'লছিল যে এদের সাফল্য সকলেই স্বীকার ক'র্‌তে বাধ্য হ'চ্ছিলেন। কিন্তু তখন একটি নূতন অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হ'ল —সেটা উৎপাদনের নয়, বণ্টনের (distribution). রিকার্ডো এরই সমাধানের চেষ্টা ক'রেছেন। তিনি এই মতবাদ প্রচার করলেন যে জমিদার, শ্রমিক এবং মহাজন

এই তিন শ্রেণীর মধ্যে দেশের উৎপন্ন জিনিসের বণ্টন কোনও শ্রেণীর চেষ্টা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে না, সেটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম অনুসারেই (natural laws) হ'য়ে থাকে। সুতরাং শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিবাদের কারণ নেই। কিন্তু তিনি স্বীকার ক'রেছেন যে অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জমীদারদের পাওনা বেড়ে যায়, এবং শ্রমিক ও মহাজনের ভাগে কম পড়ে। এবং তিনি এও স্বীকার ক'রেছেন যে, মহাজনের মুনফা না কমালে শ্রমিকের মজুরি বাড়তে পারে না। সুতরাং শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষের আভাস রিকার্ডো সাহেবই প্রথমে দেন এবং সেই সময় থেকেই অর্থনীতির ধারা আবার এক নূতন পথে প্রবাহিত হ'ল।

এই ভাবধারা নিয়ে এলেন গডউইন (অর্থাৎ কিনা ভগবানের বন্ধু)। তাঁর মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সব রকম সামাজিক অনাচারের মূলে। এর বদলে তিনি প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাইলেন অরাজক গোষ্ঠিবাদ (anarchical communism)। এতে গভর্ণমেণ্ট ব'লতে কিছু থাকবে না, এবং একটি গোষ্ঠি বা পরিবারের মধ্যে যেমন সকলে নিজের নিজের অভাব মত পায়, এতে ঠিক সেই রকম কাজেরই বণ্টন চ'লবে। এই নৈরাজ্য জিনিসটা ইংরেজের ধাতে কোনও দিনই সয়নি। এবং এই জন্যেই মনে হয় গডউইনের মত সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে নি।

এর পরে তার একদল সমাজতন্ত্রী (socialists) দেখা দিলেন। তখন জমিদারের আধিপত্য অনেকটা কমে গিয়েছে—অন্ততঃ শিল্পপ্রধান দেশে। সেখানে তখন উৎপন্ন জিনিষের প্রধান ভাগটা জমীদার পেতেন না, পেতেন মহাজন। হল, টমসন, গ্রে প্রমুখ ইংরেজ সমাজতন্ত্রীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এই মত প্রচার আরম্ভ ক'রলেন যে, শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য মজুরি পায় না, তার কারণ এই যে মহাজনেরা তার অনেকখানি আত্মসাৎ করেন। ইউরোপেও এই প্রচার চ'লতে লাগল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী নৈরাজ্যবাদী (anarchist) প্রুদঁ "সম্পত্তি জিনিষটা কি?" তাঁর এই প্রবন্ধটাতে সাফ ব'ললেন "সম্পত্তি চুরির নামান্তর মাত্র।" এই কথাই পুনরুক্তি ক'রলেন কার্ল মার্ক্স প্রায় বছর পরে—বিখ্যাত সমষ্টিবাদী ঘোষণা পত্রে (Communist Manifesto)* এবং তারও প্রায় বছর কুড়ি পরে তাঁর "Capital" গ্রন্থে এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ক'রলেন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মূলে অধর্ম, অন্যায়, অত্যাচার এই সব আছে, তাঁর এই মতের কথা পূর্বেই ব'লেছি। তিনি আরও বললেন এটা স্বখাত সলিলেই ডুবে যেতে বাধ্য। কারণ ধনতন্ত্রে উৎপাদন বাড়ে একথা যেমন সত্য, উৎপন্ন জিনিষের ব্যবহার বা খাদন ক'মে যায় একথাও তেমনই সত্য, কারণ জনসাধারণ কায়ক্লেশে জীবন ধারণ ক'রতে পারে, এর চেয়ে বেশী কিছু তারা কোনও মতেই পেতে পারে না। এর ফলে অত্যুৎপাদন, এবং মহাজনে মহাজনে দারুণ প্রতিযোগিতা। ক্রমে মহাজনেরাও সঙ্ঘবদ্ধ হবে এবং শ্রমিকেরাও সঙ্ঘবদ্ধ হবে। সঙ্কটের পরে সঙ্কট এসে মহাজনদের বলক্ষয় এবং শ্রমিকদের বলবৃদ্ধি হবে। এবং পরিশেষে সমস্ত ক্ষমতা শ্রমিকদের হাতেই চ'লে যাবে এবং তারাই উৎপাদন চালাবে, ব্যষ্টির জন্যে নয়, সমষ্টির জন্যে।

অন্য দিকে আবার এর আগে থেকেই গোঁড়া অর্থনৈতিকদের মধ্যেও নানা সংশয় দেখা দিল। রিকার্ডোর শিষ্য জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মত লোকও ব'লে ব'সলেন যে উৎপন্ন জিনিষের বণ্টন কোনও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম অনুসারে হয় না, সেটা মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানগুলির উপরেই নির্ভর করে সুতরাং প্রতিষ্ঠানগুলি বদলিয়ে বণ্টনের হার পরিবর্তন করা অসম্ভব নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপের সকল মনীষীই প্রায় স্বীকার ক'রলেন যে স্বাতন্ত্র্যবাদ সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতে সুফলপ্রসূ হয় না। কারণ দরকষাকষি ক'রে নিজের স্বার্থ রক্ষা করবার ক্ষমতা প্রত্যেকের সমান নয়। এটি সর্ব্ব প্রথম সুস্পষ্টভাবে দেখালেন সিসমণ্ডি (Sismondi) ১৮১৯ সালে তাঁর "নব্য অর্থনীতি"তে (New Principles of Political Economy). ক্রমে গোঁড়া স্বাতন্ত্র্যবাদীরাও স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'লেন

* প্রকৃত প্রস্তাবে এটাকে Communist Manifesto না ব'লে Collectivist Manifesto বলা উচিত। সে জন্যে "গোষ্ঠিবাদী ঘোষণাপত্র" এই তর্জ্জমা করা হয় নি। সম্পত্তি চৌর্য্যমূলক এই বিষয়টা ছাড়া আর কিছুতে প্রুদঁর সঙ্গে মার্ক্সের মতের মিল ছিল না।

যে স্ত্রী ও শিশু শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের মনিবের প্রতিযোগিতার কোন মূল্যই নেই। এর ফলে এল কারখানা আইন (factory laws) এবং এখানেই হ'ল স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রথম পরাজয়। শ্রমশিল্পের বিপ্লব এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন যেমন ইংল্যাণ্ড থেকে ইউরোপের দেশে দেশে ব্যপ্ত হ'য়েছিল, কারখানা আইনও তেমনি দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে প'ড়্‌ল। বর্ত্তমান কালে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের কাজ পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হ'য়েছে। স্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তি শিথিল হওয়াতে ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন হ'ল। ১৫৬৩ সালে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে শিক্ষানবিশদের বেতন নির্দ্দিষ্ট ক'রে যে আইন বিধিবদ্ধ হ'য়েছিল তার বিলোপ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হ'য়েছিল বটে কিন্তু ১৯০৯ ও ১৯১৮ সালে (Trade Board Acts) বাণিজ্য সংসদ আইনের সাহায্যে কোন কোন শিল্পের সর্ব্বনিম্ন বেতনের হার বেঁধে দেওয়া হ'ল।

শ্রমিকদের সুবিধাজনক এই সব নানা আইন কানুনের কারণ কি? অবশ্য শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে তাদের প্রতিনিধিদের সাহায্যে এই রকম আইন কিছু কিছু পাশ করিয়েছে এবং করাচ্ছে। কিন্তু এর মূল কারণ সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব। সমাজ-তন্ত্রীরাই শ্রমিকদের হিতকর অনেক আইন ক'রেছেন। অন্যদিকে আবার এই প্রভাব পরোক্ষরূপেও কম ফলদায়ক হয়নি। পাছে শ্রমিকেরা সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে জোট বাঁধে, এই ভয়েই কূটনীতিবিশারদ বিস্‌মার্ক শ্রমিকেরা যাতে দুর্ঘটনা এবং রোগ ভোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে এই জন্যে বীমা (insurance) আইন ক'র্‌লেন। এখন এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, হয় রাজশক্তিকে সামাজিক অনাচার দমনের চেষ্টা ক'র্‌তে হ'বে নতুবা সেই দেশে সমাজতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে, এই আশঙ্কা আছে।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এরূপ হ'বে এমন কথা নাই। কোনও কোনও স্থলে এর বিপরীত ফলও ঘ'টেছে। কেন, তার একটু আলোচনা করা দরকার। স্মিথ সাহেব ভেবেছিলেন যে বণিকতন্ত্র যুগের একচেটিয়া ব্যবসা গিয়ে যখন প্রতিযোগিতা পুরোদস্তর চ'ল্‌তে থাক্‌বে তখন স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতা অব্যাহত হ'বে। কার্য্যতঃ তা' ঘটে নি। বরং মার্ক্‌সের ভবিষ্যদ্বাণীই ফ'লেছে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কেবলই একচেটিয়া হ'বার দিকে যাচ্ছে। এতে প্রতিযোগিতার অপচয় থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে আবার নানা অবিচার, নানা অত্যাচার দেখা দিয়েছে। এইগুলি দমনের জন্য উৎপাদন রাজকীয় শক্তির অধিকারে আনার চেষ্টা নানা দেশে হ'য়েছে। এমন কি, সরকারী রেল, খাল ও খনের উল্লেখ ক'রে ১৯০৬ সালে জন মর্লি ভারতবর্ষকে সমাজতন্ত্রবাদী আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু এটা কি সত্য? মহাজন, প্রজাই হো'ক বা রাজাই হো'ক, মহাজন থাক্‌লেই ধনতন্ত্র হ'বে, সমাজতন্ত্র হ'বে কেমন ক'রে? আর এটা ইংরেজের দান, একথা বলাও চলে না। কারণ হিন্দুযুগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং মুসলমানযুগে বার্ণিয়ে প্রমুখ ইউরোপীয় বণিকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে সরকারী কারখানার বিষয়ে উল্লেখ আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রাজকীয় শক্তির প্রভাবে কোনও কোনও স্থলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে নি বটে কিন্তু অনেক স্থলে ঐ শক্তির জন্যেই সমাজতন্ত্রের সূচনা হ'য়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যে ধনতন্ত্রের ভিত্তি একথা আগেই বলা হ'য়েছে। বর্ত্তমান কর আদায়ের পদ্ধতির আলোচনা ক'র্‌লে বোঝা যায় যে বণ্টনের বৈষম্য দূরীভূত করার জন্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারও ক্ষুণ্ণ ক'র্‌তে বিশেষ আপত্তি হ'চ্ছে না। বড়লোকদের কাছ থেকে বেশী বেশী টেক্স আদায় ক'রে তা এমনভাবে খরচ করা হ'চ্ছে যাতে গরীবলোকেরা বেশী সুবিধা পায়।

আবার অন্যদিকেও পুরাতন অবস্থার পুনরাবির্ভাব হ'চ্ছে। বণিকতন্ত্র যুগের জাতীয়তা-বোধের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ ক'রেছি এবং তার পরিবর্ত্তে আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠার কথাও ব'লেছি। এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ক'র্‌লেন ফ্রেডরিক লিষ্ট (Friedrich List) এবং তার পরে জাতীয়তাবোধ গত পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে কেবলই বেড়ে চ'লেছে। দেশের পর দেশ সংরক্ষণনীতির সাহায্যে (protection) বিদেশী শিল্পদ্রব্যের আমদানী বন্ধ ক'রে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা ক'রেছে। এই উৎকট জাতীয়তাবোধকে জাতিপ্রেম না ব'লে জাত্যভিমান বা জাত্যান্ধ বলাই উচিত। এর ফলে অর্থনীতিক্ষেত্রে ও বিষয়

হ'য়েছেই; রাজনীতিক্ষেত্রেও এমন ভয়াবহ হ'য়েছে যে তার পরিণামে অর্থনৈতিক জগতেও প্রচণ্ড উলোট পালোট হ'য়েছে এবং হ'চ্ছে। যত অনর্থের মূলে এই, বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের মূলেও এই। কবির ভাষায়—

লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে এ কথা আমি জানি। অনেকেরই বিশ্বাস যে বিগত মহাযুদ্ধের কারণ ধনতন্ত্র। কিন্তু কথাটা কি ঠিক? দুই চারজন শান্তিবাদীকে বাদ দিলে দেখা যায় যে প্রায় সকল দেশেই যুদ্ধ করা সম্বন্ধে মহাজন ও শ্রমিক সম্প্রদায়ে কোনও মতভেদ ছিল না। আর তা হ'বেই বা কেন? অন্যান্য দেশ জয় ক'রে বা কোনও উপায়ে নিজেদের কবলে এনে, সেই সেই দেশে ব্যবসা চালিয়ে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধিশালী করার বিষয়ে শ্রমিকে মহাজনে কোনই মতদ্বৈধ নাই,—যত বিরোধ শুধু পাওনার বখরা নিয়ে। যদি ঐ দেশে ধনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সমষ্টিতন্ত্র অনুযায়ী রাজকীয় শক্তির দ্বারা উৎপাদন কার্য্য চল্‌ত, তা হ'লেই কি যুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন হ'ত?

কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে এই জাতীয়তা-বোধের মূলেও আছে ধনতন্ত্র; সুতরাং ধনতন্ত্রই অন্ততঃ পরোক্ষভাবে যুদ্ধের জন্য দায়ী। এ কথা ব'ল্‌বারই বা কারণ কি? আগেই দেখান হ'য়েছে যে ধনতন্ত্রের পরেই জাতীয়তা-বোধ এসেছিল, কিন্তু পৌর্ব্বাপর্য্য এবং কার্য্যাকারণ সম্বন্ধ কি এক কথা? ধনতন্ত্রের মূলে আছে অর্থনৈতিক লাভের প্রচেষ্টা। কোন কোন স্থলে জাতীয়তা-বোধের সাহায্যে সেটী চরিতার্থ হ'তে পারে, কারণ দেশী শ্রমশিল্পের উন্নতি হ'লে তার লাভটা মহাজনেরা পায়। কিন্তু যখন তা'তে অসুবিধা হয়, কিংবা বিদেশে খাটালে মুনাফার হার বাড়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন মহাজনেরা বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে যান।

অর্থসঙ্কটের মূলকারণ সম্বন্ধেও এই রকম মতদ্বৈধ আছে। সমাজতন্ত্রীরা এটী ধনতন্ত্রের ফল এই কথাই বলেন। তাঁদের মতে প্রাচুর্য্যের মধ্যে বর্ত্তমান দৈন্যের জন্য ধনতন্ত্র অনুযায়ী উৎপাদনই দায়ী। তা নইলে এই সস্তার বাজারে লোকেদের এত হাহাকার কেন? একথা খুবই সত্য যে, যুদ্ধের পরে নব্য ও উন্নত বিধি অবলম্বনের ফলে উৎপন্ন জিনিষ যে-পরিমাণে বেড়েছে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়েনি। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অত্যুৎপাদন হ'য়েছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এর প্রয়োজন ছিল, কারণ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ করা চাইত। মাথা পিছু হিসাব ক'র্‌লে দেখা যায় ১৯২৫ সালে ১৯১৩ সালের চেয়ে বেশী জিনিষ উৎপন্ন এবং ব্যবহৃত হ'ত। অর্থাৎ আর আগেই যুদ্ধের ধ্বংসের চিহ্ন বিলোপ হ'য়েছিল। সুতরাং অত্যুৎপাদনই যদি অর্থসঙ্কটের কারণ হয় তবে অর্থসঙ্কট ১৯২৯ সালের শেষে না হ'য়ে, ১৯২৫ সালে বা তার ঠিক পরেই হওয়া উচিত ছিল। বিশেষতঃ ১৯২৫ সালের পরে অর্থনৈতিক প্রগতির বেগ আগের চেয়ে মন্দীভূত হ'য়েছিল। বাস্তবিক অত্যুৎপাদনের লক্ষণ কি? যদি বলা যায় যে যখন মাল কাট্‌বে না, কেবলই জমে যাবে, তখনই অত্যুৎপাদন হ'য়েছে বুঝতে হ'বে; তাহ'লে এটাও ভাবা উচিত যে দাম ক'মেছে ব'লেই ব্যবসাদারেরা মাল ছাড়্‌তে রাজী হ'চ্ছে না। অর্থাৎ কিনা অর্থ সঙ্কট আগে থেকেই আরম্ভ হ'য়েছে, তা নইলে দাম ক'মেছে কেন? সুতরাং অত্যুৎপাদনের জন্যে অর্থসঙ্কট হয়নি।

সত্য কথা ব'ল্‌তে কি অর্থবিজ্ঞান আমাদের এই শিক্ষাই দেয়, দুই চারিটী জিনিষের অত্যুৎপাদন হ'তে পারে বটে কিন্তু সকল জিনিষের যুগপৎ অত্যুৎপাদন সম্ভবপর নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জিনিসে জিনিসেই বিনিময় হয়, টাকা একটি উপায় মাত্র। আপাত দৃষ্টিতে যে অত্যুৎপাদন দেখা যায় তার কারণ আর কিছুই নয়, বিনিময়ের বিপর্য্যয়। এটাই যদি অর্থসঙ্কটের হেতু হয়, তবে আমাদের ভাবা দরকার যে, ধনতন্ত্রের জন্যই এরূপ ঘ'টেছে কি না। আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় সোনার সাহায্যে হয়, এ কথা সকলেই জানেন। যুদ্ধের মধ্যে অনেক দেশের স্বর্ণমান থেকে বিচ্যুতি ঘ'টেছিল বটে কিন্তু যুদ্ধের পরে অনেক দেশেই স্বর্ণমান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। অর্থাৎ কিনা সোনাই ছিল স্বদেশে ও বিদেশে

বিনিময়ের জন্য মাপকাঠি। এ কাঠি ধনতন্ত্রের জন্য ভাঙেনি, ভেঙেছে যুদ্ধের ঋণ ও যুদ্ধের খেসারতের চাপে। ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৩১ সালের জুনমাস পর্যন্ত এই দুই বাবদ ফ্রান্স ও আমেরিকা আদায় ক'রেছে ২২৬ কোটী ২০ লক্ষ ডলার। এর বেশীর ভাগই জিনিষে নিতে পারেনি, কারণ তাহ'লে যে যে জিনিষ আমদানী হ'বে, দেশের সেই সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রভূত ক্ষতি করা হ'বে। এই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হ'য়েই ফ্রান্স ও আমেরিকা জিনিষ সামান্যই নিয়েছে, বাকী সমস্তটা, প্রায় ১৫২ কোটী ডলার সোনাতে নিয়েছে। কারণ সোনা ছাড়া অন্য সব জিনিষে এ রকম চড়া হারে শুল্ক বসান হ'য়েছে যে দেনদারেরা সোনা ছাড়া অন্য কোনও জিনিষ দিয়ে দেনা শোধ ক'র্‌তে পারে নি। কিছুদিন ধ'রে অবশ্য মার্কিন দেশে সোনার যেমন আমদানী হ'য়েছিল, সোনার তেমনি রপ্তানীও হ'য়েছিল। কারণ মার্কিন মহাজনেরা বিদেশে টাকা খাটানোর জন্যে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যখন দেশে টাকা খাটানোই বেশী লাভজনক ব'লে মনে হ'ল এবং বিদেশের অবস্থা আশঙ্কা-জনক হ'য়ে উঠ্‌ল, এমন কি টাকা মারা যাওয়ারও ভয় দেখা দিল, তখন সোনার রপ্তানী বন্ধ হ'য়ে গেল, কিন্তু আমদানী সমানেই চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। সুতরাং সোনা জমা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু এই দুর্বিপাকের জন্য ধনতন্ত্র দায়ী নয়, উৎকট জাতীয়তা-বোধই দায়ী।

তবে কি ধনতন্ত্রের কোন দোষই নাই? দোষ আছে, অনেকই আছে, কিন্তু সেগুলি উৎপাদনের নয়, বণ্টনের। এই বণ্টনের বৈষম্য ও অবিচার রাজকীয় শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ বিদূরিত করা যাচ্ছে না, এবং যতদিন বণ্টন নীতিতে এই অসত্য ও অন্যায় থাক্‌বে, ধনতন্ত্রও ততদিন স্থিতিশীল হ'তে পার্‌বে না। বোল্‌শেভিকবাদ (bolshevism) এর চেয়ে ভাল কি মন্দ তার বিচার করা এখন কঠিন, কারণ তার উপরে যতদিন ধনতান্ত্রিক দেশগুলি খড়্গহস্ত হয়ে থাক্‌বে ততদিন ঐ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানা প্রায় অসম্ভব। বিশেষতঃ বোল্‌শেভিজম্‌ ধনতন্ত্রের চেয়ে বেশী স্থিতিশীল হ'বে কি না, তা' বল্‌বার সময় এখনও আসে নি। আমাদের এখন এই চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকা উচিত যে ধনতন্ত্রের দোষগুলি যথা-সম্ভব পরিহার করা। এটা বড় সহজ কথা নয়। কারণ রাজশক্তি জোর ক'রে এটা ক'র্‌তে পারে না। নতুন প্রতিষ্ঠান খাড়া করলেই শুধু হয় না, যদি না মানুষের মনও সেই সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লায়। সমাজতন্ত্রীরা বলেন প্রথমটা হ'লেই শেষটাও হ'বে। এ কথাটা আংশিক ভাবে সত্য হ'লেও, সম্পূর্ণ সত্য নয়। বরং দ্বিতীয়টি হলেই প্রথমটী সহজ হ'য়ে পড়ে। কিন্তু দুইটীই সময়সাপেক্ষ।

ধনতন্ত্র যেমন আংশিক পরিমাণে কল্যাণকর, জাতীয়তা-বোধও তেমনি নিছক মন্দ নয়। অন্ততঃ আমাদের দেশে ত নয়ই। পাশ্চাত্যদেশে জাতির ধর্ম্ম এই যে, দুর্ব্বলদেশকে নিপীড়ন ক'রে শক্তিশালী দেশগুলিকে আরও শক্তিমান্‌ করা। ওখানকার আন্তর্জাতিক মতবাদ একটা কথার কথা মাত্র। কারণ তা না হ'লে নিরস্ত্রীকরণ, যুদ্ধঋণ, যুদ্ধের খেসারত, আমদানী জিনিষের উপরে চড়াশুল্ক এসবেরই একটা সমাধান এতদিনে হ'য়ে যেত। আমাদের দেশে জাতিপ্রেমের ফলে যদি আমরা শিল্প বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করি এবং আমাদের অর্থ-নৈতিক শক্তি লাভ হয় তা হ'লে আর আমাদের দেশের সঙ্গে অন্য দেশের মিলন মৃৎপাত্রের সঙ্গে কাংস্যপাত্রের মিলনের মত হ'বে না। অন্ততঃ এটা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, দেশের যাবতীয় অভাব দূর করতেই আমাদের অনেক দিন লাগবে; অন্ততঃ ততদিন দুর্ব্বল বিদেশের উপরে শ্যেনদৃষ্টি দেওয়া আমাদের দরকারই হ'বে না। তথাপি জাতিপ্রেমের নামে জাঁতামি যা'তে আমাদের না পেয়ে বসে সেই বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। এখানেও সেই মনোভাবের কথা,—শুধু প্রতিষ্ঠানের কথা নয়। ভারতের ভাগ্যে কি আছে জানি না। কিন্তু যে শক্তি ভারতের ভাগ্যবিধাতা হ'বে, সে শক্তিকে জনগণ মন অধিনায়ক হ'তে হবে। অন্য উপায় নেই।

শ্রীযোগীশচন্দ্র সিংহ

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

অলিম্পিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ও ভারতীয় হকিদল

পুরুষোচিত ক্রীড়া প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যের পরিচয় প্রদান করে। তাই দেখা যায়, নানাবিধ ক্রীড়ায় আসক্তি ও পারদর্শিতা প্রাণবন্ত জাতিগুলির জাতীয় জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াব্যবস্থার মধ্য দিয়া জাতিতে জাতিতে মৈত্রী গড়িয়া উঠে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির ভাব জাগে।

সমগ্র বিশ্বের জাতি সমূহের মধ্যে চারি বৎসর অন্তর যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়, তাহা অলিম্পিক প্রতিযোগিতা নামে খ্যাত। প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পানে চারি বৎসর অন্তর জাতীয় উৎসবে যে সকল ক্রীড়া কৌতুক হইত তাহাকে এই নামে অভিহিত করা হইত। খ্রীঃপূর্ব্ব ৭৭৬ অব্দে ইহা প্রথম আরম্ভ হয়। তৎপরে, প্রথম ফরাসী এবং পরে জার্ম্মান প্রত্নতাত্ত্বিক ও খননকারীদের উদ্যমে এলিসে ইহার পূর্ব্বতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর ১৮৯৬ সাল হইতে ইহার পুনঃ প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং যথাক্রমে এথেন্স, প্যারি, ষ্টকহলম্, সেণ্টলুই, এথেন্স, লণ্ডন, এণ্টোয়ার্প, প্যারি, আমষ্টার্ডাম এবং লস্ এঞ্জেলসে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আমাদের যখন স্বাস্থ্য ও অর্থ ছিল, তখন দেশময় নানাপ্রকার ক্রীড়া ব্যায়ামাদির প্রচলন ছিল এবং বিভিন্ন দলের শক্তি ও কৌশলের প্রতিযোগিতায় বাংলার পল্লীঅঞ্চলে অনেক সময়েই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইত। কিন্তু, বর্ত্তমানে আমাদের শোচনীয় দারিদ্র্য জীবনের সর্ব্ববিধ আনন্দের প্রকাশকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে; ম্যালেরিয়া বাংলার পল্লীগুলিকে এমন নির্জ্জীব এবং নিরুদ্যম করিয়াছে যে, সেখানে জীবনের শেষ স্পন্দনও থামিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই আমাদের জাতীয় জীবনেও শক্তি চর্চ্চা বা ক্রীড়ার স্থান নাই।

সুখের কথা, আমাদের উন্নতির নানাবিধ প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের তরুণের দল এদিকেও কিছু আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসন পাইবার জন্য এক্ষেত্রেও যে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে, সে কথা বুঝিয়াছেন।

১৯২০ সালে আমষ্টার্ডামে ভারতীয় হকিদল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া সমগ্র সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করেন। এই বৎসর জাপানের Mici odo কয়েকটি ক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া সমগ্র প্রাচ্যের মর্য্যাদা বিশেষভাবে বৰ্দ্ধিত করেন।

এবৎসর (১৯৩২) অলিম্পিকে যোগ দিবার জন্য ভারতীয় হকিদল গত জুলাই মাসে লস্এঞ্জেলসে যাত্রা করেন এবং জাপানকে ১১—১ গোলে ও আমেরিকাকে ২৪—১ গোলে পরাজিত করিয়া, অতি সহজেই নিজেদের 'বিশ্বজয়ী' নাম অক্ষুণ্ণ রাখেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ইউরোপ হইয়া যাইবার জন্য ইঁহারা জার্ম্মানির নিকট হইতে তার পান এবং ইঁহাদের ইউরোপে অবস্থান কালে বিভিন্ন দেশ পরিদর্শনের সময় এই দেশ সর্ব্বত্রই ইঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর হোটেলে রাখিবার ব্যবস্থা করেন ও এই সকল ব্যাপারে ২০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। ইউরোপে ইঁহারা জার্ম্মানি, হলাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, জেকোস্লোভেকিয়া, হাঙ্গারি এবং ইটালি প্রভৃতি দেশের সহিত খেলায় জয়লাভ করেন। ইঁহারা সব চেয়ে অধিক বাধা পাইয়াছিলেন জার্ম্মানির নিকট হইতে। নিখিল-জার্ম্মান দলকে ইঁহারা মাত্র ৬-১ গোলে পরাজিত করিতে সমর্থ হন।

ইঁহাদের এই কৃতিত্বে বিদেশে ভারতের মর্য্যাদা বাড়িয়াছে এবং প্রত্যেক ভারতবাসীই ইহাতে গৌরব বোধ করিয়াছেন। কিন্তু, বাঙ্গালী তরুণদের একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে, এই দলের পরিচালক শ্রীযুক্ত পি-গুপ্ত ব্যতীত ইঁহাদের মধ্যে অন্য কোনও বাঙ্গালী ছিলেন না।

এই দলের কয়েকটি অভিজ্ঞতা

এই হকিদল অর্দ্ধ পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণের সময় সর্ব্বত্রই ভারতবাসীদের দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। কেবলমাত্র বুডাপেষ্ট এবং প্রেগে কোনও ভারতবাসীর সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই।

ইঁহারা সর্ব্বত্রই পদস্থ রাজপুরুষ, ধনী এবং বিখ্যাত লোকদের নিকট হইতে সমাদর লাভ করিয়াছেন এবং বড় বড় নগরে পৌর সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পি-গুপ্ত নিউ-ইয়র্ক-টাইম্‌স্‌ পত্রিকার অফিস্‌ দেখিতে যাইয়া তাহার সকল ব্যাপারের বিপুলতায় বিস্মিত হইয়া যান। পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা ১০ লক্ষের উপর; ছাপাখানা এত প্রকাণ্ড এবং তাহার কাজ এত দ্রুত যে, তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করা যায় না; ঘণ্টায় কাগজের ৭০ হাজার সংখ্যা ছাপা হয়। আমেরিকা এবং ইউরোপে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান যে কত অল্প তাহা East Bengal Timesএ প্রকাশিত শ্রীযুত পি-গুপ্তের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে অনেকটা বুঝা যাইবে।

"লস্‌এঞ্জেলসে আমার ছয় সপ্তাহ অবস্থান কালে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন আমার নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ভারতীয় নেতারা একাধিকবার প্রচার কার্য্যে এখানে ভ্রমণ করা এবং 'স্বামী'র দল এখানে এখনও আশ্রম সমূহে বাস করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ সাধারণ আমেরিকানের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং বেদনাবোধ করিয়াছিলাম। এমন কি, তাঁহারা যে খাদ্য খান, আমরাও সেই একই প্রকারের খাদ্য খাই শুনিয়া অনেক আমেরিকান বিস্মিত হইয়াছিলেন।"

এই প্রকারের ক্রীড়া-অভিযানে বিদেশে ভারতের মর্য্যাদা যে কতটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সে সম্বন্ধে উক্ত লেখক বলিয়াছেন, "এমন কি, ইউরোপেও ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সুপরিচিত নহে; এই সকল ক্রীড়া-অভিযান পৃথিবীর চোখে ভারতের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য। নিখিল-ভারতীয় দলটি ইউরোপে নিজেদের প্রভাব ভালভাবে মুদ্রিত করিয়াছে এবং যাহারা কখনই ভারতবর্ষের নাম শুনে নাই এমন সহস্র সহস্র লোকের নিকট ভারতের সম্মান সুনিশ্চিতভাবে বাড়াইয়া দিয়াছে। ইউরোপের শিক্ষিত লোকেরা এইটুকু মাত্র জানেন যে, ভারতবর্ষে একজন ঠাকুর, একজন গান্ধী এবং একজন রামণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উৎসুক শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সাধারণ লোকের নিকট, আমরা যে শুধু খেলিয়াছিলাম তাহা নয়, ভারতবর্ষের মর্ম্মকথাটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম।"

টাটা কোম্পানী ও বাংলাদেশ

টাটা লৌহ কারখানার সাহায্যে বাংলাদেশ কতটা উপকৃত হয়, সে সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল সংবাদ প্রকাশিত হয় বলিয়া উক্ত কোম্পানীর প্রধান পরিচালক এম-আর-দালাল, এম, এ, আই-সি-এস মহোদয় এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, এই কোম্পানীর সংগৃহীত মোট মূলধন ১০,৪৫,৬৮,০০০৲ টাকার মধ্যে মাত্র ৪১,৪৫,০০০৲ টাকা বাংলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯৩২ সালে এই কোম্পানীর ১৮,৪১৩ জন মাসিক বেতনভোগী কর্ম্মচারীর মধ্যে ২,৪৯৭ জন বাঙ্গালী ছিলেন। ২৫০৲ অধিক মাসিক বেতনের ২৬২ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে ৮৭ জনই বাঙ্গালী। Foreign Steel Industryর ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য শিক্ষিত কর্ম্মচারীদের কোম্পানী বিদেশে পাঠাইয়া থাকেন। এইরূপ মোট ২০ জনের মধ্যে ৮ জন কর্ম্মচারী বাঙ্গালী এবং ইঁহাদের জন্য ব্যয় হইয়াছে ৪৮,০০০৲ টাকা। এ বিষয়ে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১,১০,০০০৲ টাকা। প্রতিবৎসর কারখানায় ৮৮ লক্ষ টাকার কয়লা ব্যয় হয়; ইহার অধিকাংশ বাংলাদেশ হইতে লওয়া হয়। এই কোম্পানীর বহু কলকব্জা ও লৌহের

আমদানি রপ্তানিতে কলিকাতা বন্দর যথেষ্ট পরিমান লাভ করিতেছে। গত বৎসর কোম্পানীর ৪ লক্ষ টাকা কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট্‌কে দিতে হইয়াছে। জামসেদপুরের ৮২,০০০ অধিবাসীর আহার্য্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রধানতঃ কলিকাতা হইতেই আনীত হয়। ইহাতেও কলিকাতার লাভ কম হয় না।

অবশ্য বাঙ্গালীর যোগ্যতা ও কর্ম্মক্ষমতা এবং বাংলার ভৌগলিক অবস্থানের জন্যেই যে বাঙ্গালীরা এই সুবিধার অধিকারী হইয়াছেন, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙ্গালীরা নানাদিক দিয়া এই কোম্পানীর নিকট যে সকল সুবিধা পাইতেছেন, তাহা দেখান হইয়াছে বটে, তাহা হইলেও এই তালিকার সহিত আর একটি জিনিস থাকিলে বাঙ্গালীদের উপর অধিকতর সুবিচার করা হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাংলা দেশে কোম্পানীর উৎপন্ন দ্রব্যের কতটা বিক্রয় হয়, তাহাতে কত লাভ হয়, এবং কোম্পানীর মোট লাভের তাহা কত অংশ, এই তালিকার সহিত তাহাও থাকা উচিত ছিল।

২৫০৲ টাকার উপরের কর্ম্মচারীদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাধিক্য দেখান হইয়াছে; কিন্তু, উচ্চতম বেতনের কর্ম্মচারীদের মধ্যে বাঙ্গালী কত জন তাহা বলা হয় নাই। ২৫০৲ টাকার উপরের কর্ম্মচারীদের মোট মাসিক বেতন কত, এবং ঐ স্তরের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরাই বা তাহার কত অংশ পান; সকল কর্ম্মচারীর মোট মাসিক বেতনের কত অংশ সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা পাইয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ থাকিলে বিবরণীটি অধিকতর নিরপেক্ষ এবং ন্যায়সঙ্গত হইত।

বাংলাদেশ হইতে ইঁহারা যে কয়লা ক্রয় করেন তাহার কত অংশ বাঙ্গালী মালিকের খনি হইতে সংগৃহীত হয়; বিদেশী টীনের উপর বর্দ্ধিতহারে শুল্ক প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এই কোম্পানীর যে অতিরিক্ত লাভ হইয়াছে বাংলাদেশ তাহার কতটা যোগাইয়াছে; বাংলা দেশে ইঁহাদের যে উৎপন্ন-দ্রব্য বিক্রয় হয়, তাহার কত অংশ বাঙ্গালী মধ্যবর্ত্তির হাত দিয়া যায়; এই সকল কথাও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বাঙ্গালীরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ সংঘ

কলিকাতার কলেজ সমূহের ছাত্রেরা মিলিয়া দেশের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য একটি সংঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কলিকাতা ইঁহাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইবে এবং স্থানীয় স্কুল কলেজের মধ্যবর্ত্তিতায় মফঃস্বলেও ইঁহারা কাজ করিবেন।

আমাদের দুঃখ দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এবং আমাদের সর্ব্ব-প্রকার উন্নতি-চেষ্টার আংশিক বা সম্পূর্ণ বিফলতার মূলে যে দেশব্যাপী অশিক্ষা রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আমাদের জাতীয় প্রগতিকে স্থায়ী ও সার্থক করিতে হইলে, ও ইহাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম এই অশিক্ষার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালাইতে হইবে। দেশহিতৈষী চিন্তাশীল লোকেরা অনেকদিন পূর্ব্বেই একথা বুঝিয়াছেন এবং খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টাও অনেক দিন হইতে চলিতেছে। কিন্তু, কাজ এত বিপুল এবং ইহার জন্য এমন ধারাবাহিক, সুশৃঙ্খল ও ব্যাপক চেষ্টা এবং প্রচুর অর্থব্যয় আবশ্যক যে এক রাজসরকার ব্যতীত অন্য কোনও লোক বা দলের পক্ষে বিশেষ কিছু করিয়া তোলা অনেকটা অসম্ভব। তাহা হইলেও অবশ্য আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আমাদের ছাত্রদের মধ্যে এই উদ্যম এবং চেষ্টা এই জন্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয় যে, অন্যান্য দেশের, বিশেষ করিয়া অন্যান্য পতিত দেশের ছাত্রেরা সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের অবসর সময় দেশের গঠনমূলক কাজে ব্যয় করিয়া যেরূপে জাতীয় উন্নতিকে সাহায্য করিয়াছেন, আমাদের ছাত্রেরা এখনও পর্য্যন্ত তদনুরূপ কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সংকল্পিত চেষ্টায় অবিচলিত থাকিতে পারিলে, এই ব্যাপারে তাঁহারা অন্যান্য দেশের ছাত্রসম্প্রদায়ের সম-পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারিবেন। দেশের বহু নেতৃস্থানীয় শ্রদ্ধেয় লোক এই প্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন।

ইহাতে যতটুকু কাজ হইবে, ততটুকুই লাভ হইবে এবং তাহার চেয়ে বৃহত্তর লাভ এই হইবে যে, ইহার মধ্য দিয়া ছাত্রদের মধ্যে যে উদ্দীপনা, কর্ম্ম প্রচেষ্টা ও দেশের লোকের

উপর সহানুভূতি জাগ্রত হইবে, যে ত্যাগ ও শৃঙ্খলার সহিত কর্ম্মপরিচালনার শিক্ষা হইবে এবং দেশের অবস্থার সহিত যে পরিচয় ঘটিবে তাহাই ভবিষ্যতে অধিকতর ফলপ্রসূ কার্য্যে আত্ম-প্রকাশ করিবে এবং ইহার অনুকূলে লোকমত গঠনে সহায়তা করিয়া দেশের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য রাজসরকারের উপর চাপ দিতে পারিবে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন

বাঙ্গালী মুসলমানদিগের বাংলা সাহিত্য প্রীতি একান্ত স্বাভাবিক হইলেও এই জন্যই ইহা সবিশেষ আনন্দের কথা যে অনেক বাঙ্গালী মুসলমান মনে করিতেন, হয়ত কেহ কেহ এখনও করেন যে, বাংলা তাঁহাদের মাতৃভাষা নয় এবং বাংলা সাহিত্যও তাঁহাদের নিজস্ব নহে।

বাংলার ১৯২১ সালের আদম সুমারীর বিবরণের ৫ম খণ্ডের ভাষা অধ্যায়ে লিখিত আছে—যে, বাংলায় আরব প্রভৃতি দেশের লোকের বংশধরদের সংখ্যা প্রায় শূন্য হইলেও ঐ সমস্ত দেশের ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া লিখাইয়া দিবার একটা ঝোঁক এখানকার অনেক লোকের আছে।

'অথচ বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাংলা এবং তাহা যে হিন্দু বাঙ্গালীর ভাষা হইতে পৃথক নহে, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীই তাহা জানেন। ইহা গৌরবের কথা ব্যতীত কাহারও পক্ষে লজ্জার কথা নহে। বাহিরের কোনও চেষ্টা দ্বারা ইহার পরিবর্ত্তন সাধন ও সম্ভব নহে। মানব জাতির ইতিহাসে ভাষা পরিবর্ত্তনের উদাহরণ যে নাই, তাহা নহে; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহা সাধিত হয় নাই।

বাংলাভাষায় যাহারা কথা বলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ হইতেছেন ধর্ম্মে মুসলমান; কারণ তাঁহারাই বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। এই হিসাবে বাংলার উপর দাবী হয়ত সব চেয়ে মুসলমানেরই বেশী। কেহ কেহ মনে করেন, বাংলা সাহিত্য হিন্দুর চিন্তায় পুষ্ট, হিন্দুর ভাবধারাই তাহার প্রাণ, মুসলমান সেখানে নিজের কিছু খুঁজিয়া পায় না। এই প্রসঙ্গে এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে, ভাষা ও সাহিত্য পৃথক জিনিস। বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা ও প্রভাব কতটা প্রতিফলিত হইবে তাহা তাঁহাদের মাতৃভাষায় সাহিত্য সাধনার উপর নির্ভর করিতেছে। বাংলার পল্লীগাথাগুলি এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মুসলমানের নিকট বিশেষভাবে ঋণী—বর্ত্তমানেও অনেক শক্তিশালী মুসলমান লেখক নানাদিক দিয়া বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিতেছেন।

সম্মিলনের সুযোগ্য সভাপতি কবি কায়কোবাদ সাহেব, বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন "বঙ্গভাষা যে বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা এ সম্বন্ধে বোধ হয়—এখন আর দ্বিমত নাই। অন্ততঃ অধিকাংশ বঙ্গীয় মুসলমানই একথা একবাক্যে স্বীকার করেন। অল্পসংখ্যক যাহারা করেন না, তাঁহারা এখনও উর্দ্দুর স্বপ্নেই বিভোর হইয়া আছেন। ...প্রকৃতির নিয়মকে উল্টাইয়া দিয়া উর্দ্দু কোনরূপেই বাংলার মুসলিম্ জনসাধারণের ভাষা হইতে পারিবে না। উহা কয়েকজন ভাব বিলাসীর ভাষা হইতে পারে ইহার বেশী কিছু নয়।

"আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, বাংলাভাষা কেবল আমাদের মাতৃভাষা নয়, আমাদের জন্মভূমির ভাষা। ইহা হিন্দুরও ভাষা, মুসলমানেরও ভাষা। ইহার উপর হিন্দু মুসলমানের তুল্য অধিকার। আজ হয় ত কাহারও নিকট মুসলমানের সাহিত্য সাদনার—বাংলা সাহিত্য সাধনার কোনও মূল্য নাই,—কিন্তু এমন একদিন আসিবে যেদিন··· মুসলমানের পরিচর্য্যার ফলে বাংলাভাষা নবজীবন লাভ করিবে। উহার অঙ্গে অঙ্গে আমাদের আদর্শের ছাপ, আমাদের ভাবের ছাপ, আমাদের সাধনার ছাপ দীপ্যমান হইয়া উঠিবে।"

মাতৃভাষার পরিবর্ত্তন প্রয়াসীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আমার মাতৃভাষার পরিবর্ত্তন প্রয়াসী মুষ্টিমেয়কে আমি বলিতে চাই আমার মায়ের যে ভাষা, যে ভাষায় আমি প্রথম কথা বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষা আমি সকল প্রাণমন দিয়া শিক্ষা করিয়াছি যে ভাষায় আমি গল্প করিয়াছি স্বপ্ন দেখিয়াছি—বন্ধু বান্ধবের সহিত মন খুলিয়া নানা বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিয়াছি—গীত গাহিয়াছি, কবিতা লিখিয়াছি, সেই অমৃতোপম ভাষা আমার

মাতৃভাষা না হইয়া বাংলার বাহিরের একটি ভাষা যে, কেমন করিয়া আমার মাতৃভাষা হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

বাংলার হিন্দু ও বাংলার মুসলমানের জন্য এক মিলিত ভাষা চাই

কোনও কোনও মুসলমান বাংলা-লেখক লেখার মধ্যে প্রচুর আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে চান। বাস্তবিকপক্ষে অন্যদেশের মুসলমানদের ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া বাংলার মধ্যে ঢুকাইলে, তাহাতে মুসলমানদিগের বিশিষ্ট সভ্যতা, চিন্তা, ভাব বা আদর্শের ছাপ সাহিত্যে মুদ্রিত হইবে না। ইহাতে মাত্র ভাষা বিকৃত হইবে এবং সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালীর নিকট তাহা সুবোধ্য হইবে না। সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে একটি প্রকৃত মিলনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিতেছে, সেখানে কোনও প্রকারের বাধার সৃষ্টি করা কাহারও পক্ষেই মঙ্গলের হইবে না। পূর্ব্বোক্ত সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ভাবে এ বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "আমি বাংলার হিন্দু এবং বাংলার মুসলমানের জন্য এক মিলিত ভাষা চাই। মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কোনই প্রয়োজন অনুভব করি না। আমার বক্তব্য এই যে, বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সাহিত্যের দিক দিয়া সকল প্রকার সাধনা করিতে হইবে। আমার নিবেদন এই যে, আমরা যেন বাংলা ভাষাকে অস্বাভাবিক না করিয়া তুলি। বাংলা সাহিত্যের বুকে ইস্‌লামী ছাপ ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, ভাবের দিক দিয়াই উহার বিকাশ করিতে হইবে। প্রচুর আরবী, ফারসী শব্দের প্রচলন দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে না। আমরা যাহা রচনা করিব তাহা যেন আমাদের প্রতিবেশীরাও অনায়াসে বুঝিতে পারেন, সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নতুবা আমাদের রচিত ভাষা বা সাহিত্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষা বা সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ...মাতৃভূমির ভাষা হইবে এক ও অখণ্ডিত। ইহাকে যাহারা খণ্ডিত করিতে চান, আমি তাঁহাদের রুচির এবং দেশপ্রেমের প্রশংসা করিতে পারি না। আমার ভরসা আছে, মাতৃভাষাকে দ্বিধা বিভক্ত না করিয়াও আমরা আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিব। উহা বজায় রাখাই আমাদের কাজ,—ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করা নহে।

সেনাদল ও সামরিক জাতি

ঐক্য সম্মিলনের কমিটিতে সৈন্য সংগ্রহ সম্বন্ধে পূর্ব্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, শুধু মাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে সেনাদলে লোক ভর্ত্তি করা হইবে। এই নীতি সর্ব্বথা ন্যায়ানুমোদিত ও গণতান্ত্রিক ছিল। কিন্তু পরে মুসলমান ও শিখদিগের ইচ্ছানুযায়ী ইহাতে এই কথা যোগ করা হইয়াছে যে, যোগ্যতা নির্ণয়ের সময় সামরিক সংস্কারের (military traditions) কথা বিবেচনা করা হইবে।

ইহা আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য ও লজ্জার কথা যে, সমগ্র জাতির ভাগ্য নির্ণয় ও মঙ্গল সাধনের ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, অনেক সময়েই তাঁহারা নীতি, সঙ্গতি এবং নিরপেক্ষতা অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর স্বার্থকে বড় করিয়া দেখেন এবং অপর অনেকে, মিলন ও ঐক্যের আশায়, মূলনীতি পরিত্যাগ করিয়া এবং সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইয়া অর্দ্ধ পথে নামিয়া আসিয়া এই প্রকার অন্যায় দাবীর সহিত সন্ধি করেন। বস্তুতঃ এই সকল অন্যায় দাবীর দ্বারা যেমন জাতীয় স্বার্থকে অবহেলা ও অস্বীকার করা হয়, কোনও দাবী সমর্থনের দ্বারাও তেমনই তাহাকে খণ্ডিত ও দুর্ব্বল করা হয়।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ন্যায় আত্ম-রক্ষার পূর্ণতম সুযোগও সকল জাতির থাকা উচিত। বাঙ্গালীদের ন্যায় অসামরিক জাতিরও এই স্বাভাবিক অধিকারের দাবী আছে। জাতিগত সামরিক সংস্কারের অভাব ব্যক্তিগত যোগ্যতার পথে সামান্য বিঘ্ন উৎপাদন করিলেও তাহা বিশেষ দুঃখ ও আপত্তিকর ব্যাপার হইবে। সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা এবং বিশ্বস্ততা প্রভৃতি সৈনিকোচিত গুণে যে অসামরিক জাতিরাও সামরিক জাতিদের সমকক্ষ হইতে পারেন যুদ্ধক্ষেত্রে এবং অন্যত্র তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে।

শিখেরা অথবা সীমান্ত প্রদেশের পাঠানেরা যে অর্থে সামরিক জাতি, পৃথিবীর অনেক জাতি সেই অর্থে সামরিক

নহে। ইহা তাঁহাদের সৈনিক হইবার পথে বাধা বলিয়া বিবেচিত হয় না এবং এজন্য তাঁহাদের সেনাদলের উৎকর্ষও কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় না।

যাঁহাদের মধ্যে সামরিক ঝোঁক নাই, স্বভাবতঃই তাঁহাদের কম সংখ্যক লোক সেনাবিভাগের দিকে ঝুঁকিতেন। তাহার জন্য এই প্রকার নিষেধ সূচক বাক্যাংশ যোগ করিয়া নীতিকে খর্ব্ব করিবার প্রয়োজন ছিল না। ইহার জন্য আমাদিগকে এই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে যে, অন্য সর্ব্ববিধ যোগ্যতায় একজন বাঙ্গালী এবং একজন শিখ সমান হইলেও, শুধুমাত্র সামরিক জাতির লোক বলিয়া শিখ প্রার্থীর অধিকতর সুবিধা পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

আরও আপত্তির কথা এই যে, আকাশ ও নৌ-সৈন্যের সম্বন্ধেও এই নীতির অনুসরণ করা হইবে; অথচ, এই দুই ক্ষেত্রে ভারতের সামরিক জাতিদেরও কোনও অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা নাই।

ঐক্য সম্মিলন ও বাঙ্গালী হিন্দু

বাংলার মুসলমানদিগকে বিনা সর্ত্তে শতকরা ৫১টি সদস্যপদ দিতে, সম্মত হইতে না পারায় বাঙ্গালী হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িকতা ও মিলন বৈঠকের ব্যর্থতার দোষ চাপান হইতেছে। কিন্তু, সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই আনয়ন করা যায় না যে, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা কখনও ভাল বলিয়া মনে করেন নাই এবং নিজেদের সুবিধা বা স্বার্থের জন্য কখনও তাহা দাবী করেন নাই। নিজেরা সংখ্যাল্প সম্প্রদায় হইয়াও এবং জেলাবোর্ড প্রভৃতি মিশ্র নির্ব্বাচন কেন্দ্রের অবস্থা হইতে নিজেদের ভবিষ্যৎ অসুবিধা বুঝিয়াও শুধু জাতীয়তার পরিপন্থী বলিয়া পৃথক নির্ব্বাচন প্রণালীর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছেন। তাঁহারা যাহা চাহিয়াছেন, তাহা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট নহে; সাম্প্রদায়িক দাবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মাত্র। মুসলমানেরা শতকরা ৫১, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাধিক্য চাহিয়াছেন। হিন্দুরা তাহা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু, কয়েকটি সর্ত্তে। অন্যান্য স্থানে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের জনসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক প্রতিনিধি চাহিয়াছেন। এখানে হিন্দু এবং অন্যদের জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা ৪৪'৭। হিন্দুরাও এই অনুপাতে প্রতিনিধি পাইবার দাবী করিয়াছেন।

ইউরোপীয়দের প্রতিনিধি সংখ্যা প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের ঘোষণা অনুসারে অত্যন্ত অধিক থাকায়, হিন্দু এবং মুসলমানেরা মিলিত ভাবে সমগ্র প্রতিনিধি সংখ্যার শতকরা ৫১ + ৪৪'৭ পান নাই। হিন্দুরা পূর্ব্ব সর্ত্ত স্বরূপে চাহিয়াছিলেন যে, মিলিতভাবে উভয় দল ইউরোপীয়দের নিকট হইতে তাঁহাদের ন্যায়তঃ প্রাপ্য সংখ্যাগুলি আদায়ের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু, মুসলমানেরা বিনা সর্ত্তে তাঁহাদের শতকরা ৫১টি পদ প্রথমেই দাবী করিতেছেন। তাহা দিতে গেলে হিন্দুদের নিজেদের অংশে যে পদগুলি কমতি পড়িয়াছে, তাহার পরেও নিজেদের কম সংখ্যা হইতে, মুসলমানদের কমতি পদগুলি পুরাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ দ্বিগুণ ক্ষতি স্বীকার করিতে যদি তাঁহারা সম্মত না হইতে পারেন তবে, ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁহাদিগকে কিছু দোষ দেওয়া যায় না।

মোট যে সদস্য সংখ্যাগুলি কম পড়িয়াছে নিজ নিজ জন সংখ্যার অনুপাতে উভয় সম্প্রদায় সেই ক্ষতিটা ভাগ করিয়া লইয়া যদি একত্রে অধিকার আদায় করিবার চেষ্টা করিতেন তবে, তাহা ন্যায়ানুমোদিত হইত।

এই প্রসঙ্গে একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিবার আছে। প্রত্যেক প্রদেশের অধিকার রক্ষার জন্য সকল প্রদেশের মুসলমানেরা মিলিতভাবে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু, এক প্রদেশের হিন্দু অন্য প্রদেশের হিন্দুর স্বার্থের জন্য কিছুমাত্র উদ্বেগ দেখান নাই। বাঙ্গালী হিন্দুদের অধিকার রক্ষার জন্য শুধুমাত্র যে তাহাদের মুসলমান ভ্রাতাদের সহিত লড়িতে হইতেছে তাহা নহে। অন্য প্রদেশের হিন্দুদের সহিতও লড়িতে হইতেছে।

অন্ততঃ এই একটা ব্যাপারেও যে বাঙ্গালী হিন্দুরা এক হইয়া দাঁড়াইয়া নিজেদের সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা বিশেষ সুখের বিষয়।

ব্রহ্ম বিচ্ছেদ

ব্রহ্ম আইন পরিষদে ব্রহ্মবিচ্ছেদের প্রস্তাব গৃহীত না হইয়া ভারতের সহিত যুক্ত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু, নির্ব্বাচনে ব্রহ্মবিচ্ছেদ বিরোধী দলের জয় লাভ, এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রাথমিক কথাবার্ত্তা ও চালচলন এবং নিরপেক্ষ দলেরও এ বিষয়ে আনুকূল্য দেখিয়া অধিকাংশ ভারতবাসী যেমন আশা করিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। বিচ্ছেদ-বিরোধীদলের নেতারা, ব্রহ্মদেশকে ভারতের অনুরূপ শাসনতন্ত্র দেওয়া হইবে এরূপ আশা পাইয়া, তাঁহাদের পূর্ব্ব সংকল্প হইতে কতকটা বিচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। দেখা গেল, ভারতের সহিত যুক্ত থাকিবার লাভ লোকসানের কথা ইঁহারা বিবেচনা করেন নাই। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের ঘোষণানুযায়ী শাসনতন্ত্র ইঁহাদের পছন্দ না-হওয়ায়, প্রতিবাদ স্বরূপ ইঁহারা বিচ্ছেদের বিরোধিতা করিয়াছেন এবং ইচ্ছানুরূপ শাসনতন্ত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত বিরোধিতা করিবেন। সম্পর্ক ত্যাগ ও অন্যান্য কতকগুলি সর্ত্তে ইঁহারা ভারতের সহিত যুক্ত হইতে অবশ্য সম্মত হইয়াছেন। ভারতীয় নেতারা সকলেই ইহাতে আনন্দও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু, কয়েকটি কারণে বিষয়টির গুরুত্ব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সম্পর্কত্যাগের অধিকার থাকা নিশ্চয়ই সঙ্গত; সে অধিকার না থাকিলে তাহা অধীনতার নামান্তর হইয়া পড়ে—যদিও এই অধিকারটি নিতান্ত অসময়ের জন্য রক্ষিত থাকে। কিন্তু, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই অধিকারটি ইহার গৌণ উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তে একটা অযথা প্রাধান্য পাইয়াছে এবং সংযোগটাকে নিতান্ত সাময়িক ও প্রয়োজন সিদ্ধির ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে।

মহাত্মাজীর উপবাস স্থগিত

মাদ্রাজের আইন সভায় ডাঃ সুবারায়ানের মন্দির-প্রবেশ-সম্মতি আইনের প্রস্তাব উত্থাপন সম্বন্ধে বড়লাটের মতামত ১৫ই তারিখের মধ্যে পাওয়া যাইবে না বলিয়া মহাত্মাজী তাঁহার ২রা তারিখের সংকল্পিত উপবাস অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিবেন।

সুশীলকুমার বসু

আমারে ভাসিয়ে নাও

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

(গান)

আমারে ভাসিয়ে নাও, ভাসিয়ে নাও, ভাসিয়ে নাও
হে আকাশ, ওহে বাতাস, আমারে শরণ দাও।
হে নীরদ আকাশ-ভরা,
বিজলী চকিত্-করা,
হে পবন মত্ত উতল, আমারে লইয়ে যাও।
লয়ে যাও অচিন্ দেশে,
লয়ে যাও সাগর-শেষে,
সাগরের উত্তাল ঢেউর মাথায় মাথায় নাচিয়ে দাও।
নাচিয়ে দাও, মাতিয়ে দাও,
বজ্র-ভাষণ কইয়ে দাও,
খোলা ঝড়ের ঝড়ের খেলায় খুব দোলাও।
পাগল দোলায় প্রলয় নাচন আজ শিখাও॥

দুরাশায়

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু বি-এ

তারে কই, এসো এসো
আমার এই বুকের কাছে,
যেখানে তোমার আসন
চিরদিন পাতাই আছে,
যেখানে তোমার সুখে
কেবলি হাসির ধারা,
যেখানে তোমার ব্যথায়
বেদনা বাঁধন হারা ;
সদা ভয় অবহেলায়
তারে বা হারাই পাছে,
বলি তাই এসো এসো
এসো এই বুকের কাছে ।

কি জানি ভাবে কি সে,
আসেনা আমার কথায় ।
আমি তার মুখটি হেরি
আকাশে, তরুলতায়,
বাদলে পথের পরে
ভাবি তায় সঙ্গী করি,
ডাকি তাই এসো এসো
তোমারি আঁচল ধরি,
তত সে দূরে পালায়
যত তায় হৃদয় যাচে,
মিছে কই এসো এসো
এসো গো বুকের কাছে ।

গগনের মেঘের কোলে
বিজলী চমকে গেল,
অজানা রাতের পাখী
যেন ঠিক থমকে গেল !
একেলা বাতায়নে,
একেলা শয়ন ঘরে,
ডেকেছি কখন তারে
এসো গো বুকের পরে,
দূরে ঐ জলের রেখায়
পথিকের আলোক নাচে
প্রদীপের নিভুল শিখা,
এসো গো বুকের কাছে ।

একদা আমিও যাব
ছেড়ে তার ভুবনখানি,
যত সে ডাকুক আমার
শোনে কি অভিমানী ?
আসে কি ফিরে কভু
ব্যথা যে গেছে পেয়ে ?
পেলনা কখনো যে
কতবার পাশে চেয়ে ?
বারেবার অনাদরে
মরমীর প্রাণ কি বাঁচে ?
বৃথা যে ডেকে গেলাম
এসো এই বুকের কাছে ।

নানা কথা

'বাঙলার রঙ ও রূপ'

সুপরিচিত চিত্রশিল্পী শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদারের অঙ্কিত চিত্রগুলি থেকে কয়েকখানি ছবি নির্ব্বাচিত ক'রে শীঘ্রই একটি অ্যাল্‌বাম প্রকাশিত হবে। গত পৌষ মাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'বাঙলার রঙ ও রূপ' প্রবন্ধটি নলিনীবাবুর উক্ত অ্যালবামের ভূমিকাস্বরূপ রচিত।

কান্তি ইন্‌স্যুওরান্স কোং লিঃ

কান্তি ইন্‌স্যুওরান্স কোম্পানীর হিতৈষীগণ অবগত হয়ে সুখী হবেন যে, সিন্ধুপ্রদেশের খ্যাতনামা মুসলমান নেতা, বোম্বাই লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য স্যার শাহ নওয়াজ জি ভুট্টো সি-আই-ই, ও-বি-ই মহাশয় উক্ত কোম্পানীতে হেড বোর্ডের ডিরেক্টররূপে যোগদান করেছেন। এবং স্বীয় প্রদেশে কোম্পানীটিকে জনপ্রিয় করবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

'প্যালেষ্টাইন্'

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর রচিত 'প্যালেষ্টাইন' শীর্ষক প্রবন্ধের কয়েকটি তথ্যের ভ্রম দেখিয়ে শিলং থেকে সৈয়দ এম, এ, শাত্তার মহাশয় একটি প্রতিবাদ-পত্র পাঠিয়েছেন। মূল প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার বহু বিলম্বে প্রতিবাদ প্রকাশিত হ'লে প্রতিবাদেরই উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হয়—সে জন্য মূল প্রবন্ধ প্রকাশের পর [illegible] প্রতিবাদ পাঠানো উচিত। সে যা হ'ক, বিরোধ [illegible] যুক্ত হয়, তথ্যের, সেখানে প্রতিবাদ বিলম্বে প্রকাশিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। আমরা নীচে শত্তার মহাশয়ের প্রতিবাদ পত্রের সারাংশ প্রকাশিত করলাম।

"গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বিচিত্রা'র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর মহাশয়ের লিখিত 'প্যালেষ্টাইন্' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে আশ্চর্য্যান্বিত হলাম। ধর ম'শায় এই প্রবন্ধটীর মাল মসলা ধার করে লিখেছেন না স্বীয় অভিজ্ঞতা হ'তে লিখেছেন তা প্রবন্ধ পাঠে বুঝিলাম না। যেরূপেই লিখে থাকুন 'বিচিত্রায়' এই প্রবন্ধ লিখ্‌তে গিয়ে যে তিনি অনেক বিভ্রাট ঘটায়েছেন তা' বলাই বাহুল্য।

মোসলেম অধিকার হ'তে য়ুরোপীয়দের অধীনে এসে 'প্যালেষ্টাইন' আজ উন্নতির দিকে চলেছে না অবনতির দিকে চলেছে তার বিচার করা এ প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয়দের মত 'প্যালেষ্টাইন' বাসীরাই হয়ত অদূর ভবিষ্যতে নিজেরাই তার মীমাংসা করবে। তবে ধর ম'শায় সেই দেশের বাসিন্দা বেদুঈনদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে যা' লিখেছেন আমরা তার প্রতিবাদ না করে পারছি না।

উপরি উক্ত প্রবন্ধে 'বিচিত্রা'র ৬৭৪ পৃষ্ঠায় ধর মশায় লিখেছেন,—মরুর বুকে ঘুরে বেড়াতেই বেদুঈনরা ভালোবাসে। এক একটি মরুদ্যানের পাশে এরা তাঁবু খাটায়, সেখানে বাস করে যতদিন পর্য্যন্ত না মরুদ্যানের ফল মূল সব কিছুই নিঃশেষিত হয়ে যায়।…… এক একটি দলের তাঁবুর কিছুদূরে একটি করে বিশেষ তাঁবু খাটানো থাকে উপাসনার জন্য। সকাল দুপুর, সন্ধ্যায় প্রত্যহ এরা এই তাঁবুর মধ্যে একত্রে উপাসনা করে। উপাসনার বিশেষ কোন মন্তব্য স্তোত্র নাই, শুধু—ঈশ্বর এক, দ্বিতীয় নাই এবং মোহাম্মদ তাঁর অবতার।"

এই আজগবী তথ্যটি ধর ম'শায় কোথা হ'তে যে যোগাড় করলেন তা' আমরা ভেবে পাচ্ছি না। পৃথিবীর কোন স্থানের মুসলমানেই কেবল সকাল, দুপর এবং সন্ধ্যায়

বা ধর মশায়ের মতে ত্রিসন্ধ্যা (বিচিত্রা ৬৭৯ পৃঃ) উপাসনা করে না, তারা রাত্র দিনে ৫বার অর্থাৎ ফজর (খুব ভোরে) জোহর (১২৷৷ টা হ'তে ২টার মধ্যে) আসর (চারিটায়) মগরেব সন্ধ্যায় ও এশা (রাত্রে ১২টার পূর্ব্বে) নামাজ পড়িয়া থাকে এবং বেদুঈনরাও ইহার ব্যতিক্রম করে না। বিশেষ বা অবিশেষ কোন মন্ত্র বা স্তোত্র কোন মুসলমানেই নামাজে পাঠ করে না সত্য তবে সব মুসলমানেই নামাজে (কোরানের অংশ বিশেষ) পড়ে থাকেন এবং বদ্দুরাও তা' অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। 'ঈশ্বর এক, দ্বিতীয় নাই' তা' দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের মুসলমানের ন্যায় বেদুঈনরাও বিশ্বাস করে কিন্তু 'মোহম্মদ তার অবতার' এরূপ বিশ্বাস পৃথিবীর কোন মুসলমানেই করে না এবং বদ্দুরাও না। আর মুসলমানের নামাজের ছুরার অর্থও ইহা নহে। সংসারের অন্যান্য স্থানের মুসলমানের মত বেদুঈনরাও বলে থাকে 'আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছু উপাস্য নহে এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত রসুল (সংবাদবাহক)।'

আমি সুদীর্ঘ তিন বৎসর মরুর বুকে কাটায়েছি এবং প্রত্যহ শত শত বেদুঈনদের সঙ্গে থাওয়া, বসা করেছি, তা'দের বিবাহ ও সামাজিক মজলিসে যোগ দিয়েছি এবং তা'দের ভাষায় অর্থাৎ আরবী ভাষায় তা'দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেছি, কাজেই আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছি ধর মশায় উপরি উক্ত প্রবন্ধে বেদুঈনদের ধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয়ে যা' লিখেছেন তা' সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

তারপর বেদুঈনরা মেয়েকে হত্যা করে ফেলে বলে ধর মশায় যা লিখেছেন তা'র মূলেও কোন ভিত্তি নাই। বেদুঈনরা মেয়েকে ছেলের চেয়ে বেশীই ভালবাসে এবং ইহা আমি নিজ চোখেই দেখেছি।

আর 'শালে-এদ্-দিন' (বিচিত্রা ৬৮১ পৃষ্ঠা) নামে কোন যোদ্ধার বিষয়ও আমরা জানি না, তবে য়ুরোপীয়দের ত্রাসোৎপাদক, 'প্যালেষ্টাইন' বিজয়ী বীরবর 'শালেহউদ্দীন'-এর নাম ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন।

৺কবিরাজ সত্যচরণ সেন

গত ৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার কলিকাতায় সুপরিচিত চিকিৎসক কবিরাজ সত্যচরণ সেন মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে এঁর বয়স ৫৭ বৎসর হয়েছিল। ইনি পূর্ব্বে স্বর্গীয় কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় প্রতিষ্ঠিত "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে"র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, পরে যামিনীভূষণের মৃত্যুর পর কবিরাজ-শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যশাস্ত্র পীঠের অধ্যাপক ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। সত্যচরণ বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ছিলেন এবং অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচিত করেন। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধেও তিনি কায় চিকিৎসা প্রভৃতি কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'মায়া' নামে একটি নাটক সম্প্রতি কলিকাতার ষ্টেজে অভিনীত হচ্চে। সত্যচরণ আয়ুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান এবং আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনী নামক তিনখানি মাসিকপত্রের পর-পর সম্পাদক ছিলেন। সত্যচরণের মৃত্যুতে কলিকাতায় বৈদ্যচিকিৎসক সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল সন্দেহ নেই।

৺ কবিরাজ সত্যচরণ সেন

কুমারী অমলা নন্দী

প্রায় দেড় বৎসর ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের পর কুমারী অমলা নন্দী সুবিখ্যাত প্রাচ্যনৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের

মাতার সহিত ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন। ইনি কলিকাতা ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দীর কন্যা।

গত ১৯৩১ সালের প্যারিস ইণ্টার ন্যাশনাল কলোনিয়াল এক্জিবিশনের উৎসব-রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন দেশের নৃত্যকলা প্রদর্শিত হয়েছিল। কুমারী অমলা সেই নৃত্যাভিনয়ে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা দেখিয়ে ইয়োরোপীয় দর্শকগণের নিকট হ'তে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ফলে তাঁকে বহুবার প্যারিসের প্রধান প্রধান উৎসব সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মুখে নৃত্য প্রদর্শন করতে হয়েছিল।

কুমারী অমলা নন্দী

উদয়শঙ্কর এবং তাঁর মাতা ভগিনী প্রভৃতির সহিত কুমারী অমলা ইয়োরোপের বহু বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি বেলজিয়ম, জার্মাণী, হল্যাণ্ড ডেনমার্ক, ... সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী, জেকোস্লোভাকিয়া, ...য়ানিয়া, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ সমূহে

ভারতীয় নৃত্যকলা প্রদর্শিত করেন এবং ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের নৃত্যকলার সহিত তাঁর পরিচয় ঘটে।

অমলার বয়স মাত্র চতুর্দ্দশ বর্ষ। এত অল্প বয়সে সুদূর ইয়োরোপের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এরকম খ্যাতি অর্জ্জন ক'রে আসা কৃতিত্বের কথা।

বেঙ্গল ষ্টোর্স

গত ১৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা ৮।এ চৌরঙ্গী প্লেসে বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেডের পরিচালনায় কেশোরাম কটন মিলস লিমিটেড স্বদেশ জাত দ্রব্য সমূহের একটি বৃহৎ দোকান খুলেছেন। উদ্বোধনের কার্য্য সম্পন্ন করেছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। দোকানটি বাস্তবিকই বৃহৎ এবং তার দ্রব্য সংগ্রহের পরিকল্পনা বিচিত্র এবং বিস্তীর্ণ। সমস্ত ভারতবর্ষের যেখানে যা নিত্য-ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় গৃহবস্তু প্রস্তুত হয় এই দোকানটিতে তা সংগ্রহ করবার সঙ্কল্প। ভাণ্ডার এখনো হয়ত সম্পূর্ণ হ'তে অনেক বাকি কিন্তু সুদক্ষ এবং সক্ষম বিড়লা ব্রাদার্সের পরিচালনায় অদূর ভবিষ্যতে তা হ'য়ে উঠবে এ ভরসা নিশ্চয়ই করা যায়। যে-দিন হয়ে উঠ্‌বে সেদিন এই দোকানটিতে উপস্থিত হয়ে শুধু আমাদের বৈভবেরই পরিচয় পাওয়া যাবে না, অভাবের দিকগুলোও নজরে পড়বে এবং তদ্দ্বারা দেশীয় শ্রমশিল্প (industry) নব-নব দিকে প্রণোদিত হ'তে পারবে। এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্বোধন সম্ভাষণে বলেছেন—"A representative stores like this, will make it evident to us in what direction enterprise is still lacking in our country, and be an incentive to industry almost every branch of which yet remains undeveloped."

কিন্তু সে ত' পরের কথা, দেশী শ্রমশিল্পজাত কত সুন্দর সুন্দর জিনিস এখনই কিন্‌তে পাওয়া যায় যার সন্ধান আমরা জানিনে—তা এই দোকানটিতে প্রবেশ করলে বোঝা যায়।

এখানে একটা কথা বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। সমগ্র ভারতবর্ষে যে-সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয় একটি-দোকানে তার সম্পূর্ণ সঞ্চয় সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই দোকানে এমন একটি তালিকা-পুস্তক রাখা যেতে পারে যাতে সেই সকল জিনিসের সন্ধান থাক্‌বে যা ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় কিন্তু এই দোকানে সঞ্চয় করা হয়ে ওঠে নি। কোনো একটি জিনিস ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় কি-না এই দোকানে এসে যদি নিঃসংশয়ে জানা যায়, তাহ'লে এ দোকানটি দেশের একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ করবে। দোকানের জিনিষ-পত্র সংগ্রহ করবার অবসরে এমন একটি তালিকা গ'ড়ে তোলা দোকানের পরিচালকগণের বিশেষ কঠিন হবে না।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই স্বদেশী ভাঁণ্ডারটির সাফল্য কামনা করি।

বিশ্বভারতী সংস্কার সমিতি

অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী থেকে একটি সংস্কার সমিতি সংগঠিত করে বীরভূম জেলায় কাজ আরম্ভ করেছেন। এই সংস্কার সমিতির নিবেদন পত্রটির বহুল প্রচার প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে এইখানে সেটা আদ্যোপান্ত মুদ্রিত করা গেল। কোনো আলোচনা নিষ্প্রয়োজন :—

সংস্কার সমিতি

সর্ব্বজনীন নিবেদন

মঙ্গলাচরণ

বেদমন্ত্র

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

—শ্বেতাশ্বতর, ৪, ১।

বঙ্গানুবাদ :—যিনি এক, যাঁর কোনো বর্ণ নেই, যিনি নানা শক্তিযোগে নানা বর্ণের মানুষের নিজ নিজ প্রয়োজন বিধান করেন, যিনি সমস্ত কিছুর আদিতেও আছেন অন্তেও আছেন, তিনি আমাদের দেবতা। তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন।

আমরা চাই

বহুকাল ধরিয়া আমাদের দেশ পরাভবের পথে চলিয়াছে। আমাদের সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে উপেক্ষা ও অসম্মান এই সাংঘাতিক দুর্গতির কারণ। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী মৃত্যু পণ করিয়া তপস্যায় বসিয়াছেন। সমস্ত দেশবাসীরও প্রাণপণ করিয়া এই অপরাধ দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।

এখন অবিলম্বে আমাদের এই কয়টি ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—

১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণের মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভাসমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবে না।

৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিতে দিব না।

আমাদের কাজ

হিন্দুসমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করা, দুর্গতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পরস্পর শ্রদ্ধা দ্বারা সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধকে সত্য করা, জনসাধারণের মধ্যে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মশক্তি উদ্বোধন করার উদ্দেশে বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন পল্লীসেবাবিভাগের ভিতর দিয়া বহুদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে। এখন হইতে ঐ কাজকে আরো ব্যাপক এবং শক্তিশালী করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত একটি **কেন্দ্রীয় সভার** পরিচালনায় বিশ্বভারতীতে সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইল।

কেন্দ্রীয় সভার সদস্য

বিশ্বভারতী কর্ম্মসচিব।
শ্রীনিকেতন সচিব।
শ্রীনেপালচন্দ্র রায়।
শ্রীজগদানন্দ রায়।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
শ্রীধীরানন্দ রায়।
শ্রীকালীমোহন ঘোষ—সম্পাদক।
শ্রীসুধীরচন্দ্র কর—সহঃ সম্পাদক।

এতদুদ্দেশ্যে অর্থ ইত্যাদি যাবতীয় সাহায্য **বিশ্বভারতী কর্ম্মসচিবের** নিকট সংগৃহীত থাকিবে। সংস্কার সমিতির কেন্দ্রীয় সভার ব্যবস্থা মতো তিনি তাহা ব্যবহার করিবেন।

সংস্কার সমিতির কার্য্যধারা মোটামুটি এইরূপ :—

১। পল্লীসেবা

(ক) কেন্দ্রীয় সভার অধীনে সুবিধামতো অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি শাখা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

(খ) ঐ শাখা-কেন্দ্র হইতে পারিপার্শ্বিক গ্রামসমূহে সংস্কার সমিতি গড়া এবং তাহার অধীন হরিসভা স্থাপন করিয়া তাহাতে সপ্তাহের নির্দ্ধারিত দিনে কীর্ত্তন, পাঠ, কথকতা এবং সংবাদপত্র হইতে দেশের ও তৎপ্রসঙ্গে নিজ গ্রামের অবস্থা পর্য্যালোচনা। মাঝে মাঝে উৎসব উপলক্ষ্যে সর্ব্বজনীন ভোজের আয়োজন। ঐ সঙ্গে দুর্গতদের ঘনিষ্ঠ সহযোগে, তাহাদেরই সেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, গ্রামে দিবা ও নৈশবিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, স্বাস্থ্য ও সেবা-সমিতি, ব্রতীদল, শান্তিশী-পঞ্চায়েৎ, সমবায়-সমিতি পরিচালনা, মুষ্টিভিক্ষাসংগ্রহ, আবাস পরিষ্করণ এবং রাস্তাঘাট সংস্কার।

২। আবাসিক শিক্ষা।

বিনা দক্ষিণায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে দুর্গতদের ছেলে রাখিয়া অন্যান্য ছাত্রদের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্য হইতেই সমিতির ভাবী কর্ম্মী ও কেন্দ্রপরিচালক তৈরী করা। এই আবাসিক শিক্ষাশ্রমের ছাত্রগণ প্রথম হইতেই যাহাতে আয়করী বৃত্তি শিখিয়া, কাজ করিয়া নিজেদের ব্যয় নিজেরা বহন করে এবং ভবিষ্যতেও উপার্জ্জনক্ষম হয়, সেই ব্যবস্থায় তাহাদিগকে আশ্রমে গ্রহণ করা হইবে।

৩। ব্যাপকভাবের প্রচার এবং সংঘ-সংগঠন।

হিন্দুসমাজের বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সভা সম্মেলনের অনুষ্ঠান। ম্যাজিক ল্যান্টর্ণ সাহায্যে জনসভায় বক্তৃতা। গীতি, বিজ্ঞাপন, পুস্তকপুস্তিকা এবং সম্ভবমতো পত্রিকাদি প্রকাশ ও প্রচার। প্রচার কার্য্যে পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে সংস্কার সমিতির শাখা স্থাপন। তদ্দ্বারা স্থায়ীভাবে অস্পৃশ্যতা-পরিহার ও শিক্ষার প্রসারে দুর্গতদের সামাজিক অধিকার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। দুর্গতদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় উন্নতির পথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহার প্রতিকার।

আমরা দেশবাসীদিগকে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য দেশের সর্ব্বত্র এইরূপ স্থায়ীকাজের অনুষ্ঠান গড়িতে আহ্বান করিতেছি। দেশহিতৈষী কর্ম্মীমাত্রেই এই উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইয়া অবিলম্বে কাজে অগ্রসর হইবেন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। কে কী ভাবে কোথায় কাজ করিতেছেন, ইহা জানিতে পারিলে আমরা উপকৃত ও আনন্দিত হইব। আবশ্যকমত প্রয়োজনমতো, সম্পাদক, সংস্কার সমিতি, শ্রীনিকেতন, পোঃ সুরুল, জিঃ বীরভূম—এই ঠিকানায় সকলে পত্রাদি ব্যবহার করিবেন এবং এই কাজে কেহ কিছু অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলে, কর্ম্মসচিব বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন, জিঃ বীরভূম—এই ঠিকানায় তাহা পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। ইতি ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ সাল।

নিবেদক
আচার্য্য, বিশ্বভারতী।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কটন্ মিল্‌স্ লিঃ

আমরা এই নবগঠিত যৌথ কারবারের একটা প্রস্পেক্টস পেয়েছি। এক বাংলা দেশেই প্রায় ১৬ কোটি টাকার কাপড়ের প্রয়োজন, অথচ এখনো ৫০ লক্ষ টাকার বেশি কাপড় এদেশে উৎপন্ন হয় না। অতএব দেখা যাচ্ছে এই ব্যবসায় এখনো অনেক উন্নতির পথ খোলা রয়েছে,—এবং এই ব্যবসার উন্নতিতে দেশেরও প্রভূত মঙ্গল। আমরা এই নবগঠিত কারবারের প্রভূত উন্নতি কামনা করি।

Edited by Upendranath Ganguli. Printed by Sarat chandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

পল্লীলক্ষ্মী

শিল্পী—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

বিচিত্রা
ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিদিকে ছেড়ে ঊর্ম্মি এক মুহূর্ত্ত নড়তে চায় না। ওষুধপত্র দেওয়া, নাওয়ানো, খাওয়ানো শোওয়ানো সমস্ত খুঁটিনাটি নিজের হাতে। আবার বই পড়তে আরম্ভ করেচে, সেও দিদির বিছানার পাশে বসে। নিজেকেও আর বিশ্বাস করে না, শশাঙ্ককেও না।

ফল হোলো এই যে, শশাঙ্ক বারবার আসে রোগীর ঘরে। পুরুষমানুষের অন্ধতাবশতই বুঝতে পারে না ছটফটানির তাৎপর্য্য স্ত্রীর কাছে পড়চে ধরা, লজ্জায় মরচে ঊর্ম্মি। শশাঙ্ক আসে মোহনবাগান ফুট্‌বল্ ম্যাচের প্রলোভন নিয়ে, ব্যর্থ হয়। পেন্সিলের দাগ দেওয়া খবরের কাগজ মেলে দেখায় বিজ্ঞাপনে চার্লি চ্যাপলিনের নাম। ফল হয়না কিছুই। ঊর্ম্মি যখন দুর্লভ ছিল না তখনও বাধার ভিতর দিয়ে শশাঙ্ক কাজকর্ম্ম চালাতে চেষ্টা করত। এখন অসম্ভব হয়ে এল।

হতভাগার এই নিরর্থক নিপীড়নে প্রথম প্রথম শর্ম্মিলা বড়ো দুঃখেও সুখ পেত। কিন্তু ক্রমে দেখলে ওর যন্ত্রণা উঠ্‌চে প্রবল হয়ে, মুখ গেছে শুকিয়ে, চোখের নীচে পড়্‌চে কালী। ঊর্ম্মি খাওয়ার সময় কাছে বসেনা, সেজন্য শশাঙ্কর খাওয়ার উৎসাহ এবং পরিমাণ কমে যাচ্চে তা ওকে দেখ্‌লেই বোঝা যায়। সম্প্রতি হঠাৎ এ বাড়িতে আনন্দের যে বান ডেকে এসেছিল সেটা গেছে সম্পূর্ণ ভাঁটিয়ে, অথচ পূর্ব্বে ওদের যে-একটা সহজ দিনযাত্রা ছিল সেও রইল না।

একদা শশাঙ্ক নিজের চেহারার চর্চ্চায় উদাসীন ছিল। নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটতো প্রায় ন্যাড়া করে। আঁচড়াবার প্রয়োজন ঠেকেছিল শিকির শিকিতে। শর্ম্মিলা তাই নিয়ে অনেকবার প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা করে হাল ছেড়ে দিয়েচে। কিন্তু ইদানীং ঊর্ম্মির উচ্চহাস্যসংযুক্ত সংক্ষিপ্ত আপত্তি নিষ্ফল হয় নি। নূতন সংস্করণের কেশোদ্গমের সঙ্গে সুগন্ধি তৈলের সংযোগ-সাধন শশাঙ্কর মাথায় এই প্রথম ঘট্‌ল। কিন্তু তারপর আজকাল কেশোন্নতিবিধানের অনাদরেই ধরা পড়চে অন্তর্বেদনা। এতটা বেশি যে, এ নিয়ে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য তীব্র হাসি আর চলে না। শর্ম্মিলার উৎকণ্ঠা তার ক্ষোভকে ছাড়িয়ে গেল। স্বামীর প্রতি করুণায় ও নিজের প্রতি ধিক্কারে তার বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করে উঠ্‌চে, রোগের ব্যথাকে দিচ্চে এগিয়ে।

ময়দানে হবে কেল্লার ফৌজদের যুদ্ধের খেলা। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে এলো, "যাবে উর্ম্মি, দেখতে। ভালো জায়গা ঠিক করে রেখেচি।"

উর্ম্মি কোনো উত্তর দেবার পূর্ব্বেই শর্ম্মিলা বলে উঠ্‌ল, "যাবে বই কি। নিশ্চয় যাবে। একটু বাইরে ঘুরে আসবার জন্যে ও যে ছট্‌ফট্‌ করচে।"

প্রশ্রয় পেয়ে দুদিন না যেতেই জিজ্ঞাসা করলে, "সার্কাস্‌?"

এ প্রস্তাবে উর্ম্মিলার উৎসাহই দেখা গেল।

তারপরে, "বোটানিকাল গার্ডেন?"

এইটেতে একটু বাধল। দিদিকে ফেলে বেশিক্ষণ দূরে থাকতে উর্ম্মির মন সায় দিচ্চে না।

দিদি স্বয়ং পক্ষ নিল শশাঙ্কর। রাজ্যের রাজমজুরদের সঙ্গে দিনে দুপুরে ঘুরে ঘুরে খেটে খেটে মানুষটা যে হয়রান হোলো,—সারাদিন কেবল কাটচে ধূলোবালির মধ্যে। হাওয়া না খেয়ে এলে শরীর যে পড়বে ভেঙে।

এই একই যুক্তি অনুসারে ষ্টীমারে করে রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত ঘুরে আসা অসঙ্গত হোলো না।

শর্ম্মিলা মনে মনে বলে, যার জন্যে কাজ খোয়াতে ওর ভাবনা নেই তাকে সুদ্ধ খোয়ানো ওর সইবে না।

শশাঙ্ককে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলে নি বটে কিন্তু চারিদিক থেকেই সে একটা অব্যক্ত সমর্থন পাচ্চে। শশাঙ্ক এক রকম ঠিক করে নিয়েচে, শর্ম্মিলার মনে বিশেষ কোনো ব্যথা নেই, ওদের দু-জনকে একত্র মিলিয়ে খুসি দেখেই সে খুসি। সাধারণ মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারত না কিন্তু শর্ম্মিলা যে অসাধারণ। শশাঙ্কর চাকরির আমলে একজন আর্টিষ্ট রঙীন পেন্সিল দিয়ে শর্ম্মিলার একটা ছবি এঁকেছিল। এতদিন সেটা ছিল পোর্টফোলিয়োর মধ্যে। সেইটেকে বের করে বিলিতী দোকানে খুব দামী ফ্যাসানে বাঁধিয়ে নিয়ে আপিস ঘরে যেখানে বসে ঠিক তার সমুখে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে। সামনের ফুলদানীতে রোজ মালী ফুল দিয়ে যায়।

অবশেষে একদিন শশাঙ্ক বাগানে সূর্য্যমুখী কী রকম ফুটেচে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ উর্ম্মির হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "তুমি নিশ্চয় জানো, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আর তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করি নে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।"

এ কথা দিদি বারবার করে উর্ম্মিকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েচে, যে, তার অবর্ত্তমানে সব চেয়ে যেটা সান্ত্বনার বিষয় সে উর্ম্মিকে নিয়েই। এ সংসারে অন্য কোনো মেয়ের আবির্ভাব কল্পনা করতেও দিদিকে বাজত, অথচ শশাঙ্ককে যত্ন করবার জন্যে কোনো মেয়েই থাকবে না এমন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থাও দিদি মনে মনে

সইতে পারত না। ব্যবসার কথাও দিদি ওকে বুঝিয়েচে, বলেচে, যদি ভালোবাসায় বাধা পায় তাহলে সেই ধাক্কায় ওর কাজকর্ম্ম সব যাবে নষ্ট হয়ে। ওর মন যখন তৃপ্ত হবে তখনি আবার কাজকর্ম্মে আপনি আসবে শৃঙ্খলা।

শশাঙ্কের মন উঠেচে মেতে। ও এমন একটা চন্দ্রলোকে আছে যেখানে সংসারের সব দায়িত্ব সুখতন্দ্রায় লীন। আজকাল রবিবার-পালনে বিশুদ্ধ খৃষ্টানের মতোই ওর অস্খলিত নিষ্ঠা। একদিন শর্ম্মিলাকে গিয়ে বল্‌লে, "দেখ, পাটের সাহেবদের কাছে তাদের ষ্টীম্‌লঞ্চ্‌ পাওয়া গেচে,—আজ রবিবার, মনে করচি ভোরে উর্ম্মিকে নিয়ে ডায়মণ্ড্‌হার্ব্বারের কাছে যাব, সন্ধ্যার আগেই আসব ফিরে।"

শর্ম্মিলার বুকের শিরাগুলো কে যেন দিলে মুচড়ে, বেদনায় কপালের চামড়া উঠ্‌ল কুঞ্চিত হয়ে। শশাঙ্কের চোখেই পড়ল না। শর্ম্মিলা কেবল একবার জিজ্ঞাসা করলে, "খাওয়াদাওয়ার কী হবে?" শশাঙ্ক বল্‌লে, "হোটেলের সঙ্গে ঠিক করে রেখেচি।"

একদিন এই সমস্ত ঠিক করবার ভার যখন ছিল শর্ম্মিলার উপর, তখন শশাঙ্ক ছিল উদাসীন। আজ সমস্ত উলটপালট হয়ে গেল।

যেমনি শর্ম্মিলা বল্‌লে, "আচ্ছা, তা যেয়ো" অম্‌নি মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে শশাঙ্ক বেরিয়ে গেল ছুটে। শর্ম্মিলার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বারবার করে বলতে লাগল, "আর কেন আছি বেঁচে।"

কাল রবিবারে ছিল ওদের বিবাহের সাম্বৎসরিক। আজ পর্য্যন্ত এ অনুষ্ঠানে কোনোদিন ছেদ পড়েনি। এবারেও স্বামীকে না বলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত আয়োজন করছিল। আর কিছুই নয়, বিয়ের দিন শশাঙ্ক যে লাল বেনারসির জোড় পরেছিল সেইটে ওকে পরাবে, নিজে পরবে বিয়ের চেলি, স্বামীর গলায় মালা পরিয়ে ওকে খাওয়াবে সামনে বসিয়ে, জ্বালাবে ধূপবাতি, পাশের ঘরে গ্রামোফোনে বাজবে সানাই। অন্যান্য বছর শশাঙ্ক ওকে আগে থাকতে না জানিয়ে একটা কিছু সখের জিনিষ কিনে দিত। শর্ম্মিলা ভেবেছিল এবারেও নিশ্চয় দেবে, কাল পাব জানতে।

আজ ও আর কিছুই সহ্য করতে পারচে না। ঘরে যখন কেউ নেই তখন কেবলি বলে বলে উঠ্‌চে, "মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে, কী হবে এই খেলায়।"

রাত্রে ঘুম হোলো না। ভোরবেলা শুন্‌তে পেলে মোটরগাড়ি দরজার কাছ থেকে চলে গেল। শর্ম্মিলা ফুঁপিয়ে উঠে কেঁদে বল্‌লে, "ঠাকুর, তুমি মিথ্যে।"

এখন থেকে রোগ দ্রুত বেড়ে চল্‌ল। দুর্লক্ষণ যেদিন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেচে সেদিন শর্ম্মিলা ডেকে পাঠালে স্বামীকে। সন্ধ্যেবেলা, ক্ষীণ আলো ঘরে, নার্সকে সঙ্কেত করলে, চলে যেতে। স্বামীকে পাশে বসিয়ে হাতে ধরে বল্‌লে, "জীবনে আমি যে-বর পেয়েছিলুম ভগবানের কাছে, সে তুমি। তার যোগ্য শক্তি আমাকে দেন নি। সাধ্যে যা ছিল করেচি। ত্রুটি অনেক হয়েচে, মাপ কোরো আমাকে।"

শশাঙ্ক কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বল্‌লে,—"না, কিছু বোলো না। উর্ম্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। সে আমার আপন বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরো অনেক বেশি পাবে যা আমার মধ্যে পাও নি। না, চুপ করো, কিছু বোলো না। মরবার কালেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হোলো, তোমাকে সুখী করতে পারলুম।"

নার্স বাইরে থেকে বল্‌লে, "ডাক্তারবাবু এসেচেন।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে "ডেকে দাও।"

কথাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শর্ম্মিলার মামা যত রকম অশাস্ত্রীয় চিকিৎসার সন্ধানে উৎসাহী। সম্প্রতি এক সন্ন্যাসীর সেবায় তিনি নিযুক্ত। যখন ডাক্তাররা বল্‌লে আর কিছু করবার নেই তখন তিনি ধরে পড়লেন, হিমালয়ের ফেরৎ বাবাজির ওষুধ পরীক্ষা করতে হবে। কোন্ তিব্বতী শিকড়ের গুঁড়ো, আর প্রচুর পরিমাণে দুধ এই হচ্চে উপকরণ।

শশাঙ্ক কোনোরকম হাতুড়েদের সহ্য করতে পারত না। সে আপত্তি করলে। শর্ম্মিলা বল্‌লে, "আর কোনো ফল হবে না, অন্তত মামা সান্ত্বনা পাবেন।"

দেখতে দেখতে ফল হোলো। নিঃশ্বাসের কষ্ট কমেচে, রক্ত ওঠা গেল বন্ধ হয়ে।

সাত দিন যায়, পনেরো দিন যায়, শর্ম্মিলা উঠে বসল। ডাক্তার বল্‌লে, মৃত্যুর ধাক্কাতেই অনেক সময় শরীর মরীয়া হয়ে উঠে শেষ-ঠেলায় আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে তোলে।

শর্ম্মিলা বেঁচে উঠল।

তখন সে ভাবতে লাগল, "এ কী আপদ, কী করি। শেষকালে বেঁচে ওঠাই কি মরার বাড়া হয়ে দাঁড়াবে।" ওদিকে উর্ম্মি জিনিষপত্র গোছাচ্চে। এখানে তার পালা শেষ হোলো।

দিদি এসে বল্‌লে, "তুই যেতে পারবি নে।"

"সে কী কথা?"

"হিন্দুসমাজে বোন সতীনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনোদিন করে নি?"

"ছিঃ!"

"লোকনিন্দা! বিধির বিধানের চেয়ে বড়ো হবে লোকের মুখের কথা!"

শশাঙ্ককে ডাকিয়ে বল্‌লে, "চলো আমরা যাই নেপালে। সেখানে রাজ-দরবারে তোমার কাজ পাবার কথা হয়েছিল—চেষ্টা করলেই পাবে। সে দেশে কোনো কথা উঠবে না।"

শর্ম্মিলা কাউকে দ্বিধা করবার অবকাশ দিল না। যাবার আয়োজন চলচে। উর্ম্মি তবু বিমর্ষ হয়ে কোণে কোণে লুকিয়ে বেড়ায়।

শশাঙ্ক তাকে বল্‌লে, "আজ যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও তা হলে কী দশা হবে ভেবে দেখো
ঊর্ম্মি বল্‌লে, "আমি কিছু ভাবতে পারি নে। তোমরা দু-জনে যা ঠিক করবে তাই হবে।"

গুছিয়ে নিতে কিছুদিন লাগল। তারপরে সময় যখন কাছে এসেচে, ঊর্ম্মি বল্‌লে, "আর দিন সাতেক অপেক্ষা করো, কাকাবাবুর সঙ্গে কাজের কথা শেষ করে আসি গে।"

চলে গেল ঊর্ম্মি।

এই সময়ে মথুর এলো শর্ম্মিলার কাছে মুখ ভার করে। বল্‌লে, "তোমরা চলে যাচ্চ ঠিক সময়েই। তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে যাবার পরেই আমি আপোষে শশাঙ্কের জন্যে কাজ বিভাগ করে দিয়েছিলেম। আমার সঙ্গে ওর লাভ-লোকসানের দায় জড়িয়ে রাখিনি। সম্প্রতি কাজ গুটিয়ে নেবার উপলক্ষ্যে শশাঙ্ক ক-দিন ধরে হিসাব বুঝে নিচ্ছিল। দেখা গেল তোমার টাকা সম্পূর্ণ ডুবেচে। তা ছাপিয়েও যা দেনা জমেচে তাতে বোধ হয় বাড়ি বিক্রি করতে হবে।"

শর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, "সর্ব্বনাশ এতদূর এগিয়ে চলেছিল। উনি জানতে পারেন নি!"

মথুর বললে, "সর্ব্বনাশ জিনিষটা অনেক সময় বাজ-পড়ার মতো, যে মুহূর্ত্তে মারে তার আগে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জানান্ দেয় না। ও বুঝেছিল ওর লোকসান হয়েচে। তখনো অল্পেই সামলে নেওয়া যেত। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি ঘট্‌ল; ব্যবসার গলদ তাড়াতাড়ি শুধরে নেবে মনে করে আমাকে লুকিয়ে পাথুরে কয়লার হাটে তেজিমন্দী খেলা সুরু করলে। চড়ার বাজারে যা কিনেচে সস্তার বাজারে তাই বেচে দিতে হোলো। হঠাৎ আজ দেখলে হাউয়ের মতো ওর সব গেছে উড়ে পুড়ে, বাকি রইল ছাই। এখন ভগবানের কৃপায় নেপালে কাজ পেলে তোমাদের ভাবতে হবে না।"

শর্ম্মিলা দৈন্যকে ভয় করে না। বরঞ্চ ও জানে অভাবের দিনে স্বামীর সংসারে ওর স্থান আরো বেড়ে যাবে। দারিদ্র্যের কঠোরতাকে যথাসম্ভব মৃদু করে এনে দিন চালাতে পারবে এ বিশ্বাস ওর আছে। বিশেষত গয়না যা হাতে রইল তা নিয়ে এখনো কিছুকাল বিশেষ দুঃখ পেতে হবে না। এ কথাটাও সসঙ্কোচে মনে উঁকি মেরেচে যে, ঊর্ম্মির সঙ্গে বিয়ে হলে তার সম্পত্তিও তো স্বামীরই হবে। কিন্তু শুধু জীবনযাত্রাই তো যথেষ্ট নয়। এতদিন ধরে নিজের শক্তিতে নিজের হাতে স্বামী যে-সম্পদ সৃষ্টি করে তুলেছিল, যার খাতিরে আপন হৃদয়ের অনেক প্রবল দাবীকেও শর্ম্মিলা ইচ্ছে করে দিনে দিনে ঠেকিয়ে রেখেচে, সেই ওদের উভয়ের সম্মিলিত জীবনের মূর্ত্তিমান আশা আজ মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল এরই অগৌরব ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। মনে মনে বলতে লাগ্‌ল তখনি যদি মরতুম তাহলে তো এই ধিক্কারটা বাঁচত আমার। আমার ভাগ্যে যা ছিল, তা তো হোলো, কিন্তু দৈন্য অপমানের এই নিদারুণ শূন্যতা একদিন কি পরিতাপ আনবে না ওঁর মনে? যার মোহে অভিভূত হয়ে এটা ঘটতে পারল একদিন হয়তো তাকে মাপ করতে পারবেন না, তার দেওয়া অন্ন ওঁর মুখে বিষ ঠেকবে। নিজের

মাৎলামির ফল দেখে লজ্জা পাবেন কিন্তু দোষ দেবেন মদিরাকে। যদি অবশেষে উর্ম্মির সম্পত্তির উপর নির্ভর করা অবশ্য হয়ে ওঠে তাহলে সেই আত্মাবমাননার ক্ষোভে উর্ম্মিকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জ্বালিয়ে মারবেন।

এদিকে মথুরের সঙ্গে সমস্ত হিসেবপত্র শোধ করতে গিয়ে শশাঙ্ক হঠাৎ জানতে পেরেচে যে শর্ম্মিলার সমস্ত টাকা ডুবেচে তার ব্যবসায়ে। এ কথা শর্ম্মিলা এতদিন তাকে জানায়নি, মিটমাট করে নিয়েছিল মথুরের সঙ্গে।

শশাঙ্কের মনে পড়ল, চাকরির অন্তে সে একদিন শর্ম্মিলার টাকা ধার নিয়েই গড়ে তুলেছিল তার ব্যবসা। আজ নষ্ট ব্যবসার অন্তে সেই শর্ম্মিলারই ঋণ মাথায় করে চলেচে সে চাকরিতে। এ ঋণ তো আর নামাতে পারবে না। চাকরির মাইনে দিয়ে কোনোকালে শোধ হবার রাস্তা কই?

আর দিন দশেক বাকি আছে নেপাল যাত্রার। সমস্ত রাত ঘুমতে পারে নি। ভোর বেলায় শশাঙ্ক ধড়্‌ফড়্‌ করে বিছানা থেকে উঠেই আয়নার টেবিলের উপর হঠাৎ সবলে মুষ্টিঘাত করে বলে উঠ্‌ল,—"যাব না নেপালে।" দৃঢ় পণ করলে, "আমরা দু-জনে উর্ম্মিকে নিয়ে কলকাতাতেই থাকব—ভ্রুকুটিকুটিল সমাজের ক্রূর দৃষ্টির সামনেই। আর এইখানেই ভাঙা ব্যবসাকে আর একবার গড়ে তুলব এই কলকাতাতেই বসে।"

যে-যে জিনিষ সঙ্গে যাবে, যা রেখে যেতে হবে, শর্ম্মিলা বসে বসে তারি ফর্দ্দ করছিল একটা খাতায়। ডাক শুনতে পেলে "শর্ম্মিলা, শর্ম্মিলা।" তাড়াতাড়ি খাতা ফেলে ছুটে গেল স্বামীর ঘরে। অকস্মাৎ অনিষ্টের আশঙ্কা করে কম্পিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েচে?"

বল্‌লে, "যাব না নেপালে। গ্রাহ্য করব না সমাজকে। থাকব এইখানেই।"

শর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, কী হয়েচে?"

শশাঙ্ক বল্‌লে, "কাজ আছে।"

সেই পুরাতন কথা। কাজ আছে। শর্ম্মিলার বুক দুরু দুরু করে উঠল। "শর্ম্মি, ভেবো না আমি কাপুরুষ। দায়িত্ব ফেলে পালাব আমি, এত অধঃপতন কল্পনা করতেও পারো?"

শর্ম্মিলা কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে বল্‌লে, "কী হয়েচে আমাকে বুঝিয়ে বলো।" শশাঙ্ক বল্‌লে, "আবার ঋণ করেচি তোমার কাছে, সে কথা ঢাকা দিয়ো না।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "আচ্ছা বেশ।"

শশাঙ্ক বল্‌লে, "সেইদিনকারি মতোই আজ থেকে আবার ঋণ শোধ করতে বসলুম। যা ডুবিয়েচি আবার তাকে টেনে তুলবই এই রইল কথা, শুনে রাখো। একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে তেমনি আবার আমাকে বিশ্বাস করো।"

শর্ম্মিলা স্বামীর বুকের উপর মাথা রেখে বল্‌লে, "তুমিও আমাকে বিশ্বাস কোরো। কাজ বুঝিয়ে দিয়ো আমাকে, তৈরি করে নিয়ো আমাকে, তোমার কাজের যোগ্য যাতে হতে পারি সেই শিক্ষা আজ থেকে আমাকে দাও।"

বাইরে থেকে আওয়াজ এল "চিঠি"।

উর্ম্মির হাতের অক্ষরে দু-খানা চিঠি। একখানি শশাঙ্কের নামে :—

"আমি এখন বোম্বাইয়ের রাস্তায়। চলেচি বিলেতে। বাবার আদেশমতো ডাক্তারি শিখে আসব। ছয় সাত বছর লাগবার কথা। তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করে গেলুম ইতিমধ্যে কালের হাতে আপনিই তা জোড়া লাগবে। আমার জন্যে ভেবো না, তোমার জন্যই ভাবনা রইল মনে।"

শর্ম্মিলার চিঠি—

"দিদি, শত সহস্র প্রণাম তোমার পায়ে। অজ্ঞানে অপরাধ করেচি, মাপ কোরো। যদি সেটা অপরাধ না হয়, তবে তাই জেনেই সুখী হব। তার চেয়ে সুখী হবার আশা রাখব না মনে। কিসে সুখ তাই বা নিশ্চিত কী জানি। আর সুখ যদি না হয় তো নাই হোলো। ভুল করতে ভয় করি।"

শেষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারস্য-ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেলা আড়াইটার সময় যাত্রা করলুম। তেহেরান থেকে বেরিয়ে প্রথমটা পারস্যের নীরস নির্জ্জন চেহারা আবার দেখা দিল, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। দৃশ্য পরিবর্ত্তন হোলো। ফসলে সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে তরু-সংহতি, যেখানে সেখানে জলের চঞ্চল ধারা, মেটে ঘরের গ্রাম তেমন বিরল নয়। দিগন্তে বরফের আঙুল-বুলানো গিরিশিখর।

সূর্য্যাস্তের সময় কাজবিন সহরে পৌঁছলুম। এখানে একটি হো—টে—লে আমাদের জায়গা হয়েচে। বাংলাদেশে রেলপথের প্রধান জংশন যেমন আসান্‌সোল, এখানে নানা পথের মোটরের সঙ্গমতীর্থ তেমনি কাজবিন।

পারস্যের নৃপতি শাহ্‌ রেজা পহ্লবী

কাজবিন সাসানীয় কালের সহর, দ্বিতীয় শাপুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় সাফাবি রাজা তামাস্প এই সহরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। দিল্লির পলাতক মোগল বাদশা হুমায়ুন দশ বৎসর কাল এখানে তাঁরই আশ্রয়ে ছিলেন। সাফাবি বংশের বিখ্যাত শা আব্বাসের সঙ্গে এণ্টনি ও রবার্ট শার্লি নামক দুই ইংরেজ ভ্রাতার এইখানে দেখা হয়। জনশ্রুতি এই যে এঁরাই কামান প্রভৃতি অস্ত্র সহযোগে আধুনিককালীন যুদ্ধবিদ্যায় বাদশাহের সৈন্যদের শিক্ষিত করেন। যাই হোক বর্ত্তমানে এই ছোট সহরটিতে সাবেক কালের রাজধানী মর্য্যাদা কিছুই চোখে পড়ে না।
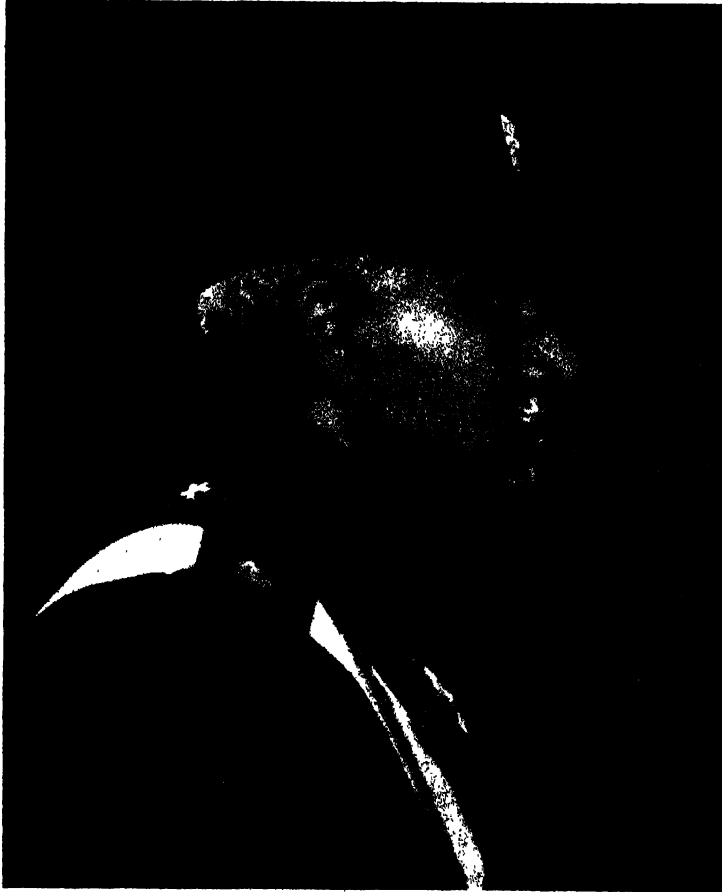
ভোর বেলা ছাড়লুম হামাদানের অভিমুখে। চড়াইপথে চল্‌ল আমাদের গাড়ি। দুইধারে ভূমি সুজলা সুফলা, মাঝে মাঝে বড়ো

বড়ো গ্রাম, আঁকাবাঁকা নদী, আঙুরের ক্ষেত, আফিমের পুষ্পোচ্ছ্বাস। বেলা দুপুরের সময় হামাদানে পৌঁছিয়ে একটি মনোহর বাগানবাড়ির মধ্যে আশ্রয় পাওয়া গেল,—পপ্‌লার তরুসজ্জের ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বরফের আঁচড়কাটা পাহাড়।

তেহেরানে গরম পড়তে আরম্ভ করেছিল, এখানে ঠাণ্ডা। সমুদ্রের উপরিতল থেকে এ সহর ছ হাজার ফুট উঁচু। এল্‌ভেন্দ পাহাড়ের পাদদেশে এর স্থান। একদা একেমেনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এইখানে। সেই রাজধানীর প্রাচীন নাম ইতিহাসবিখ্যাত একবাতানা। আজ তার ধ্বংশাবশেষ প্রায় কিছু বাকি নেই।

আহার ও বিশ্রামের পর বিকেল বেলা সহর দেখতে বেরলুম। প্রথমে আমাদের নিয়ে গেল, ঘন বনের মধ্য দিয়ে গলিপথ বেয়ে একটি পুরোনো বড়ো ইমারতের সামনে। বললে, এর উপরের তলা থেকে চারদিকের দৃশ্য অবারিত দেখতে পাওয়া যায়। আমার সঙ্গীরা দেখতে গেলেন কিন্তু আমার সাহস হোলো না। গাড়িতে বসে দেখতে লাগলুম, একদল লোক এসেচে বনের ধারে চড়িভাতি করতে। মেয়েরাও তার মধ্যে আছে,—তারা কালো চাদরে মোড়া, কিন্তু দেখচি বাইরে বেরোতে রাস্তায় ঘাটে বেড়াতে এদের সঙ্কোচ নেই।

আজ মহরমের ছুটি, সবাই ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়েচে। অল্প কয়েক বছর আগে মহরমের ছুটি রক্তাক্ত হয়ে উঠত, আত্মপীড়নের তীব্রতায় মারা যেত কত লোক। বর্ত্তমান রাজার আমলে ধীরে ধীরে তার তীব্রতা কমে আসচে।

কাজবিনের একটি স্বর্ণ মস্‌জিদের অভ্যন্তর

বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে সহরে গেলেম। আজ দোকান বাজার বন্ধ কিন্তু ছুটির দলের খুব ভিড়। পারস্যে এসে অবধি মানুষ কম দেখা আমাদের অভ্যাস, তাই রাস্তায় এত লোক আমাদের চোখে নতুন লাগল। আরো নতুন লাগ্‌ল এই সহরটি। সহরের এমন চেহারা অন্য কোথাও দেখিনি। মাঝখান দিয়ে একটি অপ্রশস্ত খামখেয়ালি ঝর্না নানা ভঙ্গীতে কলশব্দে বহমান,—কোথাও বা উপর থেকে নীচে পড়চে ঝরে, কোথাও বা তার সমতলীন স্রোত রৌদ্রে

ঝলমল করচে, ধারে ধারে পাথরের স্তূপ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট সাঁকো এপার থেকে ওপারে; ঝর্নার সঙ্গে পথের আঁকাবাঁকা মিল; মানুষের কাজের সঙ্গে প্রকৃতির গলাগলি; বাড়ির সামিল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণগুলি উপরের থাকে, নীচের থাকে, এ-কোণে ও-কোণে। তারি নানা জায়গায় নানা দল বসে গেছে। বাঁকাচোরা রাস্তায় মোটরগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, এমন কি, মোটরবাস্ ভর্তি করে চলেচে সব ছুটি-সম্ভোগীর দল। গাড়ির ঘোড়াগুলি সুশ্রী সুপুষ্ট। এই ছুটির পরবে মত্ততা কিছুই দেখলুম না. চারিদিকে শান্ত আরামের ছবি এখানকার অরণ্য পর্ব্বত ঝর্নার সঙ্গে মিশে গেছে।

গবর্ণর কাল সহরের বাইরে বনের মধ্যে বিকেলে আমাদের চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাঁ-ধারে পাহাড়, ডাইনে ঘন অরণ্যের অন্ধকার ছায়ায় ঝর্না ঝরে পড়চে। পাহাড়ী পথ বেয়ে বহু চেষ্টায় মোটর গেল। সেই বহুযুগের মেষ-পালকদের ভেড়া-চরা বনের মধ্যে চা খেয়ে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এলুম। হামাদানের যে মূর্ত্তি চিরসজীব, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেখানে বুলবুল গান করে আসচে, আলেকজাণ্ডারের লুঠের বোঝার সঙ্গে সে অন্তর্ধান করে নি কিন্তু পথের ধারে প্রান্তরের মধ্যে অনাদরে পড়ে আছে একটা পাথরের পিণ্ড, সম্রাটের সিংহদ্বারের সিংহের এই অপভ্রংশ।

স্নানাহার সেরে দুপুরের পর হামাদান থেকে রওনা হলুম। যেতে হবে কির্ম্মানশা। তখন ঝোড়ো হাওয়ায় ধুলো উড়িয়েচে, আকাশে মেঘ ঘন হয়ে এলো। চলেচি আসাদাবাদ গিরিপথ দিয়ে। দুই ধারে সবুজ ক্ষেত ফসলে ভরা, মাঝে মাঝে বনভূমি জলস্রোতে লালিত মাঠে ভেড়া চরচে। পাহাড়গুলো কাছে এগিয়ে এসে তাদের শিলাবক্ষপট প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে। থেকে-থেকে এক-এক পসলা বৃষ্টি নেমে ধুলোকে দেয় পরাভূত করে। আমার কেবল মনে পড়েছিল "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্বনভুবঃশ্যামাঃ— তমালদ্রুমে নয়, কী গাছ ঠিক জানিনে, কিন্তু এই মেঘলা দিনে উপস্থিতমতো ওকে তমালগাছ বলতে দোষ নেই।

আমরা যে-পথ দিয়ে চলেচি এরি কাছাকাছি কোনো-

সপ্তদশ শতাব্দীর পারসিক শিল্পের নমুনা—একখানি পুস্তকের মলাট
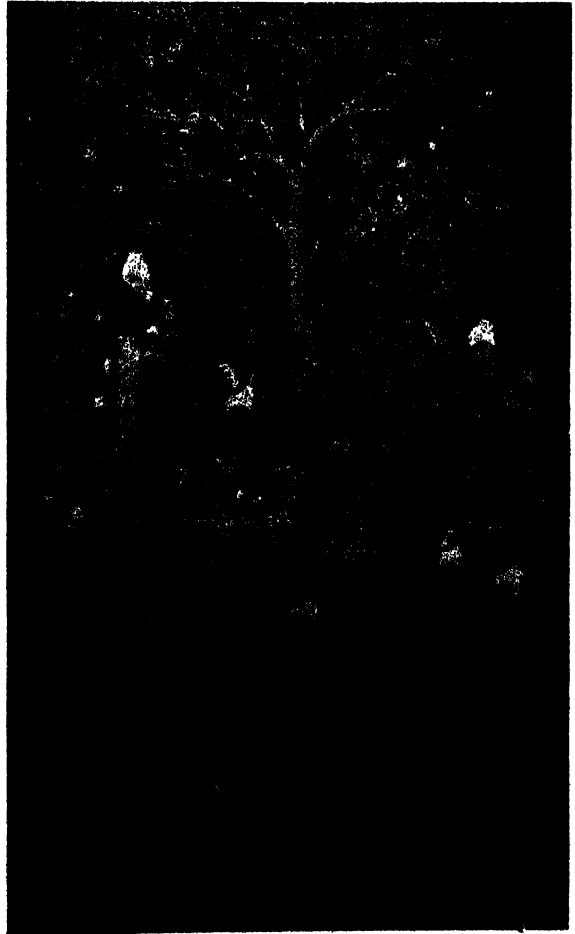
এক জায়গায় বিখ্যাত নিহাবন্দের রণক্ষেত্রে সাসানীয় সাম্রাজ্য আরবদের হাতে লীলা সমাপন করে। সেইদিন বহুকালীন প্রাচীন পারস্যের ইতিহাসে হঠাৎ সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় সুরু হোলো।

অবশেষে আমাদের রাস্তা এসে পড়ল বেহিস্তুনে। এখানে শৈলগাত্রে দরিয়ুসের কীর্ত্তিলিপি পারসিক সুসীয় ও ব্যাবিলোনীয় ভাষায় খোদিত। এই খোদিত ভাষার ঊর্দ্ধে দরিয়ুসের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির সামনে বন্দীবেশে দশজন বিদ্রোহীর প্রতিরূপ। এরা তাঁর সিংহাসন অধিরোহণে বাধা দিয়েছিল। দরিয়ুসের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা ক্যাম্বাইসিস (পারসিক উচ্চারণ কাম্বোজিয়) ঈর্ষা বশতঃ গোপনে তাঁর ভ্রাতা স্মর্দিসকে
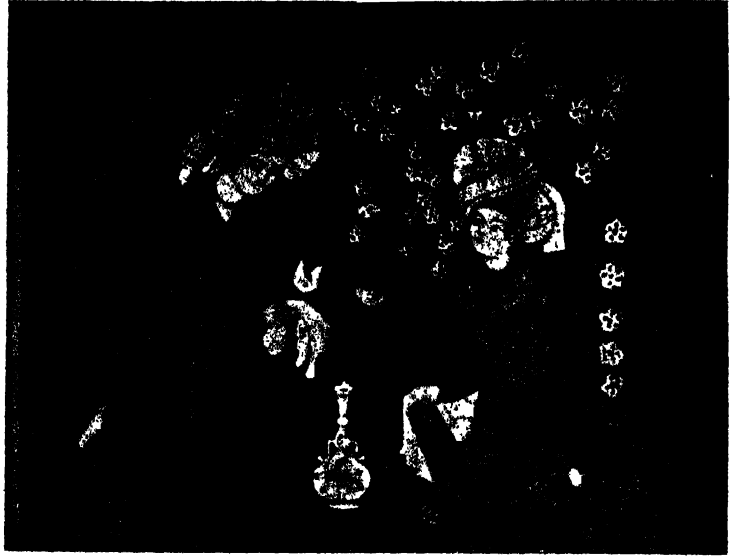
ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর পারসিক শিল্পের নমুনা—একটি দরজার পাল্লা
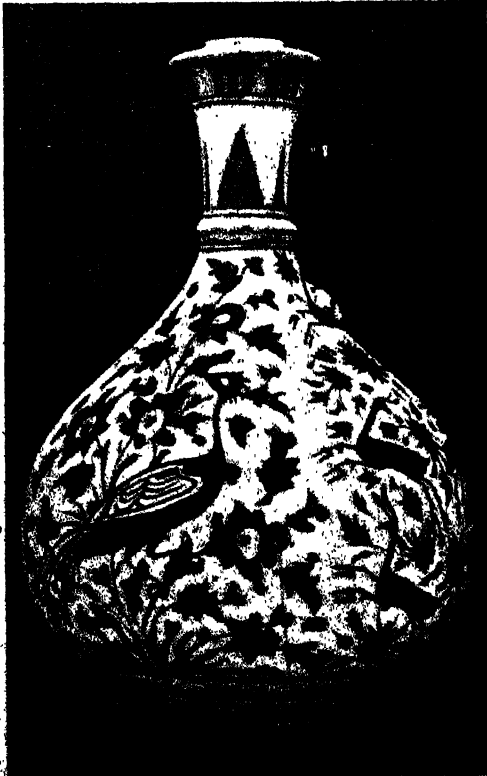
ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর পারসিক শিল্পের নমুনা—একটি মাটির কুঁজো

হত্যা করিয়েছিলেন। যখন তিনি ইজিপ্ট অভিযানে তখন তাঁর অনুপস্থিতিকালে সৌমতে বলে এক ব্যক্তি নিজেকে স্মর্দিস নামে প্রচার করে' সিংহাসন দখল করে বসে। ক্যাম্বাইসিস্ ইজিপ্ট থেকে ফেরবার পথে মারা যান। তখন একেমীনয় বংশের অপর শাখাভুক্ত দরিয়ুস ছদ্মরাজাকে পরাস্ত করে বন্দী করেন। প্রতিমূর্ত্তিতে ভূমিশায়ী সেই মূর্ত্তির বুকে দরিয়ুসের পা, বন্দী ঊর্দ্ধে দুই হাত তুলে ক্ষমা ভিক্ষা করচে। দরিয়ুসের মাথার উপরে অহুরমজদার মূর্ত্তি।

অধ্যাপক হর্টজ্‌ফেল্‌ড বলেন সম্প্রতি একটি শিলালিপি বেরিয়েচে, তাতে দরিয়ুস জানাচ্চেন তিনি যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর পিতা পিতামহ উভয়েই বর্ত্তমান। এই

প্রথাবিরুদ্ধ ব্যাপার কী করে সম্ভব হোলো তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের মাঝে মাঝে এক একটা দ্বীপ দেখা যায় যা ভূমিকম্পের হাতে তৈরি। তার সর্ব্বত্র গলিতধাতু আর অগ্নিস্রাবের চিহ্ন। তেমনি বহুযুগ ধরে ইতিহাসের ভূমিকম্পে এবং অগ্নিউদ্গীরণে পারস্যের জন্ম। প্রাচীনকাল থেকে পারস্যে সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়ে এসেচে। মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে পুরাতন মহাসাম্রাজ্য সাইরাস্ স্থাপন করেন তার পরেও দীর্ঘকাল পারস্যের ইতিহাসক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক দ্বন্দ্ব। তার প্রধান কারণ পারস্যের চারদিকেই বড়ো বড়ো প্রাচীন রাজশক্তির স্থান। হয় তাদের সকলকে দমন করে রাখতে হবে, নয় তাদের কেউ না কেউ এসে পারস্যকে গ্রাস করবে। নানাজাতির সঙ্গে এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব থেকেই পারস্যের ঐতিহাসিক বোধ ঐতিহাসিক সত্তা এত প্রবল হয়ে উঠেচে। ভারতবর্ষ সমাজ সৃষ্টি করেচে, মহাজাতীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেনি। আর্য্যের সঙ্গে অনার্য্যের
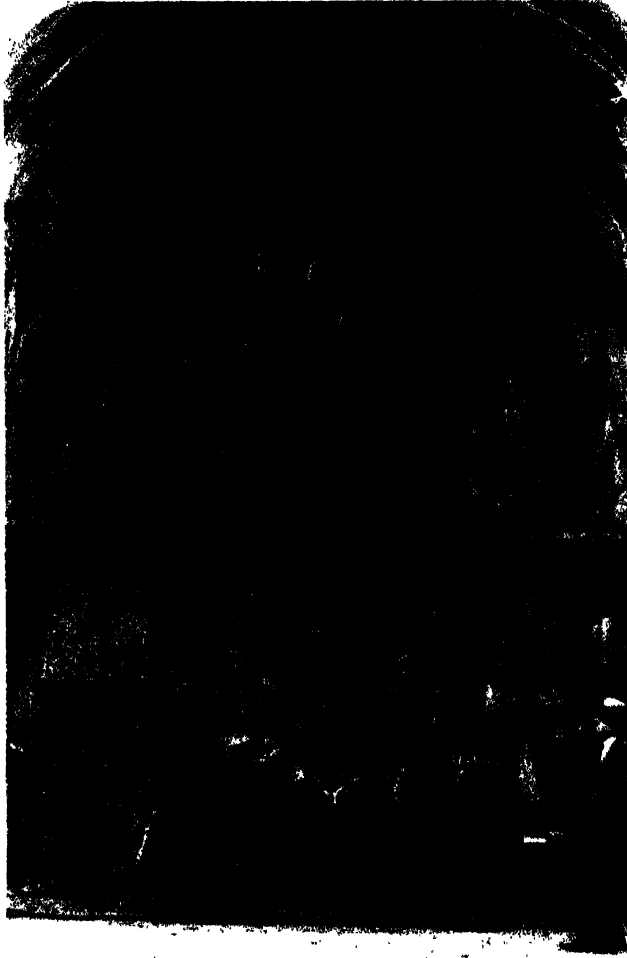
পারস্যে কেরমান্শাহের নিকটবর্ত্তী তাক-ই-বেস্তান শৈলগাত্রে চিত্রলিপি

দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ সামাজিক। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক আর্য্য বহুসংখ্যক অনার্য্যের মাঝখানে পড়ে নিজের সমাজকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। রামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ, রাষ্ট্রজয়ের নয়, সমাজরক্ষার,—সীতা সেই সমাজনীতির প্রতীক। রাবণ সীতাহরণ করেছিল রাজ্য হরণ করেনি। মহাভারতেও বস্তুত সমাজনীতির দ্বন্দ্ব · এক পক্ষ কৃষ্ণকে স্বীকার করেচে, কৃষ্ণাকে পণ রেখে তাঁদের পাশা খেলা, অন্য পক্ষ কৃষ্ণকে অস্বীকার ও কৃষ্ণাকে করেচে অপমান। শাহনামায় আছে প্রকৃত ইতিহাসের কথা, রাষ্ট্রীয় বীরদের কাহিনী, ইরানীদের সঙ্গে তাতারীদের বিরোধ। তাতে ভগবদ্গীতার মতো তত্ত্বকথা বা শান্তিপর্ব্বের মতো নীতি উপদেশ প্রাধান্য পায় নি।

পারস্য বারবার পরজাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপন পারসিক ঐক্যকে দৃঢ় করবার ও জয়ী করবার চেষ্টা করেচে। গুপ্তরাজাদের আমলে ভারতবর্ষ একবার আপন সাম্রাজ্যিক একসত্তা অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু তার প্রভাব গভীর ও স্থায়ী হয় নি। তার প্রধান কারণ ভারতবর্ষ অন্তরে অন্তরে আর্য্যে অনার্য্যে বিভক্ত, সাম্রাজ্যিক ঐক্য সামাজিক ঐক্যের উপর ভিত পাততে পারেনি। দরিয়ুস শিলাবক্ষে এমনভাবে আপন জয়ঘোষণা করেচেন যাতে চিরকাল তা স্থায়ী হয়। কিন্তু এই জয়ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে

পারস্যে কেরমানশার নিকটবর্ত্তী তাক্-ই-বোস্তানের প্রস্তর-গাত্রে বহু প্রাচীন চিত্রাবলী

ঐতিহাসিক,—দরিয়ুস পারসিক রাষ্ট্রসত্তার জন্যে বৃহৎ আসন রচনা করেছিলেন,—যেমন সাইরসকে তেমনি দরিয়ুসকে অবলম্বন করে পারস্য আপন অখণ্ড মহিমা বিরাট ভূমিকায় অনুভব করতে পেরেছিল। পারস্যে পর্ব্বে পর্ব্বে এই রাষ্ট্রিক উপলব্ধি পরাভবকে অতিক্রম করে জেগেচে, আজও আবার তার জাগরণ হোলো। এখানকার প্রধান মন্ত্রী আমাকে যা বলেছিলেন তার মূল কথাটা হচ্চে

এই যে, আপন সমাজনিহিত দুর্ব্বলতার কারণ দূর করাই ভারতবর্ষের সমস্যা, আর পারস্যের সমস্যা আপন শাসন-ব্যবস্থার অপূর্ণতা মোচন করা। পারস্য সেই কাজে লেগেচে ভারতবর্ষ এখনো আপনার যথার্থ কাজে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে লাগে নি।

বেহিস্তন থেকে বেরলুম। অদূরে তাকিবুস্তানের পাহাড়ে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি। সহর থেকে মাইল চারেক দূরে। অভিষেকের পাত্র ও ডান হাতে মালা নিয়ে পাখা মেলে বিজয়দেবতা দাঁড়িয়ে—তার নীচে এক দাঁড়ানো মূর্ত্তি এবং তার নীচে বর্ম্মপরা অশ্বারোহী। পাশের দেয়ালে শিকারের ছবি। এই মূর্ত্তিগুলিতে আশ্চর্য্য একটি শক্তি প্রকাশ পেয়েচে, দেখে মন স্তম্ভিত হয়।

সাসানীয় যুগ বলতে কী বোঝায় সংক্ষেপে বলে রাখি।

কেরমান শাহের দৃশ্য

গবর্ণরের দূত এসে পথের মধ্যে থেকে সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন। দূর থেকেই দেখা যায় অগভীর গুহাগাত্রে খোদাই-করা মূর্ত্তি, তার সামনে কৃত্রিম সরোবরে ঝরে পড়চে জলস্রোত। দুটি মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে, পায়ের তলায় দলিত একজন বন্দী। কোনো লেখা পাওয়া যায় না কিন্তু সাজ-সজ্জায় বোঝা যায় এরা সাসানীয়। পাহাড়ের মধ্যে খোদাই-করে তোলা একটি গম্বুজাকৃতি কক্ষের ঊর্দ্ধভাগে বাম হাতে

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে একেমেনীয় রাজত্বের অবসান হলে পরে যে-জাত পারস্যকে দখল করে তাদের বলে পার্থীয়। তারা সম্ভবত শকজাতীয়, প্রথমে গ্রীকদের প্রভাবে আসে পরে তারা পারসিক সভ্যতা গ্রহণ করে। অবশেষে ২২৬ খৃষ্টাব্দে সাসান-এর পৌত্র অর্দশীর পার্থীয় রাজার হাত থেকে পারস্যকে কেড়ে নিয়ে আর একবার বিশুদ্ধ পারসিক জাতির সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এঁদের

সময়কার প্রবল সম্রাট ছিলেন শাপুর, তিনিই রোমের সম্রাট ভ্যালেরিয়ানকে পরাস্ত ও বন্দী করেন।

একমেনীয়দের ধর্ম্ম ছিল জরথুস্ত্রীয়, সাসানীয়দের আমলে আর একবার প্রবল উৎসাহে এই ধর্ম্মকে জাগিয়ে তোলা হয়।

সহরে প্রবেশ করলুম। পরিষ্কার রাস্তার দুইধারে নানাবিধ পণ্যের দোকান। পথের ধূলো মারবার জন্যে ভিস্তিরা মশকে করে জল ছিটচ্চে। সুন্দর বাগানের মধ্যে আমাদের বাসা। দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন এখানকার গবর্ণর।

তেহেরাণের রাজমন্ত্রীগণের মধ্যে ইরাকের সম্রাট

ঋজু প্রশস্ত নূতন তৈরি পথ বেয়ে আসচি। অদূরে সামনে পাহাড়ের গায়ে কির্ম্মিনশা সহর দেখা দিল। পথের দুইধারে ফসলের ক্ষেত, আফিমের ক্ষেত ফুলে আচ্ছন্ন, মেঘের আড়াল থেকে অস্তসূর্য্যরশ্মির আভা পড়ে সদ্যধৌত গাছের পাতা ঝলমল করচে।

ঘরে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন। এই পরিষ্কার সুসজ্জিত নূতন বাড়িটি আমাদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিয়ে গৃহস্বামী চলে গেছেন।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাজিরাও পেশোয়ার অভিষেক হবে
কাল সকালে।

কীর্ত্তনী এসেছে গ্রামের থেকে,
মন্দিরে ছিল না তার স্থান।
সে বসেছে অঙ্গনের এক কোণে
পিপুল গাছের তলায়।
একতারা বাজায় আর কেবল সে ফিরে ফিরে বলে
"ঠাকুর তোমায় কে বসালো
কঠিন সোনার সিংহাসনে।"
রাত তখন তুই প্রহর,
শুক্লপক্ষের চাঁদ গেছে অস্তে।
দূরে রাজবাড়ির তোরণে
বাজছে শাঁখ শিঙে জগঝম্প,
জ্বলছে প্রদীপের মালা।

কীর্ত্তনী গাইছে,
"তমাল কুঞ্জে বনের পথে
শ্যামল ঘাসের কান্না এলেম শুনে,
ধূলোয় তারা ছিল যে কান পেতে,
পায়ের চিহ্ন বুকে পড়বে আঁকা,
এই ছিল প্রত্যাশা।"

আরতি হয়ে গেছে সারা
মন্দিরের দ্বার তখন বন্ধ,
ভিড়ের লোক গেছে রাজবাড়িতে।

কীর্ত্তনী আপন মনে গাইছে,—
"প্রাণের ঠাকুর,
এরা কি পাথর গেঁথে তোমায় রাখ্‌বে বেঁধে।
তুমি যে স্বর্গ ছেড়ে নামলে ধূলোয়
তোমার পরশ আমার পরশ
মিলবে বলে।"

সেই পিপুল তলার অন্ধকারে
একা একা গাইছিল কীর্ত্তনী,
আর শুনছিল আরেকজনা গোপনে-
বাজিরাও পেশোয়া।

শুনছিল সে,—
"তুমি আমায় ডাক দিয়েছ আগল দেওয়া ঘরের থেকে।
আমায় নিয়ে পথের পথিক হবে।
ঘুচবে তোমার নির্ব্বাসনের ব্যথা,
ছাড়া পাবে হৃদয় মাঝে।
থাক গে ওরা পাথরখানা নিয়ে
পাথরের বন্দিশালায়
অহঙ্কারের কাঁটার বেড়া ঘেরা।"

রাত্রি প্রভাত হোলো।
শুকতারা অরুণ আলোয় উদাসী।
তোরণদ্বারে বাজল বাঁশি বিভাসে ললিতে।
অভিষেকের স্নান হবে
পুরোহিত এল তীর্থবারি নিয়ে।

রাজবাড়ির ঠাকুর ঘর শূন্য।
জ্বলছে দীপশিখা,
পূজার উপচার পড়ে আছে,
বাজিরাও পেশোয়া গেছে চলে
পথের পথিক হয়ে॥

১৬ই মাঘ
১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

কলেজে আমার সহপাঠীদের মধ্যে অবনীভূষণ রায় ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। অর্থাৎ আমি ছিলেম তাঁর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। প্রথম যৌবনে পাঁচজনের মধ্যে একজন সমবয়স্ক যুবক যে কেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে, তা বলা কঠিন। কারণ অনুরাগ কিম্বা ভক্তির ভিতর একটা অজানা জিনিষ আছে। আমরা সে অনুরাগ বা ভক্তির যখন কারণ নির্দ্দেশ করতে চাই, তখন আমরা সেই সব কথাই ব্যক্ত করি যা আর পাঁচজনের কাছে প্রত্যক্ষ। কিন্তু আমার বিশ্বাস—অন্তত: অনুরাগের মূলে এমন একটা অনির্দ্দিষ্ট কারণ থাকে, যা ঠিক ধরা-ছোঁয়ার বস্তু নয়; অতএব তা অপরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও দেওয়া যায় না। অবশ্য অবনীভূষণের শরীরে এমন ক'টি স্পষ্ট গুণ ছিল, যা কারও চোখ এড়িয়ে যেত না। প্রথমত, অবনীভূষণ ছিলেন অতিশয় প্রিয়দর্শন, উপরন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় ভদ্র। বনেদি ঘরের ছেলের দেহে ও চরিত্রে যে-সব গুণের সম্ভাব আমরা কল্পনা করি, অবনীভূষণের দেহে ও মনে সে সব গুণই পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁর তুল্য ধীর ও অমায়িক যুবক আমাদের মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। আর ধনীর সন্তানের চরিত্রে যে-সব ছার গুণের নিত্য সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—যথা মূর্খোচিত দাম্ভিকতা, সর্ব্বজ্ঞতা, অনবস্থচিত্ততা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি—সে সবের লেশমাত্রও তাঁকে স্পর্শ করে নি। যদিচ অবনী ছিলেন একাধারে বনেদি বংশের ও বড় মানুষের ছেলে— রায়নগরের বড় জমিদার লক্ষ্মীকান্ত রায়ের একমাত্র সন্তান। সেকালে কলেজে আমরা প্রায় সকলেই ছিলাম romantic প্রকৃতির যুবক। একমাত্র অবনীভূষণের মনে romanticism-এর ছাপ কখনো পড়েনি, ছোপও ধরে নি। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁর কোনরূপ কৌতূহল, কোনরূপ মায়া ছিল না, এমন কি কোনও মনগড়া সুন্দরীর সঙ্গে তিনি একদিনের জন্যও loveএ পড়েন নি। কিসে দেশের অসংখ্য নিরক্ষর নিঃসহায় রোগক্লিষ্ট লোকদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিধান করা যায়, এই ছিল তা'র প্রধান এবং একমাত্র ভাবনা। অতএব এ ভাবনায় যে তিনি সিদ্ধিলাভ করবেন, তা নিঃসন্দেহ।

এই সব কারণে আমি আন্দাজ করেছিলুম যে, অবনীভূষণ একদিন বাঙলার জমিদারদের মুখোজ্জ্বল করবেন। অবনীর একটি প্রধান গুণ ছিল তাঁর একাগ্রতা। উপরন্তু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করবারও তাঁর যথেষ্ট সুযোগ ছিল। আমাদের পাঁচজনের মত তাঁর পেটে কিঞ্চিৎ বিদ্যা ছিল, পরোপকার করবার বাসনা ছিল, তার উপর তাঁর ছিল অর্থসামর্থ্য—যা আমাদের পাঁচজনের ছিল না। আর তাঁর পারিবারিক সঞ্চিত অর্থ তিনি যে আমোদআহ্লাদে অপব্যয় করবেন না—সে বিষয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবরা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

অবশ্য আমরা অনেকেই নানারূপ শুভ সংকল্প নিয়ে কলেজ থেকে বেরুই, কিন্তু জীবনে সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত করতে পারিনে। সামাজিক জীবনকে আমাদের মনোমত পরিবর্ত্তন করা যে আমাদের পক্ষে অসাধ্য না হোক দুঃসাধ্য—দুদিনেই তা বুঝতে পারি বলে আমাদের কর্ম্মজীবনকে সামাজিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতেই ব্রতী হই। আর যিনি যতটা খাপ খাওয়াতে কৃতকার্য্য হন, তিনিই ততটা কৃতিত্ব লাভ করেন। দুঃখের বিষয় অবনীভূষণ যে সামাজিক জীবনের স্রোত উজান বহাতে পারেন নি শুধু তাই নয়, নিজের জীবনকেও অদ্ভুত ট্রাজেডিতে পরিণত করেছিলেন। কি কারণে, সেই কথাটা আজ বলব।

২

কলেজের যুগটা পার হলেই আমরা পাঁচজনে নানাস্থানে নানাদেশে ছড়িয়ে পড়ি ; কর্ম্মজীবনই আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। M.A. পাশ করবার পর অবনীভূষণ স্বস্থানে ফিরে গেলেন, আর আমি গেলুম পশ্চিমের এক সহরে স্কুলমাষ্টারি করতে। বছর তিনেক তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি; তাঁর কাছে কোনো চিঠিপত্রও পাইনি। তারপর একদিন হঠাৎ তাঁর কাছে থেকে আদেশ পেলুম রায়নগরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে। তাঁর সংকল্পিত ডিস্‌পেনসারি ও স্কুলঘর তৈরী হয়ে গিয়েছে ; বাকী আছে শুধু উপযুক্ত মাষ্টার ও ডাক্তার সংগ্রহ করা। ইতিমধ্যে অবনীভূষণকে একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। তার এই চিঠি পেয়ে সেকালের সব কথা আবার মনে পড়ে গেল, এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর সব কীর্ত্তি দেখবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মাল। ফলে আমি পূজোর ছুটিতে রায়নগরে গেলুম স্কুল চালানো সম্বন্ধে তাঁকে দুটো একটা পরামর্শ দেবার মতলবও আমার ছিল

গিয়ে দেখি অবনীভূষণ সেই কলেজের ছোকরাই আছেন। তিনি এ যাবৎ বিবাহ করেন নি, কারণ তিনি দেশে জনসাধারণের শিক্ষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা না করে বিবাহ করবেন না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ইতিমধ্যে স্কুল ও ডিস্‌পেনসারির বাড়ী দুটি তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সে দুটি ত পাড়াগেঁয়ে স্কুল ও ডাক্তারখানা নয়—রাজপ্রাসাদ। দেখলুম দেশবিদেশ থেকে সব কারিগর আনিয়ে এই অট্টালিকা দুটিকে অলঙ্কৃত করা হয়েছে। আমি ব্যাপার দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম লক্ষ্য করে অবনীভূষণ বললেন—ছেলেবেলা থেকে beautyর মধ্যে বর্দ্ধিত না হলে লোক যথার্থ সুশিক্ষিত হয় না।

৩

তাঁকে সৌন্দর্য্যের উপাসক হতে শিখিয়েছেন তাঁর নতুন friend philosopher and guide প্যারিলাল। এ ভদ্রলোক রায়পরিবারের একটি পুরোনো আমলার ছেলে, অবনীভূষণের জ্ঞাতি ও সম্পর্কে অগ্রজ। গ্রামেই বাড়ী, কিন্তু থাকেন বেশির ভাগ বিদেশে এবং মধ্যে মধ্যে স্বদেশে আবির্ভূত হন। শুনলুম ইনি B.A. পাশ করে নানাস্থানে নানারকম কাজ করেছেন। প্রথমে জয়পুরে স্কুলমাষ্টারী, তারপরে কাশীতে কবিরাজী, তারপরে আউধে কোনো তালুকদারের মোসাহেবী। তারপর বহুকাল ধরে করেছেন তীর্থভ্রমণ অর্থাৎ দেশপর্য্যটন। যখন যে কাজ করেছেন তাতেই তিনি সুখ্যাতি লাভ করেছেন, কিন্তু কোনো কাজেই বেশিদিন লিপ্ত থাকতে পারেন নি। বছরে একবার পেশা পরিবর্ত্তন না করলে তাঁর আর মনের শান্তি থাকত না। আসল কথা এই যে, লোকটা ছিল জন্ম-ভবঘুরে ও লক্ষ্মীছাড়া। তবে তিনি যে অসাধারণ বুদ্ধিমান, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তাঁর মুখে চোখে যেন বুদ্ধির বিদ্যুত খেলত। তার উপর তাঁর ছিল নানাবিদ্যায় সহজ অধিকার। ইংরেজি তিনি ভালই জানতেন আর সংস্কৃতে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তার উপর তিনি ছিলেন অতি সদালাপী। আর্ট বলো, সঙ্গীত বলো, হিন্দু শাস্ত্র বলো, সব বিষয়েই তিনি চমৎকার কথা বলতেন। আর্ট ও ধর্ম্মই ছিল তাঁর কথোপকথনের প্রধান বিষয়—অর্থাৎ সেই দুই বিষয়, আমাদের স্কুলকলেজে যা আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে। আর তিনি ছিলেন চমৎকার সেতারী। সেতার নাকি তিনি অপরকে শোনাবার জন্য নয়, নিজে শোনবার জন্যই বাজাতেন। তিনি সেতার শিক্ষা করেছিলেন জনৈক সন্ন্যাসীর কাছে, আর তাঁর গুরু নাকি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পরের মনোরঞ্জনার্থে বাজালে কেউ আর সঙ্গীতসাধনা করতে পারে না ; কারণ তখন সে পেশাদার ওস্তাদ হয়ে পড়ে। অপর পক্ষে কর্ম্মজীবনের প্রতি প্যারিলালের ছিল অগাধ অবজ্ঞা। এরকম লোকের বশীভূত হলে কেউই আর কর্ম্মজীবনে কৃতী হতে পারে না। আর অবনীভূষণকে তিনি যে যাদু করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এসব দেখেশুনে আমার ভয় হল যে, অবনীভূষণের সামাজিক হিতসাধনের খেয়াল হয়ত বেশিদিন থাকবে না। কেননা আর পাঁচজনের কাছে শুনলুম, প্যারিলাল অত্যন্ত অসামাজিক প্রকৃতির লোক—একেবারে বেপরোয়া। প্যারিলাল যে philosopher তা নিঃসন্দেহ, অবনীর friendও হতে পারেন, কিন্তু guide হিসাবে সর্ব্বনেশে। কেননা তিনি ছিলেন genius বিগড়ে গেলে যা হয়, তাই।

৪

আমি চলে আসবার পর অবনীভূষণের স্কুল ও ডাক্তারখানা খোলা হল এবং ভালভাবেই চলতে লাগল, প্যারীলালের তত্ত্বাবধারণে। অবনীভূষণের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর বন্ধুর শিক্ষা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে ঢের নতুন নতুন idea আছে, যা তিনি ইতিপূর্ব্বে ছাত্রদের ও রোগীদের উপকারার্থে পরের স্কুল কলেজে ডাক্তারখানায় প্রয়োগ করবার সুযোগ পাননি। তিনি ডাক্তার ও মাষ্টারদের শিক্ষার ভার নিজের হাতে নিলেন। প্যারীলাল ডাক্তারদের শিক্ষাশাস্ত্র সম্বন্ধে ও মাষ্টারদের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সুরু করলেন, কারণ তাঁর মতে দেহ বাদ দিয়ে মানুষের মন গড়া যায় না, আর মন বাদ দিয়েও তার দেহ গড়া যায় না। এ সব উপদেশ, কি ডাক্তারবাবুদের কি মাষ্টারবাবুদের কারও বিরক্তিকর হয়নি, কেননা তাঁর মুখের কথা ছিল এক রকম বশীকরণ মন্ত্র। বুদ্ধির এরকম বিচিত্র ও অদ্ভুত খেলা তাঁরা পূর্ব্বে আর কখনো দেখেন নি।

বছরখানেক না যেতেই অবনীভূষণ বিবাহ করলেন। অবনীভূষণের স্ত্রী ছিলেন যেমন সুন্দরী, তেমনি ভাল মেয়ে। বিবাহের পরেই অবনীভূষণের জীবনের কেন্দ্র হয়ে উঠল, তাঁর স্ত্রী। পৃথিবীতে স্ত্রীজাতি যে এক রকম অপূর্ব্ব জীব, এবং তাদের ভিতর যে একটা বিশ্বজোড়া রহস্য আছে,—অবনীভূষণ তাঁর স্ত্রীর সংসর্গে এসে এই সত্যটি প্রথমে আবিষ্কার করলেন। ক্রমে তিনি তাকে মনে মনে একটি দেবতা করে তুললেন। এই প্রতিমার নিত্যপূজা উপাসনা ধ্যানধারণাই হল তাঁর জীবনের নিত্যকর্ম্ম। বলা বাহুল্য তাঁর স্কুল ও ডাক্তারখানার ভার তিনি সম্পূর্ণ ডাক্তার ও মাষ্টারদের হাতে ন্যস্ত করলেন। এবং তিনি তাঁর স্ত্রীর শিক্ষা ও রূপের অনুশীলনেই তাঁর সকল মনপ্রাণ নিয়োজিত করলেন। লোকে বলতে আরম্ভ করলে যে, তিনি ঘোর স্ত্রৈণ হয়ে পড়েছেন; কারণ তিনি কারও সঙ্গে আর মেলামেশা করতেন না। যে লোক শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হয়েছিলেন এবং জন্মাবধি একমাত্র চাকরবাকর আমলাফয়লা মাষ্টার ও ডাক্তারের হাতে লালিতপালিত হয়েছেন, তাঁর অন্তরে একটি রক্তমাংসের মানুষের রক্তমাংসের ভালবাসার বুভুক্ষা প্রচণ্ডভাবে দেখা দিল। এতো হবারই কথা। তাঁর একমাত্র বন্ধু প্যারীলাল ইতিমধ্যেই অন্তর্ধান হয়েছিল। বোধহয় আবার কোনো নূতন বিদ্যা শিখতে কোনো নূতন গুরুর সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়েছিল।

৫

অবনীভূষণের দেহ ও মনে তাঁর স্ত্রীর প্রতি আসক্তি একটা দমকা জ্বরের মত এসে পড়েছিল। বছরখানেক পর সে জ্বর আস্তে আস্তে ছাড়তে আরম্ভ করলে। তাঁর দুকূল-ছাপানো প্রেমের জোয়ারে যখন ভাটা ধরতে আরম্ভ করলে, তখন প্যারীলালের একটা পুরোনো কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। প্যারীলাল একদিন তাঁকে বলেছিলেন যে, "নিত্যপূজা হচ্ছে ধর্ম্মমনোভাবের প্রধান শত্রু। কারণ নিত্যপূজাটা ক্রমে একটা শারীরিক অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়, আর তখন মন ধর্ম্ম থেকে অলক্ষিতে সরে যায়, আর লোকে ঐ অভ্যাসটাকেই ধর্ম্ম বলে ভুল করে। অবনীভূষণ কথাটাকে প্রথমে রসিকতা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আবিষ্কার করলেন যে, প্যারীলালের কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। তাঁর মনে হল যে, তাঁর স্ত্রী-দেবতার পূজা ব্যাপারটা ক্রমে প্রেমের একটা মন্ত্রপড়া ও ঘণ্টানাড়ার ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে। আর তিনি তাঁর আসল কর্ত্তব্যগুলি উপেক্ষা করছেন। স্কুল ও হাঁসপাতালের উন্নতিকল্পে তিনি শুধু টাকা দিচ্ছেন, মন দিচ্ছেন না। আর টাকা যে দিচ্ছেন, সে শুধু অনায়াসে তা দিতে পারেন বলে। আর এ অর্থও তাঁর স্বোপার্জ্জিত নয়—উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব্বপুরুষের নিকট প্রাপ্ত। প্যারীলাল তাঁকে বলে গিয়েছিল "দেখো যেন এ কর্ত্তব্য থেকে কখনো ভ্রষ্ট হয়ো না।" প্যারীলাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার প্রস্তাব শুনে প্রথমে হেসে বলেছিল যে—"অবনীভূষণ, তুমি যা করতে চাও সে বস্তু কি জানো? লাঙল ঠেলবার যন্ত্রকে কলমঠেলবার যন্ত্রে পরিণত করবার কারখানা। কিন্তু এ কারখানা খুলতে তুমি যখন কৃতসংকল্প হয়েছ, তখন তাই করাই তোমার কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য পালন করার ভিতর কোনো সুখ নেই। কিন্তু সুখ নেই বলেই কর্ত্তব্যসাধন হচ্ছে নিজের ক্ষুদ্র অহংএর

বন্ধন থেকে লৌকিক মুক্তির সহজ উপায়। কারণ মানুষের লৌকিক কর্ত্তব্যগুলি তার মনের সীমা নির্দ্দিষ্ট করে দেয়; সে সীমা অতিক্রম করলেই মানুষের মন অসীমের মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়ে। আর তখন তার কর্ম্মজীবন ব্যর্থ হয়।"

"লৌকিক মুক্তি" অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায়, প্যারীলাল বলেছিলেন যে -"এ যুগে যুগধর্ম্ম অনুসারে সবিকার সমাজ-ব্রহ্মে লীন হওয়াই পরম পুরুষার্থ—নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে নয়।"

প্যারীলালের কথাটা কতটা সত্য আর কতটা রসিকতা তা না বুঝলেও, স্ত্রৈণ হওয়াটাই যে পরম পুরুষার্থ নয়, এ কথাটা অবনীভূষণ হৃদয়ঙ্গম করলেন। এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও ডাক্তারখানার উন্নতিসাধন করাই যে তাঁর মুখ্য কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন।

৬

এর পর অবনীভূষণ আবার তাঁর স্কুল ও ডাক্তারখানার মাজাঘসার কাজে পুরোদমে লেগে গেলেন। নূতনত্বের মধ্যে এই হল যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে যে সব বিষয় শিক্ষা দিতেন, সেই সব বিষয়ে স্কুলে শিক্ষকতা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কিছুদিন পর আবার আবিষ্কার করলেন যে, এ কর্ত্তব্য-পালনে তাঁর সুখও নেই, সন্তোষও নেই, সম্ভবতঃ সার্থকতাও নেই। তাঁর স্ত্রী যেরকম একাগ্রমনে তাঁর কাছে পাঁচরকম লেখাপড়া শিখতেন, স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একজনেরও সে মন নেই, সে আগ্রহ নেই। ক্রমে তাঁর জ্ঞান হল যে, তিনিও যেমন শিক্ষাদান করা শুধু একটা অপ্রিয় কর্ত্তব্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন, ছেলেরা শিক্ষালাভটাও তেমনি একটি অপ্রিয় কর্ত্তব্য হিসেবে গ্রাহ্য করে নিয়েছে। তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো মনের টান নেই। ফলে তাঁর পক্ষে শিক্ষাদান করাটাও যেমন নিরানন্দ ব্যাপার ছেলেদের পক্ষে শিক্ষা-লাভ করাটাও তেমনি নিরানন্দ ব্যাপার। এবং সেই সঙ্গে তাঁর মনে হল যে, প্যারীলাল যে শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিয়েছে, তার কারণ বোধহয় সে যেদিন বুঝলে ও-জাতীয় শিক্ষার ভিতর কোনো আনন্দ নেই, না মাষ্টারদের না ছাত্রদের, তখন এ ব্যাপারের দিকে পিঠ ফিরিয়েছে। ছাত্রদের মনে যদি তাঁর স্ত্রীর মত শিক্ষালাভের জন্য আকুলতা থাকত, তাহলে শিক্ষা দেবার একটা সার্থকতা থাকত। এর থেকে তাঁর মনে হল যে, শিক্ষা যথার্থ নিতে পারে মেয়েরা, আর দিতে পারে পুরুষে। এর পর তিনি নিশ্চয়ই একটি Girls' Schoolএর প্রতিষ্ঠা করতেন, যদি না তাঁর মনে পড়ে যেত যে প্যারীলাল বলেছিলেন সব মেয়েরা তাঁর স্ত্রীর প্রকৃতির নয়। অনেকে বরং তার উল্টো প্রকৃতির।

৭

অবনীভূষণ ক্রমে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন যে, স্কুল-মাষ্টারী করার ভিতর অপরের কোন সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর নেই। সুতরাং স্কুল তাঁর সমানভাবেই চলতে লাগল, শুধু তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেন। এ কাজ তিনি অনায়াসেই করতে পারলেন, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর স্কুলের একটি অবৈতনিক এবং উপরি মাষ্টার।

আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাঁসপাতালের মোহও কেটে গেল। ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে দুটি বিষয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানলাভ হল,—এক রোগ আর দ্বিতীয় মৃত্যু। মানুষের রোগযন্ত্রণা আর তারপর মৃত্যু তাঁর মনকে নিতান্ত অভিভূত করে ফেল্‌লে। বিশেষত তাঁর স্কুলের সব চেয়ে ভাল ছেলে শ্রীশঙ্কর যখন বসন্তরোগে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে মারা গেল, তখন তাঁর মন ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তাঁর মনে হল তাঁর স্ত্রীও একদিন হয়ত ঐ ভাবে অকস্মাৎ মারা যেতে পারে। একথা মনে উদয় হবামাত্র তাঁর কাছে পৃথিবীটা একটা মহাশ্মশানে পরিণত হল, যার নীচে শুধু ছাই আর উপরে ধোঁয়া। পৃথিবীতে মৃত্যু আছে জেনেও মানুষে যে কি করে হেসে খেলে কাজকর্ম্ম করে বেড়ায়, এ ব্যাপারটা তাঁর কাছে বড়ই অদ্ভুত মনে হল। প্যারীলাল হয়ত তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে এ সত্যের উপলব্ধি করেছিলেন। তাই প্যারীলালের মতে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির দুটিমাত্র উপায় আছে—এক আর্ট, আরেক ধর্ম্ম। কারণ এ দুটি বস্তুই মৃত্যুকে অতিক্রম করে, এবং মর্ত্ত্যকেও অমৃতলোকে পরিণত করে। এর পর অবনীভূষণ মনস্থির করলেন যে,

তিনি ধর্ম্মের শরণাপন্ন হবেন, যে ধর্ম্মকে তিনি এতদিন উপেক্ষা করে আসছিলেন। অতএব তিনি আদ্যোপান্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করবেন সংকল্প করলেন। এ শাস্ত্রের সন্ধানও তাঁকে প্যারীলাল দিয়েছিল। ভাগবত তাঁর লাইব্রেরিতেই ছিল কিন্তু সে বই আর তাঁর পড়া হল না।

৮

এই সময় একটি এমন ঘটনা ঘটল, যাতে করে অবনীভূষণের মনের ও জীবনের গতি নূতন পথে চলে গেল। এ নূতন পথ সর্ব্বনাশের পথ।

রায়নগরের সন্নিকট কৃষ্ণপুরের জমিদার কামদাপ্রসাদের কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অবনীভূষণ কৃষ্ণপুরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাধ্য হয়েছিলেন বলছি এই কারণে যে, কামদাপ্রসাদের জীবনযাত্রা ছিল সেকেলে ধরণের। দেশের ও দশের জন্য নূতন কিছু করা কামদাপ্রসাদ এক-দিনের জন্যও নিজের কর্ত্তব্য বলে মনে করেন নি। তাঁর জীবন ছিল পুরোমাত্রায় বিলাসীর জীবন। তিনি বারোমাস গাইয়ে বাজিয়ে মোসাহেব ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দ্বারা পরিবৃত থাকতেন—অর্থাৎ তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ ছিল আমোদপ্রমোদের চর্চ্চা। অথচ সামাজিক লোকের তিনি অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন; কারণ তিনি প্রজাদের উপর কথনো অত্যাচার করেননি, কাউকে কথনো রূঢ়কথা বলেননি, এবং গরিবদুঃখী গুরুপুরোহিতকে যথেষ্ট দান করতেন; কন্যাদায় মাতৃদায়গ্রস্ত নিঃস্ব গৃহস্থদেরও মুক্তহস্তে সাহায্য করতেন। কামদাপ্রসাদের এই সব হালচাল অবনীভূষণ মোটেই পছন্দ করতেন না। তদ্ব্যতীত এই বিলাসী-জীবনকে তিনি ভয় করতেন। বিশেষত প্যারীলাল তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, বিলাসিতার একটা বিষম নেশা আছে এবং যে লোক এজীবনে অভ্যস্ত নয়, ও যার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত নয়, বিলাসের নেশা তাকে সহজেই পেয়ে বসে। যেমন, যে লোক মদ্যপানে অভ্যস্ত নয়, এক গেলাসই তার মাথায় চড়ে যায়, আর তখন দ্বিতীয় গেলাসের পিপাসা তার অদম্য হয়ে ওঠে! এ সত্ত্বেও তিনি এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বাধ্য হলেন, কেননা কামদাপ্রসাদ তাঁর স্বসম্প্রদায়ের লোক, উপরন্তু আত্মীয়।

৯

এই বিবাহবাসরে বিখ্যাত বাইজি বেনজীরের মুখে একটি মহ্লারের ঠুংরি শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তার গানের মৃদু টান ও সূক্ষ্ম তানগুলি তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে তার একটি রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলে। এবং সেই সঙ্গে একটি আনন্দময় জগৎ তাঁর মনের দেশে আবির্ভূত হল। তাঁর মনে হল যে, প্যারীলালের হাতে পড়লে সেতারের যে-সব অতিকোমল মীড় প্রাণকে স্পর্শ করত, বেনজীরের গলায় তদনুরূপ সূক্ষ্ম মীড় সব অধিষ্ঠান করেছে। প্যারীলাল বলত যে—"সঙ্গীতের স্থূলদেহ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে, আর তার সূক্ষ্মশরীরই আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে। তাই সঙ্গীত যখন আমাদের কানের কাছে মুমূর্ষু হয়, তখন তা আমাদের প্রাণের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কারণ পৃথিবীতে যা ব্যক্ত, তাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়, যা অব্যক্ত তা মনের বিষয়, আর যা অর্দ্ধব্যক্ত তা যুগপৎ ইন্দ্রিয় ও মনের অর্থাৎ প্রাণের বিষয়। অবনীভূষণ মনে মনে স্বীকার করলেন যে, প্যারীলালের কথা সত্য। কিন্তু প্যারীলালের সেতার ত তাঁর মনকে কথনো এভাবে স্পর্শ করেনি, কোন নূতন আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করেনি। এর কারণ বোধহয় স্ত্রীকণ্ঠের মধ্যে এমন কোন রহস্য আছে, যা তারের যন্ত্রে নেই। সব স্ত্রীলোক যে এক প্রকৃতির জীব নয়, একথা তিনি প্যারীলালের মুখে পূর্ব্বেই শুনেছিলেন। এইবার স্পষ্ট অনুভব করলেন যে, স্ত্রীজাতির মোহিনীশক্তিও বিচিত্র এবং নানামুখী। বেনজীরও ছিল সুন্দরী, কিন্তু তার রূপকে ফুটিয়ে তুলেছে তার আর্ট। অবনীভূষণের বিশ্বাস হল যে, আর্ট হচ্ছে সেই বস্তু, যা প্রকৃতির প্রচ্ছন্নরূপ প্রকাশ করে।

এর পর বেনজীরের সঙ্গে অবনীভূষণের কি কথাবার্ত্তা হল জানিনে। কিন্তু এই কথোপকথনের ফলে বেনজীর বিবাহান্তে আর কলকাতায় ফিরে গেল না; রায়নগরে অবনীভূষণের Guest Houseএ এসে অধিষ্ঠিত হল। আর অবনীভূষণও নিত্য তার সঙ্গীতসুধা পান করতে লাগলেন।

ফলে বেনজীর তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী হয়ে উঠল। তাঁর স্ত্রী হল তাঁর ধর্ম্মপত্নী, আর বেনজীর তাঁর রূপপত্নী।

১০

বেনজীর অবশ্য কুলবধূ ছিল না। সে ছ'মাস পরেই চলে গেল। মজলিস্, বহুশ্রোতা ও সমজদারের বাহবার অভাব অবনীভূষণের অর্থ পূরণ করতে পারল না। অবনীভূষণ তখন দ্বিতীয় সুধাপাত্রের জন্য পিপাসিত হয়ে উঠলেন; ফলে দ্বিতীয়ের পর তৃতীয়, তৃতীয়ের পর চতুর্থ ইত্যাদি ক্রমে তাঁর পাত্রের পর পাত্র আমদানী হতে লাগল। আমাদের মতে তিনি একেবারে অধঃপাতে গেলেন। শেষটা তাঁর দশা এই হল যে, তিনি শ্যাম্পেনের স্বাদ ধেনোয় মেটাতে আরম্ভ করলেন।

কিন্তু দিনের পর দিন তিনি মনের শান্তিও হারাতে লাগলেন। স্ত্রীজাতির প্রতি আসক্তি তাঁর দেহমনের যে একটা বিশ্রী অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে, সে বিষয়ে তাঁর মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। কারণ অবনীভূষণ যতই অধঃপাতে যান না কেন, তাঁর কাণ্ডজ্ঞান একেবারে লোপ পায় নি, এবং মনের সুপ্রবৃত্তিগুলি একেবারে নির্ম্মূল হয়নি। তাঁর এই নূতন মত্ততা তাঁর সমস্ত মনকে অভিভূত করতে পারে নি। তাঁর স্ত্রীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এই সময়ে বেড়েছিল বই কমেনি। কারণ এ কথা তিনি জানতেন যে, তাঁর নব প্রণয়িনীর দল কেউই শ্রদ্ধার পাত্রী নন, আর এদের কারো কাছ থেকে তিনি যথার্থ ভালবাসা পান নি। অথচ তিনি এই সব রক্তমাংসের পুতুলদের মায়া কাটাতে পারতেন না। তাঁর মন নিজের প্রতি ধিক্কারে ভরে উঠল। এ অবস্থায় তাঁর মনে হল যে, যদি কেউ তাঁকে এ পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে পারে ত সে প্যারীলাল। কিন্তু প্যারীলাল যে কোথায় কোন্ দেশে, তার সন্ধান কেউ জানে না। অতঃপর তিনি প্যারীলালের শুভাগমনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

১১

এদিকে অবনীভূষণের চরিত্রের যত অবনতি ঘটতে লাগল, তাঁর স্ত্রীর মনের চরিত্র তত তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠতে লাগল। তাঁর স্বামীদেবতা অপদেবতায় পরিণত হওয়ায় তাঁর মন অবশ্য অত্যন্ত পীড়িত হল, কিন্তু এই পীড়াই তাঁর চরিত্রের সুপ্তশক্তিকে জাগিয়ে তুললে। অবনীভূষণের স্ত্রীপূজা তিনি কখনই প্রফুল্লমনে গ্রাহ্য করতে পারেন নি। তিনি জানতেন তিনি মানুষ—দেবতা নন। এবং পরকে ভালবাসা ও পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করবার প্রবৃত্তিও মানবধর্ম্ম। তিনি কোনোকালেই স্বামীর কাছ থেকে পূজা চান নি, স্বামীকেই পূজা করতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীতে কপোত-কপোতীর মত মুখে মুখ দিয়ে বসে থাকাটা তার কোনকালেই মনোমত ছিল না। তিনি চাইতেন কাজ করতে, আর পাঁচজনের সেবা করতে। তাঁর স্বামীর এই স্ত্রীমোহটা তাঁর কাছে চিরদিনই বিপজ্জনক মনে হত। ধনীর সন্তানের বনিতা-বিলাস তাঁর কাছে মনে হত তাদের কর্ম্মহীনতার একটা বিশেষ প্রকাশ মাত্র; আর এ বিলাস কাকে যে কোন্ বিপথে টেনে নিয়ে যাবে, কে বলতে পারে? তবে অবনীভূষণ যে আর পাঁচজন ধনী ব্যক্তির জাত নয়, এ বিশ্বাস তাঁর স্ত্রীর ছিল। সুতরাং আর পাঁচজন অপদার্থ লোকের কপালে যে দুর্দ্দশা ঘটে, অবনীভূষণ যে সেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হবেন, সে ভয় তাঁর ছিল না। তাই অবনীভূষণের চরিত্রবিকারের পরিচয় পেয়ে, তিনি নিতান্ত কাতর হয়ে পড়লেন ও ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করলেন। এর ফলে তাঁর মনে নূতন শক্তি, নূতন সৌন্দর্য্য জন্মলাভ করলে। তিনি ছিলেন মানবী, হয়ে উঠলেন দেবী। তখন তাঁর প্রশান্ত স্নিগ্ধ ও করুণ দৃষ্টি যার উপরে পড়ত, তাকেই পবিত্র করে তুলত।

এ সব কথা আমি অবনীভূষণের মুখেই শুনেছি—কি অবস্থায় আর কি সূত্রে, তা পরে বলছি।

১২

অনেকদিন অবনীভূষণের কোনও খবর পাইনি, নিইও নি। ইতিমধ্যে আমি স্কুলমাষ্টারী থেকে প্রফেসারী পদে প্রমোশন পাই। আর ছেলে পড়ানো ছাড়া অপর কোনও বিষয়ে মন দেবার অবসর ছিল না। হঠাৎ একদিন অবনীভূষণের কাছ থেকে আবার এই চিঠি পাই:—

"আমি এখন নিতান্ত একা হয়ে পড়েছি। জানই তো

আমি নিঃসন্তান, তা ছাড়া আমার স্ত্রীও ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমিও সংসার ত্যাগ করব মনে করেছি, কিন্তু তার পূর্ব্বে বিষয়সম্পত্তির একটা সুব্যবস্থা করতে চাই, যাতে আমার পৈতৃক ধনের আর পাঁচজনে সদ্ব্যবহার করতে পারে। এ বিষয়ে আমি তোমার পরামর্শ চাই। তুমি যদি একবার এখানে এসো তো বড় ভাল হয়।"

এ চিঠি পেয়ে আমি কদিনের ছুটি নিয়ে রায়নগর গেলুম। গিয়ে দেখি অবনীভূষণের চেহারা এতটা বদলে গিয়েছে যে, তাকে দেখে আমাদের সেই কলেজী বন্ধু বলে আর চেনবার যো নেই। তার শরীর অসম্ভবরকম শীর্ণ ও জীর্ণ হয়ে পড়েছে—আর তার চোখে একটা আলেয়ার আলো থেকে থেকে জ্বলে উঠছে ও নিবে যাচ্ছে।

তিনি আমাকে দেখবামাত্রই তাঁর চরিত্রবিকারের ইতিহাস বললেন, যে ইতিহাস আমি পূর্ব্বেই তোমাদের বলেছি। তারপর যখন তিনি অধোগতির চরম দশায় উপস্থিত হয়েছেন, তখন হঠাৎ একদিন প্যারীলাল এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই অবনীকে দেখে হেসে বললেন—"তুমি নাকি এখন রাজা প্রিয়ব্রতের মতন মনে মনে বলছ :—

অহো অসাধ্বনুষ্ঠিতং যদভিনিবেশিতোহহংমিন্দ্রিয়ৈর বিদ্যারচিতবিষমবিষয়ান্ধকূপে তদলমলমমুষ্যা বনিতায়া বিনোদমৃগং মাং ধিগ্ধিগিতি গর্হয়াঞ্চকার।

তাঁর কথা শুনে অবনী অবাক হয়ে গেল দেখে তিনি বললেন—"ভাগবতে পড়নি যে, পরম লোক-হিতৈষী প্রিয়ব্রত রাজা প্রজার অশেষ হিতসাধন করে শেষটা বনিতার বিনোদ-মৃগ হয়ে নিজেকে এই বলে ধিক্কার দিয়েছিলেন। তারপর ভগবদ্‌ভক্তির প্রসাদে এই বনিতাবিলাসরোগমুক্ত হয়েছিলেন। তোমার মনে যখন ধিক্কার জন্মেছে, তখন তুমিও এ রোগ থেকে মুক্ত হবে; তবে ভগবদ্‌ভক্তির কৃপায় নয়, কারণ তোমার মত লোকের মনে ভগবদ্‌ভক্তি উদ্রেক করা অতি কঠিন। তোমার পক্ষে যা প্রয়োজন, সে হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনমার্গ। যে প্রবৃত্তি তোমাকে এ পথে নিয়ে গিয়েছে, সে প্রবৃত্তির চরম সার্থকতা লাভ করলেই তুমি এ রোগ থেকে মুক্ত হবে। এ বিশ্বের অন্তরে একটি নায়িকা আছেন, এ বিশ্ব যাঁর স্থূলদেহ; আর পৃথিবীর নায়িকা মাত্রই তাঁর অংশাবতার। তাঁর দর্শনলাভ করলেই তোমার রূপপিপাসা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হবে। এ সব হয়তো তুমি বিশ্বাস করছ না, কারণ এ দর্শন স্পর্শন জাগ্রত চৈতন্যের অধিকারবহির্ভূত। কিন্তু এ কথা তো মানো যে, মানুষের অন্তরে একটি অধঃচৈতন্য আছে। তেমনি তার অন্তরে একটি ঊর্দ্ধচৈতন্য আছে। আমরা যাকে আর্ট ও ধর্ম্ম বলি, তা এই ঊর্দ্ধচৈতন্যগোচর। রক্তমাংসের সম্পর্ক অধঃচৈতন্যের সঙ্গে; ও রূপের সম্পর্ক ঊর্দ্ধচৈতন্যের সঙ্গে। আর দেশকালের অতীত এই নায়িকার ঊর্দ্ধচৈতন্যেই দর্শনলাভ ঘটে; আর এ সাধনমার্গে তুমি নায়িকাসিদ্ধ হবে। আমি যে এ সিদ্ধিলাভ করিনি তার কারণ, এক পক্ষ ধরে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আমি পালন করতে পারিনি। আমার বিক্ষিপ্তচিত্ততা আমার সকল সাধনা ব্যর্থ করেছে। তাই আমি সংসারে অনাসক্ত, কিন্তু কোন্ অপার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্ত, তা ঠিক জানিনে।"

প্যারীলালের কথায় অবনীভূষণ কি সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তা আর আমাকে বললেন না। তাঁর কথার ভাবে বুঝলুম যে—কোনরূপ বীভৎস প্রক্রিয়া তাঁকে করতে হয়নি, যা করতে হয়েছিল তা আগাগোড়া মানসিক প্রক্রিয়াই। শুধু এই পর্য্যন্ত বললেন যে, মাসাবধি কাল কোনও স্ত্রীলোকের মুখদর্শন তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেই নাকি সাধকের নখদর্পণে সেই দেশকালের অতীত নায়িকার মূর্ত্তি স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

অবনীভূষণ একাগ্রমনে এ সাধনা করেছিলেন। এমন কি, তাঁর স্ত্রী কঠিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তাঁর ব্রতভঙ্গ করেন নি। যেদিন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হ'ল, সেইদিনই তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। স্ত্রীর মুখাগ্নি করে এসে তিনি নখের বস্ত্রাবরণ মুক্ত করে দেখেন যে, নখদর্পণে তাঁর স্ত্রীর অপরূপ, সুন্দর ও করুণ দিব্যমূর্ত্তি ফুটে উঠেছে।

এ ছবি নাকি ধুলেও যায় না, অথচ অপর কেউই তা দেখতে পায় না, এক স্বয়ং সাধক ব্যতীত।

এ সব কথা শুনে মনে হল যে, অবনীভূষণ বনিতাবিলাস রোগমুক্ত হয়ে উন্মাদ হয়েছেন, আর সেই সঙ্গে প্রমাণ পেলুম যে, প্যারীলাল সুধু বশীকরণের নয়, মারণ-উচাটনেরও মন্ত্র জানেন; কারণ অবনীভূষণের উন্মাদ আর স্ত্রীর অকাল মৃত্যু, দুইই প্যারীলালের মন্ত্রতন্ত্রের ফল।

এর পর অবনীভূষণকে কোনরূপ সাংসারিক উপদেশ দেওয়া বৃথা জেনে, আমি বললুম—"তোমার ধনসম্পত্তি তুমি তোমার মন্ত্রদাতা গুরুর হাতেই সমর্পণ করো, তিনি তার সদ্ব্যবহার করবেন।" উত্তরে অবনী বললে—"এ প্রস্তাব আমি প্যারীলালের কাছে করেছিলুম; তিনি তা শোনবামাত্রই প্রত্যাখ্যান করলেন এই বলে যে—'ডানহাতে যদি কাঞ্চন ধরি ত বাঁহাতে আবার কামিনী এসে পড়বে, আর এ উভয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ার চাইতে, অসীমের মধ্যে দিশেহারা হওয়া শতগুণে ভাল কিন্তু শ্রেয় নয়'।

অবনীভূষণের এ কথা শুনে আমি অবাক্ হয়ে গেলুম; কারণ বুঝলুম যে, প্যারীলালের মুখের কথা শুধু paradox নয়, লোকটা স্বয়ং একটা জীবন্ত paradox।

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

বলরামপুর গ্রামের রথতলায় চাষা-ভূষাদের একটা বৈঠক হইয়া গেল। নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে লাইনের কুলি গ্যাং রবিবারের ছুটির ফাঁকে যোগদান করিয়া সভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিল এবং কলিকাতা হইতে জনকয়েক নাম করা বক্তা আসিয়া আধুনিক কালের অসাম্য ও অমৈত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করিলেন। অসংখ্য প্রস্তাব গৃহীত হইল ও পরে শোভাযাত্রায় বন্দেমাতরম ধ্বনি সহযোগে গ্রাম পরিক্রমণ পূর্ব্বক সেদিনের মত সম্মিলনীর কার্য্য সমাধা হইল।

বলরামপুর সমৃদ্ধ গ্রাম। ছোট-বড় অনেকগুলি তালুকদার ও সম্পন্ন গৃহস্থের বাস। একপ্রান্তে মুসলমান কৃষকপল্লী ও তাহারই অদূরে ঘর কয়েক বাগ্‌দী ও দুলেদের বসতি। ভাগীরথীর একটা শাখা বহুকাল পূর্ব্বে মজিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকারে ক্রোশেক বিস্তৃত বিলের সৃষ্টি করিয়াছে ইহারই তীরে তাহাদের কুটির। এই গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা বিত্তশালী ব্যক্তি যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়। জমি-জমা তালুক তেজারতি প্রভৃতিতে তাঁহার সম্পত্তি ও সম্পদ প্রচুর বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখের পথে এই শোভাযাত্রা যখন রক্তপতাকায় লিখিত নানাবিধ 'বাণী' ও বিপুল চীৎকারে কৃষক-মজুরের জয়-জয়কার হাঁকিয়া অতিক্রম করিতেছিল, তখন দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ-গঠন যুবক নীচের সমস্ত দৃশ্য, নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছিল। অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বিক্ষুব্ধ জনতার উদ্বেলিত কোলাহল যেন এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। পুরোবর্ত্তী নেতৃস্থানীয় জন-দুই তিন ব্যক্তি চমকিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া বহুলোকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া উপরের দিকে মুখ তুলিতেই, তিনি থামের আড়ালে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

অনেকেই চাপা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, বিপ্রদাস বাবু!

কে বিপ্রদাস? গাঁয়ের জমিদার বুঝি?

কে একজন কহিল, হাঁ!

নেতারা সহরের লোক, কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করেন না, উপেক্ষা ভরে কহিলেন, ওঃ—এই! এবং পরক্ষণেই উচ্চ চীৎকারে মাথার উপরে হাত ঘুরাইয়া সমস্বরে হাঁকিলেন, 'বল, ভারত মাতার জয়!' 'বল, কৃষাণ মজুরের জয়!' 'বল, বন্দেমাতরম্।'

বিশেষ ফল হইল না। অনেকেই চুপ করিয়া রহিল, অথবা মনে মনে বলিল, এবং যে দুই চারিজন সাড়া দিল তাহাদেরও ক্ষীণ-কণ্ঠ বেশী উর্দ্ধে উঠিল না,—বিপ্রদাসের বারান্দা ডিঙাইয়া তাঁহার কানে পৌঁছিল কি না, বুঝা গেল না। নেতারা নিজেদের অপমানিত জ্ঞান করিলেন, বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এই একটা সামান্য গ্রাম্য জমিদার, তাকেই এত ভয়? ওরাইতো আমাদের পরম শত্রু,—আমাদের গায়ের রক্ত অহরহ শুষে খাচ্চে। আমাদের আসল অভিযানতো ওদেরই বিরুদ্ধে! ওরা যে—

প্রদীপ্ত বাগ্মীতায় সহসা বাধা পড়িল। বহু শাণিত শর তখনও তাঁহাদের তূণে সঞ্চিত ছিল, কিন্তু প্রয়োগ করায় বিঘ্ন ঘটিল। কে একজন ভিড়ের মধ্য হইতে আস্তে বলিল, ওঁর দাদা!

কার?

একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক নিশান লইয়া সকলের অগ্রে চলিয়াছিল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, উনি আমারই বড় ভাই।

অথচ এই ছেলেটিরই আগ্রহ উদ্যম ও অর্থব্যয়ে আজিকার অনুষ্ঠান সফল হইতে পারিয়াছিল।

ওঃ—আপনার! আপনিও বুঝি এখানকার জমিদার?

ছেলেটি সলজ্জ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

২

বিপ্রদাস নিজের বসিবার ঘরে ছোট ভাইকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, কালকের আয়োজনটা মন্দ হয়নি, অনেকটা চমক লাগবার মত। War cry গুলোও বেশ বাছা বাছা, ঝাঁজ আছে তা মানতেই হবে।

দ্বিজদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপ্রদাস প্রশ্ন করিলেন, শোভাযাত্রাটা কি বিশেষ করে আমারই উদ্দেশে, আমার নাকের ডগা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল? ভয় পাবো বলে?

দ্বিজদাস শান্তস্বরে জবাব দিল, শুধু আপনার জন্যেই নয়। শোভাযাত্রা যে পথ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হোক্ ভয় যাদের, পাবার তারা তো পাবেই দাদা!

বিপ্রদাস মুচকিয়া হাসিলেন। সে একেবারে অবজ্ঞা ভরা। বলিলেন, তোমার দাদা ঠিক সে জাতের মানুষ নয়, এ খবর তোমার শোভাযাত্রীরা অনেকেই জান্‌তো। নইলে তাদের জয়ধ্বনি শোনবার

নচে আমাকে বারান্দায় উঠে গিয়ে কান পেতে দাঁড়াতে হোত না! ঘরে বসেই শোনা যেতো। তাদের রকমারি নিশান আর বড়-বড় বক্তৃতাকে ভয় আমি করিনে। বেশ বুঝি, ঝক্‌ঝকে বাঁধানো দাঁত দিয়ে মানুষকে শুধু খিঁচোনোই যায়, তাতে কামড়ানোর কাজ চলে না।

যে কারণে কাল বহু লোকেরই কণ্ঠরোধ হইয়াছিল তাহা গোপন ছিল না। এবং ইহারই ইঙ্গিতে দ্বিজদাস মনে মনে গভীর লজ্জা বোধ করিল। সে স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতির মানুষ, এবং দাদাকে অত্যন্ত মান্য করিত বলিয়া হয়ত আর কোন প্রসঙ্গে চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু যা' লইয়া তিনি খোঁচা দিলেন সে সহা কঠিন। তথাপি মৃদু কণ্ঠেই বলিল, দাদা, বাঁধানো দাঁত দিয়ে যেটুকু হয় তার বেশী যে হয় না এ কথা আমরা জানি, শুধু আপনারাই জানেন না যে সংসারে সত্যিকার দাঁতওয়ালা লোকও আছে কামড়াবার দিন এলে তাদের অভাব হয় না।

জবাবটা অপ্রত্যাশিত। বিপ্রদাস আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—বটে?

দ্বিজদাস প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সভয়ে থামিয়া গেল। ভয় বিপ্রদাসকে নহে, অকস্মাৎ দ্বারের বাহিরে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তোরা দরজায় পর্দ্দা টাঙিয়ে রাখিস কেন বল্‌তো? ছোঁয়া-ছুঁয়ি না করে যে ঘরে ঢুক্‌বো তার যো নেই। ঘর-সংসার বিলিতি ফ্যাশানে ভরে গেল।

দ্বিজদাস ব্যস্ত হইয়া পর্দ্দাটা একধারে টানিয়া দিল, এবং বিপ্রদাস চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু রূপের অবধি নাই। একটু কৃশ, মুখের পরে বৈধব্যের কঠোরতার ছাপ পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। ছোট ছেলের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া বড় ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, হাঁ রে বিপিন, শুনচি নাকি একাদশী নিয়ে এ মাসে পাঁজিতে গোল বেঁধেছে? এমনতো কখনও হয় না।

বিপ্রদাস কহিল, হওয়াতো উচিত নয় মা।

তুই স্মৃতিরত্ন মশাইকে একবার ডেকে পাঠা। তাঁর মতটা কি শুনি।

বিপ্রদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা পাঠাচ্চি। কিন্তু তাঁর মতামতে কি হবে মা, তোমার কানে একবার যখন খবর পৌঁছেচে তখন ও-দুটোদিনের একটা দিনও তুমি জল স্পর্শ কর্‌বে না তা' জানি।

মা হাসিলেন, বলিলেন মিথ্যে উপোস করে মরা কি কারও সখ রে? কিন্তু উপায় কি? এ কর্‌লে পুণ্যি নেই, না কর্‌লে অনন্ত নরক। হাঁরে, বৌমা বল্‌ছিলেন খবরের কাগজে লিখেচে কে একজন মস্ত পণ্ডিত কল্‌কাতায় নাকি চমৎকার ভাগবত ব্যাখ্যা করচেন। একবার খোঁজ নে দিকি, কি হলে এ বাড়ীতে তিনি পায়ের ধুলো দিতে পারেন?

তোমার হুকুম হলেই নিতে পারি মা।

কেন, আমার হুকুমেরই বা দরকার কি! তোদের শুনতে কি ইচ্ছে যায় না? সেই যে কবে কথকতা হয়ে গেল—

বিপ্রদাস সহাস্যে বাধা দিয়া কহিল, সে তো এখনো তিন মাসও হয়নি মা।

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, মোটে তিন মাস? কিন্তু তিনমাসই কি কম সময়। তা সে যাই হোক,

বাবা, এবার কিন্তু না বল্‌লে চলবে না। আমার দু মামীই চিঠি লিখেচেন। কৈলাসনাথ মানস-সরোবর দর্শনে এবার আমি যাবই যাবো।

বিপ্রদাস হাতযোড় করিয়া কহিল, দোহাই মা, ও আদেশটি তুমি করোনা। তোমার দুই ছেলের একজন সঙ্গে না গেলে কেবল মামীদের জিম্মায় তোমাকে তিব্বতে পাঠাতে পারবোনা। আর সব ক্ষতিই সইবে, কিন্তু মাকে হারানো আমার সইবে না।

মায়ের দুই চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল, বলিলেন, ভয় নেইরে, কৈলাসের পথে মরণ হবে তেমন পুণি তোর মায়ের নেই। আমি আবার ফিরে আসবো। কিন্তু ছেলের মধ্যে তুই তো আমার সঙ্গে যেতে পারবিনে বিপিন, তোর পরেই এত বড় সংসারের সব ভার। আর পিছনে যে-ছেলে দাঁড়িয়ে আছে তাকে নিয়ে আমি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজি নই। বামুনের ছেলে হয়ে সন্ধ্যে-আহ্নিক তো অনেকদিনই ছেড়েচে শুনতে পাই কলকাতায় খাদ্যাখাদ্যেরও নাকি বিচার করে না। এর উপর কাল কি করেছে শুনেছিস্‌?

বিপ্রদাস ভাল মানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, কি আবার করলে? কই, শুনিনিতো কিছু।

মা বলিলেন, নিশ্চয় শুনেছিস্‌। তোর চক্ষুকে ফাঁকি দেবে এত বুদ্ধি ও-ছোঁড়ার ঘটে নেই কিন্তু এর একটা প্রতিকার কর। ও আমারই খাবে পরবে, আর আমারই টাকায় কলকাতা থেকে লোক এনে আমার প্রজা বিগড়োবার ফন্দি আঁটবে? ওর কলকাতার খরচা তুই বন্ধ কর।

বিপ্রদাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সে কি কথা মা, পড়ার খরচ বন্ধ করে দেবো? ও পড়বে না?

মা বলিলেন দরকার কি। আমার শ্বশুরের ইস্কুলের ছাত্ররা যখন দল বেঁধে এসে বল্‌লে বিদেশী লেখাপড়ায় দেশের সর্ব্বনাশ হল, তখন তাদের তুই তেড়ে মারতে গেলি। আর তোর নিজের ছোটভাই যখন ঠিক ঐ কথাই বলে বেড়ায় তার কি কোন প্রতিবিধান করবিনে? এ তোর কেমন বিবেচনা?

বিপ্রদাস হাসি মুখে কহিল, তার কারণ আছে মা। ইস্কুলের ক্লাসে প্রমোশন না পেয়ে ও নালিশ করলে আমার সয় না, কিন্তু দ্বিজুর মত এম-এ পাশ করে বিলিতি শিক্ষাকে যত খুসী গাল দিয়ে বেড়াক আমার গায়ে লাগে না।

মা বলিলেন, কিন্তু এটা? আমার টাকায় আমার প্রজা ক্ষ্যাপানো?

দ্বিজদাস এতক্ষণ নিঃশব্দে ছিল, একটা কথারও জবাব দেয় নাই। এবার উত্তর দিল, কহিল কালকের সভা সমিতির জন্যে তোমাদের ষ্টেটের একটা পয়সাও আমি অপব্যয় করিনি।

মা ঘরে ঢুকিয়া পর্য্যন্ত একবারও পিছনে তাকান নাই, এখনও চাহিলেন না। বিপ্রদাসকেই প্র করিলেন, তা'হলে হতভাগাকে জিজ্ঞেস করতো টাকা পেলে কোথায়? রোজগার করচে?

ঠিক এমনি সময়ে পর্দ্দার বাহিরে টুং টাং করিয়া একটুখানি চুড়ির শব্দ হইল। বিপ্রদাস কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, ঐ তো তার জবাব মা! তোমার নিজের ঘরের বৌ যদি টাকা যোগায় কে আটকাবে বল দিকি?

মায়ের মনে পড়িল। কহিলেন, ও তাই বটে! সতীর কাজ এই! বড়-মানুষের মেয়ে বাপের জমিদারী থেকে বছরে যে ছ' হাজার টাকা পায় সে আমার খেয়াল ছিল না। তিনিই গুণধর দেওরকে টাকা যোগাচ্চেন! একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিলেন, তোর সম্বন্ধ করতে বেয়াই মশাই নিজে যখন এলেন তখনি কর্ত্তাকে আমি বলেছিলাম রায়বাড়ীর মেয়ে ঘরে এনে কাজ নেই। ওদের বংশেরি ত অনাথ রায় বিলাত গিয়ে মেম বিয়ে করেছিল। ওরা পারে না কি? ওদের অসাধ্য সংসারে কি আছে?

বিপ্রদাস তেমনি হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। সে জানিত সতীর অদৃষ্টে এ খোঁটা আর যাবার নয়। তাহার বাপের বাড়ীর সম্পর্কে কে এক অনাথ রায় মেম বিবাহ করিয়াছিল এ কথা মা আর ভুলিতে পারিলেন না।

সকলেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি পুনশ্চ বলিলেন, আচ্ছা থাক্। বাবা কৈলাসনাথ এবার টেনেছেন, তাঁকে দর্শন করে ফিরে আসি, তারপরে এর বিহিত করব। এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিপ্রদাস কহিলেন, কিরে দ্বিজু, মাকে নিয়ে পারবি যেতে? উনি ঝোঁক যখন ধরেছেন তখন থামানো যাবে বলে ভরসা হয় না।

দ্বিজদাস তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিয়া কহিল, আপনি তো জানেন ঠাকুর দেবতায় আমার বিশ্বাস নাই। তা ছাড়া আমার সঙ্গে উনি বৈকুণ্ঠে যেতেও নারাজ, এ তো তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনলেন।—

বিপ্রদাস বিরক্ত হইয়া কহিলেন, হাঁ রে পণ্ডিত, শুনলাম। তুই যেতে পারবি কিনা তাই বল্।

আমার এখন মরবার ফুরসুৎ নেই। এই বলিয়া দ্বিজদাস অন্য প্রশ্নের পূর্ব্বেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিপ্রদাস নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই বটে। এমনি দেশের কাজ যে মাকেও মানা চলেনা। এইখানে মায়ের একটুখানি পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিপ্রদাসের ইনি বিমাতা। তাহার জননীর মৃত্যুর বৎসর কাল পরেই যজ্ঞেশ্বর দয়াময়াকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন, এবং সেইদিন হইতে ইহার হাতেই সে মানুষ। ইনি যে জননী নহেন এ সম্বাদ বিপ্রদাস যথেষ্ট বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত জানিতেও পারে নাই।

৩

এ বাড়ীতে দ্বিজদাস সব চেয়ে বেশি খাতির করিত বৌদিদিকে। তাহার সর্ব্ববিধ বাজে খরচের টাকাও আসিত তাঁহারই বাক্স হইতে। সতী শুধু সম্পর্ক হিসাবেই তাহার বড় ছিল না, বয়সের হিসাবেও মাস কয়েকের বড় ছিল। তাই অধিকাংশ সময়েই তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিত। এই লইয়া ছেলেবেলায় দ্বিজু মায়ের কাছে কত যে নালিশ জানাইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

মাত্র এগারো বছর বয়সে সতী বধূরূপে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাহার আদরের

সীমা ছিল না। শাশুড়ী হাসিয়া বলিতেন, সত্যি নাকি? কিন্তু এ তো তোমার বড় অন্যায় বৌমা, দেওরের নাম ধরে ডাকা। সতী বলিত, অন্যায় কেন, আমি যে ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

অনেক ড় কত বড় মা?

আমি জন্মেছি বোশেখ মাসে ও জন্মেছে ভাদ্র মাসে।

মা সহাস্যে কহিতেন, ভাদ্র মাসেই তো বটে মা, আমারই মনে ছিল না। এর পরেও আর যদি কখনো ও নালিশ করতে আসে তে লে দেবো।

আদালতে হারিয়া দ্বিজু রাগ করিয়া চলিয়া গেলে বধূকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া শাশুড়ী সস্নেহে বলিতেন, ও ছেলেমানুষ কিনা তাই বোঝে না। ঠাকুরপো বললে ভারি খুসি হয়। মাঝে মাঝে ডেকো, কেমন মা?

সতী রাজী হইয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিয়াছিল, আচ্ছা মা, মাঝে মাঝে তাই বলে ডাকবো।

সেদিন সে ছিল বালিকা, আজ সে এত বড় বাড়ীর গৃহিণী। বিধবা হওয়ার পরে হইতে শাশুড়ী তো থাকেন নিজের জপ তপ এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া তথাপি তাঁহার সেদিনের সেই উপদেশটুকু পরবর্ত্তী কালে সতীর অনেক দিন অনেক কাজে লাগিয়াছে। যেমন আজ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরে প্রায় পোনর ষোল দিন অতীত হইয়াছে, সকাল বেলা সতী দেবরের পড়িবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে ডাকিল, ভাই ঠাকুর পো—

দ্বিজদাস হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক্ বৌদি, আর খোসামোদের আবশ্যক নেই, আমি কোরব।

শুনি

তুমি যা' হুকুম করবে তাই। কিন্তু দাদার এ ভারী অন্যায়।

অন্যায়টা কিসে হ'ল বলো ত?

দ্বিজদাস তেমনি রাগ করিয়াই কহিল, আমি জানি। এই মাত্র দাদার ঘরের সুমুখ দিয়ে এসেছি। ভেতরে তিনি, মা এবং তোমার ষড়যন্ত্র যা' হচ্ছিল আমার কানে গেছে। তাঁদের সাহস নেই আমাকে বলেন, তাই তোমাকে ধরেছেন কাজ আদাযের জন্যে। কত বড় অন্যায় বলো ত।

সতী হাসিমুখে কহিল, অন্যায় তো নয় ঠাকুর পো। তাঁরা বেশ জানেন যে তাঁরা বলা মাত্রই জবাব আসবে আমার মরবার ফু রসৎ নেই—কিন্তু বৌদিদি হুকুম করলে দ্বিজুর সাধ্য নাই যে না বলে।

দ্বিজদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, এইখানেই হয়েছে আমার মুস্কিল, আর এইখানেই পেয়েছেন ওঁরা জোর। কিন্তু কি করতে হবে?

সতী বলিল, মা কৈলাশ দর্শনে যাবেনই, আর তোমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে।

দ্বিজদাস কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দুতিন মাসের কমে হবে না। কাজের কত ক্ষতি হবে ভেবে দেখেচো বৌদি।

সতী স্বীকার করিয়া বলিল, ক্ষতি কিছু হবেই। কিন্তু একটা নতুন যায়গাও দেখা হবে। নিজের তরফ থেকে একে নিছক লোকসান বলা চলে না। লক্ষ্মী ভাইটি, পরে যেন আর আপত্তি কোরো না।

দ্বিজদাস কহিল, তুমি যখন আদেশ করেছ তখন আপত্তি আর কোরবনা,—সঙ্গে যাবো। কিন্তু মা অনায়াসে সেদিন দাদাকে বলেছিলেন আমার কলকাতার পড়ার খরচ বন্ধ করে দিতে।

সতী সহাস্যে বলিল, ওটা .গের কথা ভাই। কিন্তু হুকুম যিনি দিলেন তিনি মা ছাড়া আর কেউ নয়। একথাটাও তোমার ভুললে চলবে না।

দ্বিজদাস উত্তর দিল, ভুলিনি বৌদি। কিন্তু সেদিন থেকে আমিও কি স্থির করেচি জানো? আমি একলা মানুষ, বিয়ে করবার আমার কখনো সময়ও হবে না, সুযোগও ঘট্‌বে না। সুতরাং, খরচ সামান্য। আবশ্যক হলে বরঞ্চ ছেলে পড়িয়ে খাবো, কিন্তু এঁদের এষ্টেট থেকে একটা পয়সাও কোনদিন চাইব না।

সতী পুনরায় হাসিয়া কহিল, চাইবার দরকার হবেনা ঠাকুরপো, আপনি এসে হাজির হবে। আর তাও যদি না আসে তোমার ছেলে পড়াবার প্রয়োজন হবে না। অন্ততঃ, আমি বেঁচে থাক্‌তে তো নয়। সে ভার আমার রইলো।

এ বিশ্বাস দ্বিজুরও মনের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় ছিল, পলকের জন্য তাহার চোখের পাতা ভারি হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ভাবটা তাড়াতাড়ি কাটাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা কবে যাত্রা করবেন স্থির করেছেন? যবেই করুন শেষকালে আমাকেই সঙ্গে যেতে হ'ল! অথচ, মা সেদিন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে আমার মত স্লেচ্ছাচারীকে নিয়ে তিনি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজি ন'ন। একেই বলে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, না বৌদি?

সতী এ অনুযোগের জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিজু বলিল, সে যাই হোক, তোমার আদেশ অমান্য করবনা বৌদি,—তাঁদের নিশ্চিন্ত থাক্‌তে বোলো।

সতী হাসিল, কহিল, আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্তই আছেন। ঘর থেকে বার হওয়া মাত্র তোমার দাদার কথা কানে গেল, তিনি জোর গলায় মাকে বল্‌ছিলেন—এবার নির্ভয়ে যাত্রার আয়োজন করগে, মা যাঁকে দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করা গেল তাঁর সুমুখে ভায়ার তর্ক চল্‌বে না। ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করবে তুমি দেখে নিয়ো।

শুনিয়া দ্বিজদাস ক্রোধে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, অস্বীকার করতে পারবোনা জেনেই যদি তাঁরা এ ফন্দি এঁটে থাকেন যে মেয়েদের এই অর্থহীন খেয়াল চরিতার্থ করার বাহন আমাকেই হতে হবে, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তুমি দাদাকে এই কথাটা বোলো বৌদি, যে তাঁদের লজ্জা হওয়া উচিত।

সতী কহিল, বলে লাভ নেই ঠাকুরপো, জমিদার হয়ে যারা প্রজার রক্ত শুষে খায় এই তাদের নীতি। নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য এদের কোন লজ্জাবোধ নেই। সম্পত্তির অর্দ্ধেক মালিক হয়েও যখন তুমি

এদের এষ্টেট থেকে টাকা নিতে সঙ্কোচ বোধ কর, তখন একদিকে আমি যেমন দুঃখ পাই, তেমনি আর একদিকে মন খুশীতে ভরে ওঠে। তোমার নাম করে আমি মাকে আশ্বাস দিয়েছি যে তাঁর যাওয়ার বিঘ্ন হবে না, সঙ্গে তুমি যাবে। তীর্থ থেকে ভালয় ভালয় ফিরে এসো ঠাকুরপো,—যত লোকসানই তোমার হোক্ আমি সবটুকু তার পূর্ণ করে দেবো।

দ্বিজদাস নিঃশব্দে চৌকি হইতে উঠিয়া বৌদির পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ফিরিয়া গিয়া বসিল।

সতী বলিল, এতক্ষণ পরের উমেদারি করেই তো সময় কাট্‌লো, এখন নিজের অনুরোধ একটা আছে।

দ্বিজদাস হাসিয়া কহিল, তোমার নিজের ? ঐটি কিন্তু পারবো না বৌদি।

সতী নিজেও হাসিল, বলিল, আশ্চর্য্য নয় ঠাকুরপো। ভয় হয় পাছে শুনে না ব'লে বোসো।

বেশ তো, বলেই দেখো না।

সতী কহিল, আমার এক ম্লেচ্ছ খুড়ো আছেন,—আপনার নয়, বাবার খুড়ত'ত ভাই,—তিনি বিলাত গিয়েছিলেন। তখন এ খবরটা এঁদের কানে এসে পৌঁছলে এ বাড়ীতে আমার ঢোকাই ঘটত না। মার মুখে এ কথা শুনেছো বোধ হয় ?

বহুবার। এমন কি গড়পড়তা দিনে একবার ক'রে হিসেব করে নিলে ঐ পোনর ষোল বছরে অন্ততঃ সংখ্যায় হাজার পাঁচ ছয় হবে।

সতী হাসিয়া কহিল, আমারও আন্দাজ তাই। কাকা থাকেন বোম্বাইয়ে। তাঁর একটি মেয়ে ঐখানেই লেখাপড়া করে। আসচে বছরে সে বিলেত যাবে পড়া শেষ করতে। তোমাকে গিয়ে তাকে আন্‌তে হবে।

কোথায় ? বোম্বাই থেকে ?

হাঁ। সে লিখেচে সে একলাই আস্‌তে পারে, কিন্তু এতটা দূর একাকী আস্‌তে বল্‌তে আমার সাহস হয় না।

তাঁকে পৌঁছে দেবার কেউ নেই ?

না, কাকা ছুটি পাবেন না।

দ্বিজদাস হঠাৎ রাজি হইতে পারিল না, ভাবিতে লাগিল। সতী বলিতে লাগিল, আমার বিয়ে যখন হয় তখন সে সাত আট বছরের বালিকা। তার পরে একটিবার মাত্র দেখা হয় কলকাতায়, তখন সে সবে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে আই-এ পড়তে সুরু করেছে,—সেও তো কত বছর হয়ে গেল। তাকে আমি ভারি ভালোবাসি ঠাকুরপো, যদি কষ্ট ক'রে গিয়ে একবার এনে দাও। আনবার জন্যে সে আমাকে প্রায় চিঠি লেখে, কিন্তু সুযোগ আর হয় না।

দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এখনই বা সুযোগ হ'ল কিসে ? মা কি রাজি হয়েছেন ?

সতী এ প্রশ্নের সহসা উত্তর দিতে পারিল না। এবং পারিল না বলিয়াই একটি সত্যকার ব্যাকুলতা তাহার মুখে প্রকাশ পাইল। একটুখানি থামিয়া কহিল, মাকে বলেছি। এখনো ঠিক মত দেননি বটে, কিন্তু নিজের তীর্থ-যাত্রা নিয়ে এমনি মেতে আছেন যে আশা হয় আপত্তি করবেন না। তা

ছাড়া নিজে যখন বাড়ীতে থাকবেন না তখন এই দু'তিন মাস সে অনায়াসে আমার কাছে থাক্‌তে পারবে।

দ্বিজদাস মনে মনে বুঝিল, শাশুড়ির হুকুম না পাইলেও এই সুযোগে সে প্রবাসী বোন্‌টিকে একবার কাছে আনাইতে চায়। প্রশ্ন করিল, তোমার কাকারা কি ব্রাহ্ম-সমাজের ?

সতী বলিল, না। কিন্তু হিন্দু-সমাজও তাদের আপনার বলে নেয় না। ওরা ঠিক যে কোথায় আছে নিজেরাও বোধ করি জানে না। এম্‌নি ভাবেই দিন কেটে যাচ্চে।

এ অবস্থা অনেকেরই। দ্বিজু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, যেতে আমার আপত্তি নেই বৌদি, কিন্তু আমি বলি মা থাক্‌তে তাঁকে তুমি এখানে এনোনা। মাকে তো জানই, হয়ত খাওয়া-ছোঁয়া নিয়ে এমন কাণ্ড করবেন যে বোন্‌কে নিয়ে তোমার লজ্জার সীমা থাক্‌বেনা। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা চলে গেলে তাঁকে আনার ব্যবস্থা কোরো—সব দিকেই ভালো হবে।

ইহা যে সুপরামর্শ তাহা সতী নিজেও জানিত, কিন্তু সে যখন নিজে চিঠি লিখিয়া আসিবার প্রার্থনা জানাইয়াছে, তখন কি করিয়া যে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় নিষেধ করিয়া চিঠির উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ইহার লজ্জা এবং দুঃখই কি কম ? কহিল, নিজের বোন বলে বলচিনে ঠাকুরপো, কিন্তু সেবার মাসখানেক তাকে কলকাতায় অত্যন্ত নিকটে পেয়ে নিশ্চয় বুঝেচি যে রূপে গুণে তেমন মেয়ে সংসারে দুর্লভ। বাইরে থেকে তাদের আচার-ব্যবহার যেমনই দেখাক, মা যদি তাকে দুটো দিনও কাছে-কাছে দেখ্‌তে পান্‌ তো, ম্লেচ্ছ মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদ্‌লে যাবে। কখনো তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারবেন না।

দ্বিজদাস বলিল, কিন্তু এই দুটো দিনই যে মাকে দেখানো শক্ত বৌদি। তিনি দেখ্‌তেই চাইবেন না।

ইহাও সত্য।

সতী কহিল, কিন্তু তার রূপটাও ত চোখে পড়বে ? চোখ বুজে তো মা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না ? সেও তো একটা পরিচয়।

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। সতী কহিল, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস বন্দনাকে পৃথিবীতে কেউ অবহেলা করতে পারেনা। মাও না।

দ্বিজদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা ? নামটা যে শুনেচি মনে হয় বৌদি। কোথায় যেন দেখেছি,—আচ্ছা দাঁড়াও,—খবরের কাগজে কি—একটা ছবিও যেন—

কথাটা শেষ হইল না, ঝি সশব্দে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বৌমা তুমি এখানে ? তোমার কে এক কাকা তাঁর মেয়ে নিয়ে বোম্বাই থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে। বাইরে কেউ নেই, বড়বাবুও না। সরকার মশাই তাঁদের নীচের ঘরে বসিয়েছেন।

ঘটনাটা অভাবনীয়। অ্যাঁ—বলিস্‌ কিরে ? বলিতে বলিতে সতী ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পিছনে গেল দ্বিজদাস।

৪

নিখুঁত সাহেবি-পরিচ্ছদে ভূষিত একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়াছিলেন, এবং একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে তাঁহারই পাশে দাঁড়াইয়া দেয়ালে টাঙানো মস্ত একখানি জগদ্ধাত্রী দেবীর ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহারও পরণে যাহা ছিল তাহা নিছক মেম-সাহেবের মত না হোক, বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়াও হঠাৎ মনে হয়না। বিশেষতঃ গায়ের রঙটা যেন শাদার ধার ঘেঁসিয়া আছে,—এমনি ফর্সা। দেহের গঠন ও মুখের শ্রী অনিন্দ্যসুন্দর। দেবরের কাছে সতী এইমাত্র যে গর্ব্ব করিয়া বলিতেছিল তার রূপটা তো শাশুড়ীর চোখে পড়িবে,—চোখ বুজিয়া তো এটা তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না, বস্তুতঃ, এ কথা সত্য। ভগিনীর হইয়া এ রূপ লইয়া অহঙ্কার করা চলে।

ঘরে ঢুকিয়া সতী গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, সেজকাকা, মেয়ের বাড়ীতে এতকাল পরে পায়ের ধূলো পড়লো?

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সতীর মাথায় হাত দিলেন, সহাস্যে কহিলেন, হাঁ রে বুড়ি পড়লো! কবে, কোন্ কালে কাকাকে নেমন্তন্ন ক'রে খবর পাঠিয়েছিলি যে অস্বীকার করেছিলাম? কখনো বলেচিস্ আসতে? নিজে যখন যেচে এলাম তখন মস্ত ভণিতা কোরে বলা হ'চ্চে পায়ের ধূলো পড়লো? দ্বিজদাসের প্রতি চোখ পড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কে?

সতী পিছনে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, উটি আমার দেওর—দ্বিজু।

দ্বিজদাস দূর হইতে নমস্কার করিল। বন্দনা দিদিকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, ওঃ—ইনিই সেই? যাঁর জ্বালায় জমিদারী বুঝি যায়-যায়। আমাকে চিঠিতে লিখেছিলে? বংশ ছাড়া গোত্র ছাড়া ভয়ঙ্কর স্বদেশী?

অমন কথা তোকে আবার কবে লিখলুম?

এই তো সেদিন। এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

সতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না ওসব লিখিনি, তোর মনে নেই।

দ্বিজদাস এতক্ষণ পর্য্যন্ত কি এক প্রকার সঙ্কোচের বশে যেন আড়ষ্ট হইয়া ছিল। অনাত্মীয়, অপরিচিত যুবতী স্ত্রীলোকের সম্মুখে কি করা উচিত, কি বলিলে ভালো দেখায় কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। ইতিপূর্ব্বে কখনো সুযোগও ঘটে নাই, প্রয়োজনও হয় নাই,—কিন্তু এই নবাগত তরুণীর আশ্চর্য্য স্বচ্ছন্দতায় সে যেন একটা নূতন শিক্ষা লাভ করিল। তাহার অহেতুক ও অশোভন জড়তা এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গিয়া সে এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করিল। মেয়েদেরও যে শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রয়োজন এ কথা সে বুদ্ধি দিয়া চিরদিনই স্বীকার করিত এবং, মা ও দাদার সহিত তর্ক বাধিলে সে এই যুক্তিই দিত যে স্ত্রীলোক হইলেও তাহারা মানুষ, সুতরাং শিক্ষা ও স্বাধীনতায় তাহাদের দাবী আছে। মূর্খ করিয়া তাহাদের ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা অন্যায়। কিন্তু আজ এই অতিথি মেয়েটির আকস্মিক পরিচয়ে সে চক্ষের পলকে প্রথম উপলব্ধি করিল যে ঐ-সব

মামুলী দাবী-দাওয়ার যুক্তির চেয়েও ঢের বড় কথা এই যে পুরুষের চরম ও পরম প্রয়োজনেই রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রয়োজন। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া পুরুষে কতখানি যে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে এ সত্য এত বড় স্পষ্ট করিয়া ইতিপূর্ব্বে সে কখনো দেখে নাই। মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া হাসিমুখে কহিল, আপনার কথাই ঠিক, বৌদি ভুলে গেছেন। কিন্তু এ নিয়ে বাদানুবাদ করে লাভ নেই। এবং বলিয়াই সে ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, বৌদি, তোমার জোরেই আমার সমস্ত জোর, আর তোমার চিঠিতেই এই কথা? বেশ, আমাকে তোমরা ত্যাগ করো আর আমিও আমার সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ করচি। তোমাদের জমিদারী অক্ষয় হয়ে থাক্, তুমি একটিবার মুখ ফুটে আদেশ করো আমি আজই উকিল ডেকে সমস্ত লেখা-পড়া করে দিচ্চি। ইনি সাক্ষী থাকুন, দেখো আমি পারি কিনা।

সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, তোর দেওর ভয়ঙ্কর স্বদেশী নাকি সতি?

সতী বলিল, হাঁ, ভয়ঙ্কর।

তুই বল্‌লেই লেখা-পড়া করে জমিদারীর অংশ ছেড়ে দিতে চায়?

সতী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, ও স্বচ্ছন্দে পারে। ওর অসাধ্য কাজ নেই।

বন্দনা কৌতূহল দমন করিতে পারিল না জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি বল্‌চেন? চিরকালের জন্য বাস্তবিক সমস্ত ত্যাগ করতে পারেন?

দ্বিজদাস তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, সত্যিই পারি। ওতে আমার একতিল লোভ নেই। দেশের পোনর আনা লোক একবেলা পেট ভরে খেতে পায়না,—উদয়াস্ত পরিশ্রম করেওনা—আর বিনা পরিশ্রমে আমার বরাদ্দ পোলাও-কালিয়া,—ও পাপের অন্ন আমার মুখে রোচেনা, গলায় আটকাতে চায়। ও বিষয় আমার গেলেই ভালো। তখন দেশের পাঁচজনের মত খেটে খেয়ে বাঁচি। জোটে মঙ্গল, না জোটে তাদের সঙ্গে উপোস করে মরতে পার্‌লে বরঞ্চ একদিন হয়ত স্বর্গে যেতেও পারবো কিন্তু এ পথে কোন কালে সে আশা নেই।

বন্দনা নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া শুনিতেছিল, কথা শেষ হইলে আর কোন কথা কহিল না,—শুধু মুখ দিয়া তাহার একটা নিশ্বাস পড়িল।

সতীর হঠাৎ যেন চমক ভাঙিল। ঠাকুরপোর এ ছাড়া যেন আর কথা নেই। কহিল, বক্তৃতা পরে দিয়ো ঠাকুরপো, ঢের সময় পাবে। সেজকাকাবাবুর হয়ত এখনো হাত-মুখ ধোয়াও সারা হয়নি। বন্দনা চল্ ভাই, ওপরে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়্‌বি।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, জামাই বাবাজীকে দেখ্‌চিনে?

সতী কহিল, তিনি সকালেই কি একটা জরুরি কাজে বেরিয়েছেন ফিরতে বোধকরি দেরি হবে।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি, তোমার শাশুড়ীকে তো দেখ্‌তে পেলুম না? বাড়ীতেই আছেন?

সতী কহিল, এখনো আছেন, কিন্তু শীঘ্রই কৈলাস-মানস সরোবরে তীর্থ-যাত্রা করবেন। সমস্ত সকালটা পুজো-আহ্নিক নিয়েই থাকেন, আর একটু বেলা হলেই তাঁকে দেখ্‌তে পাবে।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, তিনি খুব বেশি ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়েই থাকেন, না?

সতী বলিল হাঁ।

বিধবা হ'বার পরে শুনেচি ঘর-সংসার কিছুই দেখেন না,—সত্যি?

সত্যি বই কি। সব আমাকেই দেখ্‌তে-শুন্‌তে হয়।

বন্দনা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি তোমার সৎ-শাশুড়ী, না দিদি?

সতী হাসিয়া কহিল, চোখে তো দেখিনি বোন্, লোকে হয়ত মিথ্যে কথা বলে।

দ্বিজদাস উত্তর দিয়া বলিল, মিথ্যেই বলে। কারণ, সৎ-শাশুড়ী মানে বড়দার সৎ-মা তো? মিছে কথা। সৎ-মা বটে, কিন্তু দাদার নয়, আমার। সে যাক্, স্নানাদি সেরে নিয়ে সে আলোচনা পরে হবে,—এখন ওপরে চলুন। আচ্ছা, আমি দেখিগে,—বৌদি, আর দেরি কোরোনা এঁদের নিয়ে এসো। এই বলিয়া সে আয়োজনের তত্ত্বাবধান করিতে চলিয়া যাইতেছিল এম্‌নি সময়ে মাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

খুব সম্ভব দয়াময়ী খবর পাইয়া আহ্নিকের মাঝখানেই পূজার ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। বয়স বেশী নয় বলিয়া তিনি বৈধব্যের পরেও সচরাচর অনাত্মীয় পুরুষদের সম্মুখে বাহির হইতেন না, অন্তরালে থাকিয়াই কথা কহিতেন, কিন্তু আজ একেবারে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাথার কাপড় কপালের উপর পর্য্যন্ত টানিয়া দেওয়া,—কিন্তু মুখের সবখানিই দেখা যাইতেছে।

আমার সেজকাকাবাবু মা। আর এইটি আমার বোন্ বন্দনা। এই বলিয়া সতী কাছে আসিয়া হঠাৎ শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। এমন অকারণে প্রণাম করা প্রথাও নয়, কেহ করেও না। দয়াময়ী মনে মনে হয়ত একটু আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু সে উঠিয়া দাঁড়াইতে সস্নেহে সযত্নে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু বন্দনার প্রতি চোখ পড়িতেই তাঁহার চোখের দৃষ্টি রুক্ষ হইয়া উঠিল। দিদির দেখাদেখি সেও কাছে আসিয়া প্রণাম করিল, কিন্তু তিনি স্পর্শ করিলেন না, বরঞ্চ বোধ হয় স্পর্শ বাঁচাইতেই এক পা পিছাইয়া গিয়া শুধু অস্ফুটে কহিলেন, বেঁচে থাকো।

কহিলেন, বেই মশাই নমস্কার। ছেলে-মেয়ের ভাগ্য যে হঠাৎ আপনার পায়ের ধূলো পড়লো।

ভদ্রলোক প্রতি-নমস্কার করিয়া কহিলেন, নানা কারণে সময় পাইনে বেন্-ঠাকরুণ, কিন্তু না বলে-কয়ে এমন হঠাৎ এসে পড়ার দোষ মার্জ্জনা করবেন। এবারে যখন আস্‌বো যথাসময়ে একটা খবর দিয়েই আস্‌বো।

দয়াময়ী এসব কথার উত্তর দিলেন না, শুধু বলিলেন, পূজো-আহ্নিক এখনো সারা হয়নি বেই মশাই,—আবার দেখা হবে। বৌমা, এঁদের উপরে নিয়ে যাও,—খাওয়া-দাওয়ার যেন কষ্ট না হয়। বিপিন এলে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিয়ো। এই বলিয়া তিনি আর কোন দিকে না চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাহ্যতঃ, প্রচলিত সৌজন্যের বিশেষ কিছু যে ত্রুটি হইল তাহা নয়, কিন্তু ভিতরের দিক্ দিয়া সকলেরই মনে হইল জ্যোৎস্নার মাঝামাঝি যেন একখণ্ড কালোমেঘ নির্ম্মল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাসিয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

তুমি আছো, তাই—

শ্রীমতী নীলিমা দাস

আকাশের মতো অফুরান্ প্রাণ নহে নহে, প্রিয়, মোর ;
বিশ্বমানবের লাগি' বহে না ক' আঁখি-কোণে এক কণা আঁখি-লোর !
এতটুকু হৃদয়ে আমার ধরে নাই ধরণীর এত প্রেম,—এত ভালোবাসা,
তা বলে' কি মিছে হয়ে গেছে মোর এবারের লাগি' এই পৃথিবীতে আসা ?

আমি যে বেসেছি ভালো একান্তে তোমারে শুধু,—সে কি তবে মিথ্যা অভিনয় ?
আমার ধ্যানের মন্ত্রে তব নাম নিয়ত ধ্বনিছে,—সে কি কিছু নয় ?
ভাবিতে পারিনি আমি তোমার বাহিরে কভু এ বিপুল পৃথিবীরে, প্রিয় !
তোমারে ঘেরিয়া হেরি নৃত্য করে এ ধরণী, তাই তো সে এত রমণীয় !
তুমি নাহি যে-নিখিলে, সে-নিখিল লুপ্ত মোর কাছে ;
তুমি যেথা আছো, প্রিয়, সেথা আমি আছি তব পাছে।
আমার অন্তরাকাশে জ্বলে শুধু একা-শুকতারা,—সে যে তুমি, তুমি !
এ মাটীরে লাগে ভালো তাই, যে-মাটী রহিলো তব পদতল চুমি' !

তুমি আছো, তাই আছে আমার ভুবন-ভরা এত অজস্রতা,—
তৃণে-তৃণে পত্রপুষ্পে শিশিরের মুক্তাফলদল, নূতন নীপের ব্যাকুলতা ;
সন্ধ্যার গুণ্ঠিত ছায়া তাই মায়া আঁকে মোর মনে,
বকুলবনের ব্যথা বক্ষতল ব্যাকুলিয়া তোলে ক্ষণে ক্ষণে ;
পাণ্ডু দেবদারুবনে দৃষ্টি মোর পলকে হারায় !
ঘনবন বেতসের নিভৃত ছায়ায়,—
রৌদ্রদগ্ধ ক্লান্ত নভতলে
মন মোর ফিরে কুতূহলে !

বিধুর বাসন্তী-রাতে ক্লান্ত আঁখি ঢুলে' আসে তন্দ্রায় যখন,—
কেতকী-পরাগরেণু ভালে মোর ভালোবেসে আনি' দেয় দক্ষিণ পবন!
তুমি ভালোবাসো মোরে, অকৃপণ তাই এ প্রকৃতি,—
আঁখির সীমায় মোর মহাকাশ গুটায়েছে আজি তার বিরাট্ বিস্তৃতি!
কেহ আর দূর নহে; আমার আঙিনা-কোণে ঠাঁই নিল সসাগরা ধরা;
সকলে এনেছে বহি' অর্ঘ্যের পসরা!

আমার বেদনা, সে-ও তোমারি পরম দান, প্রিয়!
তোমার বিরহ বহি' সে-বেদনা হলো সোনা, দুঃখ হলো আত্মার আত্মীয়!
বেদনায় এত মধু, সে কি, বঁধু, আগে জানিতাম!
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে' আসে, নয়নে পরাণ বহে, তবু কণ্ঠে জেগে থাকে নাম!
যত স্মরি, আঁখি ভরি' পুলকের অশ্রু উথলায়,
আনন্দের হাহাকারে ভরে চিত্ত কাণায় কাণায়!

তুমি আছো, তাই আছি; প্রিয় হ'তে প্রিয়তম!—হে পরাণ-স্বামী
তোমারি লাগিয়া নিত্য শতলক্ষ ভূমণ্ডল ভ্রূক্ষেপে ভাঙিয়া গড়ি আমি!

নীলিমা দাস

সিকাগোর বিশ্ব প্রদর্শনী

শ্রীঅজিত ঘোষ

গত বৎসর জানুয়ারি মাসে যখন Art Institute of Chicago দর্শনে গিয়াছিলাম, তখন তথাকার Assistant Director মহাশয় অনতিদূরে কতকগুলি অর্দ্ধ-নির্ম্মিত অট্টালিকা দেখাইয়া বলেন যে উহাই ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের

সম্ভবত এই বৎসরের জুন মাসের প্রথমেই যুক্ত রাষ্ট্রের সভাপতি কর্তৃক বর্ত্তমান যুগের এই বৃহত্তম প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে ; এবং সর্ব্বসাধারণের দর্শনের নিমিত্ত নভেম্বর অবধি ইহা উন্মুক্ত থাকিবে।
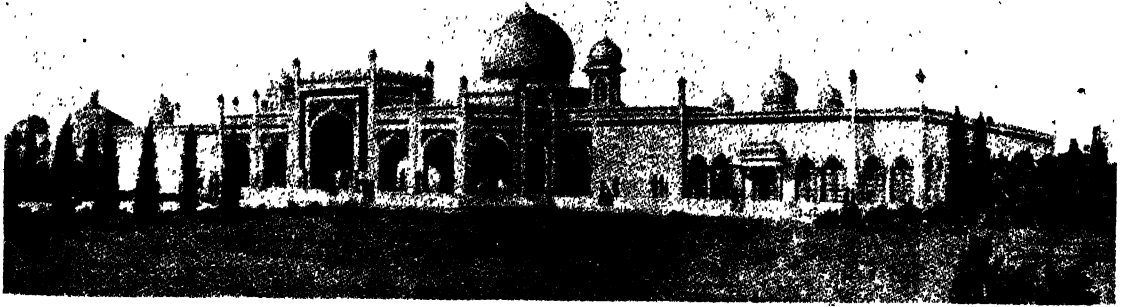
ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়ন—শতবর্ষের প্রগতি—১৯৩৩ সালের সিকাগো ইণ্টারন্যাশনাল এক্সপোজিশন

Country of Progress International Exposition নামক বিরাট প্রদর্শনীর ভিত্তি। এই ভিত্তি হইতে যে জগত-বিখ্যাত প্রদর্শনীর সৃষ্টি হইবে তাহা দেখিবার বাসনা আমার মনে তখন হইতেই উদিত হয়। আশা করি ভবিষ্যতে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকাদিগের নিকট ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে সমর্থ হইব

১৮৩৩ খৃঃ হইতে ১৯৩৩ খৃঃ অবধি গত একশত বৎসরে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সহিত শিল্পকলার যে আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাই এই বিরাট প্রদর্শনীক্ষেত্রে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইবে।

পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই এই বৃহৎ প্রদর্শনীতে সহযোগিতা করিতেছেন। এই প্রদর্শনীতে যে বিপুল অর্থ

ব্যয় হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ অনুমান ইহা হইতেই করা যাইতে পারে, যে জাপান একাই তাহার শিল্প প্রচারের জন্য ৮৫০,০০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় চৌত্রিস লক্ষ টাকা এই প্রদর্শনীতে ব্যয় করিবেন। ইহার মধ্যে জাপান সরকারই দুই লক্ষ ডলার, অর্থাৎ প্রায় আট লক্ষ টাকা দান করিবেন, এবং অবশিষ্ট অর্থ লৌহ, রেশম, চা প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক ব্যয়িত হইবে।

চীন এবং ভারতও এই একজিবিশনে যোগদান করিতেছেন। ভারতীয় বিভাগের নিমিত্ত একটি সম্পূর্ণ পৃথক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হইতেছে। বরোদা, মহিসুর ও ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ স্বদেশী শিল্প সামগ্রী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতেছেন। আশা করা যায় আমাদের দেশের শিল্প-বৈভব যাহাতে এই প্রদর্শনীতে যথাযথ ভাবে প্রদর্শিত হইতে পারে ভারত সরকার তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। হয়ত অর্থাভাবে আমাদের বঙ্গদেশীয় দ্রব্য এবং শিল্পকলা এই একজিবিসনে উপযুক্ত স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইবে না; তথাপি এটুকু আশা করা যায় যে, ভারতীয় নৃপতিদিগের সহযোগিতায় পৃথিবীর এই বিরাট প্রদর্শনীক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতও তাহার নিজস্ব শিল্পকলার সৌন্দর্য্য কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিবে। ১৯৩১ সালে প্যারী নগরে International Colonial Exposition নামক যে বৃহৎ প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে বিপুল অর্থ ব্যয়ে এক ভারতীয় বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিভাগ পরিদর্শন করিয়া আমাকে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইতে হইয়াছিল। একটি বাঙালী বালিকা ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতার একমাত্র দোকান ব্যতীত অন্য সকল গুলিই আরমেনিয়ান এবং আরবগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইগুলি ভারতের বাহিরে নির্ম্মিত কারপেট্‌ এবং অত্যন্ত সুলভ মূল্যের নানারূপ নকল অলঙ্কারাদির দ্বারাই পূর্ণ হইয়াছিল। আশা করি এবৎসরের সিকাগো প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগ প্যারী প্রদর্শনীর ন্যায় আমাদিগকে হতাশ করিবে না।

অজিত ঘোষ

মিথ্যার জয়

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম-এ, বি-এল

১

আমাদের দেশের লৌকিক শাস্ত্রে একটা মৌখিক সূত্র আছে—'চুরিবিদ্যে বড় বিদ্যে।' কোন অখ্যাতনামা টীকাকার তাহার উপর কলম চালাইয়া টীপ্পনী কাটিয়াছেন—'যদি না পড়ে ধরা।' অর্থাৎ, কেবল চুরি করিলেই হয় না, তাহার সঙ্গে চাই—ধরা না পড়া। এখন এই ধরা না পড়ার উপায় কি? ইহার একমাত্র সর্ব্ববাদীসম্মত উপায়—মিথ্যা। চুরি করিয়া যদি মিথ্যা না বল ত ডুবিলে। আর যদি মিথ্যার উপর মিথ্যা চাপাইয়া চুরিটাকে ঢাকা দিয়া ফেলিতে পার, তখন সকলে বলিবে—চুরিটাই মিথ্যা, আর সব সত্য। সুতরাং জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার মতই প্রমাণ হইয়া গেল যে চুরি অপেক্ষা মিথ্যাই বড়।

চুরি করিলে মিথ্যা বলা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু চুরি না করিয়াও লোকে কেন যে রাশি রাশি মিথ্যা কথা বলে তাহা ভাবিয়া পাই না।

এই ধরুন না, আমাদের নটবর দত্ত। নটবর—ঐ যে বৌবাজারে বৃন্দাবন দাসের গলির ঠিক মোড়ের বাড়ীটায় থাকে,—ফর্সা, ছিপ্‌ছিপে ছোকরাটি, মুখে সদাই হাসি লাগিয়া আছে। যেমন মিশুক তেমনই 'বক্তার', অচেনা লোকের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের আলাপেই গলাগলি ভাব করিয়া ফেলে—সেই নটবর।

সকালে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত একচোট ঘুরিয়া আসিয়া বৌবাজারের মোড়ে বাস্ হইতে নামিয়া ফুটপাথে উঠিতেই নটবর হয় ত দেখিল, ভৃত্য মধুসূদন বাজার করিয়া বাহির হইতেছে। ঠিক সেই সময়ে যদি কেহ বলে—"কি হে, নটবর যে; কদ্দূর ঘুরে এলে?" নটবর অমনি অবসন্ন তাহার হাত দু'খানি এলাইয়া দিয়া, ভৃত্যকে দেখাইয়া বলিবে—"এই ভাই, ঘুরে ঘুরে বাজার করে এই ফিরছি,—আর [illegible] দাদা, সংসারের জন্যে খেটে খেটে—"

এই কু-অভ্যাসের জন্য তাহাকে চাপিয়া ধরিলে সে বলে—"বোঝ না ভাই, এটা ত আর সত্যযুগ নয়, যে যা' বল্‌বে লোকে বিশ্বাস কর্‌বে। যদি দশটা খাঁটি সত্যি কথা বল, লোকে বলবে, এর মধ্যে একটা কথা সত্যি হ'লেও হ'তে পারে—বাকি সব মিথ্যে। দরকার কি তা'র চাইতে সব মিথ্যে কথাই বল্‌লুম—লোকে তার মধ্যে অন্ততঃ একটাকেও সত্যি ভাববে।

বাহিরের লোকের সঙ্গে যাই করুক, হতভাগা তার স্ত্রীর কাছে পর্য্যন্ত ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা বই সত্য বলে না। বলে—"জান না— চ।"

২

নটবরের বৌ সুষমা মেয়েটি বেশ—সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, মনটি সরল। স্বামীর উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস-এই তিন বৎসর ধরিয়া তাহার মিথ্যা কথাগুলাকে নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ক্রমে সে সেয়ানা হইতেছে। তাই এখন মাঝে মাঝে তাহার নির্ম্মল প্রশান্ত হৃদয়াকাশে সংশয়ের ছোট ছোট মেঘ কোথা হইতে ভাসিয়া আসে।

নটবরের প্রধান দোষ—সে অতিমাত্রায় আড্ডা-বাজ। থিয়েটার, সিনেমা, তাশ-পাশার মজলিশ, গার্ডেন-পার্টি, সঙ্গীতের জল্‌সা—এই সমস্ত লইয়াই সে মাতিয়া থাকে। তাহার মা-বাপ নাই, ছেলেবেলা হইতে পিসিমাই তাহার একমাত্র অভিভাবিকা। এই রকম করিয়াই যে ছেলেরা কুসঙ্গে পড়িয়া অধঃপাতে যায়, পিসিমা তাঁহার শ্বশুরকুলের দৃষ্টান্ত হইতে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছেন। তাই তিনি সুষমাকে ঘরে আনিয়া একটা প্রবল 'কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। আশানুরূপ ফলও ফলিল। কিন্তু এই নূতন নেশার মোহ যেমন নটবরের 'গা-সওয়া' হইয়া আসিল,

পুরাতন নেশা আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। পিসিমা এ পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন- যতই ফড়্ ফড়্ কর, পায়ে শিকল বাঁধা আছে—কত আর উড়্‌বে!

সুষমাও যে ইহা লক্ষ্য করে নাই তাহা নয়—কিন্তু পরিবর্ত্তনটা বুঝিবার তেমন অবসর পায় না। নটবর রাত্রে বাড়ী আসিয়া এমন রং ফলাইয়া অলঙ্কার দিয়া নানারূপ বর্ণনা আরম্ভ করে, যে তাহার বিপুল উৎসাহ এবং আনন্দ দেখিয়া সুষমা তাহার দীর্ঘ নিঃসঙ্গ দিবসের ক্লেশ ভুলিয়া যায়—স্বামীর সুখেইত স্ত্রীর সুখ!

দিনের বেলা সময় কাটাইবার জন্য সুষমা বিস্তর নাটক-নভেল পায়—নটবর নানা স্থান হইতে যে-সব যোগাড় করিয়া আনে। এই সব বই পড়িতে পড়িতে এক এক সময়ে সুষমার বক্ষ কাঁপিয়া উঠে। নটবরের চেহারা বড় সুন্দর, তাহার মুখের হাসি, চোখের চাহনি বড় মধুর, তাহার কথা কহিবার ভঙ্গী অপূর্ব্ব—মন-মুগ্ধকর। সুষমা ত এই সব দেখিয়াই তাহার সারা দেহপ্রাণ নটবরের চরণে লুটাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ভাবে, আর পাঁচটা মেয়েও ত এইরূপে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে—নাটক-নভেলের মেয়েদের মতো।

নটবর রাত্রে ফিরিয়া আসিলেই কিন্তু সমস্ত সংশয় ঘুচিয়া যায়। যেদিন রাত্রি বেশী হয়, সুষমা একটা ঈর্ষার অস্পষ্ট জ্বালা অনুভব করে। কিন্তু ঠিক সেইদিনই নটবরের আদর-সোহাগের মাত্রা বাড়িয়া যায়। সুষমা সব ভুলিয়া গিয়া ভাবে—হয়ত এই রকম দেরী হওয়াই বাঞ্ছনীয়! খেসারতের প্রাচুর্য্যে অপরাধকে লঘু বিবেচনা করে।

ওদিকে কিন্তু নটবরের দিনগুলা বেশ কাটে। অন্নচিন্তা নাই, বাড়ীখানি নিজের, ব্যাঙ্কে টাকা আছে, একটা হার্ডওয়ারের কারবারের অংশ আছে—তাহারও আয় মন্দ নয়। দ্বিপ্রহরে আহারের পর একটু বিশ্রাম করিয়া, 'অফিস যাই' বলিয়া প্রত্যহই বাহির হয়। অফিসে একবার যায়—এ কথাটা কিন্তু সত্য! তবে 'অফিসের কাজ সে মোটেই বোঝে না, দু-পাঁচটা বাজে গাল-গল্প করিয়াই সে সরিয়া পড়ে।

অফিসটি কিন্তু নটবরের পক্ষে কল্পতরু বিশেষ। ইহার আয়ের কথা বলিতেছি না—অফিসের দোহাই দিয়া সময়ে অসময়ে ইচ্ছামত বাড়ী হইতে বাহির হওয়া যায়। সুষমার বিশ্বাস, নটবর না গেলে অফিস অচল হইয়া বসিয়া থাকে!

এই অফিসের কাজের ছুতা করিয়া নটবর কত দিল্লি-দিল্লিও ঘুরিয়া আসিয়াছে। একবার কিন্তু বড় মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছে—নটবর এবং সুষমা দুজনকেই।

সেবার নটবরের দলবল সহ বোম্বাই যাইবার মৎলব। বাড়ীতে কিন্তু প্রকাশ—সে অফিসের কাজে একাই যাইতেছে। সব যখন ঠিক তখন সুষমা ধরিয়া বসিল—সেও সঙ্গে যাইবে। অত বড় সহর, কলিকাতা অপেক্ষাও নাকি বড় এবং দেখিতেও সুন্দর। তাহার উপর পিসিমার সুপারিস। অগত্যা সুষমাকে লইয়া যাইতে হইল। নটবর তাহার সঙ্গীদের সাবধান করিয়া দিল—সুষমা তাহাদের দেখিয়া না ফেলে। কারণ নটবরের বাড়ীতে মাঝে মাঝে গান-বাজনার মজলিস হইলে ইহারা প্রায়ই আসে, সেজন্য সুষমা তাহাদের অনেককে চেনে।

বোম্বাই সহরে বাঙ্গালীদের থাকিবার জন্য একটা 'বান্ধব-নিকেতন' আছে অনেকেই জানেন। নটবরের দল সেইখানে গিয়া উঠিল। কিন্তু সুষমাকে লইয়া সে বেচারির আর সেখানে থাকা চলে না। কাজেই ভাটিয়াদের একটা হোটেলে আশ্রয় খুঁজিয়া লইল। সেখানে খাইবার বিষম কষ্ট। নটবর মাঝে মাঝে বাহিরে মুখ বদলাইয়া আসে, কিন্তু অনভ্যস্ত আহারে সুষমার পেটে চড় পড়িবার উপক্রম।

নটবর দিনের বেলায় 'অফিসের কাজে' বাহিরে বাহিরে ঘোরে, বৈকালে ফিরিয়া কিছুক্ষণ সুষমার কাছে থাকে, এক এক একদিন তাহাকে লইয়া একটু বেড়াইয়া আসে। কিন্তু সন্ধ্যার পর তাহাকে আবার বাহির হইতে হয়। বলে—"দিনের বেলা কাজের ভিড়ে বড় বড় ব্যবসাদারদের সঙ্গে কি ভাল করে কথা কইবার জো আছে! রাত্রে নিরিবিলিতে—"

আসল কথা অবশ্যই তাহা নহে। নটবরের দলে একজন বিখ্যাত 'চাণক্য' আছে; তাহাকে এবং আরও দুই-চার

জনকে লইয়া স্থানীয় নাট্য-সমিতি 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় করিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল, এবং কয়দিন তাহারই মহলা চলিতেছিল।

নটবরের কিন্তু নিজের অভিনয় করিবার সখ ছিল না। সে চঞ্চল প্রকৃতির লোক, দিনের পর দিন একঘেয়ে রিহার্সাল দেওয়া তাহার পোষায় না। আর, সেই যে গেঞ্জি-পরা মালকোঁচা-আঁটা নায়িকার হাত ধরিয়া প্রণয় নিবেদন করিতে হইবে-- তাহা ভাবিলেও অঙ্গ জলিয়া যায়! 'নেবুতলা নাট্য-পরিষদের' সে একজন উদ্যোগী সভ্য বটে, কিন্তু রিহার্সালের ধার ধারে না। মাঝে মাঝে যাইয়া কেবল আসর সরগরম করে, আর খেয়াল হইলে একটু আধটু বাজায়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তবলাতে তাহার হাত খেলে।

বোম্বাই গিয়াও সেই রিহার্সালের পালা আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার পর একটু আড্ডা দিয়া আসিবার জন্য নটবর ছট্‌ফট্‌ করে, কিন্তু বেশীক্ষণ ভালও লাগে না। ফিরিয়া আসিয়া সুষমাকে বুঝায়—"তোমাকে এমন একলা ফেলে রেখে কি বেশীক্ষণ থাকতে পারি, তাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসি। কাজের ক্ষতি হ'বে? ক্ষতি আর কি, না হয় একটু দেরি হ'বে—দশদিনের জায়গায় না হয় পনেরো দিন।"

একদিন বৈকালে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গিয়া সুষমা বলিল সেদিন একটু দেরি করিয়া ফিরিবে। তিথি ছিল পূর্ণিমা। সুষমা বলিল—চাঁদের আলোয় সমুদ্র নাকি বড় সুন্দর দেখায়, এ দৃশ্য সে না দেখিয়া ফিরিবে না। সুষমার আব্দার করা স্বভাব নয়, কিন্তু যখন ধরিয়া বসে, কিছুতেই ছাড়ে না। নটবর বেশী আপত্তি করিল না।

দুজনে মিলিয়া জ্যোৎস্নালোকিত অনন্তপ্রসারিত জল-রাশির অমল শোভা দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ যে কাটিয়া গেল, কাহারও জ্ঞান ছিল না। সুষমাই শেষে স্মরণ করাইয়া দিল—এইবার ফিরিতে হইবে

একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সিকে ধরিবার জন্য নটবর একটু অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে তিন-চারজন লোক তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল—"আরে নটবর যে, এখানে ঘুরে বেড়াচ্চো! পরশু প্লে, মনে নেই বুঝি? গঙ্গাধরের অসুখ—আজ তোমাকেই বাজাতে হ'বে। হোটেলে তোমার সন্ধান পাওয়া গেল না—সারা সহর খুঁজে বেড়াচ্চি—"

নটবর যেন কি রকম হইয়া গেল। অদূরবর্ত্তিনী সুষমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিম্নস্বরে বলিল—"আজ এঁর বড় মাথা ধরেছিল, তাই একটু বেড়াতে এনেছিলুম।"

তাহারা একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়াই চোরের মত সরিয়া পড়িল।

ইহাদের রকম দেখিয়া সুষমা হাসিয়া ফেলিল। ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল—"এরা সেই নেবুতলার দল নয়? এখানে—"

নটবর রাগে ফুলিতেছিল, বলিল—"হ্যাঁ, আর কেন বল—হতভাগারা এসে জুটেছে, এই ক'দিন হ'ল। ওদের ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—হুজুগ নিয়েই আছে। আবার আমার উপর তম্বি! দয়া করে দু'দিন ওদের রিহার্শলে বাজিয়ে এসেচি বলে আমার যেন মাথা বিকিয়ে গেছে—এই রাত্তিরে চল বাজাতে!"

সুষমা বলিল—"আহা, তা যাওই না একবার। এমন ত বেশী রাত হয়নি। আর তুমি নাকি বাজাও ভাল, তাই ত বলে।"

নটবরের কিন্তু কিছুতেই রাগ পড়িল না। সে রাত্রে সে সত্য-সত্যই বাহির হইল না।

শুধু তাহাই নয়—রাগের মাথায় সে বলিয়া বসিল, কালই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। আফিসের কাজ শেষ হইয়াছে, চ্যাংড়াদের পাল্লায় পড়িয়া আর কতদিন এখানে বসিয়া থাকিবে!

সুষমা অনেক বুঝাইয়া তাহাকে শান্ত করিল—তাহার অভাবে যদি অভিনয়ের সময় কোন বিশৃঙ্খলা হয়, লোকে তাহারই দোষ দিবে; সেটা ভাল কথা নয়—না হয় ফিরিতে দু'দিন দেরীই হইবে, ইত্যাদি

অভিনয়ের রাত্রে সুষমা একরকম জোর করিয়াই থিয়েটার দেখিতে গেল। নটবর বলিয়াছিল, সেখানে তাহার অনেক কষ্ট এবং অসুবিধা হইবে। দেখিল তাহাই বটে। অভিনয় আরম্ভ হইতে অযথা বিলম্ব হইতেছিল, অচেনা লোকের মাঝে একাকী বসিয়া তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত। নটবর একবার

মাত্র আসিয়া গোটাকতক পান দিয়া গেল। তাহার পর তাহার আর দেখা নাই।

শেষ অঙ্ক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় নাট্য-সমিতির সম্পাদক ষ্টেজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া একটি বক্তৃতা দিয়া গেলেন। গোড়ার কথাগুলা হট্টগোলের মধ্যে ভাল শোনা গেল না। উপসংহারে তিনি বলিলেন—"আজকের এই অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়েরা বিলক্ষণ ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করে সুদূর কলিকাতা হ'তে এসে আমাদের যেরূপ সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেছেন, তা'র জন্যে সমিতির পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করচি।"

নটবরের নাম শুনিয়া সুষমা প্রথমটা বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিল। কিন্তু একটা সংশয় আসিয়া জুটিল—নটবর কি তবে এই থিয়েটারের জন্যই বোম্বাই আসিয়াছে নাকি? অফিসের কাজ কি সব মিথ্যা? কে জানে! নটবরকে জেরা করিয়া সত্য কথা বাহির করা যে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অসাধ্য, সুষমা তাহা একটু একটু বুঝিত, তাই সে বিষয়ে বিশেষ কোন চেষ্টা করিত না।

তথাপি হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া সুষমা একটু কপট হাসি হাসিয়া বলিল -"যাই হ'ক, থিয়েটারের জন্যে এত 'ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করে সুদূর কলিকাতা হ'তে' যে এসেছিলে তা কতকটা সার্থক হ'ল।"

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া নটবর বলিল—"আরে রাম বল! থিয়েটারের জন্যে আমি—আমার যেন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—ও সব ফাঁকা খোসামুদি, বুঝলে না? আমি এলুম কিনা নিজের অফিসের কাজে—ফাঁকতালে একটু নাম হয়ে গেল। আমি ত আগেই চলে যাচ্ছিলুম, তুমি বললে বলেই দুটো দিন থেকে যাওয়া। কিন্তু আর না—চল, কালই রওনা—কি বল?"

৪

বোম্বাই হইতে ফিরিয়া অবধি সুষমা নটবরকে পদে পদে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল। একটু জেরা না করিয়া তাহার কোন কথাই আর বিশ্বাস করিতে চাহে না। সুতরাং নটবরকে এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রচুর পরিমাণে মাল-মশলারও সংগ্রহ হইতে লাগিল।

চাঁপাতলায় তাহার এক বন্ধুর একটা ছোট ছাপাখানা আছে, তাহাতে বিজ্ঞাপন, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, বিল, চেক-দাখিলা প্রভৃতি ছাপা হয়। নটবর তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিল—ছাপাখানায় যত নিমন্ত্রণ পত্র এবং প্রীতি-উপহার ছাপা হয়, একখানি করিয়া তাহাকে দিতে হইবে। নিমন্ত্রণ পত্রগুলি রীতিমত লেফাফা ভুক্ত হইয়া শয়ন-কক্ষের টেবিলের উপর সযত্নে রক্ষিত হইয়া প্রায়ই সুষমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নটবরও ঘন ঘন নিমন্ত্রণে যায়—অধিকাংশই বিবাহের বা প্রীতিভোজনের নিমন্ত্রণ- এবং ফিরিয়া আসিয়া পকেট হইতে দুই-একখানা প্রীতি-উপহারও বাহির করিয়া দেয়। না চাহিতেই এইরূপ অকাট্য প্রমাণ দাখিল করিয়া নটবর জেরার পথ বন্ধ করিয়া দেয়।

কিন্তু ইহাতেও বিপদ আছে। একদিন- সেদিন শুক্রবার, ৪ঠা আষাঢ়—নটবর অসন্দিগ্ধ চিত্তে একখানা প্রীতি-উপহার বাহির করিয়া দিল। সুষমা দেখিল তাহাতে তারিখ দেওয়া আছে—শুক্রবার ১১ই আষাঢ়। প্রথমে সে কিছু বলিল না। কনেটির বয়স কত, দেখিতে কেমন, বর কি করে, কোথায় বাড়ী, কত বয়স, ক'টার সময় লগ্ন ইত্যাদি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর শুনিয়া শেষে বলিল—"কিন্তু বিয়েটা এক হপ্তা আগে হয়ে গেল কেন?"

নটবর আকাশ হইতে পড়িল—"এক হপ্তা আগে! মানে?"

"মানে খুব সোজা—এতে বিয়ের তারিখ ছাপা রয়েছে ১১ই আষাঢ়, কিন্তু আজ ত ১১ই নয় ৪ঠা।"

"কই দেখি", বলিয়া নটবর কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"ও কিছু নয়—ছাপার ভুল। বারটা ঠিক আছে—শুক্রবার।"

সুষমা একবার স্থির দৃষ্টিতে নটবরের মুখের পানে চাহিয় পরক্ষণেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল এবং পিসীমার ঘর হইতে পাঁজি আনিয়া হাজির করিল। 'শুভদিনের নির্ঘণ্ট' বাহির করিয়া দেখাইল—১১ই আষাঢ় বিবাহের দিন আছে, ৪ঠা আষাঢ় নাই!

নটবর কিছু না বলিয়া নীরব আক্রোশে তাহার ছাপাখানার বন্ধু জিতেন রাস্কেলটার মস্তক চর্বন করিতে লাগিল—তাহারই ত দোষ!

সে যাত্রা নটবর কিরূপে রক্ষা পাইল জানি না। তবে লক্ষ্য করিয়াছি তাহার পর হইতে তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে হইত এবং নিমন্ত্রণের সংখ্যাও যেন ক্রমশঃ কমিয়া আসিল।

৫

ইতিমধ্যে নটবরের দলে একটা নূতন হুজুগ উঠিল—একবার রেঙ্গুন বেড়াইয়া আসিতে হইবে। নটবরের প্রধান ভাবনা হইল সুষমাকে লইয়া—যাহাতে সেবারকার মত তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতে না হয়। যাইবার অবশ্য বিলম্ব আছে, কিন্তু সময় থাকিতে জমীণ পাট না করিলে ইচ্ছানুরূপ ফসল হইবে কেন?

নটবরের উর্বর মস্তিষ্কে সহজেই একটা বুদ্ধি অঙ্কুরিত হইল, এবং অবিলম্বে তাহার গোড়াপত্তন হইয়া গেল।

রাত্রে সে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার গলায় একগাছা জুঁই ফুলের ডবল গোড়ে।

বিজয়োৎফুল্ল দৃষ্টিতে সুষমার পানে চাহিয়া সে বলিল—"দেখচ? কে পরিয়ে দিয়েছে জান?"

সুষমার মনে সদাসর্বদা আশঙ্কা নটবরকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য নানাদিক হইতে চেষ্টা চলিতেছে। তাই সে চমকিয়া উঠিল। ভাবিল এ কি কোন প্রেমিকার প্রণয় উপহার নাকি? আর তাহার এই গৌরব-কাহিনী আমাকেই শুনাইতে চাহে! এতদূর নির্লজ্জ! ছি!

নটবর বলিল—"খোদ সোমেশ্বর ভাদুড়ি স্বহস্তে এই মালা পরিয়ে দিয়েছে।"

সুষমা বলিল—"সে আবার কে?"

"জান না? সোমেশ্বর ভাদুড়ির নাম শোননি?—আশ্চর্য্য! মস্ত বড় গাইয়ে এই সোমেশ্বর ভাদুড়ি। কল্‌কাতা সহরে—শুধু তাই কেন, সারা বাংলা দেশের মধ্যে—এত বড় গুণী আর একটি নেই।"

এখানে জনান্তিকে বলিয়া রাখি, এই সোমেশ্বর ভাদুড়ি নটবরের নিছক কল্পনা-প্রসূত।

নটবর বলিয়া চলিল—"সোমেশ্বর বাবুর সঙ্গে আজ প্রথম আলাপ। কিন্তু এই একদিনের পরিচয়ে তিনি আমাকে এতদূর ভালবেসেছেন, যে কি বলবো! আজ কুমার মনীন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ীতে গানের আসর হয়েছিল কিনা—আমিও ছিলুম। সোমেশ্বর বাবু খান পাঁচেক গান গাইলেন। শেষের দিকটায় আমি একটু বাজিয়েছিলুম। একটা গান যখন শেষ হয়েছে, আমিও তেহাই সেরে যেই ছেড়েচি, সোমেশ্বর বাবু অমনি তানপুরাটা ফেলে দিয়ে নিজের গলা থেকে মালা খুলে আমায় পরিয়ে দিলেন। বল্লেন—"এই রকম সঙ্গত পেলে তবে ত গান জমে। শুধু নিজের কেরদানি দেখালেই ত হয় না। আপনার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, নটবর বাবু। আর একটু সাধনা দরকার, তা হ'লেই সিদ্ধি।"

স্বামীর প্রশংসা শুনিলে কোন্ পতিপরায়ণা নারীর প্রাণ নাচিয়া না উঠে? একটা প্রবল আনন্দের উচ্ছ্বাসে সুষমার হৃদয় ভরিয়া গেল। নটবরের শেষ কথার উত্তরে সে বলিল—'তা বেশ ত, অত বড় লোকটা যখন বল্‌চে, একটু ভাল করেই চর্চ্চা কর না।"

নটবর ঠিক এই কথাই শুনিতে চাহিতেছিল। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া একটু বিষণ্ণ ভাবে উত্তর করিল—"তা কি করেই বা হয়—তার জন্যে সময় চাই, পাঁচটা মজলিসে আসা যাওয়া চাই। কিন্তু তুমিও আমাকে বেশীক্ষণ ছেড়ে থাকতে পার না, আমিও পারি না।"

সুষমা অনেক খোসামোদ করিয়া মাথার দিব্য দিয়া নটবরকে রাজি করাইল যে সে এইবার রীতিমত সঙ্গীত সাধনায় মনোযোগী হইবে।

তারপর দিন কতক বেশ যায়। নটবরকে আর প্রত্যহ বাড়ী আসিয়া কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। বিবাহের নিমন্ত্রণও আর বেশী হয় না। মাঝে মাঝে সোমেশ্বর ভাদুড়ির কথা উঠে—কবে কোথায় গাওনা হইল, নটবরের কিরূপ তারিফ হইল, এই সব।

মাসখানেক পরে একদিন নটবর মুখখানি বিমর্ষ করিয়া বাড়ী ফিরিল। দেখিয়া সুষমা বড় উদ্বিগ্ন হইল। নটবরকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল—"সোমেশ্বর বাবু আজ বল্‌ছিলেন, তাঁকে একবার রেঙ্গুন যেতে হবে দিন কতকের জন্যে; সেখানে নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলন হবে কিনা—দেশের যত বড় বড় কলাবিদ্ সেখানে জমায়েৎ হবে। সোমেশ্বর বাবু আমাকেও নিয়ে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু—"

সুষমা বলিল,—"কিন্তু আর কি, যাওই না—এত বড় সুযোগ—"

"তা ত, কিন্তু অতদূর আর দেরী হয়ে যাবে অনেক—মাসখানেক ত বটেই। তা' ছাড়া এবার ত আর তোমাকে নিয়ে যাওয়া চল্‌বে না—এখানে একলাটি অতদিন ফেলে রেখে যাওয়াও·····। তাই বল্লুম আমার আর বোধ হয় যাওয়া ঘটে উঠবে না।"

"না না, তুমি যাও, আমার কোন কষ্ট হবে না। হ'লেও, তোমার যদি এতে একটু যশ হয়—"

"সামান্য একটু যশের জন্যে তোমাকে এতটা কষ্ট দেওয়া—"

সেদিন এই পর্য্যন্ত, বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত হইল না। তারপর নটবর এ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। শেষে সুষমাই একদিন আবার কথাটা উত্থাপন করিল—এবং অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে নটবর রেঙ্গুন যাইবে, এবং সুষমা সেই অবসরে একবার শান্তিপুরে তাহার পিত্রালয়ে বেড়াইয়া আসিবে।

৬

নটবরের দল যথাসময়ে তুমুল উৎসাহে রেঙ্গুন যাত্রা করিল এবং মহা আনন্দে একটি মাস কাটাইয়া কলিকাতায় ফিরিল।

সুষমা পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। নটবর কয়েকদিন ধরিয়া তাহাকে রেঙ্গুনের বৃত্তান্ত সবিস্তারে শুনাইল—মুক্ত সমুদ্রের দৃশ্য, রেঙ্গুন সহরের প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান, সেখানকার অধিবাসীগণের বিচিত্র বেশভূষা ও আচার ব্যবহার ইত্যাদি। নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের রিপোর্টও দাখিল হইল, সেই সঙ্গে সোমেশ্বর ভাদুড়ি ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণের গুণের তারিফ হইল—নটবরের নিজের ভাগেও তাহার কিছু কিছু অংশ পড়িল।

তখন হইতে রাত্রে ফিরিতে বিলম্ব হইলে প্রায় সোমেশ্বর ভাদুড়ির কথাই উঠে, নটবরকে আর নিত্য নূতন নূতন গল্প রচনা করিয়া তাহার অসাধারণ কল্পনাশক্তির অপচয় করিতে হয় না।

সোমেশ্বর ভাদুড়ির কথা শুনিতে শুনিতে সুষমার মনে এই অতি-প্রশংসিত লোকটিকে দেখিবার জন্য প্রবল কৌতূহল জন্মিল। নটবরকে এ কথা বলিতে সে একটু কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—"তার আর কি—একদিন দেখিয়ে দেবো 'খন।"

আজকাল নটবর প্রায়ই থিয়েটার সিনেমা দেখিতে যায়, মাঝে মাঝে সুষমাকেও সঙ্গে লয়। আবার ঠাকুর দেবতার একটু নামগন্ধ থাকিলে পিসিমাকেও এক-একদিন দেখাইয়া আনে।

একদিন নটবর সুষমার সঙ্গে থিয়েটার দেখিয়া ফিরিবার জন্য গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে, এমন সময়ে একখানা মোটর ধীরে ধীরে তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। নটবর সেই মোটরের আরোহীর উদ্দেশে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বার কয়েক নানা ভঙ্গীতে মাথাটি নাড়িয়া সুষমার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়া বলিল—"উনিই সোমেশ্বর ভাদুড়ি।"

সুষমার সেদিকে নজর ছিল না, চকিতে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিল—"ঐ তোমার সোমেশ্বর ভাদুড়ি? ও যে বিট্‌কেল চেহারা—কালো, মোটা—দেখ্‌লে ভক্তি হয় না।"

"আরে না না, সোমেশ্বর বাবু খুব সুপুরুষলোক। তুমি তবে আর কা'কে দেখে থাক্‌বে—ড্রাইভারটাকে হয়ত।"

"কে জানে, তা হ'বে।" সুষমার কৌতূহল-নিবৃত্তি আর হইল না।

একদিন বলিল—"আচ্ছা, আমাদের বাড়ী ত গান-বাজনা মাঝে মাঝে হয়, একদিন সোমেশ্বর বাবুকে আননা। অত বড় গাহিয়ের গান ত কখনও শুনিনি—একবার শোনা যাক্।"

নটবর চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—"আরে বাস্ রে! সোমেশ্বর বাবু আমাদের বাড়ীতে আস্‌বে গাইতে!—তাঁকে কি এমনই হেঁজিপেঁজি লোক পেয়েছ? কত বড় বড় লোক তাঁর গান শোনবার জন্যে খোসামোদ করে—"

"তা হলেই বা, তোমাকে যখন অত ভালবাসেন—এ খাতিরটা আর রাখ্‌বেন না একবার? তোমার কাছে যে রকম শুনি তা'তে ত লোক ভাল বলেই মনে হয়।"

"লোক খুব অমায়িক। কিন্তু, হ'লে হ'বে কি তাঁর মোটে সময় নেই—আচ্ছা দেখি—কিন্তু, না—তাই বা কি করে হয়—"

"তা হোক, তুমি একবার বলে দেখ না। তাঁর যেদিন সুবিধা হয়—আমাদের ত কোন তাড়াতাড়ি নেই।"

নটবর সে দিনকার মত 'হতগজ' করিয়াই প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ফেলিল। কিন্তু বড় দুর্ভাবনায় পড়িল। যে লোকটার অস্তিত্বই নাই তাহাকে আনিয়া আসরে নামাইবে কিরূপে?

সুষমা মাঝে মাঝে তাগাদা করে, কিন্তু নটবরের কোন উৎসাহই দেখা যায় না। শেষে একদিন বলিল—"সামনের বুধবারে সোমেশ্বর বাবু আস্‌চেন। ওঃ কি করে যে তাঁকে রাজি করেছি, কি বল্‌বো!"

মহা উৎসাহে সুষমা এই সম্ভ্রান্ত অতিথির উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিয়া গেল।

মঙ্গলবার রাত্রে নটবর বাড়ী আসিয়া হতাশ ভাবে বলিল—"হোল না—সোমেশ্বর বাবু আজ সকালে পাঞ্জাব মেলে লক্ষ্ণৌ চলে গেছেন। সেখানে কোন এক নবাবের ছেলের বিয়ে—খুব ধুম ধাম, নানা দেশ থেকে বড় বড় গাহিয়ে সব আস্‌চে—সোমেশ্বর বাবুকে না নিয়ে গেলেই নয়। নবাবের তিনজন কর্ম্মচারী আজ দশদিন ধরে সোমেশ্বর বাবুকে নিয়ে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি। আগেই বলেছিলুম, আমাদের মতন লোকের ঘরে কি তাঁর আসা ঘটে!"

সুষমার মনটা বড় দমিয়া গেল। কিন্তু সে হাল ছাড়িবার পাত্রী নয়; বলিল—"দেখ, তিনি ফিরে আসুন,

তারপর একবার বেশ ভালকরে তাঁকে ধরতে হ'বে আচ্ছা যদি এক কাজ করা যায়—রাগ না কর ত বলি।"

নিতান্ত উদাস ভাবে নটবর বলিল—"বল।"

"আমি বলি কি, তিনি ত আমাদের চেয়ে ঢের বয়সে বড়, ব্রাহ্মণ—আমি যদি একখানা চিঠি লিখি তাঁ'কে—তুমি নিয়ে গিয়ে দেবে, লিখ্‌বো—বাবা, আপনার কথা অনেকদিন থেকেই শুন্‌ছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত শ্রীচরণের দর্শন পেলুম না; তা, একবার আপনার এই গরীব মেয়েটিকে পায়ের ধূলো দিতে আস্‌বেন না?· এই রকম করে একটু গুছিয়ে—তুমিই না হয় লিখে দেবে। কি বল? তা হলে বোধ হয় তিনি নিশ্চয় আসেন।"

নটবর তেমনই উদাস ভাবে উত্তর করিল—"তা দেখ্‌লে হয়।"

বেচারির তখন মনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে সে আর কি বলিবে? সে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া বৈঠখানায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

নটবর দেখিল, এমন করিয়া আর চলিবে না। সোমেশ্বর ভাদুড়ির কল্যাণে এতদিন বেশ নির্ভাবনায় কাটিয়াছে, কিন্তু সেই সোমেশ্বর ভাদুড়িই ক্রমে বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখন এই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় কি? নটবর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে ইহার একটি মাত্র উপায় আছে—মৃত্যু! সোমেশ্বর ভাদুড়িকে এইবার মরিতে হইবে—নতুবা তাহার জীবনে শান্তি নাই। যাহার নিকট এত উপকার পাইয়া আসিয়াছে, হয়ত আরও কত পাওয়া যাইত, তাহার মৃত্যুদণ্ড দিতে বড় কষ্ট হইতেছিল। 'কিন্তু আত্মানং সততং রক্ষেৎ'—শাস্ত্রের বচন। তাই নটবর আত্মরক্ষার্থে অনন্যোপায় হইয়া তাহার মানস-সন্তানকে স্বহস্তে বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

দিন দশ পরে নটবর বাড়ি আসিয়া বলিল—"শুনেচ, সোমেশ্বর বাবুর বড় অসুখ।"

সুষমা ব্যথিত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আহা, কি হয়েচে?"

"হয়েচে খুব শক্ত ব্যারাম। লক্ষ্ণৌ গিয়ে একদিন হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। তাড়াতাড়ি চলে এলেন। এখানে ডাক্তার কবিরাজ দেখ্‌চে। তারা বলে রোগ বড় জটিল, আগে থেকেই এর সূত্রপাত হয়েচে, এতদিন জানা যায় নি। এখন কি হয় বলা যায় না। যে রকম ছুটাছুটি টানা পড়েন আরম্ভ হয়েছিল—শরীরের উপর খুবই ধকল পড়্‌ছিল, এতে কি করে আর স্বাস্থ্য থাকে মানুষের। আমাদের দেশে গুণের আদর করতে শিখেচে বটে, কিন্তু গুণের আদর করতে গিয়ে যে গুণীর প্রাণ যায় সে জ্ঞান ত নেই! দেখ, এখন কি হয়।"

নটবর প্রত্যহ সুষমাকে সোমেশ্বর বাবুর সংবাদ আনিয়া দেয়। একদিন অনেক রাত্রে ফিরিয়া একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"এত করেও বাঁচানো গেল না সোমেশ্বর বাবুকে।" তারপর সুষমার উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বলিল—"হয়ে গেল—আজ এইমাত্র দেখে আস্‌চি। আমি আর থাক্‌তে পারলুম না। আর থেকেই বা কি করবো—আমরা ত আর কাঁধ দিতে পার না।···আহা! লোকটি বড় ভাল ছিল, আমাকে বড় ভালবাস্‌তেন।"

হিসাবে নটবরের প্রায় ভুল হয় না। ঠিক দশদিন পরে সোমেশ্বর বাবুর শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। নটবর শ্রাদ্ধ বাড়িতে খাটিতে গেল। ফিরিতে রাত্রি বেশী হইবারই কথা—বলিয়া গেল।

সেদিন শনিবার। সন্ধ্যার সময় নটবরের পিসতুত ভাই—আর এক পিসির ছেলে—জ্যোতিষ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত। সে তাহার মাসির সহিত একটু গল্প-সল্প করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, তিনি বলিলেন—"তোর বৌদিদির সঙ্গে দেখা করে যাবি না?"

"ও, বৌদি আছেন উপরে? আমি বলি বুঝি—"

ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া জ্যোতিষ বলিল—"আরে বৌদি, আপনি এখানে একলাটি বসে আছেন! নুটু দা' থিয়েটার দেখ্‌তে গেল, আপনাকে নিয়ে যায় নি?"

ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে জ্যোতিষ বলিল কোন একটা থিয়েটারে কি একটা পৌরাণিক নাটকের আজ প্রথম অভিনয় রজনী; সে দেখিয়া আসিল নটবর থিয়েটারের টিকিট করিয়া বাহির হইতেছে।

সুষমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বলিল—"সে কি! তিনি যে সোমেশ্বর বাবুর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গেলেন!"

"সোমেশ্বর বাবু? কে তিনি?"

"ও-সব খবর তুমি বুঝি কিছু রাখ না? কলকাতার সেরা গাহিয়ে সোমেশ্বর ভাদুড়ি, ক'দিন হ'ল মারা গেছেন—আজ তাঁর শ্রাদ্ধের ভোজ।"

জ্যোতিষ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"ও সব কথা আপনি বিশ্বাস করেন নাকি? ও সব ডাহা মিথ্যে কথা—একলা একলা থিয়েটার দেখবার জন্যে ঐ রকম বানিয়ে বানিয়ে বলেচে। গাহিয়ে-বাজিয়ের খবর আমি আবার রাখি না! কিন্তু ঐ কি নামটা বল্‌লেন, তা' ত কস্মিন কালেও শুনিনি।"

সুষমা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ একটা

বুদ্ধি মাথায় আসিতেই সে বলিল—"আচ্ছা, এখন গেলে কি টিকিট পাওয়া যায় না ?—আমরা যদি যাই ?"

"তা বল্‌তে পারি না—পাওয়া যেতেও পারে। সত্যি যা'বেন নাকি ? তা হ'লে কিন্তু দেরী করলে চল্‌বে না, চটপট্ তৈয়ের হয়ে নিন্—আমি ছুটে গিয়ে গাড়ী ডেকে আনি।"

পনেরো মিনিটের মধ্যে জ্যোতিষ তাহার মাসিমা এবং বৌ-দিদিকে থিয়েটারে পৌঁছাইয়া দিল। সুষমা বলিয়া দিল—"আমরা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌বো না, ভাঙ্‌বার আগেই পৌঁছে দিও।"

৮

নটবর আসিয়া দেখিল সুষমা শুইয়া পড়িয়াছে। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সে মৃদুস্বরে বলিল—"ঘুমলে না কি ? তা ঘুমও—রাত অনেক হয়েচে। আর কাজের বাড়ি থেকে ত এর আগে আসা যায় না।"

সুষমা একটু নড়িয়া চড়িয়া পিছন ফিরিয়া শুইল। নটবর বুঝিল সে ঘুমায় নাই। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কাজ কর্ম্ম সব মিটে গেল—সোমেশ্বর ভাদুড়ির সব শেষ !"

এইরূপ শত শত মিথ্যা কথা সুষমা এতদিন নির্ব্বিচারে পরিপাক করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ আর সহ্য হইল না। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া শয্যার এক প্রান্তে গিয়া বসিল—তাহার চক্ষে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা !—দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আর বল্‌তে হ'বে না তোমায় সোমেশ্বর ভাদুড়ির কথা ! আমি সব জেনেছি, সব দেখেছি। আমিও সোমেশ্বর ভাদুড়ির শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম—এই দেখ তোমার মতন প্রীতি-উপহারও নিয়ে এসেচি !" বালিশের তলা হইতে থিয়েটারের প্রোগ্রামটা বাহির করিয়া নটবরের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

নটবরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বলিল—"বটে ? থিয়েটার দেখ্‌তে যাওয়া হয়েছিল—কার সঙ্গে শুনি ?"

"জ্যোতি-ঠাকুরপোর সঙ্গে গিয়েছিলুম—আমি আর পিসিমা। শ্রাদ্ধবাড়ীতে কি রকম খাট্‌ছিলে তুমি, সব দেখে এসেছি !"

নটবরের বুদ্ধিলোপ হইল। কি বলিবে খুঁজিয়া না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল—"জ্যোতে ছোঁড়াটা ভারি বদ্ হয়েচে।"

"হাঁ, জ্যোতে ছোঁড়াটা বদ্ বই কি ! আর যে এত কাল ধরে দিনের পর দিন নিজের স্ত্রীকে রাশি রাশি মিথ্যে কথা বলে ঠকিয়ে এল, সে বড় সৎ, নয় ?"

হায় ! সোমেশ্বর ভাদুড়ি শেষে মরিয়া এত বড় শত্রুতা করিল ! নটবর দেখিল আর হালে পানি পায় না। বুঝিল মিথ্যার জয় চিরকাল হয় না। তাসের প্রাসাদ যত যত্নেই গড়িয়া তোলা যাক্ না কেন, এক ফুৎকারেই ভূমিসাৎ হইয়া যায়।

সে এবার সুর বদ্‌লাইল। নানা ভাবে, নানা ছন্দে সুষমার প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য কত চাটুবাক্যই বলিল। কিন্তু সুষমার দুর্জ্জয় অভিমান কিছুতেই ভাঙ্গিল না—সে অত্যধিক গম্ভীর মুখে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

নটবর ক্রমে ধৈর্য্যের শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইল। ব্যথিত অপ্রসন্ন স্বরে সে বলিল—"হাজার দোষ হ'লেও, স্বামী ত ! স্বামী বলেও কি একটু শ্রদ্ধা কর না সুষমা ? তবে কি তুমি আমায় ঘৃণা কর ?"

সুষমা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল—বেশ ছিল। এইবার সে ঝোঁকের মাথায় ব'লয়া ফেলিল—"হাঁ করি।" বলিয়াই কিন্তু সে শিহরিয়া উঠিল—এত বড় মিথ্যা কথাটা সে কেমন করিয়া মুখে আনিল ? নটবরের সহস্র মিথ্যা যে ইহার তুলনায় কিছুই নয় !—ছিছি ! কি লজ্জা !

টপ্ করিয়া আলোটা নিবাইয়া দিয়া সে তাহার এই বিরাট লজ্জাটাকে ঢাকিয়া ফেলিল।

অন্ধকারে নটবরেরও যেন একটু স্বস্তি বোধ হইল। সামনা সামনিই যে কথা বলিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইতেছিল, এই যবনিকার অন্তরালে তাহা অনেকটা সহজ হইয়া গেল। আবেগ-কম্পিত করুণ কণ্ঠে সে বলিল—"সুষমা, সত্যিই আমার বড় অপরাধ হয়েছে—কিন্তু তুমি কি ক্ষমা কর্‌বে না সুষমা ?"

নটবর সুষমার কণ্ঠে এ প্রশ্নের কোন উত্তর শুনিল না। উত্তর কিন্তু পাইল সে—

সুষমা লজ্জায় সে কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া বোধ করি কানে-কানে বলিতে গিয়াছিল, অন্ধকারে তাহার ঠোঁট দু'খানি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কানেরই এক পার্শ্বে সংলগ্ন হইয়া প্রগাঢ় ক্ষমার চিহ্ন আঁকিয়া দিল !

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

বাংলা ছন্দ ও দিলীপকুমার

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌

'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র" প্রবন্ধটি যখন লিখি, তখন আমার প্রতিপাদ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইবে তাহা অবশ্য আশা করিয়াছিলাম। বিষয়টি জটিল, আমার সূত্রগুলি-ও নূতন, তাহাদের ক্ষেত্র-ও সুবিস্তৃত। আমার Beat and Bar Theoryর সিদ্ধান্তগুলিই মাত্র তাহাতে দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সম্যক্‌ ব্যাখ্যা বা আলোচনা প্রকাশের স্থান হয় নাই। সুতরাং বিতর্কের সম্ভাবনা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। সুযোগ্য ভাষাতত্ত্ববিৎ বা ছন্দোবিদ্‌গণের আলোচনায় বাংলা ছন্দের তত্ত্বগুলি আরও বিশদ হইবে এইরূপ আশা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি পৌষের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় আমার প্রবন্ধের কতকগুলি সূত্রের কটু প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদ কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচনা করা দরকার

তাঁহার প্রবন্ধটি ঠিক্‌ সমালোচনা নহে। বস্তুত তিনি আমার প্রবন্ধটি ভাল করিয়া পড়িয়াছেন কি না এবং পড়িলেও মর্ম্মগ্রহণের আয়াস স্বীকার করিয়াছেন কি না তৎসম্বন্ধেই সংশয় উপস্থিত হয়। যে যে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে যুক্তি-তর্ক ত ঐ প্রবন্ধের মধ্যেই আছে। কাজেই এইরূপ সংশয়ের অবসর রহিয়া গিয়াছে। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রশংসাচ্ছলে দিলীপ বাবু এই প্রতিবাদের অবতারণা করিয়াছেন। প্রবোধ বাবুর লেখায় যদি "at long last" দিলীপকুমার বাবুর ছন্দোজ্ঞান জন্মিয়া থাকে তবে তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার কিছু নাই। দিলীপকুমার বাবু অনেক দিন হইতে বাংলা কবিতা লিখিয়া আসিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার রচিত কবিতা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন কেন দিলীপ বাবু প্রবোধ বাবুর লেখা পড়িয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে Eureka, Eureka বলিয়া ধাবমান হইয়াছেন। সুখের বিষয় দিলীপ বাবু আনন্দে কেবল টুপি খুলিতে বলিয়াছেন, আর কিছু করিতে বলেন নাই।

কিন্তু দুঃখ হয় যখন উচ্ছ্বসিত দিলীপ বাবু না বুঝিয়া ছন্দের সূত্রের কদর্থ করেন এবং রসিকতার নমুনা দিতে থাকেন। না বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার কত বেশী তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) আমার প্রবন্ধে 'মাত্রা' শব্দের অর্থ কি তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। আমার প্রবন্ধের ত্রয়োদশ ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকটি সূত্রে বাংলা ছন্দের মাত্রার কথা বলা হইয়াছে। গত আশ্বিনের "বিচিত্রা"য় 'ছন্দ-ধন্দের নিরসন' প্রবন্ধে-ও মাত্রার অর্থ কি তাহা বলিয়াছি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অক্ষরের (syllable) যে ধর্ম্ম অনুসারে হ্রস্ব, দীর্ঘ বা প্লুত বলিয়া বোধ জন্মে তাহারই নাম মাত্রা। Quantity ও মাত্রা একার্থবাচক বলিয়া ছন্দোবিদ্‌গণ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। বাংলা ছন্দ মাত্রেই যে Quantitative বা মাত্রাগত, Qualitative নয়, এবং Quantitative Equivalence বা মাত্রা সমকত্ব ইহার ভিত্তি—এ সমস্ত Platitude লইয়া প্ল্যাটিচিউড-পণ্ডিত দিলীপ বাবুর সহিত তর্ক করা অনাবশ্যক। আশা করি আমি মাত্রা কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি তাহা তিনি বুঝিবা মাত্র সমস্ত আপত্তি তুলিয়া লইবেন।

প্রবোধ বাবু ও তাঁহার ভক্ত দিলীপ বাবু মাত্রা শব্দ বলিতে বোধ হয় নিরপেক্ষ কাল ধরিতে চাহেন। কিন্তু যদি সেই অর্থ ধরেন তাহা হইলেও সর্ব্বত্রই যে closed syllable* দুই মাত্রা আর open syllable* এক মাত্রা এ কথা বলিতে পারিবেন না। নিরপেক্ষ কাল হিসাবে closed syllable মাত্রেই পরস্পর সমান নহে, অথবা open syllableর দ্বিগুণ নহে। যদি দিলীপ বাবুর কানে ইহা ধরা না পড়ে তবে Kymograph ইত্যাদি যন্ত্রের পরীক্ষার সাহায্য লইতে পারেন। ছন্দের 'length'র*

* পারিভাষিক বাংলা প্রতিশব্দগুলি ব্যবহার করিলে হয়ত বুঝিতে গণ্ডগোল হইতে পারে। সুতরাং স্থানে স্থানে পারিভাষিক শব্দগুলি ইংরাজীতে দেওয়া গেল।

পরিচয় চিত্তের অনুভূতি। কেবল বাংলা নয়, অপরাপর ভাষাতেও 'length'র ইহাই স্বরূপ। এ সম্বন্ধে ১৩৩৮ সনের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছি তাহা দিলীপ বাবুকে পড়িতে অনুরোধ করি।

দিলীপ বাবু মাত্রা অর্থে ছন্দের unit ধরিতে পারেন অথবা নিরপেক্ষ কাল ধরিতে পারেন। তাহা না করিয়া কেবল একটা মনগড়া অর্থে মাত্রা শব্দ ব্যবহারের সার্থকতা নাই। closed syllable মানে যখন ছন্দের দুই unit ও বুঝায় না অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট কালাঙ্কের দ্বিগুণও বুঝায় না, তখন closed syllable মানেই দুই মাত্রা এইরূপ বলার সার্থকতা কি? সুতরাং 'কোন দেশের গো'=৭ মাত্রা—এ রকম হিসাবের কোন্ সার্থকতা নাই।

যাহা হউক, দিলীপ বাবু যদি আমার প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'মাত্রা' শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় সূত্রগুলি পড়িয়া ততটা "অবাক্" হইবেন না।

ইহার পরে আর একটি প্রসঙ্গের আলোচনা করিলে সুবিধা হইবে। পূর্ব্বে কোন এক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে 'বাংলায় চার সিলেব্‌ল্ বা পাঁচ সিলেবলের ছন্দ নাই, আছে চার বা পাঁচ মাত্রার ছন্দ"।

বাংলা কাব্যে এক একটি পর্ব্বে বা চরণে তিনটি, চারটি বা পাঁচটি সিলেব্‌ল্ রাখিয়া ছন্দ রচনা হইয়াছে বা হইতে পারে ইহা দেখাইলে আমার উক্তির কোন খণ্ডন হয় না। আমি কোন মতের প্রতিবাদ করিয়া কোন মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছি তাহা বোঝা দরকার।

আপিস যাবার | তাড়া তো নেই, |
ভাব্‌না কিসের | তবে?
(পলাতকা—ফাঁকি)

এই চরণটির প্রথম তিন্‌টি পর্ব্বের পরস্পর সাম্য সাধিত হইয়াছে কিসে? দিলীপ বাবুরা বলিবেন, প্রত্যেক পর্ব্বে ৪টি স্বর আছে বলিয়া। আমি বলিব, প্রত্যেক পর্ব্বে ৪টী মাত্রা আছে বলিয়া। কোন কোন পাঠক হয় ত বলিবেন, তবে মতদ্বৈধ কোথায়? দুই রকম হিসাবেই ত ৪টি করিয়া unit ধরা হইতেছে।

ঐ চরণের পরবর্ত্তী চরণটি পড়িলেই দুই রকম হিসাবের পার্থক্য বোঝা যায়।

আপিস যাবার | তাড়া তো নেই, | ভাব্‌না কিসের | তবে?
আগাগোড়া | সব শুন্‌তেই | হবে।

দ্বিতীয় চরণটিতে 'আগাগোড়া'='সব শুন্‌তেই' সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেখানে দিলীপ বাবুর হিসাবে গরমিল হইয়া যায়। এক পর্ব্বে ৪টি স্বর, অপর পর্ব্বে ৩টি স্বর। তাঁহার অর্থে মাত্রা ধরিলে এক পর্ব্বে ৪মাত্রা, অপর পর্ব্বে ৬ মাত্রা। আর "অক্ষরবৃত্তের" হিসাবে—সে বর্ণসঙ্কর ছন্দের (!), জুয়াচুরির ছন্দের (!) কথা না তোলাই ভাল।

বেগতিক দেখিয়া তাঁহারা ইহাকে exceptional বলিয়া পাশ কাটাইতে চান। কিন্তু এ রকম উদাহরণ ত একটা আধটা নয়, সহস্র সহস্র মিলিতেছে। রবীন্দ্র যুগের পূর্ব্বের সমস্ত বাংলা কবিকে তাঁহারা ত কান মলিয়া ছন্দের রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিতে চান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কাব্যেও ত ঈদৃশ বহু উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। এখন উপায়?

তাঁহারা ধুয়া তুলিতেছেন—exceptions prove the rule. এ রকম যুক্তি কোন ছাত্রের লেখায় থাকিলে পরীক্ষক দিলীপ বাবুর ভাষায় "তৈল বড় জ্বালা যে রে, গোল্লা দে না দিয়ে" বলিতেন। A proposition ও O proposition পরস্পর Contradictory তাহাও কি দিলীপ বাবুকে বলিয়া দিতে হইবে? তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক জগতে পণ্ডিতেরা কোন কোন স্থলে একটা নিয়ম খাটে না বলিয়া তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া সূক্ষ্মতর নিয়ম খুঁজিতে আরম্ভ করেন কেন? Exceptions only prove that the rule is no better than a rough empirical generalisation. প্রবোধ বাবুর প্রস্তাবিত নিয়মগুলি মাত্র আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে rough and empirical generalisation ব্যতীত আর কিছু নহে। বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি জিজ্ঞাসু তিনি উহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

আমার পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদ অনুসারে "আগাগোড়া" কি

করিয়া "সব শুন্‌তেই" পদের সমান হইল তাহার ব্যাখ্যা করা সোজা। "আগাগোড়া" শব্দটিতে ৪টি মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর আছে, সুতরাং ইহাতে ৪টি মাত্রা বা unit. চরণটিতে ছন্দ স্বরাঘাত প্রধান, সুতরাং এখানে যৌগিক অক্ষরেরও হ্রস্বীকরণের প্রবৃত্তি হইতেছে। কিন্তু একই পর্ব্বে উপর্য্যুপরি তিনটি অক্ষরে হ্রস্বীকরণ চলে না বলিয়া একটি অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিতেই হইবে। সুতরাং দ্বিতীয় পর্ব্বটিতেও ৪মাত্রা বা ছন্দের ৪ unit। আমার প্রবন্ধের ১৭শ, ১৮শ, ও ২১শ সূত্র এ ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য।—তবুও যদি দিলীপবাবু বলেন যে এ হিসাব তাঁহার বুদ্ধির অগম্য, তবে আমিও নাচার। দিলীপ বাবুকে বুঝাইবার জন্য আমি যুক্তি দিতে পারি, আর কিছু করা আমার অসাধ্য। এইবার দিলীপবাবু আর যে কতকগুলি উদাহরণ দিয়াছেন সেইগুলি লইয়া আলোচনা করা যাক্।

বাপ্ বল্‌লে | কান্না তোর | আজ ডুষ্টু | রাখ্

এ রকম চরণকে দিলীপবাবু তিন unitএর ছন্দ বলেন। এখানে কোন পর্ব্বেই উপর্য্যুপরি দুইটির বেশী closed syllable নাই, সুতরাং প্রত্যেক স্বরেই একটি করিয়া unit গণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু তিন unitএর পর্ব্বাঙ্গ হয়, পর্ব্ব হয় না বলিয়া আমার বিশ্বাস। একেকটি পর্ব্ব এক একটি impulse-group ; কিন্তু ছন্দে তিন unit-ওয়ালা অংশে সাম্যস্থিতির (stable equilibrium) অভাব অনুভূত হয়, সুতরাং তিন unit দিয়া পূর্ণ পর্ব্ব গঠিত হইতে পারে না। উদ্ধৃত চরণটির নির্দ্দিষ্ট স্থানে যতি রাখিয়া পড়িতে গেলে স্বতঃই প্রত্যেক পর্ব্বে একটি যৌগিক অক্ষরকে দীর্ঘভাবে পড়িবার প্রবৃত্তি আসে।

বাপ্ বল্‌লে | কান্না তোর | আজ ডুষ্টু | রাখ্

এইভাবে ঐ চরণটি বোধ হয় পড়া হয়।

আর এক দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে ঈদৃশ চরণে কয়টি unit তাহার বিচার সোজা হয়। সাধারণ এক একটি open syllableকে যে বাংলা ছন্দে এক এক unit বলিয়া ধরা হয় এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। তা' ছাড়া প্রতিসম দুইটি পর্ব্বে যে সমান সমান unit থাকে তাহা লইয়াও কোন মতভেদ নাই।

ঐখানে ওর | বাসা আছে। স্বামী রেলের | কুলি
(পলাতকা—ফাঁকি)

ছন্দের unitএর যাহাই নাম দেওয়া হউক, এখানে প্রতি পর্ব্বে যে চারটি unit সে বিষয়ে মতভেদ বোধ হয় হইবে না। দ্বিতীয় পর্ব্বে যখন চারটি open syllable ও চারটি unit, তখন প্রথম ও তৃতীয়টিতেও চার unit আছে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং closed syllable-ওয়ালা কোনো পর্ব্বের unit কত তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠিলে তাহার সমাধান হয় যদি সেই পর্ব্বের বদলে শুদ্ধ open syllable-ওয়ালা পর্ব্বে কয়টি syllable রাখিতে হয় তাহা লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ছন্দ মাত্রাসমক-জাতীয় বলিয়া প্রত্যেক পর্ব্বে quantity বা unit-সংখ্যা সমান রাখিয়া অন্যভাবে বৈচিত্র্য আনা যায়। "সব শুন্‌তেই" প্রভৃতি পর্ব্বে মাত্র তিনটি syllable, কিন্তু প্রত্যেকটি closed syllable. ইহার সমান পর্ব্ব শুদ্ধ open syllable দিয়া গড়িতে গেলে চারটি syllable দরকার হয়। একটি কমেও চলে না। বাংলা কবিতা বা ছড়া যত কিছু দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, কোথাও ব্যতিক্রম পাই নাই। সুতরাং তিনটি closed syllable দিয়া পর্ব্ব গঠিত হইলে তাহাতে অন্ততঃ চার মাত্রা আমি গণনা করি। যদি দিলীপবাবু ব্যতিক্রম দেখাইতে পারেন, তবে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

যাহা হউক, উদ্ধৃত চরণটিতে যদি কোন পর্ব্বে closed syllable তুলিয়া দিয়া মাত্র open syllable রাখা যায়, তবে কয়টি syllable লাগিবে ?

বাপ্ বল্‌লে | চেঁচামেচি | আজ ডুষ্টু | রাখ্
বাপ্ বল্‌লে | কান্না আর | চেঁচামেচি | রাখ্
বাপ্ বল্‌লে | কান্না আর | চেঁচান | রাখ্

ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিতে ছন্দ বজায় থাকে ?

এই প্রসঙ্গে substitutionএর অজুহাত সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। এই অজুহাত-টি দিলীপ বাবু-দের trump card বা ব্রহ্মাস্ত্র। তাঁহাদের কল্পিত নিয়মের ব্যভিচার

দেখিলেই তাঁহারা এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন। যদি উদাহরণ দিয়া দেখাই যে তাঁহারা যে ভাবে ছন্দে জাতিভেদ করিতেছেন তাহা চলে না, তবে substitutionএর দোহাই দিয়া তর্ক ধামাচাপা দিবেন। * কিন্তু সে যুক্তিতে ঠিক্ সংশয় নিরসন হয় না। কারণ, তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত পর্ব্বের substitution হইয়াছে বলিলেও 'সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল অগ্নি দিল গায়' এই চরণটিতে "সর্ব্বাঙ্গ"="জ্বলে গেল"=চার unit হয় না। সমস্ত বৃত্তে-ই "জ্বলে গেল"=৪ unit, কিন্তু "সর্ব্বাঙ্গ" অক্ষরবৃত্তে ও স্বরবৃত্তে ৩ unit ও মাত্রাবৃত্তে ৫ unit হয়। তেমনি substitutionএর যুক্তি দিয়া 'সব শুনতেই'='আগাগোড়া' প্রমাণ হয় না।

যদি বা সেরূপ দেখান যাইত, তাহা হইলেও এরূপ যুক্তিকে গোঁজামিল ভিন্ন আর কিছু বলা যাইত না। দিলীপ বাবু ইংরাজী ছন্দশাস্ত্র সম্বন্ধে আর একটু চিন্তা করিয়া তার পর Substitution-র দোহাই দিলে ভাল করিতেন। Iambusএর বদলে Anapaestএর, Trocheeর বদলে Dactylএর Substitution চলে। কিন্তু Iambusএর জায়গায় Dactyl চলে কি? কেন চলে না তাহা দিলীপ বাবু ভাবিয়াছেন কি? Substitutionএর রীতি কখন ছন্দের মূল প্রকৃতির বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ইংরাজী ছন্দ qualitative, সুতরাং Substitutionএর সময়েও quality রক্ষা করিতে হয়। Iambus ও Dactyl সমজাতীয় নয় বলিয়া তাহাদের পরস্পর substitution চলে না। বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় মাত্রা সমকত্ব ছন্দের ভিত্তি। সুতরাং পর্ব্বে পর্ব্বে মাত্রার বা unitএর সংখ্যা সমান রাখিয়া বিভিন্ন উপায়ে সংগঠিত পর্ব্বের substitution চলে। হ্রস্বীকৃত ও দীর্ঘীকৃত সিলেবলের ব্যবহার কৌশলে প্রতিসম পর্ব্বের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য আনা যাইতে পারে। ছন্দঃশাস্ত্র ছন্দের ঐকাবন্ধনের সূত্রটি দেখাইয়া দেয়, কিন্তু ছন্দের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে বিচিত্র পর্ব্ব Substitution করার উপর। তাহা না হইলে ইংরাজী heroic coupletএর যে সমস্ত লেখক ti-tum | ti-tum | ti-tum | ti tum | ti-tum সঙ্কেত ধরিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছেন তাহাদের লেখা-ই ছন্দ হিসাবে অতুলনীয় হইত এবং Keats তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেন না যে Ye were dead

To things ye knew not of,—were closely wed
To musty laws lined out with wretched rule
And Compass vile ; so that ye taugat a school
Of dolts to smooth,in lay, and clip, and fit,
Till, like the certain wands of Jacob's wit,
Their verses tallied. Easy was the task :
A thousand handicraftsmen wore the mask
Of Poesy

কোন cheap formula ধরিয়া সোজা চলিবার পূর্ব্বে দিলীপ বাবু Keatsএর কথাগুলি স্মরণ রাখিবেন। যাহা হউক্ এ সম্বন্ধে অধিক লিখিতে গেলে অনেকের পক্ষে 'বাসকূট' হইয়া উঠিতে পারে, সুতরাং নিরস্ত হওয়া ভাল।

—মোট কথা, বাংলাতে-ও Substitution আছে। কিন্তু Substitutionএর ক্ষেত্রেও ছন্দের মূল প্রকৃতি বজায় রাখা দরকার। কিন্তু যদি মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ইত্যাদি ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ বাংলায় থাকিত, তাহাদের মূলতত্ত্বই যদি বিভিন্ন হইত, তবে আর তাহাদের পরস্পর Substitution চলিত না।

প্রভাত বেলায় | হেলা ভরে করে | অরুণ কিরণে | তুচ্ছ
উদ্ধত যত | শাখার শিখরে | রডো ডেন ড্রন্ | গুচ্ছ
অথবা চিন্তা দিতেম | জলাঞ্জলি থাকুতো নাকো | ত্বরা
মৃ দু প দে | যেতেম যে ন | নাইকো মৃত্যু | জরা

প্রভৃতি স্থলে পর্ব্বে পর্ব্বে কেবল মাত্রাসংখ্যা স্থির রাখিয়া অন্য দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে। যে ভাবে এ সব

* পরস্পর বিরোধী ঘটনা দ্বারাও যে hypothesisএর প্রমাণ বা অপ্রমাণ হয় না সেরূপ hypothesisকে unverifiable বলিয়া logicএ অগ্রাহ্য করা হয়।

স্থলে স্বরাঘাত ইত্যাদির বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে তাহা ইংরাজীতে চলিত না। Substitutionর যুক্তি দ্বারা বাংলা ছন্দের মূল ঐক্যের কথাই প্রমাণিত হয় এবং তথাকথিত ত্রিধাবিভাগের অযৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়।

আমার theoryর আলোচনা প্রসঙ্গে অবান্তর হইলেও দিলীপ বাবু তথাকথিত স্বরমাত্রিক ছন্দে পাঁচ সিলেব্‌লের ছন্দের যে উদাহরণ দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা দরকার। দিলীপ বাবু এখনও পর্ব্ব ও চরণের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার উদাহরণে পাঁচ সিলেব্‌লের চরণ আছে, কিন্তু সে রকম পর্ব্ব নাই।

কৃষ্ণের মন্‌ | জীর মাঝ্‌
সুর্‌হীন্‌ স্বর্‌ | পায়্‌ লাজ্‌
অন্তর গায়— | সাজ্‌ সাজ্‌
উৎসব্‌ রব্‌ | ছন্দে—

এই ভাবে ইহার পর্ব্ব বিভাগ হইবে। দিলীপ বাবু বাংলা ছন্দে একটা নূতন কিছু দান করিয়াছেন ভাবিবেন না। এক impulse এ পাঁচটি closed syllable চালান দিলীপ-বাবুর পক্ষেও অসম্ভব, অতর্কিতভাবে যতি ফেলিতেই হইবে। খুব দ্রুত লয়ে পড়িলে প্রত্যেক সিলেব্‌লের উচ্চারণের সময় সংক্ষিপ্ত হইবে এবং যদিও তদনুরূপ সংক্ষিপ্ত হইবে, কিন্তু যতি থাকিবেই।

ছয় সিলেব্‌লের পর্ব্বের উদাহরণ বলিয়া দিলীপ বাবু যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেটিতে যে আসলে চার unitর পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিসের তরে | দর্প
কিসের তরে | গর্ব্ব
কিসের জন্য | তোমায়
এত শ্রেষ্ঠ | ভাবো—

এখানেও দিলীপ বাবু পর্ব্ব ও চরণের পার্থক্য বুঝিতে গোলমাল করিয়াছেন। ছন্দোবিচারের সময় শুধু সিলেব্‌ল্ গণনা করিলে চলে না, স্বাভাবিক ছন্দোবোধেরও প্রয়োগ আবশ্যক। 'একটা নতুন কিছু' হঠাৎ করা বা আবিষ্কার করা তত সহজ নহে।

(২) সমগ্র বাংলা ছন্দের মধ্যে যে একটা মূল ঐক্য আছে এ কথা ভাবিতেও যাঁহার বিস্ময় বোধ হয়, তাঁহার পক্ষে আমার সূত্রগুলিকে সমগ্রভাবে দেখা ও বিচার করা যে শক্ত হইবে তাহা বিচিত্র নয়। বাংলা ছন্দ "শশধর Huxly and goose"র ন্যায় স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত ও মিশ্র বা যৌগিক বা জংলা বৃত্তের জগা-খিচুড়ি এইরূপ ধারণা লইয়া অথবা ব্যক্তি-বিশেষকে সার্টিফিকেট দিবার উদ্দেশ্য লইয়া যাঁহারা আমার প্রবন্ধটি পড়িতে না বসিবেন, তাঁহারা হয়ত বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব বা গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু আলোক আমার প্রবন্ধে পাইতে পারেন। বাংলায় ছন্দের নানা রূপ আছে, নানারকম ঢঙ্‌ আছে তাহার কথাও আমি বলিয়াছি। তাই বলিয়া যে একটা মূল ঐক্যের ভিত্তি থাকিবে না এমন কোন কথা আছে কি? সেই মূল ঐক্যের রীতি অর্থাৎ বাংলায় মাত্রাসমকত্বের পদ্ধতি আমি যথাসাধ্য স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই পদ্ধতি সর্ব্বত্র বজায় থাকে এবং সেইটি বজায় রাখিয়া কি ভাবে বিভিন্ন ঢঙের কবিতার রচনা বা আবৃত্তি হইতে পারে সে কথাও আমি বলিয়াছি। দিলীপ বাবুর অভিযোগ পড়িয়া মনে স্বতঃই একটা প্রশ্ন উঠে;—তিনি আমার প্রবন্ধ পড়েন নাই, বা, পড়িয়া মর্ম্মগ্রহণ করার চেষ্টা করেন নাই,—ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য?

(৩) দিলীপ বাবুর তৃতীয় অভিযোগ—আমি নাকি বলিতে চাহিয়াছি যে বাংলায় ছন্দ পতন বলিয়া কিছু নাই। এই উপলক্ষে তিনি কিঞ্চিৎ হাস্যরসের সৃষ্টির চেষ্টাও করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত একেলে ছাড়া সব বাংলা কবিরও যে কান মলিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতেই আশঙ্কা জন্মে। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের কথাই সত্য—কেহ কেহ কান দিয়া ছন্দ শোনেন, কেহ কেহ চোখ দিয়া ছন্দ গোণেন। দিলীপ বাবু কান দিয়া ছন্দ শুনিলে এত অবলীলাক্রমে হাজার বছরের বাংলা কবিকুলের কান মলার ব্যবস্থা দিতেন না। "No case: abuse the plaintiff's attorney"—দিলীপ বাবু এই নীতির অনুসরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু সহসা কেন তাঁহার মোকদ্দমার সখ হইল তাহাই বুঝিতেছি না।

বাংলা ছন্দে কোন নিয়ম নাই এ কথা আমি বলিয়াছি কোথায়? বরং সূত্রাকারে সেই নিয়মগুলিই ত বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছি। ২য় সূত্রে ত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি পদ্যে গানের ন্যায় উচ্চারণের স্বাধীনতা চলে না। বাংলায় অনেকে ছন্দপাত করিয়া থাকেন তাহাও সত্য। কেবল সেকেলে কবি নয়, একেলে দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি কবিদের লেখাতেও কখন কখন ছন্দপতন দেখা যায়। দিলীপবাবু মনে রাখিবেন যে ছান্দসিকের কাজ logicianর মত। কি ভাবে বৈজ্ঞানিক ও ভাবুক মনীষিবৃন্দ তাঁহাদের মত স্থাপিত করেন তাহা লক্ষ্য করিয়াই logicর সূত্র রচিত হয়। Aristotle ও Mill ইত্যাদি সকলেই তাহা করিয়াছেন। ছান্দসিকেরও কাজ ছন্দো-রচনার রীতি লক্ষ্য করিয়া ছন্দের মূল সূত্রগুলি বাহির করা। দিলীপবাবু কি অনুষ্টুপছন্দের বাংলা পদ্য হইতে আরোহক রীতিতে বিচার করিয়া তাঁহার কল্পিত কয়েকটি নিয়ম পাইয়াছেন, না কয়েকটি মন গড়া নিয়ম ধরিয়া লইয়া গায়ের জোরে একে ওকে তাকে ছন্দের রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন?

বাংলা ছন্দে তিনটি বিভিন্ন জাতি আছে এই মত খণ্ডনের জন্য অনেক যুক্তি দিয়াছি। কোনো 'বৃত্তে'র নিয়মই খাটে না এরূপ অনেক কবিতা বাংলায় আছে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছি। বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন যুগের কাব্য হইতে তেরটি দৃষ্টান্ত আমার প্রবন্ধে সঙ্কলিত হইয়াছে। আরও বহু দৃষ্টান্ত আমার সংগ্রহ করা আছে, কোন উদ্যোগী পুরুষ নিশ্চয়ই বহুতর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারিবেন।—দিলীপ বাবু সেগুলিকে ছন্দোদুষ্ট বলিয়া একেবারেই অগ্রাহ্য করিতে চান। এরূপ দুঃসাহসিকতা সহকারে দিলীপবাবু Gordian knot ছিন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেছি।

এ ক্ষেত্রে আর যুক্তিতর্কের অবসর নাই। এ শুধু ছন্দ বোধের কথা। তবু দু' একটি মন্তব্য করিতে চাই। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক চলতি প্রবাদ, ছড়া, খনার বচন, গ্রাম্য কবিতা ও গীতিকা (ballad) ইত্যাদি হইতে বেশীর ভাগ উদাহরণ দিয়াছি। কারণ এই ধরণের রচনা হইতে ভাষার যথার্থ স্বরূপ পাওয়া যায়। যেখানে কোন বিদেশী প্রভাবের বা কোন অধীত বিদ্যার প্রভাব নাই, যাহা নিতান্তই সহজ ও স্বভাবজ, তাহাতেই ভাষার বা জাতির নাড়ী নক্ষত্র যথার্থরূপে ধরা যায়। খুকুমণির ছড়ায় তত্ত্ব বা তথ্য থাকে না, কিন্তু ছন্দ থাকে—মাত্র ছন্দের বলেই তাহারা টিকিয়া থাকে। দিলীপবাবু যদি কখন অন্য ভাষার ছন্দের চর্চ্চা করেন তবে যেন nursery rhymeর ছন্দের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন, করিলে তিরস্কৃত হইবেন। দাশু রায়ের মত কবিরা মাত্র ছন্দোরচনার জোরে করিয়া খাইতেন, ছন্দোজ্ঞান না থাকিলে তাঁহাদের উপবাস করিতে হইত। দিলীপ বাবু অত চট্ করিয়া তাহাদের দোষ ধরিবার চেষ্টা করিবেন না। হেমচন্দ্র ছন্দ-শিল্পী বলিয়া খ্যাতনামা ছিলেন; দিলীপবাবুর যে টুকু ছন্দোবোধ আছে সে টুকুও কি সে যুগে কাহারও ছিল না? দিলীপবাবুর তর্কে এই দাঁড়ায় যে হাজার বছর ধরিয়া বাঙালীরা কাব্য লিখিয়া ও শুনিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহাদের ছন্দোবোধ ছিল না। যেখানে ছন্দ পতন হইয়াছে সেখানেও তাহারা মনে করিত যে ছন্দোরক্ষা হইয়াছে।

একটা গল্প মনে পড়ে। কোন ইংরাজ মহিলা না কি ফরাসী দেশে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে ফরাসীরা একান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, তাহারা স্বদেশের রাজধানীর নাম-ও শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না। দিলীপবাবুর ঔদ্ধত্য সেই মহিলাটির অনুরূপ!

দিলীপবাবু কি বলিয়া দিবেন যে এই হাজার বছর পরে হঠাৎ কবে, কি উপায়ে "বৃন্তহীন পুষ্পসম" ছন্দোবোধ বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিয়া উঠিল যাহার ফলে আজ রামা শ্যামা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীদিলীপ কুমার রায় প্রভৃতি সকলেই ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের ছন্দের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারিতেছে?

যাঁহাদের স্বাভাবিক ছন্দোবোধ আছে, যাঁহারা প্রথমত কান দিয়া ছন্দের বিচার করেন, এবং পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা ঐ কয়টি দৃষ্টান্তে ছন্দপতন হইয়াছে বলিবেন না—এইরূপ ভরসা করি। ঐ কয়টি দৃষ্টান্তের ছন্দ রবীন্দ্র- বিনিন্দিত কি না-

নিতান্ত অবান্তর প্রশ্ন। ছন্দের সৌন্দর্য্য ও ছন্দের কাঠাম—এক জিনিষ নয়। দিলীপবাবু কি মনে করেন যে তাঁহাদের কল্পিত নিয়ম ধরিয়া লিখিলেই ছন্দ রবীন্দ্র-বিনিন্দিত হইবে? দিলীপবাবু নিজেই কি সে চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইয়াছেন?

গানের আদর্শ ও ছন্দের আদর্শের পরিবর্ত্তন হয়। এ যুগে কবিরা লয় পরিবর্ত্তনের বিরোধী, সেই জন্য সম্প্রসারক ছন্দের কবিতার এত চল্‌তি। কিন্তু "এহ বাহ্য"—এ শুধু styleর কথা। style ভিন্ন হইলেই কি ভাষা ভিন্ন হয়?

ভয়ে ভয়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ১৩ সংখ্যক উদাহরণটি রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী" হইতে গৃহীত। সেখানেও কি ছন্দ-পতন ঘটিয়াছে? ধরিয়া লওয়া গেল যেন আজকালকার তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের ছন্দের তুলনায় হেমচন্দ্রের ছন্দ "খুঁতে ভরা, বেতো, পঙ্গু, যথেচ্ছাচারী"। প্রথম শ্রেণীর ছান্দসিক দিলীপবাবু কি বলিয়া দিবেন যে "কথা ও কাহিনী"র স্থানে স্থানেও সেই ধরণের "বেতো" ছন্দ পাওয়া যায় কি না? রবীন্দ্রনাথের সম্প্রতি রচিত কয়েকটি শ্লোকে-ও কি ছন্দের সেই দশা? নিম্নে দৃষ্টান্ত দিতেছি—

— | | — | | — | | | | | |
(১) একটি কথার লাগি   তিনটি রজনী জাগি

— | | | | | | | |
একটুও নাহি মেলে সাড়া।

| | | | — | | | | | | ‿ | | |
সখীরা যখন জোটে   কথা যেন বন্যা ছোটে

— | | — — | |
গোলমালে তোলপাড় পাড়া॥

(পরিচয়, মাঘ ১৩৩৮)

এটি কোন 'বৃত্তে' রচিত?

(একমাত্রার closed syllableকে ‿ চিহ্ন, দুইমাত্রার closed syllable কে—চিহ্ন, এক মাত্রার open syllable কে। চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছি)

‿ | | | | | | | | ‿ | | | —
(২) চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে | গিন্নি রেগে খুন,

| | | | — — — — —
ঝি বলে আমার দোষ | নেই ঠাক্‌রুণ।

(পরিচয়, মাঘ ১৩৩৮)

‿ ‿ | | | | | | | | | | | —
(৩) চিম্‌নি ফেটেচে দেখে | গৃহিনী সরোষ

| | | ‿ — — — | | —
ঝি বলে ঠাক্‌রুণ মোর | নাই কোন দোষ।

(পরিচয়, মাঘ ১৩৩৮)

কোন্ বৃত্তের নিয়ম ধরিয়া নিম্নের দুইটি শ্লোকেই ছন্দ রক্ষা হইয়াছে?

| | ‿ | | | — — — | |
(৪) তব চিত্ত গগনের | দূর দিক্-সীমা

| | — | | | | | | | | | |
বেদনার রাঙা মেঘে পেয়েছে মহিমা।

(পরিচয়, কার্ত্তিক ১৩৩৯)

| — | | | | — ‿ | | | | |
(৫) মনের আকাশে তার | দিক্ সীমানা বেয়ে

| | | | — | | | | | | | |
বিবাগী স্বপন পাখী | চলিয়াছে ধেয়ে।

(পরিচয়, কার্ত্তিক ১৩৩৯)

চোখে আঙুল দিলেও যাহাদের চোখ্ ফোটেনা তাহাদের সহিত তর্ক করা বৃথা।

বাংলা ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে বাংলায় সিলেব্‌লের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট রীতিতে বাঁধাধরা নয়। ১৩৩৮ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১ম সংখ্যায় 'বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধের প্রথম পর্য্যায়ে তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ-ও "পরিচয়ে" লিখিত প্রবন্ধাদিতে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। বাংলায় সিলেবল্ যে মাত্রার হিসাবে "স্থিতি-স্থাপক," সংস্কৃতের ন্যায় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মের নিগড়ে বন্দী নয়—এ তত্ত্বটি না বুঝিলে বাংলা ছন্দের স্বরূপ বুঝা যাইবে না। এই স্থিতি স্থাপকত্বের সীমা কতদূর তাহা আমার প্রবন্ধের

১৩শ হইতে ১৮শ সূত্রে বলা হইয়াছে। কিরূপে এই স্থিতিস্থাপকত্ব নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা সেই প্রবন্ধের ২২শ হইতে ৩১শ সূত্রে স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এই স্থিতি স্থাপকত্ব এবং ছন্দের আদর্শ অনুসারে মাত্রার নিয়ন্ত্রণ—বাংলা ভাষার এই দুইটি মূলীভূত তত্ত্ব না বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃতের অনুকরণে বাংলা সিলেবলের গায়ে মাত্রার টিকিট্ মারিয়া ছন্দোবিচার করিতে গেলে বিড়ম্বিত হইতে হইবে। ছন্দোবিচার মাত্র চোখ কান বুঝিয়া আঙুল গোণা নয়।

বাংলা ছন্দের তিনটি স্বতন্ত্র জাতি আছে—এ মত কেন অগ্রাহ্য এবং ছন্দের যে তিনটি ঢঙ্ বাংলায় চলিত আছে তাহাদের পরিচয় কিসে, বাংলা ছন্দের মূল রীতি কি—এ সমস্ত কথাই 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' প্রবন্ধে আছে। সে সমস্তের মর্ম্মগ্রহণ না করিয়া "বুঝি বা বিশ্ব কর্‌বে নস্য, এমনি-যে আকার" ধারণ করিতে গেলে ছন্দোজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

"পারস্য ভ্রমণ"

—পারস্য প্রত্যাগত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে—

শ্রীঅশোকবিজয় রাহা

পশ্চিম পারস্য হ'তে যে-পূজা লভিলে আজি কবি,
জীবনের প্রশান্ত লগনে,—এই প্রেমপূর্ণ ছবি,
এই শান্ত শুভদীপ্তি, আত্মার এ নিগূঢ় মিলন
অনন্ত কালের তরে ভারতের স্মরণের ধন।
এই মতো কতবার দিকে দিকে এ বিশ্বজগতে
তোমার বিজয়যাত্রা অলক্ষিত অন্তরের পথে
দেশে দেশে গৌরবেতে কণ্ঠে তব পরায়েছে আনি'
অম্লান কুসুমে গাঁথা বিজয়ার বরমাল্যখানি।
তুমি যা' গেয়েছ গান চিরদিন আমাদের লাগি',
তোমার সাধনা-সাথে সে-মহিমা স্থির র'বে জাগি'।
প্রেমের অমর বাণী এনেছে অমূল্য উপহার,—
বিশ্বের হৃদয়াসনে ভারতের চির-অধিকার।
সায়াহ্ন-আলোকে পুন আজিকার এই অর্ঘ্য তব
জননীর বেদীমূলে আনিল গৌরব অভিনব॥

পুনর্মিলন

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দেব

মাদাম সুরসিয়ে তার স্বামীর জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া মাদাম প্রায়ই বলিতেন,—বরং শ্রোতার সংখ্যা বেশী থাকিলেই বলিতেন: "কালকের শিশুর যা বুদ্ধি তাও বেঞ্জামিনের নেই, অথচ তাকে নিয়ে ঝক্কি পোহাতে হয় ঢের বেশী! আমি না থাকলে ও বোধ হয় একদিনও গায়ের জামা বদ্‌লাতো না;—আর বছরে দুদিনের বেশী দাঁত মাজত না! সত্যি কি না, তুমিই বল বেঞ্জামিন?"

বেঞ্জামিন অতি বিনীত ভাবে উত্তর দিতেন: "সত্যি ক্লারা।"

অভিমান বলে কোন পদার্থ বেঞ্জামিনের ছিল না। বেঞ্জামিন লোকটি ছিলেন বেঁটে খাটো। সম্বলের মধ্যে, শরীরের সঙ্গে নিতান্ত বেমানান্ মস্ত-বড় মুখ জুড়িয়া এক জঙ্গল দাড়ি এবং মাথায় লম্বা এক মুঠো বাবরী। বিবাহের পূর্ব্বে লুভ্রে ছবি নকল করিয়া কোন রকম দিনগুজরাণ করিতেন। ক্লারা ছিলেন ধনীর মেয়ে আর তার মন ছিল নিতান্ত খোলা। স্পষ্ট কথায় পরের মনে কষ্ট দিতেও ক্লারা কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। পয়গম্বরী মাথার মালীক এই শিল্পী কেমন করিয়া ক্লারার মন আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা বুঝা দুষ্কর। কিন্তু এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য শিল্পীকে অতি শীঘ্রই অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। নব-বধূর প্রতি চিত্রকরের আন্তরিক সোহাগ ও ক্লারার কাক-তাড়ানো চণ্ডা-মূর্ত্তির ভিতর এতটুকু কোমলতার সঞ্চার করিতে পারে নাই। বধূর প্রতি প্রেমানুরাগে শিল্পী যখন একান্ত আত্মহারা হইয়া উঠিতেন, হঠাৎ তখন ক্লারার একটি কথাই তাহাকে আত্মস্থ করিয়া তুলিত: "আসবার সময় কালো জামাটা ব্রুশ করে আসনি? না? বেশ, যাও! এক্ষুণি যাও; গিয়ে জামাটা আগে বুরুশ করে এসো! এক কথা যেন দুবার বলতে না হয়।"

হাত খরচের জন্য মাদাম স্বামীকে দৈনিক পঞ্চাশ সাঁতীম করিয়া দিতেন; এবং যখনই মাদামের মেজাজ খারাপ থাকিত তখনই স্বামীকে নিতান্ত বেকুফ মনে করিয়া তাচ্ছিল্যভরে বিদ্রূপাত্মক 'বিবি' নামে অভিহিত করিতেন। আতঙ্কের মধ্যে সুরসিয়ের দিন কাটিত। অন্য কোথাও গিয়া আশ্রয় লইবার স্থান বেচারার ছিল না। ভোর ছয়টায় শয্যাত্যাগ করিয়া, সমস্ত কাপড়-চোপড় গায়ে জড়াইয়া শ্রীমতী প্রচণ্ড তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিতেন। মাথার ধ্বংসাবশিষ্ট চার পাঁচ গোছা চুল তালুর উপর তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখী একটি ঝোটন বাঁধিয়া রাখিতেন। ধারাল, লিক্‌লিকে, কর্কশ জিহ্বার ভয়ে মুখ-গহ্বর হইতে প্রক্ষিপ্ত এক পাটি দন্ত সর্ব্বদাই আঘাতোদ্যত রাখিয়া শ্রীমতী এই কাপড় কাচিতেছেন,—ঐ কাপড় শুকাইতে দিতেছেন,—আর অবিশ্রান্ত চীৎকারে বাড়ী মাথায় করিয়া বেপথুমান স্বামী বেচারাকে এঘর-ওঘর তাড়াইয়া ফিরিতেছেন! বিশ বছরের দাম্পত্য-জীবনের পরও বেচারার সামান্য ত্রুটিটুকু পর্য্যন্ত শ্রীমতী ক্ষমার চক্ষে দেখিতেন না।

সুরসিয়ে মনে মনে একটি প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুষিতেন। সাতান্ন বছর বয়সে মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বহর অনেকটা খাটো হইয়াই আসে। তবু এই একটি মাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহই সুরসিয়ের জীবনভার অনেকটা হাল্কা করিয়া রাখিয়াছিল।—কোনো এক নির্জ্জন প্রদেশে রৌদ্রকরোজ্জ্বল একটি কক্ষে একাকী বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কতকগুলি রঙীন চিত্রাঙ্কণ শেষ করিয়া লইবেন। চিত্রগুলিতে বিভিন্ন রঙের আতিশয্যে তিনি তার একটানা জীবনের ক্ষতি পোষাইয়া নিতে চাহিয়াছিলেন। তার ছবিগুলি ছিল বাস্তবিকই বড় অদ্ভুত এবং

চিত্রপদ্ধতিও ছিল অত্যন্ত মৌলিক। তার আঁকা কিম্ভূত-কিমাকার নারীমূর্ত্তিগুলি সৃষ্টিছাড়া ফুলের মত দেখাইত। কুকুর আঁকিলে কুমীর বলিয়া ভ্রম জন্মিত। গোলাপফুল এবং ফুলকপির ছবিও তিনি আঁকিতেন। নারী চিত্র যেগুলি আঁকিতেন তার সবটিই ছিল নগ্ন,—ঠোঁটে ব্যর্থ হাসি, চোখ দু'টি যেন মখমলের তৈরি, নিম্নাঙ্গে চিত্তাকর্ষক বাঁকা টান ও রঙের পোছ থাকিত।

"পাগলের আঁকা ছবি!" সুরসিয়ের চিত্র সম্বন্ধে ইহাই ছিল তার পত্নীর অভিমত।

স্বামীর কাগজ, পেন্সিল ও রঙ কেনার খরচের বরাদ্দ শ্রীমতী দিন দিন কমাইয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে ঐ সব নাদুস-নুদুস, বিবংসাবাঞ্জক, হাস্যমুখী স্ত্রী মূর্ত্তির দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া শ্রীমতী শীতকালে ছবিগুলি উত্তপ্ত উননে এবং গ্রীষ্মকালে ময়লা জলের বাল্‌তীতে সমানেই নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর হইতে সুরসিয়ে স্ত্রীকে রীতিমত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। প্রকাশ্য-বিদ্রোহের সাহস না থাকায় তিনি স্ত্রীর পানে শুধু বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন এবং ঘর হইতে যতদূর সম্ভব দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন তিনি নিকটেই ছোট একটি কাফেতে গিয়া হাজির হইলেন; কিন্তু বসিবার আসন তার পক্ষে এত উঁচু ছিল যে পা দু'খানি মাটী না ছুঁইয়া শূন্যে ঝুলিয়া রহিল! সুরসিয়ের ভারি লজ্জা বোধ হইল! এর পর তিনি আর কাফেতে যান নাই। তার উপর আবার আরেক বিপদ ঘটিল। কাফির মূল্য বাবত চল্লিশ সাঁতীম দেওয়ায় চুরুটের তহবিলে ঘাটতি পড়িয়া গেল। তখন তিনি জাতীয় চিত্রশালায় যাতায়াত সুরু করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এত ছবির নকলই তিনি করিয়াছিলেন যে আর বেশী ছবির নকল করা কষ্ট-জ্ঞান হইল। বাধ্য হইয়া তাহাকে বাড়ীতেই থাকিতে হইল এবং স্ত্রীর বকুনীও পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া চলিল!

ফরাসী চিত্র-পরিষদের সদস্য, বেঞ্জামিনের সহপাঠী ফ্রেদেরিক লাক্লোক ঝেনিদ্রে নিমন্ত্রণ-উপলক্ষে যেদিন তাহাদের বাড়ীতে আহার করিতে আসিলেন, সুরসিয়ের দুর্দ্দশার মাত্রা সেদিন পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভোজনের পর ক্লারা অন্য ঘর হইতে স্বামীর সদ্য-আঁকা কতকগুলি ছবি লইয়া আসিয়া বলিলেন "শিল্পী-হিসাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি এই ছবিগুলো সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?"

লাক্লোক ঝেনিদ্রে চোখে চশমা আঁটিয়া ছবিগুলি ভাল রকম নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন: "নিরপেক্ষ সমালোচনা করলে বলতে হয়, বদ্ধ পাগল ছাড়া অমন ছবি কেউ আঁকে না। ঐ কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তিগুলোকে চিত্তাকর্ষক করবার জন্য স্থানে স্থানে যে ভাবে গভীর বক্ররেখা টানা হয়েছে এবং গাঢ় রঙের পোছ লাগান হয়েছে, তাতে মনে হয় যে চিত্রকর ভ্রষ্টচরিত্র! চিত্রের সূক্ষ্মাংশে বেজায় অসামঞ্জস্য রয়ে গেছে। ঘাসের পাতা দেখতে হয়েছে ঠিক গাছের গুঁড়ি। সহজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য চিত্রকরের বিকট উন্মাদনা ছাড়া এ সব ছবিতে আর কিছুই প্রকাশ পায় না!"

আর যায় কোথা! ঝেনিদ্রে চলিয়া যাইতেই শ্রীমতী উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রীতিমত সমর নৃত্যে নাচিয়া তিনি স্বামীর গোলা-রঙের বাটিগুলি একের পর আর ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন:

"তুমি কি ভেবেছ যে এই সব বিকট জীবের জন্য রঙ ও কাগজের খরচ যোগান দিয়ে আমি আর সর্ব্বস্বান্ত হব? না বন্ধু, না! এখন তুমি বলতে পারবে না যে আমি কিছু অন্যায় করছি। তোমার বন্ধু, শুন্‌ছো?—তোমারই বন্ধু, চিত্র-পরিষদের সদস্য—তোমার মুখের উপর কি বলে গেলেন?—এ সব পাগলের আঁকা ছবি!—বুঝলে?—পাগলের! পাগলের!—"

বার বার পাগল বলায় বেঞ্জামিনের মগজে এক ফন্দী গজাইল। আগে যে কেন এই ফন্দী গজায় নাই, এই ভাবিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। হায়, হায়,—তাহা হইলে যে বহু দিন পূর্ব্বেই তিনি মুক্তি পাইতেন!

সুরসিয়ে ধীরে ধীরে বলিলেন: "ক্লারা, তোমায় একটি কথা বলব!"

"বেশ, বল। থামলে যে?"

"আমি পাগল নই। আমি বেটোফেনের আত্মা!"

"কি!"

"আমি বেটোফেনের আত্মা! বেহালার তার দিয়ে

আমি ছবি বুনি; আমার ঠোঁট বেয়ে যে সব কথা ঝরে তাই নিয়ে অপ্সরা সঙ্গীত-রচনা করে। ট্রো-লা-লা-টো··· আমার বুকের পানে চেয়ে দেখ, পুষ্পগ্রন্থ গুল্মোন্থানে সাপের ফণায় তারকাঙ্কিত সম্মান চিহ্ন দেখছ না? আমার নখের ডগায় তারকার অশ্রুজল টলমল করছে! পা দু'খানি মেঘের রাজ্যে বিচরণ করছে। ঝিম্! ড্রান্! বিপ্লবের আদিগুরুর নিকট সকলে মস্তক অবনত কর! চুরুটের কাগজে তিনি সর্দ্দিজ্বর আরাম করে দেবেন···"

এই অসম্বদ্ধ প্রলাপের শেষ শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই ক্লারা ভয়ে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে পাচক ও দাসী সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া বলিতেছে: "মাদাম, মঁস্যোর ভয়ে আমরা ঘরে ঢুকতে পারছি নে।... ঐ যে তিনি ভোজনাগারে···"

বাস্তবিকই বেঞ্জামিক ভোজনাগারে!—বেঁটে কিন্তু ঠিক প্রস্তরমূর্ত্তির মত! দেহাচ্ছাদনীর মধ্যে শুধু দাড়ি! দেয়ালে-টাঙ্গান মলয়-দেশীয় একখানা ছোরা খুলিয়া অনবরত ঘুরাইতেছেন!

স্ত্রীকে দেখিয়াই বেঞ্জামিন বলিলেন: "শীগ্‌গীর হাঁটু গাড়, বেহায়া মেয়ে! আজ তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত! আগে তোমার দাঁত ক'টি টেনে বের করব, তারপর তোমায় কোতল করব।"

স্বামীকে ভয় দেখাইবার জন্য মাদাম বলিলেন: "শীগ্‌গীর কাপড় পর, বেঞ্জামিন! নইলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে'বলে রাখছি!"

কিন্তু বেঞ্জামিন দমিলেন না। পাগলের অভিনয় করিতে লাগিলেন। ইহাতে হয় ত কারাবাস ঘটিতে পারে—কিন্তু সে যে তার মুক্তি! দূরে—অতিদূরে—স্ত্রী হইতে বহুদূরে—উদ্যান-বেষ্টিত একেলা একটি কক্ষে তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। মানুষ সেখানে গিয়া তাহাকে বিরক্ত করিবে না। ছবি আঁকিয়া আর চুরুট ফুঁকিয়া আনন্দে তাহার দিন কাটিবে! চব্বিশ ঘণ্টা স্ত্রীর খিট্-খিট্ আর সহ্য করিতে হইবে না। পাগলের সাহচর্য্যে দার্শনিকের ভয় কি?—মানুষের প্রকৃত সত্তা যে দার্শনিক পরখ করিয়া দেখিয়াছেন!

এমনই চাতুর্য্যের সহিত সুর্‌সিয়ে বদ্ধ-পাগলের অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলেন, যে সামান্য পরীক্ষার পরই তাহাকে ডাক্তার ব্লিকের পাগলা-গারদে স্থানান্তরিত করা হইল। যেমন তিনি আশা করিয়াছিলেন, সেখানে তেমনি আলো-বাতাস-ভরা, উদ্যান বেষ্টিত একটি কামরা, লিখিবার একখানা টেবিল এবং বেশ চওড়া একখানি আরাম-কেদারা তাহাকে দেওয়া হইল। গারদে ঢুকিয়া ধারা স্নানে সুর্‌সিয়ে শরীর ও মনের সঞ্চিত গ্লানি ধুইয়া নিলেন। এখন আর লক্ষীছাড়ার মত জীবনযাপনের প্রয়োজন কি? ডাক্তারকে বলিলেন যে বর্ত্তমানযুগের প্রতিভাশালী শিল্পীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রধান,—এবং তিনি নিজে একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। এই সব কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিশেষজ্ঞেরা ধরিয়া নিলেন যে বেঞ্জামিনের রোগ চিকিৎসার অতীত!

অন্য সব উন্মাদ-রোগীর সহিত তিনি আলাপ পরিচয় জমাইয়া লইলেন। উহাদের মধ্যে একজনের ধারণা ছিল যে একদিন সে জল, অন্যদিন বরফ হইয়া যায়। হয় প্রতি-বেশীকে ডুবাইয়া মারিবে, নয় সে নিজে ভাঙ্গিয়া যাইবে—এই ভয়েই বেচারা সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত। সত্তর বছর বয়সের এক দেব-শিশুর সহিতও সুর্‌সিয়ের আলাপ হইল। তিনি ভাবিতেন যে ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বদাই তিনি গোপন-পরামর্শে নিযুক্ত আছেন। কি নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি! ছবি আঁকিতে আঁকিতে বেঞ্জামিন নিজবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। শুধু যে তিনি শান্তিই উপভোগ করিতেছিলেন এমন নহে, মৃত্যুর পূর্ব্বে জগতকে শ্রেষ্ঠদানে পরিতুষ্ট করিবার তৃপ্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিতেছিল। মাঝে মাঝে মন যখন খারাপ ঠেকিত, তখন হয় তিনি খবরের কাগজ পড়িতেন, নয় পত্নীর স্মৃতি মনে জাগাইয়া তুলিতেন—মুহূর্ত্তে বিমর্ষ-ভাব কাটিয়া চিত্তে প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিত।

এই শান্তিময় আশ্রমে সুর্‌সিয়ের এগারো মাস কাটিয়া গেল। আপন ভ্রান্তিতে বন্দীরা এখানে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করে!

একদিন সকালে সুর্‌সিয়ের কামরায় ঢুকিয়া ডাক্তার অতি বিনীতভাবে বলিলেন: "আপনাকে বোধ হয় বিরক্ত করছি না! যখনই আসি, তখনই দেখি আপনি কাজ করে যাচ্ছেন,—চমৎকার!

পাছে ডাক্তার তাহার স্বরূপ বুঝিয়া ফেলেন এই ভয়ে সুর্‌সিয়ে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন : "বুঝেছেন ডাক্তার, আমার মত প্রতিভাশালী চিত্রকর জগতে দুর্ল্লভ !"

"সে তো জানা কথা ! আমি কিন্তু আপনার জন্য এক আশ্চর্য্য খবর নিয়ে এসেছি আপনার সুখের দিন এসেছে··· আপনার স্ত্রীও শীগ্‌গীরই এই গারদে ভর্ত্তি হচ্ছেন...তিনি আপনার খুব কাছে—পাশের কামরাতেই থাকবেন।··· তাকেও উন্মাদ-রোগে ধরেছে···এখন থেকে তিনি আর আপনাকে ছেড়ে থাকবেন না। তার স্নায়ু দুর্ব্বল হয়েছে... এই খানেই তাকে বিশ্রাম করতে হবে !"

বিস্ময়-বিমূঢ় সুরসিয়ে যখন মনে মনে বোঝা-পড়া করিতেছিলেন যে এবার তিনি সত্যই পাগল হইয়া গেলেন কি-না, ঠিক সেই সময় ডাক্তার দরজা খুলিয়া দিলেন। খোলা দরজা দিয়া মাদাম সুর্‌সিয়ে ঘরে প্রবেশ করিলেন—চেহারার কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। ভুরু দুইটি উপরে তোলা ; ঠোঁট দুইখানি ফাঁক ; এক হাতে নিবানো মোমবাতি একটি লীলা-কমলের মত আল্‌গোছে ধরিয়া আছেন !

ডাক্তার ব্লিক বলিলেন ; "আমি এখন যাই !"

ডাক্তার চলিয়া গেলে মাদাম সুর্‌সিয়ে মোমবাতিটি মাটিতে রাখিয়া তাহার স্বাভাবিক চেহারা ফিরাইয়া আনিয়া স্বামীকে বলিলেন : "এখন বোধ করি তুমি প্রকৃতিস্থই আছ, কেমন ? আমি যা বলছি তা বুঝতে পারছ ?"

অতি কষ্টে শ্বাস টানিতে টানিতে হতভাগ্য সুর্‌সিয়ে বলিলেন ; "হ্যাঁ, হ্যাঁ,—কিন্তু এ সবের মানে কি ?"

"ভয় পেয়ো না। আমি মোটেই পাগল হইনি। শুধু এই গারদে আবদ্ধ থাকব বলেই পাগলামীর ভাণ করেছি। অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলুম যে তোমায় ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না, প্রিয়তম !" *

ক্ষীরোদচন্দ্র দেব

* ফরাসীলেখক আঁরি দুভার্‌নোয়ার গল্প হইতে।

লছমনঝুলায় গঙ্গা

শ্রীনবেন্দু বসু এম্‌-এ

তুমি চল তরঙ্গিনী উছল চপল
তুলি শত ছন্দকণা ও চরণ ভঙ্গে,
বনানী মুখর করি তব কলরঙ্গে,
তোমা ঘিরি তবু গিরি রহে তো অচল !
কঠিনের বুক বাহি চল গো তরল
ফেনিল মদির তব যৌবন তরঙ্গে,
হরষে মিলায়ে সুর বিহঙ্গের সঙ্গে,
তোমা বুকে ধরি গিরি তবু তো অটল !
ধ্যানেতে মগন সে যে কোন মহাধ্যানী,
পাদপীঠ তলে যার নাচ লঘু সুখে ;
সহজে ধরেছে সেই অনাসক্ত জ্ঞানী
ও রজত রূপরেখা সে ধূসর বুকে—
সে যে কোন মহাযোগী মগ্ন নিজ যোগে
বৈরাগ্য মাঝারে যেবা ধরে' রাখে ভোগে

ব্রহ্ম, কর্ম্ম ও জগৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন—তিনি উপনিসদোক্ত কবি। তিনি প্রেমিক, ঋষি, সাধক। তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়া একটা উচ্চস্তরের সাধনা বা উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক জীবন যাপন চলিতেছে। কবির জীবন যেন ব্রহ্মের আনন্দে গড়া একখানা কাব্য। তাঁহার রস-সৃষ্টির মধ্যে সেই পরিচয় স্বতঃই আমাদের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠে। কবি বলেন—

তব আনন্দ দীনতা চূর্ণ করি
ফুটে উঠে ফেটে আমার সকল কাজে।

ব্রহ্মের আনন্দ-রসে কবি-চিত্ত পরিপূর্ণ। দৃষ্টি কেবলই তাঁহাতে নিবদ্ধ—

"কেবল থাকা কেবল চেয়ে থাকা"

এ চাওয়া শুধুই চাওয়া—সার্থকতার চাওয়া নয়। কবির এ যেন স্বভাব—তাঁহার সৃষ্টির সঙ্গে এ যেন জড়িত। তাঁহার প্রাণ না চাহিয়া থাকিতে পারে না; তাই—

কৃপা নাহি পাই
শুধু চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

অরূপের অনন্ত অমৃতরূপে প্রাণারাম অনুপম রূপমাধুরীতে তাঁহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন।

কিন্তু যে প্রেম এমন একান্তভাবে সমগ্র অস্তিত্বকে জড়াইয়া আছে তাহা বিশ্বসৃষ্টিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া কবির সত্ত্য-বোধকে অপূর্ণ করিয়া তোলে নাই।

বিশ্বজনের কলরবের মাঝে স্নেহেপ্রেমে সুখে দুঃখে ভালো মন্দে প্রিয়তমের রস-সায়রে ডুবিয়া থাকিতে কবির আকাঙ্ক্ষা—

মন্দ ভালোর আঘাত বেগে
তোমার বুকে উঠ্‌বো জেগে,
শুনব বাণী বিশ্বজনের কলরবে।

'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'র ধর্ম্ম কবির নয়। নিখিল বিশ্বে বিশ্ববাসীর মিলনে বিশ্বনাথের সহিত কবি মিলিত হইয়া থাকিতে চাহেন—

সবার মাঝে আমার সাথে থাক,
আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাক,
নিয়ত মোর চেতনা 'পরে রাখ
আলোক ভরা উদার ত্রিভুবন।

অরণ্যের মাঝে নয়, হাটের মাঝেই কবি প্রেমের মন্দির গড়িয়া লইলেন—

প্রবল প্রেমে সবার মাঝে
ফিরব ধেয়ে সকল কাজে
হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে।

সংসারের বন্ধনকে সোনার অলঙ্কার করিয়া গলায় পরিয়া মুক্তি-কামী কবি

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

গাহিয়া এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিলেন। এই বার্ত্তা, এই বাণী ধূলি-মলিন সংসারকে সুষীম সুন্দর সুমধুর করিয়া ধরিয়া মানুষকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ ও বিশ্বদেবতাকে সর্ব্বকর্ম্মে জাগ্রত করিয়া দিল, প্রেমে প্রেমে মানুষকে বাঁধিয়া দিল. সংসারের মায়া-বিশ্বাসীর ভগ্নহৃদয়ে আশ্বাস দান করিল। মানুষ চমৎকৃত ও আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমাদের জাতীয় জীবনে এই বাণী আশীর্ব্বাণীর মত ঝরিয়া পড়িল। সমস্ত বাধাবিঘ্নের, ভালোমন্দের মধ্য দিয়া কর্ম্মের যোগে অনন্তের সহিত যোগসাধনই মুক্তির আদর্শ করিয়া কবি গাইলেন—

রাখোরে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।

সংসারের নিত্যসার কর্ম্মজীবনের সহিত ধর্ম্মকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া কবি এক নূতন আদর্শ দ্বারা মানবতাকে উচ্চতর করিয়া গড়িয়া লইলেন।

"কর্ম্মত্যাগী ততো ব্রহ্মনিষ্ঠামর্হতি নেতরঃ"—যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার যোগ্য, অন্যে নহে—বিজ্ঞদের এই সনাতন ধারণার বিরুদ্ধে কবি নব সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিলেন। কবি বলিয়াছেন —"ব্রহ্মহীন কর্ম্ম অন্ধকার এবং কর্ম্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। কারণ তাকে নাস্তিক বল্লেও হয়। যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এই সমস্ত-কিছু-বিবর্জ্জিত করে' দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয় সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।"

কর্ম্ম মায়া নয়—মানুষের আত্মার পক্ষে একান্ত সত্য। কর্ম্মের প্রতি আত্মার যে স্বাভাবিক টান তাহাই প্রমাণ করে যে কর্ম্মহীনতা আত্মার অসম্পূর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা মুক্তি আনিতে পারে না। পূর্ণতাই মুক্তি।

কিন্তু কর্ম্মকে আনন্দের আলোকে প্রোজ্জ্বল রাখিতে হইবে। কর্ম্ম হইবে আনন্দসাধন। আনন্দ নাই বলিয়াই কর্ম্ম বন্ধন হইয়া দাঁড়ায় এবং লক্ষ্য হয় "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি"। আসল কথা আনন্দস্বরূপের আনন্দে দৃষ্টিপূর্ণ রাখিয়া কর্ম্মের মধ্যে জীবনকে ভাসাইয়া দিতে পারিলেই সংসারের মায়া-মলিন কুৎসিত অঙ্গ সোনায় সোনায় ভরিয়া উঠে; মোহময় কর্ম্মজগৎ মুক্তিভরা এক মধুর মহাসৃষ্টিতে পরিণত হয়। কবি বলিতেছেন—

"আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি। কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা আমাদের জন্মায়নি বলেই কাজের সঙ্গে আনন্দকে আমরা ভাগ করে ফেলেছি৷ কাজের দিন আমাদের আনন্দের দিন নয়; আনন্দ করতে যেদিন চাই সেদিন আমাদের ছুটি নিতে হয়। কেন না, হতভাগ্য আমরা, কাজের ভিতরেই আমরা ছুটি পাইনে। প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই নদী ছুটি পায়, শিখারূপে জ্বলে ওঠার মধ্যেই আগুন ছুটি পায়, বাতাসে বিস্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই ফুলের গন্ধ ছুটি পায়—আপনার সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেই আমরা তেমন করে ছুটি পাইনে। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিইনি বলে, দান করিনে বলে কর্ম্ম আমাদের চেপে রাখে।"

—শান্তিনিকেতন।

তারপর কবি একটি প্রার্থনায় জীবনকে, সংসারকে, কর্ম্মকে সুমহান রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া শক্তির যে উদ্বোধন মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন তাহার উল্লেখ দ্বারা প্রবন্ধটী শেষ করিতেছি—

"হে আত্মদা, বিশ্বের কর্ম্মে তোমার 'আনন্দ-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে কর্ম্মের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা আগুনের মত তোমার দিকেই জ্বলে উঠুক, নদীর মত তোমার অভিমুখেই প্রবাহিত হোক, ফুলের গন্ধের মত তোমার মধ্যেই বিস্তীর্ণ হতে থাক জীবনকে তার সমস্ত সুখ দুঃখ, সমস্ত ক্ষয়পূরণ, সমস্ত উত্থানপতনের মধ্য দিয়েও পরিপূর্ণ করে ভালবাসতে পারি এমন বীর্য্য তুমি আমাদের মধ্যে দাও। তোমার এই বিশ্বকে পূর্ণ শক্তিতে দেখি, পূর্ণ শক্তিতে শুনি, পূর্ণশক্তিতে এখানে কাজ করি। জীবনে সুখ নেই বলে, হে জীবিতেশ্বর, তোমাকে অপবাদ দেব না। যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ, এই জীবনে পরিপূর্ণ করে আমি বাঁচব, বীরের মত একে আমি গ্রহণ করব এবং দান করব এই তোমার কাছে প্রার্থনা। দুর্ব্বলচিত্তের সেই কল্পনাকে একেবারে দূর করে দিই যে কল্পনা সমস্ত কর্ম্ম থেকে বিমুক্ত একটা আধারহীন, আকারহীন, বাস্তবতাহীন পদার্থকে ব্রহ্মানন্দ বলে মনে করে। কর্ম্মক্ষেত্রে মধ্যাহ্ন সূর্য্যালোকে তোমার আনন্দস্বরূপকে প্রকাশমান দেখে হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে সর্ব্বত্র যেন তোমার জয়ধ্বনি করতে পারি। মাঠের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে কঠিন মাটি ভেঙে যেখানে চাষা চাষ করচে সেইখানেই তোমার আনন্দ শ্যামল শস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠচে; যেখানেই জলা জঙ্গল গর্ত্ত গাড়ীকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলচে সেই খানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়চে; যেখানে স্বদেশের অভাব দূর করবার জন্য মানুষ অশ্রান্ত কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে অজস্র দান করচে

সেইখানেই শ্রীসম্পদে তোমার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।"

কবি স্রষ্টার মাধুর্য্যে সৃষ্টিকে ডুবাইয়া লইয়া প্রতি গতিতে, প্রতি কার্য্যে তাঁহার আনন্দকে উপলব্ধি করিয়াছেন। ব্রহ্মের রসসৌন্দর্য্যে ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কাছে ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিয়াছে। আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি। কোথাও দুঃখ নাই, মৃত্যু নাই, দৈন্য নাই—বিশ্ব মুক্তিভরা আনন্দধাম, সর্ব্ব কর্ম্ম আনন্দসাধন। কবি আত্মার ধর্ম্মকে সত্য করিয়া দেখিয়াছেন—Sky Larkএর—

True to the kindred points of
Heaven & home এরই ভাবে।

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।"

বাস্তব অবাস্তব, এক ও বহু এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের সহজ সৌন্দর্য্যে কবির কাব্যে ও সাহিত্যে নানাস্থানে নানারূপে মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইটিই কবির শ্রেষ্ঠদান।

অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

মানসী

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম-এ

এসো রমা, মনোরমা, এখানেতে এসোনা!
তোমারে যা' বলি আমি শুনে যেন হেসোনা।
তুমি মোর ওগো দেবী, প্রমোদের প্রতিমা,
মাধবের মধু, যেগো মদনের মহিমা!

শ্যামলের শ্যামলিমা, কুসুমের সৌরভ,
তরুণের তরুণিমা, বিজয়ের গৌরব;
চপলার চপলতা, জোছনার মাধুরী,
গোধূলির কপোলের বরণের চাতুরী!

লতিকার তুমি ফুল, কোকিলার গানটি,—
নিখিলের প্রণয়ের বাঁশরীর তানটি।
সরমের রাঙা আভা, কামনার মদিরা,
বাসরের হিয়াখানি দ্বিধা-ভরা অধীরা!

মলয়ের পবনের রসায়ণ তুমি গো,
কবিতার সুষমার জনমের ভূমি গো!
উষা-ভালে তুমি যে গো শুকতারা টীপ্‌টি,
তুলসীর তলে জ্বলা প্রদোষের দীপটি!

তটিনীর কলগানে তুমি মধু রাগিনী,
রাকা-শশী আঁকা বুকে নিদাঘের যামিনী;
ভয়-পাওয়া হরিণীর তরলিত তারা গো,
প্রকৃতির পুলকের আঁখি-ঝরা ধারা গো!

বাসনার সাধনার নিরবাণ রাণী গো,
আশা-সুখ সবকিছু তোমারই মানি গো!
যমুনার পুলিনের তুমি রাধা মানিনী,
তুমি মোর কী যে নও আজিও তা' জানিনি।

ফাগুন-সনেট

শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত বি-এ

১

সুদূর বিদেশে হঠাৎ এসেছে ভাসি
ফাগুন আমার চেনা চেনা যেন লাগে
হঠাৎ আকাশ উজলি উঠেছে হাসি
মুখখানি তব জাগে মনে অনুরাগে।
দিনগুলি মোর কাটিতেছে পরবাসে
তবু মনে হয় নহি যেন বহু দূরে
নয়নে আমার স্বপন জড়ায়ে আসে
ফাগুন এসেছে অতি পরিচিত সুরে।
এমনি ফাগুন দিনে নয়নে আমার
চেয়ে তুমি বলেছিলে দুটি হাত ধরে,—
"তুমি যে আমার আর আমি যে তোমার"
নীরবে জোছনা ধারা পড়েছিল ঝরে'।
আজো কি তোমার চোখে নীলিমা আমার
সুনীল স্বপন আঁকি দেয় থরে থরে ?

২

সুদূর গগনে আকাশের কোণে আজি
সন্ধ্যা তারাটি নিরখি ভরিল মন
বন পল্লব মর্ম্মরি ওঠে বাজি
ফাগুন এসেছে ব্যাকুল বকুল বন।
বাতায়ন মোর খুলিয়া দিয়েছি তাই
নয়নে এঁকেছি স্বপন কাজল লতা
বারে বারে আজ ফিরে ফিরে শুধু চাই
অন্তরে রাখি মৌন এ ব্যকুলতা।
তুমিও কি আজ বাতায়ন তলে বসি
নীরবে হেরিছ সন্ধ্যা তারার হাসি ;
লুটায়ে পড়িছে অঞ্চল খসি খসি
বাতাসে উড়িছে শিথিল অলক রাশি ;
অন্তর তব ওঠে নাকি নিঃশ্বসি
মনে নাহি জাগে কারে যেন ভালবাসি !

৩

আবার এসেছে আকাশ জুড়িয়া আজি
ফাগুনের শেষে পূর্ণচাঁদের রাতি,
মুখর হয়েছে আবার বাঁশরী বাজি
বেনু মর্ম্মরে বাতাস উঠিছে মাতি ;
জ্যোছনায় হেরি ভরিয়া গিয়াছে নিশা
এলোমেলো বহে বাতাস বিপথগামী
পাপিয়া আকুল হারায়ে ফেলিছে দিশা
চাঁদ জাগে আর বিভাবরী জাগি আমি।
তোমার দেশেতে ওঠে নাকি পাখী গাহি
বাতাস বহেনা আকুল বিহ্বল হায় ?
তোমার দেশেতে চাঁদের কিরণে নাহি
নয়ন মেলিয়া কুমুদ নাহি কি চায় ?
তুমিও কি আজ জ্যোছনায় অবগাহি
রাত্রি জাগিছ একা বসি নিরালায় ?

৪

বকুল পড়িছে ঝরি, ম্লান হয়ে আসে
গোধূলির আলো আকাশের নীল গায়,
পাপিয়া কাঁদিয়া কহে উদাস বাতাসে
আজিকে আমার ফাগুন ফুরায়ে যায়।
অপরাজিতার সুনীল পতাকা হেরি
ধূলায় লুটায় ছিন্ন মলিন হায়
মাধবীর আর নাহি যেন সহে দেরী
গোপন চরণে ফাগুন ফুরায়ে যায়।
তুমিও ত গেছ চলি। তাই থাকি থাকি
আকুল নয়ন মোর হয় আনমনা,
তুমি চলে গেছ বলে' তোমারে যে ডাকি
সকল সঙ্গীতে জাগে করুণ মূর্চ্ছনা,
কবে সে দখিন হাতে বেঁধেছিলে রাখি
তুমি ভুলে গেছ যদি আমি ভুলিব না।

ফাল্গুন, ১৩৩৯

গোচর

শিল্পী — শ্রীইন্দু গুপ্ত

"শেষ প্রশ্ন"

শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাস এম্-এ, বি-টি

শরৎচন্দ্রের "শেষপ্রশ্ন" আমাদের মনে সত্যই কতকগুলি প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। লেখক যে সমস্যাগুলি আমাদের সাম্‌নে তুলে ধরেছেন সেগুলি নূতন না হ'লেও দুরূহ। সেগুলি সম্বন্ধে ভাব্‌বার অনেক আছে। এসব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য লেখকেরা অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। কিন্তু সমস্যাগুলির শেষ মীমাংসা কেউই কর্‌তে পারেন নি বা কর্‌তে চান্ নি। "শেষ প্রশ্নের" লেখকও সমস্যার সমাধান কর্‌তে প্রয়াস পান্ নি বলেই মনে হয়। তাঁর নিজেরই ভাষায়—"কোন দেশেই মানুষের পূর্ব্বগামীরা শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গিয়েছেন এমন হ'তেই পারে না। তাহ'লে সৃষ্টি থেমে যেতো। এর চলার কোন অর্থ থাক্‌তো না।" কথাগুলি খুব সত্য এবং আমার মনে হয় উপন্যাসখানি বিচার কর্‌বার এটিই হচ্ছে গোড়ার কথা। কোন যুগেই কোন সমস্যার শেষ সমাধান সম্ভব নয়। যুগযুগান্তর ধরে' মানুষ তাহ'লে পুরাতনের সনাতন ছাঁচে গড়ে' উঠ্‌তো। আমাদের নীতির ধারণা, গৌরবের আদর্শ, পাপপুণ্য-বোধ যদি চিরকাল ধরে' একই থাক্‌তো তাহ'লে জগতে কোনও নূতন সত্যই কোনদিন প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌তে পার্‌তো না। আমরা তাহ'লে "finished and finite clods, untroubled by a spark" হ'য়ে পড়্‌তাম। মনের এই চিরস্থবিরতা সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়,—স্বাভাবিক তো নয়ই। তাই যুগে যুগে নব নব সমস্যা আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে, আমাদের চিন্তার ধারা বিভিন্ন পথের সন্ধানে ফিরেছে ও ফির্‌বে। একদিন যা'কে কোন সমস্যার শেষ মীমাংসা বলে' লোকে ধরে' রেখেছিল কোন যুগেই যে তা' মিথ্যা বলে' প্রমাণিত হ'বে না তা'কে বল্‌তে পারে? "জগতের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়" তো লেখা শেষ হ'য়ে যায় নি। মনের সচলতা ও চিরতারুণ্য অক্ষুণ্ণ রাখাই আমাদের জীবনের পরম প্রয়াস হওয়া উচিত। না হ'লে কালের গতিতে আমরা পেছিয়ে পড়্‌বো। বইখানিতে লেখক যে মতামতগুলি প্রকাশ করেছেন সেগুলির যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে একথা বল্লে' বোধ হয় অতিশয়োক্তি হ'বে না যে লেখক এর মধ্যে দিয়ে কতকগুলি এমন সত্যকথা বল্‌বার প্রয়াস পেয়েছেন যেগুলি আমরা কোনমতেই অবজ্ঞা বা উপেক্ষা কর্‌তে পারি না, যদিও তাদের অকরুণ দুঃসাহসিকতা ও নির্ম্মম স্পষ্টতা সকলেরই অন্তরকে আঘাত করে। অনেক মতই আমাদের "দৃঢ়মূল সংস্কারে আঘাত দেয়। চিরকাল ধরে' আমরা যাকে অখণ্ডনীয় সত্য বলে' জেনে এসেছি, যে আদর্শকে জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে' এসেছি, যখন শুনি তাতে' সত্যকার গৌরব কিছু নেই, তা' শুধু বহুদিন ধরে' আমাদের নিকট মিথ্যা মর্য্যাদা পেয়েই বড় হয়ে' উঠেছে, তখন আমাদের স্বভাবতঃ সংরক্ষণশীল মন এই বিপ্লববাদের দুর্ণিবার দুঃসাহসিকতায় ভীত হ'য়ে পড়ে। আমরা ভাবি "এইবার গেল বুঝি সব।" কিন্তু "আমাদের কাণের ভিতর জ্বালা কর্‌তে থাক্‌লেও জবাব দেবার মত কথা খুঁজে পাই না।"

লেখক মীমাংসার দুই বিভিন্ন দিকই দুই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন বলে' মনে হয়। একদিকটা দেখতে পাই বিপ্লবের প্রতিমূর্ত্তি কমলের মধ্যে, অপর একদিকটা দেখ্‌তে পাই একনিষ্ঠতার প্রতিচ্ছবি আশুবাবুর মধ্যে। একজন গাইছে "উন্মাদ যৌবনের নির্লজ্জ স্তবগান।" আর একজন "পুরাতনের অন্ধ স্তাবক।" একজনের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তরুণের বিদ্রোহ—তার বিরাট স্বপ্ন, যা' দেশ-কালের সীমাকেও ছাপিয়ে উঠেছে। তার জীবনের মূল মন্ত্র—

> "চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
> জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে'
> প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার দিবি।"

আর একজনের মধ্যে দেখ্‌তে পাই নির্ব্বিকার শান্তি, অবিচলিত নিষ্ঠার আদর্শ, জাতীয়তার মোহন্ধতা। আশুবাবু আমাদের মনে করিয়ে দেন তাঁ'দেরই কথা যাঁ'দের সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

"বাহির পানে তাকায় না তো কেউ
দেখে না যে বাণ ডেকেছে
জোয়ার জলে উঠ্‌ছে প্রবল ঢেউ।"

এই দুই দিকের মধ্যে কোন একটা দিককেই আমরা অস্বীকার করতে বা মিথ্যা বলে' উড়িয়ে দিতে পারি না। জীবনের জটিল সমস্যাগুলি সংরক্ষণশীল "পুরাতনের অন্ধ-স্তাবকের" কাছে একরূপে দেখা দিয়েছে এবং চিরদিনই সে তাঁ'দের সমাধান অতীতের মধ্যেই সন্ধান করেছে—কারণ অতীতই তার একমাত্র মূলধন। তাই তার প্রয়াস অতীতের সনাতন আদর্শের উপর বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করা। আবার সেই সমস্যাগুলিই বিপ্লববাদী তরুণের কাছে অন্যরূপ ধারণ করেছে এবং সেগুলির মীমাংসাও সে সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে কর্‌তে প্রয়াস পেয়েছে। তাই আমরা আশুবাবু ও কমলের মধ্যে শক্তির দুই বিভিন্ন ধারা দেখ্‌তে পাই—একটি সংরক্ষণী শক্তি, অপরটি বিপ্লবী। আশুবাবুর "অবসন্ন জরাগ্রস্ত মন ভবিষ্যতের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাক্‌তে চায়। আর যেন তার কিছু কর্‌বার, কিছু পাবারই দাবী নেই।" বর্ত্তমান তাই তাঁর কাছে "লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত, অর্থহীন।" "অতীতই তাঁর সর্ব্বস্ব। তার আনন্দ তার বেদনা সেই তাঁর মূলধন।" তিনি যৌবনে তাঁর স্ত্রীকে একান্তভাবে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু তিনি বহুদিন লোকান্তরিতা হ'লেও আশুবাবু আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার কথা মনের কোণেও স্থান দিতে পারেন নি। তাঁর মৃতা পত্নীর "স্মৃতির সুধায়" তাঁর জীবনের পাত্রটী পূর্ণ। "ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে' মুছে। আছে কেবল একদিন যে তাঁকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা মনে। মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ লালন করে' বর্ত্তমানের চেয়ে অতীতটাকেই ধ্রুব জ্ঞানে জীবন যাপন করা"ই তাঁর আদর্শ। তাই জীবনের প্রদোষকালেও আবার যখন তিনি সুন্দরী যুবতীর কাছ থেকে প্রেমের অর্ঘ্য লাভ কর্‌লেন তখন সে প্রেমকে শ্রদ্ধা কর্‌লেও তাকে প্রত্যাখান না করে' পার্‌লেন না। নীলিমার ভালবাসাকে তিনি সন্দেহ করেন নি, বরং বলেছেন—"হাত পেতে নিতে পার্‌লাম না বটে কিন্তু কি বলে' যে একে আজ নমস্কার জানাবো আমি ভেবেই পাই নে।" কিন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান করাও তাঁর কাছে তেম্‌নি সত্য। কোন মতেই একে তিনি "নিষ্ফল আত্মবঞ্চনা" বল্‌তেও পার্‌লেন না। পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমের মূল তাঁর অন্তরে কোন অবস্থাতেই শিথিল হ'বার নয়। তাই তিনি কমলকে বল্‌ছেন—"মণির মায়ের বন্ধন যে আজও কাটাতে পারি নি তাকে তোমরা বল মোহ, বল দুর্ব্বলতা—কি জানি সে কি, কিন্তু এ মোহ যেদিন ঘুচ্‌বে মানুষের অনেকখানিই সেদিন ঘুচে যাবে।" অথচ তাঁর স্নেহকোমল অন্তর নীলিমার ব্যর্থ জীবনের নিষ্ফলতার জন্য ব্যথায় ভরে উঠেছিল। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে স্ত্রীর ভালোবাসা নারীর ভালোবাসার কেবল একটিমাত্র দিক। তবুও "অতীতের স্মৃতি" তাঁর সম্মুখের পথকে রোধ কর্‌লো। কিন্তু কমল এ নিষ্ঠার মূল্য বোঝে না। কারণ তার কাছে "জীবনের অর্থ স্বতন্ত্র।" সে তাই বল্‌ছে—"নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা' আমি বলি নে, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে' লোকে তাকে দিয়ে আসচে সেও তার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভালবেসেছি কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্ত্তন হ'বার যো নেই, মনের এই অচল, অনড়, জড়ধর্ম্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।" "আমার দেহ মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যেদিন জান্‌বো প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্ত্তনের শক্তি নেই সেদিন বুঝ্‌বো এর শেষ হয়েছে,—এ মরেছে।" কমল হ'চ্ছে সেই জাতের মানুষ যাঁ'দের "তৃষ্ণার শেষ বিন্দু জল নিঃশেষে পান করে' না নিলেই নয়।" সে চায় যেন সে "জীবনকে সবার মাঝে সহজ বুদ্ধিতেই" পায়। "আকাশ কুসুমের আশায় বিধাতার দোরে হাত পেতে জন্মান্তরকাল প্রতীক্ষা কর্‌বার ধৈর্য্য" তার নেই। তাই তার কামনা "ফলেফুলে শোভায় সম্পদে এই জীবনটাই যেন তার ভরে ওঠে।" সে বর্ত্তমানেই একান্ত-ভাবে বেঁচে থাক্‌তে চায়। সে তাই বল্‌ছে—"যখন যেটুকু

পাই তাকেই যেন সত্যি বলে' মেনে নিতে পারি। দুঃখের দাহ যেন আমার বিগত সুখের শিশিরবিন্দুগুলিকে শুষে ফেল্‌তে না পারে।" তার কাছে "এ জীবনে সুখদুঃখের কোনটাই সত্যি নয়।" "সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু।"

"যা আসে আসুক্, যা হ'বার হোক্,
যারা চ'লে যায় মুছে যাক্ শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক্, দ্যুলোক ভূলোক প্রতিপলকের রাগিণী।
নিমিষে নিমেষ হ'য়ে যাক্ শেষ বহি' নিমেষের কাহিনী॥"

এই যেন তার অন্তরের কামনা। "তাই ওর আশাও যেমন দুর্ব্বার, আনন্দও তেম্‌নি অপরাজেয়।" "অতীতের স্মৃতি ওর সুমুখের পথ রোধ করে না।" "আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েছে বলে' সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোনমতেই সম্মত নয়।" তাই যখন তার নিজের জীবনের সমস্যা জটিল হ'য়ে উঠ্‌লো তখনও সে এই সহজ সত্যকে স্বীকার করে নিতে একটুও দ্বিধা কর্‌লো না। শিবনাথকে সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই ভালোবেসেছিল। এই ভালোবাসার কথা সে নিজেই বলেছে—"সেদিন শিবনাথ যা' পেয়েছিলেন দুনিয়ায় কম পুরুষের ভাগ্যেই তা' জোটে।" তাদের বিবাহ 'অনুষ্ঠানে ফাঁকি থাক্‌লে'ও 'মনের মধ্যে ফাঁক্ ছিল না'। তারপর শিবনাথ যখন তাকে ত্যাগ করে' মনোরমার প্রতি আকৃষ্ট হ'লো তখনও সে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করে নি। সে আনন্দের স্থায়িত্বে বিশ্বাস করে না। তাই শিবনাথ যখন তাকে বঞ্চনা করলো তখনও সে বলছে—"আমি তাঁকে ক্ষমা করেচি। যা পেয়েছি তার বেশি কেন পাইনি এ-নিয়ে আমার এতটুকু নালিশ নেই।" দুঃখ যে সে পায়নি তা নয়। কিন্তু তাকেই সে জীবনের শেষ সত্য বলে' মেনে নিল না। শিবনাথের যা দেবার ছিল তা' সে দিয়েছে, তার যা' পাবার ছিল তা' সে পেয়েছে। "আনন্দের সেই ছোট ছোট ক্ষণগুলি" তার মনের মধ্যে "মণি মাণিক্যের মত" সঞ্চিত হয়ে রইলো। "নিষ্ফল চিত্তদাহে" তাদের পুড়িয়ে' সে ছাই করে' ফেল্‌তেও চাইল না, অথবা "শুক্‌নো ঝরণার নীচে গিয়ে' ভিক্ষে দাও বলে' শূন্য দু'হাত পেতে দাঁড়িয়ে" থাক্‌তেও সে যায় নি।

সে জানে যে "হৃদয় বস্তুটা লোহার তৈরি নয়"। তা'তে "অমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ভর দেওয়া যে চলে না" এ তথ্যও তার অবিদিত নয়। তাই শিবনাথকে বোঝাও তার পক্ষে সোজা হ'য়েছিল। শিবনাথকে সে নিরপেক্ষ ভাবেই বিচার করে' বল্‌ছে—"যেদিন থেকে তাঁকে সত্যি কোরে' বুঝেছি সেদিন থেকে ক্ষোভ অভিমান আমার মুছে গেছে, জ্বালা নিভেচে। শিবনাথ গুণী, শিল্পী—শিবনাথ কবি। চিরস্থায়ী প্রেম ওদের পথের বাধা, সৃষ্টির অন্তরায়, স্বভাবের পরম বিঘ্ন।...মেয়েরা শুধু উপলক্ষ—নইলে ওরা ভালবাসে কেবল নিজেকে।" তারপর অজিত যখন তাকে তার ভালবাসা নিবেদন করলো তখনও সে সত্যের সহজ দৃষ্টিতে জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে নিল। সে সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান কর্‌লো না। শিবনাথের প্রতি তার যে ভালোবাসার এককালে সীমা ছিল না সেই অতীত প্রেমের স্মৃতি তার ভবিষ্যতের পথে বাধা এনে দিল না। এক প্রেম তার জীবনে বিফল হ'লো বলে' চিরদিনই সেই "শূন্যতার জয় ঘোষণা" কর্‌তে তার ইচ্ছা হ'লো না। কারণ সে বুঝ্‌তেই পারে না "অসময়ে মেঘের আড়ালে আজ সূর্য্য অস্ত গেছে বলে' সেই অন্ধকারটাই" কেন সত্য হবে, "আর কাল প্রভাতে আলোয় আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায় দু'চোখ বুজে" তাকেই কেন মিথ্যে বল্‌তে হ'বে। তার কাছে এই নিষ্ফল আত্মবঞ্চনার কোন মূল্যই নাই। "গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায় তার ক্ষত নূতন পাতায় পূর্ণ করে' তোলে" এই তার কাছে জীবনের সত্য এবং ধর্ম্ম। এই সত্যকে সে অস্বীকার কর্‌বে কি কোরে? অজিতের প্রেম যে ক্ষণিকের মোহও হ'তে পারে এ সংশয়ও তার মনে কোন দ্বিধা এনে দিল না। ক্ষণও তার কাছে মিথ্যা নয়। "ক্ষণকালের আনন্দ নিয়েই সে বারবার ফিরে আসে।" "মালতী ফুলের আয়ু সূর্য্যমুখীর ন্যায় দীর্ঘ নয় বলে' তাকে মিথ্যে বলে' কে উড়িয়ে দেবে?" "আয়ুর দীর্ঘতাকেই যারা সত্য বলে' আঁকড়ে' ধরে থাক্‌তে চায় সে সেইদলের কেউ নয়।" সে যেন ক্ষণিকের আনন্দকেই সর্ব্বস্ব করে' বেঁচে থাক্‌তে চায়।

"ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের

আলোকে।"—তার জীবন যেন এই সুরেই বাঁধা। তাই সে অজিতের প্রতি তার ভালোবাসার স্থায়িত্বের বা গভীরত্বের পরিমাপ করতেও চাইল না। আশুবাবু যখন তাকে প্রশ্ন করলেন—"এজীবনে তুমিই কি আর কাউকে কখনো ভালবাসতে পারবে, কমল? এমনি ধারা সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে?" সে তার জবাব দিল—"অন্ততঃ সেই আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকতে হ'বে, আশুবাবু।" যদি ভবিষ্যতের সে প্রেমও তার জীবনে নিষ্ফল হয়, তবুও সে "ভোরের বিশ্বাস নিয়েই আবার রাত্রি যাপন" করবে। তার আশা যেন অফুরন্ত। তার আর আশুবাবুর যেন জাতই আলাদা। জীবনটা কমলের কাছে "ছেলেখেলা করে সাঙ্গ করে" দেবার জিনিস নয়। কিন্তু আশুবাবুর ঘরে যেন "পশ্চিমের জানালা ছাড়া আর সকল দিকই বন্ধ।" তাই তিনি "সূর্য্যের প্রত্যুষের আবির্ভাব" দেখতে পান না, দেখতে পান শুধু "তার প্রদোষের অবসান।" "যেদিকে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ সেদিকে সহস্রবর্ষ চোখ" মেলে থাকলেও কমল যে সত্যের সন্ধান পেয়েছে তার সাক্ষাৎ মিলবে না। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে অর্থহীন। অতীত যা' কিছু, প্রাচীন যা' কিছু তা'র উপরই তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর 'শান্তিসুখময়' দীর্ঘস্থায়ী বিগত দাম্পত্য জীবনের মধুর স্মৃতিই তাঁর জীবনপথের পাথেয়। তাই আর তাঁর মনে নূতন প্রেমের স্থানই নাই। তাঁর কাছে "ভারতীয় বৈশিষ্ট্য শুধু কথার কথা নয়। এ যাওয়া যে কতবড় ক্ষতি তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য।" তিনি দেশের ধর্ম্ম দেশের আচার অনুষ্ঠান গুলিকেই চিরদিন আঁকড়ে ধরে' থাকতে চান্। কিন্তু কমলের মতে "কেবল বৎসর গণনা করেই আদর্শের মূল্য ধার্য্য হয় না। অচল, অনড়, ভুলেভরা সমাজের সহস্রবর্ষও হয় তো অনাগতের দশটা বছরের গতিবেগে ভেসে যায়। সেই দশটা বছরই ঢের বড়।" তার কাছে "বস্তু অতীত হয় কালের ধর্ম্মে, কিন্তু তাকে ভাল হ'তে হয় নিজের গুণে। শুধুমাত্র প্রাচীন বলেই সে পূজ্য হ'য়ে ওঠে না।" তাই তার মত যে "পুরাকালের ছাঁচে তৈরি করে তোলাটাই সত্যিকারের মানুষের ছাঁচে গড়ে তোলা" নয়। সে ভেবেই পায় না যে "বিশেষ কোন একটা দেশে" কেউ জন্মেছে বলে' চিরদিনই তাকে তারই আচার অনুষ্ঠানগুলি আঁকড়ে থাকতে হ'বে কেন। "বিশ্বের সকল মানবই যদি একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধিনিষেধের ধ্বজা বয়ে' দাঁড়ায়" তা'তে সে কোন ক্ষতিই দেখতে পায় না। তার মত "কোন দেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যেই মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই তার আদর।" জাতীয়তার আদর্শ বা একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ তাকে মুগ্ধ করে না। আশুবাবু ও কমলের মধ্যে কে যে ঠিক সত্যটীকে জীবনে উপলব্ধি করতে পেরেছে এ নিয়ে যুক্তিতর্ক করা নিষ্ফল। কোন আদর্শকেই আমরা হীন বা মিথ্যা বলতে পারি না। তাহ'লে সত্যকে অস্বীকার করা হয়। নিষ্ঠা ও সংযম না থাকলে আমাদের কোন কিছুরই স্থিতি বা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'তো না। অথচ চিরকাল একই আদর্শকে অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকলে কোন নূতন সংস্কার বা সৃষ্টি সম্ভব হয় না। "The old order changeth yielding place to new"—এটা মানবজীবনের একটি চিরন্তন সত্য। আশুবাবুর সঙ্গে কমলের যে বিরোধ তা' নূতনের সহিত পুরাতনের, প্রাচীনের সহিত তরুণের চিরন্তন বিরোধ। এই বিরোধ আবহমান কাল ধরে' চলে আসছে ও আসবে। না হ'লে বদ্ধমতের আবিলতায় আমাদের মন পঙ্কিল হ'য়ে উঠবে। এই দুই এর মধ্যে সামঞ্জস্যকে খুঁজে পাওয়াটাই জীবনের চরম সত্যের সন্ধান পাওয়া।

উপন্যাসের সমস্যাগুলি যে দুইজনের জীবনকেই বিশেষভাবে ঘিরে রয়েছে তাঁরা হ'চ্ছেন কমল ও আশুবাবু। অপর সকলে যেন উপলক্ষ মাত্র। এই দুইটি চরিত্রের একটি যেন অপরটিকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য ক'রেছে—পরস্পরের বৈপরীত্যের মধ্যে দিয়ে। একটি যেন অপরটীর সম্পূরক। কমলের মধ্যে যা' অসম্পূর্ণ তা' যেন আশুবাবুর মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করতো, আবার আশুবাবুর মধ্যে যা'র অভাব কমলের মধ্যে তারই প্রাচুর্য্য দেখা যায়। মতামতের সমস্ত অনৈক্য ও বিরোধের মাঝেও এদের দুই জনের মধ্যে একটি অপরূপ সামঞ্জস্য ও নৈকট্য পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। যেন "এদের দু'জনের চেহারা আলাদা কিন্তু রক্ত এক—চোখের আড়ালে শিরের মধ্যে

দিয়ে বয়। তাই বাইরের অনৈক্য যতই গণ্ডগোল বাধাক্ ভিতরের প্রচণ্ড আকর্ষণ কিছুতেই ঘোচে না।" কমল লেখকের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই মেয়েটীকে সবদিক্ দিয়েই যেন একটা পরম বিস্ময় ঘিরে আছে। "এর বাইরেটা দেখেও মানুষের যেমন আশ্চর্য্য লাগে ভেতরটা দেখ্‌তে পেলেও তেম্‌নি অবাক্ হ'তে হয়।" ওর রূপ দেখে সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে যায়। মনে হয় "এই নারীরূপকেই পূর্ব্বকালের কবিরা শিশির-ধোয়া পদ্মের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন, এবং জগতে এতবড় সত্য তুলনাও হয় ত আর নাই।" "তার দেহের মধ্যে উৎকট বিদেশী রক্ত, মনের মধ্যে তেম্‌নি উগ্র পর-ধর্ম্মের ভাব বয়ে যাচ্ছে।" তার পিতা ইউরোপিয়ান আসামের চা বাগানের এক ইংরাজ ম্যানেজারের জারজ কন্যা সে। তাঁরই হাতে তার শিশুজীবন গড়ে উঠেছিল। তাঁর সেই উদার শিক্ষা ও আদর্শের স্নিগ্ধ দীপ্তি তাঁর কন্যার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের পথকে সত্যের স্বচ্ছ আলোকে উজ্জ্বল করে' দিয়েছে। তাই কমলের আকৃতি প্রাচ্যের হ'লেও প্রকৃতিটা একান্তই প্রতীচ্যের। সে তার পিতার কাছ থেকে পেয়েছিল তাঁর উদার মতামত ও সত্যের প্রতি অচঞ্চল নিষ্ঠা। এই নির্ভীক সত্যানুরাগই তার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত আদর্শ-গুলিকে অনুপ্রাণিত করেছে। সে জীবনে কোন কিছুকেই সংস্কারের 'ঠুলি' পরে দেখ্‌তে চায় না,—সত্যের মানদণ্ডে তার মূল্যকে যাচাই করে নিতে চায়। অনেকে অনেক দিন ধরে' কিছু একটা বলে' আসচে বলেই সে তা' মেনে নিতে রাজি নয়। ইংরাজীতে যা'কে বলে iconoclast সে যেন একটি তাই। "প্রাচীন যা' কিছু তার পরেই তা'র প্রবল বিতৃষ্ণা। নাড়া দিয়ে ভেঙ্গে ফেলাই যেন তার passion।" "আমাদের ধর্ম্ম, ঐতিহ্য, রীতি, নৈতিক অনুশাসন সব কিছুকেই সে উপহাস করে' উড়িয়ে দিতে চায়।" কিন্তু "ওর বলার মধ্যে কি যে একটা সুনিশ্চিত জোরের দীপ্তি ফুটে বার হ'তে থাকে যে মনে হয় যেন ও জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে। শিক্ষার দ্বারা নয়, অনুভব উপলব্ধি দিয়ে, যেন চোখ দিয়ে অর্থটাকে সোজা দেখ্‌তে পায়।" "তাই ওর যেম্‌নি কথা তেম্‌নি কাজ। ও যদি মিথ্যে বুঝেও থাকে তবু সে মিথ্যের গৌরব আছে।" "সে যেন বর্ষার বন্যলতা। পরের প্রয়োজনে নয় আপন প্রয়োজনেই আত্মরক্ষার সকল সঞ্চয় লইয়া যেন মাটি ফুঁড়িয়া উর্দ্ধে মাথা তুলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতার ভয়ও নাই, ভাবনাও নাই—যেন কাঁটার বেড়া দিয়া বাঁচানোর প্রশ্নই বাহুল্য।" সংসারে অসম্মান ও অমর্য্যাদার মধ্যেই তার জন্ম। কিন্তু সে যেন পঙ্কের মধ্যে পঙ্কজ। তার "জন্মের সেই লজ্জাকর দুর্গতির" কোন গ্লানি বা ক্ষোভই তার সংস্কার-মোহমুক্ত উদার মনের উপর ছায়াপাত কর্‌তে পারে নি। তাই 'তার লোকান্তরিত পিতার প্রতি স্নেহ ও ভক্তির সীমা নাই।' সে সত্যকে সহজভাবেই গ্রহণ কর্‌বার শিক্ষা পেয়েছিল। জীবনের কোন সমস্যার জটিলতাই তাকে তাই অভিভূত কর্‌তে পারে নি। তার সমাধান সে সত্যের সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টিতেই খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছে। "ওর শাসন কর্‌বার অভিভাবক নেই—চোখ রাঙ্গাবার সমাজ নেই, একবারে স্বাধীন।" তার এই "দুর্দ্দম নির্ভীকতা" ও অপরাজেয় স্বাধীনতাই সব সমস্যার সমাধান তার কাছে সহজ করে' দিয়েছিল। শিবনাথের সঙ্গে যখন তার বিবাহ হ'লো তখন সকলেই বল্‌ল যে তাদের বিবাহ বৈধ হলো না। কিন্তু কমলের কাছে সত্যের চেয়ে অনুষ্ঠানটাই বড় বলে মনে হয় নি। সে ব্যাপারটাকে সহজভাবেই মেনে নিয়ে স্নিগ্ধ পরিহাসের ছলে বলল "শিবের সঙ্গে যদি শৈবমতেই বিয়ে হ'য়ে থাকে তো ভাব্‌বার কি আছে?" অনুষ্ঠানের যে ফাঁকি অপর সকলকে শঙ্কিত করেছিল তা' তার মনের শান্তিকে হরণ কর্‌তে পারে নি। সে তাই সহজভাবেই বল্‌তে পার্‌লো—"উনি করবেন আমাকে অস্বীকার, আর আমি যাবো তাই ঘাড়ে ধরে' ওঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে? সত্য যাবে ডুবে আর যে অনুষ্ঠানকে মানি নে তারই দড়ি দিয়ে ওঁকে রাখ্‌বো বেঁধে?" বিবাহ পাকা হ'লো না বলে' তাই তার একটুও ভয় হ'লো না। মনই যদি দেউলে হয় পুরুতের মন্ত্রকে মহাজন খাড়া করে' সুদটা আদায় হ'তে পারে কিন্তু আসল তো ডুব্‌লো।" তারপর যখন শিবনাথের তার প্রতি মোহ গেল কেটে তখনও তার বিরুদ্ধে কোন নালিশ

বা অভিযোগই সে করে নি। তার মতে "হৃদয়ের আদালতে একতরফা বিচারই একমাত্র বিচার, তার তো আপিল কোর্ট মেলে না।"

"ফুরায় যা দেরে ফুরাতে।
ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস্‌নেক কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা, চাহি না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে
পূরিল না যাহা কে র'বে যুঝিতে তারি গহ্বর পূরাতে।
যখন যা পাস্ মিটায়ে নে আশ ফুরাইলে দিস্ ফুরাতে॥"

শুধু কথায় নয় সমস্ত জীবন দিয়েই এই সত্যকে কমল বড় বলে' মেনে নিয়েছে। তাই শিবনাথের "ভালোবাসার আয়ু" যখন ফুরালো সে জোর করে' তাকে বাঁধতে তো চায়ই নি, বরং তাদের বিবাহ-ব্যাপারে যে ফাঁকি ছিল তাই তাকে মুক্তির আনন্দ দিয়েছে। যদি তাদের সত্যকার বিবাহ হ'তো তাহ'লে তার পক্ষে সমস্যার সমাধান পাওয়া এত সহজ হ'তো না। তাহ'লে "অধিকাংশ রমণীর যেমন ঘটে আমরণ তার দুঃখের বোঝা বয়েই এ জীবন কাটতো।" তার মতে "একদিনের একটা অনুষ্ঠানের জোরে কারও অব্যাহতির পথ যদি সারাজীবনের মত অবরুদ্ধ হ'য়ে আসে তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে' মেনে নেওয়া" চলে না। তাই তাদের "মনে মনে একটা সর্ত্ত ছিল, ছাড়বার দিন যদি কখনো আসে" যেন তারা 'সহজেই ছেড়ে যেতে' পারে। "নানা যুক্তি পত্রে লেখাপড়া করে' নয়, এম্‌নিই।" "পৃথিবীতে সকল ভুলচুকের সংশোধনের বিধি আছে, কেউ তাকে মন্দ বলে' না কিন্তু যেখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, আর তার নিরাকরণের প্রয়োজনও তেম্‌নিই অধিক, সেইখানেই লোকে সমস্ত উপায় যদি স্বেচ্ছায় বন্ধ করে' রাখে তাকে ভালো বলে' মেনে নেওয়া" যায় না। তাই শিবনাথকে ফিরে পেতে কমল চাইলই না। শিবনাথ যখন পীড়িত হ'লো আশুবাবু একান্তভাবেই চেয়েছিলেন কমল যেন শিবনাথকে সেবার মধ্যে দিয়ে আবার ফিরে পায়। কিন্তু কমলের মতে "যে অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হ'য়ে যায় তার বাইরের বাঁধনই মস্ত বোঝা।" সে আশুবাবুকে স্পষ্ট জবাব দিল—"সেবা করতে আমি অসম্মত নই।...... কিন্তু ফিরে পেতে ওঁকে আমি চাই নে। সেবা করেও না, সেবা না করেও না। এ আমার অভিমানের জ্বালা নয় মিথ্যে দর্প করাও নয়—সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে পারবো না।" অথচ শিবনাথের প্রতি তার অন্তরনিহিত গভীর ভালবাসা ব্যক্ত হ'য়েছে তার নিজেরই কথায় যখন সে শিবনাথকে অনুযোগ করছে তাকে ছলনা করার জন্যে—"আমার ওখানে না গিয়ে আশুবাবুর বাড়ীতে গেলে কিসের জন্যে? তোমার একটা কাজ আমাকে ব্যথা দিয়েছে কিন্তু অন্যটা আমাকে অপমানের একশেষ করেছে। আমি দুঃখ পেয়েছি শুনে' তুমি মনে মনে হাসবে জানি, কিন্তু এই জানাটাই আমার সান্ত্বনা। তুমি এত ছোট বলেই নিজের দুঃখ আমি সইতে পারলাম, নইলে পারতাম না।"...."জানো তুমি, আমার সব সইলো, কিন্তু তোমাকে বাড়ী থেকে বার করে দেওয়াটা আমার সইলো না। তাই এসেছিলাম তোমাকে সেবা করতে' তোমার মন ভোলাতে আসিনি।" এতেই বোঝা যায় শিবনাথের নির্ম্মমতার শেল তার বুকে কিরকম বেজেছিল। তা' যদি না বাজতো তো কমল রক্তমাংসের জীব সৃষ্ট হ'তো না। মুখে সে—"ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস্ নেক কুড়াতে"—এই নীতির জয়ঘোষণা করেছে। কিন্তু জীবনের চরম দুঃখের দিনে যদি হৃদয়ে এর ঠিক প্রতিধ্বনি সে শুনতে না পেয়ে থাকে তো তার সেই দুর্ব্বলতা মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক। মুখে সে বলেছে যে শিবনাথের বিরুদ্ধে তার মনে কোন অভিমানের জ্বালা নাই। কিন্তু তার অন্তরের প্রচ্ছন্ন অভিমানের ব্যথা ফুটে উঠেছে তার নিজের কথাতেই, যখন শিবনাথ তাকে শিবানী বলে' ডাকাতে সে তাকে বলছে—"তুমি আমাকে শিবানী বলে' ডেকো না, কমল বলে' ডেকো।"......"শুনলে আমার ঘৃণা বোধ হয়। ভাবচি মানুষ কত বড় পাষণ্ড হ'লে তবে একথা মনে কোরে দিতে পারে।" সুনিপুণ শিল্পী কমলকে তাঁর মতবাদের নিছক সমষ্টি করেই গড়তে চান্ নি—তাকে মানুষের দুর্ব্বলতা, তার ব্যথা, তার অভিমান দিয়ে জীবন্ত সৃষ্টি করেছেন। কমলের চোখে জল দিয়ে লেখক তাকে মানবত্ব দিয়েছেন।

আমরা তার অনেক ছোট খাটো ব্যবহার ও উক্তিতে তার নারীহৃদয়ের এমন একটি সূক্ষ্ম পরিচয় পাই যাতে কোরে তাকে কোন মতেই শুধু লেখকের কতকগুলি বিশেষ মতামতের মুখপাত্রই বলে মনে হয় না। মনে হয় সে যেন—

"ধূলিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান,
তার কত ভ্রান্তি, তার কত ব্যথা, তার
কত ভালবাসা, মিশ্রিত জড়িত হ'য়ে
আছে একসাথে।"

শিবনাথকে হারাণোর ব্যথা ও তার অন্তরের প্রচ্ছন্ন অভিমান কমলের অনেক ব্যবহার ও কথাতেই অনেক সময় যেন তার অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। তার কোনও যুক্তিতর্কের আড়ালেই তার হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতা ঢাকা পড়ে নি। শিবনাথের জন্যে তার পছন্দ কোরে' কেনা আসনখানি যখন সে অজিতকে বসতে দিয়ে বল্‌ছে—"কি বিচিত্র এই দুনিয়ার ব্যাপার, অজিতবাবু। সেদিন এই আসনখানি পছন্দ কোরে' কেনবার সময়ে ভেবেছিলাম একজনকে বসতে দিয়ে বল্‌বো—কিন্তু সে তো আর একজনকে বলা যায় না, অজিতবাবু—তবুও আপনাকে বস্‌তে তো দিলাম। অথচ কতটুকু সময়েরই বা ব্যবধান।"—তখন তার সেই কথাগুলির মধ্যে তার অভিমানক্ষুব্ধ বেদনাতুর হৃদয়ের আভাসই আমরা পেয়ে থাকি। নিজে সারাদিন অভুক্ত থেকে যখন সে স্নেহসরস যত্নের সঙ্গে অজিতকে খাইয়েই পরম তৃপ্তি বোধ করছে সেখানে আমরা তার মধ্যে বাঙালী মেয়েকেই দেখ্‌তে পাই—সেখানে সে বিপ্লববাদিনী কমল নয়। সেবায় সে যেন লক্ষ্মী। আমরা কমলের মধ্যে মমতাময়ী নারীকেই দেখ্‌তে পাই, যখন সে তার মন থেকে সব ক্ষোভ অভিমান মুছে ফেলে রুগ্ন শিবনাথকে সেবা করতে গিয়েছিল। স্নেহ, করুণা ও ভক্তিতে কমল একান্তই নারী। পিতৃস্থানীয় আশুবাবুর প্রতি তার যে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা—যা' কোনও মতের অনৈক্য বা আদর্শের বিভিন্নতা ক্ষুণ্ণ কর্‌তে পারে নি—তা'ও তার স্নেহশীল অন্তরের পরিচয় দিয়েছে। "ইচ্ছে হয় আমি যদি তাঁর মেয়ে হোতাম"—তার এই কথাগুলি যেন তার পিতৃস্নেহ-হারা বুভুক্ষু অন্তরের প্রতিধ্বনি। তার "দুর্ম্মদ নির্ভীকতা" ও অপরাজেয় স্বাধীনতা তার নারীত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি—বরং একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে। সে যেন সাধারণ মেয়ে হ'য়েও অসাধারণত্ব লাভ করেছে। সে যেন "নদীর মাছ। জলে ভেজা না ভেজার প্রশ্নই ওঠে না।" কারও মতামত তাকে নিজ কর্ত্তব্য করতে বাধা দেয় না। কেউ যা পাবে না সে তা'ই অনায়াসে করতে পারে। "রাজেন্দ্র ছেলেটার সঙ্গে ক'দিনেরই বা জানা শোনা। কিন্তু উৎপাতের ভয়ে কোথাও যখন তার ঠাঁই হ'লো না ও তাকে অসঙ্কোচে ঘরে ডেকে নিল।" কমলের এই নারী-সুলভ মায়ামমতাই তার নির্ভীক স্বাধীন সত্তাকে আরও বেশি সুন্দর করে' তুলেছে। তার চরিত্রের মধ্যে এই মায়ামমতা, স্নেহকরুণার সঙ্গে এমন একটি দৃঢ়তাব্যঞ্জক ঔদার্য্য ও অপ্রতিহত তেজস্বিতার সামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় যা' আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। "ওর মধ্যে এম্‌নি একটি নির্দ্বন্দ্ব সংযম, নীরব মিতাচার ও নির্ব্বিশঙ্ক তিতিক্ষা আছে যে বিস্ময় লাগে।" শিবনাথের কাছ থেকে এতখানি নির্ম্মম ব্যবহার পেয়েও সে তাকে অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্য দেখাতে কার্পণ্য করে নি। 'আক্ষেপ ও অভিযোগের ধূঁয়ায়, আকাশ কালো করে' তুল্‌তে' তার প্রবৃত্তিই হ'লো না। "শিবনাথের অপরাধের কথার চেয়ে মনে এসেছিল সেদিন" তার "নিজেরই দুর্ভাগ্যের কথা।" শিবনাথের প্রতি অপর সকলেরই যখন ক্রোধের সীমা ছিল না—তাকে দণ্ড দেবার আকাঙ্ক্ষা যখন সকলেরই মনে জেগে উঠ্‌লো—তখনও কমল তাকে শাস্তি দেওয়ার কথা মনেই আন্‌তে পার্‌লো না। সে তাই আশুবাবুকে বল্‌ছে—"যা নেই তা' কেন নেই বলে' চোখের জল ফেল্‌তেও আজ আমার লজ্জা বোধ হয়, যেটুকু তিনি পেয়েচেন কেন তার বেশি পার্‌লেন না বলে' রাগারাগি কর্‌তেও আমার মাথা হেঁট হয়। আপনাদের কাছে প্রার্থনা শুধু এই যে আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে তাঁকে আর টানাটানি কর্‌বেন না।" তার সেই 'না'র মধ্যে "বিদ্বেষ নেই জ্বালা নেই, ক্ষমার দম্ভ নেই—দাক্ষিণ্য যেন অবিকৃত করুণায় ভরা।" "একদিন যাকে সে ভালোবেসেছিল তার প্রতি নির্ম্মমতার হীনতা কমল ভাব্‌তেই পার্‌লে না এবং সকলের

চোখের আড়ালে সব দোষ তার নিঃশব্দে নিঃশেষ করে মুছে ফেলে দিল। চেষ্টা নয়, চঞ্চলতা নয়, শোকাচ্ছন্ন হা হুতাশ নয়—যেন পাহাড় থেকে জলের ধারা অবলীলাক্রমে নীচে গড়িয়ে বয়ে গেল।" শিবনাথ তাকে নিতান্তই নিরুপায় নিঃসম্বল অবস্থায় পরিত্যাগ করে' গিয়েছিল। কমলের না ছিল অর্থ – না ছিল 'সমাজ, সম্মান সহানুভূতি' কোনও দিক দিয়েই কিছু ভরসা। কিন্তু 'এতবড় নিঃসহায়তা'ও এই তেজস্বিনী নারীকে কিছুমাত্র দুর্ব্বল করতে পারে নি। "আজও সে ভিক্ষা চায় না,—ভিক্ষা দেয়।" "যে শিবনাথ তার এতবড় দুর্গতির মূল তাকেও দান কর্‌বার সম্বল তার শেষ হ'য়ে যায় নি"—সে আজও নিঃস্ব নয়। সে শিবনাথের অনেক উপরে। তাই সে শিবনাথকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেকে হীন কর্‌তে চায় নি। সে বুঝেছে যে "এই অতি ক্ষুদ্র কাঙ্গাল লোকটাকে রাগ করে শাস্তি দিতে যাওয়ায় না আছে ধর্ম্ম, না আছে সম্মান।" শিবনাথকে শাস্তি দেওয়ার প্রস্তাবে সে হরেন্দ্রকে তাই বল্‌ছে—"না, না, সে করবেন না। ও'তে আমার এতবড় অপমান যে সে আমি সইতে পার্‌বো না।" শিবনাথ যদি এত হীন, এত ছোট, না হ'তো তাহ'লে তাকে হারাণোর দুঃখ হয়তো কমলের পক্ষে অসহনীয় হ'তো। সে শিবনাথকে অনুযোগ করেছে তাকে পরিত্যাগ করার জন্যে নয়—তাকে ছলনা করার জন্যে। শিবনাথ যে তাকে ত্যাগ করার জন্যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল তার এই নীচতাই তাকে আরো বেশী পীড়া দিয়েছে। কমলের অন্তরের বিশ্বাস ছিল যে 'মানুষের দুঃখটাই দুঃখ পাওয়ার শেষ কথা নয়'—"সে এক দিকের ক্ষতি আর একদিকের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে' পূর্ণ কোরে' তোলে।" এই বিশ্বাসের জোরেই তার শিবনাথকে হারাণোর পর বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছিল। শিবনাথকে হারিয়ে রইল তার বিগত সুখের "একান্ত মধুর স্মৃতি আর তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র।" তারপর অজিতের প্রেম তার জীবনে আর এক নূতন সমস্যা এনে দিল। কিন্তু তখনও তার মন থেকে তার অতীত প্রেমের স্মৃতি মুছে যায় নি। তবুও সে অজিতের ভালবাসা গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করলো না। "কেঁদে কেঁদে যৌবনে যোগিনী হওয়ার কোন মানেই তার কাছে নাই। বাইরের শুক্‌নো লতা মরে গিয়েও গাছের সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে কাম্‌ড়ে এঁটে থাকে"—এর কোন সার্থকতাই কমল দেখ্‌তে পায় না। সে তার জীবনকে ব্যর্থ কর্‌তে চাইল না, তার বিগত জীবনের নিস্ফল প্রেমের স্মৃতি বয়ে'—কারণ তার মত—

"যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে।"

অজিতকে যে সে সর্ব্বান্তঃকরণে চেয়েছিল ও ভালবেসেছিল তা' নয়। তাকে পাওয়া অজিতেরই বেশী প্রয়োজন ছিল বলে' মনে হয়। হরেন্দ্র যখন কমলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল "এতদিনে আসল জিনিসটি পেলে, কমল।" তার উত্তরে সে বলল—"পেয়েছি? অন্ততঃ সেই আশীর্ব্বাদই করুন্।" তার কণ্ঠস্বরে তখন "দ্বিধাহীন পরমনিঃসংশয়ের" সুরটী বাজ্‌লো না। তাকে না পেলে অজিতেরই জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যেতো। অজিত যখন তাকে বল্‌ছে—"জানি আমাকে বাঁধ্‌তে চাও না, কিন্তু আমি যে চাই। তোমাকেই বা কি দিয়ে বেঁধে রাখ্‌বো, কমল? কই সে জোর?—" কমল তার জবাব দিল—"জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ তোমার দুর্ব্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো অত নিষ্ঠুর আমি নই।……ভগবান্ তো মানিনে, নইলে প্রার্থনা কর্‌তাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই একদিন যেন আমি মর্‌তে পারি।" অজিতকে যে কমল গ্রহণ কর্‌লো খানিকটা যেন তার প্রতি করুণাবশতঃই। কিন্তু "চিরদিনের দাসখৎ লিখে"ও সে অজিতের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা পড়্‌তে চাইল না। তার মতে "বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় বেঁধে সে আত্মহত্যা করে, সে মরে।" "গাছের ফুল শুকাবে বলে সুদীর্ঘস্থায়ী শোলার ফুলের তোড়া বেঁধে যারা ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে তাদের সঙ্গে" তার মত মেলে না। কমলের জীবনের মূলনীতিই যেন—

ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলকে।"

তাই সে বিবাহের প্রস্তাবে অজিতকে বল্‌ছে—"ভয়ানক মজবুত করার লোকে অমন নিরেট নিশ্ছিদ্র কোরে' বাড়ী গাঁথ্‌তে চেয়ো না। ওতে মড়ার কবর তৈরি হবে, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হ'বে না।" সংশয়-ক্ষুব্ধ-চিত্তে অজিত তাকে প্রশ্ন করলো—"তোমাকে আজ পাওয়াই তো শুধু নয়, একদিন যদি এম্‌নি কোরে' হারাতেই হয় তখন কি হবে?" কমল জবাব দিল—"সেদিন হারানোও ঠিক্ এম্‌নি সোজা হ'য়ে যাবে। যতদিন কাছে থাক্‌বো আপনাকে সেই বিদ্যেই দিয়ে যাবো।" কমলের চরিত্রের উপর তার জন্মের কতকটা প্রভাবও লেখক দেখাতে চেয়েছেন বলে' মনে হয়। জন্ম হ'য়েছিল তার প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের মিলনে। তার প্রকৃতিতেও তেমনি প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের কতকগুলি গুণের সংমিশ্রণ দেখা যায়। প্রতীচ্যের কাছ থেকে সে পেয়েছিল তার নির্ভীক স্বাধীন সত্তা ও ভোগের শিক্ষা। যুক্তিতর্কের ছলনায় কমল সংযম ও নিষ্ঠাকে যতই শাব্দিক 'মোহ' বলে উড়িয়ে দিতে চাক্—মুখে সে যতই বলুক্ যে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে কোন সত্যকার গৌরব নাই—নিজ জীবনে সে সংযম ও নিষ্ঠাকে একবারে বাদ দিতে পারে নাই। 'বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে' সে নিজে কঠোর আত্ম সংযমের নীতিই অবলম্বন করেছে। তার প্রথম স্বামী মারা যাবার পর থেকেই সে আহারে বিহারে ব্রহ্মচারিণীই ছিল। কোনদিনই কারও অনুরোধে এ নিয়মের তার ব্যতিক্রম হয় নি। তার নিজেরও বিশ্বাস যে "কেবলমাত্র ভোগটাকেই জীবনের বড় কোরে' নিয়ে কোনজাত কখনো বড় হ'য়ে উঠ্‌তে পাবে না।" "নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা আমি বলিনে"—এ তার নিজের মুখেরই কথা। আশুবাবুর অবিচলিত নিষ্ঠাকেও সে অন্তরে শ্রদ্ধাই করেছে—যুক্তিতর্কের খাতিরে তাঁকে যতই সে আঘাত করুক। "আপনি যে সত্যিকার বড়মানুষ, কাকাবাবু। আপনি তো এঁদের মত মিথ্যে নন্"—তার এই উক্তিতে আশুবাবুর প্রতি তার অন্তরনিহিত গভীর শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। কমলের চরিত্রের এই দিকটা একান্তই প্রাচ্যের। কমলের দুঃসাহসিক মতগুলি অনেকের কাছে অসহনীয় বলে' মনে হয়। "মন সায় দিতে চায় না, চিরদিনের সংস্কারে জমে কাঠ হ'য়ে ওঠে, তবু কথা খুঁজে মেলে না, পরাভব মান্‌তে হয়।" উপন্যাসের অপর চরিত্রগুলি সত্যই শেষে কমলের কাছে পরাভব মেনেছে। সকলকেই শেষ পর্য্যন্ত তার কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে হয়েছে। অক্ষয়ের মত "কঠিন সাঁচ্চা লোক" "যার শুধু নিজের নয় পরের চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতিও অত্যন্ত সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি" এবং যার মত লোকেই আমাদের সমাজের "প্রবলপক্ষ" সেও শেষ পর্য্যন্ত কমলের মতগুলিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারে নি। অক্ষয়ও কমলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ ছেড়ে দিয়ে সন্দেহ করেছে শেষে যে তার নিজ জীবনের নীতির আদর্শই জীবনের সত্য আদর্শ কি না। আশুবাবুর "একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমের সুদীর্ঘ ছায়া এতদিন যে সকল দিক আঁধার করে রেখেছিল" তা'ও যেন 'শেষে ধীরে ধীরে স্বচ্ছ' হ'য়ে গিয়েছে। তাঁর মনেও শেষে সংশয় জেগেছে একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ মানুষের সত্য 'আদর্শ' কি না। কমলের চরিত্রের ঠিক্ বিপরীত দিকটা আমরা আশুবাবুর মধ্যে দেখ্‌তে পাই। তাঁর সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধার সহিত কমল অজিতকে বল্‌ছে—"আমার চেয়েও বড় বিস্ময় সেখানে ছিল—সে আর একটা দিক। যেমন বিপুল দেহ, তেম্‌নি বিরাট শান্তি। ধৈর্য্যের যেন হিমগিরি। উত্তাপের বাষ্পও সেখানে পৌঁছায় না। ইচ্ছে হয় আমি যদি তাঁর মেয়ে হোতাম।" কমলের চরিত্র যেন আশুবাবুর আদর্শেই পরিণতি লাভ করলো। কমলের মধ্যে আমরা যেমন দেখ্‌তে পাই চির প্রাণময় চঞ্চলতা, বিশ্বমানবিকতার উদার আদর্শ, আশুবাবুর মধ্যে আমরা দেখ্‌তে পাই অচঞ্চল নিষ্ঠা, জাতীয়তার দৃঢ় নিষ্ঠ আদর্শ। তাঁর মধ্যে যেন ভারতের সনাতন আদর্শ, তার বৈশিষ্ট্য, তার শান্ত সমাহিত চিন্তার ধারা, তার অপার নিষ্ঠা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। "বাহিরের সর্ব্ববিধ সাহেবিয়ানার নিভৃত তলদেশে" তাঁর "দৃঢ়নিষ্ঠ বিশ্বাসপরায়ণ হিন্দুচিত্ত নির্ব্বাত দীপ-শিখার ন্যায় জ্বলিতেছে।" কোন অবস্থাতেই এ বিচলিত হ'বার নয়। কমলকে আমাদের অনেক সময় হেঁয়ালি বলে' মনে হয়, তার মতামতের দুঃসাহসিকতায় আমাদের অনেক সময় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে কিন্তু অমায়িক নিরীহ আশুবাবুকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। তাঁর যেন মহাদেবের মতই "নিষ্পাপ দেহ, নিষ্কলুষ মন।" "তাঁর ভাগ্যে বিষই

বা কি, আর অমৃতই বা কি, গলাতেই আটকাবে, উদরস্থ হ'বে না।" "তাঁর নিষ্কলুষ অন্তর অনুক্ষণ অকলঙ্ক শুভ্রতায় যেন ধপ ধপ' করছে। 'কোন কিছুর মন্দ দিকটা যেন এই মানুষটির মধ্যে ঢুকতেই চায় না।" কমলের বিরুদ্ধমতের সমস্ত আঘাতকে উপেক্ষা করে তাই তিনি বল্‌তে পারছেন—"কমল আমাকেই আজ তুমি সকলের চেয়ে বেশী আঘাত করেছো, কিন্তু আমিই তোমাকে আজ যেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেচি। আমার মণির চেয়ে যেন তুমি কোন অংশেই খাটো নও।" তাঁর "গভীর অন্তরে সত্যের প্রতি একটি সত্যিকার নিষ্ঠা ছিল। তাই তিনি কমলের সমস্ত বিরোধকেই ঠিক্‌ভাবে নিতে চেষ্টা করেছেন, বলেছেন "আমার মধ্যে যে বস্তুটাকে তোমরা শক্তির প্রাচুর্য্য মনে ক'রে বিস্ময়ে মুগ্ধ হও, ওর কাছে সেটা নিছক শক্তির অভাব। কিন্তু আমার যে মূল্য তার কাছে নেই জবরদস্তি তাই দিতে গিয়ে সে আমাকে খেলোও করে নি, নিজেকে অপমানও করে নি। এ'তে ব্যথা পাবার তো কিছুই নেই।" সত্যের প্রতি এই প্রগাঢ় নিষ্ঠাই কমল ও আশুবাবুকে সমস্ত অমিল ও অনৈক্যের মধ্যেও পরস্পরের নিকটে এনে দিয়েছিল। এই সত্যানুরাগই এদের দুইজনের মধ্যে একটি যোগসূত্র গেঁথে দিয়েছিল। কিন্তু "সত্যের মূল, গত সংস্কার"ই উভয়ের জীবনে "একান্ত বিভিন্ন।" তাই এত মতবিরোধ। লেখক আশুবাবু ও কমলের মধ্যে যে ঐক্যটা ফুটিয়ে তুলেছেন তা' সত্যিই বড় সুন্দর। প্রাচীন ও তরুণের মধ্যে, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে যতই অমিল থাকুক, কেউ কাউকে অস্বীকার করতে পারে না। চিরদিনই তরুণ জন্ম নিয়েছে প্রাচীনের মধ্যে থেকেই, ভবিষ্যৎ ও অতীতের কাছে তার জন্মগত ঋণ অস্বীকার করতে পারবে না। এই জগতের চিরন্তন বিধি। তাই আশুবাবু ও কমলের মধ্যে এই পিতা কন্যা সম্বন্ধের আভাসটি বড়ই সুসঙ্গত হ'য়েছে। আর একটি চরিত্র অল্পসময়ের জন্য অবতীর্ণ হ'য়েও আমাদের মনের উপর গভীর রেখাপাত করে। সে হ'চ্ছে রাজেন। সে যেন একটি সৃষ্টিছাড়া জীব। তার নিঃসঙ্গতাই তাকে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে—সে যেন সকলের মধ্যে থেকেও একাকী। কেউ তাকে বোঝে না—তার কাজের উদ্দেশ্যও তেমনি সকলের কাছে দুর্বোধ্য। "কি একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ইহাকে বারংবার কর্ম্মে নিযুক্ত করে। সে কর্ম্ম করিয়া যায়। নিজের জন্য নয়, হয়ত কোন কিছু আশা করিয়াও নয়। কাজ ইহার রক্তের মধ্যে, সমস্ত দেহের মধ্যে জলবায়ুর মতই যেন সহজ হইয়া আছে।" মনের মিল তার কাছে 'ভাববিলাস' মাত্র—এর কোন মূল্যই নাই তার কাছে। সে চায় 'মতের ঐক্য' 'কাজের ঐক্য'। তাই তার সকলের সঙ্গেই অমিল। সে কাজের মানদণ্ড দিয়েই সব কিছু পরিমাণ করতে চায়। কমল যখন তাকে তার বন্ধু হ'তে বলছে সে তখন তাকে প্রশ্ন করলো—"এই অক্ষয় বন্ধুত্ব আমার কি কাজে লাগবে?" যেন যা' তার কাজে লাগ্‌বে না তার কোন প্রয়োজনই তার জীবনে নাই। রাজেনের কাছেই কমল যেন তার নিজের দীনতা ও অসম্পূর্ণতা প্রথম অনুভব করলো। রাজেনকে দেখেই সে প্রথম বুঝ্‌লো যে জগতে এমন লোকও আছে "যার অকলঙ্ক পুরুষ চিত্ততলে আজও নারীমূর্ত্তির ছায়া পড়ে নাই"—নারীর রূপ যার মনকে সম্মোহিত করে না। "সে অতি শিক্ষিতা, অতি সুন্দরী ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী।" "সে পুরুষের কামনার ধন" এই ছিল তার ধারণা, তার 'দৃপ্ততেজ অপরাজেয়' এই ছিল তার 'অকপট বিশ্বাস'। রাজেনই যেন প্রথম তার এই অপরাহত অহঙ্কারে আঘাত করলো। রাজেনের অদ্ভুত অমানুষিক সেবা করবার শক্তির কাছেও কমলকে হার মানতে হ'য়েছিল। রাজেনের অবতারণা যেন কমলকে তার অসম্পূর্ণতার দিকটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্যেই। রাজেনকে আমরা হয়তো ভুলতে পারতাম কিন্তু সে আমাদের স্মৃতির সঙ্গে আরও বেশি করে' জড়িয়ে যায় তার শোচনীয় মৃত্যুর সূত্র দিয়ে—যখন সে গল্পের যবনিকা পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে নিজেকে বলি দিয়ে তার কর্ম্মজীবনের ঋণ শোধ করে' আমাদের কাছ থেকে জন্মের মত বিদায় নিল। কমল ও অজিতের নবজীবনের সন্ধিক্ষণে তার এই দুঃসহ মৃত্যু সকলের মনে ঘন বিষাদের ছায়া ফেলে আমাদের বিশেষ করে' স্মরণ করিয়ে দেয়—

"মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে
বেদনায়।"

কমল যে বল্‌ছে—"সংসারে গতিশীল মানবচিত্তের পদে পদে যে সত্য নিত্য নূতন রূপে দেখা দেয় সবাই তাকে চিন্‌তে পারে না। ভাবে এ কোন আপদ কোথা থেকে এল।"—বাস্তবিকই কথাগুলি খুব ঠিক্। আমরা সংস্কার মোহান্ধ হ'য়ে অনেক সময়েই সত্যের সহজরূপটা‌কে দেখ্‌তে ভুল করি। সত্যের নগ্নমূর্ত্তি আমাদের প্রাণে আতঙ্ক জাগায়। "শেষপ্রশ্নে"র লেখক যে সমস্যাগুলি আমাদের সাম্‌নে ধরেছেন সেগুলি আমাদের চিরদিনের সংস্কারে ঘা দিলেও আমরা যেন সত্যকে গলা টিপে মার্‌তে না চাই। তাঁর মতগুলি সুনীতিপূর্ণ কিনা সে প্রশ্নের জবাব দেবেন নীতিতত্ত্বের পূজারীরা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নৈতিক বিচার না হওয়াই শ্রেয়ঃ বলে' মনে হয়। ঔপন্যাসিকের কাজ জীবনের সত্যগুলিকে আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরা—নীতিকথা শুনানো নয়। আমরা যদি সেগুলি নৈতিক বিচারের মাপকাঠি দিয়ে যাচাই কর্‌তে যাই তা'হলে জীবনের সত্যকে তো অস্বীকার করা হ'বেই—ঔপন্যাসিকের প্রতিও অবিচার করা হ'বে। বাস্তবিকই কমলের জীবনের সমস্যা একটি জটীল সামাজিক সমস্যা যার সমাধান সম্বন্ধে ভাব্‌বার অনেক আছে। বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কিনা এ আমাদের প্রশ্ন নয়। কিন্তু কমল ও শিবনাথের জীবনের সমস্যা তো অহরহই ঘটছে—আমাদের সমাজেও পাশ্চাত্য সমাজেও। ভালবাসার আয়ু যেখানে ফুরিয়ে যায়, সেখানে 'অনুষ্ঠানের দাড়ি দিয়ে' 'পুরুতের মন্ত্রকে মগজন থাড়া করে' কাউকে বাঁধ্‌তে যাওয়া যে বিড়ম্বনা মাত্র একথা তো অস্বীকার কর্‌বার নয়। একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ সুন্দর হ'লেও সর্ব্বক্ষেত্রে তো ভালোবাসা চিরস্থায়ী হয় না। প্রেমের অস্থায়িত্বকে নীতির মানদণ্ডে বিচার করে' আমরা তাকে অপরাধ বল্‌তে পারি। কিন্তু তা' যে অস্বাভাবিক নয় একথাও তো আমাদের মান্‌তে হ'বে। সব ভুল সংশোধন কর্‌বার বিধি আছে, কেউ তাকে মন্দ বলে না। কিন্তু যেখানে ভুল কর্‌বার সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশী এবং সে ভুল শোধ্‌রাণোর প্রয়োজনও সব চেয়ে অধিক সেখানেই কি সংশোধনের পথটা বন্ধ করে' রাখা শ্রেয়ঃ? ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষকে ঠিক্ জায়গায় পৌছাবার পথটা খুঁজে নিতে দেওয়া উচিত নয় কি? কমল যে বল্‌ছে আমাদের অনেক আচার অনুষ্ঠান মতামতই "স্বতঃসিদ্ধ ভাল" নয়—বহুকালের সংস্কারপূত হ'য়েই সেগুলি আমাদের কাছ থেকে মিথ্যা মর্য্যাদা পেয়ে আস্‌ছে,—এ কথার মধ্যে সত্য নাই কি? আমরা তো পুরাকালের সব কিছুকেই নির্ব্বিচারে ভাল বলে মেনে নিতে পার্‌ছি না আজকাল। আমার মতে কমলের মতগুলিকে আমাদের সমস্যা ভাবেই গ্রহণ করা উচিত। আজও এগুলির সহজ সমাধানের সময় আসেনি বোধ হয়। "মানুষের প্রয়োজন জীবজগতের সাধারণ প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বহুদূরে চলে গেছে—তাই তো সমস্যা তার এমন বিচিত্র, এতো দুরূহ।" মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই সচলতা। তাই সুস্থ মনে নব নব সমস্যার উদয় হ'য়েছে ও হ'বে। স্বাধীনভাবে চিন্তা কর্‌বার শক্তি হারালে আমাদের মনও ক্রমে অসুস্থ হ'য়ে পড়্‌বে। তাই মনের খোরাকের জন্যও সমস্যার প্রয়োজন আছে। গতানুগতিকভাবেই চিন্তা করলে মনের শান্তি থাক্‌তে পারে কিন্তু তার স্বাস্থ্যহানি ঘট্‌বার সম্ভাবনা আছে।

উষা বিশ্বাস
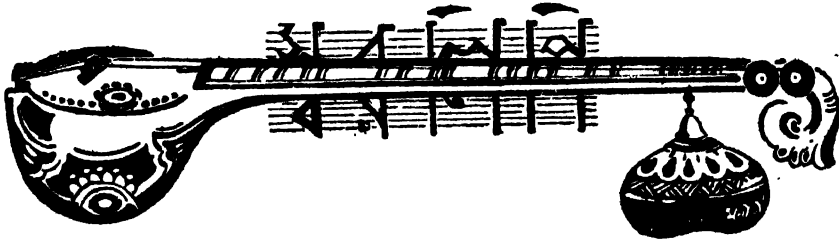
তব স্মরণ খানি
ওগো, আমার প্রাণে
আজি বাজায় বীণা
মৃদু করুণ তানে।

যেন সেই বেদনা,—
ফুলে শিশিরকণা,
বুঝি কথার ছোঁয়া
আজি নাহি সে মানে!

যাহা হ'লনা বলা,
ওগো, তারি বেদনা
আজি শিউলি-ঝরা
প্রাতে করে বিমনা।

আজি ফুল-সুবাসে
প্রাণে কী কথা ভাসে,
মেলি' সজল আঁখি
চাহি পিছন পানে॥

কথা—শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ

সুর—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর

স্বরলিপি—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

পিলু-গারা — দাদ্‌রা

+ ২ + ২
সা রা ‖ ণধ্‌া -ণ্‌া সা । -া রা মজ্ঞা ‖ রা -া -া । -া রজ্ঞা সা ‖ রা -গা মা । -া মপা মপা ‖
ত ব স্ম ০ র ০ ণ থা নি ০ ০ ০ ও গো আ ০ মা ০ র প্রা

‖ মজ্ঞা -া -া । -া রজ্ঞা রসা ‖ সা -া সধ্‌া । -সরজ্ঞা রসা রা ‖ সণ্‌া -া -া । -া ধ্‌ণ্‌া প্‌ধ্‌া ‖
ণে ০ ০ ০ আ জি বা ০ জা ০০০ য় বী ণা ০ ০ ০ মৃ দু

। ন্া -া ন্া । -া মা জ্ঞা I রসা -া -া । -া সা রা I ণ্ধ্া -ণ্া র্সা । -া রা মজ্ঞা I
ক • ক • ণ তা গে • • • ত ব স্ম • র • ণ খা

I রা -া -া । -জ্ঞা সা রা I ণ্ধ্া -ণা সা । -া রা মজ্ঞা I রসা -া -া { -া সা সা I
নি • • • ত ব স্ম • র • ণ খা নি • • { • যে ন

I সপা -া -া । পা -ধা মা I মা -পা -া । -া পা পধা I পগা -মা মা । -ণণা পমা পা I
সে • ই বে • দ না • • • ফু লে শি • শি • র ক

I মজ্ঞা -া -া } । -রসা সা সা I ন্সা -রজ্ঞা জ্ঞা । -া রা জ্ঞরা I সা -া -া । -া সরা ধ্ণ্া I
ণা • • } • বু ঝি ক • থা • র ছোঁ যা • • • আ জি

I সরা -গমা মা । -া গরা গা I রসা -া -া । -া সা সা I সা -া সধ্া । -সরজ্ঞা রসা রা I
না • হি • সে মা নে • • • বু ঝি ক • থা • র ছোঁ

I সণ্া -া -া । -া ধ্ণ্া প্ধ্া I ন্া -া ন্া । -া সা জ্ঞা I রসা -া -া । -া সা রা I
য়া • • • আ জি না • হি • সে মা নে • • • ভ ব

I ণ্ধ্া -ণ্া সা । -া রা মজ্ঞা I রা -া -া । -জ্ঞা সা রা I ণ্ধ্া -ণ্া র্সা । -া রা মজ্ঞা I
স্ম • র ণ খা নি • • • ত ব স্ম • র • ণ খা

I রসা -া -া । { -া প্া দ্া I ন্া -া ন্া । -া ন্া ন্া I সা -া -া । -া সা সা I
নি • • { • যা হা হো • লো • না ব লা • • • ও গো

I ন্সা -রজ্ঞা জ্ঞা । -া রা মা I মজ্ঞা -া -সা } । { -া সা সা I সরা -গা -া । গমা -রা গা I
তা • রি • বে দ না • • } { • আ জ শি উ • লি • ঝ

I পমা -া -া । -া মা পা I জ্ঞরা -া জ্ঞা । মগা -মা জ্ঞা I রা -জ্ঞা -সা } । { -া সা সা I
রা • • • প্রা তে ক • রে নি • ম না • • } { • আ জি

। সপা -া পা । পা -ধা মা । মা -পা -া । -া পা পধা । পগা -মা মা । -পধা পমা পা ।
কু • ল সু • বা সে • • • প্রা ণে কি • ক • থা ভা

। মজ্ঞা -া -া । -রসা সা সা । ন্সা -রজ্ঞা জ্ঞা । -া রা জ্ঞরা । সা -া -া । -া সরা ধণ্া ।
সে • • • মে লি স • জ • ল আঁ খি • • • চা হি

। সরা -গমা মা । -া গরা গা । রসা -া -া । -া সা সা । সা -া সধ্া । -সরজ্ঞা রসা রা ।
পি • ছ • ন পা নে • • • মে লি স • জ • ল আঁ

। সণ্া -া -া । -া ধ্ণ্া প্দ্া । ন্া -া ন্া । -া সা জ্ঞা । রসা -া -া । -া সা রা ।
খি • • • চা হি পি • ছ • ন পা নে • • • ত ব

। ণ্ধ্া -ণ্া সা । -া রা মজ্ঞা । রা -া -া । -জ্ঞা সা রা । ণধ্া -ণ্া সা । -া রা মজ্ঞা ।
স্ম • র • ণ থা নি • • • ত ব স্ম • র • ণ থা

। রসা -া -া । -া -া -া ॥
নি • • • • •

এই গানখানি শ্রীমতী কনক দাস ব্যতীত আর কেহ রেকর্ড করিতে পারিবেন না। হিমাংশুকুমার দত্ত।

হিন্দু এবং আরবগণের মধ্যে সাহিত্য সম্বন্ধ

সৈয়দ সামসুদ্দিন আহম্মদ

হিজরী প্রথম শতাব্দীর মধ্য হইতেই আরবের মুসলমানগণ ভিন্নদেশীয় সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাদি অনুবাদ আরম্ভ করেন। সিরিয়া তাঁহাদের অধিকারে থাকাকালীন তাঁহারা গ্রীক ও সিরীয় বহুসংখ্যক পুস্তক নিজ ভাষায় অনুবাদ করেন। পরে ইরাক তাঁহাদের শাসনাধীনে আসিলে তাঁহারা ইরাণীয় ও সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন প্রকারের পুস্তক সমূহ অনুবাদ করেন। খলিফা মনসুর অতীব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার উক্ত সুখ্যাতি শুনিয়া সিন্ধু হইতে একটি deputation এর সঙ্গে জনৈক গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ হিন্দু পণ্ডিত একটি সংস্কৃত সিদ্ধান্তসহ বোগদাদে উপনীত হন। খলিফার আদেশানুসারে তিনি ইব্রাহিম ফাজারি নামে খলিফার দরবারস্থিত জনৈক বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদের সহায়তায় তাহা আরবীতে অনুবাদ করেন (১)। ভারতের প্রতিভার সহিত আরববাসীগণের এই প্রথম পরিচয় (২)। খলিফা হারুণ-র-রসিদের সময় যে সমস্ত ভারতীয় চিকিৎসক বোগদাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে ভারতীয় প্রতিভা অমূল্য। পরে বারমাকিদগণের * উৎসাহে ও সাহচর্য্যে সাহিত্য, জ্যোতিষ, ফলিতজ্যোতিষ, চিকিৎসা ও নীতিশাস্ত্রের বহুবিধ পুস্তক সংস্কৃত হইতে অনূদিত হইয়াছিল।

অনুবাদের মধ্যবর্ত্তিতায় ভারতবাসীগণ আরববাসীদের কতদূর [illegible] হইয়াছিলেন তাহা সঠিক নির্ণয় করার [illegible] দুই তিনটি বিখ্যাত আরব গ্রন্থকারের মত [illegible] যাইবে। বসোরা নিবাসী বিখ্যাত সাহিত্যিক, দার্শনিক ও তত্ত্ববিদ জাহিদ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ২৫৫ হিজরীতে দেহত্যাগ করেন। কালো ও সাদা জাতির তুলনামূলক তাঁহার একটি আখ্যায়িকায় তিনি কালো জাতিকে উচ্চতর স্থান দিয়া বলেন "ভারতবাসীরা চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। কতকগুলি সংক্রামক রোগের ঔষধ তাঁহারা জানেন। অঙ্কন বিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা ও স্থপতি বিদ্যায় তাঁহাদের তুলনা নাই। তাঁহারা দাবাখেলার আবিষ্কারক। সুন্দর সুন্দর তলোয়ার নির্ম্মাণ ও কৌশলে তলোয়ার খেলায় তাঁহারা দক্ষ। মন্ত্রবলে তাঁহারা বিষ ও বেদনা দূর করিতে পারেন। তাঁহাদের সঙ্গীত মধুর। কঙ্কলা নামক তাঁহাদের একটি বাদ্যযন্ত্র "লাউবাঁশে" তার সংযোগ করিয়া নির্ম্মিত হয়। তাহা তানপুরা ও শাস্থের ন্যায় শব্দ করে। প্রত্যেক প্রকারের নৃত্য তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কবি এবং বক্তা হিসাবেও তাঁহারা কম নয়। দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে তাঁহারা পণ্ডিত এবং তাঁহাদের সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি প্রবল। তাঁহারা অনেকগুণে চীনাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের অবয়ব দীর্ঘ এবং তাঁহারা দেখিতে সুশ্রী। সুঘ্রাণে তাঁহাদের সুন্দর রুচি আছে। রাজাদের ব্যবহার উপযোগী মৃগনাভি তাঁহাদের দেশ হইতে আমদানী হয়। ফলিত জ্যোতিষের আবিষ্কারক তাঁহারা। তাঁহাদের নারীগণ নিপুণা গায়িকা এবং তাঁহাদের পুরুষগণ উত্তম পাক করিতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের নিকট ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট টাকা গচ্ছিত রাখে না। ইরাকের প্রত্যেক ব্যবসায়ী একজন সিন্ধুবাসী অথবা তাঁহার পুত্রকে খাজাঞ্চি নিয়োগ করিবে।" †

পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, ভ্রমণকারী আল-বিরূণী ভারতবর্ষে

(১) [illegible]-উল-হিন্দ, বাইরুণী, ২০৮ পৃঃ (লণ্ডনে প্রকাশিত)।

(২) [illegible]-উল-হুকামা, কিফ্‌তি ১৭৭ পৃঃ ইজিপ্‌টীয় সংস্করণ।

* [illegible] বোগদাদে খলিফাগণের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের বংশ [illegible] হইয়াছিল, তন্মধ্যে '[illegible]' প্রধান।

† ইত্তরিসালা ফাখরুস সুদান, আলাল বিইদান জাহিদ, মাজমু রিসায় অল-যাহিদ পৃঃ ৮৯ (ইজিপ্‌টীয় সংস্করণ)।

আসিয়াছিলেন। তিনি অনুমান ২৭৮ হিজরী সনে দেহত্যাগ করেন। তিনি বলেন "ভারতবাসীগণ উদার ও বুদ্ধিমান। ইহাতে তাহারা যে কোন জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের জ্যোতিষ গণনা অনেকাংশে নির্ভুল। "সিদ্ধান্ত" তাঁহাদের প্রতিভা চরম বিকাশ পাইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ দ্বারা গ্রীক এবং ইরাণীয়গণও উপকৃত হইয়াছে। চিকিৎসায় তাহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি অত্যন্ত বিস্ময়জনক। "চরক এবং নাদন"—এই দুইটি তাহাদের চিকিৎসা পুস্তক। এতদ্ব্যতীত এই বিজ্ঞানে তাঁহাদের আরও বহু পুস্তক আছে। তর্কশাস্ত্র এবং দর্শনে তাঁহারা পুস্তকপ্রণয়ণ করিয়াছেন।"

আবু জেইদ সেইরাফি তৃতীয় হিজরীর শেষভাগে আবির্ভূত হন। তিনি বলেন "ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের মধ্যে কবিগণ রাজপ্রাসাদে ধন্য হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, ভবিষ্যত বক্তা এবং ঐন্দ্রজালিক আছেন।"

মোট কথা এই, খলিফা মনসুর এবং হারুণ-র রসিদের উৎসাহে এবং বারমাকিদিগের সাহচর্য্যে বহুসংখ্যক পণ্ডিত এবং চিকিৎসক ভারত হইতে বোগদাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। চিকিৎসা, জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, সাহিত্য ও নীতিশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ অনুবাদে তাঁহাদের সাহায্য লওয়া হইত। পরিতাপের বিষয় এই যে উক্ত পণ্ডিতগণের নামগুলি আরবীতে এমন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে তাঁহাদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ অতীব আয়াসসাধ্য। সম্ভবতঃ ইহার একটি কারণ এই যে তাঁহাদের অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তৎকালীন নামকরণ বর্ত্তমানের বৈদিক নামকরণ হইতে বিভিন্ন ছিল। অনেকগুলিই নাম নহে, শুধু উপাধি মাত্র।

যাহা হউক, আরব গ্রন্থকারগণের রচনায় যে সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিত এবং চিকিৎসকগণের নামের উল্লেখ আছে তাহা এই—বাহ্‌লা (১), মাঙ্কা (২), বাজিগর (৩), ফিলবারফিল (৪) ও সিন্ধবাদ (৫)। জাহিদ এই সমস্ত নামের সঙ্গে আরও কতকগুলি নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তাঁহাদের সকলেই খালিদ-অল-বারমাকি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়ে বোগদাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং সকলেই চিকিৎসক ছিলেন (৬)। ইবনে আবি উসেইবা এই সকল নামের সঙ্গে মাঙ্কার পুত্র এবং বাহ্‌লার পুত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ইস্‌লামধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুসলমানী নাম সলিহ। ইবনে নাদিম, ইব্‌নে ধন্ (৭) নামক অন্য একটি নামোল্লেখ করিয়াছেন। উঁহারা সমস্তই বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। অন্যত্র তিনি যে সমস্ত নামের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের চিকিৎসা ও জ্যোতিষ পুস্তক সমূহ আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল। সেই নামগুলি এই—বাখার (৮), রাজা (৯) মাঙ্কা, সাহির (১০), আঙ্কু (১১, জঙ্কল (১২), আরাইকল (১৩), জবার (১৪), এণ্ডি (১৫), জাহারি (১৬)।

মাঙ্কা

আবি ইবান উসেইবা তাঁহার "তারিখ-উল-আত্তিব্বা"* পুস্তকে লিখিতেছেন "মাঙ্কা একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। একদা খলিফা হারুণ-র-রসিদের গুরুতর পীড়া হয়। বোগদাদের চিকিৎসকগণ তাঁহার রোগ সারাইতে অকৃতকার্য্য হইলে কোন ব্যক্তি মাঙ্কার সুযশের কথা তাঁহার গোচরীভূত করে। তিনি তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বোগদাদে পথের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া আনয়ন করেন এবং তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়া তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করেন। পরে তাঁহাকে সংস্কৃত পুস্তক সমূহ আরবীতে অনুবাদের জন্য নিযুক্ত করেন (১)।

মাঙ্কা নামটিকে 'মাণিক' বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি?

সলিহ্ বিন্ বাহ্‌লী (২)

এই ব্যক্তিও একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক। উপরোক্ত ঐতিহাসিক তাঁহাকে চিকিৎসকগণের মধ্যে অতি উচ্চে স্থান

(১) Bahla (২) Manka (৩) Bazigar (৪) Filbarfil (৫) Sindbad

(৬) কিতাব-উল-বয়ান ৪০ পৃঃ (ইজপ্ট) (৭) Ibn Dhan (৮) Bakhar (৯) Raja, (১০) S.. r, (১১) Anku, (১২) Zankal, (১৩) Araikal, (১৪) Jabhar, (১৫) Andi, (১৬) ফিহ্‌রিশ্‌ত ই ইবনে নাদিম ফিক্‌র কুতুব তিব ওয়া নজুম।

* চিকিৎসকগণের ইতিহাস।

(১) তারিখ-উল-আত্তিব্বা পৃঃ ৩৩ দ্বিতীয় খণ্ড, ইজিপ্ট এবং ফিহ্‌রিশ্‌ত-ই ইবনে-নাদিম ২৪৫ পৃঃ। (২) Salih

প্রদান করিয়াছেন। একদা হারুণ-র-রসিদএর জনৈক খুল্লতাত ভ্রাতা সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হন। গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত চিকিৎসক গেব্‌রাইল বক্তেসির্ড (১) তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হন এবং এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু জাফর-অল-বারমাকী উল্লিখিত চিকিৎসককে আনয়ন করেন। তিনি তাহাকে নিরোগ করিয়া খলিপার প্রশংসাভাজন হন (২)।

ইবন্‌-এ-ধন্‌

ইনি বারমাকিদ চিকিৎসাগারের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। সংস্কৃত পুস্তক আরবীতে অনুবাদকগণের মধ্যে তিনি অন্যতম (৩)। অধ্যাপক সাচার্ড তাঁহার 'ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত নামের উৎপত্তি নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি অনুমান করেন ইহা 'ধনিয়া' কিংবা 'ধনার্ণ' হইবে। সম্ভবতঃ 'ধন্বন্তরি' নামের সঙ্গে মিলের নিমিত্ত তিনি ঐরূপ অনুমান করিয়াছেন। ধন্বন্তরি মনুসংহিতায় দেবতাগণের চিকিৎসকের নাম (৪)।

নিম্নোল্লিখিত শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাবলী সংস্কৃত হইতে আরবীতে অনুবাদিত হইয়াছিল—

গণিত, জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রাজনীতি ইত্যাদি।

গণিতশাস্ত্র

আরবের মুসলমানগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে তাঁহারা এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যা গঠন প্রণালী হিন্দুদের নিকট শিখিয়াছেন (৫)। উক্ত কারণেই তাঁহাদের সংখ্যাগুলির নামকরণে তাঁহারা ভারতের অনুকরণ করিয়াছেন। ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের নিকট ঐ প্রথা শিখিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে "আরবী সংখ্যা" নাম দিয়াছেন। ঠিক কোন্‌ সময় আরবের মুসলমানগণ হিন্দুদের নিকট উক্ত প্রণালী শিখিয়াছেন তাহার প্রকৃত তথ্য গোপন রহিয়াছে। ১৫৬ হিজরীতে যে হিন্দুপণ্ডিত একটি সিদ্ধান্তসহ বোগদাদ গিয়াছিলেন তিনিই সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে এই প্রণালী শিখাইয়াছেন। আরবে প্রথমতঃ শব্দের সাহায্যে সংখ্যা লিখিত হইত। পরে তাহারা গ্রীক এবং য়িহুদিগণের ন্যায় অক্ষরে (৬) সংখ্যা লিখিতেন। সংক্ষিপ্ত এবং সুবিধাজনক বলিয়া আরবের ফলিত জ্যোতিষে এখনও ঐ প্রথা প্রচলিত আছে। যাহা হউক মহাম্মদ-বিন-মুসা-অল-খাওয়ারাজমীই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সংখ্যাগুলিকে আরবী আকার প্রদান করেন (৭)। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার ১১শ সংস্করণের চতুর্দ্দশ খণ্ডে পূর্ব্ব ও পশ্চিম আরবের সংখ্যাসমূহ হস্তলিপি এবং inscription হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতেই প্রতীয়মান হইবে কি করিয়া আরবে ভারতীয় সংখ্যাগুলির অনুকরণ করা হইয়াছিল। খলিপা মামুন-র-রসিদের দরবার-স্থিত জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ বিখ্যাত পণ্ডিত অল্‌-খাওয়ারাজমী উক্ত সংখ্যাগুলি সংশোধিত এবং সন্নিবেশিত করেন। * এই সংখ্যাগুলিই আন্দালুসিয়া হইতে ইউরোপে গৃহীত হইয়াছে। ইউরোপের একটি বিশেষ অঙ্কশাস্ত্রকে লগারিথম্‌, অল্‌গরিথম, এগরিজম অথবা অল্‌গরিজম্‌ বলা হয়। এই সমস্তগুলিই অল-খাওয়ারাজমী নামের অপভ্রংশ (৮)। আন্দালুসিয়ার আরবগণ এই ভারতীয় সংখ্যাগুলিকে 'হিসাব-অল্‌-গুবার' বলেন। ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণ গ্রাম্য পাঠশালায় মাটিতে কষিয়া অঙ্ক শিক্ষা দিতেন। সম্ভবতঃ এই প্রথা হইতেই উক্ত আরবী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত আকৃতির সংখ্যাগুলির উৎপত্তি স্থান যে আরব নয় ইহার একটি বিশেষ সিদ্ধ প্রমাণ এই যে আরবের অন্যান্য প্রকার লিখন প্রণালীর বিপরীত ইহাদিগকে বামদিক হইতে ডানদিকে লেখা হয়। আরবেরা কিন্তু ইহাদিগকে ডানদিক্‌ হইতে বামদিকে পড়ে। সিন্ধু হস্তাক্ষরের সহিত ইরাণ নাদিম্‌ এই সংখ্যাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন এবং এক হইতে একহাজার পর্য্যন্ত লিখনপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা

(১) Bakht .hiyan (২) তারিখ-উল-আতিব্বা ৩৪ পৃঃ দ্বিতীয় খণ্ড। (৩) ইবনে নাদিম ২৪৩ পৃঃ (৪) ইংরাজী অনুবাদের (৫) রিসায়ল ইখ্‌ওয়ানু-স-সাফা। কাল ফি হিদায়তল হিসাব. বাহাউদ্দিন আমালি কৃত। কিতাবুল হিন্দ রাইহানী কৃত। (৬) হরূপ-এ আবেযদ্‌ (৭) তাবাকাতুল উম্মাম; সাইদ অব্‌ আন্দালুসিয়া।

(৮) এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা ১৯ খণ্ড ৮৬৭ পৃঃ * ৭৮০ খৃঃ হইতে খৃঃ ৮৪০ পর্য্যন্ত।

অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে সিন্ধুবাসী পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টাতেই উক্ত প্রথা আরবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অল্-খাওয়ারাজমীর পরে যে সমস্ত মুসলমান অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আলীবিন আহমদ নসবী প্রধান। তিনি 'আলমান্কা ফিল-হিসাব-উল-হিন্দী' নামকগ্রন্থ রচনা করেন। অল্-খাওয়ারাজমীর সময়ই গ্রীক অঙ্কশাস্ত্রগুলি আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল এবং অঙ্কবিষয়ক বহুসংখ্যক পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও হিন্দু-শাস্ত্রবিদগণের সম্মান আরবে কখনও হ্রাস পায় নাই (১)। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হিন্দুগণিতশাস্ত্র সাধারণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত গণিত শাস্ত্রবিদ্ ও দার্শনিক বু-আলীসিনা বাল্যকালে জনৈক সবজী বিক্রেতার নিকট গণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন (২)।

জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আনুমানিক ১৫৪ হিজরী সনে জনৈক হিন্দুপণ্ডিত সিন্ধুদেশ হইতে একটি deputationএর সঙ্গে একটি জ্যোতিষগ্রন্থসহ বোগ্‌দাদে গিয়াছিলেন (৩)। উক্ত গ্রন্থের পূর্ণ সংস্কৃত নাম ব্রহ্মস্পথ সিদ্ধান্ত (৪)। আরবীতে সাধারণতঃ ইহাকে 'আস্-সিন্ধ-হিন্ধ' বলা হয়। অন্য একটি সংস্কৃত পুস্তক আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল। ইহার সংস্কৃত উচ্চারণ 'আর্য্যভট্ট'। 'আহ্বর কুয়ান (৫) নামক সংস্কৃত পুস্তকটিও আরবীতে অনূদিত হইয়া 'আর্কন্দ' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। উহার সংস্কৃত মৌলিক নাম 'খন্দ খাদেক' (৬)। সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধান্ত অনুবাদের সহায়ক হিন্দু পণ্ডিতের ইবরাহিম ফাজারি এবং ইয়াকুব-বিন-তারিখ নামক দুইজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে আরবীতে উক্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

কালের যেরূপ বিভাগের উপর হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে 'কেলাপ (৭) বলে। পৌরাণিক জাতিসমূহের ন্যায় হিন্দুরাও বিশ্বাস করিতেন যে চন্দ্র, সূর্য্য শনিশ্চর, প্রভৃতি গ্রহসমূহ নভোমণ্ডলে একই সময়ে vernal equinon (৮) এ আবির্ভূত হয় এবং একই সময় আবর্ত্তন আরম্ভ করে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এই সপ্তগ্রহ একই স্থানে মিলিত হইলে মহাপ্রলয় হইবে এবং পুনরায় বিশ্বের সৃষ্টি হইবে। আবার এই দুই অবস্থার মধ্যবর্ত্তী সৌরবৎসরগুলিকেও 'কেলাপ' বলা হয়। ব্রহ্মগুপ্তের মতে একটি 'কেলাপ' চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসরের সমান। উক্ত নির্দ্ধারণ অনুসারেই দিবস গণনা করা হয়। আরবেরা এই 'কেলাপ'কে সানি-উস্-সিন্ধ-হিন্ধ বা সিদ্ধান্তের বৎসর এবং দিবসগুলিকে 'আয়া-মুস্-সিন্ধ-হিন্ধ' বলেন। লক্ষ কোটি হিসাবে গণনা দুরূহ বলিয়া আর্য্যভট্ট পঞ্চম খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গণনা সহজবোধ্য করার নিমিত্ত 'কেলাপ'কে সহস্রভাগে বিভক্ত করেন এবং অংশগুলিকে 'যগ', 'মহাযগ' নাম প্রদান করেন (৯)। এই নীতি অনুযায়ী প্রণীত আর্য্যভট্টের গ্রন্থকে আরবগণ 'আরজভর' অথবা আরজভজ (১০) বলেন এবং 'যগ' শব্দটিকে 'সানি আরজভজ' অথবা আর্য্যভট্টের যুগ বলেন। তাঁহারা 'আস্-সিন্ধ-হিন্ধ' এবং 'আরজভজ' শব্দদ্বয়ের ধাতুগত অর্থ ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে ইহা গণনার নিয়ম এবং 'আস্-সিন্ধ-হিন্ধ' অর্থ 'আদ্-দাহর-উদ্ দাহির' এবং 'আরজভজ' অর্থ সহস্রতম অংশ। শেষোক্ত পুস্তকটি আবুল হাসান্ আহ্ওয়াজি কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছিল।

ইয়াকুব-বিন্-তারিখ 'আর্কন্দ' অর্থাৎ 'খন্দ খাদেক'এর নিয়মাবলী "সিদ্ধান্ত" এর পণ্ডিত অথবা অন্য কোন পণ্ডিত

(১) এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ ইসলামের অঙ্কশাস্ত্র বিষয়ক এইচ সুটার্ম লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২) উইওয়েল আন্‌বা দ্বিতীয় খণ্ড ২ পৃঃ ইজিপ্ট। (৩) তাবাকাতুল উম্মাম, সাইদ অব্ আন্দালুসিয়া ৪৯ পৃঃ বিরূত।

(৪) Barhamspat Siddant। (৫) Ahrquan

(৬) Khanda Khadeik

(৭) Kalap

(৮) বিষুপদ বা বিষুব রেখা ও অয়ন মণ্ডলের সংযোগ স্থান (২১ শে মার্চ্চ)

(৯) মওলানা সুলেই নদবীর এই প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদক সৈয়দুল হক বি-এ সাহেব 'Jag', 'mahajag' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমার মনে হয় উহা 'যুগ' 'মহাযুগ' শব্দ।

(১০) Arjbahdh

হইতে লিখিয়াছিলেন। পুস্তকটির প্রণেতা ব্রহ্মগুপ্ত কিন্তু ইহার কতক নীতি সিদ্ধান্ত এর নীতি হইতে বিভিন্ন। এই পুস্তকত্রয় আরব জ্যোতিষবিদগণের মধ্যে সিদ্ধান্তের নীতি সমূহ প্রচলন করে। এই সময়ের কিছুদিন পর টলেমির "মযিস্তি" (১) গ্রন্থটি আরবীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। খলিপা মনসুরের সময় একটি মানমন্দির স্থাপিত হয় এবং বহুবিধ গবেষণা আরম্ভ হয়। এতদ্‌সত্বেও বোগদাদ হইতে স্পেন পর্যান্ত আরব জ্যোতিষবিদগণ উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন এবং উহার ধারানুসারে গণনা করিতেন। তাঁহারা উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া ভুল সংশোধন পূর্ব্বক উহার বহুল উন্নতি সাধন করেন। পঞ্চম হিজরী সন পয্যন্ত এরূপ চলিয়াছিল। এই সময় বাইরুণী আবির্ভূত হন।

খলিপা হারুন-র-রসিদের রাজত্বকালে অল-খাওয়ারাজমী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কোষ্ঠীতে গ্রীস ও ইরাণীয় জ্যোতিষ নীতি গ্রহণ করা হইলেও উহার মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল হিন্দু জ্যোতিষ নীতির উপর। উক্ত কারণেই এই পুস্তককে 'আস্-সিন্ধ-হিন্ধ-ই-সগির (২) অথবা ক্ষুদ্রতর সিদ্ধান্ত বলা হয় (৩)। হিজরীর তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সনে হাসান-বিন-সাব্বাহ, হাসান-বিন-খাসিব, ফজল-বিন-হাতিম তাবরিজী, আহামদ-বিন-আবদুল্লাহ মারওয়াজি, ইবন-অল-আদমী আবদুল্লা, আবু রায়হান-অল-বাইরুণী "সিদ্ধান্ত" সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। অবশ্য গ্রীক জ্যোতিষনীতি ও ব্যক্তিগত গবেষণা প্রসূত সিদ্ধান্ত সমূহ যোগ করিয়া তাহারা উহাকে বিশেষ উন্নত করিয়াছিলেন। হিজরীর চতুর্থ শতাব্দীতে সিদ্ধান্তীয় নীতি সমূহ বোগদাদ হইতে স্পেনে গৃহীত হয়। মাদ্রিদ নিবাসী মুসলামা বিন-আহামদ (মৃঃ ১০০৭ খৃঃ) অল-খাওয়ারাজমীর আস্-সিন্ধ-হিন্ধ-ইসগিরের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুত করেন। আবুল আস্‌বাগ (মৃঃ হিজরী ৪২৬) সিদ্ধান্তের নীতিতে একটি বৃহৎ কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। অতঃপর সিদ্ধান্তীয় প্রভাব সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইব্রাহিম জারকালী তাঁহার 'সাফাতুজ জারকালীয়া' নামক পুস্তকে সিদ্ধান্তের নীতির উপর নির্ভর করিয়াছেন। স্পেনের আরবদের মধ্যবর্ত্তীতায় সিদ্ধান্তের নীতি সমূহ য়িহুদি এবং ইউরোপবাসীগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। য়িহুদি পণ্ডিত এবরাহাম তাঁহার হিব্রু পুস্তকগুলিতে সিদ্ধান্তীয় প্রণালীতে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছেন (৪)

আরবীতে সংস্কৃত পরিভাষা

নিজস্ব গবেষণার বলে আরবী ফলিত জ্যোতিষ উন্নতির উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিল। সংস্কৃতের একটি অপ্রচলিত এবং দুইটি প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ এখনও আরবী ফলিত জ্যোতিষে প্রচলিত আছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে জ্যোতিষ শাস্ত্র ভারত হইতে আরবে গমন করিয়াছিল। 'সিদ্ধান্ত' নামটি ব্যতীত প্রাচীন আরবী জ্যোতিষে 'করদায়া' বলিয়া একটি সংস্কৃত পারিভাষিক নাম আছে। ইহার মূল সংস্কৃত নাম 'করমজিয়া'। পরে ইহার পারিভাষিক নাম "ব্বিতর মুস্তবী" হইয়াছে 'জেইব" শব্দটি এখনও আরবী অঙ্ক শাস্ত্রে এবং ত্রিকোণমিতিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ "পকেট"। ইহার সংস্কৃত মৌলিক শব্দটি 'জিবা' (৫)। 'জেইব-উত্তামাম' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ হইতেই 'জুইউবমান কুসা', 'জুইউব সবমুতা', মাইউব প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। অত্যন্ত কাটাছাটি করিয়া এইগুলি সংস্কৃত হইতে আরবীতে গৃহিত হইয়াছে। আজকাল কেহই বিশ্বাস করিবেন না এই সমস্তগুলিই মূলতর সংস্কৃত। সর্ব্বশেষ শব্দটি "আওজ" (৬)। জ্যোতিষে ইহার অর্থ 'শীর্ষস্থান' (৭)। আরবী, পারসী উর্দ্দুতে উহা এত প্রচলিত যে কেহই বিশ্বাস করিবেন না ইহার উৎপত্তি সংস্কৃত হইতে। এই জন্যই উহার ধাতু আরবী dictionaryতে পাওয়া যায় না। আরও দুইটি শব্দের ধাতুগত অর্থ প্রণিধানযোগ্য। হিন্দু পণ্ডিতগণ গ্রহের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ কালে মধ্যান্দিন রেখা * নির্ণয়

(১) Majisti

(২) (৩) কিফ্‌তি ১৭৮ পৃঃ ইজিপ্ট

(৪) মাসউদি, কিফতি, এবং বাইরুণী প্রত্যেকের পুস্তকে সিদ্ধান্ত, আরজভজ এবং আর্কন্দ এর উল্লেখ আছে।

(৫) Jeeda

(৬) (৭) কাহারও মতে ইহার মূল শব্দ পারসী "Aug", কিন্তু সম্ভবতঃ আরবী 'আওজই' পারসী Aug হইয়াছে।

* Meridian

করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে এই রেখা সিংহলের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। আরবগণ সিংহলকে সরন্দীপ বলেন। হিন্দু জ্যোতিষগণের মতে বিষুব রেখাও সিংহলের উপর দিয়া গমন করিয়াছে। যে স্থলে বিষুব রেখা এবং মধ্যন্দিন রেখা পরস্পরকে ছেদন করিয়াছে আরবগণ তাহাকে 'কুব্বাত-উল-আরদ" বলেন। (১)। তাহারা সিংহলের উপর দিয়া অতিক্রান্ত মধ্যন্দিন রেখা হইতে দ্রাঘিমা নির্ণয় করিতেন। এই জন্যই প্রাথমিক আরব-ভৌগোলিকগণ সিংহলকে "কুব্বাত-উল-আরদ" বলিতেন। আরব জ্যোতিষগণের অন্য একটি ধারণা এই ছিল যে সিংহলের উপর দিয়া অতিক্রান্ত মধ্যন্দিন রেখা উজ্জয়িনীর (২) উপর দিয়াও অতিক্রম করিয়াছে। উজ্জয়িনী মালাবারের অন্তর্গত একটি সহর। সিদ্ধান্তে উজ্জয়িনী হইতে দ্রাঘিমা গণনা করা হইয়াছে। উক্ত কারণেই আরব জ্যোতিষগণ উজ্জয়িনী হইতে দ্রাঘিমা গণনা করেন। কালক্রমে ইহাই "উরেইন'এ পরিণত হইয়াছে। যাহা কিছু মধ্যবর্ত্তী তাহাকেই আরবী ভাষায় 'উরেইন' বলা হয়। সরিহ্ জার্জানি নামক জনৈক বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক তাহার সূত্র-পুস্তকে (৩) ইহা সমর্থন করিয়াছেন। 'বাজমালাহ্' নামক আর একটি শব্দ প্রাচীন আরবী খগোলবিদগণ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার সংস্কৃত মৌলিক শব্দ 'আজমাশাহ' (৪)। ইহার অর্থ চান্দ্রমাস ভুল ধারণা এই যে গণিত শাস্ত্র হিন্দুস্থান হইতে আসিয়াছে বলিয়া আরবী সংখ্যাগুলিকে 'হিন্দসা' বলা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় ১৮৩১ খৃঃ অব্দে মুসার আল্‌জেব্রা প্রকাশক বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্রেডারিক রোজেন্‌ও (৫) এ বিষয়ে ভুল করিয়াছেন। কিন্তু এই শব্দটি পারসী 'আন্দাজা' শব্দ হইতে উৎপন্ন।

হিন্দুগণ ও কতকগুলি বর্ত্তমান বিজ্ঞান

ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে আরব জ্যোতিবিদগণ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহারা দুইটি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুরূপ। ব্রহ্মগুপ্তের মতে এক বৎসরে ৩৬৫ দিবস ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৯ সেকেণ্ড। বর্ত্তমান জ্যোতিষ মতে এক বৎসরে ৩৬৫ দিবস ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৯ ২/১০ সেকেণ্ড। পৃথিবীর গতিবিধি সম্বন্ধেও ঐ কথা। আর্য্যভট্ট এবং তাঁহার শিষ্যগণ বিশ্বাস করিতেন যে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে। ব্রহ্মগুপ্ত গবেষণা করিয়া এই মতকে দৃঢ় করিয়াছেন। বর্ত্তমান মতও এই।

চিকিৎসা শাস্ত্র

ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্রও আরবগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ওমাইয়াদ বংশীয়গণের সময় সিরীয় এবং গ্রীক ভাষা হইতে কতকগুলি চিকিৎসা পুস্তক আরবীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। আব্বাস্ বংশীয় খলিফাগণের সময় এই অনুবাদকার্য্য বিশেষ অগ্রসর হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মাঙ্কা নামক জনৈক চিকিৎসক ভারত হইতে বোগদাদে গমন করেন এবং হারুন-র-রসিদকে নিরোগ করিয়া ভারতীয় চিকিৎসার সম্মান প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্ব্যতীত বারমাকিদগণের চিকিৎসাগারে ইবনে-ধন্ প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। আরবগণ ভারতীয় চিকিৎসার প্রতি এইটুকু সম্মান প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইয়া-হুইয়া-ইবনে খালিদ-অল-বারমাকি ভারত হইতে ভেষজ দ্রব্য এবং গাছ গাছড়া আনয়নের জন্য একজন লোক তথায় প্রেরণ করেন এবং অনুবাদ শাখায় একজন হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। তদরূপ আব্বাস বংশীয় খলিফা অল-মওয়াফ্‌ফাক বিল্লাহ তৃতীয় হিজরীতে ভারতীয় ভেষজদ্রব্য অনুসন্ধান করার জন্য লোক প্রেরণ করেন। সাচার্ড তাহার "ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে এবিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আরব ইতিহাসে এবিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। মাত্র এইটুকু পাওয়া যায় যে খলিফা মুতাদিদ বিল্লাহ আহামদ-বিন-থাপি আদদাই-লামি নামক এক ব্যক্তিকে কোন কিছু সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ভারতে প্রেরণ করেন। ইহাও জানা যায় যে উক্ত খলিফার ভারতের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান চলিত সিন্ধু দেশের দেবল নামক স্থানে ভূমিকম্পে ১৫০ সহস্র লোক মৃত্তিকা প্রোথিত হইলে কোন সরকারি পত্র-লেখক উক্ত সংবাদ খলিফার নিকট জানাইয়াছিলেন।

(১) অর্থাৎ পৃথিবীর গম্বুজ।

(২) মওলানা নদবীর, যিনি এই প্রবন্ধ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, Ujjain শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বোধহয় তাহা উজ্জয়িনী।

(৩) Book of definitions. (৪) Adhmasha.

(৫) সা প্রণীত বীজ গণিতের ভূমিকা ১২৬ পৃঃ ও ১২৭ পৃঃ।

চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুবাদ

যে সমস্ত চিকিৎসা পুস্তক আরবীতে অনুবাদিত হইয়াছিল তন্মধ্যে প্রধান দুইটি। শাশারাত—ইহাকে আরবগণ সাস্রু বলেন। উহা ১০ অধ্যায়ে বিভক্ত। উহাতে রোগের এবং রোগ-লক্ষণ সমূহের বিস্তারিত আলোচনা আছে। ইয়াহ ইয়া বিন খালিদ-অল-বারমাকির আদেশে মাঙ্কা ইহাকে আরবীতে অনুবাদ করেন। ইহাই guide রূপে বারমাকি চিকিৎসাগারে ব্যবহৃত হইত। চরক—ইহার প্রণেতা—ভারতবর্ষের জনৈক ঋষি ও বিখ্যাত চিকিৎসক। ইহা সংস্কৃত হইতে পারসীতে এবং পারসী হইতে আরবীতে অনুদিত হইয়াছিল। তৃতীয় পুস্তকটীকে ইবনে নাদিম 'সদ্ধিস্থান' এবং ইয়াকুবি 'সানজ্‌স্থান' বলিয়াছেন। ইবনে নাদিম ইহার অর্থ করিয়াছেন 'খুলাসায়ে কামইয়াবি' অথবা 'কৃতকার্য্য সোপান'। ইয়াকুবি ইহার অর্থ করিয়াছেন "সিরাত-ই-কামইয়াবি" (১)। ইয়াকুবির অর্থই শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। ইব্‌নে ধন ইহার অনুবাদ করেন। ইবনে নাদিম 'নাদন' (২) নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু ইয়াকুবি এস্থলে নীরব। ইহাতে চারিশত চারিটি রোগের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং শুধু রোগের চিকিৎসার বিবরণই ইহাতে আছে (৩)। বিভিন্ন প্রকার ভেষজ দ্রব্য ও গাছ গাছড়ার নাম সংবলিত পুস্তকে মধ্যে মধ্যে একটি ভেষজ দ্রব্যের দশটি নামও পাওয়া যায়। সুলেইমান বিন ইসাকির (৪) ব্যবহারের জন্য মাঙ্কা উক্ত পুস্তকটি আরবীতে অনুবাদ করেন। গ্রীক এবং ভারতীয় ঔষধের শারীরিক কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা এবং বৎসরকে ঋতুতে (৫) বিভাগের বিভিন্নতা সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা সংযুক্ত অন্য একটি পুস্তক অনুদিত হইয়াছিল। ইবনে নাদিম 'আস্তানজার' নামক আর একটি পুস্তকের উল্লেথ করিয়াছেন, তাহার অনুবাদক ইবনে ধন্। নওকাশনাল নামক জনৈক বৌদ্ধের দুইটি পুস্তক অনুবাদ করা হইয়াছিল। একটিতে একশত রোগ এবং একশত ঔষধের বর্ণনা আছে। অন্যটিতে রোগ নিরূপণ সম্বন্ধে ভ্রান্তি এবং উহার ফলাফলের বর্ণনা আছে। রাউয়া নামক জনৈক হিন্দু নারীর একটি চিকিৎসা পুস্তক অনুবাদ করা হইয়াছিল। তাহাতেও স্ত্রীরোগের বর্ণনা আছে। গর্ভিণী নারী সম্বন্ধে একটি ভেষজ দ্রব্য ও গাছ গাছড়া বিষয়ে একটি এবং মত্ততা সম্বন্ধে একটি—এইরূপ তিনটি পুস্তক অনুদিত হইয়াছিল। মাস্-উদি একটি চিকিৎসা পুস্তক সম্বন্ধে বলেন "রাজা কোরালের জন্য এই বৃহৎ পুস্তকটি রচিত হইয়াছিল। তাহাতে রোগের কারণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ভেষজ দ্রব্য ও গাছ গাছড়ার প্রতিকৃতি দেওয়া আছে। পানীয় দ্রব্যের বর্ণনাকালে ইব্‌নে নাদিম 'ইস্তরি'র উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ উক্ত নামের চিকিৎসকের নাম অনুসারেই উহার এই নাম। ইব্‌নে নাদিম "সাওধারম" বলিয়া অন্য একটি নামের উল্লেথ করিয়াছেন। ইহা 'সত্যভ্রমণ' হইতে পারে। বাইরুণী ইহার 'সত্য' নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন।*

পুস্তকগত প্রভাব ব্যতীত আরও বহুভাবে আরবী চিকিৎসা ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত। সেই প্রভাব এখনও বিদ্যমান। মোগল রাজত্বকালে ভারতে মুসলমান চিকিৎসায় হিন্দুপ্রভাব এখানে উল্লেখ করা হইবে না। চারিশত হিজরীতে যতটুকু প্রভাব পড়িয়াছিল শুধু তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা যাইবে।

অনেক আরবী ঔষধের নাম সংস্কৃত। 'জানজাবিল' (৬) শব্দটি সংস্কৃত। ইহা হজরত মহম্মদের সময়ও ছিল, এমন কি পবিত্র কোরাণেও উহার উল্লেখ আছে † আরবীতে একটি ঔষধ এবং একটি খাদ্যের নাম বড় অদ্ভুত। আরবী 'ইস্তরিফল' ঔষধটির নাম প্রায় সবাই জানেন। অল-খাওয়া-রাজমী এই সম্বন্ধে বলেন "ইহা সংস্কৃত ত্রিফল অথবা 'তিনটী ফল"। 'হল্লিনা', 'বালিলা,' এবং আম্‌লাহ্ (৭) নামক তিনটি ফলের সংযোগে ইহা প্রস্তুত হয়। 'আমলাহ্ একটি ভারতীয় ফল (৮)। মধুর সহিত উহাকে মিশ্রিত করিয়া

(১) অথবা The Why of Success (২) Nadan

(৩) কিতাবিলত-ই-ইবান নাদিম।

(৪) (৫) " " "

* কিতাবিল্‌ও-ই-ইবন-এ-নাদিম

(৬) Zanjabil † তাবখুল খোলাপা

(৭) (৮) আমার মনে হয় ইহা হরিতকী, বহেড়া ও আমলকী দ্বারা যে ত্রিফলা প্রস্তুত হয় তাহা। কিন্তু এস্থলে আমলাহ অর্থ "আম্" দেখিতেছি।

'আন্‌যাবাত' প্রস্তুত হয়। ইহার আদি সংস্কৃত নাম 'জুরান বা' অথবা 'আমের আচার'। 'বাহতা' শব্দটি আরও অদ্ভুত। অল খাওয়ারাজমী ইহার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ইহা একটি সিন্ধু শব্দ এবং রোগের একটি পথ্য,—ভাতের সহিত ঘি এবং দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া ইহা রন্ধন করা হয়। ইহা সম্ভবতঃ ভারতীয় 'ভাত'। কিন্তু আরবদের পক্ষে ইহা লঘু পথ্য।"

পশু চিকিৎসা

এই শাখায় শানাথ অথবা ভানাক্ এর পুস্তক অনুবাদ করা হইয়াছিল।

জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, কবচ বিজ্ঞান এবং জিয়োমেন্‌সী।*

উপরোক্ত আরবীয় বিজ্ঞান সমূহের ভারতবর্ষের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা সকলেই জানেন। খলিপা মনসুরের সময় এই সমস্ত বিজ্ঞানে ভারতীয় প্রভাব বিস্তার করে। তিনি এই বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। এমন কি বোগদাদ নগরী নির্ম্মাণের সময় কোষ্ঠী আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর ভারতীয় জ্যোতিষের অনুবাদ হইয়াছিল। জ্যোতিষ পণ্ডিতগণের মধ্যে কঙ্কাই বিখ্যাত। ওসেইবার মতে তিনি খুব বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। সাচাও গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহা "কনকলয়া" (১)। উক্ত নামের একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী আদিকালে ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইব্‌নে নাদিম তাঁহার চারিটি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন:—

১। কিতাব-উল-নামুদার—আয়ু সম্বন্ধীয় পুস্তক। (২)

২। কিতাব-অস্-সকারিণ মাওয়ালিদ—জন্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক।

৩। কিতাব-উল-কুরানাত-অল কবির—বৎসর সম্বন্ধীয় পুস্তক।

৪। কিতাব-উল-কারাণাত-সগির—বৎসর সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র পুস্তক

ওসাইবার মতে ইহা চিকিৎসা পুস্তক। কিন্তু ইবনে নাদিমের মতে ইহা জ্যোতিষ পুস্তক। সম্ভবতঃ উহাতে উভয় বিজ্ঞানেরই আলোচনা আছে।

ওসেইবা তাঁহার আরও দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

১। কিতাব-উত্-তাওয়াসি—মেস্‌মারিজম সম্বন্ধীয় পুস্তক।

২। কিতাব ফি আহ্‌দাত-উল-আলম ওয়াদ্দুর ফিল কারাণ—পৃথিবীর যুগ ও নক্ষত্রের গতি সম্বন্ধীয় পুস্তক।

মুস্‌লিম দার্শনিক বলখ্‌ নিবাসী আবুমাশার হইতে গ্রন্থকার বলেন "ভারতীয় জ্যোতিষীদের মধ্যে কঙ্কাই প্রধান" দ্বিতীয় হিজরী সনে আবির্ভূত মুস্‌লিম জ্যোতিষী 'আলারুদ বিন মহাম্মদ' ভারতীয় "জাফার" (৩) সম্বন্ধে একটি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। এবনে নাদিম আরও তিনটি হিন্দু পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন:—

১ যাওদার ২ নাহাক অথবা নায়াগ ও সজ্বল।

কোন ভারতীয় ভাষা হইতে হাতগণনার একটি পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছিল। জায়রুল হিন্দ অথবা ভারতীয় শুভাশুভ লক্ষণ সম্বন্ধে একটি পুস্তক আরবীতে আছে।

সর্পবিজ্ঞান (৪)

ভারতবাসীরা সর্পবিজ্ঞানে এবং সর্পকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে বিখ্যাত। এই বিজ্ঞান আরবে 'সারাপ' নামে বিখ্যাত। এই শাখায় 'রাই' নামক জনৈক পণ্ডিতের পুস্তক অনুদিত হইয়াছিল। তাহাতে সর্প ও সর্পবিষের জাতি বিভাগ আছে।

বিষবিজ্ঞান

ইহাতেও ভারতবাসীরা বিখ্যাত। জাকারিয়া কিজউমি তাঁহার আতারুল বিলাদে 'বিষ' নামক একটি দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত "বিষ"। জীবনরক্ষার জন্য রাজাদের এই দ্রব্যের জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সঙ্গীত

জাহিদের পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ণনায় তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের প্রশংসা করিয়াছেন। বোগ্‌দাদ হইতে যে সমস্ত পুস্তক

* Geomancy খড়ি পাতিয়া গণনা (১) সাচার্ড এর 'ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের ভূমিকা ৩৩ পৃঃ। (২) Kitabul Namudar.

(৩) Jafar (৪) Ophidia

প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় সঙ্গীতের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু আন্দা লুসিয়ার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক কাজি সাইদ নাফির নামক একটি ভারতীয় পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহার আক্ষরিক অর্থ 'বুদ্ধির ফল'। ইহাতে সুরের বর্ণনা আছে। (১)। আশ্চর্য্য নয় যে ইহা পারসী 'নওয়াবর' শব্দ। পারসী হইতে আরবীতে উহার অনুবাদ করা হইয়াছিল। জনৈক হিন্দু পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন উহা সংস্কৃত 'নাদ'---- অর্থাৎ 'রব'।

মহাভারত

প্যারিসের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে 'মুজ মাউল তাওয়ারিল' নামক একটি পারসী পুস্তক আছে। তাহাতে মহাভারতের কতকগুলি কাহিনী আছে। ভূমিকায় আছে যে আবু সলিহ্‌ বিন্‌ সুয়েব সংস্কৃত হইতে আরবীতে উহার অনুবাদ করেন। দেইলামার জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির লাইব্রেরীর সেক্রেটারি আবুল-হাসান আলী জাবালী পুনরায় উহাকে আরবীতে অনুবাদ করেন।

রাজনীতি ও দৌত্য কর্ম্ম (২)

উপরোক্ত বিষয়দ্বয়ে দুইজন হিন্দু পণ্ডিতের পুস্তক সংস্কৃত কিংবা পালি হইতে আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল। আরবগণ ইহাদের একজনকে "শানাথ" এবং অপরটিকে "বাথার" অথবা "বাজহার" নাম দিয়াছেন। প্রথমটী সম্ভবতঃ "চৌক" এবং দ্বিতীয়টি 'বয়াগর'। শানাথের আলোচ্য বিষয় "যুদ্ধের ব্যবস্থা, রাজার লোকনির্ব্বাচন, সৈন্য সমাবেশ, খাদ্য এবং বিষ। "বয়াগরের পুস্তকে তলোয়ারের গুণাগুণ ও প্রতিকৃতি দেওয়া আছে। "আদাব-উল-মুলক" নামক আর একটি পুস্তক সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়াছিল। উহার অনুবাদক আবুসলিহ্‌ বিন্‌ সুয়েব।

রসায়ন

রসায়নের আদিস্থান যেখানেই হউক আরবেরা একটি হিন্দু পণ্ডিতের রসায়ন পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত রাসায়নিক জাবিরবিন হায়ান-এর 'খালিপ' পুস্তকটি ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত। কিন্তু উক্ত পুস্তকের হিন্দু গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় না। *

সৈয়দ সামসুদ্দিন আহ্‌মদ

(১) তাবা কাতুল উম্মাম সাইদ অব আন্দা লুসিয়া।
(২) Diplomacy

* মৌলবি সৈয়দুল হক বি-এ সাহেব হায়দরাবাদ হইতে প্রকাশিত Islamic Culture এ মৌলানা সুলেইমান নদবীর উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধটি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। আমি সেই ইংরেজী হইতে বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছি। লেখক

পঞ্চাঙ্কুর

শ্রীঅনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বি-এ

ঝরাপাতা

মর্ম্মরিয়া চরণতলে ঝরাপাতা বলে ;—
কাজ ফুরুলে এমনি ক'রে সবাই পায়ে দলে !

ছুটি

পরের কাছে ছুটি আমি বারে বারে পাই ;
ঘরের কাছে ছুটি আমার মুহূর্ত্তেকও নাই !

বনের ফুল

নিরালে ফুটিয়া ফুল অকারণে গন্ধ ঢেলে দেয় ;—
অফুরন্ত ভাণ্ডারের সাধ্য দিয়ে নীরবে শুকায় !

মন-উতলা

শ্রীবিমল মিত্র

—গল্প—

ঘাটের উপর ছাতিম গাছের ডালে একটি টিক্‌টিকি ডাকিল।

বলিলাম—ওই দেখ—দেখলে তো? এখন বিশ্বাস হোল?

নিরু কিছু কথা বলিলনা···সত্য সত্যই যেন ডাইনীর গল্পটা তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল। আর না হইবেই বা কেন?...প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ ব্যাপার না হইলেই বা—কানে শোনা কথাও তো নয়!

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি জমাট অন্ধকার বুকে লইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। পায়ের নীচে ছল্ ছল্ শব্দ করিতে করিতে জলের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে; নৌকা রাখিয়া খেয়ার মাঝি বাড়ী চলিয়া গিয়াছে; রাত্রি অনেক কাছাকাছি মাইল দুইএকের মধ্যে কোথাও কেহ নাই।

গ্রামের সীমানা এখান হইতে বহু দূরে।

নিরু বলিল—আচ্ছা, সেই ডাইনীটা এখন যদি আসে—তোমার ভয় করবে না?

বলিয়া নিরু আমার দিকে চাহিল।

বলিলাম—একবার কি হ'য়েছিল শুনবে তবে?

ছোট বেলায় কি রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল—স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে উদ্ধার করিয়া সেইটাই আরম্ভ করিতেছিলাম। হটাৎ নিরু বাধা দিয়া বলিল—দেখ দেখ—ওই দিকে চেয়ে দেখ—ওটা কি বলতো?···এই যে আলোটা জ্বলছে আর নিভছে?—আলেয়া নাকি?

অনেকদূরে মাঠের উপর একটা আলো একবার জ্বলিতেছে আর নিভিতেছে।—পরিপার্শ্বের অন্ধকারের মধ্যে

* Geomancy ...রে পাড়িবারই কথা!

ভূমিকা ৩৩ পৃঃ। (২) যাই তো বলছি—

বলিয়া গল্প আরম্ভ করিলাম।

—আমরা তখন ছোট, এই খেয়া পার হ'য়ে ভজনঘাটার ইস্কুলে পড়তে যাই—বুঝেছ—যেদিন ফুটবল ম্যাচ থাকতো, সেদিন ফিরতে খুব দেরী হ'য়ে যেত। একদিন ম্যাচ খেলে ফিরে আসছি, রাত তখন অনেক হ'য়ে গ্যাচে—পথে আলোর নাম গন্ধ নেই, এমনি অন্ধকার; তিন কোশ পথ, সোজা কথা নয়; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠের পর ছোট ছোট দু'একটা গ্রাম—গ্রামের পথে ঢুকতে কুকুরগুলো তারস্বরে চীৎকার করে উঠছে···দিব্যি চলে আসছি ফুটবলের কথা ভাবতে ভাবতে! পেঁপুলবেড়ের বিলের কাছে এসেছি···বাঁশবাগানের ধারেই বিল...পায়ের তলায় শুক্‌নো পাতা মশ্ মশ্ করছে··হাতের লাঠিটা ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে করতে আসছি, হটাৎ···

নিরু এবার সরিয়া আসিল।

বলিলাম—ভয় পাচ্ছে নাকি? তবে আর বোলব না···ভূতের গল্প শুনে আর কি হবে—

নিরু কিন্তু শুনিবেই; বলিল—না না—বল, গল্প শুনতে আমার বড্ড ভাল লাগে যে···তারপর?

বলিলাম—সে গল্প বললে কিন্তু নদীর ধারে আর আসতে চাইবে না।...ভয় লাগবে খুব।

-না—না—ভয় লাগুক্—এদিকে না হয় আর না-ই আসবো···এই এক কোশ রাস্তা হেঁটে রোজ রোজ এখেনে আসতে আর ভাল লাগেনা।

বলিলাম—তবে যে বলতে—নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে চল। রোজই বলতে—এখন দু'দিন এসেই অরুচি ধ'রে গেল?

—তা' হোক—তুমি বল—তার পর কি হোল?

বলিতে আরম্ভ করিলাম:—তারপর শোন—বাঁশতলা

দিয়ে আসছি—হঠাৎ মনে পড়লো, আগের দিন ছাদেমানের বউ মারা গিয়েছিল, তা'কে ওই বাঁশতলাতেই যে কবর দিতে দেখেছি···মনে পড়তেই গা'টা কেমন শির শির ক'রে উঠলো ; হটাৎ পেছন দিকে নজর পড়লো, চেয়ে দেখি...

নিরুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম—ওর চোখ তুটিতে প্রচুর কৌতূহল সীমানা ছাড়াইয়া একেবারে আমার কথাগুলি গিলিতেছে যেন। বলিল—তারপর···?

—চেয়ে দেখি উঁচু মাটির ঢিবিটার ওপর কে যেন একটা মেয়েমানুষ তুই হাত দিয়ে কবরের মাটি খুঁড়ছে।··· আমার নিশ্বেস বন্ধ হ'য়ে এল···ভয়ে সব যেন অসাড় হয়ে গেছে···মৃত্যুর বিভীষিকা চারদিকে ভেসে বেড়াচে... অথচ পা' তু'টো যেন কে বেঁধে ফেল্লে, পালাতে পারি না··· গলাও কে চেপে ধরেছে—চেঁচাতে গেলে লাগে; অনেকখন পরে পা চালিয়ে আসতে লাগলুম, কিন্তু পেছন ফিরে চেয়ে দেখি—সেখেনে কিছু নেই, আর—গাছের মাথায় একটা আলো কেবল জ্বলছে আর নিবছে...

নিরু বলিল—তারপর ?

—তারপর হেঁটে অনেকদূর এলুম...কিন্তু যতদূর দেখা যায় সেই আলোটা কেবল দেখতে পাই ; বাড়ী আসতে তখনও তু'মাইল বাকী—পথের মাঝে ফতেপুর গাঁ পড়ে ··

নিরু বাধা দিল ; বলিল—ফতেপুর ?···সেখেনে তোমার কোন্ বন্ধু থাকতো না ?

আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—তুমি গিরীশকে চিনলে কি ক'রে ?

নিরু হাসিয়া বলিল—তোমাদের ইস্কুলের ফটোতে দেখেছি যে তা'কে—সে নাকি তোমায় খুব ভালবাসতো···

—বাস্‌তোই তো—আমার জন্যে সে একবার জীবন দিতে পর্য্যন্ত গিয়েছিল—জানো ? সে কথা যাক্ তারপর যা' বলছিলুম—ফতেপুর গাঁয়ে মল্লিকদের গোলা ডাইনে ছেলে—মিত্তিরদের কোটার পাশেই ছিল তা'দের বাড়ী; চেঁচিয়ে ডাকলুম—গিরীশ গিরীশ—তারপর সেখেনেই নাকি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে' গিয়েছিলুম···

নিরু কৌতুহলী হইয়া প্রশ্ন করিল—তারপর ?

—যখন জ্ঞান হয়েছে দেখি রাত্তির হয়ে গেছে···চারদিকে লোকের ভীড়—গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে—বাবা মা সব এসে হাজির, আর সামনে ব'সে হীরু ওঝা নাকের কাছে লঙ্কার ধোঁয়া দিচ্ছে ; আমি উঠে বসতেই হীরু ওঝা বললে—আর ভয় নেই—ডাইনী ছেড়েছে···

নিরু এবার আরো কাছে সরিয়া আসিল :—যে ডাইনীর কথা বলছিলে, সেই ডাইনী ?

বলিলাম—এখন বিশ্বাস হোল তো ? ··

নিরুর কৌতূহল তখন আরো বাড়িয়া গিয়াছে ; বলিল—তারপর কি হোল ?

—তারপর আর কিছু হয়নি—আমরা বছর খানেক পরে কলকাতায় পড়তে এলাম—কিন্তু তারপরেও ডাইনীকে কতদিন দেখেছি।

নিরু বলিল—দেখেছ ?

দেখেছি বৈকি—কিন্তু দিনের বেলায় ; এইরকম অমাবস্যার রাতে দেখিনি --গাঁয়ে তো তা'কে কেউ থাকতে দিত না, নদীর ধারে ওই দিকে—ওই যে একটা শ্যাঁড়া গাছ—ওইখানে ওর তলায় তা'র ভাঙা কুঁড়ে ঘর ছিল ;— ইস্কুল থেকে আসতে আসতে দেখতুম কোন কোন দিন বোয়ালমারির মাঠ থেকে কাট কুড়িয়ে ফিরছে···দেখে দূর থেকে পালাতুম—কোনওদিন দেখতুম বুড়ী আমসত্ত্ব শুকোতে দিচ্ছে—আর গিরীশ কি করতো জানো ?

নিরু বলিল—কি করতো—কি ?

—তা'র তো অত ভয় টয় ছিল না—একেবারে সাম্‌পেটে ছেলে—সে সেই আমসত্ত্ব চুরি ক'রে নিয়ে দে ছুট···ডাইনী বুড়ী আসত পেছন পেছন—সে গিরীশের সঙ্গে ছুটে পারবে কেন ? বুড়ী আসতে আসতে বিড় বিড় ক'রে কত গালাগালি দিয়ে ফিরে যেত—বিড় বিড় করে বকাই ছিল তা'র রোগ, কিন্তু যদি কোনও দিন শাপ দিত - তা হ'লে আর দেখতে হোত না—তে রাত্তিরের মধ্যেই সাবাড়--তাই তো গিরীশকে সকলে কত বারণ করতো—কিন্তু সে কি তা' শোনে ?

অতীতের কথা বলিতে বলিতে সব স্মৃতি মনের সম্মুখে উদয় হইল।

একদিন ছোট বেলায় এই খেয়াঘাট দিয়া ইস্কুল যাইবার

পথে চলিতে চলিতে যে ভয়-বিহ্বল শিশু-মনের লীলা চলিত সে যেন আবার নূতন হইয়া প্রকট হইল। ওই শাঁড়া গাছ—উহারই তলায় সেই কুঁড়ে ঘরখানি কত রহস্য মাথা ঠেকিত—আজ বিজ্ঞান-চালিত মন যেন আবার তেমনি করিয়া সেই অপূর্ব্ব রহস্যে ডুবিয়া গেল।

গিরীশ!…গিরীশ যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত! কত বড় অসম্ভব কথা! হউক অসম্ভব কথা—ধর গিরীশ আবার বাঁচিয়া উঠিল! কল্পনায় বাঁচিয়া উঠিতে তো আর আপত্তি নাই; ধর গিরীশ বাঁচিয়া উঠিয়া এইখানে এই রাত্রে আমাদের দুজনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—কালো কুচকুচে দেহের রঙ্, পায়ের একটি আঙুল কাটা…বড় বড় ডাগর দু'টি চোখ…কোমরে কাপড় জড়ান—'খালি গা'…ধর যে বেশে সে বেড়াইত হুবহু সেই বেশে সে এইখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই—আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া নিরু বলিয়া উঠিল—'মা গো'—

তারপর প্রথম দর্শনের বিস্ময় হইতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিরুর সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিলাম।

গিরীশ বলিল—এই নে নিমাই—খাবি?

বলিলাম—কি রে?

—খা না—এ এক রকম ফল—সেখান থেকে চুরি করে এনেছি…নে…

স্বর্গের বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত—নন্দনকানন পরিবেষ্টিত স্বর্গের অমর-পুরী হইতে গিরীশকে আটহাতি আধ ময়লা কাপড়ে সজ্জিত করিয়া এই অন্ধকারে ইচ্ছামতীর তীরে ছাতিম গাছের তলায় টানিয়া আনিয়া, তাহার দ্বারা ফল চুরি করাইয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলাম।

নিরু বলিল—দেখো একদিন গিরীশকে নিয়ে এস আমাদের বাড়ীতে তোমাকে তো কত ভালবাসতো… একদিন নিজে হাতে রেঁধে তা'কে খাওয়াব—কি বল?

হঠাৎ আমার মনে হইল—পিছনে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইল।—কালো গায়ের রঙ,…বড় বড় ডাগর দুটি চোখ—কোমর কাপড়ে জড়ানো…তাহার ভারে হঠাৎ বাতাস ভারী হইয়া উঠিল। মনে হইল কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যে ছেলেটি পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহাকে ঠিক এমনি জায়গায় স্মরণ করা ভাল হয় নাই; বুঝিতে পারিলাম না—যাহাকে একদিন অমন করিয়া ভালবাসিতাম সে আজ হঠাৎ এমন ভীতির বস্তু হইয়া উঠিল কেমন করিয়া! স্মরণের মণিকোঠায় আজো যে তাহার অক্ষয় আসন পাতা!

নিরুর কথার উত্তরে বলিলাম—সে কি আর আজ আছে নিরু, থাক্‌লে রোজ আসতো—না ডাকতেই আস্‌তো—এখন তা'কে আর নেমন্তন্ন কোরলেও আসছে না… ঝিনিদ'র শ্মশানে তা'র একটা হাড়ও খুঁজলে পাওয়া যাবে না।

বলিতে বলিতে সারা মন যেন কান্নায় ভিজিয়া গেল; এতদিনকার বন্ধু…তাহাকে তো একরকম ভুলিতেই বসিয়া-ছিলাম! সেই পেঁপুলবেড়ের বিলের মাঠে কলমি শাক তুলিতে যাওয়া…কলুদের ঘানিতে চড়িয়া ঘোরা; খেয়া পার হইয়া দু'জনে ভাজনঘাটা ইস্কুলে পড়িতে যাওয়া…গাব গাছে উঠিয়া গাব পাড়া…সব স্মৃতির সঙ্গেই গিরীশ যে আজও জড়িত আছে…সে যে গিয়াও যায় নাই!…তাহাকে আমি ভুলিতে বসিয়াছিলাম নাকি!

নিরু বলিল—কই—সে যে মারা গেছে…এ খবর তো কোনও দিন বলনি!

আমি বলিয়া যাইতে লাগিলাম—এই ঘাট পার হ'য়ে রোজ দু'জনে ইস্কুলে পড়তে যেতুম, বুঝেছ? একদিন কি হয়েছিল শোন, মর্ণিং ইস্কুল তখন—রাত থাকতে বাড়ী থেকে বেরুই; সেদিন গিরীশকে ডেকে নিয়ে এই ঘাটে এসে জলে দাঁড়িয়ে মুখ ধুচ্ছি; মাঝি তখনও আসেনি সেদিন—নৌকো ছিল ওপারে—সাঁতরে যাব কিনা তাই ভাবছি… গ্রীষ্মকাল জলে নেবে বেশ আরাম বোধ হল—আস্তে আস্তে দু'জনে জলে নাবলুম—হঠাৎ দূরে দেখলুম কি যেন একটা টুপ্ করে ডুবলো……

গিরীশ বললে—শিগ্গির উঠে আয় নিমাই—শিগ্গির…

হঠাৎ কী যে হ'য়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছিলুম। গিরীশ ওপরে গিয়ে উঠেছে। আমি জলের মধ্যে চলতে গিয়ে পড়ে গেলুম। সর্ব্বনাশ! গিরীশ তখন তাড়াতাড়ি নেবে আমাকে ধরে তুলতে তুলতে কুমীরটা এসে পড়েছে…এসে পড়ে যখন দেখলে শিকার তা'র পালিয়েছে…সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে

গিরীশকে কামড়াতে এল ; আমি ওপরে উঠে পড়েছিলুম··· গিরীশও উঠ্‌ছে··পেছনে শুধু একটা পা জলের ওপর ছিল···সেটা টেনে নিতে নিতে একটা আঙুল তখন কুমীরটা কামড়ে ধরেছে···তারপর অনেক টানাটানির পর আঙুলটা কেটে নিয়ে সে পালালো...আমার জন্যে সেদিন ও জীবনটাই দিতে যাচ্ছিল ··ভাগ্যক্রমে একটা আঙুলের ওপর দিয়েই সে ফাঁড়া কেটে গেল

নিরুর নিশ্বাস দ্রুততর হইয়া পড়িতেছে ; বলিল—তাইতেই বুঝি মারা গেল সে ?

—সে যাত্রা সে অনেক ভুগে বেঁচেছিল—কিন্তু মরেছিল তা'র বছর খানেক পরে·· সকলে মিলে গিয়ে তা'কে পুড়িয়ে এলুম। ঝিনিদ'র বাঁওড়ের পাশেই শ্মশান—সেই শ্মশানে তা'র চিতা জললো ; তারপরে আর কখনও দেশে আসিনি—এই তোমার সঙ্গেই যা' এলুম—নইলে কা'র জন্যেই বা আসা। গিরীশ মরে' যাবার পর এখেনে আসতে আর ভালো লাগতো না ; তা' ছাড়া বাবা মা সবাই চলে' গেলেন—ছুটিতে কোথাও যদি বেড়াতে যেতুম তা' হ'লে পশ্চিমের দিকেরই টিকিট কাটতুম।

ছোট বেলার কথা বলিতে বলিতে যেন বর্ত্তমান জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলাম

বলিলাম—একদিন গিরীশ কি বলেছিল জানো নিরু, বলেছিল—'তোকে ছেড়ে আমি কখনও একলা থাকবো না নিমাই দেখে নিস্‌। যখন যেখানেই থাকি, দু'জনে এক সঙ্গে থাকবো—কি বল ?' মানুষ কি ভাবে আর কি হয় বল দিকিনি ? সেই বা আজ কোথায়—আমিই বা কোথায়, তার চিতার ছাইএর ওপরে বারো বছরের বর্ষার জল পড়ে' সব ধুয়ে গেছে—একটা কণাও আর খুঁজলে পাওয়া যাবে না···

অনেক দিন পরে একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম—যে জায়গাটার উপর গিরীশকে পোড়ান হইয়াছিল ঠিক সেই জায়গাটিতে একটি কাণ্ড ঘটিল। শ্মশানের সেই চিতাটির উপর যেন একটি মস্ত বড় পদ্ম ফুল ফুটিয়াছে—লাল রঙের আভায় সারা শ্মশানখানি আলো করিয়া দিয়াছে···যেমন আমি নীচু হইয়া ফুলটি তুলিতে যাইব—আঙুল কয়টি বোঁটায় লাগিয়াছে কিনা সন্দেহ—অমনি কোথায় বা ফুল, কোথায় বা কী—তাহার বদলে একটি কাঁটা গাছ দেখিতে দেখিতে চোখের সমুখে গজাইয়া উঠিল। সেই স্বপ্নের কথা যখনি মনে পড়িয়াছে—তখনই মনে হইয়াছে পরলোক গিয়াও যেন গিরীশের আত্মার শান্তি নাই, আমি না যাইলে যেন তাহা আর কখনও শান্ত হইবেও না।

হয়ত অহেতুক—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ইহার সবটুকুই মিথ্যা ; কিন্তু কোনও দিন এ চিন্তা হইতে নিজেকে অব্যাহতি দিতে পারি নাই। আজ এই অন্ধকার অমাবস্যা রাত্রে ছাতিম গাছের তলায় ঘাটের ধারে বসিয়া তাহার কথা স্মরণ করিতেই আবার ওই চিন্তাই আমাকে পাইয়া বসিল।

বলিলাম—আচ্ছা নিরু, আজ যদি আমি গিরীশের কাছে চলে যাই অর্থাৎ—মানে গিরীশ আমায় কত ভালবাসতো সে তো জানো—তোমার চাইতেও অনেক বেশী ভালবাসতো—এখন সে যদি আমায় ডাকে—আমার কি করা উচিত ?

নিরু ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল—অথচ ওর বিস্ময়ের অন্ত নাই !

বুঝাইয়া বলিলাম—লক্ষ্মী নিরু, রেগোনা যেন, ধর সে এসে আমায় তা'র কাছে যেতে বললে···তখন কা'র ভালবাসার দাবীটা বড় হবে—তোমার না গিরীশের—তুমিই বল—

নিরু এবার অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া বসিল। চাহিয়া দেখি—নিরু সত্যই রাগ করিয়াছে ; অভিমানী শিশুর মত ঠোঁট দু'টি তা'র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে ; ফরসা দু'টি গালের উপর চোখ দু'টি যেন টলটল করিয়া উঠিতেছে।

নিরুর হাত দু'টি ধরিয়া বলিলাম—আমি কি সে কথা বলেছি নিরু যে তুমি অমন রাগ করলে—যাক্‌ গে, ওর কথা আর কখনও বলব না—আমাকে সে ভালবাসতো না ছাই ; কলাটা আনারসটা চুরি করে' এনে খেতে দিত তাই—নইলে —ও আলোচনা থাক্‌ গে—চল চল ওঠা যাক্‌—ডাইনীর গল্প বলতে বলতে কা'র কথা এসে পড়লো বল দিকিনি···?

নিরুকে হাত ধরিয়া তুলিলাম। নদীর ধার ধার দিয়া রাস্তা—এক মাইলই এই রকম। তারপর সে পথ দক্ষিণ মুখো বাঁকিয়া গ্রামের ভিতর ঢুকিয়াছে। নদীর ধারের রাস্তা দিয়া দু'জনে চলিতে লাগিলাম।

বলিলাম—সত্যি কথা বলছি নিরু, আজ যে আমার কি হ'য়েছে—সর্ব্বক্ষণ যেন তা'কে মনে পড়ছে—কি জানি কেন! আমাকে সেই যে গিরীশ বলে' গিয়েছিল—আমাকে ছেড়ে কখনও একলা থাকবে না,—সেই কথাটাই কেবল কেবল মনে পড়ছে আজ···কথাটা যদি সত্যি হয়—কি হবে তা' হ'লে?

নিরু কোনও কথা কহিল না।

আবার বলিতে লাগিলাম কি মনে হচ্চে জানো নিরু—মনে হচ্চে গিরীশ যেন আমাদের পেছন পেছন আসছে—এখন—এই রাত্তিরে···আমাদের সঙ্গ যেন ও আর ছাড়বে না। কখ্‌খনো না—

এবার নিরু হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া চারিদিকে চাহিয়া লইল।

বলিল—তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ বুঝি—নয়?

—ভয় দেখাবো কেন? এই দেখনা—কান পেতে শোন—আমাদের পেছনে তা'র পায়ের শব্দ হ'চ্ছে...আমকাটা ছুরিটা ওই দেখ তা'র ট্যাঁকে। পায়ের আঙুল একটা কাটা। নাকের তিলটা দেখছ?··আমাদের কি আর ও ছাড়বে?···একেবারে শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গে যাবে—ওযে তাই বলে' গিয়েছিল, বুঝছ না···?

সত্যই আমার মনে হইতেছিল—একটি লোক যেন অতি সন্তর্পণে পিছনে পিছনে আসিতেছে··কিন্তু পশ্চাৎ পানে ফিরিয়া চাহিলেই যেন সে অদৃশ্য হইয়া যায়! চিরকাল তবে কি গিরীশ সঙ্গেসঙ্গেই আছে নাকি! অথচ এতদিন কই তাহাকে ত' একবারও দেখিতে পাই নাই।

নিরুর হাত ধরিয়া বলিলাম—আমার হাত ধরে' পাশে পাশে চল—দেখ্‌ছ না চারদিকে কি রকম অন্ধকার। ধর—গিরীশ যদি এসে সামনে দাঁড়ায়-তখন?

নিরু বলিল—আর কথা বলতে পারছিনে—বাড়ী পৌঁছুতে পারলে বাঁচি। এতদিন তবু একটু একটু চাঁদ উঠতো—আজ একেবারে অন্ধকার···আমাবস্যে...

নদীর ধারে ধারে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মিয়াছে—তাহারই পাশ দিয়া রাস্তা; দু'এক জায়গায় ধানের জমির বেড়া হইতে কচার ডাল আসিয়া পথে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে....শেয়াকুলের চারাগুলির দু'একটা হাঁটুর উপর আসিয়া লাগে।

নিরুর দিকে চাহিয়া দেখি।

চাহিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারি—গল্প শুনিতে শুনিতে নিরু যেন বারো বছর পিছনে অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া গেছে। এই মুহূর্ত্তে যদি গিরীশ আসিয়া হঠাৎ নিরুকে বলে—'চিনতে পার বৌঠান?' নিরুর চিনিতে একতটুকু দেরী হইবে না। রহস্যময় জগৎ হইতে যে উজ্জ্বল আলোক ঠিকরাইয়া আসিবে··নিরুর চোখে তাহা এতটুকু ধাঁধাঁ লাগাইতে পারিবে না। যে অপরূপ শুদ্ধ শুভ্রতা উহার মনে বিরাজ করিতেছে...বেশ ভাল করিয়া বুঝিলাম..তাহা ওই গিরীশেরই জন্য। আকাশের সমস্ত গভীরতার ও যেন হঠাৎ অপূর্ব্ব আস্বাদ পাইয়াছে. আমি উহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিব না...আমার গল্প ওর মনের উপর এমনই বিস্মৃতি-মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে!...

প্রথমে আমিই কথা কহিলাম।

—এই দেখ—এই সেই বুড়ীর বাড়ী···

নিরু ফিরিয়া দেখিল:

—কোন বুড়ীর? সেই ডাইনীর?

বলিলাম—হাঁা।

একটা শাড়া গাছ—তাহারই তলায় একটা কুঁড়ে ঘরের অংশ··দু'পাশের দেয়ালের চিহ্ন নাই। বাঁশের খুঁটির উপর খড়ের চাল এককালে ছিল—তাহা অনুমানে বুঝিতে হয়···আর কিছু বোঝা যায় না।

নিরু চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; তাহার বোধ হয় মনে হইল—চারিদিকের এই সুনিবিড় আবহাওয়ার সঙ্গে এক আশী বছরের বৃদ্ধার কী এক ভয়াবহ সম্বন্ধ আছে। যাহা শুধু এমনি অন্ধকার রাত্রে আসিয়াই অনুভব করা যায়; রেলগাড়ীর জানালা দিয়া দেখিলে সে রহস্যের একতিল ধরা পড়ে না!

নিরু বলিল···আচ্ছা···এখানে মানুষ থাকে কি করে'? ···ঘরের যে কিছুই নেই···

বলিলাম...এখন কিছু কথা বলো না নিরু···এইখানটা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে' এস দিকি; পরে বলছি···

বাতাসে শাঁড়া গাছের এক ডাল দুলিয়া উঠিল। একটি ঘুঘরো পোকা কোথায় ডাকিতে ডাকিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। পাশের গাছে দু'টি পেঁচা একসঙ্গে বিকট সুরে চীৎকার করিয়া উঠিল—চ্যাঁ—চ্যাঁ—

দু'জনে অনেক দূর চলিয়া আসিলাম। কাহারো মুখে কথা নাই। এককালে কবে বারো বছর পূর্বে গিরীশ নামে একটি ছেলে কোন এক ডাইনীর বাড়ী হইতে ফল মূল চুরি করিত। কেমন করিয়া এক আশী বছরের বৃদ্ধা সারা গ্রামের লোকের মনে ভীতি সঞ্চার করিত সে সব কথা আজ নিরুর মনটি অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

আকাশে মেঘ করিয়াছে, কালো কালো মেঘ পশ্চিমের আকাশখানিকে ঢাকিয়া ফেলিল, বৃষ্টি আসিলেই বিপদ, এখনও বাড়ী পৌঁছিতে প্রায় এক মাইল পথ বাকী।

বলিলাম গিরীশের কথা—এই রাত্তিরেই ওরা বেরোয়—বুঝলে?

নিরু বুঝিতে পারিল না, বলিল—কা'রা?

—আবার কা'রা যা'দের বাড়ী দেখালুম তোমায়—তা'রাই—

নিরু আর একবার পিছন পানে চাহিল। বাহিরের আবহাওয়া, ভিতরের ভয় সব যেন একসঙ্গে মিলিয়া ওর পা জড়াইয়া ধরে।

নিরু বলিল—কই বললে না তো—ওরা ওই ভাঙা ঘরে থাকে কি করে'?

বলিলাম—সে কি আমাদের মত রক্তমাংস নিয়ে বেঁচে আছে যে ওখানে থাকতে তা'র কষ্ট হবে। তা'কে দেখতেই পাওয়া যায় না; নীলকুটীর ইঁট-চাপা পড়ে' একদিন সে মারা গেছ্‌লো—সে আমি নিজের চোখে দেখেছি কিন্তু মর'লে কি হবে—আজো অদৃশ্য ভাবে বেঁচে আছে সে—তা'ও জানি!

কালো কালো মেঘগুলি সারা আকাশখানি কখন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। গাছের ডালগুলি হাওয়ায় নড়িয়া উঠিল। ঝড় উঠিল চারিদিকে। পথের ধূলা উড়িয়া কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া গেল। রাত্রির নীড়ে পৃথিবীর জীব[illegible] [illegible] উঠিল। মনে হইল—যে অদৃশ্য সঙ্গী [illegible] চলিতেছে, এ যেন তাহারই কাণ্ড?

বলিলাম—এক কাজ করি চল নিরু। এ বৃষ্টিতে বাড়ী যাওয়া যাবে না—চল, এখানেই কোথাও থাকবার জায়গা খুঁজি।

নিরু আপত্তি করিল—না না, এখানে আমার থাকতে বড় ভয় করছে—ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চল যাওয়া যাক্।

বলিলাম ভয় কিসের দু'জনে আছি। আর গিরীশ কি আমাদের কোনও অনিষ্ট করতে পারে। আমায় সে কত ভালবাসতো সে তো জানোই—

কাছাকাছি থাকিবার মত জায়গা একটা ছিল। বহু-কালের অব্যবহার্য্য একটি নীলকুটী।

চারিদিকে বন জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। ভিতরে ঢোকাই মুস্কিল। নিরুকে লইয়া সেই দিকেই গেলাম। বৃষ্টির বিরাম নাই, এক একটি বড় বড় ফোঁটা তীরের মত গায়ে আসিয়া বিঁধে। আমার চাদরটা খুলিয়া নিরুর পিঠে ও মাথায় ভাল করিয়া জড়াইয়া দিলাম। বলিলাম—জল লেগে তোমার জ্বর না হ'লে বাঁচি—এই তো সেদিন অসুখ থেকে উঠেছ?

নীলকুটীটি পথের উপরেই। বনজঙ্গলে চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তা' হউক, ভিতরে আশ্রয় আছে জানিতাম; ছোটবেলায় ঠিক এমনি এক দুর্য্যোগে গিরীশ আর আমি এইখানে এই কুটীর ভিতর আশ্রয় লইয়াছিলাম, সে দিনও ঠিক এমনি রাত্রি—বৃষ্টির বেগ ইহা অপেক্ষা এক তিল কম নহে।

বলিলাম—দেখো। সাবধানে পা ফেলো—কাঁটা গাছ রয়েছে—ফোটে যদি বিপদের উপর আবার বিপদ হবে—

কোনও ক্রমে পথ করিয়া চলিতে লাগিলাম; সুবৃহৎ আঙিনা, বড় বড় চৌবাচ্ছা লতায় গুল্মে পরিপূর্ণ হইয়া বুজিয়া মাটি সমান হইয়া গিয়াছে। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে—অতি সন্তর্পণে নিরুকে লইয়া চলিলাম। সম্মুখেই বারান্দা এবং তারপরেই ঘর; কিন্তু বারান্দার উপর ইঁট পড়িয়া বৃহৎ স্তূপ হইয়া আছে, সামনের দিকের খানিকটা ছাদ ভাঙিয়া গিয়াছে;—তাহা হইতেই ইঁট ও সুরকি পড়িয়া জায়গাটিকে অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছে।

উপরে উঠিয়া হাত বাড়াইয়া নিরুকে টানিলাম, চারি-

দিকেই অন্ধকার টর্চ্চের ব্যাটারি ফুরাইয়া যাওয়াতে সেটি আনি নাই; কিছুই দেখা যায় না; পরিপার্শ্বে ইঁট কাট লতাগুল্ম সব মূক দৃষ্টিতে আমাদের কাণ্ড দেখিতেছে যেন।

বৃষ্টির তেজ হঠাৎ আরো বাড়িয়া গেল। আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িবে বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছে;...কোনও উপায় নাই আর: মনে হইল—বৃষ্টির বেগ আর কিছুক্ষণ এইরূপ থাকিলে এখানেই দু'জনে একত্রে সমাধিলাভ করিব।

কতদিন হইতে বাড়ীটি অব্যবহার্য্য অবস্থায় এখানে পড়িয়া আছে—কত বিষাক্ত জীবজন্তুর আবাস-স্থল ইহা কে বলিতে পারে!

নিরু প্রায় আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াই ছিল: আমার মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি হানিয়া বলিল—আমার বড় ভয় করছে যে।

নিরুর সেই অসহায় অবস্থা হতাশ-মূর্ত্তি দেখিয়া পুলক অনুভবের পরিবর্ত্তে বেশ একটু ভীতই হইলাম। কারণ, কি জানি কেন...আমারও যেন মনে হইতে লাগিল—এমন দুর্য্যোগে একজন নারীকে এখানে আনা উচিত হয় নাই। বিপদ হইতে কতক্ষণ!

নিরুর মাথা আমার বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিলাম ভয় কিসের নিরু?—এ বৃষ্টি এখুনি থেমে যাবে—আমি ত আছি—কিসের ভয়?

নিরু অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—সেই...?

আর বলিতে দিলাম না; যে কথা এতক্ষণ মনে পড়ে নাই—সেই কথাই হঠাৎ মনে করাইয়া দিল। সেই ডাইনীকে এখনও নিরু ভুলিতে পারে নাই—

এমন দুর্য্যোগ হইবে জানিলে কি আর নিরুকে ও গল্প বলিতাম?

পুরাণো লোহার দরজা কোন রকমে সরাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিলাম।

ভিতরে ঢুকিয়া চাহিয়া দেখি—লক্ষ লক্ষ ফণা মেলিয়া যেন অন্ধকার আমাদের গ্রাস করিল বলিয়া!

ঘরের উত্তর-কোণে দেওয়াল ও ছাদ ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে...দু'তিনটি নর-দেহ উহার ভিতর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে—এমনি ফাঁক; উপর্য্যুপরি বৃষ্টির ধারা তাহারই ভিতর দিয়া ঘরের মেঝেতে আসিয়া পড়িতেছিল।

ঘরটি সুবৃহৎ—এককোণে নিরুকে বসাইয়া নিজে তাহাকে আড়াল করিয়া বসিলাম।

দরজা দিয়া জলের ছাট্ আসিতেছিল—উঠিয়া গিয়া সেটি খিল দিয়া বন্ধ করিয়া দিই।

মনে পড়িয়া গেল—ঠিক এমনি রাতে এই জায়গাতেই আমি আর গিরীশ আসিয়া একদিন আশ্রয় লইয়াছিলাম: মনে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চমকিয়া উঠিলাম—

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—অদৃশ্য সঙ্গীর মত গিরীশ নিকটেই কোথাও আছে নাকি?

ডাকিলাম—নিরু।

চকিতে মনে হইল—উহার চোখে যেন মৃত্যুর স্পর্শ লাগিয়াছে: এইরূপ স্তব্ধ-মত্ততায় উহাকে কখনও এমন তন্ময় আর দেখি নাই। মনে হইল—পুরুষ-প্রকৃতি উহাকে আমার বাহু-বন্ধন হইতে ছিনাইয়া লইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে যেন।

আবার ডাকিলাম—নিরু?

এবার উত্তর আসিল—উঁ—

বলিলাম—ভয় করছে নাকি নিরু?

সে কথার উত্তর না দিয়া নিরু বলিল—এইটেই বুঝি নীলকুটী?

বলিলাম—হ্যাঁ—কিন্তু কেন বল দিকিনি?...ও কথা বলছ কেন?—

নিরু বলিল—না কিছু নয়—এইখানেই ত সেই—যে ইঁট চাপা পড়ে' মরে' গিয়েছিল—না?

সর্ব্বনাশ, নিরুর সেই ডাইনী-ভীতি এখনও যায় নাই। বাহিরের প্রবল প্রলয়—ভিতরের ভীতি—সব একসঙ্গে আমাকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। দ্বিতীয় বারের জন্য মনে পড়িল—নিরুর মত অসুস্থা এক নারীকে আনা উচিত হয় নাই—অমঙ্গল আশঙ্কায় চিত্তের তলদেশ পর্য্যন্ত দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে থাকে।

প্রচুর হাওয়ায় ভগ্নপ্রায় দেওয়ালের ইঁটগুলি যেন নড়িতেছে।—আশে পাশে পায়ের উপর সুরকী. বালি খসি

পড়ে ; এই ধ্বংস-পুরীতে বসিয়া দুইজন অসহায় নরনারী মৃত্যুর প্রলোভনকে এড়াইয়া একের পর এক মুহূর্ত্ত গুণিতেছি।

বলিলাম—ওসব কথা এখন বলব না নিরু—মিছি মিছি কেন···

নিরু কিন্তু আপত্তি শোনে না। বলিল—না না বল না—তুমি তা'কে নিজে মরতে দেখেছ ?···সত্যি মরেছিল··· না বেঁচেছিল ?

বলিলাম—ও সব কথা থাক্ এখন—বাড়ীতে গিয়ে শুনবে খন ; এখন শুনলে তোমার ভয় পাবে—

তবু নিরু শুনিবেই ; বলিল—না বললে কিন্তু আমার ভয় আরো বেড়ে যাবে—বল—

অগত্যা বলিতে হইল ; অতীতের স্মৃতি-কোটায় যে-কথা এতদিন ধূলি-মলিন হইয়া পড়িয়াছিল—এই জায়গায়—এই রাত্রে—এই দুর্য্যোগের মধ্যে তাহা যেন আবার বেশ স্পষ্ট মনে পড়িয়া গেল।—এত স্পষ্ট যেন মাত্র কালই সে ঘটনা ঘটিয়াছে ; হুবহু সব আজ মনে পড়িতেছে।

সেদিন স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলাম।

সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছিল ;···রাত্রির অন্ধকারে পথ ঘাট ঢাকিয়া গিয়াছে ;

আজিকার মত সেদিনও হঠাৎ পথে বৃষ্টি আসিল ; পথের মধ্যে প্রচুর হাওয়ায় আর ধূলায় নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে ; সঙ্গে ছিল গিরীশ।

কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গিরীশ ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে ; পিছনে ফিরিয়া আমাকে বলিল—আয় নিমাই—পেছন পেছন আয়—বলিয়া সোজাসুজি আমার দিকে না-চাহিয়া অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

গিরীশের কথায় কোনও দিনই আপত্তি করি নাই :·· সেদিনও করিলাম না—পিছন পিছনেই ছুটিলাম।

তার পর বন-জঙ্গল ঠেলিয়া এই নীলকুটীর ভিতর আসিয়া ঠিক আজিকার মতই দরজায় খিল লাগাইয়া দিলাম। অপরিণত বয়স, অপরিণত মন—ভয়ে গলা শুকাইয়া আসিতেছিল।

বলিলাম—গিরীশ, আমায় বড় ভয় করছে রে—

গিরীশ বলিয়াছিল—দূর ভীতু—দরজা বন্ধ রয়েছে—ভয় কিসের ?

কিন্তু সেদিন আমার সে-ভয় ছিলনা ; ভয় ছিল, যদি ছাদ ভাঙিয়া মাথায় পড়ে ; কেহ জানিতে পারিবেনা—কেহ শুনিতে পাইবেনা—জঙ্গলের মধ্যেই চির-সমাধি লাভ করিয়া সেইখানেই পড়িয়া পড়িয়া পচিব যে।

ক্রমে রাত্রি অনেক হইল ; বৃষ্টির হাওয়ার দাপটে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলাম।

জামা কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল—সেগুলি ছাড়িয়া ফেলিয়া—অন্ধকারের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম ; কাহারো কথা কহিবার সাহসটুকু জোগাইল না।

ঘরের ভিতর জীবজন্তুর অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনিয়া দু'জনেই চমকাইয়া উঠি ; চামচিকার পাখার শব্দে মনে হয় মৃত্যু যেন ডানা মেলিয়া শিকার খুঁজিতে সুরু করিল।

গিরীশ বলিল—এক কাজ কর দেখি নিমাই, বইগুলো মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ি আয় ;—এ বৃষ্টি আজ আর থামছে না—কাল ভোর বেলা একেবারে ঘুমিয়ে উঠে বাড়ী যাওয়া যাবে—কি বল্ ?

ওর কথামত শুইয়া পড়িলাম ;– গিরীশ বলিল—একটা গান গা' তো নিমাই—সেই গানটা—'আমার সকলি হরেছ হরি'—

আস্তে আস্তে গানটা গাহিলাম। কিন্তু ভীষণ ভয় করিতেছিল ; গিরীশের গা ঘেঁসিয়া শুইলাম ;—কিন্তু ঘুম কি আসে ? একসঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত ভয় জড়ো হইয়া যেন অসহায় চোখের সম্মুখে মূর্ত্তি ধরিয়া ভাসিয়া ওঠে ; অন্ধকারের মধ্যে কাহাদের ঘূর্ণায়মান রক্তচক্ষু দেখিতে পাই ; বাহিরে মেঘের কড় কড় শব্দে মনে হয়—মাথার উপরেই বাজ পড়িল বুঝি বা !

বাহিরের তুমুল তাণ্ডব-লীলা—ভিতরে কেবল দু'টি শিশু ! কেবলই মনে হইতেছিল যে সূর্য্যকে এ রাত্রি ঢাকিয়া রাখিয়াছে—সে যদি আর না উঠে !

দু'জনে শুইয়াছিলাম।

হঠাৎ দরজায় কে যেন আঘাত করিল।

বার বার তুইবার আঘাত করিবার পর তু'জনেই সচকিত হইয়া উঠিলাম।

নিরু বলিল—কই তারপর থাম্‌লে কেন—বল?

বলিলাম—হঠাৎ দরজায় কে ঘা দিতেই তু'জনেই ভয় পেয়ে গেলুম: অনেকখন চুপ করে' থেকে দেখলুম কিন্তু আঘাত যেন আরও দ্বিগুণ জোরে হ'তে লাগলো—দরজা ঠেলবার সেকি বিপুল চেষ্টা!...আমি বললুম—কেউ হয়ত বিষ্টিতে জায়গা না পেয়ে আমাদের মত এখানে দাঁড়াতে এসেছে—খুলে দিই—

গিরীশ বললে—না কাজ নেই—

আমি আবার বল্লাম—দিই না খুলে—

গিরীশ আমার হাতটা চেপে ধরে' বললে—না দিতে হবেনা খুলে—

কিন্তু তখনও তেমনি জোরে দরজা ঠেলা চলছিল; গিরীশ আমাকে খুলতে দিলেনা।

খানিক পরে একটা ভয়ানক শব্দে তু'জনেই চম্‌কে উঠলুম; বাড়ীটার শিরা উপশিরা যেন থর থর করে কেঁপে উঠলো;—সে কাঁপন বাড়ীটার শেকড় অবধি পৌঁছে চারিদিক নাড়া দিয়ে গেল—ভূমিকম্পের মৃদু শিহরণের মত—তা' আমাদের তু'জনের মনের ভয় বাড়িয়ে দিলে: বোঝা গেল—বাড়ীটার কোনও এক অংশ ধসে' পড়ে গেছে—

গিরীশ বললে—আয় নিমাই, আমার সঙ্গে আয়—

তারপর তু'জনে ওই যে দেয়ালের কোণে ফাটা রয়েছে—ওর ফাঁক দিয়ে পালিয়ে গেলুম—পালিয়ে একেবারে বাড়ী গিয়ে তবে নিশ্বাস ছেড়েছি—একবার পেছন দিকে'ও ফিরে তাকাই নি।

নিরু বলিল—তারপরে?

বলিলাম—তারপর দিন সকাল বেলা এসে দেখি ইঁট চাপা পড়ে' সেই বুড়ীটা মরে' আছে।

নিরু বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বলিল—সেই ডাইনী বুড়ী?

—হাঁ—অতরাত্রে ওখানে কি করতে এসেছিল কে জানে—এসে কখন দরজা ঠেল্‌ছিল ঠিক সেই সময়ে ছাদটা ভেঙে পড়ে—সেই ইঁট চাপা পড়েই মারা গেল; কিন্তু মরলে কি হয়—ওরা মরে কখনও—অজয় অমর ওরা—মরে' যাবার পরও গাঁয়ের লোক কতদিন দেখেছে বুড়ী এপার থেকে যাচ্ছে ওপারে—ওরা কি মরে?

নিরু চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম—কিন্তু তা'র ফল ভোগ করলে গিরীশ—ও যেমন দোর খুলে দিতে চাইনি—ডাইনির দৃষ্টি পড়ল ওর ওপর—সেই ঘটনার তে-রাত্রের মধ্যেই গাব গাছ থেকে পড়ে' গিয়ে মারা গেল; ঝিনিদ'র শ্মশানে সকলে মিলে তা'কে নিয়ে যাওয়া হোল—সেই থেকে' এ-বাড়ীতে আর কেউ আসে না।

অনেকখন তু'জনেই চুপ করিয়া রহিলাম।

নিরু হঠাৎ বলিল—চল চলে' যাই এখেন থেকে—

বলিলাম—বৃষ্টি যে এখনও পড়ছে খুব—?

নিরু বলিল—তা' পড়ুক।

বলিলাম—বাড়ী পৌঁছুতে এখনও এক মাইল পথ যে বাকি, বিষ্টিতে ভিজ্‌লে আবার যদি অসুখ করে তোমার!

—তবে বিষ্টি একটু কমলেই যাওয়া যাবে কিন্তু এখেন আর এক মুহূর্ত্ত থাকা নিরাপদ নয়—

কেন নিরাপদ নয়—তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু বাহিরে বৃষ্টির অজস্র বর্ষণ তখন সমান তালে চলিতেছে: রাত্রিও গভীর; বৃষ্টি মাথায় এক মাইল রাস্তা কাদা ঠেলিয়া যাওয়া কষ্টসাধ্য বৈ কি!—বৃষ্টি থামিলে বরং কথা ছিল।

এক একটি মুহূর্ত্ত কাটে—যেন মনে হয় এক একটি যুগ গেল: ষাট সেকেণ্ডেই যে এক মিনিট তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না এখন। গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া—কাহার পায়ের থম্ থম্ শব্দ কানে আসে;—

কতক্ষণ বসিয়া ছিলাম;

হঠাৎ দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল!

নিরু উঠিয়া বসিল; আমিও চমকিয়া উঠিলাম। বারো বছর পূর্ব্বে একদিন যে অবস্থায় যে রকম ধাক্কা আসিয়াছি ...আজিও তেমনি! শঙ্কায় মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তুই বারের জন্ম মনে পড়িল—নিরুর মত এক অসুস্থা নারীকে এখানে আনিয়া ভাল কাজ করি নাই!

নিরু বলিল—দাও, দরজা খুলে দাও, শিগ্‌গির—

বলিলাম—না, খবরদার না—

নিরু বলিল—না, দাও খুলে—তুমি না খুলে দাও—আমি দিচ্ছি—

নিরুকে ধরিয়া বাধা দিলাম।

বলিলাম—তা'র চেয়ে চল—ওখান দিয়ে পালিয়ে যাই—ওই ফাটল্ দিয়ে—

নিরু বলিল—না-না—খুলে দাও; জাননা সেই গিরীশ খুলে দেয়নি বলে'—

সবই মনে আছে—তবু খুলিতে ইচ্ছা হইল না! কত বদমায়েস লোক হইলেও ত হইতে পারে—কাজ কি! এই অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া কেহ যদি আসিয়া অত্যাচার করে—নিজের প্রাণপণ শক্তিতেও তাহাদের এতটুকু বাধা দিতে পারিব না—; আমারই চোখের সমুখে যে অন্যায়-অমানুষিকতা ও হীন কলঙ্কের সূত্রপাত এবং পুষ্টি চলিবে তাহা আমার নিজের চোখ দিয়াই দেখিতে হইবে হয়ত?

বলিলাম—এস নিরু, এদিকে—আস্তে আস্তে—

বলিয়া নিরুকে লইয়া সেই ফাটকুটা দিয়া অতি সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেলাম। বৃষ্টি তখনও সমান তালে চলিতেছে -বিরতি নাই—বিচ্ছেদ নাই—একভাবে।

শেষ রাত্রে বিছানায় শুইয়া সারা গায়ে যেন কেমন বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম।

গরম নিশ্বাসে সারা ঘর গরম হইয়া উঠিয়াছিল।

নিরু হঠাৎ পাশ ফিরিয়া শুইল; আমার দেহের স্পর্শ লাগিতেই বলিল—একি—তোমার গা যে গরম,—দেখি, জ্বর হোল নাকি?

জ্বরই হইয়াছিল বটে!

নিরু বলিল—এখন উপায়?...না—কালই যেতে হবে সেখানে—তখনই বললুম—

বলিলাম—কোথায় যাবে আবার?

নিরু বলিল—সেই নীলকুটীতে—কালই শুধু যাব—আর কোনও দিন না—

এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম; তেমনি করিয়া ডাইনীর মত আর কেহ সেখানে ইঁট চাপা পড়িয়া আছে কিনা তাহাই দেখিতে যাইবে!

নিরু বলিল—তখন ত শুনলে না—বললাম—খুলে দাও দরজা—এখন কি হয় কে জানে—

হাসি হাসিল এবার।

হাসি আসিল,—কাল অমাবস্যা রাত্রের অন্ধকার আবহাওয়ার মাঝে মনের যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহাই স্মরণ করিয়া!

বেশ জানি ডাইনীর গল্পটি মিথ্যা! শুধু নিরুকে গল্প শোনাইবার জন্য একটা মিথ্যা গল্প বাস্তবের সঙ্গে মিশাইয়া সুন্দরভাবে মুখে মুখে রচনা করিয়াছিলাম; রাত্রির অন্ধকারে—উপযুক্ত আবহাওয়ায় গল্পটি ঠিক খাপ্ খাইয়াছিল—জানিতাম না সেই মিথ্যাই আজ একটা বাস্তব বেদনা সৃষ্টি করিয়া নিরুকে আঘাত দিবে।

কাল নীলকুটীতে যে কাণ্ডটি ঘটিয়াছিল সব মনে পড়িল আবার।

হয়ত সেখানে কেহই দরজায় ধাক্কা দেয় নাই;...হাওয়ার দাপটে সেটি সামান্য একটু নড়িয়া উঠিয়াছিল মাত্র—কিন্তু তাহা ধারণা এবং বিশ্বাস করিবার মত স্পর্দ্ধা তখন না হইবারই কথা।

ভাবিলাম—কাল সারা রাত্রি জলে ভিজিয়া আজ জ্বরই যদি হইয়া থাকে—এবং সে জ্বরে যদি ভবিষ্যতে কিছু বিপদের কারণই ঘটে তবে ডাইনীর গল্পটা বিশ্বাস করিতে হয়ত নিরুর বাধিবে না।

না বাধুক। আমি জানি অদৃশ্য জগৎ হইতে এ গিরীশের আকর্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়! মনে হইল—এ ভালই হইয়াছে—ভালবাসার তুলাদণ্ডে একটা নির্ভুল পরিমাপের প্রমাণ হইয়া যাক্!

কিন্তু নিরু তাহা বিশ্বাস করিবে কি?

শ্রীবিমল মিত্র

—০—

ককচূপম সুত্তং

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস্

(মঝ্ঝিম নিকায় হইতে)

পালি ভাষায় মঝ্ঝিম নিকায় নামে এক অমূল্য উপদেশ-গ্রন্থ আছে। গ্রন্থখানি বিশেষজ্ঞদিগের নিকট সুপরিচিত। পশ্চিমদেশীয় ভিক্ষু শিলাচার্য্য ইহার সুন্দর ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু মূলগ্রন্থ বা ভাষান্তর সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের নজরে পড়িবার সম্ভাবনা অতি অল্প। অথচ বুদ্ধদেবের এই উপদেশমালার লিখনভঙ্গী এত চমৎকার, এত সুন্দর উপমা ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে, যে ইহা পাঠ করিলে সাহিত্যানোদী মাত্রেই মোহিত হইবেন। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন সমস্তই চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি। বটবৃক্ষতলে পদ্মাসনে সমাসীন ভগবান্ তথাগত, ঋজু দেহ ভঙ্গ, ঈষদানত বদন, উদ্ধৃত দক্ষিণ করপল্লব, ধীরে ধীরে করুণা-কোমল স্বরে মৈত্রী প্রচার করিতেছেন, আর চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট পীতবসন পরিহিত ভক্ত ভিক্ষুমণ্ডলী নির্নিমেষনয়নে প্রভুর প্রসন্ন মুখকমল নিরীক্ষণ করিতেছেন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স।

এইরূপ শুনিয়াছি যে এক সময় যখন ভগবান্ বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরীতে জেতবনে অনাথ পিণ্ডিকের আবাসে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মহাত্মা মোলিয় ফগ্‌গুণ ভিক্ষুণীদিগের সংসর্গে বড় বেশী কাল কাটাইতেন। তাঁহাদিগের এরূপ নিকট সম্বন্ধ ছিল যে মহাত্মা মোলিয় ফগ্‌গুণের সম্মুখে কেহ ভিক্ষুণীদিগের নিন্দা করিলে তিনি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিতেন। সেইরূপ কেহ ভিক্ষুণীদিগের সকাশে মহাত্মার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ উষ্ণ হইয়া উঠিতেন।

একদিন এক ভিক্ষু ভগবৎসমীপে গিয়া প্রণাম করিল এবং কিঞ্চিৎদূরে উপবিষ্ট হইয়া নিবেদন করিল যে মহাত্মা মোলিয় ফগ্‌গুণকে যখন তখন সময়ে অসময়ে ভিক্ষুণীদিগের সহিত দেখা যায়, তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ দাঁড়াইয়াছে যে মহাত্মার নিকট ভিক্ষুণীদিগের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার উপায় নাই, বলিলে তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন; তথা ভিক্ষুণীদিগের নিকট তাঁহার বিন্দুমাত্র নিন্দাবাদ করিলে তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ সক্রোধে তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ অন্য এক ভিক্ষুকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "যাও ভিক্ষু, মোলিয় ফগ্‌গুণকে আমার নাম করিয়া বল, বন্ধু ফগ্‌গুণ, গুরুদেব তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন।" অনন্তর সেই ভিক্ষু মহাত্মা সকাশে গমনপূর্ব্বক ভগবানের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। মহাত্মাও ভগবৎ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যথারীতি অভিবাদন-পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তখন একান্তে উপবিষ্ট সেই মহাত্মাকে ভগবান্ এইরূপ বলিলেন, "সত্য কি ফগ্‌গুণ, যে তুমি ভিক্ষুণীদিগের সহিত অসময়ে কালাতিপাত কর, এত ঘনিষ্ঠভাবে তুমি তাহাদের সহিত আবদ্ধ যে তোমার সম্মুখে কেহ তাহাদের নিন্দাবাদ করিলে তুমি অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ কর, তথা কোন ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের নিকট তোমার নিন্দাবাদ করিলে তাহারাও ক্রোধে আত্মহারা হয়? তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ দাঁড়াইয়াছে?"

মহাত্মা মোলিয় ফগ্‌গুণ উত্তর দিলেন, "ভগবন্, ইহা সত্য।"

ভগবান্ পুনরায় বলিলেন, "ফগ্‌গুণ, ইহা কি সত্য যে তুমি সৎকুলজাত হইয়াও ভক্তিবশতঃ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক হইয়াছ?"

"ইহাও সত্য, ভগবন্।"

ভগবান্ কহিলেন, "তাহা হইলে বলত ফগ্‌গুণ, এ

কার্য্য কি তোমার উপযুক্ত হইতেছে যে সৎকুলজাত হইয়াও, ভক্তিবশতঃ গৃহত্যাগী পরিব্রাজক হইয়াও, আজ তুমি ভিক্ষুণী-দিগের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে কালযাপন করিতেছ? কিরূপে এমন হইল ফগ্‌গুণ, যে তোমার সম্মুখে কেহ এই ভিক্ষুণীদিগের নিন্দা করিলে কিংবা তাহাদিগকে কেহ, মুষ্টি-দ্বারা হউক বা লোষ্ট্রদ্বারা দণ্ডদ্বারা খড়্গদ্বারা হউক, প্রহার করিলেও তুমি সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ক্রুদ্ধ হও? ভিক্ষু ফগ্‌গুণ, তোমার কর্ত্তব্য নিজেকে এই শিক্ষা দান করা, আমার চিত্ত সদা অবিকম্পিত থাকিবে, আমার মুখ হইতে দুর্ব্বাক্য কদাপি নিঃসৃত হইবে না, দ্বেষহীন হইয়া আমি সদা হিতানুকম্পী করুণাচিত্ত থাকিব। ফগ্‌গুণ সর্ব্বদা তোমার এই মন্ত্র হইবে। শুধু ইহাই নহে, যদি কেহ তোমাকেও কুকথা বলে কিংবা, মুষ্টিদ্বারা হউক, লোষ্ট্রদ্বারা দণ্ডদ্বারা বা খড়্গদ্বারা হউক, তোমাকে প্রহার করে, তথাপি ফগ্‌গুণ তোমার মনে গৃহস্থজনসুলভ ক্রোধ আসিতে দিবে না। পূর্ব্ববৎ নিজেকে শিক্ষা দিবে, আমার মন শান্ত থাকিবে, মুখ নির্ব্বাক্‌ থাকিবে, হৃদয় দ্বেষহীন থাকিবে। আমার চিত্তে মৈত্রী ও করুণাকে স্থান দিব, ক্রোধ ও হিংসাকে কদাপি আসিতে দিব না।"

অনন্তর ভগবান্ সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এক সময় যখন ভিক্ষুদিগের মন বিপথগামী হয় নাই, আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি দিবসে একবার মাত্র পূর্ব্বাহ্ণে ভোজন করি এবং এইরূপ ভোজন করিয়া আমি নিত্য বলবান্ ও লঘুদেহী, নীরোগ ও স্বচ্ছন্দবিহারী রহিয়াছি। ভিক্ষুগণ, তোমরাও আমার মত একবার পূর্ব্বাহ্ণে আহার করিও, তদ্বারা তোমরাও সুস্থ, সবল, লঘুদেহী ও স্বেচ্ছাবিহারী থাকিবে।' কিন্তু ভিক্ষুগণ, আমার অনুশাসনের কোন প্রয়োজন হয় নাই। কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট ছিল।

মনে কর, চতুর্মহাপথে সমতল ভূমির উপর এক রথ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাতে সুজাত অশ্বচতুষ্টয় যোজিত, রশ্মি প্রভৃতি সজ্জিত, শুধু চালক নাই বলিয়া চলিতেছে না। [illegible] এক দক্ষ সারথি উপস্থিত হইল ও তৎক্ষণাৎ [illegible] হইয়া বামহস্তে রশ্মি ও দক্ষিণ হস্তে কশা গ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকের পথে যথাভিরুচি রথচালনা করিতে লাগিল। এই রথের মত সেই ভিক্ষুদিগেরও অনুশাসনের প্রয়োজন ছিল না, স্মরণই যথেষ্ট ছিল।

অতএব ভিক্ষুগণ, যাহা কিছু অকুশল তোমরা তাহার পরিহার কর, ও যাহা কুশল, যাহা ধর্ম্ম, তাহার অনুশীলন কর। এইরূপে তোমরা ধর্ম্ম বিনয়ে বৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

ভিক্ষুগণ, মনে কর যেন লোকালয় হইতে অদূরে এক শালবন আছে, শালবৃক্ষগুলির শাখাপ্রশাখা যত্নের অভাবে পরস্পরের সহিত বিজড়িত হইয়া যেন এক ভীষণ অরণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এমন সময়ে সেই বনে এক পুরুষ উপনীত হইলেন, যিনি ঐ বনের অর্থকামী, হিতকামী ও যোগ-ক্ষেমকামী। তিনি করিলেন কি? দেখিয়া দেখিয়া শুষ্ক ও কুটিল শালশাখা সমস্ত কাটিয়া ফেলিয়া দিলেন। শালকুঞ্জের অন্তঃস্থল সুবিশোধিত ও সুন্দর হইল। তারপর সেই পুরুষ সুজাত ও সবল শালশাখাগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে কালে সেই শালবন বৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যাহা অক্ষেম তাহা ত্যাগ কর, যাহা ক্ষেম তাহা গ্রহণ কর, তদ্বারা ধর্ম্ম বিনয়ে, বৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

শিষ্যগণ, পুরাকালে এই শ্রাবস্তী নগরীতে বিদেহিকা নাম্নী এক গৃহপত্নী ছিলেন। প্রতিবেশীরা সর্ব্বদাই তাহার স্তুতি করিত, বলিত, 'গৃহপত্নী বিদেহিকা, স্থিরা, ধীরা ও করুণ-হৃদয়া।' এই গৃহপত্নীর কালী নাম্নী এক দাসী ছিল। সে অনলসা ও কর্ম্মকুশলা ছিল। একদিন তাহার মনে এই ভাব আসিল 'প্রতিবেশীরা সর্ব্বদা আর্য্যা বিদেহিকা'র গুণ-কীর্ত্তন করেন, তিনি স্থিরা ধীরা করুণহৃদয়া এইরূপ বলেন। কিন্তু ইহা কি সত্য? সত্যই কি তিনি শান্তশীলা, না আপন কোপন স্বভাব লোকচক্ষুর অন্তরালে গুপ্ত রাখা অভ্যাস করিয়াছেন? অথবা আমি আপন কার্য্য এরূপ সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন করি যে তাঁহার অন্তরের কোপ প্রকাশ করিবার কারণ ঘটে না? ভাল, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক্।'

ভিক্ষুগণ, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরদিবস কালী

সূর্য্যোদয়ের পর পর্য্যন্ত শয্যাত্যাগ করিল না। বিদেহিকা ডাকিলেন, 'কালী, কালী, ওগো কালী।' কালী উত্তর দিল 'কি বলিতেছেন আর্য্যে ?' বিদেহিকা বলিলেন 'এখনও উঠিস্ নাই কেন ?' কালী বলিল, 'তাহাতে কি বিশেষ কিছু আসে যায় ?' গৃহপত্নী ক্রোধ ও বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, 'পাপী দাসী, আমার অনেক ক্ষতি, তোর কি ?' তখন কালী দাসী ভাবিল সত্য এই। 'আর্য্যা তাঁহার অন্তরের কোপ লুকাইতেছিলেন। আমি সুসঙ্গবিহিত ভাবে স্বকার্য্য করি বলিয়াই ক্রোধ প্রকাশের কারণ ঘটে না। তাঁহার স্বভাব শান্ত, একথা মনে করিবার কারণ নাই। ভাল, পুনরায় পরীক্ষা করিব।'

পরদিবস কালী দাসী আরও বিলম্ব পর্য্যন্ত শয্যায় পড়িয়া রহিল। পূর্ব্ববৎ স্বামিনী বিদেহিকা বলিলেন "কালী, কালী, ও কালী!"

"কি আজ্ঞা করিতেছেন, আর্য্যে ?"

'এতক্ষণ শুইয়া আছ কেন ?"

"তাহাতে কি বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে ?"

"পাপী দাসী, তোর কি ? আমার ক্ষতি অনেক হয়।"

এই বলিয়া গৃহপত্নী বিদেহিকা ক্রুদ্ধা হইয়া নানা দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিলেন। কালী দাসী ভাবিতে লাগিল, "হাঁ, ইহা অতি সত্য। এতদিন আর্য্যা তাঁহার অন্তরের কোপন স্বভাব গুপ্ত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার যথার্থ স্বভাব চিরদিনই এরূপ ছিল। আমি স্বকার্য্যে অবহেলা করি নাই বলিয়া, তাহা প্রকাশ পায় নাই। ভাল, আবার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

তৃতীয় দিবসে কালী দাসী অধিকতর বিলম্বে উঠিল। স্বামিনী ডাকিলেন, "কালী, কালী, ওরে কালী!"

"আর্য্যে কি বলিতেছেন ?"

"বলি তোর দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না ?"

"আর্য্যে, তাহাতে কি আসে যায় ?"

"পাপীয়সি, আসে যায় আমার। তুই বুঝিবি কি ?"

এই কথা বলিয়া গৃহপত্নী বিদেহিকা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া অর্গলসূচী গ্রহণপূর্ব্বক দাসীকে মস্তকে আঘাত করিলেন। অনন্তর কালীদাসী আহত মস্তকে, রক্তাক্ত কলেবরে প্রতিবেশিনীদের গৃহে ধাবিত হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "দেখুন, আর্য্যে আপনাদের করুণাময়ীর কার্য্য, দেখুন আপনাদের ধীরা শান্তা বিদেহিকার কর্ম্ম। রাখিবেন একটীমাত্র দাসী, আর তাহার প্রত্যূষে উঠিতে বিলম্ব হইলে অর্গলসূচী লইয়া তাহাকে প্রহার করিবেন, তাহার মস্তক চূর্ণ করিবেন।" ইহার ফল হইল, যে অল্পকাল মধ্যে বিদেহিকাকে সকলে নিন্দা করিতে লাগিল, বিদেহিকা নির্দ্দয়, বিদেহিকা কোপন স্বভাব, বিদেহিকা চণ্ডী।

হে শিষ্যগণ, এইরূপ একজন ভিক্ষুও স্থির ধীর শান্ত বলিয়া খ্যাত হইতে পারে, যতদিন না কেহ তাহার অবমাননা করে। কিন্তু কেহ সেই ভিক্ষুর নিন্দাবাদ করিলে, তখন বুঝিবে সে সত্যই স্থির ধীর শান্ত কিনা। যে ভিক্ষুর পিণ্ড, চীবর ও গৃহের অভাব নাই বলিয়া সে ধীর ও শান্ত থাকে, তাহাকে আমি যথার্থ সুবচ ও বিনয়ী বলি না। কেন বলি না জান, ভিক্ষুগণ? কারণ তাহার পিণ্ড, চীবর ও গৃহের অভাব হইলেই তাহার শান্তশীলতা ও বিনয়ের অবসান হয়। কিন্তু যে ভিক্ষু ধর্ম্মকে সত্য জানিয়া, ধর্ম্মকে মান্য করিয়া সুবচ ও বিনয়ী হয়, তাহাকেই আমি যথার্থ সুবচ বলিয়া থাকি। অতএব ভিক্ষুগণ, তোমরা ধর্ম্মকে ধ্রুব জানিয়া, ধর্ম্মকে মান্য করিয়া বিনয় ও নম্রতার অনুশীলন কর।

ভিক্ষুগণ, বচন প্রথা এই পঞ্চবিধ হইয়া থাকে। একজন অন্যের সম্বন্ধে কথা কহিলে, তাহা সময়োচিত কিংবা অসময়োচিত, সত্য বা অসত্য, বিনীত বা পরুষ, সার্থক বা নিরর্থক, সানুকম্প বা দ্বেষান্বিত হইতে পারে। তত্রাপি, ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ধ্যান করিবে 'আমার চিত্ত সদা নির্ম্মল থাকিবে, মুখ হইতে দুর্ব্বাক্য কদাপি নিঃসৃত হইবে না। হৃদয় সর্ব্বদা হিতানুকম্পায় পূর্ণ থাকিবে। তাহাতে দ্বেষ প্রবিষ্ট হইতে দিব না। যে ব্যক্তি নিন্দাবাদ করিবে, তাহাকে মৈত্রী দ্বারা অভিভূত করিব, আর সেই মৈত্রী তাহার হৃদয় হইতে প্রসৃত হইয়া এই বিপুল বিশাল অনন্ত ভুবনকে পূর্ণ করিবে। দ্বেষ ও হিংসার স্থান থাকিবে না।'

মনে কর ভিক্ষুগণ, এক মনুষ্য কোদালি ও পিটক লইয়া আসিয়াছে। আর বলিতেছে, 'এই পৃথিবী আমি মৃত্তিকাশূন্য

করিব।' এই বলিয়া সে সর্ব্বত্র যেখানে সেখানে গহ্বর খনন করিতেছে, ও মৃত্তিকা উঠাইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছে, মুখে বলিতেছে, 'ধরা মৃত্তিকাশূন্য হউক।' তোমরা কি মনে কর ভিক্ষুগণ? এই পুরুষ কি ধরাকে মৃত্তিকাশূন্য করিতে পারিবে?"

"কখনই পারিবে না।"

"অসম্ভব, কারণ এই পৃথিবীর মৃত্তিকাস্তর এত গভীর যে এই পুরুষ যতই কেন না পরিশ্রম করুক সমস্ত মৃত্তিকা খনিয়া বাহির করিতে কিছুতেই পারিবে না। তোমাদের হৃদয়ের মৈত্রী এই ধরার মৃত্তিকার মত অন্তহীন হউক। হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া এই বিপুল বিশাল অনন্ত ভুবনকে পরিব্যাপ্ত করুক।

"আবার মনে কর ভিক্ষুগণ, এক পুরুষ লাক্ষা, হরিদ্রা, নীল, ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি নানা উপকরণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর বলিতেছে আমি আকাশে বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিব। তোমরা কি বিশ্বাস কর যে সে আকাশে রূপলেখা ফুটাইতে পারিবে?"

"কখনই পারিবে না।"

"অসম্ভব। কারণ আকাশ অদৃশ্য ও অরূপ। সেই পুরুষ যতই কেন চেষ্টা করুক না, তাহার উপর রেখাপাত করিতে পারিবে না। তোমাদের হৃদয় এই আকাশের মত হউক। দ্বেষ ও হিংসা তাহার উপর যেন রেখাপাত না করিতে পারে। হৃদয় হইতে মৈত্রীর ধারা নিঃসৃত হইয়া এই বিপুল বিশাল অনন্ত ভুবনকে পরিব্যাপ্ত করুক।

আবার মনে কর, ভিক্ষুগণ, একব্যক্তি শুষ্ক তৃণের জ্বলন্ত মশাল হস্তে উপস্থিত হইয়াছে আর বলিতেছে 'আমি এই মশালের অগ্নিদ্বারা গঙ্গার সমস্ত সলিল উত্তপ্ত করিব।' তোমরা কি বিশ্বাস কর তাহা সম্ভব?"

"অসম্ভব, প্রভো, অসম্ভব।"

"নিশ্চয়ই অসম্ভব। কারণ গঙ্গা গভীর, তাহার নীর অপরিমেয়, মশালের অগ্নিদ্বারা তাহা কিরূপে সন্তপ্ত করিবে, যতই কেন সেই পুরুষ পরিশ্রম করুক না। তোমাদের চিত্তের মৈত্রী এই গঙ্গার ন্যায় অপরিমেয় হউক। তাহা তোমাদের চিত্ত হইতে প্রসৃত হইয়া এই বিপুল বিশাল অনন্ত ভুবন পরিব্যাপ্ত করুক।

আবার মনে কর, ভিক্ষুগণ, একখণ্ড কোমল মার্জ্জারচর্ম্ম আছে। চর্ম্মকার-হস্তে নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা শোধিত মর্দ্দিত পরিমর্দ্দিত হইয়া তাহা ক্ষৌম বস্ত্রের ন্যায় কোমল মসৃণ হইয়াছে। একপুরুষ এক কাষ্ঠখণ্ড লইয়া উপস্থিত হইল ও বলিতে লাগিল 'আমাকে এই কোমল বিড়াল চর্ম্ম দাও। আমি আমার হস্তস্থিত কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা পিটিয়া পিটিয়া উহাকে কঠিন ও দৃঢ় করিয়া দিব।' তোমরা কি মনে কর যে তাহা সম্ভব? কাষায়বস্ত্রবৎ কোমল মার্জ্জার চর্ম্মকে দণ্ডাঘাতে কি দৃঢ় করা যায়?"

"অসম্ভব, দেব, অসম্ভব।"

"নিশ্চয়ই অসম্ভব। কারণ সুপরিমর্দ্দিত মৃদুক মার্জ্জার চর্ম্মকে কিরূপে কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা পিটিয়া দৃঢ় ও কঠিন করিবে, যতই কেন না সেই পুরুষ চেষ্টা করুক।

অতএব, ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা পুনরায় স্মরণ কর। অন্যে তোমাদের সম্বন্ধে কিছু বলিলে সে বাক্য সময়োচিত বা অসময়োচিত হউক, সত্য বা অসত্য হউক, বিনীত বা পরুষ হউক, সার্থক বা নিরর্থক হউক, সানুকম্প বা দ্বেষান্বিত হউক, তোমরা শুধু এই বলিবে, 'আমার চিত্ত সদা নির্ম্মল থাকিবে, মুখ হইতে দুর্ব্বাক্য কদাপি নিঃসৃত হইবে না, হৃদয় সর্ব্বদা হিতানুকম্পায় পূর্ণ থাকিবে, তাহাতে হিংসা, দ্বেষ প্রবিষ্ট হইতে দিব না। যে পুরুষ নিন্দাবাদ করিবে তাহাকে মৈত্রীদ্বারা অভিভূত করিব, আর সেই মৈত্রী তাহার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া এই বিপুল বিশাল অনন্ত ভুবনকে পরিপূর্ণ করিবে। দ্বেষ ও হিংসার স্থান থাকিবে না।' এই অভ্যাস সর্ব্বদা করিবে।

এমন কি যদি তস্কর আসিয়া দ্বিদণ্ড করপত্রের দ্বারা তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তত্রাপি মনে ক্রোধ আসিতে দিবে না। যে ক্রুদ্ধ হইবে সে আমার অনুশাসন অমান্য করিল মনে করিব। তখনও মনে এইরূপ বলিবে 'আমার চিত্ত সদা নির্ম্মল থাকিবে, মুখ হইতে দুর্ব্বাক্য কদাপি নিঃসৃত হইবে না, হৃদয় সর্ব্বদা হিতানুকম্পায় পূর্ণ থাকিবে, তাহাতে দ্বেষ হিংসা প্রবিষ্ট

হইতে দিব না। যে পুরুষ নিন্দাবাদ করিবে তাহাকে মৈত্রীদ্বারা অভিভূত করিব, আর সেই মৈত্রী তাহার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া এই বিপুল বিশাল অনন্ত ভুবনকে পরিপূর্ণ করিবে। দ্বেষ ও হিংসার স্থান থাকিবে না।'

এই ককচুপম সূত্রের অনুশাসন সর্ব্বদা মনে রাখিবে। বারংবার স্মরণ করিবে। আমার এই উপদেশের মধ্যে এমন কিছু অতি স্থূল বা অতি সূক্ষ্ম কথা কি আছে যাহা তোমাদের অগ্রাহ্য ?"

"না প্রভো, এমন কিছুই নাই।"

"তবে তোমরা সর্ব্বদা এই সূত্রের অনুশাসন মনে রাখিও। ইহা তোমাদিগের চিরসুখের ও চিরমঙ্গলের হেতু হইবে।"

ভগবান্ বোধিসত্ত্ব এইরূপ কহিলে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী তাঁহার অভিনন্দন করিলেন।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

—o—

মুইতো যোগ্য নই

জসীম উদ্দীন

ফুল যদি হইতাম, বন্ধু!
পরতা গলায় মালা;
বাতাসে ছড়াইয়া বাস
জুড়াইতাম মনের জ্বালা।
পাখী যদি হইতাম, বন্ধু!
উইড়া পড়তাম গায়;
হাতে লয়ে কর্‌তা আদর
মনে যত চায়।
নিঠুর বিধি গড়ছে মোরে
কইরা কুলের বালা,
কোন্ পরাণে বইব বুকে
তোমার আদর-ডালা!
ভাঙ্গা না নৌকায়, বন্ধু!
(তুমি) দিলে সোনার গুরা,
ঘোলাট্ বিলের জলে তোমার
ডাকে সুরের কোড়া।
তুমি ত বেবুঝ হৈছ
করো বেবুঝেরই রীতি,—
অধম নারীর সঙ্গে
জুড়িলা পিরীতি।
আমি ত পাগল নহি
সইরা সইরা রই,—
অমন সোহাগের বন্ধু!
মুই তো যোগ্য নই।

—o—

সঙ্গীতের ছন্দ*

শ্রীমণিলাল সেন-শর্ম্মা

কবিতার ছন্দ হইতে গীতের ছন্দের প্রভেদ অনেক। কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটু মিল আছে। মাত্রার সংখ্যা ও ঝোঁকের বিভিন্নতায় তালের এবং অক্ষর সংখ্যার কম বেশীতে কবিতার ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। গীতের ছন্দের আরও প্রভেদ হয় 'লয়'এর বিভিন্নতায়। এই 'লয়'-এর সৌন্দর্য্যটুকু কবিতায় তেমন নাই। আজকাল আবৃত্তিতে সেই সৌন্দর্য্যটুকু ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। তবে একটানা গতিরও একটা সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু তাহা একঘেয়ে দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে। আবৃত্তিকালে এই একঘেয়েমি নষ্ট করিবার পক্ষে লয়ের নানাবিধ গতির প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী। গল্প আবৃত্তি করিতে এক প্রকার লয়ের দরকার; আবার রূপ-বর্ণনা, প্রাকৃতিক বিবরণ প্রভৃতি আবৃত্তিতে অন্য এক প্রকার লয়ের দরকার। একই প্রকার লয়ে আবৃত্তি করিলে তাহা সুমধুর হইবে না। একই কবিতা আবৃত্তি করিতে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লয়ের পরিবর্ত্তন অনেকটা ছায়া অভিনয়ের দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনের মত করিতে হয়। তাহা না হইলে সেই আবৃত্তিতে তেমন মাধুর্য্য থাকে না; কিছু পরেই এক ঘেয়ে হইয়া পড়ে।

দুইটি ভাবব্যঞ্জক ছন্দের তুলনা চলে না। তবে সাদৃশ্য কতক কতক পাওয়া যায়। মাত্রা সংখ্যা দিয়াই গীতের ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। কবিতার ছন্দে মাত্রা সংখ্যার সাহায্যে অবশ্য কয়েক প্রকার ছন্দ রচিত হইয়াছে কিন্তু গীতের ছন্দের ন্যায় কেবল মাত্রা সংখ্যাই কবিতার ছন্দের মুখ্য নয়। গীতের ছন্দের প্রধান জিনিষ 'লয়'। লয়ের অনুপাতে মাত্রার ওজন ঠিক হয়। সেই ওজন মত মাত্রার কম-বেশীতে এবং ঝোঁক পড়ার বিভিন্নতায় তালের প্রকার-ভেদ হয়। সমসংখ্যক মাত্রার তাল হইলেই যে একই তাল হইবে তাহা নহে। ঝোঁক ও পদ বিভাগের বিভিন্নতায় এবং লয়ের প্রকার-ভেদে সমসংখ্যক মাত্রার তাল নানা-প্রকারের হয়। নদীর ও পারের দৃশ্য সকালে এক প্রকার, মধ্যাহ্নে অন্যপ্রকার, বিকাল বেলায় আর এক প্রকার, রাত্রিতে আর এক বিশেষ প্রকার। সৌর জগতের দৃশ্যপটে এইরূপ নানাবিধ পরিবর্ত্তন হয়। অথচ রাত্রির ওপারের গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর-দালান ইত্যাদি সবই সেই বাড়ী, সেই ঘর-দালানই থাকে কিন্তু সেইগুলি প্রহরে প্রহরেই নানা প্রকার বর্ণ ধারণ করে। ঠিক সেইরূপই সঙ্গীতে লয়ের প্রভাব। লয়ের ঠা, দুন, চৌদুন, আড়ী-কুয়াড়ী ইত্যাদি রূপ ভেদে তালের উপরও সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করে এবং নানাবিধ রূপের সৃষ্টি করে।

একটা গান বা গৎ যদি এক লয়ে গাওয়া বা বাজান যায় তাহাতে সেই গানের বা গতের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ রসের আবির্ভাব করে না। নদীর গতি একটানা। কিন্তু তবুও একটানা বলা চলে না। সময় সময় তাহারও পরিবর্ত্তন হয়। জোয়ার-ভাটায়, বর্ষায়-শীতে, চাঁদনী রাতে, ঝড়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নব নব রূপ ধারণ করিয়া নদী বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া নূতন নূতন রসের সৃষ্টি করে।

চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন, সাত দিনে এক সপ্তাহ, ত্রিশ দিনে এক মাস, বার মাসে এক বৎসর এইগুলি হইল সৌর-জগতের তাল ও মাত্রা। এক বৎসরকে তালের এক আওয়ার্দ্দা ধরিলে, মাস হইবে তালের পদ বিভাগ ও দিন হইবে মাত্রা এবং 'সম' হইবে বৈশাখের প্রথম দিনে। সৌর জগতের নিয়মে তাল ও মাত্রার এইরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম পুরাপুরি থাকিলেও শীতের দিন আর বর্ষার দিন এক হয় না। সৃষ্টির লয়ের তারতম্যে এইরূপে নানাবিধ রূপের ও রসের আবির্ভাব হয়।

লয় বলিতে আমরা বুঝি গতি। নূতন ঘোড়া গাড়ীতে

* বিচিত্রায় ছন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধটি আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। বিঃ সঃ।

জুড়িলে সে ঠিক লয়টুকু যতদিন পায় না ততদিন আনাড়ীর মতো লাফালাফি করে। ঠিক কি করিয়া চলিলে যে পরিশ্রমও কম হইবে অথচ গাড়ীও উল্টাইবার ভয় থাকিবে না তাহা না বুঝিয়া উঠা পর্যন্ত নূতন ঘোড়া যন্ত্রণা দেয়। বড়বাবু সহিসকে ঘোড়ার কথা বলিলে উত্তর পান যে ঘোড়াটা এখনও লয়টুক্ ঠিক পায় নাই। এইরূপ লয়ই আমাদের গীত, বাদ্য, নৃত্য ও আবৃত্তিতে দরকার হয়।

চলিবার গতি নানাবিধ। আমি হাঁটি এক প্রকার লয়ে, মুট মাথায় মুটে চলে অন্য লয়ে। কিন্তু প্রত্যেকের পা-ই সমান কাল পর পর মাটি ছুঁইয়া থাকে। দৌড় প্রতিযোগিতার দৌড় দেওয়া আর পথে বৃষ্টিতে ভিজিবার ভয়ে চঞ্চল পদে পথ অতিক্রম করা এই দুইভাবে লয়ের পার্থক্য হইয়া পড়ে অনেক। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে প্রত্যেকের পা গুলিই পর পর সমান চলে। এই পদক্ষেপই মাত্রা। হাতী যে গতিতে চলে ঘোড়া সেই গতিতে চলে না, অথচ হাতীর বা ঘোড়ার পা গুলি ঠিক সমান কাল পর পর সম্মুখের দিকে চলে। এইখানে ঘোড়ার ও হাতীর পদক্ষেপই মাত্রা, আর চলিবার গতিটা লয়।

মাত্রা কাল সমান হয় না। লয়ের বিভিন্নতায় মাত্রার পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। বাটখারার মত আদর্শ পরিমাপ মাত্রায় কিছু নাই। লয়ের বিভিন্নতায় মাত্রার বিভিন্নতা হয়। মাত্রা সময়ের সমান সমান সূক্ষ্ম খণ্ড মাত্র। এই মাত্রা-সমষ্টি নানা ভাবে বিন্যাস করিয়া সঙ্গীতে এক এক তালের সৃষ্টি হইয়াছে। মাত্রাবিন্যাসকেই এক একটা নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহাই তাল।

সঙ্গীতের সঙ্গে বাঁয়া-তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি তালযন্ত্র দিয়া 'সঙ্গত' করা হয়। এই সব যন্ত্রের সুমধুর ধ্বনি দিয়া সঙ্গীতকে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করা হয়। তাহাতে গীত-বাদ্য-নৃত্যের রস বাড়িয়া যায়। সঙ্গত না হইলে সম্পূর্ণ রসের সৃষ্টি করা শক্ত হইয়া পড়ে। 'পরশুরাম'-এর লেখার সঙ্গে লেখার ভাব অনুযায়ী 'নারদ' ছবি আঁকিয়া যে নূতন রস আনিয়া দিয়াছেন ইহাকে আমরা সঙ্গত বলি। যদি চিত্রগুলি না থাকিত তবে ততটা রসবাঞ্জক হইত না। কেদার বাবুর লেখাগুলি এমন একজন সঙ্গতকারের হাতে পড়িলে তাঁহার লেখার রসের মাত্রা আরও যে অনেকাংশে বাড়িয়া যাইত তাহা নিঃসন্দেহ।

তাল যন্ত্রের ধ্বনিগুলি বুঝাইবার জন্য অনুরূপ শব্দ তৈয়ারী হইয়াছে তাহাকে 'বোল্' কহে। এই সব বোল্ বহু প্রাচীন কাল হইতেই সঙ্গীতজ্ঞগণ গুরুমুখে শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সত্যিকার সঙ্গতকারগণ অনুরূপ বোল্ তৈয়ারীও করিতেছেন। বাংলা দেশের সাহিত্যে সৈনিক বিভাগের বাদ্যযন্ত্র বিনির্গত ধ্বনির অনুরূপ শব্দ বোধ হয় প্রথম লিখিয়াছেন রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র। যেমন—

ধু ধু দম্ দম্ ঝমক ঝমক ঝম্
ঘন ঘন নৌবত বাজে
ঝাগড় ঝাগড় গড় গড় গড়
দগড় রগড় ঘন বাজে।

বা—

গোলা ধম্ ধম্ গোলী ঝম্ ঝম্
গম্ গম্ তোপ আবাজে
ঝন্ ঝন্ ঝননন ঠন্ ঠন্ ঠননন
বরিখত বরকান্দাজে।

সঙ্গীতের ন্যায় ললিতকলার সঙ্গত যন্ত্রের ধ্বনি সৈনিকের রক্ত-পাগল-করা ধ্বনির মত এত কর্কশ নয়, বেশ একটু মধুর। তাই সঙ্গতকারগণ তৈয়ারী করিয়াছেন—

ধাগে ধাগে নাগ্ ধাগে ধিনি নাগ্
তাকে তিনি নাক্ তাকে তিনি নাক্

বা—

ধা কেটে ধিন্ ধাগি নাগি ধিন্
তা কেটে ধিন্ ধাগি নাগি ধিন্

কবিতার ছন্দে যেমন যুক্ত অক্ষর বেশী ব্যবহৃত হইলে ছন্দের ভাব গম্ভীর হইয়া থাকে সঙ্গীতের ছন্দেও সেইরূপই হয়। গম্ভীর ভাব ব্যঞ্জক পৃথক পৃথক তাল আছে। তাহাতে পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর ধ্বনি দিয়া সঙ্গত করা হয়, তাহা না হইলে সঙ্গীতের লাবণ্য ফুটিয়া উঠে না। ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একই ছন্দকে সঙ্গতকারগণ সঙ্গত-যন্ত্রে সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের লঘুগুরু ভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে।

এবং বৈচিত্র্য আনিবার জন্য নানাবিধ মধুর ধ্বনির সৃষ্টি করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া থাকেন।

কবিতার ছন্দ দিয়া গীতের ছন্দ বুঝাইতে অনুরূপ কবিতার অভাবে পড়িতে হয়। তার উপর তালের প্রস্বন, ঝোঁক ও মোচড় ঠিক ঠিক ভাবে কবিতার ছন্দে প্রকাশ করা অনেক ক্ষেত্রেই পারা যায় না। তবুও কতক কতক মিল যে-সব ছন্দে ও কবিতায় আছে তাহা এই প্রবন্ধে দেখান হইবে। সঙ্গীত-অভিজ্ঞ কোন কবি যদি সঙ্গীতের ছন্দ অনুযায়ী কবিতা লিখেন তবে বাংলা ছন্দ আরও নূতন কিছু লাভ করিবে সন্দেহ নাই। এই কারণে সঙ্গীত আলোচকদের সুবিধার জন্য সঙ্গীতের ছন্দের বিশেষত্ব ও যথাসম্ভব অনুরূপ কবিতা দিতেছি।

তেতালা

তেতালার গতি একটু হ্রস্ব। ইহা অনেকটা আফিস ফেরত কেরাণীর চলিবার গতি। ইহা ষোল মাত্রার তাল, চারিভাগে বিভক্ত। তালবিভাগের প্রথম মাত্রায় ঝোঁক, সর্ব্বপ্রথম মাত্রায় সব চেয়ে বেশী ঝোঁক। তৃতীয় তালের প্রথম মাত্রায় ঝোঁক নাই বলিলেও চলে। প্রথম মাত্রায় 'সম' অর্থাৎ সব চেয়ে বড় ঝোঁক। আর নরম মাত্রায় ফাঁক। সমের চিহ্ন ×, ফাঁকের চিহ্ন O, আর ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক দিয়া তালি বুঝান হয়।

তালের ঠেকা—

× ২ ০ ৩
ধা ধি ধি না | না ধি ধি না | না তি তি না | না ধি ধি না |

অনুরূপ কবিতা—

× । ।।	২ । । ।	০ । । ।	৩ । ।।
তোমরায়	গান গায়	চরকায়	শোন ভাই
থেইদাও	পাঁজ দাও	আমরাও	গান গাই
ঘর বার	করবার	দরকার	নাই আর
মন দাও	চরকায়	আপনার	আপনার

—সত্যেন্দ্রনাথ—

এখানে প্রথম অক্ষর যদি গুরু অক্ষর 'ভ' না হইয়া কোন লঘু অক্ষর ও তৃতীয় বিভাগের প্রথম অক্ষর লঘু অক্ষর 'চ' না হইয়া গুরু অক্ষর থাকিত তবেই আর অনুরূপ ছন্দ হইত না। আবার যদি এইরূপ কবিতার মধ্যে খুব বেশী যুক্ত অক্ষর থাকে তবে তাহার ভাব গম্ভীর হইয়া যাইবে, সুতরাং গতির ও পরিবর্ত্তন হইবে। তখন তাহা আর তেতালা তাল থাকিবে না, তাহা হইয়া পড়িবে ঢিমা তেতালা।

ঢিমা তেতালা

তেতালা গজেন্দ্রগামী হইলে ঢিমা তেতালা হইয়া পড়ে। ঢিমা তেতালা ১৬ টি দীর্ঘ মাত্রা বা ৩২টি হ্রস্বমাত্রার তাল, পদ বিভাগ তেতালার মত। মন্দাক্রান্তা ও বাসবল্লী ছন্দের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে।

তালের ঠেকা—

× । । । ২ । । ।
ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধিন্ ধাগে তেরেকেটে ধিন্

০ । । । ৩ । । ।
না তিন্ তিন্ তা | ধিন্ ধাগে তেরেকেটে ধিন্ |

অনুরূপ কবিতা—

× ২ ০ ০
। ॥ । । ॥ । ॥ । । । । । । ॥ । ।। । ।
পিঙ্গল বিহ্বল | ব্যথিত নভতল | কই গো কই মেঘ

৩
॥ । । । ॥।
উদয় হও

সন্ধ্যা তন্দ্রার | মূরতি ধরি আজ | মন্দ্র মন্থর
বচন কও

—সত্যেন্দ্রনাথ—

আদ্ধা

তেতালা দ্রুত চালে চলিলে তাহা আদ্ধা তালে পরিণত হয়। এই তালের লম্ব মুট মাথায় মুটের পথ চলার গতি। ইহা আট মাত্রার বা ষোলটী হ্রস্ব মাত্রার তাল, চারি ভাগে বিভক্ত।

তালের ঠেকা—

× ২ ০ ৩
ধা ধিনতা | তা ধিনতা | না তিনতা | তা ধিনতা

অনুরূপ কবিতা—

×	২	০	৩
ঝর্ণা	ঝর্ণা	সুন্দরী	ঝর্ণা
তরলিত	চন্দ্রিকা	চন্দন	বর্ণা
অঞ্চল	সিঞ্চিত	গৌরিকে	স্বর্ণে
গিরিমল্	লিকা দোলে	কুন্তলে	কর্ণে

—সত্যেন্দ্রনাথ—

তেতালার দুই ফেরে ঢিমা তেতালার এক ফের হয়, আর আদ্ধার চারি ফেরে ঢিমা তেতালার এক ফের হয়। যেমন—

পিঙ্গল বিহ্বল | ব্যথিত নভতল | কই গো কই মেঘ উদয় হও

ভোমরায় গান গায় | চরকায় শোন ভাই |
ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা |

এই তিনটী তালের মধ্যে আদ্ধা অতি দ্রুত চলে বলিয়া তাহা চাল্কা তাল। কাজেই এই ছন্দের ভাবও হাল্কা। তেতালার ভাব মাঝারি। আর ঢিমা তেতালার 'লয়' বেশ গম্ভীর। মন্দাক্রান্তা ছন্দের ভাবে ও গম্ভীর মেঘের গুরু গুরু ধ্বনির প্রভাবে মেঘদূত রচিত হইয়াছিল। এই মন্দাক্রান্তা ছন্দের সঙ্গে পাখোয়াজের গুরু গম্ভীর ধ্বনির সঙ্গতে চলিতে হইবে। এই ছন্দে বিলম্বিত গতিতে যদি কেহ কোন কবিতাই পড়িয়া যান আর সে সঙ্গে পাখোয়াজের সঙ্গত করা হয় তাহা হইলেও যে ধ্বনির সৃষ্টি হইবে তাহা শুনিবার মত হইবে সন্দেহ নাই। এইরূপ লয়ের গানই ধ্রুপদ। অর্থাৎ ভাব, সুর ও ছন্দ এই তিনটিই যে গীতে গম্ভীর তাহাই ধ্রুপদ। তেতালা বা আদ্ধা ছন্দে পাখোয়াজের সঙ্গত চলে না, হাল্কা ধ্বনিবিশিষ্ট যন্ত্রের, যেমন বায়া তব্লার, সঙ্গতই ভাল হয়

ঠুংরী

ইহা আট মাত্রার তাল। একটু শ্লথগতি। চারি ভাগে বিভক্ত, কিন্তু দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ মাত্রায় ঝোঁক পড়ে।

\+ ২ ০ ৩
ধা ধা | গে দিন্ | তা ধা | গে ধিন।

অনুরূপ কবিতা—

×	২	০	৩
লে খা	প ড়া	ক রে	যে ই
গা ড়ী	ঘো ড়া	চ ড়ে	সে ই

—মদন মোহন তর্কালঙ্কার—

কার্ফা

আটটী হ্রস্ব মাত্রার তাল। দুই ভাগে বিভক্ত। মাত্রা খুব দ্রুত উচ্চারিত হইয়া থাকে। নৃত্যে এই তাল খুব ব্যবহৃত হয়। তেতালার এক ফেরে কার্ফার চারি ফের হয়।

তালের ঠেকা—

× ১
ধে নে না তে | নেতে নাক্

অনুরূপ কবিতা—

× ১
পালকী চলে | দুল-কী তালে

—সত্যেন্দ্রনাথ—

কাহার্‌বা

কাহার্‌বাও আটটী হ্রস্ব মাত্রার তাল। দুই ভাগে বিভক্ত। ইহারও কার্ফার মত গতি, প্রভেদ এই যে ইহার প্রতি মাত্রার উপর প্রস্বান পড়ে।

তালের ঠেকা—

× ১
ধি ধি কে টে | না ক ধে নে

অনুরূপ কবিতা—

×	১
তুল্ তুল্	টুক্ টুক্
টুক্ টুক্	তুল্ তুল্
তার তুল্	কার মুখ
তার তুল্	কোন ফুল

—সত্যেন্দ্রনাথ—

চৌতাল

চৌতাল বার মাত্রার তাল। ছয় ভাগে বিভক্ত। ইহার ছন্দ গাম্ভীর্য্য পূর্ণ। এই ছন্দে পাখোয়াজের সঙ্গত দরকার হয়।

তালের ঠেকা—

× ০ ২ ০
ধা ধা | দিন্ তা | কৎ তাগে | দিন্ তা |
৩ ৪
| তেটে কতা | গদি ঘেনে |

অনুরূপ কবিতা—

× ০ ২ ৩ ৪
রজনী | গন্ধা | প্রত্যেক | সন্ধ্যা | ফুটে কত | রাশি রাশি |

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—

একতালা

এই তাল বার মাত্রার তাল। তিন ভাগে বিভক্ত। ছয় ভাগেও বিভক্ত করা হয়। ইহাও গম্ভীরাত্মক ছন্দ।

তালের ঠেকা—

× ১ ৩
ধিন্ ধিন্ ধা ধা | তিন্ তা তা তিন্ | ধা ধা দিন্ তা |

অনুরূপ কবিতা—

×	১	২
উচ্ছলিত	সন্ধ্যা-সিন্ধু	তরঙ্গিত
বিক্ষোভিত	পৃথ্বী-প্রান্ত	প্রকম্পিত
সৃষ্টি-ক্ষুব্ধ	মৃত্যু-ক্ষুধা	হানে শঙ্কা
যুদ্ধোন্মত্ত	যক্ষ-দৈত্য	গর্জ্জে ডঙ্কা

—পান্নালাল সেন—

নিম্নলিখিত ভাবে এই তাল ছয় ভাগেও বিভক্ত করা হয়।

যেমন—

× ০ ২ ০ ৩ ০
ধিন্ ধিন্ | ধা ধা | তিন্ তা | তা তিন্ | ধা ধা | দিন্ তা |

অনুরূপ কবিতা—

হাসি	কান্না	হীরা	পান্না	দোলে	ভালে
কাঁপে	ছন্দ	ভ	মন্দ	তালে	তালে
নাচে	জন্ম	নাচে	মৃত্যু	পাছে	পাছে
তাতা	থৈ থৈ	তাতা	থৈ থৈ	তাতা	থৈ থৈ

—রবীন্দ্রনাথ—

একতালা আর এক ভাবেও বাংলা দেশে ব্যবহৃত হয়। তাহাতে তাল বিভাগ তিন মাত্রা করিয়া চারিভাগে বিভক্ত। সেই ছন্দ দীর্ঘ মাত্রার তাল। পঞ্চ চামর ছন্দের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। নিম্নের কবিতার দুইটি অক্ষরে একটি মাত্রা হইবে।

অনুরূপ কবিতা—

বাজাও পিনাক	বাজাও মাদল	আকাশ পাতাল	কাঁপাও হেলায়
মেঘের ধ্বজায়	সাজাও ভূলোক	সাজাও দ্যুলোক	ঢেউয়ের মেলায়

—সত্যেন্দ্রনাথ—

খেম্‌টা

ইহা বারটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। উপরোক্ত একতালের মত ছন্দ বিভাগ হয়। কিন্তু ইহা হাল্‌কা ছন্দ।

তালের ঠেকা—

× ৩ ০ ২
ধা কেটে ধিন্ | ধা তে নে | তা কেটে ধিন্ | ধা ধে নে

অনুরূপ কবিতা—

×	২	০	৩
আপন	বক্ষের	কাঁপন	দেখ্ লেই
যে জন	চম্‌কায়	মরণ	তার্ সেই

—সত্যেন্দ্রনাথ—

দাদ্‌রা

ছয়টি হ্রস্ব মাত্রার তাল। দুইভাগে বিভক্ত। পদের প্রথম মাত্রায় ঝোঁক। হাল্‌কা তাল।

তালের ঠেকা—

× ১
ধিন্ ধিন্ তা | ধা দিন্ তা

অনুরূপ কবিতা—

×	১
কতনা	যামিনী
তোমারে	সজনী
ভেবেছি	স্বপনে
জানিবে	কেমনে

ঝাঁপতাল

ঝাঁপতাল অনেকটা খরগোস চলার গতি। ইহা বক্র-গতিতে চলে। মাত্রা সমষ্টি দশ। মাত্রা বিভাগ ২।৩।২।৩। গম্ভীর, সরল দুইভাবেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

তালের ঠেকা—

× ২ • ৩
ধিন্ না | ধিন্ ধিন্ না | তেৎ তা | ধিন্ ধিন্ না |

অনুরূপ কবিতা

×	২	•	৩
সাপ	মানে না	বাঘ	মানে না
ভূত	গুলো তার	সবাই	চেনা

বা

×	২	•	৩
কালো	নদীর	দুই	কিনারে
কল্ল	তরুর	কুঞ্জ	কি রে

—সত্যেন্দ্রনাথ—

তেওরা

সাতটী হ্রস্ব মাত্রার তাল। ইহার বিভাগ ৩ | ২ | ২। গম্ভীর কিন্তু জলদ্ লয়ের তাল। তালের ঠেকা—

× ২ ৩
ধা দিন্ তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে |

অনুরূপ কবিতা—

×	২	৩
ঝরিছে	ঝর	ঝর
গরজে	গর	গর
স্বনিছে	সর	সর
শ্রাবণ	মা -	- -

উপরের উদাহরণ মাত্রা ও তাল বিভাগ অনুযায়ী ঠিক হইলেও ছন্দ ভাব অনুযায়ী হয় নাই। কারণ আরও একটু গাম্ভীর্য্য পূর্ণ হওয়া উচিত। ইহাতে পাখোয়াজের সঙ্গতের দরকার হয়। নিম্নে আর একটি কবিতা দিতেছি তাহা সঠিক ছন্দ হয়।

+	২	৩
ধ্বনিছে	দিগ্	বধূ
শঙ্খ	দিকে	দিকে
গগনে	কারা	যেন
চাহিয়া	অনি	মিখে
ধূ ধূ ধূ	হোম	শিখা
জ্বলিছে	দ্বার	তেরে
ললাটে	জয়	টিকা
প্রসূন	হার	গলে
চল্‌রে	বীর	বলে

—নজরুল ইস্‌লাম—

তেওরার অনুরূপ ছন্দ বিভাগে লয় আরও গম্ভীর হইলে 'রূপক' তাল হয়। তাহার অনুরূপ কবিতার অভাব। ইহাতেও পাখোয়াজের দরকার হয়।

ধামার

ইহা ধ্রুপদেরই তাল। ইহা গম্ভীর রসাত্মক ১৪মাত্রার তাল, নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত। তেওরার দুই ফেরে ধামারের এক ফের হয়।

তালের ঠেকা—

× • ২ • ৩ •
ক ধে টে | ধে টে | ধা — | গ দি নে | দি নে | তা —

অনুরূপ কবিতা

× • ২ • ৩ •
ব ল ত | ক ত | আ র | স হি ব | এ ই | ভা র |

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—

সুরফাক্তা

ইহা গাম্ভীর্য্য পূর্ণ ছন্দ। দশ মাত্রার তাল। ইহাতে ৪ | ২ | ৪ এইরূপ তাল বিভাগ হয়।

তালের ঠেকা—

× ০ ২ ৩ ০
ধা ঘেনে | নাগ্ দি | ঘেনে নাগ্ | গ দি | ঘেনে নাগ্ |

সুরফাক্তার ছন্দে গৌড়ী-গায়ত্রী ছন্দের এবং মালিনী ছন্দের ঝোঁকের সাদৃশ্য আছে।

যেমন—

+	০	২	৩	০
জয়	করি	ভয়	জগৎ	প্রিয়
বর	ণ্য -	হে -	ব ন্দ	নীয়

(গৌড়ী গায়ত্রী) —সত্যেন্দ্রনাথ—

×	২	৩
উড়ে চলে গেছে	বুল্ বুল্	শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর
ফুরায়ে এসেছে	ফাল্ গুন	যৌবনের জীর্ণ নির্ভর

(মালিনী) —সত্যেন্দ্রনাথ—

উপরের মালিনী ছন্দের সঙ্গে সুরফাক্তার বিলম্বিত লয়ের ও গৌড়ী-গায়ত্রীর সঙ্গে মধ্যলয়ের মিল পাওয়া যাইতেছে।

আড়া চৌতাল

আড়া চৌতাল চৌদ্দটী হ্রস্ব মাত্রার তাল। ইংরেজী Dactyl ছন্দের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত ভাবে ইহার তাল বিভাগ হয়।

তালের ঠেকা—

× ২ ০ ৩ ০
ধিন্ কেটে | ধিন্ না | দিন্ না | তেৎ তা | দিন্ দিন্ |

৪ ০
না ধিন্ | ধিন্ না |

অনুরূপ কবিতা—

× ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
ওই | সিংহল | দ্বীপ | সিন্দুর | টিপ | কাঞ্চনময় | দেশ |

—সত্যেন্দ্রনাথ—

বা

+ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
হাসে | সুন্দর | মুখ | খঞ্জন | চোখ | জাফ্ রাণ রং | অঙ্গ |

—করুণানিধান—

যৎ

যৎ চৌদ্দটী হ্রস্ব মাত্রার তাল। ৩।৪।৩।৪ মাত্রা বিন্যাসে ইহার তাল বিভাগ হয়।

তালের ঠেকা—

+ ২ ০ ৩
ধা ধিন্ ইন্ | ধা গে ধিন্ ইন্ | না তিন্ ইন্ | ধা গে ধিন্ ইন্ |

অনুরূপ কবিতা—

+ । ।	২ । । ।	০ । ।	৩ । । ।
বরষা	আসিয়াছে	গগনে	আয়োজন
মেঘেরা	খেলিতেছে	করিয়া	গরজন

এ প্রবন্ধে যে সব কবিতার অংশ দেওয়া হইল সেগুলি যে সব ছন্দ বুঝাইবার জন্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই সব ছন্দে যদি সেগুলিতে সুর সংযোজন করা হয় তবে সে গান মোটেই মধুর হইবে না। সুরের কাজ করিবার মত স্থান পাওয়া যাইবে না বলিয়া কবিতা আবৃত্তি হইবে মাত্র। এই সকল কবিতার অংশগুলি পড়িতেই সুন্দর শুনাইবে। কবিতার ছন্দের ঝোঁক অনুপাতে সুর সংযোজন করা কঠিন। কবিতার ভাব ও ছন্দের ভাব অনুযায়ী সুর ও তাল সংযোজিত হয়।

শ্রীমণিলাল সেন-শর্ম্মা

নিশির ডাক

শ্রীঅতুল ভট্টাচার্য্য

চারিদিকে সুবিস্তৃত মাঠ, ধূ ধূ করে। তাহারই উপর দিয়া শাখা রেলপথ বরাবর চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে ছোট খাট একটি ষ্টেশন।

মালগাড়ীর মত ঝকর ঝকর শব্দে কচিৎ দুই একখানা ট্রেণ আসে। যাহারা অপেক্ষায় থাকে, অতি ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া পড়ে; যাহারা নামে, নিঃশব্দে টিকিট দেখাইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে বিদায় লয়।

একদা এই জন-বিরল ষ্টেশনে সহযাত্রীদের তো কথাই নাই, ষ্টেশন মাষ্টার পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া দেখিল, সন্ধ্যা হইতে যদিও বিলম্ব নাই, একটি নিতান্ত অপরিচিত ভদ্রবেশধারী যুবক এই মাঠের ষ্টেশনে নামিয়া পড়িল।

ব্যাপারটি বিস্ময়কর, কারণ, আশে পাশে ভদ্রপল্লী একেবারে নাই বলিলেও চলে, দূরে দুই একটিও যাহা আছে, তাহা এই ষ্টেশনে নামিয়া কেহ যায়না; সামনের ষ্টেশনে কিংবা তারও আগের ষ্টেশনেই সকলে ওঠা নামা করে।

যাক গে, লোকের খেয়ালের অন্ত নাই।···

সুতরাং ষ্টেশন-মাষ্টার ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া দেয়, হুইশেল দিয়া গাড়ী চলিয়া যায়।

যাহারা তখনও ষ্টেশনে ছিল, অদূরের নদীর খেয়া পার হইবার জন্য দ্রুত রওনা হইল!

যতীন,—আগন্তুকের নাম যতীন, তাহাদের পিছনে পিছনে পথ চলিতে থাকে!

মাইল খানেকের রাস্তা, বেশীক্ষণ লাগিল না। শেষের খেয়া বলিয়া নৌকায় বেশ ভিড় হইয়াছে। অতঃপর যতীন উঠিলেই নৌকা ছাড়িয়া দিবে।

কিন্তু তাহার কোন আগ্রহ দেখা গেল না!

মাঝি ডাকিল, "বাবু—"

সে হাত দিয়া ইসারা করিয়া বলিল, "না, তোমরা যাও—" হয়ত তাহার মত বদলাইয়াছে, হয়ত বা পরের আবার সে ফিরিয়া যাইবে। সুতরাং খেয়া ছাড়িয়া গেল।

সেই সন্ধ্যার স্তিমিত অন্ধকারে, নদীর পারে পারে যতীন পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যতদূর দেখা যায়, জন-মানবের কোন চিহ্ন নাই। পিছনে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, দক্ষিণে, বামে সীমাহীন বালুর চর, সম্মুখে হেমন্তের শান্ত নদী মৃদু মন্থর গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। আকাশের শুক তারাটা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর জলে তাহার প্রতিবিম্ব আপন আনন্দে নাচিতেছে।

কিন্তু যতীনের সেদিকে লক্ষ্য নাই। সে অধীর ভাবে ঘুরিতে লাগিল, এবং ক্রমাগতই নদীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যেন কিসের প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

তাহার মনে ভরসা আছে; আশা তার ফলবতী হইবে, তাহাই যদি না হইবে···

যতীন ভাবে।······

গত রাত্রির কথা···যতীনের বেশ মনে পড়ে। মেসে সে খাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। অপরিচিত মেস। মাত্র দুইদিন হইল নিতান্তই একা সে সেখানে আসিয়া উঠিয়াছে। কাহারও সহিত যাচিয়া কথা কহে নাই, এবং এই স্বল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির লোকটাকেও সকলে পরিহার করিয়াই চলিয়াছে।

তারপর সে একমাত্র মাদুরের উপর মাথা রাখিয়া শ্রান্ত-ভাবে শুইয়া পড়িয়াছে। ঘুম ঘোরে অনুভব করিয়াছে, নির্ম্মলা আসিয়া তাহার শিয়রের কাছে বসিয়াছে।

যতীন অভিমান ভরে বলে, "এত দেরী!···"

"কতদূর থেকে আসতে হয়, রাগ্‌কোরোনা লক্ষ্মীটি!—সে

নদীর পার, ··ভয়ানক শীত, পা' চলতে চায় না !···গায়ে জামা নেই।···আমি বলে তাই আসি। তুমি হ'লে কবে ভুলে যেতে, একটিবারও আসতে না !"

যতীন বলে, "না, আসতুম না ! তুমি নিষ্ঠুর···তাই অমন কথা বলো। কী যে বলো তুমি !···কিন্তু তোমার হাত যে একেবারে বরফ গো। খুব শীত বুঝি ?"

নির্ম্মলা ঘাড় নাড়িয়া বলে, "খু-ব ! আর যে যায়গায় রেখে এসেছ তুমি, বাবাঃ, একটুও কি আলো পড়ে সেখানে ! অন্ধকার ! কিছু দেখা যায় না !···লাগছে বুঝি খুব ? তুলে নোব হাত ?···"

যতীন তার হাত চাপিয়া ধরে, বলে, "না ! কিন্তু জামা নেই যে তোমার। শীত তো লাগবেই।· আচ্ছা, দাঁড়াও···"

নির্ম্মলা বলে, "না, উঠোনা, তুমি ! ভোর হ'য়ে এলো, আমায় এক্ষুনি যেতে হ'বে···"

"আর আসবে না তুমি ?"

"আসবো আবার, কাল !—এমনি সময়।

"আর সারাদিন ?"

"না !"

"আমার বড় কষ্ট হ'বে যে, নিমু !"

নির্ম্মলা বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলে, "দিনে আসবার যো নেই যে গো।···তারপরে অনেক দূরের পথ, আসতে আসতে রাত পুইয়ে যায়। কি করি বলো !···তুমি তো যাবে না একটিবার।···আমারই আসতে হয়। কিন্তু বড় কষ্ট।"

যতীন বলে, "যাবো আমি !"

নির্ম্মলা খুসী হইয়া বলে, "সত্যি ?"

"হ্যাঁ !"

"ভয় পাবে নাতো ?"

"না ভয় কিসের নিমু ! সত্যি, কালই আমি যাবো, তুমি এসো কিন্তু,···সেই খেয়া-ঘাটের পাশে !···ভুলো না যেন···"

নির্ম্মলা বলে, "না, ভুলবো না।···আমার যাবার সময় হয়ে এলো।···আমি যাই ··"

তার হাত চাপিয়া ধরে, বলে, "আর একটু···"

"না গো না, দেখছো না তুমি, ভোরের হাওয়া আরম্ভ হ'য়েছে। আমি যাই।...তুমি এসো কিন্তু, ভুলো না।..."

নির্ম্মলা চলিয়া যায়। যতীন চীৎকার করিয়া ডাকে, "নিমু···"

ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত শরীর অত্যন্ত ঘামিয়াছে কিন্তু নির্ম্মলার স্পর্শ লাগিয়া হাত যেন বরফের মত ঠাণ্ডা। সে অধীর ভাবে পায়চারী করিতে থাকে। তারপর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে আসিয়া টিকিট কাটিয়া এখানে চলিয়া, আসিয়াছে।

নিমু যদি না আসে, যতীন ভাবে। আবার নিজের মনেই বলে, পাগল।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে।···বেশ হিম পড়িতেছে, ঠাণ্ডাও লাগিতেছে মন্দ নয়।...যতীন র‍্যাপারটা ভালো করিয়া জড়াইয়া লইয়া নদীর দিকে মুখ করিয়া বসিয়া পড়ে···একদৃষ্টে সে চাহিয়া দেখে, যদি কিছু দৃষ্টি-গোচর হয় !

আসিতে নিমুর দেরী হইতেছে !·· তা' হোক···আর কতদূর হইতে আসে হয়ত,·· জামা কাপড়ও নাই কিছু !··· যতীন তাহার জন্য দামী দুইখানা র‍্যাগ কিনিয়া আনিয়াছে,··· যাবার সময় ওকে দিয়া যাইবে।

যতীনের আজ ভয় করিতেছে না।······চারিদিক নিস্তব্ধতায় থম থম করিতেছে।··একটা ঝিঁঝিঁ পোকার পর্য্যন্ত সাড়া নাই—জনমানবের তো দূরের কথা !...যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কালো কালো জমাট অন্ধকার।···নদীর জল মাঝে মাঝে দুই একবার চিকমিক করিয়া ওঠে...দুই একটা মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া পড়ে, অকস্মাৎ খানিকটা শব্দ হয়।···ওপার হইতে প্রতিধ্বনি আসে।···সেই নৈশ স্তব্ধতার মধ্যে এই আকস্মিক ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি একটা ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি করে।···তারপর পূর্ব্বের মতই সব চুপ চাপ।······

আবার আর একটা চাপ ভাঙ্গে·· যতীন কাণ পাতিয়া শোনে, বেশ বড় চাপের শব্দ।...ছোট ছোট মাছগুলি ভয় পাইয়া ছড় ছড় করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।···বোয়াল

কিংবা ঐ জাতীয় দুই একটা বৃহৎ মৎস্য সময় বুঝিয়া লাফ দিয়া শীকার ধরে।

তারপরে আবার সব চুপচাপ। যতীন তন্ময় হইয়া এই নৈশ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিল।…বিরাট বিরাট মাটির চাপ কোথায় কি ভাবে অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।…তারপর কখন এক সময় দুরন্ত শিশুর মত সহসা লম্ফ দিয়া নদীর গর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়ে!

অনেকক্ষণ ধরিয়া আর কোন শব্দ হয় নাই।… এমন কি মাছগুলি পর্য্যন্ত লাফায় নাই। এইবার বোধ হয় খুব বড় একটা চাপ ভাঙ্গিবে। এই বিরাট স্তব্ধতা এবং শূন্যতা তাহার সূচনা করিতেছে।…

যতীন চমকিয়া ওঠে।…কখন আসিয়া নির্ম্মলা তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এবং যতীনকে অন্যমনস্ক দেখিয়া সে যে মনে মনে হাসিতেছে, তাহা সে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে।…

বলে, "এলে নিমু!"

"এলুম! কিন্তু তোমার তো ভাবনার অন্ত নেই।… আমি কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার কাণ্ড দেখছি! ‥ কি ভাবছিলে গা?"

"তোমায়…"

"না, তা' হ'লে আমি ঠিক বুঝতে পারতুম।…কিন্তু বড্ড শী…ত। কিছু থাকেতো বিছিয়ে দাও।…আর তোমার র‍্যাপারটার এক আঁচল দাওতো আমায়,…দেখছো না, কেমন কাঁপছি।…"

বস্তুতঃই সে কাঁপিতেছিল। যতীন তাড়াতাড়ি ব্যাগটা খুলিয়া দুইখানা পুরু পুরু র‍্যাগ বাহির করিয়া একখানা বিছাইয়া বলে, "বোস," তারপর দুইভাগে পাশাপাশি বসিয়া বাকী কম্বলটা বেশ করিয়া গায় দেয়।

যতীন বলে, "কতক্ষণ ধরে এসেছি আমি!…ভাবলুম, তুমি বুঝি এলে না।…"

"পাগল!…কথা দিইছি যখন।…আর না দিলেই বা কি?…তোমায় না দেখে কি থাকতে পারি? তুমি না এলেও আমি ঠিক যেতুম…"

"রোজই যেতে?"

"রোজই" তারপরে হাসিয়া বলে, "অবশ্যি, তুমি যদি না আবার বিদায় দিতে!…

যতীন অভিমান করিয়া বলে, "আমি বিদায় দিয়েছি তোমায়?"

"না তো কি?…দেখো তো, কোথায় আমায় রেখে গেছ তুমি! একটা লোক নেই, জন নেই, কিচ্ছু নেই।… খালি মাঠ, আর নদীর জল; আর অন্ধকার!…আমার মোটেই ভালো লাগে না!" ‥

যতীন নিঃশব্দে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, তারপর বলে "আচ্ছা নিমু, সত্যি আমি তোমায় বিদায় দিয়েছি?"

"তবে কি করেছ?"

"তুমি আগে কেন বল্লে না?"

"আমি কি জানি, তোমার মনে সন্দেহের বিষ ঢুকেছে! …আমায় জিজ্ঞাসা-বাদ কিচ্ছু নেই,…মাঝখান থেকে কি কোরে বোসলে দেখ তো!" তারপর সে হাসিয়া বলে, "আবার হাসিও পায়! এই এত ভালোবাসা, আদর, সোহাগ, একদণ্ড না দেখে থাকতে পারো না…অথচ এক মিনিটের মধ্যে কি যে কোরলে তুমি!…"

যতীন নির্নিমেষ চাহিয়া থাকে। জবাব দেয় না, দেবার কিই বা আছে! নির্ম্মলা যাহা বলিতেছে, সবই সত্য… একবর্ণ রঞ্জিত নয় অথচ কি করিয়া যে কি হইয়া গেল!

সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে, "খুব ব্যথা পেয়েছ, না নিমু?"

নির্ম্মলা ছেলেমানুষের মত মাথা দোলাইয়া বলে, "খু—ব! আর না পাবারই বা কি কারণ? ভেবে দেখো তো তুমি বেশ করে একবার।…বিয়ে কোরলে--আচ্ছা কোরলেই না হয়; কিন্তু পড়া ছাড়লে কেন?"

যতীন বলে, "ছাড়িনি তো একদম, দুদিন পরেই গিয়ে আবার ভর্ত্তি হ'ব ঠিক করেছিলাম।…"

"ছ' মাস বুঝি তোমার দু'দিন?" নির্ম্মলা বলে' "পড়া ছাড়লে, কিন্তু ঘর ছাড়লে না, অর্থাৎ, চব্বিশ ঘণ্টার একটা ঘণ্টাও যদি বাড়ী ছেড়ে থাকতে, তবু না হয় যা হয় হোত।… কাজেই লোকে যে নিন্দে কোরবে তার আর বিচিত্র কি?"

"লোকের নিন্দের কি যায় আসে—"

"তা' আসে না বটে !" তারপর পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া সে হাসিয়া ওঠে, বলে, "মাগো, কি কাণ্ডটাই কোরলে তুমি !...পান নাকি আগে কোনও দিন ভুলেও মুখে তোলনি।...অথচ আমাকে ঘরে এনে পান তামাকের এমনি ভক্ত হ'লে..."

যতীনও হাসে, বলে, "তুমি তো আর আসতে না সারাদিনের মধ্যে একটিবার !...তবুও পানটা খাবার ছলে দু' একবার দেখা যেত, কল্কেতে আগুন আনবার ছলে রান্নাঘরে নিরিবিলি তোমায় দু' একবার কাছে পাওয়া যেত।..."

নির্ম্মলা বলে, "তা' যেতো। কিন্তু আমার যে লজ্জা কোরত ভারী।—ছিঃ ছিঃ সবাই কি ভাবতো বলোতো ?"

যতীন বলে, "তোমার লজ্জাটাই প্রধান হোল। আর আমার যে কি কষ্ট হ'ত, তা' তো বুঝতে না ! তোমায় না দেখলে আমি পাগল হ'য়ে যেতুম।...বিশ্বাস কর ?"

"করি, এবং করি বলে তো আজও তোমার মায়া কাটাতে পারিনি।...দেখছো না, এই জন বিরল স্থানে, তোমায় কাছে পেয়েও যেখানে ভয় করছে, এমনই স্থানে তোমায় খোঁজার জন্য কতই না ঘুরেছি একা একা।..."

কাছেই ঝপাৎ করিয়া খুব বড় একটা শব্দ হইল।... বেশ বড় একটা চাপ ভাঙ্গিয়াছে। ওপারে তাহার প্রতিধ্বনি এখনও শোনা যাইতেছে।...

যতীন বলে, "কি ভুলটাই হোল !"

"তোমরা পুরুষ কিনা, হ'বে না ! ...তিলকে তাল কোরতে তোমাদের যেমন তর সয় না, তার ফলও হয় ঠিক তেমনি !...কেন, আমাকে একটিবার জিজ্ঞাসা কোরলে কি, এমনই অশাস্ত্রীয় হোত ?"...

যতীন বলে, "তখন কি আর জ্ঞান ছিল !...সারাদিন বাড়ী ছিলাম না।...সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরেই তোমায় খুঁজলাম।...দেখি, তুমি ঘরে নেই। মনে এমনই কষ্ট হোল।...কত কষ্ট এবং কৌশল করে যে সন্ধ্যার সময় আসতে পেরেছিলাম, তা' তো জানো না তুমি...অথচ এসে তোমাকে দেখতে পেলোম না !"

"কি ক'রে দেখবে !...তোমার যে তর সয় না !... আর তোমাদের যে বাড়ী।...সেই আম কাঁঠালের বাগানের মধ্য দিয়ে তবে পুকুর ঘাটে যেতে হয়। সন্ধ্যা বেলা,... অত বড় বাড়ী,...তুমি, মা, বাবা সেই সকাল থেকেই ও' পাড়ায় গেছ।...খালি বাড়ী আমার গা' ছম ছম করছিল, তাড়াতাড়ি ঘাটের কাজ সেরে ফিরে আসতেই দেখি, মামা হন হন করে কোথায় চলেছে।...সেই বাগানের পথের মধ্যেই দেখা হ'য়ে গেল।..."

"আর আমিও ঠিক সেই সময় তোমায় খুঁজছিলুম ! দেখি, সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে গল্প কোরছ।..."

"গল্প না গো ! মামার শ্বশুরের বড্ড অসুখ, মামা তাই পাশের গ্রামে শ্বশুর বাড়ী চলেছিল, বল্লুম, 'চলনা মামা, খেয়ে দেয়ে যাবে অখন।' কিন্তু অসুখ কঠিন বলে মামা চলে গেল !"

নির্ম্মলা আবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "কিন্তু ভালোবাসা খুব গভীর কিনা, স্থির কোরলে, আমি পরপুরুষের সঙ্গে প্রণয় কচ্ছি।...পোড়া কপাল !"

যতীন লজ্জা পায়, সত্যই সে তাহাই স্থির করিয়াছিল, বলে, "জ্ঞান কি আর ছিল, নিমু ?"

"বোধ হয় ছিল না।...ছিল না বলেই তো অতর্কিত প্রশ্ন করলে, আমি তোমায় ভালবাসি কিনা !...চমকে উঠলুম, একি প্রশ্ন !"

যতীন অবুঝের মত বলে, "তুমি কিন্তু বললেই হোত ?..."

নির্ম্মলা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলে, "বারে। আমি কি তখন জানি যে তোমার মনে সন্দেহের সাপ ঢুকেছে ?... জিজ্ঞেসা করলে, ভালবাসি কি না !...বললুম, বাসি।... বল্লে, তুমি বিষ দিলে আমি খেতে পারি কিনা ; উত্তর দিলুম, পারি।...তখন কি আর বুঝেছি যে. সত্যি সত্যি তুমি বিষ দেবে ?...বুঝতে পারলে কিন্তু আমি খেতুম না কিছুতেই।..."

যতীন ব্যথা পাইয়া বলে, "থাক্, নিমু, থাক্।..."

নির্ম্মলা হাসিয়া বলে, "ইস্ ! এখন যে ভারী দরদ গো। আর তখন তো অনায়াসে নিজের হাতে আমার মুখে বিষ তুলে দিলে।...কই, একটুও তো বাজলো না ?..."

যতীন বিবর্ণ হইয়া কহে, "বাজে নি নিমু!"···

"হয় তো বেজেছিলো," নির্ম্মলা বলে, "তুমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলে।···ভাবলাম, কত ঠাট্টাই তো কর তুমি।··· হয়ত বা সেই রকমই কিছু। মনে একটু সন্দেহও হল না যে, তুমি নিজ হাতে আমাকে বিষ দিতে পার।"

যতীনের চক্ষু দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়ে। নির্ম্মলা বলে, "ছিঃ কেঁদো না।···সত্যি, বিষের জন্য আমার একটুও কষ্ট হয়নি।...আমি শুধু ভাবছিলুম, মরে গেলে তোমায় আর দেখতে পাবো না, সে না দেখার দুঃখ আমি কেমন করে সহ্য কোরব।···আমার সমস্ত শরীর হীন, অসাড় হয়ে এল, তবু তোমারই দু'হাত মুঠো ক'রে ধ'রে আমার বার বার বলতে ইচ্ছে হ'য়েছিল, ওগো, কেন আমাকে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে!"

যতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের সামনে সেদিনের ছবি ভাসিতে লাগিল।···সন্ধ্যার অন্ধকার।··· বাড়ীতে আর কেহই নাই।···তাহারই দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিয়া নির্ম্মলা যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, বলিতেছে,··· "ওগো, আমায় তুমি একি খাওয়ালে!"···

···যতীন একদৃষ্টে চাহিয়াছিল, বলিল "বিষ!" বিষ! নির্ম্মলার বিশাল দুই চোখের চাহনি যেন এখনও দেখিতেছে ...সে যেন এখনও শুনিতেছে, নির্ম্মলা বলিতেছে, "এমন কি মহাপাপ করেছিলাম আমি, যে, অপরাধ না জানিয়ে এমন কঠিন শাস্তি দিলে?"···যতীন বলে, "অপরাধ!··· না এমন কিছু নয়।···স্বামীর অবর্ত্তমানে তাহারই বাড়ীতে সন্ধ্যার অন্ধকারে পরপুরুষের সহিত নির্জ্জন প্রেমালাপ···এমন আর কি অপরাধ!"...নির্ম্মলা চমকিয়া ওঠে, বলে, "হায়, হায়, যে ভুল আজ কোরলে, একদিন এর জন্য অনুতাপ কোরতে হ'বে।··ওগো সে যে আমার মামা, পর নয়, পরপুরুষ নয়···!"

তাহার আর্ত্তকণ্ঠস্বর নদীর উপর দিয়া, অন্ধকার চিরিয়া যতীনের বুকে আসিয়া আঘাত করিতেছে।···যতীনের মনে পড়ে, সেদিনও এমনই অন্ধকার ছিল।···যতীন কত কাঁদিল, তাহার বুকের উপর আছড়িয়া আছড়িয়া কত কাঁদিল।··· কিন্তু নির্ম্মলা তখন চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে কাঁদাইয়া, তাহার পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিয়া অভিমানিনী বিদায় লইয়াছে।...তারপর যখন রাত্রি গভীর হইল, নির্ম্মলার দেহ অসাড় হইয়া গেল, যতীনের চোখের জল শুকাইয়া আসিল, যতীন তখন উঠিয়া দাঁড়াইল, নির্ম্মলার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া সেই অন্ধকার নিশীথে উন্মাদের মত একা একা মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এই নির্জ্জন নদীর পারে, এমনি গভীর নিশীথে আসিয়া উপস্থিত হইল!···অন্ধকারে যতটুকু দেখা যায় আর একবার জন্মের শোধ তাহাকে দেখিল আর একবার তাহার বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিল,···আর একবার, শেষবার, অধরে অধর দিয়া বিষ চুষিয়া লইবার অসফল চেষ্টা করিল।···তারপর···তারপর সেই সোনার দেহের সহিত পাথর বাঁধিয়া তাহাকে এই নদীর জলে একা একা বিসর্জ্জন করিল।···জমাট জমাট অন্ধকার তাহার নীরব সাক্ষী রহিল।···আকাশের লক্ষ তারকা তাহার বিসর্জ্জনের অশ্রু নদীর জলে মিশাইতে দেখিল। হেমন্তের নিস্তব্ধ নদী বারেকের জন্য ছলাৎ করিয়া সাড়া দিয়া আবার স্থির হইয়া গেল।···

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গিয়াছে। নির্ম্মলা বলে, "কি ভাবছো?"

"ভাবছি, এ কি করে আমার দ্বারা সম্ভব হ'ল!"

নির্ম্মলা হাসিয়া বলে, "তুমিই জানো। আমি হ'লে কিন্তু কিছুতেই পারতুম না, বাবাঃ···"

যতীন তাহাকে জড়াইয়া সহসা প্রশ্ন করে, "কোথায় থাকো তুমি নিমু?···"

নিমু সম্মুখের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলে, "ওই নদীর গর্ভে! কি যে শীত ওখানে!···আর অন্ধকার! একা একা আমার বড় কষ্ট হয়···"

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ।···যতীন স্থির করিয়া আসিয়াছিল, আজ সে তাহার যত কিছু অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া লইবে। এই অন্ধকার আকাশের তলে, নদীর পাড়ে, পিছনে সুবিস্তৃত মাঠ,···এবং বালুর চর···নির্ম্মলা তাহাকে কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিবে না!

কোন দিনও করে নাই।

যতীনের মনে হইল, কিছুরই প্রয়োজন নাই। সে

চাহিতেই সব পাইয়াছে! তাহাকে অদেয় নির্ম্মলার কিইবা আছে!…

ঠাণ্ডা হাওয়া জোরে বহিতে আরম্ভ করিল। নির্ম্মলা চকিত হইয়া কহে, "যাই!"

যতীন শান্ত কণ্ঠে বলে, "না।"

"পাগল! দেখছো না ভোরের হাওয়া আরম্ভ হ'য়েছে।… আমি যাই।…" যতীন বলে, "আচ্ছা, দাঁড়াও তবে, আমিও যা'ব!…" নির্ম্মলা বাধা দিয়া বলে, "না!"

"আমি যাব!" যতীন জেদ করে, "আমার বড় কষ্ট হয় নিমু। তোমাকে এইখানে রেখে আজ তিন দিন কেমন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেখছো না তুমি,… নিষ্ঠুর!…"

নির্ম্মলার দু'টী বিষন্ন চোখ ছল ছল করিয়া ওঠে. বলে, "তুমি এসো না, ভারী কষ্ট হ'বে তোমার। যাও, লক্ষীটি ফিরে যাও তুমি। আবার বিয়ে থা' করে সুখী হও।…"

যতীন দুঃখিত কণ্ঠে বলে, "নিমু…"

"আচ্ছা থাক্, কষ্ট যদি হয় তোমার নাই কোরলে বিয়ে। …কিন্তু এসোনা তুমি।…কেন মিছিমিছি কষ্ট কোরবে?… আর আমি তো সত্যি মানুষ নই!…দেখছো না তুমি, ছায়ামাত্র।…"

কিন্তু যতীন উঠিয়া তাহার পিছন পিছন অনুসরণ করিতেছে। নির্ম্মলা বলে, "যাবে সত্যি?"

"হ্যাঁ!"

নির্ম্মলা কি ভাবিয়া দাঁড়ায়। তারপর হাসিয়া হাতছানি দিয়া বলে, "আচ্ছা, এসো তবে! এসো আমার পিছু পিছু। …বেশ হ'বে কিন্তু।…একসঙ্গে থাকবো দু'জনে…চিরকাল! কেউ আর বিরক্ত করবে না!" তারপর সে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, "এসো গো, এসো!"

যতীন নিঃশব্দে চলিতে থাকে!…তাহার চলার শব্দ নাই, আকাশে শব্দ নাই, বাতাসে শব্দ নাই, নদীর স্রোত নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে, মৌন প্রকৃতি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!…

সে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল।…চরের বালুতে পা বাধিয়া যাইতেছে।…জোলো হাওয়ায় শীত আরও কনকনে বোধ হইতেছে।…আকাশের তারাগুলি নিষ্প্রভ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে।…

যতীন জলে নামিল। এখন আর তাহার ঠাণ্ডা লাগিতেছে না। নির্ম্মলা হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, "এসো, এসো,…আরও দূরে…নদীর মধ্যিখানে…একেবারে অতল গর্ভে।"…যতীন অগ্রসর হইল। ক্রমে ক্রমে জল বাড়িতে লাগিল—হাঁটু, কোমর, বুক অবশেষে জল আসিয়া তাহার গলায় ঠেকিল।

নিমু ডাকিল, "এসো!"—

"দাঁড়াও নিমু, যাই…"

তারপর সে আরও অগ্রসর হইল! তাহার চিবুক ডুবিল, নাক ডুবিল, চোখ ডুবিল, কপাল ডুবিল, কোঁকড়া কোঁকড়া রাশি রাশি কালো চুল অন্ধকারের মধ্যেও একটু একটু দেখা গেল! তারপর আর কিছুই দেখা গেল না!…

খালি নদীর জলে ক্ষণিকের আলোড়ন পড়িয়া গেল,… কয়েকটা বুদ্বুদ উঠিল,…খানিকটা জল ঘোলা হইল,… তারপর অনন্ত জল প্রবাহ উদ্দেশ্যহীন অবিরাম গতিতে বহিয়া চলিল।

অতুল ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনা

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

হোরীকে তাঁহার নিজ সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি এমন এক স্মৃতি-স্তম্ভ রচনা করিয়া গেলেন যাহা পিত্তল স্তম্ভ অপেক্ষাও স্থায়ী। অনন্ত নিরবধি মহাকালের ললাটে এমন জয়তিলকই তিনি অঙ্কিত করিয়াছিলেন যাহা যুগ যুগ ধরিয়া এই বিপুলা পৃথ্বীর নিকট তাঁহার অক্ষয় গৌরব ঘোষণা করিবে। এমনি করিয়া সকল যুগের, সকল দেশের সাহিত্যিক মহারথীগণ শাশ্বত মহাকালের জন্য তাঁহাদের সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ সাহিত্য, সৌন্দর্য্য, ও রসসৃষ্টির মহিমাকে দেশ ও কালের অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডী কোন প্রকারেই ব্যাহত করিতে পারে না। মানুষের অন্তরের যে চিরন্তন শাশ্বত অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া এবং যে সুবিরাট রসকল্পনাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বসাহিত্যের সৃষ্টি, তাহাতে কোন বিশিষ্ট ভেদবুদ্ধি বা কৌলীন্যপ্রথার অবকাশ অথবা সুযোগ থাকিতেই পারে না। দেশের এবং কালের বিশিষ্ট আবেষ্টনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াও তাই রস-প্রাচুর্য্যে সাহিত্য সর্ব্বকালীন্ এবং সার্ব্বভৌমিক হইয়া পড়ে।

সাহিত্য ও রসসৃষ্টির যেমন এই সার্ব্বভৌমিকত্ব রহিয়াছে, সাহিত্য এবং রসবিচারেও তদ্রূপ একটি বহুকাল পরম্পরাগত সার্ব্বভৌমিক বিচারের আদর্শ গঠিত হইয়া গিয়াছে। মানুষের অন্তরের রসচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে চিরন্তন ভাবব্যঞ্জনাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের সাহিত্যের চরম উপকরণ করিয়া লইয়াছেন—তাহাই আবার সাহিত্য-বিচারের আদর্শকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই "নিত্যকালীন ভাব-ঐশ্বর্য্য"কে সাহিত্য সমালোচনার প্রধান সামগ্রী করিয়া লইয়া সর্ব্বদেশ এবং সর্ব্বকাল-প্রযোজ্য বিচার রীতি প্রবর্ত্তন করিবার মহতী কল্পনা হইয়াছিল প্রথম গ্যয়টের। গ্যয়টে বিশ্ব সাহিত্যবিচারে যে পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহারই চরম পরিণতি হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনায়। বিশ্বমানবের ভাবনা-কল্পনা ও কামনা-বেদনাকে অপূর্ব্ব পুলকরসে অভিষিক্ত করিবার ক্ষমতা হইয়াছে যে বিরাট মহা-মনীষীর—তিনিইত' প্রকৃতপক্ষে "দেখাইয়া দিতে অধিকারী কি করিয়া সাহিত্য মানবমনকে চিরকাল ভরিয়া হাসিকান্নার সাগর-দোলায় দুলাইয়া থাকে—তিনিইত বুঝিতে পারেন এমন কি যাদু রহিয়াছে সাহিত্যে ও শিল্পে যাহা অনাগত ভবিষ্য মহাকালকেও অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিতে পারে। যিনি স্বয়ং স্রষ্টা এবং শিল্পী তিনিইত' শুধু তাঁহার অতিসূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সরস দরদ এবং অনুভূতির সহায়তায় শিল্পীর সৃষ্টি-মহিমাকে ও সৃষ্টি-কৌশলকে যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন এবং "রসস্য নিবেদনম্"কে সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে এই সুবিপুল বিশ্বের বহু বিভিন্ন জাতির এবং সম্প্রদায়ের মানব-মনে এমন কি অতীন্দ্রিয় এবং অচ্ছেদ্য যোগধারা রহিয়াছে, এমন কি অদ্বৈতের অবস্থিতি রহিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ অথবা গ্যয়টের মত সাহিত্য সমালোচকগণ সমগ্র মানব জাতির রস-চেতনা ও সাহিত্যিক আবেদনকে একই ক্ষেত্রে আনিয়া একই আদর্শে বিচার করিয়াছেন? এই সংখ্যাতীত মানব মনের শত বিচিত্র অনুভূতির সূক্ষ্ম তন্তুজালকে ব্যাপিয়া এমন কি অবিচ্ছিন্ন সূত্র রহিয়াছে যাহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা মানবের রসানুভূতিকে ও সৌন্দর্য্যোপলব্ধিকে একই আইনের গ্রন্থিতে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন? রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে, বহুগ্রন্থে, এবং বহু প্রবন্ধে মানবের রসিক চিত্তের এই নিগূঢ় আত্মীয়তা এবং সকল সৃষ্টির অন্তরালস্থিত এই creative unityকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন।

"মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের

দূরের সহিত নিকটের অন্তরঙ্গ যোগ সাধন"ই রবীন্দ্রনাথের নিকট সাহিত্যের পরমধর্ম্ম। মানব সমাজের অপরিমেয় অশ্রু-লবণাক্ত সমুদ্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন-দ্বীপ-সদৃশ মানব-ব্যষ্টিকে একভাবযুক্ত করে বলিয়াই সাহিত্য শব্দের ধাতুগত ব্যাখ্যা (সহিত+ষ্ণ্য) রবীন্দ্রনাথের নিকট অর্থসঙ্গত হইয়াছে।

বহির্জীবনের মানুষের সহিত মানুষের যে যোগ তাহা বাস্তব জীবনের বহুমুখী ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণরূপে সার্থক হইতে পারে না। তাহা স্বার্থের সংঘাতে কলুষিত, শতপ্রকার ভেদবুদ্ধিতে কণ্টকিত। কিন্তু মানুষের বাস্তব জীবন যেখানে আসিয়া তাহার শত গ্লানি, শত অসঙ্গতি, শত তুচ্ছতা সহ পরিসমাপ্ত হইয়াছে—সেখানে সকল মানুষের অন্তরই এক "মহামানবের সাগরতীরে" আসিয়া সমবেত হয়। সেখানে শুধু সকল মানবচিত্তের যোগতীর্থ ই নহে—সেখানে প্রকৃতির সহিতও মানুষের অনন্ত বিহার লীলা চলিয়াছে।

পারিপার্শ্বিক বিশ্বজগৎ-এর সহিতও মানুষের জীবনের যোগ শুধু বাহিরের স্থূলদৃষ্টিতে আমরা যতটা দেখি—ঠিক ততটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সাধারণ নিত্য বাস্তব জীবনের সহিত বাহিরের জগৎ এবং প্রকৃতির যে সম্পর্ক তাহা হইল প্রয়োজনের এবং ব্যবহারের যোগ। মানুষের বাস্তবজীবনের শত দ্বৈধতা এবং খণ্ডতার উৎস হইল বহিঃপ্রকৃতির সহিত মানবমনের এই ব্যবহারিক যোগ। "শুধু দিন-যাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি" জীবনকে "খণ্ড খণ্ড" করিয়া তাহার সকল মাধুর্য্য, সকল সৌন্দর্য্য "দণ্ডে দণ্ডে" ক্ষয় করিয়া দেয়। কিন্তু জীবন ও প্রকৃতির ইহাই চরম সম্পর্ক নহে। ইহাদের মধ্যেও অখণ্ড লালায় এবং অক্ষুণ্ণ গৌরবে বিরাজ করিতেছে এক ভূমানন্দময় পরম রস-সম্পর্ক।

বাস্তব প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে, মানুষের বস্তুজীবনের সুদূর অতীতে, তাহার মানস জীবনের সহিত বাহিরের বিশ্বজীবন যেখানে আসিয়া অপরূপ সম্মেলনে যুক্ত হইয়াছে, সেই চিন্ময় লোকে এক অফুরন্ত রস-উৎস উচ্ছ্বসিত বেগে উৎসারিত হইয়া [illegible] চিত্তমনকে চিরকালই অভিষিক্ত করিতেছে।

এই যে মানুষের মানস জগৎ-এ বিশাল বিশ্বজীবন মুকুরিত হইয়া এক সুদূরপ্রসারী আনন্দের লীলা-নিকেতন সৃষ্টি করিয়াছে—সেই সীমাহীন কল্পলোকেই ভাবরসিক মানব মনের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র। L'art commence où la vie cesse।

সেখানে যে সুগভীর হৃদয়াবেগ, যে বিপুল রসানুভূতির সৃষ্টি তাহা কোন খণ্ডতা বা দ্বৈধতাদ্বারা বিড়ম্বিত হয় নাই। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে তাই সে অনুভূতি এবং আনন্দ এক অখণ্ড রস-পরিণামে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। যাঁহারা সে রাজ্যের অসীম সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণ সুষমাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ত মানব-চিত্তের অনুভূতি ও আনন্দবেদনার কোন প্রকৃতিবিভেদ নাই, কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের মত ধ্যান-যোগী রসবেত্তা দ্রষ্টাপুরুষ মানুষের রসানুভূতি ও সাহিত্যিক আবেগকে একই আইনে—স্পিনোজার sub specie œeternitatis এ বাঁধিয়া ফেলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। মানব-অন্তরের এই বিপুল ঐক্যকেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যবিচারে প্রয়োগ করিয়াছেন। রস ও আনন্দের ঊর্দ্ধলোকে যদৃচ্ছ বিচরণ করিয়াছেন বলিয়াই সাহিত্যের রসব্যঞ্জনার মূল সত্তাগুলিকে তিনি একত্র সংহত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের রসবিচার-রীতি বা সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতিকে বুঝিতে হইলে রস-বেদনার ও শিল্পসৃষ্টির এই সকল চিরন্তন সত্তাসমূহকে কি করিয়া তিনি এক "অদ্বৈতে"র মধ্যে পরিসমাপ্তি করিয়াছেন তাহাই বুঝিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনাকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার সমগ্র জীবন, কাব্য, শিল্প, দর্শনে তিনি যে সৌন্দর্য্য সাধনা করিয়াছেন, যে পরম অনুভূতি তাঁহার কাব্যের শতবিচিত্র অভিব্যক্তিকে রসোজ্জ্বল ও ভাবঘন করিয়া তুলিয়াছে—সেই নিরঙ্কুশ সৌন্দর্য্য-চেতনাই এখানেও অবিচ্ছিন্নভাবে আপনার লীলা বিস্তার করিয়াছে। উপনিষদের ঋষি স্থলে, জলে, ভূমিতে, আকাশে সর্ব্বত্রই দেখিয়াছিলেন এক অখণ্ড আনন্দম্-এর অধিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথও আপনার তুরীয় দৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বত্র

দেখিতে পাইয়াছেন এক নয়নাভিরাম আনন্দসুন্দর মূর্ত্তি। জীবনে ও কাব্যে তিনি যে অদ্বৈতের আরাধনা করিয়াছেন তাহাও কিন্তু এই সুন্দরের মধ্যেই সকল কিছুর পরিণতি-সাধন করিয়া। সাহিত্যবিচারেও তিনি অসংশয়চিত্তে তাঁহার সুন্দর-দেবতারই পূজাবেদী স্থাপন করিয়াছেন।

এই "সুন্দরম্"ই হইল তাঁহার নিকট একমাত্র সত্য। তাই যাহা কিছু অসুন্দর এবং গ্লানিময়—তাহাই হইয়াছে তাঁহার নিকট মিথ্যার মায়ারূপ। অসুন্দর আবিলতার পঙ্কস্তূপের অন্তরালে যে পঙ্কজ তাহার শতদল বিস্তার করিয়াছে, আপনার দিব্যদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ সেই সুন্দর-কমলেরই সন্ধান করিয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বত্রই অকুণ্ঠচিত্তে বলিয়াছেন, যাঁহার পরিপূর্ণদৃষ্টি আছে, তাঁহার নিকট বাহিরের মায়ারূপটিই একান্তভাবে ধরা দিবে না। সকল কিছুর অতীত সুগোপন-রক্ষিত সুন্দরের সত্যরূপই প্রতিভাত হইবে, মিথ্যার এবং অসুন্দরের কুহেলি ভেদ করিয়া তিনি দেখিতে পাইবেন যে সুন্দরের নয়ন-মোহন মূর্ত্তি অনন্তের ভাস্বর আলোকে বিভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিপূর্ণদৃষ্টি লইয়া মহাদেবকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তাপসী গৌরী তাঁহার মধ্যে কোন অসুন্দরের চিহ্নমাত্র পান নাই। "ভাবৈকরসং মনঃস্থিতং" যাঁহার, তাঁহার নিকট বাহিরের তুচ্ছ অসুন্দরের স্থান কোথায়? এই পরমদৃষ্টি বলেই হেগেল আবার দেখিয়াছিলেন, "Features of the ultimate ideal of a harmonised universe"।

কিন্তু শুধু সত্যকেই সুন্দরের মধ্যে বিলীন করিয়া তিনি ক্ষান্ত হ'ন নাই কল্যাণকেও সত্য ও সুন্দরের সহিত একাঙ্গ করিয়া "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"-এর একক মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের কাছে সম্পূর্ণতা লাভ করে তখনই, যখন মানুষ শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, মনের দৃষ্টি দিয়া দেখে। "অতএব যে দেখাতে আমাদের মনের বড় অংশ অধিকার করে—সেই দেখাতেই আমরা বেশী তৃপ্তি পাই। ফুলের সৌন্দর্য্যের চেয়ে মানুষের মুখ আমাদের বেশী টানে, কন না, মানুষের মুখে শুধু আকৃতির সুষমা নয়, তাহাতে চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ের লাবণ্য আছে তাহা আমাদের চৈতন্যকে, বুদ্ধিকে দখল করিয়া বসে। আবার, যে রাজপুত্র মানুষের দুঃখ মোচনের উপায় চিন্তা করিতে রাজ্য ছাড়িয়া বনে চলিয়া গেলেন—তাঁহার মনোহারিতা মানুষকে কত কাব্য, কত চিত্র রচনায় লাগাইয়াছে তাহার সীমা নাই।" (রবীন্দ্রনাথ) কারণ এখানে ভারবী ঠাকুরের সেই "হিতং" এবং "মনোহারী"র সুদুর্লভ সমাবেশ।

বস্তুতঃ, মঙ্গল মানুষের নিকটবর্ত্তী অন্তরতর সৌন্দর্য্য। রবীন্দ্রনাথ শিল্পের মধ্যে মঙ্গলের এই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার নিকটও মম্মট ভট্ট'র ন্যায় সাহিত্য ও শিল্প নবনব বিচিত্র বিকাশের ভিতর দিয়া "হ্লাদৈকময়ী অনন্যপরতন্ত্রা" হইয়া উঠিয়াছে। তাই, তাঁহার নিকট উপনিষদের মন্ত্র সার্থক হইয়া উঠিয়াছে—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" তিনিই রস, যিনি এই তিন-এর সার্থক সংযোগে রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছেন—তাঁহাকে পাইয়াই মানবের রসিকচিত্ত অসীম আনন্দে পরিপ্লুত হয়। "যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।' আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমস্তই truth এবং সমস্তই beauty—সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্।"

রবীন্দ্রনাথের নিকট, রামগিরি আশ্রমের বিরহী যক্ষের প্রণয়বার্ত্তা যে কালিদাস আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের মেঘকে দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন—তাহাও মঙ্গলের সহিত সুন্দরের যোগসাধন করাইবার জন্যই। "ধরণীর তাপশান্তি, শস্যক্ষেত্রের দৈন্যনিবৃত্তি, নদীসরোবরের কৃশতা-মোচনের উদার আশ্বাস তাহার স্নিগ্ধ নীলিমার মধ্যে যে মাখানো। মঙ্গলময় পরিপূর্ণতার গম্ভীর মাধুর্য্যে সে স্তব্ধ হইয়া থাকে। সে যে জগতের তাপ নিবারণ করে—সে কি শুধু প্রণয়ীর বার্ত্তা প্রণয়িনীর কানের কাছে প্রলাপিত করিবে? সে যে সমস্ত পথটায় নদগিরি-কাননের উপর বিচিত্র পূর্ণতার সঞ্চার করিতে করিতে যাইবে। কদম্ব ফুটিবে, জম্বুকুঞ্জ ভরিয়া উঠিবে, বলাকা উড়িয়া চলিবে—ভরা নদীর জল ছল্ ছল্ করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিবে এবং

জনপদবধূর ভ্রূবিলাসহীন প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দৃষ্টিপাতে আষাঢ়ের আকাশ যেন আরও জুড়াইয়া যাইবে। বিরহীর বার্তাপ্রেরণকে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল-ব্যাপারের সঙ্গে পদে পদে গাঁথিয়া গাঁথিয়া তবে কবির সৌন্দর্য্যরসপিপাসু চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছে।" (রবীন্দ্রনাথ)

কালিদাস যে অকাল বসন্তের আকস্মিক উৎসবে, পুষ্পশরের মোহবর্ষণের মধ্যে হর-পার্ব্বতীর মিলনকে চূড়ান্ত না করিয়া, বেদনার তপস্যার মধ্যে তাহাদের মিলনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন আর অভিজ্ঞান-শকুন্তলের রাজদম্পতির মিলনকে বাসনার চাঞ্চল্যের এবং কামনার আঘাত-আলোড়নের মধ্য হইতে আনিয়া শান্তসংযত চিত্তের কমনীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন—সেও শান্ত এবং মঙ্গলের মধ্যেই সৌন্দর্য্যের চরম সম্পূর্ণতা দেখাইবার জন্য। এই পরিণতিতে সৌন্দর্য্যের সহিত মঙ্গল একাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

এমনি করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যসমালোচনায় শিবসুন্দরকেই একমাত্র আদর্শ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু আনন্দময় তাহাকেই তাঁহার সৌন্দর্য্য পিপাসু চিত্ত পরম আদরে গ্রহণ করিয়াছে; আর যাহা কিছু অসুন্দর এবং কুৎসিত তাহাকেই তিনি নির্ম্মমভাবে সাহিত্যজগৎ হইতে চিরনির্ব্বাসন দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই নিজস্ব রসতত্ত্ব এবং বিশিষ্ট মতবাদকে না বুঝিলে তাঁহার সাহিত্যসমালোচনাকে কখনই ঠিক করিয়া বুঝা যায় না।

তাই যখন বাংলার তথাকথিত অতি আধুনিক সাহিত্যজগতে বাস্তব চেতনার উপলক্ষ করিয়া কাম-জৃম্ভন এবং অসুন্দরের পূজার উদ্বোধন হইয়াছিল—বাংলা সাহিত্যের সেই পরম দুর্দ্দিনে, সৌন্দর্য্যের একনিষ্ঠ সাধক এই রবীন্দ্রনাথই "সাহিত্যধর্ম্মে"র পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আবার তরুণ সাহিত্যিকের সাহিত্যসৃষ্টিকুশলতার আনন্দে তিনিই অপরিস্ফুট অনাগত গৌরবের সূচনার প্রতিলক্ষ্য করিয়া নবীন কবির বন্দনা গীত গাহিয়াছেন। সাহিত্য-সমালোচনা জগতে এই একনিষ্ঠ সৌন্দর্য্য-তন্ময়তা এবং এই নিরপেক্ষ বিদগ্ধতাই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দান।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দৈবী প্রতিভার মায়াকাঠিটি সাহিত্য-জগৎ-এর যে ক্ষেত্রেই স্পর্শ করিয়াছেন সেখানেই মুহূর্ত্তের মধ্যে সপ্তভূমক প্রাসাদচূড়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই বিরাট স্বর্ণ-হর্ম্ম্যের প্রতি কক্ষে কক্ষে রহিয়াছে যে বিপুল আড়ম্বর এবং অশেষ বস্তুসম্ভার তাহার মূল্য পরিমাপ করিবার সময় এখনও আসে নাই।

তবে যে কবি তাঁহার অপরূপ রসদৃষ্টি এবং অলোক-সামান্য প্রজ্ঞাবলে আমাদের নয়ন সম্মুখে যে নব জগৎ-এর দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া আমাদের চিত্তমনকে পুলকবিহ্বল করিয়া দিয়াছেন সেই পরম সুরসিকের বন্দনাগীতই আজিকার উৎসব গগন ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলুক!

"ন ত্বদন্যঃ কবিতরো, ন মেধয়া ধীরতরো ত্বধাবন্।
ত্বং তা বিশ্বা ভুবনানি বেত্থ সখা নো অসি, পরমং চ বন্ধুঃ!"

"ধ্যানবলে তোমা অপেক্ষা অধিক কবি কেহ নাই, হে আত্মলীলাময় জ্ঞানেও তোমা অপেক্ষা জ্ঞানী কেহ নাই। বিশ্বভুবন সকলই তোমার জানা। তুমি আমাদের সখা, আমাদের পরমবন্ধু।"

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

নলিয়ায় রাজা সীতারাম

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

যে অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীগ্রামটির সম্বন্ধে দুচারটি কথা আমি লিখিতেছি তাহার গৌরবময় অতীতের মঠ, মন্দির, বিগ্রহের অতুলনীয় কলা-সম্পদ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের ভিতরে বিভিন্ন প্রকার চারু শিল্পের চর্চ্চা, পূজার্চ্চনা প্রভৃতির ভিতর দিয়া জনসকলের সদ্বৃত্তির প্রকাশ, আমার গ্রামের বর্ত্তমান শ্রীহীনতার অন্তরাল ভেদ করিয়া আমার অন্তরে যে প্রেরণা বহন করিয়া আনিয়াছে তাহার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হইয়া এই গ্রামকে এবং সাথে সাথে বাংলার প্রাণ-স্পন্দনের সত্যকার স্থানকে দেশবাসীর নিকটে পরিচিত করিতে আমার এই প্রচেষ্টা।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোয়ালন্দ মহকুমার বালিয়াকান্দি থানায় এই নলিয়া গ্রাম অবস্থিত। পূর্ব্বে এই সব স্থান নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় নলবন দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। গ্রামের উত্তর অংশে ভট্টাচার্য্য এবং দক্ষিণে শর্ম্মা উপাধি বিশিষ্ট কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। যখন গ্রামের এইরূপ অবস্থা তখন সীতারাম একজন প্রতাপশালী রাজা বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। রাজা সীতারামের এই সব স্থানে বিগ্রহ, মন্দিরাদি স্থাপন এবং আসিবার কারণের বোধ হয় নিম্নলিখিত দুইটী উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। 'যখন সীতারাম নবাব সায়েস্তা খাঁর নিকট হইতে "রাজা" উপাধির পাঞ্জাসহি ফারমাণ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন তখন উত্তরে দৌলত খাঁ গড়ই (মধুমতী) নদী হইতে পূর্ব্বে পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানের মালিক মারা যান এবং তাঁহার পুত্র নসিব ও নসরৎ খাঁর নামানুসারে এই বিস্তীর্ণ স্থান নসিব সাহী ও নসরৎ সাহী নামক দুইটী পরগণায় বিভক্ত হয় এবং পরে উহা হইতে মহিমশাহী ও বেলগাছী নামে আরও দুইটী পরগণা বাহির হয়। বর্ত্তমানে বেলগাছী নলিয়া হইতে ১৪ মাইল দূরে। এই সব পরগণার অধিকার লইয়া যখন ছেলেদের মধ্যে খুব বিবাদ আরম্ভ হয় তখন রাজা সীতারাম তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য মোগল শাসন-কর্ত্তাদের নিকট হইতে আদিষ্ট হইয়া এখানে আসেন। পরগণা জয় করিবার জন্য রাজা সীতারাম সৈন্য সামন্ত লইয়া পদ্মার কূলে কয়েকস্থানে দুর্গ স্থাপন করেন এবং উহাদের সাথে তাঁহার বহুদিন যুদ্ধ করিবার পর সমস্ত পরগণা তাঁহার হস্তগত হয়।'*

* ৺সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "সীতারামের রাজ্যবিস্তার, যশোহর খুলনার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড।"

বর্ত্তমান পাংশা রেল ষ্টেশনের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে মালঞ্চী গ্রামে একটী ভগ্নস্তূপকে এখনও লোকে সীতারামের গড় বলিয়া থাকে এবং নলিয়ার এক মাইল উত্তরে দুই মাইল ব্যাপিয়া জলবেষ্টিত একটী বিস্তীর্ণ স্থান 'সীতারামের গড়' নামে পরিচিত। এই সময় রাজা সীতারাম দীর্ঘকাল রাজধানী ছাড়িয়া নসীবশাহী পরগণায় বাস করেন। নলিয়া-গ্রাম নসীবশাহী পরগণার অধীন। উত্তরে যাহাতে তাঁহার রাজ্য সুদৃঢ় হয় তাহার জন্য বোধ হয় তিনি শত্রুপক্ষ হইতে একটু দূরে নদী-বহুল এইস্থানে একটি উপনিবেশ স্থাপনকল্পে দেব-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করেন। নলবন পরিষ্কার করা হইয়াছিল বলিয়াই এই গ্রামের নাম নলিয়া হয়। এখানেও তাঁহার দুর্দ্দান্ত ডাকাতদিগকে দমন করিতে হইয়াছিল। নলিয়ার পূর্ব্বে চত্‌রার বিলের মধ্যের 'ডাকাতের ভিটাগুলি' এখনও লোকের মনে ভীতি উৎপাদন করে। ঠিক ইহার পার্শ্বের স্থানকে 'ছাউনীপাড়া' বলা হয় এবং বিলের নিকট দিয়া বহু পুরাণো পুকুরের ইট দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় রাজা সীতারাম এখানে ছাউনী ফেলিয়াছিলেন।

রাজা সীতারাম তাঁহার নূতন রাজধানী মহম্মদপুরের সাথে পদ্মায় বাণিজ্যের যাহাতে খুব প্রসার হয় তাহার জন্যও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নলিয়া চতুর্দ্দিকে নদী এবং বিল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। নলিয়ার পূর্ব্বদিকে বিরাট চত্‌রার বিল, যাহা নলিয়ার তিন মাইল দূরে চন্দনা নদীর সাথে মিশিয়াছে, পশ্চিমদিকে জোলা (খাল) চন্দনা নদী হইতে বাহির হইয়া পদ্মায় গিয়া মিশিয়াছে; এখন এই জোলা শুকাইয়া গিয়াছে এবং নলিয়ার ঠিক এক মাইল দক্ষিণে চন্দনা প্রবাহিত। এই চন্দনা নদী দক্ষিণে মধুমতী এবং উত্তরে পদ্মার সাথে মিশিয়াছে।

রাজা সীতারামের এই নলিয়ার পার্শ্বস্থ জোলা এবং চন্দনা নদীর মধ্য দিয়া যাওয়া ব্যতীত ঐ সময়ে পদ্মার উপকূলে পৌছাইবার অন্য কোন সহজ পথ ছিল না, কেননা নলিয়ার দুই মাইল দক্ষিণে ভূষণা এবং তাহার কিছুদূরে মহম্মদপুর রাজধানীর নিকট দিয়া যে মধুমতী নদী প্রবাহিত এবং কুষ্টিয়ার নিকট হইতে যে গড়ই নদী পূর্ব্বোক্ত নদীর সাথে ভাটপাড়ার নিকট মিশিয়াছে এবং যাহাকে একই মধুমতী নদী নামে বর্ত্তমানে বলা হয়, ইহার এইরূপ অবস্থা পূর্ব্বে ছিল না। এমন কি রেণেল সাহেব তাঁহার ডায়রীতে লিখিয়াছেন যে, প্রথমে যখন তিনি এদিকে জরিপ করিতে আসেন তখন কুষ্টিয়ার নিকটের গড়ই নদী দিয়া নৌকায় কিছুদূরমাত্র অগ্রসর হইয়া জলাভাবে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন এবং বেলগাছির নিকট চন্দনা নদী দিয়া এই সব অঞ্চলে আসেন। পরে পদ্মার ভাঙ্গনে এই খাল বিস্তৃত হইয়া 'গড়ই' নদী নামে পূর্ব্বোক্ত মধুমতী নদীর সাথে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং রাজা সীতারামের চন্দনা নদীর পথই সহজ এবং সুবিধার ছিল। নলিয়ায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে পার্শ্বস্থ জোলা দিয়া রাজা সীতারামের "ময়ূরপঙ্খী", "গুঞ্জরীদোলা", "কোতরখুপি", "কালপাশা" ইত্যাদি নামে বহু নৌকা পদ্মায় যাতায়াত করিত। এই জোলার ধারের বিস্তীর্ণ স্থানকে এখনও লোকে "কারখানা" বলে এবং জোলার অপর পার্শ্বে তিনটি বিরাট পুকুর এবং

শ্যামরায় ও রাধিকা

পুকুরগুলির ধারে ইটের ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের বর্ত্তমান বৃদ্ধারা বলেন যে তাঁহারা শৈশবকালে জোলা দিয়া বহু ইলিস মাছের নৌকা সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে দেখিয়াছেন। আজ প্রায় ৬০ বৎসর হইল এই জোলা শুকাইয়া গিয়াছে। এই সময় হইতেই নলিয়ার প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয়।

নলিয়ায় দেব মন্দিরাদি এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার সময় রাজা সীতারাম নলিয়ার ছয় মাইল উত্তরে বাড়িগ্রাম হইতে কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তীকে নলিয়ায় আনয়ন করেন। ইঁহার সম্বন্ধে গ্রামে একটি প্রবাদ আছে যে কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার চারি কন্যার বিবাহ চারিজেলের ছেলের সাথে দেন এবং অন্যান্য এইরূপ সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া রাজা সীতারাম তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার উপরেই নলিয়ার এই সব দেবমন্দির, নিষ্কর জমি ও বিগ্রহাদির রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত করিয়া যান।

গ্রামের মধ্য স্থানে এই দেবমন্দির গুলি প্রতিষ্ঠিত। ৺সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডের সীতারামের রাজ্যবিস্তারে' আমরা দেখিতে পাই যে রাজা সীতারাম মহম্মদপুরে কালাচাঁন্দ, রাধামাধব, রাধিকা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, গণেশ, সর্ব্বমঙ্গলা, বুড়োশিব, দশভূজা ইত্যাদি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। নলিয়া গ্রামেও দশভূজা, বুড়োশিব, কালাচাঁদ, লক্ষ্মী জনার্দ্দন, লক্ষ্মী নারায়ণ, বুড়োশিব, পঞ্চরত্ন ইত্যাদি ছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে মাত্র দশভূজা, কালাচাঁদ, বুড়োশিব, লক্ষ্মীনারায়ণ (শ্যামরায়, গোবিন্দরায়, বৃন্দাবন রায় ও তাঁহাদের রাধিকা) পঞ্চরত্নের মধ্যে দুইরত্ন, জাগেশ্বর ও বীরেশ্বর, বুড়োশিবের মধ্যে কালরুদ্র ও কালভৈরব ও অন্যান্য কয়েকটি বিগ্রহ আছেন। পূর্ব্বে এখানে বহুমন্দিরই ছিল কিন্তু বর্ত্তমানের শেষদশায় কেবলমাত্র 'জোড় বাংলা', ইহার মধ্যেই পিতলের জয়দুর্গা মূর্ত্তি, শ্যামরায়, বৃন্দাবন, এবং শিবের মন্দির আছে।

এই সব মন্দিরগুলি প্রায় দুই বিঘা জমির উপর নির্ম্মিত। পূর্ব্বে মন্দিরগুলি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং প্রাচীর দ্বারের সম্মুখের দুইটি বিরাট পুকুর এখনও আছে। নলিয়া গ্রাম খুব বৃহৎ পুকুরের জন্য প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ পুকুর গুলি গ্রামের পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত। বোধ হয় পূর্ব্ব দিকের দুর্দ্দান্ত ডাকাতদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছিল। গ্রামের প্রাচীন বৃদ্ধারা বলেন যে তাঁরা বাল্যকালে প্রাচীর গায়ে বহু অঙ্কিত ছবি দেখিতেন এবং এই সব রক্ষা করিবার জন্য লাঠিয়ালরা সর্ব্বদা পাহারা দিত। ইহারা যে সব কৃপাণ, সড়কী ইত্যাদি ব্যবহার করিত তাহা বর্ত্তমানে চক্রবর্ত্তী বংশের সুরেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী

শ্যামরায়ের মন্দির

মহাশয়ের বাটীতে এখনও আছে কিন্তু সেই বহুমূল্য ছবিগুলি অকালে অযত্নে এই বিরাট ভগ্নস্তূপের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে।

জয়দুর্গার মন্দিরকেই জোড়বাংলা বলা হয়। বাংলাঘরের দুইটি মন্দির একসঙ্গে নির্ম্মিত বলিয়াই জোড়বাংলা নাম হইয়াছে। ইহার ছাদ খিলান করা ও ঘরের ভিতর হইতে দেখিতে বাংলা ঘরের চালের ন্যায়। মন্দিরের মাপ ৩৩´ ফিট × ২৪´ ফিট, ভিত্তি ৪½´ ফিট্। জয়দুর্গার মন্দির

নলিয়ার ভিতরে রাজা সীতারামের প্রধান কীর্ত্তি। এই মন্দিরটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বহির্দ্দেশ বহু কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ। সম্মুখের রোয়াক দিয়া প্রবেশ পথ অতিক্রম করিলেই বারাণ্ডা। এই বারাণ্ডাটাই জোড়বাংলার একটি বাংলা। তারপরেই মন্দিরাভ্যন্তরের প্রবেশ দ্বার। দ্বারের উপরের প্রাচীরে বহু কারুকার্য্যখোদিত ইঁট আছে। মন্দিরের মধ্যে বেদীর উপরে সিংহারূঢ়া মহিষাসুর-বধোদ্যতা 'জয়দুর্গার' মূর্ত্তি। বামে সরস্বতী, দক্ষিণে লক্ষ্মী, সরস্বতীর নিম্নে ময়ূরের উপরে কার্ত্তিক, লক্ষ্মীর নিম্নে গণেশ, তাঁহার বাহন মূষিকোপরি উপবিষ্ট। মায়ের মাথার উপরে ষাঁড়ের পৃষ্ঠে সেই আত্ম-ভোলা মহেশ্বর। অপূর্ব্ব এই পিতলের দশভুজার মূর্ত্তিখানি, প্রায় দুইহাত উচ্চ এবং দেড় হাত বিস্তৃত। পূর্ব্বে জয়দুর্গা দশপ্রহরণধারিণীই ছিলেন, কিন্তু এখন একটি প্রহরণও নাই; সব চুরী হইয়া গিয়াছে।

এই বিগ্রহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদটী গ্রামে প্রচলিত আছে। সীতারাম তাঁহার রাজকর্ম্মকারকে একখানি সোনার দশভুজা প্রস্তুত করাইবার জন্য তাঁহার বাটীতে ডাকিয়া পাঠান এবং বলেন যে তোমরা সোনা চুরী কর বলিয়া আমার বাটীতে প্রহরী বেষ্টিত থাকিয়া সোনার প্রতিমা গড়িতে হইবে। রাজকর্ম্মকার রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া প্রতিদিন অন্য একখানা পিতলের একইরূপ প্রতিমা গড়িতে থাকে। সোনার প্রতিমা প্রস্তুত হইলে রাজার আদেশ অনুসারে কর্ম্মকার প্রতিমাখানি জলে পরিষ্কার করিতে লইয়া যায়। এই সোনার প্রতিমাখানি জলে লুকাইয়া রাখিয়া পিতলের প্রতিমাখানি রাজাকে আনিয়া দেয়, রাজা উহাই সোনার প্রতিমা ভাবিয়া গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার দিন কর্ম্মকার প্রকৃত ব্যাপার রাজার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলে রাজা তাহার কৌশল ও নির্ম্মাণ চাতুরীর পুরস্কার স্বরূপ বহু অর্থ দান করেন এবং বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া দেন। তখন রাজা তাঁহার সোনার প্রতিমাখানি রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পিতলের খানি নলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

জয়দুর্গার মূর্ত্তিটি পিতলের কিন্তু চোখ দুটি শ্বেত পাথরের, চোখের উপরের দিকে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় দুটি কালোমণি, ঢুলু ঢুলু ভাব। একদিন যে মায়ের বেদীমূলে দিবা অবসানের সঙ্গিত সারে সারে সন্ধ্যাপ্রদীপ জলিয়া উঠিত, পুরোহিতের হস্তস্থিত ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে আরতির দীপশিখার স্পন্দন ছন্দে বন্দনা গান চলিত, বধূগণের শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিত এবং সমবেত ভক্তিপ্লুত পল্লী-

সীতারামের দীঘি

বাসীর মুখে চোখে প্রসাদ গ্রহণান্তর যে অপূর্ব্ব তৃপ্তির আভাস ফুটিয়া উঠিত সে সমস্তই আজ 'নিশার স্বপন সম' হইয়া গিয়াছে। প্রত্যুষের নহবতের সুরে মালী জাগিয়া ফুল তুলিতে বাহির হইত, স্বতন্ত্র দালানে ভোগের আয়োজন চলিত, ঝি মন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিত, পুরোহিত পূজার ব্যবস্থায় লিপ্ত থাকিতেন। দ্বিপ্রহরে দেবীর ভোগ অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা হইত, বৈকালী ভোগ হইত ফলমূলাদি দ্বারা। আজ আর মন্দিরের ভিতর সন্ধ্যাদীপ জলে না, পূজার্চ্চনা বন্ধ, ভোগ ইত্যাদি বহুদিনই উঠিয়া গিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন, শত শত চামচিকার

বাসস্থান। সমস্ত মেঝেটি চামচিকার বিষ্ঠায় অপরিস্কৃত। দেবীর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মলিন হইয়া গিয়াছে, পরিধানে ছিন্ন পুরাতন একখানি লাল চেলীর কাপড়, নিরাভরণা। সমগ্র মূর্ত্তিটি ঘিরিয়া একটি করুণ ম্লানছায়া। মায়ের মুখে কিন্তু মধুর হাসি, চক্ষু দুইটি ক্ষমা-সুন্দর—অসীম স্নেহে পূর্ণ। ভোগের জন্য বহু টাকা আয়ের নিষ্কর সম্পত্তি, ভোগের মৎস্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট জলাভূমি, কুম্ভকার, মালী, ঝি, ঢাকী ইত্যাদির মধ্যে চাকরাণের বন্দোবস্ত, রাঁধুনীর মাহিনা এবং পুরোহিতের দক্ষিণা বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য দ্রব্যের নিমিত্ত তহবিল প্রভৃতি থাকিতেও যে বিগ্রহের সেবা হয় না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

দুর্গা হইতে মূষিকটি পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি মূর্ত্তি যে কতটি দরদের সহিত মৃত্তিকার প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা একটু মনোযোগ করিলেই লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি মূর্ত্তির ভঙ্গী লীলায়িত এবং মনোহর। প্রত্যেকটি অঙ্কন-রেখার মধ্যে একটি আন্তরিকতার ছাপ এবং সমগ্র গঠন-সৌষ্ঠবের ভিতর দিয়া একটি সুস্থ, সবল, ঝর ঝরে ভাব। ফটোগ্রাফের ভিতর দিয়া পাঠক মূর্ত্তিগুলি এবং বিশেষভাবে সিংহটির শিল্প-সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিবেন। মন্দিরটির অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিলেও এবং কারুকার্য্যগুলি একেবারে শেষদশায় আসিয়া উপনীত হইলেও এখনো যেটুকু দেখা এবং বোঝা যায় তাহাতে মন প্রাচীন কালের সেই অজ্ঞাত শিল্পীগণের প্রশংসায় ভরিয়া উঠে। মন্দিরটির বহির্গাত্রের প্রত্যেকখানির ইঁটের উপর দিয়া এবং স্তম্ভগুলির সমস্ত ইঁট ঘিরিয়া নানা প্রকার ফুল, লতা পাতা ইত্যাদি নির্ম্মিত। সম্মুখে দুইটি অশ্বাকৃতি তেজিয়ান সিংহ। দুইটিকে লক্ষ্য করিলেই নির্ম্মাতার অসাধারণ কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মন্দির এবং প্রত্যেকটি মন্দিরের কারুকার্য্যই অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রণালীতে করা হইয়াছে।

জয়দুর্গার বেদীর দুই পার্শ্বেই দুইটি কালোপাথরের শিবলিঙ্গ আছে। ইহাদের নাম কালরুদ্র ও কালভৈরব। এ দুটির উচ্চতা ৩½ ফিট হইবে, এক্ষণে একটির মাঝখানটা দ্বারের গে . বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের ঠিক গ্রাম খু ভোগ রান্না করিবার দালান ছিল, এখন তাহার চিহ্ন নাই। যে খিড়কী দ্বার দিয়া রান্নার কোঠা হইতে ভোগ মন্দিরে আনয়ন করা হইত, মন্দিরের গায়ে সেই দ্বারটি ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। ইহার পশ্চিম পার্শ্বেই শ্যামরায়ের মন্দির।

মন্দিরগুলির মধ্যে এইটিই সবচেয়ে ছোট . কিন্তু মন্দির গাত্রের শিল্পকলায় এই ছোট মন্দিরটিই সবচেয়ে সুন্দর। শ্যামরায় অর্থ্যাৎ রাধিকাসংযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি। কৃষ্ণ অবয়ব কালো পাথরের ও রাধিকা পিত্তলের প্রস্তুত। এইরূপ

সরস্বতী

রাধিকার ভঙ্গী সচরাচর দেখা যায় না। মহম্মদপুরে যেরূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ আছেন এই বিগ্রহ গুলি প্রায় অবিকল সেইরূপ দেখিতে। শ্যামরায়ের মাথায় পাথরই খোদাই করা চূড়া। বর্ত্তমানে এই শ্যামরায় ও রাধিকার মূর্ত্তি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতেই হাত পা ভাঙ্গিয়া পূজার অযোগ্য বলিয়া একটি অন্ধকার গৃহে অযত্নে পড়িয়া আছে, এবং এদিকে শ্যামরায়ের মন্দিরটি শৃগাল কুকুরের বাসস্থান হইয়াছে মন্দির-গাত্র অপূর্ব্ব লতা পাতা ফুল ইত্যাদি কারুকার্য্য যার

বেষ্টিত, উভয় পার্শ্বে দুইটী সুন্দর ময়ূর সাপ ধরিয়া খাইতেছে। মন্দিরটির নীচে বটবৃক্ষের শিকড়ের আড়ালে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যাহা কিছু অতি কষ্টে দেখিয়াছি তাহার উল্লেখ করিলাম। প্রথম ইঁটখানায় রাখালের সাথে কৃষ্ণ ও বলরাম শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে গরু বাছুর গুলিকে গোষ্ঠে লইয়া যাইতেছেন। অন্যদিকে রাজা শিকারে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার মহিষী এবং সারথিগণ, সম্মুখে অশ্বের উপরে শিকারী অতি সুন্দর ভঙ্গীতে হরিণ ও হরিণীকে বধ করিতেছে। এইরূপ অন্যান্য সুন্দর মূর্ত্তিও ছিল কিন্তু সে সমস্তর আর চিহ্নও নাই।

শ্যামরায় ও রাধিকার পূর্ব্বে বর্ত্তমানের মত এইরূপ হীন দরিদ্র অবস্থা ছিল না। তাঁহার হাতে সোনার বাঁশী, পায়ে নূপুর ছিল। রাধিকার মাথায় সোনার মুকুট, কানে 'ফুলঝুমকো', গলায় 'পাঁচলহরী,' হাতে 'বাজু', সোনার তাবিজ, পায়ে মল, হাতে চুড়ী ছিল। এই মন্দিরের ঠিক সম্মুখেই গোবিন্দ রায়ের মন্দির। গোবিন্দ রায়েরও শ্যামরায়ের মত রাধিকা ছিল, এবং শ্যামরায় ও তাঁহার রাধিকা যেরূপভাবে সোনার অলঙ্কারে সজ্জিত ছিলেন, ঠিক ইহাঁরাও সেইরূপ ভাবে অলঙ্কার ইত্যাদিতে সজ্জিত থাকিতেন। গোবিন্দ রায়ের মন্দিরটি ঠিক জোড়বাংলা মন্দিরের মত দেখিতে কিন্তু জয়দুর্গার মন্দির হইতে কিছু ছোট। এই মন্দিরটির পিছনের বাংলার উপরে দুইটি ত্রিশূল দেখিতে পাওয়া যায়। মহম্মদপুরের অধিকাংশ বিগ্রহের মন্দিরের উপরে এইরূপ ত্রিশূল আছে। এই মন্দিরটির সাম্নে দুইটি সিংহ আছে, সিংহ দুইটির পদতলে দুইটি হস্তী। সিংহ দুইটির মাঝখানে সুন্দর ইঁটের উপর খোদাই করা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। মন্দির-গাত্রে বহু লতা এবং ফুল আছে। বহুকষ্টে মন্দিরের নীচের একদিকে মাত্র যাহা দেখিতে পাইয়াছি এখানে তাহারই উল্লেখ করিলাম। প্রথমে তিনজন গোপিনী দুধ লইয়া যাইতেছে, কৃষ্ণ তাহাদের ভাণ্ড হইতে মাখন চুরি করিতেছেন, তারপর বড়াই বুড়ী গোপিদের সহিত চলিয়াছে, সঙ্গে বাঁকে করিয়া গোয়ালারা দই লইয়া যাইতেছে। ইহার উপরে কতকগুলি হাঁস জলে সাঁতার কাটিতেছে। এইরূপ বহু জীব জন্তুর ইঁটের উপর খোদাই করা মূর্ত্তি ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে তার কিছুই নাই। গোবিন্দ রায় কালোপাথরের, রাধিকা পিতলের। মূর্ত্তি দুখানি দেখিতে ঠিক শ্যামরায় ও রাধিকার মত কিন্তু উহাদের অপেক্ষা কিছু উঁচু। গোবিন্দরায়ের মন্দিরের সম্মুখের উন্মুক্ত স্থানকে 'গোবিন্দরায়ের থলাট' বলা হয়। বৃন্দাবন মন্দিরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সিংহাসনে

বৈরাগী ও বৈষ্ণবী

থাকিতেন। এই সিংহাসনের পা গুলি সিংহ ও হস্তী দ্বারা নির্ম্মিত ছিল, সমস্ত সিংহাসনটি চিত্রিত করা ছিল। সিংহাসনের প্রথম থাকে পূজার সাজ, দ্বিতীয় থাকে পান ও বৈকালীর ফলমূলাদি, তৃতীয় থাকে গোবিন্দ রায় ও রাধিকা বাস করিতেন। উপরে চাঁদোয়া ছিল। কিন্তু এই অমূল্য সিংহাসনটি ভদ্রলোকের বাটীর জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হইয়া বহুদিনই হইল লোপ পাইয়াছে। ইহার পর

বৃন্দাবন অর্থাৎ কৃষ্ণ ও রাধিকা। এই দুইখানি মূর্ত্তি কাষ্ঠের নির্ম্মিত কিন্তু এই রাধা শ্যামরায় অথবা গোবিন্দ রায়ের রাধিকার মত নয়। যুগলমূর্ত্তিতে যেরূপ রাধিকার ভঙ্গী ঠিক সেইরূপ দেখিতে। উপরে মাটি দেওয়া ছিল এবং মাটির উপর সমস্ত মূর্ত্তি দুইখানি চিত্রিত করা ছিল কিন্তু এখন তার সামান্য চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। বৃন্দাবনের চক্রবর্ত্তীদের বাটীতেই পূজা হইত। বর্ত্তমানে বৃন্দাবন হাত পা ভাঙ্গিয়া জয়দুর্গার বেদামূলে কোন রকমে একটু স্থান করিয়া লইয়াছেন, রাধারও তদ্রূপ অবস্থা। মহম্মদপুরেও কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিগ্রহ আছে। স্বজননাথ মিত্র মহাশয়ের ১৩৩১ সনের চৈত্র মাসের ভারতবর্ষের একটি প্রবন্ধে দেখিতে পাই যে রাজা সীতারামের নিম্ব-দারু-নির্ম্মিত ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুর ইত্যাদি বিগ্রহ তথায় পূজা পাইতেন।

গ্রামে দোল আসিলে গোবিন্দ রায়, শ্যাম রায়, বৃন্দাবন ও তাঁহাদের রাধিকা এবং অপর একখানি ঠাকুরকে চারখানা পাল্কী করিয়া জয়দুর্গার মন্দিরের পার্শ্বস্থ দোলমঞ্চ মন্দিরে আনা হইত। এই দোলমঞ্চটি মহম্মদপুরের ৺লক্ষ্মীনারায়ণের দোলমন্দিরের মতই দেখিতে কিন্তু উহার মত ইহার চারিটি থাক নাই। ইহার ভিত্তি প্রায় ৩½ হাত তার উপরেই দোল মন্দির। এই দোল মন্দিরে বিগ্রহগুলিকে গ্রামের স্ত্রীপুরুষেরা বরণ করিয়া এবং রং খেলিয়া চারখানি পালকী সহ গ্রামের মধ্যে শোভাযাত্রায় বাহির করিতেন। ইহাকেই ঠাকুরদের 'গস্তে' যাওয়া বলা হইত।

ইহার পশ্চিম পার্শ্বে নহবত খানা এবং দ্বাদশটী শিবের মন্দির ছিল কিন্তু তাহা এখন বিরাট ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার সম্মুখেই 'নাটমন্দির' এবং জয়দুর্গা এবং বিগ্রহগুলির আয় ব্যয় সংক্রান্ত তিনটি কাছারী ঘর ছিল। 'নাটমন্দিরে'র সম্মুখে সব চেয়ে উঁচু একটি মন্দির আছে। ইহাতে 'লক্ষ্মী জনার্দ্দন,' 'নাড়ুগোপাল', 'চক্রধর' এবং 'শালগ্রাম' ইত্যাদি বিগ্রহ থাকিতেন। বর্ত্তমানে মন্দিরের চামচিকার ময়লার দুর্গন্ধে এবং সর্প দংশনের ভয়ে ভিতরে কাহারও যাইতে সাহস হয় না। এই মন্দিরটির গাত্রে মহাবীর, দশ অবতার এবং অন্যান্য বহু মূর্ত্তি খোদিত আছে।

চক্রবর্ত্তী বাটীর প্রাচীন এক বৃদ্ধার নিকট শুনিলাম যে রাজা সীতারাম কোন একটি বিশেষ পূজা উপলক্ষে কয়েকটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তন্মধ্যে কাষ্ঠের বৈরাগী ও বৈষ্ণবী এবং চড়কপূজার পাঠবান, কালাচাঁদ আছেন। কাষ্ঠের বৈরাগী ও বৈষ্ণবী মূর্ত্তি দুইখানি চক্রবর্ত্তীদের বাটীতেই আছে।

মাটির দয়াময়ী
(কালীমূর্ত্তির দক্ষিণে উলঙ্গিনী ডাকিনী মূর্ত্তি)

বৈরাগী জোড়াসন হইয়া হরিনাম জপিতেছে, গলায় মালা, মাথার চুল উপরে বাঁধা। তাহারই পার্শ্বে বৈষ্ণবী ছোট ছেলেকে কোলে করিয়া লজ্জাজড়িত নেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। মূর্ত্তি-গুলি খুব কাল হাল্‌কা কাঠের নির্ম্মিত। ছেলেটি মায়ের কোলে যে ভাবে রহিয়াছে তাহাতে অজ্ঞাত শিল্পীগণের অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি কল্পনার উজ্জ্বল নিখুঁত এইরূপ দৃষ্টান্ত আর

হরিঠাকুর বাটির সিংহাসন (১)

কিন্তু দুই মুখ সরু নয়। অগ্রভাগে কাষ্ঠ খোদিত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং মাঝখানে একটি ত্রিশূল আছে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন গ্রামের 'চড়ক গম্ভীরা দল' দশ অবতার এবং অবতার নৃত্য করিয়া থাকে (শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় আশ্বিনের প্রবাসীতে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন)। বর্ত্তমানে কালাচাঁদ ভগ্ন অবস্থায় একটি ভগ্ন সিংহাসনে জয়দুর্গার মন্দিরের পার্শ্বে পড়িয়া আছেন।

ইহা ব্যতীত কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তীর পরে ৺ রাজলক্ষ্মী দেব্যা জয়দুর্গার মন্দির হইতে কিছুদূরে দক্ষিণে মৃন্ময় দয়াময়ী প্রতিষ্ঠিত করেন। নলিয়ার এক মাইল দূরে আচার্য্য বাটী আছে। এই আচার্য্যরা পূর্ব্বে চিত্রাঙ্কন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। তাঁহাদের দ্বারাই এই দয়াময়ীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বে এই আচার্য্যরা বংশানুক্রমে জয়দুর্গার বাংলার সমস্ত চিত্র এবং পুথির পাটার উপরকার ছবিগুলি আঁকিতেন। দয়াময়ী কালীমূর্ত্তি, অশ্বারূঢ়া, দুই পার্শ্বে তাঁহার সহচরী উলঙ্গিনী দুই জন ডাকিনী যোগিনী নরমাংস ভক্ষণ করিতেছে। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিগুলির কিছু সংস্কার করা হয়। আচার্য্য শিল্পীদের বর্ণ সঙ্গতি জ্ঞান যে কতদূর ছিল তাহা এই মূর্ত্তিগুলি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিগুলিও অযত্নে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। সাধারণত নলিয়া গ্রামে পাঠবান পূজা চৈত্র সংক্রান্তিতে হয় কিন্তু এই কালাচাঁদ জয়দুর্গার মন্দিরে থাকিতেন বলিয়া সর্ব্বদাই পূজা পাইতেন। সুজন নাথ মিত্র মহাশয়ের ১৩৩১ সনের চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে মহম্মদপুর নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাই যে জয়দুর্গা মন্দিরের মধ্যে এক পার্শ্বে প্রায় ৫।৬ হাত দীর্ঘ একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত পদার্থ আছে। উহার দুই মুখ সরু, লোকে ইহাকে সীতারামের চড়কের পাটবান অথবা কালাচাঁদ কহে। এখানের পাটবান অথবা কালাচাঁদ কাষ্ঠ নির্ম্মিত

হরিঠাকুর বাটির সিংহাসন (২)

এই সময় নলিয়ার উত্তর পাড়ায় ৺পদ্মলোচন ঠাকুর হরিনাম প্রাপ্ত হইয়া জয়দুর্গার মন্দিরে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। তখন এই সব স্থানের খুব উন্নতি হইয়াছিল এবং পদ্মলোচন ঠাকুর বিগ্রহের বড় সাধকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। যখন ঠাকুরের নাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে তখন তাঁহার এক ধনী জমিদার ভক্ত ঠাকুরের জন্য উত্তরপাড়ায় যে বাটি, পুষ্করিণী, বিগ্রহ এবং তাঁহাদের জন্য যে সমস্ত কাষ্ঠের সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া দেন তাহাদের মধ্যে হইতে দুইখানি সিংহাসনের ফটো এখানে দিলাম। এই সিংহাসন দুইটির অদ্ভুত সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য এবং জীবজন্তুর নিখুঁত নানারূপ ভঙ্গীর মূর্ত্তি দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়।

এইরূপ ভাবে রাজা সীতারামের সংস্পর্শে আসিয়া যে নলিয়া গ্রাম একটি বিরাট্ তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল আজ তাহা একটি শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভেনিসিয়া

(সনেট)

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

যে কবি আসিল হেথা প্রণয়িনী সাথে
অবজ্ঞার জ্বালা সহি' স্বদেশে সুদূর—
তারে নিলে বক্ষে তব ; বিরহ-বিধুর
আরেক বিদেশী কবি নিঃসঙ্গ প্রভাতে
আসিল দুয়ারে গাহি' মরণের সুর—
তারে দিলে কোল ; মূঢ় প্রেমাতুর
ওথেলোর ঈর্ষাজ্বালা জুড়াইলে রাতে।

তাহাদের ব্যথা সনে মোর পরিচয়
আজিকার নহে সখি, সে যে চিরন্তন—
জন্মে জন্মে সহিয়াছি না গণি' বিস্ময় ;
সে ব্যথার সাক্ষী তুমি—নীরব ক্রন্দন
ওই তব—রচিয়াছে তাই মনে লয়
তোমার আমার মাঝে অটুট বন্ধন।

তরুণকবি সুকুমার সরকার

শ্রীরাজেন্দ্র মিত্র

শুনলাম সুকুমারের মৃত্যু ঘটেছে।

তরুণকবি সুকুমারের এই আকস্মিক মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হয়েছেন এবং বহু সাময়িক পত্রে সুকুমারের সাহিত্য অনুরাগ এবং তার জীবন আলোচনা হয়েছে।

ফোটবার পূর্ব্বেই অকালে একটি তরুণ জীবন ঝরে যাওয়ার অনেক দুঃখ আছে—কিন্তু আরও দুঃখিত হয়েছি তার মৃত্যুর পরিণাম এবং অধঃপতনের কথা স্মরণ করে।

৫।৬ বছর পূর্ব্বে লোকচক্ষুর অন্তরালে শান্তিনিকেতনের মুক্ত প্রান্তরে বিশ্বভারতী কলেজে একটি সুকুমার ফুটফুটে ছেলে পড়তে এল। সদাহাস্যময় মুখ...নাদুষনুদুষ গড়ন .. শান্ত সুন্দর চেহারায় লালিত্য এবং লাবণ্য মাখানো। এই সুকুমার সরকার। পরিচয় সেইখানেই ঘটে।

সুকুমারের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করে দু'চার দিনের মধ্যেই বুঝলাম—কোলকাতার ধোঁয়া, গাড়ী, কলেজবাড়ী, মেসের নোংরা বৈচিত্র্যহীন জীবন সুকুমারের প্রকৃতির সাথে খাপ্ না খাবারই কথা—তাই হয়তো সে এই মুক্ত প্রান্তরে অধ্যয়ন করতে এসেছে।

সুকুমার কবি ছিল সত্য—কিন্তু শান্তিনিকেতনে সে কবি বলে পরিচিত হবার পূর্ব্বে থেকেই লক্ষ্য করেছি সুকুমারের প্রকৃতি কবিদের মতই—সাধাসিধে আপন ভোলা মানুষ। নিজের জিনিষ পত্তর. বই খাতা···কাপড় জামা কখন যে কোথায় থাকে সুকুমারের তা খেয়াল থাকে না; বহুদিন দেখেছি, স্নানের পর ভিজে কাপড় মেলে দিতেও মনে নেই, দু' তিন হয়তো কাপড়খানি ভিজে অবস্থায়ই একস্থানে পড়ে রইল, তারপর যেদিন খোঁজ পড়লো—খুঁজতে খুঁজতে হয়তো দেখা গেল কাপড়খানি ধুলো কাদা মেখে ঘরের এক কোণে পড়ে আছে কিম্বা হয়তো কাপড়খানির সন্ধানই পাওয়া গেল না। এ সবদিকে সুকুমারের গ্রাহ্য নেই। শান্তি নিকেতনে অবস্থানকালে সুকুমারের মধ্যে বিলাসিতা কোনদিন দেখিনি। পরণে শুধু একখানি কাপড়···জামা হাতের সামনে পেলে তবেই গায়ে দিলে... নতুবা দরকার নেই...কাপড় যদি একটু ছেঁড়া একটু সেলাই করা হয় তাতেও সুকুমারের বিশেষ আপত্তি নেই। এমনি সুকুমারের চরিত্র। সুকুমার খেয়ালী—নিজের খেয়ালে নিজেই বিচরণ করে। মনে আছে সেবার আশ্রমের পাশেই একটা গ্রামে আগুন লাগলো—ঢং ঢং ঢং বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি অবিশ্রান্ত বেজে চলেচে—ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, আশ্রমবাসী সবাই, ছেলে বুড়ো কেউ বাকি রইল না, বালতি হাতে আগুন নিবাতে ছুটলো—হুড়োহুড়ি, দৌড়দৌড়ি, অবিশ্রান্ত চীৎকার। তারপর ঘণ্টা দুই বাদে আগুন নিবিয়ে ফিরে এসে দেখা গেল—সুকুমার নিজের ঘরে খাটের উপরে শুয়ে দিব্য আরামে মোলায়েম সুরে রবীন্দ্রনাথের "উর্ব্বশী" পড়চে, বুকের উপর "চয়নিকা" রেখে। সুকুমারের খেয়ালও নেই সে জানেও না যে এদিকে এত কাণ্ড হয়ে গেল। এই ধরণের অনেক ছোট খাটো কারণে তার এই উদাসী মনের জন্য কর্তৃপক্ষ তাকে অনেকবার তিরস্কার করেছেন—আমরাও হয়তো অনেক অপ্রিয় রসিকতা করে "ভাবুক" "পাগল" এইরূপ বহু গঞ্জনা দিয়েছি কারণ তখন ভাবতাম এসব সুকুমারের ইচ্ছাকৃত ভণ্ডামি কিন্তু পরে বুঝেছিলাম এই খামখেয়ালীপনা সুকুমারের ইচ্ছাকৃত নয়—ইহা তার প্রকৃতি-দত্ত স্বভাব।

শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির বিচিত্র লীলার মধ্যে কিছুদিন বাস করবার পর সুকুমারের মনে কবিতা রচনার ইচ্ছা দেখা দিল। ইহার পূর্ব্বে রচনা অভ্যাস হয়তো ছিল কিন্তু তাহা অত্যন্ত চিমে তেতালা, প্রাণ ছিলনা, গোপনে ফুটে গোপনেই ঝরে যেতো। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বার্ষিক

স্মৃতি-সভায় সুকুমারের কবিতা প্রথম শুনি। সেই প্রথম আশ্রমবাসী জানলো সুকুমার কবিতা রচনায় একজন নিপুণ শিল্পী। কবিতাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্যেই রচিত। বহুদিনের কথা—সব মনে নেই, প্রথম লাইন দুটি মনে পড়ছে—

কার তরে গো, কার তরে
শ্রাবণ দিনে অশ্রু ঝরে—

সুকুমার সভায় দাঁড়িয়ে অতি সহজ ও সুন্দরভাবে এই কবিতাটি পাঠ করলো। সভায় উপবিষ্ট সকলের দৃষ্টি সেদিন কলেজের এই নূতন ছাত্রটির উপর পড়েছিল। প্রথম কবিতাটি দিয়েই সুকুমার সকলের দৃষ্টি নিজের প্রতি টেনে নিল। তারপর থেকে প্রত্যেক সাহিত্য সভায় সুকুমার একটি কবিতা কিম্বা আবৃত্তি না করলে সভা যেন তেমন জমে না। সুকুমার ভাল আবৃত্তি করতে পারতো এবং পরে কোলকাতায় এসে নানা সভা সমিতিতে আবৃত্তি করে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছিল। মনে আছে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথও তার কবিতার প্রশংসা বহুবার করেছেন। শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন—তিনিও সুকুমারের কবিতার প্রশংসাই করেছেন। শ্রীযুত অমিয় চক্রবর্ত্তীর কাছ হতেও সুকুমার কাব্য রচনায় খুব উৎসাহ পেয়েছিল—সুকুমার তাঁর ছাত্র ছিল, সুকুমারকে তিনি স্নেহ করতেন খুবই।

সুকুমার মেতে উঠলো কাব্যচর্চ্চায়। প্রান্তরের মাঝে সুকুমারের প্রকাশ হলো। তাই কতদিন দেখেছি জ্যোৎস্না প্লাবিত মধুরাতে...বর্ষার মেঘমেদুর সন্ধ্যায় নির্জ্জনে বসে সুকুমার কবিতা লিখছে। সুকুমার অলস ছিল—কিন্তু প্রাণহীন ছিল না, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে শান্তিনিকেতনে শালবনের মাথায় যখন প্রচণ্ড বর্ষা নেমে আসতো সেই অশ্রান্ত ঝরঝর বৃষ্টির মধ্যে সুকুমার ঘর ছেড়ে মাঠে বেরিয়ে পড়তো একা – কেয়াবনের অভিসারে।

বিশ্বভারতী কলেজ থেকে আই-এ পাশ করে সুকুমার এবার এল কোলকাতায় কলেজে পড়তে। আজ ভাবি অনভিজ্ঞ সুকুমার কোলকাতায় না এলেই যেন ছিল ভাল—তা'হলে হয়তো এমনভাবে সে জীবনে পথ-ভ্রষ্ট হতো না।

সরল সুকুমারের কোলকাতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা। তাই সুকুমার চলবার পথটি না চিনে কেবলই বিপথে চলেছিল। সে সব কথা স্মরণ করতেও দুঃখ হয়, না বলাই ভালো। ক্রমে সুকুমারের দেহ হতে লালিত্য গেল···স্বাস্থ্য নষ্ট হলো...অকালে যৌবন বুঝি বা ঝরে যায়—আর চেনবার উপায় নেই। এ যেন সেই বিশ্বভারতীর সুকুমার নয় – এ তারই যেন কঙ্কাল। ইদানীং তাকে দেখে দুঃখ হতো...ভয়ও হতো, সুকুমারের চোখের পাতায় মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসছে·· সে বুঝি আর বেশীদিন বাঁচবে না। "স্বদেশ" মাসিক পত্রে "মুসাফির" শীর্ষক একটি কবিতায় সুকুমার তার শেষ জীবনের কথা লিখেছে—

"কামনার কাপালিক ঘুরি আমি যৌবন চঞ্চল
নিখিল নারীর দ্বারে, নিত্য চলি প্রেম মুসাফির!"

* * *

"উচ্ছৃঙ্খল অনুভূতি করিয়াছে আমারে উন্মাদ
অর্থ হীন আনন্দেতে নিজ মনে লক্ষ্য কথা বলি
আছে কী পথের প্রান্তে বসে' কেহ মেলি রূপফাঁদ!
ফেনিল কামনা মোর ফেনায়েছে সমুদ্রের মত
কাহার আঁখির দিকে সেই স্রোতে চলিয়াছি আমি।"

* * *

"অসহ এ পুলকের উগ্র সুরা না পারি সহিতে
তবুও কহিব কথা মেলিব এ দৃষ্টি দূরপানে
বেগমান দেহভার আর আমি না পারি বহিতে
তবু চলি লোকে লোকে অদৃশ্যের বাহুর আহ্বানে।"

ইদানীং সুকুমারের সব কথাই জানা যায় শুধু এই একটি মাত্র কবিতা থেকে। অথচ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সুকুমার বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নকালে প্রথম যৌবনের মিতালি বনে বসে যে প্রেমের স্বপ্ন দেখেছিল তা' এমন উচ্ছৃঙ্খল নয়। শান্তিনিকেতনে অবস্থান কালে এই কবিতাটি কাগজে প্রকাশিত হয়—

"পবিত্র সুন্দর করে
ফুটায়ে তুলিব প্রাণে
ধরাতে বহাব নদী
প্রেমের পবিত্র গানে।"

যার ছাত্র জীবনে নির্ম্মল সুন্দর জীবন যাপন করবার এত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, যার মধ্যে এতখানি সংযমের বাঁধন ছিল তা অতি অল্পসময়ের মধ্যেই কী করে সব ভেঙ্গে গেল!...

সুকুমারকে বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নকালে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন—সুকুমারের ভবিষ্যত জীবন যে এমন হবে, তা' কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল।

কোলকাতায় আসবার পর থেকেই সুকুমারের কবিতা নানাপত্রে প্রকাশিত হতে সুরু হয়। সুকুমার বরাবরই কবিতা ভাল লিখতো—তার কবিতার মধ্যে বেশ ওজস্বিতা ছিল—তার কবিতায় প্রাণ ছিল। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিচিত্রা প্রভৃতি বহু পত্রে তার কবিতা ছাপা হয়েছে। কাব্য রচনায় তার যে অসীমশক্তি ছিল—একথা যাঁরা তার কবিতা পড়েছেন তাঁরাই স্বীকার করেছেন। সুকুমার বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে আরও সুনাম অর্জ্জন করতে পারতো।

ইদানীং সুকুমার যথেষ্ট অর্থকষ্ট পেয়েছিল। ঠিক জানিনে সুকুমারের আর্থিক সঙ্গতি কিরূপ ছিল তবে বিশ্বভারতীতে যেভাবে তাকে জীবন যাপন করতে দেখেছি তা'তে তাকে অবস্থাপন্ন বলে কোনদিন মনে হয়নি।

সুকুমার শেষের দিকে কবিতা লিখে অর্থ উপার্জ্জন করবার চেষ্টা করেছিল। দু' তিন খানি "কাগজ" ছাড়া অপর কাগজগুলির অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়—তবু কয়েকটি কাগজের সম্পাদক সুকুমারকে অর্থ দিতেন। অর্থ দেবার সঙ্গতি না থাকলেও তাঁরা সুকুমারকে অর্থ দিতেন... সুকুমারের অবস্থা দেখে অর্থ না দিয়েও উপায় ছিল না...সুকুমারও লেগে থাকতো টাকা চাই-ই। ইদানীং এমনও দেখেছি—দুপুর রৌদ্র...এখনও আহার হয়নি...দু' তিন দিন স্নান অভাবে মাথার রুক্ষ চুল গুলো এলোমেলো ভাবে ছড়ানো... সুকুমার সম্পাদকের আফিসে এসে উপস্থিত—টাকা চাই... দু' তিন দিন সে ফিরেছে, আজ আর ফিরবে না, আজ টাকা দিতেই হবে। একটি কবিতার মূল্য স্বরূপ মাত্র ৩।৪ টাকার জন্য সুকুমারের এই হাহাকার! পেশাদার লেখক-জীবনে এই অর্থের হাহাকার চিরদিন চলে আসছে সকল দেশে, সকল কালে। প্রথম জীবনে গোর্কি থাকতো উপোস করে ...মুসোলিনী পুলের তলায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতো... নুটহামসন্ ট্রাম কণ্ডাক্টরি করতো...এড্গার ওয়েলেস্ ফেরিওয়ালা ছিল...শেলী তিনদিন খেতে পায়নি আর এই দরিদ্র বাংলা সাহিত্যে আর্থিক দুর্দ্দশা যে আরও বেশী হবে তা' আর বিচিত্র কী! ইদানীং কবিতা ছাপা হবার পর সুকুমার সম্পাদকদের কাছে অর্থ চাইতে বাধ্য হতো—কিন্তু সকল সম্পাদক দিতে পারতেন না।

হাঁসপাতালে বসন্তরোগে সুকুমারের মৃত্যু ঘটেছে। অভিভাবক আত্মীয়স্বজনহীন এই সহরে তার হয়তো আর কোন আশ্রয় ছিলনা। সুকুমারকে শেষ সময়ে দেখাশোনা করেছেন তার একটি বন্ধু শ্রীকর্ম্মযোগী রায়।

যাঁরা সুকুমারকে চেনেন তাঁরাই জানেন যে এই তরুণ কবির জীবন কতবড় একটা ট্রাজেডি। সুকুমারের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কথা স্মরণ হলে সত্যই চোখ দুটি ছলছল করে আসে।

মানুষের যৌবন—প্রেমময়ী নারীর আশ্রয় চায়, কোমলতা চায়, প্রেমের পূর্ণতা চায়—কিন্তু সুকুমার যে পথ ধরেছিল সে পথে সে সঞ্চয় করবার মত কিছুই পায়নি—শুধু পাক ঘেটেই তার তরুণ সুন্দর জীবনটিকে নষ্ট করে গেল।

রাজেন্দ্র মিত্র

সাঁতার

শ্রীমনোজ বসু

বাংলাদেশে নদী খাল বিলের অন্ত নাই। সুতরাং এ দেশের লোকের স্বভাবতঃই সন্তরণপটু হইবার কথা। বস্তুতঃ নিম্ন বঙ্গের এমন জায়গার সহিত আমাদের পরিচয় আছে যেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা দেখিলে মানুষ যে জলচর প্রাণীবিশেষ একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

অতএব এই বাংলার মাটি ও জলে শ্রেষ্ঠ সন্তরণবীরদের জন্ম হইবে এমন আশা স্বচ্ছন্দে করা যাইতে পারে। বাস্তবিক আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোক আলো হাওয়ার মতোই সন্তরণ বিদ্যা অতি সহজে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ছোট ছেলে মেয়েরা ডাঙায় যেমন দৌড় ঝাঁপ করে জলেও তেমনি অবাধে সাঁতার কাটে। এটা যে একটা কষ্ট করিয়া শিখিবার কিছু এ ধারণাই কাহারো মনে উঠে না। নদী ও খাল-বিলের সঙ্গে বসতি করিয়া এটা জানা না থাকিলে এ দেশে অর্দ্ধেক পঙ্গু হইয়া জীবন কাটাইতে হয় এবং দিনের মধ্যে অন্ততঃ দণ্ডে দণ্ডে অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা ঘটিতে পারে।

শান্তি বাবু ও শিষ্যমণ্ডলী

কিন্তু আধুনিক পৃথিবীখ্যাত সন্তরণ-বীরদের রীতিনীতির সহিত এই অতি সাধারণ সাঁতার কাটার কোন তুলনাই হইতে পারে না। আমরা সাঁতার কাটি প্রয়োজনের তাগিদে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, সংসারে দিনগুজরান করিতে যেটুকু নহিলে নয় কেবল সেইটুকু মাত্র। কিন্তু নিছক কলা বিদ্যা হিসাবে ইহার চর্চ্চা করিয়া এক প্রকার উচ্চতর আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়—তাহাতে রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষালাভের প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না তাই ইউরোপে যখন সাঁতার দিয়া ইংলিশ চ্যানেল পার হইবার বিপুল প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, ম্যাথিউজ ওয়েব নূতন রেকর্ড করিতে গিয়া অতলে ডুবিয়া মরিলেন (২৪শে জুলাই, ১৮৮৩) তখন এদেশে কোন সাড়া নাই। এমন কি বছর ছয়েক আগেও তের বছরের দুটি মেয়ে বার্গিস ও ফিলিস ৫২ ঘণ্টা ২০ মিনিট অবিশ্রাম সাঁতার দিয়া যখন সমস্ত পৃথিবীর তাক লাগাইয়া দিল তখন আমাদের দেশে ঐ ধরণের কোন উল্লেখযোগ্য সন্তরণবী-

পাই নাই। তারপর এই দুটি মেয়েকে পরাস্ত করিবার কী দারুণ চেষ্টা সুরু হইল! জলের উপর অবিশ্রান্ত কত দীর্ঘকাল সাঁতার কাটা যাইতে পারে সেই শক্তির পরীক্ষা চলিল। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে মিসেস লতিমুর স্কোমেল একাদি ক্রমে ৭২ ঘণ্টা ২মিনিট ৪সেকেণ্ড সাঁতার দিয়া সমস্ত পুরাতন সময়-নির্দ্দেশ (record) ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর মিসেস ক্যাথারাইন নেহুয়া সাঁতার দিয়াছিলেন ৭২ ঘণ্টা ২১ মিনিট। এর চেয়ে বেশী অক্ষ কেহ সাঁতার দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দীর্ঘ সময়ব্যাপী (endurance) সন্তরণ আমাদের দেশেও রীতিমত আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে প্রফুল্ল ঘোষ গত ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন প্রধানতঃ তাহাই ইহার কারণ। অগ্নিকুমার সেনই বোধ হয় এদেশে সর্ব্বপ্রথম দীর্ঘ সময়ব্যাপী সন্তরণের উদ্যম করেন। ১৯২৭ সাল—তখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উপর। কলেজ স্কোয়ারে একাদি ক্রমে তিনি ১৪ ঘণ্টা সাঁতার দিয়াছিলেন। তাহার পর ১৬ বছর বয়সের বালক মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী হেদুয়ায় ১৬ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া অগ্নিকুমারকে পরাভূত করেন। হায়দরাবাদের সফি আমেদ ইহার পরে সাঁতার দেন ২৬ ঘণ্টা।

১৯২৯ সালে প্রফুল্ল ঘোষ সর্ব্বপ্রথম কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে দীর্ঘকাল ব্যাপী সন্তরণে নামিয়াছিলেন। সেবারে তিনি জলে থাকিতে পারিয়াছিলেন মাত্র ২৮ ঘণ্টা। কিন্তু সাঁতারের বিশেষত্ব ছিল এই প্রফুল্লকুমার কেবলমাত্র ভাসিয়া ছিলেন না, অবিরত চলিয়া বেড়াইয়াছিলেন। সেই সন্তরণ-চক্রের হিসাব করিলে দূরত্ব ২৫ মাইলের বেশী হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী ও বীরেন্দ্র পাল ঐ বৎসরেই প্রফুল্ল ঘোষের রেকর্ড ভাঙিয়া যথাক্রমে ২৯ ও ৩২ ঘণ্টা সন্তরণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ের রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ বৎসর কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে একাদি ক্রমে ৫৪॥ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া কলিকাতায় অপূর্ব্ব সাড়া জাগাইয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জলের উপর কেবলমাত্র ভাসিয়া ছিলেন, পরিভ্রমণ করিয়া ঐ দিকের কোন নূতন রেকর্ড করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাসের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩০ সালে প্রফুল্ল ঘোষ যে শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সে কথা দেশবাসী কোন দিন ভুলিতে পারিবে না। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে বাঙালী পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় হইবে এই বিরাট সঙ্কল্প লইয়া বিমুগ্ধ লোকচক্ষুর সম্মুখে তিনি কর্ণ-ওয়ালিস স্কোয়ারে নামিয়াছিলেন। তখন আর্থার রিজো পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তরণবীর বলিয়া সমাদৃত। তিনি
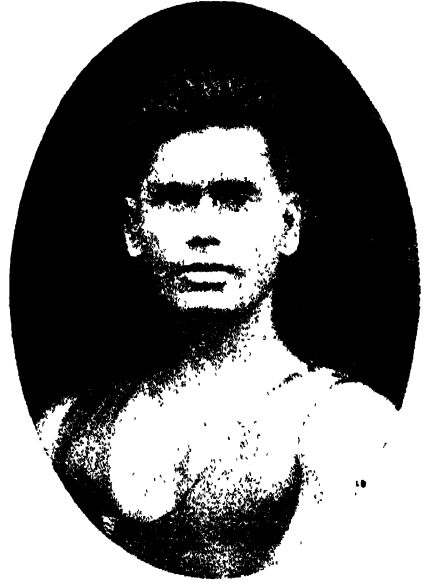
শান্তিপ্রিয় পাল

মেডিটেরেনিয়ানে ৬২ ঘণ্টা সাঁতার দিয়াছিলেন। লতিমুর স্কোমেলের ৭২ ঘণ্টা সাঁতারের সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহের কারণ আছে। প্রফুল্লকুমার ৬৭ ঘণ্টা ১০মিনিট সাঁতার দিয়া আর্থার রিজোকে পরাভূত করেন। জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তরণবীরের আসনে বাঙালী অধিষ্ঠিত হইল কিন্তু একমাস পরেই আর্থার রিজো পুনরায় ৬৯ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া প্রফুল্ল কুমারের রেকর্ড নষ্ট করিয়া দেন। পর বৎসর ১৯৩১ সালেও আর একবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া প্রফুল্ল কুমার জলে নামিয়াছিলেন, কিন্তু সেবারের সন্তরণ কাল আরও ৩৫ মিনিট কম হইয়া গেল।

তা হউক। তবু সাঁতারে বাঙালীর বিজয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রফুল্লকুমার ও অন্যান্য সন্তরণ বীর এই দিক দিয়া জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমরা কোন দিন ভুলিব না। কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বল দীপমালার নীচে অন্ধকারে বসিয়া যে আপন-ভোলা লোকটি নিঃশব্দে আলোর শিখা বাড়াইয়া দিতেছেন বাঙালী জনসাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

ইনি শান্তিপ্রিয় পাল। প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ সন্তরণ বীরদের শিক্ষা দিয়া ইনিই গড়িয়া তুলিয়াছেন—বাংলা দেশে সন্তরণের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে সসম্ভ্রমে ইঁহার নিষ্ঠা ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের উল্লেখ করিতে হয়। দেশকে সমৃদ্ধ ও গৌরবময় করিবার নানাবিধ পন্থা আছে। শান্তিবাবু নিজের ব্যক্তিগত নামযশের কামনা না করিয়া বছরের পর বছর অনাড়ম্বরভাবে এই পথে যে কাজ করিয়া আসিতেছেন তাহার মূল্য অপরিমেয়।

"কেবল সাঁতার-শিক্ষক নহেন, নিজেও তিনি সাঁতারে মহা ওস্তাদ। ওয়াটার পোলো খেলাতে শান্তিবাবুর জুড়ি পাওয়া ভার। বক্সিংএও তাঁহার কৃতিত্ব আছে। কিন্তু সব চেয়ে তাঁহার বড় গৌরব এই যে দেশব্যাপী কলুষতা ও বিলাসের আবহাওয়ার মধ্যে তিনি শক্তির উদ্বোধন করিতেছেন।" তিনি নিজে নির্ধন নহেন—কিন্তু সকলপ্রকার আমোদ ও আরামের জীবন পরিহার করিয়া শক্তির সাধনায় দিনপাত করেন। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব প্রধানতঃ শান্তিবাবুর যত্নে স্থাপিত—এই ক্লাব প্রফুল্ল ঘোষকে গড়িয়া তুলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। পাল্‌স্ বক্সিং ইনষ্টিটিউসন—বক্সিং শিখবার আখড়া—ইহাও শান্তিবাবুর কীর্ত্তি। কলিকাতা স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচারের শান্তিবাবু একজন বিশিষ্ট অবৈতনিক শিক্ষক। বর্ত্তমানে শিয়ালদহের বিখ্যাত সিনেমা হাউস ছবিঘরের পরিচালনায় তিনি নিজেকে নিয়োগ করিয়াছেন। শান্তিবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত প্রতিষ্ঠানটির নির্ম্মাতা।

১৯১৭ সালে প্রফুল্ল ঘোষ যখন শান্তিবাবুর কাছে আসেন তখন তিনি সন্তরণে একেবারে আনাড়ী। সমস্ত শক্তি দিয়া শান্তিবাবু তাঁহাকে শিখাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ একের পর এক এইরূপ বিজয়ী শিষ্য গঠন করিয়া শান্তিবাবু নিজে ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে পাশে দাঁড়াইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক রীতিতে সাঁতার শিক্ষা দিতে তাঁহার জুড়ি বোধ হয় বাংলায় আর নাই। শিষ্যভাগ্যে শান্তিবাবু প্রচুর গর্ব্ব বোধ করিয়া থাকেন। প্রফুল্ল ঘোষ ছাড়াও জে কে গোস্বামী, এস গোস্বামী, এস দত্ত, কে, পি, রক্ষিত, জি দাস, এন ঘোষ, সুকুমার ভড় প্রভৃতি অনেকেই শান্তিবাবুর শিষ্য।

১৯৩১ সালে প্রফুল্ল ঘোষের সাঁতারের পরেই আগষ্ট মাসে শান্তিবাবু আবার সুকুমার ভড়কে শিক্ষিত করিয়া জলে নামাইয়া ছিলেন। সুকুমার ৫০ ঘণ্টা ১০মিনিট পরে জল হইতে উঠেন। শান্তিবাবু শিষ্যদের দিয়া পৃথিবীর সাঁতারের রেকর্ড ভাঙিবার যে স্বপ্ন দেখেন আজও তাহা সফল হয় নাই। প্রফুল্ল ঘোষকে দিয়া বোধ হয় আর বেশী কিছু ঘটিয়া উঠিবে না। কিন্তু সুকুমারের বয়স অল্প, তাঁহার সম্বন্ধে আশা পোষণ করিতে ক্ষতি নাই। শান্তিবাবুর শিক্ষায় আগামী বৎসর সুকুমারকে পুনরায় নূতন উদ্যমে জলে নামিতে দেখা আদৌ অসম্ভব নহে।

আর একটা গোপন খবর দিয়া রাখি। সম্ভ্রান্ত বাঙালী মহিলাকে দিয়া দীর্ঘ সময় ব্যাপী (endurance) সন্তরণের কোন প্রচেষ্টা ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। শান্তিবাবু মফঃস্বল হইতে একটি মহিলা আনাইয়া তোড়জোড় করিতেছেন। ইহার সমস্ত খরচই তাঁহার নিজের। আশা করা যায়, মহিলাটির সন্তরণের রেকর্ড আমাদিগকে চমকিত করিবে। আগামী বছর তাঁহাকে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে নামাইবার আয়োজন চলিতেছে।"

মনোজ বসু

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা

নিজেদের সভ্যতা, ভাষা এবং ধর্ম্ম প্রচারের ঝোঁক সব মানব সমাজের মধ্যে চিরকাল ধরিয়া আছে। পাশ্চাত্য জাতি সমূহের রাজনীতিক শক্তি, সুদৃঢ় অধ্যবসায়, কার্য্যে শৃঙ্খলা, অক্লান্ত উদ্যম তাঁহাদের এই চেষ্টাকে অচিন্তনীয় সাফল্য দান করিয়াছে। পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভাব, ভাষা, সাহিত্য এবং সভ্যতা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী আধিপত্য লাভ করিয়াছে, এবং অল্লাধিক পরিমাণে পৃথিবীর সকল জাতিকেই পাশ্চাত্যধর্ম্মী করিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তৃত মিলন ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মিশরীয়, চৈনিক, জাপানী, ভারতবাসী, তুর্কী, জাভানিজ, নিগ্রো, পারসিক প্রভৃতি সকল জাতিই মিলিত হইয়াছে

কিন্তু অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে, কোনও সভ্য এবং শক্তিশালী জাতি অপরের কুক্ষিগত হইতে চায় না। সেইজন্য সংখ্যাল্প, বিচ্ছিন্ন এবং সভ্যতার আলোক হইতে বঞ্চিত আদিম জাতিগুলির মধ্যেই প্রধানতঃ প্রচার কার্য্য চলিয়া থাকে।

যে সকল খৃষ্টান মিশনারী এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন ধর্ম্ম প্রচার তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, অনেকেই মানব-প্রীতির জন্য এই সেবা কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করেন। মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইঁহাদের নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

ভারতবর্ষের আদিম এবং পার্ব্বত্য জাতিগুলির মধ্যে ইঁহাদের কার্য্য অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা, অনেক পরিমাণে যে সফল হইয়াছে, তাহা বলিতেই হইবে।

পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অসভ্য জাতিগুলির সহিত ভারতের আদিম জাতিগুলির একটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। ইহারা একটা বৃহৎ সভ্যতার প্রতিবাসী এবং সভ্য-মানব অধ্যুসিত দেশের অধিবাসী। ভারতীয় মহাজাতির সহিত ইহাদের ভাগ্য অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অন্য সভ্যতা বা অন্য জাতির নিকট হইতে ইহারা যতটুকু গ্রহণ করিবে, তাহা ভারতীয় মহাজাতির অংশ স্বরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই বিদেশীয় প্রচার সংঘগুলির প্রচেষ্টার ফলে এই দিক দিয়া ইহারা যদি কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে তবে, তাহার দায়িত্ব বিদেশী প্রচারকদের নহে। আমাদের উদ্যমহীন জড়ত্ব এবং নিজেদের গণ্ডীর বাহিরের দেশের লোকের প্রতি আত্মঘাতী মনোভাব ইহার জন্য দায়ী।

ইহারা ভারতের ভবিষ্যৎ সামাজিক ও রাজনীতিক জীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে এবং সময় থাকিতে এদিকে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে না পারিলে, হয়ত কালে ইহারা আমাদের নানা কঠিন সমস্যার অন্যতম হইয়া উঠিবে।

ইহারা সংখ্যায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ। যাহারা অন্য কোনও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ঠিক ভাবে ধরা হইলে এই সংখ্যা আরও অনেক বর্দ্ধিত হইবে। কয়েকটি বড় দেশের কথা বাদ দিলে পৃথিবীর অধিকাংশ স্বাধীন দেশের লোক সংখ্যা ইহার চেয়ে কম। ইহারা বহু ছোট ছোট জাতি ও ভাষায় বিভক্ত বলিয়া, ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের এতটা ঔদাসীন্য সম্ভব হইয়াছে।

ইহারা এই প্রকার ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত বলিয়াই প্রত্যেক বড় জাতি, প্রত্যেক বড় সভ্যতা এবং প্রত্যেক বড় ভাষা ইহাদের দ্বারা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। কাজেই, এ সম্বন্ধে আমাদের শুধু মাত্র সজাগ হইবার নয়, বিশেষ উদ্যমের সহিত কাজ করিবার দিন আসিয়াছে। বাঙ্গালীদেরও এ সম্পর্কে এই কথাটা মনে

রাখিতে হইবে যে তাঁহাদের প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র বিদেশীয়দের সহিত নহে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও নিশ্চেষ্ট হইয়া নাই। যাহাতে বাংলার এবং বাংলার সন্নিহিত প্রদেশ সমূহের অনার্য্য জাতীয় লোকেরা সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গালী হইয়া উঠিতে পারে, তাহার জন্য আমাদের অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

আসাম, সভ্যতা, ভাষা ও অনেকাংশে জাতির দিক দিয়া সর্ব্বতোভাবে বাংলার অংশ। এখানকার অনুন্নত পার্ব্বত্যজাতিগুলির প্রতি বাঙ্গালীর বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বাংলায় অনেকগুলি সেবা ও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান আছে। তাঁহারা যদি এই সকল স্থানে কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া এই সকল জাতির সেবা ও উন্নয়নে আত্ম-নিয়োগ করেন, তবে, লোক-সেবা ও ধর্ম্ম প্রচারের সহিত জাতির ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে ও যথেষ্ট সাহায্য করিবেন।

খাসি পাহাড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্য

খাসি পাহাড়ের পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন যে কার্য্য করিতেছেন তাহা প্রশংসনীয় ও আদর্শস্থানীয় এবং সকলের সহযোগিতা ও সাহায্য পাইবার যোগ্য। খাসি পাহাড় রামকৃষ্ণ আশ্রম (চেরাপুঞ্জী পোঃ) হইতে স্বামী প্রভানন্দ অর্থের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। আশা করি, তাঁহার আবেদন ব্যর্থ হইবে না।

ইঁহারা খাসি পাহাড়ের শেলাপুঞ্জী নামক স্থানে বাঙ্গলা শিখাইবার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। অন্য জাতির মধ্যে বাঙ্গালীরা বঙ্গভাষা প্রচলনের বিশেষ কোনও ধারা-বাহিক বা প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা করেন নাই। অন্য জাতির লোকদের নিজেদের ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে গেলে, নিজেদের ভাষা তাহাদের শিখান বিশেষভাবে দরকার। বিশেষ করিয়া এই সকল অনার্য্য জাতীয় লোকদের ভারতবর্ষের কোনও বড় ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। যাহাতে বাংলা, আসাম এবং ইহাদের সন্নিহিত প্রদেশের এই সকল লোক বাংলা শিখিবার পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয়, বাংলা শিখিবার প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা তাহারা বুঝিতে পারে এবং এই ভাষার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, আত্মরক্ষা ও আত্ম সম্প্রসারণের জন্য, তাহার ব্যবস্থা বাঙ্গালীকে করিতেই হইবে।

শেলাপুঞ্জী স্থানটিতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল; আশ্রমের তৎপরতায় তাহা দূর হইয়াছে। এখানে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং চেরাপুঞ্জীতে এই সকল জাতির বালকদের জন্য একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইঁহারা শুধুমাত্র শিক্ষাদান ও সেবার কার্য্যাদি করেন, কাহাকেও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বলেন না। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা এখানে এই প্রকারের কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত এই আশ্রমের কর্ম্মীদের এই পার্থক্যটি বিশেষ ভাবে পর্ব্বতবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহারা অনেকেই সেচ্ছায় অবশ্য হিন্দু হইয়াছে।

ইঁহারা নানাদিক দিয়া ইহাদের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। মাতৃ ভাষা রক্ষা করা এবং তাহার সমৃদ্ধি সাধন করা প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্যের জন্য অত্যাবশ্যক। রামকৃষ্ণ আশ্রমের কর্ম্মীগণ যে শুধু ইহাদের বাংলা শিখাইতেছেন, তাহা নহে। তাঁহারা খাসি ভাষায় একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পুস্তকাদি প্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন।

কালা আদমিকে অধিক সম্মান করা ভাল নহে

মিঃ জেমস্ ষ্টুয়ার্ট নামক দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের জনৈক ভূতপূর্ব্ব উচ্চতন কর্ম্মচারী, রয়াল ইউনাইটেড্ সার্ভিসেস্ ইনষ্টিটিউসনের এক সভায়, ইংরেজ পরিবারে কালা আদমিরা ইংরেজ পরিবারে যেরূপ সাদর অভ্যর্থনা এবং সযত্ন ব্যবহার পায়, তাহার নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইংরেজ কৃষ্টি এবং সংস্কারের সহিত সম্পর্কহীন লোকদের উপর ইহার ফল ভাল হইবে না, এবং ইংরেজ সমাজও ইহার প্রতিক্রিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবে না।

কালো লোকদের সম্বন্ধে শ্বেত জাতির অনেক লোকের যে এইরূপ হীন মনোভাব আছে, তাহা জানা কথা। কিন্তু তাহা হইলেও, প্রকাশ্য সভায় এরূপ উক্তি একটু আস্ফালনে

মত শুনায় এবং বক্তার নির্লজ্জ স্থূলতার পরিচয় প্রদান করে। শ্রোতাদের রুচিও প্রশংসনীয় নহে।

অন্য কোনও জাতির লোক কোনও সভ্য জাতির নিকট সংস্পর্শে আসিলে, কোনও পক্ষেরই ক্ষতির আশঙ্কা নাই। এই আশঙ্কার উৎপত্তিস্থল অন্যত্র। পৃথিবীর শ্বেত জাতিরা অশ্বেত জাতির বহু কোটি লোকের শ্রমশক্তি, অর্থশক্তি এবং ক্রয়শক্তিকে ভোগ এবং সুখসুবিধার জন্য নিজেদের কাজে লাগাইতেছেন। ইউরোপ আমেরিকার অতি সমৃদ্ধির পশ্চাতে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের বঞ্চনা এবং দুঃখের ইতিহাস আছে। বঞ্চিত জাতিদের মধ্যে যাহাতে কোনও প্রকার আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হইতে পারে, এই প্রকারের সকল কাজই ইউরোপের স্বার্থের পক্ষে হানিকর। ইহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিলে অথবা ইউরোপের পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিলে, পাছে ইহাদের মধ্যে এই আত্ম-সম্মান-বোধ জাগ্রত হয় এবং শ্বেত জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিজের হীনতা সম্বন্ধে ভুয়া ধারণা অপসারিত হয়, আসল আশঙ্কা হইতেছে ইহাই।

খৃষ্টান সম্প্রদায় ও মিশ্র নির্বাচন

রাজনীতিক মতামত এবং স্বার্থ লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। তাহা হইলেও, আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে ইহাকেই ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভাগাভাগি করা হইল। সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের পাছে স্বার্থহানি ঘটে ইহার মূলে এই আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এদেশে খৃষ্টানেরা অতিশয় ক্ষুদ্র সম্প্রদায়। দেশের সাধারণ লোকে আজও তাঁহাদিগকে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই। দেশের অধিকাংশ লোকের সহিত তাঁহাদের রীতিনীতি আদর্শের মিল নাই। তাহার পর তাহারা কতকটা রাজানুগৃহীত। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদেরই আত্মরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাঁহারা তাহা হন নাই।

জাতীয়তার পরিপোষক মত ইঁহারা পূর্ব্বেও ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ডক্টর এস-কে দত্তের সভাপতিত্বে নাগপুরে নিখিল ভারত খৃষ্টান সম্মিলনের যে উনবিংশ অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতে দশ বছরের জন্য সদস্যপদ রক্ষিত রাখিয়া মিশ্র নির্ব্বাচনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয়, সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা-রহিত জাতীয়তার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, কোনও প্রকারের বিশেষ ব্যবস্থা তাঁহারা চান না, এবং এই দেশবাসীরূপেই তাঁহারা নিজেদের স্থান গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

ভারতবর্ষে জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'

আধুনিক সভ্যতার তীব্র সমালোচক বিশ্ববিখ্যাত মনীষি জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' জাহাজে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলিতে চাহেন নাই। শ' কখনও কাহারও প্রিয় কথা বলিতে পারেন না। কাজেই, তিনি কিছু বলিলে তাহা যে, অনেকেরই অপ্রিয় হইত তাহা, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বম্বের প্রেস প্রতিনিধিদের উত্তরে তিনি এইটুকুমাত্র বলিয়াছিলেন যে, ব্রিটিস সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হইতেছে ভারতবর্ষ; ব্রিটিস সাম্রাজ্য বলিতে ভারতবর্ষকেই বুঝায়। তাঁহার মতে ভারতীয়জনমণ্ডলী শিক্ষিত হইলে এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ সাধিত হইলে, ভবিষ্যতে ইহা খুবই সম্ভব যে, ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভারতবর্ষ ব্রিটিস সাম্রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রধান স্থান। এই সাম্রাজ্যে সকলের অধিকার সাম্যের প্রতিষ্ঠা হইলে, প্রভুত্ব ও ক্ষমতা স্বভাবতঃই ভারতবাসীর হাতে আসিয়া পড়িবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইঁহাকে বিশ্বভারতীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ অসামর্থ্যের জন্য ইনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'

মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে ইনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার ন্যায় লোক কয়েক শতাব্দির মধ্যে একবার আবির্ভূত হন। এরূপ একজন লোক যে বর্ত্তমানে আছেন, ইহা বিশেষ আশা ও আনন্দের কথা।

নিরস্ত্রকরণ অর্থহীন

নিরস্ত্রকরণকে শ' একেবারেই অর্থহীন বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জাতিদের নিরস্ত্র করিলে, তাহারা মুষ্টি যুদ্ধে লাগিয়া যাইবে। লোকেরা পরস্পরকে হত্যা করিতে ভালবাসে এবং যে হত্যা করিতে পারে তাহাকে প্রশংসা করে। ব্যঙ্গ ছলে তিনি বলিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী যদি ৬০লক্ষ লোককে হত্যা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সকলে তাঁহার কথা শুনিত। কথাগুলি ব্যঙ্গ হইলেও, যুদ্ধ সম্বন্ধে মানুষের আসল মনোভাবটি ইহাতে ভালভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যুদ্ধের কারণ অস্ত্র নহে। স্বার্থের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন এবং যুদ্ধের প্রবৃত্তি হইতে অস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। যখন মানুষের অস্ত্র ছিল না, অথবা অস্ত্রের এতদূর উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই, তখনও পৃথিবীতে যুদ্ধের বিরাম ছিল না। তখনকার দিনের ন্যায় এখনও গায়ের জোরকেই লোকে সব চেয়ে বেশী সম্মান দিতেছে। শিক্ষা এবং ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্বোধনের দ্বারা মানুষের এই মনোভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে, পৃথিবী হইতে যুদ্ধের অবসান হইবে না।

কোনও সম্প্রদায়ের বিধিবদ্ধ সংখ্যাধিক্য অন্য বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষে পরাধীনতার নামান্তর

পরাধীনতায় শুধু নানাপ্রকার দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা ও ক্ষতি আছে বলিয়াই মানুষ যে স্বাধীনতা চায় তাহা নহে। পরাধীনতায় যদি ঐ সকল দুঃখ না থাকিয়া সুখের ব্যবস্থাও থাকিত তাহা হইলেও মানুষ স্বাধীনতা চাহিত। জেল খানায় যতই সুখে থাকা যা'ক, তাহার চেয়ে লোকে বাহিরের দুঃখকে নিঃসন্দেহ বরণীয় মনে করিবে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বা নিজের ব্যবস্থা নিজে করিবার ইচ্ছা মানুষের সহজাত ও তাহার মনুষ্যত্বের পরিপোষক।

স্বাধীনতার অভাবে আমাদের পার্থিব ক্ষতি যতটুকু হয়, নৈতিক এবং মনুষ্যত্ব হানির অনিষ্ট তাহার চেয়ে কম হয় না। কোনও দেশ স্বাধীন হইয়াও যদি স্বেচ্ছাচারী শাসন তন্ত্রের অধীন থাকে তবে, পরাধীনতার এই সকল দুঃখ সমানই বর্ত্তমান থাকে। যদি দেশের কোনও একটি সম্প্রদায় রাজ ক্ষমতা পরিচালনের ভার পায়, তাহা হইলে, দেশের অন্যান্য সম্প্রদায় ঐ প্রকার অনিষ্টের হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে যদি কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক দলাদলি না থাকে, তাহা হইলে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা যে সম্প্রদায়েরই লোক হউন না কেন, তাঁহারা সমগ্র জাতির প্রতিনিধি বলিয়াই গণ্য হন; সকল শ্রেণীর দেশবাসীর নিকট তাঁহাদের দায়ী থাকিতে হয় এবং জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ভোটদাতার দ্বারস্থ হইতে হয়। কাজেই, কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে তাকান তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

কিন্তু, কোনও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন, দেশের সকল লোকের নিকট তাঁহাদের দায়িত্ব থাকিবে না এবং নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহারা অনেক সময়েই জাতীয় মঙ্গলকে উপেক্ষা করিবেন। কোনও আইন বা মন্ত্রী সভায় যদি ইঁহাদের সংখ্যাধিক্য থাকে তবে, সমগ্র দেশের অথবা দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ সহজেই উপেক্ষিত হইতে পারিবে। হয়ত বৈদেশিক অধীনতা হইতে স্বার্থহানি কিছু কম ঘটিতে পারে, কিন্তু, নৈতিক অবনতি কিছুমাত্র কম ঘটিবে না।

সংখ্যা ন্যূন সম্প্রদায়গুলির হস্তে শাসন ক্ষমতা কিছুমাত্র না থাকায়, তাহাদের আত্ম বিশ্বাস নষ্ট হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হইলে নিজেদের সুখ সুবিধার অভাব বা স্বার্থহানি ঘটিতে পারে বলিয়া উচিৎ কাজ করিবার বা উচিৎ কথা বলিবার সাহস ইঁহারা হারাইবেন। অন্য সম্প্রদায়কে কিছু খোসামোদ করিয়া চলিতে হইবে। সংখ্যা-বহুল সম্প্রদায়ের লোকেরা, হাতে ক্ষমতা পাওয়ায় স্বভাবতঃই একটু অহংকৃত হইবেন এবং প্রতিবেশী অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের কিছু কৃপার চক্ষে দেখিবেন। কোনও অনভিপ্রেত সাম্প্রদায়িক বিরোধে, সংখ্যান্যূন সম্প্রদায়ের লোকেরা সুবিচার পাইবেন না এবং আরও অন্যান্য প্রকারের অসুবিধায় পতিত হইবেন। কাজেই রাষ্ট্রে কোনও সম্প্রদায়ের বিধিবদ্ধ সংখ্যাধিক্য অন্য বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষে পরাধীনতারই নামান্তর।

বাংলার পাট শুল্কের টাকা বাংলাকে প্রত্যর্পণ করা হউক

ফেডারেল ফাইনান্স কমিটিতে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, বাংলার পাট-শুল্ক হইতে প্রাপ্ত টাকা বাংলাকে ফিরাইয়া দেওয়া সম্পর্কে বিশেষ যোগ্যতার সহিত বাংলার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ব্রিটিস প্রতিনিধিদের মত কতকটা অনুকূলে আনিতেও ইনি সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় ভারতীয় প্রতিনিধিদের অধিকাংশ ইহার বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। অন্য প্রদেশবাসীদের নিকট হইতে বাংলা যে কতটা সুবিচার পাইতে পারেন, ইহা তাহার একটি নমুনা।

প্রস্তাবিত মন্দির প্রবেশ আইনের ভাগ্য

অস্পৃশ্যদিগের মন্দির প্রবেশের বাধা এবং তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অপারগতা দূরীকরণের জন্য মাদ্রাজ আইন সভায় দুইটি এবং কেন্দ্রিয় আইন সভায় একটি বিল সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের অভিমত জানিবার জন্য দেশের লোক বিশেষ উদ্বেগের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল। ব্যাপারটি কোনও বিশেষ প্রদেশের নহে এবং মাদ্রাজের যে সকল মন্দির সম্বন্ধে এই বিল কার্য্যকরী হইবে, মাদ্রাজে অবস্থিত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তাহা সকল ভারতের হিন্দুদের, এই যুক্তিতে সরকার প্রথমোক্ত বিল দুইটি সম্বন্ধে অনুমতি প্রদান করেন নাই। কেন্দ্রীয় সভার বিলটিও, আইন সভার বাহিরের দেশের লোকের মতামত অবগত হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে। মন্দির প্রবেশ সম্পর্কিত একটি বিলও কেন্দ্রীয় আইন সভায় উপস্থিত করা হইবে।

চীন জাপানের বিরোধ

জাপান সহসা Sanhaikawan অধিকার লওয়ায় চীন জাপানের বিরোধ আবার তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। শহরটি পীত সমুদ্রের ধারে অবস্থিত; এখানে আসিয়া চীনের প্রাচীর শেষ হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে জাপানীরা এইবার চীনের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিল।

চীনের সহিত জাপানের এই বিবাদ মাঞ্চুরিয়া লইয়া [illegible] সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হয়। সাউথ্ মাঞ্চুরিয়ান রেলওয়ের জাপানী সেনাদল এক রাত্রিতে মুকডেনের চীন সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিল।

নিজের কর্তৃত্বাধীনে জাপান মাঞ্চুরিয়াকে একটি নামমাত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিল এবং চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাটকে ইহার ক্ষমতাবিহীন রাজা করিয়া রাখিল। চীন এই অপমান ও ক্ষতির কোনও প্রকার প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া, জাতি সংঘের নিকট সুবিচারের জন্য আবেদন জানাইল।

জাতি সংঘের অবস্থা পূর্ব্বেই বিশেষ বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছিল। জাপান এই যুদ্ধবিরোধী সংঘের সভ্য হইয়াও, অপরের রাজ্য অধিকার করিল, এবং জাতি সমূহের মধ্যে শান্তি ভঙ্গের কারণ হইয়া উঠিল। অথচ জাপান প্রথম শ্রেণীর শক্তি; প্রশান্ত মহাসাগরে তাহার শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চোখ রাঙ্গাইয়া তাহাকে কথা শুনান সম্ভব নহে। তাহার পর জাপানকে খুব দৃঢ়ভাবে এই কথা বলিবার নৈতিক শক্তিও এই সংঘের ছিল না। কারণ ইহার সভ্য সকল শক্তিশালী জাতিই সাম্রাজ্যবাদী, এবং দুর্ব্বলতর জাতিদের পীড়ন করিয়াই তাঁহারা শক্তিশালী হইয়াছেন।

যাহা হউক, ইঁহারা সকল ব্যাপার অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য বিভিন্ন দেশের লোক লইয়া গঠিত একটি নিরপেক্ষ কমিসন প্রেরণ করেন। আর্ল অব লিটন্ এই কমিশনের নেতৃত্ব করেন। এই কমিশন্ ঘটনাস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সাংহাইয়ে চীন জাপানে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। চীন গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিকারে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু, ক্যাণ্টনের উসাং দুর্গের সৈন্যদল, বিশেষ বীরত্বের সহিত জাপানের অগ্রগমনে বাধা প্রদান করিল এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া জাপানের পক্ষে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। চীনের অভ্যন্তরে জাপানীদের আধিপত্য বিস্তারের এই চেষ্টা আমেরিকাকে বিশেষ বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল নানা প্রকার কারণে মাত্র আট সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধ স্থগিত হইল।

জাপানের ক্রম বর্দ্ধমান লোকসংখ্যা, শক্তি, সভ্যতা ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সহিত বর্দ্ধিত প্রয়োজন, তাহার পক্ষে ঔপনি-

বেশিক বিস্তার অপরিহার্য্য করিয়া তুলিয়াছে। মাঞ্চুরিয়ার ভৌগলিক অবস্থান, স্বল্প জন সংখ্যা, অব্যবহৃত এবং আজও পর্য্যন্ত অনায়ত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এই জন্য জাপানকে বিশেষভাবে লুব্ধ করিয়াছে।

মাঞ্চুরিয়ার আয়তন ৩৮০,০০০ বর্গ মাইল এবং ইহার জনসংখ্যা তিন কোটি। মাঞ্চুরিয়া প্রদেশটি ভৌগলিক হিসাবে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং অধিবাসীর দিক দিয়াও ইহার তিন কোটি লোকের মধ্যে দুই কোটি আশী লক্ষই হইতেছে চীনা। এখানকার জাপানীর সংখ্যা মাত্র ২৩০,০০০। কাজেই, মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের অনেক টাকা খাটিতেছে এবং মাঞ্চুরিয়ার উন্নতি সাধনে জাপান অনেক সহায়তা করিয়াছে প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদিদের মামুলি কৈফিয়তের উপর নির্ভর করিয়া জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার সমর্থন করা যায় না।

চীন-জাপান বিরোধের আরম্ভ হইতে অধুনা পর্য্যন্ত জাপানী সেনা, শান্তিপ্রিয় সাধারণ কাজ কর্ম্মে লিপ্ত চীনাদের উপর অনেক অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছে।

জাপানের জাগরণের পর এবং বিশেষ করিয়া রুষজাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের পর হইতে সকল প্রাচ্যদেশবাসীই জাপানের গৌরবে গৌরব বোধ করিতেছিলেন। তাঁহারা তখন বুঝিতে পারেন নাই যে প্রাচ্যের শান্তি এবং স্বাধীনতার পক্ষে জাপানই সব চেয়ে বড় শত্রু হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমানে, জাতিসংঘ অবশ্য জাপানের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে একটু দৃঢ়তা দেখাইতেছেন। জাপানও আবার উত্তরে, প্রয়োজন হইলে জাতিসংঘের সংস্রব ত্যাগ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে।

বাংলার অনুন্নত শ্রেণী

সরকার এতদিন পরে বংলার অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত জাতিগুলির তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে নাই।

আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে দলাদলি হইয়াছে ধর্ম্ম লইয়া। তাহার পর একই ধর্ম্মের মধ্যে যখন উপরিভাগের সৃষ্টি হইল, তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে, এই দুই বিভাগেরই মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে এবং ইহার প্রত্যেক দলভুক্ত ব্যক্তিদের স্বার্থ অনেকাংশে এক প্রকারের।

এই বিভাগ যেরূপে করা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, অনুন্নত সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর স্বার্থ, জীবিকা, শিক্ষা, রাজনৈতিক অগ্রবর্ত্তিতা এবং সামাজিক অবস্থা এক প্রকারের নহে। উন্নত সম্প্রদায়দের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আবার অনুন্নত সম্প্রদায়ের অনেক শ্রেণীর সহিত উন্নত সম্প্রদায়ের অনেক শ্রেণীর ঐ সকল বিষয়ে মিল আছে। বাংলার দুইটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় নমঃশূদ্র এবং মাহিষ্যদিগকে দুই দলে ফেলা হইয়াছে। অথচ, এই দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থা, বৃত্তি এবং স্বার্থ প্রায় একই প্রকারের। পশ্চিম বঙ্গের কতকাংশে মাহিষ্যেরা ধনী এবং শিক্ষিত হইলেও অন্য সর্ব্বত্র ইঁহাদের প্রধান বৃত্তি কৃষি; নমঃশূদ্রদের মধ্যের অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোককে বাদ দিলে ইঁহাদেরও কৃষক জাতি বলা চলে। ইঁহাদের এক দলের স্বার্থ যদি উন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া রক্ষিত হইতে পারে, তবে, অন্যদলেরই বা হইবে না কেন, তাহা বুঝা কঠিন।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে যাহাদের ধরা হইয়াছে, তাহাদের অর্থ ও শিক্ষার অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ এবং উন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা তাহাদের স্বার্থ ভালভাবে রক্ষিত হইবে না, তাহা হইলে উন্নত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দুই একটি শিক্ষা প্রভৃতিতে অগ্রসর শ্রেণীর কথা বাদ দিলে, অন্য সকলের স্বার্থ রক্ষিত হইবে কি প্রকারে। ইহারা অনুন্নত অনেক শ্রেণীর চেয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী।

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে বৈষম্য আছে, তাহা অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও আছে। ইঁহাদের কোনও এক শ্রেণীর লোক যদি ইঁহাদের অন্য সকল শ্রেণীর স্বার্থ, এই বৈষম্য সত্ত্বেও দেখিতে পারেন, তবে, উন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুরাই বা তাহা পারিবেন না কেন? বরং নানাপ্রকার কার্য্যের দ্বারা তাঁহারা ইহার পূর্ব্বেই এই যোগ্যতা এবং সদিচ্ছার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

তাহার পর অনুন্নতদের মধ্যে সংখ্যা ভূয়িষ্ট শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ সুবিধাগুলি ভোগ করিবেন এবং নিজেদের ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীকে এই অনুন্নত অবস্থায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন।

ইহা ব্যতীত, যে সকল শ্রেণীকে অনুন্নত বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাঁহারা সকলে এই হীনাবস্থা মানিয়া লইয়া রক্ষা কবচের আশ্রয় চান কি না, তাহাও বিশেষভাবে জানা দরকার। অনেক সম্প্রদায় ত বেশ দৃঢ়ভাবে নিজেদের অনুন্নতত্ব অস্বীকার করিতেছেন। যাঁহারা করিতেছেন না, তাঁহাদের নেতা এবং প্রধান ব্যক্তিরা নিজেদের কোনও প্রকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, চেষ্টা করিয়া কোনও প্রকার বিকৃত জনমতের সৃষ্টি করিয়াছেন কি না, তাহাও দেখিতে হইবে।

সুশীলকুমার বসু

পুস্তক পরিচয়

মঞ্জরী—গান ও স্বরলিপির বই। প্রণেতা শ্রী দত্ত। মূল্য পাঁচ সিকা। প্রাপ্তিস্থান :—সকল প্রধান পুস্তকালয় ও গ্রন্থকারের নিকট ১০৩।৫, বকুলবাগান রোড ; ভবানীপুর ; কলিকাতা।

এই বইখানির সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে একটু গোড়ার কথা বলিতে চাই। সে আজ প্রায় আট বৎসরের কথা—উদীয়মান কবি হিসাবে রামেন্দু বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। তিনি আমায় কয়েকটি গান পড়িয়া শোনান এবং গানগুলি আমার খুব ভাল লাগে। রচনার লালিত্যে ও সরলতায় রামেন্দু বাবুর গানগুলি আমায় মুগ্ধ করে। সেই হইতে তাঁহার সহিত আমার অন্তরের সৌখ্যের সঞ্চার হয়। রামেন্দুবাবুর রচিত বহুগান আমি গ্রামোফোন রেকর্ডে ও রেডিয়োতে এবং অনেক সভা-সমিতিতে গাহিয়াছি ও এখনো গাহিয়া থাকি ; সেগুলি আমার ভাল লাগে বলিয়াই গাই।

মধ্যে আমি একবার রামেন্দুবাবুকে দিয়া প্রায় পঞ্চাশটি হিন্দি ও উর্দ্দু গানের (ভজন, গজল, ঠুংরি প্রভৃতি) ঠিক অনুরূপ বাংলা গান রচনা করাইয়া লইয়াছিলাম। হিন্দি বা উর্দ্দু মূল গানগুলি একবার একসঙ্গে শুনিয়া লইয়া গিয়া অতি অল্প কয়েকদিন পরেই ইনি যখন আমায় একসঙ্গে সবগুলি গানের বাংলা রচনা আনিয়া দিলেন তখন আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। আরও বিস্মিত হইলাম যখন দেখিলাম যে প্রত্যেক গানটি নিখুঁৎ ভাবে মূল গানের সুরে গাওয়া যায়। এমন কি অধিকাংশ গানে মূল গানের ভাবার্থও পাওয়া গেল। রামেন্দুবাবুর গান রচনার শক্তি ইহাতেই সম্যক্ প্রতীয়মান হয়।

রামেন্দু বাবুর গানের আর এক বিশেষত্ব এই যে তাঁহার গানগুলি আধুনিক বাংলা গান হিসাবে আদৃত হইলেও সকলের সম্মুখেই গাওয়া চলে। গানগুলির রুচি সর্ব্বত্র মার্জ্জিত। মঞ্জরীর মধ্যে তাঁহার বাছাই করা ৩৬টি গান দেওয়া আছে—সুতরাং "মঞ্জরী" যে সকলেরই প্রীতি ও আদর লাভ করিবে ইহাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। যাঁহারা রামেন্দুবাবুর গানের সুর-শিক্ষার্থী তাঁহারা আমার নিকট আসিলে আমি সর্ব্ব সময়ই সানন্দে তাহা শিখাইতে প্রস্তুত আছি। আমি আশা করি আমার নিকট রামেন্দু বাবুর আরো যে সকল গান দেওয়া আছে, মঞ্জরীর মত শোভন সংস্করণে, স্বরলিপি সমেত, আর একখানি পুস্তকে তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। "মঞ্জরী" সঙ্গীতপ্রিয় সমাজে আদৃত হইলেই আমাদের সে আশা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবে না। ইতি—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
(অন্ধ গায়ক)

মহামিলন——স্কুলের--ছাত্র--ছাত্রীদের নাটক। শ্রীশৈলেশ্বর বসু সার্ব্বাধিকারী প্রণীত। প্রকাশক ডি, এম্, লাইব্রেরী। ৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

লেখক ভূমিকায় জানাইয়াছেন—তিনি এই নাটক খানা প্রথমে ছাত্রীদিগের জন্য লিখিতে সুরু করিয়া পরে কোনও কারণে মত পরিবর্ত্তন করিয়া ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের উপযোগী করিয়া লেখেন। "ছেলেদের জন্য লিখিত" মার্কামারা বাজারের নাটকে যাহা যাহা দেখিতে পাওয়া যায়-রাজা রাণীর লম্বা বক্তৃতা, গুরু-মহাশয়ের সহিত পাঠশালার বালকদিগের গ্রাম্য রসিকতা, কবির "কাতব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" বলিয়া কাতর আবৃত্তি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গান এবং শিক্ষক মহাশয় দিগের তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য উপদেশ, কোষমধ্যে অসির ঝনঝনা, বালিকাদের কি করিয়া উপযুক্তা গৃহিণী ও উপযুক্তা মাতা হইতে হয় সে বিষয়ে ছন্দোবদ্ধ উপদেশ, এবং পরিশেষে সকলের অপ্রত্যাশিত

ভাবে মিলন—প্রভৃতি সকলই ইহাতে আছে। ছেলে মেয়েদের ভালোছেলে ও ভালো মেয়ে করিবার যতগুলি পন্থা আছে গ্রন্থকার বোধহয় তাহার সকলগুলিই ইহাতে অবলম্বন করিয়াছেন। দুই এক জায়গা কাটিয়া দিয়া ইহাকে "ছেলে মেয়েদের নীতিশিক্ষা-সার" বলিয়া অনায়াসে চালান যায়। তবে মুস্কিল এই যে, ছেলেদের অত সহজে ভুলান যায় না। তাহাদের চিন্তার প্রণালী যতই সরল হউক না কেন, তাহাদের কল্পনা উদার ও সুদূরপ্রসারী। যাহা তাহা লিখিয়া তাহাদের কল্পনার খোরাক জোগাইবার চেষ্টা বৃথা ও অসঙ্গত। লেখকও 'দ্রষ্টব্যে' সে কথা স্বীকার করিয়াছেন, অথচ গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসাইয়া 'কাহারও সহিত কলহ করিও না, কলহ করা বড় দোষ ইত্যাদি ধরণের বাক্য গৈরিশীছন্দে লিখিয়া ছেলেদের চিত্ত-বিনোদনের এবং স্কুলের গণ্ডীর বাহিরে তাহাদের কল্পনার ক্ষেত্রের পরিসর বাড়াইবার' প্রয়াস পাইতেছেন!

প্রচ্ছদ-পটের চিত্রটি কি কবিদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য আঁকা হইয়াছে?

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

লক্ষ্যহারা—শ্রীক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, "গোলাপ পাব্লিশিং হাউস," ১২নং হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

১৫৩ পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ উপন্যাস খানিতে গ্রন্থকার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া সচরাচর যে সকল চরিত্রকে আমরা ঘৃণা, অবহেলা বা ভয় করিয়া চলি তাহাদের প্রকৃতরূপ ফুটাইয়া তুলিয়া একটা ব্যর্থতার ট্রাজেডি সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়ে এই উপন্যাস খানি যতই পরিণতির দিকে চলিয়াছে ততই অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইহার নায়ক নায়িকাগুলি সাধারণ মানুষের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক, তাহাদের চিন্তা ও কার্য্যকলাপের ধারাও স্বতন্ত্র। এই বইখানির প্রধান চরিত্র অশান্ত রায় বিপ্লবী এবং ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের নায়কের মত অসাধ্য-সাধনক্ষম, এবং সেইজন্যই সম্পূর্ণ অবাস্তব। ইহা ভিন্ন উপন্যাসখানিতে কয়েকটি চরিত্রহীনা অনাবশ্যক ভাবে 'ভিড় করিয়া' আসিয়াছে,—কেবল মাত্র কতকগুলো ভাব-প্রবণ বক্তৃতা শুনাইবার জন্য। বস্তুতঃ, বইখানির প্রারম্ভে আমরা যত মুগ্ধ হইয়া যেরূপ ঘাত-প্রতিঘাতের আশা করিয়াছিলাম, শেষের দিকে ততখানি হতাশ হইয়া দেখিলাম ইহার চরম পরিণতি কতকগুলি চমকপ্রদ কথার কৌশল এবং অত্যদ্ভুত চরিত্রের কোলাহলে পর্য্যবসিত। যে চরিত্রগুলি গ্রন্থকার বাজে ভাবিয়া যবনিকার অন্তরালে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, সেইগুলিই চমৎকার রূপে ফুটিয়া উঠিয়া আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল, যেমন সেবা বা তাহার মা, রামতারণবাবু, প্রভৃতি উষার কাহিনী নেহাৎ মামুলী; অন্যগুলি চক্ষুপীড়াদায়ক।' তবে গ্রন্থকারের ভাষার উপর দখল আছে, এবং সেইজন্য পড়িতে সহসা ক্লান্ত হইয়া পড়ি না। স্থানে স্থানে 'স্মার্ট' হইবার একটু চেষ্টা ছাড়া ভাষা বিশেষ কোথাও গতিরুদ্ধ হয় নাই। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় লেখক যদি সস্তা সেন্টিমেন্টালিটি ও চমকপ্রদ কথার কৌশল দিয়া পাঠক ভুলাইবার মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কাছে আমরা ইহাপেক্ষা ভাল জিনিষ পাইবার আশা করিতে পারি।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

নানা কথা

ভারত-সাহিত্য-পরিষদ্

বরোদাধিপতি শ্রীমন্ত সয়াজী-রাও গায়কওয়াড় মহারাজ বিগত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে কোলাপুরে মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে একটি নিখিল-ভারত-সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করেছিলেন,—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর নেতাদের তা' বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। মারাঠী ও গুজরাটী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার উন্নতির জন্ম মহারাজা প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন এবং দুই লক্ষ টাকার একটি মূলধনের ব্যবস্থা করেছেন,—যার সুদ থেকে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'য়েছে। এবার মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি যে নিখিল-ভারত-সাহিত্য-পরিষদের পরিকল্পনা করেছেন,—তা এমন সাহিত্য-দরদী লোকের পক্ষেই সম্ভব। পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একটা যোগ স্থাপনা করা। প্রস্তাবটা এই রকম—

ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের সাহিত্য-পরিষদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা ভারত "সাহিত্য পরিষদ" (academy) গঠিত হোক। এ পরিষদের উদ্দেশ্য হবে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করা, পরস্পরের পরিচয় বৃদ্ধি করা, সকলের গ্রহণীয় পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করা, ভারতীয় পুস্তকের পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য পুস্তকের ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা, সকলের মতে পরস্পরের ব্যবহারের যোগ্য এক রাষ্ট্রভাষা ও রাষ্ট্রলিপি নির্দ্ধারিত করে প্রচার করা ইত্যাদি। একটি সর্ব্বসাধারণ ভাষা প্রচার করা যদি সম্ভব নাও হয় অন্ততঃ একটি সর্ব্বসাধারণ লিপির প্রচার হলেও বিস্তৃতভাবে নূতন প্রণালীর মুদ্রণালয়ের প্রবর্ত্তনা করা যেতে পারে এবং ফলে ছাপার কাজ বিশেষ রকম সুবিধাজনক ও সুলভ হতে পারে। অন্ততঃপক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষের পারিভাষিক শব্দের ধারা এক হওয়া নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। মহারাজা এই উদ্দেশ্যে শাসনকল্পতরু নামক কোষ রচনা করিয়ে শাসন বিষয়ক পারিভাষাগুলি বিধিবদ্ধ করেছেন। সে কোষে আটটি ভাষায় প্রচলিত ও সূচিত শব্দ দেওয়া হয়েছে। নিখিল ভারতের সর্ব্বসাধারণ ভাষা হিসাবে উর্দ্দু মিশ্রিত হিন্দী সবিশেষ উপযোগী মহারাজা এই মত প্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি বরোদাধিপতির প্রস্তাবিত নিখিল-ভারত-সাহিত্য পরিষদের এই পরিকল্পনাটি বাস্তবে পরিণত করবার জন্ম অন্যান্ত প্রদেশের সাহিত্য পরিষদগুলি এবং বিশেষ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যথাসাধ্য যত্নবান হবে।

শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের চিত্র-প্রদর্শনী

বাঙলা দেশের শক্তিমান চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে শ্রীযামিনী রায়ের স্থান অনেকের উপরে। এঁর শক্তির মূলে সাধনার কঠোর নিষ্ঠা বর্ত্তমান। চিত্রের আনন্দ-লোকে যে বস্তুর আবেদন নেই—এঁর চিত্র-পটও সে বস্তুর স্থান নেই। তাই তাঁর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে আন্তরিকতার এমন একটা সুস্পষ্ট ছাপ প'ড়ে যায় যার জন্মে হয়ত গুণীসমাজে তিনি যতটা সমাদৃত হ'ন চিত্র শিল্পের সুলভ 'বাজারে' ততটা হন না।

যামিনীবাবুর অঙ্কিত ছবি যাঁরা বহুদিন থেকে লক্ষ্য ক'রে আসছেন তাঁরা জানেন যে তাঁর চিত্র-প্রতিভা সতত পরিবর্ত্তনশীল—একটি বহুদলবিশিষ্ট ফুলের মতো ক্রমবিকচমান। গত ২২শে জানুয়ারী তাঁর চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-দিনেও তাঁর বহু-বিচিত্র চিত্র-সম্ভারের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই কথাই অবিলম্বে প্রতীয়মান হয়েছিল। তাঁর পূর্ব্ব-অঙ্কিত চিত্রের সহিত গতবৎসরের অঙ্কিত চিত্রের পরিবর্ত্তন বিস্ময়কর। কিন্তু তাই বলে ধারার বিচ্ছিন্নতা কোথাও ঘটেনি। পাশ্চাত্য আদর্শে আরম্ভ হয়ে সেই ধারার ক্রমশঃ খাঁটি ভারতীয় ধারায় পরিণতি সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক।

যামিনীবাবুর ছবিগুলির মধ্যে কল্পনা ও কৌশলের অভিনবত্ব মনের মধ্যে বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। তাঁর ছবিগুলি যে সহজ নয়, সুলভ নয়, দুর্ব্বল নয় তা দৃষ্টিপাত মাত্রই বোঝা যায়। এবারকার প্রদর্শনীতে তাঁর ছবিগুলি দেখে আমরা সত্যই আনন্দিত হয়েছি

বিপ্রদাস

বর্ত্তমান সংখ্যা থেকে বিচিত্রায় শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপন্যাস 'বিপ্রদাস' আরম্ভ হ'ল। এ উপন্যাস খানির প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদ 'বেণু' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু উক্ত মাসিকপত্রখানির প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় বিপ্রদাস উপন্যাস লেখাও বহুদিন বন্ধ ছিল। উপন্যাসখানি সূচনাতেই বাঙলা দেশের পাঠক-চিত্তে অপূর্ব্ব আনন্দ ও কৌতূহল বিস্তার ক'রে অকস্মাৎ বন্ধ হওয়ায় সকলেরই মনে বিশেষ রকম ক্ষোভ উৎপন্ন হয়েছিল। আমরা শরৎচন্দ্রকে বইখানির লেখা আরম্ভ করতে সম্মত করেছি। পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশটি খুব সম্ভবতঃ আগামী সংখ্যাতেই শেষ হয়ে যাবে, তারপর মাসে মাসে নূতন লেখা প্রকাশিত হবে। পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশটুকুও শরৎচন্দ্র সামান্য সংশোধিত ক'রে দিয়েছেন।

শ্রীজসিম উদ্দিনের শিল্প-দ্রব্য প্রদর্শনী

গত জানুয়ারী মাসে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে কবি শ্রীজসিম উদ্দিন তাঁর দ্বারা সংগৃহীত শিল্পদ্রব্যাদির একটি প্রদর্শনী খুলেছিলেন। প্রদর্শনীর অধিকাংশ দ্রব্য পূর্ব্ববঙ্গ হ'তে সংগৃহীত। গৃহস্থরমণীগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত কয়েকখানি নক্সীকাঁথা ছিল, তার মধ্যে দুখানির সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং রচয়িতার অপূর্ব্ব শিল্পরসবোধ দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। এ কাঁথাগুলি তৈরী করতে বিপুল ধৈর্য্য এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। শেষ করতে সময়ে সময়ে দশ বারো বৎসর সময় লাগে! সুতরাং ব্যবসার প্রয়োজনে এগুলিকে খাটানো সম্ভবপর নয়। সাধারণতঃ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এগুলি মাতা তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে অথবা ভগ্নী ভগ্নীকে উপহার দেন এবং গৃহ-সম্পদরূপে এই নক্সীকাঁথাগুলি বংশ-পরম্পরায় সযত্নে রক্ষিত হয়। কাঁথা ব্যতীত প্রদর্শনীতে পাঁড়িচিত্র, চিত্রিত কলস, চিত্রিত লক্ষ্মীর সরা, লক্ষ্মীর আসন, চিত্রিত পানের বাটা, গাজির পট, রঙিন সুতার সিকা, খড়কেদানী, সল্‌তেদানী, পুতুল নাচের পুতুল ইত্যাদি বহু শিল্প-দ্রব্য প্রদর্শিত হয়েছিল।

বাঙলা দেশের ব্যবসায়ী এবং গৃহস্থের ঘরে ঘরে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শিল্পকলা যে কি বিপুলভাবে এবং অবলীলাক্রমে আশ্রয় ক'রে আছে তা আমরা এইরূপ এক-একটি শিল্প-প্রদর্শনী না দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারিনে। লোক-শিক্ষার জন্য এরূপ প্রদর্শনীর বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

পরলোকগত জন গলস্‌ওয়ার্দ্দি

বিগত ৩১শে জানুয়ারী সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক জন গলস্‌ওয়ার্দ্দি পরলোক গমন করেছেন। ১৮৬৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ সালে আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু জীবনে কখনো আইন ব্যবসায় অবলম্বন করেন নি। গত বৎসর তিনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।

আগামী সংখ্যা বিচিত্রায় গলস্‌ওয়ার্দ্দির জীবনধারার এবং সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা আছে।

Edited by Upendranath Ganguli. Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works
259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, | চৈত্র, ১৩৩৯ | ৩য় সংখ্যা

স্নান সমাপন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুরু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে
গঙ্গার জলে পূর্ব্বমুখে।
তখন জলে লেগেচে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
ভোরের হাওয়ায় স্রোত উঠ্‌চে ছল্‌ছল্‌ করে।
রামানন্দ তাকিয়ে আছেন
জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য্যোদয়ের দিকে।
মনে মনে বল্‌চেন,
"হে দেব, তোমার যে কল্যাণতমরূপ
সে তো আমার অন্তরে প্রকাশ পেল না।
ঘোচাও তোমার আবরণ।"

সূর্য্য উঠল শালবনের মাথার উপর।
জেলেরা নৌকায় পাল দিলে তুলে,
বকের পাঁতি উড়ে চলেচে সোনার আকাশ বেয়ে
ওপারে জলার দিকে।
এখনো স্নান হোলো না সারা।

শিষ্য শুধালো "বিলম্ব কেন প্রভু.
পূজার সময় যায় বয়ে।"
রামানন্দ উত্তর করলেন—
"শুচি হয়নি তনু,
গঙ্গা রইলেন আমার হৃদয় থেকে দূরে।"
শিষ্য বসে ভাবে, এ কেমন কথা।

শর্ষেক্ষেতে রৌদ্র ছড়িয়ে গেল।
মালিনী খুলেচে ফুলের পসরা পথের ধারে,
গোয়ালিনী যায় দুধের কলস মাথায় নিয়ে।
গুরুর কী হোলো মনে,
উঠলেন জল ছেড়ে।
চল্‌লেন বন ঝাউ ভেঙে
গাঙ্ শালিকের কোলাহলের মধ্য দিয়ে।
শিষ্য শুধালো "কোথায় যাও, প্রভু,
ওদিকে তো নেই ভদ্রপাড়া।"
গুরু বল্‌লেন, "চলেচি স্নান সমাপনের পথে।"

বালুচরের প্রান্তে গ্রাম।
গলির মধ্যে প্রবেশ করলেন গুরু।
সেখানে তেঁতুল গাছের ঘন ছায়া,
শাখায় শাখায় বানর দলের লাফালাফি।
গলি পৌঁছয় ভাজন মুচির ঘরে।
পশুর চামড়ার গন্ধ আসচে দূর থেকে।
আকাশে চিল উড়চে পাক দিয়ে,
রোগা কুকুর হাড় চিবচ্চে পথের পাশে।
শিষ্য বললেন "রাম, রাম।"
ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে রইল গ্রামের বাইরে।

ভাজন লুটিয়ে প'ড়ে গুরুকে প্রণাম করলে
সাবধানে।
গুরু তাকে বুকে নিলেন তুলে।
ভাজন ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল,—
কী করলেন প্রভু,
অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্য দেহে।
রামানন্দ বললেন,
স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে
তাই যিনি সবাইকে দেন ধৌত করে
তাঁর সঙ্গে মনের মিল হোলো না।
এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে
বইল সেই বিশ্বপাবনধারা।
ভগবান সূর্য্যকে আজ প্রণাম করতে গিয়ে প্রণাম বেধে গেল,
বল্‌লেম, হে দেব, তোমার মধ্যে যে জ্যোতি আমার মধ্যেও তিনি
তবু আজ দেখা হোলো না কেন।
এতক্ষণে মিল্‌ল তাঁর দর্শন
তোমার ললাটে আর আমার ললাটে।—
মন্দিরে আর হবে না যেতে॥

১৫ ফাল্গুন
১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারস্য-ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কির্ম্মিনশা থেকে সকালে যাত্রা করে বেরলুম। আজ যেতে হবে কাসরিশিরিনে—পারস্যের সীমানার কাছে। তার পরে আসবে কানিকিন আরব সীমানার রেলোয়ে ষ্টেশনে।

পারস্যে প্রবেশ পথে আমরা তার যে নীরস মূর্ত্তি দেখেছিলুম এখন আর তা নেই। পাহাড়ে রাস্তার দুইধারে ক্ষেত ভরে উঠেচে ফসলে, গ্রামও অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন, চাষীরা চাষ করচে এ দৃশ্যও চোখে পড়ল, তা ছাড়া এই প্রথম গোরু চরতে দেখলুম।

কর্ম্মরত পারসিক কৃষক

ঘণ্টা দুয়েক পরে সাহাবাদে পৌঁছলুম। এখানে রাজার একটি প্রাসাদ নতুন তৈরি হয়েছে, গবর্ণর সেখানে গাছের ছায়ায় বসিয়ে চা খাওয়ালেন, সঙ্গে চল্‌লেন কেরেন্দ নামক জায়গায় মধ্যাহ্নভোজন করিয়ে আমাদের বিদায় দেবার জন্যে। বড়ো সুন্দর এই গ্রামের চেহারাটি। তরু-চ্ছায়া-নিবিড় পাহাড়ের কোলে আশ্রিত লোকালয়, ঝর্‌না ঝরে পড়চে এদিক ওদিক দিয়ে পাথর ডিঙিয়ে। গ্রামের দোকানগুলির মাঝখা

পারস্যের কৃষক

দিয়ে উঁচুনীচু আঁকাবাঁকা পথ,—কৌতূহলী জনতা জমেচে।

তার পরের থেকে ধরণীর ক্রমেই সেই আবার শুষ্ক-নৈরাশ্যের মূর্ত্তি। আমরা পারস্যের উচ্চভূমি থেকে নেমে হাওয়াটা আমাদের দেশের মাঘ মাসের মতো।
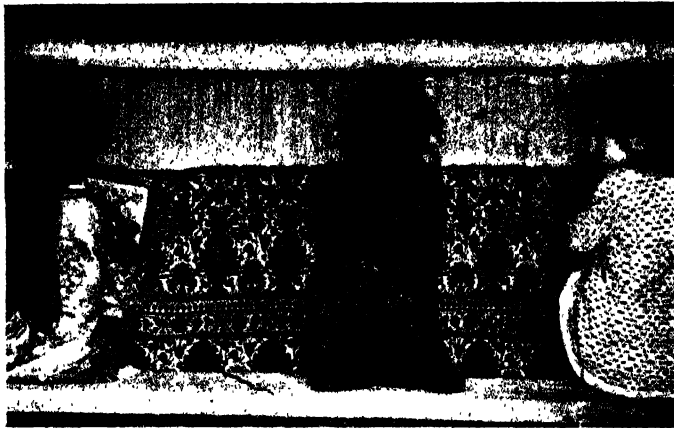
পারস্যের শেষ সীমানায় যখন পৌঁছলুম দেখা গেল বোগদাদ থেকে অনেকে এসেচেন আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। কেউ কেউ রাজকর্ম্মচারী, কেউ বা খবরের কাগজের সম্পাদক, অনেকে আছেন সাহিত্যিক, তা ছাড়া প্রবাসী ভারতীয়। এঁরা কেউ কেউ ইংরেজি জানেন। একজন আছেন যিনি নিয়ুইয়র্কে আমার বক্তৃতা শুনেচেন। সেখানে শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়ন শেষ করে ইনি এখানকার শিক্ষাবিভাগের কাজে নিযুক্ত। ষ্টেশনের ভোজনশালায় চা খেতে বসলুম। একজন বল্‌লেন, যাঁরা এখানে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে এসেচেন তাঁদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছেন। আমরা

কার্পেট-বয়ন-নিরত পারসিক শিশু

বোগদাদের গোল ছাউনীবিশিষ্ট নৌকা-বিশেষ

[illegible] সকলেই ভয় দেখিয়েছিলেন এখান থেকে আমরা [illegible] গরম পাব। তার কোনো লক্ষণ দেখলুম না। সকলেই এক। ভারতীয় মুসলমানেরা ধর্ম্মের নামে কেন যে এমন বিরোধ সৃষ্টি করচে আমরা একেবারেই বুঝতে

পারিনে। ভারতীয়েরাও বলেন এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতার লেশমাত্র অভাব নেই। দেখা যাচ্ছে ইজিপ্টে তুরস্কে ইরাকে পারস্যে সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম মনুষ্যত্বকে পথ ছেড়ে দিচ্চে। কেবল ভারতবর্ষেই চলবার পথের মাঝখানে ঘন হয়ে কাঁটাগাছ উঠে পড়ে, হিন্দুর সীমানায়, মুসলমানের সীমানায়। এ কি পরাধীনতার মরুক্ষেত্রে লালিত ঈর্ষ্যাবুদ্ধি, এ কি ভারতবর্ষের অনার্য্যচিত্তজাত বুদ্ধিহীনতা ?

পারস্যের মরুভূমিবাসী উষ্ট্র

অভ্যর্থনাদলের মধ্যে একজন বৃদ্ধ কবি ছিলেন, আমার চেয়ে দুই এক বছরের ছোটো। পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, শান্ত স্তব্ধ মানুষটি। তাঁর মুখচ্ছবি ভাবুকতায় আবিষ্ট। ইরাকের মধ্যে ইনিই সব চেয়ে বড়ো কবি বলে এঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোলো।

অনেকদিন পরে মোটর ছেড়ে রেলগাড়িতে চড়া গেল। গাড়িগুলি আরামের। দেহটা এতকাল পথে পথে কেবলি ঠোকর খেয়ে নাড়া খেয়ে একদণ্ড নিজেকে ভুলে থাকতে পারছিল না, আজ বাহনের সঙ্গে অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব তার মিটে গেল।

ইরাক সাম্রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিতেছেন। পারস্য সাম্রাজ্য পার হইয়া এইখানে মোটর বদল করিতে হয়। ইরাক গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

জানালার বাইরে এখনো মাঝে মাঝে ফসলের আভাস দেখা যায়, বোধ হয় যেন কোথাও কোথাও খাল নালা দিয়ে জলসেকের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মোটের উপরে কঠিন এখানকার ধূসরবর্ণ মাটি।

মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো ষ্টেশনে অভ্যর্থনার জনতা পেরিয়ে এলুম। যখন শোনা গেল বোগদাদ আর পনেরো মিনিট পথ দূরে তখনো তার পূর্ব্বসূচনা কিছুই নেই, তখনো শূন্য মাঠ ধূ ধূ করচে।

অবশেষে বোগদাদে এসে গাড়ি থামল। ষ্টেশনে ভিড়ের অন্ত নেই। নানাশ্রেণীর প্রতিনিধি এসে আমাকে সম্মান জানিয়ে গেলেন, ভারতীয়েরা দিলেন মালা পরিয়ে। ছোটো অধিকার করে থাকে সেখানে আলাপের প্রসঙ্গে ব্যবসার জেরও চলে। সহরের মতো জায়গায় এরকম সামাজিকতা চর্চ্চার কেন্দ্র থাকা বিশেষ আবশ্যক সন্দেহ নেই। আগেকার দিনে গল্প বলবার কথক ছিল, তখন তারা এই সকল পথপ্রান্তসভায় কথা শোনাত। আমাদের দেশে যেমন কথকের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেচে, এদের এখানেও তাই। এই বিদ্যাটি ছাপার বইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

বগ্দাদে কবিকে জনসাধারণের অভিনন্দন

ছোটো দুটি মেয়ে দিয়ে গেল ফুলের তোড়া। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে একটি বাঙালী মেয়েকেও দেখলেম। বোগদাদের রাস্তা কতকটা আমাদেরি দেশের দোকানবাজারওয়ালা পাড়ার মতো। একটা বিশেষত্ব আছে, মাঝে মাঝে পথের ধারে কাঠের বেঞ্চি পাতা চা খাবার এবং মেলামেশা করবার জায়গা। ছোটখাটো ক্লাবের মতো। সেখানে আসর জমেছে। এক এক শ্রেণীর লোক এক একটি জায়গা উঠতে পারলে না। মানুষ আপন রচিত যন্ত্রগুলোর কাছে আপন সহজ শক্তিকে বিকিয়ে দিচ্চে।

টাইগ্রিস নদীর ধারে একটি হোটেলে আমাদের জায়গা হয়েচে। আমার ঘরের সামনে মস্ত ছাদ, সেখানে বসে নদী দেখা যায়। টাইগ্রিস প্রায় গঙ্গার মতোই প্রশস্ত,—ওপারে ঘন গাছের সার, খেজুরের বন, মাঝে মাঝে ইমারত। আমাদের ডানদিকে নদীর উপর দিয়ে ব্রিজ

চলে গেছে। এই কাঠের ব্রিজ সৈন্য পারাপারের জন্য গত যুদ্ধের সময় জেনেরাল মড অস্থায়ীভাবে তৈরি করিয়েছিলেন।

চেষ্টা করচি বিশ্রাম করতে কিন্তু সম্ভাবনা অল্প। নানারকম অনুষ্ঠানের ফর্দ্দ লম্বা হয়ে উঠচে। সকালে গিয়েছিলুম ম্যুজিয়ম দেখতে, নূতন স্থাপিত হয়েচে, বেশি বড়ো নয়, একজন জর্ম্মান অধ্যাপক এর অধ্যক্ষ। অতি প্রাচীন যুগের যে সব সামগ্রী মাটির নীচে থেকে বেরিয়েচে সেগুলি দেখালেন। এ সমস্ত পাঁচ ছয় হাজার বছর আগেকার পরিশিষ্ট। মেয়েদের গহনা, ব্যবহারের পাত্র প্রভৃতি সুদক্ষ হাতে রচিত ও অলঙ্কৃত। অধ্যাপক বলেন এই জাতের কারুকার্য্যে স্থূলতা নেই, সমস্ত সুকুমার ও সুনিপুণ। পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘকালের অভ্যাস না হলে এমন শিল্পের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হোত না। এদের কাহিনী নেই জানা, কেবল চিহ্ন আছে। এটুকু বোঝা যায় এরা বর্ব্বর ছিল না। পৃথিবীর দিনরাত্রির মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের স্মরণভ্রষ্ট এই সব নারীর সুখদুঃখের পর্য্যায় আমাদেরই মতো বয়ে চলত। ধর্ম্মে কর্ম্মে লোকব্যবহারে এদেরও জীবন-যাত্রার আর্থিক পারমার্থিক সমস্যা ছিল বহু বিচিত্র। অবশেষে, কী আকারে ঠিক জানিনে, কোন্ চরম সমস্যা বিরাটমূর্ত্তি নিয়ে এদের সামনে এসে দাঁড়ালো, এদের জ্ঞানী কর্ম্মী ভাবুক, এদের পুরোহিত এদের সৈনিক এদের রাজা তার কোনো সমাধান করতে পারলে না, অবশেষে ধরণীর

বগ্দাদে ভারতীয় সম্প্রদায় ও রবীন্দ্রনাথ

হাতে প্রাণযাত্রার সম্বল কিছু কিছু ফেলে রেখে দিয়ে সবাইকে চলে যেতে হল। কোথায় গেল এদের ভাষা, কোথায় এদের সব কবি, এদের প্রতিদিনের বেদনা কোনো ছন্দের মধ্যে কোথাও কি সংগ্রহ করা রইল না? কেবলমাত্র আর আট দশ হাজার বছরের প্রান্তে ভাবীকালে দাঁড়িয়ে মানুষের আজকের দিনের বাণীর প্রতি যদি কান পাতি, কোনো ধ্বনি কি পৌঁছবে কানে এসে, যদি বা পৌঁছয় তার অর্থ কি কিছু বুঝতে পারব?

আজ অপরাহ্নে আমার নিমন্ত্রণ এখানকার সাহিত্যিকদের তরফ থেকে। বাগানে গাছের ছায়ায় আসন। ছোটো ছোটো টেবিলে চায়ের আয়োজন আমাদের জনতার মধ্যে বিক্ষিপ্ত। একে একে নানালোকে তাঁদের

বগদাদের পথে বাকুবা ষ্টেশনে কবি-সম্বর্দ্ধনায় ইরাকী জনসাধারণের সমাগম

বাকুবা

অভিনন্দন পাঠ শেষ করলে সেই বৃদ্ধ কবি তাঁর কবিতা আবৃত্তি করলেন। বজ্রমন্দ্র তাঁর ছন্দপ্রবাহ, আর উদ্দাম তাঁর ভঙ্গী। আমি তাঁদের বললেম এমন কবিতার অর্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; এ যেন উত্তাল তরঙ্গিত সমুদ্রের বাণী, এ যেন ঝঞ্ঝাহত অরণ্যশাখার উদ্গাথা।

অবশেষে আমার পালা উপস্থিত হলে আমি

বললুম, আজ আমি একটি দরবার নিয়ে আপনাদের কাছে এসেচি। একদা আরবের পরম গৌরবের দিনে পূর্ব্বে পশ্চিমে শাসনের আকারে নেই, তবুও সেখানকার বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকার করে বিস্তার আকারে ধর্ম্মের

বগ্দাদ ষ্টেশনে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার্থে ভারতীয় সম্প্রদায়

বগ্দাদ ষ্টেশনে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী

পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক ভূভাগ আরব্যের প্রভাব-অধীনে এসেছিল। ভারতবর্ষে সেই প্রভাব যদিও আজ রাষ্ট্র- আকারে আছে। সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে আপনাদের বলচি আরবসাগর পার করে আরব্যের নব

আর একবার ভারতবর্ষে পাঠান,—যাঁরা আপনাদের স্বধর্ম্মী তাঁদের কাছে,—আপনাদের মহৎ ধর্ম্মগুরুর পূজ্যনামে, আপনাদের পবিত্রধর্ম্মের সুনাম রক্ষার জন্য। দুঃসহ আমাদের দুঃখ, আমাদের মুক্তির অধ্যবসায় পদে পদে ব্যর্থ;

বগদাদ্ ষ্টেশনে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা
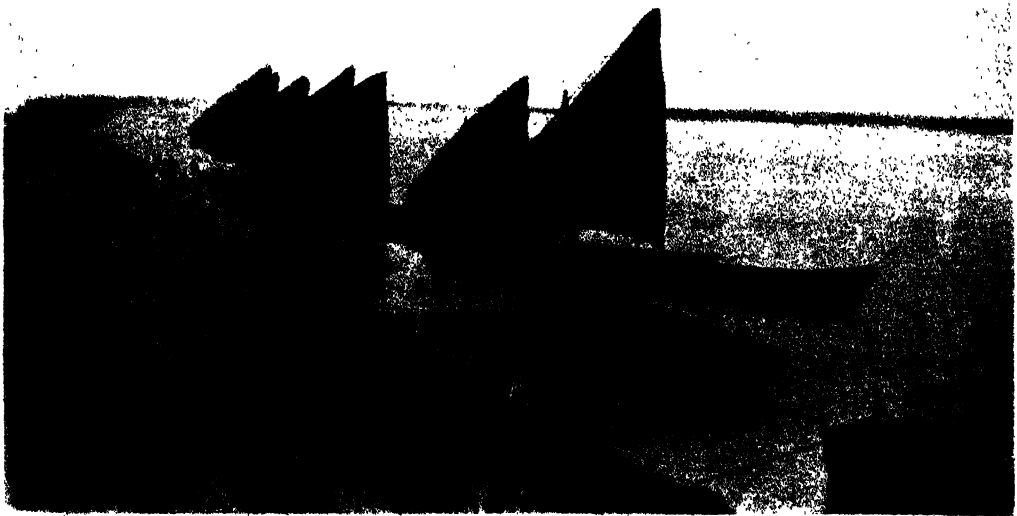
টাইগ্রিস্ নদী—বগদাদ্

আপনাদের নবজাগ্রত প্রাণের উদার আহ্বান সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা থেকে, অমানুষিক অসহিষ্ণুতা থেকে, উদার ধর্ম্মের অবমাননা থেকে মানুষে মানুষে মিলনের পথে মুক্তির পথে নিয়ে যাক হতভাগ্য ভারতবর্ষকে। এক দেশের কোলে যাদের জন্ম অন্তরে বাহিরে তারা এক হোক্।
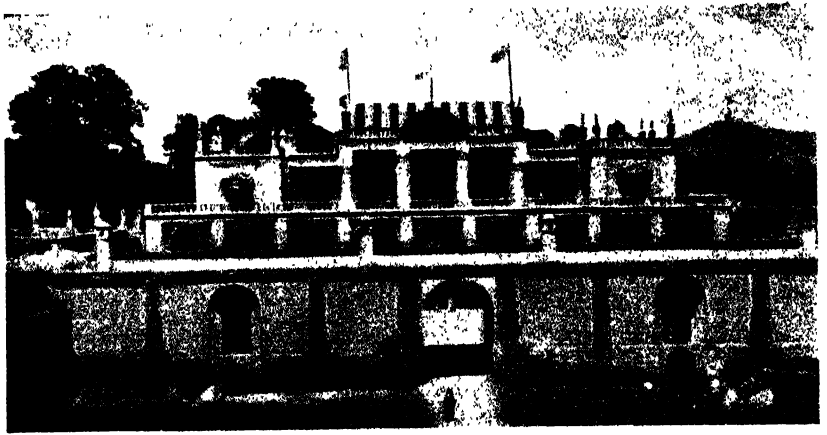
কাজভিনে এই হোটেলে কবি ছিলেন
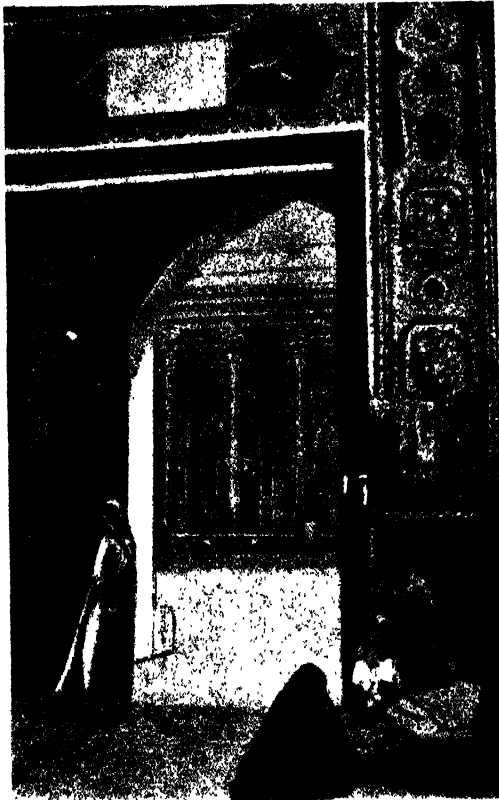
বগদাদে প্রসিদ্ধ কাদিমান মসজিদ্‌এর সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছিলেন

রাজা আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেচেন নদীর ওপারে তাঁর একটি বাগানবাড়িতে। রাজা একেবারেই আড়ম্বর-শূন্য মানুষ, অত্যন্ত সহজ ব্যবহার। খোলা চাতালে আমরা বসলুম, সামনে নীচে বাগান। রাজার ভাই আছেন তাঁর সঙ্গে। প্রধান মন্ত্রী আছেন,—অল্প বয়স, এখানকার সবাই বলেন, আজ পৃথিবীতে সব চেয়ে অল্প বয়সের মন্ত্রী ইনি। যিনি দোভাষীর কাজ করবেন তিনিও উপস্থিত। রাজা বল্লেন ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানের যে দ্বন্দ্ব বেধেচে নিশ্চয়ই সেটা ক্ষণিক। যখন কোনো দেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বোধন আসে তখন প্রথম অবস্থায় তারা নিজেদের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেইটেকে রক্ষা করবার জন্যে তাদের চেষ্টা প্রবল হয়। এই আকস্মিক বেগটা কমে গেলে মন আবার সহজ হয়ে আসে।—আমি বল্লেম আজ তুর্কি ইজিপ্ট পারস্যে নবজাগ্রত জাতির যে পরিচয় আমরা পেয়েচি তাতে দেখলুম, যে-বিশিষ্টতাবোধ সঙ্কীর্ণভাবে আত্মনিহিত ও অন্যের প্রতি বিরুদ্ধ, সচেষ্টতার সঙ্গেই তার তীব্রতা কমিয়ে দেওয়া হয়েচে, নইলে সেই অন্ধতার দ্বারা জাতির রাষ্ট্রবুদ্ধি অভিভূত হয়। ভারতবর্ষের উদ্বোধনে যদি সেই সর্ব্বজনের হিতজনক শুভবুদ্ধির আবির্ভাব দেখ্‌তে পেতেম তাহলে নিশ্চিন্ত হতেম। কিন্তু যখন দেখতে পাই হিন্দুমুসলমান উভয় পক্ষেই শিক্ষার

সঙ্গে সঙ্গেই আত্মঘাতী ধর্ম্মান্ধতা প্রবল হয়ে উঠে রাষ্ট্রসত্ত্বকে প্রতিহত করচে তখন হতাশ হতে হয়

নিজামীর "খুসরু ও শিরীণের" একটি দৃশ্য, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পারসিক চিত্র।

এই বাগানের ধারে চায়ের টেবিলে সহজ বাক্যালাপের মধ্যে সেদিনের ছবি মনে আনা দুরূহ, যেদিন এই রাজা পথশূন্য, মরুভূমির মধ্যে বেদুয়িনদের বহু উপজাতিকে আপন নেতৃত্বের অধীনে এক করে নিয়ে জর্ম্মানি ও তুরস্কের সম্মিলিত অভিযানকে পদে পদে উদ্‌ভ্রান্ত করে বিধ্বস্ত করেছিলেন। মৃত্যুর মূল্যে কিনেছিলেন জীবনের গৌরব। কঠিন ভীষণ সেই রণপ্রাঙ্গণ, জয়ে পরাজয়ে নিত্য সংশয়িত দুঃসাধ্য সেই অধ্যবসায়। সেই অক্লান্ত রণরঙ্গের অধিনায়ককে দেখলেম। তখনকার মৃত্যুচ্ছায়াক্রান্ত দিনরাত্রির সেই বিভীষিকার মধ্যে তাঁর উষ্ট্রবাহিনীর সঙ্গে কোথাও কোনো একটা স্থান পাবার সম্ভাবনা আমার ছিল না। কিন্তু আজ বসেছি চায়ের টেবিলে এই নূতন ইতিহাস-সৃষ্টিকর্ত্তার পাশে সহজভাবে; কেননা আমিও অন্য উপকরণ নিয়ে মানুষের ইতিহাস-সৃষ্টিতে আপন শক্তি উৎসর্গ করেচি। সেই স্বতন্ত্র অথচ অনগার্গ সহযোগিতার মূল্য যদি না এই বীর বুঝতে পারতেন তবে তাঁর যুদ্ধবিজয়ী শৌর্য্য আপন মূল্য অনেকখানি হারাত। কর্ণেল লরেন্স বলেচেন আরবের মহৎ লোকদের মধ্যে মহম্মদ ও সালাদিনের নীচেই রাজা ফয়সলের স্থান। এই মহত্ত্বের সরলমূর্ত্তি দেখেচি তাঁর সহজ আতিথ্যে, এবং তাঁকে অভিবাদন করেচি। বর্ত্তমান এসিয়ায় যাঁরা প্রবল শক্তিতে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেচেন তাঁদের দুজনকেই দেখলুম অল্পকালের ব্যবধানে। দুজনেরই মধ্যে স্বভাবের একটি মিল

একটি প্রাচীন পারসিক চিত্র

দেখা গেল,—উভয়েই আড়ম্বরহীন স্বচ্ছ সরলতার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশমান।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাহ্ অব্বাসের যুগের (১৫৮৭—১৬২৯) পারসিক চিত্র—
একটি টালির গাত্রে খোদিত

১৪ই এপ্রিল তারিখে কবি মহামহিম পারস্য সম্রাট রেজা শা পহ্লবীর নিকট যে তার প্রেরণ করেছিলেন, নীচে আমরা তার মর্ম্মানুবাদ দিলাম।—বিঃ সঃ

মহারাজ,

যে উদার আতিথেয়তা আপনার নিকট পেলেম তার জন্যে ইরাণ থেকে বিদায় নেবার আগে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা আপনার কাছে নিবেদন করি। আপনি আপনার নিজস্ব প্রাণশক্তি দেশের জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করেচেন, আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাঅর্ঘ্য রেখে যাই। আপনার প্রজাবর্গের প্রতি আমার অন্তরের প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি কথা বলে আজ বিদায় গ্রহণ করব।

ইরাণের বন্ধুবর্গের প্রতি :—

আজ শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের কাছে বিদায় নেবার সময় এসেচে; কৃতজ্ঞতায় ভরা আমার এই হৃদয়খানি তোমাদের দেশে রেখে গেলেম। তোমাদের সম্রাট্ তাঁর সাম্রাজ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করে যে সম্মান দিয়েচেন তোমরা রাজভক্ত প্রজার মতো সেই সম্মানের মর্য্যাদা রেখেচ এবং তোমাদের চিরাচরিত আতিথেয়তার ইতিহাসবিশ্রুত যশ অম্লান রেখেচ। তোমাদের এই উদার অভ্যর্থনা আমি গ্রহণ করেচি অন্তরের সঙ্গে, বিশেষতঃ যখন এর মধ্যে রয়েচে আমার মাতৃভূমির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন। যে দুটি জাতির মহাস্থান আজ ভারতবর্ষ ও পারস্য, ইতিহাসের প্রথম যুগে তারা যখন অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে তাদের জয়যাত্রা শুরু করেছিল তখন তারা ছিল এক। কালচক্রে তারা পৃথক হয়ে গড়ে তুলল এশিয়ার দুটি বিরাট সভ্যতা, তার মধ্যে প্রকাশের ভঙ্গিমা বিভিন্ন হলেও অন্তরের তেজ ও প্রাণশক্তি একই রকম। যুগে যুগে তাদের মধ্যে চিন্তা-সমৃদ্ধ চিত্তের আদান প্রদান চলে এসেচে যতদিন না পর্য্যন্ত এসিয়া তন্দ্রাবেশে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লো।

অবশেষে দেখা গেল নব জাগরণের আলোকরশ্মি। এই মহাদেশের অন্তরের মধ্যে একটা স্পন্দমান জীবনের কম্পন ক্রমেই যেন নিবিড় আত্মোপলব্ধির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌চে। এই পুণ্য মুহূর্ত্তে আজ আমি কবি তোমাদের

কাছে এসেচি নব যুগের শুভ্রপ্রভাত ঘোষণা করতে, তোমাদের দিগন্তের অন্ধকার ভেদ করে যে আলোক ফুটে উঠেচে সেই আলোককে অভিনন্দন করতে—আমার জীবনের মহৎ সৌভাগ্য আজ তোমাদের কাছে এলেম।
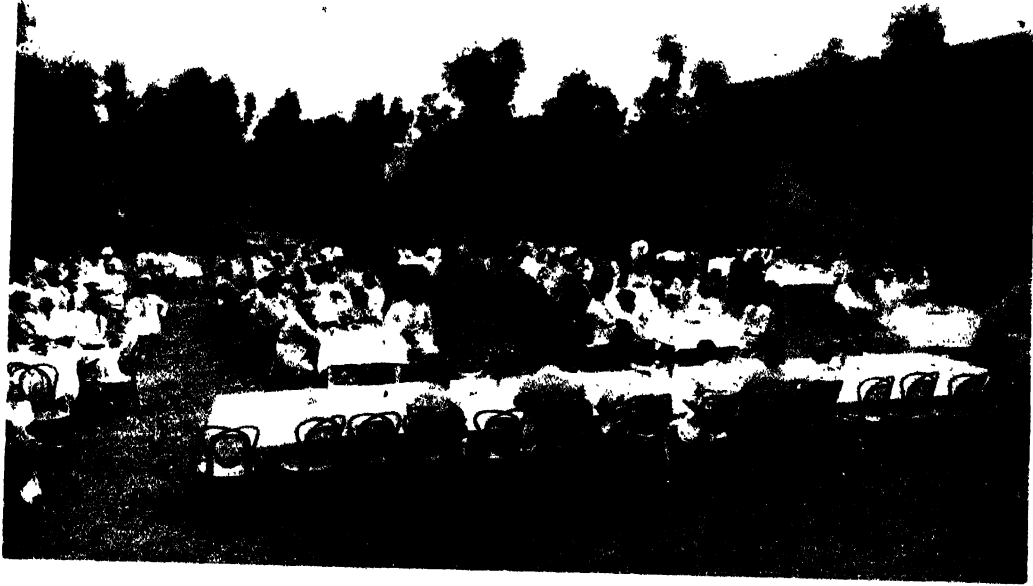
বগদাদের মিউনিসিপাল গার্ডেনে পুরসভা কর্ত্তৃক কবিকে অভিনন্দন। এখানে উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। ইরাকের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ অভিনন্দন পাঠ করেন।

বগদাদের একটি বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ। (ফটো উপরের তলা হইতে গৃহীত

জয় হোক্ ইরাণের।
ইরাণ সম্রাট রেজা শা পহ্লবী দীর্ঘজীবি হোন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারস্য সম্রাটের উত্তর—

জনাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :—

আমরা আপনার টেলিগ্রাম দেখেচি। আপনি পারস্য-প্রবাসে তৃপ্ত হয়েচেন এতে আমরা সুখী হয়েচি। আপনার এই প্রতিবেশী দেশটিতে যদি আরো কিছুকাল থাকতে পারতেন তো আরো খুসী

রবীন্দ্রনাথ বগদাদ ষ্টেশন হইতে সহরে যাইতেছেন

হতেন এবং প্রাচ্যের প্রতি আপনার অন্তরের প্রীতি আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পেয়ে আরো উপকৃত হতেন। আপনি আমাদের সম্বন্ধে যে সাধুবাদ করেচেন তা আমরা কখনো ভুলব না।

রেজা শা

বগদাদ ম্যুনিসিপালিটি কর্তৃক ম্যুনিসিপাল উদ্যানে কবি-সম্বর্দ্ধনার সময় কবি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন নিম্নে তার অনুবাদ প্রকাশ করা গেল।

বিঃ সঃ

কবি সম্বর্দ্ধনায় বগদাদের টাইগ্রিস্ প্যালেস্ হোটেলে শিক্ষক মণ্ডলীর প্রীতিভোজন ও সম্মেলন

ইরাক সম্রাটের সাদর নিমন্ত্রণে আজ যে আমি ইরাকের প্রাচীন ও বিরাট সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আস্‌বার সুযোগ পেলেম সেজন্য সম্রাটকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

আজ যখন এই প্রাচীন জাতি নবজন্ম লাভ করচে যখন সৃষ্টির একটা অদম্য বেগ এর চিত্তকে সুস্পষ্ট আত্মপ্রকাশের গরিমা ও মুক্তির পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে পরিণত করে তুলচে তখন এখানে উপস্থিত থাকতে পারাটা আমার জীবনের সত্যই একটা বড়ো অনুপ্রেরণার বিষয়। এখানকার বাতাসে আমি অনুভব করচি যৌবনের সেই উদ্দীপনা যা সমস্ত এশিয়া মহাদেশকে আজ নবযুগের নূতন প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ব্যাকুল করে তুলচে।

রবীন্দ্রনাথ ও ইরাকের সম্রাট (কবির বামে)।
সম্রাটের পার্শ্বে (মাথায় চাদর ও শিরস্ত্রাণ পরিহিত) রাজভ্রাতা এমির ফৈসল্।

আপনারা জানেন দুর্ভাগ্যবশত বয়স এবং স্বাস্থ্য দূরত্বের ব্যবধানকে অতিক্রম করতে বাধা দেয়; তাই আপনাদের এই সাদর অভ্যর্থনার পরিবর্ত্তে আপনারা আমার কাছে যতখানি আশা করেন হয়তো তার সবটুকু সফল করে তোলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

শুনলেম আজকের দিনে আমাকে এই নিমন্ত্রণ প্রধানত বোগদাদের সাহিত্যিকদের তরফ থেকে। আমি যে দলের লোক বলে গৌরব অনুভব করি আমাকে সর্ব্বসাধারণে তাঁরাই যে প্রথমে অভিনন্দন করবেন এটা স্বাভাবিক। আজ হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দ বোধ করচি এই ভেবে যে আমার কিছু কিছু রচনা আপনাদের ভাষায় অনূদিত হয়েচে এবং আপনাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করতে পেরেচে। সেই

রচনাগুলির মধ্য দিয়ে আমি আগেই আপনাদের নিকট পরিচিত হয়েচি। এতে নূতন করে এই প্রমাণ হয় যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে জাতির প্রভেদ নেই, আমাদের ভাবরাজি অবাধে মেলামেশা করে পরস্পরের সহযোগিতায় এমন একটা পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করতে পারে যার মধ্যে চিরন্তন মানবের কল্যাণ নিহিত আছে।

বোগদাদের মসজিদ

ইতিহাস মানুষের প্রতি বিশেষ সদয় হয় নি। প্রবল জাতির লোলুপতা দুর্ব্বল জাতিকে অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেচে; অন্যায় ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য দুর্ব্বল জাতিকে শোষণ করতে তারা কুণ্ঠিত নয়। তাই আজ মনুষ্যত্ব পরস্পরের প্রতি সন্দেহে দুঃখে যন্ত্রণা-জর্জ্জরিত। অসামঞ্জস্যের গ্লানি আমাদের জীবনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েচে। পরস্পরের প্রতি এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধের বেদনা থেকে মনুষ্যত্বকে উদ্ধার করা, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রাকে উচ্চতর সুরে বেঁধে তোলা —সে তো আমাদেরই কাজ—আমরা, যারা সাহিত্যের মন্দিরে আমাদের জীবন উৎসর্গ করেচি। আমরা যে-দেশেরই সন্তান হই না কেন আমাদের জীবনের এই এক উদ্দেশ্য। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ও মৈত্রী স্থাপনের এই সম্মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বের পাকা ভিৎ গাঁথতে হবে। মানবজাতিকে আত্মঘাতী সংগ্রাম ও উন্মত্ত কুসংস্কারের বর্ব্বরতা থেকে রক্ষা করবে এই মিলনের উপনিবেশ। নূতন যুগের সূচনা করব আমরা—শুভ বুদ্ধির যুগ, সহযোগিতার যুগ, যার মধ্যে ভাবের পরস্পর আদান প্রদানের দ্বারা মনুষ্যত্বের বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

বন্ধুগণ, প্রাণের মধ্যে এই অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজ আমি আপনাদের মাঝখানে এসেচি। আমার প্রাণের এই গোপন কথাটি আজ আপনাদের বলি, যে গোপন উদ্দেশ্য গভীরতম অন্তরে পোষণ করে আজ আপনাদের দেশে বেড়াতে এসেচি। আমার আহ্বান এই—আসুন আমরা পরস্পর মিলিত হয়ে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিদ্বেষের মূল ছিন্ন করে দিই, মানুষে মানুষে সহজ বিশ্বাসের নিত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করি। ইতিহাসের গৌরবের যুগে আপনাদের আরব সভ্যতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের অর্দ্ধেকেরও বেশী জায়গা জুড়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল; আজও ভারতবর্ষের মুসলমান অধিবাসীদের আশ্রয় করে আমার দেশের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে আরব সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত আছে। আজ আরবসাগর পার হয়ে আসুক আপনাদের বাণী বিশ্বজনীন আদর্শ নিয়ে; আপনাদের পুরোহিতরা আসুন তাঁদের বিশ্বাসের আলো নিয়ে: জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ও ধর্ম্মভেদ প্রেমের মধ্যে অতিক্রম করে সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ সখ্যের সহযোগিতায় মিলিয়ে দিন তাঁরা।

মানুষের মধ্যে যা কিছু পবিত্র ও শাশ্বত তারই নামে আজ আমি আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা জানাই আপনাদের মহানুভব ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতার নামে আজ আ-

আপনাদের অনুরোধ করি,—মানুষে মানুষে প্রীতির আদর্শ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার গত পার্থক্য নির্ব্বিবাদে সহ্য করার আদর্শ, সহযোগিতার উপর সভ্য জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবার আদর্শ প্রতিবেশীর প্রতি ভ্রাতৃভাবের আদর্শ আজ আপনারা সকলের সম্মুখে প্রচার করুন। আমাদের ধর্ম্ম সমূহ আজ হিংস্র ভ্রাতৃহত্যার বর্ব্বরতায় কলুষিত, তারই বিষে

স্বর্ণ মসজিদ—বোগদাদ

ভারতের জাতীয় চেতনা জর্জ্জরিত, স্বাধীনতার দিকে ভারতের অভিযান আজ বাধাপ্রাপ্ত। তাই আমার প্রার্থনা তমসাচ্ছন্ন কুবুদ্ধিজনিত সমস্ত কুসংস্কার ও মোহ অতিক্রম করে আজ আপনাদের কবিদের, আপনাদের চিন্তাবীরদের বাণী আমার দুর্ভাগা দেশে প্রেরণ করুন, তাকে দেখিয়ে দিন কল্যাণের পথ, দেখিয়ে দিন নৈতিক বিনষ্টি থেকে মুক্তিলাভের পথ।

বন্ধুগণ, আজ আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে স্বদেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অভাব মোচন করাতেই জাতীয় আত্মপ্রকাশের সকল দায়িত্ব শেষ হয় না,—দেশ কালের সীমানা অতিক্রম করে আপনাদের বাণী পৌঁছন চাই সেইখানে যেখানে মনুষ্যত্বের নৈতিক সমস্যাগুলি আপনাদের বিচার ও বিবেচনার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

প্রয়োজন হলে দ্বিধা না করেই সত্যবাক্য শোনাতে হবে। আজ সেই মহাপ্রয়োজন সমাগত। আপনাদের সমধর্ম্মী ভারতবাসীরা আজ প্রতীক্ষা করে আছে আপনাদের কাছে থেকেই নূতন বাণী শুনবে, বীর্য্যের বাণী, মিলনের বাণী, সকল ধর্ম্মকে কল্যাণের যোগে শ্রদ্ধা করবার মানবোচিত শুভবুদ্ধির বাণী। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

বন্দনা স্নানাদি সারিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল পিতা ইতিপূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া লইয়াছেন। একখানা জমকালো গোছের আরাম কেদারায় বসিয়া চোখে চশমা দিয়া সংবাদ-পত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পাশের ছোট্ট টেবিলের উপর একরাশ খবরের কাগজ এবং কাছে দাঁড়াইয়া দ্বিজদাস সেইগুলি তারিখ মিলাইয়া গুছাইয়া দিতেছে। ট্রেনের মধ্যে ও কাজের ভিড়ে কয়েকদিনের কাগজ দেখিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। কন্যাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চোখ তুলিয়া কহিলেন, মা, আমরা দু'টোর গাড়ীতেই কলকাতা যাবো স্থির করলাম। দিদির বাড়ীতে দিনকতক যদি তোমার থাক্‌বার ইচ্ছে হয় তো ফেরবার পথে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আমি সোজা বোম্বাই চলে যাবো। কি বল?

কলকাতায় তোমার ক'দিন দেরি হবে বাবা?

পাঁচ-সাতদিন—দিন আষ্টেক,—তার বেশি নয়।

কিন্তু তারপরে আমাকে বোম্বায়ে নিয়ে যাবে কে?

সে ব্যবস্থা একটা অনায়াসে হতে পারবে। এই বলিয়া তিনি একটু ভাবিয়া কহিলেন, তা' বেশ, ইচ্ছে হয় এই ক'টা দিন তুমি সতীর কাছে থাকো, ফেরবার পথে আমিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো, কেমন?

বন্দনা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা মেজদিকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

দ্বিজদাস কহিল, বৌদি রান্না-ঘরে ঢুকেছেন,—হয়ত দেরি হবে। হাতের বাণ্ডিলটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কি দেব?

খবরের কাগজ? ও আমি পড়িনে।

কাগজ পড়েন না ?

না। ও আমার ধৈর্য্য থাকেনা। সন্ধ্যাবেলা বাবার মুখে গল্প শুনি, তাতেই আমার ক্ষিধে মিটে।

আশ্চর্য্য। আমি ভেবেছিলাম আপনি নিশ্চয়ই খুব বেশি পড়েন।

বন্দনা বলিল, আমার সম্বন্ধে কিছুই না জেনে অমন ভাবেন কেন ? ভারি অন্যায়।

দ্বিজু অপ্রতিভ হইয়া উঠিতেছিল, বন্দনা হাসিয়া কহিল, আপনারা কে কতটা দেশোদ্ধার করলেন, এবং ইংরেজ তাতে রেগে গিয়ে কতখানি চোখ রাঙালে তার কিছুতেই আমার কৌতূহল নেই। আছে বাবার। ঐ দেখুন না একেবারে খবরের তলায় তলিয়ে গেছেন,—বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত নেই।

সাহেবের কানে বোধ করি শুধু মেয়ের "বাবা" কথাটাই প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু চোখ তুলিবার সময় পাইলে না, বলিলেন, একটু সবুর কর—বলচি। ঠিক এই জবাবটাই আমি খুঁজছিলাম।

মেয়ে মুচকিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কহিল, তুমি খুঁজে খুঁজে সারাদিন পড়ো বাবা, আমার একটুও তাড়াতাড়ি নেই। দ্বিজদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মেজদির মুখে শুনেচি আপনার মস্ত লাইব্রেরি আছে, বরঞ্চ সেইখানে চলুন, দেখিগে আপনার কত বই জমেছে।

চলুন।

লাইব্রেরি ঘরটা তেতালায়। মস্ত চওড়া সিঁড়ি, উঠিতে উঠিতে দ্বিজদাস কহিল, লাইব্রেরি বেশ বড়ই বটে, কিন্তু আমার নয়, দাদার। আমি শুধু কোথায় কি বই বেরুলো সন্ধান নিই এবং হুকুম মত কিনে এনে দিই।

কিন্তু পড়েন তো আপনি ?

সে কিছুই নয়। পড়েন যাঁর লাইব্রেরি তিনি স্বয়ং। আশ্চর্য্য শক্তি এবং তেমনি অদ্ভুত মেধা তাঁর।

কে ? দাদা ?

হাঁ। ইউনিভারসিটির ছাপ-ছোপ বিশেষ কিছু তাঁর গায়ে লাগেনি সত্যি, কিন্তু মনে হয় এতবড় বিরাট পাণ্ডিত্য এদেশে কম লোকেরই আছে। হয়ত নেই। আপনার ভগিনীপতি তিনি, কখনো দেখেননি তাঁকে ?

না। কিরকম দেখ্‌তে ?

ঠিক আমার উল্টো। যেমন দিন আর রাত। আমি কালো তাঁর বর্ণ সোনার মত। গায়ের জোর তাঁর এ অঞ্চলে বিখ্যাত। লাঠি, তলোয়ার বন্দুকে এদিকে তাঁর জোড়া নেই। একা মা ছাড়া তাঁর মুখের পানে চেয়ে কথা কইতেও কেউ সাহস করেনা।

বন্দনা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমর মেজদিও না।

দ্বিজদাস বলিল, না, আপনার মেজ্‌দিও না।

ভয়ানক বদ্‌রাগী বুঝি ?

না, তাও না। ইংরেজীতে যে অ্যারিষ্টোক্র্যাট্‌ বলে একটা কথা আছে আমার দাদা বোধ করি কোন জন্মে তাদেরই রাজা ছিলেন। অন্ততঃ, আমার ধারণা তাই। বদ্‌রাগী কি না জিজ্ঞেসা করছিলেন? কোনরকম রাগারাগি করবার তাঁর অবকাশই হয় না।

বন্দনা কহিল, দাদার ওপর আপনার ভয়ানক ভক্তি ? না ?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, একথার জবাব যদি কখনো সম্ভব হয় আপনাকে আর একদিন দেব।

বন্দনা সবিস্ময়ে কহিল, তার মানে ?

দ্বিজদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, মানে যদি এখনই বলি আর একদিন জবাব দেবার প্রয়োজনই হবেনা। আজ থাক্‌।

মস্ত লাইব্রেরী। যেমন মূল্যবান আলমারি টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আস্‌বাব, তেম্‌নি সুশৃঙ্খলায় পরিপাটী করিয়া সাজানো। পল্লীগ্রামে এতবড় একটা বিরাট কাণ্ড দেখিয়া বন্দনা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বোম্বাই সহরে এবস্তুর অভাব নেই, সে তুলনায় এ হয়ত তেমন কিছু নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে বাস করিয়া কোন একজনের নিছক নিজের জন্য এত অধিক সঞ্চয় সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করিল, বাস্তবিক এত বই দাদা পড়েন নাকি ?

দ্বিজদাস বলিল, পড়েন এবং পড়েছেন। আলমারি বন্ধ নয়, কোন একটা বই খুলে দেখুননা তাঁর পড়ার চিহ্ন হয়ত চোখে পড়বে।

এত সময় পান কখন্‌? দিন-রাত শুধু এই-ই করেন না কি ?

দ্বিজু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। অন্ততঃ, আমি তো জানিনে। তা'ছাড়া আমাদের বিষয়-সম্পত্তি ভীষণ কিছু একটা না হলেও নিতান্ত কমও নয়। তার কোথায় কি আছে এবং হচ্চে সমস্ত দাদার চোখের ওপর। কেবল আজ বলে নয়, বাবা বেঁচে থাক্‌তেও এই ব্যবস্থাই বরাবর আছে। সময় পাবার রহস্য আমিও ঠিক খুঁজে পাইনে আপনার মত আমার বিস্ময়ও কম নয়,—তবে শুধু এই ভাবি যে জগতে মাঝে মাঝে দু' একজন জন্মায় তারা সাধারণ মানুষের হিসেবের বাইরে। দাদা সেই জাতীয় জীব আমাদের মত হয়ত এঁদের কষ্ট করে পড়তেও হয়না, ছাপার অক্ষর চোখের মধ্যে দিয়ে আপনিই গিয়ে মগজে ছাপ মেরে দেয়। কিন্তু দাদার কথা এখন থাক্‌। আপনি তাঁকে এখনো চোখে দেখেন নি, আমার মুখে এক-তরফা আলোচনা অতিশয়োক্তি হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আমার শুন্‌তে খুব ভালোই লাগ্‌চে।

কিন্তু কেবল ভালো-লাগাটাই তো সব নয়। পৃথিবীতে আমরা ও অত্যন্ত-সাধারণ আরও দশজন তো আছি ? একটি মাত্র অসাধারণ ব্যক্তিই যদি সমস্ত যায়গা জুড়ে বসে আমরা যাই কোথা ? ভগবান মুখটা তো কেবল পরের স্তব গাইতেই দেন নি ?

বন্দনা সহাস্যে কহিল, অর্থাৎ দাদাকে ছেড়ে এখন ছোট ভাইয়ের একটু স্তব গাইতে চান ;—এই তো ?

দ্বিজুও হাসিল, কহিল, চাইতো বটে, কিন্তু সুযোগ পাই কোথায় ? যারা পরিচিত তারা কান দেবে না, অচেনার কাছেই একটু গুণ্ গুণ্ করা চলে। কিন্তু সাহস পাইনে, ভয় হয় অভ্যাসের অভাবে নিজের স্তব নিজের মুখে হয়ত বেধে-বেধে যাবে।

বন্দনা বলিল, না যেতেও পারে,—চেষ্টা করে দেখুন। আমার বিশ্বাস পুরুষেরা এ বিদ্যেয় আজন্ম-সিদ্ধ। আর দেরি করবেন না, আরম্ভ করুন।

দ্বিজু মাথা নাড়িয়া কহিল, না, পেরে উঠবোনা। তার চেয়ে বরঞ্চ নিরিবিলি বসে দু'চারখানা বই দেখুন আমি মৈত্রদিকে পাঠিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই বন্দনা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, বেশতো আপনি ! না, একলা ফেলে আমাকে যাবেন না। বই আমি অনেক পড়েচি, তার দরকার নেই। আপনি গল্প করুন আমি শুনি ।

কিসের গল্প।

আপনার নিজের।

তাহলে একটু সবুর করুন, আমি এক্ষুণি নীচে গিয়ে ঢের ভালো বক্তা পাঠিয়ে দিচ্চি।

বন্দনা বলিল, পাঠাবেন মেজ্‌দিকে তো ? তার দরকার নেই। তাঁর বল্‌বার যা' কিছু ছিল চিঠিতেই শেষ হ'য়ে গেছে। সে গুলো সত্যি কিনা এখন তাই শুন্‌তে চাই।

দ্বিজদাস বলিল, না সত্যি নয়। অন্ততঃ বারো-আনা মিথ্যে। আচ্ছা, আপনি নাকি শীঘ্রই বিলেতে যাচ্চেন ?

বন্দনা বুঝিল, এই লোকটি নিজের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে চায়না এবং জিদ্ করার মত ঘনিষ্ঠতা অশোভন হইবে। কহিল, বাবার ইচ্ছে তাই। ইস্কুলের বিদ্যেটা তিনি সেখানে গিয়েই শেষ করতে বলেন। আপনিও কেন চলুন না ?

দ্বিজদাস বলিল, আমার নিজের আপত্তি নেই কিন্তু টাকা পাবো কোথায় ? সেখানে ছেলে পড়িয়েও চল্‌বেনা, এবং এত ভার বৌদিদের ওপরেও চাপাতে পারবোনা। এ আশা বৃথা।

শুনিয়া বন্দনা হাসিল। কহিল, দ্বিজুবাবু, এ আপনার রাগের কথা। নইলে, যে অর্থ আপনাদের আছে তাতে শুধু নিজে নয়, ইচ্ছে কর্‌লে এ গ্রামের অর্দ্ধেক লোককে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। বেশ, সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্চি, আপনি যাবার জন্য প্রস্তুত হোন্।

দ্বিজু কহিল, সে ব্যবস্থা হবার নয়। টাকা প্রচুর আছে সত্যি, কিন্তু সে সব দাদার, আমার নয়। আমি দয়ার ওপর আছি বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

বন্দনা পুনরায় হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, অত্যুক্তি যে কি এবং কোনটা সে আমিও বুঝি। কিন্তু এও রাগের কথা। মেজদির চিঠিতে একবার শুনেছিলাম যে, যে-সম্পত্তি আপনি নিজে অর্জ্জন করেননি সে নিতে আপনি অনিচ্ছুক। এ কথা কি ঠিক নয় ?

দ্বিজদাস বলিল, যদি ঠিকও হয়, সে মানুষের ধর্ম্ম-বুদ্ধির কথা, রাগের নয়। কিন্তু এ-ই সমস্ত কারণ নয়।

সমস্ত কারণটা কি শুনতে পাইনে?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি স্বভাবতঃ এত কৌতূহলী নই এবং আমার এই আগ্রহ যে সৃষ্টি- ছাড়া আতিশয্য সে বোধ আমারও আছে, কিন্তু বোধ থাক্‌লেই সংসারের সব প্রয়োজন মেটেনা—অভাব হাঁ করে চেয়ে থাকে। আপনার কথা আমি এত বেশি শুনেচি যে আপনি প্রথম যখন ঘরে ঢুক্‌লেন অপরিচিত বলে আপনাকে মনেই হল না,—যেন কতবার দেখেচি এম্‌নি সহজে চিন্‌তে পারলুম! মেজদিকে এত কথা বল্‌তে পেরেছেন, আর আমাকে পারেন না? আর কিছু না হোক্, তাঁর মত আমিও তো একজন আত্মীয়া।

কথা শুনিয়া দ্বিজু অবাক্ হইয়া গেল। এবং অকস্মাৎ সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়িয়া তাহার সঙ্কোচ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সম্পূর্ণ অচেনা বয়স্থা কন্যার সহিত নির্জ্জনে এই ভাবে আলাপ করার ইতিহাস এই প্রথম, দেয়ালে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, এক ঘণ্টারও উপর কাটিয়া গেছে, ইতিমধ্যে নীচে কেহ যদি তাহাদের খুঁজিয়া থাকে এ বাটীতে তাহার জবাব যে কি সে ভাবিয়া পাইল না। হয়ত দাদা বাড়ী ফিরিয়াছেন, হয়ত মায়ের আহ্নিক সারা হইয়াছে—হঠাৎ সমস্ত দেহ-মন তাহার ব্যাকুল হইয়া যেন এক মুহূর্ত্তে সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া গেল, কিন্তু কিছুই করিতে না পারিয়া তেম্‌নি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কই, বল্‌লেন না? বলুন?

দ্বিজুর চমক্ ভাঙিল। কহিল, যদি বলি, আপনাকেই প্রথম বোলব। বৌদিকেও আজও বলিনি।

সে বোঝাপড়া তিনি করবেন। আমি কিন্তু না শুনে ছাড়বোনা।

বলা যে উচিত নয় এ সম্বন্ধে দ্বিজুর সংশয় ছিলনা, কিন্তু অনুরোধ যেন আদেশের মত—উপেক্ষা করারও তাহার শক্তি রহিলনা।

হতবুদ্ধির মত মিনিট খানেক চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বাবা আমাকে বস্তুতঃ কিছুই দিয়ে যান্‌নি।

বন্দনা চমকিয়া উঠিল,—ইস্! মিছে কথা। এ হতেই পারেনা।

প্রত্যুত্তরে দ্বিজু মাথা নাড়িয়া শুধু জানাইল, পারে।

কিন্তু তার কারণ?

বাবার বোধ হয় ধারণা জন্মেছিল আমাকে দিলে সম্পত্তি তাঁর নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ ধারণার কোন সত্যিকার হেতু ছিল?

ছিল। আমাকে বাঁচাবার জন্যে একবার তাঁর বহু টাকা নষ্ট হয়ে গেছে।

বন্দনার মনে পড়িল এই ধরণের একটা ইঙ্গিত একবার সতীর চিঠির মধ্যে ছিল। জিজ্ঞাসা করিল বাবা উইল করে গেছেন?

দ্বিজদাস বলিল, না।

বন্দনা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবু রক্ষে। আমি ভেবেচি বুঝি তিনি সাঁ; কিন্তু তাহার উপেক্ষাটাই বঞ্চিত করে গেছেন। তুমি একলা খেতে বসেচো

দ্বিজদাস কহিল, তাঁর নিজের ইচ্ছের অভাব ছিলনা, কিন্তু দাদা করতে দেন

দাদা করতে দেননি? আশ্চর্য্য!

দ্বিজু হাসিয়া বলিল, দাদাকে জান্‌লে আর আশ্চর্য্য মনে হবে না। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ঘরে তখনো চাকরে আলো দিয়ে যায়নি, আমি পাশের ঘরে একটা বই খুঁজ্‌ছিলাম, হঠাৎ বাবার কথা কানে গেল। দাদা বল্‌লেন, না। বাবা জিদ্‌ করতে লাগলেন, না কেন বিপ্রদাস? আমার পিতা-পিতামহ-কালের সম্পত্তি আমি নষ্ট হতে দিতে পারবোনা। পরলোকে থেকেও আমি শান্তি পাবোনা। তবুও দাদা জবাব দিলেন, না, সে কোনমতেই হতে পারে না। বাবা বল্‌লেন, তবুও তোমারি হাতে আমি সমস্ত রেখে গেলাম। যদি ভালো মনে কর দিয়ো, যদি তা না মনে করতে পারো তাকে দিয়োনা। এর পরেও বাবা দু'তিন বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি তিনি তাঁর মত পরিবর্ত্তন করেননি।

বন্দনা মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ কথা আর কেউ জানে?

কেউ না। জানেন শুধু দাদা, আর আমি জানি লুকিয়ে শুনেছিলাম বলে।

বন্দনা বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অস্ফুটে কহিল, সত্যিই আপনার দাদা অসাধারণ মানুষ।

দ্বিজদাস শান্তভাবে শুধু বলিল, হাঁ। কিন্তু এখন আমি নীচে যাই, আমার অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। আপনি বসে বসে বই পড়ুন যতক্ষণ না ডাক পড়ে।

বন্দনা হাসিয়া কহিল, এখন বই পড়বার রুচি নেই, চলুন আমিও যাই। অন্ততঃ আট-দশ দিন ত এখানে আছি,—বই পড়বার অনেক সময় পাবো।

দ্বিজদাস চলিতে উদ্যত হইয়াছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাবার সঙ্গে আজ কলকাতা যাবেন না?

না। তাঁর ফেরবার পথে বোম্বায়ে চলে যাবো।

দ্বিজদাস কহিল, বরঞ্চ, আমি বলি তাঁর ফেরবার পথেই আপনি কিছুদিন এখানে থেকে যাবেন।

বন্দনা কহিল, প্রথমে সেই ইচ্ছেই ছিল, কিন্তু এখন দেখ্‌চি তাতে ঢের অসুবিধে। আমাকে পৌঁছে দেবার কেউ নেই। কিন্তু আপনি যদি রাজি হন, আপনার পরামর্শ ই শুনি।

কিন্তু আমি তো তখন থাক্‌বো না। এই সোমবারে মাকে নিয়ে কৈলাসতীর্থে যাত্রা কোরব।

বন্দনার দুই চক্ষু আনন্দ ও উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—কৈলাস? কৈলাসে যাবেন? শুনেচি সে নাকি এক পরমাশ্চর্য্য বস্তু। সঙ্গে আপনাদের আর কে কে যাবেন?

ঠিক জানিনে, বোধ হয় আরও কেউ কেউ যাবেন।

আমাকে সঙ্গে নেবেন?

.। রহিল। বন্দনা ক্ষুণ্ণ অভিমানের কণ্ঠে জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়

। ঠিক সেই সময়ে আমাকে এখানে এসে থাক্‌বার সুপরামর্শ দিচ্চেন ?

দ্বিজ... খের পানে চোখ তুলিয়া শান্তভাবে কহিল, সত্যিই এই জন্যে পরামর্শ দিয়েছি বৌদি এত কথা লিখেচেন, কেবল এই খবরটিই দেননি যে আমাদের এটা কত বড় গোঁড়া-হিঁদুর বাড়ী এর আচার-বিচারের কঠোরতার কোন আভাস চিঠিতে পাননি ?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

না ? আশ্চর্য্য। একটুখানি থামিয়া দ্বিজদাস বলিল, একা আমি ছাড়া আপনার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাবার লোক এ বাড়ীতে কেউ নেই।

কিন্তু দাদা ?

না।

মেজদি ?

না, তিনিও না। আমরা চলে গেলে তবুও হয়ত দুদিন এখানে থাক্‌তে পারেন, কিন্তু মা থাক্‌তে একটা দিনও আপনার এ বাড়ীতে থাকা চলেনা।

বন্দনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল,—সত্যি বল্‌চেন ?

সত্যিই বল্‌চি।

ঠিক এমনি সময়ে নীচের সিঁড়ি হইতে সতীর ডাক শোনা গেল,—ঠাকুরপো ? বন্দনা ? তোমর দুটিতে কোরচ কি ?

যাচ্চি বৌদি,—সাড়া দিয়া দ্বিজদাস দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, বন্দনা পাংশু মুখে চাপা কণ্ঠে শুধু কহিল, এত কথা আমি কিছুই জানতুম না। ধন্যবাদ।

৬

বন্দনা নীচে আসিয়া দেখিল পিতা হৃষ্টচিত্তে আহারে বসিয়াছেন। সেই বসিবার ঘরের মধ্যেই একখানি ছোট টেবিলের উপর রূপার থালায় করিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে। একজন দীর্ঘাকৃতি অতিশয় সুশ্রী ব্যক্তি অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন,—তাঁহার দেহের শক্তিমান গঠন ও অত্যন্ত ফর্সা রং দেখিয়াই বন্দনা চিনিল যে ইনিই বিপ্রদাস। সতী সঙ্গেই আসিতেছিল, কিন্তু সে প্রবেশ করিল না, দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতে ইঙ্গিত করিয়া জানাইল যে, হাঁ ইনিই।

বাঙালীর মেয়েকে ইহা শিখাইবার কথা নহে, এবং ইতিপূর্ব্বে মাকে যেমন সে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়াছিল বড় ভগিনীপতিকেও তাহাই করিত, কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন তাহার সমস্ত মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। ইহার অনন্যসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধির বিবরণ দ্বিজদাসের মুখে না শুনিলে হয়ত এই প্রচলিত শিষ্টাচাররীতি লঙ্ঘন করিবার কথা তাহার মনেও উঠিত না, কিন্তু এই পরিচয়ই তাহাকে কঠিন করিয়া

তুলিল। দিদির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সে হাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিল বটে, কিন্তু তাহার উপেক্ষাটাই তাহাতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, কথা কহিল সে পিতার সঙ্গেই, বলিল, বাবা, তুমি একলা খেতে বসেচো, আমাকে ডেকে পাঠাওনি কেন?

সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, আমার যে গাড়ীর সময় হোলো মা, কিন্তু তোমার তো তাড়াতাড়ি নেই। বলিলেন,—আমি চলে গেলে তোমরা ধীরে-সুস্থে খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে।

সতী আড়াল হইতে ঘাড় নাড়িয়া ইহার অনুমোদন করিল। বন্দনা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, মেজ্‌দি, এতগুলো দামী রূপোর বাসন নষ্ট ক'র্‌লে কেন, বাবাকে এনামেল কিম্বা চিনে মাটির বাসনে খেতে দিলেই তো হোতো?

সাহেবের চিবানো বন্ধ হইল। অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ তিনি, কন্যার কথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিলেন না, ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিলেন—যেন দোষটা তাঁহার নিজেরই,—তাইতো, তাইতো এ আমি লক্ষ্য করিনি,—সতী কোথায় গেলে—আমাকে ডিশে খেতে দিলেই হোতো,—এঃ—

বিপ্রদাসের মুখ ক্রোধে কঠোর ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এতাবৎ এতবড় অপমান করিতে তাহাকে কেহ সাহস করে নাই, এই নবাগত কুটুম্ব মেয়েটি তাহাকে যেমন করিল। বাসন নষ্ট হইবার দুশ্চিন্তা একটা ছলনা মাত্র। আসলে ইহা তাহাদের আচারনিষ্ঠ পরিবারের প্রতি নির্লজ্জ ব্যঙ্গ, এবং খুব সম্ভব তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া। এ দুরভিসন্ধি কে তাহার মাথায় আনিয়া দিল বিপ্রদাস ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু যেই দিক্‌, এই ভালো মানুষ বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে উপলক্ষ সৃষ্টি করার কদর্য্যতায় তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না। কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমার দিদির কাছে শোনোনি যে এ গোঁড়া হিন্দুর বাড়ী? এখানে এনামেল বলো, চিনে মাটিই বলো কিছুই ঢোকবার যো নেই—শোনোনি?

বন্দনা কহিল, কিন্তু দামী পাত্রগুলো তো নষ্ট হ'য়ে গেলো?

সাহেব ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু শুনেচি ঘি মাখিয়ে একটুখানি পুড়িয়ে নিলেই—

বিপ্রদাস এ কথায় কান দিল না, যেমন বলিতেছিল তেমনি বন্দনাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিল, এ বাড়ীতে রূপোর বাসনের অভাব নেই, কিন্তু বিশেষ কোন কাজে লাগে না। তোমার বাবা সম্বন্ধে আমার গুরুজন, এ বাড়ীতে অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি, রূপোর বাসনের যত দামই হোক্‌, তাঁর মর্য্যাদার কাছে একেবারেই তুচ্ছ,—তোমাদের আসার উপলক্ষে কতকগুলো যদি নষ্ট হয়েই যায়,—যাক্‌ না। এই বলিয়া একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার দিদির মতো তোমারও যদি কোন গোঁড়াদের বাড়ীতে বিয়ে হয়, তোমার বাবা এলে তাকে মাটির সরাতে খেতে দিয়ো, ফেলা গেলে কারও গায়ে লাগবে না। কি বল বন্দনা?

ইস্‌, তাই বই কি। বাবার জন্যে আমি সোনার পাত্র গড়িয়ে রেখে দেবো।

বিপ্রদাস হাসিমুখে উত্তর দিল, সে তুমি পারবে না। যে পারে সে বাপের সম্বন্ধে অমন কথা মুখে আনতেও পারে না। এমন কি অপরকে অপমান করার জন্যেও না। তোমার বাবাকে তুমি যত ভালোবাসো আর একজন তার কাকাকে বোধ করি তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে।

শুনিয়া সাহেবের মনের উপর হইতে যে একটা ভার নামিয়া গেল তাই নয়, সমস্ত অন্তর খুশীতে ভরিয়া গেল। বলিলেন, তোমার এই কথাটা বাবা, ভারি সত্যি। দাদা যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন সতী খুবই ছোট, বিদেশে চাক্‌রি নিয়ে থাকি, সর্ব্বদা বাড়ী আসা ঘটেনা, আর এলেও সমাজের শাসনে একলাটি থাকতে হয়, কিন্তু সতী ফাঁক পেলেই আমার কাছে ছুটে আসতো,—

বন্দনা তাড়াতাড়ি বাধা দিল,—ওসব কথা থাক্‌না বাবা—

না না, আমার যে সমস্তই মনে আছে,—মিথ্যে তো নয়। একদিন আমার সঙ্গে একপাতে খেতেই বসে গেলো--তার মা তো এই দেখে—

আঃ বাবা, তুমি যে কি বলো তার ঠিকানা নেই। কবে আবার মেজদি তোমার সঙ্গে,—তোমার কিচ্ছু মনে নেই।

সাহেব মুখ তুলিয়া প্রতিবাদ করিলেন,—বাঃ মনে আছে বই কি। আর পাছে এই নিয়ে একটা গোলমাল হয়, তাই তোমার মা সেদিন কি রকম ভয়ে ভয়ে—

বন্দনা বলিল, বাবা, আজ তুমি নিশ্চয় গাড়ী ফেল করবে। ক'টা বেজেছে জানো?

সাহেব ব্যস্ত হইয়া পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিলেন, সময় দেখিয়া নিরুদ্বেগের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুই এমন ভয় লাগিয়ে দিস যে চম্‌কে উঠ্‌তে হয়। এখনো ঢের দেরী,—অনায়াসে গাড়ী ধরা যাবে।

বিপ্রদাস সহাস্যে সায় দিয়া বলিল, হাঁ গাড়ীর এখনো ঢের দেরি। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আহার করুন, আমি নিজে ষ্টেশনে গিয়ে আপনাকে তুলে দিয়ে আসবো। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বারের আড়াল হইতে সতী নিকটে আসিয়া দাঁড়াতেই বন্দনা অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি বাবা কি কাণ্ড করলেন শুনেচো?

সতী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

বন্দনা বলিল, তোমার শাশুড়ীর কানে গেলে হয়ত তোমাকে দুঃখ পেতে হবে। না মেজ্‌দি?

সতী কহিল, হয় হবে। এখন থাক্, কাকা শুন্‌তে পাবেন।

কিন্তু তোমার স্বামী,—তিনিও যে নিজের কানেই সমস্ত শুনে গেলেন এ অপরাধের মার্জ্জনা বোধ করি তাঁর কাছেও নেই?

সতী হাসিল, কহিল, অপরাধ যদি সত্যই হয়ে থাকে আমিই বা মার্জ্জনা চাইবো কেন? সে বিচার আমি তাঁর পরেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। যদি থাকো নিজের চোখেই দেখ্‌তে পাবে। কাকা তোমাকে আর কি এনে দেবো বল?

সাহেব মুখ তুলিয়া কহিলেন, যথেষ্ট যথেষ্ট,—আমার খাওয়া হয়ে গেছে মা, আর কিছুই চাইনে এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্রমশঃ, ষ্টেশনে যাত্রা করিবার সময় হইয়া আসিল ; নীচে গাড়ীবারান্দায় মোটর অপেক্ষা করিতেছে, বিছানা ব্যাগ প্রভৃতি আর একখানা গাড়ীতে চাপানো হইয়াছে, সাহেব নিকটে দাঁড়াইয়া বিপ্রদাসের সহিত কথা কহিতেছেন, এমনি সময়ে বন্দনা কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

পিতা বিস্মিত হইলেন,—এই রোদে ষ্টেসনে গিয়ে লাভ কি মা?

বন্দনা বলিল,—শুধু ষ্টেসনে নয়, কলকাতায় যাবো। যখন বোম্বায়ে যাবে, আমি তোমার সঙ্গেই চলে যাবো।

বিপ্রদাস অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, সে কি কথা? তুমি দিন কতক থাকবে বলেই ত জানি।

বন্দনা উত্তরে শুধু কহিল, না।

কিন্তু তোমার ত এখনো খাওয়া হয়নি?

না, দরকার নেই। কলকাতায় পৌঁছে খাবো।

তুমি চলে যাচ্ছো তোমার মেজদি শুনেছেন?

বন্দনা কহিল, ঠিক জানিনে। আমি চলে গেলেই শুনতে পাবেন।

বিপ্রদাস বলিলেন, তুমি না খেয়ে অমন কোরে চলে গেলে সে ভারি কষ্ট পাবে।

বন্দনা মুখ তুলিয়া বলিল, কষ্ট কিসের? আমাকে ত তিনি নেমন্তন্ন করে আনেননি যে না খেয়ে চলে গেলে তাঁর আয়োজন নষ্ট হবে। তিনি নির্ব্বোধ নয়, বুঝবেন। এই বলিয়া সে আর কথা না বাড়াইয়া দ্রুতপদে গাড়ীতে গিয়া বসিল।

সাহেব মনে মনে বুঝিলেন কি একটা হইয়াছে। না হইলে হঠাৎ অকারণে কোন কিছু করিয়া ফেলিবার মেয়ে সে নয়। শুধু বলিলেন, আমিও জান্‌তাম ও দিন-কয়েক সতীর কাছেই থাকবে। কিন্তু একবার যখন গাড়ীতে গিয়ে উঠেছে তখন আর নামবেনা।

বিপ্রদাস জবাব দিলেন না, নিঃশব্দে তাহার পিছনে-পিছনে গিয়া মোটরে উঠিলেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অকস্মাৎ উপরের দিকে চাহিতেই বন্দনা দেখিতে পাইল তেতালার লাইব্রেরি ঘরের খোলা-জানালার গরাদে ধরিয়া দ্বিজদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখো-চোখি হইতেই সে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

ষ্টেসনে পৌঁছিয়া খবর পাওয়া গেল কোথায় কি-একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য ট্রেনের আজ বহু বিলম্ব,—বোধ করি বা এক ঘণ্টারও বেশি লেট হইবে। পরিচিত ষ্টেসন মাষ্টারটিও হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় একজন মাদ্রাজী রিলিভিং হ্যাণ্ড কাল হইতে কাজ করিতেছিল সে সঠিক সম্বাদ কিছু দিতে পারিল না, শুধু অনুমান করিল যে দেরী একঘণ্টাও হইতে পারে দু'ঘণ্টাও হইতে পারে। বিপ্রদাস সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কলকাতায় পৌঁছতে রাত্রি হয়ে যাবে, আজ কি না গেলেই চলে না?

কেন চল্‌বে না? আমার তো—

বন্দনা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না বাবা, সে হয় না। একবার বেরিয়ে এসে আর ফিরে যাওয়া চলে না।

বিপ্রদাস অনুনয়ের সুরে কহিল, কেন চল্‌বে না বন্দনা? বিশেষতঃ, তুমি না খেয়ে এসেচো, সারাদিন কি উপোস করেই কাটাবে?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার ক্ষিধে নেই। ফিরে গেলেও আমি খেতে পারবো না।

সাহেব মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন, কহিলেন, এদের শিক্ষা-দীক্ষাই আলাদা। একবার জিদ্ ধর্‌লে আর টলানো যায় না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল, আর অনুরোধ করিল না।

ষ্টেসনটি বড় না হইলেও একটি ছোট গোছের ওয়েটিঙ্ রুম ছিল, সেখানে গিয়া দেখা গেল একজন ছোকরা বয়সের বাঙালী সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী ঘরখানি পূর্ব্বাহ্ণেই দখলে আনিয়াছেন। সাহেব সম্ভবতঃ ব্যারিষ্টার কিম্বা ডাক্তার কিম্বা বিলাতি পাশ-করা প্রফেসারও হইতে পারেন। এ অঞ্চলে কোথায় আসিয়াছিলেন সে একটা রহস্য। আরাম কেদারার দুই হাতলে পদদ্বয় দীর্ঘ প্রসারিত করিয়া অর্দ্ধ সুপ্ত। আকস্মিক জনসমাগমে মাত্র চক্ষুরুন্মীলন করিলেন,—ভদ্রতা প্রকাশের উদ্যম ইহার অধিক অগ্রসর হইল না। কিন্তু মহিলাটি চেয়ার ছাড়িয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হয়ত মেম-সাহেব হইয়া উঠিতে তখনও পারেন নাই, কিন্তু উঁচু গোড়ালির জুতা ও পোষাক-পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া মনে হয় এ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না।

ঘরের মধ্যে আর একখানা আরাম চৌকি ছিল, বন্দনা পিতাকে তাহাতে বসাইয়া দিয়া নিজে একখানি বেঞ্চি অধিকার করিয়া বসিল, এবং অত্যন্ত সমাদরে বিপ্রদাসকে আহ্বান করিয়া বলিল, জামাইবাবু, মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন কেন, আমার কাছে এসে বসুন। বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই, আপনার জাত যাবে না।

শুনিয়া বন্দনার পিতা অল্প একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, বিপ্রদাসের ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাচ-বিচার কি খুব বেশি নাকি?

বিপ্রদাস নিজেও হাসিল, বলিল, বাচ-বিচার আছে, কিন্তু কি হ'লে খুব বেশি হয় না জান্‌লে এ-প্রশ্নের জবাব দিই কি কোরে?

বৃদ্ধ কহিলেন, এই ধরো বন্দনা যা' বল্‌লেন?

বিপ্রদাস কহিল, উনি না খেয়ে ভয়ানক রেগে আছেন। মেয়েরা রাগের মাথায় যা' বলে তা নিয়ে আলোচনা হয় না।

বন্দনা বলিল, আমি রেগে নেই,—একটুও রেগে নেই।

বিপ্রদাস কহিল, আছো, এবং খুব বেশি রকমই রেগে আছো। নইলে আজ তুমি কলকাতায় না গিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে। তা'ছাড়া তোমার আপনিই মনে পড়্‌তো যে এইমাত্র আমরা এক গাড়ীতেই এলাম, জাত গিয়ে থাক্‌লে আগেই গেছে, বেঞ্চিতে বসার কথাটা শুধু তোমার ছল মাত্র।

বন্দনা বলিল, হোক্ ছল, কিন্তু সত্যি বলুন তো জামাইবাবু, আমাদের ছোঁয়া-ছুঁয়ি করার জন্যে ফিরে গিয়ে আপনাকে আবার স্নান করতে হবে কি না?

চলোনা, বাড়ী ফিরে গিয়ে নিজের চোখে দেখ্‌বে?

না। জানেন আপনি, মাকে প্রণাম করতে গেলে তিনি ছোঁবার ভয়ে দূরে সরে গিয়েছিলেন? বলিতে বলিতেই তাহার মুখ ক্রোধে ও লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস ইহা লক্ষ্য করিল। উত্তরে শুধু শান্তভাবে বলিল, কথাটা মিথ্যে নয়, অথচ সত্যিও নয়। এর আসল কারণ তাঁর কাছে না থাকলে তুমি বুঝ্‌তে পারবে না। কিন্তু সে সম্ভাবনা ত নেই।

না, নেই।

এই তীব্র অস্বীকারের হেতু এতক্ষণে বিপ্রদাসের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনে মনে তাহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। ক্ষোভ নানা কারণে। বিমাতার সম্বন্ধে কথাটা আংশিক সত্য মাত্র, এবং সে নিজেও যেন ইহাতে কতকটা জড়াইয়া গেছে। অথচ, বুঝাইয়া বলিবার সুযোগও নাই, সময়ও নাই। অন্যপক্ষে, ধীর-চিত্তে বুঝিবার মত মনোবৃত্তিরও বন্দনার একান্ত অভাব। সুতরাং, চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় ছিল না,—বিপ্রদাস একেবারেই স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ছোকরা সাহেব পা নীচে নামাইয়া হাই তুলিয়া বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই জমিদার বিপ্রদাস বাবু, না?

হাঁ।

আপনার নাম শুনেচি। পাশের গাঁয়ে আমার স্ত্রীর মামার বাড়ী, বেঙ্গলে যখন আসা-ই হোলো তখন ওঁর ইচ্ছে একবার দেখা করে যান। তাই আসা। আমি পঞ্জাবে প্র্যাক্‌টিস্ করি।

বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল লোকটি তাহারই সমবয়েসী,—এক আধ বছরের এদিক-ওদিক হইতে পারে, তার বেশি নয়।

সাহেব কহিতে লাগিল, কালই আপনার কথা হচ্ছিল। লোকে বলে আপনি ভয়ানক,—অর্থাৎ কিনা খুব কড়া জমিদার। অবশ্য, দু'চারজন বামুন-পণ্ডিতে গোঁড়া হিঁদু বলে বেশ তারিফও করলে। এখন দেখ্‌চি কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়।

অপরিচিতের এই অযাচিত আলোচনায় বন্দনা ও তাহার পিতা উভয়েই আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু বিপ্রদাস কোন উত্তর দিল না। বোধ হয় সে এম্‌নিই অন্যমনস্ক ছিল যে সকল কথা তাহার কানে যায় নাই।

তিনি পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, আমার লেক্‌চারে আমি প্রায়ই বলে থাকি যে চাই রিয়েল, সলিড্ শিক্ষা,—ফাঁকিবাজি, ধাপ্পাবাজি নয়। আপনার উচিত একবার ইয়োরোপ ঘুরে আসা। সেখানকার আব-হাওয়া, সেখানকার ফ্রি এয়ার ব্রিদ্ করে না এলে মনের মধ্যে freedom আসে না,—কুসংস্কার থেকে মন মুক্ত হতে চায় না। আমি একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর সে-দেশে ছিলাম।

বন্দনার পিতা শেষ কথাটায় খুসী হইয়া কহিলেন, এ কথা সত্যি।

উৎসাহ পাইয়া তিনি গরম হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, এই ডিমোক্রাসির যুগে সবাই সমান, কেউ কারো ছোট নয়, এবং চাই প্রত্যেকেরই নিজের অধিকার জোর করে assert করা,—consequence তার যা-ই কেননা হোক্। আমার টাকা থাক্‌লে আপনার জমিদারীর প্রত্যেক প্রজাকে আমি নিজের খরচে ইউরোপ ঘুরিয়ে আনতাম। নিজের right কাকে বলে, একথা তারা তখন নিজেরাই বুঝ্‌তো।

বন্দনার বোধকরি ভারি খারাপ লাগিল, সে আস্তে আস্তে কহিল, জামাইবাবু তাঁর প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেন এ খবর আপনাকে কে দিলে? আশা করি আপনার মামা-শ্বশুরের ওপর কোন জুলুম হয়নি?

ও—উনি বুঝি আপনার ভগিনীপতি? Thanks. না, তিনি কোন অভিযোগ করেন নি। নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া সহাস্যে কহিলেন, তোমার বোনেরা যদি এই রকম হোতো! আপনি বোধকরি বিলেত ঘুরে এসেছেন? যান্‌নি? যান্, যান্। Freedom, সাহস, শক্তি কাকে বলে, সে-দেশের মেয়েরা সত্যি কি একবার স্বচক্ষে দেখে আসুন। আমি next time যাবার সময় ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবো স্থির করেচি।

কেহ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই ষ্টেসনের সেই রিলিভিঙ হ্যাণ্ডটি মুখ বাড়াইয়া জানাইল যে ট্রেন distance signal পার হইয়াছে,—আসিয়া পড়িল বলিয়া।

সকলে ব্যস্ত হইয়া প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গাড়ী দাঁড়াইলে দেখা গেল ছুটির বাজারে যাত্রী-সংখ্যার সীমা নাই। কোথাও তিল ধারণের যায়গা পাওয়া কঠিন। মাত্র একখানি ফার্ষ্ট ক্লাস ও আর একখানি সেকেণ্ড ক্লাস। সেকেণ্ড ক্লাস ভর্ত্তি করিয়া একদল ফিরিঙ্গী রেলওয়ে-সারভ্যাণ্ট কলিকাতায় কি একটা খেলার উপলক্ষে চলিয়াছে এবং বোধহয় তাহাদেরই কয়েকজন স্থানাভাবে ফার্ষ্টক্লাসে চড়িয়া বসিয়াছে। অপর্য্যাপ্ত মদ ও বিয়ার খাইয়া লোকগুলার চেহারাও যেমন ভয়ঙ্কর, ব্যবহারও তেমনি বে-পরোয়া। গাড়ীর দরজা আট্‌কাইয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—go! যাও—যাও!

ষ্টেসন মাষ্টার আসিল, গার্ড সাহেব আসিল, তাহারা গ্রাহ্যই করিল না।

ছোকরা সাহেব কহিলেন, উপায়?

বন্দনা ভয়ে ভয়ে কহিল, চলুন, আজ বাড়ী ফিরে যাই।

বিপ্রদাস বলিল, না।

না তো কি? না হয় রাত্রির ট্রেনে—

ছোকরা সাহেব বলিলেন, সে ছাড়া আর উপায় কি ? কষ্ট হবে, তা হোক।

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। গাড়ীতে চার পাঁচজন আছে আরও চার পাঁচজনের যায়গা হওয়া চাই।

বন্দনার পিতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, চাইতো জানি, কিন্তু ওরা সব মাতাল যে।

বিপ্রদাসের সমস্ত দেহ যেন কঠিন লোহার মত ঋজু হইয়া উঠিল, কহিল, সে ওদের সখ,—আমাদের অপরাধ নয়। উঠুন,—আমি সঙ্গে যাবো। এবং পরক্ষণেই গাড়ির হাতল ধরিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। বন্দনার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া কহিল, এসো। ছোকরা সাহেবকে ডাকিয়া বলিল, right assert করবেন ত' স্ত্রী নিয়ে উঠে পড়ুন। অত্যাচারী জমীদার সঙ্গে থাকতে ভয় নেই।

মাতাল সাহেবগুলা এই লোকটির মুখের পানে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে গিয়া ও-দিকের বেঞ্চে বসিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

নীললোহিত

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

বর্ত্তমান কালের সব চেয়ে উর্ব্বর সাহিত্য হ'চ্ছে ছোট গল্প। ছেলে বুড়ো নির্ব্বিশেষে মানুষ চিরদিন গল্প শুন্তে ভালবাসে। কিন্তু প্রাচীন কালে এই গল্পের বেশীর ভাগ চল্‌তো লোকের মুখে মুখে। কারণ লেখা পড়্‌তে পারে এ-রকম লোকের সংখ্যা ছিল যেমন কম, হাতে লিখে লেখার প্রচারও ছিল তেমনি কষ্টসাধ্য। শুধু মাত্র একটি ছোট গল্পের খাতিরে প্রাচীনেরা এ কষ্ট স্বীকারে রাজী ছিলেন না। সুতরাং সেকালে ছোটগল্প মুখ থেকে লেখায় প্রমোশন পেতো বড় আখ্যায়িকার অঙ্গে মিশে, না হয় নীতি ও ধর্ম্মোপদেশের বাহন হ'য়ে। সেইজন্য এ সব ছোট গল্পের উপাখ্যান ভাগটাই ছিল সর্ব্বস্ব, সাহিত্যিক গড়ন অকিঞ্চিৎকর। ছোট গল্পের রূপ দিয়ে সাহিত্য রচনা আধুনিক সাহিত্যের নূতন সৃষ্টি। এবং সেইজন্যই আধুনিক ছোট গল্পে রূপও এক নয়, বহু এবং বিচিত্র। কারণ এ গল্পের আখ্যায়িকাই একমাত্র বস্তু নয়, এমনি কি অনেক গল্পেই প্রধান বস্তু নয়। এ-কালের ছোট গল্প লেখক আখ্যায়িকাকে অবলম্বন ক'রে নানা চরিত্র ও রসের সৃষ্টি করেন, এবং বহু ভাবকে মূর্ত্তি দেন। এ সব চরিত্র, রস ও ভাব থেকে তফাৎ কর্‌লে গল্পাংশ যা পাওয়া যায় তা ছোট গল্প নয় ছোট গল্পের কঙ্কাল মাত্র। যারা ছোট গল্পের বড় লেখক, তাঁদের শ্রেষ্ঠ গল্পে অবশ্য গল্পাংশ থেকে তার চরিত্র ও ভাব সৃষ্টি প্রকৃত পক্ষে তফাৎ করা যায় না। গল্প গ'ড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এ গুলিও গ'ড়ে ওঠে তার অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে। সেজন্য কোনও পৃথক প্রযত্নের চিহ্ন তাঁদের গল্পের গায়ে পড়ে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও আধুনিক ছোট গল্পের মুখ্য কাজ নয় পাঠককে গল্প শোনান। গল্পের মুখে যে সব ভাব ও চরিত্রের সৃষ্টি হয় তারাই আধুনিক ছোট গল্পকে তার বিশেষ রূপটি দেয়। এবং আধুনিক ছোট গল্পের যে রস তা প্রধানত আসে তার ঘটনা থেকে নয়, ঐ ভাব ও চরিত্রের সৃষ্টি থেকে। সেইজন্যই গল্পলেখক যে বিশেষ সাহিত্যিক দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবী ও মানুষকে দেখেন তার আলোছায়ার খেলা তাঁর ছোট গল্পের সর্ব্বাঙ্গে দেখা যায়; এবং তাঁর মনের গড়ন তাঁর গল্পকে আকার দেয়।

'নীললোহিত' নাম দিয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের যে ছোট গল্পের বই সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে তার গল্পগুলিতে প্রমথবাবুর সাহিত্যিক মনের ছাপ সর্ব্বত্র। প্রত্যেক মানুষের দেহের চেহারা যেমন অন্য সবার চেহারা থেকে ভিন্ন, তেমনি মানুষ মাত্রেরই মনের চেহারা অন্য সকলের মন থেকে অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র। কিন্তু এমন মানুষ আছে যার চেহারা ভীড়ের মধ্যেও একাকার হ'য়ে যায় না, হাজার লোকের মধ্যেও বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে। প্রমথবাবুর মন এমনি ধারা বিশিষ্ট মন। সাহিত্যিকের মন স্বভাবতই আর পাঁচজনার মন থেকে একটু বেশী রকম স্বতন্ত্র, যে স্বাতন্ত্র্য তাকে সাহিত্য রচনার প্রেরণা দেয়। কিন্তু এমন মন আছে যার গড়ন ও ভঙ্গীর বিশেষত্ব সাহিত্যিক সমাজের বিশিষ্টতার মধ্যেও বিশেষ রকমে স্বতন্ত্র। প্রমথ বাবুর মনের প্রশস্ত বর্ত্তুলাংশ কপাল, দীর্ঘ উন্নত নাসিকা, বাষ্পলেশহীন স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ চোখ, কৌতুক ব্যঙ্গে ঈষৎ বাঁকা অধর—তাঁর মনের চেহারাকে এমন স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে যে হঠাৎ ভুলেও অন্য কোনও মনের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। এই মনের ছাপ 'নীললোহিতের' গল্পগুলির গায়ে পড়ায় পাঠকের যা প্রথমে মনে হয় সে হ'চ্ছে এ গল্পগুলি অন্য কোনও লেখকের ছোটগল্পের মত নয়; এদের ধরণ একবারে ভিন্ন। ছোট গল্পের শ্রেণীভাগে এ গল্পগুলিকে রাখ্‌তে হয় নিজেদের এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে।

'নীললোহিতের' এগারটি গল্পের মধ্যে একটি গল্পের

প্রধান চরিত্র স্ত্রী-চরিত্র নয়। একটিও গল্প নেই যার বিষয়-বস্তু হচ্ছে 'প্রেম'; অবশ্য নীললোহিতের সঙ্গে যারা প্রেমে পড়েছিল তাদের প্রেম ছাড়া। বাঙ্গলা সাহিত্যের ছোট গল্পের পুঁথিতে এ ব্যাপার অনন্যসাধারণ। অবশ্য এ বিশেষত্ব বাহ্যিক; কিন্তু এই বাহ্য বিশেষত্ব গল্পগুলির মূল গড়ন ও মূলে রসেরই ফল, তাদেরই বহিপ্রকাশ। কারণ এই গল্পগুলিতে বিন্দুমাত্র sentimentalism এর ছোঁয়া যে দূর থেকেও লাগেনি কেবল তাই নয়, কোনও passion এর সুরও একটুও চড়া গ্রামে ওঠে নি। প্রমথবাবুর সাহিত্যিক মন কেবলমাত্র সমস্ত রকম ভাবাতিশয্যের দিকে বিমুখ নয়, যে সব ভাবের আতিশয্যের দিকে প্রবণতা আছে তাকেও যতটা সম্ভব এড়িয়ে চল্‌তে চায়। মানুষের যে অবস্থা ও সম্পর্ক ঈষৎ ব্যঙ্গর তুলিতে ও কৌতুকের রঙ্গে আঁকলে সব চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে প্রমথবাবুর সৃষ্টি-ক্ষমতার সেইটি হ'ল সব চেয়ে অনুকূল ক্ষেত্র। তার কারণ বোধ হয় এখানে sentimentalism এর বাষ্প জম্‌তে পায় না, ভাবের তাপও প্রখর হ'য়ে উঠতে পারে না। সেইজন্য যে গল্পের ভিতরের সুর গভীর এবং পরিণাম ট্রাজিক প্রমথবাবু তাকেও হাসি-কৌতুক-ব্যঙ্গ দিয়ে অনাড়ম্বর লঘুতার সঙ্গে গ'ড়ে তুল্‌তে চান। এবং যে গল্পের কথাবস্তু তার অনুকূল সে গল্প অভিনব রসের একটি নবীন সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে।

এই পুঁথির 'ঝাঁপান খেলা' গল্পটি তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নমুনা। দেশী বিদেশী সেরা ছোটগল্পের তালিকায় এই গল্পটি অনায়াসে স্থান পাবে। নীচ অন্ত্যজ শ্রেণীর একটি পুরুষের প্রাণের প্রাচুর্য্যে পূর্ণ দেহ ও মন এবং সহজ বীরত্বের ছবি প্রমথবাবু হালকা তুলির টানে এমন জীবন্ত ও উজ্জ্বল ক'রে এঁকেছেন যে আনন্দ ও বিস্ময়ে মন ভ'রে ওঠে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় তা সম্ভব হ'য়েছে এইজন্য যে তাঁর প্রধান চরিত্র ও মূল গল্পের যে back ground প্রমথ বাবু দিয়েছেন তা যেমন জীবন্ত তেমনি পূর্ণ। গল্পের বক্তা 'হওয়া উচিত ছিল ডেপুটি' কিন্তু 'আসলে মুনসেফ্' বাবুটি থেকে আরম্ভ ক'রে, 'নীলকুঠেল সাহেবের কৃষ্ণপক্ষের মেম' টগর বিবি ও 'পেলাগ্' কুকুরটি পর্য্যন্ত রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে বেঁচে উঠেছে। মাত্র দশ পৃষ্ঠায় এই ছোট গল্পে প্রমথবাবু অনেকগুলি মানুষ ও মানুষেতর জীবের নাম ক'রেছেন, কিন্তু কাউকে শুধু নামমাত্র রাখেন নি। আশ্চর্য্য কৌশলে, —দুটি একটি কথায়, ছোট খাটো দু একটি ইঙ্গিতে—তাদের জীবন্ত, বিশিষ্ট রূপ পাঠকের চোখে ফুটিয়ে তুলেছেন। টগর বিবি যে সাহেবের কৃষ্ণপক্ষের হ'লেও মেম তাতে পাঠকের সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মে যখন শোনা যায় যে তার 'পেলাগের' গুণবর্ণনা হচ্ছে 'তার দাম চড়াবার জন্য।' বিবি যে, 'কুঠীর হেড বরকন্দাজ উমেশ সর্দ্দারের মেয়ে', এবং তার মুখের 'পেলাগ' যে 'ইংরাজী Pluck শব্দের বুনো অপভ্রংশ'—এই খবর টুকুতে নীলকুঠেল সাহেব ও তার সাঙ্গ পাঙ্গদের জানা ইতিহাস মনের মধ্যে আকার পায়। যে সংসারে বীরবল 'কুকুরের বাগন' হ'য়ে চাকরীতে ঢুক্‌লো তার কর্ত্তা গিন্নি,—মুনসেফ্ বাবুর বাপ মা, এবং তাঁদের অম্ল-মধুর গার্হস্থ্য সম্পর্ককে পৃথক প্রযত্নে স্বতন্ত্র ক'রে আঁকবার কোনও চেষ্টা না ক'রে, মূল গল্পের মুখে এবং বীরবলকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁদের উপর বীরবলের রূপ ও স্বরূপের প্রভাব প্রসঙ্গেই —প্রমথবাবু একবারে সজীব ক'রে তুলেছেন। 'ঝগড়ু'ও 'লখিয়া' গল্পের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত 'বেটা বাঁদরের বাচ্ছা' এবং 'কি সুন্দরী!'—মুন্সেফ বাবুর বাপের মুখের এই বর্ণনা—শুধু হ'য়েই ছিল, কিন্তু গল্প যখন চরমে পৌঁছিল তখন দু এক কথাতেই প্রথমবাবু তাদের বাঁচিয়ে তুলেছেন। ঝগড়ু ও ঝাঁপান খেলায় রাত্রিতে দলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু 'তুবড়ি বাজাবার ওস্তাদ হিসেবে', এবং 'অতি মাত্রায় মদ্যপানের ফলে সাপের সঙ্গে ইয়ারকির' ফল থেকে তাকে বাঁচাতে যেয়েই বীরবলের হাতে সাপের ছোবল পড়েছিল। 'লখিয়াকে' দেখা গেল সে 'সজোরে বীরবলের গা টিপ্‌ছে—সাপের বিষ ড'লে নাবাবার জন্য।' প্রমথবাবু তাঁর এই ছোট গল্পের ছোট্ট জগতটির উপর থেকে যেন ঢাকা খুলে দিয়েছেন, আর পাঠকের মনের চোখে জেগে উঠেছে ছেলে বুড়ো, ইতর ভদ্র, কুকুর ঘোড়ার এক টুক্‌রো গল্পের নয়, বাঁচা মানুষ ও জানোয়ারের প্রকৃত জগত। যেখানে হাস্য ও করুণ, 'কমিক' আর 'সাব্‌লাইম্' পাশাপাশি নয় একত্র মেশামিশি অভিনয় হচ্ছে। যেখানে লখিয়া বীরবলের সর্ব্বাঙ্গ থেকে সাপের বিষ নামাবার জন্য সজোরে তার গা

টিপছে, ও 'বীরবলের ভাই-ব্রাদারী থেকে থেকে বেহুলার যাত্রার ধুয়ো ধরেছে—"ও যে বাঁচবে না", এবং 'নামী রোজা' মঙ্গলা খৃষ্টান চণ্ডী ও মেরির দুয়ের মন্তরই লাগিয়ে দেখ্‌ছে কোনও ফল হয় কি না। আর এই প্রহসনের মধ্যেই একজন 'লালবেগীর' ছেলে তার অনায়াস সহজ বীরত্বে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করছে। বস্তুতন্ত্র ব'লে সাহিত্যে যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে এই বস্তু।

'ঝাঁপান খেলার' ঠিক আগের গল্প 'সহযাত্রী'—গল্পের মধ্যে বাস্তবের এই মায়া-সৃষ্টির আর একটি চমৎকার উদাহরণ। এ গল্পের ঘটনাস্থান ঝাঝাগামী Slow passenger গাড়ীর একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা, সুতরাং জনবিরল। বহু পাত্রপাত্রীর জীবন্ত পটভূমি সত্যের যে ভ্রান্তি জন্মায় এখানে তার অবসর নেই। কিন্তু পল্টনি ইংরেজ কর্ণেল সাহেব, এবং Court of wards এর ইংরেজ মাষ্টারের হা'তে তৈরি বাঙ্গালী জমীদার সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর —এ দুজনকে এমন সুস্পষ্ট রেখা ও উজ্জ্বল রং দিয়ে প্রমথবাবু এঁকেছেন যে তাদের গল্পের জগতের লোক ব'লে মোটেই মনে হয় না, এবং পরস্পরের বন্দুক সম্বন্ধে তাদের যে বাক্যালাপ তা সে সত্য ঘটনা নয় কল্পনার সৃষ্টি তা একটু চেষ্টা ক'রেই মনে আন্‌তে হয়। এ হচ্ছে শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সম্যক্ সৃষ্টি-ক্ষমতার ফল। বস্তু—জগতের কোনও অংশ তার চোখ এড়ায় না, এবং কোন অংশ সাহিত্যের সৃষ্টিতে স্থান দিলে সত্যের মায়া তার চারপাশে নেমে আসে তার অভ্রান্ত বোধ শিল্পীকে চালিয়ে নেয়। এ দৃষ্টি ও ক্ষমতা প্রমথবাবুর দু-ই অসাধারণ। অনেক নামকরা বিদেশী ছোটগল্প ও উপন্যাস আমাদের বাঙ্গালীর রুচিতে অনাবশ্যক বস্তু ভারাক্রান্ত ব'লে মনে হয়। কল্পনার সৃষ্টিকে সত্যের চেহারা দেবার জন্য বস্তুজগতের যতটা ছায়া এবং রচনার রস অনুযায়ী যে সব বিশেষ অংশের ছায়া প্রয়োজন তার অতিরিক্ত এবং অবান্তর বাস্তবতা যেন লেখক তার লেখায় আমদানী করেন। সে বাস্তবতা সাহিত্যের সৃষ্টিকে সজীব ক'রে তোলার কাজে কোনও সাহায্যে আসে না, বোঝার মত তার কাঁধে চেপে থাকে। আমাদের বাঙ্গলা গল্প উপন্যাসে প্রায়ই দেখা যায় এর বিপরীত ব্যাপার। কল্পনাকে মূর্ত্তি দিতে হ'লে বাস্তবের রক্ত-মাংস-হাড় যেটুকু না হ'লেই নয় তারও সেখানে অভাব ঘটে। ফলে লেখকের বস্তু-ভার-হীন কল্পনা কল্পলোকেই থেকে যায়, সৃষ্টির মর্ত্ত্যলোকে নেমে আসতে পারে না। বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যে বস্তু-তান্ত্রিক রচনা নামে যা চলে এ দৈন্য তাতেই সব চেয়ে বেশী। তার কারণ লেখকের ধারণা যে কতকগুলি বিশেষ রকম ভাবের নামই হচ্ছে বস্তু। সুতরাং কল্পনাকে সুস্পষ্ট আকার দিয়ে গ'ড়ে তোলার কোনও চেষ্টা না ক'রে বিশেষ এক শ্রেণীর ভাব-লোকে বিচরণকেই লেখক মনে করেন সাহিত্যে বস্তু-তন্ত্র। এই বিদেশী স্ফীতি ও স্বদেশী শীর্ণতার মধ্যে প্রমথবাবু দুর্লভ মধ্যপন্থা খুঁজে পেয়েছেন।

এমন বিষয়-বস্তু অবশ্য আছে বস্তুজগতের পূর্ণতার মধ্যে যাকে সাহিত্যে দাঁড় করান যায় না। সে পূর্ণতা থেকে রসের বিরোধী অংশকে নির্ম্মম হ'য়ে ছেটে ফেল্‌তে হয়। কারণ এমন রস আছে যা exclusive, যার অন্য রসের মিশ্রণ সহ্য হয় না। সত্যিকার জগতে যেখানেই 'কমিক' বস্তু আছে, তার সাহিত্যিক প্রতিরূপে সেখানেই তাকে আনা চলে না। যে গল্পের বিষয়-বস্তু এ রকমের সেখানে প্রমথবাবুর গল্প রচনার যেটি প্রিয় রীতি তার প্রয়োগ সম্ভব নয়। নীললোহিতের 'পূজার বলি' ও 'দিদিমার গল্প' এ দুটি গল্পের বিষয়-বস্তু এই ধরণের। কারণ এদের মূল রস হচ্ছে আলংকারিকেরা যার নাম দিয়েছেন 'ভয়ানক'। একটি ছোট গল্পের পরিসরের মধ্যে ও রসকে মনে জমিয়ে তুলতে হ'লে আর প্রায় সব রসকেই দূরে রাখতে হয়; এবং যখন এই ভয়ানকত্ব আসে মানুষের মনের ভাব ও passion থেকে তখন সে ভাব ও possion কেও গাঢ় রং দিয়ে আঁকতে হয়। প্রমথবাবুর মনের মধ্যে এই কাজের দিকে একটা বিমুখতা আছে। সেই জন্য 'পূজার বলি' গল্পে কোনও পাত্র পাত্রীকে সজীব ক'রে তোলার চেষ্টা করেন নাই, সুধু একটা ঘটনা ব'লে গেছেন। 'দিদিমার গল্প' তেও অনেকটা তাই। কেবল 'মহালক্ষ্মীকে' একটু ফুটিয়ে তুলেছেন, কারণ মহালক্ষ্মীর মধ্যে যে ভীষণত্ব সেটা সূক্ষ্ম অদ্ভুতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। নিজের অভ্যস্ত রীতির বাইরে, সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ক্ষেত্রেও যে প্রমথবাবুর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সৃষ্টি

ক্ষমতা নিজেকে সার্থক করতে পারে প্রমথবাবু তার প্রমাণ দিয়েছেন গত ফাল্গুনের "বিচিত্রায়" 'অহিভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি' গল্পটিতে। আশা করা যায় সে ক্ষেত্র থেকে প্রমথ বাবু হাত গুটিয়ে নেবেন না। কারণ নূতন ক্ষেত্রে তাঁর এই প্রথম সাধনা নিঃসন্দেহ সিদ্ধিলাভ করেছে।

যার নামে এ গল্পের বই-এর নাম সেই একাধারে গল্পের বক্তা ও নায়ককে যখন প্রমথবাবু মাসিক পত্রের সম্পাদকের তাড়ায় সৃষ্টি করেছিলেন, তখন মনে করেছিলেন সেই গল্পটিতেই ঘটবে 'নীললোহিতের' সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। নীল-লোহিতের' রোমাণ্টিক ডাকাতির সেই প্রথম গল্পটি পড়লেই তা বোঝা যায়। কিন্তু এ রকম সৃষ্টি এক গল্পেই লয় হয় না। নিজের সৃষ্টি কর্তাকে দিয়ে বার বার সে নিজেকে সৃষ্টি করায়। কারণ যদিচ নীল-লোহিত একটি বিশেষ মানুষ, তবুও সে হচ্ছে দার্শনিক ভাষায় যাকে বলা চলে একটি principle এবং সে principle হচ্ছে আধুনিক জগতে আরব্যোপন্যাসের principle। মাটির জগতের সত্য থেকে মুক্তির জন্য নীল-লোহিত রচনা করতেন 'কল্পলোকের সত্য কথা'। সে কথা পাঠককে মুক্তি দেয় গল্পলোকের সত্য কথা থেকে। কল্পনার সৃষ্টিকে সম্ভব অসম্ভবের অনুশাসন থেকে ছাড়া দিয়ে প্রাচীনেরা রচনা করতেন রূপকথা। কিন্তু রূপকথার অদ্ভুত রস আমাদের বস্তু-তান্ত্রিক কালে শিশুর ভোগ্য। অপোগণ্ডদের মন তাতে ভোলে না। অদ্ভুত রস তাদের পরিবেশন করতে হয় হাসির থালায়; আর আসন বাটি গ্লাস, নুন—লেবু লঙ্কা সব হওয়া চাই খাঁটি প্রকৃত জিনিষ। নীল-লোহিতের গল্প তিনটিতে এই অদ্ভুত-হাসি-বাস্তবের এক অপূর্ব্ব রস প্রমথবাবু পাঠকদের জন্য সৃষ্টি ক'রেছেন। গল্পগুলি extravaganza, কিন্তু তাদের প্রতি অংশ বাস্তবের ঠাস বুনোনি। মহারাজ কিরাতনাথের সঙ্গে গাড়ো পাহাড়ে খেদা ক'রতে গিয়ে নীল-লোহিতের হাতী ধরার বিবরণটি অদ্ভুত বীরত্বের বে-পরোয়া গল্প; কিন্তু খেদায় কি ক'রে হাতী ধরে তার নির্ভুল, সূক্ষ্ম বর্ণনার উপর হচ্ছে তার ভিত্তি। 'নীললোহিতের স্বয়ম্বর' গল্পে এই কৌশল চরমে পৌঁচেছে। সম্পূর্ণ অসম্ভব সব 'কমিক' ঘটনা ও অবস্থা একের পর আর প্রমথবাবু এমন অনায়াসে ও convincing রকমে তৈরী ক'রে চলেছেন যে দেখে চমক লাগে; কিন্তু ও সব-ই গ'ড়ে উঠেছে অতি বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রমথবাবু যে বহুরকম লোকের ধরণধারণ ও গতিবিধির আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন তার হুবহু বর্ণনার উপর। ভোজপুরী দরওয়ানদের সেনাপতি সেজে নীল-লোহিতের নুরনগর যাত্রার অদ্ভুত ব্যাপারটিতে ঐ দরওয়ান শ্রেণীর যে সব টাইপ প্রমথবাবু এঁকেছেন তা একবারে হোগার্থের ছবি। নুরনগরের রাজবাড়ীর বাঙ্গালী লেঠেলদের 'সিঙ্গার পটার,' ভাব-ভঙ্গীর যে বর্ণনা তা ও শ্রেণীর লুপ্ত-প্রায় জীবদের সঙ্গে যার কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনিই তাদের প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্র ব'লে মেনে নেবেন। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরের আধুনিক বাঙ্গলা সংস্করণটির কথা বলা বাহুল্য। ওর হাসি-ব্যঙ্গ প্রমথবাবুর খাস তালুকের নিজস্ব ফসল। পাঠকেরা নীললোহিতের আরও গল্প অবশ্য শুনতে চাইবে। কারণ এতে ত আর সন্দেহ নেই যে নিজের বীরত্বের ইতিহাস নীললোহিত যা বলেছে তার অনেক বেশী এখনো বলে নাই।

এ সব গল্পের বাহন প্রমথবাবুর ভাষা সম্বন্ধে কোনও কথা বলা বাহুল্য। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের সেটি একটি দ্রষ্টব্য জিনিষ। তাঁর ভাষার সাবলীল গতি তরল ইস্পাতের প্রবাহ; প্রমথবাবুর মনের প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড intellectualityর বাণী-মূর্ত্তি। এ সমস্ত গল্পের সব জায়গা থেকে যে হাসি—ব্যঙ্গ ঠিকরে পড়ছে বাঙ্গলা-সাহিত্যে তা সুপরিচিত। যাকে বলে অনাবিল শুভ্রহাসি এ সে বস্তু নয়। এ হচ্ছে বিদ্যুতের বাঁকা-চোরা চমক। আলোতে চোখ ঝলসে দেয়, গায়ে লাগলে মৃত্যু।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

কল ও কারখানা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

এতদিনে বেঙ্গল কেমিকালের কারখানা দেখা হোলো। বহুদিন পূর্ব্বেই আমার দেখতে যাওয়া উচিত ছিল। কেননা কলকাতা সহরে দেখবার মতো জিনিষ কী বা আছে। চিড়িয়াখানা? সেখানে জন্তুদের বন্দী করে খর্ব্ব করে রাখা হয়েচে তাদের পুরো পরিচয় পাবার জায়গা সে নয়।

বেঙ্গল কেমিকালের কর্ম্মশালায় গেলেম। সেও বন্দীশালা, সেখানে বিশ্বশক্তির গোটাকয়েক অগ্নিশর্ম্মা চর বাঁধা পড়েচে। কিন্তু তাদের পরিচয় দুর্ব্বল হয়নি, সংহত আকারে তারা ব্যক্ত করচে নিজের প্রবল উদ্যম, দেখতে দেখতে বিচিত্র হয়ে প্রকাশ পাচ্চে তাদের কর্ম্মের রূপ। দানবকে দেখা যাচ্চে প্রকটভাবে, কিন্তু মানবের পিছনে।

কল জিনিষটা দানবিক, কারখানাটা মানুষের। কলের দেহে দৈত্য রূপ নিয়েচে, কারখানাটা মানুষের ইঙ্গিত। কলটা গর্জ্জাচ্চে বটে, মনে হচ্চে তার লোহার অঙ্গে খেঁচুনি ধরেচে, তবু ইঙ্গিতের শাসনে বরাদ্দ মতো কাজ জোগাচ্চে। নানা কলকে একত্র করে শৃঙ্খলিত করে ইঙ্গিত প্রবাহিত হয়ে গিয়েচে কারখানার ভিতর দিয়ে।

বুদ্ধদেব নানাদেশে নানা লোককে ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন। সেই ধর্ম্ম একটা শক্তি। এই শক্তি বহুলোকের মধ্যে ছড়ালো, অবশেষে তিনি তাকে নিয়মে সংযমে ব্যাপক করে বাঁধলেন, সেই হোলো সঙ্ঘ। বহুলোকের মনকে একধর্ম্মতন্ত্রে মিলিত ক'রে সঙ্ঘ সৃষ্টি করা—মনীষার কাজ।

যান্ত্রিক ব্যবহারে কল হোলো শক্তি আর কারখানা হোলো সঙ্ঘ। কল উদ্ভাবন করতে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার দরকার হয়, আর কারখানা গড়ে তুলতে লাগে মনীষা। বেঙ্গল কেমিকালে বহু যন্ত্র বহু উদ্দেশ্য সাধন করতে একত্র করা, কিন্তু তাদের সবাইকে সংঘটিত করে যে নিবিড় নিবদ্ধ যন্ত্র-সঙ্ঘ সৃষ্টি করা হয়েচে সেইটে দেখে আমি বিস্মিত হয়েচি এবং আনন্দ পেয়েচি। এখানে দেখা গেল রাজশেখর বসুর মনীষা।

পশ্চিম মহাদেশে কারখানার বিরাট চেহারা মাঝে মাঝে দেখেচি। দেখে মন অভিভূত হয়েচে এবং ভিতরে ভিতরে একটু ক্লেশও পেয়েচে, মনে হয়েচে এক্ষেত্রে বাঙালী অনধিকারী। নানা অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছিল যে, কর্ম্মসঙ্ঘ গড়ে তোলার মনোবৃত্তি বাঙালীর নয়, বাঙালীর ভাঙন ধরানো মন, সে মন পরস্পর আঁট বাঁধেনা, হাতে হাত মেলায় না, দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে পারে না, নিজেদের মধ্যে শৈথিল্য থাকাতেই পরস্পরকে ব্যর্থ করবার ছিদ্র অন্বেষণ করে।

* শ্রীমতী রাণী মহলানবীশকে লিখিত পত্র।

দেশে কোনো না কোনো উদ্যোগের মধ্যে এই ধারণার প্রতিবাদ থাকার একান্ত প্রয়োজন আছে। উপযুক্ত প্রমাণ নিয়ে আপনার জাতকে শ্রদ্ধা করতে চাই নইলে নৈরাশ্যে হাত পা আড়ষ্ট হয়ে যায়। বেঙ্গল কেমিকালে সেই প্রতিবাদ দেখেচি বৃহৎ আকারে, মনে প্রবল উৎসাহ বোধ করেচি।

এখানে যেটা আমার মনে বিশেষ করে লেগেচে সে হচ্চে এই কারখানায় সমৃদ্ধির বৈচিত্র্য। এখানে একটি মাত্র কাজের ধারা নিয়ে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে চলা হয়নি। এর সঙ্কল্পনায় অতি সতর্ক ভীরুতা নেই, প্রাণবান জীবের মতো এ অভিব্যক্ত হয়ে উঠেচে নানা শাখায় প্রশাখায়। এ কেবল অভ্যস্ত অনুবৃত্তির আবর্ত্তন নয়, এর মধ্যে সৃষ্টিপ্রসারিণী মনীষার সাহস দেখা গেল! মনে হোলো এখনো এ রয়েছে বেড়ে চলবার পথে।

আমার মনে হোলো, কলকাতা সহরে সবচেয়ে বড়ো দেখবার জিনিষ এই বেঙ্গল কেমিকালের কারখানা। এখানে কলে নানা জিনিষ বানানো হচ্চে সে একটা কৌতূহলের বিষয় বটে কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা বিচিত্র কলেবর নিয়ে এই কারখানাটার সৃষ্টি। অর্থাৎ যা দেখা গেল তার চেয়ে দূর নির্দ্দেশী ইসারা আছে এর মধ্যে। সেখানে শুধু আজ আছে কাল আছে, তা নয়, আছে পরশু। সৃষ্টির গতিবেগ সেই আগামীর অভিমুখে।

আমি জানি তুমি বিদেশে অনেক ভ্রমণ করেচ। কিন্তু একটা ভ্রমণ তোমার বাকি আছে, সেটা সেরে নিয়ো—একবার যাত্রা কোরো বেঙ্গল কেমিকালের দিকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লজিক্ ও সত্যানুসন্ধান

শ্রীসুশীলকুমার দেব

ইংরেজী রেশনালিজম্ কথাটা অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্ম্মন্ Cultur und Aufklärung এর প্রতিধ্বনি মাত্র। বস্তুতঃ একালে যুক্তিবাদের জন্মভূমি জার্ম্মেনী: লাইব্‌নীজ ও হ্বোল্‌ফের দর্শন থেকে এর সুরু। যুক্তিবাদের মর্ম্মকথা এই যে—All that is real is rational। তর্কশাস্ত্রে এই তথ্য প্রচার করার জন্যে হেগেলের মতবাদকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, Panlogism বা লজিকৈকসর্ব্বস্বতা। তর্ক-শাস্ত্রের ইতিহাসের দিক থেকে এই তথ্যের সামান্য আলোচনা দরকার।

প্রথমতঃ আমরা যা-কিছু জানি বা বুঝি তা সবই যুক্তির ভিতর দিয়ে নয়। আমাদের ভারতীয় দর্শন এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ: অনুমান উপমান ছাড়া-ও প্রত্যক্ষ আর্ষ ও উপলব্ধি প্রভৃতি জ্ঞানের উপায় বলে স্থির করা হয়েছে। তারপর, আমাদের যা' জানা উচিত বা বোঝা উচিত তা-ও অনেক-কিছু বিশুদ্ধ যুক্তির বাইরে—যেমন কাব্য, চিত্র ইত্যাদির রসবোধ। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যা-কিছু জানি অর্থাৎ জ্ঞেয় যা-কিছু আছে, তার-ও অতীত আরো একটি-বা-বহু, স্থিতিশীল-বা গতিশীল সত্তার অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়—যেমন রাসেলের neutral particulars অথবা কান্টের thing-in-itself। এই থেকেই প্রমাণিত হয় যে, উপরোক্ত তর্কশাস্ত্রের যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ সমস্ত realকে rationalএর গণ্ডীভূক্ত করা, তা' সাধন করা অসম্ভব।

সমগ্র রিয়ালিটিকে জানার উপায় হিসেবে লজিক্ যদি যুক্তিকেই একমাত্র অবলম্বন করে থাকে তা'হলে শিশুর চাঁদ ধরার মতো এ চেষ্টা। গোটে বলেছেন যে, জার্ম্মেনীর অষ্টাদশ শতাব্দীর Enlightenment এর গোড়ায় মানব-মনের এক প্রচণ্ড দম্ভের দিক ধরা পড়ে গেছে। তদনুযায়ী জর্ম্মান্ দার্শনিক-ঐতিহাসিক আর্ডমেন্ লিখেছেন—If we always keep in view that it is for man as an individual, that the Enlightenment manifests such enthusiasm, it becomes easy to explain the flood of autobiographies that characterised this period. [History of Philosophy Vol. II P. 284.] এই যুগের গোটের সাহিত্যে কিন্তু আছে একটি সুস্থির আত্মনিবেদনের ভাব, ইংরেজরা যাকে বলেন Shakespearean calm, আমরা বাঙালীরা যাকে বলব আধুনিক রবীন্দ্র-সাহিত্যের শান্ত ও করুণ রস।

সৃষ্টিটা যদি শুধু মানবমনের জন্যেই হয়ে থাকে তা'হলে হয়ত-বা বলতে পারতাম যে লজিকের categories সৃষ্টিরহস্য বে-আব্রু করতে পারলো। প্লেতো—য়ুরোপে যিনি লজিক্ শাস্ত্রের সূচনা ও সৃষ্টি করেছেন, তাঁর Sophistএ—এমনি ছয়টা categories এর উল্লেখ করেছেন, যথা:—Rest & Motion, Being & non-Being, Same & Other। Sophist এর ২১০ থেকে ২৬০ সূত্রাবলীর ভাবার্থ এই যে, রিয়ালিটিকে জ্ঞান-নিরপেক্ষ হিসেবে বিচার করলে দেখা যাবে, উক্ত categories বা highest kinds তার মূলে। অন্য কথায়, এই সমস্ত kinds "সূত্রে মণিগণা-ইব" রিয়ালিটির বিভিন্নতাকে একত্ব-সূত্রে গ্রথিত করে রাখে। ব্রেড্‌লী ও বোসাঙ্কে একে বলবেন—Ontological modes of determination। তারপর Sophist-এ দেখানো হলো যে, এই modesগুলো শুধু জ্ঞান-নিরপেক্ষ সত্তার নয়, জ্ঞানের-ও বটে: মানে, এগুলো logical modes of determination-ও বটে। প্লেতোর এই সিদ্ধান্ত বিশেষ করে নকল করলেন হেগেল এবং তিনি জ্ঞান ও সত্তা

স্বরূপতঃ এই সমস্তাকে নাম দিলেন—identity of thought and existence। হেগেল মতবাদীরা বলবেন, তাঁর আসল অবদান হচ্ছে Dialectic। এই প্রবন্ধে Dialectic এর অন্তঃসন্ধান নিয়ে তর্ক করার জায়গা নেই। তবে শুধু এই কথা বোল্‌ব যে, এর মূল কথা হচ্ছে categories-এর পরস্পর আত্মীয়তার রূপটি ব্যাখ্যা করে বোঝানো যে, একটা আরেকটার চাইতে বড়ো;—এম্‌নি ছোট থেকে বড়ো, বড়ো থেকে তারো বড়োতে পৌছনো। অন্যকথায়, ক্রম-বিস্তারের দিক দিয়ে categoriesদের ভেতর একটা আত্মীয়তা ও বিভিন্নতা আছে। এই ব্যাপারটিকে আগাগোড়া জটিল ও দুর্বোধ করে দেখিয়েছেন হেগেল; কিন্তু প্লেটো এর-ও গোড়াপত্তন করে গেছেন। হেগেলের categories-এর ব্যাখ্যা পড়্‌লে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূতের কাব্য-রস। কবির "পঞ্চভূত" বৈজ্ঞানিকের অথবা সাংখ্যকারের ভূত নয়—তারা কবি-কল্পনার উপবনে লালিত-পালিত। তেমনি এই দার্শনিকের categories কাল্পনিক যুক্তিজাল রচনা করে বিশ্বামিত্রের নব-সৃষ্টির ব্যর্থ আধুনিক অভিনয়ের একটি নমুনা হয়ে রয়েছে। শেষাশেষি, প্লেতো বললেন যে, all-pervasive categories হলো Being & Non Being, Same & Other। হেগেল জর্ম্মান্ সুলভ মিলিটারী চালে Absolute Idea নামধেয় 'একমেব'র জয়-গান করলেন। হেগেলের Absolute Idea লজিক্-স্বর্ণলঙ্কার একচ্ছত্রাধিপতি রাবণ—জেম্‌স্ এই কথাই বলেছেন। কিন্তু বুদ্ধির এই জাল বুনে তর্কশাস্ত্রে প্রমাণিত হলো কি, যে, রিয়ালিটি-সৌধটি যে কড়ি-বরগার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার সবকটা অশুদ্ধি আর রইলো না?

আরিস্তুতল্ কি বলেন? Posterior Analytics য়ুরোপ দর্শন সাহিত্যে লজিকের প্রথমতম প্রধান গ্রন্থ। এই বই-এ গোড়ার দিকে তিনি দেখালেন basic facts বলে একজাতীয় পদার্থ আছে যার উপর নির্ভর করেই demonstration বা আধুনিক পরিভাষার discursive thought সম্ভব হয়ে ওঠে। এই factগুলো ধরে নেওয়া জিনিষ, চিন্তা থেকে তারা আলাদা। চিন্তা ঐগুলোকে গ্রহণ করে মাত্র, অথবা এরা আছে বলেই চিন্তা সম্ভব হয়। এরা চিন্তার জনক নয়, কিন্তু এরা না থাকলে চিন্তা সম্ভব হত না। তাই যদি হলো, তবে চিন্তা-নিরপেক্ষ সত্তারও অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়—হেগেল যাই বলুন।

হেগেলের বিরুদ্ধে আরেকটি জবরদস্ত যুক্তি দিয়েছেন অক্স্‌ফোর্ডের কুক্-উইল্‌সন্। Thoughtকে তিনি আরেক জাতীয় মনোবৃত্তি থেকে ভিন্ন করে দেখ্‌বার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন—Apprehension। তিনি বলেছেন, Apprehension is the starting point of logic। এই কথার মর্ম্মার্থ এই যে, লজিকে যেখানে হেগেল শুধু judgement-এর দোহাই দেবেন সেখানে কখনো কখনো judgement of perception বলে আরো একটা নতুন রকমের লজিকের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের অবতারণা করার দরকার আছে। এইজন্য রাসেল্ জ্ঞানকে description ও acceptance এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এই knowledge by acceptance অথবা সহজ জ্ঞান স্বীকার করলে লজিকের চেহারা একেবারে বদ্‌লে যায়। এই চেহারা হেগেল দেখে যান নি। সহজ-জ্ঞান যুক্তি-জ্ঞানের অতীত। অথচ, লজিক্ দিয়ে যদি জ্ঞান-তত্ত্বের ভিত্তি-ভূমি রিসার্চ্চ করে বের করতে হয় তবে এই সহজ জ্ঞানকেও বাদ দেওয়া চলে না।

জ্ঞান নিয়ে বিচার করে আরিস্তুতল্ বলেছিলেন—আমরা জাতি (genus) ও উপজাতি (species) বিভাগের ভেতর দিয়ে জ্ঞেয় বস্তু (individual) সম্বন্ধে সজ্ঞান হই। কোন জিনিষ জান্‌তে হলেই চাই সেই জিনিষের জাতি-উপজাতি ঠিক করা। কিন্তু এই individual-এর ভেতরে আবার এমন জিনিষও আছে—যাকে বলি আপতিক গুণ—যাতে পূর্ব্বোক্ত বর্গ-বিভাগ করার জো নেই। অতএব জ্ঞানের একটা গণ্ডী আছে। কোন জ্ঞেয় বস্তুর আপতিক গুণ বস্তুতঃ আমরা জান্‌তে পাই না। অথচ এই আপতিক ধর্ম্মগুলো মৌলিক ধর্ম্মগুলোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ হয়েই জ্ঞেয় বস্তুর সৃষ্টি করেছে। তবু যুক্তিবাদীরা বলবেন—বস্তু মাত্রই জ্ঞেয়—all that is real is rational!

যা real তা'ই যে rational নয় তার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুক্তি বেদান্তের মায়াবাদ। গৌড়পাদের অজাতবাদ—যা বস্তু ও জ্ঞান দুটোরই উচ্ছেদ সাধন করে—তার কথা না হয় অপ্রাসঙ্গিক বলে নাই বললুম। কিন্তু বেদান্তের অনির্ব্বচনীয়তার কথা না বলে চলে না। এর ইংরেজী নাম contingency আরিস্তত্লের চিন্তা-ধারা থেকে বেরিয়েছে। তিনি দেখালেন এই irrational element এর কারণ হল principle of individuation বা "matter"।

কান্ট্ তাঁর Transcendental Dialectic এ প্রতিপন্ন করলেন যে, আমাদের জ্ঞান সমস্ত রিয়ালিটিকে জান্তে পারে না। আমরা যতটুকু জানি তার নাম experience; এবং আরো যা' আমরা জান্তে স্পর্দ্ধা করি তার নাম দিয়েছেন unconditioned বা condition of the conditioned। Experience কে জানি knowledge দিয়ে, Unconditioned কে জান্তে চাই reason দিয়ে, কিন্তু জান্তে পারি না। সমগ্রকে জান্বার চেষ্টা করে আমরা মস্ত ভুল করে বস্তে পারি: যে-সমস্ত categories দিয়ে খণ্ড experience কে জানি সেগুলি দিয়ে অখণ্ড unconditionedকে জানবার চেষ্টা মাত্রেরই ফল ভ্রান্তি—যাকে তিনি বলেছেন Transcendental illusion। মানব-বুদ্ধি দিয়ে ভূমাকে জানা চলে না। যা' দিয়ে আমরা ভূমার সংস্পর্শ লাভ করতে পারি তার নামকরণ তিনি করেছেন good will। শিব-স্বরূপ যে ভূমা (Absolute Good) তাঁকে কামনা করতে পারা যায় "শুদ্ধানুকাজ্ক্ষা" দিয়ে। নান্যঃ পন্থাঃ। সোজা কথায়, যে রিয়ালিটি knowledge-এর চস্মা-পরা মানুষের কাছে শুধু experience এর গণ্ডী বলে প্রতিভাত হয়, অখণ্ড অসীমকে জান্তে গেলে যেখানে অধ্যাসের সৃষ্টি হয়, সেখানে উপায়—শুদ্ধানুকাজ্ক্ষা যোগ। রিয়ালিটি জ্ঞান-নিরপেক্ষ শুদ্ধানুকাজ্ক্ষার বস্তু।

তবু যুক্তির মূল্য আছে, এটা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। কিন্তু নিঃসংশয়ে এ-ও বোল্ব যে, নিখিলের জ্ঞান অর্জ্জন বিষয়ে যুক্তি একেবারে মুখ্ড়ে পড়ে। বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্ একজন ঘোর যুক্তিবাদী। তবু তিনি বলেছেন যে, রিয়ালিটিতে একটা element of Subjectivity আছে যাকে লজিকের ঠাট বজায় রাখার জন্যে কিছুতেই কাজে লাগাতে পারা যায় না। রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন— রিয়ালিটি শুধু আত্মগত (Subjective) বা শুধু বিষয়গত (Objective) নয়, যেমন জ্ঞান ও শুধু আত্মগত বা শুধু বিষয়গত হতে পারে না।

ইংরেজ দার্শনিক হিউম্ "নিশ্চিত জ্ঞান" সম্বন্ধে সন্দেহ তুলেছিলেন। ফ্রিজি, পিয়ানো প্রভৃতি রাসেলের পূর্ব্বানুগ বৈজ্ঞানিকগণ এই সন্দেহের সারবত্তা উপলব্ধি করে লজিক্ যে "নিশ্চিত জ্ঞান" নিয়ে গবেষণা করে শুধু মরীচিকার অনুধাবন করছে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। তাঁরা যুক্তি দিয়ে যেটুকু নির্দ্ধারণ করেন কল্পনা দিয়ে তাকে রঙীন করে তোলার কোনো চেষ্টা করবেন না এই পণ করে লজিক্‌কে অঙ্ক-শাস্ত্রে পরিণত করার আদর্শ স্বীকার করে নিয়েছেন। যুক্তির কথায় লজিকের কথা উঠ্লো। লজিক্ যে-সমস্ত categories মেনে এতদিন চলেছে তারা যে বিশুদ্ধ রূপক মাত্র নয় তাই এখন অঙ্কের অগ্নি-পরীক্ষায় স্থির করার দিন এসেছে।

জগৎ সম্বন্ধে আধুনিক মানবের বুদ্ধি যতই পরিষ্কার হতে থাকে ততই রেশনেলিজমের ওপর সন্দেহ বাড়ে। জ্ঞানটাই বড়ো জিনিস, যুক্তি নয় লজিক নয়। যাঁরা বলেন যে সৃষ্টি ব্যাপারের ব্যাকরণের মধ্যে কোনো ভুল নেই সবই rational তাঁরা সৃষ্টির নিয়ত গতিশীলতা সম্বন্ধে উদাসীন; অথচ সৃষ্টির প্রধান সত্য হলো change বা গতি। প্রাচীন লজিকের মধ্যে এই কথাটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, রিয়ালিটি স্থিতিশীল—ব্রেড্লী যেমন বলেছেন যে, গতি শুধু অল্প বা part-এর মধ্যেই সম্ভব, ভূমা বা wholeএ নয়। কথাটা মেটাফিজিক্সের দিক থেকে সত্য হতে পারে কিন্তু লজিকের রিয়ালিটি তো judgement এবং এই judgement ভূমাকে কখনো প্রকাশিত করতে পারে না— প্রকাশ করে গতিশীল আংশিক রিয়ালিটিকে। আরিস্তত্ল্ থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় তার্কিকগণ judgement-এর যে তালিকা দিয়েছেন তা' এখনো

অসম্পূর্ণ আছে এবং চিরকালই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। [মিস্ এল্ ষ্টেবিং-এর Introduction to Modern Logic দ্রষ্টব্য।] তার কারণ এই যে judgement একাধারে মন ও বস্তু এই দুটি চির-চঞ্চল পদার্থের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন এই চঞ্চল যোগাযোগ নিয়ে স্থায়ী সনাতন (non-temporal) একটি judgement এর তালিকা তৈরী হতে পারে না। অধিকন্তু judgement-এর প্রকাশ বাক্যে এবং যে-সব শব্দ নিয়ে বাক্য তৈরী হয় তারা ভাষাতত্ত্বে নানার্থব্যঞ্জক বলে এবং ভাষাও পরিবর্ত্তনশীল বলে শব্দের Symbolic একটা সঠিক রূপ ও অর্থ মেলে না। রাসেল্ ইঙ্গিত করেছেন যে, লজিক লেখার আগে শব্দ-তত্ত্বের একখানা গ্রন্থ-প্রণয়ন দরকার। এই গতি-কে স্বীকার করে বোসাঙ্কে morphology of knowledge (জ্ঞান-দেহের বিবর্ত্তন)-কে লজিক আলোচনার মূলে স্থান দিয়েছেন। বোসাঙ্কের মনে অন্যান্য আইডিয়ালিষ্ট্দের মতো একটি বিশ্বাস আছে যে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য মহৎ, অতএব অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় একদা লজিক্-ও সু-পরিণতি লাভ করবে। এই নিমিত্তবাদে ব্রেড্লীর-ও যে বিশ্বাস ছিল না, তা' নয়: তিনিও নীতি-ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য মহৎ এবং মানুষ এই সৃষ্টির বিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরমপুরুষার্থ লাভ করবে—কাণ্টের এই মতে তিনি মত দিয়েছেন। কিন্তু লজিক্ নীতি ধর্ম্মী হবে, এমন খত তার্কিককে লিখে দিতে হয় না। তাই সত্যের মুখ চেয়ে ব্রেড্লী দেখ্লেন যে, আমাদের judgement বা চিন্তা রিয়ালিটিকে যথাযথ প্রকাশ না করে বরং বিভক্ত খণ্ডিত করে দেখায়। আর, চিন্তা এই খণ্ডকে অখণ্ড করার চেষ্টায় চল্তে থাকে। চিন্তার প্রগতির পথে truth এর পাশাপাশি error সার বেধে দাঁড়ায়। truth এর আশায় error এর সঙ্গে মুখোমুখী হতে হয়; আবার errorকে অতিক্রম কর্‌তে-না-কর্‌তে আরেক error এর সঙ্গে দেখা হয়। এম্নি truth নামক আলেয়ার পেছনে চিন্তার অন্ধ অভিযানের কাহিনী নিয়ে লজিকের কলেবর বৃদ্ধি পায়। ব্রেড্লীর degrees of truth-তথ্যের মূলে series of errors ad infinitum-এর আভাব পাওয়া যায়।

আসলে সৃষ্টি রহস্যময়। সুতরাং সৃষ্টির ছবি চিন্তার পটে যে পরিমাণে ধরা পড়ে তা-ও রহস্যময় থেকে যায়। সাহিত্যিক-দার্শনিক হার্ডি বলেছেন—সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভালো বা মন্দ নয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই যেমনটি সৃষ্টি হয় তাই। তাঁর কথাকে বিস্তৃত করে বলা চলে: সৃষ্টির অস্তিত্বই সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ভালো বা মন্দ, সুন্দর বা কুৎসিৎ, সত্য বা মিথ্যার প্রতিষ্ঠা করা এর উদ্দেশ্য নয়। সৃষ্টি আছে তাই সৃষ্টি—এর আর 'কেন' নেই। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জ্ঞানযোগের বক্তৃতায় এরই নাম দিয়েছেন "মায়া"। মায়ার মূল কথাটি রহস্য। সৃষ্টির এই রহস্য বা অনির্ব্বচনীয়ত্বকে যে-লজিক্ স্বীকার করবেন না, সত্যের অনুসন্ধানে তাকে ঠক্‌তেই হবে।

যাঁরা বলেছেন যে affirm করাই jndgement এর উদ্দেশ্য তাঁদের কথায় ফাঁকি আছে। কারণ, নিশ্চিত জ্ঞান affirm করা চলে কই? আমরা করি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ চালাবার জন্যে। judgement-এর উদ্দেশ্য সত্য-জ্ঞাপন নয়, ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা দূর করাই উদ্দেশ্য—প্রেগ্‌মেটিষ্ট্দের এই কথা খুব খাঁটি। judgement-এর উদ্দেশ্য negate করাও নয়। যে-রহস্যকে অস্ত্যর্থক বা নঙর্থক কিছুই বলা চলে না, অথচ যার সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, 'এ রহস্যই', তাকে judgement-এর অন্তর্ভুক্ত আমরা দৈনন্দিন জীবনে করে থাকি সত্য; কিন্তু জীবনে করার দরকার বোধ থেকেই শুধু করি, অন্য কোনো উদ্দেশ্য থেকে নয়। চিন্তা জীবন যাপনের বহু অবলম্বনের মধ্যে একটি অবলম্বন মাত্র। জীবন যুক্তির জন্যে নয়, লজিকের জন্যে নয়; লজিক ও যুক্তিই জীবনের জন্যে। সৃষ্টিতে প্রাণ-ধর্ম্মই বড়ো, চিন্তা একটি উপধর্ম্ম মাত্র। সৃষ্টির এই রহস্য সম্বন্ধে কাইজারলিঙ্ লিখ্ছেন—

"The ultimate terminus, undefinable as such, the Logos-side of which I call 'adjustment', is nothing else than Life itself," [Creative Understanding]

এই প্রাণ-লীলা কাল-ধর্ম্মী। Judgement-এর জন্ম ও অভিব্যক্তি এই কালের মধ্য দিয়ে। বার্গসোঁর

একটি মতের কথা এখানে উল্লেখ কোরব যার খণ্ডন কেউ করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন যে, বুদ্ধি বা symbolic thinking দিয়ে লীলা-চঞ্চল কালকে কখনো বোঝা যায় না। বুদ্ধির দৌড় ডার্বি রেসের ঘোড়ার চেয়েও বেশী গতি-শীল; কিন্তু তবু কালের অগ্র-গতির তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। তাই বুদ্ধি কালের স্রোতোবেগের মধ্যে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ-এর রেখাঙ্কন করে শব্দ-রচনা দ্বারা ব্যবচ্ছেদের চেষ্টা করলেও কাল এই শব্দের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে পড়ে; কারণ গতিই তার প্রাণ। সুতরাং শব্দ-রচনা করে judgemeat সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে judgement-এর শরীরে ভাঙন ধরে যায়। কালকে আমরা বুদ্ধি দিয়ে ছুঁতে পারি, কিন্তু ধরে রাখতে পারি না। আমাদের সহজাত জ্ঞান intuition দিয়ে কিন্তু এই কালের প্রাণ-লীলার স্পন্দন ও ছন্দোবৈচিত্র্য অনুভব করতে পারি। অনুভূতির রসে প্রাণের গতি লীলায়িত ও ছন্দোময় —স্থবির judgement দিয়ে তাকে ব্যক্ত করা যাবে কেন? অথচ morphology of judgement-এর প্রতিপদে এই অনুভূতি বা সহজজ্ঞানের পরিচয় আছে। আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে সহজ-জ্ঞান ও সহজ জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধি চিরবন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের বুদ্ধি অনুভূতির নৃত্যরসে উতলা— আমাদের অনুভূতি বুদ্ধির প্রতিভায় সমুজ্জ্বল।

সৃষ্টির প্রাণলীলার মধ্যে যে রহস্য, তার গূঢ় স্বভাব অনুভূতির আলোকে আলোকিত, বুদ্ধির ব্যবচ্ছেদের দ্বারা খণ্ডিত নয়। শঙ্করাচার্য্যর মত অবলম্বন করলে দেখি রিয়ালিটির একটা বিশিষ্ট প্রকাশের দিক, আবার একটা নির্বিশেষ অদ্বৈতের দিক আছে—কান্ট্ যেমন বলেছেন (Deism) দুটো জগতের কথা। প্রকাশ-জগতে বুদ্ধি ও অনুভূতি। অদ্বৈত-জ্ঞানের "তত্ত্বমসি"—অনুভূতিই চরম। এই অনুভূতি অবাঙ্মনসো গোচরম্ লজিকের বেড়াজাল সেখানে একেবারে নেই বলে সত্য-সূর্য্য সেখানে সম্পূর্ণ নিরাবরণ, এতটুকু কলঙ্ক তাতে নেই। ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার এই সম্বন্ধে লিখছেন—"The absolute intuition as existence and as truth is the same fact appearing in the different levels of consciousness. As existence it is the final reality. Tatramasi is not a judgement. As fruth it is supramental revelation indicative of an existence which is real in a different plane of cons ciousness. .....The absolute is, therefore, the Fact-in-itself. Its truth is given by revela tion, but it is realised as the undivided intuition. [Phases of Immediate Experience—Prabuddha Bharata, June 1930.]

সৃষ্টির কেন্দ্রস্থিত সত্যটি তাই অনুভূতির সামগ্রী। এই অনুভূতি প্রাণিজগতের সহজ জ্ঞান নয়, দৈনন্দিন জীবনের কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক খণ্ড সত্য আবিষ্কার জনিত আনন্দ নয়, সৃষ্টিরহস্যের গূঢ় পদ্দাগুলির অন্তরালে বিচ্ছুরিত কবিকুলের অন্তর্দৃষ্টি নয়—এই intuition বা সংবিৎ তুরীয়ানন্দময়, এ এক অপূর্ব্ব অমৃতায়তন।

এই অমৃত-আস্বাদনের কথা কাইজারলিঙের (Creative Understanding এ) Life Beyond এর তত্ত্ব-কথায় আদৌ প্রকাশ পায়নি। কাইজারলিঙ্ সৃষ্টির প্রাণলীলার ছন্দোবৈচিত্র্যের মধ্যেই আত্মহারা, সৃষ্টি লীলার অনুপ্রাণনায় নব নব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্যের সঙ্গে পুনঃপুনঃ সাক্ষাতের আনন্দে চঞ্চল-চিত্ত, অসংখ্য বাধা-বিঘ্নের মুখে সত্যানুসন্ধানের উজান স্রোতে বীরদর্পে জীবন তরণী ভাসান দেবার পক্ষপাতী। লেসিঙের কথা মনে পড়ে—ভগবান্ যদি এক হাতে সত্য ও অন্য হাতে সত্যানুসন্ধান নিয়ে এসে বলেন 'কোন্‌টি চাও', তবে 'সত্যানুসন্ধানই জীবনে সার্থক হোক্'—এই বর গ্রহণ কোরব। লেসিঙ-এর পক্ষে যোগ্য প্রার্থনা বটে। লেসিঙ্ জার্ম্মাণীর ভাব-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পৎ Siegfried এর আদর্শে অনুপ্রাণিত। জার্ম্মান্ সাহিত্যে Siegfried সত্যানুসন্ধিৎসার ঘনীভূত মূর্ত্তি—ইনি শান্তির বার্ত্তা নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে বয়ে নিয়ে এসে সংগ্রামকে মহনীয় করে তোলেন। কঠোপনিষদে Siegfried এর আদর্শানুযায়ী মনোভাবের প্রতিরূপ পরিভাষা "শ্রদ্ধা"। নচিকেতার এই শ্রদ্ধা উপজাত হয়েছিল। ইনি সত্য-জ্ঞানের জন্যে মৃত্যু-দ্বার পর্য্যন্ত এগিয়ে যেতে ভয় পান নি। সত্যানুভূতির জন্যেই সত্যানুসন্ধান—সত্যানুসন্ধানই সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্য নয়। তাই নচিকেতা লেসিঙ্ এর মতো অনুসন্ধান নিয়েই শুধু তৃপ্ত হয়ে থাকতে পারেন না—সত্যোপলব্ধি করে, শেষ পর্য্যন্ত দেখে, তবে নিবৃত্ত হন। সাধনার চেয়ে সাধনার ধন বড়ো, গাছের চেয়ে ফুল বড়ো।

সুশীলকুমার দেব

মৃত্যুঞ্জয়

শ্রীরাধারাণী দেবী

মুক্তির অমৃত বাহি' মৃত্যু আসে অমর্ত্ত্য-কৃশাণু
এ মর্ত্ত্য-জগতে
স্পর্শে তার ধন্য মানে স্পন্দমান প্রতি পরমাণু,
তাই প্রাণপথে
অনন্ত জীবনযাত্রী,—মহাশূণ্য ব্যাপি, চরাচরে
অব্যাহত-গতি
মরণ-চরণ ছুঁয়ে নবজন্ম মাঝে নিত্য করে
কালের আরতি।

উৎসবলগনে কারো যৌবনের কুঞ্জদ্বার পানে
সঙ্গোপনে আসে।
নির্ম্মম কৌতুকে কভু অঞ্চল ধরিয়া কারো টানে
লঘু-পরিহাসে।
কখনো প্রলয়ঝড়ে জীবন মালঞ্চ মাঝে পশি'
দেয় রুদ্রহানা!
কচি কিশলয় পুষ্পমুকুল কোরক পড়ে খসি'
অকালে না-জানা।

মৃত্যু আসে সৃজনের লীলাকুঞ্জে নিত্য নববেশে,
রাজসাজে কভু
নির্ঘোষি' বিজয়শঙ্খ জয়গর্ব্বে ফেরে দেশে দেশে
—দিগ্বিজয়ী প্রভু!
কখনো বা আসে দ্বারে চক্ষে তার প্রেমহাস্য লয়ে
বক্ষে বহি' বীণ্;
রুদ্ররূপে কভু কা'রে দেয় দেখা ভয়াবহ হ'য়ে
ভ্রুকুটী-কঠিন।

হে মৃত্যু! অদৃশ্যচারি! তোমার আকাশ আসে জানি
নিত্য মরলোকে।
তবুও জানে না আজো কেহ তব কোথা রাজধানী
স্বর্গে বা নরকে।
কোন্ দীপ্ত জ্যোতির্গ্রহে কিম্বা ঘন অমাঅন্ধকারে
অধিষ্ঠান তব,
অজ্ঞাত সে তত্ত্ব আজো; শুধু জানি তব পুরদ্বারে
সবে এক হব।

খেলে সে কতনা ছলে কারো সাথে দীর্ঘকাল ধরি
নিষ্ঠুর-লীলায়।
বারে বারে প্রাণদ্বারে আঘাতিয়া যায় পুনঃ সরি'—
আঁধারে মিলায়।
অতর্কিতে তপ্ত ওষ্ঠে আঁকি কারো শীতলচুম্বন,
লুকায় নিমিষে।
কারো বা নিভায়ে দীপ কণ্ঠহার করিয়া লুণ্ঠন
ছোটে নিরুদ্দেশে।

জীবনের অস্তাচলে দিয়েছো যে যবনিকা টানি'
গূঢ়-আবরণ!
কী রহস্য আছে ওর অন্তরালে, জানিবারে প্রাণী
করে প্রাণপণ!
সংজ্ঞাহীন কত বস্তু সংখ্যাহীন কতকোটী জীব!
প্রতি দণ্ড পলে
হারায়ে আপন সত্তা, মিলাইছে হে সুন্দর শিব!
তব পদ তলে।

তোমার সংহার-নৃত্য ধ্বংসের তাণ্ডব লীলাখেলা
চলেছে নিয়ত।
চূর্ণ প্রতি পদাঘাতে লক্ষ লক্ষ সৃজনের মেলা
বুদ্বুদেরি মত!
প্রলয়-তিমির-গর্ভে অন্তহীন কোটীবিশ্ব কত
লভিয়াছে গতি!
—কে জানে সন্ধান তার?—এ সংসার সহিছে নিয়ত
কত ক্ষয় ক্ষতি!

শুধু শুনি অবিরাম বাজে তব গুরু-পদধ্বনি
ত্রিলোকের বুকে।
দেহরুদ্ধ প্রাণবায়ু প্রতিশ্বাসে কহিছে নিঃস্বনি'
চাহি তব মুখে;—
"—ছিন্ন করো এ বন্ধন, ভাঙো দ্বার, হে মৃত্যু স্বাধীন!
মুক্ত করো মোরে!
এ তনুপিঞ্জরে বলো বদ্ধ আর র'বো কতোদিন
অন্ধ মোহঘোরে!"

জলে বিচ্ছেদের বহ্নি বেদনার মেলি রক্তশিখা—
বিচ্ছুরিয়া দাহ!
মনে হয়, শূন্য করি দিলো বুঝি নিয়তির লিখা
জীবন নির্ব্বাহ!
নিভেছে আনন্দ-দীপ, তমাচ্ছন্ন যেন চরাচর
বিশ্ব প্রাণহীন!
সর্ব্ব সুখ সাধ আশা সংসারের সকল নির্ভর
বিষাদে বিলীন।

বিমুখ অন্তরতলে নিরন্তর তবু যেন জাগে
—কোথা ক্ষীণ আলো!
মৃদুরশ্মিটুকু তার সান্ত্বনার মত মনে লাগে,—
—ভাবি, এই ভালো!
সুদূর আকাশ পানে অজানিত লোকের উদ্দেশে
মন চলে ধেয়ে!—
নক্ষত্রমণ্ডলে খুঁজি' কোন্ গতি জীবনান্ত শেষে?—
—নির্নিমেষে চেয়ে।

মৃত্যুাহত চিত্ত ঘিরি' সুগম্ভীর প্রশান্তির ছায়া
নামে এসে ধীরে!
স্তিমিতবিয়োগব্যথা, অপসৃত মিথ্যা মোহমায়া
নয়নাশ্রুনীরে!
প্রবুদ্ধ বৈরাগ্য জাগে জ্ঞানের গৈরিকদীপ জ্বালি'
দৃষ্টির সমুখে!
জীবন মরণ সেথা একসাথে দেয় করতালি
মিলে সুখে দুখে!

গম্ভীর সাম্যভাবোধ ভেদাভেদ দিয়া যায় মুছি'—
সহসা অন্তরে!
মনের উদারক্ষেত্রে স্বার্থ-সংকীর্ণতা অমা ঘুচি'
প্রেম আলো ঝরে!
শোকের হোমাগ্নি মাঝে যে নিত্য পরম সত্যজ্ঞান
আবির্ভূত হয়,—
তারে যদি প্রাণে বরি' তারে যদি করি পূর্ণধ্যান
মৃত্যু কোথা র'য়?

শ্রীরাধারাণী দত্ত

সুন্দর

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়

ওগো সুন্দর, প্রভাতের মূক-কবি
শয়ন-শিয়রে বাতায়নে কা'র ছবি ?
গত নিশীথের স্বপ্নেতে সেকি
উঁকি দিয়ে মোরে চলে গেছে দেখি ?
জাগরণে তারি বার্ত্তা এনেছ
খুসীভরা শিশু-রবি ?
ওগো, সুন্দর, প্রভাতের মূক-কবি ॥

ওগো সুন্দর, দ্বিপ্রহরের মায়া
দগ্ধ-মাঠের বৃদ্ধ-বটের ছায়া !
সেকি খুঁজে শুধু চলে গেছে ফিরে ?
বসেনি বারেক তব ছায়ানীড়ে ?
বলিতে পারকি কোন্ প্রান্তরে
মিলায়েছে তার কায়া ?
ওগো সুন্দর, দ্বিপ্রহরের মায়া ॥

ওগো সুন্দর গোধূলির ধূলাখেলা !
রাঙা-মেঘে কা'র ঘনা'ল বিদায়-বেলা ?
পথ-চাওয়া-বধূ আঁখি ছলছল্
করুণ করেছে বাতায়ন-তল
ঘন মিলনের স্বপনে ভোলেনি
বিরহের অবহেলা ?
ওগো সুন্দর, গোধূলির ধূলাখেলা ॥

ওগো সুন্দর, সন্ধ্যার ফুল-শোভা,
সাঁঝ-তারা জ্বেলে বসায়েছ কা'র সভা ?
সুদূর সুরের কণাটি মাগিয়া
রুদ্ধ নিশাসে রয়েছ জাগিয়া ?
কোন্ ছায়াপথে সন্ধান তা'র
আমিও শুধাবু সবা' !
ওগো সুন্দর, সন্ধ্যার ফুলশোভা ॥

ওগো সুন্দর, নীরব-নিশীথ বেণু,
মূক-আলাপনে সন্ধান নাহি পেনু !
বৃথা গৃহে চারু-শয্যাটী রচা
ডাকিছে আকাশ লাখো-তারা খচা
তন্দ্রা তাড়ায়ে মনোপথে খুঁজি
কা'র চরণের রেণু ?
ওগো সুন্দর, নীরব-নিশীথ বেণু ॥

ওগো সুন্দর, প্রভাত কয়েছে হেসে
তা'র পরিচয় পা'ব দুপুরের দেশে ॥
দুপুর বলেছে,—গোধূলির কাছে
তার অপরূপ পরিচয় অ'ছে'।
গোধূলি বলেছে,—সাঁঝকে শুধাও
পারে যদি বলিতে সে' ?
সঘন সন্ধ্যা রাত্রির পথ
দেখাইল অবশেষে ॥

সুন্দর ওগো, রাতি আঁতিপাঁতি খুঁজে
স্বপন-আলসে লুটা'ল চক্ষু বুঁজে !!
তবু জেগে থাকি উষার আশায়
যে পারাবারে যে মেশে ॥
ওগো সুন্দর, যা'র দেখা পাবো বলে
প্রতি নিমেষের নিঃশ্বাস গুণি
বিশ্ব-বক্ষ-তলে ;
তা'র পরিচয় সকলের জানা
শুধু সন্ধানি মেলেনি ঠিকানা—
আছে অন্তর ভরে'।
ঘরে-বাঁধা-মন সন্ন্যাসী হয়
স্বপনের অবসরে !!

অজিত মুখোপাধ্যায়

ব্যথার মালা

শ্রীনবগোপাল দাস আই, সি, এস্

নাম তার অ্যানিটা। সুব্রত তাকে ডাকৃত অনীতা...

অ্যানিটা বলৃত, কিন্তু আমি ত তোমার নামটা আমার মনের মত বদ্লাতে পারছিনা, সু। এ বড্ড অন্যায় তোমার ··

সুব্রত হেসে বল্‌ত, তোমায় কি অমনি আমার পছন্দসই নাম দিয়েছি? এর পেছনে আছে আমার প্রকাণ্ড একটা স্বার্থ!

ভ্রূ কুঁচ্‌কে কিছু-যেন-বুঝ্‌ছেনা এমনি ভাবে তাকিয়ে অ্যানিটা জিজ্ঞেস্ করৃত, তার মানে?

উত্তর হ'ত, মানে আর কিছুই নয়! তোমার আসল নামটায় মনে পড়ে এক রণরঙ্গিনী বীরাঙ্গনার কথা। তখন ভয় হয়, আঁৎকে উঠি; কারণ আমি চাই তোমায় দেখ্‌তে প্রেমিকার বেশে, স্নেহময়ী কল্যাণীর মূর্ত্তিতে।...আমি ত আর গ্যারিবল্ডী নই, আমি যে শুধু 'সু'...

একটুখানি তর্জ্জন ক'রে সুব্রতর ঠোঁটের উপর তার চম্পকাঙ্গুলী দুটো রেখে অ্যানিটা বলৃত, তোমার বক্তৃতা এখন রাখো! তোমার কথার মধ্যে আছে শুধু শব্দের প্রাচুর্য্য এবং রূপকের বাহুল্য!·· তুমি কি মনে করো যে বসন্তের দখিন হাওয়া যখন নরনারীর দেহমনে পুলকের শিহরণ আনৃত তখন তোমার বীরাঙ্গনা কল্যাণী মানসীর মূর্ত্তিতে তাঁর দয়িতের সম্মুখে এসে হাজির হতেন না?...

সুব্রত একটুখানিও না দমে বল্‌ত, মনে করি এবং করিনাও।...আমার মনে হয় না মলয় পবনের পরশ লেগেও অ্যানিটার যৌবন এবং মন আমার মানস প্রেমিকার মত উচ্ছ্বলিত হ'য়ে উঠ্‌ত। অ্যানিটা যে ছিলেন আর এক পৃথিবীর মানুষ, এ পৃথিবীর স্নেহ আলিঙ্গন তাঁকে চঞ্চল ক'রে থাকৃতে পারে, কিন্তু তাঁকে অভিভূত করৃতে পেরেছিল ব'লে বোধ হয় না...

অ্যানিটা এরও জবাব দিতে পারৃত হয়ত, কিন্তু প্রায়ই কিছু না ব'লে অসহায় বালিকার মত সুব্রতর কোলে তার মাথাটি রেখে বাঁহাতের ছোট ছোট আঙুলগুলি দিয়ে সুব্রতর ঠোঁট চেপে ধরে বলৃত লক্ষ্মীটি, আর তর্ক করে না··· তোমারই জিৎ···

তাদের প্রথম আলাপ হয় এক সন্ধ্যায়।

লণ্ডনে সুব্রত পড়্‌ত। দিনে ঘণ্টা দুই তিন ক্লাশ— তার মধ্যে বড় জোর একটার বেশী সে কোনদিনই করৃত না। বাকী সময়টা কলেজের কমনরুমে বন্ধুবান্ধবীদের সাথে গল্পগুজব করাই ছিল তার নিত্তনৈমিত্তিক কাজ। যখন একে একে কমনরুম খালি হ'য়ে যেত তখনও সে আগুনের ধারে তার প্রিয় চেয়ারখানিতে হেলান দিয়ে বসে থাকৃত। লেখা বা কবিতার ত্রিসীমানায়ও সে কখনো যায়নি, কাজেই বসে বসে যা-খুসি-তাই ভাবাই ছিল তার প্রধান বৃত্তি। সব সময় যে ভাব্‌ত তা'ও নয়, অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে নিঃশব্দতার গাম্ভীর্য্য উপভোগ ক'রেই সে সুখ পেত বেশী।

এমনি ধারা একটা সন্ধ্যায় হাতে একখানা পুরাণো Punch নিয়ে চুপ ক'রে সে বসে আছে, আর তার মন কমনরুমের ক্ষুদ্র সীমারেখা ছাড়িয়ে কোন্ দিগন্তে ছুটে চলেছে···হঠাৎ ঘরে মেয়েদের জুতোর খুটখুট শব্দ শুনে তার দিবাস্বপ্ন গেল টুটে! চেয়ে দেখ্‌লে নীলরঙএর টুপী এবং ফ্রক পরা একটি মেয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে এবং উৎসুক নেত্রে কাকে যেন খুঁজছে...

সুব্রত একবার আড়চোখে মেয়েটির আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ ক'রে নিলে। কলেজের প্রায় সব মেয়েই তার মুখ চেনা, অনেকের সাথে তার আলাপও আছে; কিন্তু এ মেয়েটিকে দেখেই তার মনে হলো এর মধ্যে তাদের

কলেজের মেয়েদের ব্রীড়াহীনতা, স্বচ্ছন্দ অবাধগতি নেই। এর মুখ এবং মন যেন সরমে ঢাকা, আর তার প্রতীক তার লজ্জামুকুলিত চোখ দুটি...

অপরিচিত মেয়েদের সাথে আলাপ জমাতে সুব্রত সিদ্ধহস্ত—অনেক নাচে ও পার্টিতে সে অনেক মেয়ের বুকেই দাগা দিয়েছে। কাজেই সে তার স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যের সহিত চেয়ার হ'তে একটুখানি উঠে বল্‌লে, মাপ করবেন, আপনাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারি কি?

মেয়েটি যেন এই প্রশ্নের প্রতীক্ষায়ই ছিল, সে একটুখানি হেসে বল্‌লে, ধন্যবাদ···আমি আমার এক বন্ধুকে খুঁজ্‌ছি, তাঁর নাম মিস্ রবিন্‌সন্, ডরোথি রবিন্‌সন্।···আপনি তাঁকে চেনেন কি?

সুব্রত মিস্ রবিন্‌সন্ ব'লে কাউকে চেনে না। বল্‌লে, বড় দুঃখিত, ঠিক চিন্‌তে পার্‌লাম না, হয়ত মুখ চেনা আছে, নাম জানিনে···

মেয়েটি বল্‌লে, ওঃ—তা' বেশ! আমি এখানে একটু অপেক্ষা করি—আমার বন্ধু এখনি বোধ হয় আস্‌বেন।

সুব্রত তার নিজের চেয়ারটা আগুনের সাম্‌নে আরও একটু এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, আপনি এখানটায় বসুন।··· বাইরে বেজায় শীত···নয় কি? ··

মেয়েটি সুব্রতর সৌজন্য গ্রহণ করবে কি না ভাব্‌ছিল। একটুখানি ইতস্ততঃ ক'রে হঠাৎ বসে পড়ে বল্‌লে, কিন্তু আমি যে আপনাকে বেদখল করলাম ·

সুব্রত সপ্রতিভভাবে বল্‌লে, আমাকে বল্‌বেন না, আমার জায়গাটাকে বেদখল করেছেন বলুন···

মেয়েটি সুব্রত'র এই উত্তরে বিব্রত ও লজ্জিত বোধ ক'রে একটু রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। চোখ দুটি নত ক'রে আগুনের দিকে চেয়ে রইল···

খানিকক্ষণ দুজনেই নীরব। ফায়ারপ্লেসের কয়লা জ্বলছে আর নিব্‌ছে। লেলিহান শিখার দীপ্তি বা তীব্রতা সেই আগুনের মধ্যে নেই, তার মধ্যে আছে শুধু এক অস্পষ্ট মাদকতা। কর্ম্মক্লান্ত অবসাদের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ কয়লার দগ্ধ টুকরোগুলি···

নিজের আড়ষ্টতায় নিজেই লজ্জিত বোধ ক'রে সুব্রত আবার কথা পাড়্‌লে। বল্‌লে, আপনি নিশ্চয়ই এ-কলেজের ছাত্রী নন্···

মেয়েটি জবাব দিলে, না...

মেয়েটি বেশী কথা বলে না। নিক্তিতে ওজন করা তার উত্তর। সুব্রত ভাবে কি ক'রে এর সাথে ভাব জমানো যায়!

দেয়ালে ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করে। মেয়েটি তার রিষ্ট-ওয়াচের দিকে তাকায়—বন্ধু যে এখনও আস্‌ছেন না!

সুব্রতর মনের মধ্যে তখন কথাবার্ত্তার লুকোচুরি খেলা চল্‌ছে। প্ল্যান অব্ আক্‌শন্ তার গড়া হচ্ছে আর ভাঙ্‌ছে। হঠাৎ বাইরে কার পায়ের শব্দ পেয়ে তার দোদুল মন গেল স্থির হ'য়ে। একটুখানি গম্ভীরভাবে একটুখানি হেসে সে জিজ্ঞেস্ করলে, আপনি কী তাহ'লে লণ্ডনের বাসিন্দা নন্?

ছোট্ট একটি উত্তর এল, না ··

ভাল বিপদ্ যা হোক্! বাস্তবিক ইংরেজদের মত এমন cold জাত খুব কমই আছে। সুব্রত মনে মনে মেয়েটির মুণ্ডপাত করছিল, কিন্তু এদিকে তার পুরুষকার তাকে প্রেরণা এবং উৎসাহ দিচ্ছিল আরও বেশী···

মরিয়া হ'য়ে সে আবার প্রশ্ন করলে, যদি আমার বেয়াদবী মাপ করেন তবে একটা কথা বল্‌তে চাই।... আপনি কি ডেভন্‌শায়ারে থাকেন?

মেয়েটি সুব্রতর এই আচম্‌কা প্রশ্নে একটুখানি বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে, না·· কিন্তু আপনি এপ্রশ্ন আমায় করলেন যে?

এবার সুব্রতর পালা। চালগুলো তাহ'লে নেহাৎ ভুল হয় নি'! সে সুরু করলে, সে এক মস্ত বড় কাহিনী মিস্— ···

মেয়েটি বল্‌লে, মিস্ ক্লার্ক...

সুব্রত নামটি লুফে নিয়ে বল্‌লে, ধন্যবাদ, মিস্ ক্লার্ক... আর এই বাচাল ছেলেটির নাম মিঃ বসু, এস্, বসু,··· হ্যাঁ, যে কথা বল্‌ছিলাম...গত ঈষ্টারের ছুটির কিছুদিন পরে আমি ডেভনশায়ারে গিয়েছিলাম·· সে কী সুখের দিনটা গিয়েছে! সীটনে থাকতাম—বেশ নিরিবিলি জায়গা সাম্‌নে সমুদ্রের নীল ঢেউ এসে বেলাভূমির পাথরের উপর

খেলা করত, আর পেছনে ডেভনের লালপাহাড় যেন নিতান্ত অবজ্ঞার চোখে গর্ব্বিত উদ্ধতভাবে নীল আকাশের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকত! তারি মাঝখানে আমরা দুই বন্ধু বেড়াতাম আর গল্প করতাম।···আপনি ক্লান্তি বোধ করছেন কি, মিস্ ক্লার্ক? ··

—না, না···আপনি ব'লে যান্···

হ্যাঁ, বল্‌ছিলাম, আমরা গল্প করতাম। আমাদের গল্পের মধ্যে নিয়ম বা শ্লীলতার রেখামাত্র সময় সময় থাকত না···। হ্যাঁ, একদিন পাহাড়ের উপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে জেলেদের একটা ছোট্ট গ্রামে গিয়ে পড়েছিলাম। সেদিন ছিল সেই গ্রামে একটা মেলা···সেখানে আমরা ঢুক্‌লাম। দেখি, ডেভন্‌শায়ারের typical পোষাক পরে একটি মেয়ে ঘুরছে, আর সব বিদেশী লোক কৌতূহলমাখা চোখে তাকে দেখ্‌ছে···। ওকি মিস্ ক্লার্ক, আপনি ঘুমিয়ে পড়েননি' ত?

—না, বলুন···শেষ করুন···

—হ্যাঁ···ঘটনাটা আমার মনে আছে একটা বিশেষ কারণে। একজন আমেরিকান্ ছিলেন সেখানে, হয়ত ফোর্ড বা রথ্‌চাইল্ড গোছের একটা কিছু হবেন। তিনি হঠাৎ কোত্থেকে লাল গোলাপের প্রকাণ্ড একটা বোকে নিয়ে এসে মেয়েটির হাতে দিলেন! চারিদিকে চাপাহাসির শব্দ··· কিন্তু ভদ্রলোক শুধু তোড়া দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, সেখানে দাঁড়িয়ে ডেভনের প্রাকৃতিক ও মানুষিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এমন একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন যে আমার যদি ক্ষমতা থাকত ডেমস্থিনিসেরও উঁচু ব'লে আমি তাঁকে পৃথিবীতে জাহির করতাম···

মিস্ ক্লার্ক একটু হাসলে।

—আসল কথাটাই যে ভুলে গেছি! এ গল্পের কথা উঠল এই জন্যে যে সেই মেয়েটির মুখে যে ব্রীড়া, লালিমা এবং রহস্যমধুর আভা আমি দেখেছিলাম তা' হুবহু দেখতে পাচ্ছি আপনার মধ্যে।···আমি ঠাট্টা করছি না, যদি কোন উদ্ধতা প্রকাশ পেয়ে থাকে মাপ করবেন।···

একটুখানি শ্লেষের সুরে মিস্ ক্লার্ক বল্‌লেন, আপনার কম্‌প্লিমেন্টের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমায় এখন উঠ্‌তে হচ্ছে, আমার বন্ধুত' আর এলেন না···আচ্ছা গুড্ নাইট্···

সুব্রত ত অবাক্—তার প্ল্যান্ সবই যে মেয়েটা উল্টে দিয়ে গেল! কী সৃষ্টিছাড়া গল্পই সে ফেঁদে বস্‌ল যে তাতে মেয়েটা চটে চলে গেল। কিন্তু তার মুখভাব থেকে আগে তার বিরক্তি বা রাগের লেশমাত্রও বোঝা যায়নি! নাঃ— সাধে কি আর সেকালের মুনিঋষিরা বলেছিলেন যে নারী-চরিত্র অতিশয় দুর্জ্ঞেয়!···

এর দিন কয়েক পরের কথা।

সুব্রত সেদিন হেমার্কেট থিয়েটারে শ'র প্লে "সেণ্ট্ জোয়ান্" দেখ্‌তে গেছে। মাসে একটা ক'রে প্লে দেখা ছিল তার বাতিক। বল্‌ত ইংলণ্ডের ষ্টেজের সঙ্গে যার অল্পবিস্তর পরিচয় নেই তার শিক্ষা অঙ্গহীন, অসম্পূর্ণ।

সুব্রত প্রোগ্রাম কিনে একমনে দেখ্‌ছে। ওদিকে ঐক্যতানবাদনও সুরু হ'য়ে গেছে। এমন সময় সে ভয়ানক ভাবে চম্‌কে উঠ্‌ল যখন তার কানের কাছে মিষ্টস্বরে কে যেন বল্‌লে, গুড্ ঈভ্‌নিং, মিঃ বসু ···

ঘাড়টা ডানদিকে একটুখানি ঘুরিয়ে দেখ্‌লে তার পাশেই বসে সেই উদ্ধত গর্ব্বিত মিস্ ক্লার্ক···মুখে মৃদু হাসি···

সুব্রতর সেদিনকার মনের ক্ষোভ আর রাগ মুহূর্ত্তের মধ্যে জল হ'য়ে গেল। সে একটু হেসে বল্‌লে, গুড্ ঈভ্‌নিং···কী আশ্চর্য্য, কে জান্‌ত আপনার সাথে এমনিভাবে আবার দেখা হ'বে! বাস্তবিকই আমার সৌভাগ্য!

ফস্ ক'রে কথাটা বলেই সুব্রত জিভ কাম্‌ড়ালে। আঃ— আবার কী মূর্খের মত কথা বললাম!

মেয়েটি কিন্তু আজ বড় ভ্রূ না কুঁচ্‌কে আগেরই মত হাসি-মুখে বল্‌লে, সৌভাগ্য দু'জনেরই···অথবা তিনজনেরই···

সুব্রত হেঁয়ালি না বুঝ্‌তে পেরে বল্‌লে, তিনজনেরই! তার মানে?

মিস্ ক্লার্ক সুব্রতর বিমূঢ়তা দেখে একটুখানি বেশী হেসে বল্‌লে, ঘাবড়াবেন না···আমি এসেছি একাই, এবং আপনিও একাই এসেছেন মনে হচ্ছে···তিনজনের একজন হচ্ছেন শ' নিজে...

সুব্রত তার রসিকতায় পুলকিত হয়ে বল্‌লে, ওঃ—আমি ত একটুখানি নার্ভাস্ হ'য়ে প্রায় পড়েছিলাম!

—কিন্তু আপনি ত নার্ভাস্ হবার ছেলে নন্! সেদিন

ডেভনশায়ারের গল্প যা ফাঁদ্‌লেন তাতে মনে হ'লো আপনি নার্ভাস্‌নেসের ত্রিসীমানায়ও যান্ না!

আবার সেই শ্লেষের সুর! সুব্রত আহতভাবে জবাব দিলে, আপনি কি সেদিনকার রাগ ও বিরক্তি আজও ভুল্‌তে পারেননি' মিস্ ক্লার্ক?

মিস্ ক্লার্ক এবার গম্ভীরভাবে বল্‌লে, বাস্তবিক আমারই সেদিন অন্যায় হ'য়ে গেছ্‌ল মিঃ বসু। আপনি আপনার জীবনের একটা ঘটনা যা' আপনার মনে দাগ রেখে গিয়েছিল তার কথা বল্‌ছিলেন, আর আমি উদ্ধত-ভাবে সেদিকটা না দেখে অপমান বোধ ক'রে হঠাৎ চলে গেলাম···আশা করি আপনি আমার সম্বন্ধে যা' তা' ভাবেন্‌নি'···

সুব্রত এবার বল্‌লে, না···না···তবে, সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেদিন আমি একটু দুঃখিত হয়েছিলাম বৈকি··কিন্তু আজকে আপনি আমার সব ক্ষোভ দূর ক'রে দিয়েছেন।

ততক্ষণে অডিটরিয়ামের বাতি নিব্‌তে আরম্ভ করেছে। যবনিকা উঠল—দুজনেই প্লের দিকে মন দিলে···

প্লে চল্‌ছে···ফ্রান্সের কলঙ্কের কাহিনী। ইংলণ্ডের বাহিনী দুর্গের পর দুর্গ অধিকার ক'রে যাচ্ছে—ফ্রান্সের এতটুকু ক্ষমতা নেই বাধা দেয়। নৈরাশ্য, দলাদলি, ভীরুতায় প্রত্যেক ফরাসীর মন অভিভূত, আচ্ছন্ন। জাতীয় অবমাননার দিনে দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে পরেও ফ্রান্সের ব্যারন্‌রা নিজেদেরই স্বার্থ খুঁজ্‌ছেন···এমন কেউ নেই তাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাদের শ্রান্ত হতাশ মনে একটা প্রেরণা এনে দেয়!

সুব্রত ষ্টেজের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধভাবে অভিনয় দেখ্‌ছিল, হঠাৎ একবার পাশে চোখ পড়ায় দেখ্‌লে মিস্ ক্লার্ক যেন অস্বস্তি বোধ ক'রে তাঁর সীটের মধ্যে নড়্‌ছে। সুব্রত বল্‌লে, আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি মিস্ ক্লার্ক?

চাপা গলায় বল্‌লে, একটু হচ্ছে··দেখুন না সাম্‌নে ওই লোকটা বসে রয়েছে এম্‌নিভাবে যে আমায় ঘাড় উঁচু ক'রে দেখ্‌তে হচ্ছে···

সুব্রত বল্‌লে, আপনি আমার সীট্‌টা নিন্ না হয়, এখান থেকে কোন অসুবিধা হবে না আশা করি···

মিস্ ক্লার্ক ধন্যবাদ দিয়ে বল্‌লে আপনার কোন অসুবিধা হ'লে জানাবেন কিন্তু···

অন্ধকার অডিটরিয়াম·নিস্তব্ধ নিঝুম···শুধু ষ্টেজের উপর অভিনয় চল্‌ছে। সকলেরই দৃষ্টি সেখানে নিবদ্ধ। অতি সন্তর্পণে দু'জনে সীট্ বদল করলে—কিন্তু সম্মুখে স্পেশ্ খুবই অল্প, তাই চেঞ্জের সময় দু'জনের গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি হ'য়ে গেল বেশ···

মিস্ ক্লার্কের সীটে এসে সুব্রত বল্‌লে, এখন কেমন দেখ্‌তে পাচ্ছেন?···তার বাঁ হাতটা তখন মিস্ ক্লার্কের ডান হাতের সঙ্গে ঠেক্‌ছে···

—ধন্যবাদ, বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি···আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত?···

—না···

অর্দ্ধেক প্লে শেষ হ'য়ে গেল। ইন্টারভ্যাল—বাতিগুলো আবার জ্বলে উঠ্‌ল। মিস্ ক্লার্ক বল্‌লে বেশ হয়েছে কিন্তু···

সুব্রত বললে, আমার সব চেয়ে ভাল লাগ্‌ল সীবিল থর্ণডাইকের পার্টটা। ওর কথাগুলোর মধ্যে কেমন একটা মাদকতা আছে! জোয়ান্ অব্ আর্ককে আমরা দেখি শুধু রণরঙ্গিণীর বেশে, কিন্তু তাঁর মধ্যেও যে নারীর কোমলতা, মাতার স্নেহ. ভগ্নীর প্রেম ছিল সেটা আমরা ভুলে যাই···

—প্লের শেষ দিকটায় সেটা আরও বেশী ফুটে উঠ্‌বে, মিঃ বসু।

—আপনি বইটা পড়েছেন বুঝি? আমার কিন্তু বই পড়ে প্লে দেখ্‌তে একটুও ভাল লাগে না। তাতে অনেকটা নতুনত্ব ও মাধুর্য্য নষ্ট হ'য়ে যায়···

—সব সময় নয়। প্লে আপনি দেখ্‌ছেন তার প্লটের জন্য নয়, তার পাত্রপাত্রীদের অনুভূতির ঘাতপ্রতিঘাত দেখবার জন্য, মন দিয়ে তা' উপলব্ধি করবার জন্য···। বইতে হয়ত সেটা সব সময় বোঝা যায় না—ভাল লেখকে সেটা আমাদের চোখের সাম্‌নে এসে উপস্থিত হয়, আর সীনিক ব্যাক-গ্রাউণ্ডের সাহায্যে সেটা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে···

থিয়েটারের মেয়েরা চকলেট্ নিয়ে আস্‌ছে। মিস্ ক্লার্ক

একটা bar কিনে নিলে, আধখানা ভেঙ্গে সুব্রতর দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, নিন্‌…

সুব্রত গ্রহণ ক'রে বল্‌লে, ধন্যবাদ…আমি চক্‌লেট্‌ বিশেষ পছন্দ করিনে' যদিও…কোনোদিন-ই আমি নিজের পয়সায় চক্‌লেট্‌ কিনে খাইনি'…

—সত্যি বল্‌ছেন ?…মেয়েটির মুখে কৌতুক মেশানো অবিশ্বাসের হাসি।—কাউকে কখনও কিনেও দেন্‌ নি ?

সুব্রত বল্‌লে, সে কথা ত আমি বলিনি'…আমি শুধু বলেছি নিজের পয়সায় কখনও চক্‌লেট্‌ কিনে খাইনি'…

—ও:, ব'লে মেয়েটি চুপ্‌ কর্‌লে।

অভিনয়ের শেষে দু'জনে যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। হেমার্কেট ও পিকাডিলী তখন নৈশবিহারী বিহারিণীদের দ্বারা পূর্ণ। সুব্রত বল্‌লে, আসুন বড্ড তেষ্টা পেয়েছে একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক্‌…

খুঁজে খুঁজে ছোট্ট একটা রেস্তঁরায় গিয়ে দু'জনে হাজির। ছোট্ট হ'লে কি হয়, আভিজাত্যের গর্ব্ব তার মধ্যে পুরো মাত্রায় বিদ্যমান্‌। একটি মেয়ে ভায়োলিনে Mozart এর মার্চ্চ বাজাচ্ছে, আর সান্ধ্য পোসাক পরা জোড়া জোড়া যুবক-যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা টেবিল অধিকার ক'রে বসে আছে। সুব্রত ও মিস্‌ ক্লার্ক কোণে একটা টেবিলে গিয়ে বস্‌ল।

কফি এল…

সুব্রত প্রশ্ন কর্‌লে, সীবিল থর্ণডাইকের অভিনয় আপনার কেমন লাগ্‌ল ?…

—বেশ, তবে শেষের দিকটা যেন ততটা ভাল হয়নি', যাকে বলে overstrung…

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হ'ল…

এইভাবে তাদের পরিচয়ের সুরু। কফির পর কফি শেষ হ'তে চল্‌ল, Beethoven, Schubert, Mozart অনেক কিছুই তাদের কানের ভিতর দিয়ে পশ্‌ল, কিন্তু গল্প তাদের থাম্‌ল না।

রাত্রি ছুটোর সময় দু'জনে যখন বেরিয়ে এল তখন লণ্ডনের পথঘাট নিস্তব্ধ নিঝুম হ'য়ে গেছে। মাঝে মাঝে দুই একটা পুলিশম্যান্‌ শুধু পায়চারি কর্‌ছে, আর আড়চোখে নিশাচর নিশাচরীদের দিকে একটু আধটু তাকাচ্ছে…।

পোর্টম্যান্‌ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে মিস্‌ ক্লার্ক বল্‌লে, আমায় এদিক দিয়ে যেতে হ'বে মিঃ বসু…

সুব্রত মিস্‌ ক্লার্কের প্রসারিত ডান হাতখান খপ্‌ ক'রে ধরে নিজের ঠোঁটের কাছে লাগিয়ে বল্‌লে, গুড্‌ নাইট, অ্যানিটা…

এরপর বহু দিন চলে গেছে। মিস্‌ ক্লার্ক আর এখন মিস্‌ অ্যানিটা ক্লার্ক নয়, সুব্রত তার নাম বদ্‌লে রেখেছে 'অনীতা'…। আর অ্যানিটার প্রথম দিনের আহত গর্ব্ব সুব্রতর নিবিড় আলিঙ্গন চুম্বনে কোথায় মিশে গেছে! ডেভন্‌শায়ারের কাহিনী এখন তাদের কাছে কৌতুকের সামগ্রী, প্রেমকলহের উপকরণ। অ্যানিটা বলে বাস্তবিক সু, সেদিন যদি আমার বন্ধুর খোঁজে না যেতাম তাহ'লে ত তোমায় জান্‌তেই পার্‌তাম না, নয় কি ?…

সুব্রত উত্তর দেয় সেদিন কি আর তুমি তোমার বন্ধুর খোঁজে গিয়েছিলে ? তুমি গিয়েছিলে আমার সাথে যেচে আলাপ কর্‌তে…

অ্যানিটা তর্জ্জন ক'রে উত্তর দেয় নাগো, কী মিথ্যুক তুমি! জানো, তোমায় আমি একেবারেই চিন্‌তাম না; শুধু তাই নয়, এর আগে আমি কোন ভারতীয় ছেলের সাথে আলাপ পর্য্যন্ত করিনি!

সুব্রত তবু ছাড়ে না বলে তাহ'লে কি হয়, প্রথম দেখাতেই তুমি আমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলে একথা কি অস্বীকার কর্‌তে পারো ?

অ্যানিটা জোর গলায় জবাব দেয় নিশ্চয় পারি। তা না হ'লে তোমায় সেদিন অমন অপমান কর্‌লাম কি ক'রে ?

সুব্রত বলে, সে ত অপমান নয় সে যে প্রেমের অভিমান!

অ্যানিটা বলে, হ্যাঁঃ—তোমার সাথে আবার অভিমান করব। অভিমানের যোগ্য হ'লে ত!

কলহের অবসান হয় চুম্বনে…

অ্যানিটা প্রশ্ন করে, আচ্ছা সু, তুমি আমায় কেন ভালোবাস বল্‌তে পারো ?

সুব্রত বলে, বড্ড কঠিন প্রশ্ন করলে অনী! যুগযুগান্ত ধরে নরনারীর মধ্যে এই প্রশ্ন এই সমস্যা উঠেছে, কেউই এর সমাধান করতে পেরেছেন ব'লে বোধ হয় না। দান্তে, কালিদাস, সেক্সপীয়র সবাই মানবমানবীর এই পুণ্য মনোবৃত্তির বিকাশ বর্ণনা করেছেন—নানাভাবে, নানাভঙ্গীতে; কিন্তু একটি মেয়ে একটি ছেলেকে বা একটি ছেলে একটি মেয়েকে কেন ভালোবাসে তা' ঠিক বোঝাতে পেরেছেন কি? এ ত তর্ক বা ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু নয়, এ যে অনুভূতির জিনিষ।

অ্যানিটা বলে, তাই বুঝি তুমি অমন তীব্রভাবে বল্‌ছিলে, বয়সে যাঁরা প্রবীণ তাঁরা তরুণদের ভাব বা ideas বুঝতে পারেন না!

—নিশ্চয়ই! যে কোন জিনিষ বুঝতে হ'লে নিজের মন দিয়ে তা' অনুভব করা চাই।··টুর্গেনিভের Fathers and sons পড়েছ ত?···কথাশিল্পী সেখানে অতি নিপুণ-ভাবে দেখিয়েছেন এই পরস্পর অনুভূতির অভাবেই জীবনের অধিকাংশ ট্রাজেডির সৃষ্টি। এই ধরো আমাদের দেশের কথা;—আমাদের দেশের সংস্কার, ধর্ম্ম, প্রথম আমি খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখি, তাদের অনেক দোষ সত্ত্বেও! কিন্তু সব চেয়ে খারাপ লাগে কল্পনাশক্তির অভাব—অনুভূতির দাম সেখানে নেই!

—কিন্তু তোমাদের দেশে তরুণরাও ত আছেন?

—সেইটেই ত সব চেয়ে দুঃখের বিষয় অনী···। অনুভূতির অভাব যে শুধু প্রবীণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা' নয়। তরুণ প্রবীণ সবাই সেখানে একটা অস্বাভাবিক আব্‌হাওয়ার মধ্যে মানুষ; গতানুগতিক জীবনে তাঁদের হাড়মাংস এতখানি অভ্যস্থ হ'য়ে গেছে যে তার চেয়ে আলাদা রকমের নতুন কিছু দেখ্‌লে বা শুনলেই তাঁরা শিউরে ওঠেন, তার মধ্যে দেখ্‌তে পান বিপ্লবের সূচনা, ধর্ম্মনাশের ভীতি···

—কিন্তু তোমরা যারা বুঝ্‌তে পারো তারা কেন্ বিদ্রোহ ক'রে থাকনা? সত্য যখন তোমাদের দিকে, তোমাদের নীতি বন্ধন চিরন্তন ও শাশ্বত তখন একদিন না একদিন জয়মুকুট তোমাদের হবেই!

একটুখানি বিষাদের হাসি হেসে সুব্রত বলে, বিদ্রোহ আমরা করতে পারি, কিন্তু কেউ শুনবে না। আমাদের দেশ বা সমাজ আমাদের জন্য একেবারেই প্রস্তুত নয়! আমরা যদি বিদ্রোহ করি তবে আমরা কাউকেই শেখাতে পারব না—আমাদের দূরে সরিয়ে রাখ্‌বে, তাতে দেশের ও জাতির অকল্যাণ হ'বে বেশী।···তাই আমার মনে হয় ঠিক বিদ্রোহ না ক'রে যদি আমরা ধীরে ধীরে দেশ ও সমাজের চোখ খুলে দেওয়ার চেষ্টা করি তাহ'লে বোধ হয় কাজ হবে বেশী।···তবে তাতে মস্ত বড় একটা ভয় আছে—পুরোপুরি বিদ্রোহী না হ'লে নিজের ব্যক্তিত্ব ও সত্ত্বা লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল।···

কথার ধারা উল্‌টিয়ে নিয়ে অ্যানিটা জিজ্ঞেস্ করে, আচ্ছা, সু, তুমি ত শীগ্‌গীরই ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাচ্ছো, নয় কি?

সুব্রত এর উত্তরে তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে বলে এখন সে সব কথা মনে করিয়ে দিওনা, অনীতা··। এ দেশের মুক্ত বাতাস, উদার আকাশ আমার প্রাণ, এর যতখানি পারি আমি বয়ে নিয়ে যেতে চাই, আমার পাথেয় স্বরূপ···

একটু থেমে আবার বলে, নিতান্ত স্বার্থপরের মত কথা বল্‌ছি, অনী, নয় কি?···

আরো একমাস পরের কথা। গ্রীষ্মের ছুটিতে সুব্রত আর অ্যানিটা দিনকয়েকের জন্য সাউথ্‌সীতে এসেছে। তিনদিন যেন স্বপ্নের মত কেটে গেছে! তিন দিন নয় ত', যেন তিন মুহূর্ত্ত! শেষের দিন মুখভার ক'রে অ্যানিটা বল্‌লে, আজকে আমি যাবো না, সু · এ সুখনীড় ছেড়ে কে সেই লণ্ডনের কোলাহলের মধ্যে যায় বল ত?

সুব্রত বল্‌লে, কিন্তু আমায় যে যেতেই হ'বে, অনীতা। আমার উপস্থিতি যে সেখানে নিতান্তই দরকার!

ঠোঁট ফুলিয়ে অ্যানিটা বল্‌লে বেশ, তুমি তাহ'লে যাও —আমি এখানেই রইলাম। আমি এখানকার স্মৃতিটা আর একটু গভীরভাবে উপভোগ করতে চাই, সু···

সুব্রত বেগতিক দেখে বল্‌লে আচ্ছা, আর একটা দিন তোমায় দিলাম, কিন্তু এর প্রোগ্রাম আমার ইচ্ছামত হ'বে···

খুসী হ'য়ে অ্যানিটা বল্‌লে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত লণ্ডনের মুখে রওনা না হচ্ছ আমি যখন যে ভাবে বল যেতে রাজি আছি···

প্ল্যান্ ঠিক হ'লো আইল্ অব্ ওয়াইটে যাবে। সেখানে কোথায় যাবে তা' ঠিক করলে না, ইচ্ছা ক'রেই। নিরুদ্দেশের যাত্রা দিয়ে তাদের week-end শেষ করবে এই হলো সুব্রতর মতলব—দু'জনেরই hiking এর পোষাক আর সঙ্গে শুধু ম্যাকিন্‌টস্···

আইল্ অব্ ওয়াইটে নেমেই তারা সমুদ্রের ধার দিয়ে পথ ধরে হাঁটতে সুরু করলে। তখন সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে—তবু সুব্রত'র জেদ, হেঁটে হেঁটে যতদূর যাওয়া যায় তার বেশী সে এগোবেনা। অ্যানিটা প্রতিবাদ করায় সে বলেছিলো, আমি ত আর দেশ দেখতে আসিনি···আমি এসেছি এখানকার জলবাতাস আমার lungs-এর মধ্যে ভরে নিতে···হাঁটাই তার পক্ষে প্রশস্ত···

অ্যানিটা হেসে বলেছিলো, তুমি কি জল বাতাসের পিপে?

ঘণ্টাখানেক দু'জনেই নীরবে হাঁটছে। কারো মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নেই। গ্রাম্যপথ দুধারে মাঠ এদিক ওদিকে দু'চারটে বনফুল ফুটে রয়েছে—নিতান্ত অজ্ঞাত অবজ্ঞাত-ভাবে। হঠাৎ কিছুদূরে কতকগুলো buttercups দেখে ছোট্ট বালিকার মত নেচে উঠে অ্যানিটা বল্‌লে, দেখ দেখ সু, কী সুন্দর ফুল···

সুব্রত এতক্ষণ একটা ছল খুঁজছিল বসবার জন্য। সমস্ত পথটা হাঁটবার মত ধৈর্য্য বা উৎসাহ তার ছিল না। অ্যানিটার কথায় সে কপট বিরক্তি প্রকাশ করে বল্‌লে, তোমার জ্বালায় মনের সুখে বেড়াবার জো' নেই···এখন বলো, ফুল তুলবে!···

অ্যানিটা সুব্রতকে জানত। তার কপট বিরক্তি গায়ে না মেখে আব্দারের সুরে বল্‌লে, বাঃ রে—আমি কোথায় তোমার সুখের ব্যাঘাত করলাম। ফুল তুলতে ত' আমি চাইনি'···।

সুব্রত তার কথায় কান না দিয়ে তাকে একরকম টেনে নিয়ে গিয়ে ঘাসের উপর বসালে, তারপর ম্যাকিন্‌টস্ দুটো পাত্‌তে পাত্‌তে বল্‌লে, আর জ্যাঠামো কর্‌তে হ'বেনা—এখন বসে কিছু খাও দেখি!

অভিমানে অ্যানিটার চোখে প্রায় জল এসে পড়েছিল। সে কোনক্রমে তা' রোধ করে গোটাকয়েক ফল ও স্যাণ্ড্‌-উইচ্ বার করলে।

সুব্রত একটা আপেল তুলে নিয়ে অ্যানিটার মুখের কাছে এনে বল্‌লে লক্ষীটি, রাগ ক'রোনা। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে—একটা কামড় দেও দেখি!

অ্যানিটার চোখ জলে ভরে এল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে যেতেই সুব্রত তাকে বাহুপাশে বন্দী ক'রে তার চক্‌চকে চোখের উপর দুটি চুমু খেয়ে নিলে। অ্যানিটার মুখে হাসি ফুটলো—যেন মেঘের পর রৌদ্র···

কপট অভিমানের সুরে অ্যানিটা বল্‌লে, তুমি আমায় মিছিমিছি আজ বক্‌লে! আমি কী করেছি বলত?···

সুব্রত হেসে উত্তর দিলে, কেন তোমায় বক্‌লাম জানো? ···মেয়েজাত হচ্ছে তেজি ঘোড়ার মত, মাঝে মাঝে রাঁশ আল্গা করতে হয়, কিন্তু যখন বেশী আল্গা হ'য়ে যায় তখন হঠাৎ রাঁশটা টেনে তাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে তার স্বাধীনতা পূর্ণ স্বরাজ নয়, তাতে safeguards আছে যথেষ্ট···

খানিকক্ষণ দু'জনেই নীরব। মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছে, আর অর্থহারা ভাবেভরা ভাষায় চোখ দিয়ে কথা বল্‌ছে। অ্যানিটা সুব্রতর বাঁহাতের উপর মাথাটা রেখে শুয়ে আছে, সুব্রত ফলগুলো অ্যানিটার মুখের কাছে এনে ধরছে, তার প্রতিবাদে কাণ না দিয়ে তার মুখে গুঁজে দিচ্ছে···

সূর্য্য ততক্ষণে দিগন্তে ঢলে পড়েছে। অদূরে নীলসমুদ্র শ্রান্ত রূপসীর মত আঁচল বিছিয়ে শুয়ে আছে। জনমানবের লেশমাত্র নেই—উপরে উদার আকাশ···আর বিশাল প্রান্তরে দুটিমাত্র প্রাণী, একা···

অ্যানিটা আধঘুমন্তভাবে বল্‌লে, সু···

সুব্রত তেম্‌নি ভাবে জবাব দিলে, উঁ?···

—কী ভাব্‌ছো?

—ভাব্‌ছি এই আমাদের কথা। আমি তোমার কে?

ক'দিনবাদে যখন এই স্বপ্নের শেষ হ'বে তখন বুদ্বুদের মত আমরা কোলাহলমুখর ইংলণ্ডের বিশাল সমুদ্রে মিশে যাব··· তুমি আমায় ধীরে ধীরে ভুলে যাবে, আমিও তোমায় ভুলে যাব।

—কী বল্‌ছো তুমি? অনুভূতিকে কি কেউ ভুল্‌তে পারে সু? বিশেষ ক'রে প্রেমবেদনার অনুভূতিকে?··· তুমি তাহ'লে আমায় ভালবাসনা, সু!

—এই দেখ! পাগ্‌লী মেয়ে! (একটুখানি হেসে দুষ্টামিভরা চোখে) আচ্ছা, আমি কি কখনও বলেছি যে আমি তোমায় ভালোবাসি?

একটুখানি চিন্তা ক'রে অ্যানিটা বল্‌লে, সত্যি ত!··· দেখ, আমি তোমায় পেয়ে এতখানি আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছিলাম যে সে প্রশ্নটার সোজা জবাব পর্য্যন্ত তোমার কাছে আদায় করতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ তোমায় বল্‌তেই হবে, সু···

আঁধার হ'য়ে আস্‌ছে। চাঁদ এখনো ওঠেনি,—ঝিকি-মিকি আলোছায়া। সমুদ্রের কল্লোল শোনা যাচ্ছে দূরে; সঙ্গীহীন ঢেউগুলো যেন দু'জনকে ডাক্‌ছে, ওগো তোমরা এসনা হেথায়, শুধু দু'জনে মিলে কথার লুকোচুরি ক'রে কি হ'বে? আমাদের তার ভাগ দাও··

সুব্রত জিজ্ঞেস্ করলে, তোমার শীত লাগ্‌ছে, অনী?

অ্যানিটা উত্তর দিলে, না, তোমার?

সুব্রত বল্‌লে, বিশেষ নয়; যাহোক্, একটু কাছে এসো।—এই বলে সে অ্যানিটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এল। তার রাঙাদুটি ঠোঁটে আবার চুমু খেয়ে বল্‌লে, আমি তোমায় ঠিক ভালবাসি কি না নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, অনীতা। তোমায় আমার ভালো লাগে একথা সত্যি, তোমার সাহচর্য্য আমার কাম্য এ আরও সত্যি। কিন্তু যথার্থ ভালোবাসা বল্‌তে কী বুঝায় আমি নিজেই জানিনা···

অ্যানিটা সুব্রতর গলা দু'হাতে জড়িয়ে বল্‌লে, আমার প্রিয়তম···এর বেশী আমি আর তোমার কাছে শুন্‌তে চাইনে। বাকীটা আমি নিজেই বুঝে নিয়েছি, সু···

সুব্রত চুপ ক'রে ভাবে হৃদয়ে তার গভীর আলোড়ন। স্বপ্নমুগ্ধের মত বল্‌লে, আজ তোমার কথা বলার পালা অনী। তুমি বলে যাও আমি শুনি···

—তোমার সাথে আমার পরিচয় আজ প্রায় তিনমাস হ'লো, সু। এর আগে আমি অনেক স্তুতি, অনেক প্রশংসাই শুনেছি। কলেজে যখন ছিলুম তখন একটি ছেলে প্রায় নাছোড়বান্দা হয়ে আমার পিছু নিয়েছিল। আমার হাত থেকে রুমাল পড়্‌লে তুলে দিত, ঘর থেকে বেরোবার সময় আমার আগে আগে গিয়ে দরোজাটা খুলে ধর্‌ত, রিফেক্‌টরীতে চা বা লাঞ্চ্ খাবার সময় জোর ক'রে আমার পাশে এসে বস্‌ত।···আমি ভাব্‌লাম, আচ্ছা দেখা যাক্ ছেলেটির নিষ্ঠা কতখানি! তার সাথে দু'দিন গেলাম, তিনদিনের দিন সে আমার কাছে নীচ শয়তানের মত জঘন্য প্রস্তাব কর্‌লে···।···ওগো, তুমি ঘুমিয়ে গেলে নাকি?

—না, চোখ মুদে তোমার গল্পটা উপভোগ করছি বেশী।

—আমি তবু তাকে ছেড়ে দিলাম না। আমার তখনও জেদ ওর নিষ্ঠাটা ভাল ক'রে পরখ করা। আমি ওর প্রস্তাবে অস্বীকার কর্‌লাম, কিন্তু বল্‌লাম, বন্ধুভাবে তোমার সাহচর্য্যে আমি রাজি আছি।···কিন্তু তার উৎসাহ তখন দমে গেছে। পরের দিন একখানা চিঠি এসে হাজির, সে ভয়ানক দুঃখিত, তার কাজকর্ম্মের চাপ পড়েছে বড়, কাজেই সে আগের মত আমার সাথে মেলামেশা করতে পারবে না ইত্যাদি···

—বেচারী হতাশ প্রেমিক···

—হতাশ প্রেমিকই বটে! হাঁ, যে কথা বল্‌ছিলাম, সু···এদেশের শতকরা নিরানব্বুই জন ছেলে নরনারীর সম্বন্ধকে দেখে সম্ভোগের চোখে। সাথীত্ব সাহচর্য্য ব প্রেমের কদর তাদের কাছে একটুমাত্র নেই। এটা আমি বাড়িয়ে বল্‌ছি না, এ আমার ঠেকে এবং দেখে শেখার ফল

—কিন্তু, অনী, আমিও যে সেই চোখে দেখিনা এ আশ্বাস তোমায় কে দিলে?

সুব্রতর গালে একটু চুমু খেয়ে তার কালো চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বল্‌লে, তুমি নিজে, তোমার ব্যবহার, তোমার শ্রদ্ধা, প্রীতি, সাথীত্ব।···আমি তোমা

কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছি, কিন্তু তুমি তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করনি'···

—তার মানে এই নয় যে সম্ভোগকে আমি ভাল চোখে দেখি না। আমিও মানুষ, তরুণ যৌবন আমার; সম্ভোগ আমার কাছে absolutely খারাপ কিছু নয়। প্রেমের পূর্ত্তিই সম্ভোগে—কিন্তু তাকে আগে নিয়ে আসতে নেই, তাহ'লে প্রেমের লালিমা নষ্ট হ'য়ে যায়।

—বাস্তবিকই, সু, যখন আমি তোমার কথা ভাবি তখন মনে হয় তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা! তোমাদের মহাকাব্যে অর্জ্জুনের কথা পড়েছিলাম—তাঁর ইন্দ্রিয় জয়ের কাহিনী। তুমি তার চেয়ে কম কিসে?

—কী যে তুমি বলো, অনীতা! আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্ভোগের জন্য লালায়িত, আর তুমি আমায় বলো দেবতা!

—লালসাকে যে তুমি জয় ক'রেছ, সু, তাই তুমি জিতেন্দ্রিয়···

কথাটা পাল্‌টে নিয়ে সুব্রত জিজ্ঞেস্ করলে, তুমি আমায় সত্যি ভালোবাস, অনী?

—সত্যি মিথ্যে জানিনে, সু, তবে আমার মনে হয় তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। আমার তৃপ্তি এখন সম্পূর্ণ আত্মদানে; আমি এখন মাটির ঢেলা, তুমি কর্ম্মকার, তুমি আমায় যে ভাবে গড়াবে আমি সেই ভাবেই গড়ে উঠ্‌ব। তাতেই আমার সুখ আমার সত্ত্বার সার্থকতা।

একটু গম্ভীরভাবে সুব্রত বল্‌লে, তুমি ঠিক বল্‌ছ, অনী? তুমি আমায় সব দিতে পার? তোমার এই দেহ, এও কি আমার সম্ভোগের জন্য বিলিয়ে দিতে পার?

বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত বাঁহাতটা সুব্রতর গলা থেকে সরিয়ে নিয়ে একটুখানি ব্যবধান রেখে অ্যানিটা আহতভাবে বল্‌লে, আমি তোমার কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব আশা করিনি', সু···

সুব্রত তার আচমকা ব্যবহারের জন্য যেন প্রস্তুত হ'য়েই ছিল এইভাবে ব্যঙ্গ ক'রে স্নেহের সুরে বল্‌লে, বাস্তবিকই আমার বড্ড অন্যায় হ'য়ে গেছে, অনীতা। তোমার সম্পূর্ণ আত্মদানের মধ্যে যে দেহটা বাদ সেটা বোঝ্‌বার মত শুভবুদ্ধি আমার হ'য়ে ওঠেনি'···

মর্ম্মাহত হ'য়ে কাঁদকাঁদ স্বরে অ্যানিটা বল্‌লে, তুমি অম্‌নি ক'রে জিনিষটার দিকে দেখ্‌ছ কেন সু? তুমি ত নিজেই কতবার আমায় বলেছ তুমি কোন জিনিষই for its own sake চাওনা! তুমি কি শুধু আমার দেহটা পেলেই তৃপ্ত হও?···বলো···

সুব্রত কোন উত্তর দিলে না। গুম্ হ'য়ে শুয়ে রইলো। অ্যানিটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাব্‌লে, তারপর ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার সুব্রতর গলা জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটের উপর সন্তর্পণে একটি চুমু খেলে···

সুব্রত কিন্তু কোনই সাড়া দিলে না।

খোলা মাঠের মধ্যেই দু'জনে সে রাতের মত শুয়ে রইলো।

ভোর হ'য়ে এসেছে তখন। পূর্ব্বদিকে আকাশের রক্তিমা তখনও দেখা যায়নি, সামান্য কুয়াসার ভাব একটু একটু আছে। একটুখানি হাই তুলে অ্যানিটা বল্‌লে, ওগো ওঠো, আজকে যে আমাদের লণ্ডনে ফিরে যেতেই হ'বে···

চোখ খুলেই আবার মুদে সুব্রত উত্তর দিলে, উঠ্‌ছি··· কেমন ঘুম হ'ল তোমার?

—মন্দ নয়।···আসলে কিন্তু সারাটি রাত অ্যানিটার ঘুম হয়নি, সে শুধু সুব্রতর কথা ভেবেছে, আর ভেবেছে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পটলেখা। কতবার সে ঘুমন্ত সুব্রতর চুল নিয়ে খেলা করেছে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। সুব্রতর ছোট্ট ছোট্ট রসিকতাগুলি, তার অভিমান, তার কপট বিরক্তির কথা ভেবেছে আর তার সাথে তুলনা করেছে তার সেই শ্লেষমাখা ব্যঙ্গোক্তির। সমাধান কিছুই করতে পারে নাই, মন শুধু প্রেমবেদনায় নিপীড়িত হ'য়েছে মাত্র।

চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে উঠে বসে সুব্রত গম্ভীরভাবে বল্‌লে, তাইত, আর ত দেরী করা যায় না! এখন যে আমাদের উঠ্‌তেই হ'বে নইলে লণ্ডনের ট্রেণ মিস্ করব···

অ্যানিটা তার বিশৃঙ্খল চুলগুলো এবং অসংলগ্নবেশ সংবরণ করতে করতে বল্‌লে, তুমি কি আমার উপর রাগ করলে, সু?

সুব্রত মুখে হাসি টেনে এনে বললে, পাগল···তোমার উপর রাগ করব কেন ?···(তারপর একটুখানি অভিমানের-স্বরে) আর রাগ করবার অধিকারই বা আমার কী আছে ?

অ্যানিটা দু'হাতে সুব্রতর ডাঁনহাতটা ধরে বললে, আমার প্রিয়তম, তুমি আমায় ভুল বুঝোনা। একটুখানি মন খুলে হাসো, আমায় ঠিক আগের মত ডাকো দেখি ..

সুব্রত ম্যাকিনটস্ টা গুটাতে গুটাতে বললে, না, না, আমি সত্যি রাগ করিনি, অনীতা। আমি শুধু ভাব্ছি আমাদের কথা···

লণ্ডনে দু'জনেই ফিরে এলো। পথে সুব্রত অধিকাংশ সময়টাই নীরব হ'য়ে রইল। অ্যানিটা অনেকবার তার সাথে গল্প রসিকতা করবার প্রয়াস করেছিল, কিন্তু সুব্রতর গাম্ভীর্য্যের কাছে সবই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হ'য়ে গেল। ওয়াটার্লু ষ্টেশনে বিদায় নেওয়ার সময় অ্যানিটা সুব্রতর হাত দুটি ধরে আবার বলে গেল, লক্ষ্মীটি, রাগ করোনা। আর যখনই তুমি আমায় আসতে বলবে আমি ছুটে আসব।

সুব্রত প্রশান্তভাবে জবাব দিলে, আমি রাগ একটুও করিনি অনীতা। আমাদের সম্বন্ধটার ভিত্তি কোথায় তাই একটু তলিয়ে দেখ্বার চেষ্টা করছি মাত্র।

দিন দশেক পরের কথা। অ্যানিটা এর মধ্যে সুব্রতর কোনই খবর পায়নি', চিঠি একখানা লিখেছে, উত্তর আসেনি'। সেদিন সন্ধ্যাবেলা অপরিচিত হাতে লেখা একখানা চিঠি দেখেই তার মন অজানা শঙ্কায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্ল। তাড়াতাড়ি খুলে দেখ্লে, সুব্রতর এক বন্ধু লিখেছে যে সুব্রত ভয়ানক অসুস্থ, সুচিকিৎসার জন্য তাকে ইতালীয় হাঁসপাতালে দেওয়া হয়েছে···সে অনীতাকে দেখ্বার জন্য বড় উৎসুক···

সুব্রত তাকে ডাক্ছে! তার সমস্ত দেহ মনের মধ্য দিয়ে পুলকের স্পন্দন ব'য়ে গেল। হোক্ না তার অসুখ, স্নেহ এবং পরিচর্য্যা দিয়ে সে সুব্রতকে সুস্থ ও নিরাময় ক'রে তুলবে, তার প্রেমের পরিতৃপ্তি হ'বে সুব্রতর সেবায়, সুব্রতর ম্লান অথচ প্রশান্ত হাসিতে। ফিল্মের মত অ্যানিটার চোখের সামনে কত ছবিই যে ভেসে উঠ্ল তার গুণ্তি সে নিজেই জানে না!

ঘণ্টা দুই পরে অ্যানিটা যখন ইতালীয় হাঁসপাতালে গিয়ে পৌছ্ল তখন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের দেখা করার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। সে অফিসে গিয়ে মিঃ এস্. বসুর কামরা কোথায় জিজ্ঞেস্ ক'রে গম্ভীরভাবে লিফ্টে উঠ্তে যাবে এমন সময় একটি নার্স তার দিকে দৌড়ে এসে বললে মাপ্ করবেন, আপনিই কি মিস্ অনীতা ?

—হ্যাঁ।···ব'লে জিজ্ঞাসুনেত্রে অ্যানিটা চেয়ে রইল।

—আপনি বেশ ভালো সময়ই এসেছেন। মিঃ বসুর জ্ঞান ফিরেছে, আপনাকে দেখ্তে পেলে তিনি খুবই খুসী হ'বেন, কিন্তু আপনি কোন রকম উত্তেজনার প্রশ্রয় দিবেন না, মিস্ অনীতা···

—তাঁর কি খুবই শক্ত অসুখ, নার্স ?

—হ্যাঁ, শক্তই দাঁড়িয়েছিল, বুকে সর্দ্দি বসে গিয়েছিল কিনা! তবে তিনি crisis পার হ'য়ে গেছেন, এখন শীগ্গীর সেরে উঠ্বেন আশা করি···বিশেষতঃ আপনি যখন কাছে এসেছেন···

পুলকে অ্যানিটার মুখখানা সিঁদুররাঙা হ'য়ে উঠ্ল। সে কোনক্রমে ধন্যবাদ দিয়ে লিফ্টে ঢুকে পড়্ল।

অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সে যখন সুব্রতর ঘরে ঢুক্ল তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। ঘরের মধ্যে শুধু এক কোনে সবুজপর্দ্দায় ঢাকা আলো জ্বল্ছে, তা'ছাড়া আর সবটা ঘরেই আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা চল্ছে। অ্যানিটা সুব্রতর শিয়রের কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে বললে, এখন কেমন লাগ্ছে, সু ?

সুব্রত যেন এতক্ষণ তারই অপেক্ষা করছিল এমনি ভাবে নিতান্ত নির্ভরের সুরে বললে, আজ বেশ আছি অনী··। তোমার হাতটা কী নরম, আঃ···

অ্যানিটা তখন সুব্রতর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে; সুব্রত তার আদর, তার স্পর্শ উপভোগ করছে এই গর্ব্ব ও সৌভাগ্যে তার মন পরিপূর্ণ।

সুব্রত আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস্ করলে, আমায় তুমি মাপ করেছ, অনী ?

অ্যানিটা মৃদুতর্জ্জন ক'রে বললে, কী যে বলো সু! তুমি কখন অপরাধ করলে যে আমি মাপ করব? তো[illegible]

আমায় যদি কখনও মতের পার্থক্য হ'য়ে থাকে তবে সেটা ত মিলনের কল্লোল, বিরহের সূচনা সে ত নয়!

অ্যানিটা রাত্রে জেদ ধর্‌লে সে হাঁসপাতালেই থাকবে সুব্রতর পাশে। নার্স এবং মেট্রন্‌ এসে নিষেধ করলেন, বল্‌লেন তার সান্নিধ্য সুব্রতর পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে। কিন্তু অ্যানিটা হাসিমুখে উত্তর দিলে রোগীর রোগ আমিও একটু চিনি। আমার মনে হয় আমার সান্নিধ্য সুব্রতকে সুষ্ঠু ও সবল ক'রে তুল্‌বে শীগ্‌গীর।

দৃঢ়তার সাম্‌নে তর্ক চলে না, তাই অ্যানিটার জেদই বহাল রইল।

রাত তখন দুটো। সুব্রতর ঘরে অ্যানিটা একটা ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে, চোখে তার ঘুম নেই। ঘুমন্ত সুব্রতর দীর্ঘ-শ্বাসপ্রশ্বাস সে গুণ্‌ছে আর ভাব্‌ছে। হঠাৎ নিঃশ্বাসের দীর্ঘতা থেমে গেল দেখে সে পাশ ফিরে তাকালে। সুব্রত জেগে উঠেছে—জিজ্ঞেস করলে, তুমি এখনও ঘুমোও নি' অনী?

—না, আমার আজ ঘুম পাচ্ছে না···

—আমার কাছে এসো, অনীতা ··

অ্যানিটা তার চেয়ারখানা সুব্রতর বিছানার কাছে এগিয়ে এনে বস্‌ল। সুব্রত তার শীর্ণ হাতে অ্যানিটার এলোচুলগুলোর মধ্যে আঙুল দিতে দিতে বল্‌লে, তুমি আমায় সেদিন কী নীচই না জানি ভেবেছিলে অনী!

--আবার তুমি ছেলে মানুষের মত ওকথা তুল্‌ছ, সু?··· তুমি শান্ত হ'য়ে ঘুমোও দেখি।

—অনী তোমার আমার মধ্যে লুকোচুরি কিছুই নেই। তুমি জানো সেদিনকার ব্যবহারের জন্য আমি কতদূর সন্তপ্ত এবং সেই ক্ষোভটা ঠিক প্রকাশ করতে পেরেছিলাম না বলেই বোধ হয় আমার বুকটা এতখানি ভারী হ'য়েছিল এতদিন। তুমি যে আমার কতখানি প্রিয় তা' আমি এই কয়দিনের ব্যবধানে বুঝ্‌তে পেরেছি।

—সু, অপরাধ যদি কারও হ'য়ে থাকে তবে সে আমার। সংস্কার আমার মনকে এতখানি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল যে তোমার সেদিনকার কথায় আমি চম্‌কে গিয়েছিলাম, আমার মন তার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই একটু আঘাতও পেয়েছিলাম। মূর্খ আমি, তখন ভেবে দেখিনি যে তোমার দাবি সম্ভোগের দাবি নয়, সে যে স্নেহের, পূর্ণ প্রেমের ন্যায্য অধিকার·

আরও কিছুদিন পরে। সুব্রত সেরে উঠেছে—বাড়ী এসেছে। দিন দশেক সুব্রত আর অ্যানিটা মুহূর্ত্তের জন্যও কাছ ছাড়া হয়নি। অ্যানিটা তার অপরাধের স্খালন করবার চেষ্টা করেছে তার সেবায়, কর্ম্মনৈপুণ্যে, আদরে; আর সুব্রত তার প্রতিদান দিয়েছে তৃপ্তিভরা হাসিতে, চঞ্চল চোখের কটাক্ষে, টুক্‌রো টুক্‌রো কথায়।

এক সন্ধ্যায় সুব্রত হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস্‌ করলে, আচ্ছা, অনী, সম্ভোগের জন্য কখনও তোমার মন আকুল হয় না?

লজ্জাবনতমুখে অ্যানিটা উত্তর দিলে, এই বয়সে তোমার সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যে তোমার বুকভরা ভালবাসা পেয়েও যদি না হয় তবে আর কখন হ'বে?

—কিন্তু তুমি কখনও তোমায় আমার কাছে তেম্‌নি ভাবে বিলিয়ে দাওনি কেন? সম্ভোগের তীব্র মাদকতা তোমায় কখনও স্পর্শ করেছে ব'লে আমার বোধ হয় না!

—আত্মসমর্পণ করিনি এতদিন তার কারণ ছিল সংস্কার। তুমি বল্‌বে, যা স্বাভাবিক তাই সত্য, সংস্কার মানা দুর্ব্বল মনের পরিচয়। আমি বল্‌ব, না গো···সংস্কার যদি ঠিক পথে চালিয়ে নিতে পারো তবে সেটা তোমার ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্রের ব্যাঘাত করে না, তাতে বরং বল পাওয়া যায় অনেকটা।···আর তা'ছাড়া আমার সমস্ত মন যখন তোমার জন্য উন্মুখ তখন শুধু দেহটাকে বড় ক'রে লাভ কী?

—কিন্তু দেহটা ত মিথ্যা নয়···

—মানি, কিন্তু দেহটা সব চেয়ে বড় সত্যিও নয়, সু...

তুমি আমায় ধাঁধাঁর মধ্যে ফেল্‌লে, অনীতা। তুমিই না সেদিন বলেছিলে তোমার দেহটা পর্য্যন্ত আমার কাছে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছ! আজ্‌কে যেন আবার বেসুর বল্‌ছ, অনী...

—বেসুর নয়, সু; সুর দুটো একই, যদিও বার থেকে মনে হয় এদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। দেহটাকে আমি মিথ্যা কখনও বলিনি, শুধু বলেছি এটা সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সত্যি নয়। কিন্তু খুব বড় সত্যি এটাও হ'তে পারে যখন আমরা দেহের লোভে মনটাকে না ভুলি, যখন সম্ভোগটাকে আমাদের মনের পূর্ণতার প্রতীক ব'লে ভাবতে পারি। এতদিন আমি সেটা ভাবতে পারিনি, সংস্কার ও মনের দুর্ব্বলতার জন্য। এখন আমি আলো পেয়েছি, সু···

দু'হাতে অ্যানিটাকে বুকের কাছে টেনে এনে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে তার অন্তররহস্য বুঝবার চেষ্টা করতে করতে সুব্রত বললে, তাই তুমিও আমায় ভাবিয়ে তুলেছ, অনী। বক্তৃতা আমি চিরকালই দিয়ে এসেছি, কিন্তু তোমার মত মর্ম্মে মর্ম্মে সে সত্য উপলব্ধি করতে পারিনি বলেই আমার পৌরুষ আমায় মানা করছে তোমার আত্মদানের advantage নিতে!

অ্যানিটা গর্ব্বে পুলকে আত্মহারা হ'য়ে সুব্রতর নিবিড় আলিঙ্গন নিবিড়তর ক'রে তার ঠোঁটে দুটি চুমু খেয়ে বললে, প্রিয়তম সু আমার, তোমার মহত্ত্ব, তোমার ভালবাসার যোগ্য যেন আমি হ'তে পারি এই আশীর্ব্বাদ করো। আমার বেদনাকে তুমি ভাষা দিয়েছ, সেই ভাষাকে আমি তোমার প্রেমের অর্ঘ্য পরাতে চাই...

বিদায়ের আগের দিন। অ্যানিটা আব্দার ধরেছে সে নিজে সুব্রতর জিনিষপত্তর সব গুছিয়ে দিবে। সুব্রত মূঢ়ের মত বসে আছে, আর অ্যানিটা নিপুণা গৃহকর্ত্রীর মত সুব্রতর মোজা, টাই, সার্ট সব ঠিকঠাক ভাঁজ করছে আর পুরছে। অ্যানিটার ক্ষিপ্রতা, তার সযত্ন কাজ সুব্রত শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে আর ভাবছে, কী অদ্ভুত মেয়ে!

ঘণ্টা দুইএর পর যখন সব গুছানো শেষ হ'ল তখন অ্যানিটা হাঁপাতে হাঁপাতে সুব্রতর কাছে এসে তার কোলের উপর বসে বললে, মাগো, কী অগোছাল ছেলে তুমি... আমি না এলে তোমার কত টাই আর কলার যে পড়ে থাকত! আর তোমার ডেভন্‌শায়ারের সেই সুভেনিরটাও ত তুমি এককোণে ফেলে দিয়েছিলে...

—ডেভন্‌শায়ারের সেই গল্প মনে আছে, অনী?

—বাঃ, সে কী আর ভুলতে পারি?...ডেভন্‌শায়ারের গল্পেই ত আমাদের প্রথম ঝগড়া আরম্ভ হয়, নয় কি গো?

—হুঁ···আচ্ছা, অনী, সেদিনগুলো কি আর ফিরে আসবে?

এবার একটু গম্ভীর হয়ে অ্যানিটা বললে, যে দিন চলে যায় তা' আর ফিরে আসে না, পড়ে থাকে শুধু স্মৃতি। কিন্তু স্মৃতি বড় কঠোর জিনিষ, সু। তা' আমাদের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বেদনা দেয়, আমাদের চেতনাকে সব সময় সন্ত্রস্ত সজাগ ক'রে রাখে।

—কিন্তু জান ত' তোমাদেরই কবি বলে গিয়েছেন, Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts...

—জানি। কিন্তু তার মাধুর্য্য ত গানের নায়কনায়িকারা পায় না, সেটা উপভোগ ক'রে বাইরের নরনারী। দুটি প্রাণীর মর্ম্মবেদনার উপর সৃষ্টি হয় কবির সঙ্গীত ঝঙ্কার: ব্যথার অবদানকে ঘিরে সকল সুরের অখণ্ড রাগিনী বেজে ওঠে··

ব'লে সে চুপ করে রইল। ঘরের নিস্তব্ধতায় অস্বস্তি-বোধ ক'রে সুব্রত বললে, কথা বলো, অনী···

অ্যানিটা একটুখানি চুপ ক'রে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস্ করলে, আচ্ছা, সু, তোমার আমার মিলন কি একেবারেই অসম্ভব?

—একেবারেই অসম্ভব এমন কথা বলতে পারিনে, অনী, কারণ নেপোলিয়ন নাকি বলেছিলেন অসম্ভব কথাটা মূর্খেরাই ব'লে থাকে। তবে যতদূর দেখছি আশার আলো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, অনী··

—তুমি বলছ, আমি তোমার দেশ তোমার সমাজকে আপন ক'রে নিতে পারব না।···আমি তোমার দেশ ও সমাজকে নিজের চোখে দেখিনি, বইএর পাতায় শুধু পড়েছি, কাজেই তোমার কথার প্রতিবাদ করার মত ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু ভালোবাসায় কী না হয় সু?··· তুমি যদি আমায় একটুখানি সাহস দাও তাহ'লে আমি আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে তোমার মনের মত হ'বার চেষ্টা করি···

—সে বড় কঠিন, অনী…

—অস্বীকার করিনে…কিন্তু মিস্ মেড্ ত আমার দেশেরই মেয়ে! তোমাকে কেন্দ্র ক'রে আমার যে অপরিসীম ভালোবাসা সে কি তোমারই প্রিয় দেশ বা সমাজকে ভালোবাস্তে পার্বে না?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুব্রত বল্লে, তোমার দৃঢ়তা বা ক্ষমতাকে আমি অবিশ্বাস করিনে, অনী।…কিন্তু তুমি আমাদের সমাজ ও দেশের পরিচয় এখনও পাওনি, তাই অমন বল্ছ! তুমি ভালোবাস্বে কাদের?—যারা সন্দেহের চোখে তোমায় দেখ্বে, তোমার আমার নামে কুৎসা রটাবে তাদের? যাদের অনুভূতি নেই, কল্পনা শক্তির অভাব যাদের প্রতি অণুপরমাণুতে তাদের সাথে মীমাংসা চলে না।

—আমি সবই সইতে পারব, প্রিয়তম…

—হাজার হোক্, তুমি মেয়ে, তোমার পক্ষে সব সহ্য করা খুবই কঠিন হ'বে, অনী। আর তোমার প্রেম, সেবা ও স্নেহের মর্য্যাদা যারা বুঝ্বে না তাদের সাথে ভদ্রতা বা বন্ধুত্বের মুখোসটুকু পর্য্যন্ত আমি রাখ্তে পারব না।

অ্যানিটা বল্লে, তুমি হয়ত ঠিকই বল্ছ, প্রিয়তম। তোমার কাজ তোমার দেশে, আমার অদৃষ্ট আমায় রাখ্ছে এখানে। ভবিতব্য আমি মান্তাম না, কিন্তু ভবিতব্যের দোহাই দেওয়া ছাড়া মনকে প্রবোধ দেওয়ার আর কী আছে, সু?…

চোখে তার জল,…মুখে তার বেদনার লেখা।

শেষের দিন সুব্রতর ইচ্ছা ছিল না অ্যানিটা ষ্টেশনে এসে বিদায় নেয়। অভাগিনী মেয়ে…বাপ মা হারা ছেলেবেলা থেকেই…সুব্রতর প্রেম তাকে এতদিন যেন সঞ্জীবনীর শক্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল—তার মনের প্রফুল্লতার বিকাশ হ'য়েছিল তার দেহের সৌন্দর্য্যে। সুব্রত কেবলই ভয় করছিল, অ্যানিটা না কেঁদে ফেলে…

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন। সুব্রত তার বন্ধুবান্ধবদের সাথে গল্প করতে ব্যস্ত, কিন্তু তার চঞ্চল চোখ দুটি কার সন্ধানে দশমিনিট বাকী আছে, এমন সময় পেছনে কার অঙ্গুলি স্পর্শ পেয়ে ফিরে সুব্রত দেখে অ্যানিটা দাঁড়িয়ে, মুখে তার এক গাল হাসি…

—আমি ভাব্ছিলাম তুমি বুঝি এলে না…

দুষ্টামিভরা চোখে বল্লে, ভেবেছিলাম আস্ব না। তারপর ভেবে দেখ্লাম না এলে তুমি ছোট্ট খোকাটির মত মুখভার ক'রে বসে থাক্বে, হয়ত সারাটা পথ কিছুই খাবেনা। তাই এলাম—নিতান্ত অনুকম্পায়…

সুব্রত অ্যানিটার সহজ স্বচ্ছকথার ভঙ্গিতে একটু বিস্মিত হ'য়ে গিয়েছিল। সেটা চেপে রেখে বল্লে, শুধু অনুকম্পায়, অনী?…

চোখ টিপে অ্যানিটা বল্লে, ষ্টেশনের প্লাট্‌ফরমে দাঁড়িয়ে ছেলেমানুষী ক'রো না, সু…(তার পর একটুখানি থেকে) তুমি সবই জানো, সু, আমায় বুঝিয়ে দিতে হ'বে না…

—আমি তোমায় মার্সেলস্ থেকে চিঠি লিখ্ব, অনী…

—সে এখন তোমার খুসী, তুমি না লিখ্লে আমি ত' আর জোর ক'রে আদায় কর্তে পারব না!

একটু আহত হ'য়ে সুব্রত বল্লে, তুমি আমায় শেষে এমন ভাব্লে, অনী?

অ্যানিটা সুব্রতর হাত দুটি ধরে বল্লে, এই দেখ… আজ আমার যেন কী হয়েছে! তোমার যাবার বেলায় তোমায় ব্যথা দিলাম আবার, মাপ ক'রো…

বাঁশী বাজ্ল গাড়ীতে উঠ্বার সময় হ'য়ে এল। সুব্রতর চোখে জল ভরে আস্ছে, সে কোনক্রমে তা' রোধ ক'রে বল্লে, তোমায় আমি কখনও ভুল্তে পারব না, অনী…

অ্যানিটা প্রথমে কলহাস্যে প্লাটফরম্ মুখরিত ক'রে হঠাৎ একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্লে, সে কি আমি জানিনে সু?…তোমার মনের পরিচয় ত আমার কাছে অজানা নয়…

গাড়ীতে উঠ্তে উঠ্তে সুব্রত বল্লে, আচ্ছা, বিদায় আনীতা তা হ'লে…

অ্যানিটা তেম্নি হাসিমুখে বল্লে, বিদায় বল্তে দেব না আমি, বল আসি তা হ'লে…

মন্ত্রমুগ্ধের মত সুব্রত বল্লে, আসি তাহ'লে অনীতা…

গাড়ী ছেড়ে দিল।

প্লাটফরম্ ছাড়িয়ে ট্রেণ যখন চলে এসেছে তখন সুব্রত জান্‌লা থেকে সরে এসে নিজের সীটে বস্‌তে গিয়েই দেখে একখানা চিঠি। সেই পরিচিত হাতের লেখা—উপরে সম্বোধন, আমার প্রিয়তমের প্রতি···

• খুল্‌লে, অ্যানিটা লিখেছে—

"প্রিয়তম, মুখে সব সময় হয়ত তোমার কাছে বল্‌তে পারিনি কিন্তু আমার মনের ভাষা তুমি বুঝেছ। আমি তোমায় নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসি একথা বারবার ব'লে তোমার বুদ্ধি ও প্রেমের অপমান আমি করতে চাইনে; আমি শুধু বল্‌তে চাই এই যে এ শুধু বাসনার বিফল মিনতি বা কল্পনার ছল নয়, এ আমার মর্ম্মের অনুভূতি। তুমি জীবনে জয়মুকুট পর, সে আমার গৌরব। আমি দূর হ'তে শুনব, তোমার স্মৃতি নিয়ে আমার খেলা খেল্‌ব, আমার মালা গাঁথ্‌ব। কিন্তু আমার দৃঢ়তা তোমার চেয়েও কম নয় তোমাকেই আমি একমাত্র ভালোবেসেছি, এবং সেই ভালোবাসার মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে আমি আজীবন তোমার জন্য অপেক্ষা করব।.. তুমি বিচলিত হ'য়োনা, তোমার কর্ত্তব্য তুমি ক'রে যাও, কিন্তু যদি কখনো ইচ্ছা হয় আমাকে ডেকো; দেখ্‌বে আমি আমার সাথীত্ব, সাহচর্য্য ও সেবা তোমায় দেবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে বসে রয়েছি।

তোমার সেই আহ্বানের প্রতীক্ষায় রইলাম, প্রিয়তম।

তোমার অ্যানিটা (ও অনীতা)।

ট্রেণ তখন বিপুলবেগে ডোভারের দিকে ছুটেছে...

নবগোপাল দাস

ভালবাসা (২)

"অনিকেত"

সত্যি তুমি বেসেছিলে ভালো?
ভালোবাসা
মর্ম্মের মর্ম্মর-তলে চিতা ভস্ম সম,
রুদ্ধ করি' সব হাসি সব আশা মম,
অশ্রুহীন বেদনায় এ জীবন করে আছে কালো।

সত্যি তুমি চেয়েছিলে ও পূত হৃদয়
করিবারে বিনিময়?
কার সনে, হে কল্যানি! স্বর্ণাঞ্চল মেলি'
কেবা লয় ধূলি রাশি? সুরধাম ফেলি'
কেবা চায় মরতের ব্যথাতপ্ত আঁধার নিলয়?

তাই যদি হ'ত! আর আমার জীবনে
সত্য হ'ত ভালোবাসা!
তবে আজ স্পর্শে তব, ওগো মুগ্ধাননে,
আবার ফুটিত হাসি শুষ্ক, ভগ্ন হৃদয় কাননে,
আবার উঠিত নব বসন্তের সান্দ্রছায়ে মিলনের উদ্বেলিত ভাষা,
আবার জাগিত শত আশা।

ষ্ট্রীণ্ডবার্গে ভারতীয় চিন্তার প্রভাব

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ইউরোপে হেনরিক্ ইব্‌সেন ও বিয়র্নসনের মত অগাষ্ট ষ্ট্রীণ্ড্‌বার্গ (August Strindberg) একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি। আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় পার্শ্বে সাহিত্য জগতে তাঁহার বিশেষ সম্মান। পশ্চিমের এই তিনজন সাহিত্যিকই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অধিবাসী। ষ্ট্রীণ্ড্‌বার্গ ইব্‌সেনের সমসাময়িক। সেক্সপিয়র দুই তিন শত বৎসর সাহিত্য জগতের একচ্ছত্রাধিপতি হওয়ার পর ইব্‌সেন্ তাঁহার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। বার্ণার্ডশ প্রভৃতি সাহিত্যিক তাঁহার শিষ্য।

ষ্ট্রীণ্ডবার্গ সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হলম্ সহরে ১৮৪৯ খ্রীঃ ২২শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে ১৯১২ সালে ১৪ই মে পরলোক গমন করেন। জনসাধারণে জাতীয় অনুষ্ঠানের মত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাঁহার পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু অগাষ্টের জন্ম হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার ব্যবসায়ে সমূহ ক্ষতি হয়। তাঁহার মাতা একটি সুইডিস্ হোটেলে পরিচারিকা ছিলেন। এইরূপে তাঁহার বাল্যকাল অতি দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। অগাষ্ট পিতামাতার তৃতীয় পুত্র। তাঁহার সহিত তাঁহার পিতামাতার বা অন্যান্য ভাইদের কোন প্রকার সাদৃশ্য ছিল না। শিশুকাল হইতে তাঁহার বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে। তিনি স্কুলে আদৌ সুখী হন নাই। তাঁহার নিকট পড়াশুনা বড়ই কষ্টকর বোধ হইত। ১৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতার মৃত্যু হওয়ায় পিতা পুনরায় বিবাহ করেন—ইহাতে তাঁহার গৃহের প্রতি উদাসীনতা পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই সময় হইতে পাঁচ বৎসর যাবৎ তিনি গভীরভাবে ধর্ম্ম চিন্তা ও অভ্যাসে নিযুক্ত হন ও পরে ১৮ বৎসর বয়সে আপ্‌শালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। দারিদ্র্যের পীড়নে তিনি পাঠ্য পুস্তক কিনিতে পারিতেন না—তাই পড়াশুনা ছাড়িয়া দেন; ও ষ্টক্‌হলমের যে স্কুলে তিনি ছাত্র ছিলেন—তথায় শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এই সময় একটি মিলনাত্মক (comedy) ও আর একটি ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া একটি রাজকীয় বৃত্তিলাভ করেন ও ডিগ্রী লাভের আশায় পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়া যান। এইখানে তিনি ড্যানিশ্ দার্শনিক কিয়ারকিগার্ড, ইংরাজ দার্শনিক বাক্‌ল্, জার্ম্মান্ দার্শনিক এডুয়ার্ড হার্টমান (ভারতীয় দর্শনে সুপণ্ডিত দুঃখবাদী শোপেন হাওয়ারের প্রধান শিষ্য) হুগো, নিট্‌জে, বালজাক্, ডারউইন, সোয়েডেনবার্গ প্রভৃতির দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময় হঠাৎ রাজার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায় ও তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয়। তিনি প্রথমে ডাক্তারি ও পরে সংবাদপত্র লেখকরূপে কিছুকাল চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায় ইব্‌সেনের মত একটি ছোট দ্বীপে কিছুকাল নির্জ্জন বাস করেন। পরে রাজকীয় পুস্তকালয়ে একটি চাকুরী পান; এইখানে তাঁহার ইচ্ছামত তিনি বহু পুস্তক অধ্যয়ন করেন। ভাষা বিজ্ঞান, চীনভাষা, রসায়ন শাস্ত্র তাঁহার প্রিয় পাঠ্য ছিল। ২১, ৪২, ও ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি তিনবার বিবাহ করেন কিন্তু সমস্ত বিবাহ বিচ্ছিন্ন (divorce) হইয়া যায়। তাঁহার ৫টি সন্তান ছিল। নামে তিনি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টান্ হইলেও অন্তরে তিনি সোয়েডেনবর্গের মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র ধর্ম্ম ও জীবনের নিগূঢ় রহস্য অবগতি দ্বারাই জীবনের দুঃখকষ্ট হাসিমুখে বরণ করা যায়। সাধুদের মত কঠোর সংযত, পরিমিত জীবনযাপন অধিকাংশ লোকের পক্ষে উচিত ও যে সব প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনে বিশেষ কোন মিশন আছে তাঁহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এক মূলপদার্থ হইতে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি প্রমাণ করা তাঁহার জীবনের এক স্বপ্ন ছিল।

প্যারিসে অবস্থান কালে অন্যান্য বণিজ পদার্থকে সোনায় পরিণত করার পরীক্ষা করিতে করিতে মুনি ঋষিরা (mystics) যে আনন্দলোক লাভ করিয়াছিলেন তাহার অন্বেষণে তাঁহার মন উন্মত্ত হইয়া উঠে; এই সময় তিনি বহু অলৌকিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেন। ইহাতে তিনি জড়বাদমূলক সন্দেহবাদ হইতে বিশ্বাসী ধার্ম্মিক হন ও মনের চাঞ্চল্য ও অস্থৈর্য্য দূর হইয়া যাওয়ায় আধ্যাত্মিক সত্যে ও জীবনে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর ইংরাজি অনুবাদক বিয়র্কম্যান বলেন "স্ট্রীণ্ডবার্গ দুঃখবাদ (pessimism)-মূলক জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন ও ঐহিক দুঃখ, অপমান ও নৈরাশ্যের মধ্যে এক উচ্চতর জীবন দেখিতে পাইতেন, যার জন্য এই জীবন আয়োজন মাত্র। যাহা কিছু তাঁহার নিকট বা অন্যের নিকট ঘটিত তাহাতে তিনি কোন অদৃশ্য মহাশক্তির অলঙ্ঘ্য প্রভাব অনুভব করিতেন যাহা সকলকে উত্থানপতন, ভালমন্দ, নিন্দাস্তুতি, ভয় সাহস প্রভৃতি দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া উচ্চাদর্শে লইয়া যাইতেছে। তাঁহার মতে আত্মনিবেদন দয়া, দৈন্য প্রভৃতি সদ্গুণই মানবজীবনের প্রধান অবলম্বন।"

স্ট্রীণ্ডবার্গ ৪৯ খানি মনোবিজ্ঞান-মূলক নাটক (psychological drama), ১৬ খানি উপন্যাস ও ছোট গল্পের বই, ৮খানি আত্মজীবনীমূলক সাহিত্য ও ৯খানি ইতিহাস রচনা করেন। তিনি জাতীয় ইতিহাস এমন উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন যে, তাঁহার "সুইডিস্ জাতি" (Swedish People) নামক গ্রন্থ বাইবেলের পরেই সুইডেনে সর্ব্বত্র পঠিত ও আদৃত হয়।

নাটকের নাম শুনিয়া কোন পাঠক যেন অতিষ্ঠ ও অসহিষ্ণু হইয়া না উঠেন। ভারতবর্ষে উচ্চ সাহিত্য নাই বলিলেই চলে। পৃথিবীর ৭।৮টি প্রধান ভাষার অন্যতম বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ব্যতীত ভারতের কোন ভাষাতেই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্ট হয় নাই। আমাদের দেশে পুরাণ জাতি গঠনে যাহা হইয়াছে পশ্চিমে 'ড্রামা' (নাটক) তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী করিয়াছে। ধর্ম্মমন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ যে জনসাধারণের নিকট ধর্ম্ম ও শিক্ষাপ্রচার পশ্চিমে stage (রঙ্গমঞ্চ) তাহা করিতেছে। দর্শনবিজ্ঞান যে সকল সত্যে উপনীত হয় সাহিত্য তাহা পত্রপুষ্প শোভিত নানা অলঙ্কারের মধ্য দিয়া সর্ব্বসাধারণের দ্বারে দ্বারে প্রচার করে। পল্লীগ্রামে যাত্রা গানের প্রভাব সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। দর্শনবিজ্ঞান সামান্য কয়েক জনের জন্য—সাহিত্য আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের জন্য। পশ্চিমের হুগো, আনাতোল ফ্রান্স, টমাসম্যান, ইবসেন, সেক্সপিয়র, গেটে প্রভৃতির সাহিত্য যাঁরা পড়িয়াছেন তাঁরা জানেন উহা কেমন ধর্ম্মনীতি, দর্শনবিজ্ঞান, রাজনীতি, কৃষ্টি (culture)-তে ভরা। যে জাতি যত বড় সে দেশের সাহিত্য তত বড়। উচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি হইলেই বুঝিতে হইবে জাতির নবজীবন সূচনা আরম্ভ হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' 'কর্ম্মযোগ' প্রভৃতি পুস্তক দেশে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা সকাই জানেন। গিরীশচন্দ্রের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব বিশেষতঃ বাংলার সাহিত্য জীবনে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। গিরীশচন্দ্রের 'তপোবল', 'বিল্বমঙ্গল,' 'শঙ্কর', 'বুদ্ধ', 'নিমাই' প্রভৃতি নাটক ধর্ম্ম ও সাধন তত্ত্বে পূর্ণ। মনোবিজ্ঞানের আলোকে সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে উহাতে মানব মন ও জীবনের ব্যষ্টি ও সমষ্টি চিত্র নিখুঁতভাবে পাওয়া যায়।

স্ট্রীণ্ডবার্গে ভারতীয় চিন্তার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এক শতাব্দীরও অধিক হইল পশ্চিমের প্রাচ্যতত্ত্ববিৎগণ ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রাচ্যতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, তথায় প্রায় সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্রে ভারতীয় চিন্তার অধ্যাপনা হয়, বিশেষতঃ সংস্কৃত। জার্ম্মেনি বর্ত্তমান যুগে বিশেষভাবে ভারতীয় চিন্তা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করিতেছে। রিজ্ ডেভিড্স যেমন বৌদ্ধ সাহিত্যে জীবনপাত করিয়াছিলেন, তেমনি মোক্ষমূলর প্রধানতঃ বেদ প্রচারে ও ডয়সেন বেদান্তপ্রচারে উড্রফ্ সাহেব তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারে প্রাণপণ করিয়াছেন স্ট্রীণ্ডবার্গ যে আপ্শালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন—তথা বর্ত্তমান ডাক্তার চার্ল কার্পেন্টিয়ার ভারতীয় দর্শন ও কৃষ্টি অধ্যাপক; ইনি বিখ্যাত 'ভারতের কেম্ব্রিজ ইতিহাস' (Cambridge history of India)-এ 'জৈনধর্ম্মের ইতিহাস' নামক পরিচ্ছেদ লিখিয়া দিয়াছেন। পাদ্

ডাক্তার অটো তাঁহার 'ভারতের ভক্তিবাদ' (Indian doctrine of Grace) নামক পুস্তকের সমস্ত বক্তৃতা এইখানে প্রদান করেন। (১)

ষ্ট্রীণ্ডবার্গের ২খানি নাটকের নাম 'চণ্ডাল' ও 'পারিয়া'। প্রতিপাদ্য বিষয়ও পুস্তকের নামানুযায়ী অনেকটা। অনুবাদকও হিন্দুভাব ও নাম রক্ষা করিয়াছেন। ফরাসী দেশের বিশ্ববিখ্যাত নোবেল প্রাইজ্‌প্রাপ্ত ভারতীয় ভাবাপন্ন সাহিত্যিক মরিস মেটারলিঙ্কের প্রভাবে লিখিত তাঁহার 'Dream Play' (স্বপ্নকেলী), Dance of Death, (মৃত্যুতাণ্ডব) নাটক্ অতীন্দ্রিয় বাদে (Mysticism) পূর্ণ। Dream Play বা স্বপ্নরঙ্গ নামক নাটকখানি তাঁহার অধ্যাত্ম ও ধর্ম্মমূলক নাটকের মধ্যে সর্ব্বোত্তম। উহাতে শুক্র, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ব্রহ্ম, মায়া, বরুণ, গঙ্গা প্রভৃতি হিন্দুপুরাণের নামগুলি আছে। উহার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, এই জগৎ ও মানবজীবন স্বপ্নের খেলার মত কোন বাস্তবিক সত্তা নাই। 'মুখবন্ধে' গ্রন্থকার লিখিতেছেন যে, "এখানে সব কিছুই ঘটতে পারে, সমস্তই সম্ভব। দেশকাল বলে কোন কিছু নাই, একটা অলীক ভূমির উপর কল্পনাময়ী, অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, সম্ভব, অসম্ভব, সত্যমিথ্যায় জাল সৃষ্টি করিতেছে। স্বপ্নজগতের চরিত্রের মত এ জগতের সমস্তই যুক্ত, বিযুক্ত, দ্বিধা, ত্রিধা, স্পষ্ট, অস্পষ্ট হইয়া আলোক আঁধারে মিশিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই সমস্তের মধ্যে স্বপ্ন দ্রষ্টার জ্ঞান অপ্রতিহত, অটুট, অবিকৃত রহিয়াছে; উহার নিকট কোন কিছুই অজ্ঞাত, বা কোন রহস্য লুক্কায়িত থাকে না। এবং স্বপ্নের মত জীবন প্রায়ই কষ্টদায়ক, কচিৎ আরামজনক—জগৎজোড়া দুঃখের রোল বহিয়া উঠিতেছে।" এই 'স্বপ্নলীলা'র উল্লিখিত জনৈক ব্যক্তির মুখে তিনি বলিতেছেন "কালের প্রভাতে যখন সূর্য্য কিরণ দিত না তখন ব্রহ্ম আদিশক্তি জগৎপ্রসবিনী মায়া-যুক্ত হইলেন। এই আদি দৈবীশক্তির সহিত অজ্ঞানের সংযোগ হওয়ায় স্বর্গে পাপের সৃষ্টি হইল। তাই এই জগৎ জীবন, মানবজাতি মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে—এ সমস্তই মরীচিকা, স্বপ্নতুল্য, স্বপ্নের খেলা"।

'Dance of Death' বা মৃত্যু-তাণ্ডব নাটকে তিনি বল্‌ছেন আত্মার অমরত্ব বা পূর্ণজন্মবাদ জীবনের প্রতি নবালোকিত দৃষ্টিদান করে। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিলে জগতের অন্য সমস্ত সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া যায়; জীবনধারণ করা মানেই দুঃখভোগ করা। বোধ হয় যখন মৃত্যু আসে তখনই প্রকৃত জীবন আরম্ভ হয়। মৃত্যুর দ্বারেই নবজীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়; জীবন যেন একটা ভীষণ চাতুরী, সকলের উপর খেলান হচ্ছে।

'There are crimes and crimes' বা "এখানে কেবল অপরাধ এবং অপরাধ" নামক পুস্তকে তিনি বল্‌ছেন "মানব, তুমি এই জগতকে বাটীর মত আপনার মনে করছ? দুঃখবরণ কর, দুঃখে জীবন পবিত্র হয়, দুঃখে জীবন মহীয়ান হয়। এ জগতের সম্মান একটা ধাঁধাঁ, জীবনকে বিপদগ্রস্ত করা কুসংস্কার মাত্র, কাঞ্চন শুক্‌নো পাতা বই আর কিছু নয়, আর নারী জাতি জীবনে ভ্রান্ত মত্ততা আনায়।" "কুমারী জুলিয়া" নামক গ্রন্থে তিনি বল্‌ছেন "জগতের সব জিনিষই অদ্ভুত, মানব হইতে সব জিনিষ যেন একটা ভেতর-ফাঁপা খোলস মাত্র, যাহা সময়-সমুদ্রের উপর ভাস্‌ছে ও ভাস্‌তে ভাস্‌তে কেবল ডুবে যাচ্ছে—একবারে অতলতলে।" 'অতিথি' 'চণ্ডাল' ও 'পারিয়া' নামক পুস্তক হইতে বহু বাক্য উদ্ধার করা যাইতে পারে যাহাতে পাঠক বিশ্বাস করিবেন যে, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ ভারতীয় চিন্তার দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। দুঃখবাদের ভেতরেই মায়াবাদের বীজ নিহিত আছে। বৌদ্ধ দুঃখবাদ হইতে যেমন বেদান্তের মায়াবাদের উৎপত্তি হইয়াছে—তদ্রূপ পশ্চিমেও হইতেছে। আলেক্‌জান্দ্রিয়ার প্লটিনাশের অতীন্দ্রিয়-বাদ পাশ্চাত্যজগতে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অবশ্য অজ্ঞাতসারে। শোপেন্‌হাওয়ারের দুঃখবাদ ভারতীয় দর্শনের ইউরোপীয় সংস্করণ মাত্র। তিনি এত হিন্দু ও

(১) বহু বৎসর যাবৎ বাঙালী সন্ন্যাসী আনন্দাচার্য্য স্বামী নরওয়েতে 'গৌরীশঙ্কর মঠ' প্রতিষ্ঠা করিয়া বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। তাঁহার ভাই শ্রীযুক্ত রবীন্ বড়াল বি-এ, বি-টি, (নিউদিল্লী বাংলা স্কুলের শিক্ষক) বলেছিলেন যে, স্বামিজী ওখানে বহু শিষ্য করিয়াছেন ও নরওয়ে ভাষায় বহু বেদান্ত ও যোগগ্রন্থ লিখিয়াছেন।

বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন যে নিজের অধ্যয়ন কক্ষে কান্টের প্রতিচ্ছবির নিকট বুদ্ধদেবের একখানি প্রস্তরমূর্ত্তি রাখিতেন। পশ্চিমে বৌদ্ধ-চিন্তা ও দর্শন প্রায় এক শতাব্দীর অধিককাল রাজত্ব করিয়াছে। যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোতে বেদান্তের বিজয়ী পতাকা তুলিলেন, সেদিন হইতে পাশ্চাত্যে বৌদ্ধযুগের অবসান হইয়া বেদান্তযুগের সূত্রপাত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, দর্শন ভারতীয় চিন্তার আগমনী গাহিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের স্বপন আজ সত্য হইতে চলিয়াছে। সমস্ত জগতের চিন্তারাশি বেদান্তে পরিসমাপ্তি লাভ করিবে (Indianisation of the whole humanity)। তবে ভারতের স্বাধীনতার অভাবে তাহার দেরী হইতেছে। ভারত স্বাধীন হইলে বিদ্যুৎবেগে তাহার 'মিশন্' সম্পন্ন করিবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে আজ ভারতমাতা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে, তাই তাহার 'সাধনা'র দিকে তেমন লক্ষ্য নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিক লেনপুল সত্যই বলিয়াছেন যে, গ্রীসের মত ভারতও তাহার বিজেতাকে কৃষ্টিদ্বারা পরাস্ত করিবে। ভারতের সেই শুভদিন, সেই অনন্ত মুহূর্ত্ত আগতপ্রায়। বর্ত্তমান্ জগৎ ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার বিষয় অনেক পড়িয়াছে ও শুনিয়াছে। এখন চায় অনুভূতি সম্পন্ন দৈবী মানুষ যাঁরা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক আলোক দিতে পারিবেন। স্বামিজী সেই কাজ আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। শুধু পাণ্ডিত্য নয়—প্রত্যক্ষানুভূতি চাই। রাজনীতি-ক্ষুব্ধ তরুণ ভারত, তুমি স্বামীজির পদানুগ হইয়া ভারতের বাণী জগতে জীবনদ্বারা প্রচার কর।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

তবুও কেন হয়না চেনা-শোনা ?

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অস্ত-রবির রঙিন্ আলোর ঝরা
আমার ঘরে লুকিয়ে যখন চায়,
তোমার মেঘে প্রভাত তখন জাগে
তোমার বনে কোকিল তখন গায়!

আমার হাতের বাঁশি যখন থামে—
সুরের খেয়া কূল খুঁজে না পায়,
তোমার বীণায় পুলক নেচে ওঠে,
তোমার বাণী আকাশ বেয়ে ধায়

আমার শাখায় বাতাস যখন লাগে
কাঁটায় কাঁটায় শিহর-ধ্বনি ওঠে,
তোমার ছায়ায় রঙের জোয়ার আসে
তোমার তীরে গোলাপ তখন ফোটে!

আমার চোখে অশ্রু যখন নামে
ব্যথা যখন ভাষায় নাহি আঁটে ;
তোমার সুরের ঝর্ণা তখন বেয়ে
রসের তরী লাগে রূপের ঘাটে!

এমনি ক'রে তোমায় আমায় সখি,
চিরটা কাল চল্‌ছে আনাগোনা,
দুঃখ-সুখের লক্ষ আবর্ত্তনে—
তবুও কেন হয় না চেনা শোনা ?

মণিকা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

আজ থেকে দশবছর আগে, কল্‌কাতার সাহেবি-ঘেঁষা তখনকার দিনে অভিজাত ব'লে বিবেচিত সমাজে মণিকা কর ছিলো যাকে বলে গিয়ে rage। ওর বাপ ছিলেন সিবিল সার্ব্বিসে: ঊনবিংশ শতাব্দীর বিলেত-ফেরৎ, তাঁর ছিলো নির্ভেজাল সাহেবি মেজাজ: তিন ছেলের পর এক মেয়ে—এবং একমাত্র মেয়ে—তাঁর মণিকা, তাকে যথাসম্ভব মেমিয়ানার দীক্ষিত করতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। এবং বাপের আদর্শের সঙ্গে মেয়ের রুচির ও ইচ্ছার সর্ব্বৈব মিল ছিলো: আগাগোড়া লোরেটোয় শিক্ষিত, মণিকার সুন্দর ইংরেজি উচ্চারণ, সে-ভাষা অনর্গল বল্‌বার ক্ষমতা, তা'র নিখুঁত ইউরোপীয় আদব-কায়দা অনেক অক্সফোর্ড-ডিগ্রীধারীরও বিস্ময়ের উদ্রেক করতো। ছেলেবেলায় গবর্ণেসের কাছে সে ফরাসী শিখেছিলো, সে ল্যাটিন পদ্য আবৃত্তি ক'রে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পার্‌তো; শোনা যায়, ইস্কুলে থাকতে একবার ল্যাটিনে মৌলিক পদ্য রচনায় সে প্রাইজ পেয়েছিলো। মণিকা ছিলো মেজাজি মেয়ে, জেদি মেয়ে; তার কোনো ইচ্ছায় বাধা দিলে তার ভীষণ রোখ চেপে যেতো; কোনো বিষয়ে তার কৃতিত্ব সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে সেই বিষয়বিশেষে দখল অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত সে থাম্‌তো না। 'কেন পারবো না? ইচ্ছে করলে সবই পারি।' 'আমি যদি এ-কাজ না পারি, কে পারবে?' এ-ধরণের কথা প্রায়ই তার মুখ থেকে শোনা যেতো। এবং ও-সব ছিলো তা'র শুধু মুখের কথা নয়, মনের কথা; তা'তে বিশ্বাস করতো বলেই সে-অনুযায়ে কাজ করবার শক্তি সে পেতো। গণিতে সে ছিলো স্বভাবতই একটু কাঁচা; ও-জিনিষকে সে ভয় পেতো, পারতপক্ষে তার কাছ দিয়ে ঘেঁষতো না। তারি ফলে একবার ইস্কুলের এক পরীক্ষায় গণিতে সে ফেল করতে করতে বেঁচে যায়; এবং তা নিয়ে ক্লাসের টিচার একঘর মেয়ের সাম্‌নে একটা অপ্রিয় মন্তব্য করেন। সেই যে তার রোখ চাপ্‌লো—কোথায় গেলো তার ল্যাটিন পদ্য আর ফরাসী—কিছুকাল পর্য্যন্ত শুধু অঙ্ক আর অঙ্ক আর অঙ্ক: যেন গণিতের জিন তা'কে পেয়ে বসেছিলো। ফাইনেল পরীক্ষায় দেখা গেলো অঙ্কেই সে পেয়েছে সব চেয়ে বেশি নম্বর। যথেষ্ট: সে যা দেখাতে চেয়েছিলো, তা দেখিয়েছে: আর দরকার নেই। গণিত যেদিন একটা নির্ব্বাচ্য বিষয় হ'লো, সেদিন থেকে তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক সে বর্জ্জন করলো।

বস্তুত, এই দেখানোপনা, বাহাদুরি নেবার জন্যই কিছু করা মণিকার স্বভাবের একটা অংশ ছিলো, অন্যান্য ব্যাপারেও তা প্রকাশ পেতো। তার বাপ তাকে দিয়েছিলেন অবাধ স্বাধীনতা; যত রকম ভাবে তার 'মাথা খাওয়া' যায়, সে-বিষয়ে কোনো কার্পণ্য করেন নি। এবং সত্যি বল্‌তে, মণিকা যে সব সময় শোভনতার সীমা মেনে চল্‌তো, তা নয়। সে যে-সব কাজ করতো, তা আজকের দিনে তেমন কিছু অসাধারণ মনে হবে না; কিন্তু দশবছর আগেও তাদের মধ্যে নতুনত্বের জৌলুষ ছিলো, অন্যায়ের মোহ ছিলো। এবং সেই কারণেই, আমার বিশ্বাস, মণিকা ও-সবে আনন্দ পেতো; দশবছর পরে জন্মালে সে হয়-তো চুপচাপ বাড়ি এসে' কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়তো আর মাঝে-মাঝে পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে বাঙ্‌লা কবিতা লিখতো। একটা ফ্যাশান যখন সবাই গ্রহণ করে, তার বিরুদ্ধে যাওয়াই হয় ফ্যাশানের চূড়ান্ত। তখনকার দিনে মণিকার পক্ষে বহির্মুখী না হওয়া অসম্ভব ছিলো: উচ্ছৃঙ্খলতা ছিলো তার নিজের প্রতি অনস্বীকার্য্য কর্ত্তব্য। বাড়াবাড়ি: তোমার নাম মণিকা কর—সে-সময়ে তাকে

দেখলে এই হচ্ছে প্রথম কথা, যা আপনার মনে হ'তো। হৈ-চৈ ক'রে সে কখনো ক্লান্ত হ'তো না; ট্যাক্সিতে-রেস্তোরাঁয়-সিনেমায় অজস্র পয়সা ওড়াতো, কুলিয়ে উঠ্‌তে না পেরে এর-ওর কাছ থেকে নির্ব্বিচারে ধার কর্‌তো, রাত দশটার আগে কোনোদিন বাড়ি ফির্‌তো না। একবার নাকি সারারাত বাইরে কাটিয়ে পরদিন সকালে উস্‌কো-খুস্‌কো চেহারা নিয়ে বাড়ি ফিরে সে অত্যন্ত সাধারণ সুরে শুধু বলেছিলো, 'ব্যারাকপুরে ভীষণ মশা।' তবে এ-কথা লোকের মুখে শোনা; সত্য কিনা, জানিনে। ঘটনা-হিসেবে সত্য না হ'লেও এর স্পিরিটটা সত্যি; মণিকা ঠিক ঐ রকমই ছিলো। এক সময় হঠাৎ সে রোজ কুড়ি-পঁচিশটা করে সিগ্‌রেট খেতে আরম্ভ করে; সিগ্‌রেট তার ভালো লাগতো বলে নয়, শুধু লোক দেখাবার জন্য, বাহাদুরি নেবার জন্য। যখন সে মনে কর্‌লো সবাইকে যথেষ্ট অভিভূত করা গেছে, ঝাঁ ক'রে ছেড়ে দিলে সিগ্‌রেট। ওর সমস্ত আচরণই যেন একটু হেক্‌টিক; ওর মুখেও সব সময় উত্তেজনা-প্রসূত রক্তাভা যেন রঙের মত লেগে থাক্‌তো। কখনো-কখনো ও এমন কাজ কর্‌তো, যাকে হিস্‌টিরিয়া মনে করা ছাড়া উপায় থাক্‌তো না। একটানা অতক্ষণ ধরে' হাস্‌তে, হাস্‌তে-হাস্‌তে একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যেতে অন্য-কোনো মানুষকে আমি দেখিনি। আর, একদিন—দৈবাৎ আমি দেখে ফেলেছিলাম—বালিশের ওপর মুখ চেপে ধরে ও উচ্ছ্বসিত, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদ্‌ছে, এমন-ভাবে কাঁদ্‌ছে যেন সেই মুহূর্ত্তে ওর বুক ভেঙে যাবে। প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিলো, ওর যেন একটু মাথা খারাপ। এর শেষ কোথায়, মাঝে-মাঝে অবাক হ'য়ে আমি ভাবতাম। ওর এক-একটা stunt-এর পর, এর পর কী? আমি ভাব্‌তাম। এবং তারপর? তা'র পর?

এমন যে মেয়ে মণিকা, যার নাম কল্‌কাতা শহরের একটা অগ্নিকাণ্ড, তাকে ঘিরে যে প্রকাণ্ড এক ভক্তমণ্ডলী গড়ে' উঠ্‌বে, পৃথিবীতে কোনো ঘটনা যদি স্বাভাবিক হয়তো তা এ-ই। সে-বিষয়ে, সুতরাং, বেশি কিছু বলা বাহুল্য। তবে এটুকু বলা দরকার যে মণিকার অসংখ্য ভক্তের মধ্যে দীনতম, অযোগ্যতম—কিন্তু পূজার গভীরতায়, আন্তরিকতায় কারো চেয়ে কম নয়—ছিলাম আমি। কারণ সে-সময়ে—এখন অকপটে স্বীকার করতে দোষ নেই—আমি ওকে ভালোবাস্‌তাম। আমার প্রণয়ের নিষ্ফলতা আমি জান্‌তাম; কিন্তু তৎসত্ত্বেও, সেই জন্যেই আরো বেশি করে ভালোবাসতাম। আমার নবযৌবনের আকাশ ছিলো মণিকার স্বপ্নে আচ্ছন্ন। আমি তখন ছিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র; মণিকার দাদা শিশির ছিলো আমার সহপাঠী। সেই সূত্রে, এবং ছাত্র-হিসেবে আমি নাম-করা ছিলাম বলে'—কারণ, এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে বিদ্যার আদর সর্ব্বাগ্রেই আছে, বিশেষত তা যদি পরীক্ষায় প্রথম-হওয়া-ধাঁচের হয়—ওদের সমাজে আমি প্রবেশ লাভ করতে পেরেছিলাম। আমি জান্‌তাম, এ-ই যথেষ্ট; আমার পক্ষে এর বেশি কিছু আশা করা স্রেফ পাগলামি। তা আমি কর্‌তামও না। তবু—মনের ওপর মানুষের হাত নেই; অশুভ, সব সময় থাকে না। তখনকার মত, তাই, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত রহস্যময় বিশ্বের চেয়েও মণিকা ছিলো আমার কাছে গভীরতরো রহস্য: গণিতের সূক্ষ্মতম, জটিলতম সমস্যার চেয়ে, বস্তুজগতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরীক্ষার চেয়ে, মহাশূন্যের জ্যামিতির চেয়েও অনেক বেশি কল্পনা-উদ্দীপক, প্রেরণা-সঞ্চারী, সন্ধান-যোগ্য আমার কাছে মনে হ'তো মণিকার ছোট, পাৎলা শরীর, সে-শরীর যা-কিছু ধারণ কর্‌ছে। তবে প্রেমে পড়েও আমি বুদ্ধি খোয়াই নি: আমার সেই প্রথম যৌবনের মোহময় প্রেমে গভীর যতটা ছিলো, তার চাইতে কিছুমাত্র কম গোপন ছিলো না। আমার ভালোবাসা আমি কখনো উচ্চারণ করিনি। তার একটা কারণ অবিশ্যি এই বিবেচনা যে প্রতিযোগিতায় আমার কোনো স্থান নেই। আমি যদি কখনো বলি, 'মণিকা, আমি তোমাকে ভালোবাসি' তা হ'লেও আমার মুখের ওপর হো-হো ক'রে হেসে উঠবে, এ-রকম একটা সন্দেহ আমার মনে সব সময়েই ছিলো। কিন্তু আসল কারণটা তা-ও নয়। আমি বুঝ্‌তে পার্‌তাম, মণিকা আমাকে পছন্দ করে; সে আমাকে তাঁর বন্ধুতায় গ্রহণ করেছিলো। সে ছিলো উচ্ছৃঙ্খভাব, তার প্রকৃতি ছিলো

স্বভাবত স্নেহশীল ; এখন পর্যান্ত আমি বিশ্বাস করি, আমার প্রতি তার একটা মমতাবোধ ছিলো। এমন কিছু নয়, আপনি বল্‌বেন? এমন কিছু নয়, যে-মেয়েকে তুমি ভালোবাসো, তার কাছ থেকে? নয়, জানি। কিন্তু তখন আমার সে-কথা মনে হ'তো না। তার বন্ধুতা—তা-ই ছিলো এত সুন্দর, ঐশ্বর্য্যময়, তাকে কখনো কোনো সঙ্কটে ফেল্‌তে আমার সাহস হ'তো না। পাছে বেশি কিছু চাইতে গিয়ে তাও হারাতে হয়, সেই ভয়ে আমি মনের কথা কখনো প্রকাশ করিনি: আভাসেও তাকে কখনো জান্‌তে দিইনি, সে সহজভাবে বাইরে থেকে আমার যেটুকু দেখ্‌ছে তার অতিরিক্ত এক তিলও কিছু আছে। দীর্ঘ চার বছর ধরে তার প্রতি আমার ভালোবাসা শুধু আত্মগোপন কর্‌তেই কৃতকার্য্য হয়েছিলো।

শেষটায় একদিন এলো, মণিকাকেও যেদিন বিয়ে কর্‌তে হ'লো। ভাগ্যবান এক ব্যারিস্‌টর, যদিও আইনের ব্যবসা কর্‌বার কিছুমাত্র দরকার নেই, কারণ, তাঁর বাপ রেখে গেছেন বিস্তর বিষয়-সম্পত্তি। অত্যন্ত সুপুরুষ। সবাই ধরে নিয়েছিলো, মণিকা তাঁর প্রেমে পড়েছে।

বিয়ের পর মণিকা ডোভার লেইনের বাড়িতে তার স্বামীর সঙ্গে বসবাস কর্‌তে গেলো। আমাদের সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে গেলো, ওখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে, কিন্তু আমরা—পূর্ব্বযুগের ভক্তমণ্ডলী—স্বামীটির প্রতি কী-রকম যেন আড়ষ্ট হ'য়ে রইলুম; মণ্ডলী আস্তে-আস্তে ভেঙে পড়্‌তে লাগলো। কিন্তু আমার সঙ্গে মণিকার বাপের বাড়ির সম্পর্ক ঘুচলো না—শিশিরের জন্য, এবং খানিকটা আমার নিজেরও জন্য; কারণ, ওদের কাছ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়্‌বার কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিলো না। মণিকার স্বামী ওকে ছোট্ট একটা গাড়ি কিনে দিয়েছিলো, সেটা চালিয়ে ও প্রায় রোজই একবার বাপের বাড়ী আসতো; মাঝে মাঝে দেখা হতো আমার সঙ্গে। আমার মনে হয়েছিলো বিয়ের পর ও যেন একটু বেশি সুন্দর হয়েছে।

এই সময় দিয়ে, আমি কখনো যা আশা করি নি, তাই ঘটলো। পরীক্ষায়-প্রথম-হওয়া-ধাঁচের বিস্তার চরম পুরস্কার আমি পেয়ে গেলাম, সরকার আমাকে এক স্কলার্শিপ দিলেন ইয়োরোপে যাবার জন্য। খবরটা শুনে প্রথম আমার যে-কথা মনে হ'লো, তা এই যে যদি শুধু সময়ের একটু বিপর্য্যয় না হ'য়ে পড়্‌তো, তা হ'লে মণিকার প্রতি আমার ভালোবাসা হয় তো এমন মূক, এমন নিস্ফল হ'তে বাধ্য হ'তো না।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর কাটিয়ে এক দিগ্‌গজ ডক্টর হ'য়ে দেশে ফিরে এলাম। কল্‌কাতায় পৌঁছে একবার মণিকার কথা মনে হয়েছিলো; কিন্তু কে কোথায় আছে, জানতাম না, এবং সত্যি বল্‌তে, জান্‌তে বিশেষ আগ্রহও কর্‌লাম না। স্বভাবতই; কারণ, সময় হচ্ছে সব চেয়ে বড় শক্তি। এ-ক'বছরে ওদের সঙ্গে সব সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলেছিলাম; শুধু, বার্লিনে পৌঁছবার বছরখানেক পরে শিশিরের এক চিঠিতে জেনেছিলাম যে মণিকার এক ছেলে হয়েছে। শিশিরের কাছ থেকে সে-ই প্রায় শেষ চিঠি। যেন পারস্পরিক সম্মতিতে, দু'জনের পত্র ব্যবহার হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো। লোকমুখে শুন্‌লাম, মিঃ কর মাস আঠারো হয় মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা যায়, জীবৎকালে তিনি যে-রকম অজস্র ব্যয় করে গেছেন, সেই অনুপাতে—এবং সেই কারণেই—তেমন-কিছু রেখে যেতে পারেন নি। শিশিরের দুই ইয়োরোপ প্রত্যাগত দাদা আগে থেকেই বাঙ্‌লার বাইরে মোটা চাক্‌রি কর্‌তেন; শিশিরের কপালেই জুটলো ফাঁকি। সে, শুন্‌লাম, এখন বাধ্য হয়েছে মাকে নিয়ে ঢাকায় তাঁদের পৈতৃক বাড়িতে গিয়ে থাক্‌তে। মণিকার নাম কেউ উল্লেখ কর্‌লো না: যে-মণিকার নাম তিন বছর আগেও কল্‌কাতা শহরে একটা অগ্নিকাণ্ড ছিলো, তাঁর অস্তিত্ব যেন সবাই বিস্মৃত হয়েছে। সময়ের মত প্রচণ্ড শক্তি আর নেই।

এর কয়েক বছর পর আমি ঢাকায় গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা রিডারশিপ নিয়ে। রম্‌না চমৎকার লাগলো; চমৎকার, যে-বাড়িটিতে ওরা আমাকে থাক্‌তে দিলে। কিন্তু, চিরকাল কল্‌কাতায় থেকে অভ্যস্ত, প্রথমটায় কেমন যেন একটু ফাঁকা-ফাঁকা ঠেক্‌তে লাগ্‌লো। শিশিরের কথা মনে পড়্‌লো, কিন্তু ওদের বাড়ির ঠিকানা জানি নে; আর

আমি তো সবে নতুন জায়গায় এসেছি। অথচ ঢাকা এসেও যদি ওদের সঙ্গে দেখা না হয়, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হ'বে।

আমার সঙ্কট থেকে আমাকে উদ্ধার করলো শিশির নিজেই। একদিন সকালে সে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। আমার এখানে চাকরি নিয়ে আস্‌বার কথা সে শুনেছিলো—আরো আগেই আস্‌তো, তবে নানা কাজকর্ম্মে—ইত্যাদি। বল্‌লাম, 'যা হোক্, তবু যে তোমার দেখা পেয়েছি এই ঢের।' দু'জনে অনেকক্ষণ গল্প কর্‌লাম। শিশির তার ঠিকানা ও পথনির্দ্দেশ দিয়ে বল্‌লে, 'যেয়ো কিন্তু একদিন। মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন—দেখতে চান তোমাকে। কবে যাবে? কাল?'

'হ্যাঁ, কালই যাবো।'

শেষটায়, শিশির যখন উঠ্‌ছে, আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'মণিকা কোথায়?'

'এখানে।'

'এখানে?' সত্যি অবাক হ'লাম।

শিশির মাথা নাড়্‌লে।—'আচ্ছা, চলি এখন। কাল ভুলো না কিন্তু।' শিশির, মনে হ'লো, মণিকা সম্বন্ধে কথা বল্‌তে অনিচ্ছুক। আমিও আর কিছু বল্‌লাম না।

মণিকা, মণিকা এখানে! আমার মনের মধ্যে হঠাৎ যেন পুরোনো দিনের প্রতিচ্ছবি জেগে উঠ্‌লো। সময়ের শ্মশান পার হ'য়ে কথা ক'য়ে উঠ্‌লো অতীত। মণিকা, মণিকা: নামটা যেন একটা মোহ। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'লো মণিকা এখানে, আমি এখানে এসেছি, তা-ও সে জানে; কিন্তু শিশিরের কথা থেকে তো মনে হ'লো না আমাকে দেখ্‌তে সে খুব ব্যগ্র। আর কিছু না হোক্, অত্যন্ত সাধারণ অতিরিক্ত মাত্রায় মানবীয় একটু কৌতুহলও তো হ'তে পারে।

শিশিরদের বাড়ি বার করতে কোনো অসুবিধে হ'লো না, পরদিন সন্ধ্যে নাগাদ গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। ওয়ারিতে ছোট, একতলা এক বাড়ি; ফটক দিয়ে ঢুকে একটু ঘাসাবৃত আঙিনা; সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা পার হ'য়ে মাঝখানে বড় মত একটা বস্‌বার ঘর, তার দু'দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট থাক্‌বার ঘর। বস্‌বার ঘরে আলো জ্বল্‌তে দেখে আমি নিঃসঙ্কোচে সেখানে ঢুকে গেলাম—ঢুকেই একটু থমকে দাঁড়ালাম।

ঘরের মেঝের ওপর ছড়ানো এক বিশাল মাংসস্তূপ—অন্য-কোনো নামের অভাবে যাকে মেয়ে লোক বল্‌তে হচ্ছে। তার পরনের শাড়ির অর্দ্ধেকের বেশি মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে; পা থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত ও কোমর থেকে গলা পর্য্যন্ত একেবারে অনাবৃত। তার খর্ব্ব, পাৎলা চুল মাথার উপর একটা চুড়োর মত করে' সাজানো, নাকের ওপর এক প্রকাণ্ড চক্র একটা রূপোর শেকল দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। তার বিশাল যুগ্মবক্ষ যেন স্থানাভাবে পরস্পরকে ঠোকাঠুকি করে মারছে, এক হস্তীয় হাত নেড়ে পাখা দিয়ে সে নিজকে হাওয়া করছে। একবার মাত্র সে-মূর্ত্তির ওপর আমার চোখ পড়্‌লো—কিন্তু ঐ একবারই যথেষ্ট। দৃশ্যটি মোটেও প্রীতিকর নয়। এ কে? কী করবো, কী বল্‌বো, বুঝে উঠ্‌তে না পেরে আমি ভাবলাম, আমি কি ভুল বাড়িতে এসেছি? কিন্তু না; দরজায় তো ঠিক নম্বর দেখেই ঢুকেছিলাম; আর শিশিরের বর্ণনার সঙ্গে বাড়িটি হুবহু মিলে যাচ্ছে? ঝি? কিন্তু অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে গায়ে হাওয়া করবার জন্য তো ঝি রাখা হয় না। ভাব্‌লাম, একটু গিয়ে দেখি—পাশের কোনো ঘরে শিশির আছে হয়তো। পা বাড়াতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি সেই স্ত্রীমূর্ত্তিধারী মাংসস্তূপ বুকের ওপর দু'হাত একত্র করে ঠিক আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে হ'লো তার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ প্রায় সমান: সবসুদ্ধ এক বিশাল মেদপিণ্ড। একটু সময় কঠিন দৃষ্টিতে সে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগ্‌লো। সে-দৃষ্টির সাম্‌নে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ কর্‌লাম; সত্যি বল্‌তে, একটু কেমন-কেমন করতে লাগ্‌লো—ইংরেজিতে যাকে বলে queer। আজ না এলেই হ'তো—এ-ও পর্য্যন্ত একবার ভাব্‌লাম। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমি আশ্বস্ত হ'লাম; কারণ তা'র দৃষ্টির সেই কাঠিন্য হঠাৎ এক অদ্ভুত কোমলতায় দ্রব হ'য়ে এলো। বুকের ওপর থেকে হাত নামিয়ে আমার দিকে একটু ঝুঁকে খুব বেশি নয়, কারণ, মেদাতিশয্যে তার ঘাড় প্রায় লুপ্ত

হ'য়ে গিয়েছিলো—সে এক অদ্ভুত, কোমল স্বরে জিজ্ঞেস কর্‌লো, 'তুমি কে গা ?'

তার কথার কোনো উত্তর দেয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করে' আমি তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌লাম। কিন্তু সেই স্ত্রীরূপী দুঃস্বপ্ন দাঁড়ালো আমার পথ রোধ করে। তা'র চোখে ফিরে এলো সেই কঠিন নিরীক্ষণের ভাব। হঠাৎ, নিখুঁত সুন্দর ইংরেজি উচ্চারণে সে জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'whom do you want, please ?'

ভুল কর্‌বার উপায় ছিলো না ; সন্দেহ করা অসম্ভব। নিমেষে আমার সমস্ত শরীর যেন পাথর হ'য়ে গেলো। বিহ্বল, স্তম্ভিত, বিমূঢ়, সেই মেদপিণ্ডের দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম ; তাকিয়েই রইলাম। কেউ যেন আঠা দিয়ে আমার দৃষ্টি আটকে রেখেছে ; তার দিক থেকে চোখ ফেরানো অসম্ভব।

'what is it you want ?' নিখুঁত সুন্দর উচ্চারণে মণিকার স্বর আবার বল্‌লে।

আমি কথা বল্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম ; কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর যেন কোন্ অতলতায় হারিয়ে গেছে ; মনে হ'লো, জীবনে আমি আর তা ফিরে পাবো না। মণিকার—কিম্বা এক কালে যে মণিকা ছিলো তার—তীব্র, তীব্র দৃষ্টি বিদ্ধ হ'লো আমার উপর, সন্ধানী, উন্মাদ। যেন কোনো ভীষণ আকর্ষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, নিশ্চল, প্রস্তরীভূত, একটি বার আমার চোখের পাতা পড়্‌লো না। তারপর হঠাৎ, এক বিশাল হস্তীর হাত পড়্‌লো এসে আমার কাঁধের ওপর ; আমার গলা আঁকড়ে ধর্‌লো তার মোটা, নরম আঙুল। 'কে ? কে তুমি ?' আমার মুখ তার মুখের কাছে নামিয়ে এনে সে একবার বল্‌লে। তার কণ্ঠস্বরে উন্মত্ততা, হতাশা। আর তার উন্মাদ দৃষ্টি আমার ওপর—আমাকে চেন্‌বার অসহ্য, ভীষণ চেষ্টায় উন্মাদতরো। সে-দৃষ্টি যেন আমার চামড়া ভেদ করে মাংসের মধ্যে গিয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছে : আমার মনে হ'লো, আমার শরীর যেন স্বচ্ছ হ'য়ে গিয়েছে। আমার কাঁধের ওপর তার একখানা হাত, বিরাট এক ভার ; তা'র বুকের মাংসপর্ব্বতের ওপর আমি চূর্ণ হ'য়ে গেলাম। আর মুহূর্ত্ত থেকে মুহূর্ত্তে আমার গলার ওপর তার আঙুলগুলো আরো শক্ত হ'য়ে জড়িয়ে যাচ্ছে ; আমার শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এলো : হঠাৎ আমি উপলব্ধি কর্‌লাম যে এ ইচ্ছে করলেই আমার গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে পারে, আমি কিছুই কর্‌তে পারিনে। আমার যেন নিশ্চয় মনে হ'তে লাগ্‌লো যে এ আমাকে মেরে ফেল্‌তেই চায়। এক মর্ম্মান্তিক আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বস্‌লো ; ঘামে আমি স্নান করে উঠ্‌লাম। আমার মনে হ'লো, এক্ষুণি আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌বো।

আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার গলার ওপর তার আঙুলের গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে এলো ; তা'র চোখের কঠিন, অসহ্য চেষ্টার হ'লো বিরাম ; হঠাৎ উচ্চস্বরে সে হেসে উঠ্‌লো। 'তুমি অনিল না ?' তার অদ্ভুত কোমল স্বরে সে জিজ্ঞেস কর্‌লে। 'বা রে, অনিল যে !' তা'র স্বরে যেন মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দের দোলা লাগ্‌লো। হঠাৎ তার বিশাল গোল মুখমণ্ডল অসংখ্য হাসির ভাঁজে-ভাঁজে ভেঙে গেলো। কোথায় ছিলে এতদিন ? খেয়ে এসেছো তো ? তুমি খাবে আমার সঙ্গে। আমরা একসঙ্গে বসে খাবো—আপেল খাবো, সন্দেশ খাবো, কমলালেবু খাবো। মাছ ? না, না। মাছ তো ছাগলে খায়। লক্ষ্মী, কথা শোনো ; মাছ তো আমাদের খেতে নেই। Bless me, can't you speak ? I hate dumb men. But I love you, darling. I love you. Do you understand ? Oh my sight ! why is this man an idiot ? But say one word, love ! what, wilt break my heart ? একটা গান কর্‌বো, শুন্‌বে ? একটা গান, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো ? আমি এখন ঘুমুবো। তোমরাও ঘুমুবে ? ঘুমুতে ভারি আরাম। কিন্তু বড় যে খারাপ স্বপ্ন দেখ্‌তে হয়, অনিল। গান গাইতে আমি পারি নে বল্‌ছো ? শোনো তবে। Drink to me only with thine eyes, হঠাৎ তীব্রস্বরে সে গেয়ে উঠ্‌লো, 'এইবার তুমি গাও : And I will drink with mine. কিন্তু একটু দাঁড়াও, আগে দেখে নিই ক'টা বাজলো। ঘড়ি আছে তোমার হাতে ? টিক্‌টিক করে ? আমার কানে রাখ্‌বে একটু ? দেখি না ? আমার বাঁ হাতের মণিবন্ধের ওপর সে আর-এক হাত রাখ্‌লো।

'এ কী? অনিল? কখন এলে?' শিশিরের দিকে আমি শুধু একটা দ্রুত দৃষ্টিক্ষেপ কর্‌লাম। সে ডেকে আনলে ত'ার মাকে। Don't let them take me away from you', আমাকে শক্ত করে চেপে ধ'রে করুণ অনুনয়ের স্বরে মণিকার ধ্বংসাবশেষ বল্‌লে।

তার মা এসে আস্তে তার গায়ের ওপর এক হাত রাখ্‌লেন। 'লক্ষ্মী মা, এখন তোমার ঘরে যাও; শুয়ে থাকো গে। তোমার যে খাবার সময় হয়েছে—যাও। যাও, আমি এক্ষুনি তোমার খাবার নিয়ে আসছি। যাও, মা। তোমার ঘরে গিয়ে একটু শোও। লক্ষ্মী, একটু ঘুমুলে যে তোমার ভালো লাগ্‌বে। যাও তোমার ঘরে। একই কথা বার-বার করে' নানাভাবে মাসীমা বল্‌তে লাগ্‌লেন। সেটা যেন একটা সম্মোহনের কাজ কর্‌লো। আমার কাঁধ থেকে উথিত হ'লো সেই বিরাট হাতের ভার; দূরে স'রে গিয়ে একটু চুপ করে' দাঁড়িয়ে থেকে আমার দিকে তীব্র এক দৃষ্টি ছুঁড়ে সেই মেদপিণ্ড আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

'কী করে হ'লো?' আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম।

'এম্‌নিই', মাসীমা বল্‌লেন, 'বিশেষ যে কোনো কারণ ছিলো, তা নয়। ওর ছেলেটা অবিশ্যি মারা যায় হ'বার এক বছরের মধ্যেই। তা ছেলে কি আর সংসারে আর কারো মরে না? আর ঐটুকু তো শিশু—তার ওপর এমন একটা মায়াই বা কী বস্‌তে পারে। যে ক'দিন ছিলো, ছেলেকে নার্সের কাছে ফেলে তো ও বাইরে-বাইরেই ঘুরে বেড়াতো। আর ছেলে মর্‌বার আগে থেকেই ও মাঝে-মাঝে কেমন যেন হ'য়ে যেতো—তখন তো আর বুঝতে পারি নি।'

'তুমি ভয়-টয় পাওনি তো?' শিশির জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'ও খুব শান্ত; কিন্তু কাউকে কিছু করে না। আর মা'কে ভীষণ মেনে চলে। শুধু, গরম পড়্‌লে ওর বড্ড কষ্ট হয়। অনেক আগে থেকেই মাথার ভেতর ওর মাঝে-মাঝে যন্ত্রণা হ'তো। চিকিৎসা যদ্দূর সম্ভব করানো হ'লো, কিন্তু…। স্পেশ্‌লিষ্ট বলেছিলো, একদিন-না-একদিন নাকি ওর এ-রকম হ'তোই। যাক্, ছেলেটা মরে গিয়ে একরকম ভালোই হয়েছে।

'আর ওর স্বামী?'

'গেলো বছর তিনি আবার বিয়ে করেছেন। তা ছাড়া আর কী-ই বা তিনি কর্‌তে পার্‌তেন? বাড়ি চিন্‌তে কোনো অসুবিধে হয়নি তো? সুরেনকে একটু চা করতে বলো না, মা।'

বুদ্ধদেব বসু

দুই নারী

শ্রীলীলাময় রায়

৪

যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ সুধীর চিত্তকে সংকটারূঢ় করে রেখেছিল। প্রত্যুষে ঘুম ভেঙ্গে যায়, দেখে সূর্য্যের আলো সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা রাখেনি, জানালার কাঁচ ঝক্‌ঝক্‌ করছে সূর্য্যালোকিত গ্রহের মত; সেই কাঁচের তেজ সদ্য উন্মীলিত চক্ষুর পক্ষে যথেষ্ট তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। সেই যে মনটা প্রাসের সঙ্গে গান করতে সুরু করে দেয় তারপর বেলা হলেও বিরতি মানে না। সুধী কোনোদিন পড়ায় মগ্ন থাকে, কোনোদিন পদচারণে, কিন্তু প্রতিদিন সেই একই প্রভাতানুভূতি তার সমস্ত দিনটাকে প্রভাত করে রাখে। দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপী আলোকের ক্রিয়া মনের মণিকোঠায় প্রবেশ পূর্ব্বক মনটাকে এমন ঝলমল্‌ করে দেয় যে জগতের কোথাও কিছু অস্পষ্ট থাকে না। জগৎ যেন নখদর্পণে। তার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি অনায়াসে দৃষ্টিগম্য হয়। যেন সুধী রয়েছে বিশ্ব-শতদলের কেন্দ্রে। পাপড়িগুলি তাকেই ঢেকে রেখেছিল, সেই সঙ্গে নিজেদেরকেও। অন্ধকারে যার কার্য্যপদ্ধতি অজ্ঞেয় ছিল বলে যাকে Destinyর মত মনে হত আলোকে তার কার্য্যাবলী সুসম্বদ্ধ প্রতিভাত হল, সে নিয়তি নয়, সে লীলা।

ব্রহ্মাণ্ড নামক বস্তুপিণ্ডটা ত স্বচ্ছ হয়ে গেল একটা স্ফটিক গোলকের মত। তার কোথাও দৃষ্টি বাধা পায় না। দেহের ভিতর দিয়ে যেতে X-Roy যতখানি বাধা পায় ততখানিও না। সুধীকে কষ্ট স্বীকার করে বাইরে তাকাতে হয় না। মনের পর্দ্দাটা এত সূক্ষ্ম যে একটুখানি সরালে ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ হয়। অগণিত সৌরলোক ঘর্ঘর রবে ঘূর্ণিত হচ্ছে। অপরিমিত আলোক দিকে দিকে ঠিকরে পড়ছে। ধ্বনির টুক্‌রা পাখীর কলকণ্ঠে। রং-এর ফাগ ফুলে ফুলে বিকীর্ণ হল। গতি হিল্লোল জড়কে করল সচল; ধূলি মুষ্টির উপর কি মন্ত্র পড়ে দিল এক নিমেষ কালের ব্যবধানে সেই হয়ে উঠল মানুষ।

এ গেল সুধীর আনন্দ। তার বিষাদ তাকে আনন্দের প্রতি বিমুখ করতে চায়। সে আলোক বর্জ্জন করে সুড়ঙ্গে বেড়ায়। অবিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণে জাগে উজ্জয়িনীর ধ্যান মূর্ত্তি। কয়েক মাস যাবত উজ্জয়িনীর চিঠি আসা বন্ধ। মহিমও লেখেন না। দেশের জন দুই তিন বন্ধু নিজেদের খবর দেন, আর দেন দেশের ভাবধারার আভাস। কিন্তু তাঁরা হয়ত উজ্জয়িনীকেই জানেন না, নয়ত জানেন না যে উজ্জয়িনীর কুশল বার্ত্তায় সুধীর প্রয়োজন আছে। Cable করে সংবাদ নেবার মত ছেলেমানুষী সুধীর সাজে না, উদ্বেগরাহিত্য তার সাধনার অঙ্গ। যে যেখানে আছে যথাস্থানেই আছে, সেখানে যাবে যথাস্থানেই যাবে। স্বয়ং বিধাতা নিয়েছেন সকলের ভার, ভাবনাটা একা তাঁরই। আমরা কেন হস্তক্ষেপ কিম্বা চিত্তক্ষেপ করতে যাই? এ হল উদ্বেগের বিরুদ্ধে যুক্তি। কিন্তু বিষাদের বিরুদ্ধে যুক্তি খাটে না। বিষাদ যে অন্তরতম অনুভূতি, উদ্বেগের মত মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। সভ্য মানবের বোঝা (white man's burden?) হচ্ছে উদ্বেগ। আর বিষাদ হচ্ছে পশু পক্ষী ওষধি বনস্পতিরও। বিধাতা ও-জিনিষকে কি যে মূল্যবান মনে করেন ওর অংশ তাঁর সকল সন্তানকে দিয়েছেন।

কেন সুধীর এ বিষাদ? সে হেতু অন্বেষণ করে সন্তোষ পায় না। উজ্জয়িনী তার কেউ নয়। কোনোদিন উজ্জয়িনীকে সে চাক্ষুষ দেখেনি। উজ্জয়িনীর জন্য উদ্বেগও তার নেই বলা চলে। বাদল যদি নিতান্তই পরাঙ্মুখ হয় তবে উজ্জয়িনী বোধ করবে বৈধব্যের অনুরূপ বেদনা। তার বেশী নয়। খ্রীষ্টান কিম্বা মুসলমান হয়ে থাকলেও "এ অবস্থায় বিবাহচ্ছেদ দাবী করতে পারত না, হিন্দু হয়েছে বলেই ও-

দাবী হারিয়েছে এমন নয়। বাদলকে সুধী মর্ম্মে মর্ম্মে চেনে। বাদল না কর্‌বে স্ত্রীর উপর অত্যাচার, না কর্‌বে স্ত্রী বিদ্যমানে অপরা-সঙ্গ। মুখে অবশ্য সে অনেক কথাই আওড়াবে। যখন যেটা তার সত্য মনে হয় তখন সেইটেই তার মুখে ফুলঝুরির মত ঝরে এবং ঝর্‌তে ঝর্‌তে নিঃশেষ হয়। দু'দিন পরে ঠিক বিপরীতটা তার মনে ও মুখে। অন্য কেউ হলে বল্‌ত বাদল ভণ্ড। কিন্তু সুধী জানে বাদলের মন ও মুখ এক। তবে ভণ্ডতার অর্থ যদি হয় চিন্তার, বাক্যের ও কর্ম্মের অসামঞ্জস্য তবে বাদল সম্ভবত ভণ্ড। সুধী এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ল না কেন বাদল ইংলণ্ডকে নিজের দেশ কর্‌বার খেয়ালে ইন্‌টেলেক্‌টের মার্গ থেকে প্রথম কয়েক মাস বিচ্যুত হয়েছিল। বাদলের মত মনীষীর পক্ষে ওটা কি একটা ছেলেমানুষী হয়নি? বাদল নিজেই একদিন ভ্রম স্বীকার কর্‌বে। ভণ্ডতা নয়, ভ্রম। না, বাদল কখনো ভণ্ড হতে পারে না। ভণ্ডতার কোনো অর্থেই না। তার মনের টান বিশুদ্ধ চিন্তার দিকে। বাক্য ঐ চিন্তার নাগাল পায় না। কাজ যে পেছিয়ে পড়্‌বে এর আর সন্দেহ কি? পেছিয়ে পড়া কাজ দেখে এগিয়ে চলা চিন্তার বিচার করা অন্যায়। ছোট বেলায় বাদলের সখ ছিল ইংরেজের দেশে ইংরেজ হয়ে বাস কর্‌তে। প্রথম কয়েক মাস সেই প্রাচীন সখের সঙ্গে তার পেছিয়ে পড়া কাজের সামঞ্জস্য ঘটল। ম্যাট্রিকের পরে বিলাতে আসা হয়ে ওঠে নি বলেই এই আপদ্‌। কিন্তু কই কোনো দিন ত বাদল সম্ভোগের সাধ পোষণ করেনি। সম্ভোগ কি কোনও দিন তার পেছিয়ে পড়া কাজ হবে? যদি হয় তবে হয়ত তা উজ্জয়িনীকেই অবলম্বন করে। না হয় ধরে নেওয়া যাক বাদল অন্যানুরক্ত হল। উজ্জয়িনীর তাতে সত্যিকার কিছু আসে যায় না। ঈর্ষা উজ্জয়িনীর স্বভাবে নেই; সে মহীয়সী।

একটা অহেতুক বিষাদ সুধীর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল। যেন তার নিজের নয় উজ্জয়িনীরই বিষাদ দেশান্তরিত হয়ে পাত্রান্তরিত হয়েছে। কেন সুধীর এ বিষাদ এই প্রশ্নের উত্তরে বোধ হয় প্রশ্ন কর্‌তে হয় কেন উজ্জয়িনীর ঐ বিষাদ। উজ্জয়িনীর কোনো বিষাদ উপস্থিত হয়েছে কিনা সুধী সে বিষয়ে লিখিত কিম্বা মৌখিক সমাচার পায়নি, তবু তার প্রত্যয় হয়েছে উজ্জয়িনী বিষাদ-বিমৌনা। সে আর চিঠি লিখ্‌বে না। সুধী বুঝেছে চিঠি সে লিখ্‌ছিল সুধীর উদ্দেশে নয়, বাদলের উদ্দেশে। চিঠি সে পাচ্ছিল সুধী সংক্রান্ত নয় বাদল সংক্রান্ত। হয় বাদল সম্বন্ধে তার কৌতূহল তথা উৎকণ্ঠা অন্তর্হিত হয়েছে, নয় সুধী যখন বাদলের খোঁজ খবর নিজেই রাখে না তখন সুধীর সঙ্গে পত্র ব্যবহার করে ফল কি হবে।

কিম্বা হয়ত যোগানন্দের মৃত্যু করেছে উজ্জয়িনীর লেখনীকে মূক। যে আঘাত সে পেল তা কেবল আকস্মিক হলে রক্ষা ছিল, তার আংশিক দায়িত্ব উজ্জয়িনীর। সে তার বাবাকে অন্তরের দিক থেকে নিঃসঙ্গ করে দিল। বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হলে কি কেউ বাঁচে? ভদ্রলোকের একমাত্র কীর্তি ছিল তাঁর এই কন্যাটি। বিয়ে সকলের হয়, এরও হল। কিন্তু সত্য সত্য পর হয় কয়টা মেয়ে? যোগানন্দেরও দোষ ছিল। তিনি মেয়েকে চলাফেরার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যা দিতে পিতৃসাধারণ ভয় পান। কিন্তু বিশ্বাসের স্বাধীনতা দেবার কথা মনে আনেন নি, যে বিষয়ে পিতৃসাধারণ সম্পূর্ণ বেপরোয়া। মেয়ে স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে কোন বাপ ভাবেন? সে শ্বশুরবাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পার্‌লেই তাঁরা কৃতার্থ। যোগানন্দ কেন ধৈর্য্য ধর্‌লেন না? উজ্জয়িনীর বিশ্বাস যে তাঁর ইচ্ছানুরূপ একদিন হত এ আশা কেন হারালেন?

মৃতকে প্রশ্ন করা বৃথা। সুধী তাঁর অমর আত্মাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌ল। সামান্য পৃথিবী, সামান্যতর আয়ু, সামান্যতম ভ্রান্তি—এ সকলের তুলনায় যোগানন্দ অনেক, অনেক বড়। পার্থিব ও সাময়িক তুলাদণ্ড তাঁর জন্য নয়। মানব বিচারকের ন্যায় দণ্ড মানব সমাজের নিয়মনের জন্য। তিনি মানব-সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছেন।

৫

দে সরকার বলেছিল, "আবার কবে দেখা হবে?"

সুধী আন্দাজে বুঝেছিল ওর একটা দীর্ঘ বক্তব্য আছে। সম্ভবত নাটালী সম্বন্ধে। বেচারা দে সরকার। একা

না একটা affair না হলে তার চল্‌বে না, এবং প্রত্যেকটির বিবরণ তাকে অপরের কর্ণগোচর করতেও হবে।

সুধী বলেছিল, "যেদিন আপনার খুসী।"

দে সরকার উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কাল মিসেস তালুকদারের পার্টিতে আস্‌ছেন ত? নিমন্ত্রণ পাননি? পাননি! রাইট্ ও। আমি এখুনি ফোন করে আনিয়ে দিচ্ছি।"

সুধীর কোনো পার্টিতে যাবার আগ্রহও ছিল না, উদ্যোগও ছিল না। তা বলে সামাজিক আমোদ প্রমোদকে অসার বলে উপেক্ষা করবার মত পণ্ডিত কিম্বা মূর্খ সে নয়। সুবেশা নারী ও সৌখিন সুপুরুষ, রসনারোচন ভোজ্য পানীয়, অবিশ্বাস্য অথচ শ্রবণ-সুখদ খোসগল্প, ব্রিজ খেলার ক্রম-বর্দ্ধমান উত্তেজনা—এরই নাম যদি পার্টি হয় তবে মধ্যে মধ্যে এতে নিমন্ত্রিত হওয়া কঠিন পরিশ্রমের পরে ছুটি পাওয়ার মত। তবু তার উদ্যম কিম্বা আগ্রহ ছিল না, কারণ সারাদিনের অধ্যয়নের পর মার্সেলের মুখাবলোকন করে তার মনে হত স্বর্গ তার কত কাছে! দুটি ক্ষুদ্র বাহু দিয়ে সুধীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মার্সেল যখন জিজ্ঞাসা করে, "দা-দা-! আজ এত দেরি হল যে!" সুধী উত্তর দেয়, "এই ছাখ্, চৌদ্দ মিনিট আগে এসেছি।" ঘড়ি দেখ্‌তে মার্সেল এখনো শেখেনি। তবু বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে। মার্সেলের চেয়ে মার্সেলের কুকুর জ্যাকীর আদর দুঃসম্বরণীয়। সেও তেমনি নিজের দু'খানা পা দিয়ে সুধীর দুটি পা জড়িয়ে ধরে; কিন্তু কাপড়ে দেয় এমন কামড় যে থাপ্পড় মেরেও ছাড়ান যায় না। এদের ছেড়ে কিসের আকর্ষণে সুধী আর একদফা পায়ে হাঁটবে বাসে উঠ্‌বে টিউবে নাম্‌বে! অত ছুটাছুটি ছুটীর মত লাগ্‌বে না।

সুধী কাতর ভাবে বলেছিল, "যেতেই হবে পার্টিতে?"

"আপনি না এলে আমি নিরাশ হব।" দে সরকার তার পক্ষে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত বলেছিল। তাই থেকে মালুম হয়েছিল গরজটা কার।

সুধী মুচ্‌কি হেসে বলেছিল, "আচ্ছা।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ রাত্রি আটটায়, বেলসাইজ পার্কের নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে সুধী যখন উপস্থিত হল দে সরকার তখনো পৌঁছায়নি। চেনা মুখ একটিও চোখে না পড়ায় সুধী একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিল, এমন সময় তার পিঠে হাত রাখ্‌ল—কে? না, বিভূতি নাগ।

"হস্টেসের সঙ্গে দেখা হয়েছে?"—অথ বিভূতি নাগোবাচ।

"তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্যই ঘটেনি।" ইতি সুধী।

বিভূতি সুধীকে টেনে নিয়ে গেল, তার পায়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পা ফেলে। মিসেস তালুকদার জন পাঁচেক নানা বয়সের স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আলাপ কর্‌ছিলেন। বিভূতির সঙ্গে সুধীকে লক্ষ্য করে ভ্রূ কপালে তুল্‌লেন। তার পরে তাঁর গণ্ডদ্বয় ঈষৎ স্ফীত হল এবং অধরোষ্ঠের সংযোগস্থল সেই পরিমাণে ভিন্ন হল।

বিভূতি একটা অনভ্যস্ত bow করে সোজা তাঁর দিকে তাকিয়ে শেখান ভাষায় জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "আপনাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্ত কর্‌তে পারি কি, মিসেস তালুকদার?"

"অবশ্য, মিষ্টার—মিষ্টার—"

"নাগ।"

বিভূতি গড়্ গড়্ করে আওড়ে গেল, "মিষ্টার চাকারবার্টী, মিসেস তালুকদার।"

তখন মিসেস তালুকদার সুধীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কপট উৎসাহের সুরে শুধালেন, "হাউ ড্ ইউ ডু?" তারপরে একান্ত অনুকম্পার সহিত বল্লেন, "ওঃ আপনাকে ত আমি চিনি। আই মীন্, আপনার নাম আমি শুনেছি। আই-সি-এস্‌এ সেবার কেমন কর্‌লেন?"

সুধী বুঝ্‌তে পার্‌ল মহিলাটি উদোকে বুধো ঠাওরেছেন। ধীরভাবে বল্ল, "আমার নাম সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।"

মহিলাটি সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে অথচ সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বল্লেন, "O How silly of me! আচ্ছা, make yourself at home." এই বলে তিনি স-নাগ সুধীকে ফেলে কয়েকজন নবাগত ও নবাগতাকে অভ্যর্থনা কর্‌তে এগিয়ে গেলেন।

ড্রইং রুমের একান্তে আসন নিয়ে সুধী দে সরকারের প্রতীক্ষা করল। নাগ কিন্তু তাকে ছাড়্‌ল না। হতাশ সুরে বল্ল, "দেখলেন ত ব্যবহারখানা? আমার নামটা

শুদ্ধ ভুলে গেছেন, আর আমি তাঁর ছেলের ক্লাসফ্রেণ্ড হিসাবে সেদিন তাঁর এখানে কল্ করে গেছি।"

উৎসব সভায় নিরানন্দ সুধী পছন্দ করে না। রেডিওর রিসিভার কানে তুলে নিয়ে সে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট রইল। বিভূতি অভিমানে গজ্‌রাতে থাক্‌ল। "টাকা, টাকা, টাকা, যার টাকা নেই তার নাম নেই, তার নাম পড়্‌বে কি করে! কবি সত্যই বলেছেন, দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি নাশীঃ। বেঁচে থেকে কোনো সুখ নেই মশাই যদি না আপনার—অন্তত আপনার বাবার কিম্বা শ্বশুরের—টাকা থাকে।"

নাগের স্বগতোক্তি বোধ হয় সে রাত্রে শেষ হত না, কিন্তু কাকে লক্ষ্য করে সে হঠাৎ স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত লাফ দিয়ে উঠ্‌ল। সুধী ভাব্‌ল দে সরকার এল বুঝি। না, দে সরকার নয়। একটি অসাধারণ ফরসা প্রচণ্ড টাকওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও তাঁর অসাধারণ সুন্দরী তন্বী তরুণী ভার্য্যা মিসেস তালুকদার কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হলেন। তরুণীটি দরজা থেকে সোফা পর্য্যন্ত যেটুকু পথ পায়ে হাঁটলেন সেটুকু দেখে মনে হল তিনি হাঁটার চেয়ে নাচা পছন্দ করেন। পা ফেল্‌ছিলেন কোমর উঁচিয়ে ও নামিয়ে এবং হাই হীল্ জুতা পায়ে দিয়ে। তাঁর পরনের শাড়ীখানি স্কার্টের মত খাটো। তাঁর মাথায় যদিও কাপড় ছিল তবু তাঁর বব্ করা চুল ঠিক বিজ্ঞাপিত হচ্ছিল। তিনি যখন মিসেস তালুকদারের সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন তখন তাঁর মাথাটা ঘনঘন নানা ভঙ্গীতে দুল্‌ছিল এবং তাঁর চাউনি একবার মেজের উপর পড়্‌ছিল, একবার ছাতের উপর চড়্‌ছিল, একবার মিসেস তালুকদারের মুখের উপর থাম্‌ছিল। মিসেস তালুকদার যেই সরে গেছেন অমনি বিভূতি আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে তরুণীটির অদূরে দাঁড়িয়ে অসম্ভব নুয়ে একটি bow কর্‌ল।

"O my sacred aunt! Now tell me if you are not Shyama Charan Babu's son:" এই বলে তরুণীটি উঠে গিয়ে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন। এক সঙ্গে তাঁর ব্রেস্‌লেট ও বিভূতির মুখ ঝক্‌ঝক্ করে উঠ্‌ল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কটমট দৃষ্টিতে বিভূতিকে জেরা করতে লাগলেন। তরুণীটি তাঁর সঙ্গে বিভূতির পরিচয় ঘটিয়ে দিলে তিনি পৃষ্ঠপোষকের মত তর্জ্জনী সংকেত পূর্ব্বক বল্লেন, "Sit down", বিভূতি কৃতার্থ হয়ে গেল। সে যতই বাংলা বল্‌তে যায় ওঁরা বলেন ইংরেজী, অগত্যা বিভূতিও বলে বৈভূতিক ইংরেজী। বেশীক্ষণ এ সৌভাগ্য সইল না। কে এক খাস বিলিতী ইংরেজ ঘরের মধ্যে ঢুকে পরিচিত কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে একটা গুড্ ইভ্‌নিং ঠুকে দিলেন। তরুণী ভাব্‌লেন সেটা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি বিভূতির বক্তব্য আধখানা শুনে তার দিকে পিছন ফিরে নবাগতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। নবাগত কোন্ আসনে বসবেন ইতস্তত কর্‌ছিলেন। তা দেখে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাকে গম্ভীরভাবে বল্লেন, "can't you make room?"

বিভূতি মুখ কাঁচুমাচু করে গোটা তিনেক bow কর্‌ল, সুধীর কাছে ফিরে গিয়ে পুনর্মূষিক হল। তারপর সেই একই আক্ষেপ, "টাকা টাকা টাকা।"

সুধী পরিহাস করে বল্ল, "এবার ত টাকা নয়, এবার রং।"

বিভূতি বিস্ফোরকের মত শব্দ করে বল্ল, "সেই জন্য ত আমি কমিউনিষ্ট।"

"চুপ্ চুপ্ চুপ্।"—সুধী ও বিভূতি সচকিতভাবে চেয়ে দেখ্‌ল পিছনে দে সরকার দাঁড়িয়ে। সে বল্‌ছে, "আস্তে! ফুটো মোটর টায়ারের মত আওয়াজ করবার জন্য রাস্তা রয়েছে, এটা বৈঠকখানা।"

বিভূতি গলা নামিয়ে কাঁদকাঁদ সুরে নালিশ করে বল্ল, "অনেক দুঃখে ও কথা বলেছি, ভাই। পুলিশে ধরে নিয়ে যায় ত কি করব বল? ডলি গুপ্ত ত একদিন আমাকেই বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপেছিল। আজ না হয় সে ডলি মিটার।"

দে সরকার বিভূতিকে ধাক্কা দিয়ে একটুখানি হটিয়ে দিয়ে সুধী ও বিভূতির মাঝখানে জায়গা করে নিল। বল্ল "শুনে তোমার পরে কিছু শ্রদ্ধা হল, নাগ। যদিও তোমার গল্পটা গাঁজাখুরি, তবু নিজেকে ঐ মেয়ের নায়ক কল্পনা করাতেও বাহাদুরি আছে।"

বিভূতি ফস করে একটা হাত মেলে ধরে হুঙ্কার দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "রাখ বাজি। যদি সত্যি হ

কয় গিনি হারবে? মিথ্যা হলে আমি ছাড়ব পাঁচ গিনি।"

দে সরকার নাসিকা কুঞ্চিত করে বল্ল, "মোটে?"

বিভূতি লজ্জিত হয়ে বল্লে, বেশ, দশ গিনি।"

দে সরকার ক্ষ্যাপাতে ভালবাসে। বল্ল, "যার যত দূর দৌড়।" কিন্তু নিজে কত হারবে জানাবার নাম করল না। বিভূতি মরীয়া হয়ে বল্ল, "আচ্ছা, পঞ্চাশ গিনি।"

দে সরকার তামাসা করে বল্ল, "নীলাম ডাকৃছ নাকি?"

বিভূতি নিষ্ফল আক্রোশে সুধীর দিকে চেয়ে বল্ল, "দেখ্লেন ত কাণ্ডখানা? ওর ধারণা উনি একাই একজন Don Juan, ওঁর প্রণয়িনীর সংখ্যা হয় না, আর আমরা—"

সুধী হাসতে হাসতে বাধা দিয়ে বল্ল, "বহুবচন ব্যবহার করেন কেন?"

দে সরকার বিভূতিকে জবাব দিতে দিল না। বল্ল, "যার একটি স্ত্রী ও দুটি সন্তান বিদ্যমান ডন জুয়ানী করা তার পক্ষে বেমানান।" মুখে মুখে একটা ছড়া কাটা হয়ে গেল শুনে নিজের কবি-প্রতিভায় তার আর সন্দেহ রইল না।

তপ্ত অঙ্গারের সঙ্গে তখন বিভূতির মুখের তুলনা করলে অসঙ্গত হত না। সে যেন আকাশকে উদ্দেশ করে বল্‌তে থাক্‌ল, "দেখলেন ত, দেখলেন ত। আমাকে বলে বেইমান।"

দে সরকার তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে বল্ল, "বেইমান বলিনি, বলেছি বেমানান। দূর হোক গে, কেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মরি। কফির কত দেরি বল্‌তে পার হে ডন বিভূতি?"

বিভূতি সত্যিই ভাল মানুষ। হি হি করে একবার হেসে নিল। তারপর করল হো হো করে একটু হাস্য। শেষে কৃতনিশ্চয় হয়ে বল্ল, "আমি জানি তুমি আমাকে নিয়ে একটু রঙ্গ করছিলে। যাকে ইংরেজীতে বলে পা ধরে টানা। কেমন ঠিক্ ধরেছি কি না।"

দে সরকার তার পিঠে চাপড় মেরে বল্ল, "সাধে কি ডলি তোমাকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপেছিল? আমি মেয়ে মানুষ হয়ে থাক্‌লে আমিই তোমার প্রেমে পাগলিনী হয়ে সুন্দরবনে চলে গিয়ে থাক্‌তুম।"

একথা শুনে বিভূতির মুখের রক্তিমা তপ্ত অঙ্গারের সঙ্গে তুলনায় না হয়ে পোড়া ইটের সঙ্গে হল। সে ফিক করে হেসে বল্ল, "কি যে বল তার মানে হয় না।" তারপরে কি মনে করে সে সুধীকে সম্বোধন করে বল্ল, "ভাল কথা, আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছলুম। ডলি মিটার কে জানেন?...জানেন না? আন্দাজ করুন।...পার্‌লেন না? বলব?...ওয়াই গুপ্তের মেজ মেয়ে কৌশাম্বী।...হা হা হা।"

৬

বিভূতি কেন যে হা হা হা করে হাস্‌ল বোঝা গেল না, কিন্তু সুধীর হৃদয়ে ওটা বাণের মত বিঁধ্‌ল। যোগানন্দ গেলেন মারা; কৌশাম্বীর আচরণে রইল না শোকের অভিব্যক্তি। ওটা কি তার মুখ, না মুখোস? ঐ কি তার স্বাভাবিক হাবভাব, পার্টি উপলক্ষে? যোগানন্দের কন্যা, উজ্জয়িনীর দিদি, বাদলের শ্যালিকা—কই, তার দিকে তাকালে ত ওকথা মনে হয় না? কুল পরিচয় ত তার শীলে নেই।

তবু কি রূপ! সে যেন মানবী নয়, যেন একটি চিত্র পতঙ্গ, একটি moth. কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষা ধার করে ওর সম্বন্ধে বল্‌তে হয় "She is a phantom of delight." কেন ওর আচরণ শোকাকুলার মত হবে? শোক তাকে দেখ্‌লে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে পাশ কাটিয়ে পালায়।

সে যে উজ্জয়িনীর দিদি তাইতে তাকে সুধীর আত্মীয়ার পর্য্যায়ে উন্নীত কর্‌ল। নাই বা চিন্‌ল সে সুধীকে, নাই বা হল তার সঙ্গে সুধীর আলাপ, তবু সে ত উজ্জয়িনীর দিদি, বাদলের শ্যালিকা। বাদল এঁকে দেখ্‌লে এঁদের পরিবারে বিয়ে করেছে বলে হয়ত গৌরব বোধ কর্‌ত এবং উজ্জয়িনীর প্রতি অনুকূল হত। ইনি যখন এমন রূপসী তখন উজ্জয়িনীও নিশ্চয়ই উপযুক্ত বয়সে এমনি রূপবতী হবে। এ বয়সে যদি না হয়ে থাকে তবে সেটা বয়সের দোষ। আর সুধী ত বাদলকে এতকাল ধরে দেখ্‌ল। বাদলটার সৌন্দর্য্যবোধ এখনো বিকশিত হয়নি, সত্যি বল্‌তে কি। প্রকৃতির স্তরে স্তরে যে নিবিড় সৌন্দর্য্য প্রতিনিয়ত

আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, মুখর সূর্য্যাস্ত ও বাঙ্ময় মেঘ-বলাকা যে বাণী শোনবার জন্য বিবর্ত্তিত করতে পৃথিবীকে কোটী বছর সময় দিয়েছে, অরণ্যে কান্তারে সাগরে ভূধরে যে রসসৃষ্টি অজ্ঞাতে অগোচরে অকীর্ত্তিতরূপে থেকেও কোনোদিন ক্লান্তি দেয়নি, বাদল এ সম্বন্ধে নিশ্চেতন। তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এক আছে মন; তাই দিয়ে সে যা গ্রহণ করে তাই তার জগৎ। উজ্জয়িনীতে হয়ত সে মনের গ্রহণ-যোগ্য কিছু পায়নি। কৌশাম্বীতেও হয়ত মনীষীভোগ্য কিছু নেই। তা বলে এরা নিঃস্বত্ব নয়। কৌশাম্বী যদি উজ্জয়িনীর সদৃশ হয় তবে উজ্জয়িনীর অন্য এক নাম নয়নজ্যোৎস্না।

কৌশাম্বীর সদৃশ, কিন্তু স্বভাবে নয়। স্বভাবে উজ্জয়িনী মীরার মত। কিন্তু উজ্জয়িনীর অবস্থায় পড়লে কৌশাম্বীর স্বভাব যে মীরার মত হত না কোন্ প্রমাণে সুধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে ?

সুধীর মত স্থিতধী ব্যক্তিও অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে উজ্জয়িনীর দিদিকে প্রত্যক্ষ করে অন্তরে যে চমক বোধ করল সে চমক তার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হওয়ায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি দে সরকারের চোখ এড়াল না। সুধীর মত সংযত চেতার সমাহিত মুখভাবে এই প্রথম সে চাঞ্চল্যের আভাস পেল এবং পেয়ে হৃষ্ট হল। বল্ল, 'কি মশাই, প্রেমে পড়ে গেলেন ?"

সুধী সতর্ক হয়ে মৃদু হেসে উত্তর দিল, "প্রেম ছাড়া কি অন্য অনুভূতি সম্ভব নয় ?"

"কি জানি! মিষ্টান্ন দেখলেই যেমন শিশুরা লোভে পড়ে সুন্দরী দেখলেই তেমনি মুনিরাও love-এ পড়েন।"

বিভূতি ইতিমধ্যে কফি পরিবেশন করতে লেগে গেছে। মিসেস তালুকদারের কাছে ঐ ভার পেয়ে সে নিজেকে একটা কেষ্ট বিষ্টু ঠাওরাচ্ছে ও আড়চোখে ডলির দিকে চেয়ে ভাবছে ডলিও বোধ করি বুঝেছে যে বহরমপুরে যাই হোক লণ্ডনে বিভূতি নেহাৎ যে সে লোক নয়। দে সরকারকে দেখে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চাপা চীৎকারে বল্ল, "Coming."

অন্ততপক্ষে পঞ্চাশজন অভ্যাগত মিলে পাশাপাশি দু'খানা বড় ড্রইং রুম সরগরম করে তুলেছে। বাঙ্গালী মাদ্রাজী হিন্দুস্থানী সিংহলী ইংরেজ দিনেমার ইহুদি ইত্যাদি নানা-জাতির মানুষ জমায়েৎ হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি স্বামীজিও আছেন। তাঁর গেরুয়া আলখাল্লা যেমন আগুল্‌ফলম্বিত, গাঢ় কৃষ্ণ কেশও তেমনি পৃষ্ঠদেশে লুণ্ঠিত। একটি মাদ্রাজী যুবক কেবলই মহিলাদের চারিপাশে লাটিমের মত ঘুরঘুর করছে। কেউ এক জায়গার থেকে আর এক জায়গায় যাবেন; যুবকটি তাঁর জন্য রাস্তা করে দিচ্ছে। কারুর জন্য দরজা খুলে ধরে দাঁড়াচ্ছে, কারুর কোট খুলে নিয়ে ঝুলিয়ে রাখছে। অসম্ভব গ্যালাণ্ট। একটি বাঙ্গালী যুবক নাকটা উঁচু করে ট্রাউজার্সের পকেটে হাত পূরে পায়চারি করছে। তার চশমা, পোষাক ও টেরি তার বাবুয়ানার তিনটি ধ্বজা। তার ধারণা তার মত সুপুরুষ আর নেই।

ওদিকে ব্রিজ খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। মিষ্টার ও মিসেস তালুকদার সার ফ্রেডুনজি বিলিমোরিয়া ও তস্য দুহিতার সঙ্গে একটি টেবিল নিয়েছেন। ডলি মিটার, তাঁর স্বামী, সেই ইংরেজটি—পরে জানা গেছে তিনি একজন কিষ্কিন্ধোলজিষ্ট অর্থাৎ রিজেণ্ট্‌স পার্ক চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের সামিল - এবং একটি বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলা— মহিলাদের বয়সের খোঁজ করা যদিও অভদ্রতা তবু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে তিনি রাজা এডওয়ার্ডের সমবয়সিনী আর লম্বায় চৌড়ায় উচ্চতায় একটি কিউব আর তাঁর মাথায় সামান্য যে কয়টি চুল অবশিষ্ট আছে তাদের নিয়ে তিনি একটি কুটকি রচনা করেছেন - এই চারজনে মিলে আর একটি টেবিল দখল করেছেন। তৃতীয় একটি টেবিলে খেলা করছেন একটি বর্ষীয়সী বাঙ্গালী বিধবা, (এঁর শরীরের বাঁধুনি শক্ত, সমস্ত চুল কাঁচা, রং ময়লা কিন্তু মুখে চোখে অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য, গলার স্বর মোলায়েম, আয়তন বৃহৎ), তাঁর তরুণ বন্ধু এক হিন্দুস্থানী গাইয়ে, একটি মধ্যবয়সিনী পোলাণ্ডদেশীয়া ইহুদি মহিলা (বোধ হয় হলিউডের বাতিল ফিলম্ অভিনেত্রী, পোষাক ও হাবভাব সম্বন্ধে টীকা নিষ্প্রয়োজন) এবং আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত স্বামীজি (ইনিও সম্ভবত হলিউড্ ফেরৎ)।

দে সরকার কি যে উন্মাদনা অনুভব করল, বল্ল, "প্রতিজ্ঞা করেছিলুম গল্প বল্‌ব, খেল্‌ব না, কিন্তু চুলায় যাক্ গল্প, আসুন এক হাত খেলি।"

সুধীও কেমন শৈথিল্য বোধ করছিল। এইটুকু সীমার মধ্যে সবাই উৎসবমত্ত, সেই শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে রইবে? বিশাল আকাশের তলে বিজনে বিরলে বসে থাকা এক কথা, এ অন্য কথা। সুতরাং সে দে সরকারের প্রস্তাবে সায় দিল। আর কোনো টেবিল খালি ছিল না, তারা একটা অব্যবহৃত পিআনোকে টেবিল কল্পনা কর্‌ল। জন দুই পার্টনার পাওয়া কঠিন হল না। সেই নাক উঁচু করা সুপুরুষ তখনো পায়চারি কর্‌ছিলেন। দে সরকার তাঁকে পাকড়াও করে সুধীর কাছে এনে বল্ল, "এঁর নাম নার্‌সিসাস্।" তারপর আর একটি বাঙ্গালী যুবক এক কোণে একমনে ইউরোপীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি পড়ছিলেন, তাঁকে পিআনোর কাছে টেনে এনে বল্ল, "আগে একটু খেলুন, তারপর একটু বাজাবেন।" তাঁর নাম নীলমাধব চন্দ।

খেল্‌তে বস্‌ল না কেবল বিভূতি নাগ ও সেই মাদ্রাজী টহলদার। এদের একজন কর্‌তে থাক্‌ল কেক্ স্যাণ্ডউইচ বিলি, অন্যজন এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে বার্ত্তা বহন করতে থাক্‌ল। সকলে যখন খেলার মত্ততায় এদের উপস্থিতি বিস্মৃতি হল তখনো এরা অদম্য উৎসাহে ফরফরায়মান।

৭

আধঘণ্টা না যেতেই সার ফ্রেডুনজি গাত্রোত্থান করলেন। তিনি যে দয়া করে এসেছিলেন ও এতক্ষণ ছিলেন একন্য তালুকদার সাহেব জানালেন কৃতজ্ঞতা; আর তিনি যে আরও কিছুকাল থাক্‌তে পার্‌লেন না এজন্য তালুকদার গৃহিণী খেদ প্রকাশ কর্‌লেন। উভয়ে যেটা ব্যক্ত কর্‌লেন না সেটা হচ্ছে তাঁদের এই আশঙ্কা যে সার ফ্রেডুনের অনুসরণে পাছে একে একে সকল অভ্যাগত অকালে প্রস্থান করেন, এবং অকালে প্রস্থান করাকে মনে করেন ইদানীন্তন চাল।

তালুকদারেরা পরস্পরের থট্‌রিডিং জান্‌তেন। স্বামী গেলেন সকন্যা সার ফ্রেডুনকে মোটর পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গমন কর্‌তে, স্ত্রী চল্লেন ড্রয়িং রুমে অবশিষ্ট অতিথিগণকে উপবিষ্ট রাখ্‌তে। তিনি প্রত্যেককে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "না, না, না, না, না। উঠ্‌বার নাম মুখে আন্‌বেন না।" হঠাৎ তার নজরে পড়্‌ল তাঁর কন্যা অশোকার টেবিলে সকলেই মেয়ে, ছেলে একটিও নয়। দেখ দেখি কি আপদ্! যেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই সেই দিকে বিশৃঙ্খলা। এত বড় মেয়ে, নিজের স্বার্থ নিজে বোঝে না। তবু যদি ছেলের অকুলান থাক্‌ত! মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা আহূত হয়েছিল অধিক সংখ্যায়, সমাগতও হয়েছে। জন দুয়েক রয়েছে রিজার্ভে। ঐ ত ওখানে চারজন ছেলে এক টেবিলে। দেখ দেখি কি অনাচার। কি স্বার্থপরতা।

তালুকদার-জায়া ভূতলিঙ্গম্‌কে ইসারায় ডাক্‌লেন। মাদ্রাজী টহলদার ছুটে এসে আদেশের প্রতীক্ষা কর্‌ল। "মিষ্টার ভূতলিঙ্গম্, আপনি কি আমাকে এতটা অনুগ্রহ কর্‌বেন যে ঐ-যে ওখানে ঐ কাল পোষাক-পরা চশমা চোখে ভদ্রযুবক বসে আছেন ওঁকে—ওঁর নাম মিষ্টার রায়চৌধুরী—সার বি এল্ রায় চৌধুরীর মেজ ছেলে স্নেহময় - ওকে..."।

ভূতলিঙ্গম্ কথাটা শেষ হতে দিল না। অনুগ্রহ কর্‌বে কি না তার মস্তকভঙ্গী থেকে অনুমান করা কঠিন হলেও তার ধাবমান অবস্থা থেকে সপ্রমাণ হল। ফলে স্নেহময় পরিমিত পদক্ষেপে স্বীয় মর্য্যাদা প্রকট কর্‌তে কর্‌তে মিসেস্ তালুকদারের সম্মুখীন হল। নাকটা তার বাস্তবিক উঁচু নয়, এই সভায় কেউ তাকে সম্যক সম্মান দেখাল না দেখে সেও তার অবজ্ঞাজ্ঞাপন কর্‌ছিল ভাষাযোগে নয়, নাসাযোগে। গৃহকর্ত্রীর বিশিষ্ট আহ্বানে তার নাসিকা নিম্নগতি হল, কিন্তু সে তাঁকে ক্ষমা কর্‌ল না।

মিসেস্ তালুকদার বানিয়ে বল্লেন, "তুমি কখন এলে স্নেহময়? অশোকা তোমার কথা কতবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল, তোমার খোঁজ না পেয়ে অন্য কোনো ছেলেকেই তার পার্টনার কর্‌তে চাইল না। শেষকালে ঐ দেখ ব্যাপার! দেখ্‌লে ত? এখন লক্ষ্মী ছেলেটির মত তোমার কোনো সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে এস দেখি।"

স্নেহময় এবার কিছু চঞ্চল চলনে স্বস্থানে ফিরল এবং অপরিচিত হলেও সুধীকেই মনোনয়ন করল। সুধী হঠাৎ কোন্ পুণ্যফলে মিসেস্ তালুকদার কর্তৃক স্মৃত হল তা বুঝে উঠতে পারল না। যন্ত্রচালিতের মত স্নেহময়ের অনুসরণ করল। মিসেস তালুকদার ইতিমধ্যে অশোকার সঙ্গিনীদের মধ্যে দু'জনকে স্থানান্তরিত করবার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়েছেন। পুরুষ মানুষের খেলার সাথী হবার প্রস্তাবে তারা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়েছে, উল্লাস গোপন করতে পারে নি। অবশ্য মুখে বলেছে, "ওঃ খেলাটা চমৎকার জমেছিল, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আর একটা রাবার হত।"

মিস্ অম্বল ও মিস্ খান্নাকে অপ্রার্থিত রূপে পেয়ে দে সরকার ও চন্দ কৃতজ্ঞ হল কি না বলা যায় না, কিন্তু সুধী ও স্নেহময় যে অশোকা ও কুন্তলার জন্য নির্বাচিত হল এতে দে সরকার হল কম্পিত এবং চন্দ হল চমকিত। সুধীকে তার ভাল লেগেছিল। প্রথম দর্শনে তার মনে হয়েছিল এই মানুষটি তার সমবয়সী। সুধীর সান্নিধ্য তাকে পরিতোষ দিচ্ছিল।

কুমারী অশোকা তালুকদার সুধীকে প্রতি নমস্কার করে তার পার্টনার হতে অনুরোধ জানালেন, কিন্তু স্নেহময়ের ইংরেজী অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন করতে ভুলে গেলেন। এতে স্নেহময়ের প্রতি অভিমান প্রকাশিত হল কি সুধীর প্রতি সম্মানাধিক্য স্নেহময় ও সুধী তাই নিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। স্নেহময় বোধ করি ভাবছিল সুধীকে মনোনয়ন করে সুবুদ্ধির কাজ করেনি। প্রথম দর্শনে সুধীকে সে সাধু সন্ন্যাসী জাতীয় বলে সাব্যস্ত করেছিল। যেন সুধী মেয়েমহলে অতীব কৃপার পাত্র।

সুধী একটু ইতস্তত করল। বল্ল, "আপনার আদেশ অমান্য করব না, কিন্তু যদি বলে না রাখি যে আমি ব্রিজ খেলায় অনভ্যস্ত তবে হয়ত প্রবঞ্চনা করা হবে।"

একথা শুনে কুমারী কুন্তলা দত্ত—ইনি অশোকার থেকে বয়সে বড়, সুধীর থেকেও—রঙ্গ করে বল্লেন, "প্রবঞ্চনাটা আমার প্রতি না হয়ে অশোকার প্রতি হলেই আমি খুশী হই।"

অশোকা সুধীকে অভয় দিল। আর সেই সঙ্গে স্নেহময়ের নাসিকার ভাব পরিবর্তিত হল। তা দেখে কুন্তলার মনে যেটুকু আশার সঞ্চার হয়েছিল সেটুকুও হল অন্তর্হিত। কিন্তু তাতে তার মৌখিক উল্লাসের ব্যতিক্রম হল না। সে তাসগুলোকে বিলাতী হাতপাখার মত সাজিয়ে চোখের সুমুখে ধরে ডাক দিল থ্রী নো ট্রাম্পস্। স্নেহময়ের চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অশোকার যাতে হার না হয় এজন্য সুধী সাতিশয় অভিনিবেশ এবং চিন্তাকুলতার সহিত খেলতে লাগল। যেন খেলা নয়, সংগ্রাম। কাজ কিম্বা খেলা যেটাই হোক যেটা করতে হবে সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে। এমনিতেই সুধীর এই বিশ্বাস। তার উপর অশোকার প্রতি দায়িত্ব। সুধীর পরাজয়ের ভরসায় স্নেহময়ও খেলায় মন দিয়েছিল। ধরে নিয়েছিল যে জয়লক্ষ্মী ও অশোকা একসঙ্গে দু'জনেই তার পক্ষপাতী হবেন। কুন্তলার নিপুণতায় তার আস্থা ছিল না বলে তাকে সে ক্রমাগত ডামি করতে থাকল।

ওদিকে দে সরকারদের দল পিআনো পরিত্যাগ করে একটা টেবিল দখল করেছে। ওদের খেলা আদৌ জমছিল না। ওরা বার বার জোড় বদলাচ্ছিল। একবার মিস খান্না ও দে সরকার। একবার মিস্ অম্বল ও দে সরকার। দু জনের একজনকেও দে সরকারের মনে ধরছিল না। ওরা যে সুন্দরী নয়, এই এক অপরাধে ওদের সঙ্গে খেলতে দে সরকারের প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। চুরি করে দেখছিল সুধীর কি হাল। দেখছিল সুধীর সমস্ত মন খেলায়, কিন্তু অশোকার অর্দ্ধেকটা মন সুধীর মুখমণ্ডলে। সুধী স্নেহময়ের মত সুপুরুষ নয়, সমাজেও মেশে না। তার অপরূপ পরিচ্ছদ তাকে অপাংক্তেয় করে রাখে। তবু তার ললাটের আভা, দৃষ্টির সৌম্যতা ও মুখের মৌনতা অশোকাকে তার প্রতি সভয়ে আকৃষ্ট করছিল।

দে সরকার একচক্ষু মুদ্রিত করে অন্য চোখে দুষ্টু হাসি হাসল। মুনিবরের তপোভঙ্গ আসন্নপ্রায়।

লীলাময় রায়

ক্ষুধিত-পাষাণ*

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ

অনেক গল্পই গল্প এবং অনেক গল্পই হ'য়ে থাকে আকারে ছোট। কিন্তু তাই ব'লে তারা কেউ ছোট গল্প নয়। আবার আকারে ছোট ও প্রকারে গল্প হ'লেও তাকে ঠিক ছোটগল্প বলা চলে না। ছোটগল্পের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। তার একটি বিশিষ্ট ধারা আছে, প্রবাহ আছে। এই বিশিষ্ট রূপটি কোন গল্পের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠ্‌লে তবেই তাকে ছোটগল্প বলা যেতে পারে। ছোট গল্পের এই যে বিশিষ্ট রূপ এটা কি? প্রথমেই যে জিনিষটি ছোট গল্পকে অন্য গল্প-সাহিত্য থেকে বিভিন্ন করেছে তা হ'চ্ছে তার সূচনার নৈপুণ্য। বলা নেই, কওয়া নেই, কোন কিছুর ভূমিকা পর্য্যন্ত নেই হঠাৎ একেবারে মাঝখান থেকে তা'র আরম্ভ এবং আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুতগতিতে ঘটনার পর ঘটনার জাল বুনে চলাই হ'চ্ছে ছোট গল্পের ধর্ম্ম। উপন্যাসের মত ধীর মন্থর গতিতে তার আরম্ভ হবার সুযোগ নেই, পাত্র পাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় বা বিশ্লেষণের স্থান এতে নেই। তা ছাড়া ঔপন্যাসিক যেমন অনেক সময় গল্প বহির্ভূত প্রসঙ্গ বা মন্তব্যদ্বারা তার গল্পের ছিদ্রগুলি পূরণ ক'রে থাকেন, ছোট গল্পলেখক তা' তার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে ক'রবার সুযোগ পান না।

ছোটগল্পের ঘটনাস্রোত এম্‌নি দ্রুতগতিতে চলে যে পাঠকের মন যেন সেই ঘটনাস্রোতের সঙ্গে একেবারে হু হু ক'রে ছুটে চলে, তাকে কোন কিছু ভাব্‌বার অবসর দেয় না। এই ভাবে নিজেকে ও পাঠকের মনকে টান্‌তে টান্‌তে ঘটনাস্রোতে একটি climaxএর মধ্যে এসে উপনীত হয়। নিজেকে ও সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনকে এই climaxএ নিয়ে যেতে পারাই হ'চ্ছে ছোট গল্পের চরম সার্থকতা। এই climax জিনিষটি কি তা একটু জানা দরকার। এই climax জিনিসটি বোঝাতে গেলে রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' ব'লে যে গল্পটির আলোচনা পূর্ব্বে এ সভায় হ'য়ে গেছে সেইটি নিলেই যথেষ্ট হবে। হবে, কেননা climaxএর দিক দিয়ে দেখ্‌লে 'নিশীথে' গল্পটি অনুপম। 'নিশীথে' গল্পটির মধ্য দিয়ে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই দেখি সমস্ত গল্পটির রহস্য নিবিড়তর হ'য়ে উঠ্‌ছে এবং শেষে যেখানে পদ্মাতটে বোটে দক্ষিণাচরণের অদ্ভুত অনুভূতি সবচেয়ে প্রবল হ'য়ে পাঠকের মনকে নিবিড়তম রহস্যে পরিপ্লুত ক'রেছে সেইখানে এসে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এইটেই হ'চ্ছে গল্পের climax—যেখানে পাঠকের মন সব চাইতে বেশী দোলা খাচ্ছে এবং এই রকম climaxএ এসেই সাধারণতঃ ছোট গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে। যেখানে 'নিশীথে' শেষ হ'য়েছে তার পরও তাকে অনায়াসেই টেনে নিয়ে যাওয়া যেতে পারত কিন্তু তা হ'লে গল্পের রসমাধুর্য্যটুকু নষ্ট হ'তো। জন্য দক্ষিণাচরণের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে উষার আলো দেখে তার ঘর ছেড়ে পলায়ন কবি গল্পের শেষ দিকে introduce ক'রে গল্পের উপর যবনিকা ফেল্‌তে বাধ্য হ'য়েছেন। এই climaxএর দিক থেকে 'ক্ষুধিত পাষাণ'ও আর একটি অপরূপ সৃষ্টি। এ গল্পটিও এমন একটি জায়গায় শেষ করা হ'য়েছে যেখানে সমস্ত গল্পের পেছনের রহস্যটি জানবার জন্য পাঠকের মন উন্মুখ হ'য়ে আছে। কিন্তু রহস্যটি সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন না ক'রে কেবলমাত্র তার একটু আভাস দিয়ে পাঠকের মনকে রহস্যটির জন্য অধিকতর ব্যাকুল ক'রে কবি তাঁর গল্প শেষ ক'রেছেন। অতএব দেখ্‌তে পাচ্ছি climax, যা হ'চ্ছে ছোট গল্পের প্রাণ তা এ দু'গল্পের মধ্যেই অতি চমৎকার পরিণতি লাভ করেছে। Climax ছাড়াও ওপরে ছোট গল্প সম্বন্ধে যা যা

---

* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠচক্রে 'ক্ষুধিত পাষাণের' আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

বলা হ'য়েছে 'ক্ষুধিত পাষাণে' তার সমস্তই আশ্চর্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র আরম্ভ হ'য়েছে হঠাৎ—ট্রেনের প্রতীক্ষায় ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে। আর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্রোত তার এমনি দ্রুতগতিতে ছুটে চ'লেছে যে পাঠকের মনও সেই স্রোতে দ্রুততালে ছুটে চলে। এতে গল্পবহির্ভূত কোন কিছুরই উল্লেখ নেই; আর সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে 'ক্ষুধিত পাষাণে' কবি যে একটি অদ্ভুত স্বপ্নরাজ্য সৃজন করেছেন তা পাঠকের মনে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলবার জন্য গল্প-বহির্ভূত কোন প্রসঙ্গ বা মন্তব্যের তিনি অবতারণা করেন নি। অথচ এমনিভাবে সমস্ত গল্পটি লেখা যে যখন প'ড়ে যাওয়া যায় তখন গল্পের কোথাও কোন অসঙ্গতি আছে বলেই যেন মনে হয় না যদিও পাঠান্তরে তা খুবই মনে হ'তে পারে।

ছোট গল্পের আরম্ভও যেমন হঠাৎ আবার শেষও হ'য়ে থাকে তেমনিই হঠাৎ। কিন্তু এই দুই 'হঠাতের' টানে তার বিকৃতি ঘটলে চল্‌বে না, তাকে একটি পূর্ণ অবয়বে প্রকাশ পেতেই হবে। কিন্তু শেষ তার হঠাৎ হয় বলে কখনো কখনো তার মধ্যে একটা অসমাপ্তির রেশ থেকে যায়। সে সম্পূর্ণ হয়েও অসম্পূর্ণ থেকে যায়, শেষ হয়েও অশেষ। কিন্তু তাই ব'লে তার রসোপলব্ধিতে পাঠকের মন কখনো বাধা পায় না। এই সকল কারণে ছোট গল্পে জীবনের এমন সব খণ্ডাংশ বেছে নিতে হয় যা তার স্বল্প পরিসরের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। আর এই নির্ব্বাচন ব্যাপারটাই হ'চ্ছে ছোটগল্প লেখকের একটি মস্ত পরীক্ষা। 'নিশীথে' ও 'ক্ষুধিত পাষাণে' এই নির্ব্বাচন ব্যাপারটিতে লেখক আশ্চর্য্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমটিতে দক্ষিণাচরণের মনোবিকার হ'তে উদ্ভূত তার জীবনের একটি খণ্ডাংশ দেখানো হ'য়েছে আর দ্বিতীয়টিতে "বাদশাহী যুগের সমস্ত ঐশ্বর্য্যদীপ্তি, রাজান্তঃপুরের সমস্ত অব্যক্ত ক্রন্দন, সমস্ত যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস" আশ্চর্য্য কৌশলে একটি মানবের দিন কয়েকের অনুভূতির ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে। আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার, তা হ'চ্ছে এই যে 'ক্ষুধিত পাষাণে' গল্প আরম্ভ হবার পূর্ব্বে গল্পটিকে যে একটি setting দেওয়া হ'য়েছে তা দীর্ঘ বাধার দ্বারা গল্পে রসমাধুর্য্য নষ্ট না ক'রে গল্পটিকে হঠাৎ শেষ করবার সুযোগ লেখককে দিয়েছে। অতএব দেখতে পাচ্ছি ছোট গল্পের রূপ হিসেবে 'নিশীথে' ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' দুই-ই success.

রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পগুলির মধ্যে কতকগুলি হ'চ্ছে মানবজীবনে কখনো কখনো অতিপ্রাকৃতের যে স্পর্শ লেগে থাকে তাই নিয়ে লেখা। 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'নিশীথে' এইরূপ দুটি গল্প। এ দুটি ছাড়া 'কঙ্কাল', 'মণিহারা' ও অন্যান্য অনেক গল্পই এই পর্য্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। একটি জিনিষ এই শ্রেণীর গল্পগুলি সম্বন্ধে লক্ষ্য করবার আছে, তা হ'চ্ছে এ গল্পগুলির বর্ণনা সবই হ'য়েছে রাত্রির অন্ধকারে। রাত্রির অন্ধকারে যখন বিশ্ব লুপ্তপ্রায়, যখন বিশ্বের সমস্ত কোলাহল মিলিয়ে গিয়ে চারিদিক নিভৃত নির্জ্জন, যখন মানুষের চেতনাশক্তি শিথিল, তখন মনের কোণ থেকে বিশেষ একটি কথা বেরিয়ে আসবার অবসর পায় তা সে যত অসাধারণই কেন না হোক। 'ক্ষুধিত পাষাণে' আরেকটা যে জিনিষ লক্ষ্য করবার তা হ'চ্ছে ভাষার ইন্দ্রজাল। ভাষার ইন্দ্রজালে কবি যেন এক মুহূর্ত্তের একটি স্বপ্ন সৃজন ক'রেছেন।

সাহীবাগের বাদশাহী প্রাসাদে কবি কিছুকাল ছিলেন তাঁর মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। পরবর্ত্তী জীবনে এই প্রাসাদের স্মৃতি অবলম্বনেই নাকি 'ক্ষুধিত পাষাণ' লেখা হয়েছিল। প্রকাণ্ড প্রাসাদ জনমানবহীন ব'ললেই চলে। প্রাসাদের অধিবাসীদের মধ্যে ছিলেন কবি নিজে, তাঁর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁদের অল্পসংখ্যক ভৃত্য। মধ্যাহ্নে সত্যেন্দ্রনাথ যখন আপিসে যেতেন তখন জনশূন্য, প্রখর মধ্যাহ্নরৌদ্রতপ্ত প্রাসাদটি আপনার প্রকাণ্ড ছাদ, কারুকার্য্যখচিত খিলান, বিচিত্র বৃহদায়তন কক্ষসমূহ নিয়ে "আপনার বিপুল শূন্যতাভরে গমগম করিতে থাকিত", ইহ খুবই স্বাভাবিক যে এই জনশূন্য রহস্যময় প্রাসাদে কবি কল্পনাপ্রবণ মন অতীতযুগের বাদশাহী ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র চি এঁকে বেড়াতো এবং নিজের কল্পনার তীব্রতায় চিত্রগুলি হয় একান্ত প্রত্যক্ষবৎ হ'য়ে উঠ্‌ত। সমস্ত কিছু ভুলে যখ কল্পনার মধ্যে আপনার মনকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতেন তখন হয়ত সত্যই তিনি শুনতে পেতেন—কোথাও

ঝর্ঝরশব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, * * * * কোথাও বা স্বর্ণভূষণের সিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কখনো বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতিদূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক দোলকগুলির টুনটুন ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক।" হয়ত এরূপ মনে করা শুধুই কেবল ভ্রান্তি কিন্তু যে কবি আকাশে বাতাসে শুনতে পান "কেমন ক'রে গান করো হে গুণী তার পক্ষে কল্পনার আতিশয্যে এরূপ শুনতে পাওয়া যে বিশেষ আশ্চর্য্য তা মোটেই মনে হয় না। তা ছাড়া "ক্ষুধিত পাষাণে" একজায়গায় আছে "জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও কোন অমূর্ত্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোন মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কিনা তাহা আমাদের মহাকবি এবং কবিবরেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু একথা নিশ্চয় সত্য যে আমি বরীচের হাটে তুলাব মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চারশো টাকা বেতন লইয়া থাকি।" এই কথাগুলি কবি হয়ত ঠিক সহজভাবে বলেন নি। তিনি নিজেই হয়ত মায়া-সেতারে অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হ'তে শুনেছেন। কিন্তু তা শুনে অনেকে হয়ত অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন ; তাই তিনি নিজের কথাটাই একটু ঘুরিয়ে ব'লেছেন। হয়ত এর ঠিক উত্তরটি পাওয়া যেতে পারে নীচের ক'টি লাইনে—

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাসবি কিনা
বুঝবো কেমন ক'রে ?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
ঠাট্টা ক'রে ওড়াই সখী
নিজের কথাটাই।

*　　*
*

সত্য কথা সরলভাবে
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
অবিশ্বাসে হাসবি কিনা
বুঝবো কেমন ক'রে ?
মিথ্যা ছলে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
উল্টা ক'রে বলি আমি
সহজ কথাটাই।

পূর্ণেন্দু গুহ
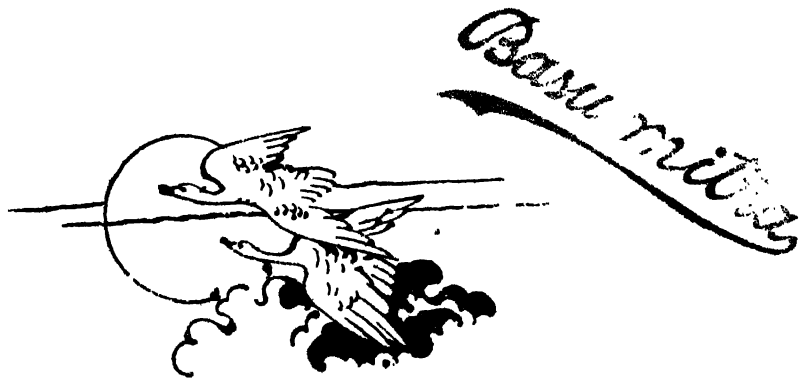
মন্দের ভালো

শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত

সেদিন সুমিতা যখন অত্যন্ত বিজ্ঞের মত মুখ করে বলেছিল, জীবনে সুখও আছে, দুঃখও আছে, এমনি করেই জীবন কেটে যায়—সুপ্রকাশ তখন হেসেই তার কথা উড়িয়ে দিয়েছিল। বোকা মেয়ে সুমিতা হঠাৎ এরকম দার্শনিক কথা বলে ফেলাতে নিজেই যথেষ্ট অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল; সুপ্রকাশের হাসিতে আরও লজ্জিত হয়ে পড়ল। বেচারা সুমিতা! তখন কিন্তু সুপ্রকাশ কল্পনাতেও আনতে পারে নি যে সুমিতার ভবিষ্যদ্বাণী এত শীগ্‌গিরই হাতে-হাতে ফলবে, এবং বিশেষ করে তা'রই ওপর দিয়ে তার সত্যাসত্য প্রমাণিত হবে। আজ তাই সুমিতার কথা স্মরণ করে সেদিনের দুর্ব্যবহারের জন্য নিজকে বারবার তিরস্কার করেও সে শান্তি পাচ্ছিল না। মনে মনে বলেছিল, সুমিতা তুমি যদি আমার এ লাঞ্ছনার ইতিহাস জানতে তা' হলে সেদিনের সব রাগ-করা ভুলে গিয়ে তুমি নির্ব্বিকারভাবে আবার বলতে, জীবনে সুখও আছে, দুঃখও আছে, এমনি করেই জীবন কেটে যায়; এবং সেই হোত আমার উপযুক্ত শাস্তি। তুমি এখন কোথায় আছ জানিনা, কিন্তু আমার এ লাঞ্ছনার কাহিনী পড়ে যদি সামান্য আত্মতৃপ্তির প্রসাদও তুমি উপভোগ করতে পারো, তা' হলেই এ চেষ্টাকে সার্থক মনে করবো।

অরুণার সঙ্গে সুপ্রকাশের পরিচয় হয় মামুলি ধরণেই; কিন্তু ঘনিষ্ঠতার একটুখানি ইতিহাস আছে।

একটা ইংরেজি দৈনিকে কাজ পেয়ে সুপ্রকাশ কলকাতা চলে এল। বাড়ী খুঁজে নিতে সময় লাগে, তাই মামার বাড়ীতেই উঠতে হোল। মামীমা বললেন—তোমার একটা আলাদা বাড়ীর কি দরকার; এখানেই থাকো।

সুতরাং বাড়ী খোঁজ করা খুবই আস্তে-আস্তে চলল।

সুপ্রকাশের মামা, নীরেন বাবুর পাশের বাড়ীতে থাকতো অরুণারা। একদিন অরুণাদের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল নীরেন বাবুর বাড়ীতে। একটা টেবিলের একদিকের মাঝখানে বসেছিল সুপ্রকাশ, তার ডানদিকে অরুণা ও বা দিকে অরুণার বাবা। টেবিলের অপর দিকে নীরেন বাবু ও তাঁর স্ত্রী। অরুণার বাবা ইতিহাসের অধ্যাপক। বিপুল উৎসাহে তিনি Letters of Junius-এর authorship নিয়ে সুপ্রকাশের সঙ্গে তর্ক সুরু করলেন। সেই সময় এদিকে এক বিষমকাণ্ড হয়ে গেল। সুপ্রকাশের খাবারগুলো আগেই শেষ হয়েছিল। কিন্তু সেটা তার খেয়াল ছিল না। অরুণার বাবার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে একটু হাত বাড়াতেই যে প্লেটে তার হাত ঠেকলো সেটা অরুণার; এবং নিজের ভেবে ওটা থেকে নিশ্চিন্তমনে একটা চপ্‌ তুলে সুপ্রকাশ মুখে পুরলো। হঠাৎ মামা ও মামীমার হাসির শব্দে ফিরে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠলো।

এক অন্যমনস্ক মুহূর্ত্তের সেই একটি ভুল, তারি প্রায়শ্চিত্তের জের চলল অনেকদিন ধরে।

সেইদিন থেকে সুপ্রকাশ হয়ে উঠ্‌ল অরুণার সম্পত্তি, তার কপিরাইট্‌। সুপ্রকাশের ধারণা ছিল সে অত্যন্ত সতর্ক ছেলে; এ রকম ভুল ত জীবনে তার এই প্রথম। নিজের কাছে সে এজন্যে যথেষ্ট লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, এবং কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না এমন ভুল তার কি করে হোল। কিন্তু অরুণা তাকে আবিষ্কার করল অন্যভাবে: সে দেখতে পেল সুপ্রকাশের ভেতরে একটা অগোছালো কবিপ্রাণ যা' স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সাড়া দেয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কিন্তু ছোটখাটো সাংসারিক বিষয়ে একান্ত অসামর্থ্য। সুতরাং অত্যন্ত নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তমনে সে সুপ্রকাশের শুভার্থিনী হয়ে দাঁড়াল।

অরুণার এরকম ব্যবহারে সুপ্রকাশ প্রথমটা খুব আমোদ অনুভব করত। পরে মনে হোল এ অন্তরঙ্গতার কারণ, সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, তাই। কিন্তু তাতেও সন্দেহ জাগে। অরুণার কিঞ্চিৎ স্থূলকায় দেহ কেবল ভিটামিন খাদ্যেরই বিজ্ঞাপন জাহির করে, তার ভেতরে আর কোন বিশিষ্টবৃত্তি আছে বলে মনে হোত না। এ অবস্থায় ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন না করে অরুণাকে যতখানি সহ্য করা যায়, সুপ্রকাশ তাই করতে লাগলো।

একদিন সকালবেলা সুপ্রকাশের ঘরে ঢুকে অরুণা বললে —কী ভুলো মন আপনার। কাল এই বইটা আমাদের বাড়ী ফেলে এসেছেন, অথচ সে কথা হয়ত আপনার খেয়ালই নেই। দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবছেন যে বইটা হারিয়েই গেল।

সুপ্রকাশ হারানো বই ফিরে পাওয়াতে একটুও উৎসাহ না দেখিয়ে বললে—Thank you-বইটা শেল্‌ফের ভেতরে দয়া করে রেখে দিন।

আগেকার দিন সন্ধ্যার সময় সুপ্রকাশ বইটা হাতে করে অরুণাদের বাড়ী যায়। অরুণা সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এক সময় উঠে ভেতরে চলে যায়, এবং যখন ফিরে আসে তখন বইটা তার হাতে ছিল না। সুপ্রকাশ ভেবেছিল, পড়বার জন্য অরুণা বইখানা রেখেছে। আজ সকালবেলা সে যখন তার অসাবধানতার নালিশ নিয়ে এল, তখন সমস্ত ব্যাপারটার অর্থ সুপ্রকাশের কাছে জলের মত সোজা হয়ে গেল।

অরুণা আবার বললে—দেখুন, বইগুলো একটু সাবধানে রাখবার অভ্যাস করা ভালো। ঐ জিনিষটার হারিয়ে যাবার একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে—একবার হাতছাড়া হলে ফিরে পাওয়া বেজায় শক্ত হয়ে ওঠে।

সুপ্রকাশ দ্বিধাহীন ভাবে উত্তর দিল—এবার থেকে তাই করবো। খানিকক্ষণ এটা-ওটা দেখে অরুণা বললে—আজতো রবিবার, আপনাকে আপিসে যেতে হবে না। চলুন না, মুজিয়মে গিয়ে 'মামি'টা দেখে আসা যাক্। শুনেছি, ওটা চার হাজার বছরের পুরোণো। আশা করি খুব interesting হবে।

সুপ্রকাশ মনে-মনে স্থির করল, আর এক রবিবার আসবার আগেই যেমন করে হোক একটা বাড়ী ঠিক করে এখান থেকে চলে যাবে।

নিশ্চিন্ত আলস্যে দিন কেটে যায়। হাতের কাছে অনেক কাজ—ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করা যায়। কিন্তু কোন্‌টা করবো ঐ বিষয়ে মনস্থির করাই সব চেয়ে কষ্টকর ব্যাপার। একবার মনস্থির করে উঠতে পারলে কাজও আপনিই হয়ে যায়। রাসবিহারী এভেনিউতে নীচতলার একটা ছোট ফ্ল্যাট্ ভাড়া করে সুপ্রকাশ তাতে বাসা বাঁধল। তার সঙ্গী হল, মামীমার উপহার, মেদিনীপুরবাসী এক অদ্ধ-উড়ে। তার নাম মকর এবং লোকটা নাকি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব কাজেই সমান ওস্তাদ। অবশ্য এক্ষেত্রে মামীমার কথা বিশ্বাস করবার নয়, কারণ লোকটা বাজারের পয়সা চুরি করে তাকে প্রায় দেউলে করেছিল। সব জেনে শুনেও সুপ্রকাশ মকরকে ভরসা করেই সংসার পাতানোতে মন দিল। অরুণার সহৃদয় ও নিঃস্বার্থ শুভ-কামনা ও মকরের কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তি, এ' দুটোর মধ্যে দ্বিতীয়টাকেই মেনে নেওয়া মন্দের ভাল মনে করে সুপ্রকাশ নিজের মনে খুসি হয়ে উঠল।

কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার সৌভাগ্য তার কপালে ছিল না। বাড়ী বদল করবার ঠিক দু'দিন আগে অরুণা এই মারাত্মক সংবাদটি তাকে জানালো। হাতের কাছেই একটা চেয়ার ছিল; ধপ্ করে সুপ্রকাশ তাতে বসে পড়ল। বিদ্যুৎপ্রবাহের মত তার মগজের ভেতরে একটা চিন্তা উঠেই মিলিয়ে গেল। বাড়ীটা বদল করা যায় না? পরক্ষণেই মনে পড়ল, একমাসের ভাড়া অগ্রিম দেওয়া হয়েছে, সুতরাং অসম্ভব। কথাটা এই:

অনিলা বললে—শুনলুম আপনি রাসবিহারী এভেনিউতে বাড়ী ভাড়া করেছেন। নম্বর শুনে মনে হল আপনি উমাদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই যাচ্ছেন।

—উমা? উমা রায় নয় তো?

—হ্যাঁ, উমা রায়। আপনি চেনেন নাকি?

—খুব। কিন্তু তারা তো আগে ভবানীপুরে থাকতো। দু'বছর আগে পুরীতে পাশাপাশি বাড়ীতে একমাস

থাকার ফলে দু'জনের মধ্যে যথারীতি অন্তরঙ্গতা হয়েছিল।

—আগে ভবানীপুরেই থাকতো। এখন বালিগঞ্জে তার বাবা বাড়ী করেছেন। বেশ ভালোই হল। ওদের এখানে আমি প্রায়ই যাই—সেই সঙ্গে আপনার সাথেও দেখা হয়ে যাবে।

ক্ষীণকণ্ঠে সুপ্রকাশ উত্তর দিল—হ্যাঁ, ভালোই হল।

পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সুপ্রকাশ অফিস্ থেকে বাড়ী ফেরে এবং এর পরে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী চা পানের সময়ে সে সমসাময়িক সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। সমস্তদিন খাটুনির পরে বিকেলবেলা এই চা পানের মুহূর্তটি তা'র কাছে অত্যন্ত শুভ। এই সময়টাকে সে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছানুসারে খরচ করতে চায়। তা না পারলেই তা'র মত সহনশীল লোকের পক্ষেও মেজাজকে আয়ত্ত্বাধীনে রাখা শক্ত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পেয়ালা চাতে চুমুক দিয়ে সুপ্রকাশ সবে মাত্র একটা সিগ্রেট্ ধরিয়েছে, এমন সময়, 'কি হচ্ছে প্রকাশ বাবু', বলে অরুণা ঘরে ঢুকলো। এরকম ব্যাপার আজ-কাল মাঝে মাঝে ঘটছে। সুতরাং অরুণার আগমনে কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে সুপ্রকাশ সহজভাবে উত্তর দিল—চা খাচ্ছি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, বলে অরুণা একটা চেয়ার দখল করল।

—সম্প্রতি চা খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করছি না। আপনাকে দেব এক পেয়ালা?

—না, ধন্যবাদ। নতুন বাড়ী কেমন লাগছে?

—মন্দ নয়। কিন্তু আপনি আমাকে প্রকাশ বাবু বলে ডাকবেন না। সুপ্রকাশ বাবু বলবেন।

—কেন বলুন তো? এতে আপনার আপত্তি হচ্ছে কেন?

—কারণ ঐটেই আমার নাম, এই কি যথেষ্ট কারণ নয়?

—কিন্তু এ' বিষয়ে অন্যদিক থেকে বলবারও অনেক কথা আছে। আজকাল হচ্ছে days of simplification, জীবনটা যতপ্রকারে সহজ করে আনা যায় তারই চেষ্টা চলেছে। এক কথায় ফোর্ডের ফিলজফি। আর আপনি গোড়াতে নামটাকে সংক্ষিপ্ত করতেই এত বড় আপত্তি তুললেন? একটা হাই পিষে ফেলে সুপ্রকাশ বললে—আমার বিশ্বাস ফোর্ডের ফিলজফি জীবনকে সহজ করে তোলা নয়; জীবনটাকে যতদূর সম্ভব, সাধারণের মতে যাকে বলে আরামের, তাই করে তোলা। ফোর্ড সাহেবের ইচ্ছে রান্না, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জুতো ব্রুশ করা, বেড়ানো, সমস্তই মেসিনে হবে। একগ্লাস জলের দরকার হলে একটা সুইচ্ টিপ্‌বো, অমনি একগ্লাস জল উপস্থিত হবে! তাতে করে আরাম অনেক বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু ঝক্‌মারিরও অন্ত থাকবে না। আজ এ-মেসিনটা খারাপ, কাল ও-মেসিনটা খারাপ এই নিয়েই সমস্ত দিন কাটাও।

—কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আপনি যা ভয় করছেন তা কখনও হবে না। একটা মেসিন বিগড়ে গেলে অন্যটাতে কাজ চলবে। অথবা খারাপ হলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারেরও বন্দোবস্ত থাকবে।

—কিন্তু আপনি যে গোড়াতেই ভুল করছেন। আরাম মাত্রই তো আর real happiness নয়। একটা জিনিস চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি আপনি পেয়ে যান তা' হলে তার মূল্য, যে জিনিষটা পরিশ্রম করে আপনাকে জোগাড় করতে হয়েছে তার চেয়ে ঢের কম। সুতরাং আপনার simplification process এর যেটা logical end সেই অবস্থায় পৌছুলে মানুষ অখণ্ড boredom এ মরে যাবে।

—না-ও যেতে পারে। সে অবস্থায় পৌছুলে মানুষ নেহাৎ খাওয়া পরার চেষ্টায় সময়ের বাজে খরচ না করে, অনেক বৃহত্তর ব্যাপারে শক্তির পরীক্ষা করতে পারবে। তাতে সমাজের আরো কত বেশি হিতসাধন হবে একবার ভেবে দেখুন।

সুপ্রকাশ ভেবে দেখলে। সিগ্রেটটাতে শেষ টান দিয়ে, চেয়ারে আরও একটু কাৎ হয়ে বসে জবাব দিলে—চুলোয় যাক্ সমাজ! এ-ই বা মন্দ আছি কি? না হয় নেহাৎ খাওয়া পরার জন্যেই একটু কষ্ট করলুম। তা'তে যদি সময়ের বাজে খরচ হয়, হোক্। তা'তে আমার অন্তঃ

কিছু আসে-যায় না। জানেন, আমার এক বন্ধু সেদিন ঠিকই বলেছিল—জীবনে সুখও আছে, দুঃখও আছে, এম্‌নি করেই জীবন কেটে যায়। সেদিন তার কথা শুনে হেসেছিলুম। এখন দেখ্‌ছি ও-ই ঠিক।

সুপ্রকাশ আরও একটা সিগ্‌রেট ধরিয়ে, পা টি আরও একটু ছড়িয়ে দিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে একটা দীর্ঘ আরামের শব্দ করলে আঃ। তখন অরুণা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠ্‌ল—যান্‌, আপনার সব তাতেই কেবল ফাজলামি।

এক মুহূর্ত্তে সুপ্রকাশের সমস্ত দেহ কঠিন হয়ে উঠল; আরামের ভঙ্গী কোথায় উড়ে গেল। সুপ্রকাশ ভাবলে—এইরে! এখনি 'প্রোপোজ্‌' করবে নাকি? মকরটা আবার আমাকে একা ফেলে কোথায় গেলো?

কিন্তু শীগ্‌গিরই তার সে ভয় ভেঙ্গে গেল। অরুণা অন্য কথা পাড়লে।

—একটা কথা সেদিন আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। উমাকে আপনার সম্বন্ধে বলেছিলুম। উমা বল্‌লে সে আপনাকে চেনে না। অথচ আপনি বল্‌ছেন চেনেন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমাকে চেনে না বললে বুঝি? তা' হবে!

সুপ্রকাশের মনে পড়ল উমা একদিন তাকে জগন্নাথের মন্দির দেখিয়ে আনতে অনুরোধ করছিল। মন্দিরের চারদিকে এত অশ্লীল মূর্ত্তি যে উমাকে সঙ্গে করে সেগুলো দেখতে সুপ্রকাশ কিছুতে রাজি হয়নি। অজুহাত দিয়েছিল যে জ্বর ও গা ব্যথাতে সে মরে যাচ্ছে এবং এ' অবস্থাতে বাড়ী থেকে বেরুনো তার পক্ষে অসম্ভব। সকাল বেলা উমা দেখ্‌তে পাবে এই ভয়ে চান্‌ করা হয়নি। সুতরাং দুপুরবেলা গিয়ে নির্ভয়ে সমুদ্রে নেবেছে, এমন সময় সুপ্রকাশ কেমন আছে জানতে এসে উমা খবর পেলো, সে খানিকক্ষণ হল' সি-বাথ্‌ নিতে বেরিয়ে গেছে। পরদিন কি একটা জরুরি তার পেয়েই তাকে পুরী ছাড়তে হয়। সুতরাং মানভঞ্জনেরও অবসর পাওয়া যায়নি। সেই রাগ অথবা অভিমান উমা এখনও ভোলেনি।

অরুণা এসব ব্যাপার জানতো না। তাই বল্‌লে—চলুন, উমার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। তা' হলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে।

সুপ্রকাশ তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বললে—চলুন।

তবু উমার কৃপায় যদি অরুণাকে ঘাড় থেকে নাবানো যায়।

উমার সঙ্গে কিন্তু আলাপের বিশেষ সুবিধা হল না। উল্টে উমা তাকে এমন দু'চার কথা শুনিয়ে দিলে যাতে তা'র মনে হল, এখানে না এলেই হোত সব চেয়ে ভালো। সুপ্রকাশের মুখে যে জবাব না এসেছিল তা' নয়, তবে নিতান্তই একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে অন্ততঃ তখনকার মত তার ইচ্ছে ছিল না। অবশ্য পুরীর ব্যাপারটা খুলে বললেই সব হাঙ্গাম চুকে যেতে, কিন্তু চালাক মেয়ে উমা, সুযোগ আসবার আগেই সে পথ বন্ধ করে দিলে।

মামুলি পরিচয় শেষ হয়ে গেলে সুপ্রকাশ বললে—আপনি নাকি আমাকে চেনেন না?

উমা—আপনাকে কোথাও meet করেছি বলে' তো মনে পড়ছে না!

সুপ্রকাশ কেন পুরীতে। সেই বছর—

উমা—পুরীতে কোন বছর আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছে বলে তো মনে হয় না। আপনি হয়ত ভুল করেছেন।

সুপ্রকাশ মনে-মনে বললে, 'damn', কিন্তু মুখে যতদূর সম্ভব সিনিক্যাল্‌ হাসি টেনে বললে—তা হবে।

অরুণা বল্‌লে—পুরী টুরী ছেড়ে দে উমি—

উমা বাধা দিয়ে বললে—উমি বলাটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে।

অরুণা অবিচলিত স্বরে তার কথাটা শেষ করলে—Never mind.

এখন তো আলাপ হল। I hope you are going to be great friends.

উমা—যীশুখৃষ্ট বলে গেছে প্রতিবেশীকে ভালবাসবে। সেইজন্যে প্রতিবেশীকেই আমরা সন্দেহের চোখে দেখি ও সব চেয়ে কম ভালবাসি। তাই নয় কি' সুপ্রকাশ বাবু?

—নিশ্চয়। ওটা যদি যীশুখৃষ্টের না হয়ে আপনার কথাও হয় তা' হলেও আমি যথাসাধ্য মেনে চলতে রাজি আছি।

অরুণা খেঁকিয়ে উঠল—আঃ, তোমরা কি সমস্তক্ষণ কেবল ঝগড়াই করবে! আমি চললুম রাত হয়ে যাচ্ছে।

উমা স্মিতমুখে উত্তর দিলে—আচ্ছা। নমস্কার সুপ্রকাশ বাবু। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে সত্যি খুব খুসি হলুম।

সুপ্রকাশ ভাবলে কথাটা তারই বলা উচিত ছিল। কিন্তু এ ভাবে বিতাড়িত হবার পরে আর কি-ই বা বলা যায়। মুখ লাল করে অরুণার সঙ্গে সে-ও বেরিয়ে এল। যে তিমিরে সেই তিমিরে।

অরুণার উপদ্রব বেড়ে চলেছে। বড় হওয়া অবধি যে একমাত্র মুহূর্তটিকে সে শুভ বিবেচনা করত, বিকেলে সেই চা পানের সময়টাই হয়ে উঠল সব চেয়ে বিপদ সঙ্কুল। কয়েকদিন সে বাড়িতে চা খাওয়া ছেড়ে দিলে। কিন্তু কতদিন আর এ-ভাবে লুকিয়ে কাটানো যায়। আবার ধরা পড়তে হয়। অরুণা এসে একদিন হয়ত বলে, চলুন লেকে বেড়াতে যাই; আর একদিন বলে, চলুন আপনার মামার বাড়ী; আর একদিন হয়ত বালিগঞ্জ ষ্টেশন থেকে ঘুরে আসতে চায়। অবশ্য ইচ্ছে করলেই সে একটা মিথ্যে কথা বানিয়ে বলে তখনকার মত অরুণার হাত এড়াতে পারে। কিন্তু এক নিমেষে কোন কথা বানিয়ে বলবার আর্টটা তার নিতান্তই এখনও আয়ত্ত হয়নি, সে-ই হয়েচে বিপদ। (অবশ্য এ বিষয়ে সে কিছুদিন থেকে বাধ্য হয়ে অভ্যাস করছে) মাঝখানে একদিন মাত্র উমা এসেছিল, তা-ও অরুণার সঙ্গে এবং ভদ্রভাবে ঠিক সাতমিনিট কথা বলবার পরেই সে নির্মম ভাবে তাকে অরুণার হাতে সমর্পণ করে সরে পড়ে।

সুপ্রকাশ ঠিক করলে, বাড়ীতে বসে আয়েস করে চা খাওয়া আর চলবে না। মকরের ওপরে সব সময়ের জন্যে আদেশ রইল, ঠিক পাঁচটার সময় চা বানিয়ে গরম করে রাখবে। সুপ্রকাশ অফিস্ থেকে ফিরেই তা' কোন রকমে গলাধঃকরণ করে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে যাবে। এ' ব্যবস্থায় কিছুকাল সুফল ফললো। কিন্তু অরুণারও নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা ছিল না। তা'র কপি-রাইট্ তারই চোখের সামনে হাতছাড়া হয়ে যাবে এও কি সম্ভব। একদিন অফিস্ থেকে ফিরে সুপ্রকাশ দেখলে অরুণা তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।

ঠোঁটে মুমূর্ষু ক্ষীণ হাসি টেনে সুপ্রকাশ বললে - আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

—এই কয়েক মিনিট। কিছুদিন আপনি হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হলেন বলুন তো?

ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জিত হয়ে সুপ্রকাশ একটি অর্থহীন জবাব দিলে—বড্ড ব্যস্ত ছিলাম ক'দিন।

অরুণা যত বেশি অগ্রসর হচ্ছিল সুপ্রকাশের সাহসও সেই পরিমাণে কমে আসছিল। মনে-মনে সে বলত—কত আর একটা লোক যুদ্ধ করতে পারে।

অরুণা কঠোর স্বরে বললে—অফিস্ থেকে একটু না জিরিয়ে বেরুনো ঠিক নয়। আপনার মামীমা বললেন তা'তে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবার কথা নয়।

—আমিও তাই ভাবচি। ক'দিন থেকে আমার স্বাস্থ্যটাও তত ভালো যাচ্ছে না।

—তা'হলে আর ওরকম করে পালাবেন না যেন। কেমন, মনে থাকবে তো?

—না, না, কি যে বলেন আপনি। পালাবো কেন?

অবস্থা বিপর্যয়ে পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষকেও কখন কখন, স্ত্রীলোক নয়, শিশু বনে' যেতে হয়।

অরুণা চলে যাবার পরেই সুপ্রকাশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার (অরুণার) ভিটামিন্ খাদ্যে পুষ্টিকৃত স্থূলকায় দেহ ও অতি সাধারণ চেহারা এবং সর্ব্বোপরি তা'র অসম্ভব dull কথাবার্ত্তা তখনও যেন ঘরময় পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সুপ্রকাশের মনে হচ্ছিল যে প্রায় দু'ঘণ্টাব্যাপী অরুণার সাহচর্য্যে তার ভেতর থেকে অন্ততঃ দু'টন্ এনার্জ্জি বেরিয়ে গেছে। এমন অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা নিজেদের একান্ত অবাঞ্ছিত সাহচর্য্য দানে কতগুলো নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় লোকের মৃত্যু ঘটায়। ভদ্রতার খাতিরে তাদের

স্পষ্ট করে উঠে যেতে বলাও যায় না, অথচ ছোটখাটো ইঙ্গিতগুলোও তা'রা গ্রাহ্য করে না। তা'দের যা' বলবার আছে, অপর ব্যক্তির তা' শুনতে কোনপ্রকার আগ্রহ অথবা কৌতূহল আছে কিনা তা' সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, বক্তব্য শেষ করে' যখন তা'রা চলে যায়, তখন শ্রোতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থাটাকে মৃতপ্রায় বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না। সুপ্রকাশও একই কারণে জড় পদার্থের মত স্তূপীকৃত হয়ে চেয়ারের ওপরে পড়েছিল।

খট্ করে সুইচ্ টেপ্‌বার শব্দ হল এবং আলো জ্বলতেই মকরের মূর্ত্তি তা'র চোখে পড়ল। মকরের তৈলাক্ত মস্তকে পরিপাটীরূপে টেরি কাটা, গালে তিন দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ে একটা অতি নোংরা পাঞ্জাবি ও তার ওপরে সদ্য ধোপা-বাড়ী ফেরৎ নিখুঁত ইস্ত্রী করা একটি "ওপেন্ ব্রেষ্ট্" কোট, এবং পরণে একখানা আট হাত এক ইঞ্চি চওড়া লাল পাড় ময়লা ধূতি। অন্য সময় হ'লে মকরকে হয়ত এই অসাধারণ বেশভূষার জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হোত। কিন্তু সুপ্রকাশের এখন সেদিকে নজর দেবার সময় ছিল না। সে ভাবছিল ঠিক খুন ছাড়া এমন একটা-কিছু করা দরকার যাতে অরুণার কবল থেকে চিরকালের মত অব্যাহতি লাভ করা যায়।—বাবু, পেয়ালা টিপট্‌গুলো নিয়ে যাবে? মকর জিজ্ঞেস করলে।—দাঁড়া। আচ্ছা, বল্‌তো, একটা মেয়ের সঙ্গে তুই বেশি কথা কইতে চাস না, কিন্তু সে যদি সব সময় তোকে জ্বালাতন করে মারে, তা'হ'লে তুই কি করিস্?

—একগাল হেসে মকর উত্তর দিলে—ঝেঁটিয়ে বিদেয় করি।—আর তা' যদি সম্ভব না হয়?

ঘাড়ের এক কোণ চুলকে মকর বললে—তা'হলে বিয়ে করে ফেলি। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে মকরের কাঁধে এক প্রচণ্ড চড় বসিয়ে সুপ্রকাশ বললে—ঠিক্ বলেছিস্। আমার ধারণা ছিল বুদ্ধি সুদ্ধি তোর কিছু নেই। এখন দেখচি তা' নয়। এক মিনিট দাঁড়া একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি! চিঠিটা পাশের বাড়ীর উমাকে এক্ষুনি দিয়ে আসবি।

সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি এক টুকরা কাগজে একখানা চিঠি লিখে মকরকে পাঠিয়ে দিলে।

চিঠি পেয়ে উমা জিজ্ঞেস করলে—তোর বাবু লিখেছেন, তার এত অসুখ যে হঠাৎ মারা যাওয়াও অসম্ভব নয়। কি হয়েছে বলতো? মকর বললে—কি অসুখ, দিদিমণি, তা' তো বলতে পারবো না। তবে খুব অসুখ। তারপরে কণ্ঠস্বর আরও একটু নীচু করে—অরুণা দিদি আজও এসেছিলেন। উমা তুই ভ্রূ যতদূর সম্ভব একত্র কর' বললে—হুঁ। আচ্ছা, তুই যা। আমি যাচ্ছি।

উমা এসে দেখলে সুপ্রকাশ অস্থির ভাবে ঘরময় পাইচারি করে বেড়াচ্ছে। একটু হেসে বললে—ওটা তো কোন মারাত্মক ব্যামোর সিম্‌টম্ বলে মনে হচ্ছে না।

সুপ্রকাশ যথাসাধ্য সিরিয়াস চেহারা করে বললে—হাসির কথা নয়। তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে উমা? দয়া করে আমাকে বিয়ে করবে?

—চিঠিতে সে কথা লেখা ছিল না। তাছাড়া বল্‌তে গেলে আমি তো তোমাকে চিনিই না।

—রিসিয়াস্‌লি, উমা। পুরীতে আমার অপরাধ হয়েছিল স্বীকার করছি। কিন্তু এখন তোমার একটা কথার ওপরে আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। অরুণাকে তুমি জানো না, তাই হাসতে পারছো।

—জানি বই কি। অরুণাকে খুব ভালো করে জানি বলেই তো এত encourage করেছি।

—Encourage করেছ! ওঃ গড্, তোমরা সবাই সমান।

—তবে শেষের দিক্‌টাতে অরুণাকে আর বিশেষ উৎসাহ দেখাতে হয়নি। সুপ্রকাশ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বললে—তা'হলে কালকেই বিয়ের চিঠি ছাপিয়ে অরুণাকে একখানা পাঠিয়ে দিই, কি বল?

উমা কোন উত্তর দেবার আগেই মকর এসে বললে—বাবু, আজ একটু শীগ্‌গির করে খেয়ে নিন্। একবার যাত্রা দেখ্‌তে যাবো।

সুপ্রকাশ এক ধমক দিয়ে বললে—পালা এখান থেকে। আজ আর তোর মুখ দেখতে চাইনে।

সুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত

—o—

শেষের কবিতা

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

কী সত্য কথাই অমিত সেদিন বলেছিল, অণু! যতীকে সে বলেছিল, মনে আছে! 'আমরা ডিক্সনারিতে যে-কথার এক মানে বেঁধে দিই, মানবজীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায় সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।' মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে যত কথা আছে সেই কথারই 'হাজারখানা মানে' হয়, এই কথাটাই আজ মনে পড়চে, সত্যিই তো "মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তা'র মানে বের করতে গেলেই ধাঁধাঁ লাগে।"

শ্রাবণের সেই দিনটি তুমি ভোলোনি' নিশ্চয়! দূরে ঢেউ খেলানো সবুজ মাঠের পর মাঠ তার ওপাশে বিস্তৃত শালবন! আকাশটি সেদিন ছিল বাদল ঘেরা, বাতায়ন খুলে দিয়ে বসেছিলাম আমরা দুজন, আর সারাদিন তুমি পড়েছিলে 'শেষের কবিতা'—ওই বইখানির সঙ্গে মিশে, ওই লাবণ্যের হৃদয়বেদনার সঙ্গে মিশে সেদিনকার আকাশ বাতাস, শালবন আর শ্যামল প্রান্তর, আর তোমার আমার মধুর বেদনাময় সঙ্গ সব যে কি ভাষাময় হয়ে উঠেছিল, মনে পড়ে বন্ধু! অমন ক'রে সমস্ত জীবন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে কদাচিৎ। সেদিন ওই শেষের কবিতা শুনেচি শুধু কান দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, সমগ্র হৃদয়ের বেদনা-আবেগ দিয়ে। তুমিও পড়েছিলে কি তেমনি ক'রেই? তোমার পড়াও মাঝে মাঝে স্তব্ধ হ'য়ে এসেছিল, প্রগাঢ় অনুভূতির বিপুল আবেগে তোমারও যে চোখ বুজে গিয়েছিল আনন্দ বেদনায়, (তোমার হাতে হাতটি ছিল, সেই সুন্দর হাতটি আমার হাতের কাছে কি যে কথা বলেছিল মনে আছে তোমার?)

হায়রে মধুর স্মরণ! মধুময় মুহূর্ত্তগুলো আমাদের জীবনের কত বড় সম্পদ্, কত আনন্দের, আবার কত বেদনারই! এই ভাদ্র দিনের অবিরাম বর্ষণে তাই বইখানি নিয়ে বসেছিলাম, বইখানি আজ আত্মগোপন করেচে, সে নিয়ে এসেচে আমার কাছে সেই দিনটি যে-দিনটি জীবনে অমর হয়ে রইল, যে-দিন আর বুঝি আসবে না, যে-দিনটি মধুস্মৃতি বুঝি চিরদিনের অশ্রু নির্ঝর হয়েই রইল!

কথা বলতে বসে মন কোথায় ভেসে যায়, অনুপম! মানুষের কাছে মানুষ যে-দিন পরম সুন্দরের সাক্ষাৎ পায় সে-দিনটি কি অপূর্ব্ব রহস্যময়!

শোভনলালের কাছে লাবণ্য কবে সেই আশ্চর্য্য মুহূর্ত্তটি নিয়ে এসেছিল, কল্পনা করতে পার? যার পর থেকে শোভনের প্রাণের গোপন মন্দিরে একটি পূজারতির ধূপগন্ধ অবিরাম উত্থিত হ'তে লাগল!

কত মানুষকে আমরা প্রত্যহ আনাগোনার পথে দেখি, পণ্যশালায় বেচাকেনার মুখে দেখি, পথ চলতে চলতে পথ পাশে দেখি, তার মাঝে অকস্মাৎ একটি মানুষ কেন এমন বিশেষ হয়ে ওঠে এক জনেরই চোখে, আর তখন কেন এমন বিস্ময় লাগে ভেবে যে আর হাজারো মানুষ এই মানুষটিকে একটু বিশেষ ক'রে দেখতে পাচ্চে না।

এই বিশেষ-ক'রে দেখাটা কি, যে দেখে তারই একটি বিশেষ মুহূর্ত্তের ঔজ্জ্বল্য দিয়ে গড়া একটি বিশেষ সৃষ্টি। আমার সম্বন্ধে তোমার কথাটা মনে ক'রে ওই কথাটাই বার বার মনে এসে লাগে অণু!

জীবনের কোন্ একটি হৃদয়াবেগের মুহূর্ত্তে না জানি কোন্ অলস মধ্যাহ্নের নীরবতায় শোভনের চোখে এসে নীলাকাশের নীলিমা স্বপ্নাঞ্জন টেনে দিয়েছিল, না জানি কোন্ শরতের লঘু পবনের স্পর্শে চিত্ত তার বিধুর হয়েছিল আর না জানি লাবণ্যের ফুলবাগানের পুষ্প সুরভিতে তার চিত্ত কি অপূর্ব্ব আবেশে বিবশ হয়েছিল, তখনকার সেই

মুহূর্ত্তে লাবণ্যের নির্ম্মল যৌবন লীলায়িত তণুর তনিমা, তার স্নিগ্ধ নিবিড় চোখের দৃষ্টি তাকে পরম সুন্দরের পদপ্রান্তে নিয়ে উপনীত করেছিল!

তারপর তার সেই নীরব স্বপ্নময় পূজা চলেছিল সবার অগোচরে, হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে!

হায়রে বাইরের তৃষা! যে-রূপ হৃদয়ে পরিপূর্ণ তাকেও চাই বাইরের চোখের সামনে পেতে, সহস্র অপরিপূর্ণতা সত্ত্বেও তাকে চাই কী আগ্রহে! তাই তো অনিবার্য্য আঘাত এল শোভনের বুকে! কেনই বা সেই অযত্ন ম্লান ফটোখানির লোভ সে সম্বরণ করতে পারলে না, তার বুকের ভেতরকার চোখ দুটো কি তার লাবণ্যের রূপখানিকে কিছু কম ক'রে দেখেছিল। না, তবু আর্টিষ্ট বন্ধুর অনুগ্রহ কাম্য হ'ল।

তারপর কি নিদারুণ বঞ্চনাই না তার হৃদয়কে বিদ্ধ করল। প্রেমের কি নিষ্ঠুর অপমান! নীরব প্রকৃতি শোভন নিঃশব্দে মাথা পেতে সব স্বীকার ক'রে নিয়ে চলে গেল। ভেবেচ কী দুঃসহ মৃত্যুসাগরে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? শোভনের জীবনে চিরসুন্দর চিরদিনের মতই বিলুপ্ত হয়ে গেল! তারপর সুন্দর পথের আর কোনো বাঁকেই তাকে বিস্মিত বিমুগ্ধ করলে না; হৃদয় হ'ল মরুভূমি আর তার উষ্ণ নিঃশ্বাস হ'ল একটি চিরন্তন হাহাকার অন্তর্হিতার উদ্দেশে! শোভনের সেই চিত্রটি কখনো মনে জাগে তোমার?

কেন এমন হয় সংসারে! একজন আপনাকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে, সব উজাড় ক'রে দিয়ে ভিখারী হয়ে যায় শুধু একখানি প্রসন্ন হাসির জন্য, আর অন্যজন, যাকে এই পূজা অর্পিত হয়, সেই পূজারীর দিকে ফিরেও চায় না, তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করতে পারে না, যদিবা সেই অস্তিত্বকে অনুভব করে, সেই অস্তিত্বের প্রতি তার বিমুখতার আর অন্ত থাকে না! কেন এমন হয়?

তাই তো বলছিলাম, আমার যেন মনে হয় "বিশেষ" মানুষটি দ্রষ্টার চোখের আলোয় জন্ম নেয়, তাকে দেখবার সাধ্য ওই একটি দ্রষ্টা ছাড়া আর কারু নেই! আমি যা দেখলাম তা কি এই বিশ্বে আর কেউ দেখতে পাবে কখনও! কিন্তু বল দেখি, বন্ধু, বিশেষ অন্তরের আলোকে বিশেষ রূপটি দেখেচি বলেই সে রূপটি আমারই অন্তরের একটা সৃষ্টি—projection—এ কথা কি স্বীকার করা চলে? অনুপম কি আমার সৃষ্টি? না, আমার আবিষ্কার?

("ভরা বাদর মাহ ভাদর"—কি অঝোরেই বৃষ্টিধারা ঝরচে বন্ধু!)

কিন্তু লাবণ্যকে কে তা হ'লে সত্যি ক'রে দেখেছিল? আরেক দিনের একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে অমিত দেখলে লাবণ্যকে সেই দিনের লাবণ্যই সত্য, না শোভনের সেই চিহ্নহীন অথচ চিরস্মরণীয় দিনের লাবণ্যই সত্য? লাবণ্য শেষের কবিতা অর্ঘ্যে এই কথাটিই জানাবার চেষ্টা করেছিল অমিতকে যে অমিতর লাবণ্য অমিতরই সৃষ্টি, আর শোভন যে লাবণ্যকে দেখেচে 'ভালোমন্দে মিলায়ে সকলি' সেই যেন সত্যিকারের লাবণ্য নিজে। ও কথা লাবণ্যের বলবার দরকার কি ছিল! কে বলবে আজও অমিতর লাবণ্য শোভনলালের লাবণ্যের চোখে বেদনা ঘনদৃষ্টি বিস্তার ক'রে আকাশের পানে চেয়ে থাকে না? অমিতকে লাবণ্য কি সত্যি বিদায় দিয়েচে নিঃশেষে? লাবণ্যকে একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা যায়। এমন ভরা বাদরে সে কি ভাবে?

আচ্ছা, অণু, লাবণ্য যে অমিতকে সে-দিন বিদায় দিলে তার কারণটা কি মনে হয় তোমার? কেতকীর হীরের আংটির ধারালো আলোই লাবণ্যকে অমিতর বন্ধন থেকে মুক্ত করলে না কি? কেতকীর হীরকাঙ্গুরী যদি কেতকীর আঙুল থেকে সাত বছর পরে ব্যথিত লজ্জিত হয়ে স্খলিত হয়ে না পড়ত লাবণ্য কি তার প্রেমটিকে অমনি নিরঞ্জন থাকতে দিতে চাইত?

(শোভনের ভালোবাসা, লাবণ্যের ভালোবাসা, অমিতর ভালোবাসা…ভালোবাসা কাজাবো মানে হয়, না?)

জানি লাবণ্যের মনে বিবাহ নিয়ে একটা দ্বিধা ছিল গোড়ার দিকেই। লাবণ্যকে আশ্রয় ক'রে অমিতর কবি মন যে নব-সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়ে লাবণ্যকে কেবলি রূপে রসে অপরূপ ক'রে সাজিয়ে তুলচে তা লাবণ্য বুঝেছিল ব'লেই মনে মনে এ আশঙ্কা তার বরাবরই ছিল যে একদিন

অমিতর কবিমনকে নবসৃষ্টি প্রেরণা দেবার মত কিছু লাবণ্যের না ও থাকতে পারে; সেদিন অমিতর মনকে বিবাহের হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা চলবে না। তাই লাবণ্য প্রেমকে স্বচ্ছন্দবিহারী ক'রেই রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা কি তার নিজের মনের কথা ছিল। সে কি অমিতর মনের চঞ্চলতার শঙ্কা থেকে জাগেনি? পাছে ভুল ভেঙে যায়—'

লাবণ্য অমিতর বিশেষ-দেখাটাকে লাবণ্য সম্বন্ধে একটা ভুল দেখা ব'লেই জেনেছিল, তাই সংশয় ছিল এ ভুল ভেঙে গেলে তখন কি হ'বে? কিন্তু শোভনের দেখায় যে ভুল নেই তা লাবণ্য জানলে কি ক'রে? তার ওই দীর্ঘকালের একনিষ্ঠ তপস্যা দেখে?···কেতকীর ব্যর্থ জীবনকে দেখে অমিতর ব্যক্তি-প্রেম-নিষ্ঠার অভাবটা কি লাবণ্যর মনকে তার অজ্ঞাতসারেও একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল কোথাও?

. অমিতর প্রেমে স্থায়িত্ব নেই 'এই কথাটাকে লাবণ্য যে-ভাবে বুঝলে তাতে সে অমিতকে সাধারণভাবে বিচার করে নি।' এই অস্থায়িত্বে কেতকী দেখেছিল প্রেমের অপমান, কিন্তু লাবণ্য তা দেখেনি'। লাবণ্য গভীর বেদনা পেলে কিন্তু অমিতকে কখনো নিষ্ঠাহীন বলেনি'।

অমিত যে প্রাণে মনে কবি সেই কথাটি লাবণ্য ছাড়া কে এমন ক'রে বুঝবে? তাই ক্ষণে ক্ষণে অমিত অসীম সুন্দরকে নানারূপে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, কোথাও কিন্তু অমিত বাঁধা পড়ে না, বাঁধা পড়লেই যে কবির মৃত্যু ঘটবে! ব্যক্তিটা অমিতর কাছে একটা উপলক্ষ মাত্র, ব্যক্তিকে আশ্রয় ক'রে যে পরম সুন্দরের এক একটি অপূর্ব্ব আভা ফুটে ওঠে সেই আভায় অমিতর মন ঝিলমিলিয়ে ওঠে! ওর মন যেন একটি জলপ্রপাত, যার গায়ে আলোক প'ড়ে রামধনু হয়ে ওঠে। এই অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটাকে সে কখনো লিলি ব'লে ডাকে কখনো কেতকী, কখনো বন্যা। ও যখন দেখে সেই দেখাকে তাই কেউ সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারে না নানা কারণে। লাবণ্যকে দেখে অমিতর প্রাণে বাণীর উৎস উৎসারিত হ'ল তখন লাবণ্য অন্তরে যেন স্বীকার করতে পারলে না যে তার চোখের স্নিগ্ধ গভীর কালোর মাঝে ওই উৎস তার রসধারা পেয়েচে! অমিত লাবণ্যের মাঝে এই যে অশেষ রস-উৎস আবিষ্কার করেচে একি তার ক্ষণিকের স্বপ্ন মাত্র? কোনো নিবিড় মুহূর্ত্তের নীরবতায়, কোনো দিন গভীর মধ্য রাত্রির অতল নিস্তব্ধতার ধ্যান মুহূর্ত্তে লাবণ্য কি আপনার হৃদয়ের গভীর গোপনতায় এই অশেষ মাধুরীকে উপলব্ধি ক'রে বিস্ময়াকুল হয়নি? তবু তার মনে জাগল মিথ্যা আত্মসংশয়! মনে হ'ল তার হৃদয়ের সম্পদে অমিতর রসতৃষ্ণা মিটবে না—(কারণ কেতকীও তো একদিন এমনি করেই অমিতকে রসধারায় ডুবিয়েছিল, তারপর কেতকী পারলে না তো! কেউই অমিতকে বাঁধতে পারবে না! ও শুধু উধাও হয়ে উড়ে বেড়াবে।—লাবণ্যের মন এমনি সংশয়ে কাতর হয়েছিল হয়ত, না অনুপম?) তাই লাবণ্য—(হায় লাবণ্য!)—তার প্রেমকে নির্ম্মম ভাবে বলি দিলে! লাবণ্য অমিতকে জানিয়েচে

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েচে কর্ম্ম, আমার রয়েচে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।

অথচ এই ঘনান্ধকার ঝর্ঝর বর্ষণের মাঝখানে বসে, বাতায়ন দিয়ে ধারাস্নাত শ্যামপত্র পুষ্পবনের পানে চেয়ে চেয়ে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়চে ওই লাবণ্যেরই জন্য। আমি শোক করি লাবণ্যের জন্য। লাবণ্য কেন অত বড় ভুল করল, অনুপম?

(হায়রে, প্রশ্ন করেই নীরব হয়ে গেলাম, উত্তর এর দেবার প্রয়োজন আছে কি! জানি জানি ভুল করার কারণ নেই, নিয়তি কোনো কারণের শৃঙ্খলে বাঁধা নেই। হায়রে, কেমন ক'রে অজানিতে মানুষ নিদারুণ ভুল করে বসে: যা তার পরম সম্পদ্ তাকে কাছে পেয়েও জানতে পারে না হারিয়ে ফেলে, স্নেহের ছলে ঠেলে দেয় দূরে, তারপর দীর্ঘ জীবন তারায় তারায় শুধু খুঁজে বেড়ায় সেই না-জেনে হারিয়ে ফেলা বন্ধুকে। বন্ধু আমার!)

শোভনের ভালবাসাকে আমি চিনি! সেই ভালবাসা লাবণ্যের বাস্তব ব্যক্তিত্বকে জড়িয়ে শোভনের হৃদয়ের পরতে পরতে মিশিয়ে গেছে জানি। কিন্তু তবু শোভন লাবণ্যকে

জানে এ কথা বলব কেমন ক'রে? লাবণ্যের গভীর কালো চোখের দৃষ্টি শিলঙ পাহাড়ের সূর্য্যাস্তের পানে তাকিয়ে যেখানে হারিয়ে যায় সেখানে শোভন কি কোনোদিন পৌঁছুতে পারবে? বর্ষারাতে যখন রজনীগন্ধার গন্ধ লাবণ্যকে উতলা করবে, বাতায়ন দিয়ে মেঘান্তরাল থেকে জোৎস্না যখন লাবণ্যের মুখের ওপর এসে পড়বে আর নিঃশব্দতার একতারায় যখন অনন্ত আকাশের তারার সঙ্গীত কেঁপে কেঁপে চেতনাকে বিলীন করবে তখন লাবণ্যের হাতে কার হাতের স্পর্শটি জাগবে—শোভনের না, অমিতর? আজ রাতে লাবণ্যর চোখ কি অদৃশ্য অশ্রুতে টলটল করছে না? (লাবণ্য, তোমার এই আত্মবলির কোন্ প্রয়োজন ছিল এই জগতে? শোভনের জন্য করুণা? শূন্যকে পূর্ণ করবার শক্তি তোমার অক্ষয় থাকবে? যে তোমাকে তোমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ করেছে, তোমার প্রেমকে রূপময় করেছে, চেতনা দিয়েছে তাকে বিদায় দিয়ে তারপর একদিন কি এই তোমাকে তোমার কাছে বড় রিক্ত বড় ব্যর্থ মনে হবে না?)

আর অমিত? সেদিন সে তার দার্শনিক তত্ত্ব বোঝালে সেটা তোমার কেমন মনে হয়েছিল, অনুপম? অমন ক'রে অমিত আপনাকে ভোলাবার চেষ্টা করলেই তার মন ভুলবে? বেশ কবিত্ব ক'রেই অমিত বললে নীড়ও আছে আকাশও রইল! কেটি মিটার কেতকী হয়েছে জানি, কিন্তু ওই কি অমিতর নীড়? তারপর লাবণ্যকে আর কি অমিত খুঁজে পাবে? অমিত জীবনে অনেক লিলি গাঙ্গুলির কানে কানে তার সৌন্দর্য্যস্বপ্ন ঢেলে থাকতে পারে কিন্তু লাবণ্য তার জীবনেও কি ওই একটি বারই এল না? আর কি জীবনে প্রেমের অসীম মাধুরী এমন ক'রে কেউ জাগাতে পারবে মনে হয়? অমিতও তা ভাবতে পারে না বলেই বলেছিল লাবণ্য চিরদিনের তরেই তার মুক্ত বিহারের আকাশ হয়ে রইল। অন্তরের অলক্ষ্য লোকে যার অজিন আগমন ঘটল. যাকে পেলাম চিরদিনের তরে, যে আমার মুক্ত পথের সাথী, তাকে কি এমনি করেই অন্তর্দ্ধানের মাঝ দিয়ে প্রত্যক্ষ করা ছাড়া উপায় ছিল না? এই ক্ষুদ্র জীবন, এই নশ্বর জীবন, অনাহুত অন্ধকারের মাঝখানে এই একটুখানি আলোক দ্বীপে দু'দণ্ডের মিলন, তাকে এমন করে বিচ্ছেদের বেদনায় আচ্ছন্ন করে কোন্ সার্থকতা পেলে অমিত? লাবণ্য ভালো বেসেছিল কেতকীও ভালোবেসেছিল, কিন্তু দুটি ভালোবাসার মানে কত আলাদা—ওই দুটি ভালোবাসার বর্ণে গন্ধে স্বাদে কত বিভিন্নতা! অমিত একটি ভালবাসায় পেলে অসীম আকাশের নীলিমার স্পর্শ, মুক্ত পথের চলার ছন্দ জাগল সেই ভালোবাসার আবির্ভাবে, কিন্তু অমিত সেই মুক্তির মাঝে কি ক্লান্ত হয়ে শেষে ডানা গুটোতে চাইলে ওই নীড়ের ভালোবাসায়, গৃহের বন্ধনে? (বন্ধনে প্রাণ যখন অচিরেই হাঁপিয়ে উঠবে, অমিত, যখন আকাশের মৌন আহ্বান তোমাকে উদাস করবে তখন তুমি সেই আকাশের পথ খুঁজে পাবে তো? সেই হাতখানির কথা তোমার মনে আছে, সেই যে বলেছিলে, ভালোবাসার যতো-কিছু আদর, যতো কিছু সেবা, হৃদয়ের যতো দরদ, যতো অনির্ব্বচনীয় ভাষা, সব-যে ঐ হাতে? ওই হাতখানির পিপাসায় আর্ত্ত হ'য়ে যে-দিন তুমি ছটফট করবে সেদিন তোমার সেই পিপাসাকে কল্পনার কোন্ মায়া দিয়ে মুগ্ধ ক'রে শান্ত করবে, বলতে পারো?)

অমিত কেন এমন করে আত্মবঞ্চনা করলে, বলতো অনুপম? ধূমকেতুর মতো কেতকীর আবির্ভাব না ঘটলে কি এমনটি হ'ত? যে-অমিত সব রকমের ফ্যাসানকে চিরদিন ব্যঙ্গ করেছে উচ্চহাস্যে, সেই অমিত অকস্মাৎ শিলঙএ কেতকীদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল কেন জান? কবে সাতবছর আগে অমিত কোন্ দিনের নেশায় কেতকীকে হীরের আংটি পরিয়েছিল তারপর দীর্ঘ সাতটি বছর তার কোনো সন্ধান কোথাও ছিল অমিতর মনে? তবু কি কেতকী সাতবছর একনিষ্ঠ প্রেমসাধনা করছিল মনে কর? তারপর সেদিন শিলঙএ সেই প্রেমের জয় হ'ল? অমিতর মনে কি তার সাতবছর আগেকার ভেসে যাওয়া স্বপ্ন এবং সঙ্কল্প অকস্মাৎ লাবণ্যকে পাওয়ার লগ্নেই আবার ফিরে এল? অমিতর মন লজ্জিত হ'ল কিন্তু সেই লজ্জা কি অমিতর জীবনকে যে এমনি করেই রূপান্তরিত করল? যে-দিন অমিত রায় প্রেমের আগুনে জ্বলে উঠল সেদিনও কি সে বুঝতে পারলে না যে ওই প্রেমের সামনে দাঁড়িয়ে আর কোনো কিছুই নেই, থাকতে পারে না—কেতকীও না?......

পুরাণো কাগজের দোকানে মেয়েলি হাতের বড় বড় অক্ষরে লেখা একগুচ্ছ গোলাপী চিঠির কাগজের দিকে সেদিন অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়ল। শেষের দিকে হয়ত আরো কি সেই অজানা মেয়েটি লিখেছিল অনুপমকে, অনেক খুঁজেও গোলাপী চিঠির কাগজ সেই স্তূপে আর পাওয়া গেল না। হ'তে পারে বাদলরাতে তার লেখা ওখানেই এসে থেমে গিয়েছিল—(ঘুমের ক্লান্তিতে, না, কোনো গোপন বেদনায় যার ইঙ্গিত মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে ওর লেখার ফাঁকে ফাঁকে?)

মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

—o—

স্নেহের ডাক

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

১

ভৈরবের উর্মিবহুল জলের স্রোতে প্রভাত সূর্য্যের আলোকধারা অজয়ের বালকচিত্তকে আকৃষ্ট করিল। পড়া তাহার শেষ হইয়াছিল। সাদাখাতার পৃষ্ঠে ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁকিবার পর তাহার দৃষ্টি বাতায়ন পথে ভৈরবের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। বাবার কাছে সকালবেলা প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ সে দিয়াছে। বালকের চিত্ত খেলার সঙ্গীর অভাবে বহমান ভৈরবের উচ্ছল জলরাশির উপর আকৃষ্ট হইল। ভৈরব তাহার নিত্য সহচর। তাহার কূলে কূলে সে বাবার সঙ্গে প্রত্যহ বেড়াইতে বাহির হয়, পাড়ের উপর আপন মনে দৌড়াদৌড়ি করে—বাবা অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিয়া থাকেন। ওপারের সবুজগাছপালার ছবি তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া অনেক সময় তাহাকে যেন হাতছানি দিয়া আহ্বান করিয়া থাকে।

ভৈরবের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বালক অজয় যেন নিবিষ্ট হইয়া গেল। অন্য সঙ্গী তাহার কেহ নাই। সে তাহার বাবার সঙ্গে খেলা করে, মার সঙ্গে অবসর কালে বসিয়া বসিয়া গল্প শুনে। এতদিন সে স্কুলে যায় নাই। বাবার কাছেই বাড়ীতে থাকিয়া সে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি নিজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ। গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী সহরের কলেজে তিনি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক।

ভৈরব কলোচ্ছ্বাসে বহিয়া চলিয়াছে। কি সুন্দর তাহার শোভা। বালক বুঝি ভাবিতেছিল, এই জলরাশি কোথায় চলিয়াছে, সমুদ্রে? পরপারের গাছের সারি যেন একটা সমান্তরাল রেখার মত দাঁড়াইয়া। উহার অন্তরালে কত গ্রাম, কত নগর রহিয়াছে। রেলে চড়িয়া সে যখন তাহার দাদুর সহিত গিয়াছিল, ঐ সকল গ্রাম ও নগর পার হইয়া রেলগাড়ী ছুটিয়াছিল।

দাদুর কথা মনে হইতেই বালকের প্রাণে যেন একটা আকুলতা জাগিয়া উঠিল। দাদুর সৌম্য, সুন্দর হাস্য-প্রফুল্ল মূর্ত্তি তাহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। দাদু তাহাকে কত ভাল বাসেন, কত আদর করেন, কত জিনিষ দেন! দাদুর বুকে চড়িয়া, দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিবার প্রবল বাসনা তাহাকে যেন অধীর করিয়া তুলিল।

কয়মাস আগে সে দাদুর কাছেই ছিল। তিনিও তাহার বাবার মত তাহাকে পড়াইতেন, সঙ্গে করিয়া বেড়াইতেন। এক শয্যায় না শুইলে তাহার নিদ্রা হইত না—দাদুর সঙ্গে বসিয়া একপাতে আহার না করিলে তাহার ক্ষুধার তৃপ্তি হইত না।

বালকের মনে পুরাতন কথাগুলি মনে পড়ায় সে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারিল না। দাদুকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ওপারে রেলগাড়ীতে চড়িয়া বসিলে দাদুর কাছে যাওয়া যায়। তাঁহাকে সে দুইমাস দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে একপাতে বসিয়া আহারের আনন্দ হইতে সে কতদিন বঞ্চিত হইয়া আছে। দিদিমণি ও দাদু তাহাকে কোল হইতে নামাইতে চাহেন না। সে এখন বড় হইয়াছে, কত বই পড়ে, তবু যেন সে ছোট খোকাটির মত তাঁহাদের কোলে, বুকে চড়িয়া বেড়াইতে ভালবাসে।

বাবা তাহাকে ভালবাসেন, মা কত আদর করেন কিন্তু দাদু? সে যেন আর এক রকমের স্নেহ। তাহার পড়ার কোন বইয়ে সে এমন জিনিষ এখনও পড়ে নাই। তাহার সামান্য আবদার দাদুর কাছে যেন অলঙ্ঘ্য আদেশ।

বালক বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। দাদু তাহাকে পত্র লিখিবার জন্য অনেক টিকিট খাম, চিঠির কাগজ দিয়াছেন। সে গত সপ্তাহেও তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছে,

উত্তরও পাইয়াছে। দাদুকে দেখিবার জন্য তাহার মন এত আকুল হইয়া উঠিতেছে কেন?

চাই, দাদুকে চাই! নহিলে তাহার মন শান্ত হইবে না।

সে কাগজ কলম বাহির করিয়া পত্র লিখিতে বসিল। লেখা শেষ হইলে সে খামে ঠিকানা লিখিয়া উহা ডাকে দিবার জন্য বাহির হইল। তাহাদের বাড়ীর কাছেই ডাকঘর। তাহার বাবার চেষ্টায় এই ছোট ডাকঘরটুকুর ব্যবস্থা হইয়াছে।

অজয় একদৌড়ে চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে মার কাছে চলিয়া গেল। চিঠির কথা কাহাকেও বলিল না।

২

"ওগো শুনে যাও!"

স্বামীর আহ্বানে অন্নপূর্ণা দেবী তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গড়গড়ার নল হইতে মুখ তুলিয়া সহাস্য বদনে রামতারণ বলিলেন, "অজয় চিঠি লিখেছে।"

অন্নপূর্ণার মুখমণ্ডল সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি কৌতুহলভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কি লিখেছে?"

"পড়ে দেখ" বলিয়া রামতারণ গৃহিণীর হস্তে দৌহিত্রের সংক্ষিপ্ত পত্র প্রদান করিলেন।

অন্নপূর্ণা পড়িলেন,

শ্রীচরণ কমলেষু,

দাদু, তোমার জন্য মন কেমন করিতেছে—কিছু ভাল লাগিতেছে না। তুমি এস। তোমাকে শীঘ্র দেখিতে চাই। তুমি এস, দাদু, তুমি এস।

প্রণত

অজয়

সংক্ষিপ্ত পত্রখানির মধ্যে বালকের হৃদয়ের ব্যাকুল আহ্বান অন্নপূর্ণার হৃদয়ও স্পর্শ করিল। অনেকগুলি সন্তানকে একে একে হারাইয়া অবশেষে কমলা তাঁহাদের গৃহের অন্ধকার, মনের নিরানন্দ হরণ করিয়াছিল। এই একমাত্র কন্যাকে কেন্দ্র করিয়া দম্পতির যৌবনের অপরাহ্নকাল অনেক আশার স্বপ্ন-মাধুর্য্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পিতামাতার জীবনের অবলম্বন স্বরূপ কমলাকে তাঁহারা বাড়ীতে সযত্নে লেখাপড়া শিল্পকলা শিক্ষা দিয়া পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তাহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতা শান্তিপ্রিয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া এম্ এ পাশ করেন। দেশের কলেজে অধ্যাপকতা গ্রহণ করিয়া শান্তিপ্রিয় পৈতৃক জমিদারীরও তত্ত্বাবধান করিতেন। কুলে শীলে, চরিত্র-মাধুর্য্য পাণ্ডিত্য ও ঐশ্বর্য্যে তাঁহারা ঈপ্সিত জামাতাই লাভ করিয়াছিলেন। রামতারণের সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য এবং জমিদারীর কন্যাই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। গৃহে শ্বশুর শাশুড়ী না থাকায় কমলা অনেক সময় পিতৃগৃহে বাস করিত। শান্তিপ্রিয় তাহাতে আদৌ আপত্তি করিতেন না। কারণ, তিনি জানিতেন প্রৌঢ় শ্বশুর শাশুড়ীর আর কোনও অবলম্বন নাই; কন্যা তাঁহাদের বক্ষের পঞ্জরাস্থি অপেক্ষাও প্রিয়। কাজেই বৎসরের অধিকাংশ কমলা পিতৃগৃহে কাটাইত।

অজয়ের জন্মগ্রহণের পর রামতারণ ও অন্নপূর্ণা কন্যাকে চার বৎসরের মধ্যে শান্তিপ্রিয়ের কাছে যাইতে দেন নাই। পিণ্ডদাতা দৌহিত্র, বন্ধনের উপর তাঁহাদের প্রাণে বন্ধন-পাশকে দৃঢ় করিয়া দিয়াছিল। তাহাকে ছাড়িয়া থাকা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। পাঁচ বৎসরে হাতে খড়ি দিয়া অজয়ের জন্য মাষ্টার রাখিয়া রামতারণ স্বয়ং তাহার পড়াশুনার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি নিজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কাজেই দৌহিত্রের পড়াশুনা ও রীতিনীতি চরিত্র গড়িয়া তুলিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। বাড়ীতে পড়াশুনা এত দ্রুতগতিতে চলিতেছিল যে, অল্পবয়সেই সে অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক সমূহ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

জীবনসূর্য্য অপরাহ্নের আকাশে ঢলিয়া পড়িতেছিল। অন্নপূর্ণা দেবীর আগ্রহাতিশয্যে রামতারণ তীর্থ পর্য্যটনের ব্যবস্থা করিয়া কন্যা দৌহিত্রকে শান্তিপ্রিয়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আশ্বিন হইতে তীর্থ পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের যাবতীয় প্রসিদ্ধ তীর্থ দর্শন করিয়া ফাল্গুনের প্রথমে দেশে ফিরিয়াই কন্যা-দৌহিত্র-দর্শন ব্যাকুল চিত্তকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রামতারণ সস্ত্রীক জামাতৃ-গৃহে দুই সপ্তাহ অবস্থান করিয়াছিলেন।

তারপর মাসাধিকাল অজয়ের সহিত দেখা নাই। বিষয় কর্ম্মকে শৃঙ্খলাচালিত করিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। সহধর্ম্মিণী পুনরায় তীর্থভ্রমণে উত্তরভারত দর্শনের তাগিদ দিতেছিলেন, কাজেই সকল কার্য্য সুপরিচালিত করিবার চাপে প্রিয়জনদর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। অজয় একমনে তাহার পিতার নিকট লেখাপড়া শিখিতেছে, সুতরাং সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন রামতারণের স্নেহদুর্ব্বল চিত্তও অনুমোদন করিতে পারে নাই।

আজ দাদু ভাই স্বয়ং তাঁহাকে ব্যাকুলভাবে আহ্বান করিয়াছে। রামতারণের সমগ্রচিত্ত যেন পাখা মেলিয়া এখনই তাহার কাছে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অন্নপূর্ণা তাঁহার অন্তরের অভিলাষের পরিচয় পাইলেন। তাঁহারও চিত্ত দৌহিত্রকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল।

স্বামীর হাতে চিঠিখানি ফিরাইয়া দিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "যাবে নাকি ?"

রামতারণ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন। লেখাটা শেষ করিয়া পত্নীকে বলিলেন, "দুটো টাকা বের করে দাও ত।"

পত্নীর প্রশ্নের উত্তর তখনও তিনি দেন নাই।

টাকা দুইটি লইয়া তিনি ডাকিলেন, "নিতাই !"

পুরাতন ভৃত্য কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই, রামতারণ একখানি লিখিত কাগজ তুলিয়া লইয়া টাকা ও কাগজ ভৃত্যের হাতে দিয়া বলিলেন, "এখুনি ডাকঘরে যাও।"

তারপর পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দাদুর ডাক—না গিয়ে পারি কি ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমাকে নিয়ে চল।"

রামতারণ কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে থাকিয়া বলিলেন, "তুমি যাবে ? কিন্তু আমি বলি এখন থাক্। আমি কালই ফিরে আস্‌বো। থাক্‌বার যে উপায় নেই। বৈশাখের শেষে—আর দিন কুড়িক পরে আবার ত বেরিয়ে পড়তে হবে। সেই সময় দু'জনে হপ্তাখানেক কমলার ওখানে থেকে বেরিয়ে পড়া যাবে। কি বল, সেই ভাল হবে না ?"

অন্নপূর্ণা বুদ্ধিমতী। স্বামীর উক্তির মধ্যে যুক্তির সন্ধান তিনি পাইলেন। বিষয় কর্ম্মের ব্যবস্থার সঙ্গে, গৃহস্থালীর বন্দোবস্তও ত উপেক্ষণীয় নহে। সব গুছাইতে তাঁহারও কম সময় লাগিবে না। সেই ভাল।

"তুমি কোন গাড়ীতে যাবে ?"

রামতারণ বলিলেন, "দুটার গাড়ীই ভাল। ঠিক সন্ধ্যায় পৌছান যাবে। ওখান থেকে নৌকায় একঘণ্টার বেশীত লাগ্‌বে না।"

"তবে খাবে এস। এখন এগারটা বাজে। খাওয়ার পর খানিক বিশ্রাম ত দরকার।"

রামতারণ পত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আহারার্থ গমন করিলেন।

৩

কমলা সূচের সাহায্যে বস্ত্রের উপর যশোদা-দুলালের মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতে ব্যস্ত ছিল। অদূরে অজয় বসিয়া বসিয়া সুর করিয়া "টুকটুকে রামায়ণ" পাঠ করিতেছিল। মাঝে মাঝে কমলা অন্যমনা হইয়া সূচের কাজ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেছিল।

অজয়—তাহাদের আদরের ধন, বংশের দুলাল—নয় বৎসরে পড়িয়াছে। তাহার দোসর কেহ হয় নাই। এই বয়সে পড়াশুনায় তাহার যেরূপ আগ্রহ ও যত্ন, তাহাতে এই একটি সন্তানই বংশ গৌরব রক্ষা করিতে পারিবে—পিতৃমাতৃ কুল উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। কমলা নিজেই রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী গল্পচ্ছলে পুত্রকে শিখাইয়াছে। বালক অজয় রাম লক্ষ্মণের এমনই ভক্ত যে, সময় পাইলেই সে রামায়ণ কথা পুনঃ পুনঃ পাঠ করে।

এ বিষয়ে অজয় কমলার পিতার, দাদামহাশয়ের মনোবৃত্তি পাইয়াছে। কমলা জানে বাবা তাহাকে হিন্দুর আদর্শজীবন যাত্রা সম্বন্ধে কিরূপ যত্নসহকারে শিক্ষা দিয়াছেন। হিন্দু সভ্যতার গৌরব,—হিন্দুর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম বিকাশ সম্বন্ধে প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জনের জন্য পিতার উপদেশ সে কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে না। সে হিন্দু কন্যা, হিন্দু গৃহিণী, হিন্দু জননী ইহা শিক্ষা দিবার জন্য পিতৃহৃদয়ের প্রয়াস, তাহার সমগ্র চিত্তকে প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে।

মধ্যাহ্নের সূর্য্য সায়াহ্নের আকাশে ঢলিয়া পড়িতেছিল।

"শুনেছ, অজয়ের দাদু আসছেন!"

কমলা উজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। সম্ভবতঃ কথাটা সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কোনও সংবাদ নাই, হঠাৎ তিনি আসিতেছেন, ইহা কি সত্যই বিশ্বাস-যোগ্য?

পত্নীর নয়নে সন্দেহ ও বিস্ময় দৃষ্টি দেখিয়া শান্তিপ্রিয় নিকটে আসিয়া টেলিগ্রামখানি কমলার হস্তে অর্পণ করিলেন।

"বিশ্বাস হচ্ছে না? পড়ে দেখ।"

কমলা পড়িয়া দেখিল। ইংরাজীতে লেখা আছে—"আজ সন্ধ্যায় আমি যাইতেছি।"

পিতার আদরিণী কন্যার বুকের মধ্যে অকস্মাৎ আনন্দ-শিহরণ জাগিয়া উঠিল। বাবা আসিতেছেন!

হাতের কাজ পড়িয়া রহিল। কমলা উঠিয়া দাঁড়াইতেই পুত্র অজয়ের ক্ষুদ্র বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

"মা, সত্যি দাদু আস্‌ছেন?"

পুত্রের দিকে চাহিয়া পিতা ও মাতার দৃষ্টিতে আনন্দ ও স্নেহ যেন ছলছল করিয়া উঠিল। উভয়েই জানিত অজয়ের সমগ্র অন্তর তাহার দাদুর চিন্তায় পূর্ণ হইয়া থাকে। ইদানীং দাদুকে ছাড়িয়া থাকিতে হইতেছে বলিয়া অজয়ের কল্পনাপ্রবণ ক্ষুদ্র হৃদয় কতখানি দুঃখ ও অভাব অনুভব করে, তাহা শান্তিপ্রিয় ও কমলার অগোচর ছিল না।

কমলা দুই হাতে অজয়ের মুখমণ্ডল তুলিয়া ধরিয়া হাস্য-প্রসন্নকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, বাবা আজ আসছেন।"

অজয় খুসিতে পূর্ণ হইয়া বলিল, "জান মা, আমি দাদুকে চিঠি দিয়েছি। তাই দাদু আস্‌ছেন।"

কমলা বলিয়া উঠিল, "ওরে দুষ্টু, তাই নাকি?"

"হাঁ মা, ক'দিন ধরে দাদুকে দেখবার জন্য মন কেমন করছিল। তাই তোমাদের না জানিয়েই দাদুকে আস্‌বার জন্য লিখেছিলুম।"

বালক মার হাত হইতে টেলিগ্রামখানা লইয়া নিজেই পড়িতে লাগিল।

শান্তিপ্রিয় বলিলেন, "ভজহরিকে ডেকে বলে দেই, আমার পানসীখানা নিয়ে ষ্টেশন ঘাটে চলে যাক্। ওরে অজয়, তোর দাদুকে আজ কি খাওয়াতে চাস্ বলত?"

অজয় বলিল, "দাদু কি ভালবাসেন, মা তা ভাল জানেন। না, মা?"

কমলা হাসিতে লাগিল। হাঁ, আজ বাবার কতকগুলি প্রিয়খাদ্য সে নিজের হাতেই প্রস্তুত করিবে। আর সময় নাই, এখনই রান্নাঘরে না গেলে চলিবে না।

সীবন যন্ত্রাদি তুলিয়া রাখিয়া উৎসাহ ভরে কমলা সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শান্তিপ্রিয়, শ্বশুর মহাশয়ের আনিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

অজয় কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। কয়ঘণ্টা কোনও মতে কাটাইতে পারিলেই সে তাহার দাদুর প্রশান্ত ও প্রশস্ত বক্ষের মাঝে আপনাকে লুকাইতে পারে। দাদুর মুখের চুমা—আঃ, সে কি মিষ্টি, কি মধুর!

৪

দূরে, পশ্চিম দিকচক্রবালে ও কি মেঘেরই রেখা?

দ্বিতলের বাতায়ন পথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া শান্তিপ্রিয় যেন কিছু উন্মনা হইলেন। ভজহরি তাঁহার দ্রুতগামী পান্‌সী লইয়া ওপারে ঠিক সময়েই গিয়াছে। এখনও ট্রেন আসিতে কি কিছু বিলম্ব আছে?

শান্তিপ্রিয় দেখিলেন, অজয় আর একটি বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভৈরবের জলোচ্ছ্বাস দেখিতেছে। সে তাহার দাদুর আসন্ন আগমন সম্ভাবনায় বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে চঞ্চলতা দমন করিয়া অজয় জানালা ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না। নদীবক্ষে পানসী যখন তাহার দাদুকে বহন করিয়া আনিবে, সে দৃশ্য অজয় এড়াইতে চাহে না।

অকস্মাৎ শান্তিপ্রিয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অপরাহ্নের আকাশ সহসা মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া তাঁহার মন শঙ্কায় দুলিয়া উঠিল।

এ বৎসর কালবৈশাখী এ পর্যন্ত দেখা দেয় নাই। আজ যেন সে রুদ্র নৃত্যে আবির্ভূত হইবার আয়োজন করিতেছে। ভৈরবের জলে মৃদুতরঙ্গেরও বিক্ষোভ যেন স্তব্ধ—জলরাশি যেন

স্থির, নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। মেঘের কালো ছায়া ভৈরবের বুকে পড়িয়া যেন বিরাট গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে।

কমলা তাড়াতাড়ি স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে কথা নাই। সেও আকাশের দিকে চাহিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

কালোছায়াকে আরও তিমির বর্ণে গাঢ় করিয়া মেঘের দল উন্মাদবেগে আকাশে ছুটিয়া চলিল। অতিকায় দৈত্য হুঙ্কার ছাড়িয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া প্রচণ্ডঝটিকা ভৈরবের বুকে ফেনপুষ্পের মালা বিছাইয়া দিয়া রুদ্রতালে নাচিয়া উঠিল।

সে কি ভীষণ হুঙ্কার, সে কি ভীম গর্জ্জন! সঞ্চিত-শক্তি প্রয়োগ করিয়া মৃত্যুর বার্ত্তা লইয়া কালবৈশাখী নৃত্য করিতে লাগিল।

জানালা দরজা সব তাড়াতাড়ি বন্ধ করিবার জন্য ভৃত্য-পরিজন ব্যস্ত হইল। সুবৃহৎ অট্টালিকা ঝটিকার প্রমত্ত বেগে যেন কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। দিকে দিকে মড়মড় করিয়া বড় বড় গাছ মুহূর্ত্তে ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

কমলা ভূমিতলে বসিয়া পড়িয়া নিমীলিত নেত্রে ভগবানের চরণে আকুল প্রার্থনা জানাইল, তাহার পিতা যেন আজ না আসেন।

যদি তিনি সন্ধ্যার গাড়ীতে আসিয়া থাকেন, তবে এতক্ষণ—

কমলা আর চিন্তা করিতে পারিল না। হে দয়াল ঠাকুর! বাবাকে রক্ষা কর। তিনি যেন নৌকায় না উঠিয়া থাকেন। কমলা শত উপচারে ঠাকুরের পূজা দিবে, আজ যেন তাহার পিতা নৌকায় না উঠিয়া ষ্টেশনেই অপেক্ষা করেন।

কমলার অশ্রুসিক্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া শান্তপ্রিয় অস্থিরচিত্তে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে পূর্ব্ব দিকের বারাণ্ডায় বাহির হইয়া প্রকৃতির সংহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিলেন।

অজয় তখন কাঠ হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার ক্ষুদ্র অন্তরে যে ভীষণ, মূর্ত্তিহীন শঙ্কা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রকাশের ভাষাও যেন ভয় পাইয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রলয় ঝটিকার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিধারার শব্দ, বজ্রের গর্জ্জন তড়িৎ-রসনার নিষ্ঠুর, নির্ম্মম অট্টহাস্য অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। রুদ্রদেবতা যেন সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন।

শান্তিপ্রিয় অস্থির চরণে নীচে নামিয়া গেলেন। কাল বৈশাখীর এমন সংহারিণী মূর্ত্তি তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই।

নদীতীরের শাখাবহুল পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষটি প্রচণ্ডশব্দে ভূপতিত হইল। ভৈরব যেন আজ কাল, ভৈরবের জটাজাল উড়াইয়া নৃত্য করিতেছিল। মেঘের উপর মেঘ কি শুধু মৃত্যুরবার্ত্তা বহন করিয়াই ছুটিয়া চলিয়াছে? ক্রুদ্ধ দেবতার উদ্দাম প্রলয়-নর্ত্তন কি আজই পৃথিবীর অন্তিম দিনের বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া চলিয়াছে?

শান্তিপ্রিয় আবার দ্বিতলে উঠিলেন। অজয় তাহার জননীর গললগ্ন হইয়া বসিয়া আছে। কমলা তাহাকে আশ্বাস দিতে দিতে শতবার অঞ্চল দ্বারা অশ্রু মুছিতেছিল।

স্বামীকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অজয়ও মাতাকে ছাড়িয়া দিয়া বাবার কাছে ছুটিয়া আসিল।

"বাবা, বাবা, দাদু কি নৌকায় উঠেছেন?"

পুত্রকে বুকের কাছে তুলিয়া লইয়া শান্তিপ্রিয় বলিলেন, "বোধ হয়, তিনি ঝড়ের আগে ট্রেন থেকে নামেন নি।"

কিন্তু এ আশ্বাস কি আন্তরিক? ঝড় উঠিবার অন্ততঃ পনের মিনিট আগে তাঁহার নৌকা ছাড়িয়া দিবার কথা। তখনও মেঘের রেখা দিগন্ত ছাড়াইয়া দেখা দেয় নাই। শ্বশুর মহাশয়ের প্রকৃতি তিনি ভাল করিয়াই জানেন। অনাগত আশঙ্কার দুর্ভাবনায় তিনি কোন আরব্ধ কার্য্যকে স্থগিত রাখিতে অভ্যস্ত নহেন।

পিতার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া অজয় তখনও ফোঁপাইতেছিল। শান্তিপ্রিয় পত্নীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নীরবে তাহার স্কন্ধদেশে একখানি হাত রাখিলেন। কথা কহিয়া নীরবতা ভঙ্গ করিবার প্রবৃত্তিও তখন তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

এ প্রলয় ঝটিকা কি থামিবে না?

কালবৈশাখীর আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তিরোভাবও তেমনই। মেঘ ও বৃষ্টি মুছিয়া লইয়া নির্ম্মল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিয়া উঠিল।

শান্তিপ্রিয় লণ্ঠন ও মশালসহ কয়েকজন ভৃত্যকে লইয়া নদীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন। ভৈরবের সে রুদ্রমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, শুধু জলরাশির তরঙ্গোচ্ছ্বাস তখনও সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হয় নাই।

তীরের কাছে আসিতেই মনে হইল জলরাশি ঠেলিয়া ঠেলিয়া ঘাটের কাছে যেন এক মনুষ্যমূর্ত্তি অতিকষ্টে অগ্রসর হইতেছে। শান্তিপ্রিয়ের আদেশে দুইজন পরিচারক জলে নামিয়া লোকটিকে সাহায্য করিতে গেল।

তীরে আসিলে শান্তিপ্রিয় দেখিলেন, সে তাঁহারই পানসীর মাঝি, ভজহরি। সে তখন হাঁপাইতেছিল। সন্তরণে ভজহরির সুনাম ছিল। বলিষ্ঠদেহ মাঝি তীরে আসিয়াই শুইয়া পড়িল।

শান্তিপ্রিয়ের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিতে পারিলেন, নৌকা সে কোনমতেই রক্ষা করিতে পারে নাই। কর্ত্তাবাবু ও তিনজন দাঁড়ী কোনদিকে ভাসিয়া গিয়াছে তাহা সে জানে না। কর্ত্তাবাবুকে কাছে রাখিবার সে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ভীষণ অন্ধকার এবং প্রচণ্ড ঝটিকার আক্রমণে সে নিজেই এমন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল যে—

আর কিছু শুনিবার ধৈর্য্য শান্তিপ্রিয়ের ছিল না। তিনি হুকুম দিলেন, তাঁহার গ্রামের সমুদয় জানুক প্রজাকে নৌকা লইয়া এখনই আসিতে হইবে।

অত্যল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। খাড়ির মধ্যে জেলে ডিঙ্গীগুলি বাঁধা ছিল। দশ মিনিটের মধ্যে ভৈরবের বক্ষে ৩০।৩৫ খানি জেলে ডিঙ্গি জলমগ্ন ব্যক্তিগণের উদ্ধারের জন্য ধাবিত হইল।

শান্তিপ্রিয় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "অজয়ের দাদুকে যে নিয়ে আসতে পারবে পাঁচশ' টাকা তার পুরস্কার।"

জমিদারকে প্রজারা প্রাণ দিয়া পূজা করিত। অজয় তাহাদের নয়নের মণি। খোকাবাবুর দাদুর মধুর সদয় ব্যবহার তাহারাও ভুলে নাই। নদীর দুইদিকে নৌকার দল বিভক্ত হইয়া তীর বেগে ছুটিয়া চলিল একখানি জেলেডিঙ্গীতে শান্তিপ্রিয় স্বয়ং চড়িয়া বসিলেন।

মশাল জ্বালিয়া বিশজন লোক দুই দলে বিভক্ত হইয়া তীরের পথে দৌড়াইতে লাগিল।

জ্যোৎস্নালোকে ভৈরবের বক্ষ সমুদ্ভাসিত—যতদূর দৃষ্টি চলে প্রকৃতি যেন লাজনম্রা। কে বলিবে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রকৃতি সংহারিণী-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিল—ভৈরব রণোন্মাদনায় অধীর হইয়া সগর্জ্জনে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়াছিল!

জেলে ডিঙ্গিগুলি দ্রুত লঘুহস্তের ক্ষেপনী সাহায্যে অধীর আগ্রহে ছুটিতেছিল। প্রত্যেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চন্দ্রকরোজ্জ্বল জলরাশির উপর নিক্ষিপ্ত।

ওখানে অদূরে জলের স্রোতে কি যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। শান্তিপ্রিয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। জেলে ডিঙ্গি দ্রুত ভাসমান বস্তুর দিকে ছুটিয়া গেল।

"রঘু, ধর্ ধর্—ঝাঁপিয়ে পড়!"

যুবক সন্তরণপটু রঘু দাঁড় ছাড়িয়া প্রভুর আদেশে ভৈরব বক্ষে ঝাঁপ দিয়া উদ্দিষ্ট বস্তুর সম্মুখীন হইল। হাঁ, মানুষই ত!

ধরাধরি করিয়া সকলে মিলিয়া জেলে ডিঙ্গির উপর একটি দেহ উত্তোলিত করিল। পরিপূর্ণ, সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে জলমগ্ন মনুষ্যমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া শান্তিপ্রিয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

* * * *

প্রতীক্ষাক্লান্ত অজয় ঘরের মেঝের উপর লুটাইতেছিল। ক্লান্তি ও চিন্তাহারিণী নিদ্রা তাহার দেহ ও মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। বালকের নয়ন কোণে অশ্রুরেখা তখনও শুকাইয়া যায় নাই।

কমলা অস্থিরচিত্তে ঘর ও বারাণ্ডা করিয়া বেড়াইতেছিল। মধ্যরাত্রি আসন্ন, কই এখনও ত কোন সংবাদই নাই! তাহার বাবা কি তবে আজিকার ট্রেনে আসেন নাই?

বৃহৎপুরী নিস্তব্ধ প্রায়। আমলা, গোমস্তা, চাকর—সকলেই কি নিদ্রিত? কাহারও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না ত! স্বামীই বা কোথায় গেলেন? পিতার সন্ধানে কি

এই রাত্রিতে তিনি নৌকা করিয়া ওপারে ষ্টেশনের দিকে গিয়াছেন ?

কমলার সমস্ত অন্তর যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছিল। চোথ ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। অনেক সে কাঁদিয়াছে—তথাপি ক্রন্দনের বেগ পুনঃ পুনঃ তাহার বুকের মধ্যে পীড়া দিতেছিল। পাছে বাবার অমঙ্গল ঘটে এই আশঙ্কায় সে যথাসাধ্য ক্রন্দন-বেগকে সংবরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল।

বাতায়ন তখন উন্মুক্তই ছিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া সে ভৈরবের প্রশান্ত চন্দ্রকরোজ্জ্বল শোভার দিকে চাহিয়া রহিল। মাঝে মাঝে সে সন্তানের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছিল। ব্যগ্র-প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া অজয় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সে সন্ধ্যার পর কোন আহার্য্য গ্রহণ করে নাই। দাদুর সহিত একপাতে সে আহার করিবে মাকে সে কথা জানাইয়া দিয়াছিল।

কমলা বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিল।

সহসা কাহার স্পর্শে সে ফিরিয়া চাহিল। স্বামী কখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া-ছিলেন। তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই।

স্বামীর রুক্ষকেশ, নয়নে অস্বাভাবিক দীপ্তি এবং সিক্ত বেশ দেখিয়া কমলা চমকিয়া উঠিল। সে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল।

বহির্বাটীতে যেন শত মানবকণ্ঠের শব্দ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। কমলা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, কি হয়েছে, তুমি অমন করছ কেন ?"

কমলার চীৎকারে অজয় জাগিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে পিতামাতার দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, "দাদু ? দাদু কোথায়, বাবা ?"

দৃঢ়চেতা, পরম সহিষ্ণু শান্তিপ্রিয় আত্মগোপন করিতে পারিলেন না। তিনি উদ্গত অশ্রুধারা গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন।

বাহিরে মনুষ্যকণ্ঠের শব্দ ক্রমেই উচ্চতর হইতেছিল।

কমলা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল। অজয়ও মাতার অনুসরণ করিল।

শান্তিপ্রিয় বাধা দিতে পারিলেন না। তিনিও স্খলিত-গতিতে নীচে নামিয়া গেলেন।

বহির্দ্বারে আসিয়া কমলা দেখিল শত মশালের আলোকে প্রদীপ্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ভূমিতলে এক দীর্ঘদেহ মনুষ্যমূর্ত্তি শায়িত। তাঁহার গায়ে গরদের কোট, আর্দ্র কর্দ্দমাক্ত।

সে পরিচিত মূর্ত্তি কাহার, কমলার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় দ্বারপ্রান্তে সে লুটাইয়া পড়িল। শান্তিপ্রিয় তাহাকে ধরিবার অবকাশও পাইলেন না।

নক্ষত্রবেগে অজয় দুইহাতে লোক সরাইয়া উন্মত্তের ন্যায় ভূশায়িত ব্যক্তির বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া হৃদয়ভেদী কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"দাদু! আমার দাদু!"

জনতা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ বাধা দিতে পারিল না। গ্রামের বিজ্ঞ চিকিৎসক পরীক্ষা শেষ করিয়া স্তব্ধভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিলেন।

জীবনের পরপার হইতে সে আহ্বান, সে শিশুহৃদয়ের স্নেহের ডাক, তাহার দাদু শুনিতে পাইতেছিলেন কিনা—কে জানে ?

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
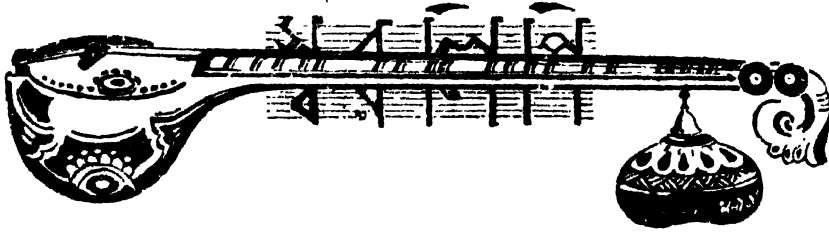
যমুনা কূলে মুরলী মধুর কেন বাজিল।
মাধব নিকুঞ্জ-চারী শ্যাম বুঝি আসে,
কদম তমাল নব পল্লবে সাজিল।
ময়ূর মাধবী তলে, পেখম খোলে
ব্যাকুল গোপবালা শুনিয়া সে তান—
যুগ যুগ ধরি যেন শ্যাম বাঁশরী বাজায় গো—
বাঁশীতে শ্যাম মোরে যাচিল॥

কথা ও সুর—কাজী নজরুল্ ইস্‌লাম স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশ কুমার দত্তগুপ্ত.

পাহাড়ী (ঠুংরী)—তেতালা

০ ১ + ৩

গা মা ‖ গা -মা -পা -ধা । -পধা -র্রা র্সা র্সা । -া -া নর্সা নর্সর্রা । র্সণা ধা -পা মা ।
য মু না • • • • • • কূ লে • • মু • র • • লী • • ম

মপা -ধা -পা মা । -মগা -রসা সা রা । মা -া -া -া । মা -া -া -া ।
ধু • • • র • • • • কে ন বা • • জি ল • • •

মা মা গামা রা । রা রাগ সা সা । সরা সা ণ্া ণ্া । ধ্া -া প্া -া ।
মা ধ ব নি কু ঞ্জ চা রী শ্যা • ম বু ঝি আ • সে •

প্া ধ্া সা রা । গা গা গা গা । মা ধা পা মগরসরা । মা মা গা, মা ‖
ক দ ম ত মা ল ন ব প ল্ল বে সা • • • • জি ল "য মু"

০　　　　　১　　　　　+　　　　　৩

II পা ধা মা পা । ধা র্সা র্সা র্সা । গা -মা পা ধা । মপধা -র্সা র্সা -া I
ম য়ূ র মা　　ধ বী ত লে　　পে ০ থ ম　　খো ০ ০ ০ লে ০

পা -ধা র্সা র্সা । র্রা র্রা র্সর্রা র্সর্রা । র্সা র্সা র্রা র্গা । র্সর্রা -র্গা র্সা -া I
ব্যা ০ কু ল　　গো প বা লা　　শু নি য়া সে　　তা ০ ০ ন ০

নর্সা নর্সর্রা র্সা ণা । -া -া ধা পা । পা ধা মপা ধা । পধা পা মা মা I
যু ০ গ ০ ০ যু গ　　০ ০ ধ রি　　যে ন শ্যা ০ ০　　ম বাঁ শ রী

মা -া গা -রা । -া -া -া রাজ্ঞা । সা -া -া -া । -া -া -া -া I
বা ০ জা ০　　০ ০ ০ য়　　গো ০ ০ ০　　০ ০ ০ ০

-া সা ণ্া ধ্ণ্া । ণ্সা মা মা মা । মগা -রসা সা রা । মা -া গা মা IIII
০ বাঁ শী তে ০　　শ্যা ম মো রে　　যা ০ ০ ০ ০ চি　　ল ০ "য মু"

ফটোগ্রাফী আর ফিলসফি

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

এক ছিল ফটোগ্রাফার। সে সব কিছুরই ফটো তুলত। প্রোফাইল্, সামনে থেকে, থ্রি কোয়ার্টার, আপাদমস্তক। ডেভেলাপ্, ফিক্স, টোন্ গোল্ড বাথ, প্রিন্ট—সব বিষয়েই সে অদ্বিতীয়। তুখোড় লোক; কিন্তু কখনও তার মন খুসী থাকত না। কারণ সে ছিল দার্শনিক—প্রকাণ্ড দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিকও।

দুনিয়াটা তার ফিলসফির তোড়ে একেবারে ওলোট-পালট। ডেভেলাপারে ভেজা প্লেট থেকে কি করে ফিলসফিতে পৌছান যায়, দেখতেই পাবে। প্লেটের বাঁ ধারটা মানুষের ডানধার, প্লেটে যা' কালো, সত্যি তা' আলো, আঁধার সব উজ্জল, নীল সব সাদা, রূপার বোতামগুলো লোহার মত মিশ্ মিশে। সব ওলোট পালট।

তার একটি বন্ধু ছিল। নিতান্ত সাধারণ মানুষ; শুধু তার সামান্য কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল। সারাদিন সে পাইপ খেত, দুয়োর বন্ধ করা যেন তার স্বভাবে লেখেনি; খাবার সময় কাঁটার বদলে ছুরিটাই সে মুখে দিত, ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াত মাথায় টুপি দিয়ে, ছবি তুলবার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নখ কাটত; আর যেমন করেই হোক্ সন্ধ্যাবেলা তিন গ্লাস বিয়ার তার খাওয়া চাই-ই। তার দোষ ছিল অশুচ্ ছি।

দার্শনিক—তাঁর দোষ দেখান মুস্কিল—সঙ্গীকে নিয়ে ভারী ব্যতিব্যস্ত। সময়ে সময়ে বিরক্তি এত বেশী হত যে ভাবতেম এই শেষ। কিন্তু কাজের খাতিরে দু'জনাকে এক সঙ্গেই থাকতে হত। বাধ্য হয়ে একসঙ্গে থাকতে থাকতে দার্শনিকের বিরক্তি ক্রমে পরিণত হল ঘোর ঘৃণায়। ভয়ঙ্কর।

যাই হোক্, বসন্ত এল; গ্রীষ্মের জন্য একটা বাসা ঠিক করা দরকার। বন্ধু চললেন বাসার সন্ধানে, ফিরে এসে খবর দিলেন—সব ঠিক। এক শনিবার বৈকালে দু'জনে ষ্টিমারে চড়ে যাত্রা করলেন; দার্শনিক ওপরের ডেকে বসে সারা পথ পাঞ্চ্ খেতে লাগলেন। তাঁর শরীর ছিল বেজায় মোটা, ব্যাধিও ছিল অনেকগুলি—হয় ত লিভারের কিছু। আর পায়েও যেন কি হয়েছিল—বোধ হয় বাত; আরও কি, তা' কে জানে। যাই হোক, সেখানে পৌঁছে দু'জন নামলেন পীয়ারে।

দার্শনিক জিজ্ঞাসা করলেন, "এইখানে?"

বন্ধু বললেন, "একটু গিয়েই।"

দু'জনে হেঁটে চললেন কাঁচা পথে, গাছের শেকড়ের ওপর দিয়ে। একটা বেড়ার কাছে এসে পথটা হঠাৎ থেমে গেল। বেড়াটা ডিঙোন গেল; তারপর চলা সুরু হল পাথরের ওপর দিয়ে। দার্শনিক পায়ের বেদনা সম্বন্ধে কি বলতে যাচ্ছিলেন—মাথা থেকে বেদনার চিন্তা দূর হয়ে গেল আর একটা বেড়া দেখে। সেটাও পার হতে হল; তার পর রাস্তাটা আপনা হতেই বেমালুম সরে পড়ল।

বড় বড় পাথর, বাঁশের কঞ্চি, আর ঝোঁপ জঙ্গলের ওপর দিয়ে চলা আরম্ভ হল। তৃতীয় বেড়ার গায়েই একটা ষাঁড় দাঁড়িয়েছিল। তাড়া করে সে দার্শনিককে ছুটিয়ে নিয়ে গেল চতুর্থ বেড়ার কাছে। তাঁর সারা গা ঘামে ভিজে উঠল—লোমকূপের ছিদ্রগুলো খুলে গেল।

দু'টি বেড়ার পরে বাসা দেখতে পাওয়া গেল। ভিতরে ঢুকে বারান্দায় ফিরে এসে দার্শনিক জিজ্ঞাসা করলেন, "এত গাছ কেন? সামনে কিছুই দেখা যায় না যে!"

বন্ধু উত্তর দিলেন, "ভালোই ত! সমুদ্রের বাতাস থেকে বাঁচা যাবে।"

"জায়গাটা যে চার্চ্চ-ইয়ার্ডের মত; এই কীর বনের মধ্যে থাকতে হবে?"

বন্ধু জবাব দিলেন, "স্বাস্থ্য খুব ভালো।"

তারপর দু'জনে চান করতে চললেন। কিন্তু সমুদ্র সৈকত বলতে দার্শনিক যা বুঝতেন, তার কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। খালি নুড়ি আর কাদা। স্নানের পর দার্শনিক এক গ্লাস জল চাইলেন। কুঁয়ো থেকে জল এল মরচে পড়া লোহার মত রং, খেতে বিশ্রী। এ অসম্ভব··· কিছুতেই চলতে পারে না। মাংস পাওয়া যায় না, খাবার শুধু মাছ।

দার্শনিকের মুখ আঁধার হয়ে এল। তরমুজের লতার তলে বসে পড়ে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে থাকতে হলই। বন্ধু চলে গেলেন সহরে কাজ কর্ম্ম দেখতে, দার্শনিক ভোগ করতে লাগলেন ছুটী।

দেড়মাস পরে বন্ধু ফিরে এলেন। পীয়ারের ওপরে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে দাঁড়িয়ে আছে ছিপ্‌ছিপে পাতলা একটি যুবক, দুই গালে তার গোলাপ, ঘাড়ের রং মেটে। সে-ই দার্শনিক, বয়স ঝরে গিয়েছে, যৌবনের আভা ফুটে উঠেছে সারা গায়ে।

দু'টি বেড়াই লাফিয়ে পার হয়ে, ষাঁড়টাকে তাড়া করে নিয়ে তিনি ছুটে চললেন।

বারান্দায় এসে বন্ধু বললেন, "তোমাকে ভালোই দেখাচ্ছে; আছো কেমন?"

দার্শনিক বললেন, "খাসা, চমৎকার। বেড়াগুলো আমার চর্ব্বি ঝরিয়ে দিয়েছে; পাথরগুলো পা মালিশ করেছে; কাদা সেক দিয়ে আমার বাত দূর করেছে, মাগুলি খাবার লিভার সারিয়েছে, ফার বনে বুকের অসুখ ভালো হয়েছে। আর—তুমি বললে বিশ্বাস করবে না—কুঁয়োর ঐ ব্রাউন্ জলে কি ছিল জানো? আইরন্, ঠিক আমার যা' দরকার।"

বন্ধু বললেন—"হাঁ দার্শনিক; নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট্ তৈরি হয়। কালোগুলো আবার আলো হয়। যদি আমার একটি প্রিন্ট্ নিতে, আমার কি কি দোষ নাই দেখতে পেতে, তা হলে আমাকে আর ঘৃণা করতে না। একটু ভেবে দেখ—আমি মদ খাই না, তাই ঠিক করে কাজ করি। চুরি করি না, কখনও তোমার দোষ ধরি না; খুঁৎ-খুঁৎ করি না কিছুতেই। কখনও তর্ক করে বোঝাতে চাই না যে সাদা মানেই কালো।"

"খদ্দের এলে খারাপ ব্যবহার করি না। উঠি খুব সকালে; নখ কাটি যেন ডেভেলাপার পরিষ্কার থাকে। মাথায় টুপি দিয়ে রাখি যেন প্লেটে চুল না পড়ে। তামাক খাই ঘরের বিষাক্ত বাষ্পটি দূর করতে। দরজা একটুখানি খুলে রাখি—বন্ধ করতে গিয়ে শব্দ করতে চাই না বলে। সন্ধ্যাবেলা বিয়ার খাই যা'তে কখনও হুইস্কি না ধরতে হয়। মুখের মধ্যে কাঁটার বদলে ছুরি দিই—জিভে যা'তে কাঁটা না ফোটে।"

ফটোগ্রাফার বললেন, "সত্যি তুমি প্রকাণ্ড দার্শনিক; এবার থেকে আমরা বন্ধু—দিন আমাদের ভালোই যাবে।"

বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

বিবাহ-অনুষ্ঠান

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম-এ, পি-আর্-এস্

বিবাহ একটি সামাজিক ব্যাপার, সকল সমাজেই তার রূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয়। বিবাহ কেন সামাজিক জীবনের ভিত্তি হয়েছে সে সম্বন্ধে কিন্তু খুব বেশী আলোচনা হয় না। সমাজ বন্ধনের সূত্র বলেই হোক্, আদিকাল হতে প্রচলিত হয়ে এসেছে সে জন্যই হোক্ বা পার্থিব ও পারিবারিক জীবনের স্বার্থের অনুকূল বলেই হোক্, বিবাহই সমাজের মূল, এর বেশী কিছু জানবার প্রয়োজন হয় না। যুগে যুগে চিন্তাশীল লোক যে এর কারণ না ভেবেছে তা নয়, সিদ্ধান্তও অনেক প্রকার হয়েছে, কিন্তু সে সিদ্ধান্তের মূল্য সমাজে কোনও দিনই দিতে চায়নি, এখনও চায় না। ভয় হয় পাছে, সুন্দর সুগঠিত সুকোমল দেহের বিশ্লেষণের ফলে কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কঙ্কালকে ত অস্বীকার করাও যায় না।

এদেশে কেন, সমগ্র সভ্য দেশেই আজ এমন একটি সময় এসেছে যখন এই বিবাহের আকার ও উদ্দেশ্য নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা চলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, উদ্দেশ্য, অবস্থা, কাল ও সমাজের গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের আকার, আচার, ব্যবহার ইত্যাদিরও সংস্কার সম্ভব কি না। এ কয় বৎসর বাংলা সাহিত্যের, বিশেষতঃ তথাকথিত তরুণ সাহিত্যের ধারা লক্ষ্য করলে এই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বাংলার তরুণরা এ সমস্যা সমাধান করতে সচেষ্ট। কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ডের গায় একটি সূত্র যখন কেটে যায়, তখন যতবার পিন্‌টি ঐ সূত্রের মধ্যে আটকায় ততবারই একটি অস্বাভাবিক আওয়াজ বার হয়। এই অস্বাভাবিক শব্দ আমাদের প্রবীণ প্রবীণাদের নিকট খুবই শ্রুতিকটু লেগেছে। আমাদের সন্দেহ হয়েছে যে, তরুণদের লেখায় বিবাহ-সমস্যার সমাধান ফুটে উঠেনি।

প্রশ্নটি যে নিতান্তই জটিল তা অস্বীকার করা যায় না। সমাধান হচ্ছে যে প্রণালীতে তা নিয়েই আলোচনা সম্ভব। যখন সমাজের অধিকার নিয়ে বিরোধ ও মতভেদ প্রকট হয়নি, তখনও সমাজ এই প্রণালীকে ত অনুমোদন করেই নি, বরং যাতে চিন্তার গতি ও সমস্যার সমাধান এভাবে না হয়, সমাজ তার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টাই করেছে। আজ সমাজের বিরুদ্ধে সংস্কারকরা বিরোধ ঘোষণা করেছেন, সমাজের অনুষ্ঠানের মূলে ঘা দিয়েছেন; সমাজের আর সে শক্তি নেই যে অধিকারের দাবী দিয়ে তার আদেশ প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করে, তাই সমাজ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে জানবার জন্য যে এই নবশক্তির প্রেরণা কতটা ফলপ্রসূ হয়।

বিবাহের ভিত্তি তরুণের মতে যৌন সম্বন্ধে। সত্য কথা এই, নরনারীর যৌন মিলন থেকে বিবাহ বন্ধন দৃঢ় হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে প্রশ্ন ওঠে, মূল উদ্দেশ্য বজায় রেখে বিবাহ অনুষ্ঠান তুলে দেওয়া সম্ভব কিনা? আর যেখানে এই মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হবে না বা হওয়া সম্ভব নয়, সেখানে বিবাহের ওজুহাতে নরনারীর স্বামী স্ত্রী সম্পর্ককেই বৈধ বলে স্বীকার করতে হবে কি? বিবাহ ভিন্ন যৌন মিলন সমাজ স্বীকার করবে না কেন? এই সকল প্রশ্নই আজ আমাদের সামাজিক জীবনের গতিকে বিপদসঙ্কুল করে তুলেছে। সমাজের দুর্ব্বল বেষ্টন এই সকল প্রশ্নের মীমাংসাকে স্বীকার করেও করতে পারছে না অথচ যে উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের ভিতর আবির্ভাব হয়েছে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার ফলে তারও মূলোৎপাটন করতে পারছে না। তাই আজ আমাদের কর্ত্তব্য, বিবাহের উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠানের তুলনামূলক সমালোচনা করা।

বিবাহের অনুষ্ঠান দেশকাল সমাজ-ভেদে বিভিন্ন। বিবাহের উদ্দেশ্যও কতকটা তাই। বিবাহ যে সকল

সমাজেই আছে এবং সৃষ্টির প্রাক্কাল হতেই চলে এসেছে এও অনেকে মানেন। আমি কিন্তু পুরোপুরি মানিনা। বিবাহ বলতে নরনারীর মিলন বা যৌন-সম্বন্ধ বুঝলে, বিবাহ আবহমান কাল হতেই চলে এসেছে স্বীকার করতে হয়। অতএব মানতে হয় যে বিবাহের আলোচ্য বিষয়--তার উদ্দেশ্য নয় তার আদর্শও নয়,—তার অনুষ্ঠান। যার প্রচলন' সমাজের সৃষ্টির পূর্ব্ব হ'তে, তার উদ্দেশ্য ও আদর্শের তত্ত্ব ভগবানের অস্তিত্ব বা সৃষ্টির ইতিহাসের ন্যায় রহস্যপূর্ণ, অথচ অজ্ঞেয়।

বিবাহ সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে বিবাহ সমস্ত জাতি ও সমস্ত সমাজেরই একটি স্বাভাবিক অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছে। অসভ্য জাতির সামাজিক জীবন বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক ম্যালিনোস্কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিবাহ যৌন-মিলন নয়, বিবাহের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। যদি বিবাহ যৌন-মিলন হ'ত, তবে আজ সভ্য অৰ্দ্ধসভ্য, অসভ্য জাতি সকলেই অনুষ্ঠান নিয়ে এত ব্যস্ত থাকত না। যৌন-মিলন প্রায় সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যেই বিবাহ ভিন্নও সম্ভব হয়ে এসেছে। তবুও যেখানে নরনারীর অবাধ যৌন-সম্বন্ধ আবহমান কাল হ'তে প্রচলিত সেই সমাজেই আনুষ্ঠানিক বিবাহ অনুমোদিত হয়েছে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য-চেষ্টার ক্রটি হয়নি। মেলানেসিয়ানরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় তার কারণ, দশজনের নিকট স্বামী স্ত্রীর মিলন সপ্রমাণিত করবার জন্য; দু'জনাতে সংসার করতে পারে, একের তুষ্টির ভেতর দিয়ে সমষ্টির তুষ্টি সম্পাদন করতে পারে বলে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্থিতিশীল হয়, গতির ভিতর সে তৃপ্তি পায় না, একজনকে একান্তে ভালবেসে দশজনকে ভালবাসার ক্ষমতা অর্জ্জন করে। তাই বিবাহের প্রয়োজন, তাই অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা।

সন্তান প্রতিপালনও বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে প্রচলিত। সন্তান প্রতিপালনের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে কিন্তু সেটা বিবাহকে স্থায়িত্ব দান করে না। যেখানে পাঁচবৎসর বয়সের পরই সন্তানের ভরণপোষণের ভার সমাজের উপর ন্যস্ত হয়, স্থায়ী বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সে সমাজ স্বীকার করবে কেন? আর অনুষ্ঠানের প্রাকার দিয়েই বা তাকে আবদ্ধ করবে কেন? তাই বিবাহের উদ্দেশ্য যৌন-সম্বন্ধও নয়, সন্তান প্রতিপালন ও সংরক্ষণও নয়, বিবাহের কারণ, মানুষের বয়সের সহিত মনের দুর্ব্বলতা ও স্থিতিশীলতা, সমাজের নিকট স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের পরস্পরের যোগ্যতা সপ্রমাণিত করার আত্মপ্রসাদ ও গার্হস্থ্য জীবনে নরনারীর পরস্পরের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। মনের দুর্ব্বলতা যে বয়সের সহিত বেড়ে চলে, তার প্রমাণ না দিলেও হয়, তবে এটুকু বলা দরকার যে তরুণের চঞ্চলতা আশ্বিনের ক্ষণস্থায়ী বর্ষণের মতো আকস্মিক ও স্বাভাবিক। দৌড়ের পর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা যেমন অস্বীকার করা যায় না, তরুণের প্রগতির পরে স্থিতির আবশ্যকতাও তেমনি স্বতঃসিদ্ধ। বয়সের সহিত শরীরের পরিবর্ত্তনের মতো মনেরও পরিবর্ত্তন হয়। তাই মানুষ চায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, নিজের ঘরে নিজের অধিকারের ভিতর নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখতে, নিজের বেষ্টন দৃঢ় করতে, দশজনের নিকট নিজের স্থিতিশীলতা লোভনীয় করে তুলতে। যেদিন সমাজ মানুষের গতির বেগ সীমাবদ্ধ দেখল, যেদিন মানুষ ভিতরকার স্পন্দনের বেগ প্রশমিত অনুভব করল, সেদিন অনুষ্ঠানের মায়াবন্ধনে নরনারীর মিলন স্থায়ী হ'ল।

সমাজ যখন বুঝলে, যৌন মিলন স্থায়ী নয়, যখন বুঝলে, সন্তানের মঙ্গলকামনাও স্থায়ী মিলন সম্পাদন করে না, তখন নরনারীর মিলন স্থায়ী করবার নিমিত্ত অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হ'ল। অনুষ্ঠানই কাম্য হয়ে দাঁড়াল, অনুষ্ঠানের জোরে বিবাহ-বন্ধন স্থায়ী মিলন ঘটাল।

আজ তাই সমগ্র মানব সমাজে অনুষ্ঠানই বিবাহের ভিত্তি হয়েছে, অনুষ্ঠান ভিন্ন বিবাহ সম্ভব নয়। 'কারণ' 'কার্য্যে' পরিণত হয়েছে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না, যে 'কারণ' 'কারণ'ই থাকে, কার্য্যের দাবী করলেও, 'কারণ' 'কার্য্যে' পরিণত হয় না। তাই অনুষ্ঠানকে আমরা যতই সম্মান করি না কেন, সে অনুষ্ঠানের বেশি আর কিছুই নয়। উদ্দেশ্যবিহীন অনুষ্ঠান হতে পারে না, যদিও উদ্দেশ্য অনুষ্ঠানে চাপা পড়ে যেতে পারে। সমাজ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুমোদন করেছে, স্থায়ী মিলনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে যদি বিবাহ যৌন-মিলন বা সন্তান-পালনের নিমিত্ত ন

হয়, কেবল চিরস্থায়ী মিলনের জন্যেই হয়, তবে অনুষ্ঠান ভিন্ন এই মিলন সম্ভব হয় কি না। যদি অনুষ্ঠান ভিন্ন চিরস্থায়ী মিলন সম্ভব হয় তবে সমাজ অনুষ্ঠানকে বিবাহের প্রধান অঙ্গ বলে স্বীকার করে কেন? আজ অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির সামাজিক জীবন পর্য্যালোচনা করে এ কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে অনুষ্ঠান ভিন্নও স্থায়ী মিলন সম্ভব এবং অনুষ্ঠান ভিন্ন মিলনও সভ্যজগতের বিবাহ অপেক্ষা কোনও অংশে হেয় বা অগৌরবের নয়।

স্থায়ী মিলন ভিন্ন বিবাহ আরও কয়েকটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। তাই বলে একথাও সত্য নয় যে ঐ সব উদ্দেশ্যের জন্যই বিবাহের প্রচলন হয়েছে। বিবাহ সন্তানের পিতৃত্ব ও জ্ঞাতিত্ব নির্দ্দেশ করে। কিন্তু বিবাহ ভিন্নও যদি সেই নির্দ্দেশ সম্ভব হয় তবে বিবাহ ছাড়াও সমাজ গড়ে তোলা যেতে পারে। সন্তানের পিতৃত্ব ও জ্ঞাতিত্ব নির্দ্ধারণ সমাজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সমাজ যদি অন্য প্রকারে সে বিষয়ে প্রমাণ সাধন করতে পারে তবে কেবল সমাজের স্থিতির জন্য বিবাহের কোনও দরকার নেই। সমষ্টির মতের উপরই যদি সন্তানের legitimacy নির্ভর করে, তবে সমষ্টির প্রামাণ্য মেনে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়। তাই এই সমস্যা নিয়ে অসভ্য সমাজ বিব্রত হয়নি। মাতৃকুল সমাজে পিতৃত্ব নির্দ্ধারণের জন্য 'কু'ভেদ' (couvade) প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। স্ত্রীর সন্তান প্রসবের পর স্বামী নিজে সন্তান কোলে করে বসে থাকত; নিজের দায়িত্বের প্রমাণ হেতু, নানাপ্রকার বলকারী পানীয় গলাধঃকরণ করত। এই সময় স্ত্রী গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম করতেন। স্বামীর এই প্রকাশ্য আচরণে সমাজের নিকট তাহার দায়িত্ব প্রমাণিত হত এবং সন্তানের পিতৃত্ব ও জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকত না। যেখানে স্ত্রীর বহু স্বামীত্ব প্রচলিত আছে, সেখানেও সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয় করার প্রথা আছে যেখানে স্বামীগণ বিভিন্ন পরিবারের লোক, সেখানে সন্তানের পিতৃত্ব নির্দ্ধারণের জন্য "তীর ধনুক" অনুষ্ঠান আছে (Bow and arrow ceremony)। যেখানে কয়েকজন ভাই একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করে সেখানে প্রথম সন্তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বলে মেনে নেওয়া হয়। অতএব সমষ্টির মতের উপরই সব সমাজে সন্তানের পিতৃত্ব ও জ্ঞাতিত্ব নির্দ্দেশিত হতে পারে। যেখানে আনুষ্ঠানিক বিবাহ ব্যতিরেকে স্থায়ী মিলন সম্ভব, সে সমাজ সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে না। চেরো জাতি আনুষ্ঠানিক বিবাহ ভিন্নও নরনারীর স্থায়ী মিলন স্বীকার করে। পূর্ব্বে সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয়ের জন্য সন্তানের বিবাহের সময় সন্তানের পিতামাতা প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবাহ করত—পরে সন্তানের বিবাহ হ'ত। এখন তারও প্রয়োজন হয় না। সন্তানের পিতৃত্ব পিতামাতার স্থায়ী মিলন ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রমাণের উপর নির্ভর করে, কোনও অনুষ্ঠানেরই প্রয়োজন হয় না। স্থায়ী মিলনের অর্থ জীবনব্যাপী মিলন নয়। স্থায়ী মিলনের অর্থ পাঁচ, সাত, দশ বৎসরের মিলন হতেও পারে, কারণ সে সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। তাই বলে চেরোরা যে সচরাচর বিবাহ বিচ্ছেদ পছন্দ করে বা তাদের পক্ষে বিচ্ছেদ খুবই সহজ তা নয়। আনুষ্ঠানিক বিবাহ ভিন্নও যে মিলন হতে পারে, সমাজে সন্তানের স্থান হয় ও মিলন সাধারণতঃ স্থায়ী হয় তার অন্যান্য বিস্তর প্রমাণও পাওয়া যায়।

কুকীজাতি অসভ্য পার্ব্বত্য পীতজাতির একটি প্রশাখা। কুকীরা আনুষ্ঠানিক বিবাহ স্বীকার করলেও অনুষ্ঠান বিহীন মিলনকে অগৌরবের চক্ষে দেখে না। তাই কুকী সমাজে আজ আনুষ্ঠানিক বিবাহ ভিন্নও স্থায়ী মিলন প্রচলিত রয়েছে। কুকী যুবক তার মনোনীতার সঙ্গে সারাজীবন বসবাস করলেও সমাজ তাকে অসম্মান করেনা, তার সন্তান সন্ততিকে অনাদর করে না, অথবা তাদের পিতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয় না। এবং যদি কোনও কারণে মিলন বিচ্ছিন্ন হয় তবে একপক্ষ অপরপক্ষকে অপরাধী সাব্যস্ত করে, সমাজও তার যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করে। যারা সঙ্গতিপন্ন তারাই আনুষ্ঠানিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহেচ্ছুক যুবক তার সঙ্গিনীর পিতার সম্মতি নিয়ে ভাবী শ্বশুরালয়ে দিনযাপন করে। যতদিন সে মনে না করে যে তাদের মিলন কাম্য ও সুখপ্রদ হবে, ততদিন তারা একত্রে বাস করে। তিনমাস থেকে তিন বৎসর বা ততোধিক কাল এইভাবে বাস করতে পারা যায়। তার

সঙ্গিনীর কুটিরে যতদিন সে থাকে, ততদিন সেই কুটির গাত্রে 'একটি থারল' বা অন্য কোনও সাঙ্কেতিক চিহ্ন রাখে যাতে অন্য কোনও কুকী যুবক সেই যুবতীর প্রতি অনুরক্ত না হয়। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে যখন তারা স্থির-সংকল্প হয় তখনই সে কথা সমাজকে জানানো হয়ে থাকে। অন্যথা তাদের বিচ্ছেদ সমাজ মেনে নেয় মাত্র। যতদিন পর্য্যন্ত কুকীদম্পতি বিবাহ না করেও স্বামী স্ত্রী ভাবে দিনযাপন করে, ততদিন তাদের সন্তান সন্ততি সমাজের বুকে অগৌরবের বোঝা নিয়ে দাঁড়ায় না। সমাজের আদর্শও ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ বিবাহের সকল উদ্দেশ্যই এস্থলে সফল হয়।

যদি অসভ্য সমাজে বিবাহ ব্যতিরেকে স্থায়ী মিলন সম্ভব হয়, যদি সন্তানের প্রতিপালন ও সংরক্ষণে কোনও অযত্ন না ঘটে, এবং বিবাহ বন্ধনের অভাবেও অবাধ যৌন সম্বন্ধ (Promiscuity) প্রচলিত না হয়ে থাকে, তবে এই মিলন সমাজের পক্ষে যে কল্যাণকর নয় তাই বা বলি কি করে? আনুষ্ঠানিক বিবাহ ভিন্ন সমাজে ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত যখন পূর্ব্বতন সমাজে নেমে এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি, তখন এই সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে শপথ করে বলা যায় না। সমষ্টির মতের উপরই যখন বিবাহের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে, তখন যে সমষ্টি আনুষ্ঠানিক বিবাহ অনুমোদন করেছে, সেই সমষ্টিই যদি বিবাহ-বন্ধন-বিহীন-স্থায়ী-মিলন মেনে নেয় তবে আনুষ্ঠানিক বিবাহের বিশেষ সার্থকতা থাকে না। মিলনেচ্ছু নরনারী যে অনুষ্ঠানের অভাবে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হবে তারও বিশেষ আশঙ্কা নেই। শিক্ষা প্রবৃত্তি ও সমষ্টির অনুশাসনের সমবেত শক্তি যদি আমাদের কাম্য পথে না চালাতে পারে তবে সমাজের পত্তন ভেঙ্গে গড়াই কি উচিত নয়?

ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রত্যাশা

শ্রীমানসী দেবী

যদি মোর কণ্ঠে আর নাহি ফোটে বাণী,
যদি চিরদিন তরে আমার রাগিণী
চির মৌনতার মাঝে লভে পরিণতি,
সে কি তব ওই বুকে বাজিবে না অতি?
সে কি কভু ওই দুটি কাজল নয়ন
অশ্রুতে দিবেনা ভরি'? অনিন্দ্য বদন
হবে নাকি অকারণ বিষাদে মলিন?
তোমার সংসার আর তব রাত্রি দিন
শূন্যতার বেদনায় যাবে নাকি ভরি'?
সময়ের পরিমাণ পল পল করি'
হবে নাকি দীর্ঘতর? ভাবিবেনা মনে
মুসাফির পাখী এক তব উপবনে
আর না গাহিছে গান! মুগ্ধ ভক্ত তব
পারে না রচিতে আর স্তুতি নব নব!

য়ুরোপীয়ানা

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

অক্সফোর্ডে প্রথম যাত্রাটা হয় রেজির সঙ্গেই। এক সময়ে সে ছিল এখানকার ক্রাইস্টচার্চ্চ কলেজের ছাত্র। এই কলেজের বিস্তৃত ভোজন-শালার ভিত্তিগাত্র অনেক বিশিষ্ট এবং ইতিহাস-উক্ত ব্যক্তির ছবিতে অলঙ্কৃত। এঁরা সকলেই ছিলেন এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এঁদের মধ্যে একজন অন্ততঃ ভারতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং জন দুই এদেশের প্রধান মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। অনেকেই রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তৃত ক'রে গেছেন। এই ছবিগুলোর উপরেই বিশেষ ক'রে রেজি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলে। এগুলো রেজির গর্ব্বের বিষয় হ'তে পারে, কিন্তু যে মন্দভাগ্য ভারতীয়র দৃষ্টি রোজ খাবার সময় এই ছবিগুলোর উপর পড়বে তার মনে যে একটা বিষম inferiority complex-এর সৃষ্টি হবে, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? সে জানে কলেজের সেরা ছাত্র হ'লেও, দু'একটা দরজা ছাড়া প্রতিষ্ঠার আর সব দরজাগুলো তার কাছে রুদ্ধ। অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজের ছাত্রজীবনের পরিচয় পেয়ে মনে যে ভাব-পরম্পরা উঠেছিল, তা একটা প্রশ্নেই সংকলিত হ'তে পারে এবং তা' হ'চ্ছে এই যে—

আমাদের দেশের ছেলেরা অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজে প'ড়তে আসে কেন?

এক সময় ছিল যখন অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজের ডিগ্রীর একটা দর ছিল আমাদের দেশের চাকরীর বাজারে। কিন্তু সেদিন এখন আর নেই। আর একমাত্র ওই কারণেই যে ভারতীয় ছেলেরা কিম্বা তাদের অভিভাবকেরা আর সব বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে এই দুটোকেই পছন্দ করতেন, তা' নয়। একটা অনন্যসাধারণ জ্ঞানার্জ্জনের জন্য? তাও নয়। কেন না য়ুরোপ-আমেরিকায় এমন কোন কোন বিদ্যায়তন আছে, যেখানে জ্ঞানার্জ্জনের সুবিধা অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজের চেয়ে অনেক বেশী এবং যেখানকার ডিগ্রীর মূল্যও বড় কম নয়। খরচের দিক থেকেও অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজ বড় সুবিধার জায়গা নয়। অতএব ধ'রে নেওয়া যাক্, ইংরাজছাত্ররা যে উদ্দেশ্যে এখানে পড়তে আসে, ভারতীয় ছাত্রদের উদ্দেশ্যও তাহাই।

সে উদ্দেশ্যটা কি? রেজি বলে—আমাদের ভদ্রশিক্ষিত সমাজে চ'লতে হ'লে পাব্‌লিক স্কুল অথবা অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজের "ছাপ" থাকা দরকার। সেই "ছাপটা" পাবার জন্যেই আমাদের ওখানে যেতে হয়, ডিগ্রী পাওয়াটা গৌণ। ভগ্নী ঈডিথ ওই কথাটাকেই সোজা ক'রে ব'ললে—আমাদের ছেলেদের ওখানে পাঠানো হয়, স্নব তৈরী করবার জন্যে—আসল, অকৃত্রিম ইংরাজী-মার্কা স্নব্। এই দুটো কথার মধ্যেই কিছু কিছু সত্য নিহিত আছে। পাব্‌লিক স্কুল এবং অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজের জীবন-ধারার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। নবাগত ছাত্রকে সেই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়—খেলাধূলা, সামাজিকতা, তর্কবিতর্ক, ঝগড়া-মারামারির মধ্য দিয়ে। সেইটেই একটা তপস্যা এবং সেই তপস্যা বা discipline-এর ছাপটা ভবিষ্যৎ জীবনে চরিত্রে ও ব্যবহারে ফুটে উঠ্‌বে, এইটেই হ'চ্ছে আদর্শ। আদর্শের ভাল মন্দের বিচার করছি না, কিন্তু বলতে চাই, এই ছাপটা একেবারে ইংরাজী-মার্কা এবং তার পরিচয় শুধু ইংরাজ জাতের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। ভারতবর্ষে আমরা অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজ-শিক্ষিত ইংরাজদের মধ্যে সে পরিচয় কচিৎ পাই এবং য়ুরোপের অপরাপর জাতেরা যতটুকু পায়, তাতে তাদের হাস্যরসের উপাদান সঞ্চিত হয় মাত্র।

এই "ছাপটা" পাওয়া ভারতীয়দের পক্ষে বাঞ্ছনীয় কিনা,

সে বিচার পরে হবে। এখন দেখা যাক, এই ছাপটা ভারতীয় ছাত্রেরা আদৌ পায় কিনা। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর আগে যখন সামান্য কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল, তখন তাদের সংখ্যা-লঘুত্বের জন্য ইংরাজ-ছাত্রসমাজে মিশে যেতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু এই কয়েক বৎসরে অনেক-কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। এখন ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে তারা নিজেদের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবার আবশ্যকতা বোধ করে না, এবং ইংরাজ জাতের স্বভাব এমন নয় যে তারা বিদেশীকে বিশেষ ক'রে একটা বিদেশীয় দলকে সহজে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশাধিকার দেবে। ফলে এই হ'য়েছে যে বিরল দু'একজন ভারতীয় ছাড়া আর সকলে অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজ থেকে শুধু ডিগ্রী নিয়েই দেশে ফেরে। তারা B. A (Oxon) হয়, কিন্তু Oxford Man ব'লতে ইংরাজরা যা' বোঝে, তা হয় না।

এই Oxford Man বা Cambridge Man ব'লে পরিচিত হওয়া ইংরাজ যুবকদের পক্ষে খুব বাঞ্ছনীয়, সন্দেহ নাই। আদর্শও খুব উচ্চ হ'তে পারে, এবং ভারতীয় ছাত্রেরা যদি নিগ্রো রোড্‌স্ স্কলারদের মত ওই আদর্শ টাকে একেবারে নিজস্ব ক'রে নিতে পারে, তা' হ'লে হয়ত খুব ভালই হয়, অন্ততঃ কোন গোল থাকে না। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবেই। এবং সেটা যখন সম্ভব নয়—অন্ততঃ গত তিন পুরুষেও সেটা সম্ভব হয়নি—তখন সেটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কবি মনোমোহন ঘোষ এবং তাঁর ভ্রাতা শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন সত্যকারের তাই যা' ইংরাজরা Oxford Man এবং Cambridge Man ব'লতে বোঝে। অরবিন্দের জীবনে Cambridge Man-ত্বর বিনাশের পরে জাতীয় সাধনার আরম্ভ—তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির বহু পূর্ব্বে। মনোমোহন তাঁর অক্সফোর্ডের দীক্ষা ছাড়তে পারেন নি ব'লেই জীবনে শুধু ব্যর্থতাই উপলব্ধি ক'রে গেছেন। সেই দীক্ষা তাঁর ভারতীয়ত্বকে ক্ষুণ্ণ ক'রেছিল এবং ভারতবর্ষ তার প্রতিশোধ নিয়েছিল তাঁর কবি প্রতিভাকে ফুটতে না দিয়ে।

এ সব জেনেও এবং অধুনাতন নানারূপ বাধা স্বত্বেও যে ভারতীয় যুবকরা এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ কাটাতে পারেনা, তার কারণ হয় চিরাচরিত সংস্কারের প্রভাব, নয় চিন্তাশক্তির অভাব। এখানকার ছাত্রদের মধ্যে আরো একটা বিশেষ মনোভাব লক্ষ্য করেছি, সেটার উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারা গেল না। অক্সফোর্ডে একজন ভারতীয় ছাত্রের গবেষণার বিষয় ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর এক নগণ্য ইংরাজ কবির কাব্য। ভারতীয় ছাত্রকে যে এক ইংরাজ কবির বিষয়ে গবেষণা করবার অধিকার দেওয়া হ'য়েছে, তাতে সেই ছাত্রটি এবং তার ভারতীয় সতীর্থরা খুবই গৌরব বোধ ক'রেছিল, এবং এখনও তারা সেটা গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করে। আর একজন ভারতীয়কে এই অধিকার দেওয়া হয়নি ব'লে সে বেচারা বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়েছিল। তার গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে শুদ্ধমাত্র ভারতীয় কবিদের সংশ্রব ছিল, এও তার মনঃক্ষুণ্ণ হবার আর একটা কারণ যদিও তার গবেষণার মূল্য সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্ব্বোক্ত ছাত্রের গবেষণার চেয়ে অনেক বেশী। এ মনোভাবটাকে কি আখ্যা দিতে পারা যায়?

* * *

কেম্‌ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের মধ্যে আমার অক্সফোর্ডকেই লেগেছিল ভাল। কেন ব'লতে পারিনা। তবে কেম্‌ব্রিজে পেয়েছিলুম শুধু বৃষ্টি, এক বিদুষী ভারত হিতৈষিণী ইংরাজ মহিলার সঙ্গেও আতিথ্য এবং এক স্বদেশদ্রোহী ফরাসী যুবকের সাহচর্য্য। মিশ্রণটা ঠিক বিজ্ঞানসম্মত হয়নি বোধ হয়। আর অক্সফোর্ডে পেয়েছিলুম এক বঙ্গনারীর কল্যাণ-হস্তের আতিথ্য পরিচর্য্যা। সেই জন্যেই অক্সফোর্ড ভাল লেগেছিল কিনা, কে জানে।

প্রাচীনত্বে অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজ দুই-ই সমান। তবে অক্সফোর্ড তার একটা পুরোনো নামের সম্মান আজও বজায় রেখেছে। অক্সফোর্ড আগেও যেমন, এখনও তেমনি —home of lost cause. কম্যুনিজ্‌ম্ ইংলণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্র হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আশ্রয় পেয়েছে।

রয়্যালিস্‌টদের অক্সফোর্ডই হোক, আর কম্যুনিস্‌টদের অক্সফোর্ডই হোক, জাওয়েটের অক্সফোর্ডই হোক, আর রেজির অক্সফোর্ডই হোক—সমস্তটাই ভারতীয়ের কাছে একটা অবাস্তব স্বপ্ন।

আর এখানকার শিক্ষা দীক্ষা ইংরাজের কাছে যতই আদরের হোক, ভারতীয়ের কাছে তা' একটা নিষ্ঠুর পরিহাস, একটা বিরাট মিথ্যা।

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

—০—

এষ্টোনিয়া

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

বাল্টিক সাগরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ তীরে যে ক্ষুদ্রদেশ সমূহ অবস্থিত, সেইগুলিকে একত্রে বাল্টিকষ্টেট্স্ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পর এষ্টোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, প্রভৃতি বাল্টিক দেশ সকল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা লইয়া ইউরোপের মানচিত্রে স্থিতিলাভ করিয়াছে। তাহা পর্য্যালোচনার বিষয়, নতুবা ইউরোপের সমগ্ররূপ আমাদের কাছে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

'এষ্টোনিয়া', 'লাটভিয়া', 'লিথুনিয়া' পাশাপাশি অবস্থিত তিনটী ক্ষুদ্রদেশ। ইহাদের উত্তর ও পূর্ব্ব তটভূমি যথাক্রমে ফিনিস্ উপসাগর ও বাল্টিক সাগর দ্বারা বিধৌত। পশ্চিম

ট্যালিনের সাধারণ দৃশ্য

ইহাদের বিগত জাতীয় জীবন দুঃখময় ঘটনাবহুল পরপীড়নের ইতিহাসে পূর্ণ। তা' সত্ত্বেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সেই দেশগুলির প্রত্যেকটি কিরূপে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চির-আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় স্বাধীন সত্ত্বাকে লাভ করিল এবং সংস্কৃতির দিক দিয়া জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যই বা কি, দিকে রাশিয়া এবং দক্ষিণ দিকে পোল্যাণ্ড। এই আমরা যে পোল্যাণ্ড দেখিতেছি তাহাও গত ইউরোপীয় মহাসমরের পর স্বাধীনভাবে স্থিতি লাভ করিয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত মনে করেন যে, গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশ সমূহের যখন সীমানা নির্দ্ধারিত হয়, তখন শক্তিমান

জাতির কুটিল রাজনীতিবিদ্‌দের দ্বারা অতিকৌশলে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ সমূহের সৃষ্টি করা হইয়াছে (?) এবং তাহার এক উদ্দেশ্য কোন একটি জাতিকে শক্তিমান হইতে না দেওয়া। এইরূপ অনুমানের যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ কথা বলা বাহুল্য যে, এই সকল ক্ষুদ্র দেশের স্বাধীন সত্তার সৃষ্টি নূতনভাবে করা মোটেই সম্ভব হইত না, যদি ঐতিহাসিক দিক দিয়া উহাদের জাতিগত কোনও রূপ না থাকিত। জাতি ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বহুশতাব্দী পরে হইলেও ইহাদের জাতীয় ইতিহাস রচনাকে সম্ভব করিয়াছে। আজ শুধু এষ্টোনিয়া ও তথাকার অধিবাসীদের কথা বলিতেছি।

ধামুগে নির্ম্মিত তালিনের বিপুলাকার প্রাচীরের এক অংশ

তালিন—পুরাতন সহরের রাস্তা—দুইদিকে প্রাচীর—রাস্তাটি টাওয়ারের নীচ দিয়া চলিয়াছে

১৯৩০ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে উত্তরদেশ সুইডেন ছাড়িয়া 'কালেভিপোয়েগ' নামক জাহাজে ষ্টক্‌হলম্ হইতে এষ্টোনিয়ায় রওয়ানা হই। জাহাজটি এষ্টোনিয়ান্; সপ্তাহে দুইবার করিয়া ষ্টক্‌হলম্ ও এষ্টোনিয়ার প্রধান সহর তালিন,—এই দুইয়ের মধ্যে আনাগোনা করে। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে প্রায় বিশ ঘণ্টা লাগে। এষ্টোনিয়ার এস্পেরান্ট সমিতি আমাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উন্নত ও সমৃদ্ধ সুইডেন দেশে অনেক দিন থাকার পর যখন সর্ব্বপ্রথম তালিনে পৌঁছি, তখন মনে খুব স্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে পারি নাই। দেশের যে দিকে চোখ পড়ে, সর্ব্বত্রই কেমন একটা দারিদ্র্যের ছাপ রহিয়াছে। কিন্তু সেখানে কিছুদিন থাকা ও দেশবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর অস্বচ্ছন্দতা বোধ আপনা হইতেই চলিয়া গিয়াছিল।

এষ্টোনিয়ান্‌রা 'ফিন্-উগ্রীক জাতি'র শ্রেণীভুক্ত। তাহাদের ভাষার সঙ্গে ফিন্‌ল্যাণ্ড দেশীয় ও হাঙ্গেরিয়ান ভাষার মূলতঃ সাদৃশ্য খুব বেশী; কারণ জাতিতেও সকলেই একশ্রেণীভুক্ত। এষ্টোনিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী লাটভিয়া ও লিথুনিয়া দেশ

দুটির অধিবাসীদের ভাষা কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্র। এই দুইটি 'হিন্দু-ইউরোপীয়' ভাষার শ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেও একই শ্রেণীয় অন্যান্য ভাষার তুলনায় এ-দুটিতে সংস্কৃতের প্রাধান্য খুব বেশী, বিশেষ করিয়া শেষোক্তটিতে। 'ইন্দ্র', 'অগিন' (অগ্নি) 'মাতে' (মাতা) প্রভৃতি শব্দ ও অঙ্ক-সংখ্যাগুলি শুনিতে সংস্কৃতের মত। সেখানে বহু প্রচলিত একটি গল্প আছে যে জনৈক লিথুলিয়ান মহিলা কোন্ এক প্রাচীন যুগে উত্তর ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। পরে তিনি দেশে ফিরিয়া ভারতবাসীদের সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে ভারতীয়েরাও একই ভাষায় কথা বলে, তবে উচ্চারণের পার্থক্য বর্ত্তমান। এই গল্পের মধ্যে কতটুকু সত্য নিহিত আছে তাহা মোটেই জানিনা—তাছাড়া নিজে ভাষাবিদ্ও নহি। আমাদের দেশের ভাষাবিদেরা এ সম্বন্ধে হয়ত কিছু জানেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে ভাষাসম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

তালিম সহরের এক্‌চেঞ্জ্‌ গৃহের পার্শ্বস্থিত একটি প্রাচীন তোরণ

এষ্টোনিয়া দেশটি বাল্টিক সাগরের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। ইহার অধীনস্থ ৮১৮টি দ্বীপ বাল্টিক সাগর ও ফিনিস উপসাগরের উপর ছড়াইয়া আছে এবং সেইগুলি একত্রে কতকটা বিখ্যাত স্কাণ্ডেনেভিয়ান দ্বীপোদ্যানের মত,—যদিও ভূমির নৈসর্গিক প্রকৃতি একেবারে বিভিন্ন। এই দ্বীপ-পুঞ্জের কোন-কোনটির অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালী, বেশভূষা ও ভাষা প্রাচীন ধারায় এখনও চলিয়া আসিতেছে। একটী দ্বীপে কতকগুলি সুইড বাস করে। মধ্যযুগে তাহারা সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা এখনও মধ্যযুগের সুইডিস ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। তাহাদের রঙ্গিন ও দীর্ঘ পোষাকও সেই এক যুগের। মেয়েদের সকলেরই চুল লম্বা—বেণী বাঁধিয়া কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝোলান। 'বব্‌ড্‌' সেখানে এখনও আধিপত্য বিস্তার করে নাই। এই সমস্তই খুব চমকপ্রদ।

—এষ্টোনিয়ার পূর্ব্বপার্শ্বে রাশিয়ার সীমানায় একটি বড় হ্রদ আছে। ইহার নাম 'পেইপুস' এবং ইহা ইউরোপের বৃহত্তম হ্রদগুলির মধ্যে অন্যতম।

এষ্টোনিয়া আকারে ৪৭৫৪৮ বর্গমাইল। দৈর্ঘ্যে দেশটি মাত্র ৬৭২ কিলোমিটার; জনসংখ্যা ১১০০০০০এর সামান্য উপর। দেশের দক্ষিণভাগে পাহাড়-সদৃশ উচ্চভূমি আছে বটে কিন্তু আদতে দেশটি সমতল। সামুদ্রিক লেভেলের উপর ইহার উচ্চতা গড়পড়তা ৫০ মিটার মাত্র। দেশটি ছোট,—কাজেই অনায়াসে তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিয়া লওয়া যায়। আমি সে দেশে চারমাস ছিলাম। সেই সময়ের ভিতর প্রত্যেকটি সহর পরিদর্শন করিয়াছি এবং সর্ব্বত্রই কিছুদিন থাকিয়া দেখাশুনা করিয়াছি। যান্ বাহনের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কখনও বা ঘোড়ার গাড়ী, কখনও বা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া কতকগুলি গ্রামও দেখিয়াছি। কারণ কৃষিজীবী বলিয়া গ্রামেই অধিকাংশ লোকের বাস। আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের সামাজিক নিয়ম কানন জীবনযাত্রা প্রণালী—বিশেষ করিয়া গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির কার্য্যনীতি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ও সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করা। এমন করিয়া ঘুরাফেরা করা আমার মত ক্ষুদ্রাকৃতি ভারতীয়ের পক্ষে খুব

সহজ ছিল না। কারণ সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভ্রমণের পক্ষে নৈসর্গিক প্রতিকূলতা খুব বেশী। তখন উত্তরদেশের ন্যায় সেখানেও দিনগুলি ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে। সচরাচর বৃষ্টি পড়িয়া গ্রাম্যরাস্তার স্থানে স্থানে দুই ফিট আন্দাজ কাদা দাঁড়ায়। তা' ছাড়া সামুদ্রিক জলযুক্ত বায়ু প্রায় সকল সময়েই জোরে বহিতে থাকে এবং তখনকার কন্‌কনে শীত যেন শরীরের হাড়গুলিকে পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তোলে। কিন্তু দেখাশুনা ও নূতন লোকদের

তালিন—মধ্যযুগের তৈরী প্রাচীর পার্শ্বস্থ জলপূর্ণ পরিখা। পরপারে সুবৃহৎ উদ্যান

সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপন এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বত্রই এস্‌প্যারেন্টিস্ বন্ধুদের আদর যত্ন—অপরিহার্য্য ভ্রমণ-ক্লেশকে দূর করিয়া দিত। এস্থানে বলিয়া রাখি যে ১৪ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দেশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যক ছিল না এবং অধিকাংশ অধিবাসীই নিরক্ষর ছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এখন প্রায় সকলেই, এমন কি বৃদ্ধ বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত লিখিতে ও পড়িতে পারেন। পরাধীন অবস্থায় মাতৃভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ছাপান নিষিদ্ধ ছিল। সেজন্য স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষামূলক আইন প্রবর্ত্তন করিলেও দেশকে গুরুতর কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যেভাবে তাহারা সে সমস্যার সমাধান করিয়াছিল তাহা অতিশয় অদ্ভুত, সে সম্বন্ধে যথাস্থানে পরে লিখিব। হাতের কাজ শিক্ষার একটি বড় অঙ্গ এবং প্রায় সকল এস্টোনিয়ানই কোন না কোন হাতের কাজ জানে।

ফিন্-উগ্রীক শ্রেণীর বর্ত্তমান এস্টোনিয়ান জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহু বৎসর পূর্ব্বে বাল্টিক সাগরের তীরে আসিয়া আশ্রয় লয়, সেই সময় হইতে ১২০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা পৃথক পৃথক সর্দ্দার বা মোড়লের অধীনে বাস করিত। শুধু বাহিরের কোন শক্তির বা শত্রুর আক্রমণকালে ও যুদ্ধের সময়ে আত্মরক্ষার্থ সকলে একত্রিত হইত। ১২০৮ খৃঃ জার্ম্মান দেশীয় জমিদার শ্রেণীর লোকেরা তরবারি হস্তে দেশকে আমক্রণ করে। সেই ক্ষমতাবান্ অত্যাচারী জমিদারগণ বাল্টিক ব্যারণ বলিয়া খ্যাত। ব্যারণদের অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান-দেশীয় ধর্ম্মযাজকেরাও এস্টোনিয়ানদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করে। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ইউরোপীয়

জাতিদের ইতিহাস ও তাহাকে ভিত্তি করিয়া তাহাদের যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার মূলে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে

শূন্য পথ হইতে তোলা তালিনের আংশিক দৃশ্য। সম্মুখভাগে উজ্জ্বল 'পঞ্চগম্বুজা' রুশীয় গির্জ্জা

পাওয়া যায় যে মহাত্মা যীশু খৃষ্টের প্রেমধর্ম্মের বাণী বিস্তার করিবার জন্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ধর্ম্ম-পুরোহিতেরা তরবারির রক্ষণ ও ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম অনেকের জীবনকে মহৎ করিয়াছে এবং করিয়া থাকিবে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে অত্যাচার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভাবে শক্তিমান জাতিদের মনকে এক জায়গায় এমনভাবে অন্ধ ও পঙ্গু করিয়াছে যে আজ তাহাদের মধ্যে শান্তিভঙ্গের দারুণ দুশ্চিন্তাতেই তাহা স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

তালিন সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানের বিপুলকায় মধ্যযুগের গির্জ্জার ধ্বংসাবশেষ

এষ্টোনিয়ার কথা বলিতেছিলাম। এই জাতি সংখ্যায় নগণ্য হইলে জার্ম্মান ব্যারণদের স্বার্থমূলক ধর্ম্ম অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। প্রায় ১৯ বৎসর পরে ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ভ্যালডেমার সৈন্যসামন্ত লইয়া ব্যারণদিগকে সাহায্য করেন। এইভাবে এষ্টোনিয়ানদিগকে সাময়িকভাবে অভিভূত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তরবারির শাসনে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করান হইতে থাকে। রাজা ভ্যালডেমার রেভাল সহরে আপন প্রাসাদ ও দুর্গ তৈরী করেন। এষ্টোনিয়ানেরা বহিঃশক্তির কাছে পরাভূত হইলেও অন্তরে অত্যাচারকে মানিয়া লয় নাই। ডেনিসেরা ছাইচাপা আগুনের তাপ বুঝিয়া বুদ্ধিমানের মত নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি ব্যারণ ও ধর্ম্মযাজকদের কাছে অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়। জার্ম্মান ব্যারণেরা ধর্ম্মযাজকদের সহায়তায় ও প্ররোচনায় এষ্টোনিয়া ও ল্যাথভিয়া যোগ করিয়া লিভ্‌নিয়া বা লিভ্‌ল্যাণ্ড বলিয়া আখ্যা দেয় এবং নিজেদের একাধিপত্য বিস্তার করে।

প্রজাদের উপর নির্ম্মম অত্যাচার চলিতে থাকে; তাহাদিগকে ভূম্যাধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত করা হয়।

১৫৬২ সালে রাজা ইভান—যাহার অত্যাচার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে,—লিভ্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া অংশত ধ্বংস করেন। অন্যদিকে সুইডেনের বিখ্যাত রাজা গোস্তাভ আদলফ পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, ফলে এষ্টোনিয়া ও প্রতিবেশী লাটাভিয়া সুইডেনের অধীনে আসে। বহুকাল অসীম নির্যাতন ভোগ করার পর

এষ্টোনিয়ার মহিলা কবি শ্রীযুক্তা হিল্‌দা ড্রেসেন্। এস্‌পেরান্ট্ ভাষায় লেখা তাঁহার বইগুলি আন্তর্জাতিক সুধী সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তিনি এষ্টোনিয়ান্ ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী লিখিয়াছেন।

এষ্টোনিয়ানেরা সুইডিস্ শাসনের অধীনে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। প্রজারা ভূম্যাধিকার ফিরিয়া পাইল,—জাতীয় শিক্ষার পথ সুগম হইল। গোস্তাভ আদলফ তার্ত্তু সহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। এখনও এষ্টোনিয়ানেরা কৃতজ্ঞ অন্তরে অতীত সুইডিশ রাজত্বের সুনাম করিয়া থাকে। এ কথায় সত্যই আনন্দ হয়, কারণ পরাধীন জাতির মুখে প্রভু জাতিদের আচরণ সম্বন্ধে সুখ্যাতি বড় শোনা যায় না। জগতের ইতিহাসে তাহা এতই বিরল।

১৭০৯ সালে রাশিয়া ও সুইডেনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাশিয়ানেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এষ্টোনিয়া ও ল্যাটভিয়া আপন অধিকারের অন্তর্ভূত করে। বাল্টিক ব্যারণেরা পূর্ব্ব ক্ষোভ মিটাইবার সুযোগ পাইয়া 'জার-রাশিয়াকে' সাহায্য করে। পুনরায় নির্য্যাতনের তাণ্ডব লীলা আরম্ভ হয়। দুই শতাব্দী এই ভাবে চলিতে থাকে। পরে ১৯১৪ সালে ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হয়। বাল্টিকদেশগুলিও চিরাকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের আশায় যুদ্ধে যোগদান করে। রাশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী জার-রাজত্বের বিলুপ্তি ঘটে। কাল ১৯১৮ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী এষ্টোনিয়া স্বাধীনদেশ বলিয়া ঘোষিত হয়।

বলা হয়ত বাহুল্য, যদিও এষ্টোনিয়ানেরা আপনাদের জাতীয় ইতিহাস অনেক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই রচনা করিয়া আসিতেছিল কিন্তু তাহার ফল স্বরূপ তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ও তাহা ভোগ এই প্রথম, বর্ত্তমানে সেখানে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্য করিবার বিষয়, যদিও তাহারা বোলশেভিক-পন্থী নহে তবু জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া সে দেশে কোনো বস্তু নাই।

দেশে জন্ম সংখ্যা হাজার করা ১৮; মৃত্যু সংখ্যা ১৫.৯। শতকরা ৪৭ ভাগ পুরুষ—বাকী ৫৩ নারী, শতকরা ৮৮ জন জাতিতে এষ্টোনিয়ান; ৮.২ ভাগ রাশিয়ান; ১½ ভাগের উপর জার্ম্মান; .৭ ভাগ সুইডিস; .৪ ভাগ ইহুদী। সংখ্যালঘিষ্ট জাতিদের সঙ্গে এষ্টোনিয়ানদের সম্বন্ধ কিরূপ, কি ভাবে তাহারা বর্ত্তমান সময়ের এই সমস্যাকে সমাধান করিয়া একত্রে বসবাস করিতেছে তাহা পৃথকভাবে আলোচনার বিষয়।

দেশের শতকরা ৫৯ জন কৃষিজীবী এবং তাহাদের অধিকাংশই গ্রাম্য অধিবাসী। শতকরা ১৫ জন শিল্পী কার্য্যের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে; ৪.২ ভাগ ব্যবসা ব্যাঙ্কের কার্য্যে রত। শতকরা ৩১ জন সহরে বাস করে।

সমস্ত দেশে মাত্র ১৮টি সহর। ইহাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য—তালিন, তার্ত্তু, নার্ভা, প্যার্নো, ভালগা, ভিলান্দি।

নোম্মে ও রাথভেরে। ইহাদের মধ্যে তালিন প্রধান সহর এবং ইহাতে ১২৮২০০ লোকের বাস। পূর্ব্বে ইহার নাম রেভাল Reval ছিল। মধ্যযুগে এই সহরের প্রতিষ্ঠা হয়। সহরের রাস্তা ঘাট, ঘরবাড়ী, প্রাসাদ, দুর্গ, প্রাচীর সমস্তই মধ্যযুগের। ফলে, ইহাকে ইউরোপীয় কোন দেশের প্রধান সহর বলিয়া মনে হয় না। সর্ব্বত্রই ঐতিহাসিক বিপর্য্যয় বহুলতার রহস্যময় গন্ধ যেন লাগিয়া আছে। স্থানে স্থানে পর্ব্বত সদৃশ ভূমির উপর প্রাচীন যুগের অট্টালিকাগুলি। পুরাতন সহরের সংকীর্ণ রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় বড় দালানের উপরিভাগের ছাদ সকল স্থানে স্থানে খিলান দ্বারা সংযুক্ত—যেন কোন রাজপুরীর সদর দরজা। কোন কোন খিলানের উপর উঁচু উঁচু টাওয়ার। স্থানে স্থানে আঁকাবাঁকা সিঁড়ি বাহিয়া উঠানামা করিতে হয়। সর্ব্বোচ্চ ভূমির উপর ডেনমার্কের রাজার তৈরী প্রাসাদ। এখন তাহা মন্ত্রীদের কার্য্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এই প্রাসাদের আঙ্গিনা হইতে সমস্ত সহরের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বিশালকায় প্রাচীর উক্ত প্রাসাদের এক কোণ হইতে নামিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সমস্ত সহরটিকে ঘেরিয়া আছে। প্রাচীরের গা হইতে সর্ব্বসমেত ১৭টি টাওয়ার মাথাউঁচু করিয়া যেন উঁকি দিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার ও উঁচুটির নাম লঙ্ হেরম্যান টাওয়ার। ইহা সুইডিস যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীরের গায়ে মাত্র চারটি সদর দরজা। দরজার খিলানের উপর বিভিন্ন আকারের টাওয়ার শোভা পাইতেছে, প্রাচীর দিয়া ঘেরা রাজ প্রাসাদের বাহিরে গভীর জলপূর্ণ খাদ। খাদের পরপারে ফলফুলে শোভিত প্রকাণ্ড বাগান বা পার্ক। গ্রীষ্মকালে পত্র পুষ্পে ভরা এই বাগানটি সহরবাসীদের প্রমোদোদ্যানে পরিণত হয়।
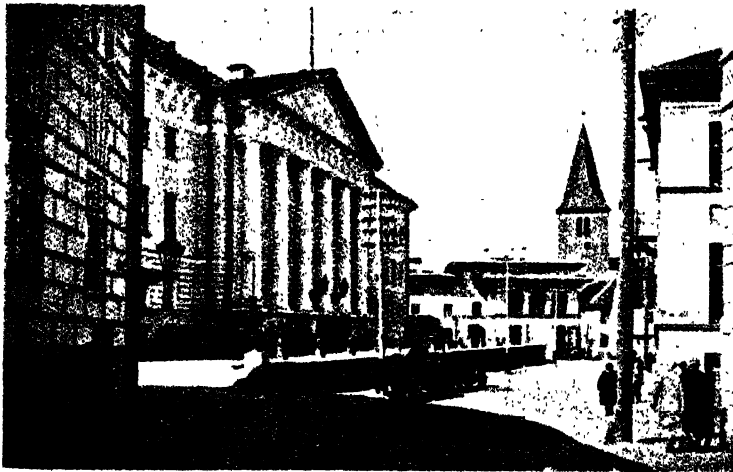
তার্তু, বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রধান গৃহ

প্রাচীন সহরের অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়া ঘুরিবার সময় উভয় দিকে প্রায় একই ধরণের কাঠের দোতালা ঘর দেখা যায়। প্রতি ঘরের দোতালায় রাস্তার উপর ঝোলান বারান্দা। রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে দুইটি প্রকাণ্ড খৃষ্ট মন্দির। তন্মধ্যে একটি রাশিয়ানদের তৈরী। ইহার উপর উজ্জ্বল রংএর পাঁচটি ডোম বা গম্বুজ শোভা পাইতেছে। অন্যটি সেণ্ট্-ওলয়া নামে খ্যাত ও ডেনিসদের দ্বারা তৈরী। আকারে অতি বৃহৎ এই মন্দিরের উঁচু দেওয়ালের ধূসর রং ও আকাশভেদী চূড়া ইহাকে অতি সৌম্যভাব দান করিয়াছে।

সহরের মধ্যস্থানে উচ্চভূমির উপর টাউনহলটি। ইহার আকৃতি অতি অদ্ভুত। ১৪০০ শতাব্দীতে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ভিতর ঐতিহাসিক মূল্যবান অনেক বস্তু রহিয়াছে। এই টাউনহলের আঙ্গিনার এক পার্শ্বে ইউরোপের সর্ব্ব পুরাতন কেমিক্যাল জিনিষের দোকান। ১৪২২ সালে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। এই দোকানটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আপন দেশের কত বিপর্য্যয়ই না ঘটিতে দেখিয়াছে!

প্রাচীন সহরের চারিদিকে আধুনিক সহর সবে গড়িয়া উঠিতেছে। নূতন গৃহগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জাতীয় রঙ্গমহল। মহাযুদ্ধের পর এই হলেই সর্ব্বপ্রথম স্বাধীনতার বাণী ঘোষিত হয়। জাতীয় সঙ্গীত দিবসে প্রাচীন কালের জাতীয় পোষাকে সজ্জিত হইয়া দেশের

বিভিন্ন স্থান হইতে ১৬।১৭ হাজার লোক এই সহরে বৎসরে একদিন মিলিত হয়। এই সঙ্গীত উৎসবে ১৬।১৭ হাজার কণ্ঠের গান আকাশ পাতালকে যেন কাঁপাইয়া তোলে, তাহা দর্শনীয় ও অনুভব করিবার জিনিষ।

তালিনের পরেই দ্বিতীয় সহর তার্ত্তু। এই সহরে মোটামুটি ৬২০০০ হাজার লোকের বাস। অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন এই স্থানটি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সভ্যতার কেন্দ্র। খাট ও টেবিলগুলি এখনও যথাস্থানে পড়িয়া আছে। কারারুদ্ধ ছাত্রেরা সময় কাটাইবার জন্য আপনাপন কক্ষের দেওয়াল ও ছাদ চিত্রিত করিয়াছিল। এ সমস্ত দেখিলে বিদেশী দর্শকের মন আপনা হইতেই যেন প্রাচীনযুগে বিচরণ করিতে থাকে এবং মনকে অভিভূত করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুইডিস রাজা গোস্তাভ আদলফ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

ছাত্রী-সমিতির সভায় প্রবন্ধ-লেখক

সেখানে দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়—এষ্টোনিয়ান্‌দের অতি গৌরবের জিনিষ। কারণ ইহা ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি। এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুপ্রাচীরের প্রাচীন প্রাসাদটি দেখিবার মত। সদর দরজা দিয়া ঢুকিলে অপ্রশস্ত করিডর-পথের দুই পার্শ্বে 'ক্লাসরুম'গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাসাদের একপার্শ্বে কতকগুলি কক্ষ আছে যেখানে অতীত যুগে যে কোন অপরাধে ছাত্রদিগকে বন্দী করিয়া শাস্তি দেওয়া হইত। বন্দীদের ব্যবহৃত

বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক পুস্তকাগারটিও সাধারণ পুস্তকাগারের মত নহে এবং হয়ত বা পৃথিবীর কোন একটার সঙ্গে ইহার তুলনা চলে না। অতি নির্জ্জন উচুস্থানে বাগানের ভিতর প্রাচীন কালের অগ্নিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক বিপুলকায় গির্জ্জাকে অতি কৌশলে সারাইয়া পুস্তকাগারে পরিণত করা হইয়াছে। শুনিয়াছি, সেই দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা শতকরা হিসাবে পৃথিবীর অন্য দেশের অপেক্ষা বেশী। অবশ্য নিজে কোনদিন সেই হিসাব

করিয়া দেখি নাই। তবে দেশ ও দেশের লোক সংখ্যার তুলনায় তাহা সত্য বলিয়া মনে করিতে মোটেই কষ্ট হয় না।

ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের মত এষ্টোনিয়ার সর্ব্বত্রই এসপেরাণ্ট সমিতি রহিয়াছে। এই আন্তর্জাতিক ভাষার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া রাখি। পৃথিবীর বহু-ভাষাভাষী বিভিন্নজাতিদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানকে সহজ স্বাভাবিক করিয়া পরস্পরের ভিতর সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের ক্ষেত্র প্রশস্ত করা এই আন্তর্জাতিক ও নিরপেক্ষ ভাষার একমাত্র লক্ষ্য। ইউরোপ, কানাডা, আমেরিকা, প্রাচ্যদেশ সকলের মধ্যে জাপান, চীন, ইণ্ডচীনা, সায়াম প্রভৃতি মহাদেশ ও দেশের সর্ব্বত্রই এই ভাষার বহুল প্রচার আছে এবং অতি দ্রুতগতিতে জনসাধারণ এই ভাষা শিখিয়া তাহার সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় এষ্টোনিয়ার বিদ্যালয়ে এসপেরাণ্ট দ্বিতীয় ভাষারূপে শিখান হয়।

তার্ত্তু সহরে প্রায় দেড় সপ্তাহ ছিলাম। অন্য স্থানের ন্যায় এখানেও এসপেরান্টিস্ বন্ধুদের সহযোগে দেখাশুনা করিতেই অধিকাংশ সময় কাটিয়াছিল। বিদ্যালয়গুলির কাজকর্ম্ম পরিদর্শন কালে প্রায়ই ছাত্রদের সভায় বলিতেও হইত। শুনিয়া হয়ত অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে দোভাষীর সাহায্য ছাড়া বার তের বৎসরের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে এসপেরাণ্ট ভাষায় আমার কথাবার্ত্তা চলিত। প্রায় সকল এষ্টোনিয়ানই মাতৃভাষা ছাড়া রাশিয়ান ও জার্ম্মান ভাষা জানে। তার কারণ সুস্পষ্ট। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মাতৃভাষায় যাহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়াছে তাহারা বিদেশী ভাষা তেমন ব্যবহার করে না।

বলা বাহুল্য, তার্ত্তু সহরটি ছাত্রদের বড় আড্ডা। ছাত্রদের পৃথক পৃথক কো-অপারেটিভ সমিতি আছে। আমি দুইবার ছাত্র সমিতির সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। একদিন তাহাদের এক সভায় বলিতে গিয়া বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সমবেত ভদ্রমহিলা ও মহোদয় বলিয়া কথা আরম্ভ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে বক্তা ভিন্ন সেখানে দ্বিতীয় পুরুষ নাই। এষ্টোনিয়ানদের সম্বন্ধে ইহা খুব লক্ষ্য করিবার বিষয় যে প্রাচীন কাল হইতেই জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে মহিলারা খুব অগ্রণী এবং তাহাদের দানও কম নহে। সেইদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি একজন মহিলা। তাঁহার নাম শ্রীযুক্তা মারিয়ে উনডার। তাঁহার লেখা ইউরোপের সাহিত্য সমাজে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

নার্ভা সহরে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বস্ত্রবয়ন কারখানার এক অংশ

পরপীড়নে, পরশোষণে দেশ পূর্ব্বে কখনও স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে পারে নাই। ফলে, দেশের লোক যে সাধারণত অপেক্ষাকৃত দরিদ্র তাহা বলাই বাহুল্য। ৩০।৪০ টাকায় অনায়াসে যে কোন সহরে সাধারণ ভাবে থাকা চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র ছুটীর দিনে বা অবসর সময়ে কাজ করিয়া নিজের উপার্জ্জিত অর্থে স্বাবলম্বীভাবে আপনাপন জীবিকা নির্ব্বাহের ও পড়াশুনার খরচ বহন করে। যুবকদের মাদক দ্রব্য নিবারণী সমিতির জনৈক বিশিষ্ট সভ্যের সঙ্গেন

একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়াছিলাম যে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। অবসর সময়ে বা ছুটীর দিনে জুতা তৈরী ও চামড়ার কাজ করিয়া নিজের সমস্ত ব্যয় বহন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যাহাতে অল্প খরচে খাবার পায় সেজন্য গবর্ণমেণ্ট পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। সেইরূপ ক্ষেত্রে তিন বা চারি আনায় পেট ভরিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করা যায়। এই জাতিদের সকলেই কর্ম্মপটু ও কর্ম্মে তাহাদের অসীম আনন্দ।

এষ্টোনিয়ার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাৎসরিক ব্যায়াম-উৎসব

এষ্টোনিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ইন্ডাষ্ট্রিয়েল সহর নার্ভা। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ইউরোপের সংযোগ স্থলে এই ক্ষুদ্র সহরটি নানা বিপর্য্যয়ের ও রোমাঞ্চকর বিপ্লবের ক্ষত চিহ্ন সকল বহন করিয়া নার্ভা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আছে। 'জার' বংশের রাজারা সময় সময় এই সহরে বিশ্রাম ভোগ করিবার জন্য আসিয়া বাস করিতেন। রাজ প্রাসাদটি এখন মিউজিয়মে পরিণত হইয়াছে। পুরাতন সহরের ঘর বাড়ীগুলি মধ্য-যুগের এবং ইহাদের স্থপতি কার্য্য অতি বিভিন্ন রকমের। সহরের উপর দুইটি প্রকাণ্ড কেল্লা। ইহাদের একটি রাশিয়ানদের অপরটি সুইডিসদের দ্বারা তৈরী। প্রথমটি গ্রেণাইট পাথরের ও দ্বিতীয়টি লাল ইঁটের। ইহাদের পার্শ্বে নার্ভা নদীর তীরে ছোট বন্দর।

এই সহরে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বস্ত্র-বয়ন কারখানা প্রতিষ্ঠিত। খোঁজ নিয়া জানিয়াছি যে সেখান হইতে আমাদের দেশে কলে তৈরী 'খদ্দর' রপ্তানী করা হয় (?)। সহরের কারখানার দিকটা আধুনিক। সেখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এক উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব জন্মে। তাঁহার স্ত্রী ভারতের সাহিত্য, কলা প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশুনা করিয়াছেন। আমার নিকট হইতে নূতন কিছু জানিবার ইচ্ছায় আপন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সময়ের অল্পতা হেতু সেরূপ নিমন্ত্রণ প্রায়ই গ্রহণ করিতে পারিতাম না।

এষ্টোনিয়ানরা খুব শ্রম-সহিষ্ণু, শান্ত ও চিন্তাশীল। তাহারা যাহা শুনে শিখে সমস্তই উত্তমরূপে যাচাই করিয়া নেওয়া তাহাদের চরিত্রের এক বিশেষত্ব। সাধারণ বিদেশীদের সঙ্গে তাহারা অতি সংযত হইয়া কথাবার্ত্তা বলে, তাহার কারণ কতকটা স্পষ্ট। বহু শতাব্দী ধরিয়া পরপীড়ন ও ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ফলে তাহারা সকল বিষয়েই সতর্ক। কিন্তু সুখের বিষয় ব্যক্তিগতভাবে সর্ব্বত্রই আমি যথেষ্ট আদর যত্ন ও সহৃদয়তা ভোগ করিয়াছি এবং তাহা সম্ভব করিয়াছেন সেই দেশের এসপেরাণ্ট সমিতির চালকদের সুবন্দোবস্ত।

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

অসমাপ্ত

শ্রীমতী প্রকৃতি ঘোষ

২২

আমাদের সন্ধ্যে বেলার ছোট্ট সভাটিতে কোনদিন কবিতা পড়া হোত, কোনদিন গল্প, কোনদিন তর্ক, কোনদিন নিজের নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করা হোত। শেষের দিকে দাদা বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করতো'। দাদা দিনকতক আমায় বাঁশী বাজানো শেখাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল কিন্তু আমার দ্বারা হোল না, শেষে বল্লুম "না দাদা, আমার বাঁশী শিখে কাজ নেই, তুমি বাজাও আমরা শুনি।" একদিন সন্ধ্যের সময় ভগবানের কথা উঠ্‌লো। দাদা বল্লে "মূর্ত্তি ধ্যান আমার আর ভাল লাগেনা, হয়ও না।" ঐ সব নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। দাদা ছিল পুরোপুরি অদ্বৈতবাদী; আর আমি তখন অদ্বৈতবাদ যে কি রকম তাও জান্‌তাম্ না। তখন জান্‌তাম ঈশ্বর একজন শক্তিমান পুরুষ, তিনি মানুষ অন্যায় করলে শাস্তি দেন, ভাল কাজ করলে পুরস্কার দেন। তিনি দয়াময়, কাতরভাবে প্রার্থনা করলে প্রার্থনা শোনেন। আমি ক্ষুদ্র জীব আর তিনি হচ্ছেন সকলের প্রভু।—এই রকম নানা অদ্ভুত ধরণের কল্পনায় মাথা ভর্ত্তি ছিল। সেদিন আমি দাদার সঙ্গে তর্ক করেছিলাম। কিন্তু দাদার জীবনের পরিবর্ত্তে আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে।

একদিন দাদা বল্লে "রোহিতাশ্বদা' স্বপ্ন দেখেছিল, রোহিতাশ্বদা আর আমি এক মটোরে করে বনের মধ্যে দিয়ে খুব ছুটে যাচ্ছি এমন সময় প্রকৃতি আর রোহিতাশ্বদা'র মা সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে 'তোমরা যেওনা, ফিরে এস ফিরে এস।' অনেক বল্‌তে রোহিতাশ্বদা নেমে গেল গাড়ী থেকে, কিন্তু আমি নামলুম না, সটান্ চলে গেলুম।" আমরা শুনে খুব খানিকটা হাস্‌লাম। দাদা বল্লে "হাসিস আর যা' করিস্ আমি সত্যিই পেছনে ফিরবোনা কি থাম্‌বোনা এখন থেকেই আমি তা' বুঝতে পারছি। কোন রকম নিয়মের ভেতর আমি কিছুতেই থাকতে পারছিনা।"

কিছুদিন বাদে দাদার পরীক্ষার খবর বেরোলো, সেকেণ্ড হ'য়েছে।

২৩

দাদা 'ওমর খৈয়াম' পড়ে শোনাচ্ছিল, আমি শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে গল্পও করছিলুম। দাদা খানিকটা পড়ে গল্প করতে করতে বল্‌লে "ডায়মণ্ডহারবারকে আমার আর একটুও ভাল লাগেনা, এখানে থাক্‌তে আমার আর একটুও ইচ্ছে হয়না।" আমি বল্লুম "ডায়মণ্ডহারবার আমার খুব প্রিয় বল্লে অল্প বলা হয়, আমি এমন জায়গা ছেড়ে স্বর্গেও যেতে চাইনা।" তখন আমি জানতুম না যে ঠিক একটি বছর আমি ডায়মণ্ডহারবারের অফুরন্ত লীলার মাঝে থাক্‌তে পাব। এতদিন মুখে বল্‌লেও অন্তরে ভাল করে বুঝিনি যে একে কতটা ভালবাসি। আজ এর ভাবী বিরহের সূচনায় প্রাণ হাহাকার করে উঠ্‌ছে। এর মাটীতে আমি শৈশব কৈশোরের মধুর স্বপ্নভরা দিনগুলি কাটিয়ে যৌবনে পা দিয়েছিলাম। এইখানে আমি আমার আনন্দকে আমার সতের বছরের আশাকে সমাধিস্থ করেছি।

*　　　*　　　*

দাদা ইংলিশে অনার্স নিয়ে B. A. পড়বে ঠিক হোল। বাবার ইচ্ছে হ'য়েছিল দাদা প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হয়, কিন্তু দাদা তখন কিছুতেই রাজি হোলনা। স্কটিশে ভর্ত্তি হোল। দাদা বল্লে "আমি একবার কল্‌কাতায় গিয়ে উঠ্‌তে পারলে হয়, আর আস্‌ছি না সেই আবার B. A. পরীক্ষা দিয়ে আস্‌বো।" মা শুনে বল্লেন "অচু আমাদের যে মন কেমন

করবে বাবা, তুই আসবি না কেন, কেউ কি তোকে খোঁচা দেয়?" দাদা বল্লে, আমি যখন বিলেত যাব তখন তোমরা কি করবে?"

পয়লা জুলাই দাদা কল্‌কাতায় ভোরের গাড়ীতে চলে গেল। আমার চোখ জলে ভর্ত্তি হ'য়ে আসছিল। দাদা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আমার কাছে এসে বল্লে "আসি তা'হলে, আমার উপর রাগ করিস্‌না।" ক'দিন আগে দাদার সঙ্গে আমার একটা সামান্য কথায় ঝগড়া হ'য়েছিল। দোষ আমারই ছিল বেশী কিন্তু আমি রাগ ক'রে দু'দিন কথা কইনি। মনে হোল আমি যদি দাদার বোন না হ'য়ে ভাই হতুম তবে আজ দাদাকে ছেড়ে থাকবার এ-কষ্ট সহ্য করতে হোতনা। তখনো আলো দেখা যাচ্ছে না,—আকাশে ঘনকালো মেঘ—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছিল, দীর্ঘশ্বাসের মত বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমরা সদর দরজার কাছ থেকে দাদাকে বিদায় দিলুম, দাদা অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

২৪

২রা আশ্বিন আমরা জয়নগরে এলুম। এখানে আসবার আগে যেমন আনন্দ হচ্ছিল, এখানে এসে আর ভাল লাগ্‌ছিল না। অত বড় বাড়ীতে মোটে লোক নেই। সকলের জন্য ভারি মন কেমন করতে লাগ্‌ল। চুপ ক'রে বসে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। দাদাকে জয়নগরে আস্‌তে লেখা হোল। দাদা তা'র উত্তরে লিখ্‌লে, "আমি মা বাবার কাছে কাশীতে চল্লুম।"

বিজয়ার দু'দিন পরে আমরা মামার বাড়ীতে চলে এলাম। মামার বাড়ীতে কিছুদিন থাকবার পর আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হোল। এই সময় মার চিঠিতে জান্‌তে পারলাম দাদা কাশী থেকে চলে এসেছে। দাদা হোষ্টেলে আছে কি কোথায় গেছে, এই খবর জানবার জন্যে আমার মাস্‌তুত ভাইকে হোষ্টেলে পাঠানো হ'লো, তিনি ফিরে এসে বল্‌লেন "অচু যেদিন কল্‌কাতায় নেমেছে সেইদিনই আবার কাশীতে চলে গেছে। হোষ্টেলে বলে গেছে 'আমার বাবার অসুখ হয়েছে, আমি ফের চল্লুম', ছেলেরা আমায় এই বল্লে। মার চিঠিতে পরদিন জানলুম দাদা সেইদিনই কাশীতে চলে গেছে।

২৪শে আশ্বিন রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতে উঠে জানলার ধারে দাঁড়ালাম। একটি শব্দও নেই কোন দিকে, দিনের হাস্য, কোলাহলময় পুরী রাত্রির কোন্ যাদুমন্ত্রে গভীর সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। আজ সারাদিন দাদার জন্যে বড় মন কেমন কর্‌ছিল। এই নিস্তব্ধতার মাঝে বড় অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লুম। সারাদিনের রুদ্ধ বেদনা চোখের জলে ঝরে পড়্‌ল।

যেদিন অসুখ ভাল হোল, সেইদিনই আমি মামীমাদের সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখ্‌তে গেলুম, ফেরবার পথে ভয়ানক বৃষ্টি, আমাদের ট্যাক্‌সি থেমে গেল। বৃষ্টিধারা যেন বরফের টুক্‌রোর মত আমার গায়ে এসে পড়ছিল, আমার হাত ঠাণ্ডায় অসাড় হ'য়ে আসছিল। দাদার কথা মনে পড়ে হাসি পেল। দাদার দুষ্টুমীর কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, —শীতকালে দাদা স্নান করে এসে ঠাণ্ডা হাতটা চুপি চুপি আমাদের গায়ে বুলিয়ে দিয়ে ছুটে পালাতো। গেল শীতকালে একদিন আমি অন্যমনস্কভাবে একটা কাজ কর্‌ছিলাম, দাদা আস্তে আস্তে এসে নিজের হিমের মত ঠাণ্ডাহাতটা আমার ঘাড়ে বুলিয়ে দিতেই আমি ভয়ানক চম্‌কে উঠ্‌লাম। দাদা ঐ রকম করে ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমায় ভয় দেখাচ্ছে দেখে আমি বল্লুম, "থাম তোমাকে আমি মজা দেখাচ্ছি।" আমার কাছে বাসি জলের বাল্‌তি ছিল, আমি হাত ডুবিয়ে দাদার গায়ে দিতে দাদা বল্লে "কই আমার কিচ্ছু ঠাণ্ডা লাগছে না, আচ্ছা তুই আমায় দিলি এইবার আমি তোকে দিই।" আমি বল্লুম "না দাদা দিও না, ভাল হবে না বল্‌ছি আমার শীত করে।" দাদা আমার কথা কানে না তুলে জলে হাত দিতেই আমি পালালুম। দাদা সেইখান থেকে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে আমার গায়ে দিতে লাগল আমি মা'র কাছে গিয়ে বল্লুম, "দেখমা দাদা আমার মাথাটাথা সব ভিজিয়ে দিয়েছে।" মা দাদাকে বল্‌লেন "হাঁ রে অচু, তুই যত বড় হচ্ছিস তত দুষ্টুমী বাড়ছে?" দাদা বল্লে "ও কেন আমার দিলে?" আমি বল্লুম "বাঃ তুমি আমায় আগে দিলে না?" দাদ

বল্লে "আমি জলশুদ্ধ, হাত দিইছি তোর গায়ে?" মা বল্লেন "আচ্ছা ওর দোষ হ'য়েছে কিন্তু তুমি অম্‌নি করে আর জল ছুঁড়োনা।" আমি সেই থেকে দাদাকে জব্দ করতে আর কখন যেতুম না।

ভাই ফোঁটার দিন সকালেই আমরা ডায়মণ্ডহারবারে রওনা হলুম। বেলেঘাটা ষ্টেশনে বাবা মা আগে এসেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম "মা, দাদা কোথায়?" মা বল্লেন সে হাওড়ায় নেমেই চলে গেছে। যে ছেলে, কেবল জ্বালাতন করেছে, খেয়ালের শেষ নেই।

ডায়মণ্ডহারবারে কুড়ি পঁচিশ দিন থাকার পর কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি একদিন দাদার জন্যে বড় মন কেমন করতে লাগল মনে হোল দাদা যদি কাল আসে তো বেশ হয়না, আস্‌বে না কি? বিকেলবেলা দাদার চিঠি এল 'মা, আমি শনিবার সকালে যাব ওখানে।' চিঠিটা পড়ে আমার মনে খুব আনন্দ হোল। পরদিন দশটার গাড়ীতে দাদা এল। আমি প্রণাম করতে গেলে দাদা বল্লে "না, ওসব আমি পছন্দ করিনা।" আমি বল্লুম "বাঃ বিজয়ার পর তোমার সঙ্গে বুঝি আমার দেখা হ'য়েছে।" দাদা তাড়া দিয়ে বল্লে "যা, যাঃ, ফাজ্‌লামি করতে হবে না, এত রোগা হ'য়ে গেছিস্ কেন?" আমি একটু আস্তে আস্তে বল্লুম "মামার বাড়ীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'য়েছিল।" দাদা বল্লে "কেমন আমি বলেছিলুম না। বেশ হয়েছে আমি খুব খুসি হ'য়েছি।"

দিদি দাদাকে ভাই ফোঁটার জন্যে টাকা দিয়ে বল্লে "অচু তোর যে বই ভাল লাগে সেই বই কিনিস্।" দাদা প্রথমে নিতে রাজি হোল না দিদি অনেক করে বলবার পর নিতে রাজি হোল। আমায় বল্লে "প্রকৃতি তুই আমায় কি দিবি?" আমি একটু অবাক হ'য়ে গেলুম, দাদা কখন কারুর কাছ থেকে কিছু নিতে চাইতো না, চাওয়া তো দূরের কথা। বল্লুম "আমি আর কি দেবো, পরে তোমায় এক সেট্ বই কিনে দেবো, এবছরে নয় আর বছরে।" দাদা আর কিছু বল্‌লো না। মাকে বল্লে "জান মা আমি তোমার রোজগারে ছেলে হইছি।" মা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন "আমায় তবে মাসে মাসে কিছু দিস্।" দাদা তখন দুটো টিউসানি করছিল। "মা বল্লেন 'তুই অত টাকা নিয়ে কি করিস, বাবু তোকে আলাদা আবার দেন তো।" দাদা বল্লে কি কি খরচ করে। বেশীর ভাগ বই কিন্‌তে যেতো। আমি বল্লুম "বাব্বা, দাদা তোমার এই ক'মাসে কত টাকার বই কেনা হোল, বাবাই তো তোমাকে চারশ' পাঁচশ-টাকার বই কিন্‌তে দিয়েছিলেন।" দাদা বল্লে "আমার অনেক বই কেনা হ'য়েছে কিন্তু ঘরে আর রাখবার জায়গা নেই। মা, বাবাকে বালীগঞ্জের দিকে একখানা বাড়ী কিনতে বলোনা, বেশ হয় তা'হলে। সব্বাই একসঙ্গে থাকি, হোষ্টেলে থাকতে আর ভাল লাগে না।" মা বল্লেন "কে ক'রে দেবে, বাবু তো পারবেন না, তুই বড় হ' হ'য়ে করবি।" দাদা রাগতভাবে বল্লে "আমার কি? তোমাদের ভালর জন্যই বল্‌ছি। আমি তো থাক্‌তে আস্‌বো না, আমি এদেশে থাক্‌বো না, আমি বিলেতে গিয়ে থাক্‌বো।" দাদা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে আবার বল্লে "আমার যদি একটা ভাই থাক্‌তো তা'হলে বেশ হোত, আমি ভগবানের কাছে কখন কিছু চাইনি কিন্তু এখন বল্‌ছি আমার যেন একটা ভাই হয়।" মা ধমক দিয়ে বল্লেন "কি যা' তা' বক্‌ছিস অচু, ভাই হোলে তোর যে ভাগিদার হোত।" দাদা বল্লে তা' হোক্, আমি সব দিয়ে যেতুম; আমি তোমাদের তার কাছে রেখে চলে যেতুম আর কোন দায়িত্ব থাক্‌তো না।" আমি বল্লুন "ও বাব্বা, মনে মনে এত ফন্দি এঁটেছ দাদা, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়বো না, সে তুমি বিলেতেই যাও আর যেখানেই যাও সঙ্গে সঙ্গে যাবোই, যেমন করেই হোক্।" দাদা বল্লে "তোকে নিয়ে গেলে তো"।

পাঁচটার গাড়ীতে দাদা চলে গেল।

আমরা বাবার সঙ্গে অঘ্রাণ মাস থেকে রোজ ভোরে নদীর ধারে বেড়াতে যেতুম। বেড়াতে বেড়াতে দাদার কথা আমাদের বেশী আলোচনা হোত। বিকেলে আবার দিদি আর আমি নদীর ধারে বেড়াতে যেতুম। সেদিন নদীর ধারে বসে মনে হচ্ছিল আচ্ছা এই নদীর তীরে এলে আমার প্রাণে এত আনন্দ আসে কেন? নদীর কলকল শব্দ প্রত্যেক মানুষের কানে যেমন ভাবে বাজে আমারো কি ঠিক তেমনি ভাবে বাজে? আমার মনের ভেতর থেকে

কে বলে 'ওঠে 'না তা' নয়, এর সঙ্গে যে তোমার আশৈশবের স্মৃতি জড়ানো' তার উপর এখানে আমি একটা শান্তি পাই।

রোজ নদীর ধারে বসে নদীর বিচিত্র খেলা দেখি; দিনান্তে সূর্য্যের ম্লান আভা নদীর বুকে, গাছের পাতায়, মানবের চোখে মুখে, ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্য্যের ছবি জলের উপর কখন স্থিরভাবে ভেসে ওঠে কখন নিষ্ঠুর তরঙ্গের খেলায়, খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যায়। সূর্য্য চলে যায় কিন্তু আকাশকে ব্যথায় রাঙ্গিয়ে দিয়ে যায়। আমার চোখের সামনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠে মিলিয়ে যায় আর আকাশের উপর রংঙের বিচিত্র খেলা চলে। তারপর ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টি দূরে চলে যায় যেখানে কোন রংঙের খেলা নেই, শুধু উপরে বিরাট শান্ত নীল আকাশ, আর নীচে জলের খেলা। ক্রমে একটা পাত্‌লা কুয়াসার ঘোমটা দূরের খেলাকে ঢেকে দেয়। মনের মাঝে একটা স্বপ্নরেখা টেনে দিয়ে যায়।

একদিন নদীর ধারে বসে আছি, সন্ধ্যে হয়-হয়, দূরে কে একজন ভারতের 'বন্দনা গীত' গেয়ে সকলকে ডাকছিল দেশের কাজে নাম্‌তে। হঠাৎ আমার মনে প্রশ্ন এল— আচ্ছা দেশ বড় না ভাই বড়?—দু'দিন ধরে এ প্রশ্নের মীমাংসা আমি কিছুতেই করতে পারলুম না। প্রাণ মন চায় বল্‌তে ভাই বড়, কিন্তু মহত্ত্ব এসে বাধা দেয়, বলে 'এ তোমার স্বার্থপরের মত কথা, তোমার ভাই, তুমি, ক'দিন থাক্‌বে? কিন্তু দেশ বিরাট একটা জাতের।' মনে হয় সত্যিই তো। কিন্তু ভায়ের চেয়ে যে আমি আর কাউকে ভালবাস্‌তে পারিনি। শেষে ঠিক করলাম ব্যক্তিগত ভাবে ভাই বড়, অন্তরে ভাই বড়, আর সমষ্টিভাবে দেশ বড়। বুঝলুম এ স্বার্থপরের মত হোল, কিন্তু কি করবো আমি আর নিজের সঙ্গে যুঝ্‌তে পারলুম না। আমার একমাত্র জীবনের লক্ষ্য আমার ভাই।

(ক্রমশঃ)

প্রকৃতি ঘোষ

বুদ্ধদেব

—মহবুব্—

সুন্দর নিরমল সুকোমল শুদ্ধ
বিধাতার করুণার পূত ধার বুদ্ধ।
দেবগণ-ধ্যান-ধন জগ-জন পূজ্য,
আঁধিয়ার দুনিয়ার চন্দ্রিকা সূর্য্য।

দ্বন্দ্বরে বিভেদের মিলনের পন্থা,
অন্যায় অনাদর হিংসার হন্তা,
প্রীতি-প্রেম-দয়া-ক্ষেম-স্নেহ-সুধা-সিন্ধু
বিশ্বের নিঃস্বের বক্ষের ইন্দু।

অজ্ঞান তমোহর, মহাজ্ঞান দীপ্তি,
সত্যের প্রচারক সাধনার সিদ্ধি,
চেতনের নিকেতন শান্তির কক্ষ,
দুষ্কৃত জনগণ বাঞ্ছিত মোক্ষ।

ধরমীর ধর্ম্ম সে মরমীর স্বর্গ,
তাঁর পদ কোকনদে প্রণতির অর্ঘ্য।

বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি গোড়ার কথা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম-এ

বাংলার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সকলের আগেই স্মরণ রাখা উচিত যে, ইতিহাসের প্রথম যুগে আমাদের দেশটি একটিমাত্র জাতির বাসভূমি ছিল না এবং একটি মাত্র নামেও পরিচিত ছিল না। আধুনিক বাংলাদেশ তখন বহুখণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং একেক খণ্ডে একেকটি বিশেষ 'জন' বা tribe বাস করত। একেকটি জনের দ্বারা অধ্যুষিত ভূখণ্ডকে বলা হ'তো একেকটি 'জনপদ' এবং ওই জনপদগুলি অধিবাসী জনের নামেই অভিহিত হ'তো।

বাংলার ইতিহাসের যবনিকা-উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌তে পাই, এ দেশে অন্যূন ছটি জনপদে ছটি স্বতন্ত্র জন বাস করছে। প্রথমেই তাদের নাম এবং বাসভূমির একটু পরিচয় দেওয়া যাক্‌। এই জনগুলির মধ্যে সকলের আগেই নাম করতে হয় অঙ্গদের। বর্ত্তমান মুঙ্গের এবং ভাগলপুর জেলায় ছিল তাদের বাস। কাজেই অঙ্গ-জনপদ বল্‌তে ঐ দুটি জেলাকেই বোঝায়। বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের রাজ্য হিসেবে এই অঙ্গ-জনপদের সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। আর, অঙ্গদের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হচ্ছে বঙ্গরা। এই বঙ্গ-জনের নাম থেকেই আমাদের দেশের নামটি উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু আদিকালে বঙ্গ-জনপদ আধুনিক বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশেই নিবদ্ধ ছিল। পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে ভাগীরথী ছিল বঙ্গ-জনপদের সীমা। কোনো সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী তাম্রলিপ্তিও (বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক) বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বে বঙ্গ-জনপদ বিস্তৃতিলাভ করেছিল এবং বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর এবং সুবর্ণগ্রাম বঙ্গের কেন্দ্র ব'লে গণ্য হ'তো। অঙ্গ ও বঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তৃতীয় জনের নাম হচ্ছে কলিঙ্গ। এই কলিঙ্গ জনপদ বঙ্গ-জনপদের পশ্চিম সীমা থেকে বর্ত্তমান উড়িষ্যার কতকাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্ত্তী কালে শুধু বৈতরণী নদীর দক্ষিণাংশই কলিঙ্গ নামে পরিচিত হ'তো। বর্ত্তমান রাঢ়দেশ তখন দুটি জনপদে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসী ছিল সুহ্মরা। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুবিখ্যাত তাম্রলিপ্তি-নগরী এই সুহ্ম জনপদেরই দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। রাঢ়ের উত্তরাংশের নাম ছিল ব্রহ্ম-জনপদ। (Ind. Hist. Quart. Sept, 1932 ; pp. 521-529) এই ব্রহ্ম-জাতির স্পষ্ট উল্লেখ নাই দশম শতাব্দীর বিখ্যাত কবি রাজশেখরের কাব্য মীমাংসা নামক গ্রন্থে। কোনো কোনো পুরাণে এবং ধোয়ীর পবনদূত নামক কাব্যেও এই ব্রহ্মদের উল্লেখ আছে। মহাভারতে প্রসুহ্ম নামক জনের উল্লেখ আছে। এই প্রসুহ্ম সম্ভবত' ব্রহ্ম জাতি থেকে অভিন্ন। যদি তাই হয়, তবে বলতে হবে ব্রহ্মার সুহ্ম জনেরই একটি শাখাবিশেষ। প্রাচীন বাংলার ষষ্ঠ জনের নাম হচ্ছে পুণ্ড্র। পণ্ডিতেরা মনে করেন পুণ্ড্র-জনপদ অবস্থিত ছিল উত্তর বঙ্গে, বর্ত্তমান রাজশাহী বিভাগে। কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক (সিল্‌ভাঁ্যা লেভি) প্রাচীন উড্রজাতিকে পুণ্ড্রদের সগোত্র ব'লেই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মহাভারতের একটি উপাখ্যান থেকে জানা যায়, অসুর-রাজ বলির মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয় এবং তাদের নামেই পূর্ব্ব ভারতের ঐ পাঁচটি জনপদ অভিহিত হয়। এই উপাখ্যানটি থেকে এই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি পাঁচটি জন (tribe) কোনো কোনো বিষয়ে পরস্পর পৃথক্‌ হ'লেও এরা মূলে কোনো একই মহাজাতির (race) বিভিন্ন শাখা মাত্র। এই শাখা জাতিগুলি কোন্‌ মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত সে-বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করব। এখানে

একথা বলা প্রয়োজন যে, খুব সম্ভবত' ব্রহ্মরা সুহ্মদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বা প্রশাখা ব'লে গণ্য হ'তো ব'লেই পূর্ব্বোক্ত সুদেষ্ণার উপাখ্যানে তাদের নামোল্লেখ নেই।

এ স্থলে একথা বলা প্রয়োজন যে, এই পাঁচটি বা ছ'টি জন ছাড়া আর কোনো জাতি প্রাচীন বাংলায় বাস করত না এমন মনে করার হেতু নেই। বরং আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন এদেশে বাস করত তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাদের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, উড্র জাতিকেও প্রাচীন বাংলার অধিবাসী জনবিশেষ ব'লে গণ্য করা সঙ্গত। আর, কর্ব্বট নামে আরেকটি ছোট জাতি রাঢ়ের কোনো অংশে বাস করত ব'লে মনে করার হেতু আছে। কাজেই একথাও সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় এই সাত-আটটি জনপদ ছাড়া আরও অপেক্ষাকৃত অখ্যাত-জনপদ অবস্থিত ছিল।

আমরা পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তর বঙ্গের প্রধান জন ও জনপদগুলির উল্লেখ করলুম। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী প্রদেশের জনপদ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করিনি। তার কারণ, বাংলার ইতিহাসের আদি যুগে এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সম্বন্ধে কোনো তথ্যই আজ পর্য্যন্ত জানা যায়নি। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এই প্রদেশে দুটি জনপদের কথা জানা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় দেখিয়েছেন, বর্ত্তমান শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলা তৎকালে সমতট নামে পরিচিত ছিল। এই সমতটের দক্ষিণে অবস্থিত বর্ত্তমান নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা নিয়ে ভূখণ্ড, তার প্রাচীন নাম ছিল হরিকেল, একথা মনে করার হেতু আছে। যথাসময়ে তা দেখাতে চেষ্টা করব।

প্রাচীন বাংলার এই জনদের সম্বন্ধে বৈদিক আর্য্যসাহিত্যে যে সমস্ত উল্লেখ আছে তার থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক আর্য্যরা এই জনদের নিরতিশয় অবজ্ঞার চোখেই দেখ্‌ত। অথর্ব্ববেদে (৫।২২।১৪) অঙ্গ এবং মগধ জনপদ দুটি তৎকালীন আর্য্যসভ্যতা এবং আর্য্যদেশের বহির্ভুক্ত ব'লেই গণ্য হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র জাতিকে অনার্য্য দস্যু ব'লে গণ্য করা হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকে

বঙ্গজাতির প্রথম উল্লেখ পাই। সেখানে বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদদের পক্ষী (বয়াংসি) ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। বোধায়নের ধর্ম্মসূত্রে (১।২।১৪) পুণ্ড্র এবং বঙ্গ-কলিঙ্গদের দেশে গেলে পুনস্তোম বা সর্ব্বপৃষ্ঠা নামক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। তা-ছাড়া, কলিঙ্গ-জনপদে যাবার দরুণ যে পাপ হয় তার জন্যে একটি বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের (বৈশ্বানরং হবিঃ) ব্যবস্থা আছে বোধায়নের ধর্ম্মসূত্রে (১।২।১৫)। কিন্তু ওই ধর্ম্মসূত্রেই অঙ্গদের সংকীর্ণযোনি অর্থাৎ মিশ্রজাতি ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে (১।২।১৩)। অপর একটি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে, তীর্থযাত্রা বিনা অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ জনপদে গেলে পুনঃ-সংস্কার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত মহাভারতের গল্পটিতেও অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতিকে অসুর-বংশোৎপন্ন ব'লেই গণ্য করা হয়েছে।

এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা একথা নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হয় যে, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা বৈদিক আর্য্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, প্রাচীন বাংলার এই জাতিগুলিকে কোনো একটি বিশেষ মহাজাতির (race) অন্তর্গত বিভিন্ন শাখাজাতি ব'লে মনে করার হেতু আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এই জাতিগুলিকে প্রায় সর্ব্বদাই এমনভাবে এক সঙ্গে উল্লেখ করা হ'য়ে থাকে যার থেকে সহজেই অনুমিত হয়, এই জাতিগুলি পরস্পর জ্ঞাতিত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিল। পাণিনি ৪।১।১৭০ এবং ২।৪।৬২ বার্ত্তিকসূত্র দ্রষ্টব্য। যা হোক্, বাংলার ইতিহাসের সর্ব্বপ্রথম গুরুতর সমস্যা হচ্ছে—অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন জনগুলি কোন্ মহাজাতির অন্তর্গত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা দেহের সংগঠন-বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি ক'রে এই সমস্যার বহু বিভিন্ন রকমের সমাধান করেছেন। কিন্তু ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে সংমিশ্রণ-ক্রিয়া এত প্রচুর পরিমাণে সংগঠিত হয়েছে যে, দেহের সংগঠন-বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন ক'রে এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আরেক শ্রেণীর পণ্ডিতরা আধুনিক বাংলা প্রভৃতি কথিত ভাষার নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

করেছেন। তাঁদের মতে দেহ বৈশিষ্ট্যের চেয়ে ভাষা বৈশিষ্ট্যই এক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভর-যোগ্য। "Racial conditions have become so complicated that it is no longer possible to analyse their constituents. Language alone has preserved a record which would otherwise have been lost."—Rapson, Cambridge History of India, Vol. I. p. 41.

ভারতীয় ভাষাসমূহের মূলপ্রকৃতির আলোচনা করলে বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণা এবং ছোটনাগপুরে কোল বা মুণ্ডাজাতীয় যে ভাষা কথিত হয় তাকে আর্য্য এবং দ্রাবিড়ী থেকে বিভিন্ন একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী ব'লে গণ্য করতে হয়। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে এই ভাষাই ভারতের প্রাচীনতম ভাষা। দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহের চেয়েও এ ভাষা প্রাচীনতর। এই ভাষা যে শুধু সাঁওতাল পরগণা এবং ছোটনাগপুরেই সীমাবদ্ধ তা নয়। পঞ্জাব থেকে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতে যে-সমস্ত মিশ্র ভাষা প্রচলিত আছে তাদের অনেকগুলির মূলেই ভাষাতাত্ত্বিকরা এই মুণ্ডাজাতীয় ভাষার ভিত্তি আবিষ্কার করেছেন। আসামের খাসিয়া পর্ব্বতে, উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মে, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এবং মালয় উপদ্বীপে মোন্-খ্মের জাতীয় যে-সমস্ত ভাষা এখনও প্রচলিত আছে পণ্ডিতদের বিবেচনায় ঐ ভাষাগুলিও ভারতীয় মুণ্ডা বা কোল-জাতীয় ভাষার সগোত্র। তা ছাড়া, বর্ত্তমান আনাম এবং কাম্বোডিয়াতেও এই শ্রেণীর ভাষা প্রচলিত আছে। তার থেকেই অনুমান করা হয়, এক সময়ে (ভারতীয় ইতিহাসের নিওলিথিক বা নব্যপ্রস্তর যুগে) সুদূর ইন্দোচীন থেকে সমগ্র ভূখণ্ডে একই ভাষা প্রচলিত ছিল। এই ভাষাগুলিকে ভাষাতাত্ত্বিকরা অষ্ট্রিক্ (Austric) এই সাধারণ নামে অভিহিত করেছেন (ঐ, পৃঃ ৪৮-৪৯; ১১২)।

অষ্ট্রিক্ ভাষাগুলির এই ভৌগোলিক সংস্থানের বিষয় বিবেচনা করলে এ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা এই অষ্ট্রিক্ভাষী মহাজাতিরই বিভিন্ন শাখা মাত্র। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি আছে এস্থলে সংক্ষেপে তার আলোচনা করব।

পূর্ব্বেই বলেছি দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর ক'রে ভারতীয় জনসমূহের জাতি (race) নির্ণয় করা দুষ্কর বা একেবারেই অসম্ভব। অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিকই স্বীকার করেন, আধুনিক মুণ্ডাভাষী জাতিদের এবং দ্রাবিড়ীভাষী জাতিদের মধ্যে দৈহিক গঠন বিষয়ে কোনোই পার্থক্য নেই। বস্তুত' দ্রাবিড় জাতিদের আসল দৈহিক প্রকৃতি কি ছিল তাই এখন সংশয়ের বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে (ঐ, পৃঃ ৪১, ৪২, ৮৫ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

বৈদিক যুগের আর্য্যরাও যে অষ্ট্রিক বা মুণ্ডাজাতীয় জনসমূহের বিষয় অবগত ছিলেন, সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু প্রমাণ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর প্রভৃতি কয়েকটি জাতিকে দস্যু ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে, বৈদিক আর্য্যরা শুধু অনার্য্য দ্রাবিড়দেরকেই দস্যু নামে অভিহিত করত। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। তারা আর্য্যেতর শত্রুজাতিকেই দস্যু বলত। তার প্রমাণ শবর জাতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত অন্ধ্ররা সম্ভবত দ্রাবিড়-জাতীয়। কিন্তু শবররা দ্রাবিড় জাতীয় নয়, এই হচ্ছে পণ্ডিতদের অভিমত। প্রাচীন শবরদের বংশধরেরা বর্ত্তমানকালেও শবর নামেই পরিচিত। বর্ত্তমান উড়িষ্যা এবং মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সির সীমান্ত প্রদেশে তাদের বাস এবং তাদের ভাষা আদিতে মুণ্ডা বা অষ্ট্রিক্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তার প্রমাণ এখনও তাদের কথিত ভাষায় বিদ্যমান আছে (ঐ, পৃঃ ১১৭, ১২৪)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত শবররা যদি অষ্ট্রিক্-জাতীয় হয়, তাহ'লে তাদের সঙ্গে উল্লিখিত পুণ্ড্রাও অষ্ট্রিক্-জাতীয় হওয়া বিচিত্র নয়।

আর্য্যরা যখন ক্রমে ক্রমে সপ্তসিন্ধু থেকে লৌহিত্য পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ল তখন তারা স্বভাবতই এমন সব গাছপালা, ফলফুল, জীবজন্তু প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে লাগ্ল যা তারা আগে কখনও দেখেনি এবং কাজেই যার পরিচয়-সূচক কোনো নাম আর্য্য ভাষায় ছিল না। অথচ তাদের একেকটি নাম তো চাই। কাজেই আদিম অধিবাসীদের দেওয়া নামগুলোই গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লো। বৈদিক আর্য্যভাষা এবং পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায়

এমন বহু শব্দের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যা আর্য্যরা মুণ্ডা বা অষ্ট্রিক্-জাতীয় ভাষা থেকে ধার করেছিল। ওই শব্দগুলির বিশদ আলোচনা করলে বর্ত্তমান বাংলাদেশ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদের জাতি নির্ণয় করা সহজ হয় এবং তাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি বহু বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। এই প্রণালীর ভাষা-তত্ত্বের আলোচনার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা খুব সম্ভবত' অষ্ট্রিক্-ভাষী মহাজাতিরই কয়েকটি শাখা। এ নূতন পদ্ধতির ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে যাঁরা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক Jean Przyluski। তাঁর অনুসরণ ক'রে অন্যান্য পণ্ডিতরা এ পথে আরও অগ্রসর হয়েছেন। এস্থলে আমরা তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষেপে আলোচনা ক'রেই বর্ত্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

উক্ত প্রকার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা পণ্ডিতরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খুব সম্ভবত কলা, নারিকেল, জাম, লাউ, বেগুন, নেবু প্রভৃতি ফলের নাম প্রথমে আর্য্য-ভাষায় ছিল না। কারণ ও সমস্ত ফলের সঙ্গে আর্য্যদের পরিচয়ই ছিল না। পরে ওগুলোর সঙ্গে যখন তাদের পরিচয় ঘটল তখন তারা ওদের নামগুলোও স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকেই ধার করল। পণ্ডিতদের মতে কদলী, নারিকেল, জম্বু, অলাবু, বাতিঙ্গন, নিম্বু প্রভৃতি শব্দ অষ্ট্রিক্ ভাষার শব্দ থেকে উৎপন্ন। জীবজন্তুর মধ্যে গজ, মাতঙ্গ, গণ্ডার, ময়ূর, কপোত, কাক প্রভৃতির নামও মূলে অষ্ট্রিক্-ভাষাজাত ব'লে তাঁদের বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মনে করেন, আধুনিককালেও কুকুরকে ডাকবার জন্যে কিংবা লেলিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে যে তু-তু বা ছু-ছু শব্দ ব্যবহৃত হয় তাও কুকুরবাচক অষ্ট্রিক্ শব্দ থেকেই উৎপন্ন। জৈন আচারাঙ্গ সূত্র থেকে জানা যায়, মহাবীর যখন রাঢ়দেশে এসেছিলেন তখন স্থানীয় লোকেরা 'ছুচ্ছু' শব্দ ক'রে তাঁর প্রতি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। তার থেকে প্রবোধ বাবু অনুমান করেন, রাঢ়ের তৎকালীন অধিবাসীরা খুব সম্ভব অষ্ট্রিক্ভাষী মুণ্ডা বা কোলজাতীয় ছিল। আজকালও রাঢ় অঞ্চলে অনেক কোলজাতীয় লোক বাস ক'রে। তা-ছাড়া, গুড়, তণ্ডুল, তাম্বুল, কম্বল, কার্পাস প্রভৃতিও অষ্ট্রিক্ ভাষা থেকে ধার করা শব্দ ব'লেই অনুমান হয়। শুধু যে শব্দই ধার করা হয়েছিল তা নয়। ওই সকল দ্রব্যের ব্যবহারও ধার করা হয়েছিল। ওই সকল দ্রব্যের কোনো কোনোটা যে অষ্ট্রিক্-ভাষী ইন্দোচীন কিংবা দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ থেকে আমদানি করা হয়েছিল এমন মনে করার হেতুও আছে। ওই সমস্ত আমদানি করা জিনিষের মধ্যে কামরাঙ্গা (কর্ম্মরঙ্গ) এবং সুপারি এই দুটির উল্লেখ করাই এস্থলে যথেষ্ট।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, বাংলার ইতিহাসের প্রথম যুগে যে-সমস্ত অধিবাসীরা পূর্ব্বভারতে তথা বাংলাদেশে বাস করত তাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ইত্যাদি। বৈদিক আর্য্যরাও ও-সব নামেই ওই জাতিগুলিকে অভিহিত করত। কারণ বৈদিক এবং সংস্কৃত সাহিত্যেই আমরা ওসব নামের প্রথম উল্লেখ পাই। অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি যে-সব নামে আর্য্যরা ওই জাতিগুলিকে অভিহিত করেছে সে নামগুলি কোন্ ভাষার শব্দ, এ প্রশ্ন সহজেই মনে জাগে। ওই নামগুলি আর্য্যদের দেওয়া নাম নয়, পরন্তু ওই অন্-আর্য্য জাতিদের নিজেদেরই দেওয়া নাম, একথাও সহজেই অনুমিত হয়। সুতরাং অঙ্গ বঙ্গ ইত্যাদি নামগুলিকে অন্-আর্য্য শব্দ ব'লেই ধ'রে নেওয়া সঙ্গত। খ্যাতনামা ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি মনে করেন অঙ্গ-বঙ্গ, কলিঙ্গ-ত্রিলিঙ্গ, উড্র-পুণ্ড্র, পুলিন্দ-কুলিন্দ, কোসল তোসল প্রভৃতি নাম মূলত' অষ্ট্রিক্ ভাষাজাত শব্দ। অষ্ট্রিক্ ভাষার ব্যুৎপত্তির নিয়ম ওই শব্দগুলি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সুহ্ম এবং ব্রহ্ম, এই শব্দদ্বয়কেও সম্ভবত ওই নিয়ম অনুসারে অষ্ট্রিক্ শব্দ ব'লে গণ্য করা যেতে পারে। পূর্ব্বেই বলেছি বর্ত্তমান রাঢ়ের দক্ষিণাংশ সুহ্মদের এবং উত্তরাংশ ব্রহ্মদের বাসভূমি ছিল, এরূপ মনে করার হেতু আছে। গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমির গ্রন্থে Brammakowra নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক Jean Przyluski দেখিয়েছেন, ওই নামটির যথার্থ রূপ হচ্ছে ব্রহ্মকুর বা ব্রহ্মপুর (কুর=পুর) এবং তিনি বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত

প্রোমনগরের সঙ্গে উক্ত ব্রহ্মপুরের কোনো সম্বন্ধ থাক্‌তেও পারে এমন ইঙ্গিত করেছেন। ভামো শহরের নামটিও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। তাঁর এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহ'লে উত্তর রাঢ়ের অধিবাসী প্রাচীন ব্রহ্মজাতির সঙ্গে টলেমির উক্ত ব্রহ্মপুরের এবং বর্ত্তমান দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের প্রোম (বা ভামো) নগরের কোনো প্রকার সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নয়। যা হোক্, অধ্যাপক Jean Przyluski অঙ্গ-বঙ্গ এবং উড্র-পুণ্ড্র শব্দের অষ্ট্রিক্ ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কুলিন্দ-পুলিন্দ, কোসল-তোসল, কলিঙ্গ-ত্রিলিঙ্গ প্রভৃতি শব্দ অষ্ট্রিক্-ভাষাজাত হওয়া সম্ভব ব'লেই তিনিও মনে করেন।

অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জাতিবাচক নাম এবং কদলী, তাম্বুল, কম্বল প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে অনুমান হয়, বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অষ্ট্রিক-ভাষী মহাজাতিরই কয়েকটি শাখা। কাজেই ভারতীয় আর্য্য-সাহিত্যে অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জাতির প্রতি যে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের অষ্ট্রিক্-ভাষী জাতিভুক্ত ব'লে মনে করার পক্ষে আরও যে সব যুক্তি আছে, এস্থলে তার দুয়েকটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। বাংলায় আমরা বিংশতি অর্থে 'কুড়ি' শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকি। আর্য্য বা সংস্কৃত ভাষায় 'কুড়ি' শব্দের অনুরূপ কোনো শব্দ নেই। পক্ষান্তরে কোল বা মুণ্ডা ভাষায় উক্ত অর্থে 'কুড়ি' শব্দটি ব্যবহার হ'য়ে থাকে। মূলত এশব্দটির অর্থ হচ্ছে মানুষ এবং মানুষের অঙ্গুলিসংখ্যা বিশ ব'লে কুড়ি শব্দটিও ওই অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার, সাঁওতালি ভাষার গণ্ডা বা গোণ্ডা শব্দের অর্থ চার এবং পন্ বা পোন্ শব্দের অর্থ হচ্ছে আশি। এই শব্দ-দুটি থেকেই আমাদের গণ্ডা এবং পণ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, এমন মনে করার হেতু আছে। শুধু তাই নয়। চার কড়িতে এক গণ্ডা, পাঁচ গণ্ডায় এক কুড়ি, চার কুড়িতে এক পণ এবং এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি ইত্যাদি ধরণের যে গণনা প্রণালী আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তাও আসলে সাঁওতাল, কোল বা মুণ্ডাদেরই গণনা পদ্ধতি ব'লে পণ্ডিতরা মনে করেন। আর, সাঁওতাল, কোল্ বা মুণ্ডারা যে অষ্ট্রিক্-ভাষী জাতিরই শাখা সে-কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

আর্য্যরা যখন এদেশে আসে তখন তারা তীর-ধনুর ব্যবহার নিশ্চয়ই জানত। কিন্তু তথাপি তীর বাচক 'বাণ' শব্দটি তারা অষ্ট্রিক্‌ভাষা থেকে ধার করেছে, এ কথা মনে করার কারণ আছে। আর্য্যরা যে তীর বা শর ব্যবহার করত তা ছিল ধাতুনির্ম্মিত। কিন্তু অষ্ট্রিক্-ভাষী ভারতীয় অন-আর্য্যদের বাণ ছিল বাঁশের তৈরি। তাই মনে হয় বাঁশের তীর অর্থেই বাণ শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে তীর এবং বাণ শব্দ একার্থবাচক হ'য়ে গেল।

'লাঙ্গল' শব্দটিও ওই রূপেই অষ্ট্রিক্ ভাষা থেকে আর্য্য ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এ শব্দটি ঋগ্বেদেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় কিংবা অভারতীয় কোনো আর্য্য ভাষাতেই এ শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অভারতীয় কোনো আর্য্য ভাষাতেই 'লাঙ্গল' কথার অনুরূপ কোনো শব্দ নেই। অথচ অষ্ট্রিক্ ভাষাগুলিতে অনুরূপ বহু শব্দ আছে এবং ওসব ভাষার নিয়ম অনুসারে ও-শব্দটির ব্যুৎপত্তি করাও সহজ-সাধ্য। কাজেই অনুমান হয় ও-শব্দটি ঋগ্বেদের যুগেই অষ্ট্রিক্ ভাষা থেকে আর্য্য ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। শুধু তাই নয়। লাঙ্গল, লাঙ্গুল, লগুড় এবং লিঙ্গ শব্দ মূলত একার্থবাচক ব'লেই ভাষাতাত্ত্বিক Jean Przyluski সিদ্ধান্ত করেছেন এবং তাঁর মতে ওই সব-কটি শব্দই অষ্ট্রিক্ ভাষা থেকে নেওয়া। তিনি আরও অনুমান করেন লাঙ্গল শব্দের দ্বারা পূর্ব্বে যে কৃষি-যন্ত্র বোঝাত তা আধুনিক লাঙ্গলের অনুরূপ ছিল না। লাঙ্গল শব্দের দ্বারা পূর্ব্বে তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড (বা লগুড়) বোঝাত এবং তাই কৃষির নিমিত্ত খনন-যন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হ'তো এবং সেজন্যই লাঙ্গল, লাঙ্গুল এবং লিঙ্গ শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

ভারতের আদিম অষ্ট্রিক্-জাতীয় অধিবাসীদের ভাষা থেকে 'লিঙ্গ' শব্দটি আর্য্য ভাষায় গৃহীত হয়েছিল, এ সিদ্ধান্তটি যদি সত্য হয় তা'হলে লিঙ্গ-পূজার প্রথাও ঐ আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকেই হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়েছে, এই অনুমান করতে হয়। পূর্ব্বোক্ত ফরাসী ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতও এই

সিদ্ধান্তের পক্ষেই মত দিয়েছেন। Dr. J. H. Hutton ও অনুমান করেন, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্ম্ম সম্ভবত অষ্ট্রিক্ জগৎ থেকেই ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। যদি এ অনুমান সত্য হয় তাহ'লে বল্‌তে হবে, বৈদিক আর্য্যরা শিশ্নদেবা: ব'লে যে-জাতিদের নির্দ্দেশ করেছে তারা ভারতের আদিম মুণ্ডা বা অষ্ট্রিক্-ভাষী ছাড়া আর কেউ নয়। আসাম, বাংলা ও উড়িষ্যায় যে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখা যায় তার মূলে অষ্ট্রিক্-ভাষী ভারতীয় আদিম অধিবাসীদেরই প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। ডক্টর প্রাণনাথ ইদানীং দেখাতে চেষ্টা করেছেন, মোহেন্-জো-দড়োর প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। যদি তাঁর একথা সত্য হয় তাহ'লে পূর্ব্বভারতের অষ্ট্রিক্-ভাষী তান্ত্রিক অধিবাসীদের সঙ্গে মোহেঞ্জো দড়োর সভ্যতার কোনো প্রকার সম্বন্ধ ছিল এই অনুমানও করতে হয়। কিন্তু আমাদের প্রমাণ ও ও অনুমান ক্রমে কল্পনায় পরিণত হচ্ছে। সুতরাং এখানেই আমাদের বিরত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তা-হ'লেও ব'লে রাখা দরকার যে, এ কল্পনা একেবারেই নিছক কল্পনা নয়। কারণ অধ্যাপক Przyluskiও বলেছেন—"Nothing prevents us to hold that the degenerated Santals are the descendants of the people who built Harappa and Mohen-jo Daro" (Ind. Hist. Quart., Dec. 1931, p. 737). আর এই সাঁওতালরা যে বাংলার আদিম অধিবাসী অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি জাতি সমূহের সঙ্গে জ্ঞাতিত্বসূত্রে সম্বন্ধ, একথা মনে করবার পক্ষে কি হেতু আছে তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

পরিশেষে আর একটিমাত্র প্রশ্নের উত্থাপন ক'রেই আমাদের প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। আমরা দেখেছি, অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা খুব সম্ভবত অষ্ট্রিক্-ভাষী মহাজাতির শাখা বিশেষ, আর্য্যরা তাদের অবজ্ঞার চোখেই দেখ্‌ত এবং শত্রু ব'লেই মনে করত। তাদের ধর্ম্মও ছিল আর্য্য ধর্ম্ম বিরোধী। সম্ভবত' তারা ছিল লিঙ্গ-উপাসক (শিশ্নদেবাঃ) এবং এ জন্যও বৈদিক আর্য্যরা তাদের অবজ্ঞা করত। আর, বর্ত্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে এই যে তারা ছিল অনার্য্যভাষী। তাদের ভাষা ছিল বর্ত্তমান মুণ্ডা বা কোল-জাতীয় এবং অষ্ট্রিক্ ভাষার অন্তর্গত। কিন্তু তাদের ভাষাকে আর্য্যরা কি মনে করত এবং কি নামে অভিহিত করত সে বিষয়ে স্বভাবতই ঔৎসুক্য হয়। এ বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা এখন পর্য্যন্ত কেউ কিছু বলেন নি। কিন্তু এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এ স্থলে আমি একটি মাত্র বিষয়ের প্রতি একটু ইঙ্গিত ক'রেই ক্ষান্ত হব। আর্য্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের দ্বাবিংশ পটলবিসরে প্রাচীন ভারতীয় ভাষাসমূহ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। ভারতীয় ভাষার ইতিহাস সঙ্কলন করার পক্ষে এই অধ্যায়টির খুবই উপযোগিতা আছে ব'লে মনে করি। ঐ অধ্যায়ের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি।—

অসুরাণাং ভবেদ্ বাচা গৌড় পৌণ্ড্রোদ্ভবা সদা।
যথা গৌড়জন শ্রেষ্ঠৈং রুতং শব্দাবিভূষিতম্॥

এই উক্তি থেকে মনে হয় এক সময়ে গৌড় এবং পৌণ্ড্র ভাষা আসুর শ্রেণীভুক্ত ব'লে গণ্য হ'তো। তার একটু পরেই আবার বলা হয়েছে—"সর্ব্বেষাং অসুরপঙ্কাণাং বঙ্গ সামতটাশ্রয়াৎ"। সুতরাং বঙ্গ এবং সমতটের ভাষাও আসুর শ্রেণীর। এ বিষয়ে আরও যে সব উক্তি আছে তার বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর না হ'য়ে শুধু এইটুকুই বল্‌তে চাই, এ স্থলে অসুর শব্দের দ্বারা খুব সম্ভব শুধু অনার্য্যই বোঝাচ্ছে না, বিশেষ এক প্রকার ভাষার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সম্ভবত মুণ্ডা (অতএব অষ্ট্রিক্) জাতীয় ভাষাকেই আসুর ভাষা ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতের উপাখ্যানে অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতিকে যে অসুররাজ বলির সন্তান ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে তা একেবারেই নিরর্থক নাও হ'তে পারে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে অসুরদের ম্লেচ্ছভাষী ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে, এই উক্তিরও বিশেষ সার্থকতা থাকতে পারে। শতপথ ব্রাহ্মণে ও প্রাচ্যরা অসুর ব'লে অভিহিত হয়েছে। এই সমস্ত উক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য কি তা ভেবে দেখা উচিত। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে আধুনিক কালেও কোল বা মুণ্ডা ভাষার একটি উপশাখার নাম আসুরি, এটিও পূর্ব্ব ভারতেরই ভাষা। এই আসুরি উপভাষাটি হয়তো পূর্ব্ব

ভারতের প্রাচীন আসুর ভাষারই ক্ষীণ স্মৃতিটি বহন করছে।

পূর্ব্বোক্ত ফরাসী ভাষাতাত্ত্বিক Jean Przyluski অষ্ট্রিক্ ভাষার বিশ্লেষণ করতে করতে এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছেন যে সুমেরিয়ার প্রাচীন ভাষার সঙ্গে এ ভাষার কোনো প্রকার সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নয়। কারণ তিনি এই দুই ভাষার মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। আবার, সুমেরিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের মোহেনজো দড়োর সভ্যতার যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। তাহ'লে মোহেঞ্জো দড়ো সভ্যতার ভাষার সঙ্গে অষ্ট্রিক্ ভাষার কি কোনো সম্পর্ক ছিল? থাকা বিচিত্র নয়। পূর্ব্বে দেখেছি তান্ত্রিক ধর্ম্ম মোহেঞ্জোদড়ো এবং পূর্ব্বভারত উভয় এই বিদ্যমান ছিল, এমন মনে করার হেতু আছে। মোহেঞ্জোদড়োর প্রাচীন অধিবাসীরাও শিশ্ন অর্থাৎ লিঙ্গ-উপাসক ছিল। যদি এ সব অনুমান সত্য হয় তাহ'লে মনে করতে হবে, এক সময়ে লৌহিত্য থেকে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত একই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল এবং সে সভ্যতার সঙ্গে সুমেরিয়ারও যোগ ছিল। আর, এই সভ্যতার অধিকারী যারা, তাদের সঙ্গেই বৈদিক আর্য্যদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। আর্য্যরা হয়তো এদেরকেই অসুর বল্‌তেন। এই সুমেরিয়-সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টাদের সঙ্গে Assyria বা Assur দেশেরও কোনো সম্পর্ক ছিল, কেউ কেউ এমন অনুমানও করেছেন। তাঁদের এ অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন না হ'তেও পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে কল্পনার সাহায্য ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের দ্বারা এসব কথা প্রতিপন্ন করার কোনো উপায় নেই।

সিন্ধুনদীর তীরে যে-প্রদেশে মোহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা এক সময়ে বিকাশ লাভ করেছিল ওই প্রদেশই পরবর্ত্তী কালে সিন্ধু-সৌবীর নামে পরিচিত হয়েছিল। বোধায়নের ধর্ম্ম-সূত্র থেকে জানা যায়, তৎকালে আর্য্যরা সিন্ধু-সৌবীর এবং অঙ্গ-মগধের অধিবাসীদের মিশ্র জাতি (সংকীর্ণ যোনয়ঃ) ব'লে গণ্য করত। এই উভয় প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী অবন্তি, সুরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ এবং উপাবৃৎ দেশের লোকেরাও "সংকীর্ণ যোনি" ব'লে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে পুণ্ড্র, সৌবীর এবং বঙ্গ কলিঙ্গের অধিবাসীরা একেবারে অমিশ্র অনার্য্য ব'লেই গণ্য হয়েছে। এই শ্রেণী বিভাগের যথার্থ কারণ কি, অঙ্গ-মগধের সঙ্গে সিন্ধু-সৌবীরের জাতিগত কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা, এ বিষয়ে আরও বিশেষ গবেষণা করা আবশ্যক। আমাদের জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় কতগুলি hypothesis নিয়ে তথ্যের অনুসন্ধান করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই।

যা হোক্, অধ্যাপক Jean Przyluski, Sylvain Levi প্রভৃতি মনীষীদের গবেষণা থেকে একমাত্র এই সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন ব'লে মনে হয় যে, অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অষ্ট্রিক্-ভাষী এবং বৈদিক আর্য্যসমাজের সঙ্গে তাদের কোনো সম্বন্ধই ছিল না। কিন্তু এই অষ্ট্রিক্‌ভাষী অনার্য্য জাতিরাই পরবর্ত্তী কালে আর্য্যদের সম্পর্কে এসে ক্রমে আর্য্য-ধর্ম্ম, আর্য্য ভাষা, আর্য্য সমাজবিধি, এক কথায় আর্য্যসভ্যতাকে আত্মসাৎ ক'রে আর্য্য সমাজ-ভুক্ত হ'য়ে গেল। বাংলার এই আদিম অষ্ট্রিক্-ভাষী অনার্য্যরা কিরূপে শুধু আর্য্যসমাজভুক্ত নয়, পরন্তু আর্য্যদের সমাজবিধি, ধর্ম্ম, ভাষা ও সভ্যতার পতাকাবাহী গর্ব্বিত জাতিতে পরিণত হয়েছে তার ইতিহাস খুবই ঔৎসুক্যকর। কিন্তু সে আলোচনার স্থান এটা নয়। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বাংলার এই আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যারা পুরোপুরি আর্য্য সমাজ-ভুক্ত হ'তে পারেনি পরবর্ত্তী কালে প্রধানত তারাই ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে বাংলার বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ গঠন করেছে। বস্তুত বাংলার ইতিহাস আলোচনার ফলে সর্ব্বপ্রথমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হয় সেটি এই যে,—বাংলার হিন্দুরাও মূলত' আর্য্য বংশধর নয়, বাংলার মুসলমানরাও মূলত আরব, তুর্কী কিংবা পাঠান-মোগলের বংশধর নয়। আসলে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই একই অষ্ট্রিকভাষী মহাজাতি সম্ভূত—এই হচ্ছে বাংলার ইতিহাসের সর্ব্বপ্রথম এবং বোধ করি সর্ব্বপ্রধান তথ্য।

প্রবোধচন্দ্র সেন

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

হিন্দু-বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন

ডাঃ গৌরের হিন্দু-বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাবিত আইন বিবেচনার জন্য সিলেক্ট্ কমিটির হাতে গিয়াছে। ইহার পক্ষে ১২জন এবং বিপক্ষে ১১জন সদস্য ভোট দিয়াছিলেন। সরকারপক্ষ এবং মুসলমানেরা নিরপেক্ষ ছিলেন; মাত্র মিঃ গজ্‌নভী ইহার বিপক্ষতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন।

এই প্রকারের আইন ন্যায়সঙ্গত কিনা

এই আইন এবং এই প্রকারের অন্যান্য যে সকল আইন ধর্ম্ম এবং সমাজের প্রচলিত প্রথাকে পরিবর্ত্তিত করিতে চায়, তাহা প্রণয়ন করিবার নৈতিক অধিকার রাজসরকারের আছে কি-না, এই প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হইয়াছে। কোনও দেশের মানব সমাজের যে একত্রীভূত শক্তি সেই দেশের লোকের সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করে, তাহা হইতেছে রাষ্ট্রশক্তি। কাজেই, এমন কোনও প্রথা যদি থাকে, যাহা বহু মানবের কোনও প্রকার অধিকার বা স্বাধীনতা নষ্ট বা খর্ব্ব করিতেছে, তাহা হইলে সেই বাধা দূর করিবার নৈতিক অধিকার এবং দায়িত্ব, দেশের রাজসরকারের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু, আমাদের দেশ পরাধীন বলিয়া এবং যাঁহারা রাজ-ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন, এদেশের লোকের মঙ্গল অমঙ্গল, বা সুনীতি দুর্নীতি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবে না ও তাঁহারা এদেশের লোকের সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি নহেন এই অনুমানে লোকের মনে এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু, আমরা যদি উন্নতি-প্রয়াসী হই, তবে, সমাজ সংস্কারের জন্য অনেক ব্যাপারে, রাজসরকারের সহায়তা গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই।

তাহার পর, এই সকল আইন ভারতীয় আইন-সভার সাহায্যে বিধিবদ্ধ হইবে। এই আইন সভার গঠনের কথা বিবেচনা করিলে, এই সভার দ্বারা গৃহীত কোনও আইন, দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা কৃত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। তাহাও যদি আবার শুধুমাত্র নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের এবং যে সমাজের জন্য ইহা উদ্দিষ্ট, প্রধানতঃ তাঁহাদের দ্বারা উত্থাপিত ও গৃহীত হইয়া থাকে, তবে, ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিবার থাকে না। বর্ত্তমানে ভোটের অধিকার অপেক্ষাকৃত অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এই জন্য আইন সভার বর্ত্তমান সদস্যেরা ঠিক জনমণ্ডলীর প্রতিনিধি না হইতে পারেন, এই প্রকার একটা ক্ষীণ আপত্তির কথা অবশ্য উঠিতে পারে।

আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত আছেন। এই সকল আইন প্রণয়নের দ্বারা, তাঁহারা সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেছেন, অনেকে এরূপ অভিযোগ করিতেছেন। রাজনীতিক স্বার্থ জড়িত নাই, আমাদের এমন সকল আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া ব্রিটিশ সরকার যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহার মূলে এদেশের লোকের ধর্ম্ম বা সমাজ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাব ছিল, একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে। ধর্ম্ম এবং প্রাচীন প্রথা সম্বন্ধে এদেশের লোকের মনে সংস্কার যে অত্যন্ত প্রবল একথা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন; পাছে তাহাতে আঘাত দিতে যাইয়া কোনও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা এই নিরপেক্ষতা অবলম্বন

করিয়াছিলেন। এই প্রকারের নিরপেক্ষতা কোনও রাজসরকারের দায়িত্ব পালনের পরিচায়ক নহে।

সদস্তেরা যাঁহাদের প্রতিনিধি সেই জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া, নিজেদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন, এমন কথা উঠিতে পারে। সকল প্রকার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দেশের মধ্যে দুইটি মত থাকিবেই। বিশেষ করিয়া, আমাদের দেশের ন্যায় প্রাচীন এবং শিক্ষাবর্জ্জিত দেশে যে ইহার বিরুদ্ধতা করিবার অনেক লোক থাকিবে, তাহা সুনিশ্চিত। কোনও দেশেরই সাধারণ ভোট দাতারা সামাজিক বা রাজনীতিক জটিল বিষয় সম্বন্ধে সুবিবেচিত মতামত দিবার যোগ্যতা রাখেন না। আমাদের ভোটদাতারা অপেক্ষাকৃত অধিক অশিক্ষিত বলিয়া তাঁহাদের মতামতের মূল্য আরও কম। যাঁহারা কার্য্যের দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, যোগ্যতার দ্বারা সাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, সাধারণের পক্ষ হইয়া দেশের ও সমাজের পক্ষে শুভকর কার্য্য করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে।

দেশের মধ্যে যখন দুইটি পরস্পর বিরোধী মত আছে, তখন, কোন্ দলের মতানুসারে ইহাঁরা কার্য্য করিবেন তাহাও বিচার্য্য। দেশের শিক্ষিত চিন্তাশীল এবং উন্নতিকামী লোকেরা যে মত পোষণ করেন, দেশে শিক্ষাবিস্তারের সহিত যাহা ক্রমেই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিলাভ করিবে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে দেশের লোকের মত। ইহাঁরাই প্রকৃতপক্ষে সমাজ নিয়ন্ত্রিত ও জনমত পরিচালিত করেন।

এই আইনের সত্য কোনও প্রয়োজন আছে কিনা

হিন্দুরা মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে বিবাহ শুধুমাত্র সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক চুক্তিমাত্র নহে। ইহার আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্য তাঁহাদের নিকট কম নহে। কিন্তু, শুধু হিন্দুদের পক্ষে নহে, সকল মানব সমাজের পক্ষেই বিবাহের আদর্শ এবং লক্ষ্য ঐ একই প্রকারের উচ্চ; আবার পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সাধারণ ক্ষেত্রে নরনারীর বৈবাহিক মিলন যে এই আদর্শানুরূপ থাকে নাই, তাহা হিন্দুদের মধ্যেও সমানই সত্য। কাজেই, পৃথিবীর অন্য সর্ব্বত্র যাহার প্রয়োজন হইয়াছে, হিন্দুদের পক্ষেও যে তাহার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বাহুল্য দেখাইয়া কেহ কেহ এই কথা বলিতেছেন যে, এই আইন প্রবর্ত্তিত হইলে, আমাদের সমাজেও এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে।

পাশ্চাত্য সমাজের এই অবস্থা নিঃসন্দেহ ভয়াবহ এবং আভ্যন্তরীণ অস্বাস্থ্যের পরিচায়ক। কিন্তু, লক্ষণকে কারণ বলিয়া মনে করিলে বিশেষ ভুল করা হইবে। বর্ত্তমান জীবনযাত্রা আবেষ্টন এবং সামাজিক অবস্থার মধ্যে ইউরোপে দাম্পত্যবন্ধন যে কিছু শিথিল হইয়াছে, এই কথা বিবাহ-বিচ্ছেদের বর্দ্ধিত সংখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহাকে বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী করা যায় না। বিবাহ বিচ্ছেদের সুবিধা পাশ্চাত্য দেশে পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে, অথচ পূর্ব্বাপেক্ষা বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা অনেকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের সুবিধা থাকা যদি কারণ হইত, তবে এই অবস্থান্তর ঘটিত না। বরং এই কথা বলা যায় যে, বহির্গমনের এই স্বাভাবিক পথ যদি না থাকিত তবে, গ্লানিতে সমাজদেহ ভরিয়া উঠিত।

আমাদের সমাজে প্রকৃতপক্ষে নারীর অধিকার এবং মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা খুবই কম। বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন বা নিয়ম না থাকিলেও, ইচ্ছা করিলেই, পত্নীত্যাগ করিয়া অথবা না করিয়াই পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু, যতই অসুবিধা হউক, লাঞ্ছনা, গ্লানি, এবং অপমান থাকুক, নারীর পক্ষে পতিত্যাগ বা পত্যন্তর গ্রহণ সম্ভব নহে। অনেকস্থলে এজন্য যে গ্লানি এবং অসুবিধার সৃষ্টি হয়, বিবাহ-বিচ্ছেদের সুবিধা থাকিলে কখনই তাহা হইত না।

বর্ত্তমানে নারীর প্রতি যেরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার সম্ভব হইতেছে, এই আইন প্রবর্ত্তিত হইলে তাহা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। সমাজে নারীর অধিকার এবং মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহা পুরুষ ও নারী উভয়েরই পক্ষে হিতকর হইবে।

ইহাতে দাম্পত্য-বন্ধন শিথিল হইবে কি না? যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় হইবে, তবে, একথাও স্বীকার

করিতে হইবে যে, দাম্পত্য-বন্ধনের সত্য মূল্য কিছু নাই, শুধুমাত্র কৃত্রিম উপায়ে ইহাকে রক্ষা করা হইতেছে এবং এ সম্বন্ধে আমাদের সব গর্ব্বই অমূলক। কিন্তু, আসলে তাহা সত্য নহে। দাম্পত্য-বন্ধনের মূল মানুষের চিত্তের গভীর প্রদেশে নিহিত; এই আকর্ষণ এত প্রবল এবং স্বাভাবিক যে মুক্তি পাইবার পথ আছে বা না আছে, সে চিন্তা, এই পথের অন্তরায় বা সহায়ক হইতে পারে না। সমাজে যেখানে অসন্তোষ এবং এই বন্ধন হইতে মুক্তির ইচ্ছা আছে, সেখানে তাহাকে একটা স্বাভাবিক পথ দেওয়ায় পারিবারিক শান্তি এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইবে। যেখানে বিবাহভঙ্গের জন্য আইনের সাহায্য লইতে কেহ অগ্রসর হইতে পারিবে, সেরূপস্থলে বাধ্য হইয়া একত্র থাকা বিচ্ছিন্ন হওয়া অপেক্ষা অনেক অধিক গ্লানিকর।

এই সকল কারণে এই আইন প্রবর্ত্তিত হওয়া সমাজের পক্ষে সর্ব্বথা মঙ্গলকর এবং বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সংস্কারের পক্ষে যদি ইঁহাদের মত না থাকে,—যেমন বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের অনুকূলে অনেকের নাই দেখা গেল—তবে, ইঁহারা বাংলার অগ্রবর্ত্তী জনমতের সত্য প্রতিনিধি নহেন বলিতে হইবে। এই সকল সংস্কারের পক্ষে থাকিয়াও যদি কেহ এই প্রকার আইনের প্রবর্ত্তক না হইয়া থাকেন তবে, তাহা দুই কারণে সম্ভব হইতে পারে। এক, তাঁহাদের মধ্যে এমন যোগ্য ব্যক্তি কেহ নাই, যিনি ইহা করিতে পারেন, অথবা তাঁহাদের কাহারও এমন প্রতিষ্ঠা নাই যাহাতে, অন্যান্য প্রদেশের সদস্যদের নিজের মতে বা দলে আনিতে পারেন। আর, যোগ্য ব্যক্তি কেহ থাকিলেও তাঁহার এমন উদ্যম বা যত্ন না থাকিতে পারে যাহাতে তিনি এই প্রকার চেষ্টা করিতে পারেন বা করিয়া সাফল্যলাভ করিতে পারেন। কারণ যাহাই হউক, ইঁহাদের মনে রাখা দরকার যে, বাংলার সুনাম এবং অতীত গৌরবের ধারা রক্ষা করিবার যে দায়িত্ব তাঁহাদের উপর আছে, তাহার গুরুত্ব কম নহে।

বাঙ্গালীদের তৎপরতা না যোগ্যতার অভাব

ভারতীয় আইন সভায় বাঙ্গালীরা এপর্য্যন্ত বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠা বা প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। নিখিল ভারতীয় অন্য সকল ব্যাপারে বাঙ্গালীর প্রাধান্য হ্রাসের ন্যায় এখানেও তাঁহাদের এই পাশ্চাদ্বর্ত্তীতার কারণ কি, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। তাঁহাদের যোগ্যতার অভাবে অথবা তৎপরতা এবং আগ্রহের অভাবে অথবা এতদুভয়ের সমবায়ে এই অবনতি ঘটিতে পারে।

গত শতাব্দীতে এবং এই শতাব্দীরও প্রথম ভাগে ভারতের জাতীয় জাগরণ-প্রচেষ্টায় বাঙ্গালীর স্থান সর্ব্বোচ্চ ছিল। সকল প্রকার সমাজ-সংস্কারের কার্য্যেও তাঁহারাই অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় আইন সভায় গুরুতর সমাজ সংস্কার-মূলক যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইল বা হইতে চলিল, তাহার কোনওটিই বাঙ্গালীদের দ্বারা উত্থাপিত বা তাঁহাদের চেষ্টায় বিধিবদ্ধ হইল না। ইহা রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্বদেশীয়দের পক্ষে গৌরবের কথা নহে।

ছেলেমেয়েদের একত্র শিক্ষা

আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রী শিক্ষার জন্য সমাজে যেটুকু আগ্রহ জাগিয়াছে, তাহাকে কাজে লাগাইবার মত সুযোগ আমাদের দেশে বর্ত্তমানে নাই। বিশেষ অসুবিধা এবং চিন্তার কথা এই যে, অদূর ভবিষ্যতে এই সুযোগ গড়িয়া তুলিবার সুবিধাও আমাদের নাই। কাজে লাগিবার দিক দিয়া বিচার করিলে আপাততঃ প্রবেশিকা পরীক্ষাকে প্রাথমিক এবং অপরিহার্য্য মনে করা যাইতে পারে।

আমাদের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলে। পল্লী অঞ্চলে যে সকল স্থানে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অধিক সংখ্যায় বাস করেন, সেই সকল স্থানে প্রধানতঃ পল্লীর স্কুলগুলি অবস্থিত। সর্ব্ব শ্রেণীর লোক এখনও শিক্ষার দিকে ঝুঁকেন নাই বলিয়া কোনও স্থানের শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থানীয় বালকদের দ্বারা কোনও স্কুল চলে না। যেখানে স্কুল নাই, এমন সব নিকট এবং দূরের গ্রাম হইতে বালকেরা আসিয়া স্কুলের

সন্নিহিত পরিবারে আহার বাসস্থান পায় এবং স্কুলের ছাত্রসংখ্যা পুষ্ট করিয়া স্কুল চলিবার পক্ষে সাহায্য করে। ইহা সত্ত্বেও ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য অনেক স্কুলেরই বাহিরের লোকের বদান্যতার উপর নির্ভর করিতে হয়।

যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে শিক্ষার সমধিক প্রচলন হইয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশের নিকট শিক্ষার নিজস্ব মূল্য অনেকটা গৌণ; জীবিকার্জ্জনের প্রধান উপায় বলিয়াই তাঁহারা এদিকে ঝুঁকিয়াছেন, এবং ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এজন্য অনেক সময় স্কুল চালাইয়া থাকেন।

পল্লীগ্রামে মেয়েদের জন্য এরূপ স্কুল গড়িয়া তুলা এবং চালান অসম্ভব। কারণ, যাহাদের মধ্যে এখনও শিক্ষার বিশেষ প্রচলন হয় নাই, তাহারা সহসা কন্যাকে শিক্ষা দিতে সম্মত বা আগ্রহান্বিত হইবে না। যাহারা বর্ত্তমানে ছেলেদের কষ্ট করিয়াও পড়াইতেছে, তাহাদের সকলে মেয়েদের পড়াইবে না। কাজেই, কোনও স্থানে শিক্ষা-গ্রহণেচ্ছু স্থানীয় বালিকার সংখ্যা এত অধিক হইবে না, যাহাতে এই প্রকারের বিদ্যালয় চলিতে পারে। স্থানীয় বালক ব্যতীত দূরের বালকেরা আসিয়া যেমন অনাত্মীয় পরিবারে থাকিয়া স্কুলে পড়ে, বালিকাদের পক্ষে নানাকারণে তাহা সম্ভব হইবে না। শিক্ষালাভের পর অর্থার্জ্জনের আশা বালিকাদের অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া, বালিকাদের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে লোকে কিছু সঙ্কুচিত হইবে। এজন্য ছাত্র-সংখ্যা সমান হইলেও, বালিকা-বিদ্যালয়ের আয় কম হইবার আশঙ্কা থাকিবে।

এই সকল নানা কারণে, পল্লী অঞ্চলে উচ্চ-শ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। আমাদের ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা যে এত পশ্চাদ্বর্ত্তী তাহারও প্রধান কারণ ইহাই। নহিলে পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার এই পার্থক্য যে, সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছে, পারিবারিক শান্তি ও জাতীয় প্রগতিকে ব্যাহত করিতেছে, সে কথা অনেকেই বুঝিয়াছেন।

এরূপ অবস্থায় বালকদিগের সহিত বালিকাদের একই বিদ্যালয়ে পড়াইবার ব্যবস্থা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, অনেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ইতিপূর্ব্বেই বালিকাদের শিক্ষার জন্য এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন, ও এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করিয়াছেন।

বালিকাদের পাঠ্যতালিকা, শিক্ষার বিষয়-বস্তু, শিক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতি যে বালকদের হইতে অনেকাংশে পৃথক হওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেখানে এজন্য পৃথক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, সেখানে সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহা করা বিধেয়। কিন্তু, অবস্থা যেখানে এমন যে, পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই, সেখানে কোনও শিক্ষাপ্রাপ্ত না হওয়া অপেক্ষা ত্রুটিযুক্ত শিক্ষা পাওয়াও ঢের ভাল। বালিকাদের জন্য পৃথক শিক্ষা এবং বালকদের সহিত একত্র শিক্ষা এই দুইয়ের মধ্যে যদি বাছিয়া লইবার সুবিধা থাকিত তবে, প্রথমোক্ত নীতি নিঃসন্দেহ সমর্থন-যোগ্য হইত।

সমাজের লাভ বা ক্ষতি

সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায়, বাংলাদেশে মেয়েদের স্বাধীনতা বা সর্ব্বত্র অবাধ গতিবিধি নাই। কাজেই, মেয়েদের বাড়ীর বাহির হইবার অথবা পুরুষের সহিত মেলামেশা করিবার দরকার হইলে, তাহাদের এবং ভবিষ্যৎ সমাজের অমঙ্গল হইবে মনে করিয়া কেহ কেহ উদ্বিগ্ন হইতে পারেন, অথবা আমাদের সামাজিক অবস্থা ইউরোপের সামাজিক অবস্থার ন্যায় হইয়া উঠিতে পারে, এই ভয়ে ছেলে মেয়েদের একত্র পঠন অনুমোদন না করিতে পারেন। কিন্তু ইউরোপের মানব প্রকৃতি, জীবনযাত্রা এবং সামাজিক নীতি সম্বন্ধে ধারণা এদেশ হইতে অনেক পৃথক। আমরা এই দেশের মধ্যের দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিতে পারি।

বাংলাদেশেই সমাজের নিম্নস্তরে অনেকস্থলে স্ত্রী পুরুষ একত্র কাজ করিয়া থাকে এবং পরস্পরের সহিত মেলামেশা বা আলাপ পরিচয়াদি করিবার পক্ষে বিশেষ কোনও বাধা এখানে নাই। দাক্ষিণাত্যে সমাজের সর্ব্বস্তরেই অনেক পরিমাণে এই সুবিধা আছে।

এই একত্র শিক্ষা এদেশেও একেবারে নূতন নহে;

ভারতবর্ষের অনেকস্থানে মিশ্রবিদ্যালয় আছে। বাংলাদেশের অনেক কলেজে কিছুদিন হইতে ছেলে মেয়েদের একত্র পড়িবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। এসকল স্থানে ব্যাপকভাবে কোনও অনুহিত সংঘটিত হইতেছে বলিয়া জানা যায় নাই। কাজেই, আলোচ্যক্ষেত্রেও বিশেষ কোনও অশুভফলের আশঙ্কা করা যায় না।

তাহার পর বাংলার পল্লীঅঞ্চলে বধূদের পক্ষে বিধি-নিষেধের যথেষ্ট কড়াকড়ি থাকিলেও, কন্যারা এই সকল বাধা হইতে অনেকটা মুক্ত। অন্ততঃ কিশোর বয়স পর্য্যন্ত ছেলে মেয়েরা একত্র খেলাধূলা করিয়া থাকে। স্কুলেও সাধারণতঃ এই বয়সের ছেলে মেয়েরা পড়িবে। অন্তত্র যদি অহিত কিছু না ঘটে, তবে অভিবাবকদের সতর্কতা এবং শিক্ষকদের সজাগ দৃষ্টি সত্ত্বেও কোনও প্রকার অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকিবে। বরং পরোক্ষ এই লাভ ইহাতে হইবে যে, সমাজে মেয়েদের দাসত্ব এবং অধীনতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

অবশ্য এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে বাংলার পল্লীঅঞ্চলে এখনও একটা গুরুতর অন্তরায় আছে। আমাদের নিতান্ত লজ্জা এবং গ্লানির কথা যে, এমন বহুস্থান আজও আছে, যেখানে মেয়েদের স্বাধীন গতিবিধি এবং প্রকাশ্যস্থানে যাতায়াত বা অবস্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। কাজেই, যে সকল স্থানে অশিক্ষিত লোকের বাস বেশী অথবা যেখানে স্কুলের বাহিরে মেয়েদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নাই, সেখানে বিশেষ সাবধানতার সহিত এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

ছাত্র-মঙ্গল সমিতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-মঙ্গল সমিতি, বিভিন্ন বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া, বিভিন্ন রোগগ্রস্তদের শতকরা অনুপাত নির্ণয় করিয়া, বয়সানুসারে বাঙ্গালী ছাত্রদের উচ্চতা, ওজন এবং অন্যান্য মাপের গড় নির্ণয় করিয়া, বিশেষ হিতকর ও প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতেছেন। আমাদের স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ গতির কথা এবং অন্যান্য জাতির তুলনায় আমাদের শারীরিক দুর্গতির কথা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থিরীকৃত ও লিপিবদ্ধ হওয়ায়, সাবধান হইবার এবং প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়া থাকিল। এতদিন বাঙ্গালীদের শারীরিক বৃদ্ধি, রোগগ্রস্তদের আনুপাতিক হিসাব এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের কোনও পরিমাপ ছিল না; সেদিক দিয়াও এই সমিতির কার্য্যের বৈজ্ঞানিক মূল্য কম নহে।

বাঙ্গালী ছাত্রদের বর্দ্ধিত অস্বাস্থ্য

ছাত্র-মঙ্গল সমিতির ১৯৩১ সালের বার্ষিক বিবরণে বাঙ্গালীছাত্রদের স্বাস্থ্যের যে অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অতিশয় ভয়াবহ। প্লীহাগ্রস্তদের সংখ্যা এবার অধিক দেখা যাইতেছে এবং তাহাতে দেশে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যে সকল স্থানে পূর্ব্ব হইতে ম্যালেরিয়া আছে, সেখান হইতে তাহা দূর করিবার কোনও চেষ্টা হইতেছে না এবং ক্রমেই নূতন স্থানসমূহে ইহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। গলার অসুখের রোগীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে; ইহাও সাধারণ স্বাস্থ্যহীনতার পরিচায়ক এবং অনেক সময়েই পুষ্টির অভাবে পরোক্ষ ফল। প্রত্যক্ষভাবে এক চতুর্থাংশ ছাত্র পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বাঙ্গালীদের কর্ম্মশক্তি ও উদ্যমের অভাব, প্রতিযোগিতায় অন্যান্য জাতির নিকট পরাজয় এবং প্রতিভা ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনায় সম্যক্ উদ্যমের অভাবের জন্য ম্যালেরিয়া এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব প্রধানতঃ দায়ী।

এক তৃতীয়াংশেরও কম ছাত্রের স্বাস্থ্য নির্দোষ।

বিভিন্ন জাতির ছাত্রদের শারীরিক বৃদ্ধি

৭ হইতে ১৮, এই বারবৎসরের মধ্যে বিভিন্ন জাতির ছাত্রদের মোট শারীরিক বৃদ্ধি নিম্নলিখিতরূপ :—

জাতি		উচ্চতা		ওজন
জার্ম্মান	...	৪৯.৫ c. m.	...	৩৯.৩
ইংরেজ	...	৪৮ "	...	৩৭.৮
জাপানী	...	৪৫ "	...	৩২
ফিলিপিনো	...	৪৭.৫ "	...	৩০.৯
বাঙ্গালী	...	৪৭.৫ "	...	২৯.৭

[১ c. m.='৩৯ ইঞ্চি; ১ kg.=২'২ পাউণ্ড]

উচ্চতার মোট বৃদ্ধির বেশীর ভাগ ১১ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে ঘটে।

ইংরেজ, জার্ম্মান এবং জাপানীরা ১৬ বৎসরের পরেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিন্তু ১২ অথবা ১৩ বৎসর বয়সে বৃদ্ধিটা অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়।

বাঙ্গালী এবং ফিলিপিনোদের মধ্যে ১১ হইতে ১৬র মধ্যে উচ্চতা বৃদ্ধির অনুপাত সব সময়েই প্রায় সমান এবং ১৫ বৎসরের পরে বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। ১৫ বৎসরের পরে বৃদ্ধি বন্ধের ব্যাপারটি ফিলিপিনো অপেক্ষা বাঙ্গালীদের পক্ষে অধিকতর সুস্পষ্ট।

এই বার বৎসর সময়ের মধ্যে জার্ম্মানদের ওজন বৃদ্ধি হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং বাঙ্গালীদের সর্ব্বাপেক্ষা কম।

১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে ইংরেজ জার্ম্মান এবং জাপানীদের মধ্যে ওজন-বৃদ্ধির হার পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া যায়; বাঙ্গালীদের মধ্যে এই বৃদ্ধি দেখা যায় না।

এই হিসাব হইতে ছাত্র-মঙ্গল সমিতি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, বাঙ্গালী ছাত্রদের বৃদ্ধি ১৬ বৎসর বয়সে সহসা বন্ধ হইয়া যায় এবং সমগ্র বাড়িবার বয়স ধরিয়াই উচ্চতার অনুপাতে ওজন বৃদ্ধি কম হয়।

১৬ বৎসর বয়সে বাঙ্গালীদের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি সহসা যে বন্ধ হইয়া যায়, দেখা গিয়াছে, ইহার মূলে গণনার ভুল থাকিয়া যাইবার একটা সম্ভাবনা হয়ত রহিয়া গিয়াছে। ছাত্রমঙ্গল সমিতি স্কুলে লিখিত বয়স দেখিয়া যদি বয়স ভাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অভিভাবকেরা যে ছেলেদের বয়স অনেক সময় স্কুলে কম করিয়া লিখাইয়া দেন, সেই ভুল বয়সকেই তাঁহারা ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা যাহাকে ১৬ বৎসরের বলিয়া ধরিয়াছেন, আসলে হয়ত সে ছাত্র ১৭ বা ১৮ বৎসর বয়সের। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে, তুলনামূলক আলোচনায় যে ফল পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীদের পক্ষে তাহা আরও প্রতিকূল হইবে। কারণ, এরূপ-ক্ষেত্রে সকল বয়স বিভাগেই ঐ ভুল হইয়াছে এবং অন্যান্য জাতির অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ছেলেদের সহিত আমাদের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের ছেলেদের তুলনা করা হইয়া গিয়াছে।

দৈহিক উচ্চতা মানুষের কতকটা বংশ ও জাতিগত; অবশ্য আহার এবং দেশের আবহাওয়ার পরেও কিছু পরিমাণে ইহা নির্ভর করে। কিন্তু, শরীরের ওজন, অস্থির পুষ্টি এবং মাংসপেশীর গঠনের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই দুইটি জিনিস আবার নির্ভর করে খাদ্যের উপর। বাঙ্গালীদের বিশেষ করিয়া শিক্ষিত শ্রেণীর খাদ্যে মাংসপেশী এবং অস্থি-গঠনোপযোগী উপাদান খুবই কম থাকে। বর্ত্তমান স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং ইহাদের শতকরা অনুপাত হইতেছে, ব্রাহ্মণ ৩১, কায়স্থ ২৮, বৈদ্য ৮, অন্যান্য হিন্দু ১৯, মুসলমান ৭, খৃষ্টান ২.৫ এবং অজ্ঞাত ৪.৫। ইহাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরাই প্রায় তিন চতুর্থাংশ। ইহাঁদের অনেকে স্থায়ীভাবে সহরে বাস করেন এবং যাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহাদেরও অধিকাংশের বেশীর ভাগ সময় সহরে কাটাইতে হয়। পল্লীতে অপেক্ষাকৃত সস্তায় যে সকল পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায় ইহাঁরা তাহার সুবিধা পান না; আবার অধিক ব্যয় করিয়া সহরে শরীর পোষণোপযোগী ভাল খাদ্য খাইবার আর্থিক সামর্থ্য খুব বেশীর ভাগ লোকেরই নাই। কাজেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের সমগ্র জাতির স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় প্রতিনিধি বলিয়া ছাত্রদের গণ্য করা যায় কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

ভাল খাদ্যের অভাবই যে আমাদের এই স্বাস্থ্য-হীনতার প্রধান কারণ, তাহার একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সকল সম্প্রদায় নদী, খাল অথবা বিলের ধারে বাস করেন ও মাছ, ডিম প্রভৃতি পেশী-গঠনোপযোগী খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খাইতে পান, শারীরিক উৎকর্ষে তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী জাতিদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। বাংলার নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি দৈর্ঘ্যে এবং পেশী-বহুলগঠনে পৃথিবীর যে কোনও বলিষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যবান জাতির সমকক্ষ হইবেন। অথচ, ইহাঁদেরই প্রতিবেশী যে সকল জাতির জীবনযাত্রা এবং জীবিকা একই প্রকারের, কিন্তু ঐ প্রকার ভাল খাদ্য পাইবার সুবিধা নাই, শরীর হিসাবে তাঁহারা অনেক নিকৃষ্ট। খাদ্যের পার্থক্য ব্যতীত এইরূপ হইবার আর কোনও কারণ আপাতঃ দেখা যায় না।

জয়েণ্ট সিলেক্ট্ কমিটিতে বাঙ্গালীর প্রতিনিধিত্ব

ভারতবর্ষ ও তৎপ্রদেশ সমূহের জন্য উদ্দিষ্ট শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য পার্লামেণ্ট একটি জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করিবেন। এই কমিটির সহিত পরামর্শ করিবার জন্য যে সকল ভারতীয় মনোনীত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহাতে প্রতিনিধি স্থানীয় বাঙ্গালীরা থাকেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা যাহাতে অন্য কোনও প্রদেশের প্রতিনিধিদের অপেক্ষা কম না হয়, সেজন্য বড়লাট এবং সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেটের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া বাংলা কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এই প্রস্তাব উত্থাপন কালে শ্রীযুক্ত এস, এম, বসু সুযুক্তি সহকারেই বলেন যে, বাংলায় এমন সব সমস্যা আছে, যাহা অন্য প্রদেশে নাই। বাংলার আর্থিক ও কৃষি এবং কর সম্বন্ধীয় অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যদিক দিয়াও বাংলার গুরুত্ব আছে। বাংলার লোক সংখ্যা ৫ কোটি, কিন্তু, বম্বের লোকসংখ্যা মাত্র ২৬০ লক্ষ, পাঞ্জাবের ২৫০ লক্ষ এবং মাদ্রাজের ৪৩০ লক্ষ। এই সকল কারণে, জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির নিকট বাংলার কথা যাহাতে ভালভাবে এবং যোগ্যতার সহিত বলা হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত দরকার।

বাংলার প্রতি সুবিচার করা হইবে না, এরূপ সন্দেহ কেন করা হইল, তাহার উত্তর দিতে যাইয়া বক্তা বলিয়াছেন যে, অবিচারমূলক মেষ্টনী ব্যবস্থার পর হইতে বাংলা যে দুর্ব্ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার কারণ বুঝা যাইবে। অন্যান্য প্রদেশ বাংলাকে শোষণ করিয়াছে এবং ভারত সরকারের তহবিল পুষ্ট করিতে বাংলা অনেক টাকা দিয়াছে। ১৯১৬ সাল হইতে পাটের শুল্ক বাবদ প্রায় ৫০ কোটি টাকা বাংলাকে দিতে হইয়াছে; ১৯২৯-৩০ সালে আয়কর বাবদ ২১৩ লক্ষ টাকা বাংলা হইতে ভারত সরকারের হাতে গিয়াছে। বাংলার প্রতি অবিচার অন্যদিক দিয়াও হইয়াছে; দ্বিতীয় গোল-টেবিল-বৈঠকে বাংলার প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে ইহাতে বম্বের প্রতিনিধি-সংখ্যা ১৩ জন, মাদ্রাজের ১১জন, পাঞ্জাবের ৭জন এবং বাংলা ও যুক্তপ্রদেশের মাত্র ৫ জন। কাজেই, অতীত ঘটনাবলী হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, বাংলাকে দরকার মত 'নিঙড়ান' হইয়াছে এবং সময় মত অবহেলা ও অবজ্ঞা করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বসু বহু বাঙ্গালীর কথাকে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কথা শুধু শুনিতে মিষ্ট অথবা তাহা আমাদের সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাবের অনুকূল বলিয়া যে মুখরোচক তাহা নহে; তাহা কঠোর সত্য ও সুসঙ্গত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ভাল।

পাটের শুল্কের টাকা আরও এই জন্য ন্যায়তঃ বাংলার প্রাপ্য যে, পাট প্রস্তুত করিতে বাংলাদেশের যে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এই টাকার দ্বারাই মাত্র তাহার কতকটা পূরণ হইতে পারে। বাংলা যদি পাটের শুল্কের এবং আয়করের টাকা—অন্ততঃ তাহার অধিকাংশ—না পায়, তাহা হইলে, শাসন সংস্কারের কোনও প্রকার সুবিধা গ্রহণ এ প্রদেশের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার

এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার ঘটিয়াছে। মৌলভী আবুল কাসেম এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন, আনন্দমোহন বসু, রামমোহন রায় এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিন চলিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের সহিত বাংলার বৈশিষ্ট্যও গিয়াছে। কাজেই, সরকারের নিকট হইতে সম্মান প্রত্যাশা করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীদের প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহারা সেই সম্মানের যোগ্য।

মৌলভী সাহেবের এই উক্তির তাৎপর্য্য এবং ইঙ্গিত কি তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা খুবই শক্ত। তিনি যদি মনে করিয়া থাকেন, বর্ত্তমানে যখন বাঙ্গালীর যোগ্যতার অভাব ঘটিয়াছে, তখন বাংলার নিজস্ব ব্যাপারেও বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্ব থাকা উচিৎ নহে এবং যেখানে বাংলার স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত, সেখানেও বাঙ্গালীর থাকিবার দরকার নাই; তাহা হইলে সেই যুক্তি অনুসরণ করিয়া বলা

যায় যে, বাংলায় যখন যোগ্য লোকের অভাব ঘটিয়াছে, তখন, বাংলার কাউন্সিলেও বাঙ্গালী প্রতিনিধিদের থাকিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীযুক্ত জে, এল, ব্যানার্জ্জী মহাশয় এই বক্রোক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, মৌলভী সাহেব ভুলিয়া গিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজও আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া আছেন, এই দেশ জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা এবং পি-সি-রায়েরও দেশ এবং এই দেশ বিশ্বের ভাবরাজ্যে বহু চিরস্থায়ী সম্পদ দান করিয়াছে। বাঙ্গালীর যোগ্যতার সমর্থনে আরও ২।১টি নাম হয়ত যোগ করা যাইত এবং আরও ২।১টি কথা হয়ত বলা যাইত। কিন্তু, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা পণ্ডশ্রম হইত মাত্র। মৌলভী সাহেবের ভাব দেখিয়া মনে হয়, তিনি কাউন্সিলের বাহিরের বাংলাদেশকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যোগ্যতা নিজের মাপ কাঠিতে মাপিতে চাহিয়াছিলেন।

নবাব মুসরেফ্ হোসেন এবং আরও অনেকে মৌলভী সাহেবের এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা

পরাধীনতা মানুষের যে সকল ক্ষতি করে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি হইতেছে যে, ইহা আমাদের আত্ম-বিশ্বাস এবং সম্ভ্রম-বোধ নষ্ট করিয়া, দাস-মনোবৃত্তি গড়িয়া তুলে। আমরা মাতৃভাষাকে যে পূর্ণ মর্য্যাদা বা মূল্য দিতে পারি না, তাহার মূলেও এই inferiority complex রহিয়াছে। আমাদের নিজেদের কোনও জিনিসের ভিতর শ্রেষ্ঠত্ব যে কিছু থাকিতে পারে, অজ্ঞাতসারেই, সে বিশ্বাস আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

বাংলার বিশ্ব বিদ্যালয় দুইটিতে বাংলাভাষার স্থান এখনও নিতান্তই গৌণ, এবং বাংলাকে যেটুকু গুরুত্ব দিবার কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তাহাও বিশেষ বেশী কিছু নহে। ইংরাজী শিক্ষার সপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহার সবগুলিই সর্ব্বাংশে সত্য, একথা মানিয়া লইলেও, দেখা যায়, শিক্ষার জন্য ইংরাজী ব্যবহার যেখানে অপরিহার্য্য, সে সকল স্থল ব্যতীতও, অন্য সর্ব্বত্রই আমরা ইংরাজীই ব্যবহার করি। যদিও এই সকল স্থানে বাংলা ব্যবহার সর্ব্বথা সম্ভব, শোভনীয় এবং কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

উপাধি বিতরণী সভা, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক কার্য্য। ইহার বক্তৃতা এবং পরিচালনা সহজেই বাংলায় চলিতে পারে। শিক্ষা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্য্যে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে বাংলা ব্যবহৃত হইলে, অসুবিধার কোনও কারণ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশ, প্রতিবেদন, এবং সভাসমিতির কার্য্যাদিতে বাংলা ব্যবহার অসঙ্গত নহে।

এ ব্যাপারে বাংলার আবার একটু বিশেষ দুর্ভাগ্য আছে। বাংলায় কোনও বড় করদ রাজ্য থাকিলে, সেখান হইতে সাহিত্য এবং ভাষা, উৎসাহ ও আনুকূল্য পাইত। এই সুবিধা থাকায় হায়দ্রাবাদের ওস্মানিয়া বিদ্যালয়ে, উর্দ্দু শিক্ষার বাহন হইতে পারিয়াছে এবং তাহাতে উর্দ্দুর সাহিত্যিক সমৃদ্ধি ও মর্য্যাদা বাড়িবার সুবিধা হইয়াছে। অন্য কোনও রূপে ইহা সম্ভব হইত না।

যদিও স্বাদেশিকতার প্রথম উদ্ভব বাংলাদেশে এবং বহুদিন ধরিয়া বাংলা সারা ভারতবর্ষকে প্রেরণা দিয়াছে ও পথ দেখাইয়াছে, এবং যদিও সাহিত্যিক সমৃদ্ধিতে বাংলা-ভাষা ভারতীয় ভাষাগুলির পুরোভাগে, তবুও উদ্যমের অভাবেই হউক অথবা নূতন পথে চলিবার সাহসের অভাবেই হউক, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় দুইটিতে বাংলাভাষা আজও পূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল না।

এবার কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন্ বক্তৃতা,

মালব্যজী হিন্দীতে প্রদান করিয়াছেন। ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষে এই প্রকার কার্য্য সম্পূর্ণ নূতন এবং বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

কলিকাতা এবং ঢাকায় এই নিয়ম অনুসৃত হওয়া উচিৎ এবং উপাধি বিতরণের বক্তৃতা দিতে এবং অন্যান্য কাজকর্ম্মে বাংলা ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ব্যাপারে বাঙ্গালী ভাইস্-চ্যান্সেলারদিগের কোনও প্রকার আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। অবাঙ্গালী ভাইস্-চ্যান্সেলারদিগের সম্বন্ধেও বলা যায় যে যাঁহারা বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন, তাঁহাদের নিকট হইতে বাংলার এতটুকু জ্ঞান আশা করা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার, দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তার নিকট হইতেও এটুকু প্রত্যাশা করা অন্যায় নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পর্য্যন্ত বাংলাকে শিক্ষার বাহন করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা নিঃসন্দেহ প্রশংসার্হ। কিন্তু, এইটুকু মাত্র যথেষ্ট নহে। এবিষয়েও অন্যান্য প্রদেশ বাংলাকে পশ্চাতে ফেলিতেছে।

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট্রাল-হিন্দু-স্কুলে বালকেরা মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা পাইতেছে এবং আগামী বর্ষ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসেও এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে।

কলিকাতার অধ্যাপক সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার চেষ্টাকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা যদি শিক্ষার উচ্চবিভাগেও এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, তবে তাহা আরও সঙ্গত হইত।

জাতিসংঘ ও জাপান

জগতের শান্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য জাতিসংঘের প্রয়াস যতই সাধু হউক, জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাতে সাফল্য লাভ করা যে নিতান্তই অসম্ভব, চীন জাপানের বিরোধের ব্যাপারে, অতি সহজে লীগের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিয়া, জাপান স্পষ্টভাবে তাহা প্রমাণ করিয়া দিল।

আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বাহিরের চক্রান্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য অনেকদিন হইতে চীন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। পরাধীন, পতিত দেশের লোক আমরা, ইহাতে অকপট সহানুভূতি আমাদের চিরদিনই ছিল এবং এখনও প্রাচ্যের একটি বহু প্রাচীন, সুসভ্য এবং উন্নতি-প্রয়াসী জাতিকে বলদৃপ্ত সাম্রাজ্য লোভের গ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। সুশিক্ষিত সৈন্যে, আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে, প্রাচ্যদেশগুলির মধ্যে জাপান সর্ব্বপ্রধান। কাজেই, চীন, জাপানের সহিত পারিয়া উঠিবে এমন সম্ভাবনা নাই। বহু মানুষের ধনসম্পত্তি, প্রাণ ও সম্মান নাশে, অমানুষিক নিষ্ঠুর বর্ব্বরতার ব্যাপক অনুষ্ঠানে মানব-সভ্যতা আর একবার পীড়িত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু
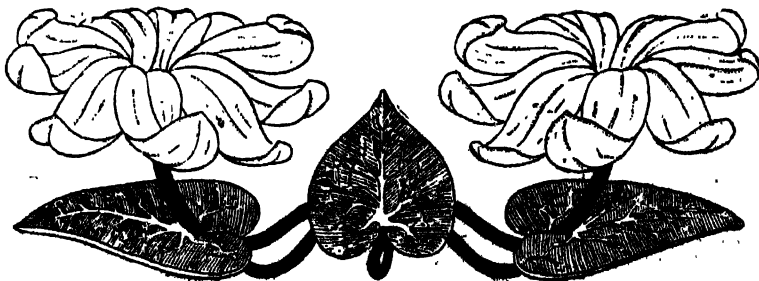
পুস্তক পরিচয়

স্বদেশ ও সাহিত্য—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীদীনেশ চন্দ্র বর্ম্মণ আর্য্য পাবলিশিং কোং ২৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১॥০ টাকা।

বিভিন্ন সময়ে লিখিত শরৎচন্দ্রের কতকগুলি প্রবন্ধ, অভিভাষণ ইত্যাদি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল, প্রকাশক সেগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসাবলী সহজলভ্য কিন্তু ইচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রবন্ধগুলি সহজে পাওয়া যাইত না, অথচ reference-এর জন্য সেগুলির অভাব বহুবার অনুভব করিয়াছি। আমার মত আর কেহ যদি এই অভাব অনুভব করিয়া থাকেন তবে তিনিও আমার সহিত প্রকাশককে ধন্যবাদ দিবেন একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শরৎচন্দ্রের রচনার স্বচ্ছতা এবং মাধুর্য্য অবিসংবাদিত একথা সকলেই জানেন। তাঁহার অনুকরণকারী লেখকগণ শত চেষ্টাতেও এই দুই গুণের নাগাল পায় না। কিন্তু এই গুণ শুধু তাঁহার কথা-সাহিত্যেরই নয়, প্রবন্ধ-সাহিত্যেরও বটে।

নিজের কথা জানি। বড় বড় মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা প্রবন্ধ পড়িতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কি সে ভাষার দুর্ভেদ্য বেড়াজাল, আর কি সে বক্তব্য বিষয়কে ধোঁয়া করিয়া তুলিবার অপরিসীম অধ্যবসায়! জ্ঞানের সম্পদ তার মধ্যে থাকে না এ কথা বলি না কিন্তু শত বাধা বিপত্তি ঠেলিয়া রসাস্বাদন করিবার মত সময় এবং সুযোগ সকলের থাকে না। আরো একটা কথা। অত্যন্ত দুরূহ এবং জটিল বিষয়ও যে সহজবোধ্য করিয়া লেখা যায় তাহার প্রমাণ দিয়াছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দিয়াছেন প্রমথ চৌধুরী। শরৎচন্দ্রও যে দিয়াছেন এই বইখানিতে তাহার প্রমাণ আছে। আমার তাই কেবলি মনে হয় জ্ঞান বিতরণের ভাণমাত্রই জ্ঞান বিতরণ নয়। মানুষ নিজের উপলব্ধিগত সত্যটা সহজগ্রাহ্য করিয়া বলিতে পারিলেই ঢের বেশি কাজ হয়।

শরৎচন্দ্র শুধু লেখকই নহেন, তিনি কর্ম্মী। কোন অনুপ্রেরণার ফলে তিনি কর্ম্মের ক্ষেত্রে নামিয়াছেন তাহার আভাস পাঠক "স্বদেশ" বিভাগের চারিটি প্রবন্ধ হইতে পাইবেন।

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা (উপন্যাসের চরিত্রগুলি) ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে, আমি ত জানি।" ভাল উপন্যাস লেখার secret কি, শুধু বাস্তব দিয়াই তাহা তৈরি কিম্বা অবাস্তব দিয়া ইত্যাদি বিষয়ে যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা উপরের লাইনগুলিতে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাইবেন।

সাহিত্যের একটা সংজ্ঞাও শরৎচন্দ্র দিয়াছেন। তাহা এই:—"হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়ন অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্য পদবাচ্য হয় না।"

তিনি আরো বলিয়াছেন, "ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়।" মানুষ সম্বন্ধে ইহার চেয়ে বড় এবং সত্য উক্তি আমি আর খুঁজিয়া পাই নাই।

রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র গুরু বলিয়া মানেন—ইহার সহস্র প্রমাণ তাঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহার নিকট সম্পর্কে আসিয়াছেন তাঁহারাও জানেন। কিন্তু তবু তিনি দুইবার রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন—একবার "শিক্ষার বিরোধ" নামক প্রবন্ধে, আর একবার "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" নামক প্রবন্ধে। উভয় প্রবন্ধেই ভাষার সংযম লক্ষ্য করিবার বস্তু।

শরৎচন্দ্র যে ইচ্ছা করিলে কিরূপে কোন লেখককে নাস্তানাবুদ করিতে পারেন তাহার উদাহরণ "ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত" নামক প্রবন্ধে মিলিবে।

"ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য" শীর্ষক রচনাটি প্রকাশক না দিলেও পারিতেন। লেখাটিতে শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব কিছুই নাই, সম্ভবত তাঁহার নিজের রচনাও নয়, বক্তৃতার সারাংশের অনুলিখন।

বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

ভারত লক্ষ্মীঃ—শ্রীমতিলাল রায়। প্রবর্ত্তক পব্লিশিং হাউস। ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

কয়েকটি পুণ্যবতী প্রাতঃস্মরণীয়া ভারত নারীর আদর্শ চরিত্র পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভারতের নারীত্বের পুণ্য আদর্শ আধুনিক যুগের সম্মুখে পুনঃস্থাপিত করার মহৎ উদ্দেশে অনুপ্রাণিত হইয়া লেখক যে আলেখ্য রাজি দৃশ্যপটে আঁকিবার প্রয়াস করিয়াছেন, আমাদের মাতা, ভগিনী ও কন্যারা তদ্দ্বারা উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। আর একদিক দিয়া দেখিলে এই পুস্তকের যথেষ্ট উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আমাদের দেশে তরুণী নারীর বৈধব্য একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অল্পবয়সে বিধবা হইয়া যাঁহারা নিজের জীবনে অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়েন, জীবনকে ব্যর্থ ও দুর্ব্বিষহ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন জীবনে সন্তানপালন ও গৃহস্থালীর কার্য্য ছাড়াও সম্পূর্ণ ভিন্ন ও উচ্চতর আদর্শের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব। তবে লেখকের ভাষা আরও সংযত হইলে ভাল হইত বলিয়া মনে হয়। মাত্রাতিরিক্ত হা হুতাশে এজাতীয় পুস্তকের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া যায় এবং অনেক সময় পুস্তকের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। প্রচ্ছদপটের sentimental ছবিটি আমাদের ভাল লাগিল না। বইটির কাগজ ও ছাপা ভাল। সামান্য দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভাঃ—শ্রীঅরবিন্দের A Defence of Indian culture হইতে অনূদিত। অনুবাদক শ্রীঅনিলবরণ রায়। মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। দাম এক টাকা চারি আনা।

বইখানি সময়োপযোগী। ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইলে তাহার রাষ্ট্রতন্ত্র কিরূপ হইবে তাহা লইয়া রীতিমত আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নানা দেশের নব নব রাষ্ট্রিক আদর্শ আমাদিগকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু আমাদের এতবড় প্রাচীন সুসভ্য দেশ অতি পুরাতন কাল হইতে যে সব মূল্যবান বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইত তাহার খোঁজ আমরা বড় একটা রাখি না। এই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ আর্য্য পত্রিকায় একটি বিচিত্র তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রায় মহাশয় ইংরাজী প্রবন্ধের যথাযথ অনুবাদ করিয়া বাংলায় প্রচারের সুবিধা করিয়া দিলেন। ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্রতন্ত্র এ যুগে অবিকল চলিতে পারে না, ইহা সত্য। লেখকের তাহা উদ্দেশ্যও নয়। কিন্তু ইহাও ভাবিয়া দেখা দরকার, রাষ্ট্রের বনিয়াদ যথাসম্ভব প্রাচীন তন্ত্রের উপর স্থাপন করিতে পারিলে দেশের মাটি ও আবহাওয়ায় উহা ভালরূপ মিশ খাইয়া যাইতে পারিবে। দেশের ভবিষ্যৎ যাঁহারা চিন্তা করেন, বইখানি তাঁহাদের পড়িয়া দেখা উচিত।

শ্রীমনোজ বসু

বিজ্ঞানে বিরোধঃ—প্রথমখণ্ড, আলোক ও অন্ধকার—শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।

—আলোক ও অন্ধকার সম্বন্ধীয় কয়েকটি বৈজ্ঞানিক মতবাদের আত্মবিরোধিতা সম্বন্ধে একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ। ভাষা প্রাঞ্জল এবং লেখকের বক্তব্য সুপরিস্ফুট।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

নানাকথা

রামমোহন রায় শতবার্ষিক

১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রামমোহন রায় পরলোক গমন করেন। আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যুর শত বর্ষ পূর্ণ হবে। সেই সময়ে সেই মহাপুরুষের গৌরবময় জীবন এবং অতুলনীয় কীর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী একটি শত-বার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আরম্ভ হয়েচে। উৎসবের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা নিরূপিত করবার উদ্দেশ্যে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার সেনেট হাউসে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহূত হয়েছিল ; তথায় উৎসবের কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ সমিতি গঠিত হয়। শতবার্ষিক সম্বন্ধে সংবাদাদি জানতে হ'লে সাধারণ সমিতির সহযোগী সম্পাদক শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট ২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতায় আবেদন করা আবশ্যক।

অজ্ঞান এবং সংস্কারের প্রগাঢ় তমসায় দেশ যখন আচ্ছন্ন, আচার এবং নিয়মের নাগপাশে ধর্ম্ম যখন সংক্ষুব্ধ, পরাধীনতার তাড়নায় মানুষের মনে বিচারবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি যখন অবলুপ্ত, সমাজ বিধ্বস্ত, আত্মচেতনা নিদ্রাগত, ভারতবর্ষের সেই মহা দুর্দ্দিনে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। সে যেন এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার! তিমিরাবৃত মসীকৃষ্ণ আকাশে সহসা যেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয়! আজ তাঁর শতবার্ষিকের দিনে এ কথাটি যেন আমরা বারম্বার স্মরণ করি যে, যে দেশাত্মবোধের উজ্জ্বল প্রভায় ভারতবর্ষ আজ উদ্ভাসিত তার শিখাটি জ্বেলেছিলেন শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রামমোহন। এ কথা যেন আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত না হই যে, জাতীয়তার যে মহাদ্রুমটি আজ ফল-পুষ্পের মহিমায় বিশ্ব সমাজের নিকট আমাদিগকে গৌরবান্বিত করে তুলেছে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তার বীজটি রোপন করেছিলেন রামমোহন অত্যন্ত কঠিন এবং অনুর্ব্বর ভূমি কর্ষিত ক'রে। দেশ তখন কুপ্রথার এবং কদাচারের বেড়ায় খণ্ডিত, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এবং পরিকর্ষর (culture) প্রকৃত মহিমার সূত্রটি বিলুপ্ত, জাতির সহিত জাতির মানুষের সহিত মানুষের ঐক্যের স্বাভাবিক বন্ধনগুলি বিচ্ছিন্ন,—আত্মবিস্মৃতির সেই মহাসঙ্কটের কালে রামমোহন আমাদিগকে রক্ষা করেছিলেন। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, ভাষা, সাহিত্য সকল বিষয়ে তিনি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মনীষা, এবং সত্যনিষ্ঠার বলে সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাঁর দুর্দ্দমনীয় ব্যক্তিত্বের নিকট সকল বাধা সকল অন্তরায় পরাভূত হয়েছিল।

রামমোহন মহাপুরুষ ছিলেন,—কেবল আমাদের দেশের পক্ষেই নয়, বিশ্বজগতের সমাজেও মহাপুরুষ-পূজার দ্বারা শুধু আমাদের ঋণলাঘবই হয় না, মানসিক এবং বাহ্য জগতে আমরা আর এক ধাপ উন্নীত হই। রামমোহন শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ক'রে যাঁরা আমাদিগকে মহাপুরুষ-পূজার সুযোগ দিয়েছেন তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য তাঁদের এই মহৎ উদ্যমে সর্ব্বতোভাবে তাঁদের সহায়তা করা। ভারতবর্ষের, বিশেষত বাঙলা দেশের, জনসাধারণকে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করছি তাঁদের সমবেত চেষ্টা এবং যত্নের দ্বারা এই শতবার্ষিক উৎসবটি সার্থক করবার জন্যে। তদুদ্দেশ্যে কেহ যদি আমাদের নিকট প্রস্তাবাদি পাঠান, উপযুক্ত বিবেচনা করলে আমরা তা সানন্দে প্রকাশ করব। এই সুযোগে মহাত্মা রামমোহনের স্থায়ী স্মৃতিরক্ষা কল্পে কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে তা সকলেরই ভেবে দেখা কর্ত্তব্য। রামমোহন শতবার্ষিক সমিতি তাঁদের কার্য্যধারা পাকাভাবে নির্দ্দিষ্ট করবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।

বাসন্তী কটন মিল্‌স্ লিঃ

এই নব প্রতিষ্ঠিত কটন মিলসের একটি প্রস্পেক্টস্ আমাদের হস্তগত হ'য়েছে। দেখা গেল, ইহার পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠাতাগণ সকলেই সুশিক্ষিত এবং সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ;

এবং যে ব্যবসায়ে তাঁদের সঞ্চিত অর্থ তাঁরা ব্যয় করছেন, আজকালকার দিনে দেশের পক্ষে তা প্রভূত কল্যাণকর। বর্তমানে দেশে কাপড়ের যা' চাহিদা, তার অতি সামান্য অংশই এখন দেশে প্রস্তুত হয়। অতএব সুপরিচালিত হ'লে এই ব্যবসায়ে লোকসানের আশঙ্কা নেই বল্‌লেই চলে।

বাসন্তী কটন মিল্‌সের পরিচালকগণের মধ্যে তিন জন স্বর্গীয় সার বিনোদচন্দ্র মিত্রের পুত্র, একজন বেহালার জমীদার স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় অন্য পরিচালকগণের মধ্যে আছেন শ্রীযুক্ত ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা এবং য়ুনিভার্সাল ট্রেডিং ইউনিয়নের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। আশা করা যায় এঁদের পরিচালনায় এই ব্যবসায় দিন দিন উন্নতি লাভ করবে। আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি কামনা করি।

পরলোকগত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

সুপরিচিত সাহিত্যিক ও কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে আমরা আন্তরিক ব্যথিত হয়েচি। তাঁর অভাবে বাঙলা সাহিত্য একটি শক্তিশালী সেবক হ'তে বঞ্চিত হ'ল। স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে পরিমাণে বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেন নি কিন্তু যে-টুকু রেখে গেছেন তা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় কতখানি থেকে তিনি আমাদের বঞ্চিত ক'রে গেলেন। গল্পলেখক এবং নাট্যকাররূপে তিনি তাঁর যে পরিচয় দিয়েছিলেন তা যেমন আশাপ্রদ তেমনি আনন্দজনক। তাঁর রচিত রহস্য নাটিকা "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" যা কিছুদিন থেকে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হচ্চে, বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙলার রসিক সম্প্রদায়কে আনন্দ দান করবে।

আমরা রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শিবচন্দ্র স্মৃতি-উৎসব

আগামী ২রা এপ্রিল "কোন্নগর পাঠচক্রে"র উদ্যোগে "শিবচন্দ্র স্মৃতি-উৎসব" অনুষ্ঠিত হবে। শ্রদ্ধেয় শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন। কোন্নগরের যে সকল অধিবাসী বিদেশে অবস্থান করছেন তাঁরা পাঠচক্রের সম্পাদক শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নামে "শ্রীনাথ নিবাস কোন্নগর" ঠিকানায় পত্র লিখ্‌লে নিমন্ত্রণ পত্র পাবেন এবং কোন্নগরের এই আদি কর্ম্মীপুরুষের স্মৃতি-উৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবার সুযোগ লাভ করবেন।

"কোন্নগর পাঠচক্রের" উত্তরোত্তর উন্নতি এবং কার্য্য তৎপরতা লক্ষ্য ক'রে আমরা সুখী হয়েচি। দেশে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রামে গ্রামে এইরকম পাঠচক্রের একান্ত প্রয়োজন।

ওভারসিজ্ করপোরেশন

পৃথিবীর নানাদেশে যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের যে ধরণের সাহায্য করেন—টমাস কুক, আমেরিকান এক্সপ্রেস প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানী,—সেই ধরণের সাহায্য করবার জন্যে কয়েকজন উৎসাহী বাঙালী, ওভারসিজ্ করপোরেশন নাম দিয়ে একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন জেনে আমরা আনন্দিত হ'লাম। পরিচালকেরা সকলেই সুশিক্ষিত এবং পৃথিবীর নানদেশে ভ্রমণ করেছেন। ১৯৩৩ সালের প্যারীর বার্ষিক প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষের যোগদান করার জন্য এঁরা বিশেষভাবে আয়োজন করেছেন। যাঁরা এই প্রদর্শনীতে তাঁদের পণ্যদ্রব্য পাঠাতে চান, তাঁরা, এই করপোরেশনের ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখ্‌লেই জ্ঞাতব্য বিষয় সব অবগত হ'তে পারবেন। গত জুন মাসে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়,—এঁদের কার্য্যালয়ের ঠিকানা, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫ ডালহাউসি স্কোয়ার। শীঘ্রই এঁরা লণ্ডন, প্যারী, বার্লিন ও অন্যান্য ব্যবসা কেন্দ্র বড় বড় সহরে শাখা কার্য্যালয় খুলবেন। এতদ্ব্যতীত এঁদের আমদানী রপ্তানী বিভাগও আছে। আমরা এই নবারব্ধ ব্যবসায়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

Edited dy Upendranath Ganguli. Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৪০ | ৪র্থ সংখ্যা

মানব সম্বন্ধের দেবতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সংসারে একটা জিনিষ অস্বীকার করতে পারিনে যে, আমরা বিধানের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জীবন আমাদের অস্তিত্ব বিশ্ব-নিয়মের দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এ সমস্ত নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতেই হবে, নইলে নিষ্কৃতি নেই। নিয়মকে যে পরিমাণে জানি ও মানি সেই পরিমাণেই স্বাস্থ্য পাই, সম্পদ্ পাই, ঐশ্বর্য্য পাই। কিন্তু জীবনে একটা সত্য আছে যা এই নিয়মের মধ্যে আপনাকে দেখতে পায় না। কেননা নিয়মের মধ্যে পাই বন্ধন, আত্মার মধ্যে চাই সম্বন্ধকে। বন্ধন এক তরফা, সম্বন্ধে দুই পক্ষের সমান যোগ। যদি বলি বিশ্ব-ব্যাপারে আমার আত্মার কোনো অসীম সম্বন্ধের ক্ষেত্র নেই—শুধু কতকগুলি বাহ্য সম্পর্ক সূত্রেই সে ক্ষণকালের জন্য জড়িত, তাহলে জান্‌ব তার মধ্যে যে একটি গভীর ধর্ম্ম আছে নিখিলের মধ্যে তার কোনো নিত্যকালীন সাড়া নেই। কেননা তার মধ্যে যা আছে তা কেবল সত্তার নিয়ম নয়, সত্তার আনন্দ। এই যে তার আনন্দ এ কি কেবল সঙ্কীর্ণভাবে তারি মধ্যে? অসীমের মধ্যে কোথাও তার প্রতিষ্ঠা নেই? এর সত্যটা তাহলে কোনখানে? সত্যকে আমরা একের মধ্যে খুঁজি। হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল, গাছ থেকে ফল পড়্‌ল, পাহাড়ের উপর থেকে ঝর্‌না নীচে নেমে এল, এ সমস্ত ঘটনাকে যেই এক তত্ত্বের মধ্যে দেখতে পেলে অমনি মানুষের মন বল্‌লে সত্যকে দেখেচি। যতক্ষণ এই ঘটনাগুলি আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ আমাদের কাছে তারা নিরর্থক। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন, তথ্যগুলি বহু কিন্তু তারা সত্য হয়েচে অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে।

এই তো গেল বস্তুরাজ্যের নিয়ম-ক্ষেত্রে—কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের আনন্দক্ষেত্রে কি এই ঐক্য তত্ত্বের কোনো স্থান নেই?

আমরা আনন্দ পাই বন্ধুতে, সন্তানে: প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে। এগুলি ঘটনার দিক্ থেকে বহু—কিন্তু কোনো অসীম সত্যে কি এদের চরম ঐক্য নেই? এ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক দেন না, দেন সাধক। তিনি বলেন, বেদাহমেতম্ আমি যে এঁকে দেখেচি, রসো বৈ সঃ, তিনি যে রসের স্বরূপ, তিনি যে পরিপূর্ণ আনন্দ।

নিয়মের বিধাতাকে তো পদে পদেই দেখতে পাচ্চি, কিন্তু ঋষি যাঁকে বলচেন স নো বন্ধু র্জনিতা—কে সেই বন্ধু কে সেই পিতা? যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি হৃদা মনীষা মনসা সকল বন্ধুর ভিতর দিয়ে সেই এক বন্ধুকে সকল পিতার মধ্য দিয়ে সেই এক পিতাকে দেখ্‌চেন। বৈজ্ঞানিকের উত্তরে প্রশ্নের যেটুকু বাকি থাকে তার উত্তর তিনিই দেন্। তখন আত্মা বলে, আমার জগৎকে পেলুম, আমি বাঁচলুম। আমাদের অন্তরাত্মার এই প্রশ্নের উত্তর যাঁরা দিয়েচেন তাঁদেরই মধ্যে একজনের নাম যিশুখৃষ্ট। তিনি বলেচেন, আমি পুত্র, পুত্রের মধ্যেই পিতার আবির্ভাব। পুত্রের সঙ্গে পিতার শুধু কার্য্য কারণের যোগ নয়, পুত্রে পিতারই আত্মস্বরূপের প্রকাশ। খৃষ্ট বলেচেন, আমাতে তিনিই আছেন, প্রেমিক প্রেমিকা যেমন বলতে পারে, আমাদের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। অন্তরের সম্বন্ধ যেখানে নিবিড়, বিশুদ্ধ, সেখানেই এমন কথা বল্‌তে পারা যায়; সেখানেই মহাসাধক বলেন, পিতাতে আমাতে একাত্মতা। একথাটি নূতন না হতে পারে, এ-বাণী হয়তো আরো অনেকে বলেচেন। কিন্তু যে-বাণী সফল হোলো জীবনের ক্ষেত্রে, নানা ফল ফলালো, তাকে নমস্কার করি। খৃষ্ট বলেছিলেন, আমার মধ্যে আমার পিতারই প্রকাশ। এই ভাবের কথা ভারতবর্ষেও উচ্চারিত হয়েচে, কিন্তু সেটি শাস্ত্র বচনের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে প্রাণের সীমায় যতক্ষণ না পৌঁছয় ততক্ষণ সে কথা বন্ধ্যা। যতই বড়ো ভাষায় তাকে স্বীকার করি ব্যবহারের দৈন্যে তাকে ততই বড়ো আকারে অপমানিত করি; খৃষ্টান সম্প্রদায় পদে পদে তা করে থাকেন। কথার বেলায় যাকে তারা বলে প্রভু, সেবার বেলায় তাকে দেয় ফাঁকি। সত্য কথার দাম দিতে হয় সত্য সেবাতেই। যদি সেই দিকেই দৃষ্টি রাখি তবে বলতে হয় যে খৃষ্টের জন্ম ব্যর্থ হয়েচে; বলতে হয়, ফুল ফুটেচে সুন্দর, তার মাধুর্য্য উপভোগ করেচি, কিন্তু পরিণামে তাতে ফল ধরল না। এদিকে চোখে দেখেচি বটে হিংসা রিপুর প্রাবল্য খৃষ্টীয় সমাজে; তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি প্রেম, লোকহিতের জন্য আত্মত্যাগ খৃষ্টীয় সমাজে সাফল্য দেখিয়েচে এ-কথাটি সাম্প্রদায়িকতার মোহে পড়ে যদি না মানি তবে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। খৃষ্টানের ধর্ম্মবুদ্ধি প্রতিদিন বলচে, মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা করো, তাঁর নৈবেদ্য নিরন্নের অন্ন থালিতে, বস্ত্রহীনের দেহে। এই কথাটিই খৃষ্টধর্ম্মের বড়ো কথা। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন খৃষ্ট আপন মানবজন্মের মধ্যে ভগবান্ ও মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেচেন।

ধনী তাঁর গ্রামের লোকের জলাভাবকে উপেক্ষা ক'রে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিলেন পুত্রের অন্নপ্রাশনে দেবমন্দিরে দেবপ্রতিমার গলায় রত্নহার পরাতে। এই কথাটি তাঁর হৃদয়ে পৌঁছয়নি যে, যেখানে সূর্য্যের তেজ সেখানে দীপশিখা আনা মূঢ়তা, যেখানে গভীর সমুদ্র সেখানে জলগণ্ডূষ দেওয়া বালকোচিত। অথচ মানুষের তৃষ্ণার মধ্য দিয়ে ভগবান্ যে জল চাইচেন সে-চাওয়া অতি স্পষ্ট অতি তীব্র, সেই চাওয়ার প্রতি বধির হয়ে এরা দেবালয়ে রত্নালঙ্কারের জোগান দেয়।

পুত্রের মধ্যে পিতাকে বিড়ম্বিত ক'রে দানের দ্বারা তাঁকে ভোলাবার চেষ্টায় মানুষ তাঁকে দ্বিগুণ অপমানিত করতে থাকে। দেখেচি ধনী মহিলা পাণ্ডার দুই পা সোনার মোহর দিয়ে ঢাকা দিয়ে মনে করেচে স্বর্গে পৌঁছবার পুরা মাশুল চুকিয়ে দেওয়া হোলো; অথচ সেই মোহরের জন্য দেবতা যেখানে কাঙাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মানুষের প্রতি দৃষ্টিই পড়্‌ল না।

আজ প্রাতে আমাদের আশ্রম-বন্ধু এনড্রুজের চিঠি পেলুম। তিনি যে-কাজ করতে গেছেন সে তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাজ নয়, বরং তাদের প্রতিকূল। বাহ্যত যারা তাঁর অনাত্মীয়, যারা তাঁর স্বজাতীয় নয় তাদের জন্য তিনি কঠিন দুঃখ সইচেন, স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম ক'রে দুঃখপীড়া পাচ্চেন। এবার সেখানে যাবা মাত্র তিনি দেখ্‌লেন বসন্তমারীতে বহু ভারতীয় পীড়িত, মৃত্যুগ্রস্ত, তাঁর কাজ হোলো তাদের সেবা করা। মারীর মধ্যে ভারতীয় বণিক্‌দের এই যে তিনি সেবা করেচেন, এতে কিসে তাঁকে বল দিয়েচে? মানবসন্তানের সেবায় বিশ্বপিতার সেবার উপদেশ খৃষ্টানদেশের মধ্যে এতকাল ধ'রে এত গভীররূপে প্রবেশ করেচে যে সেখানে আজ যাঁরা নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করেন তাঁদেরও নাড়ির রক্তে এই বাণী বহমান। তাঁরাও মানুষের জন্য প্রাণান্তকর দুঃখ স্বীকার করাকে আপন ধর্ম্ম ব'লে প্রমাণ করেচেন। এ ফল কোন্ বৃক্ষে ফল্‌লো? কে এতে রসসঞ্চার করে? এ-প্রশ্নের উত্তরে এ-কথা অস্বীকার করতে পারিনে যে, সে খৃষ্টধর্ম্ম।

লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বিবিধ আকারে এই ধর্ম্ম পশ্চিম মহাদেশে কাজ করচে। যাকে সেখানকার লোকে হ্যুম্যান ইন্টরেস্ট্ অর্থাৎ মানবের প্রতি ঔৎসুক্য বলে তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপে যেমন জাগরূক তেমন আর কোথাও দেখিনি। সেদেশে সর্ব্বত্রই মানুষকে সেখানকার লোকে সম্পূর্ণরূপে চেন্‌বার জন্য তথ্য অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্চে। যারা নরমাংস খায় তাদেরও মধ্যে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেচে, তুমি মানুষ তুমি কী করো, তুমি কী ভাবো? আর আমরা? আমাদের পাশের লোকেরও খবর নিইনে। তাদের সম্বন্ধে না আছে কৌতূহল না আছে শ্রদ্ধা। উপেক্ষা ও অবজ্ঞার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে অধিকাংশ প্রতিবেশীর সম্বন্ধে অজ্ঞান হয়ে আছি। কেন এমন হয়? মানুষকে যথোচিত মূল্য দিইনে বলেই আজকের দিনে আমাদের এই দুর্দ্দশা। খৃষ্ট বাচিয়েচেন পৃথিবীর অনেককে, বাঁচিয়েচেন মানুষের ঔদাসীন্য থেকে মানুষকে। আজকে যারা তাঁর নাম নেয়না, তাঁকে অপমান করতেও কুণ্ঠিত হয় না, তারাও তাঁর সে-বাণীকে কোনো-না-কোনো আকারে গ্রহণ করেচে।

মানুষ যে বহুমূল্য তার সেবাতেই যে ভগবানের সেবা সার্থক, এই কথা ইউরোপ যেখানে মানেনি সেখানেই সে মার খেয়েচে, এ-কথার মূল্য সে পরিমাণে ইউরোপ দিয়েচে সেই পরিমাণেই সে উন্নত হয়েচে। মানুষের প্রতি খৃষ্টধর্ম্ম যে অসীম শ্রদ্ধা জাগরূক করেচে আমরা যেন নিরভিমানচিত্তে তাকে গ্রহণ করি এবং যে-মহাপুরুষ সে-সত্যের প্রচার করেছিলেন তাঁকে প্রণাম করি।

• খৃষ্ট জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত অভিভাষণ।
পুলিনবিহারী সেন কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

পারস্য ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখান থেকে বিদায় হয়ে গেলেম এখানকার ছাত্রীদের নিমন্ত্রণ সভায়। সঙ্কীর্ণ সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা গলি। পুরাতন বাড়ি দুইধারে সার বেঁধে উঠেচে, কিন্তু তার ভিতরকার লোকযাত্রা বাইরে থেকে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। নিমন্ত্রণ গৃহের প্রাঙ্গণে সব মেয়েরা বসেচে। একধারে কয়েকটি মেয়ে আলাদা স্থান নিয়েচেন, তাঁরা কালো কাপড়ে সম্বৃত, কিন্তু মুখ ঢাকা নয়। বাকি সবাই বিলাতী পোষাক

মসজিদের অভ্যন্তরের কারুকার্য্য

পরা, স্তব্ধ শান্ত হয়ে থাকবার চেষ্টামাত্র নেই, হাসি গল্পে সভা মুখরিত। প্রাঙ্গণের সম্মুখপ্রান্তে আমাদের দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মতো। তারি রোয়াকে আমার চৌকি পড়েচে। অনুরোধে পড়ে কিছু আমাকে বলতে হোলো। বলা হলেই কয়েকজন মেয়ে এসে আমাকে ফরমাস করলেন আমার কাব্য আবৃত্তি করতে। আগের দিনে এঁরা আবৃত্তি শুনেছিলেন। নিজের লেখা কিছু তো মনে পড়ে না। অনেক চেষ্টা করে "খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে" কবিতার প্রথম শ্লোক পড়ে গেলুম, একটা জায়গায় ঠেকে যেতেই অর্থহীন শব্দ দিয়ে ছন্দ পূরণ করে দিলুম।

তারপর সন্ধ্যাবেলায় ভোজনের নিমন্ত্রণ, শিক্ষাবিভাগের লোকেরা আয়োজন করেচেন। নদীর ধারের দিকে প্রকাণ্ড একটা ছাদ, সেখানে আলোকমালার নীচে বসে গেছেন অনেক লোক। আমাদের সেই বৃদ্ধ কবিও আমার কাছেই ছিলেন। আহারের পর আমার অভিনন্দন সারা হলে আমাকে কিছু বলতে হোলো, কেননা শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কী মত এঁরা শুনতে চেয়েছিলেন।

শ্রান্তি ঘনীভূত হয়ে আসচে। আমার পক্ষে নড়ে চড়ে দেখে শুনে বেড়ানো অসম্ভব হয়ে এল। কথা ছিল সকালে টেসিফোনের (Ctesiphon) ভগ্নাবশেষ দেখতে যেতে হবে। আমি ছাড়া আমার দলের বাকি সবাই দেখতে গেলেন। একদা এই সহরের গৌরব ছিল অসামান্য। পার্থিয়ানের এর পত্তন করে। পারস্যে অনেকদিন পর্য্যন্ত এদের রাজ-

ছিল। রোমকেরা বারবার এদের হাতে পরাস্ত হয়েচে। পূর্ব্বেই বলেচি পার্থিয়েরা খাঁটি পারসিক ছিল না। তারা

খেজুর বন, বোগদাদ

তুর্ক ছিল বলে অনুমান করা হয়, শিক্ষাদীক্ষা অনেকটা পেয়েছিল গ্রীকদের কাছ থেকে। ২২৮ খৃষ্টাব্দে আর্দাশির পার্থিয়দের জয় করে আবার পারস্যকে পারসিক শাসন ও ধর্ম্মের অধীনে এক করে তোলেন। ইনিই সাসানীয় বংশের প্রথম রাজা। তারপরে বারবার রোমানদের উপদ্রব এবং সবশেষে আরবদের আক্রমণ এই সহরকে অভিভূত করেছিল। জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর বলে আরবেরা এখান [illegible] সমস্ত মালমসলা সরিয়ে বোগদাদে রাজধানী স্থাপন [illegible] টেসিফন ধুলোয় গেল মিলিয়ে, বাকি রইল বৃহৎ প্রাসাদের [illegible]নি খিলান। এই প্রাসাদ প্রথম খস্রুর আদেশে নির্ম্মিত হয় সাসানীয় যুগের মহাকায় স্থাপত্য শিল্পের একটি অতি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তরূপে।

সন্ধ্যাবেলায় রাজার ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ। ঐশ্বর্য্য-গৌরব প্রমাণ করবার জন্যে কোথাও লেশমাত্র চেষ্টা নেই। রাজার এই অনাড়ম্বর গাম্ভীর্য্যে আমার চিত্তকে সব চেয়ে আকর্ষণ করে। পারিষদবর্গ যাঁরা একত্রে আহার করছিলেন হাস্যালাপে তাঁদের সকলের সঙ্গে এঁর অতি সহজ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও বিশেষ ভোজে আহারের পরিমাণে ও আয়োজনে নির্ব্বোধের মতো যে অতিবাহুল্য

বোগদাদে সূত্রকারের দোকান

করে থাকে রাজার ভোজে তা দেখলুম না। লম্বা টেবিলের সাদা চাদর পাতা। বিরলভাবে কয়েকটি ফুলের

বোগদাদের একটি রাস্তার ভোজনশালা

আজ একজন বেদুয়িন দলপতির তাঁবুতে আমার নিমন্ত্রণ আছে। প্রথমটা ভাবলুম পারব না, শরীরটার প্রতি করুণা করে না যাওয়াই ভালো। তারপরে মনে পড়ল, একদা আস্ফালন করে লিখেছিলুম, "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন।" তখন বয়স ছিল তিরিশের কাছ ঘেঁষে, সে তিরিশ আজ পিছনের দিগন্তে বিলীনপ্রায়। তা হোক্, কবিতাটাকে কিছু পরিমাণে পরখ করে না এলে মনে পরিতাপ থাকবে। সকালে বেরিয়ে পড়লুম। পথের মধ্যে হঠাৎ নিয়ে গেল ট্রেনিং স্কুলের ছেলেদের মাঝখানে, হঠাৎ তাদের কিছু বলতেও হোলো। পথে পথে কত কথাই ছড়াতে হয়, সে পাকা ফল নয়, সে ঝরাপাতা, কেবলমাত্র ধূলোর দাবী মেটাবার জন্যে।

তারপরে গাড়ি চল্‌ল মরুভূমির মধ্য দিয়ে। বালু মরু নয়, শক্ত মাটি। মাঝে মাঝে নদী থেকে জল এনেচে নালা কেটে তাই এখানে ওখানে কিছু কিছু ফসলের আভাস দেখা দিয়েচে। পথের মধ্যে দেখা গেল নিমন্ত্রণকর্ত্তা আর-এক মোটরে করে চলেচেন, তাঁকে আমাদের গাড়িতে তুলে নেওয়া হল। শক্ত মানুষ, তীক্ষ্ণ চক্ষু; বেদুয়িনী পোষাক।

একটি আরব পরিবার

তোড়া আছে, তা ছাড়া সাজসজ্জার চমক নেই একটুও। এতে আতিথ্যের যথার্থ আরাম পাওয়া যায়।

বৌমা রাণীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, —ভদ্রঘরের গৃহিণীর মতো আড়ম্বরহীন সরল অমায়িক ব্যবহার, নিজেকে রাণী বলে প্রমাণ করবার প্রয়াস মাত্র নেই।

অর্থাৎ মাথায় একখণ্ড শাদা কাপড় ঘিরে আছে কালো বিড়ের মতো বস্ত্র বেষ্টনী। ভিতরে শাদা লম্বা আঙিয়া, তার উপরে কালো পাৎলা জোব্বা। আমার সঙ্গীরা বল্‌লেন ভেড়ার পাল, কোথাও চরচে উট, কোথাও বা ঘোড়া। হু হু করে বাতাস বইচে, মাঝে মাঝে ঘুর খেতে খেতে ছুটেচে ধূলির আবর্ত। অনেক দূর পেরিয়ে এঁদের ক্যাম্পে

মড্ ব্রিজ্, বোগ্দাদ

বোগ্দাদের রাস্তায় সব্‌জি বিক্রেতা
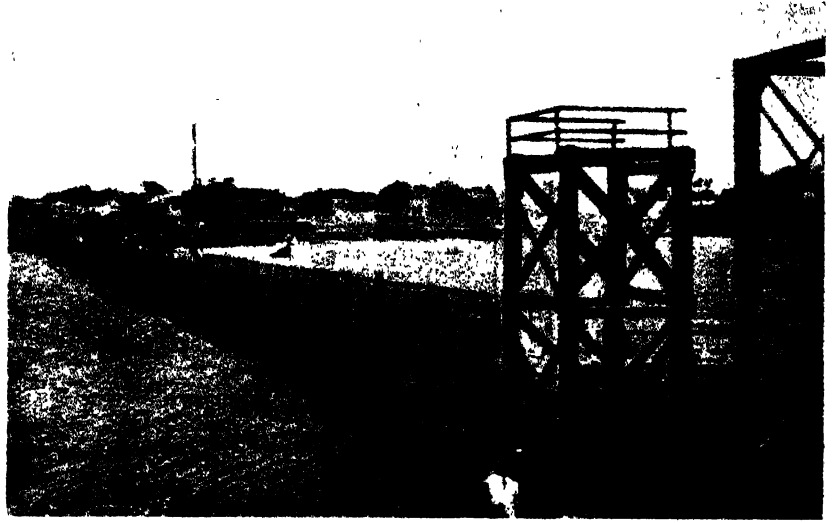
যদিও ইনি পড়াশুনো করেন নি বল্‌লেই হয়, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ইনি এখানকার পার্লামেণ্টের একজন মেম্বর।

রৌদ্রে ধুধু করচে ধূসর মাটি, দূরে কোথাও কোথাও মরীচিকা দেখা দিল। কোথাও মেষপালক নিয়ে চলেচে এসে পৌঁছলুম। একটা বড়ো খোলা তাঁবুর মধ্যে দলের লোক বসে গেছে, কফি সিদ্ধ হচ্চে, খাচ্চে ঢেলে ঢেলে।

আমরা গিয়ে বসলুম একটা মস্ত মাটির ঘরে। বেশ ঠাণ্ডা। মেঝেতে কার্পেট, একপ্রান্তে তক্তপোষের উপর

গদি পাতা। ঘরের মাঝখান বেয়ে কাঠের থাম, তার উপরে ভর দিয়ে লম্বা লম্বা খুঁটির পরে মাটির ছাদ। আত্মীয় বান্ধবেরা সব এদিকে ওদিকে, একটা বড়ো কাঁচের গুড়্‌গুড়িতে একজন তামাক টানচে। ছোট আয়তনের পেয়ালা আমাদের হাতে দিয়ে তাতে অল্প একটু করে কফি ঢাললে, ঘন কফি, কালো তিতো। দলপতি জিজ্ঞাসা করলেন আহার

আরব মরুভূমিতে বেদুয়িন তাঁবুর অভ্যন্তর
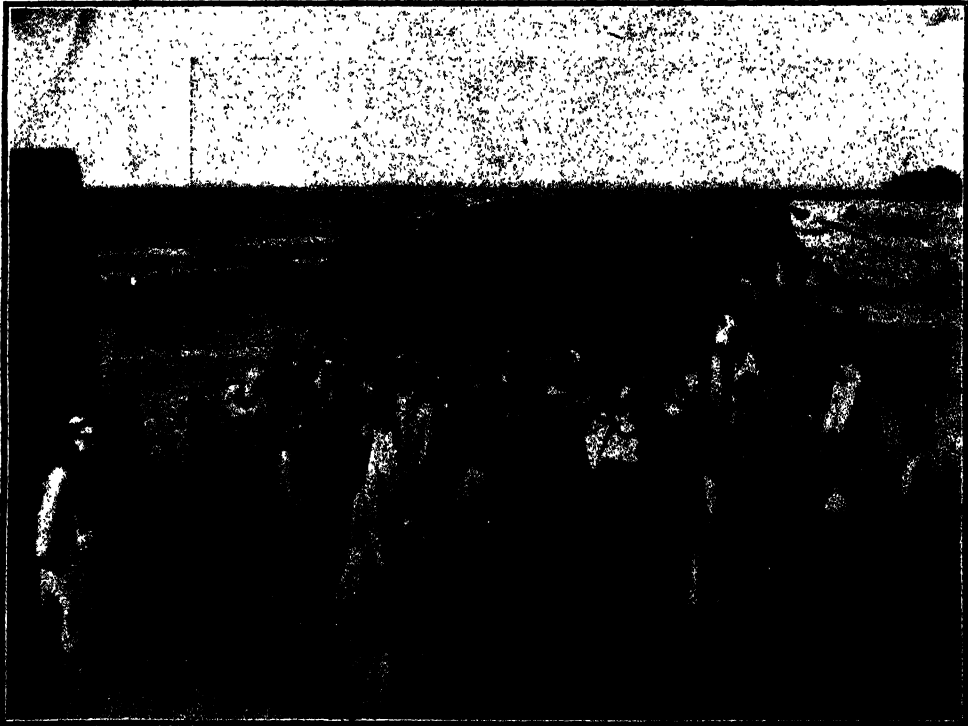
মরুভূমিতে বেদুয়িন উপনিবেশ। রবীন্দ্রনাথ এইখানে একদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়াছিলেন

ইচ্ছা করি কি না, "না" বললে আনবার রীতি নয়। ইচ্ছা করলেম, অভ্যন্তরে তাগিদও ছিল। আহার আসবার পূর্বে সুরু হোলো একটু সঙ্গীতের ভূমিকা। গোটা-কতক কাঠির উপরে কোনোমতে চামড়া জড়ানো একটা ত্যাড়া বাঁকা একতারা যন্ত্র বাজিয়ে একজন গান ধরলে। তার মধ্যে বেদুয়িনী তেজ কিছুই ছিল না। অত্যন্ত মিহিচড়া গলায় নিতান্ত কান্নার সুরে গান। একটা বড়ো জাতের সঙ্গে এই ভোজের আকৃতি ও প্রকৃতির কোনো মিল পাওয়া যায় না। আহারার্থীরা সব বসল থালা ঘিরে। সেই এক থালা থেকে সবাই হাতে করে মুঠো মুঠো ভাত প্লেটে তুলে নিয়ে আর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ঘোল দিয়ে গেল পানীয়রূপে। গৃহকর্তা বললেন, আমাদের নিয়ম এই যে অতিথিরা যতক্ষণ আহার করতে থাকে আমরা অভুক্ত দাঁড়িয়ে থাকি কিন্তু সময়াভাবে আজ সে নিয়ম রাখা

ইরাকে বোগদাদ সহরের নিকটবর্ত্তী মরুভূমিতে বেদুয়িন উপনিবেশে বেদুয়িন শেখ ও রবীন্দ্রনাথ

পতঙ্গের রাগিণী বললেই হয়। অবশেষে সামনে চিলমচি ও জলপাত্র এল। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বসলুম। মেজের উপর জাজিম পেতে দিলে। পূর্ণচন্দ্রের ডবল আকারের মোটা মোটা রুটি, হাতাওয়ালা অতি প্রকাণ্ড পিতলের থালায় ভাতের পর্বত আর তার উপর মস্ত এবং আস্ত একটা সিদ্ধ ভেড়া। দু তিন জন জোয়ান বহন করে মেজের উপরে রাখলে। পূর্ববর্তী মিহি করুণ রাগিণীর চলবে না। তাই অদূরে আর একটা প্রকাণ্ড থালা পড়ল। তাতে তাঁরা স্বজনবর্গ বসে গেলেন। যে অতিথিদের সম্মান অপেক্ষাকৃত কম আমাদের ভুক্তাবশেষ তাঁদের ভাগে পড়ল। এইবার হোলো নাচের ফরমাস। একজন এক ঘেয়ে সুরে বাঁশি বাজিয়ে চলল, আর এরা তার তাল রাখলে লাফিয়ে লাফিয়ে। একে নাচ বললে বেশি বলা হয়। যে ব্যক্তি প্রধান, হাতে একখানা রুমাল নিয়ে সেইটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

আগে আগে নাচতে লাগল, তারি কিঞ্চিৎ ভঙ্গীর বৈচিত্র্য ছিল। ইতিমধ্যে বৌমা গেলেন এদের অন্তঃপুরে। সেখানে মেয়েরা তাঁকে নাচ দেখালেন, তিনি বলেন সে নাচের মতো নাচ বটে,—বোঝা গেল য়ুরোপীয় নটীরা প্রাচ্য নাচের কায়দায় এদের অনুকরণ করে কিন্তু সম্পূর্ণ রস দিতে পারে না।

বেদুয়িন তাঁবুতে রবীন্দ্রনাথ

তারপরে বাইরে এসে যুদ্ধের নাচ দেখ্‌লুম। লাঠি ছুরি বন্দুক তলোয়ার নিয়ে আস্ফালন করতে করতে চীৎকার করতে করতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে তাদের মাতুনি, ওদিকে অন্তঃপুরের দ্বার থেকে মেয়েরা দিচ্চে তাদের উৎসাহ। বেলা চারটে পেরিয়ে গেল, আমরা ফেরবার পথে গাড়িতে উঠ্‌লুম—সঙ্গে চল্‌লেন আমাদের নিমন্ত্রণ কর্ত্তা।

এরা মরুর সন্তান, কঠিন এই জাত, জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব নিয়ে এদের নিত্য ব্যবহার। এরা কারো কাছে প্রশ্রয়ের প্রত্যাশা রাখে না কেননা পৃথিবী এদের প্রশ্রয় দেয়নি। জীববিজ্ঞানে প্রকৃতি কর্তৃক বাছাইয়ের কথা বলে, জীবনের সমস্যা সুকঠোর করে দিয়ে এদেরই মাঝে যথার্থ কড়া বাছাই হয়ে গেছে, দুর্ব্বলেরা বাদ পড়ে' যারা নিতান্ত টিকে গেল এরা সেই জাত। মরণ এদের বাজিয়ে নিয়েচে। এদের যে এক একটি দল তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এদের মাতৃভূমির কোলের পরিসর ছোটো, নিত্য বিপদে বেষ্টিত জীবনের স্বল্প দান এরা সকলে মিলে ভাগ করে' ভোগ করে। এক বড়ো থালে এদের সকলের অন্ন, তার মধ্যে সৌখীন রুচির স্থান নেই; তারা পরস্পরের মোটা রুটি অংশ করে নিয়েচে, পরস্পরের জন্যে প্রাণ দেবার দাবী এই এক রুটি ভাণ্ডার মধ্যেই। বাংলাদেশের নদীবাহুবেষ্টিত সন্তান আমি, এদের মাঝখানে বসে খাচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে তৈরি মানুষ আমরা উভয়ে। তবুও মনুষ্যত্বের গভীরতর

বাণীর যে ভাষা সে ভাষায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়। তাই এই অশিক্ষিত বেদুয়িন দলপতি যখন বল্‌লেন, আমাদের আদিগুরু বলেচেন, যার বাক্যে ও ব্যবহারে মানুষের বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই সেই যথার্থ মুসলমান,

বেদুয়িন তাঁবুতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পথসঙ্গীগণ

বেদুয়িন নৃত্য

তখন সে কথা মনকে চমকিয়ে দিলে। তিনি বললেন ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ চল্‌চে এ পাপের মূল রয়েচে সেখানকার শিক্ষিত লোকদের মনে। এখানে অল্পকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ থেকে কোনো কোনো শিক্ষিত মুসলমান গিয়ে ইসলামের নামে হিংস্র-ভেদবুদ্ধি প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি বল্‌লেন আমি তাঁদের সংসতায় বিশ্বাস করিনে, তাই তাঁদের ভোজের নিমন্ত্রণ যেতে অস্বীকার করেছিলেম; অন্তত আরব-

দেশে তাঁরা শ্রদ্ধা পাননি। আমি এঁকে বল্‌লেম, একদিন কবিতায় লিখেছি "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন"— আজ আমার হৃদয় বেদুয়িন হৃদয়ের অত্যন্ত কাছে এসেচে, যথার্থই আমি তাদের সঙ্গে এক অন্ন খেয়েচি অন্তরের মধ্যে।

তারপরে যখন আমাদের মোটর চল্‌ল, দুই পাশের মাঠে এদের ঘোড়সওয়াররা ঘোড়া ছোটাবার খেলা দেখিয়ে দিলে। মনে হোলো মরুভূমির ঘূর্ণা হাওয়ার দল শরীর নিয়েচে। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পণ্য নিয়ে আসে তখন অনেক সময় বিজ্ঞ চেহারার প্রবীণ লোককে উটের পরে চড়িয়ে তাদের কর্ত্তা সাজিয়ে আনে। আমি তাঁকে বল্‌লুম, চীনে ভ্রমণ করবার সময় আমার কোনো চৈনিক বন্ধুকে বলেছিলেম একবার চীনের ডাকাতের হাতে ধরা প'ড়ে আমার চীন-ভ্রমণের বিবরণটাকে জমিয়ে তুলতে ইচ্ছা করে। তিনি বল্‌লেন চীনের ডাকাতেরা আপনার মতো বৃদ্ধ কবির পরে
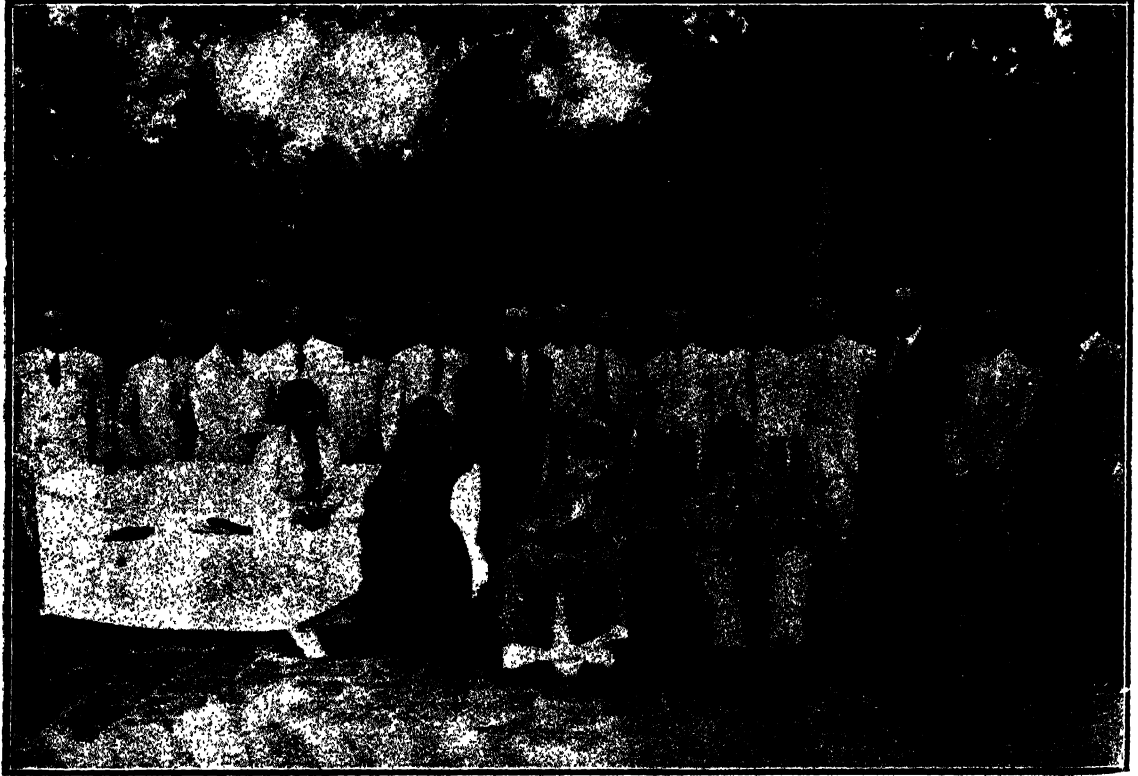
বোগ্দাদ ত্যাগের পূর্ব্বাহ্নে সহরের বাহিরের বাগান বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা

বোধ হচ্চে আমার ভ্রমণ এই "আরব বেদুয়িনে" এসেই শেষ হোলো। দেশে যাত্রা করবার আর দুতিন দিন বাকি কিন্তু শরীর এত ক্লান্ত যে এর মধ্যে আর কোনো দেখা শোনা চল্‌বে না। তাই, এই মরুভূমির বন্ধুত্বের মধ্যে ভ্রমণের উপসংহারটা ভালোই লাগচে। আমার বেদুয়িন নিমন্ত্রণ-কর্ত্তাকে বল্‌লুম যে, বেদুয়িন আতিথ্যের পরিচয় পেয়েচি কিন্তু বেদুয়িন দস্যুতার পরিচয় না পেলে তো অভিজ্ঞতা শেষ করে যাওয়া হবে না। তিনি হেসে বল্‌লেন, তার একটু বাধা আছে। আমাদের দস্যুরা প্রাচীন জ্ঞানীলোকদের গায়ে হস্তক্ষেপ করেনা। এই জন্যে মহাজনরা যখন আমাদের অত্যাচার করবে না, তারা প্রাচীনকে ভক্তি করে। সত্তর বছর বয়সে যৌবনের পরাকা চলবে না। নানাস্থানে ঘোরা শেষ হল, বিদেশীর কাছ থেকে কিছু ভক্তি নিয়ে শ্রদ্ধা নিয়েই দেশে ফিরে যাব, তারপরে আশা করি কর্ম্মের অবসানে শান্তির অবকাশ আসবে। যুবকে যুবকে দ্বন্দ্ব ঘটে সে দ্বন্দ্বের আলোড়নে সংসার প্রবাহের বিকৃতি দূর হয়। দস্যু যখন বৃদ্ধকে ভক্তি করে তখন সে তাকে আপন জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যুবকের সাক্ষেই তার শক্তির পরীক্ষা, সেই দ্বন্দ্বের আঘাতে শক্তি প্রবল থাকে, অতএব ভক্তির সুদূর অন্তরালে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।

শেষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

গণ্ডগোল শুনিয়া পাশের কামরার সহযাত্রী সাহেবরা প্লাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইল, এবং রুক্ষ-কণ্ঠে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, what's up ? ভাবটা এই যে, সঙ্গীদের হইয়া তাহারা বিক্রম দেখাইতে প্রস্তুত।

বিপ্রদাস অদূরবর্ত্তী গার্ডকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া কহিল, এই লোক গুলো খুব সম্ভব ফার্ষ্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার নয়, তোমার ডিউটি এদের সরিয়ে দেওয়া।

সে-বেচারাও সাহেব, কিন্তু অত্যন্ত কালো-সাহেব। সুতরাং, ডিউটি যাই হৌক, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অনেকেই তামাসা দেখিতেছিল, সেই মাদ্রাজী বিলিভিং হ্যাণ্ডটিও দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে হাত নাড়িয়া নিকটে ডাকিয়া বিপ্রদাস পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়া কহিল, আমার নাম আমার চাকরদের কাছে পাবে। তোমার কর্ত্তাদের কাছে একটা তার করে দাও যে এই মাতাল ফিরিঙ্গির দল জোর করে ফার্ষ্টক্লাসে উঠেছে, নামতে চায় না। আর, এ খবরটাও তাঁদের জানিয়ো যে গাড়ীর গার্ড দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌লে কিন্তু কোন সাহায্য করলে না।

গার্ড নিজের বিপদ বুঝিল। সাহসে ভর করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, Don't you see they are big people ? তোমরা রেল-ওয়ে স্যার্‌ভ্যাণ্ট, রেলের পাশে যাচ্চো—be careful !

কথাটা মাতালের পক্ষেও উপেক্ষণীয় নয়। অতএব, তাহারা নামিয়া পাশের কামরায় গেল, কিন্তু ঠিক অহিংস মেজাজে গেল না। চাপা গলায় যাহা বলিয়া গেল তাহাতে মন বেশ নিশ্চিন্ত হয় না। সে যা হোক, পঞ্জাবের ব্যারিষ্টার সাহেব গার্ডকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, আপনি না থাকলে আজ হয়ত আমাদের যাওয়াই ঘটতোনা।

ও—নো। এ আমার ডিউটি!

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। বিপ্রদাস নামিবার উপক্রম করিয়া কহিল, আর বোধ হয় আমার সঙ্গে যাবার প্রয়োজন নেই। ওরা আর কিছু করবেনা।

ব্যারিষ্টার বলিলেন, সাহস করবেনা। চাকরির ভয় আছে তো?

বন্দনা দরজা আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না সে হবেনা। চাকরির ভয়টাই চরম guarantee নয়,—সঙ্গে আপনাকে যেতেই হবে।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, পুরুষ হলে বুঝ্‌তে এর চেয়ে বড় guarantee সংসারে নেই। কিন্তু আমি যে কিছু খেয়ে আসিনি।

খেয়ে আমিও তো আসিনি।

সে তোমার সখ। কিন্তু একটু পরেই আসবে হোটেল-ওয়ালা বড়-ষ্টেসন, সেখানে ইচ্ছে হলেই খেতে পারবে।

বন্দনা কহিল, কিন্তু সে ইচ্ছে হবে না। উপোস করতে আমিও পারি।

বিপ্রদাস বলিল, পেরে কোন পক্ষেরই লাভ নেই,—আমি নেবে যাই। ব্যারিষ্টার সাহেবকে কহিল, আপনি সঙ্গে রইলেন একটু দেখ্‌বেন। যদি আবশ্যক হয় তো—

বন্দনা কহিল, চেন টেনে গাড়ী থামাবেন? সে আমিও পারবো। এই বলিয়া সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাড়ীর চাকরদের বলিয়া দিল, তোমরা মাকে গিয়ে বোলো যে উনি সঙ্গে গেলেন। কাল কিম্বা পরশু ফিরবেন।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

বন্দনা কাছে আসিয়া বসিল, কহিল, আচ্ছা মুখুয্যে মশাই, আপনি তো একগুঁয়ে কম নয়।

কেন?

আপনি যে জোর করে আমাদের গাড়ীতে তুললেন, কিন্তু ওরা তো ছিলো মাতাল,—যদি নেবে না গিয়ে একটা মারামারি বাধিয়ে দিত?

বিপ্রদাস কহিল, তা'হলে ওদের চাক্‌রি যেতো।

বন্দনা বলিল, কিন্তু আমাদের কি যেতো? দেহের অস্থি-পঞ্জর? সেটা চাকরির চেয়ে তুচ্ছ বস্তু নয়।

বিপ্রদাস ও বন্দনা উভয়েই হাসিতে লাগিল, অন্য মহিলাটিও হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ঘাড় ফিরাইল, শুধু তাঁহার স্বামী, পঞ্জাবের নবীন ব্যারিষ্টার, মুখ গম্ভীর করিয়া রহিলেন।

বন্দনার পিতা এতক্ষণ বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, আলোচনার শেষের দিকটা কানে যাইতে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, না না, তামাসার কথা নয়, এ ব্যাপার ট্রেনে প্রায়ই ঘটে খবরের কাগজে

দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাইতো জোর-জবরদস্তির আমার ইচ্ছেই ছিল না,—রাত্রের ট্রেনে গেলেই সব দিকে সুবিধে হোতো।

বন্দনা কহিল, রাত্রের ট্রেনেও যদি মাতাল-সাহেব থাকতো বাবা?

পিতা কহিলেন, তা কি আর সত্যিই হয় রে? তা'হলে তো ভদ্রলোকদের যাতায়াতই বন্ধ করতে হয়। এই বলিয়া তিনি একটা মোটা চুরুট ধরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বন্দনা আস্তে আস্তে বলিল, মুখুয্যে মশাই, ভদ্রলোকের সংজ্ঞা নিয়ে যেন বাবাকে জেরা করবেন না।

বিপ্রদাস হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। সে আমি বুঝেচি।

আচ্ছা, মুখুয্যে মশাই, ছেলেবেলা গড়ের-মাঠে সাহেবদের সঙ্গে কখনো মারামারি করেছেন? সত্যি বল্‌বেন।

না, সে সৌভাগ্য কখনো ঘটেনি।

বন্দনা কহিল, লোকে বলে দেশের লোকের কাছে আপনি একটা terror শুনি, বাড়ীর সবাই আপনাকে বাঘের মত ভয় করে। সত্যি?

কিন্তু শুন্‌লে কার কাছে?

বন্দনা গলা খাটো করিয়া বলিল, মেজদির কাছে।

কি বলেন তিনি?

বলেন, ভয়ে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

কি রকম জল? মাতাল-সাহেব দেখ্‌লে আমাদের যেমন হয়,—তেম্‌নি?

বন্দনা সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, অনেকটা ঐ রকম।

বিপ্রদাস কহিল, ওটা দরকার। নইলে মেয়েদের শাসনে রাখা যায়না। তোমার বিয়ে হ'লে বিদ্যেটা ভায়াকে শিখিয়ে দিয়ে আস্‌বো।

বন্দনা কহিল, দেবেন। কিন্তু সব বিদ্যে সকলের বেলায় খাটেনা এও জান্‌বেন মেজদি বরাবরই ভালোমানুষ, কিন্তু আমি হ'লে আমাকেই সকলের ভয় ক'রে চল্‌তে হোতো।

বিপ্রদাস বলিল, অর্থাৎ, ভয়ে বাড়ী শুদ্ধ লোকের গায়ের রক্ত জল হয়ে যেতো? খুব আশ্চর্য্যি নয়। কারণ, একটা বেলার মধ্যেই নমুনা যা' দেখিয়ে এসেচো তাতে বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হয়। অন্ততঃ, মা সহজে ভুল্‌তে পারবেননা।

বন্দনা মনে মনে একটুখানি উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার মা কি করেছেন জানেন? আমি প্রণাম করতে গেলুম,—তিনি পেছিয়ে সরে গেলেন।

বিপ্রদাস কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কহিল, আমার মায়ের ঐটুকু মাত্রই দেখে এলে, আর

কিছু দেখবার সুযোগ পেলেনা। পেলে বুঝ্‌তে এই নিয়ে রাগ কোরে না-খেয়ে আসার মত ভুল কিছু নেই।

বন্দনা বলিল, মানুষের আত্ম-সম্ভ্রম বলে তো একটা জিনিষ আছে?

বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল, আত্ম-সম্ভ্রমের ধারণা পেলে কোথা থেকে? ইস্কুল-কলেজের মোটা-মোটা বই পড়েতো? কিন্তু মা তো ইংরিজি জানেন না, বইও পড়েননি। তাঁর জানার সঙ্গে তোমার ধারণা মিল্‌বে কি ক'রে?

বন্দনা বলিল, কিন্তু আমি তো শুধু নিজের ধারণা নিয়েই চল্‌তে পারি।

বিপ্রদাস কহিল, পারলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়, যেমন আজ তোমার হয়েছে। বিদেশের বই থেকে যা' শিখেচো তাকেই একান্ত বলে মেনে নিয়েছো বলেই এম্‌নি কোরে চলে আসতে পারলে। নইলে পারতেনা। গুরুজনকে অকারণে অসম্মান করতে বাধ্‌তো। আত্ম-মর্য্যাদা আর আত্ম-অভিমানের তফাৎ বুঝ্‌তে।

বন্দনা তফাৎ না বুঝুক, এটা বুঝিল যে তাহার আজিকার আচরণটা বিপ্রদাসের অন্তরে লাগিয়াছে। তাহার জন্য নয়, মায়ের অসম্মানের জন্য।

মিনিট দুই-তিন চুপ করিয়া থাকিয়া বন্দনা হঠাৎ প্রশ্ন করিল, মায়ের মত আপনি নিজেও খুব গোড়া হিন্দু, না?

বিপ্রদাস কহিল, হাঁ।

তেমনি ছোঁয়া-ছুঁইর বাচ-বিচার করে চলেন?

চলি।

প্রণাম করতে গেলে তাঁর মতই দূরে সরে যান?

যাই। সময়-অসময়ের হিসেব আমাদের মেনে চল্‌তে হয়।

আমার মেজদিদিকেও বোধকরি এম্‌নি অন্ধ বানিয়ে তুলেছেন?

সে তোমার দিদিকেই জিজ্ঞেসা করো। তবে, পারিবারিক নিয়ম তাঁকেও মেনে চল্‌তে হয়।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ বাঘের ভয় না কোরে কারও চলবার যো নেই।

বিপ্রদাসও হাসিয়া বলিল, না যো নেই। যেমন, দিনের গাড়ীতে বাঘের ভয় থাকলে মানুষকে রাত্রের গাড়ীতে যেতে হয়,—ওটা প্রাণ-ধর্ম্মের স্বাভাবিক নিয়ম।

বন্দনা বলিল, দিদি মেয়েমানুষ, সহজেই দুর্ব্বল,—তাঁর ওপর সব নিয়মই খাটানো যায়, কিন্তু দ্বিজবাবুও তো শুনি পারিবারিক নিয়ম মেনে চলেননা, সে-সম্বন্ধে বাঘমশায়ের অভিমতটা কি?

প্রশ্নটা খোঁচা দিবার জন্যই বন্দনা করিয়াছিল, এবং বিদ্ধ করিবে বলিয়াই সে আশা করিয়াছিল, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের পরে কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইলনা, তেমনিই হাসিয়া বলিল, এ সকল গূঢ় তথ্য অধিকারী ব্যতিরেকে প্রকাশ করা নিষেধ।

দ্বিজবাবু নিজে জান্‌তে পাবেন তো?

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সময় হলেই পাবে। সে জানে রক্ত-মাংসে বাঘের পক্ষপাতিত্ব নেই।

মুহূর্ত্তকালের জন্য বন্দনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। ইহার পরে সে যে কি প্রশ্ন করিবে ভাবিয়া পাইল না।

এই পরিবর্ত্তন বিপ্রদাসের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে এড়াইলনা।

পিতা ডাকিলেন, বুড়ি, আমাকে একটু জল দাওতো মা।

বন্দনা উঠিয়া গিয়া পিতাকে কুঁজা হইতে জল দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। পুনশ্চ দ্বিজদাসের কথা পাড়িতে তাহার ভয় করিল। অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কহিল. মেজদির শাশুড়ীর জন্যে নয়, কিন্তু আমার না-খেয়ে আসায় মেজদি যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন তো আমিও দুঃখ পাবো। আমি সেই কথাই এখন ভাব্‌চি।

বিপ্রদাস কহিল, মেজদি কষ্ট পাবেন সেইটে হোলো বড়, আর আমার মা যে লজ্জা পাবেন, বেদনা বোধ করবেন সেটা হোলো তুচ্ছ। তার মানে, মানুষে আসল জিনিষটি না জান্‌লে কত উল্টো চিন্তাই না করে।

বন্দনা কহিল, একে উল্টো চিন্তা বল্‌চেন কেন? বরঞ্চ, এই তো স্বাভাবিক।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। তাহার ক্ষুণ্ণ মুখের চেহারা বন্দনার চোখে পড়িল।

বাহিরে অন্ধকার করিয়া আসিতেছিল, কিছুই দেখা যায়না, তথাপি জানালার বাহিরে চাহিয়া বন্দনা বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অন্যদিন এই সময়ে ট্রেন হাবড়ায় পৌঁছায়, কিন্তু আজ এখনো দু'তিন ঘণ্টা দেরি। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল বিপ্রদাস পকেট হইতে একটা ছোট খাতা বাহির করিয়া কি সব লিখিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মুখুয্যে মশাই, একটা কথার জবাব দেবেন?

কি কথা?

আপনি বলছিলেন আমাদের আত্ম-সম্ভ্রমবোধ শুধু ইস্কুল-কলেজের বই-পড়া ধারণা। কিন্তু আপনার মা তো ইস্কুল-কলেজে পড়েননি, তাঁর ধারণা কোথাকার শিক্ষা?

বিপ্রদাস বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিলনা।

বন্দনা কহিল, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল আমি মন থেকে সরাতে পারচিনে। তিনি গুরুজন, আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু সংসারে সেই কথাটাই কি সকল কথার বড়?

বিপ্রদাস পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া রহিল।

বন্দনা বলিতে লাগিল, আজ আমরা ছিলাম তাঁর বাড়ীতে অনাহূত অতিথি। এতো আমার বই-পড়া বিদ্যের শিক্ষা নয়? তবুও এসব কিছুই নয়,—শুধু বয়সে ছোট বলেই কি আমার অপমানটা আপনারা অগ্রাহ্য করবেন?

এখনও বিপ্রদাস কিছুই বলিলনা,—তেম্‌নি নীরবে রহিল।

বন্দনা কহিল, তবুও তাঁর কাছে আমি ক্ষমা চাইচি। আমার আচরণের জন্যে দিদি যেন না দুঃ পান। একটু থামিয়া বলিল, আমাদের এক জ্যাঠা ইংরেজের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন, আমার বাপ-মা বিলেতে গিয়েছিলেন বলে মেম-সাহেব ছাড়া আমাদের আর কিছু তিনি ভাব্‌তেই পারেন না। শুনেচি এই জন্যেই নাকি আজও মেজদির গঞ্জনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তাঁর ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা মিল্‌বেনা তবু তাঁকে বলবেন, আমি যাই হই, অপমানটা অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। দিদির শাশুড়ী করলেও না বলিতে বলিতে তাহার চোখের কোনে জল আসিয়া পড়িল।

বিপ্রদাস ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু তিনি তো তোমাকে অপমান করেননি।

বন্দনা জোর দিয়া বলিল, নিশ্চয় করেছেন।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলনা, কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া কহিল, না, অপমান তোমাকে মা করেননি। কিন্তু তিনি নিজে ছাড়া এ কথা তোমাকে কেউ বোঝাতে পারবেনা। তর্ক কোরে নয়, তাঁর কাছে থেকে এ কথা বুঝ্‌তে হবে।

বন্দনা জানলার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, একদিন বাবার সঙ্গে মা'র ঝগড়া হয়। কারণটা তুচ্ছ, কিন্তু হয়ে দাঁড়ালো মস্ত বড়। তোমাকে সকল কথা বলা চলেনা, কিন্তু সেই দিন বুঝেছিলাম আমার এই লেখা-পড়া-না-জানা মায়ের আত্ম-মর্য্যাদা বোধ কত গভীর।

বন্দনা সহসা ফিরিয়া দেখিল অপরিসীম মাতৃ-গর্ব্বে বিপ্রদাসের সমস্ত মুখ যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে কিছুই না বলিয়া আবার জানালার বাহিরেই চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, অনেকদিন পরে কি-একটা কথার সূত্রে একদিন এই কথাই মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—মা, এতবড় আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ তুমি পেয়েছিলে কোথায়?

বন্দনা মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, কি বললেন তিনি?

বিপ্রদাস কহিল, জানো বোধ হয় মায়ের আমি আপন ছেলে নই। তাঁর নিজের দুটি ছেলেমেয়ে আছে,—দ্বিজু আর কল্যাণী। মা বল্‌লেন, তোদের তিনটিকে একসঙ্গে এক বিছানায় যিনি মানুষ কোরে তোলবার ভার দিয়েছিলেন, তিনিই এ বিত্তে আমাকে দান করেছিলেন বাবা, অন্য কেউ নয়। সেই দিন থেকেই জানি মায়ের এই গভীর আত্ম-সম্মান বোধই কাউকে একটা দিনের জন্যে জান্‌তে দেয়নি তিনি আমার জননী ন'ন, বিমাতা। বুঝতে পারো এর অর্থ?

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনরায় সে বলিতে লাগিল, অভিবাদনের উত্তরে কে কতটুকু হাত তুল্‌লে, কে কতটুকু সরে দাঁড়ালো, নমস্কারের প্রতি-নমস্কারে কে কতখানি মাথা নোয়ালে এই নিয়ে মর্য্যাদার লড়াই সব দেশেই আছে, অহঙ্কারের নেশার খোরাক তোমাদের পাঠ্য-পুস্তকের পাতায়-পাতায় পাবে, কিন্তু মা না হয়ে পরের-ছেলের মা হয়ে যেদিন মা আমাদের বৃহৎ পরিবারে প্রবেশ করলেন, সেদিন আশ্রিত আত্মীয়-পরিজনদের গলায় গলায় বিষের থলি যেন উপ্‌চে উঠ্‌লো। কিন্তু যে-বস্তু দিয়ে তিনি সমস্ত বিষ আ

করে তুল্লেন, সে গৃহ-কর্ত্রীর অভিমান নয়, সে গৃহিণীপনার জবরদস্তি নয়, সে মায়ের স্বকীয় মর্য্যাদা। সে এত উঁচু যে তাকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারলেননা। কিন্তু এ তত্ত্ব আছে শুধু আমাদের দেশে। বিদেশীরা এ খবর তো জানেনা, তারা খবরের কাগজের খবর দেখে বলে এদের দাসী, বলে অন্তঃপুরে শেকল-পরা বাঁদী। বাইরে থেকে হয়ত তাই দেখায়—দোষ তাদের দিইনে—কিন্তু বাড়ীর দাস-দাসীরও সেবার নীচে অন্নপূর্ণার রাজ্যেশ্বরী মূর্ত্তি তাদের যদিও বা না চোখে পড়ে, তোমাদেরও কি পড়বেনা?

বন্দনা অভিভূত চক্ষে বিপ্রদাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ব্যারিষ্টার সাহেব অকস্মাৎ জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন, ট্রেন এতক্ষণে হাবড়া প্ল্যাটফর্ম্মে ন করলে

বন্দনার পিতার বোধ করি তন্দ্রা আসিয়াছিল, চমকিয়া চাহিয়া কহিলেন, বাঁচা গেল।

বন্দনা মৃদুকণ্ঠে চুপি চুপি বলিল, আমার কলকাতায় নাম্‌তে আর যেন ভালো লাগ্‌চেনা, মুখুয্যে শাই। ইচ্ছে হচ্চে আপনার মা'র কাছে ফিরে যাই। গিয়ে বলি, মা আমি ভালো করিনি, আমাকে ার্জ্জনা করুন।

বিপ্রদাস শুধু হাসিল,—কিছু বলিল না।

ষ্টেশনে নামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন?

রায় সাহেব বলিলেন, গ্র্যাণ্ড হোটেলেই ত বরাবর উঠি, তাদের তার করেও দিয়েছি—ঐখানেই ঠে বো।

এই লোকটির সুমুখে গ্র্যাণ্ড-হোটেলের কথায় বন্দনার কেমন যেন আজ লজ্জা করিতে লাগিল।

পঞ্জাবের ব্যারিষ্টার সাহেব গাড়ীর অত্যন্ত লেট হওয়ার প্রতি নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বার ার জানাইতে লাগিলেন তাঁহাকে বি, এন, লাইনে যাইতে হইবে,—অতএব ওয়েটিং রুম ব্যতীত আজ ার গত্যন্তর নাই।

বিপ্রদাস নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, রায় সাহেব নিজেও একটুখানি যেন লজ্জিত হইয়াই কহিলেন, কিন্তু বিপ্রদাস, তুমি—তুমিও বোধ হয় আমাদের সঙ্গে—

গ্র্যাণ্ড হোটেলে? বলিয়াই বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল, কহিল, আমার জন্যে চিন্তে নেই। বউ-বাজারে দ্বিজুর একটা বাড়ী আছে, প্রায়ই আসতে হয়,—লোকজন সবই আছে,—আচ্ছা, আজ সেইখানেই কেন সকলে চলুননা?

বন্দনা পুলকিত হইয়া উঠিল,—চলুন, সবাই সেখানেই যাবো। তাহার মাথার উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। আনন্দের প্রাবল্যে অপর দুই সহযাত্রীকে সে-ই সাদরে আহ্বান করিয়া সবাই মিলিয়া মোটরে গিয়া উঠিল।

৯

বন্দনা সকালে উঠিয়া দেখিল এই বাড়ীটার সম্বন্ধে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়। মনে করিয়াছিল পুরুষ মানুষের বাসা-বাড়ী, হয়ত ঘরের কোণে-কোণে জঞ্জাল, সিঁড়ির গায়ে থুথু, পানের পিচের দাগ, ভাঙা-চোরা আসবাব পত্র, ময়লা বিছানা, কড়ি-বরগায় ঝুল, মাকড়সার জাল,—এম্‌নি সব অগোছালো বিশৃঙ্খল ব্যাপার। কাল রাত্রে সামান্য আলোকে স্বল্পকালের মধ্যে দেখাও কিছু হয় নাই, কিন্তু আজ তাহার সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্নতায় সত্যই আশ্চর্য্য হইল। মস্ত বাড়ী, অনেক ঘর, অনেক বারান্দা, সমস্ত পরিষ্কার ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দ্বারের বাহিরে একজন মধ্যবয়সী বিধবা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়াছিল, দেখিতে ভদ্র-ঘরের মেয়ের মতো, সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতেই বন্দনা সঙ্কোচে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে বলিল, দিদি, আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি, চলুন, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিই। আমি এ বাড়ীর দাসী।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, বাবা উঠেছেন?

না, কাল শুতে দেরি হয়েছে, হয়ত উঠ্‌তেও দেরি হবে।

আমাদের সঙ্গে আর দুজন যাঁরা এসেছেন তাঁরা?

না, তাঁরাও ওঠেননি।

তোমাদের বড়বাবু? তিনিও ঘুমুচ্ছেন?

দাসী হাসিয়া বলিল, না, তিনি গঙ্গাস্নান, পূজো-আহ্নিক সেরে কাছারি-ঘরে গেছেন। খবর পাঠাবো কি?

বন্দনা বলিল, না তার দরকার নেই।

স্নানের-ঘরটা একটু দূরে, ছোট একটা বারান্দা পার হইয়া যাইতে হয়। বন্দনা যাইতে যাইতে কহিল, তোমাদের এখানে বাথরুম শোবার ঘরের কাছে থাকবার যো নেই, না?

দাসী কহিল, না। মা মাঝে মাঝে কালী দর্শনের জন্যে কলকাতায় এলে এ বাড়ীতেই থাকেন কিনা, তাই ও-সব হবার যো নেই।

বন্দনা মনে মনে বলিল, এখানেও সেই প্রবল-প্রতাপ মা। আচার অনাচারের কঠিন শাসন। সে ফিরিয়া গিয়া কাপড়-জামা গামছা প্রভৃতি লইয়া আসিল, কহিল, এখানে দুচার দিন যদি থাক্‌তে হয় তোমাকে কি বলে ডাক্‌বো? এখানে তুমি ছাড়া আর বোধ হয় কোন দাসী নেই?

সে বলিল, আছে, কিন্তু তার অনেক কাজ। ওপরে আসবার সময় পায়না। যা দরকার হয় আমাকেই আদেশ করবেন, দিদি, আমার নাম অন্নদা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক, হয়ত অনেক দোষ ত্রুটি হবে।

তাহার বিনয় বাক্যে বন্দনা মনে মনে খুসি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় তোমার বাড়ী অন্নদা? তোমার কে-কে আছে?

অন্নদা বলিল, বাড়ী আমার এঁদের গ্রামেই,—বলরামপুরে। একটি ছেলে, তাকে এঁরাই লেখাপড়া শিখিয়ে কাজ দিয়েছেন, বউ নিয়ে সে দেশেই থাকে। ভালোই আছে দিদি। বন্দনা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, তবে, নিজে তুমি এখনো চাক্‌রি করো কেন, বউ-ব্যাটা নিয়ে বাড়ীতে থাক্‌লেই তো পারো?

অন্নদা কহিল, ইচ্ছে তো হয় দিদি, কিন্তু পেরে উঠিনে। দুঃখের দিনে বাবুদের কথা দিয়েছিলুম নিজের ছেলে যদি মানুষ হয়, পরের ছেলেদের মানুষ করবার ভার নেবো। সেই ভারটা ঘাড় থেকে নামাতে পারিনে। দেশের অনেকগুলি ছেলে এই বিদেশে লেখা-পড়া করে। আমি না দেখ্‌লে তাদের দেখবার কেউ নেই।

তারা বুঝি এই বাড়ীতেই থাকে?

হাঁ, এই বাড়ীতে থেকেই কলেজে পড়ে। কিন্তু আপনার দেরি হয়ে যাচ্চে, আমি বাইরেই আছি, ডাক্‌লেই সাড়া পাবেন।

বন্দনা বাথরুমে ঢুকিয়া দেখিল ভিতরে নানাবিধ ব্যবস্থা। পাশাপাশি গোটা তিনেক ঘর, স্পর্শ-দোষ বাঁচানোর যত প্রকার ফন্দি-ফিকির মানুষের বুদ্ধিতে আসিতে পারে তাহার কোন ত্রুটি ঘটে নাই। বুঝিল এ সব মায়ের ব্যবহারের জন্য। পাথরের মেঝে, পাথরের জল-চৌকি, একদিকে গোটা তিনেক প্রকাণ্ড তাঁবার হাঁড়া—বোধ হয় গঙ্গাজল রাখার জন্য,—নিত্য মাজা ঘষায় ঝক্‌-ঝক্‌ করিতেছে—তিনি কবে আসিয়াছিলেন, এবং আবার কবে আসিবেন নিশ্চিত কেহ জানে না, তথাপি, অবহেলার চিহ্নমাত্র কোথাও চোখে পড়িবার যো নাই। যেন এখানেই বাস করিয়া আছেন এম্‌নি সযত্ন-সতর্ক ব্যবস্থা। এ যে কেবল হুকুম করিয়া, শাসন চালাইয়াই হয়না, তাহার চেয়েও বড় কিছু-একটা সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এ কথা বন্দনা চাহিবা মাত্রই অনুভব করিল। এবং, এই মা, এই স্ত্রীলোকটি যে এ সংসারে সর্ব্বসাধারণের কতখানি উর্দ্ধে অবস্থিত এই কথাটা সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের মনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। গল্পে, প্রবন্ধে, পুস্তকে ভারতীয় নারী-জাতির বহু দুঃখের কাহিনী সে পড়িয়াছে, তাহাদের হীনতার লজ্জায় নিজে নারী হইয়া সে মর্ম্মে মরিয়া গেছে—ইহা মিথ্যাও নয়,—কিন্তু, এই ঘরের মধ্যে আজ একাকী দাঁড়াইয়া সে-সকল সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেও তাহার বাধিল।

বাহিরে আসিতে অন্নদা হাসিমুখে কহিল, বড্ড দেরি হয়ে গেল যে দিদি, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক,—ওঁরা সব নীচে খাবার-ঘরে অপেক্ষা করে আছেন। চলুন।

তোমাদের বড়বাবু কাছারি-ঘর থেকে বেরিয়েছেন?

হাঁ, তিনিও নীচে আছেন।

আমাদের সঙ্গে বোধকরি খাবেননা?

অন্নদা সহাস্যে কহিল, খেলেও তো সেই দুপুরের পরে দিদি। আজ আবার তাও নেই। একাদশী,—সন্ধ্যের পরে বোধ হয় কিছু ফল-মূল খাবেন।

বন্দনা কি করিয়া যেন বুঝিয়াছিল এ গৃহে এই স্ত্রীলোকটি ঠিক দাসী জাতীয় নয়, কহিল, তিনি

তো আর বামুনের ঘরের বিধবা নয়, একাদশীর উপোস করবেন কোন্ দুঃখে? কাল গাড়ীতে একাদশী না হোক্, দশমীর উপোস তো এম্নিই হয়ে গেছে।

অন্নদা বলিল, তা হোক্, উপোস ওঁর গায়ে লাগেনা। মা বলেন, আর জন্মে তপস্যা কোরে বিপিন এ জন্মে উপোস-সিদ্ধির বর পেয়েছে। ওঁর খাওয়া দেখ্‌লে অবাক্ হতে হয়।

বন্দনা নীচে আসিয়া দেখিল তাহাদের অভ্যস্ত চা রুটি ডিম প্রভৃতি টেবিলে সুসজ্জিত, এবং পিতা ও সস্ত্রীক পঞ্জাবের ব্যারিষ্টার ক্ষুধায় চঞ্চল। অধৈর্য্য তাঁহাদের প্রায় শেষ সীমায় উপনীত, মুহূর্ত্তে খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া সাহেব অনুযোগের কণ্ঠে কহিলেন, ইঃ—এতো দেরি মা, সকাল বেলাটায় আর তো কোন কাজ হবেনা দেখ্‌চি।

বিপ্রদাস অদূরে বসিয়াছিল, বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মুখুয্যেমশাই, আপনি খাবেননা?

বিপ্রদাস কথাটা বুঝিল, হাসিয়া কহিল, চা আমি খাইনে, খাই শুধু ডাল-ভাত। তার সময় এ নয়,—আমার জন্যে চিন্তা নেই, তুমি বসে যাও।

বন্দনা ইহার উত্তর দিলনা, পিতা এবং অতিথি দুজনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আমার অপরাধ হয়ে গেছে। বলে পাঠানো উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। খাবার ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু আপনারা আর অপেক্ষা করবেননা,—আরম্ভ করে দিন। আমি বরঞ্চ আপনাদের চা তৈরি করে দিই। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গেল।

সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকরটা একধারে দাঁড়াইয়াছিল সে কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, পিতা উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুখ করেনিত মা? সস্ত্রীক ব্যারিষ্টার সাহেব কি যে বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না

বন্দনা চা তৈরি করিতে করিতে কহিল, না বাবা অসুখ করেনি, শুধু খেতে ইচ্ছে করচেনা।

তা'হলে কাজ নেই। কাল বেশি রাত্রের খাওয়াটা বোধকরি তেমন হজম হয়নি। তা' ছাড়া দিনের বেলা পিত্তি পড়ে গেল কিনা।

তাই বোধ হয় হবে। বেলা হলে মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে বসে ডাল-ভাত খাবো, এ বাড়ীতে সে হয়ত হজম করতে পারবো।

কথাটায় আর কেহ তেমন খেয়াল করিল না, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের উপর দিয়া যেন একটা কালো ছায়া মুহূর্ত্তের জন্য ভাসিয়া গেল।

চাকরটা কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আজ একাদশী, ও-বেলায় দুটো ফল-মূল ছাড়া আর তো কিছু খাননা।

বন্দনা এইমাত্র এ কথা শুনিয়া আসিয়াছিল, তথাপি বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, শুধু ফল-মূল? বেশ হাল্কা খাওয়া। সে-ই বোধহয় খুব ভালো হবে। না, মুখুয্যে মশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িল বটে, কিন্তু কেহ যে তাহাকে স্বচ্ছন্দে উপহাস করিতে পারে আজ

এই প্রথম জানিয়া মনে মনে সে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। এবং তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বন্দনাও বোধকরি ইহা অনুভব করিল।

কাজ-কর্ম্ম সারিয়া বন্দনা পিতার সহিত যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল তখন অপরাহ্ণ বেলা। সস্ত্রীক ব্যারিষ্টার সাহেব যাদুঘর, চিড়িয়া-খানা, গড়ের মাঠের ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু সকল পরিদর্শন করিয়া তখনও ফিরেন নাই। রাত্রের গাড়ীতে তাঁহাদের যাইবার কথা, কিন্তু প্রোগ্রাম বদল করিয়া যাত্রাটা আপাততঃ তাঁহারা বাতিল করিয়াছেন।

রায় সাহেব কাপড় ছাড়িতে তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন, বন্দনার নিজের ঘরের সম্মুখে দেখা হইল অন্নদার সঙ্গে। সে হাসিমুখে অনুযোগের সুরে বলিল, দিদি, সারাদিন তো না খেয়ে কাটলো,—আপনার ফল-মূল সমস্ত আনিয়ে রেখেচি একটু শীগ্‌গীর করে মুখ-হাত ধুয়ে নিন আমি ততক্ষণ সব তৈরি করে ফেলি। কি বলেন?

কিন্তু বড়বাবু,—মুখুয্যে মশাই? তিনি কই?

অন্নদা কহিল, তাঁর জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই দিদি, এ সব তাঁর রোজকার ব্যাপার। খাওয়ার চেয়ে না-খাওয়াটাই তাঁর নিয়ম।

কিন্তু কই তিনি?

তিনি গেছেন দক্ষিণেশ্বরে কালীদর্শন করতে। এখুনি আস্‌বেন।

বন্দনা কহিল, সেই ভালো, তিনি এলেই [illegible] বাকি সকলে? তাঁদের কি ব্যবস্থা হোলো? চলোত অন্নদা, তোমাদের রান্নাঘরটা একবার দেখে আসি।

অন্নদা কহিল, চলুন, কিন্তু এ বেলায় তাঁদের ব্যবস্থা তো রান্না-ঘরে হয়নি দিদি, ব্যবস্থা হয়েছে হোটেলে,—খাবার সেখান থেকেই আস্‌বে।

বন্দনা আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—সে কি কথা? এ পরামর্শ তোমাদের দিলে কে?

বড়বাবু নিজেই হুকুম দিয়ে গেছেন।

কিন্তু সে-সব অখাদ্য-কুখাদ্য তাঁরা খাবেন কোথায়? এই বাড়ীতে? তোমাদের মা শুন্‌লে বল্‌বেন কি?

অন্নদা অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, কহিল, না, তিনি শুন্‌তে পাবেননা। নীচের একটা ঘরে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বাসন-পত্র হোটেল-ওয়ালারাই নিয়ে আস্‌বে, কোন অসুবিধে হবেনা।

বন্দনা বলিল, হুকুম তো দিয়ে গেলেন কিন্তু তামিল করলে কে? তাঁর কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারো?

সে আর বেশি কথা কি দিদি, চলুন নিয়ে যাচ্চি।

চলো।

মুখুয্যেদের একটা বড় রকমের তেজারতি কারবার কলিকাতায় চলে। নীচের তলায় গোটা চারেক ঘর লইয়া আফিস; কেরাণী, গমস্তা সরকার, পেয়াদা ম্যানেজার প্রভৃতি ব্যবসায়ের যাবতীয় লোকজন

সেখানে কাজ করে, বন্দনা প্রবেশ করিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। বয়স ও পদমর্য্যাদার লক্ষণে ম্যানেজার ব্যক্তিটিকে সহজেই চিনিতে পারিয়া সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া কহিল, হোটেলে হুকুম দিয়ে এসেছিলেন কি আপনি নিজে?

ম্যানেজার ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলে কহিল, আর একবার যান্ তাদের বারণ করে দিয়ে আসুন।

ম্যানেজার বিস্মিত হইল, ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, বড়বাবু ফিরে না আসা পর্য্যন্ত—

বন্দনা কহিল, তখন হয়ত আর বারণ করবার সময় থাকবেনা। মুখুয্যে মশাই রাগ করলে আমার ওপর করবেন আপনার ভয় নেই। যান্, দেরি করবেন না। এই বলিয়াই সে ফিরিতে উদ্যত হইল, উত্তরের অপেক্ষাও করিলনা।

হতবুদ্ধি ম্যানেজার ভাবিল, মন্দ নয়। বিপ্রদাসের হুকুম অমান্য করা কঠিন, এমনকি অসম্ভব বলাও চলে, কিন্তু এই অপরিচিত মেয়েটির সুনিশ্চিত, নিঃসংশয় শাসন অবহেলা করাও কম কঠিন নয়। প্রায় তেমনি অসম্ভব। ক্ষণকাল বিমূঢ়ের ন্যায় স্তব্ধ থাকিয়া দ্বিধার স্বরে কহিল, আজ্ঞে, যাই তা'হলে,—নিষেধ করে আসি? কিছু আগাম দেওয়া হয়ে গেছে—

তা'হোক্, আপনি দেরি করবেননা। এই বলিয়া সে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিয়া বিপ্রদাস খবর শুনিল। খুসি হইবে কি রাগ করিবে হঠাৎ ভাবিয়া পাইলনা। রান্না-ঘরে আসিয়া দেখিল, আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, বন্দনা ছোট একটা টুল পাতিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে লইয়া ব্যস্ত, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম বিনয়ের কণ্ঠে কহিল, রাগের মাথায় ম্যানেজার বাবুকে বরখাস্ত ক'রে আসেননি ত মুখুয্যে মশাই?

বিপ্রদাস কহিল, মুখুয্যে মশাই যে এমন বদ্‌রাগী এ খবর তোমায় দিলে কে?

বন্দনা বলিল, লোকে বলে বাঘের গন্ধ এক যোজন দূর থেকে পাওয়া যায়।

বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল,—কিন্তু, অতিথিদের উপায় হবে কি? এঁদের সকলের যে রাত্রে ডিনার করা অভ্যেস,—তার কি বলো ত?

বন্দনা কহিল, যাঁর না হলে নয় তাঁকে লোক দিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দিন। বিলের টাকা আমি দেবো।

তামাসা নয় বন্দনা, এ হয়ত ঠিক ভালো হলনা।

ভালো হোতো বুঝি ঐ সব জিনিস এ বাড়ীতে বয়ে আন্‌লে? মা শুন্‌লে কি বল্‌তেন বলুন ত?

বিপ্রদাস এ কথা যে ভাবে নাই তাহা নহে, কিন্তু স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই, কহিল, তিনি জান্‌তে পারতেননা।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া বলিল, পারতেন। আমি চিঠি লিখে দিতুম।

কেন?

কেন? কখনো যা করেননি, দুদিনের এই ক'টা বাইরের লোকের জন্যে কিসের জন্যে তা' করতে যাবেন? কখ্‌খনো না।

শুনিয়া বিপ্রদাস শুধু যে খুসি হইল তাই নয়, বিস্ময়াপন্ন হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু তুমি যে কাল থেকে কিছুই খাওনি বন্দনা ? রাগ কি পড়বে না ? তাহার কণ্ঠস্বরে এবার একটু স্নেহের সুর লাগিল।

বন্দনা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, রাগিয়ে দিয়েছিলেন কেন ? কিন্তু শুনুন, আপনার খাবার ফল-মূল সব আনানো আছে, ততক্ষণ সন্ধ্যে আহ্নিক আপনি সেরে নিন, আমি গিয়ে তৈরি করে দেবো। কিন্তু আর কেউ যদি দেয়, আমি আজও খাবোনা তা' বলে দিচ্চি।

আচ্ছা, এসো,—বলিয়া বিপ্রদাস উপরে চলিয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বন্দনা ফল-মূল মিষ্টান্নের শাদা পাথরের থালা হাতে লইয়া বিপ্রদাসের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্নদার হাতে আসন ও জলের গ্লাস। জল-হাতে সমস্তটা সে সযত্নে মুছিয়া ঠাঁই করিয়া দিল।

বিপ্রদাস বন্দনার পানে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল, তুমি কি আবার এখন স্নান করলে নাকি ?

আপনি খেতে বসুন, বলিয়া সে পাত্রটা নামাইয়া রাখিল।

ক্রমশঃ

শরৎচন্দ্র

৮

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছিন্নপত্র

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

যে পুঁথিখানি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ সালে আবিষ্কার করেন এবং ১৩২৩ সালে স্বকপোল-কল্পিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে প্রকাশ করেন ; সে পুঁথিখানি নাকি বঙ্গ সাহিত্যে একটি ঘোর সমস্যার সৃষ্টি করে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় এ সমস্যাকে "বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস সম্পর্কিত সর্ব্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা বলা যাইতে পারে"। সমস্যা শুধু পলিটিক্‌সেই নেই, সাহিত্যেও আছে।

সমস্যামাত্রেরই মহাগুণ এই যে, বিদগ্ধ সম্প্রদায় সে বিষয়ে স্বীয় বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দেবার অবাধ সুযোগ পান। তখন পণ্ডিতী তর্কের আর কুলকিনারা পাওয়া যায় না। এবং সম্ভবতঃ—"প্রমাণ-পঞ্জী সংবলিত অনুশীলনের দ্বারা তাঁদের কাব্যের রসাস্বাদন সার্থকতা লাভ করে, কেননা তখন তাঁদের কাব্য-আস্বাদন পূর্ণতর হয়, বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত হয়, মধুরতর হয়"। শাদা কথায়, কাব্যরস পুরোমাত্রায় আস্বাদন করতে হলে কাব্যকে লেহন করে কোন ফল নেই, তার নীরস অংশ মক্ষমরূপে চর্ব্বণ করতে হয়। ফলে অপণ্ডিত দলের মনে এ সন্দেহ থেকেই যায় যে, এই পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের অনুশীলিত কাব্যের রসাস্বাদন করছেন, না শুধু ছিবড়ে চিবচ্ছেন।

অপরপক্ষে সমস্যার মুস্কিল এই যে, আমাদের মত যাঁদের কাব্যের রসাস্বাদন "প্রাকৃতজনোচিত", সমস্যা জন্মলাভ করেই তাঁদের মনের শান্তিভঙ্গ করে। কারণ আমরা পণ্ডিতই হই আর অপণ্ডিতই হই, সন্-তারিখ সম্বন্ধে কৌতূহল আমাদের সকলেরই আছে—সুতরাং কোন একটি তারিখ-সমস্যার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা পেলে আমরাও নিশ্চিন্ত হই। তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের খানকতক ছিন্নপত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ আবিষ্কার এ সমস্যার উপর নাকি এমন আলোকপাত করেছে, যাতে এ সমস্যা আবার নবরূপ ধারণ করেছে।

২

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক এই আবিষ্কার শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়ের আবিষ্কারের গায়ে কিরকম আলো ফেলেছে, তা বুঝতে হলে প্রাচীন আবিষ্কারটি যে কি, তা জানা দরকার।

বসন্তবাবু যে নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন তা সংক্ষেপে এই :—

(১) যে চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্গে আমরা পরিচিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনও তাঁরি রচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনা তাঁর কবিপ্রতিভার আদি লীলা, আর পদাবলী রচনা মধ্য ও অন্তলীলা।

(২) চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, আর মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কাব্যরসে মাতোয়ারা ছিলেন। বসন্তবাবু অবশ্য এ দুই বিষয়ে কোনও সমস্যা তোলেন নি, কারণ এ দুই বিষয়েই তিনি চূড়ান্ত মত প্রকাশ করেছিলেন, প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে এ দুই চূড়ান্ত মত, লিপি-পণ্ডিত ও ভাষা-পণ্ডিতরা গ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু আমাদের মত অপণ্ডিত পাঠকেরা নতশিরে তা গ্রাহ্য করতে পারে নি কি কারণে, তার কৈফিয়ৎ এ প্রবন্ধে দেবার কোনও সার্থকতা নেই, কারণ তা করতে হলে প্রমাণ-পঞ্জী সংবলিত চণ্ডীদাসের তারিখ-সমস্যার দিকে পিঠ ফিরিয়ে তাঁর কাব্য মীমাংসা করতে হয়। আমাদের মতে পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস কবি, আর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবিওয়ালা অকবি। এ বিষয়েও অবশ্য ঘোর মতভেদ আছে এবং তা থাকবারই কথা, কেননা লোকের রুচি ভিন্ন। আর যাঁর

আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁরাও আমাদের রুচি শোধন করতে পারেন নি। সুতরাং এ সম্বন্ধে তর্ক বৃথা। এই মতান্তরের ফলে পাঠকে ও পণ্ডিতে যে মনান্তর ঘটেছে, সেইটিই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আসল সমস্যা।

৩

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়ের দ্বিতীয় মত সম্বন্ধে এই "ছিন্নপত্র" গুলির "লক্ষণীয়" আবিষ্কার কোন দিক দিয়ে কি আলোক পাত করেছে, সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার হাল সংখ্যার প্রবন্ধযুগল পাঠে তা আমাদের চোখে পড়ল না। আমার মনে হয় চণ্ডীদাস সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে; তার সমাধানের পথে ছিন্নপত্রগুলি আমাদের বিন্দুমাত্রও অগ্রসর করে নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মহা-আবিষ্কারের পরে এই ছিন্নপত্রের উপ-আবিষ্কার কি কারণে "লক্ষণীয়" হয়ে উঠল, তা আমাদের মত "প্রাকৃত জনের" পক্ষে বোঝা কঠিন। এ কারণ, আমি উক্ত উপ-আবিষ্কারের সংক্ষেপে পরিচয় দেব। যদি ভুলক্রমে কোথায়ও ভুল কথা বলি, তাহ'লে "আদি" চণ্ডীদাসের অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের কাছে আগে থাকতেই ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর প্রবন্ধ ছিন্নপত্রের পরিচয়পত্র মাত্র। অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার + হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা, এত জড়ানো যে তার খেই খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। উপরন্তু এই লেখক যুগল বিশেষ উত্তেজিত ভাবে তাঁদের প্রবন্ধ লিখেছেন। গদ্যেরও একটা normalt emperature আছে, কোনও লেখক তা অতিক্রম করলেই আমরা ঈষৎ অসোয়াস্তি বোধ করি। সুনীতিবাবু যাকে "সমালোচনা" বলেন, তার ইংরেজী নাম বোধহয় higher criticsm; আর higher criticism যে কত সুন্দর, সরল ও সরস ভাষায় লেখা যায়, তার প্রমাণ Renanর লিখিত যিশুখৃষ্টের জীবন-চরিত। তর্কেরও একটি সুনীতি আছে। তবে শুনতে পাই যে এদেশে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ পরস্পরকে অপদস্থ করতে না পারলে পণ্ডিতের তর্ক-যুদ্ধ জমে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সে তর্ক এক রকম কুস্তি লড়াই, বিদ্যার বলপ্রকাশ। এ ক্ষেত্রে স্বদেশী রীতির আমি পক্ষপাতী নই, কারণ উত্তেজিত ভাবে তর্ক করতে হলে, সে তর্ক রাগদ্বেষমুক্ত হয় না। আর তখন বক্তার ভাষা অব্যবস্থিত হয়ে পড়ে, আর শ্রোতারা এক বুঝতে আর বোঝে। ফলে সুনীতিবাবুর প্রবন্ধ পড়ে তাঁর কথা ভুল বোঝাটা অসম্ভব নয়।

৪

এখন এই উপ-আবিষ্কারের পরিচয় দিই।

গত ৮ই আশ্বিন শনিবার দিন, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি "অগুছান" আলমারী ঘাঁটতে ঘাঁটতে বড়ু চণ্ডীদাসের "ভণিতাযুক্ত পদসংবলিত" দুইখানি পুঁথি প্রাপ্ত হন।

সাক্ষী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমিয় সেন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ।

এতগুলি সাক্ষীর নাম দেবার কারণ হচ্ছে discovery-কে কেউ invention বলে পাছে অপবাদ দেন এই ভয়। এ ভয়ের কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামক অপূর্ব্ব মহাকাব্যকেও নাকি লোকে জাল বলছেন। মহা-আবিষ্কারকেই লোকে যখন জাল বলেছে, তখন মণীন্দ্রবাবুর উপ-আবিষ্কারকে লোকে যে জালের জাল বলবে—তার আর আশ্চর্য্য কি? এ কথা মণীন্দ্রবাবুর মনে উদয় হয়নি যে, বসন্তবাবুকে যিনি জালিয়াৎ বলেছেন, যদি কেউ বলে থাকেন, ত তাঁর কথার কোনও প্রতিবাদ করবার প্রয়োজন নেই। কথায় বলে পাগলে কি না বলে? আর সাহিত্যজগতেও mono-maniac আছে।

যাক ও-সব বাজে কথা। মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত প্রথম পুঁথিতে কোন তারিখ নেই। দ্বিতীয় পুঁথিতে তিনটি তারিখ আছে (১) সন ১২৫৫ সাল, মাহ আষাঢ় (২) সন ১২৫৪ সাল, মাহ কার্ত্তিক (৩) ১২৩৭ সাল। এর থেকে নাকি প্রমাণ হল যে, দ্বিতীয় পুঁথি ১০২ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয়েছিল। এর কোন তারিখটি পুঁথির জন্মতিথির পরিচয় দেয়? মণীন্দ্র বাবুর মতে প্রথম পুঁথি এখন হতে দেড়শ বৎসর পূর্ব্বে লেখা। প্রথম পুঁথি যে দ্বিতীয় পুঁথির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লেখা, এরূপ অনুমান করবার কোনও কারণ

প্রদর্শিত হয় নি। এ ছিন্নপত্রগুলি জীর্ণপত্র। এই কারণেই সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও "লিপিবিদ্যাবিশরদ" অধ্যাপক উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এর ফলে একটি বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ, যে ১০২ বৎসর আগে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কোনও কোনও পদ রাঢ় দেশে "কবির দলে" প্রচলিত ছিল।

৫

পুঁথি দুখানি পদাবলী সংগ্রহ। এবং এ পদাবলী সমূহের অধিকাংশই প্রকৃত কীর্ত্তন হতে সংগৃহীত। ছিন্নপত্রের পদাবলী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীর মাছিমারা নকল নয়। এ উভয়ের ভিতর অবশ্য অল্পবিস্তর পাঠ-বৈষম্য আছে। এদেশে কোনও লেখকের এমন দুখানি পুঁথি পাওয়া যায় না, যাতে পাঠান্তরের সাক্ষাৎ না মেলে। বিশেষতঃ ওই ছিন্নপত্রের আখরিয়া ছিলেন মূর্খ, যদিও তিনি তালমান সম্বন্ধে সংস্কৃত বচন লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রথমতঃ, তিনি এ পুঁথি লিখেছেন মুসলমানী কায়দায়—অর্থাৎ ডান থেকে বাঁয়ে, তার উপর তাঁর বানান যাচ্ছেতাই। তিনি ষকার সিদ্ধ। এর থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, উক্ত আখরিয়া ছিলেন মুসলমান এবং তিনি গানগুলি কোন বই থেকে "কপি" করেন নি, কিন্তু কানে শুনে লিখেছিলেন। এখন দেখা যাক্ যে, এই ছিন্নপত্রের আবিষ্কারের কোন গুপ্ত সত্যের নাগাল পাওয়া গেল।

মুদ্রিত পুস্তকের অন্তর্গত পদাবলীর কোনওকোনও পদের পাচালি গায়কের দলে যে প্রচলন ছিল, সে কথা নিঃসন্দেহ। এ ছাড়া চণ্ডীদাস সমস্যার উপর এই ছিন্নপত্র যে কি লৌকিক কিম্বা অলৌকিক আলোকপাত করছে, আমাদের সাদা চোখে তা ধরা পড়ে না।

মণীন্দ্রবাবু বলেছেন যে "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বিতীয় পুঁথি পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া অনেকে ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছিলেন।" এরূপ সন্দিগ্ধ সমালোচক যদি কেউ থাকেন, ত উনবিংশ শতাব্দীর এই পুঁথি দৃষ্টে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মহাকাব্য, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন। তবে উক্ত ভদ্রলোকের সন্দেহ ও তার ভঞ্জন, দুই সমান logical হবে।

৬

এখন এ মামলায় ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পদতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উচ্চ আদালতের রায়ের মর্ম্মোদ্ধার করবার চেষ্টা করা যাক্। এ প্রচেষ্টায় সফল হব কি না বলতে পারি নে, কারণ প্রবন্ধটি একে দীর্ঘ, উপরন্তু অবান্তর আলোচনায় ভারাক্রান্ত। এ আলোচনা আমি নির্ভয়ে করতে পারি, কারণ আমি বৈষ্ণব কবি কিম্বা সাধক নই। ঐ লেখকযুগল বলেছেন যে—

"চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রধান লক্ষণীয় আবিষ্কার, যাহা চণ্ডীদাস সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতেছে মণীন্দ্রবাবুর কর্ত্তৃক এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের আধুনিক পুঁথি দুইখানির আবিষ্কার।" আমি পূর্ব্বে বলেছি এই ছিন্নপত্রের আবিষ্কার চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধানের পথে আমাদের তিলমাত্রও অগ্রসর করে নি। কিন্তু কি হিসেবে যে এই জটিল সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠল, তা আমরা বুঝতে পারলুম না, আর লেখকযুগলও অনুগ্রহ করে তা আমাদের বুঝিয়ে দেন নি। সম্ভবতঃ এই কারণে যে, তাঁরা অপণ্ডিত পাঠকের জন্য উক্ত প্রবন্ধ লেখেন নি।

আমি এ প্রবন্ধ এই বলে সুরু করেছি যে, পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বাঁধনদার যে অভিন্ন,—বসন্তবাবুর এ মত আমরা প্রসন্নমনে গ্রাহ্য করতে পারি নি।

লেখকযুগলের মন্তব্য পড়ে মনে হয় যে, তাঁরাও এ সম্বন্ধে অতঃপর আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন। এ উভয় কবির ভাষা ও ভাবের অসামঞ্জস্য এত স্পষ্ট যে, তা অপণ্ডিতদেরও চোখে পড়ে। তবে এ সব বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে আমরা অধিকারী নই, কারণ ভাষা ও পুঁথির ক্রমোন্নতির প্রতি ধাপের মাপজোখ আমাদের জানা নেই। ভাষার জীবনে কি শুধু evolutionই আছে, মাঝে মাঝে transmutation নেই? আমাদের মতে

কোনও কোনও যুগে ভাষা সম্পূর্ণ নবকলেবর ধারণ করে। আর এ পরিবর্ত্তনের মূল খুঁজতে হবে ভাষার দেহে নয়, কবির অন্তরে।

৭

তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের স্রষ্টা চণ্ডীদাস অর্থাৎ "আদি চণ্ডীদাস" যে পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস নন্, এ কথা শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। কারণ "বত্রিশ সিংহাসন" যে কালিদাসের রচিত, এ কথা বিশ্বাস করা যেমন কঠিন, অর্ব্বাচীন চণ্ডীদাসের পদাবলী আদি চণ্ডীদাসের কণ্ঠের হাস্কাতান, এ কথা বিশ্বাস করাও তেমনি কঠিন। সম্ভবতঃ সুনীতি বাবু ও হরেকৃষ্ণ বাবু ছিন্নপত্রের "লক্ষণীয়" আবিষ্কারের পূর্ব্বে বিশ্বাস করতেন যে এ দুই কবি দুয়ে এক আর একে দুই। কারণ এঁরা-দুজন চণ্ডীদাসের পরিচিত পদাবলী-গুলিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় রূপান্তরিত করতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছিলেন; এবং তাতে আমরা অপণ্ডিতী আপত্তি করায়, কারও ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করলে ধর্ম্ম-প্রাণ লোক যেরূপ কাতর হয়ে পড়ে, তাঁরাও তদ্রূপ কাতর হয়ে পড়েছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের যে সভায় এই দুর্ঘটনা ঘটে, সে সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই সুনীতি বাবু ও হরেকৃষ্ণ বাবু এ আপত্তিতে যে কতদূর ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তা লক্ষ্য করেছেন। আমরা যে তাঁদের প্রস্তাব সমর্থন করতে পারিনি, তার কারণ আমরা অন্ততঃ সাহিত্যে এরকম শুদ্ধিপ্রক্রিয়ার পক্ষপাতী নই। কারণ উচ্চ পদ্ধতিতে শোধন করতে গেলে অধিকাংশস্থলে কবিতা অকবিতা হয়ে পড়ে। ফলে একমাত্র ভাষাতত্ত্ববিদ ছাড়া অপর কারও তা কানের ভিতর দিয়ে মর্ম্মে গিয়ে পৌঁছয় না।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সুনীতি বাবু ও হরেকৃষ্ণ বাবুর মন্তব্য,—পদকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে ৺সতীশচন্দ্র রায় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, তারই পরিবর্দ্ধিত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত সংস্করণ মাত্র। সে মন্তব্যে তিনি বলেছেন যে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনের ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর সমকালীনতা ও অভিন্ন কবির কৃতিত্ব প্রমাণ হয় না"—আমাদের বিশ্বাস লেখকযুগল এই মতেই অতঃপর সায় দিয়েছেন।

৮

এখন চণ্ডীদাসঘটিত দ্বিতীয় সমস্যা সম্বন্ধে সুনীতি বাবু ও হরেকৃষ্ণ বাবুর মন্তব্য শোনা যাক। তাঁরা বলেছেন "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে চৈতন্য-পূর্ব্বযুগের রচনা, ইহাই আমাদের কাছে পরিস্ফুট হইতেছে।" এরূপ পরিস্ফুট হবার কারণ কি? লেখকযুগল বলেছেন যে, "কতকগুলি প্রমাণযোগে আমাদের দৃঢ় নিশ্চয়তা দাঁড়াইয়াছে যে, কৃষ্ণকীর্ত্তন বইখানির মূল পুঁথি এখন অপ্রাপ্য, সেখানি আরও প্রাচীন ছিল এবং তাহার অল্পাধিক পরে এই পুঁথিখানি অনুলিখিত।"

যে মূল পুঁথিখানির কোন অস্তিত্ব নেই, আর যেখানি পুরাকালে থাকা না-থাকা দুই সমান সম্ভব, সেই অপ্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্য x পুঁথির সাহায্যেই সুনীতি বাবু ও হরেকৃষ্ণ বাবুর "দৃঢ় নিশ্চয়তা দাঁড়াইয়াছে" যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অতি প্রাচীন কাব্য। এই x পুঁথিখানি চণ্ডীদাস সমস্যার উপর কিরূপ আলোকপাত করেছে জানেন? সেই আলোক, ইংরাজীতে যাকে বলে x-ray! আমাদের না থাক্, পণ্ডিতদের চোখে এ x-ray আছে।

এ যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলা অসম্ভব, কারণ তর্ক যখন এহেন ভিত্তির উপর দাঁড়ায়, তখন তা হয়ত অতি ঐতিহাসিক কিম্বা অতি বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠে! যার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাই, তা ছিল বলে ধরে নিলে ত তর্কের বালাই-ই থাকে না।

আদি চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কবি হতে পারেন। তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কারণ আমাদের মতে ও গ্রন্থ থাকা না থাকায় বঙ্গসাহিত্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। ও-পুঁথির যদি কোন মূল্য থাকে ত ভাষাতত্ত্ববিদের দলিল হিসেবেই—কাব্যহিসেবে নয়। কিন্তু মহাপ্রভু যে আদি চণ্ডীদাসের গান শুনে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হতেন, এ কথা আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রাহ্য করতে কুণ্ঠিত। কারণ আমাদেরও একটা সাহিত্যিক ধর্ম্মজ্ঞান আছে।

৯

পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস যে মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজন, এই হচ্ছে বাঙলার বৈষ্ণব সমাজ ও সাহিত্য সমাজের tradition।

এ tradition যে অমূলক, তা প্রয়োগপ্রমাণ সাপেক্ষ।

অবশ্য tradition মাত্রই লোকপরম্পরায় অথবা গুরু পরম্পরায় আগত।

এখন প্রাকৃতজনের কথা ছেড়ে দিলেও বৈষ্ণব "কবি ও সাধকদের" এ বিষয়ে কি বলবার আছে শোনা যাক্।

চৈতন্যচরিত্রের আদি গ্রন্থ চৈতন্য-ভাগবত এ বিষয়ে নীরব। তার পরবর্ত্তী চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু কোন্ কোন্ পদকর্ত্তার গান শুনতেন, তার নানাস্থানে উল্লেখ আছে। বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় নিম্নলিখিত পদটি উদ্ধৃত করেছেন :—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।"

এর থেকে জানা গেল যে, মহাপ্রভু জয়দেবের, বিল্বমঙ্গলের, ও রামানন্দ রায়ের সংস্কৃত গীত, বিদ্যাপতির মৈথিলী গীত ও চণ্ডীদাসের বাঙলা গীত গাইতে ও শুনতে ভালবাসতেন। এবং এসব গীতের গায়ক ছিলেন সম্ভবত স্বরূপ দামোদর, কেন না তিনি প্রথমতঃ ছিলেন বাঙালী, উপরন্তু প্রসিদ্ধ গায়ক।

কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর কথায় এ প্রমাণ হয় না যে, এ চণ্ডীদাস আমাদের পরিচিত চণ্ডীদাস নন্—আদি চণ্ডীদাস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মহাকবি।

১০

তারপর নরহরিদাস বলেছেন—

জয় জয় চণ্ডী দাস দয়াময়
মণ্ডিত সকল গুণে
অনুপম যার যশ রসায়ন
গাওত জগত জনে
শ্রীনন্দ নন্দন নবদ্বীপ-পতি
শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া
যার গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ
রায় রামানন্দ লৈয়া। (বসন্তবাবুর ধৃত-পদ)

সম্ভবতঃ নরহরিদাস চৈতন্য চরিতামৃত থেকেই এ সত্য উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর একটি কথা লক্ষ্য করবার বিষয়। এ চণ্ডীদাসের পদ "গাওত জগত জনে।" এ কবি সম্ভবতঃ মহাকবি আদি চণ্ডীদাস নন, কারণ কীর্ত্তনীয়া সমাজে নাকি বৃকভানু রাজার নন্দিনীকে দিয়ে মথুরার হাটে দুধ-দই বিক্রয় করানোর অপরাধে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বৈষ্ণব-সমাজে অস্পৃশ্য হয়ে পড়েছিল। ধরে নেওয়া যাক্ যে—

"রাজার নন্দিনী প্যারী যা করো তা শোভা পায়"

এই বচনের উপর নির্ভর করে তখনকার বৈষ্ণব সমাজ "আইহানের রাণীকে" গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে জিজ্ঞাসা করি চৈতন্যের পরবর্ত্তী বহু বৈষ্ণব কবি কি রাধিকাকে দিয়ে মথুরা নগরে দুধ দই বেচান নি? (পদকল্পতরুর ২য় খণ্ডে দানখণ্ড দ্রষ্টব্য)।

সুনীতিবাবু ও হরেকৃষ্ণবাবু বলেছেন যে, "বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের অবস্থান কালে গদাধর দাসের বাটীতে নিত্যানন্দের সমক্ষে দানখণ্ডের গান ও গোপীভাবে গদাধরের নৃত্যের বর্ণনা আছে।" অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সে গানটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেরই গান; কারণ চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উক্ত অনুমান প্রমাণ পঞ্জী সংবলিত নয়।—বৃন্দাবনদাস বলেছেন,—

সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনিয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাহিতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর নিতাই॥

উক্ত তিন ভাই-ই পদকর্ত্তা, এবং বাসুদেব ঘোষের দানখণ্ডের একাধিক পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয়েছে। যে গান নিত্যানন্দ শুনেছিলেন, সে হয়ত বাসুঘোষের পদ।

সে যাই হোক, পদকল্পতরুর সংগ্রহকর্ত্তা বৈষ্ণবদাস যা বলেছেন, তাতে প্রমাণ হয় যে মহাপ্রভু পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদকীর্ত্তনই শুনতেন। বৈষ্ণবদাস তাঁর পদসংগ্রহের মঙ্গলাচরণে বলেছেন—

জয় জয় দেব কবি নৃপতি শিরোমণি।
বিদ্যাপতি রসধাম

জয় জয় চণ্ডী দাস রসশেখর
অখিল ভুবনে অনুপম
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্যপদ্যময় গীত
প্রভু মোর গৌর চন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত।

পদকল্পতরুতে যে-সকল চণ্ডীদাসের পদ সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই আমাদের পরিচিত চণ্ডীদাসেরই পদাবলী। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, বৈষ্ণব দাসের মতে মহাপ্রভু পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসেরই গান শুনে মত্ত হতেন। তবে "গদ্যপদ্যময় গীত" বাক্যটিতে একটু খটকা লাগে। আর এক কথা। বৈষ্ণব দাস বহুকবির পদ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু পদকল্পতরুর শেষে মাত্র তিনটি কবির নাম উল্লেখ করেছেন—জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

১১

তারপর সুনীতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মধুর-রস কি "নিরমল?" যদি বলেন যে হাঁ তাই, তাহলে আমরা অবাক হয়ে থাকব। পদাবলীর চণ্ডীদাস বলেছেন যে—

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা ওরফে চন্দ্রাবলী গোয়ালীর গায়ে কামগন্ধ ছাড়া আর কি গন্ধ আছে? দুধ দইয়ের?

সুতরাং বৈষ্ণব সমাজের tradition হচ্ছে, মহাপ্রভু যে-চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনতেন, সে-চণ্ডীদাস হচ্ছে আমাদের পরিচিত চণ্ডীদাস—বসন্তবাবুর আবিষ্কৃত চণ্ডীদাস নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কবি মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী হতে পারে, কিন্তু পরিচিত চণ্ডীদাসের পদাবলীও যে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী নয়—তার প্রমাণ কি?

চৈতন্যচরিতামৃতে একটি গানের চার লাইন তোলা আছে। সে চার লাইন এই—

"হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে
কানু-প্রেম-বিষে মোর তনুমন জরে
রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াত না পাঙ
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ"

এ পদটি যে পরিচিত চণ্ডীদাসের পদ, তা স্বয়ং হরেকৃষ্ণ বাবুই আবিষ্কার করেছেন। তবে যাঁরা আদি চণ্ডীদাসের কদর্য্য পদগুলি মহাপ্রভুকে না শুনিয়ে ছাড়বেন না—তাঁরা কবিরাজ গোস্বামীর কথা যে অবিশ্বাস্য, সে বিষয়ে অনেক যুক্তিযুক্ত কথা বলেছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী উদ্ধৃত করলেই যদি কবিরাজ গোস্বামীর কথা অগ্রাহ্য হয়—তাহলে মহাপ্রভু যে চণ্ডীদাসের গান শুনতেন, তাঁর এ কথাই বা কোন যুক্তি অনুসারে গ্রাহ্য হয়? চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত কি আজকাল যাকে বলে ইতিহাস—তাই?

লেখকযুগল বলেছেন যে "এই কাব্যখানির সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরের মধ্যে অনেকেরই পরিচয় ছিল বলিয়া অনুমান হয়। চণ্ডীদাস যে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড ইত্যাদি লীলা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের সামসময়িক শ্রীসনাতন গোস্বামী জানিতেন। শ্রীসনাতন তাঁহার কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী নামক টীকায় ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন—কাব্যশব্দের পরম বৈচিত্র্য তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাস্তথা চণ্ডিদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারশ্চ জ্ঞেয়া।"

যদি সনাতন গোস্বামীর টীকায় উদ্ধৃত বাক্যটি থাকে—তাহলে এই প্রমাণ হয় যে, চৈতন্যদেবের পরিকরের মধ্যে অনেকে নয়, সনাতন এমন কোনও চণ্ডীদাসের কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, যে কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা ও নৌকালীলার পদ ছিল। কিন্তু এ অনুমান সাব্যস্ত হয় না যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

তবে এ বাক্যটির পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ একটি কথার ভিত্তির উপর চণ্ডীদাস সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা খাড়া করা যায় না, কারণ কি সূত্রে কি উদ্দেশে তিনি উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সেটি না জেনে এ বিষয় কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। ভাগবতের উক্ত শ্লোকের আদ্যোপান্ত টীকা না দেখে অন্ধকারে ঢিল মারা নিরাপদ নয়। দুঃখের বিষয় বহরমপুর থেকে

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীবৈষ্ণবতোষনীর টিপ্পনীতে উদ্ধৃত বাক্যটি নেই; অন্ততঃ আমিত খুঁজে পাই নি।

এই শ্রীবৈষ্ণবতোষনী কি সনাতন গোস্বামীর টিপ্পনী নয়—জীব গোস্বামীর? হতে পারে। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

"সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃত।
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলা রসপ্রেম যাহা হইতে জানি॥

চৈতন্যচরিতামৃত অন্তখণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ২০৭, ২০৮ শ্লোক।

চৈতন্যচরিতামৃতের টীকাকার মাখনলাল দাস ভাগবত ভূষণ বলেন যে, এই দশম টিপ্পনীই শ্রীবৈষ্ণবতোষনী ওরফে "বৃহত্তোষনী" নামে পরিচিত। এর থেকে এই কথা ধরে নিতে হয়, টীকাকার মহাশয় বৈষ্ণবতোষনীর সঙ্গে বৃহত্তোষনী গুলিয়ে ফেলেছেন। উক্ত বৃহৎ বৈষ্ণবতোষনী দেখবার যতদিন সৌভাগ্য না ঘটে, ততদিন সনাতন গোস্বামী যে ও কথা বলেছিলেন, তা আমাদের মেনে নিতে হবে। কেননা সুনীতি বাবু পরের মুখে শুনে নয়, নিজের চোখে দেখেই যে বাক্যটি উদ্ধার করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তাতেও সনাতন গোস্বামী যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেরই কথাই বলেছেন, এরূপ অনুমান করা যায় না। কারণ আমাদের পরিচিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দানলীলা ও নৌকাবিহারের পদ নেই বলে যে, তিনিও যুগললীলা সম্বন্ধে কোন পদ রচনা করেন নি, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এরূপ negative evidence ডাক্তররাও গ্রাহ্য করতে কুণ্ঠিত করেন, উকিলদের ত কথাই নেই।

১৪

প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে পড়ল। এর কারণ বোধহয় আমার কলমের গায়ে সুনীতিবাবুর কলমের ছোঁয়াচ লেগেছে। এখন উক্ত প্রবন্ধ পড়ে আমার কি ধারণা হয়েছে ত বলছি :—

(১) আলোচ্য ছিন্নপত্রগুলি চণ্ডীদাস সমস্যায় কোনরূ আলোকপাত করেনি।

(২) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস ও পদকর্ত্তা চণ্ডীদা এক কবি নন্।

(৩) আদি চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হতে পারেন কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রমাণপঞ্জী নেই; যদি থাকে ত ও পুঁথির ভাষা ও অক্ষরের ভিতর তা গা-ঢাকা দিয়ে আছে সে প্রমাণ আমাদের চর্মচক্ষুর গোচর নয়, যাঁদের জ্ঞানন উন্মীলিত হয়েছে, তাঁদেরই গোচর।

(৪) পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী, এ হচ্ছে বৈষ্ণব সমাজের tradition। এ tradition, যে অগ্রা তারও কোন প্রমাণপঞ্জী নেই।

(৫) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে বৈষ্ণব সমাজে অনাদৃত, তা কারণ ও-বস্তু কীর্ত্তন নয়, ঝুমুর। ঝুমুর বস্তুটি কি? এ উত্তর সুনীতিবাবু ও হরেকৃষ্ণবাবুর কথাতেই দিচ্ছি "অধুনা রাঢ়ে ঝুমুর বিশেষ প্রচলিত, এবং তাহা বাস্তবিক শৃঙ্গারবহুল, অশ্লীল"। এই ছিন্নপত্রগুলি ঝুমুরওয়ালাদে পুঁথি। ১০২ বৎসর পূর্ব্বে তা প্রচলিত ছিল, সম্ভব আজও আছে। কিন্তু মহাপ্রভু যে রাত্রিদিন ঝুমুর গাইতে ও শুনতেন, এ কথা অবিশ্বাস্য। উপরন্তু তা বিপজ্জনক কারণ উক্ত নজীরের দোহাই দিয়ে পণ্ডিতের দল বঙ্গসাহিত্যে ঝুমুরের চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত না করেন; সেকালের বৈষ্ণব সমা যে কাব্যকে একঘরে করেছিল, তাকে এঁরা আবার জাতে তোলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আবিষ্কার কাব্যরস ঘুলিয়ে দিয়েছে। এরি নাম চণ্ডীদাস সমস্যা।

(৬) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রথমের ও শেষের যে কখানি পাতা বসন্তবাবুর আবিষ্কৃত পুঁথিতে খণ্ডিত ছিল, সেই কখানি ছিন্নপত্রের আবিষ্কারই একটি লক্ষণীয় আবিষ্কার হবে। কারণ উক্ত পুঁথির গৌরচন্দ্রিকায় হয়ত গৌরবন্দনা আছে, আর শেষে সন্ তারিখ।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২।৩।৩৩।

দুই নারী

শ্রীলীলাময় রায়

বারম্বার পরাজিত হয়ে স্নেহময় হঠাৎ এক সময় "Bad Luck" বলে আসন ছেড়ে উঠল ও অশোকার প্রতি ভঙ্গীপূর্ব্বক bow করে সুধীর দিকে অনুকম্পার সহিত ডান হাত বাড়িয়ে দিল। উভয়কে একত্র বল্ল, "কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স। May your partnership prosper !" উত্তরের জন্য সে অপেক্ষা করল না।

"বাবু যত ক'ন পারিষদ্‌গণ কহে তার শত গুণ।" চঞ্চলা দত্তও গাত্রোত্তোলন করলেন। ঐ কার্য্য কিঞ্চিৎ শ্রমসাপেক্ষ। শ্রান্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তিনি সুধী ও অশোকাকে এক সঙ্গে বল্লেন, "বাস্তবিক আপনারা অসাধারণ কো-অপারেশন দেখিয়েছেন। যেন দুইজনের এক মন এক হাত। প্রশংসা না করে পারা যায় না, মিষ্টার চাকারবাটী ও মিস্ টালুকডার।" তাঁর গতি স্নেহময়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করল।

সুধী অবাক। অশোকা অশোক পুষ্পের মত আরক্ত। সুধীর মনে হল যেন তার বিদায়ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অতিথির দীর্ঘীকৃত উপস্থিতি গৃহস্থের হর্ষবর্দ্ধন করবে না। সে অশোকাকে একটি নীরব নমস্কার করে ধীরে ধীরে সরে গেল।

তার মনের মধ্যে স্নেহময়ের উক্তি ফিরে ফিরে পুনরুক্ত হচ্ছিল। কি অর্থে ও কেন স্নেহময় অমন উক্তি করল? বক্রোক্তি নয় ত? অশোকা দেবী কি ভাবলেন? অশোকার সঙ্গে স্নেহময়ের প্রাক্তন সম্বন্ধ সুধীর জানা ছিল না, থাকবার কথা নয়। স্নেহময় যে মিসেস তালুকদারের অভীষ্ট জামাতা ও অশোকা যে স্নেহময়ের প্রতি কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক অপ্রসন্ন ছিল না সুধী কেমন করে তা জানবে? একদিন অশোকা দেখতে পেল স্নেহময় একটি ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে একটু মিঠে ইয়ার্কি করছে। অশোকা জিজ্ঞাসা করল, "মেয়েটি কে?" স্নেহময় বল্ল, "A flame of mine"। ভেবেছিল অশোকা ওটাকে পরিহাস বলেই গ্রহণ করবে। ভেবেছিল অশোকা যখন কয়েক বছর থেকে ইংলণ্ডে আছে তখন সে দস্তুর মত modern girl। কিন্তু দেশ পরিবর্ত্তনে সংস্কারের পরিবর্ত্তন হয় না। অশোকা সেই দিন থেকে স্নেহময়ের প্রতি বিরূপ। স্নেহময় সে জন্য কেয়ার করে বলে তার ব্যবহারের দ্বারা ব্যক্ত করল না। মিসেস তালুকদার উৎকণ্ঠিত হয়ে কতবার নিজের পার্টিতে তাকে ডাকলেন ও পরের পার্টিতে তাকে ডাকালেন। তার নাসিকা ক্রমশ হিমালয়ের মত উচ্চ হল। কিন্তু অশোকার হৃদয় থাকল চাঁদের মত সুদূর।

চিন্তান্বিত ভাবে সুধী কখন গিয়ে ওভারকোট গায়ে দিল ও সদর দরজা খুলতে হাত বাড়াল। এমন সময় পিছু ডাকল দে সরকার। "হে যোগীবর! একটু দাঁড়ান।" কাছে এসে পিঠে হাত রাখল। "যোগীদের তৃতীয় নেত্রটা সামনের দিকে না হয়ে পশ্চাদ্‌ভাগে হলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। যাকে পিছনে রেখে চল্লেন তার হৃদয়টা যে মট্ করে ভেঙ্গে গেল সেটা চোখে পড়লে একাগ্রতার ব্যাঘাত হত, কিন্তু একেবারে যোগী না হয়ে একটু মানুষের মত হতেন।"

হাসির কথা এমন গম্ভীর ভাবে বলতে দে সরকারের জুড়ি নেই। সুধীর প্রাণেও তার হাসির হাওয়া লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, "কার হৃদয় মট্ করে ফেটে গেল?" দে সরকার রাস্তায় পা বাড়িয়ে উত্তরে বল্ল, "দিন, দিন, আপনার তেসরা চোখটা আমাকেই দিন।" মুক্ত হাওয়া ও ক্ষীণালোকিত অন্ধকার তাদেরকে আর এক লোকে উপনীত করল। একটি ভিখারী একলা অন্তরীক্ষকে গান শোনাবার বায়না নিয়েছে। গানের ভাষা পরিস্ফুট নয়,

কিন্তু সুর সুধীকে ও দে সরকারকে ছুঁয়ে গেল। পরস্পরকে তারা বিনা কথায় বল্ল, "চুপ চুপ চুপ। চুপ চুপ চুপ।"

আণ্ডার গ্রাউণ্ড্ ষ্টেশনে এসে সুধীর মনে পড়্ল দে সরকারের প্রেমোপাখ্যান শুন্‌তে হবে। বাসায় ফিরবার ত্বরা ছিল না। বল্ল, "যদি কোনো অসুবিধা না বোধ করেন, আসুন আমাকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে দিন্। হীথের ধার ধরে Spaniards ছাড়িয়ে গোল্ডার্স গ্রীনে গিয়ে আপনাকে ট্রেনে তুলে দেব ও আমি বাস নেব।"

দে সরকার খুসী হয়ে সুধীর সাথী হল। দুজনেই ভুলে গেল ব্রিজ পার্টির কাহিনী। দে সরকার তার স্মৃতির মন্দিরে আবাহন করল নাটালীকে। সুধী অবগাহন করল উজ্জয়িনীর ভাবনায়। নিঃশব্দে চড়াইয়ের উপর দিয়ে অগ্রসর হতে থাক্‌ল উভয়ে। অনেকক্ষণ পরে সুধীর চেতনা ফির্‌ল। সে হেসে বল্ল, "পথ যে শেষ হতে চল্ল দে সরকার। আর দেরি কর্‌বেন না, কাহিনী সুরু করুন।"

দে সরকার জোর করে সংকোচ কাটাল। বল্ল, "নাটালীরা রাশিয়া ছাড়ে রুশ বিপ্লবের সময়। ওদের আশা ছিল বছর না ঘুরতেই কোল্‌চাক ডেনিকিন দেশ দখল কর্‌বে আর লেনিন-ট্রট্‌স্কী প্রাণত্যাগ কর্‌বে। এই শেষেরটা সম্বন্ধে নাটালীর মা-বাবার গবেষণার অন্ত ছিল না। ওরা কোনোদিন ট্রট্‌স্কীকে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ান অবস্থায় গুলি কর্‌ত, যেহেতু ট্রট্‌স্কী হচ্ছে বীর। আবার কোনোদিন লেনিনকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাত, যেহেতু লেনিন হচ্ছে কাপুরুষ। বছরের পর বছর যায়, নাটালীদের প্রত্যাবর্ত্তন আর ঘটে না। ওর মা এক বোর্ডিং হাউস খুলে বস্‌লেন আর ওর বাবা ফেঁদে বস্‌লেন এক রাশিয়ান ikon-এর ব্যবসা। পলায়নের সময় যেটুকু স্বর্ণ সঙ্গে এনেছিলেন রাশিয়ান প্রিন্স্ ও প্রিন্সেসরূপে ঐ দিয়ে বেশীদিন চল্ল না। অবস্থার সঙ্গে যাতে বেমানান না হয় সেজন্য ইতর লোকের মত মসিয়ে ও মাদাম ষ্টানিস্‌লাভ্‌স্কী নামে পরিচয় দিলেন। শুনছেন ত চক্রবর্ত্তী?"

সুধী সত্যই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। লজ্জিত হয়ে বল্ল, "Ikon-এর ব্যবসা করেন নাটালীর বাবা। তারপর?"

"তারপর থেকে মসিয়ে ষ্টানিস্‌লাভ্‌স্কী এই তাঁর পরিচয়। লেনিন মারা গেলেন, ষ্টালিন হলেন ছত্রপতি। কিন্তু মসিয়ে ষ্টানিস্‌লাভ্‌স্কী রাত্রে যখন নিজের মত অন্যান্য রাশিয়ান পলাতকদের সঙ্গে সামোভার নিয়ে বসেন তখন নিত্যকার নিরাশার পাত্রে পুরাতন আশাকে অভিষিক্ত করেন। ষ্টালিন রাইকভ জিনোভিয়েফ একে একে নিববে দেউটি। এই উদ্দেশ্যে প্রকাণ্ড এক আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্র Ikon-এর ব্যবসার তলে তলে চলেছে। আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের কাজ কি? তাই আপনাকে জনকয়েক প্রসিদ্ধ ইংরেজ সম্পাদক ও ক্যাপিটালিষ্টের নাম করা নিষ্প্রয়োজন বোধ কর্‌লুম। এঁদেরকে সম্পাদক পাড়া ও ব্যাঙ্ক পাড়ার মধ্যবর্ত্তী লাড্‌গেট সারকাসে ষ্টানিস্‌লাভ্‌স্কীর ikon-এর দোকানে মূর্ত্তি পরীক্ষা কর্‌তে নিযুক্ত দেখে কেউ কখনো সন্দেহ কর্‌তে পারে না যে ওটা এঁদের rendezvous"।

সুধী আবার অন্যমনস্ক হয়েছিল। বল্ল, "ঠিকই বলেছেন। জাহাজের খবরে আমাদের কাজ কি? আমরা শুধু জান্‌তে চাই জাহাজের ব্যাপারীর মেয়ে আদার ব্যাপারীর সঙ্গে কোন সূত্রে গ্রথিত।"

৯

গৌরচন্দ্রিকাটা সংক্ষিপ্ত করে দে সরকার বল্ল, "তবে শুনুন। আমার এক বন্ধু সেই বোর্ডিং হাউসে থাক্‌বার সময় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছ্‌লুম। জান্‌তুম না যে আমারই ক্লাসের একটি অপরিচিত মেয়েরও বাড়ী সেটা। নাটালীকে সেখানে দেখে পাঁচ মিনিটে আলাপ হয়ে গেল। "ওঃ আপনি এখানে থাকেন?" "ওঃ আপনি!" বন্ধুর দৌত্যের প্রয়োজন হল না। তাতে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। আরো ক্ষুণ্ণ হলেন নাটালী যখন তার মায়ের সঙ্গে চা খাবার জন্য আমাকে উপরে নিয়ে গেল—এবং আমার খাতিরে আমার বন্ধুকেও। মাদামের সঙ্গে সেদিন ফরাসীতে কথা কয়ে তাঁর প্রিয় পাত্র হয়ে পড়্‌লুম। ইংরেজী তিনি মাত্র কয়েকটি কথা শিখেছেন সাত আট বছরে। "Stalin die. I go. Again princess."

সুধী মন দিয়ে শুনছিল। হেসে উঠ্‌ল। গল্পটা জমে আস্‌ছে জেনে দে সরকার পুলকিত হল। কেউ তার বক্তব্য এক মনে শুনছে জান্‌লে সে কৃতার্থ হয়ে যায়। অন্তরে উৎসাহ পেয়ে সে গল্পের খেই যেখানে ছেড়ে ছিল সেইখান থেকে ধর্‌ল।

"রাগ করে দত্ত-মজুমদার ও বাড়ী থেকে উঠে গেল। অথচ ওর স্থান পূরণ কর্‌বার মত ধনবল আমার ছিল না। মাদামের অনুরোধ আমি রাখ্‌তে পার্‌লুম না। নাটালী বুঝ্‌ল, তার মা বুঝ্‌লেন না। তাঁর ধারণা ভারতীয় হলেই ধনী হয়। সেই যে তাঁর শ্রদ্ধা প্রীতি হারালুম তারপরে তাঁর বাড়ী যাওয়া পীড়াকর বোধ হল। নাটালীকে বল্লুম। সে বল্ল, "পর্ব্বত এখন থেকে মহম্মদের ওখানে যাবে।"

নাটালী তার মায়ের শ্রমনির্ভর ছিল না। কয়েক বছর একটা পশুলোমের দোকান একলা চালিয়ে অবশেষে সে তার এক সখীকে পার্টনার করে আধুনিক ব্যবসায় পদ্ধতি শিক্ষা করবার সময় পেয়েছিল। নিজেকে এফিসিয়েন্ট করা ছাড়া তার অন্য চিন্তা ছিল না। নিজে যে পরিমাণে তৈরি হবে জীবনের প্রত্যেক কাজে সেই অনুপাতে সফল হবে এই ছিল তার সুদৃঢ় বিশ্বাস। নারী ও পুরুষের কর্ম্মগত পার্থক্য সে মান্‌ত না। আজকালকার কয়জন মেয়ে মানে? সে বল্‌ত, কোনো কাজের গায়ে এমন কোনো ছাপ মারা নেই যে এটা মেয়ের কাজ, ওটা পুরুষের কাজ। মেয়ের মধ্যে জননী হবার সম্ভাব্যতা ও পুরুষের মধ্যে জনক হবার সম্ভাব্যতা রয়েছে—তাই বলে সব মেয়েকেই মা হতে হবে, আর বাপ হতে হবে সব পুরুষকেই, এটা হল বর্ব্বর মনের যুক্তি—সেই যুগের যুক্তি যে যুগে লাখ লাখ শিশু অযত্নে ও অনাহারে মরত বলে সমাজ লাখ লাখ শিশুকে জীবনক্ষেত্রে নামাত। এখনকার দিনে মা হতে যারা চায়, বাপ হতে যারা চায়, তারা নিজেদের কাজ আপোষে ভাগ করে নিক্‌, কিন্তু এই কাজটা মেয়েলি, ঐ কাজটা পুরুষোচিত, এরূপ ফতোয়া কেউ জারি করতে পারবে না।

সুধী ও দে সরকার এতক্ষণে Spaniards Roadএ এসে পড়েছিল। একটা বেঞ্চিতে উপবিষ্ট হয়ে ছুটন্ত মোটরকার ও দুধারের আলোকমালার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ কর্‌ল। রাস্তার দু দিকের হীথ উপত্যকার মত নিম্নগামী ও অরণ্যভূষিত। দিনের বেলা হলে ওরা বনপথ দিয়ে যেত। এখন যাবে নর্থ-এণ্ড রোড্‌ দিয়ে।

"অথচ" দে সরকার পূর্ব্বানুবৃত্তি কর্‌ল, "ওর মধ্যে মেয়েলিয়ানা ছিল ষোল আনা। সে যখনই আমার গ্যারেটে পা দিত তখন শিউরে উঠে বল্‌ত, আ-হা-হা-হা। ওটা অমন হবে না, এমন হবে। সেটা ওখানে থাক্‌বে না, এখানে থাক্‌বে। আমি চাই একটু সঙ্গসুখ, একটু আদর কর্‌তে ও পেতে। কিন্তু তার সমস্ত মন আমার ঘরের আসবাব বই বাসন ও বসনের উপরে। এটা ঝাড়ে ওটা ভাঁজ করে সেটা জল দিয়ে ধুয়ে ন্যাকড়া দিয়ে মোছে। আমি ওর সাহায্য করতে চাইলে ভাগিয়ে দেয়। বলে, ঘরখানাকে যা করে রেখেছ তা থেকে তোমার সাহায্যকারিতা সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তি নেই। আমি ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্য বলি, এসব মেয়েলি কাজে আমার সাহায্যকারিতা সম্বন্ধে ভ্রান্তি কি আমারই আছে? তবে শিভ্যাল্‌রী আমাদের ধর্ম্ম—! সে এমন ভাবে চোক পাকায় যে আমার মুখের কথা মুখে থেকে যায়। সে উষ্মার সঙ্গে বলে, অনেক পুরুষ যা পারে তুমি তা পার না। অনেক মেয়ে যা পারে না, আমি তা পারি। ক্ষমতা অক্ষমতার লিঙ্গভেদ নেই, মসিয়ে দ্য সরকার।

যাক্‌, আসল কথা, সে যতক্ষণ আমাকে সঙ্গদান করত, ততক্ষণ আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত নিষ্ক্রিয় করে রাখ্‌ত। দংশন করতে দিত না। আমার হৃদয়ের মধ্যে কত কামনা জাগ্‌ত; কিন্তু ওর হৃদয়ে তার রং লাগ্‌ত না। আমি ইঙ্গিতে যা বল্‌তুম ওর কাছে তার সাড়া পেতুম না। যে সব ভিক্ষা খুব স্পষ্ট ভাষায় চাওয়া যায় না তাদের সম্বন্ধে আমি সিদ্ধলিপ্ত। আমি তার চোখের সুমুখে চোখ নিয়ে যাই, এই পর্য্যন্ত আমার overture। উৎসাহ না পেলে আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করতেও লজ্জা বোধ করি। এক শ্রেণীর পুরুষ আছে—

দে সরকার একটা সিগ্‌রেট ধরাল। নিজের খরচে সিগ্‌রেট খাওয়া তার নীতিবিরুদ্ধ। মূলধন স্বরূপ গুটি কয়েক

রাখে, যার কাছে একটা দিলে পাঁচটা পাওয়া যায় তেমন লোকের দিকে বাড়িয়ে দেয়। সুধীর সঙ্গে পড়লে বহু কুঠার সহিত মূলধন ভাঙ্গতে হয়।

"এক শ্রেণীর পুরুষ আছে—পুরুষ আছে—যারা রসের উপর জুলুম খাটায়, তারা প্রার্থী না, তারা প্রভু। এক শ্রেণীর মেয়ে আছে তারা এদের Sadismকে পছন্দ করে ও প্রশ্রয় দেয়। উভয় পক্ষই হাতে হাতে কামনার চরিতার্থতা পায়। পশুর মধ্যেও যেটুকু প্রার্থনার ভাব লক্ষ্য করি সেটুকু এদের মধ্যে নেই থাকলে কি মানুষের সমাজে গণিকাবৃত্তি সনাতন ও সাধারণ হত?"

সুধী বল্ল, "আসুন এবার উঠি।"

"হাঁ, ওঠা যাক্। আর অল্প বাকী।"

চলতে চলতে দে সরকার বল্ল, "নাটালী যে কোন শ্রেণীর মেয়ে তাই অধ্যয়ন করতে আমার অনেক দিন গেল। আগেই বলেছি, সে ষোল আনা মেয়ে। অর্থাৎ তার স্বভাবে পুরুষভোগ্য সমস্তই আছে। অধ্যয়নের ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম যে সে আমার বর্ণিত শ্রেণীর। রুশ ভালুকের মেয়ে, আর কত হবে। Ivan the Terrible তার পূর্ব্বপুরুষ। তাঁর সঙ্গে তার কয় পুরুষের ব্যবধান? আর আমি বাঙ্গালী। আমার পূর্ব্বপুরুষ ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ, সহজিয়া, চৈতন্যপন্থী। আমরা যাকে চূড়ান্ত মূল্য দিয়ে এসেছি সে হচ্ছে রস। আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে আমরা ষণ্ড নই।"

সুধী হেসে বল্ল, "কে যেন বলেছে আমরা চড়ুই পাখী।"

ও কথা কানে না তুলে দে সরকার বলে গেল, "কিন্তু আমি অন্যায় করছি। ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতাকে জাতির ঘাড়ে চাপালে সান্ত্বনা পেতে পারি, কিন্তু শক্তি পাইনে। সোজাসুজি স্বীকার করলে শক্তি পাই। মোট কথা, যাকে বলে virile আমি তা নই। আর নাটালী তাই। আমি যদি দুবেলা মিষ্ট কথা ও শিষ্ট আচরণের সাধনা না করে বক্সিং শিখতুম ও কাঠখোট্টার মত ব্যবহার করতুম তবে বোধ হয় এই কাহিনী অন্য রকম করে বলতে পারতুম। কিন্তু তখনকার দিনে আমি ছিলুম পুরুষমানুষের পক্ষে অতিরিক্ত vain। আমি ভাবলুম, নাটালী আমার প্রতি আকৃষ্ট হল আমার কি দেখে? বাহুবল নয়। যার দ্বারা তাকে পেয়েছি তারই দ্বারা তাকে রাখব। পরধর্ম্ম ভয়াবহ। এই ভেবে আমি লেগে গেলুম যা আমার মতে আমার শ্রেষ্ঠ গুণ তারই চর্চ্চায়। তা হচ্ছে আমার ষ্টাইল। আমি ষ্টাইলিষ্ট।"

সুধী বাধা দিয়ে বল্ল, "তার মানে?"

"তার মানে?" দে সরকার সুধীর অজ্ঞতায় আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "তার মানে আমি কায়দামাফিক হাসি ও কাঁদি, কথা বলি ও পোষাক পরি, হাঁটি ও দাঁড়াই। আমি কেবল অঙ্গের প্রসাধন করিনে, প্রসাধন করি অঙ্গভঙ্গীরও। শেষে এমন হল যে ট্রেনে যেতে যেতে স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হয়ে নাটালীর সাক্ষাতে যে অভিনয় করতুম তার মহলা দিই। ফলে কয়েকবার নাকাল হতে হল। কিন্তু নাকাল হলেই যথেষ্ট ছিল।"—দে সরকার গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বল্ল, "ঐ বুঝি গোল্ডার্স গ্রীন ষ্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। এবার সংক্ষেপ করি।"

১০

"নাটালীর আসা যাওয়া বিরল হয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় না। এ দিকে আমিও তাকে সত্যিই ভালবেসেছি। অর্থাৎ তাকে না দেখলে আমার দিনটা ব্যর্থ যায়, তার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ আমার মনটা পায়রার মত বকম বকম করতে থাকে। সে আমার এত কাছে—আমরা দুজনে এত নির্জ্জন যে ভাবতে বুকের ভিতর হাতুড়ির প্রহার চলে। আহা, আমি যদি পাগল হয়ে থাকতুম তা হলে আমার সাবধানী প্রকৃতির শাসন উপেক্ষা করতুম। কিন্তু সাহস—বুঝলেন চক্রবর্ত্তী—সাহস আমার নেই। বাহুবলের অভাব একটা মিথ্যা ওজর। পৌরুষের প্রথম কথা হচ্ছে সাহস। নাটালী আমার চরিত্রে এই সাহস জিনিষটি বিকশিত করবার জন্য আমাকে দিনের পর দিন সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু এমনি নির্ব্বোধ আমি, নারীকে আমি বাক্‌চাতুরী ও নাটকীয় অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা জয় করবার আশা পুষেছি।

অবশেষে একদিন—সে দিনটি আমার চিরকাল স্মরণ

থাকবে—নাটালী আমাকে নিমন্ত্রণ করে মারগেটের সন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতটে নিয়ে গেল। জনমানবের অগম্য একটি গুহা, এক দিকে তরঙ্গের লম্ফ, অন্য দিকে সমুচ্চ তট-প্রাচীর। তটপ্রাচীর যেন দুই বাহু তুলে আমাদের অভয় দিয়ে বল্‌ছিল, আমি পাহারা আছি। মা ভৈঃ। নীলাকাশ ছাড়া কৌতুহলী দৃষ্টি কারুর ছিল না। চক্রবর্ত্তী, আপনি কি অন্তরে গ্লানি বোধ করছেন?"

সুধী ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

"দেখুন," দে সরকার কৈফিয়তের সুরে বল্ল, "আমার মরাল ফিলসফির সূত্র হচ্ছে, দুই পক্ষের যদি সম্মতি থাকে তবে তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ সমাজের আপত্তি থাকা অনুচিত।"

সুধী বল্ল, "তৃতীয় পক্ষের সপক্ষে যুক্তি আছে, কিন্তু আজ আমি বক্তা নই, শ্রোতা। নির্ব্বিঘ্নে বলে যান।"

দে সরকার আর একটা সিগ্‌রেট ধরাল। বল্‌তে তার দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। বাহ্য বস্তুর সাহায্যে যদি দ্বিধা দূর হয়।

"সেদিন আকাশে একখানিও মেঘ ছিল না। সূর্য্যের আলোতে আর ঢেউয়ের ফেনাতে মিলে রামধনু রচনা কর্‌ছিল। মৃদুল বায়ু সৈকতে শীকর ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। নাটালীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম সে আমারই দিকে চেয়ে কি চিন্তা করছে। তার চিন্তা যে কি হতে পারে যেই ওকথা কল্পনা কর্‌লুম অমনি আমার যেন কম্প দিয়ে জ্বর এল। কেবল হৃৎকম্প নয়, দেহের যতগুলো য়্যাটম্ ছিল এক সঙ্গে ক্ষেপে গিয়ে লাফাতে সুরু করে দিল।"

এতক্ষণে তারা ষ্টেশনের খুব কাছে এসেছিল। এগারটা বাজে। সুধীর ঘুম পেয়েছিল, কিন্তু দে সরকারের ভাব থেকে মনে হচ্ছিল না যে সুধীকে সে সকালে ছুটী দেবে। দে সরকার সাম্‌নে একটা রেস্তরাঁ দেখে সুধীর জামায় টান দিয়ে বল্ল, "আসুন, একটু পান করা যাক্। না, না, ভয় নেই আপনার। আমার ইচ্ছা থাক্‌লেও অর্থ নেই। গান্ধী-অনুমোদিত পানীয় ফরমাস কর্‌ব। গরম দুধ, তাতে এক ফোঁটা কোকো। ঘ্রাণ বিনোদনের জন্য।" সুধী আপত্তি কর্‌ল না।

"তারপর" দে সরকার এ দিক ও দিক তাকিয়ে বাঙালীর মত দেখ্‌তে কেউ নেই সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, "তারপর কি বলছিলুম? বৈষ্ণব গোস্বামীদের মত আমার মুহুর্মুহু স্বেদ আর কম্প হতে লাগ্‌ল। কিন্তু মূর্চ্ছা হল না। খুব শীত কর্‌লে যেমন বাচাল হয়ে কতটা আরাম বোধ করা যায় এই দশায় আমি তেমনি বক্ বক্ কর্‌তে লাগ্‌লুম। নাটালীকে আপনি দেখেছেন। তার রূপ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। তবে সে কয়েক মাসের মধ্যে অত্যধিক মোটা হয়েছে। তন্বী সে কোনো দিন ছিল না, কিন্তু তার শরীরে পুষ্টির অতিরিক্ত মাংস ছিল বলে মনে হয় না। তার মাংসপেশীগুলি বেশ আঁটসাট ছিল আর তার চিবুক ছিল এক থাক্। আমি তার কি দেখে ভালবেসে-ছিলুম? তার আকৃতির সর্ব্বত্র সঞ্চারিত দীপ্তি। সে যেন একটি নক্ষত্র। আর তার আকারের শক্তিশালিতা। সে যেন রোমানদের কোনো দেবী। দৈহিক বল ওর থেকে আমার বেশী। বোধ করি যে-কোনো মেয়ের থেকে বেশী। কিন্তু বল ও শক্তি এক জিনিষ নয়। নইলে শাক্তরা স্ত্রীদেবতার উপাসনা কর্‌তে লজ্জা বোধ কর্‌তেন।

"আমি বক্ বক্ কর্‌তে লাগ্‌লুম। কর্‌তে কর্‌তে লগ্ন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ সে কলের বাঁশীর মত চীৎকার করে দুই হাতে মুখ ঢাক্‌ল। আমি হতভম্ব ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাক্‌লুম। আমার চোখে পড়্‌ল দূরে একটি মানুষ পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে সমুদ্রের শোভা সন্দর্শন করছে। আমি যদি আর্য্যঋষি হতুম তবে ঐ হতভাগ্যকে ভস্ম করে ফেল্‌তুম। খণ্ডিত কামনা আমাকে উদ্দাম করে তুল্ল, আর নাটালীকে কর্‌ল মোহগ্রস্ত। নৈরাশ্য যেন বিষধর সাপের কামড়। নাটালীর মুখে সে কালী মাখিয়ে দিল। আমার দৃষ্টির সম্মুখে তার ঘন সংবদ্ধ গঠন জীর্ণ ও লোল হয়ে গেল। যেন কোন দেবতার বর জরতীকে যুবতী করেছিল; কাল নিঃশেষিত হয়েছে। ঐ মানুষটা যেন তার যৌবনের যমদূত। বুড়া মানুষ; হয়ত পেন্‌সন নিয়ে কাছেই বসত করেছে। সঙ্গে শিকল বাঁধা এক কুকুর। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাক্রমে এত বড় শত্রুতা কর্‌ল।

"পাছে একটা খুনখারাবি করে বসি সেজন্য ভগবানকে বল্‌তে থাক্‌লুম, Father, father, forgive him. He knows not what he does. লোকটা কি ছাই

সম্বার নাম করে! পুরা এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে ফল হল এই যে, আগুন জল হয়ে গেল। দুজনেই উঠ্‌লুম। কিন্তু নাটালী আমার মুখ দেখ্‌ল না। তখন থেকে বাইরের দেখাশুনা বন্ধ। ক্লাসে অন্যত্র বসে, চোখাচোখি হলে ভ্রূ-ধনুকে অবজ্ঞার বাণ যোজনা করে। কিন্তু আমি"—দে সরকার প্রস্থানের উদ্যোগ করে বল্ল—"এদানীং অপরকে হৃদয় দিয়েছি।"

সুধীর উঠ্‌ল। একটা অসামাজিক ব্যাপার সংঘটিত হয়নি, এজন্য তার প্রফুল্ল হবার কথা। কিন্তু কি জানি কেন সে ক্ষুব্ধ হল। হয়ত সমাজনীতির চেয়ে সত্য কাম বড়।

১১

দে সরকার যাবার সময় বলে গেল, "একজন গেলে আর একজন আসে। তাই পৃথিবী মধুময়। একদণ্ড বসে শোক করব, আসা যাওয়ার মাঝখানে সেটুকুও ব্যবধান নেই। শোক নেই বলে যে খেদ নেই তা মনে করবেন না চক্রবর্ত্তী। বড় বেদনার সংসার। জ্ঞানে, অজ্ঞানে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, ভ্রান্তিতে, কুযুক্তিতে, হিংসাবশে, মূর্খতায়, ভাল মনে করে, একেবারে না ভেবে—কত রকমে দুই পক্ষের আনন্দ তৃতীয় পক্ষ হরণ করছে তার বিবরণ আমি একদা লিপিবদ্ধ করব ও গ্রন্থের নাম দেব, My Experiments with Love।"

সুধী যখন বাসায় পৌঁছল তখনও তার কানে বাজ্‌ছিল, "আনন্দ মাত্রেই নির্দোষ, চক্রবর্ত্তী। দোষ যদি কোথাও থাকে তবে সে মানবের সমাজ ব্যবস্থায়।"

কথাটা সুধী মেনে নিতে পার্‌ছিল না। প্রেমের মৃত্যু প্রেমিকের নিজেরই মধ্যে—প্রেমের অমরত্বও অপরানপেক্ষ। এই হল সুধীর স্থির বিশ্বাস। আজকের গল্পের শেষ অমন হত না যদি দে সরকার সময় থাক্‌তে দ্বিধাহীন হত। এই যে মেয়েটি দিনের পর দিন সেবাচ্ছলে ওকে পরীক্ষা করে গেল ও পরিশেষের পরীক্ষায় ওর অযোগ্যতার পরিচয় পেল, এর মধ্যে তৃতীয় মানুষটির অপরাধ কোথায়?

দে সরকারের হৃদয় ভাবে যথেষ্ট নিষ্ঠা নেই। তাই লোকটা কোনো পরীক্ষায় পাশ হতে পার্‌ল না। ব্যর্থতাকে ওর নিজের পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতা কর্‌ল। অনাবশ্যক দুঃখ ওর স্বভাবকে কর্‌ছে বক্র, বিকল ও সন্দিগ্ধ। সুধী ছাড়া অন্যের সঙ্গে কথা বলে ভেংচিয়ে। বাদলকে ক্ষ্যাপায় বিভূতিকে ব্যঙ্গ করে।

পরের ভাবনা স্থগিত রেখে সুধী নিজের ভাবনায় মন দিল। মেয়েদের সম্বন্ধে সে কোনোদিন চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেনি। এর কারণ এমন নয় যে সে কামিনীকাঞ্চনে বিরাগী। এমনো নয় যে তার ভোগক্ষমতা দুর্ব্বল। যথার্থ কারণ, সে ভালবাস্‌বার মত কাউকে দেখেনি। তার ভালবাসা তার সমগ্র সত্তা জুড়্‌বে, তার জীবনের সবটাকে জড়াবে। জীবনশিল্পে পুনরুক্তির স্থান নেই। তাই সুধীর অনুরাগ হবে একানুগ। সেই এক যে কেমন সুন্দরী হবে কেমন গুণবতী, বিদুষী হবে কি বিদ্যাধরী, সুধীর দিক থেকে এরূপ কোনো প্রত্যাশা ছিল না। দেশপ্রথা অনুসারে গুরুজনের মনোনীতা পাত্রীকে বিবাহ করতে হবে, এ সম্ভাবনায় সুধী আপত্তিযোগ্য কিছু পেত না। স্ত্রী রূপে লাভ করলে যে কোনো নারীকে সে তার সাধ্যানুসারে সুখী করতে প্রস্তুত ছিল।

আজকের সন্ধ্যার সম্মিলনীতে সে চিত্ত চাঞ্চল্য অনুভব করেনি, কিন্তু তার স্মৃতি পুনঃপুনঃ কৌশাম্বীর অনুসরণ কর্‌ছিল। কৌশাম্বীর মধ্যে সে কি কেবল উজ্জয়িনীকে অন্বেষণ কর্‌ছিল, না কৌশাম্বীর সত্য স্বরূপকেও? কি চাল ও কিছু জাল বাদ দিলে কৌশাম্বী কি বিশুদ্ধ আনন্দের লীলাপ্রতিমা নয়? অথবা শাপভ্রষ্টা অপ্সর রমণী? সংসারের সঙ্গে সামঞ্জস্য কর্‌তে কর্‌তে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির আকৃতি দাঁড়ায় ওর কতকটা অনুকৃতি ও কতকটা বিকৃতি। সত্যসন্ধানীর কাছে তাই ওগুলি ধর্ত্তব্য নয়।

অশোকাকেও তার মনে পড়্‌ছিল। তার মত মানুষের প্রতি অশোকার মত মেয়ের হৃদয়ে কোনো ভাব উপচিত হওয়া সম্ভবপর নয়। আকস্মিকতার তরঙ্গে ভাস্‌তে ভাসতে তারা পরস্পরের পার্শ্বলগ্ন হয়েছিল। জীবনে অন্য কোনো দিন তাদের সাক্ষাৎ হবে কিনা সন্দেহ। সুধীর বিদায়ে অশোকার ব্যাকুলতা দে সরকারের রজ্জুতে সর্পের ভ্রম সে ছাড়া আর কি? তবে খেলার সময় সুধীর প্রতি অশো

পক্ষপাতিত্ব নানা আকারে ও ইঙ্গিতে ব্যক্ত হতে সুধীও লক্ষ্য করেছে। ওটা সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত। খেলার সাথী যদি খেলা জিতিয়ে দিতে থাকে তবে কে না হৃষ্ট হয়! কার না মুখ খুলে যায়!

তবু স্নেহময় ও কুন্তলা যে-ভাষায় অভিনন্দন করে গেল তার মর্ম্ম সুধী বুঝ্তে পার্‌ল না। খেলার পার্টনারশিপ বিভিন্ন বার বদলায়। আবার যখন অশোকা ব্রিজ খেল্‌বে তখন অন্য কেউ তার পার্টনার হবে। খেলাঘরের সম্বন্ধ যদি বাসরঘর পর্য্যন্ত গড়াত তবে ত খেলার সাথী নির্ব্বাচন নিয়ে হুলস্থূল বেধে যেত।

শুতে যাবার আগে সুধী স্নান করে। স্নান করে উঠ্‌তে একটা বাজ্‌ল। তার শয়নকাল তিন ঘণ্টা বিলম্বিত হয়েছে। আর বিলম্ব নয়। ভোর না হতেই মার্সেল তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতে আস্‌বে। রোজ ভোরে চঞ্চনের খানিকটে বেড়িয়ে আসা চাই। সুধী ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার মুখে যার কথা তার মনে জাগ্‌ল সে উজ্জয়িনী—বিষাদিনী।

সুধী স্বপ্ন দেখ্‌ল, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, হাতে একতারা, মাথার চুল কটা হয়ে জটায় পরিণত হতে চলেছে—উজ্জয়িনী কৌতূহলী জনতার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আপন মনে গান করছে, তার মুখে হাসি, চোখে জল। গানের কথা বোঝা যাচ্ছে না, সুর শুনে প্রাণ উদাস হচ্ছে। জনতার চোখে ক্রমশ বাষ্প ঘনিয়ে এল। ওরা মিনতি করে বল্ল, "মা, তুমি যদি ফিরে না যাও তবে আমরাও তোমার সঙ্গ নেব।" উজ্জয়িনী কানে তুল্ল না। ওরা বলতে থাক্‌ল, "তোমার এত অল্প বয়স, তোমার এমন প্রতিভা, তুমি গৃহশ্রী হতে, তুমি হতে সমাজের রাণী। মা, তুমি আমাদের ত্যাগ করে যেতে পারবে না।" উজ্জয়িনীর গান তবু থামে না। তখন জনতাকে দুই হাতে ঠেলে সুধী এগিয়ে গেল। উজ্জয়িনীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্ল, "উজ্জয়িনী, তুমি আমাকে তোমার বৈরাগ্য দান কর।" উজ্জয়িনী সুধীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চিন্তামৌন থাক্‌ল। তার গানের সুরের রেশ জনতার বেষ্টনী ভেদ করে শূন্যে মিশিয়ে গেল। তার একতারার গুঞ্জন স্তব্ধ হল।

সে বল্ল, "সুধীদা, তোমার সম্ভবপর পত্নীকে বঞ্চিত কর্‌বার অধিকার তোমার নেই।"

সুধী বল্ল, "সমাজের জন্য তোমাকে আমি ফিরিয়ে নিলে যদি তেমন কোনো নারীর অস্তিত্ব থাকে তবে তিনিও উপকৃত হবেন। তা ছাড়া, বৈরাগ্য বহনের যোগ্যতা একমাত্র আমারই আছে, কারণ এই দ্যুলোক ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতিদেবীর আমার মত অনুরাগী আর নেই। উজ্জয়িনী, তোমার বৈরাগ্য আমাকে দান কর।"

উজ্জয়িনী কিয়ৎকাল চিন্তা কর্‌ল। জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "বিনিময়ে তুমি আমাকে কি দেবে?"

"আমি দেব তোমাকে কল্যাণী হবার দীক্ষা।" সুধী উত্তর দিল।

উজ্জয়িনী সুধীকে তার বৈরাগ্য দান কর্‌ল। সুধীর কণ্ঠে এল গান, হাতে এল একতারা, গাত্রে এল বহির্ব্বাস। উজ্জয়িনী যখন তাকে বিদায়-প্রণাম কর্‌ল তখন সে আশীর্ব্বাদের সঙ্গে নিজের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পাত্রান্তরিত করে দিল। জনতা উজ্জয়িনীকে নিয়ে হর্ষধ্বনি কর্‌তে কর্‌তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লীলাময় রায়

প্রত্যুত্তর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেল-কুঁড়ি-গাঁথা মালা
দিয়েছিনু হাতে,
সে মালা কি ফুটেছিল রাতে ?
দিনান্তের ম্লান মৌনখানি
নির্জ্জন আঁধারে সে কি ভরেছিল বাণী ॥

অবসন্ন গোধূলির পাণ্ডু নীলিমায়
লিখে গেল দিগন্ত সীমায়
অস্তসূর্য্য, স্বর্ণাক্ষর ধারা।
রাত্রি কি উত্তরে তারি রচেছিল তারা।

পথিক বাজায়ে গেল পথে-চলা বাঁশি,
ঘরে সে কি উঠেছে উচ্ছ্বাসি।
কোণে কোণে ফিরিছে কোথায়
দূরের বেদনখানি ঘরের ব্যথায় ॥

২৬ চৈত্র
১৩৩১

কমলচরিত্রের রূপায়ন

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

"শেষ প্রশ্নে" ব্যক্ত অতি উদার মতামতের জন্যে একদল যেমন নিন্দায় পঞ্চমুখ, আর একদল তেমনি গভীর অভিযোগ তুলেছেন, রসশিল্পহিসাবে উপন্যাসখানার গলদ অনেক। এই শেষোক্তদলের প্রধান অভিযোগ হচ্চে, "শেষপ্রশ্নে" অস্বাভাবিক আবহাওয়া এবং অস্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েচে। বিশেষতঃ কমলের মত চরিত্র আমাদের জীবন-প্রাঙ্গণে দেখা পাওয়া অসম্ভব। এ অবাস্তব, অস্বাভাবিক এবং লেখকের লঘু কাল্পনিকতার অপসৃষ্টি! কিন্তু স্বভাবতঃই মনে হয়, জীবন, সাহিত্য অথবা ইতিহাসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাপকাঠি দিয়ে শিল্পীর সৃষ্ট চরিত্রের স্বাভাবিকতা বিচার করা যুক্তিসঙ্গত নয়। জীবনের অনেক বৈচিত্র্য শুধু শিল্পীর দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে,—যার সন্ধান পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্য শুধু অতীত এবং বর্ত্তমানের নিছক অনুকরণ নয়। সকল দেশে এবং সকল যুগে বড় সাহিত্যিকেরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা,—অনাগতের স্বপ্নে বিভোর। তাঁদের সাহিত্য কোন জাতির শুধু বর্ত্তমান কালের ইতিহাস নয়। তাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের কণ্ঠে ভবিষ্যতের বাণী। অতএব, কমলচরিত্রে যদি আমাদের অতীত এবং বর্ত্তমানের চিহ্ন থাকে অতি অল্প, তা'তে বিশেষ ক্ষতি নেই। সকল সাহিত্যিকদেরই মানস-মেয়েরা এম্নি ছায়া ও কায়ায়, বাস্তব ও কল্পনায়, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুসঙ্গত মিলনে অপরূপ হয়ে রয়েচেন। তাঁদের অস্তিত্বে সংশয় করা মানে নিজেদের অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া। কিন্তু, এক্ষেত্রে বিচার করতে হবে, লেখকের কল্পনার অবাধগতিতে কমল একেবারে কাল্পনিক হয়ে পড়েচে কিনা! অর্থাৎ তাকে রক্ত-মাংসে-রচা নারী বলে মনে হয় কিনা! হোক সে কথা-শিল্পীর মানস-মেয়ে, তবু তার সৃষ্ট জীবনের ভিত্তি বাস্তবজীবনকে আশ্রয় ক'রে গ'ড়ে উঠেচে কিনা। বিশেষ বিচার ক'রে দেখলে বুঝতে পারা যায়, কমলচরিত্রে বাস্তবিকই আছে সেই "illusion of reality that convinces a reader of its fidelity to life." কমলের চিন্তা ও মতামত যতই আমাদের সংস্কারে আঘাত দিক, যাঁরা তা' শুনে বিতৃষ্ণা ও ক্ষোভে অন্ধ হয়ে যাননি, তাঁদের সকলকেই কমলের সুখদুঃখ,—তার অন্তরের দুর্বিষহ দ্বন্দ্ব,—তার চিত্তের বেদনা ও আনন্দ আত্মীয়ের মত কাঁদায় হাসায়। তাদের আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, যেমন আশুবাবু, হরেন্দ্র, নিলীমা বা অজিত পারেন নি।

কমলকে রক্ত-মাংসে-রচা নারী বলে প্রতীয়মান হয় কিনা বিচার করতে গেলে প্রথমেই দেখা উচিৎ, উপন্যাসের মধ্যে তার চরিত্রের একটা পূর্ণ আলেখ্য ফুটে উঠেচে কিনা। কথা ও কাজের মধ্যে তার যতই গরমিল থাকুক,—অবশ্য এই গরমিল থাকাটাই তার স্বাভাবিকতার পরিচয়, কারণ, মানুষ লোহার তৈরী মেশিন নয়,—তবু আখ্যানধারা এবং কথোপকথনের বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে যদি কমলের চরিত্রের একটা Complete structure গ'ড়ে না উঠে থাকে, তবে বলতে বাধ্য হব, কমল কথাশিল্পের নায়িকা নয়, লেখকের ভাবপ্রচারের গ্রামোফোন মাত্র। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, কমল অসাধারণ, অদ্ভুত স্ত্রীলোক। কিন্তু কমল অসাধারণ হতে পারে,—অদ্ভুত, অস্বাভাবিক মোটেই নয়। কমলচরিত্রের দুর্বোধ্যতার কারণ দু'টি। প্রথমতঃ, শরৎচন্দ্রের ব্যাখান ভঙ্গি ক্রমশঃই সংক্ষিপ্ত থেকে অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠচে। "দত্তা"র চেয়ে চরিত্রহীনের ষ্টাইল অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। আবার চরিত্রহীনের চেয়ে "দেনাপাওনা"য় অথবা "শ্রীকান্ত" দ্বিতীয় খণ্ডের চেয়ে তৃতীয় খণ্ডের ষ্টাইলে শরৎচন্দ্র অনেক বেশী অল্পভাষী। সেক্‌স্‌পীয়ারের সাহিত্যজীবনের ক্রমোন্নতির মধ্যেও এমনি ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ততার পরিচয় পাওয়া যায়।

কথাশিল্পী বিজয়া ও নরেন্দ্রের মধ্যে যে গভীর প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং ঘাতপ্রতিঘাত "দত্তা"য় প্রস্ফুট ক'রে তুলেচেন, "শেষপ্রশ্নে" কমল ও অজিতের মধ্যে প্রায় তেমনি গভীর প্রেমের ঘাতপ্রতিঘাতের লীলায়িত চিত্র অঙ্কিত হয়েচে, কিন্তু এত অল্পকথায়, এত অল্পইঙ্গিতে যে অনেক সময়ে তাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য না করলে ধরা পড়ে না। তাজমহলের প্রাঙ্গণে যেদিন নানা অপরিচিত জনের সামনে কমল শিবনাথের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেছিল, "হাঁগা, করবে নাকি তুমি এই রকম কোনদিন ?" ঐ একটি প্রশ্নে তার নির্ভয় অন্তরে শিবনাথের প্রতি অনুরাগ এবং একান্ত বিশ্বাস কি সুন্দরভাবেই না পরিস্ফুট হয়ে উঠেচে। অথচ শৈববিবাহের লঘুত্বের কথা জেনেও তার পরিণাম চিন্তা যে ওর চিত্তকে অকারণে চঞ্চল ক'রে তুলত না, সে ইঙ্গিতও আমরা এখানে পাই। এই কথাটির মধ্যে শিবনাথের প্রতি শিবাণার যে গূঢ়, গভীর প্রেম ব্যক্ত হয়েচে, তা' ধরতে না পারলে, কমলকে পদেপদে আমরা ভুল বুঝব।

কমলচরিত্রের দুর্ব্বোধ্যতার দ্বিতীয় কারণ, শরৎপ্রতিভার কাছে নারী চরিত্র এক পরম বিস্ময়। এ বিষয়ে Maeterlinck এর সঙ্গে তাঁর অনুভূতির আত্মীয়তা আছে। Maeterlinck "On women" প্রবন্ধে এক জায়গায় বলেচেন, "Women are indeed the veiled sisters of all the great things we do not see. They are indeed nearest of kin to the infinite that is about us......It is they who preserve herebelow the pure fragrance of our soul,... and were they to depart, the spirit would reign in solitude in a desert. Theirs are still the divine emotions of the first days; and the sources of their being lie, deeper far than ours, in all that was illimitable." * নারীচরিত্রের মধ্যে আছে সৃষ্টির প্রথমদিনের গোপন রহস্য। তার আবরণ ভেদ করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। নারীর অন্তরের অন্তস্তলে যে 'এমোসানে'র প্রবল প্রবাহ অলক্ষ্যে প্রবাহিত হচ্ছে, তার গতি সম্যকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। 'অর্থাৎ নারীচরিত্রের গোপন অন্তঃপুরের সন্ধান আমাদের পক্ষে দুজ্ঞের্য়। শরৎ-প্রতিভা সেই রহস্য বোধে ভরপুর। প্রেমে জর্জ্জরিত কুসুমের পক্ষে বালাজোড়া ফেরত পাঠানো অথবা বিরাজ-বৌএর গৃহত্যাগের হিসাব-করা কারণ এই জন্যেই পাওয়া যায় না। অথচ আমরা এসব অবিশ্বাস করতে পারিনা, কারণ, এদের চরিত্রের মূলগতিটিকে যারা ধরতে পেরেচেন, তারা জানেন, এ অতি স্বাভাবিক। এই জন্যই শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলিকে মনে হয়, তারা যেন ধরা ছোঁয়ার অনেক দূরে,—'এমন একটা অদৃশ্য আবেষ্টন তাদের অহর্নিশি ঘিরে আছে, যার ভেতরে প্রবেশের পথ পর্য্যন্ত নেই'। সাবিত্রী বা রাজলক্ষ্মী বা অলকা, এদের সকলেরই চরিত্রের মধ্যে রয়েচে এই রহস্যময়তার গভীর প্রকাশ। কমলচরিত্রে তা' হয়ে উঠেচে আরো একস্তর গভীর। এই রহস্যময়তার জন্যে যেখানে যেখানে তার হৃদয় খুব বেশী চঞ্চল হয়ে উঠেচে, সেখানেই (বিশেষতঃ অজিতের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এবং হরেন্দ্রের সঙ্গে রাজেন্দ্রের বিষয়ে আলাপে) কমলের কথাগুলো মাঝে মাঝে প্রায় দুর্ব্বোধ হয়ে পড়েচে। এই দুর্ব্বোধ্যতা কমলচরিত্রে বরং স্বাভাবিকতার স্পষ্ট ছাপ। এ রকম চরিত্রের সঙ্গে জীবনে যাদের পরিচয় ঘটবার অবসর হয়েচে, তারা জানেন, এই ধরণের নরনারীদের যখন হৃদয়াবেগ তীব্রভাবে চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন তারা লোকচক্ষু থেকে তা' গোপন করার জন্যে একান্তভাবে চেষ্টা করে। আর সেই চেষ্টা করতে গিয়েই দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ চিত্তের জন্যে তাদের কথাবার্ত্তা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। মনের এই দ্বন্দ্বকে প্রস্ফুট ক'রে তুলতে কথাশিল্পী অদ্বিতীয়। ২৫৩ পাতা থেকে খানিকটা তুলে দিই। কমলের চিত্তে ছিল রাজেনের পরে গভীর স্নেহ: "সে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় গেছেন এবং কবে গেছেন ? মুচীদের পাড়ায় চেষ্টা করে একটু খোঁজ নিলে কি বার করা না হরেনবাবু, তার প্রতি আপনার স্নেহের পরিমাণ জা এ সকল প্রশ্ন হয়ত বাহুল্য মনে হবে, কিন্তু কদিন থেকে এছাড়া কিছু আর আমি ভাবতেই পারিনে আমার এমনি দশা হয়েছে। এই বলিয়া সে এমনি ব্যাকুল চক্ষে চাহিল যে হরেন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখ নামাইয়া "পূর্ব্বের মতই সেলাইয়ের কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।"

* "The Treasure of the Humble."

এই যে ব্যাকুল চক্ষে চাওয়া এবং রাজেনের বিষয়ে শঙ্কাকুল প্রশ্ন এর মধ্যে যেমন ব্যক্ত হয়েচে তার অন্তরের স্নেহচঞ্চল প্রবল হৃদয়াবেগ, তেমনি হরেন্দ্রের বিস্ময় প্রকাশে পরক্ষণেই নির্ব্বিকারের মত কাজে নিবিষ্ট হওয়ার মধ্যে রয়েচে মনের চাঞ্চল্যকে গোপন করার চেষ্টা।

বার্ণাডশ'এর Tanner-কে যাঁরা বুঝেচেন, কথাশিল্পীর কমলকে তাঁরা সহজে বুঝতে পারবেন। এই দু'টি চরিত্রের রূপ এক, তা' নয়, কিন্তু এদের চরিত্রের মূল ভিত্তিটা একই। কমলের অন্তরে বুদ্ধি এবং হৃদয়াবেগ অত্যন্ত প্রবল। এই দুই অতি বিকশিত, বিপরীত বস্তুর মিলনে কমলচরিত্র হয়ে উঠেচে অসামান্য। কিন্তু হৃদয়াবেগ অত্যন্ত প্রবল হলেও কমল একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েই জীবনকে চালিত করার চেষ্টা করে। তাই ওর প্রখর বুদ্ধিই জীবনের প্রধান অঙ্গ। তাই সংস্কার বিমুক্ত চিত্তে একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে ও সমাজ যন্ত্রের বিধি নিষেধ এবং আমাদের আধুনিক জীবনের মূলমন্ত্রের সত্যরূপটিকে ধরতে চা। এবং জীবনের অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধিতে যা সত্য বলে বোঝে তা-ই গ্রহণ করে, আর সব মিথ্যা, মায়া বলে নিঃসঙ্কোচে পরিহাস এবং পরিহার করে। সত্যের জন্য কমলের অন্তরে আছে তীব্র অনুরাগ। অজিতকে সে একদিন উত্তর দিয়েছিল, "আমি তো কখনই মিথ্যে বলিনে অজিতবাবু।...এ জীবনে কখনো কোন কারণেই যেন মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা বাক্যের আশ্রয় না নিই, বাবা এই শিক্ষাই আমাকে বারবার দিয়ে গেছেন।" কমল স্পষ্টবাদী এবং সত্যভাষী। কঠোর দুঃখ, তীব্র অপমান, দুঃসহ দারিদ্র্য কিছুই কমলকে সত্যভাষণ থেকে বিচলিত করতে পারেনি। শিবনাথও স্পষ্টবাদী এবং সত্যভাষী। কিন্তু শিবনাথের সত্যভাষণের স্পর্দ্ধা ও উগ্রতা কৃত্রিম। কমলের মধ্যে ছিল একটা সহজ, স্বচ্ছন্দভাব। অনেক সময়ে দেখা গেচে, শিবনাথের স্পষ্টবাদিতা নিছক নির্লজ্জপনা। অবিনাশের অত বড় মর্ম্মান্তিক অভিযোগের উত্তরে শিবনাথ নির্ব্বিকারের মত বলেছিল, "না। খাসিম চপটা খাসা রেঁধেছ হে। আরো দু-একটা আনত।"—এই নির্লজ্জ কথাগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, শিবনাথ জোর ক'রে নিজেকে সত্যভাষী, বেপরোয়া এবং স্পষ্টবাদী প্রমাণ করতে চাইচে। কিন্তু কমল এ রকম নির্লজ্জের মত কথা কোথাও বলেনি, নিজের চিত্তের হীনতাকে স্পষ্টবাদিতার আবরণে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দেখাবার চেষ্টা কোথাও করেনি। কমলের মনে ছিল না দুর্ব্বলতা, হীনতা বা নীচতা। তাই জড়তা বা আড়ষ্টভাব তার কথায় পাওয়া যায় না,—নাবা, তার আচরণে। হতে পারে, তার মতবাদ বা কাজকর্ম্মের অনেক কিছুই প্রচলিত ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ডে বিচার করলে বিকৃত ব'লে মনে হবে, কিন্তু তার অন্তরে এক—বাহিরে আর এক ছিল না। কৃত্রিমতার লেশমাত্র তার জীবনে পাওয়া যায় না। বিধবার সম্পত্তি গ্রাস ক'রে নিজের পাপ সম্বন্ধে মনে সঙ্কোচ এলেও বাহিরে নির্ভয়তার মুখোস প'রে সে থাকতে পারতো না।

কথার প্রধান চরিত্রের মধ্যে মহনীয় কিছু (element of greatness) না থাকলে সাহিত্য-সৃষ্টি হ'তে পারে না। নিছক নীচ চরিত্রকে নায়ক বা নায়িকা ক'রে এ পর্য্যন্ত কোন প্রকৃত সাহিত্য রচিত হয়নি। কথাশিল্পের এই প্রথম ও প্রধান কথাটি শরৎচন্দ্র ভোলেন নি। কমল মহৎ, তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের নানাভাবে পরিচয় দিতে কথাশিল্পী একটুও অবহেলা করেন নি। অতি-শিক্ষিতা, অতি-সুন্দরী, প্রখর-বুদ্ধিশালিনী কমলের অন্তরে আছে তীব্র সত্যপরতা, সুকঠিন ধৈর্য্য, দৃঢ় আত্মমর্য্যাদা, অপরাজেয় তেজ, সাবলীল আন্তরিকতা, নির্দ্বন্দ্ব সংযম এবং গভীর, সহজ নিরাসক্তি, সমাজে সম্মান, সহানুভূতি, আত্মীয়ের আশ্রয় কিছুই তার ছিল না, তবু এই নিঃসহায় রমণীর জীবনের যে কয়টা দিন আমরা দেখেচি তার মধ্যে দুঃসহ দুর্গতি, পরিচিত-অপরিচিতের অনুদার অপমান এব নিষ্ঠুর দারিদ্র্য কিছুই তাকে দুর্ব্বল করতে পারেনি,—নাবা বিচলিত ক'রেচে তার ধৈর্য্যকে। জীবনকে নির্ভয়চিত্তে যোদ্ধার মত গ্রহণ করবার এই যে দুর্জ্জয় শক্তি—এ বাইরের আবরণ নয়,—এ ছদ্মবেশ নয়। ছদ্মবেশ হ'লে জীবনের এই দীর্ঘ অগ্নি-পরীক্ষায় তার মিথ্যামূর্ত্তি প্রকাশিত হ'য়ে পড়ত। এর সত্যিকার উৎস কমলের অন্তরের গভীরতায়,—অপরাজেয় তেজে। জীবন সম্বন্ধে কমল একদিন মত প্রকাশ করেছিলো "এ জীবনের সুখ দুঃখের কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু,

সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই তো সত্যিকার পাওয়া।" জীবনের এই যে পৌরুষমন্ত্র এর মূল ওর অন্তরে। তাই জীবনের কঠোর দুর্দ্দিনে অনিশ্চিতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নিজেকে বঞ্চিত ক'রেচে তবু ভিক্ষা কারো কাছে চায়নি, সাহায্য কারো নেয়নি, এমনি কি অজিতবাবুর ঋণগ্রহণের প্রস্তাবও নির্ব্বিকারচিত্তে অগ্রাহ্য ক'রেছিলো। আশুবাবু একদিন সত্যি কথাই বলেছিলেন, "তোমাদের যেন মহাদেবের দারিদ্র্য।"

কমলের কথাগুলো আপাতদৃষ্টিতে bravodo-র মত শুনতে কিন্তু বাস্তবিক তা' নয়। অনেক সময় মনে হয়, কমল যদি তর্ক না কর্ত ত' শোনাত ভালো। কিন্তু একথা তো ভুললে চলবে না যে কমলের এই তর্ক একটা ভুয়ো তর্কপ্রিয়তা থেকে জাগেনি। এর উৎস ওর চিত্তের আন্তরিকতায়। জীবনের কিছুর সঙ্গেই ও আপোশ করতে পারতো না, তা' এর জন্যে যত বড় মূল্যই দিতে হোক না কেন। কমলের মত যাদের অন্তরে আছে গভীর আন্তরিকতা এবং জীবনের মূল মন্ত্রটিকে সন্ধান ক'রে পাবার তীব্র আগ্রহ, তারা কোথাও ভয়ে বা ছদ্মভদ্রতায় চুপ ক'রে থাক্তে পারে না। নিজের অদ্ভুত মতবাদ স্থানে-অস্থানে জাহির ক'রে লোকের মিথ্যা প্রশংসা লাভ করার প্রবৃত্তি ব'লে কমলের তর্কশীলতাকে ধারণা কর্লে ভুল বোঝা হবে, বিশেষতঃ, কমল পাত্রাপাত্র বিচার কর্তে ভুলতো না। অক্ষয়ের সঙ্গে কখনো সে তর্ক করতে চাইতো না এবং অবিনাশকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কর্তো। আশুবাবু ও হরেন্দ্রের সঙ্গেই তার তর্ক জমতো ভালো, কারণ এঁরা তার মনের মত লোক ছিলেন এবং যা' সত্য ব'লে বুঝেচেন, তা' জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারে প্রতিফলিত করার মত আগ্রহ ও আন্তরিকতা একমাত্র এঁদের মধ্যেই ছিলো। তাছাড়া কমল কূটতার্কিক নয়, কৌশলে বক্তব্য প্রকাশ করার উচ্চ শক্তির পরিচয় স্থানে স্থানে পাওয়া যায় বটে তবু কমলের কথাবার্ত্তার অকাট্যতা ও তেজ তার তর্কপটুতার জন্যে নয়, তার প্রকাশ করার কৌশলের জন্যেও নয়। অনেক ক্ষেত্রে ওর বক্তব্যকে যুক্তি বলা যায় না,—সে শুধু ওর নিজের বিশ্বাস, অনেক সময়ে ওর বিরুদ্ধপক্ষ যদি তর্ক কর্তেন ত' কমলকে হার মান্‌তে হত, কিন্তু তাঁরা তা পারেন নি, কারণ কমলের চিত্তের একান্ত আন্তরিকতা এবং নিজের মতবাদের 'পরে দৃঢ়, অটুট বিশ্বাস সকলকেই নির্ব্বাক ক'রে দিতো। ওর তর্ক আলোচনার মধ্যে এই গুপ্তশক্তির পরিচয় হ'রেন পেয়েছিলো। একদিন ও বলেছিলো, "...ওর বলার মধ্যে কি যে একটা সুনিশ্চিত জোরের দীপ্তি ফুটে বার হ'তে থাকে যে মনে হয় যেন ও জীবনের মানে খুঁজে পেয়েচে। শিক্ষাদ্বারা নয়, অনুভব উপলব্ধি দিয়ে নয়, যেন চোখ দিয়ে অর্থটাকে সোজা দেখতে পাচ্ছে।"

Tanner যখন কথা বলে, তার মধ্যে প্রকাশ পায় একটা কৌতুক ও প্রচ্ছন্ন উপহাসের ভঙ্গী, তাই তার কথাগুলো bravodo ব'লে ধারণা করা বরং স্বাভাবিক ;—অমিতর রবীন্দ্রনাথকে গালাগালি দেওয়ার মধ্যে বরং bravodo-র পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু কমলের আলোচনায় কখন এভাব প্রকাশ পায়নি। সব সময়েই দেখা যায় ওর এই তর্কের মধ্যে যেন ওর জীবন মরণের সমস্যা নির্ভর কর্‌চে—এমনি আন্তরিকতা ও সুনিশ্চিত জোরের সঙ্গে ও কথা বলে। অনেকে অভিযোগ তুলেচেন, উপন্যাসের ঘটনাগুলোর সমাবেশ এমনভাবে করা হ'য়েচে যাতে কমল সুযোগ পায় কূটতর্ক কর্‌বার। কিন্তু এঁরা আখ্যানভাগের আবহাওয়া ও আবেষ্টনের সত্যিকার রূপটি ঠিক ধর্‌তে পারেন না, তাই এই ভুল ধারণা জন্মায়। অক্ষয় সনাতন আদর্শ ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে অটুট রাখবার জন্যে আগ্রহ ও আন্তরিকতায় কারো চেয়ে হীন নয়, হোক্ সে রূঢ়, অভদ্র এবং অত্যন্ত অশিষ্ট। হরেন্দ্র একটা আদর্শকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত কর্‌বার জন্যে পরম আগ্রহে চেষ্টা করচে। অগাধ শক্তির মালিক হ'য়েও আশুবাবুর জীবনযাপন লঘু ও ভাসাভাসা নয়,—তিনি জীবনের মূল সত্যটির সন্ধানে কারো চেয়ে কম ব্যগ্র নন্। এদের সকলের এতদিনের অভিজ্ঞতার সংস্কার এবং ধারণার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ালো কমল তার মতামত, আচরণ এবং জীবনের সত্যটিকে সন্ধান কর্‌বার জন্যে দুর্দম আন্তরিকতা নিয়ে। এই অবস্থায় এদের মধ্যে দেখা হলেই তর্ক উঠা কিছু অস্বাভাবিক নয়। আশুবাবুরা

যদি সাধারণ হ'তেন বা জীবনের মূল সত্যের সম্বন্ধে উদাসীন হ'তেন অথবা কমল যদি শুধু চমকপ্রদ কিছু বলবার জন্তেই কথা বল্‌তো বা ওর মতামত এবং আচরণে যদি অটুট বিশ্বাস ও দৃঢ়তা প্রকাশ না পেত ত' তর্ক দু'একদিনেই নিঃশেষ হ'য়ে যেত,—মীমাংসার জন্তে এমন ব্যগ্রতা, এমন নাছোড়বান্দাভাব কোন ক্রমেই প্রকাশ পেতো না।

কমল cynic নয়। জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে সে একটুও সংশয়ী নয়। জীবনের পরে ছিল না তার তীক্ষ্ণ, শ্লেষাত্মক, ত্রুটিসন্ধানী দৃষ্টি। বরং কমলচরিত্র ঠিক এর বিপরীত। প্রাচীন যা কিছু তার পরেই কমলের প্রবল বিতৃষ্ণা, অদৃষ্ট ও মানে না, অতীতের স্মৃতি ও সংস্কারের মোহ ওর নেই বটে কিন্তু তথাপি অনাগত ও ভবিষ্যতের স্বপ্নে ও বিভোর। জীবনের কিছুই ও সংশয়ীচিত্তে ত্যাগ কর্‌তে চায় না, প্রতিমুহূর্ত্তটি ও একান্তভাবে ভোগ কর্‌তে চায়। কমলের কাছে জীবনের ভোগ মানে সুখের নিশ্চিন্ত আরাম নয়,—গতির আনন্দ,—"চ'লে যাওয়ার ছন্দটুকু"র অনুভূতি। জীবন এবং মানব সভ্যতার অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ওর অন্তর আশা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। ধ্বংস সে চায়,—কিন্তু নতুন সৃষ্টির সূচনার জন্তে। বিপ্লবের দুঃখে আশুবাবু অধীর হ'লে কমল শেষদিনে জবাব দিয়েছিলো, "দুঃখকে ভয় কর্‌চেন কাকাবাবু, তারই ভেতর দিয়ে আবার তারও চেয়ে বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে, আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হ'বে, সেই মৃত দেহের সার থেকে তার চেয়ে মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে। এমনি ক'রেই সংসার শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই তো মানুষের মুক্তির পথ।" জীবনের অভিব্যক্তির গতি সম্বন্ধে যার এরূপ ধারণা তাকে cynic কোনক্রমেই বলা যায় না।

কমল যতই কঠোর হোক, আত্মসুখ সর্ব্বস্ব, মায়া মমতাহীন পাষাণী নয়। যে কমল পীড়িত শিবনাথ সম্বন্ধে আশুবাবুর ব্যবস্থা শুনে বৃদ্ধের সানুনয় অনুরোধ সত্ত্বেও অবাধে অত্যন্ত চোখা চোখা জবাব দিয়ে এসেছিলো, সেই কমল পাঞ্জাবীবাবুদের তত্ত্বাবধানে শিবনাথের দুরবস্থা দেখে আর স্থির থাকতে পারেনি। রাজেন যখন বল্‌লে "ঝাঁটা কি করবেন? ওকে পিটবেন নাকি?" কমল গম্ভীর হ'য়ে উত্তর দিয়েছিলো, "একি তামাসার সময়? মায়ামমতা কি তোমার শরীরে কিছু নেই?" তাছাড়া, নারীসুলভ সেবা ও যত্নে সে অদ্বিতীয়। যে তার কাছে এসেচে সে-ই হরেন্দ্রের সঙ্গে একমত, "সেবায় যেন লক্ষ্মী।" এ-বিষয়ে কমলের তুলনা একমাত্র নীলিমাতে পাওয়া যায়। অজিত ও হরেন্দ্রকে অতি যত্নে খাওয়ানর কথা ছেড়ে দিই, মোটা বালাপোষখানা দিয়ে আশুবাবুর পা ঢেকে দেবার পর আগন্তুকের' পরে বৃদ্ধের যখন দৃষ্টি পড়্‌ল, তখন তার অভিভূত অন্তর থেকে এই কথাই অতি সহজে বেরিয়ে এসেছিলো, "তাই তো বলি, একি যোদোর হাত! এমন কোরে পা ঢেকে দিতে তো তার চোদ্দ পুরুষে জানে না।"

কমল আত্মসুখসর্ব্বস্ব নয়। তার গতিবিধির মধ্যে আছে একটা নীরব মিতাচার, নির্দ্বন্দ্ব সংযম। পরিচ্ছদ তার অতি সাধারণ—বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে সে প্রায় হেঁটেই চলাচল করে। সে একবেলা খায় নিরামিষ। চাল, ডাল আর আলু এই ওর রাজভোগ। নিমন্ত্রণ ক্ষেত্রে নীলিমার উপরোধ অথবা শিবনাথের রোগশয্যার পাশে রাজেনের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও কমলের খাওয়া সম্বন্ধে এই যে কঠোর নিয়ম-পালন,—অনেকের মনে হয় তা' অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। কমলের যৌন জীবন সম্বন্ধে মতবাদ এবং আচরণ যাঁদের সংস্কার বোধে আঘাত করে, তাঁরা খাওয়া সম্বন্ধে এই কঠোর নিয়মপালনের মূলকথাটি বুঝতে পারেন না। যে ব্যবস্থা পালন করবার জন্তে একবার গ্রহণ করা হ'য়েচে, কষ্ট সহ্য ক'রেও তা' অক্ষুণ্ণ রাখার মত শৃঙ্খলাবোধ কমলের চিত্তে ছিল। কমল দরিদ্র, জীবনে বার বার অনিশ্চিতের সঙ্গে যুদ্ধ করার দরুণ দরিদ্রের মত আহারের ব্যবস্থাই ও কায়েম করে নিয়েছিলো। জীবনে এর চেয়ে বেশী ভোগের অবসর কেন ঘটেনি, এ অভিযোগ সে করেনি। তার চরিত্রের মধ্যে ছিলো একটা নিরাসক্তির ভাব—একটা নির্ব্বিশঙ্ক তিতিক্ষা। ক্ষণস্থায়ী প্রেম এবং দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে সে যত অদ্ভুত মতই প্রচার করুক না কেন, তার মনের সহজ গতি ascetic। Tanner বা Devil's Disciple-এর চরিত্র ঠিক এমনি ascetic—যতই কেননা তাদের মতবাদ

cynicism-এ পূর্ণ থাকুক। মনে হয়, এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের নিজের চরিত্রই সম্পূর্ণ দায়ী। "চরিত্রহীন" থেকে আরম্ভ ক'রে "শেষপ্রশ্ন" পর্য্যন্ত কথাশিল্পী যতই কেননা বিপ্লবের বাণী ঘোষণা করে থাকুন, মনে হয় তার চরিত্রের সহজ গতি ascetic। তাই তার মানস-মেয়েরা—সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, অলকা প্রভৃতি সকলেরই চরিত্রের ভিত্তিমূলে আছে, জীবনের পরে গভীর নিরাসক্তি। এ বিষয়ে বার্ণাড শ'এর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখা যায়। শ'র কোন সমালোচক ব'লেচেন, "Mr. Shaw throws morality overboard, frankly proclaims himself an anarchist and bids us give free expression to the instinctive life-force within us; while all the time his ascetic temperament and intellectual tastes show very clearly that he is an immoralist and an anarchist simply because he happens to be the most moral of men and the most orderly and has no personal need of rules and conventions to make him a highly useful member of society. Shaw's life-force is not tempestuous, elemental, but a finely austere tendency that makes for righteousness." এই কথাগুলির মধ্যে Mr. Shawএর পরিবর্ত্তে কমল এবং life forceএর স্থানে "জীবনের সত্যরূপ আনন্দের রূপ" লিখলে কোন অসামঞ্জস্য বা অসত্য হবে ব'লে মনে হয় না।

কমল সামাজিক অনুষ্ঠান মানে না; কারণ, তাহার সংযমশীল জীবনে অনুষ্ঠানের কঠোর বন্ধনের কোন আবশ্যকতা নেই। তাহার মতামতের বাক্যগত অর্থ ধরলে অনেক সময়ে হ'য়ে পড়ে তা' স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর অথবা উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য—যা দিয়ে কোন সমাজ গঠন করা একেবারে অসাধ্য এবং অসম্ভব। কিন্তু বাস্তব জীবনে সে একটুও স্বেচ্ছাচারী নয়। লঘুচিত্তের অবাধ খেয়াল চরিতার্থ করাই তার জীবনে চরম কামনা নয়। নিজের অসংযত উদ্দাম বাসনার পরিতৃপ্তির জন্যে কারো সংসারে সে আগুন জ্বালেনি, না-বা কখন আবিলতার মধ্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েচে। একটা সহজ, স্বাভাবিক সংযম এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা তার জীবনের গতিবিধিকে বরাবর চালিত করে এসেচে।

* * *

কিন্তু উপন্যাসে নায়িকাচরিত্রের পূর্ণ অবয়ব ফুটে উঠলেই তাকে জীবন্ত বলা যায় না। চরিত্রে প্রাণময়তার সৃষ্টি করে আপন অন্তরের দ্বন্দ্ব। কমলের emotion ও intellectual জীবনের,—তার বাস্তব এবং ভাবজগতের এই পূর্ণ আলেখ্য স্বচ্ছ, সুন্দর এবং সাবলীল হলেও কমলচরিত্রের "Womanly woman"এর অনবদ্যরূপ ফুটে উঠেচে তার অন্তরের দুর্ব্বিষহ দ্বন্দ্বে। এই দ্বন্দ্ব যেখানে ওর জীবনের মূলধারা অর্থাৎ intellectual জীবনে ঘটেনি, ঘটেছিল emotional জীবনে। কথাশিল্পী যদি ওর এই দ্বন্দ্ব হৃদয়ে না জাগিয়ে intellectual জীবনে জাগাতেন, তাহলে কমলকে মনে হত একটা অনুভূতিহীন, চিন্তাসর্ব্বস্ব প্রাণী ব'লে। কিন্তু তা' করা হয়নি ব'লেই শিল্পীর রূপায়নে যে কমল ফুটে উঠেচে, তার প্রতি আমাদের অন্তরের দরদ আকর্ষিত না হয়ে পারে না। একদিকে শিবনাথের প্রতি স্বামীপ্রেম,—যার মধ্যে ছিল কর্ত্তব্যের বন্ধন; অপর দিকে অজিতের প্রতি নব অনুরাগ, যার মধ্যে ছিল চিত্তের দুর্দ্দম্য আবেগ। অজিতের প্রতি ভালবাসা প্রথম স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে কমলের সেই জোর ক'রে নিরন্তর মোটরে এগিয়ে যাবার ব্যগ্রতা দেখে। সেই প্রথমদিনের কথাবার্ত্তাতেই ওর অন্তরের এই অপরিসীম বিরোধের ব্যথা প্রকাশ হয়ে পড়েচে। নূতন আসনখানি অজিতকে পেতে দিয়ে কমল বলেছিল, "বসুন। কিন্তু কি বিচিত্র এই দুনিয়ার ব্যাপার অজিতবাবু। সেদিন এই আসনখানি পছন্দ ক'রে কেনবার সময়ে ভেবেছিলাম একজনকে বসতে দিয়ে বলবো, কিন্তু সে তো আর একজনকে বলা যায় না অজিতবাবু—তবুও আপনাকে বসতে তো দিলাম। অথচ কতটুকু সময়েরই বা ব্যবধান।" এ যেন অজিতকে কথা বলা নয়,—এ ওর সংশয়ক্ষুব্ধ চিত্তের নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করা। ওর হৃদয়ের যে পদ্মাসনে পূর্ণ অধিকার একমাত্র শিবনাথের, সেখানে আজ সৃষ্টি হয়েচে অজিতের স্থান। ওর চিত্তের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে ও নিজেই বিস্মিত। শিবনাথ বর্ত্তমানে অজিতের

প্রতি এই নব-অনুরাগ,—এ যে ভালবাসার অপব্যবহার,—এ যে মস্তবড় অকর্ত্তব্য, সে বিষয়ে কমলের সংশয় ছিল না। পরের দিন অজিতকে সযত্নে খাওয়ানোর সময় এই কথা নিজেই সে বলেছিল, "এই যে শিবনাথের আসনে এনে আপনাকে বসিয়েছি, ভালবাসার এই অপব্যবহারের মধ্যে আমি আনন্দ পেতাম কোথায়? এই যে সারাদিন অভুক্ত থেকে কত কি বসে বসে রেঁধেছি,—আপনি এসে খাবেন বলে, এত বড় অকর্ত্তব্যের ভেতর আমি তৃপ্তি পেতাম কোথায়?" তবুও অন্তরের গোপন আসন থেকে অজিতকে কিছুতেই তাড়াতে পারেনি। নিষ্ঠুর প্রজাপতির মায়াজাল মানুষকে যুগে যুগে এমনি ভাবেই অন্ধ ক'রে তোলে। আবার এদিকে নব-অনুরাগের আবেগে শিবনাথের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করাও কমলের মত চরিত্রের সাধ্য নয়। যদিও ওর মনে সন্দেহ এসেছিল যে "শৈববিবাহের শিবাণীর মোহ বোধ হয় তাঁর কেটেছে," তবু শিবনাথের পক্ষ থেকে শেষ-নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীর কর্ত্তব্য থেকে সে বিচলিত হয়নি। কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও প্রেমের মধ্যে এই তীব্র দ্বন্দ্ব আখ্যানধারার শেষ পর্য্যন্ত কমলকে দুঃসহ ব্যথা দিয়েচে।

কমল যে জীবন্ত নারী, তার আরো বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় শিবনাথের পরিত্যাগ ব্যাপারে। শিবনাথের এই জঘন্য মিথ্যাচারের পর কমলের মুখে বার বার ঔদাসীন্য প্রকাশ এবং কৌতুক প্রশ্ন শুনে অনেকেই মনে করেন, এই ঔদাসীন্য কমলচরিত্রেই শোভা পায় কারণ, রক্তমাংসের তৈরী, উপেক্ষিত নারীর পক্ষে তা' সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু ওর কথাবার্ত্তাগুলো সবিশেষ বিচার করলে দেখা যায়, কমলের সেই তথাকথিত ঔদাসীন্যের মধ্যে লোকচক্ষুর অগোচরে কি নিদারুণ ব্যথা আর তা' দমন করার জন্যে কি প্রাণপণ চেষ্টাই না ফুটে উঠেচে! অজিতের দৃষ্টিতে অবশ্য তা ধরা পড়েনি। সে আশ্চর্য্য হয়ে ভেবেছিল, "মুখের পরে না ফুটিল বেদনার আভাস, না আসিল অভিযোগের ভাষা। এত বড় মিথ্যাচারের সে কিছুমাত্র নালিশ পরের কাছে করিল না।" কিন্তু কমলের অন্তরের অন্তস্তলে যে গভীর অভিযোগ মুখর হয়ে উঠেছিল, তা পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। রাজেন্দ্র চলে গেলে শিবনাথের (অবশ্য রোগের ভাণমাত্র) সঙ্গে কথাবার্ত্তায় উপেক্ষিত, অকারণ পরিত্যক্ত, স্নেহদুর্ব্বল স্ত্রীর মর্ম্মের গোপন অভিযোগ কি বার বার প্রকাশিত হয়ে পড়েনি? শিবনাথ যখন বললে, "কাজের ঝঞ্ঝাটে ব্যবসার খাতিরে দিনকতক একটা আলাদা বাসা করলেই কি ত্যাগ করা হয়?" তখন শিবনাথকে জোর করে থামিয়ে দিয়ে কমল বলেছিল, "থাক, থাক, ও আমি জানতে চাইনি।" "কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজের উত্তেজনায় নিজে লজ্জা পাইল।" কথাশিল্পী এই সামান্য কথার মধ্যে ওর মনের দুর্ব্বিষহ দ্বন্দ্বকে অপরূপভাবে প্রস্ফুট ক'রে তুলেচেন। ওর যদি কোন অভিযোগ,—কোন বেদনা না থাকত, ত' হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠত না। এবং অন্তরে আপন প্রবলবুদ্ধির দ্বারা যদি হৃদয়ের বেদনাকে দমন করার চেষ্টা না চলত, ত' হঠাৎ এই উত্তেজনা প্রকাশে ও লজ্জিত হয়ে পড়ত না। এর পরে মনোরমাকে নিয়ে শিবনাথের পলায়নের কথা যখন ও হরেন্দ্রের মুখে শুনলে, তখন ওর কথাবার্ত্তায়ও এই দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। প্রথমে কৌতুক প্রশ্ন, তারপর মনের আবেগে ব্যাকুলভাবে নিজের ঔদাসীন্য প্রকাশ এবং পরমুহূর্ত্তেই 'নির্ম্মল, প্রশান্ত হাসি'হাসা,—এই একই সঙ্গে বার বার অবস্থান্তর কি গভীর বিক্ষোভের পরিচয় নয়? স্থানাভাবে নানা পরিচ্ছেদ থেকে কমলের কথাবার্ত্তা উদ্ধৃত করতে পারলুম না। উপন্যাসের প্রথমে শিবনাথকে হারাবার দিনে বিচ্ছেদ খুব সহজেই হবে বলে যতই কমল উগ্রমত প্রকাশ করে থাকুক, বাস্তবজীবনে যেদিন সত্যি সেই মুহূর্ত্ত এল, তখন এ ঘটনা যে "জল হাওয়ার মত" সহজ হয়ে উঠতে পারেনি, তা নিঃসন্দেহ। কমল মর্ম্মে মর্ম্মে একথা উপলব্ধি করেছিল। চিত্তের এই নিদারুণ বেদনা সত্ত্বেও যে ও কারো কাছে উচ্ছ্বাসের সহিত অভিযোগ নিবেদন করেনি, এর মধ্যে মনে হয় কমলের মত সবল, হৃদয়াবেগদমনে পটু, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী চরিত্রের সুসঙ্গতি রক্ষিত হয়েচে। অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে, কমলের কথাও কাজের মধ্যে,—মতামত এবং আচারের মধ্যে এই যে গরমিল, এতে কি ওর চরিত্র রূপায়নে অসঙ্গতি (Inconsistency) এসে পড়েনি। এই অসঙ্গতি আছে বলেই

ওর চরিত্র-রূপায়নে illusion of realityর পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের ভাবপ্রচারের মোহে (যদি এ অভিযোগ সত্য হয়) দক্ষ রূপকার যে আপনাকে ভুলে যাননি, এইখানেই তার যথার্থ প্রমাণ। মনে হয়, শরৎচন্দ্র অতি-আধুনিক গভীর-মনের মূল সূত্রটি যথার্থ ভাবেই ধারণা করতে পেরেছেন। অতি আধুনিক মন বুদ্ধিকে জীবনধারার একমাত্র সম্বলরূপে যতই আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করুক, তবু হৃদয়াবেগকে জীবন থেকে কিছুতেই মুচে দিতে পারে না। এমন কি বুদ্ধির শাসনের বিরুদ্ধেই একদিন Tanner ও (কমলের চেয়ে সে প্রখর বুদ্ধিশালী, সে "Superman") Ann-এর সযত্নরচিতজালে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির এই দুর্জ্ঞেয় ভাগকে B. Shaw উপেক্ষা করতে পারেননি, "Life-force" বলে নূতন নামকরণ করেছেন মাত্র।

বিকশিত, সূক্ষ্ম অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে নিরন্তর চলে হৃদয় ও বুদ্ধির ঘাত প্রতিঘাত। এদের কোন একটিকে মাত্র একান্তভাবে আশ্রয় ক'রে মানুষ জীবনের দুর্গম পথে এগিয়ে যেতে পারে না। এই দ্বন্দ্বই মানুষের মধ্যে মনস্তত্ত্বের জটিলতা সৃষ্টি করে—মানুষের কথা ও কাজের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটিয়ে দেয়। কমলচরিত্রে বরাবর এই দ্বন্দ্বের মূর্ত্তি অতি সুন্দর-ভাবে প্রকট হয়ে উঠেচে। দাম্পত্যজীবনে অতি স্বাধীনতার উগ্রবাণী কমল প্রথমদিকে যতই কেন না ঘোষণা করে থাকুক, শেষের দিকে অজিতকে সে বলতে বাধ্য হয়েছিল, "জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ তোমার দুর্ব্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, অত নিষ্ঠুর আমি নই।" অনেকে এই কথার ব্যাখ্যা করে বলেচেন, * দুর্ব্বলচিত্ত অজিতকে সবলচিত্ত কমল গ্রহণ করল খানিকটা যেন তার প্রতি করুণা বশতঃই। কিন্তু তাঁরা কমলের প্রেমের সত্যরূপটি ধরতে পারেন নি। এই কথাগুলির মধ্যে ভক্তের প্রতি দেবীর করুণা নেই, আছে প্রেমের চরণে রমণীর নিঃশেষে আত্মদান। তা না হলে পরক্ষণেই বলতে পারত না, "ভগবান তো মানিনে, নইলে প্রার্থনা কোরতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই একদিন যেন আমি মরতে পারি।" কিন্তু এ ওর প্রেমাকুল হৃদয়ের কথা। এর মধ্যে ওর বুদ্ধির সম্মতি নেই। এই পরম মুহূর্ত্তেও ওর বুদ্ধি জীবনের বাস্তবরূপটির প্রতি অন্ধ হয়ে যায়নি। তাই হরেন্দ্র যখন বললে, "এতদিনে আসল জিনিষটা পেলে কমল, তোমাকে অভিনন্দন জানাই।" তখন ওর কণ্ঠে 'দ্বিধাহীন, পরম নিঃসংশয়' সুরটি বাজেনি। ও জবাব দিয়েছিল, "পেয়েছি? অন্ততঃ সেই আশীর্ব্বাদই করুন।" এই যে ক্ষণে ক্ষণে সঙ্গতিহীন (inconsistent) কথাবার্ত্তা, এর কারণ হচ্ছে ঐ বুদ্ধি ও হৃদয়ের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। সেই কথাটি যদি আমরা মনে রাখি, তাহলে কমলের কথাবার্ত্তার যথাযথ অর্থ ধারণা করা সহজ হবে এবং ওর চরিত্রের এই স্বাভাবিকতার জন্যে কথাশিল্পীর প্রশংসা না করে থাকতে পারব না।

তাছাড়া, আখ্যানধারার শেষভাগের কমল আর পূর্ব্বেকার কমল এক নয়। পূর্ব্বে জীবনকে বুদ্ধি দিয়ে আঁকড়ে ধরার যে উগ্রচেষ্টা দেখা গেছল, তা অভিজ্ঞতা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। শেষের দিকের কমল তেমন আর দ্বিধাহীন, নিঃসংশয়চিত্তে মতামত প্রকাশ করতে পারেনি। যে সব তত্ত্ব পূর্ব্বে সে অকাট্য বলে জাহির করেছিল, এই শেষভাগে সেই সব তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে সে বার বার ব্যবহার করেচে "উচিৎ,"—"অন্ততঃ এই আমি কামনা করি" ইত্যাদি। পূর্ব্বে বুদ্ধির যে প্রখর দীপ্তি দেখা গেছল, তা শেষের দিকে স্তিমিত হয়ে এসেচে হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে। তাই মনে হয়, কমলচরিত্র Static নয়, পরিবর্ত্তনশীল, জীবন্ত। উপন্যাসের চরিত্র নানাদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে পরিবর্ত্তিত হবে, এই হচ্চে কথাশিল্পের চরিত্ররূপায়নের মূলকথা। কমলচরিত্রে আমরা এদিক থেকে বিশেষ কোন ত্রুটি পাই না।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

* বিচিত্রা, ফাল্গুন ১৩৩৯

বন্দিনী

শ্রীআশীষ গুপ্ত

পিতামাতার, আত্মীয় স্বজনের আদরিণী কন্যা,—অত্যন্ত মধুর স্বভাবের বলিয়া নহে, তিন ছেলের পর পৃথিবীতে আসিয়া কেমন করিয়া যেন সহসা তাহার মর্যাদা বাড়িয়াছে !

বছর দশেক তাহার বয়স, কিন্তু, দুরন্তপনা নয় শয়তানিতে তাহার জুড়ী মেলা ভার। মুখখিস্তিতে সে গ্রাম্য ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোককে অনায়াসে টেক্কা দিতে পারে, এত বড় বাহাদুর মেয়ে জয়া !—কৃষ্ণবর্ণ স্থূল আকৃতি, দেখিলে মনে হয়, আহা সংসারে আসিয়া ইহারাই ভূম্যধিকারী হইল বটে,—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যতখানি জায়গা জুড়িয়া থাকা যায়, ততখানিই মঙ্গল !

পয়লা নম্বরের সংবাদ-সরবরাহক এই জয়া। একজনের নামে নির্জলা মিথ্যা কথা অন্যের কাছে এমন অনর্গলভাবে ঢোঁক না গিলিয়া সে বলিতে পারে যে, চিন্তা হয় এ মেয়ে কি তাহার পিতামাতার কপালে বাঁচিবে ! জয়াকে কিছু বলিলে, হাসিয়া বলে, "মাইরী বল্‌ছি, গপ্পো করতে আমার বড্ড ভালো লাগে !"

এমনিতর মেয়ে এই জয়া,—পৃথিবীতে সে সেনাপতির উর্দ্দি পরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে

—তিন বছর বয়সে জয়া তাহার দাদা মিহিরকে বলিল, "ডু্ক, রাচ্‌কেল,"—পাঁচ বছর বয়সে মাতাকে ডাকিল, "হারামজাদী বদ্‌মাইস"—সাত বছরে কাকা, মামা মাসী পিসিদের কহিল, "ইষ্টুপিট্‌ গাধা,"—নবম বর্ষে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শূয়ারকা বাচ্চা !"—এখন তাহার বয়স দশ বছর।

জয়ার সমস্ত কাজ একেবারে সময় বাঁধা,—সাড়ে সাতটার সময় সে ঘুম হইতে ওঠে,—[illegible] গোগ্রাসে প্রথমেই কড়কড়ুয়া বাসী ভাত তরকারী [illegible] করে। তাহার পর খায় চা, খাতায় ভাজা আটা [illegible]—অবশেষে ভোজন করে মুড়ি, নারিকেল এবং গুড়। প্রাতরাশ সাঙ্গ করিয়া জয়া ভ্রমণে বাহির হয়।

সে মুখ ধোয় না, দাঁত মাজে না,—তাহার নিকট হইতে হাত দশেক দূরে বসিয়াও চোখ বুজিয়া টের পাওয়া যায়, জয়া হাজির,—এমনই দিগন্তপ্রসারী তাহার দাঁতের এবং গায়ের সুগন্ধ ! পাড়ার একটি মেয়ে টাট্‌কা টাট্‌কা মহাভারত পড়িয়া তাহার নামকরণ করিয়াছে যোজনগন্ধা।

জয়া দশটার সময় বেড়াইতে বাহির হয়, একটার সময় বাড়ী ফেরে। বাড়ী ফিরিয়া সে একপো চালের ভাত খায়,—আহারের পর জয়ার আধঘণ্টা বিশ্রাম,—বিশ্রাম শেষে সে আবার বাহির হইয়া যায়।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া সে গা ধোয়, মুখের বাহিরটায় ক্রীম মাখে, বাঁদিককার কানের ইঞ্চি দেড়েক উপরে সিঁথি পাড়ে, ফ্রক পরে, স্কিপির রোপ্‌ হাতে করিয়া বাহির হয় সান্ধ্য বায়ু সেবনে।

রাত্রি নয়টার সময় জয়া বাড়ী ফেরে, রাত্রি এগারোটা অবধি সে তাহার গালাগালি চালায়, এগারোটা হইতে সকাল সাড়ে সাতটা পর্যান্ত সে ঘুমায়

জয়ার একটা মস্ত গুণ আছে,—দিবারাত্র প্রসন্নমুখে থাকিতে ভালবাসে।—তাহার বড়দাদা মিহির সেদিন তাহাদের সদর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। পিছন হইতে আসিয়া জয়া তাহাকে দিল এক ধাক্কা, মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়া মিহির তাহাকে দিতে লাগিল অশ্রাব্যভাষায় গালাগালি। কোমরে দুইহাত দিয়া জয়া প্রথমে খানিকটা হো হো হি হি করিয়া হাসিল, শেষে কহিল, "শূয়ারকা বাচ্চা—"

জয়া ফেমিনিষ্ট, স্ত্রী-পুরুষের সম-অধিকার সে বক্তৃতার সাহায্যে নয় কার্য্যের দ্বারা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জয়ার দাদা মিহির বিখ্যাত পুরুষ, কিন্তু জয়ার খ্যাতির তুলনায়

তাহা কিছুই নয়। তাহার মায়ের কপালের উপরকার তিনটা কাটা দাগের মধ্যে দুইটার জন্য দায়ী জয়া, একটার কৃতিত্ব মিহিরের,—চোখের উপরের বড় দাগটার জন্য জয়ার দাবী অনাপত্তিক।

জয়া একখানি থিয়েটার সঙ্গীত গাহিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল নৃত্য। কোমর বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া জয়া বলে, "এই হ'ল নটরাজ—"

অকস্মাৎ তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলে, "এই হ'ল সাগর নৃত্য—"

দুইহাত ঘুরাইয়া গান গায়,—থিয়েটারের রঙ্‌দার গান! দেখিয়া শুনিয়া মাতা কহিলেন, "জয়ী, ওই রসের গানগুলো এত শীগ্‌গিরই আরম্ভ করিস্‌নে, আরও কয়েকটা দিন যাক্—"

জয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া চোখ পাকাইয়া ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া ঠোঁট উল্‌টাইয়া কহিল, "চোপ,—" সঙ্গে সঙ্গে ঠাস্ করিয়া মানদার গালে লাগাইল এক চড়। নিদারুণ ক্রোধে মানদা যেন একেবারে দিশাহারা হইয়া গেলেন। কন্যা খিল্‌খিল করিয়া হাসিল, বলিল, "আমার মাথা খারাপ, কখন কি করে' বসি তার ঠিক নেই—"

মানদা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হারামজাদী, বার করছি তোমার বদমায়েসী,—যত না কিছু বলি তত—" বলিয়া জয়াকে ধরিবার জন্য তাড়া করিয়া আসিতেই, সে ছুটিয়া গিয়া কুরুণীটা তুলিয়া লইয়া মানদার দিকে ছুড়িয়া মারিল,—চোখের উপরকার বড় দাগটা তাহারই।

সংসারে জয়া যেন সম্রাটের মত বাস করিতেছে, তাহার হাতের জোরে, তাহার জিভের জোরে। প্রথম দর্শনেই যে কোনও লোকের মনে হওয়া স্বাভাবিক, এ মেয়ে সর্পজাতীয়া, ভাবে, ভাষায়, আচরণে। পথের ধারে বিকলাঙ্গ গলিত দেহ বীভৎসদর্শন কুষ্ঠীকে দেখিলে যেমন একটা অসাধারণ জুগুপ্সার আবির্ভাব হয়, জয়ার কথা শুনিলেও সকলের ঠিক তেমনই একটা ঘৃণার উদয় হইত। ওইটুকু মেয়ে, অথচ তাহার আচরণের মধ্যে কোথাও শৈশবের মাধুর্য্যের লেশমাত্র নাই। খুব একটা কুৎসিত ইতর মানব জয়ার মধ্যে জাগিতেছে, এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জাগিতেছে। কিন্তু তবু তিন ছেলের পর অতিপ্রার্থিতা কন্যা—মাতা বলেন, "শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে জয়ী আমার বেঁচে থাক্—"

পিতা বলেন, "আহা তাই হ'ক—"

মাসী, পিসি, মামীরা বলেন, "কিই বা বয়েস, বড় হ'লেই শুধরে যাবে—"

কাকা, জ্যেঠা, মামারা বলেন, "একটু কড়া শাসন করলেই ঠিক সায়েস্তা হ'য়ে যাবে, তবু থাক্ ঘর জুড়ে—"

জয়াদের বাড়ীটাকে দেখিলে মনে হয়, নরককুণ্ডের অবস্থা এরূপ হইলে সেখানে যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবার পক্ষেই ত্যাগ করা ভালো।

সেদিন মানদার গলার হার বাক্সের মধ্য হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। জয়া বলে, "ওই শূয়ারের বাচ্চা মিহির নিয়েছে।"

মিহির বলে, "ওই শয়তান শাঁকচুন্নীর কম্মো এ,—আমি যদি না ওকে পুলিশে দিই ত আমার নামই নয়—"

দাঁতে দাঁত ঘসিয়া ব্যাকরণ অগ্রাহ্য করিয়া জয়া বলে, "দিস্‌লো দিস্, জেলে যাবার আগে তোর মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাব—"

মিহির লাগিল অনুসন্ধানের কাজে।—সূক্ষ্মবুদ্ধি, টিক্‌টিকির চাকরীতে মিহিরের উন্নতি কোন বড়বাবুরও ঠেকাইবার সাধ্য নাই!

বহু ভয়প্রদর্শনের পর স্যাকরা স্বীকার করিল, জয়ার কাছ হইতে হার সে পঞ্চাশ টাকায় কিনিয়াছে।—জয়াকে জিজ্ঞাসা করায় সে পুনরায় ব্যাকরণ তুচ্ছ করিয়া, তাণ্ডব নাচ সুরু করিয়া দিল। কিন্তু টাকা কি করিয়াছে কিছুতেই প্রকাশ করিল না।

সেদিন মিহির সমস্তদিন নিজের কৃতিত্বে নাচিয়া বেড়াইল। মিহিরের বয়স ষোল, তাহার ধূমপানের অভিজ্ঞতা এই পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

সিক্সথ্ ক্লাসে পড়িতে পড়িতে সে স্কুল ছাড়িয়াছে আজ অনেকদিন,—লোকে জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীর মুখ করিয়া বলে, "ফাষ্ট্ কেলাসে পড়ি, সেকেণ্ড কেলাস থেকে উঠেছি ফাষ্ট হ'য়ে।"

মিহির শিষ দিয়া গান গায়,—অপেরার চুটকি গান, বায়স্কোপের ইংরেজী গান। ঘাড় কামাইয়া বারো আনা চার আনা চুল ছাঁটে, রাস্তায় রাস্তায় বায়স্কোপের হাণ্ডবিল বিলাইয়া বেড়ায়, কথায় কথায় বলে, "আরে ম্যান টেক্ ইট ফ্রম্ মী—"

আবার কিছু পরেই বলে, "O. K"

সুর টানিয়া বলে, "ও-ও-ও কে-এ-এ—"

আবার কখনও বলে, "ও কে-এ-এ-এ—"

ভঙ্গী বদলাইয়া বলে, "ও-ও-কে-এ-এ—"

রাত্রিতে বাড়ী ফিরিবার সময় মিহির প্রায়ই কোন বইয়ের দোকান হইতে একখানা এম-এ অথবা ল-এর পাঠ্য পুস্তকের তালিকা চাহিয়া লইয়া ডান হাতের দুই অঙ্গুলে ঝুলাইয়া সজোরে হাত দুলাইতে দুলাইতে বাড়ী ফেরে।—মিহির যে জয়ার উপযুক্ত ভাই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জয়ার কাকা অপুত্রক। বিবাহ করিয়াছিলেন, স্ত্রীটি তাঁহাকে বিচ্ছেদবেদনায় কাতর করিয়া মারা গিয়াছেন, এখন তিনি কতকটা সামলাইয়া উঠিয়াছেন। পত্নীর মৃত্যুর পর মণীন্দ্রনাথ কবিতা লেখার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—নাম দিয়াছিলেন, বজ্রাহত তালবৃক্ষ। কিন্তু ওই পর্যান্তই,—ভদ্রলোকের মাথা এত নিরেট যে পত্নী বিয়োগের মত এমন একটা রসাল ঘটনাও তাঁহার কবিতা রচনার মূলে বিন্দুমাত্র রস জোগাইতে সমর্থ হ'ল না। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুতে কয়েকটা বাংলা অক্ষর কোন গতিকে পাশাপাশি সাজাইতে না পারিলেও জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্রকন্যাদের সম্বন্ধে তাঁহার একটা স্নেহসূচক দৌর্ব্বল্য ছিল। অঙ্ক কষিয়া, কোন রকম নিয়ম কানুনের প্যাঁচে ফেলিয়া ইহার হেতু নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে,—কারণ সর্ব্বপ্রকারে অপদার্থ এই গৃহের লোকগুলার প্রতি প্রকৃতই তাঁহার অহেতুক সহানুভূতির সীমা ছিল না।

তিনি ভালো চাকরী করেন এবং মেসে আলাদা বাস করেন।

বেলা প্রায় দশটার সময় মণীন্দ্রনাথ দরজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই, জয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে আবদার করিয়া বলিল, "কাকা একটা পয়সা—"

জয়া যখন আবদার করিয়া কথা বলে, তখন সেটা সবাক চিত্রে দেখিবার এবং শুনিবার জিনিস হয়। তাহার কুৎসিত মুখখানা কার্য্যোদ্ধারের আশায় একটা বিচিত্র রসে রূপান্তরিত হইয়া যায়,—অঙ্কশাস্ত্রের বাংলা পাঁচের ন্যায় তাহার মুখচন্দ্রমা শেষের পাক খুলিয়া অকস্মাৎ ছয় হইয়া ওঠে।—অত্যন্ত প্রসন্নভাবে জয়া হাসিতে থাকে,—আকর্ণবিস্তৃত হাসি উহাকেই বলে, জয়ার হাঁ পৌঁছায় তাহার কান অবধি। তাহার মুখের দুর্গন্ধ সর্ব্ববন্ধনমুক্ত অবস্থায় বাহিরে আসিয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতে থাকে।

জয়া কহিল, "কাকা, একটা পয়সা—"

বিরক্তির সুরে মণীন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখা হ'লেই কেবল পয়সা আর পয়সা। ভাগ্ এখান থেকে—"

জয়া কাকার হাত ছাড়িয়া দিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া চোখ তুলিয়া দাঁড়াইল, মুখে এক মুখ থুতু আনিয়া মণীন্দ্রনাথের গায়ে সযত্নে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "দূর হ'য়ে যা তুই এখান থেকে,—কে বলেছে তোকে আমাদের বাড়ী আসতে?—খবরদার আর আসবিনে বলছি।"

নিরতিশয় অপমানে এবং দুরন্ত ক্রোধে মণীন্দ্রনাথের মুখ লাল হইয়া উঠিল,—তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মানদা ছুটিয়া আসিলেন। নিজের জন্য কিছু আমসত্ত মানদা একটা হাঁড়িতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন,—চুরি করিয়া জয়া সেটুকু আজ প্রাতে সাবাড় করিয়াছে, সেই জন্য সকাল হইতেই তিনি জয়ার 'পরে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ছিলেন। অতএব কন্যার একটা কান সজোরে আকর্ষণ করিয়া মানদা কহিলেন, "হারামজাদী, যা নয় তাই! কিছু বলিনে বলে' তুমি বড্ড আস্কারা পাচ্ছ। আজ তোমার মুখ আমি দেয়ালের গায়ে ঘষব—" বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া দেয়ালের 'পরে তাহার মুখখানা সযত্নে ঘসিয়া দিলেন।

জয়ার নিকষকালো বদনকৌমুদীর স্থানে স্থানে চুণ লাগিয়া বুটিদার নীলাম্বরী শাড়ীর বাহার খুলিল,—কপাল, নাক, চিবুক ছড়িয়া গিয়া সমস্ত মুখ বেগুনে রং ধারণ করিল। সেই কুৎসিত মুখখানার মধ্য হইতে যে কুৎসিততর বাক্যরাশি এবার বজ্রনির্ঘোষে বাহির হইতে লাগিল, তাহা শুনিয়া কানে আঙুল দিয়া মণীন্দ্রনাথ পলায়ন করিলেন।

চোখ রাঙা করিয়া মানদা কহিলেন, "ফের্—?"

জয়া বলিল, "আর বেশী দেরী নেই, তোমার মুখ আমি শানের ওপর ঘস্‌ব, তারপর দেব নুনলঙ্কা ছড়িয়ে—" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিহির অত্যন্ত ভালো ছেলে। তাহার মা বাবা বলে, মিহিরের মাথা ভারী পরিষ্কার,—সে যদি অত দুরন্ত, অর্থাৎ পাজী, না হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় একটা কিছু করিয়া যাইতে পারিত!

কিন্তু তাহার পিতামাতা যে কেন চিন্তিত হয়, তাহা বুঝিয়া ওঠা যায় না,—মিহির এম্‌নিতেও যে চিরস্মরণীয় একটা কিছু করিবে তাহাতে সংশয় নাই।

জয়া বড় হইতেছে, এখন সে স্কুলে যায়,—জয়ার উপযুক্ত স্কুল,—চেষ্টা যত্ন থাকিলে সংসারে সবার যোগ্য সকল জিনিষই লাভ করা যায়। যেমন হাঁড়ি, তেমনি সরা পাওয়া পৃথিবীতে এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

জয়ার স্কুলে যে সব বালিকা আসিয়া জোটে, সংসারে তাহারা বাছাই-করা চালুনি দিয়া ছাঁকা মেয়ে।—জয়া আবার তাহাদের দলে রাজার রাজা।

মাসে এক টাকা মাহিনা এবং চার টাকা বাস ভাড়া, মোট এই পাঁচ টাকা মাত্র খরচ করিয়া এমনতর আড্ডা-খানার সভ্য হওয়ার ন্যায় সৌভাগ্য জয়ার জীবনে আর কোনদিন ঘটিবে কিনা তাহা সে জানে না,—এতগুলি সমধর্ম্মী দরদী প্রাণের বন্ধু এত সহজে আর কোন্‌খানেই বা মিলিত!

জয়া সেদিন স্কুলের পাঠাভ্যাস করিতেছিল,—ওদিকে বসিয়া মিহির সম্মুখে তাহার ভূগোল খুলিয়া, হাঁটুর উপর কাপড় গুটাইয়া নিবিষ্টমনে খোস চুলকাইতেছে!

ঘরের এক কোণ ঘেঁসিয়া মিহিরের পিতৃদেব রমণীকান্ত ঘন ঘন বিড়ি ফুঁকিতেছিলেন। মিহিরের কাকা বসিয়া-ছিলেন দরজার কাছে। রমণীকান্তের দুই পিসতুত ভাই সেদিন জয়াদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিলেন,—গৃহমধ্যে তাঁহারাও ছিলেন উপস্থিত।

সমস্ত ঘরের দেয়ালের গায়ে সবশুদ্ধ প্রায় গণ্ডা তিনেক দেবদেবীর ছবি প্রলম্বিত। জয়ার মা মানদা একখানা অত্যন্ত খাটো কাপড় পরিধান করিয়া দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভারী দ্রুতগতিতে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।—জয়ার কনিষ্ঠ ভাইবোনদের দেহে বেশীর ভাগ সময়েই ঈশ্বরদত্ত আবরণ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না,—এখনও প্রায় তাহাদের সেই বিমুক্ত অবস্থা।

মিহিরের পরের ভাইটা বেশী কথাবার্ত্তা কহে না,—অধিকাংশ কাজই যে নীরবে সমাধা করে। এতবড় নীরব-কর্ম্মী সংসারে প্রকৃতই দুর্লভ! পড়াশুনাও তাহার নিঃশব্দেই সমাপ্ত হয়। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া, প্রথমেই আহার করিয়া সেই যে সে তাহার পিতার ঘনকৃষ্ণ সুপুষ্ট দেহের গাঢ় ছায়ার অন্তরালে পুস্তক লইয়া বোধ করি বা নীরবে পড়িতে পড়িতেই ঝিমাইতে আরম্ভ করে, এবং ঝটিতি পড়ে নিদ্রিত হইয়া, তাহার পর মানদা বিছানা পাতিয়া দিলে, রাত্রিবেলা কখন যে জয়া এবং মিহির তাহার হাত পা ধরিয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া নানাবিধ কসরৎপূর্ব্বক "ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাংলা" করিতে করিতে তাহাকে তাহার বিছানায় টানিয়া আনিয়া ফেলে, তাহা নীরবকর্ম্মী জহর ঘুণাক্ষরেও টের পায় না!

জুয়াখেলার দিকে তাহার অত্যন্ত ঝোঁক, এবং নাকের ডাকের দিকেও।—একমাত্র নাসিকাগর্জ্জনের ব্যাপারেই নীরবকর্ম্মী জহর অত্যধিক রকমের সরব। রমণীকান্তের নাকের সহিত পাল্লা দিয়া তাহার নাক ডাকে! এই দিক দিয়া পিতাপুত্রে একটা সরস প্রতিযোগিতা আছে।—

সেদিনও দেয়ালের গায়ে তাহার পিতার পুরু দেহের ছায়ারআড়ালে আত্মগোপন করিয়া সে ঝিমাইতেছিল।

জহরের পরবর্ত্তী ভ্রাতা চণ্ডী তিন বছর বয়সে মরিয়া পৃথিবীর ভার কিছু কমাইয়া গেছে।

বরদার নীচেকার ঠোঁটটা অত্যধিক পরিমাণে উন্নতির পক্ষপাতী। সম্পূর্ণ বিনা সংবাদে সেটা সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। উপরের ঠোঁটটা ভীরু স্বভাবের, বোধ হয় একটু বেশী মাত্রায় ভীরু স্বভাবের,—খাঁ করিয়া পিছাইয়া গেছে।

বরদার নাসিকা অত্যন্ত সরস, সেই ইন্দ্রিয়টা তাহার জন্মগ্রহণের সময় হইতেই দিবারাত্র রসসিক্ত হইয়া থাকে। গায়ের রং মসীকৃষ্ণ, গাল দু'টা ফুলাফুলা, মনে হয়, সে যেন টেনিস বল আহার করে! তাহারই দু'টা দুই গালে পুরিয়া যেন বরদা বসিয়া আছে! সেই বেলুনের মত গাল আরও ফুলাইয়া নিজের গালে নিজেই চড় মারিয়া "বু বু বু বু" শব্দে অনেকক্ষণ হইতেই বরদা একটা বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ করিতেছিল।

চার বছর বয়সের সারদা পা ছড়াইয়া বসিয়া হাঁটু চাপ্‌ড়াইয়া গাহিতেছিল, "মালা গেঁথেছি আঁখির জলে, বঁধুর গলে পরাব বলে!"

চার বছর বয়সেই সারদা শুধু যে আঁখির জলে মালা গাঁথিয়াছে, তাই নয় আবার তাহা গলায় পরাইবে বলিয়া বঁধুরও সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে! অদূর ভবিষ্যতে সারদা যে বাংলাদেশের প্রেমের গল্পের নায়িকা হইবে, ইহা যেন এখন হইতেই দলিলে লিখিয়া, নীচে নাম সহি করা চলে।

সারদার পরের ভাইটা সর্ব্বকনিষ্ঠ,—সেটার বয়স দুই বৎসর। মাটির উপর পড়িয়া কখন এক ফাঁকে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল।

জয়া মুখ তুলিয়া চোখ টিপিয়া হাসিল, সারদার দিকে চাহিয়া বলিল, "গা ভাই মঞ্জু, বেশ ভালো করে' গা—"

নামটা স্কুলের কোন্ মেয়ের বোনের নাম।—জয়ার মনে হইয়াছে, স্কুলে পড়িতে হইলে ওইরকম নামের একটা বোন থাকা অত্যাবশ্যক,—তাই আজ সারদাকে আদর করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে "মঞ্জু"!—

মানদা বিকালবেলা তীব্র মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়াছিলেন, "ডাক্‌গে যা তোর বাপকে কঞ্জুস কঞ্জুস বলে' ইস্কুলে পড়া পেত্নী, আমার মেয়েকে খবরদার ডাক্‌বিনে কঞ্জুস—"

জয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিল, বলিল, "বাপ ছিল পাটের দালাল, এক পয়সার কাদার মাদার, কঞ্জুস শুনে শুনে কানে পেছে চড়া পড়ে, নৌকো আট্‌কে যায়, ত মঞ্জু নামটা ঠেকবে না?"

স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। জয়ার স্কুলে পড়া ব্যর্থ হইতেছে না।—এই একটা উক্তির মধ্যে তাহার নানান জ্ঞানের প্রমাণ আছে।—কিন্তু সারদার মঞ্জু নাম শুনিয়া অকস্মাৎ রমণীকান্তের পিসতুত ভাইয়েরা শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহাদের বোধ হইল, বলা নাই, কহা নাই, পিছন হইতে আসিয়া অতর্কিতে কেহ যেন তাঁহাদের পিঠে ছুরি বসাইয়া দিল।

এই কুৎসিত নোংরা আবহাওয়ার মধ্যে ইহারা ইহাদের আচরণ এবং জয়া বরদা নাম লইয়া অত্যন্ত মানানসই ভাবে বাস করিতেছিল,—এমন সময় জয়া কোথা হইতে মঞ্জু নামটা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেবী বীণাপাণিকে, শব্দরূপ ব্রহ্মকে এবং বিশ্বের সকল সুরুচিকে যেন তাহার গাঢ় হলুদ রং-এর অপরিচ্ছন্ন দাঁত বাহির করিয়া ভেঙ্‌চাইতে আরম্ভ করিয়াছে। জয়ার মুখে সারদার নাম শুনিয়া রমণীকান্তের পিস্‌তুত ভাইয়েদের দেহে থাকিয়া থাকিয়া কাঁটা দিতে লাগিল।

জয়া কহিল, "গা ভাই মঞ্জু, বেশ ভালো করে' গা, এই এম্‌নি করে' বল্, মালা গেঁথে—ছি-ই আঁখির-ও জ—অ—অ—লে, বঁধুর—ও গ—অ—লে পরাব বো—ও—লে, বল্ এম্‌নি করে'—"বলিয়া একবার আড়-চোখে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিতে থাকে।

রমণীকান্ত বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন! অলৌকিক ক্ষমতা। ইহা লইয়া কেহ তাঁহারই প্রশংসাবাদ করিলে গর্ব্বিতকণ্ঠে রমণীকান্ত বলেন, "আরে মশাই, আমার বাবা রোজ বেলা দশটার সময় বড়রাস্তা দিয়ে আপিস যেতে যেতে ঘুমোত, বিশ পা যেত, আর আধ মিনিট ঘুমিয়ে নিত, আবার বিশ পা যেত, আবার ঝিমোত তিরিশ সেকেণ্ড, এম্‌নি কর্‌তে কর্‌তে পৌছত আপিস—আর আমি ত তবু বসে বসে ঘুমোই, এ আর এমন বেশী কি?"

ঘুমন্ত পিতার দিকে চাইয়া মিহির বলিল, "এই জয়ী, কি-রকম হাঁ করে' ঘুমোচ্ছে দেখ্—"

জয়া সেই দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। মিহির উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরে কি একটা জিনিষ হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল। কেহ কিছু বুঝিতে পারার পূর্ব্বেই সে তাহার হাতের জিনিষটা আলুগোছোর মণীকান্তের উন্মুক্ত বদনবিবরে ঢালিয়া দিল।

পদার্থটা চিনি,—অতএব রমণীকান্তের নাসিকা গর্জ্জন বন্ধ হইয়া গেল,—নিদ্রিত অবস্থাতেই তিনি চিনিটুকু সশব্দে চাটিয়া পুটিয়া শেষ করিলেন!

বিস্মিত মণীন্দ্রনাথ নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। রমণীকান্তের পিস্‌তুত ভাইয়েদের বাক্‌শক্তি বহুপূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, নিদারুণ লজ্জায় এখন যেন তাঁহারা মাটির সহিত মিশিয়া গেলেন।

জয়া খিল্‌খিল করিয়া হাসিতে আরম্ভ করে,—ফিরিয়া আসিয়া মিহির তাহার স্থান পুনরধিকার করিয়া উদগ্র কৌতূহলের সহিত তাহার কৃতকর্ম্মের ফলাফল নিরীক্ষণ করিতে থাকে।

চিনির শেষ কণাটি অবধি গলাধঃকরণ করিয়া রমণীকান্ত আঁখি মেলিলেন, কৈ মাছের মত গোলগোল ক্ষুদ্র চোখ দুইটা দিয়া মিহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চিনি না বাতাসা?—বাতাসা হ'লে গলায় আট্‌কে দম বন্ধ হ'য়ে যেতে পার্‌ত।"

পিতার অসাধারণ ক্ষমতায় বিস্ময়পুলকিত মিহির উচ্চ হাসিয়া বলিল, "ঠিক টের পেয়েছে রে জয়ী, ঠিক টের পেয়েছে!"

রমণীকান্ত পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিলেন,—মিহির কহিল, "তোমাকে একটা লোক ডাক্‌তে এসেছিল।"

একমুহূর্ত্তে রমণীকান্ত অতি সচেতন হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?—নাম কি বল্‌লে?"

মিহির আর জয়ার চোখে চোখে কি কথা হইয়া গেল,—বোধ করি বা তাহারই ফলে এবার জয়া উত্তর দিল, কহিল, "নাম বল্‌লে না কিছুতেই,—বার বার করে' জিজ্ঞেস কর্‌লুম, বল্‌তে লাগল, সে তিনি চিন্‌তে পার্‌বে না।"

রমণীকান্তের চোখে মুখে আতঙ্ক অত্যন্ত উগ্রভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, কম্পিতকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দেখ্‌তে কেমন?"

জয়া যেন ঠিক মুখস্থ বলিয়া গেল, "কালো, রোগা, দুলে দুলে চলে, ঠোঁটটা ওল্‌টানো, থাকে থাকে আর নাক ঝাড়ে, চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, দাড়ী আছে, পাকা পাকা—"

বাধা দিয়া মিহির কহিল, "পাকা পাকা নয়, খানিকটা সাদা খানিকটা কালো,—সাম্‌নের তিনটে দাঁত উঁচু, দুটো ঢাপ্পল ঢাপ্পল চোখ,—মাথায় আছে টাক—"

জয়া কহিল, "তুই ছাই জানিস্, আমি বল্‌ছি, মাথায় আছে চুল, খোঁচা খোঁচা—"

রমণীকান্তের মুখের রং উত্তেজনায় বাদামী হইয়া উঠিয়াছে, "বল্‌লে না কি দরকার?"

ঘাড় নাড়িয়া জয়া কহিল, "না, কিছুতেই না,—জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম, কে তুমি, পাওনাদার? বিয়ের ঘটক? মিহিরের বউয়ের খোঁজ এনেছ? আমার পাত্তরের ঠিকানা এনেছ? পুলিসের লোক, আজ আমাদের বাড়ী মুসুর ডাল রান্না হ'য়েছে কিনা খবর নিতে এসেছ? কিছুতেই কিছু বল্‌লে না।"

আতঙ্কে রমণীকান্তের মুখ ঘনঘন রং বদ্‌লাইতে লাগিল। হতাশভাবে হাত পা ছড়াইয়া তিনি বলিলেন, "এইবার গেলুম, কোথাকার কোন্ ব্যাটা কি উদ্দেশ্যে সব অন্ধিসন্ধি জেনে গেল! কে জানে কি মতলব খেল্‌বে তলায় তলায়!—গেলুম এইবার!"

জয়ার প্রতিভা দেখিয়া মণীন্দ্রনাথ উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলেন। তাহার কথা কওয়ার কায়দায় অসামান্যতা ছিল। জয়া এবং মিহিরের চোখের বেতার তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই,—তিনি বুঝিয়াছিলেন পরম কল্যাণীয় শ্রীমান এবং কল্যাণীয়া শ্রীমতী মিলিয়া একটা চমকপ্রদ কাহিনী গড়িয়া তুলিতেছে। কিন্তু জয়া যে এমন মনোহর করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিবে, এতটা মণীন্দ্রনাথ আশা করেন নাই। তাহার বর্ণনা শুনিয়া সেইজন্যই তাঁহার আর শ্রদ্ধার সীমা রহিল না। গভীর পুলকে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, একখানা লিক্‌লিকে বেত যদি হাতের কাছে থাকিত, তবে তাহার সাহায্যে সাদরে জয়া এবং মিহিরের অঙ্গসেবা করিয়া তাহাদের দেহের ছাল তুলিয়া দিতেন,—তাঁহার অন্তরের গভীর আনন্দ জ্ঞাপন করিতেন!

পৃথিবীর অচেনা লোকেদের সম্বন্ধে রমণীকান্তের এক অদ্ভুত ভীতি আছে, তাহার মধ্যে আবার কেহ তাঁহাকে বাড়ীতে খুঁজিতে আসিয়াছিল শুনিলে আর রমণীকান্তের আশঙ্কার সীমা থাকে না।—মনে হয়, এইরূপ অবস্থাতেই হার্টফেল করিয়া লোকটা একদিন মারা যাইবে।

জয়ার কথা শুনিয়া তিনি একেবারে ক্ষেপিয়া যাইবার জোগাড় করিলেন, দাঁড়াইয়া উঠিয়া ত্রস্তভাবে দেয়ালের গায়ে পেরেকে টাঙান জামার পকেট হইতে আর একটা বিড়ি বাহির করিয়া কম্পিত হস্তে তাহাতে আগুন ধরাইতে ধরাইতে বারংবার বলিতে লাগিলেন, "এইবার হ'ল সর্ব্বনাশ, এতকাল পরে এইবার সর্ব্বনাশ হ'ল !"

মিহির কহিল, "তার হাতে একখানা খাতা ছিল, আমরা একটা একটা করে' জবাব দিতে লাগ্‌লুম, আর সে লিখে লিখে নিতে লাগ্‌ল—"

বিকট মুখভঙ্গী করিয়া পিতা কহিলেন, "ব্যাড্ড বুদ্ধিমান তুমি ! শূয়ার, গাধা, ষ্টুপিড ছোক্‌রা কোথাকার ! কে বলে তোমাকে এসব ছুঁচোমি কর্‌তে ?—জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব না একেবারে !"

রাগে মিহিরের চোখ পিট্‌পিট করিতে লাগিল, সে কহিল, "ভারী বীরপুরুষ ! কেউ ডাকৃতে এসেছে শুন্‌লে ভূতের নাচ আরম্ভ করে, আবার জুতিয়ে মুখ ছেঁড়্‌বার সখ ! একবার এগিয়ে এসে দেখ না,—বক্সিং শিখ্‌ছি বাবা, একটি ঘুসিতে ওই চ্যাপ্টা নাক গোব্‌দা মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেব—" বলিয়া সে হাত মুঠা করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল।

জয়া এইবার হি হি করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। রমণীকান্ত তাহার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, মাটিতে বসিয়া পড়িয়া পরম নিশ্চিন্ততার সহিত কহিলেন, "যাঃ, সব মিছে কথা।"

ক্রুদ্ধ মিহির জয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তুই হাস্‌লি বলেই ত টের পেয়ে গেল।"

জয়া কহিল, "পেলে ত পেলে, তুই গোলদীঘির জলে ডুবে মর্‌গে, যা—"

পিস্‌তুত ভাইয়েরা উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, রমণীকান্ত কহিলেন, "আরে বোসো বোসো, কথাবার্ত্তা হ'ল না, বাড়ীর খবর জিজ্ঞেসা করা হ'ল না, এসেই অমনি চল্‌লে, তাও কি কখন হয় ?"

কিন্তু যথেষ্ট হইয়াছিল, তাঁহারা আর বসিতে রাজী হইলেন না। রমণীকান্ত কহিলেন, "আমার ছেলেমেয়েদের হাসি ঠাট্টা দেখে কিছু মনে কোরো না যেন,—অজানা অচেনা লোক বাড়ীতে আসা আমি পছন্দ করিনে, ওরা তাই নিয়ে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে এক আধটুকু রঙ্গ করে—"

ভাইয়েদের সহিত দরজার কাছ পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে বলিলেন, "সুজাগঞ্জের মহারাজ বাহাদুর তাহ'লে মারা গেল। আমার বহুদিনের বন্ধু ছিল, গলায় গলায় ভাব।—রাণীই বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌লে ওকে। পাব্‌লিক তা জানে না, তাদের বিশ্বাস অসুখেই রাজাবাহাদুর মারা গেছে, কিন্তু তা নয়,—বৌ-ই মেরেছে সম্পত্তির লোভে। রাজা আমায় বহুদিন দুঃখ করে একথা বলেছিল,—সে বল্‌ত, বৌ যার অমন, তার আর বেঁচে সুখ কি ভাই !—অনেক টাকা রেখে গেছে লোকটা, এগারো কোটী নব্বই লক্ষ সাতাত্তর হাজার আটশ!—পাব্‌লিক এ সমস্ত জানেনা, এ সব কন্‌ফিডেনশ্যাল—"

সুজাগঞ্জের মহারাজ বাহাদুরের অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট হইতে মৃদুহাস্যে বিদায় লইয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া রমণীকান্ত পুনরায় তাঁহার নিজের জায়গায় উপবেশন করিলেন। মিহিরের ভূগোল পড়া সম্ভবত শেষ হইয়াছিল।—জয়া ও মিহিরের পাঠ এমনই করিয়াই সম্পন্ন হয় !—সহসা একখানা বাংলা বই খুলিয়া মিহির তারস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, "পূজাহা' মানে বাঁচিবার আশা, 'পূজাহা' মানে বাঁচিবার আশা—"

মণীন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "কি মানে বাঁচিবার আশা ?"

মিহির জবাব দিল না, সরিয়া আসিয়া মণীন্দ্রনাথ বইখানার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। একটা গল্পের শেষে লেখা আছে,—নেপোলিয়ন কহিলেন, এরূপ বালকের জননী যে সর্ব্বাংশে পূজার্হা সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।—বিস্মিত মণীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন, "পূজার্হা মানে বাঁচিবার আশা ! তাহ'লে এরূপ বালকের জননী যে সর্ব্বাংশে পূজার্হা, এই সমস্ত অংশটার মানে কি ?"

কাকার অনধিকারচর্চ্চায় মিহির অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল, সুস্পষ্ট বিরক্তির সুরে সে কহিল, "আমরা ত আর ভালো ছেলে নয়, কিন্তু ওটুকুর মানে বোধ হয় জানি—"

এমন জ্ঞানগর্ভ বিনয়োক্তির সম্মুখে মণীন্দ্রনাথ কুণ্ঠায় একেবারে অবনত হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, "তবু শুনি একটুখানি।"

ঋজু হইয়া বসিয়া গলা উঁচু করিয়া মিহির কহিল, "এমন ছেলের মায়ের আর বাঁচবার আশা নেই।"

মণীন্দ্রনাথ বলিলেন, "বৌঠান্, পঞ্চুঠাকুরের দোরে হত্যা দিয়ে তোমার এই রত্ন লাভ হ'য়েছিল, কিন্তু এ ছেলেও তোমার পূজার্হ, অর্থাৎ কিনা এরও আর বাঁচ্‌বার আশা নেই! হাতে ত দুটো মাদুলি আছেই, আরও চারটে দিয়ো বৌঠান, তবে যদি এ কুলপ্রদীপ তোমাদের পোড়া বরাতে বংশ উজ্জ্বল করে' থাকে—"

মানদা সেইমাত্র রান্নাঘর হইতে এঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এ-ধরণের কথা তিনি পছন্দ করেন না, বলেন, "পাজী হ'ক, মন্দ হ'ক, চোর হ'ক, বদমাস হ'ক, নিজের ঘরেরটা খেয়ে হচ্ছে, কারও বাপেরটা খেয়ে হচ্ছে না ত! গরীব হই, যা হই, নিজের ঘরেই ছেলেমেয়ে মানুষ কর্‌ছি, অন্য দোরে গিয়ে দাঁড়াইনি ত—"

কিন্তু মণীন্দ্রনাথকে এ-রকম কথা বলায় বিপদ ছিল। —সন্ধ্যাবেলা এ বাড়ীতে আসামাত্র মণীন্দ্রনাথের কাছ হইতে রমণীকান্ত একশ'টা টাকা চাহিয়াছিলেন। তিন মাসের বাড়ীভাড়া বাকী, কাল দ্বিপ্রহরের মধ্যে সেই টাকা না দিলে, বাড়ীওয়ালা তাহার দ্বারবান দিয়া রমণীকান্তকে ঘাড় ধরিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিবে বলিয়া শাসাইয়া গেছে।

তিনি কহিলেন, "শালাকে আমি আচ্ছা করে' শিক্ষা দিয়ে দিতে পারি মণি,—জানে না ত কার সঙ্গে লাগ্‌তে এসেছে!—কিন্তু ছোটলোকের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে মন সরে না, বুঝ্‌লে কিনা?"

মণীন্দ্রনাথ বেশ ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, অতএব কহিলেন, "আমার কাছে একশ' টাকা ত হ'বে না, গোটা ষাটেক হ'তে পারে। আচ্ছা দেখ্‌ব 'খন যদি কারও কাছ থেকে ধারধোর করে' দিতে পারি—"

মানদা কহিলেন, "তাই কোরো ঠাকুরপো,—ছোটলোকের সঙ্গে কোন কথার মধ্যে না থাকাই ভালো,—আর আমাকে এই সঙ্গে তিরিশটি টাকা দিয়ো ভাই,—ওদের বাড়ীর বউ গরদের শাড়ী পড়েছিল,—ওগুলো পর্‌লে দেখায় ভালোই—খাকি পেত্নীর মতন তাই, নইলে সাজ্‌লে গুজ্‌লে আমাকেই কোন্ না সুন্দরী দেখায়, কালো কুচ্ছিত ত আর নই!"

মানদার চেহারার দিকে চাহিয়া, মানদার পুত্রকন্যাদের পানে তাকাইয়া কৌতুক অনুভব করিয়া মণীন্দ্রনাথ কহিয়াছিলেন, "কালই হ'বে না বৌঠান, তবে দেখ্‌ব কয়েকদিন পরে যদি পারি—"

খুসী হইয়া মানদা কহিলেন, "আহা তাই দেখো ভাই, তাই দেখো। বউটো শাড়ী পরে' গড়্‌মগিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আমার বুকের মধ্যে যেন পেরেক বিঁধ্‌তে থাকে!—" অতএব গরদের শাড়ীর এবং বাড়ীভাড়ার টাকার প্রতিশ্রুতির পর, আর যাহাই হউক, মণীন্দ্রনাথকে কোনক্রমেই অসন্তুষ্ট করা চলে না। সেইজন্য তাঁহার কথা শুনিয়া অতিশয় অপ্রসন্নমুখে মানদা চুপ করিয়া রহিলেন, দেবরের কথার কোনও উত্তর দিলেন না।

তাকের উপর এক কোণে একটা সিগারেটের খালি বাক্স ছিল,—মানদা হাত বাড়াইয়া সেটা পাড়িয়া লইয়া আসিলেন। সেই সিগারেটের বাক্সে আছে ঠাকুরের প্রসাদী ফুল!

পঞ্চুঠাকুরের দরজায় হত্যা দিয়া পাওয়া যেসব ছেলেমেয়ে, তাহাদের হাতে এবং গলায় যে পাইকারী হিসাবে মাদুলি আঁটিয়া তাহাদিগকে জীয়াইয়া রাখিতে হয়, শুধু তাই নয়, ফুল বেলপাতার অতিরিক্ত ভাণ্ডারও জমা করিয়া রাখিতে হয় সিগারেটের বাক্সে! মাদুলির কার্যকারিতা কমিয়া গেলে অথবা অযথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলে, তখন এই সঞ্চিত সামগ্রীতে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। মানদাও তাহাই করিলেন, সিগারেটের বাক্স হইতে কয়েকটা শুকনা ফুল বাহির করিয়া ভক্তিভরে মিহিরের কপালে ঠেকাইয়া পুনরায় তাকের উপর রাখিয়া দিলেন।

মিহির তাহার বাংলা বই রাখিয়া ইংরেজী অনুবাদ লইয়া বসিয়াছিল,—কহিল, "বাবা, দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইংরেজী কি হ'বে?"

রমণীকান্ত ঝিমাইতে লাগিলেন, কথা কহিলেন না। মণীন্দ্রনাথ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ওর আর ইংরেজী নেই মিহির।—দন্তব্যের উপর কি আর মন্তব্য চলে?"

মিহির উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—তাড়াতাড়ি কথা কহিতে গেলে তাহার তোৎলামি সুরু হয়,—চোখ লাল করিয়া দাঁত মুখ খিঁচাইয়া তো তো করিয়া সে কহিল, "ব্-ব্-ব্-ব্বাড়ী গ্-গ্-গ্-গ্-গিয়ে নিজের চ্ছে-লেমেয়ের ওপর ম্-স্মাষ্টারী করো গে—"

মুখ নামাইয়া মৃদুস্বরে জয়া কহিল, "বাড়ী ত মেস, আর নিজে ত আঁটকুড়ে—"

মণীন্দ্রনাথের চোখ দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। ত্বরিৎগতিতে উঠিয়া আসিয়া এক লাথিতে মিহিরকে ধরাশায়ী করিয়া তাহার দেহের উপর শ্রাবণের ধারার মত পদাঘাতের পর পদাঘাত বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহার পর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দিগ্বিজয়ী জয়া প্রমাদ গণিল,—আজ যে তাহার জীবনে একটা দুর্ঘটনা না ঘটিয়া যাইবে না, মণীন্দ্রনাথের রুদ্রমূর্ত্তির পানে তাকাইয়া, এ সত্যটা তাহার কাছে জলের মত সোজা হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে হাত পা ছড়াইয়া কোলা ব্যাঙের মত চিৎ হইয়া পড়িয়া জয়া গোঁ গোঁ করিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত দিয়া জিভ চাঁছিয়া মুখের ভিতর হইতে বাহির করিতে লাগিল থুতু!

জয়ার সেদিনকার বিদ্যাভ্যাস শেষ হইয়াছিল,—বরদা আসিয়া তাহার বইখাতাগুলা সরাইয়া লইয়া কিছুদূরে দাঁড়াইয়া গোল গোল চোখ করিয়া মজা দেখিতে লাগিল।

রমণীকান্ত হৈ হৈ করিয়া উঠিলেন, "ফিট ফিট, জল, পাখা,—সিগারেটের বাক্স!"

মানদা ছুটিয়া আসিয়া সিগারেটের বাক্স হইতে ফুল বাহির করিয়া কন্যার মাথায় মুখে স্পর্শ করাইতে করাইতে চীৎকার সুরু করিলেন, "সব আত্মীয়তা দেখাতে আসেন! বিদ্যে জাহির করতে আসেন দুধের ছেলেমেয়েদের কাছে। গুণ্ডামির আর জায়গাও জোটে না, কচি শিশুর কাছে দেখাতে আসেন কুস্তীর প্যাঁচ!—মুখে আগুন অমন সব আত্মীয়ের!"

আরও সরাসরি বলিতে পারিতেন, কিন্তু গরদের শাড়ী এবং বাড়ীভাড়ার কথা তীব্রভাবে স্মরণ ছিল, সেইজন্য মানদার কথা কওয়ার পদ্ধতি এবং ভাষার উপর অধিকার হিসাবে উক্তিগুলা হইল মধুবর্ষী!

বড় বড় পা ফেলিয়া মণীন্দ্রনাথ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তিনি বাহির হইয়া যাইতেই জয়া চোখ মেলিল, নিজের থুতুর মধ্যেই সে এতক্ষণ গড়াগড়ি দিতেছিল,—মিটমিট করিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা চলে' গেছে?"

দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া একবার বাহিরটা দেখিয়া লইয়া মানদা কহিলেন, "হ্যাঁ, তুই উঠে বোস্—"

জয়া এখন তরুণী,—সে বলে, পৃথিবীর কবিরা চিরকাল ধরিয়া তাহার বন্দনা গাহিয়াছেন, যুগযুগান্তের সহস্র গাথা, লক্ষ প্রশস্তি তাহার জন্যই রচিত হইয়াছে, প্রকৃতি নাকি তাহারই লাগি দিকে দিকে উৎসব ঘোষণা করিয়াছেন!

এই সব চটকদার কথাগুলা জয়া তাহার স্কুল থেকে সংগ্রহ করিয়াছে। এতগুলা বছর মাসে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া খরচ করিয়া যে সে কিছুই শিক্ষালাভ করে নাই, একথা সত্য নয়।—জয়ার শাড়ীপরা এখন একটা দেখিবার জিনিষ, জয়ার ব্লাউজের নমুনা, চুল বাঁধিবার কায়দা, চলিবার ভঙ্গী, হাসিবার ধরণ, কথা বলিবার কৌশল, সমস্তই অপরূপ। মাসে মাত্র পাঁচটি টাকার বিনিময়ে কত বিদ্যাই যে জয়ার বিদ্যায়তন শ্রীমতীকে দান করিল!

জয়া কহিল, "আমার জন্যে আজ একখানা মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ী এনো কাকা, ব্লাউজপীস্‌ও এনো সঙ্গে—" একটু থামিয়া বলিল, "চল না হয়, আমিও যাই,—তোমার আবার যা পছন্দ!" বলিয়া সাবানদানটা লইয়া কলতলায় মুখ ধুইতে চলিয়া গেল।—

সেই জয়া এখন তরুণী হইয়াছে! বিপুল বিশ্বে মানবের দেহ মনে যে পরিবর্ত্তন তাহার না আছে শান্তি, না আছে বিরাম। ভালো হউক, মন্দ হউক, সুশ্রী হউক, কুশ্রী হউক সে পরিবর্ত্তন নিরন্তর কঠিন নিশ্চয়তার সহিত নিঃশব্দে নিজের কাজ সমাধা করিয়া যায়। প্রতিদিন তাহার পানে চাহিলে হয়ত তাহা চোখে পড়ে না, কিন্তু একখানি পৃষ্ঠা অথবা একটিমাত্র অনুচ্ছেদের ব্যবধানে যদি গোটা কয়েক বৎসরের কাহিনী একেবারে নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে হয়, বিশাল বিশ্বের নিত্যকার পরিবর্ত্তন এখানে কত বড় প্রভেদই না ঘটাইয়াছে! কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা যে এতগুলা বছর ধরিয়া তিলে তিলে পলে পলে জয়াকে গড়িতেছিলেন সে কাহিনীর উল্লেখ এ গল্পে নাই, এবং জয়ার ক্ষেত্রে তাহা বৃথা, কারণ সময়ের ব্যবধানে সে হইয়াছে পূর্ণতর, স্ফুটতর,—বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার তুলির আর কোনও একটা তুচ্ছ রেখা দিয়াও এই মেয়েটির মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ ঘটাইলেন না, অতএব চতুর্দ্দিক দিয়া জয়া সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল।

শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া তরুণী জয়া অবশেষে আমার গল্পের শেষাংশে আসিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হওয়া, সম্পূর্ণ হওয়া, সমস্তই অসত্যার্থক। ঋণবৃদ্ধি, বাতব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধির ন্যায় এ হিসাব কেবলমাত্র লোকসানের খাতের হিসাব, অতএব তরুণী জয়াকে বুঝিতে কষ্ট পাইতে হইবে না।

ঘণ্টাখানেক পরে জয়া কলতলা হইতে ফিরিয়া আসিল, সাকী ও পেয়ালার কি একটা গান নূতন শিখিয়া আসিয়াছে স্কুল হইতে, সেইটা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে সে উপরে উঠিল।

তাহারও মিনিট চল্লিশ পরে যখন সে সাজিয়া গুজিয়া বাহিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন অমন যে রূপসী জয়া তাহাকেও রূপসী বলিয়া ভ্রম করার সম্ভাবনা ছিল!

জয়া জানে কোন্ রঙের শাড়ীর সহিত কি রঙের ব্লাউজ ম্যাচ করে। জয়া জানে গোল গোল করিয়া শাড়ী পরা কাহাকে বলে, স্লীভ্‌লেস ব্লাউজ পরিলে তাহার মত নারী আধুনিক হয়, ইহা জয়া অবগত আছে! মুখে কতটা পর্য্যন্ত কার্ম্মাইন্ মাখিলে তাহা স্বাভাবিক বলিয়া চালাইতে পারিবে তাহাও জয়া জানে। তাহার পুরু ঠোঁটে জয়া লিপ্‌স্যাল্‌ভ্ ব্যবহার করে নিত্য!—জয়ার টেপ্-দেওয়া সেমিজ, জয়ার বাঁকা সিঁথি, জয়ার পায়ের জরির নাগ্‌রা, এসবে তাহাকে অপরূপ সুন্দরী দেখায় ইহাই তাহার বিশ্বাস।

জয়া একটা সাদা সিল্কের চওড়া লালপাড় শাড়ী পরে,—মাদ্রাজী প্যাটার্ণে পরা শাড়ী, সাম্‌নের দিকে কুঁচাইয়া পরিয়াছে,—লাল রঙের রেশমী জালির ব্লাউজ্ গায়ে দেয়, একটা ফার্-ট্রিম্‌ড্ ওভারকোট ঝুলায় হাতে। দোকান সারিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইবে, তখন সেটা গায়ে দেওয়া দরকার।

চল্লিশ মিনিট পরে জয়া তাহার প্রসাধন শেষ করিয়া বাহির হইল। খোদার উপর খোদ্‌কারী বটে! ভগবানের গড়া জয়া নয়, জয়ার নিজের হাতে তৈরী মূর্ত্তি!

ব্লাউজটা বোধহয় মশারীর কাপড়ের, নহিলে কখনও অত সূক্ষ্ম হয়! সেইটা গায়ে দিয়া জয়া ভারী খুশী!—চোখের কোণে সরু করিয়া কাজল লাগাইয়াছে, সুর্ম্মা থাকিলে তাহাই দিত, কিন্তু সেটা গেছে নিঃশেষ হইয়া।

এখন জয়ার বেশভূষা দেখিলে কে বলিবে যে, এ মেয়ে "পরীক্ষা" বানান লেখে 'প-রি-খ্যা', এবং ভাগিনেয়ের ইংরেজী লেখে কাজ্‌ল্!—হরিণনয়না জয়া, কাজলনয়না তরুণী জয়া, বিশ্বের কবিরা তাঁহার বন্দনা গাহিয়া গলা ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন! সার্থক তাঁহারা, জয়ার আত্মপ্রসাদও সার্থক!

রাত্রি ন'টার সময় যখন মণীন্দ্রনাথ জয়াকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন, তখন তাঁহার পার্সের ওজন যথেষ্ট কমিয়া গেছে, এবং তাঁহার ও জয়ার চারখানি হাত সুভদ্র দোকানদারদের অজস্র দানে একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গেছে। শাড়ী আসিয়াছে, ব্লাউজ্‌পীস্ আসিয়াছে, পুলোভার কেনা হইয়াছে, আসিয়াছে ওভারকোট। জয়া একটা দামী টয়লেট সেট কিনিয়াছে। গান শিখিবার জন্য চাবড়া বাধান

এক্সারসাইজ বুক, এম্‌ব্রয়ডারীর ডিজাইনের বই, সেলাইয়ের জন্য ডি-এম-সি'র সূতা!—জুতাও কিনিয়াছে এক জোড়া! সুপ্রসন্ন হাস্যে জয়ার মুখ উজ্জ্বল, জয়ার মুখের পক্ষে যতটা উজ্জ্বল হওয়া সম্ভবপর ততটাই উজ্জ্বল,—তাহার বেশী আর কি করিয়া হইবে?

গভীর আনন্দে মানদা দেবরকে সস্নেহে তিরস্কার করিলেন।—মানদাও স্নেহের তিরস্কার করিতে পারেন, মানদার কণ্ঠও স্থান কাল বিবেচনা করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে নমনীয় কমনীয় হইতে পারে!

তিনি কহিলেন, "কি যে তুমি ঠাকুরপো, ওদের জন্যে শুধু শুধু এমন করে' টাকাগুলো খরচ কর খোলামকুচির মত! আর [illegible] এমনতর যা তা করে' টাকা নষ্ট কর্‌তে পাবে না, আমি বলে' দিচ্ছি।"

নীরসভাবে মণীন্দ্রনাথ একটুখানি হাসিলেন। রাত্রি হইয়া যাইতেছিল, মেসে ফেরা দরকার, মণীন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইতেই জয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল, ভারী উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিল, "শীতটা হঠাৎ একটু বেশী পড়েছে কাকা,—গায়ের কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে নাও, ঠাণ্ডা লাগিয়ে একটা অসুখ বিসুখ বাধিয়ে বোসো না যেন—"

বিনা বাক্যব্যয়ে মণীন্দ্রনাথ অগ্রসর হইলেন।

জয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইল যেন। ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া কহিল, "কথা শুন্‌বে না কাকা? কান দুটো ঢেকে নাও বল্‌ছি,—ভারী অবাধ্য ছেলে হচ্ছ তুমি দিন দিন—মিছামিছি অসুখ বাধিয়ে বস্‌বে আর শেষে ভুগে মর্‌তে হ'বে আমাদের!" বলিয়া কাছে আসিয়া জোর করিয়া মণীন্দ্রনাথের গায়ের কাপড়টা দিয়া তাঁহার মাথা এবং কান উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাকে লজ্জানম্র নববধূটি বানাইয়া তুলিল।

মণীন্দ্রনাথ আবার শুষ্ককণ্ঠে ক্ষুদ্র করিয়া একটুখানি হাসিলেন, মানদার স্নেহের তিরস্কারে যেমন করিয়া হাসিয়াছিলেন, এ হাসি তাহারই সগোত্র যেন!

দিন কয়েক পরে এক রবিবারের অপরাহ্ণে জয়া বসিয়া তাহার স্কুলের কোনও বান্ধবীর দূর সম্পর্কীয় দাদার নিকট প্রেমপত্র লিখিতেছিল! পাশে খোলা আছে একখানা উপন্যাস, তাহাতে এই ধরণের বহু কাহিনী আছে,—বইখানা বটতলার, ভালো কাগজে ছাপা, ভালো মলাটে বাঁধা বটতলার বই!

জয়া বই পড়িয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া হি হি করিয়া হাসে,—আর বসিয়া বসিয়া বান্ধবীদের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের কাছে প্রেমপত্র লেখে। তাহার কোন্ এক বন্ধুর বাড়ীতে জয়া বেড়াইতে গিয়াছিল,—ওর বন্ধু একখানি রসাল পত্র সংগ্রহ করিয়া জয়াকে দিয়াছে,—ওরই উদ্দেশে নাকি সে-চিঠি লেখা! পারাবত দূত নয়, মেঘও দূত নয়, দূতীয়ালি করিয়াছেন বন্ধুটি। বিশ্বের কবি তাহার বন্দনা গাহিয়াছেন, একথা কি জয়া শুধু শুধুই বলে!—জয়া যে চোখ টানিয়া টানিয়া, নানান্ ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া, বাহার রকমের হাসি হাসিয়া কথা কয়, এ সকল যে সবই বাজে, তাহাই বা কে বলিবে! তরুণী জয়া, কাজলনয়না জয়া!

মণীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকিলেন,—কাকাকে দেখিবামাত্র জয়া তাহার অপাঠ্য হাতের লেখায় অজস্র বর্ণাশুদ্ধিতে কণ্টকিত সরস রচনার নমুনাগুলি গুটাইয়া ফেলিল। ফাউণ্টেন পেনটা বন্ধ করিতে করিতে কহিল, "কাকা, আস্‌ছে বুধবার বটানিক গার্ডেনে পিকনিক কর্‌তে যাব মেয়েরা মিলে, কাল দশটাকা চাঁদা দেব বলেছি,—টাকা দাও—"

মণীন্দ্রনাথ কহিলেন, "একটি পয়সাও আজ নেই, এ সপ্তাহে আমার কপর্দকশূন্য অবস্থা। আর গরীবের ঘরের মেয়ে তুই জয়ী,—অনবরত এত বড়মানুষী চাল চাল্‌লে আমরা ত আর পেরে উঠিনে বাপু—"

জয়া যখন টাকা চাহিয়াছিল, তখন তাহার মুখের মাংস স্থানে স্থানে কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল, চোখের কোণে পড়িয়াছিল খাঁজ,—জয়া হাসিতেছিল খুব সম্ভব। কিন্তু মণীন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া জয়ার মুখের চামড়ার তরঙ্গায়িত অবস্থা মিলাইয়া গিয়া, তাহা কঠিন এবং সংহত হইয়া

মণীন্দ্রনাথ কহিলেন, "এক গ্লাস জল আন্‌ত জয়ী, বড় তৃষ্ণা পেয়েছে—"

জয়া কথা কহিল না, অপ্রসন্ন পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পাশের ঘরে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বরদা তাহার কান দুইটা চুল দিয়া যত্ন করিয়া ঢাকিতেছিল। কাটা কান নয়, তবু চুল দিয়া ঢাকে,—বরদাও আধুনিক হইতে চায়। চোখের সাম্‌নে জয়ার দৃষ্টান্ত তাহাকে দিবারাত্র সম্মুখে আহ্বান করিতে থাকে, "আগে চল্, আগে চল্ ভাই—" বরদা সে ডাক অস্বীকার করে না।

বরদার কান গাধার কানের মত লম্বা, অমনতর কান ঢাকা থাকাই ভালো! কিন্তু তাহার ঝাঁটার কাঠির মত কেশদাম দিয়া সে কান ঢাকা পড়ে না! সেইজন্যই বরদার প্রচেষ্টা সার্থক হয় না। জয়ার দুইটা দুল বরদা কানে ঝুলাইয়াছে, আয়নার দিকে চাহিয়া তাহার মনে হয়, সে যেন অসামান্যা রূপসী!

দর্পণের দিকে তাকাইয়া, সে বিভিন্ন ভঙ্গীতে হাসিয়া, কোন্ হাসিটা ওই দুলের সঙ্গে ম্যাচ্ করে তাহাই অভ্যাস করিতেছিল। এম্‌নি সময়ে এই দৃশ্যে হইল জয়ার আবির্ভাব।

বরদার সাজ পোষাকের বাহার লক্ষ্য করিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া জয়া কহিল, "বরদা তোকে আমি পাঁচশবার না বারণ করেছি, আমার কোনও শাড়ী অথবা গহনায় তুই হাত দিবিনে?"

বরদা কহিল, "বাঃ রে, মা দিলে যে—"

ক্রোধোত্তেজিত কণ্ঠে জয়া বলিল, "আমায় না জিজ্ঞেসা করে' কেমন করে' মা আমার জিনিষ তোকে দেয়, তা আমি আজ দেখ্‌ছি। কিন্তু মা আমার বাক্সের চাবি পেলে কোথায়? নিশ্চয় তুইচুরি করে মাকে দিয়েছিলি?"

জয়ার উত্তেজনা দেখিয়া বরদার সাহস বিলুপ্ত হইয়া গেল, সে শুধু কহিল, "বাঃ রে, মা বল্‌লে যে—"

ভয় প্রদর্শনের ধরণে জয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, "ভালো চাস্ ত শীগ্‌গির দুল খুলে ফেল্ বল্‌ছি বরদা—"

এইবার বরদা রাগ করিল, বলিল, "কাকা ত দিয়েছে তোকে এটা,—তোরও কাকা, আমারও কাকা, তবে তুই একা নিবি কেন?"

"সে কথা বল্‌গে যা তোর কাকার কাছে—" বলিয়া জয়া একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল,—দ্রুতপদে সরিয়া আসিয়া বরদার কানের দুল দুইটা ধরিয়া মারিল এক হেঁচ্‌কা টান। চাম্‌ড়া কাটিয়া কর্ণাভরণ চলিয়া আসিল জয়ার হাতে! অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া বরদা আসিয়া বাঘিনীর মত জয়ার গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তাহাকে আঁচ্‌ড়াইয়া কাম্‌ড়াইয়া অকথ্য ভাষায় দিতে লাগিল গালাগালি,—এক ঝট্‌কা টানে তাহাকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিয়া বিজয় গৌরবে জয়া অন্তর্হিত হইল।

সেদিন স্কুল বন্ধ,—তাহার একটা এম্‌ব্রয়ডারী লইয়া জয়া অত্যন্ত ব্যস্ত এম্‌নি সময়ে মণীন্দ্রনাথ আসিলেন। মুখ তুলিয়া কাকাকে দেখিয়া জয়া হইল পুলকিত। মণীন্দ্রনাথ গত কয়েকদিন যাবৎ আসেন নাই,—এদিকে জয়া কয়েকটা জিনিষের আশু প্রয়োজন অনুভব করিতেছিল। কিন্তু অন্য কাহাকেও দিয়া আনাইলে, পয়সা খরচ করিতে হইবে ভাবিয়া সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, এখন মণীন্দ্রনাথকে দেখিয়া সেইজন্য সে প্রকৃতই আনন্দিত হইল, বলিল, "কি যে তুমি হচ্ছ কাকা, খবর নেই, বার্ত্তা নেই, কোথায় যে অদৃশ্য হ'য়ে যাও তা আর জান্‌বার যো নেই, —আমরা এদিকে ভেবে মরি।—" বলিয়া এম্‌ব্রয়ডারীর ফ্রেম, সূঁচ সূতা টেব্‌লক্লথ ইত্যাদি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে পুনরায় কহিল, "এখান থেকে খেয়ে যেয়ো কাকা, মা'কে চাল নেবার কথা বলে' আসি—"

তবুও মণীন্দ্রনাথকে নীরব দেখিয়া, ভালো করিয়া তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিতেই, তাঁহার চেহারার অস্বাভাবিক মলিনতা জয়ার চোখে পড়িল,—তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে কাকা, অসুখ করেছে তোমার?"

মাথা নাড়িয়া মণীন্দ্রনাথ কহিলেন, "না।"

"তবে?"

মণীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন না। কিন্তু জয়ার কৌতূহল একবার উদ্রিক্ত হইলে, পৃথিবীর কোনও বিরুদ্ধ শক্তির ভয়ে

সে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, এমন কথা জয়াকে যাহারা তিলমাত্র জানে তাহারা বলে না।

মনে মনে সে বিরক্ত হইয়াছিল, মণীন্দ্রনাথের রকম-সকম দেখিয়া তাঁহাকে দিয়া আজ যে আর কোনও দ্রব্য সামগ্রী কেনান যাইবে এমন বোধ হইতেছিল না, তবুও জয়া হাল ছাড়িল না। কাকার হাত ধরিয়া গভীর সহানুভূতির সুরে কহিল, "বল্‌তেই হ'বে কাকা কি হয়েছে,—না বল্‌লে ছাড়ছিনে কিছুতেই,—জান ত তোমাদের জয়ীকে।"—বলিয়া চেষ্টা করিয়া সে একটুখানি মলিন হাসি হাসিল।

মণীন্দ্রনাথের সমস্ত মুখে গভীর অবসাদের চিহ্ন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যেন তিনি পথে প্রান্তরে হতাশা সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছেন! কথাবার্ত্তা বলিবার মতন মনের অবস্থা তখন তাঁহার নয়। কিন্তু জয়াকে তিনি চিনিতেন, কাজেই মণীন্দ্রনাথকে কথা কহিতে হইল।

এক সওদাগরী অফিসের ক্যাশিয়ার বন্ধু অফিসের কিছু মোটা টাকা ভাঙ্গিয়া ধরা পড়েন,—তাঁহার জমার টাকা ছিল অযথেষ্ট, অতএব কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিলেন। এম্‌নি সময়ে মণীন্দ্রনাথ তাঁহার হইয়া জামিন দাঁড়াইয়া বন্ধুকে খালাস করিয়া আনেন। অফিসের ক্যাশ-ভাঙ্গা বন্ধুটি এই মুক্ত অবস্থায় অতিশয় বুদ্ধিমানের মতন সরিয়া পড়িয়াছেন!—তাঁহার জামিনের টাকা আজ বৈকালের মধ্যে মণীন্দ্রনাথকে পূরণ করিতে হইবে, নহিলে তাঁহাকে করিতে হইবে বন্ধুর স্থান গ্রহণ। দিবারাত্র এর কাছে তার কাছে ঘুরিয়া তিনি টাকার অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছেন, এখনও কিছু বাকী এবং সেটা জোগাড় হওয়ার আর কোনও সম্ভাবনাই নাই।

সমস্ত শুনিয়া গম্ভীর মুখ করিয়া জয়া নীরব হইয়া রহিল, কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কত টাকা এখনও বাকী?"

জয়ার কাছে অনর্থক এতগুলা কথা বলার জন্য মণীন্দ্রনাথ নিজের পরে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,—জয়ার এই প্রশ্নে তাঁহার বিরক্তির মাত্রা শুধু বাড়িল,—তিনি আর কোন উত্তর দিলেন না।

জয়া বুঝিল একটু দুঃখ প্রকাশ করা আবশ্যক, কণ্ঠস্বর সাধ্যমত করুণ করিয়া সে কহিল, "আহা এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!—কেন যে পরের জন্যে সেধে এসব ঝক্কি তোমরা ঘাড়ে নিতে যাও!"

সহানুভূতি শেষ হইয়া গেল,—জয়া তাহার সেলাইয়ের সরঞ্জাম লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "তুমি তাহ'লে এখানে খাবে না কাকা? মা'কে চাল নিতে বল্‌ব না তাহ'লে?"

সেলাইয়ের বাক্সে জিনিষগুলা গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে জয়ার কি মনে হইল কে জানে! সে ভাবে, কাকাকে যদি জেলে ধরিয়া লইয়া যায়! স্কুলের মেয়েরা যদি কোনদিন আভাসেও টের পায় যে জয়ার কাকাকে টাকার জন্য জেলে লইয়া গেছে, তাহা হইলে!—কিন্তু তাহারা যদি ঘুণাক্ষরে কোনদিন কিছু না জানিতে পারে, তবুও মণীন্দ্রনাথকে জেলে যাইতে হইবে, একথা যেন সে কল্পনা করিতে পারে না। মানসনেত্রে ঘটনাটা ঘটিতে দেখিয়া সে বারংবার শিহরিয়া উঠিতে থাকে। একটা তীব্র বেদনা পলকের জন্য মনের মধ্যে দেখা দিয়া যায়,—না বোঝা যায় তাহার কারণ, না টের পাওয়া যায় তাহার ইঙ্গিত।

হঠাৎ মাটিতে পা ঠুকিয়া, দাঁতে দাঁত চাপিয়া, ছোট ছোট কোঁকড়ান চুল ঝাঁকাইয়া অতিশয় দৃঢ়তার সহিত জয়া নিজের মনেই বলে, "না তা হ'বে না, আমি থাক্‌তে কাকাকে কিছুতেই জেলে যেতে দেব না—"

জয়া যখন এঘরে ফিরিয়া আসিল, তখনও দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়া মণীন্দ্রনাথ একভাবেই বসিয়া আছেন। টাকা জোগাড় হইবে না, ইহা জানা কথা,—সম্ভব অসম্ভব কোন স্থানেই তিনি ত চেষ্টা করিতে বাকী রাখেন নাই,—অতএব পরিশ্রম করিয়া আর লাভ নাই। চিন্তা করিয়াও বিশেষ ফল নাই। শূন্যদৃষ্টিতে গৃহের ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া মণীন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইয়া ছিলেন।

জয়া যখন এঘরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন গভীর উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, বাহিরের কাহারও দৃষ্টিতে সে কাঁপন ধরা পড়িবার নয়,—কিন্তু তাহার

বোধ হইল যেন মাঘের দুরন্ত শীতে মাদ্রাজের গরমের পোষাক পরিধান করিয়া দার্জ্জিলিং-এর পথে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়াছে সেইজন্য। জয়ার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের গতি অত্যন্ত দ্রুত হইয়া উঠিল। সে আসিয়া মণীন্দ্রনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল। মণীন্দ্রনাথ যেমন শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন, তেমনই চাহিয়া রহিলেন, জয়াকে যে দেখিতে পাইয়াছেন, এমনও বোধ হইল না। জয়া একটু কাশিয়া নিজের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করিল।—একটা দ্বিধা, একটা অত্যন্ত সচেতন সঙ্কোচ তাহার মনে উদিত হয়, বোধ হয় যেন সে আবার চিন্তা করিয়া লইতে চায়!—জয়া ভাবে, ফিরিয়া যাইবে কিনা!

সহসা মণীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কিছু বল্‌ছিলি?"

ফিরিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াও ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হইল, কম্পিত কণ্ঠে জয়া কহিল, তোমার এখনও কত টাকা বাকী?"

প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কারভাবে না বুঝিলেও মণীন্দ্রনাথ কহিলেন, "শ' চারেক, কিন্তু তা দিয়ে তোমার দরকার কি?"

জয়া নীরব হইয়া গেল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মণীন্দ্রনাথ চাহিয়া রহিলেন।

জয়া ধীরে ধীরে কহিল,—তাহার স্বরে কুণ্ঠার আর সীমা নাই, পৃথিবীর লজ্জা যেন এই লজ্জাহীনা মেয়েকে আজ আশ্রয় করিয়াছে। জয়া কহিল, "আমার হার দুটো আর দু'সেট চুড়ি তুমি নিয়ে যাও,—তোমারই দেওয়া জিনিষ ত কাকা,—আজ তোমার কাজে লাগুক। অনেক সোনা আছে, বন্ধক দিলে যে কোনও পোদ্দারের দোকান থেকে তুমি চারশ' টাকা পাবে—"

দরজার পাশ হইতে তাঁহার প্রপিতামহের প্রপিতামহকে সেই স্থানে রক্তমাংসের শরীরে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দেখিলেও মণীন্দ্রনাথ ইহার শতাংশের একাংশ আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন কিনা সন্দেহ!—জয়ার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি যেন পাথর হইয়া গেলেন,—সে যে পুলকে, না বিস্ময়ে, না অবিশ্বাসে, তাহা বলা শক্ত। মনে হইল, তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গেছে, সমস্ত দিনের দুশ্চিন্তায় মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে,—রৌদ্র করোজ্জ্বল দিবসের মধ্যাহ্নকালেও উন্মুক্তচোখে বসিয়া তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন! স্থির করিলেন, এইবার উঠিয়া মেসে ফিরিবেন, ভালো করিয়া স্নান করিলেই মাথা ঠাণ্ডা হইবে তখন শান্ত মনে জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেন,—অনর্থক এখানে সেখানে ছুটাছুটি করিয়া লাভ নাই।

জয়া অতিশয় লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল, কহিল "আবার যখন তোমার সুবিধে হ'বে, তখন ছাড়িয়ে এনে দিলেই ত চল্‌বে—"

নিজের অবসাদগ্রস্ত মনটাকে বিপুল প্রয়াসে একটা নাড়া দিয়া মণীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ সচেতন হইয়া উঠিয়া কহিলেন "আমায় কিছু বল্‌ছিলি?"

এবার জয়া বিস্মিত হইল, বিরক্তও হইল, ঈষৎ তীক্ষ্ণতার সহিত কহিল, "বল্‌ছিলুম কি আমার হার দুটো আর দু'সেট চুড়ি যদি কোনও লোকের কাছে বাঁধা রাখ, তাহ'লেই ত স্বচ্ছন্দে তুমি চারশ' টাকা আজই পেতে পার,—তারপর টাকা হাতে হ'লেই ত ছাড়িয়ে আনলে চলবে।"

মণীন্দ্রনাথের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হঠাৎ তাঁহার যে কত ভালো লাগিতে লাগিল তাহা বলা যায় না,—টাকার জন্য নয়, গভীর নিশ্চিন্ততার জন্য নয়, এতবড় একটা সমস্যার এমন চমৎকার সমধান এরূপ সহজে সম্ভব হইল বলিয়াও ঠিক নয়।—মনে হইল, জয়ার স্বরূপটা এতদিনে প্রকাশিত হইল, বাহিরের মলিনতার দ্বারা জয়া যেন এতকাল সুকৌশলে নিজেকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ কত গৌরবেই না সে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! তাহার নিজেরও অগোচর যে মন তাহার কাছে শান্ত শিশুটির মত জয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কাকার প্রতি যে সুনিবিড় ভালবাসা তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গভীর অবগুণ্ঠনের আড়ালে লুক্কায়িত ছিল, আজ পরম দুঃখের দিনে, আকস্মিক বিপদের মুহূর্ত্তে সে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চূড়ান্ত পরীক্ষা হইয়া গেছে!

মণীন্দ্রনাথ যে কত আনন্দিত হইলেন, জয়ার প্রতি উচ্ছ্বসিত স্নেহে তাঁহার হৃদয় যে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সমস্ত সত্ত্ব দিয়া যেন জয়া সেকথা অনুভব করিতে লাগিল।

মণীন্দ্রনাথ কহিলেন, "তা হয় না জয়ী, তোর জিনিষ বাঁধা দিয়ে আমি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারব না।"—মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আর তা ছাড়া জানিস্‌নে, দেওয়া জিনিষ ফিরিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়?"

মাটির দিকে চোখ রাখিয়া মৃদুস্বরে জয়া কহিল, "তুমি ত একেবারে নিচ্ছ না,—তোমার হাতে টাকা হ'লেই ত তুমি আবার এ জিনিষ ফিরিয়ে আন্‌বে।"

"তা হ'ক্‌, তবু আমি নিতে পারিনে,—কিন্তু কত যে আনন্দ পেয়েছি তোর কথায় তা বল্‌তে পারিনে। মনে হচ্ছে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা ধুয়ে মুছে গিয়েছে, ভাবনা কর্‌বার আর আমার কিছু নেই।"

জয়া কহিল, "তা হ'বে না কাকা, গহনা তোমাকে নিতেই হ'বে,—আমার জিনিষ বাক্সে থাক্‌তে আমি তোমাকে জেলে যেতে দিতে পারব না।"

মণীন্দ্রনাথ স্নেহের হাসি হাসিলেন, গভীর প্রীতির সহিত কহিলেন, "তা হয় না রে পাগ্‌লী, তা হয় না—"

কিন্তু সব দিক বিবেচনা করিয়া এবং ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল, কহিলেন, "আচ্ছা বার করে' রাখিস তোর জিনিষ বাক্সের ভিতর থেকে, আমি আড়াইটে তিনটের সময় এসে নিয়ে যাব,—ইতিমধ্যে পোদ্দারের দোকানে কথাবার্ত্তা ঠিক করে' আস্‌ব খন।—চারটে জিনিষে কত ভরি সোনা আছে রে জয়ী?"

জয়া কহিল, "ভরি তিরিশেক হ'বে,—বেশী ছাড়া কম নয়—"

"আচ্ছা, কিন্তু শতকরা বারো টাকা হিসেবে সুদ নিতে হ'বে তোকে এই চার শ' টাকার উপর, আরও পাবি একটা গহনা মাসখানেক পরে, তখনই পাবি এগুলোও ফেরত—" বলিয়া গভীর স্নেহে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "পাগ্‌লী মেয়ে, একটা পাগ্‌লী মেয়ে!—"

ঘড়ির কাঁটা দশটার পর এগারোটা, এগারোটা অতিক্রম করিয়া বারোটার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।—জয়ার মনে হয়, আড়াইটা তিনটার সময় কাকা আসিবে! ঘড়ির দিকে চাহিয়া চাহিয়া জয়ার চোখের দৃষ্টি আর ফিরিতে চায় না। সে ভাবে ঘড়িটাকে চোখের আড়াল করিলেই কি কাকার আসা বন্ধ হইবে।

মণীন্দ্রনাথের টাকায় গহনা কেনা হইয়াছিল বলিয়াই যে তাঁহার বিপদে এগুলা দান করিতে হইবে, এ-যুক্তি জয়া ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। কাকাকে কেহ তাহাদের প্রতি স্নেহপ্রকাশ করিতে সাধ্যসাধনা করে নাই,—আর সাধিলেই বা কি?—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, তাহারা ছাড়া দিবার লোক তাঁহার আর কেহ নাই,—উপার্জ্জনের টাকা না হয় তাহাদের জন্যই ব্যয় করিয়াছে, তাই বলিয়া দামী গহনাগুলা মণীন্দ্রনাথের হাতে তুলিয়া দিয়া জয়াকে তাঁহার আহাম্মকীর খেসারত গণিতে হইবে, ইহাও ত কম আবদার নয়! হয় ত কোনদিন ও গহনা আর ফেরত পাওয়া যাইবে না,—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত এমনিতর হইয়া থাকে,—মনে হইতেই গভীর দুঃখে জয়ার বুকের ভিতরটা টনটন করিতে লাগিল।

ঘড়ির কাঁটা দ্রুতগতিতে ঘুরিয়া তখন একটার ঘরে পৌছিয়াছে। কিন্তু কাকা,—কাকাকে যদি জেলে যাইতে হয়! তাহা ত হইবেই, অপরাহ্ণ চারটের মধ্যে টাকা না দিলে তাহা ত নিশ্চয়ই হইবে।—চোখের সম্মুখে নিজের অতীত জীবনের সমস্ত দৃশ্যটা নূতন মুদ্রিত গ্রন্থের আন্‌কোরা ছবির মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন, তাহাদের জন্য যে ত্যাগ, যাহার মধ্যে কলরব ছিল না, যাহার মধ্যে কোনদিন কিছু ফিরিয়া পাইবার কোনও সম্ভাবনার কথা বিন্দুমাত্র ছিল না,—শুধু কেবল দেওয়ার আনন্দে যে দান, সারাজীবনব্যাপী কাকার সেই দানের কথা জয়ার মনে পড়িল। এ কথা সে কোনদিন ভাবে নাই, একথা চিন্তা করার মত মনও তাহার কোনদিন ছিল না,—মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগেও নিজের সম্বন্ধে এ উক্তি অপরের মুখ হইতে শুনিলে জয়া তাহাকে বদ্ধ পাগল স্থির করিয়া তাহার মাথা হাতে কাটিবার বন্দোবস্ত করিত!—অথচ মণীন্দ্রনাথের সহিত তাহাদের মতে মিল নাই, পথে মিল নাই, শিক্ষা দীক্ষা রুচিতে মিল নাই। সর্ব্ব বিরোধ সর্ব্ব ভেদ অগ্রাহ্য করিয়া তবুও তাঁহার যে স্নেহ, সে যে কত গভীর কত আন্তরিক, সে কথা তাহার জীবনে জয়া যেন আজ সর্ব্বপ্রথম বুঝিল।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া গিয়া তখন দেড়টার কাছে পৌছিয়াছে। জয়ার দুই চোখ প্লাবিত করিয়া জল দেখা দিল,—এই সামান্য ত্যাগটুকু করিতে তাহার বাধিবে না, কাকা যদি না আর গহনা ছাড়াইয়া আনিতে পারেন, না পারিবেন। ছাই গহনা! উচ্ছন্নে যাক অমন গহনা! শক্ত সোনার ড্যালা করা পিণ্ড!—মণীন্দ্রনাথের সম্মান, মণীন্দ্রনাথের নির্ব্বিঘ্নতার কাছে কিই বা উহার মূল্য! কাকাকে অমর্য্যাদা হইতে রক্ষা করার জন্য উহার দশগুণ মূল্যের সামগ্রী আজ জয়া দান করিতে পারে!

ঘড়ির কাঁটা দুইটার কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। —জয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্ত অনুভব করিতে লাগিল।

পৌনে তিনটার সময় সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিতেই মানদা কহিলেন, "তোর কাকা আস্‌বে বল্‌ছিলিনে জয়ী, বোধ হয় সে-ই এল, যা দরজা খুলে দিয়ে আয়—"

ব্যস্তভাবে জয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মায়ের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস করিয়া বলিল, "আমি ওঘরে গিয়ে চুপ করে' বসে' থাকি, কাকাকে তুমি দরজা খুলে দিয়ে এসো। আমার কথা জিজ্ঞেস কর্‌লে বোলো, স্কুলের এক মেয়ের বাড়ী গিয়েছি, বড্ড দরকার, সে ছাড়লে না কিছুতেই, —বোলো মা, বোলো কাকাকে, লক্ষ্মীটি—"

সদর দরজার কড়া আবার নড়িয়া উঠিতেই ব্যাধভয়ত্রস্তা হরিণীর মত জয়া ছুটিয়া পাশের ঘরে পলায়ন করিল।

মানদা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন,—মণীন্দ্রনাথ উপরে উঠিয়া আসিলেন, ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "পাগ্‌লী কই রে?"

মানদা কহিলেন, "জয়ী ত বাড়ী নেই ঠাকুরপো, ইস্কুলের এক মেয়ের বাড়ী গেছে, আস্‌তে রাত্তির হ'বে,—সে মেয়ে এসেছিল নিজে, জয়ী কিছুতেই যাবে না, এক রকম জোর করে' ধরে' নিয়ে গেল, ছাড়লে না কিছুতেই। ইস্কুলে দিয়ে মেয়েকে এই সব ত লাভ হচ্ছে, এদের নিয়েই আমাদের ঘর কর্‌তে হ'বে ত—"

মণীন্দ্রনাথের কথা কহার শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল, তবুও অনেক কষ্টে কেবল বলিলেন, "জয়ী তোমার কাছে কিছু বলে' যায়নি বৌঠান?—কোন জিনিষ রেখে যায়নি?"

দৃঢ়তার সহিত মাথা নাড়িয়া মানদা কহিলেন, "না—"

পাশের ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া, মুখের মধ্যে কাপড়ের আঁচল পুরিয়া দিয়া জয়া প্রাণপণে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের শব্দ রোধ করিতেছিল। কোথায় যেন তাহার জন্য আজ পৃথিবীর কালিমা সঞ্চিত হইল! অথচ উপায় কি, নিজের হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার তাহার পথ কই,—আপনাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার মত মন কই!

মণীন্দ্রনাথ আর কথা কহিলেন না,—মৃতের ন্যায় বিবর্ণ মুখ, কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ভাবলেশহীন চোখ লইয়া তিনি অতি ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন,—তাঁহার পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল।—

জয়া তখন ফুলিয়া ফুলিয়া ঠিক পাগলের মত কাঁদিতেছে, সে ক্রন্দনের যেন শেষ নাই, কূল নাই, বিরাম নাই! অসহ্য অপমানের দুরন্ত ব্যথা ওর বুকে, বিশ্বের অমর্য্যাদা ওর সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া। ও যেন আর পৃথিবীকে ক্ষমা করিবে না, জগৎ সংসারকে ক্ষমা করিবে না, নিজেকে মার্জ্জনা করিবে না।

শ্রাবণের মেঘলা দিনের আকাশ শান্তি মানে না, সেই লজ্জাহীনা অপরিচ্ছন্ন মেয়ে কাঁদে ত কাঁদেই।

শ্রীআশীষ গুপ্ত

কাউণ্ট দি বইন

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, পি-আর-এস

ভারতবর্ষে সমাগত ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃন্দের মধ্যে চরিত্রের উৎকর্ষ এবং কৃতকার্য্যের সাফল্য উভয়বিধ কারণেই কাউণ্ট বেনোয়া দি বইনের স্থান অতি উচ্চে। দি বইন জাতিতে ইটালিয়ান, স্যাভয় প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন।* উক্ত প্রদেশের অন্তঃপাতী শাম্বেরী নগরে এক চর্ম্মব্যবসায়ীর (fur) গৃহে ৮ই মার্চ্চ ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে বেনোয়ার জন্ম হয়। তিনি পিতার দ্বিতীয় পুত্র। সংসারের অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল না হইলেও পুত্রগণ যাহাতে সুশিক্ষা লাভ করে সে বিষয়ে পিতার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং তিনি তাহাদের কলেজে দিয়া তখনকার দিনের পক্ষে যথাসম্ভব উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে বেনোয়া গ্রীক ও লাটিন ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পুত্র বড় হইয়া আইনজীবী হয় ইহাই ছিল পিতার আন্তরিক অভিলাষ। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই বেনোয়ার সামরিক জীবনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। এ কারণ তাঁহার পিতা পুত্রের ইচ্ছায় বাধা না দিয়া তাঁহাকে তদুপযোগী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই দি বইন ফরাসীদেশের সেনাবিভাগে প্রবেশ করিলেন (১৭৬৮ খৃঃ)।

উচ্চবংশ সম্ভূত না হইলে তখনকার দিনে সার্ডিনিয়া রাজ্যের সেনাবিভাগে প্রবেশ করা সহজসাধ্য ছিল না। কোনও মতে প্রবেশ করিতে পারিলেও আশানুরূপ পদোন্নতি লাভকরা সম্ভব ছিল না। তদ্ভিন্ন সার্ডিনিয়া ফ্রান্সের তুলনায় ক্ষুদ্ররাজ্য। শেষোক্তদেশের সেনাবিভাগে সামরিক অভিজ্ঞতা ও গৌরবলাভের ক্ষেত্র প্রশস্ততর। এই সকল নানাকারণে দি বইন স্বদেশীয় রাজার কর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া বিদেশী নরপতির অধীনে ভাগ্য পরীক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ফ্রান্স ও ইটালীরাজ্যের সীমানারূপে অবস্থিত স্যাভয় প্রদেশের অধিবাসীরা উভয় ভাষাতেই তুল্যরূপে পারদর্শী ছিল। সুতরাং দি বইনও ফরাসী ও ইটালীয় উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি থাকার জন্য অসুবিধায় পড়েন নাই। ফরাসীরাজার একদল আয়র্লণ্ডদেশীয় ভৃতিভুক সৈন্য ছিল। ইংরাজশাসনে অসন্তুষ্ট বহুসংখ্যক আইরিশ জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া আসিয়া বিদেশী রাজার বাহিনীর বলবর্দ্ধন করিত। দি বইন সর্ব্বপ্রথম এই আইরিশ-ব্রিগেডেই লর্ড ক্লেয়ারের রেজিমেণ্ট 'এনসাইন' পদ লইয়া প্রবেশ করেন। লর্ড ক্লেয়ারের অনুপস্থিতিতে কর্ণেল লে তখন রেজিমেণ্টের অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন। তিনি নবাগত সৈনিককে যথাজ্ঞান সমরবিদ্যা শিখাইলেন। আইরিশব্রিগেডে থাকার ফলে দি বইনের ইংরাজী ভাষাটা ভালরূপ শেখা হইল। তখন কি তিনি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন পরবর্ত্তী জীবনে উহা তাঁহার কত কার্য্যে লাগিবে?

সাড়ে তিন বৎসর কাল লাঁন্ড্রেসীদুর্গে অবস্থানের পর দি বইনের রেজিমেণ্ট ভারতমহাসাগরস্থ মরিশদ্বীপে প্রেরিত হয়। তথায় দেড় বৎসর থাকার পর আবার উহাদের ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তৎকালে

---

* স্যাভয়দেশ তখনও ফ্রান্সের কুক্ষিগত হয় নাই। উহা তখন স্বাধীন পীডমণ্ট বা সার্ডিনিয়ারাজ্যের অংশ ছিল। ইটালীর স্বাধীনতা সমরে (১৮৪৮-৭০ খৃষ্টাব্দ) সার্ডিনিয়ার রাজারাই অগ্রণী ছিলেন এবং কালে সমগ্র ইটালী এক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইলে সার্ডিনিয়ার রাজাই ঐ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্যের মূল্যরূপে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীসম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সার্ডিনিয়ার নৃপতির নিকট হইতে স্যাভয়প্রদেশ গ্রহণ করেন। সেই অবধি স্যাভয় ফরাসীরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমানেও কিন্তু ইটালীর রাজবংশ 'স্যাভয়বংশ' নামে পরিচিত।

দিনে ফ্রান্স কোন সময়ে লিপ্ত ছিল না। এরূপ নিষ্ক্রিয়-জীবন দি বইনের দীর্ঘকাল ভাল লাগিল না। যে উদ্দেশ্যে স্বদেশের মায়া কাটাইয়া তিনি বিদেশী রাজার কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইবার কোনই সম্ভাবনা তিনি দেখিতে পাইলেন না। মুরুব্বি না থাকিলে ফরাসী সেনাবিভাগেও যে পদোন্নতি অনায়াসলভ্য নহে তাহা তিনি বুঝিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক অতঃপর অন্যত্র ভাগ্যপরীক্ষা করিতে সমুৎসুক হইলেন (১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ)।

তখন রুষীয়া ও তুরস্কে সংগ্রাম চলিতেছিল। দি বইন শুনিলেন রুষীয় সেনাদলে সামরিক কর্ম্মচারীর একান্ত অভাব। অভিজ্ঞ অফিসার পাইলে কর্ত্তৃপক্ষ সমুচিত বেতনে কর্ম্মদান করিতে প্রস্তুত। এক সঙ্গে অর্থ, যশ, পদোন্নতি ও সামরিক অভিজ্ঞতালাভের সম্ভাবনা দেখিয়া দি বইন পরম পুলকিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্মত্যাগ করিয়া পীডমণ্টরাজ্যের রাজধানী তুরিননগরে আগমন করিলেন এবং প্রধান মন্ত্রী Marquis d' Aigublancheএর নিকট হইতে একটি পরিচয়-পত্র লইয়া কালবিলম্ব ব্যতিরেকে রুষীয় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ কাউণ্ট অরলফ সমীপে গমন করিলেন। তিনি দি বইনকে একদল গ্রীক ভলাণ্টিয়র সেনার কাপ্তেন পদে নিযুক্ত করিলেন।

দি বইনের কিন্তু বেশীদিন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা হয় নাই। ঈজিয়ানসাগরস্থ টেনেডোসদ্বীপ আক্রমণকালে তিনি শত্রু-হস্তে বন্দী হন। তুর্ক কারাগারে তাঁহাকে বহুবিধ ক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার ইহার উপর রং ফলাইয়া লিখিয়াছেন যে তুর্করা বন্দীদের দাসত্বে বিক্রয় করিয়াছিল। কনষ্টাণ্টিনোপলের জনৈক ধনীব্যক্তি বেনোয়াকে ক্রয় করেন। ক্রীতদাস অবস্থায় তাঁহার দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। কোন সুযোগে নিজের দুরবস্থা পিতার গোচরীভূত করিতে সমর্থ হইলে তিনি প্রচুর মুক্তিপণ বিনিময়ে পুত্রের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। এ কাহিনী সর্ব্বৈব কাল্পনিক। যথাকালে উভয় দেশের মধ্যে সন্ধিস্থাপিত হইলে দি বইন বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন (জুন ১৭৭৪)।

অতঃপর বেনোয়া রুষীয় রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গে (এখন লেনিনগ্রাড) গমন করেন। তুর্কহস্তে ধৃত হইয়া তিনি যে সকল দুঃখক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন তজ্জন্য সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইনের নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পথিমধ্যে ভারতবর্ষ হইতে সমাগত কতিপয় ইংরাজ বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের নিকট ঐ দেশের সুখসমৃদ্ধির কথা শুনিয়া তথায় ভাগ্যপরীক্ষার্থ যাইতে তাঁহার বাসনা জন্মিল। ক্যাথারাইন দি বইনের সহিত আলাপে পরম প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে নিজ সেনাদলে মেজর পদে উন্নীত করিলেন এবং অজ্ঞাত-প্রায় মধ্য এশিয়ার অভ্যন্তর প্রদেশে একটি অভিযানের নায়কত্ব প্রদান করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে চাহিলেন। সম্রাট পিটার দি গ্রেট তাঁহার বিখ্যাত উইলে নিজ উত্তরাধিকারীগণকে পূর্ব্বাঞ্চলে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে যে অনুজ্ঞা দিয়া গিয়াছিলেন, বলাবাহুল্য তাঁহারা সকলেই সে নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার চেষ্টা করিতেন। ক্যাথারাইনও এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া মধ্য এশিয়ায় অভিযান পাঠাইতেছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে রুষীয়ায় রাষ্ট্র বিপ্লবের পর যখন বিদ্রোহী গভর্ণমেণ্ট প্রচার করিলেন যে কনষ্টাণ্টিনোপলের উপর তাঁহাদের কোন লোভ নাই তখন রাজ্যচ্যুত সম্রাট নিকোলাস নাকি বলিয়াছিলেন, "এতকাল পরে পিটার দি গ্রেটের উইল ইহারা ছিঁড়িয়া ফেলিল!"

সে কথা যাউক। দি বইন নিজ কার্য্যভার লইয়া চলিলেন। মধ্য এশিয়ার পথে ভারতবর্ষে উপনীত হওয়াই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। দক্ষিণ রুষীয়া দিয়া যাইবার কালে ইংলণ্ডের আর্ল পার্সির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। তিনি তখন দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। বেনোয়ার সহিত আলাপে প্রীত আর্ল মহাশয় তাঁহাকে ভারতবর্ষে প্রয়োজনে আসিতে পারে এরূপ কয়েকখানি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপল, এবং আলেপ্পোর পথে বোগদাদ পঁহুছিয়া তথা হইতে বসোরাগামী স্বার্থবাহকুলের সহিত দি বইন পারস্যপ্রবেশের চেষ্টা করেন। তখন তুরস্ক ও পারস্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। তুরস্ক হইতে সমাগত বিদেশীকে গুপ্তচর সন্দেহে পারস্য রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের দেশে প্রবেশ

করিতে দিল না। দি বইন ইহাতে বিন্দুমাত্র হতাশ হইলেন না। তিনি অতঃপর জলপথে ভারতবর্ষে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং তজ্জন্য যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই আবার আলেপ্পো ফিরিয়া গেলেন। তথা হইতে পোতারোহণে মিশরদেশে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে গমন করিলেন। ঐ স্থান হইতে রোসেটা গমনকালে দুর্ভাগ্যক্রমে পোতভঙ্গবশতঃ তিনি আরবগণের হস্তে নিপতিত হয়েন। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে উহারা তাঁহার কোন অনিষ্ট ত করেন নাই, বরং তাহাদের আনুকূল্যেই তিনি কায়রোয় আসিয়া উপনীত হইতে সমর্থ হন। তথা হইতে সুয়েজে আসিয়া তিনি ভারতবর্ষগামী জাহাজে আরোহণ করিলেন এবং ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের শেষে মান্দ্রাজে আসিয়া উপনীত হইলেন। দি বইনের পর্য্যটনের যে সুদীর্ঘ বিবরণ প্রদত্ত হইল তাহা হইতেই তাঁহার ধৈর্য্য, একাগ্রতা ও শ্রম-সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ভারতবর্ষে আসিয়া দি বইন দেখিলেন অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনই পরিশ্রম ব্যতিরেকে অর্থলাভ অসম্ভব, পদোন্নতির জন্য মুরুব্বির প্রয়োজন। এদেশে সত্যই টাকার গাছ নাই, যে নাড়া দিয়া কুড়াইয়া লইলেই হইবে। তিনি একে সহায় সম্পদহীন বিদেশী; তদ্ভিন্ন ফরাসী এবং রুষীয় সৈন্যদল সংশ্লিষ্ট বলিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সন্দেহের পাত্র। দি বইন বুঝিলেন তাঁহার পক্ষে রাতারাতি ধনবান হওয়া সম্ভব নহে। প্রথমে তিনি মান্দ্রাজনগরে তরবারী চালনাবিদ্যা শিক্ষা দিবার এক স্কুল করিলেন। কিন্তু একার্য্যে আবশ্যক মত অর্থার্জ্জন হইল না, সঞ্চিত পুঁজিও ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। তখন অগত্যা উদরান্ন সংস্থানের জন্য তাঁহাকে অর্থলাভের অন্য উপায় খুঁজিতে হইল। তিনি দেখিলেন কোম্পানীর সেনাবিভাগে একেবারে উচ্চপদপ্রাপ্তি তাঁহার মত বিদেশীর পক্ষে সম্ভব নহে। তখন অগত্যা লর্ড পার্সির প্রদত্ত পরিচয় পত্রের বলে ফরাসী সেনাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব কাপ্তেন এবং রুষীয় সেনাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব মেজর কোম্পানীর দেশীয় সিপাহীদলে "এনসাইন" বা নিম্নতম অধস্তন কর্ম্মচারীর পদগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পৃথিবীর তিনটি প্রধানতম রাষ্ট্রের সেনাবিভাগে তাঁহার কর্ম্ম করা হইল।

তখন দক্ষিণ ভারতবর্ষে ফরাসীদের এবং হায়দার আলির সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ চলিতেছিল। আমেরিকার বিদ্রোহী ঔপনিবেশিকগণকে ফরাসীরা সাহায্য করায় ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (ফেব্রুয়ারী ১৭৭৮) এবং উহা হইতে অচিরেই মহিশূরাধিপতির সহিত ও ইংরাজদের সমর বাধিয়া গেল। কলিকাতা হইতে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস্ মান্দ্রাজ কর্ত্তৃপক্ষকে দক্ষিণ ভারতবর্ষে অবস্থিত যাবতীয় ফরাসীরাজ্য অধিকার করিবার আদেশ দিলেন। পন্দিচেরী, মাহি প্রভৃতি ফরাসী বন্দর সমূহ একে একে ইংরাজের করায়ত্ত হইল। মাহি ছিল হায়দারের রাজ্য মধ্যে অবস্থিত। তিনি ইংরাজদিগকে মাহি আক্রমণ হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায় অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং নিজ বিশালবাহিনীসহ প্রলয়ের প্লাবনের মতই কর্ণাটক প্রদেশের উপর নিপতিত হইলেন (জুন ১৭৮০)। পেরাম্বকম বা কঞ্জেভেরমের যুদ্ধে কর্ণেল বেলী পরিচালিত ইংরাজ সেনাবাহিনী হায়দারনন্দন টিপুর হস্তে বিধ্বস্ত হইলেন (৮-১০ই সেপ্টেম্বর)। হেড-কোয়ার্টার্স হইতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কামান গর্জ্জন শুনা গেলেও বিপন্ন ইংরাজ-বাহিনীকে উদ্ধারের কোনই চেষ্টা করা হইল না। বন্দী ইংরাজ সেনার প্রাণরক্ষা বিপক্ষ সেনাদলভুক্ত ফরাসী-সৈনিকগণের চেষ্টাতেই সম্ভব হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজের এরূপ পরাজয় খুব কমই হইয়াছে। বেনোয়ার রেজিমেণ্ট বেলীর সেনাদলভুক্ত থাকিলেও যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি কার্য্যান্তরে অন্যত্র গমন করায় ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ইহার অনতিকাল পরেই এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে তিনি ইংরাজের কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এক মিথ্যাপবাদে বিজড়িত হইয়া তিনি কোর্টমার্শালে বিচারার্থ আনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিচারের ফলে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও রেজিমেণ্টের এডজুটাণ্টের পদ যখন খালি হইল তখন উহা তাঁহাকে না

দিয়া অধস্তন অপর এক ব্যক্তিকে দেওয়া হইল। এ অপমান সহ্য করিয়া থাকিবার পাত্র দি বইন ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষের নিকট নিজ পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিলেন। ইহাতে গভর্ণর লর্ড ম্যাকার্টিনির বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি নিজে এ বিষয়ে তদন্ত আরম্ভ করিলেন এবং দি বইনের প্রতি সত্যই অন্যায় করা হইয়াছে বুঝিয়া তাহার প্রতিকার সাধনে সমুদ্যত হইলেন। কিন্তু বেনোয়ার আর ইংরাজের কর্ম্ম করিবার স্পৃহা ছিল না। তিনি মধ্য এশিয়ার পথে রুষীয়ায় ফিরিয়া যাইতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ম্যাকার্টিনির নিকট হইতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের নামে একটি পরিচয়-পত্র লইয়া কলিকাতা আগমন করিলেন (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ)।

হেষ্টিংস তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সাধ্যে যাহা কুলায় তাহা করিলেন অর্থাৎ পথিমধ্যে কাজে আসিতে পারে এরূপ বহুসংখ্যক পত্র তাহার নামে দিলেন। ঐ গুলি লইয়া দি বইন উত্তর ভারতাভিমুখে গমন করিলেন এবং যথাসময়ে লক্ষ্ণৌ নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন আসফ উদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব। চারিদিক বিলাসিতা ও আড়ম্বরে ভরপুর। অন্যতম বিখ্যাত ফরাসী ভাগ্যান্বেষী ক্লদ মার্টিন ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়া জুটিয়াছেন, নবাব দরবারে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে। কোম্পানীর এজেণ্ট মেজর মিডলটন দি বইনকে দরবারে পরিচিত করিয়া দিলেন। নবাব তাঁহাকে পরম সমাদরে আপ্যায়িত করিয়া একপ্রস্থ খিলাৎ দান করিলেন, শুনা যায় তাহার দাম নাকি চারি হাজার টাকা। বুদ্ধিমান বেনোয়া পরদিনই তাহা এক মোগল আমীরের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন! তদ্ভিন্ন নবাব তাঁহাকে কাবুল এবং কান্দাহারের মহাজনদের নামে বারহাজার টাকার হাতচিঠা দিয়াছিলেন। আলাপ পরিচয়ে এবং ফারসী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষাতেই পাঁচ-মাসকাল লখ্‌নৌয়ে কাটিয়া গেল।

এই সময়ে হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বিখ্যাত উজীর মীর্জ্জা নজফ খাঁর চেষ্টায় মোগল সাম্রাজ্য তাহার দ্রুত অধোগতির পথ হইতে একটা সাময়িক আশ্রয় ও বিরাম লাভ করিয়াছিল। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে ৪৯ বৎসর বয়সে মীর্জ্জার দেহান্ত হইল। তখন আর মোগল সাম্রাজ্যকে পতনের পথ হইতে রক্ষা করিবার কেহ রহিল না। এ সকল কথা ইতিপূর্ব্বে মাদেক প্রসঙ্গে বলিয়াছি। অতঃপর তাঁহার শূন্যপদ লইয়া তাঁহার দত্তকপুত্র আফ্রাসিয়াব খাঁ এবং মীর্জ্জা সফি খাঁর মধ্যে বিবাদ বাধিল। কলহ প্রিয় দুর্দ্দান্ত আমীরের দল সফির পক্ষাবলম্বন করিয়া বাদসাহ এবং তাঁহার নূতন উজীরের বিরোধিতাচরণ আরম্ভ করিল। সাহআলমের জ্যেষ্ঠপুত্র সাহজাদা জীবন বখ্‌ৎ জাহান্দর সাহ উহাদের কবল হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। সফিকে গোপনে ধৃত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। গুপ্ত চক্রান্তের আভাস পাইয়া মীর্জ্জাসফি দিল্লী হইতে পলায়ন করিল। অতঃপর বাদসাহ নজফ খাঁর দেহান্তে শূন্য আমীর উল ওমরার পদ আফ্রাসিয়াব খাঁকে দিলেন। এদিকে সফিও নিশ্চেষ্ট ছিল না। চারিদিক হইতে সমবেত অসন্তুষ্ট আমীরগণের অধিনায়করূপে সে-ও সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে অভিযান করিল এবং বাদসাহের নিকট হইতে উজীরী দাবী করিল। জীবন বখ্‌ৎ এবং বেগমসমরুর সেনা-ধ্যক্ষ কর্ণেল পাওলী বিদ্রোহীগণকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইবেন বলিলেও সাহ আলমের সকল সাহস অন্তর্হিত হইয়াছিল, তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া সফির সহিত সন্ধিস্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনিই উজীর হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে আর বেশীদিন মন্ত্রিত্ব করিতে হইল না। তাঁহার অন্যতম প্রধান অনুচর মহম্মদবেগ হামদানী নামক জনৈক আমীরের সহিত তাঁহার অচিরেই বিবাদ বাধিল। হামদানীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইস্মাইলবেগ একদিন সফি খাঁকে গুলি করিয়া বধ করিল। তখন আফ্রাসিয়াব খাঁ তাঁহার ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন (১৭৮৩ খৃঃ)।

এদিকে সুচতুর মহাদজী সিন্ধিয়া মনোযোগ সহকারে দিল্লীর ঘটনাপরম্পরা লক্ষ্য করিতেছিলেন। পূর্ব্ব বৎসর সালবাইয়ের সন্ধির ফলে ইঙ্গমারাঠাসমরের অবসান ঘটিয়াছিল। উক্ত সন্ধিস্থাপনে মহাদজীই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা এবং পুণাদরবারের প্রতিনিধিরূপে তিনিই ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া-ছিলেন। সালবাইয়ের সন্ধি (১৭।৫।১৭৮২) ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিতান্ত অল্প প্রভাব বিস্তার করে নাই। মহাদজীর

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ইহার ফলে খুবই বাড়িয়াছিল। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কোম্পানী তাঁহার দরবারে একজন এজেন্ট রাখিতে এবং পুণাদরবারের সহিত তাঁহাদের সকল সম্বন্ধে মহাদজীর মধ্যবর্ত্তিতা স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যমুনার অপর পারে তাঁহাদের রাজ্য বিস্তারের যে ইচ্ছা নাই, একথাও ইংরাজেরা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন।

গৃহযুদ্ধের অবসানের পর মহাদজী দিল্লীতে তাঁহার বিলুপ্ত ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমুৎসুক হইলেন। নজফখাঁ জীবিত থাকিলে ঐকার্য্য নিতান্ত সহজ হইত না, কারণ এই কয় বৎসরের মধ্যেই তিনি মোগল প্রতাপ অনেকটা দৃঢ়ীকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়ার সৌভাগ্যক্রমেই যেন সালবাইয়ের সন্ধির কয়েকদিন পূর্ব্বে মীর্জ্জার দেহান্ত হইয়াছিল। তাঁহার তিরোধানের পর দিল্লীর দলাদলি ব্যাপারে মহাদজীর খুব সুবিধা হইল। টিপুসুলতানের সহিত ইংরাজদের তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল। মহাদজীকে সন্তুষ্ট রাখিতে ইংরাজরা সচেষ্ট হইলেন; কারণ মারাঠারা যদি টিপুর পক্ষে যোগ দেয় তবেই সর্ব্বনাশ। হেষ্টিংস সিন্ধিয়াকে জানাইলেন তাঁহার মোগল রাজধানীতে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ইংরাজ বিরোধী হইবেন না। পুণা হইতে প্রতিযোগিতার কোনই আশঙ্কা ছিল না। হামদানীর দল তখনও বিদ্রোহাচরণ করিতেছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে ইংরাজের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া আফ্রাসিয়াব খাঁ ব্যর্থমনোরথ হইলেন। বৃথাই জিবনবখ্‌ৎ লখ্‌নৌয়ে গিয়া হেষ্টিংসের নিকট পিতার ও নিজের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। তখন বিপন্ন আফ্রাসিয়াব হামদানীকে দমন করিবার জন্য সিন্ধিয়াকে আহ্বান করিলেন। মহাদজী যে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহা স্বতঃই উপস্থিত দেখিয়া পরম উল্লসিত হইলেন। বাদসাহী ফৌজ হামদানীকে আগ্রাদুর্গে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। ২২শে অক্টোবর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আগ্রাতে সাহ আলম, আফ্রাসিয়াব এবং মহাদজীর মিলন হইল। কিন্তু তাহার অনতিকাল পরেই হামদানী নিয়োজিত গুপ্তঘাতকের হস্তে আফ্রাসিয়াব খাঁ প্রাণ হারাইলেন।

আফ্রাসিয়াবের মৃত্যুতে চারিদিকে বিপ্লবের অনল আরও বৃদ্ধি পাইল, বাদসাহ তাঁহার শেষ প্রভুভক্ত কর্ম্মঠ অনুচর হারাইলেন। অতঃপর সম্পূর্ণরূপে তিনি মহাদজীর আশ্রিত হইয়া পড়িলেন। হিন্দু ও মুসলমান সর্দ্দার এবং আমীরগণ সকলে একযোগে সিন্ধিয়ার শিবিরে গমন করিয়া একবাক্যে তাঁহাকে অধিনায়কত্বে বরণ করিল। সিন্ধিয়া বাদসাহকে লইয়া দিল্লী গমন করিলেন। মহাসমারোহে তথায় আবার সম্রাট তখ্‌তে বসিলেন (জানুয়ারী ১৭৮৫)। সাহআলম তাঁহাকে আমীর উল্‌ওমরার পদ দিতে চাহিলেন; কিন্তু মহাদজী তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। পেশবার জন্য তিনি বাদসাহের নিকট হইতে "বকীল ঈৎ-মুৎলুক" অর্থাৎ 'সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সহকারী' উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং স্বয়ং হইলেন পেশবার প্রতিনিধি এবং বাদসাহী ফৌজের অধিনায়ক। সেনাদলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে বাদসাহ তাঁহাকে দিল্লী এবং আগ্রা প্রদেশদ্বয় জায়গীর দিলেন, তৎপরিবর্ত্তে সিন্ধিয়া তাঁহাকে মাসিক ৬৫০০০৲ টাকা ভাতা দিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে সম্রাট সিন্ধিয়ার বৃত্তিভোগীতে পরিণত হইলেন। কিন্তু আগ্রাদুর্গ তখনও হামদানীর কবলে। অতঃপর মহাদজী আগ্রা উদ্ধারে এবং মোগল আমীরগণের বিদ্রোহদমনে সচেষ্ট হইলেন। মার্চ্চমাসে আগ্রার পতন হইল। মহম্মদ বেগ আত্মসমর্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে মার্জ্জনা করিয়া বাদসাহের কর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করা হইল। বলাবাহুল্য তাহার এ নবলব্ধ রাজভক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। অপরাপর বিদ্রোহী আমীরগণকেও একে একে বশ্যতায় আনয়ন করা হইতে লাগিল।

এ দিকে মারাঠাদেশের জনসাধারণ পেশবার গৌরবময় উপাধি লাভে সন্তুষ্ট হইলেও সিন্ধিয়ার প্রভাববর্দ্ধনে হোলকর, ভোঁসলা এবং নানা ফড়ণাবীশ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ইংরাজরাও তাঁহার বিরোধী হইলেন। এজন্য মহাদজী নিজেই কতকটা দায়ী ছিলেন। সাফল্যের প্রথম উচ্ছ্বাসে সুবিজ্ঞ দূরদর্শী রাজনৈতিক মহাদজী নিজেই যে কতকটা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়েন নাই এমন কথা বলা চলে না। তিনি সম্রাটের নামে বঙ্গদেশের রাজকর ইংরাজদিগের নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন! বলা বাহুল্য ইংরাজদের মতে তাহা দিবার কোনই কারণ ছিল না। গভর্ণর জেনারেল দৃঢ় ও

সুস্পষ্টভাবে মহাদজীকে তাঁহার আদেশের অযৌক্তিকতা দেখাইলেন। বিচক্ষণ মহাদজী অচিরেই নিজের ভুল বুঝিলেন এবং সে কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। কিন্তু ইংরাজেরা বুঝিলেন যে সিন্ধিয়ার প্রভাব খর্ব্ব করিতে হইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপরাপর মারাঠারাজন্যবৃন্দের সহিত তাঁহাদের সখ্যতা করা প্রয়োজন। অতঃপর তাঁহারা নানা ফড়ণাবিশ এবং ভোঁসলা রাজার মহাদজীর প্রতি ঈর্ষ্যা ও শত্রুতা বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন এবং পুণা দরবারে একজন রেসিডেণ্ট বসাইবার চেষ্টাও চলিতে লাগিল। *

কথায় কথায় আমরা দি বইনকে ছাড়িয়া অনেকদূরে চলিয়া আসিয়াছি। এবার তাঁহার কথা আবার বলা যাইতেছে। তিনি সম্ভবতঃ কর্ম্মপ্রার্থী হইয়াই এই সময় বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু সরাসরিভাবে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর ছিল না; আজও কোন দেশে নহে। দরবারে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য উজীরের সাহায্য প্রয়োজন। তজ্জন্য সফি খাঁর নামে একটি পরিচয় পত্র সংগ্রহ করিয়া দি বইন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে আগ্রা যাত্রা করিলেন কারণ তিনি তখন ঐ স্থানেই অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু মীর্জ্জার সহিত তাঁহার আর দেখা হয় নাই,—তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই হার্ম্মদানীর গুলিতে সফি খাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল।

সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎকার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া দি বইন অতঃপর অপর কোন দেশীয় নৃপতির অধীনে কর্ম্ম-গ্রহণ করা স্থির করিলেন এবং তজ্জন্য জয়পুর দরবারে কর্ম্মপ্রার্থী হন। বলাবাহুল্য তাঁহার আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পত্তি হয় নাই। উত্তর প্রাপ্তিতে বিলম্ব দেখিয়া অনন্তর তিনি সিন্ধিয়ার দরবারে ইংরাজ রেসিডেণ্ট মেজর এণ্ডার-সনের অনুরোধে তাঁহার নিকট গমন করেন। তিনি তখন গোয়ালিয়র দুর্গাবরোধে ব্যাপৃত মহাদজীর শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্ভেদ্য গোয়ালিয়র দুর্গ সালবাইয়ের সন্ধির ফলে গোহদের রাণা ছত্রসিংহকে প্রদত্ত হইয়াছিল। দি বইনের আগমনে মহাদজী বিশেষ প্রীত হইলেন না। ইংরাজ সেনা দলের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী এই বিদেশী সৈনিক কি উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন জানিবার জন্য তাঁহার ঔৎসুক্য হইল। সহসা একদিন শিবির হইতে দি বইনের যাবতীয় জিনিষপত্র অপহৃত হইল। এণ্ডারসনের চেষ্টায় পরে তাহার পুনরুদ্ধার সাধন হইলেও দি বইন দেখিলেন সুধু তাঁহাকে প্রদত্ত পরিচয়পত্রও হাতচিঠা-গুলি তন্মধ্যে নাই! তিনি বুঝিলেন মধ্য এশিয়ায় তাঁহার অভিযানের কল্পনায় এইখানেই যবনিকাপাৎ ঘটিল!

প্রকৃত তস্কর কে তাহা বুঝিতে দি বইনের বিলম্ব হইল না। সিন্ধিয়ার প্রতি তাঁহার বিরাগ হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি অবরুদ্ধ ছত্রসিংহকে সাহায্য করিতে সমুদ্যত হইলেন। রাণার অন্যতম সেনাধ্যক্ষ মেজর স্যাঙ্গষ্টার নামক একজন স্কচ্ জাতীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের সহিত বেনোয়ার ইতিপূর্ব্বেই পরিচয় হইয়াছিল। অনন্তর তিনি রাণার কর্ম্ম গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত পত্রব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে ছত্রসিংহ তাঁহাকে লক্ষ টাকা দিলে তিনি গোপনে বাদসাহের রাজ্যমধ্যে তাঁহার জন্য দুইদল সৈন্য সুশিক্ষিত করিবেন। অনন্তর গোহদ হইতে সমাগত রাণার পদাতিকদলের সহযোগিতায় তিনি মহাদজীকে অতর্কিতে আক্রমণ করিবেন; সেই সময় অবরুদ্ধ সৈন্যগণও যদি দুর্গ হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করে তবে তিনদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া তাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। রাণা অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীকে বিশ্বাস করিয়া একেবারে অতগুলি টাকা দিতে সাহস না করিলেও বিপক্ষকে ভীতিপ্রদর্শন উদ্দেশ্যে চারিদিকে প্রচার করিয়া দিলেন যে দি বইনের নেতৃত্বে তাঁহার নূতন সৈন্যবাহিনী গঠিত হইতেছে। দি বইনের প্রতি তাঁহার বিরাগ বাড়িলেও এই ঘটনা হইতে মহাদজী তাঁহার সামরিকজ্ঞান ও চাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইলেন এবং এতাদৃশ ব্যক্তি যাহাতে অপর কাহাকেও আশ্রয় না করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলেন।

১৭৮৩ সালের অক্টোবর মাসে জয়পুর হইতে প্রত্যুত্তর আসিল। প্রতাপসিংহ দি বইনকে মাসিক দুই সহস্র টাকা বেতনে দুই ব্যাটালিয়ন পদাতিক সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। নিজের সৌভাগ্যোদয়ে উৎফুল্ল হইয়া দি বইন সে কথা কলিকাতায় ওয়ারেন হেষ্টিংসকে

জ্ঞাপন করিলেন। ব্যক্তিগতভাবে পত্র লিখিলেও কি জন্য বলা যায় না তাঁহার পত্র গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে পঠিত হইল এবং সদস্যগণ তাঁহার জয়পুরে কর্ম্মগ্রহণে আপত্তি জানাইলে হেষ্টিংস দি বইনকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন।

এবার দি বইন সত্যই বিপদে পড়িলেন। প্রথমটায় তিনি কি করিবেন স্থির করিতে পারেন নাই। উত্তর ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বীত অধীশ্বর মহাদজীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই তাঁহার প্রতি এ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, নতুবা তাঁহার জয়পুর দরবারে কর্ম্মগ্রহণ করায় বা না করায় ইংরাজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই একথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি ইংরাজের প্রজা বা ভৃত্য নহেন; স্বাধীন বিদেশী পর্য্যটক, রুষসাম্রাজ্ঞীর কর্ম্মচারী তাঁহার উপর বৃটিশ গভর্ণর জেনারেলের কোন জোর নাই। অনায়াসেই তিনি এ আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। বাধ্যতার এ দৃষ্টান্তে বলাবাহুল্য হেষ্টিংস পরম প্রীতিলাভ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে কর্ম্মানুরোধে লখ্‌নৌ আগমনকালে তিনি দি বইনকে সঙ্গে আনিলেন এবং এবার জয়পুরে কর্ম্ম লইতে অনুমতি দিলেন। তদনুসারে ১৭৮৪ সালের মার্চ্চমাসে দি বইন জয়পুরে গমন করিলেন। কিন্তু কি জন্য বলা যায় না, ইতোমধ্যে প্রতাপসিংহের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি দি বইনকে যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু নিজ সেনাবিভাগে তাঁহাকে কর্ম্মদানে সম্মত হইলেন না; তৎ পরিবর্ত্তে নগদ দশসহস্র টাকা পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন। ইহারও মূলে মহাদজীর অনুপ্রেরণা ছিল কি না কে বলিবে? কিছুকাল পরে এই ভাগ্যান্বেষী ফিরিঙ্গী যোদ্ধার হস্তে তাঁহার,—শুধু তাঁহার কেন, সমগ্র রাজপুত জাতির কি দুরবস্থা ঘটিবে তাহা কি তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিলেন? ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইলে প্রতাপসিংহ যে কোনমতেই দি বইনকে বিদায় দিতেন না সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

জয়পুর হইতে বেনোয়া বাদসাহের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার তখন নিতান্তই শোচনীয় অবস্থা। সম্রাট তাঁহাকে মহাদজীর নিকট গমন করিতে উপদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে গোয়ালিয়র এবং গোহদের পতন হইয়াছিল। সিন্ধিয়া তখন মথুরায় বসিয়া নব বিজয়ক্ষেত্রের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে শ্যেনদৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের অরণ্য সমাচ্ছন্ন অঞ্চলে তাঁহার দৃষ্টি সমাকৃষ্ট হইল। আপ্পাজী খণ্ডেরাও নামক একজন সুদক্ষ মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়কের নায়কত্বে তিনি তথায় এক অভিযান পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময়ে দি বইন তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। ইংরাজদের সহিত যুদ্ধকালে মহাদজী পাশ্চাত্য সমরনীতির উৎকর্ষ বুঝিয়াছিলেন। দি বইনের প্রতি তাঁহার অনেকদিন হইতেই লক্ষ্য ছিল; তাঁহার সাহায্যে সুশিক্ষিত বাহিনী গঠন করিবার অভিপ্রায়েই তিনি ইতি-পূর্ব্বে তাঁহাকে ছত্রসিংহ ও প্রতাপসিংহের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেন নাই। এতদিন পরে বেনোয়ার অভিপ্রায় পূর্ণ হইল। মহাদজী প্রথমটায় তাঁহাকে প্রত্যেকটিতে ৮৫০ সিপাহী সম্বলিত দুইটি ব্যাটালিয়ন গঠনের আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের বেতন মাসিক এক হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল, তদ্ভিন্ন আট টাকা হারে সাধারণ সৈনিক এবং কর্ম্মচারীগণের বেতন তাঁহার হস্তেই প্রদত্ত হইবে স্থির হইল। কিন্তু দি বইন দেখিলেন সম পরিমান বেতনে অফিসার ও সিপাহী লাভ সম্ভব নহে; এ কারণ তিনি সধারণ সৈনিক গণকে মাসিক ৫।।০ টাকা হিসাবে দিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে সামরিক কর্ম্মচারীবৃন্দকে পদমর্য্যাদানুসারে বেতন দিবার ব্যবস্থা করিলেন। সৈন্যদল গঠন কার্য্যে তাঁহাকে কি গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সকল কার্য্যই তাঁহাকে একাকী করিতে হইত, কোনও বিষয়ে সাহায্য করিবার কেহই ছিল না। 'রিক্রুট' ভর্তি, তাহাদের ড্রিল ও সামরিক শিক্ষাদান, পোষাক পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ এ সকল ব্যবস্থা তাঁহাকে একাকীই করিতে হইয়াছিল। কোম্পানীর সেনাদলকে সকল বিষয়ে আদর্শ করিয়া দি বইন নিজের বাহিনী গড়িয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার দলে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকরাও আসিয়া জুটিল। ছত্রসিংহের পতনের পর তাহার পূর্ব্বতন সুহৃদ মেজর জর্জ্জ স্যাঙ্গষ্টার কর্ম্মহীন হইয়াছিলেন। তিনিই প্রথম দি বইনের

নিকট আসিলেন এবং কামান ঢালাইয়ের কারখানার সকল ভার পাইলেন। তাহার পর আসেন জন হেসিঙ্গ নামক একজন ওলন্দাজ এবং ফ্রেমন্ত নামক একজন ফরাসী সৈনিক। ইহাদের দুইজনকে যথাক্রমে দি বইন তাঁহার ব্যাটালিয়ন দুইটির নায়কত্ব প্রদান করিলেন। সেনাদলের শিক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ হইলে পরে মহাদজীর আদেশে দি বইন উহাদের লইয়া খাণ্ডে রাওয়ের সহিত বুন্দেলখণ্ডে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তথায় কালিঞ্জর দুর্গ অধিকারে উহারা যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিল।

হিন্দুস্থানে নিজ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সিন্ধিয়াকে যথেষ্ট আয়াস পাইতে হইয়াছিল। গর্ব্বিত, দুর্দ্দান্ত মোগল আমীরগণ সহজে একজন হিন্দু নৃপতির অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হয় নাই। নিম্নশ্রেণী হইতে উদ্ভূত মহাদজীকে অন্যান্য হিন্দু রাজারাও নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। সিন্ধিয়ার আধিপত্য প্রথম হইতেই মুসলমান আমীরগণের অপ্রিয় ছিল। তাহার পর অর্থাভাববশতঃ তিনি যখন বাদসাহের নামে উহাদের জায়গীরসত্ত্বে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন এবং যেগুলি অন্যায়রূপে গৃহীত হইয়াছে বা প্রকৃত অধিকারী ভিন্ন অপরের ভোগে রহিয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, সেগুলি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিতে থাকিলেন তখন আর তাহাদের মধ্যে ভীতি ও ক্রোধের অবধি রহিল না। অসন্তুষ্ট আমীরকুলের নেতৃত্বে পূর্ব্বোক্ত মহম্মদ বেগ হামদানী গ্রহণ করিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই রাজপুতানার রাজন্যবৃন্দের সহিত মহাদজীর বিরোধ বাধিলে হামদানী সদলবলে রাজপুতদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। রাজপুত এবং মোগলদের সম্মিলিত চেষ্টায় আবার কিছুকালের মত হিন্দুস্থানের সমতলক্ষেত্র হইতে সিন্ধিয়ার আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। নষ্টপ্রায় মারাঠা প্রতাপ পুনরুদ্ধার করিয়া মহাদজীকে উত্তরাপথের আধিপত্য প্রদান শুধু দি বইনের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল। এবার সে কথা বলা যাইবে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে রাজপুতদের সহিত মহাদজীর বিরোধের কারণ বুঝা আবশ্যক।

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে মারাঠারা সর্ব্বপ্রথম পেশবা বাজীরাওয়ের নেতৃত্বে চম্বল নদী উত্তীর্ণ হইয়া দিল্লীর সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়। সে যাত্রা মোগল সম্রাট তাহাদের সাম্রাজ্যমধ্যে চৌথ আদায়ের অধিকার দিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। অতঃপর বাজীরাও রাজপুতনায় মেবার রাজ্যে গমন করেন। মারাঠাদের আগমনে তথায় আতঙ্কের সঞ্চার হইল। রাণা বার্ষিক একলক্ষ ষাট হাজার টাকা কর দিবার অঙ্গীকার করিয়া রাজ্যরক্ষা করিলেন। এই সন্ধি দশ বৎসর কাল বলবৎ থাকে, পরে মারাঠারা ঐ পরিমাণ অর্থে সন্তুষ্ট না হইয়া অধিকতর লাভেচ্ছু হইলে সন্ধিসর্ত্ত মত আর কাজ হয় নাই। মেবার, জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি রাজপুতানার রাজ্যগুলির নৃপতিবৃন্দের আত্মকলহে হস্তক্ষেপ করিয়া কালক্রমে মারাঠারা সমগ্র রাজস্থানেই নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিল এবং তাহাদের অর্থগৃধ্নুতা ও অত্যাচারে সমস্ত রাজপুতজাতি জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মহাদজী জয়পুরাধিপতি প্রতাপসিংহের নিকট সম্রাটের নামে বক্রী ৬০ লক্ষ টাকা রাজকর দাবী করিলে তাহার একাংশমাত্র প্রদত্ত হইল, অবশিষ্টাংশ পরে দেওয়া যাইবে বলা হইল। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি প্রাপ্য অর্থ প্রদত্ত হইল না দেখিয়া তিনি অর্থাদায়ের জন্য জয়পুর রাজ্যে নিজ সেনাদল পাঠাইলেন। রাজপুতরা গোপনে অসন্তুষ্ট মোগলদের নিকট হইতে সাহায্য-লাভের আশ্বাস পাইয়াছিল। তাহারা এক্ষণে অর্থপ্রদানে অসম্মত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিল এবং মারাঠাদের অকস্মাৎ আক্রমণে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিল। প্রতাপসিংহ যোধপুরাধিপতি বিজয়সিংহকে সমগ্র রাজপুত জাতির শত্রু মারাঠাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সাহায্যকল্পে আহ্বান করিলেন। দেখিতে দেখিতে জয়পুররাজের বিদ্রোহ মহাদজীর বিরুদ্ধে সমগ্র রাজপুতজাতির অভ্যুত্থানে পরিণত হইল।

এই ঘটনায় হিন্দুস্থানে সিন্ধিয়ার শত্রুগণ পরম উল্লসিত হইল। এমন কি দুর্ব্বলচিত্ত, অপরের হস্তের ক্রীড়নক বাদসাহও আত্মপ্রাধান্য লাভের আশায় মহাদজীর উচ্ছেদ-কামনা করিতে লাগিলেন। মহাদজী বুঝিলেন বিদ্রোহ-দমনার্থে আশুপ্রতিকার চেষ্টা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজপুতানায় যুদ্ধযাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দিল্লীসমীপে বিশৃঙ্খলা, অর্থাভাব এবং তজ্জন্য বেতন বাকি পড়ায় মারাঠা ও মোগল সেনাদলে অসন্তোষ এ সকল দেখিয়াও তিনি নিবৃত্ত হইলেন না। বুন্দেলখণ্ড হইতে প্রত্যাগত আপ্পাজী এবং দি বইনকে তাঁহার সহিত যোগদান করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। এমন সময় শিখরা দিল্লীর উত্তরাঞ্চলস্থ জনপদ লুণ্ঠনার্থ আক্রমণ করায় তাহাদের বিরুদ্ধে কতক সৈন্য পাঠাইতে হওয়ায় তাঁহার বাহিনী কতকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তদ্ভিন্ন তাঁহার সহিত যে বাদসাহী ফৌজ ছিল তাহারা সুস্পষ্টতঃই বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া চলিল।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে জয়পুর হইতে ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী লালসাৎ নামক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হইল। এই যুদ্ধ টোঙ্গার যুদ্ধ নামেও ইতিহাসে পরিচিত। হামদানীরা সদলবলে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই সিন্ধিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া রাজপুতদের সহিত মিলিত হইলে তাহাদের দৃষ্টান্তে অপরাপর মোগল সৈনিকরাও অনুপ্রাণিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় মহাদজী আর কালবিলম্ব ব্যতিরেকে যুদ্ধারম্ভের আদেশ দিলেন। দক্ষিণপ্রান্তে মারাঠা অশ্বারোহী বামপ্রান্তে দি বইনের সিপাহীরা এবং কেন্দ্রদেশে আশীটি কামান লইয়া বাদসাহী ফৌজ অবস্থিত ছিল। যুদ্ধ বাধিবার অনতিকাল পরেই একটি প্রচণ্ড গোলার আঘাতে মহম্মদ বেগ নিহত হইলেন; কিন্তু ইহাতে মহাদজীর কোনই সুবিধা হইল না, কারণ ইস্মাইলবেগ তৎক্ষণাৎ নিজ পিতৃব্যের শূন্যস্থান অধিকার করিয়া পলায়নোদ্যত হতাশ সৈন্যদলকে পুনরায় সম্বদ্ধ করিলেন। নির্ভীক, সাহসী, বীর রণকুশল ইস্মাইলবেগ তখনকারদিনের একজন উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। আপাদমস্তক লৌহবর্ম্মাবৃত দেহ নিজ অশ্বসাদি মোগলবাহিনীসহ প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস অথবা অশনিসম্পাতের ন্যায়ই গভীরগর্জ্জনে হামদানী ভীমবেগে সম্মুখবর্ত্তী মারাঠা বার্গীদের উপর নিপতিত হইলেন। সে বেগ রোধ করিবার সাধ্য মারাঠা বার্গীদলের ছিল না, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

ইহাতে উৎসাহিত হইয়া রাজপুত সেনার অধিনায়ক রিয়ার সর্দ্দার দশসহস্র রাঠোর অশ্বারোহীসহ মারাঠাদের বামপ্রান্ত আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দি বইনের পদাতিকদল রণস্থলে স্থির থাকিয়া তাহাদের প্রতিহত করিল। তখন সিন্ধিয়া তাঁহার সেনাদলভুক্ত মোগল সৈন্যদলকে সম্মুখে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন; কিন্তু তাহারা সে আদেশ পালন করিল না। এই সময়ে যদি উহারা বিশ্বাসঘাতকতা না করিত কিম্বা সিন্ধিয়ার নিজস্ব সেনাদল উহাদের পরিবর্ত্তে ঐস্থানে থাকিত তবে হয়ত লালসাতের যুদ্ধের ফলাফল অন্যভাবে লিখিত হইত। কিন্তু মোগলসেনার বিদ্রোহাচরণের জন্য সবই নষ্ট হইল। দুইদিন পরে মহাদজী আবার যুদ্ধারম্ভের উদ্যম করিলেন, এবার বাদসাহী সেনা স্পষ্টভাবেই শত্রুপক্ষে গিয়া যোগ দিল। এই দৃশ্য দেখিয়া দি বইনের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্বাসঘাতকগণকে আক্রমণ করিবার জন্য সিন্ধিয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু অকারণ লোকক্ষয়ে অনিচ্ছুক মহাদজী তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

এ অপ্রত্যাশিত আঘাতের পর মারাঠারা আর রঙ্গভূমে স্থির থাকিতে পারিল না; তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শুধু নবগঠিত পদাতিক সেনা রণভূমে স্থির রহিল। তাহারা নিজেদের বিদেশী অধিনায়কের নেতৃত্বে যথেষ্ট কৃতিত্ব ও গৌরবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এক্ষণে শুধু তাহাদের অসমসাহসের সহিত পলায়নপরায়ণ সেনাদলের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করার জন্যই রণদুর্ম্মদ মোগল ও রাজপুত অশ্বারোহীসেনার হস্তে সমগ্র মারাঠাবাহিনী সমূলে বিধ্বস্ত হইল না। ছত্রভঙ্গ পলাতক সৈন্যগণ কোন-মতে আলোয়ারের প্রাচীর মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইল।

"মরাঠীরিয়াসতে"র লেখক শ্রীগোবিন্দসখারাম সর্দ্দেশাই সত্যই বলিয়াছেন যে লালসাৎ মারাঠা ইতিহাসের দ্বিতীয় পাণিপথ। এই পরাজয়ের ফলে হিন্দুস্থানে মারাঠা আধিপত্য আবার কিছুকালের মত বিলুপ্ত হইয়া গেল। যোধপুরাধিপতি আজমীর পুনরধিকার করিয়া ঘোষণা করিলেন যে অতঃপর তিনি আর মারাঠাদের চৌথ দিবেন না। রাণাও মেবার-রাজ্য হইতে মারাঠাদের বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সিন্ধিয়ার অবস্থা এই সময় বাস্তবিকই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজরাজ্য হইতে বহুদূরে শত্রুরাজ্য মধ্যে পরাজিত ও অবসাদগ্রস্ত সেনাদল লইয়া তিনি বড়ই বিপদে পড়িলেন।

আগ্রায় অবস্থিত তাঁহার সৈন্যগণের সহিত সংবাদ আদান প্রদানের কোন উপায় রহিল না। পশ্চাতে বিজয়োদ্দীপ্ত লক্ষাধিক রাজপুতসৈন্য; সম্মুখে সমগ্র হিন্দুস্থানে মোগল আমীরগণ তাঁহার পরাজয়ে উল্লসিত হইয়া অস্ত্রধারণে তৎপর; আশার লেশমাত্র কোনদিকে দেখা যায় না। কিন্তু বিপদে বীর মহাদজী সহিষ্ণুতা হারাইলেন না; তিনি এই সময় যে ধৈর্য্য ও কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। সৈন্যদলের অধিকাংশ পুনর্গঠনের জন্য খুশালগড়ের পথে গোয়ালিয়রে পাঠাইয়া দিয়া তিনি স্বয়ং আলোয়ার হইতে দীগে গমন করিলেন। দীগ দুর্গ এবং জনপদ ভরতপুরাধিপতি রণজিৎসিংহকে প্রত্যার্পণ করিয়া তিনি তাঁহার সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন এবং তদীয় জাঠ অশ্বারোহী-সৈন্য ও লেস্তিনো (Lestineaux) নামক জনৈকফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিক কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত তাঁহার পদাতিক সেনাদলের সাহায্য লাভ করিলেন। * পুণাদরবারে-ও সাহায্যপ্রার্থনা করিয়া পত্রলেখা হইল। এই পত্রে মহাদজী মারাঠাজাতির জন্য তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা একে একে বিবৃত করিয়া নানা ফড়ণাবীশকে মন হইতে সকল মিথ্যা সন্দেহ বিদূরিত করিয়া একবার ধীরভাবে সকল কথা পর্য্যালোচনা করা এবং শত্রুর বিরুদ্ধে মারাঠাজাতির সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের উদীয়মান জাতীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এ সকল কার্য্য একদিনে করিবার নহে। এই সময় যদি রাজপুতগণ আক্রমণে অগ্রসর হইত তবে আর সিন্ধিয়ার রক্ষা পাইবার কোন আশা ছিল না। কিন্তু তাহারা মারাঠাকবল হইতে নিজেদের দেশ উদ্ধার করিয়াই সন্তুষ্ট হইল। হিন্দুস্থান হইতে মারাঠাদের বিতাড়িত করিতে অথবা বাদসাহের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে তাহাদের কোনই ইচ্ছা ছিল না। এই সুযোগে হিন্দুস্থানে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিবার মত উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাহাদের ছিল না। সুতরাং মারাঠারা রাজস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে দেখিয়া রাজপুতরা সন্তুষ্টচিত্তে নিজ নিজ গৃহে ফিরিল। লালসাৎ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রতাপসিংহ দানপূজাদিতে ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইস্মাইল বেগ আগ্রা অধিকারে গমন করিলেন। এদিকে সাহারাণপুরের বিখ্যাত রোহিলা-সর্দ্দার গোলাম কাদের খাঁও ইতোমধ্যে রঙ্গভূমে দেখা দিয়াছিল। দিল্লী হইতে মারাঠাদের বিতাড়িত করিয়া মোগলরাজধানীতে সে-ই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিল। তখন হামদানী গত্যন্তর না দেখিয়া তাহার সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উভয়ে একযোগে কার্য্য করিতে সচেষ্ট হইলেন। মহাদজী তখন আগ্রার সন্নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। হামদানীর সহিত তিনি আর সম্মুখসমরে বলপরীক্ষা করিতে সাহস করিলেন না। সপ্তাহকাল ধরিয়া উভয়পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ চলিল। এমন সময়ে সংবাদ আসিল গোলামকাদের সসৈন্যে হামদানীর সাহায্যকল্পে আসিতেছে। তখন বাধ্য হইয়া মহাদজী চম্বলনদ উত্তীর্ণ হইয়া গোয়ালিয়র অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সমগ্র উত্তরাপথ হইতে তাঁহার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল। দুর্দ্দান্ত রোহিলানায়কের দিল্লীতে আধিপত্য বেগমসমরুর জন্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। বাদসাহ সাহআলমকে গোলামকাদেরের কবল হইতে বেগম-সমরু সসৈন্যে আসিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে ভীত গোলামকাদের প্রথমটায় বেগমকে নিজ পক্ষে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল না হওয়ায় বাধ্য হইয়া বাদসাহের নিকট স্বীয় আচরণের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।* তথা হইতে পথিমধ্যে আলিগড়দুর্গ অধিকার করিয়া গোলামকাদের শীঘ্রই আগ্রার সমীপে আসিয়া ইস্মাইলবেগের সহিত মিলিত হইল এবং তদনন্তর উভয় সুহৃদে সম্মিলিতভাবে আগ্রাদুর্গ অবরোধ করিল। কিন্তু প্রখ্যাতনামা মারাঠা সেনাপতি লকুবা বা লক্ষ দাদা বীরবিক্রমে দুর্গরক্ষা করিয়া তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিলেন।

* ইতিপূর্ব্বে মাদেক প্রসঙ্গে মীর্জ্জা নজফ খাঁ কর্ত্তৃক দুর্ভেদ্য দীগদুর্গ অধিকারের কথা বলা হইয়াছে। তদবধি দীগ জাঠদের হস্তচ্যুত ছিল। অবরোধকালে নবলসিংহের দেহান্ত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রণজিৎ-সিংহ রাজা হইয়াছিলেন।

* এ সকল কথা ইতিপূর্ব্বে বেগম সমরু প্রসঙ্গে বলা হিয়াছে।

এই সময়ে সিন্ধিয়ার অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সেনাদল বারম্বার পরাজিত হইতেছিল। ইস্মাইলবেগ এবং গোলামকাদেরের ইসলামের জয়ধ্বজা পুনরুত্তোলনের প্রয়াস অর্থাৎ হিন্দুকর্তৃত্ব হইতে মোগলসম্রাটকে মুক্ত করার চেষ্টা সফলপ্রায় হইল বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছিল। কিন্তু বিপদে ধীর মহাদজী এত ব্যর্থতাতেও হতাশ হইলেন না। যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত নিজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন সেনাদল সমবেত করিয়া শীতাপগমের পর তিনি খণ্ডেরাও এবং রাণখাঁকে আগ্রার উদ্ধারসাধনে পাঠাইলেন (মার্চ্চ ১৭৮৮)। পাণিপথ হইতে পলায়নকালে (১৭৬১ খৃঃ) আহত ও খঞ্জ মহাদজীর প্রাণরক্ষা এই রাণখাঁই করিয়াছিলেন। তদবধি সিন্ধিয়া তাঁহাকে সবিশেষ স্নেহ করিতেন। শুনা যায় প্রথম জীবনে তিনি ভিস্তি ছিলেন। সে যাহা হউক, মহাদজী যে অপাত্রে বিশ্বাসস্থাপন করেন নাই তাহা রাণখাঁর জীবন হইতেই দেখা যায়, তিনি তখনকার দিনের অন্যতম সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন।

গোয়ালিয়র হইতে মারাঠাবাহিনী ভরতপুরে আসিয়া জাঠদের সহিত মিলিত হইল। অনন্তর সম্মিলিত সেনাদল আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া ইস্মাইল বেগ ও গোলামকাদের তাঁহাদের সেনাদলের একাংশ দুর্গাবরোধে ব্যাপৃত রাখিয়া অপরাংশসহ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। ২৪শে এপ্রিল তারিখে ভরতপুর হইতে এগার মাইল দূরবর্ত্তী চাকসানা নামক স্থানে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সিন্ধিয়ার বাহিনীর মধ্যদেশে মারাঠা অশ্বারোহী, বামপ্রান্তে দি বইনের এবং অপরাপর পদাতিক ও দক্ষিণপ্রান্তে জাঠদের অশ্বারোহী ও পদাতিকদল সন্নিবিষ্ট ছিল। জাঠঅশ্বারোহীসেনার অধিনায়ক ছিল শিবসিংহ ফৌজদার নামক একজন সর্দ্দার। লেস্তিনোর ব্রিগেডভিন্ন জাঠপক্ষে মুসলমান সেনাপতিদ্বারা পরিচালিত আরও দুইদল পদাতিকসৈনিক ছিল। তন্মধ্যে একজন সেনানায়ক যুদ্ধারম্ভের অনতিকাল পরেই নিজ তিন ব্যাটালিয়ন সৈন্যসহ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। হামদানী মারাঠা সেনাদলের বামপ্রান্ত ও গোলামকাদের দক্ষিণপ্রান্ত আক্রমণ করিলেন। এদিকে গোলামকাদের ইস্মাইলবেগ নিজ সম্মুখবর্ত্তী দি বইনের দলকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু গোলামকাদের নিজ অশ্বারোহী সৈন্যদল একেবারে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালনা করিল। রোহিলাদের প্রথম আক্রমণেই জাঠ অশ্বারোহীদল পলায়ন করিল। শুধু লেস্তিনোর সিপাহীরা রণস্থলে স্থির থাকিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া মোগলরাও মারাঠাদের কেন্দ্র ও বামপ্রান্তের উপর প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিল। সে বেগ রোধ করিবার সাধ্য মারাঠা বর্গীদের ছিল না, তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। শুধু দি বইনের সেনাদল রণক্ষেত্রে স্থির থাকিয়া অসমসাহসে আত্মরক্ষা করিয়া শত্রুসেনার তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিল। এই সময় যদি মারাঠা ও জাঠ অশ্বসাদি সেনা সাহায্য করিত তবে দি বইন এবং লেস্টিনো নিশ্চয়ই বিজয়লাভ করিতেন। কিন্তু অশ্বারোহীর দল তখন কোথায়? তাহারা মহাভয়ে প্রাণরক্ষার্থে ভরতপুর দুর্গে আশ্রয় লইবার জন্য ছুটিয়াছে। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ইঁহারাও সুশৃঙ্খলভাবে ভরতপুরাভিমুখে পশ্চাৎপদ হইলেন।

এমন সময় শিখেরা রোহিলখণ্ডে আসিয়া দেখা দিল। আনন্দিত রাণ খাঁ তাহাদের সহযোগিতা করিবার জন্য একদল মারাঠা ও জাঠ ফৌজ পাঠাইলেন এবং গোলামকাদেরের জায়গীর আক্রমণ করিবার জন্য তাহাদের উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। অগত্যা গোলামকাদের হামদানীকে আগ্রাবরোধে ব্যাপৃত রাখিয়া নিজ রাজ্যরক্ষায় গমন করিতে বাধ্য হইল। রোহিলাসর্দ্দার অল্লায়াসেই আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলেও শিখেরা যেভাবে সমগ্র জনপদ উৎসাদিত করিয়াছিল তাহাতে সাহারাণপুর জেলা একেবারে মরুভূমে পরিণত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিধ্বস্ত অবস্থা হইতে রক্ষা পাইতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল কাটিয়া গিয়াছিল!

গোলামকাদেরের অবিদ্যমানে ইস্মাইলবেগ কতকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন চতুর মহাদজী তাহা বুঝিতে পারিয়া আবার আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। এই সময় দাক্ষিণাত্য হইতে সাহায্যকারী সেনাদল আসিয়া উপনীত হওয়ায় তিনি

নববলে বলীয়ান হইয়াছিলেন। নানা ফড়ণাবীশ তুকোজীরা ও হোলকার এবং আলি বাহাদুরের * নেতৃত্বে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন ; সর্ত্ত হইয়াছিল যে চম্বলনদীর উত্তরে যে সকল দেশ বিজিত হইবে তাহা পেশবা, সিন্ধিয়া এবং হোলকর সমভাবে উপভোগ করিবেন। এবার মহাদজীর আগ্রা উদ্ধারের চেষ্টা সফল হইল। ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধে ইস্মাইলবেগ পরাজিত হইলেন (১৮ই জুন ১৭৮৮)। তাঁহার সমগ্র তোপখানা এবং রসদাদি সামরিক সম্ভার শত্রুর হস্তগত হইল, দি বইনের যুদ্ধ কৌশলেই বিজয়লক্ষ্মী মহাদজীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। বিজয়ী মারাঠা ও জাঠসেনা আগ্রাদুর্গে প্রবেশ করিল। পরাজিত ও আহত ইস্মাইলবেগ ছত্রভঙ্গ সেনাদলসহ দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

মারাঠাদের জয়লাভের সংবাদে বাদসাহ মহাদজীকে তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করিতে আহ্বান করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পত্র গোলামকাদেরের হস্তগত হইল। অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ রোহিলানায়কও দিল্লী যাত্রা করিল। সুহৃদ্দ্বয় যমুনার অপরপারে সাহদারায় আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলে বাদসাহ তাহাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু গোলামকাদেরের বাদসাহের পরিষদগণের মধ্যে বন্ধুর অভাব ছিল না, তাহাদের সাহায্যে নদী পার হইয়া দিল্লীদুর্গে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে বিশেষ কঠিন হইল না। অসহায়, আত্মজন পরিত্যক্ত সম্রাট নিজ প্রাসাদমধ্যে বন্দী হইলেন। গোলামকাদের আবার পূর্ব্বের ন্যায়ই রাজপ্রাসাদে বাস আরম্ভ করিল। ইস্মাইলবেগ নগরোপকণ্ঠে তোগলকাবাদে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিলেন।

বর্ষানামার জন্য তখনকার মত যুদ্ধ স্থগিত রহিল। বর্ষাপগমে মারাঠারা যে দিল্লী অধিকারে অগ্রসর হইবে তাহা গোলামকাদের জানিত। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া সে প্রাসাদ হইতে যতখানি সম্ভব অর্থ-সংগ্রহ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সে যুগের অনেকেরই মত তাহারও ধারণা ছিল যে রাজপ্রাসাদ মধ্যে গুপ্ত ধনাগারে বহু অর্থ সঞ্চিত আছে ; এই ধনরত্ন হস্তগত করিবার অভিপ্রায়েই সে প্রাসাদ মধ্যে নিজ বাসস্থান নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। ২৯শে জুলাই হইতে ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত চারিদিন ধরিয়া গুপ্তধনের সন্ধানে গোলামকাদের নানাস্থানে গৃহতল খনন করিল, কিন্তু কিছুই বাহির না হওয়ায় তাহার ক্রোধের অবধি রহিল না। তখন সে সম্রাট ও তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকাগণও তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইল না ; তাহাদের অলঙ্কারাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রাজপথে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। স্বর্ণ ও রৌপ্যময় তৈজসপাত্রাদি গালাইয়া ফেলা হইল। এইরূপ অনাচার ও অত্যাচারলব্ধ অর্থেও পাপিষ্ঠের মন উঠিল না। তখন স্বয়ং বাদসাহ তাহার অত্যাচারের পাত্র হইলেন। ১০ই আগষ্ট তারিখে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট গোলামকাদেরের আদেশে তাহার অনুচরবর্গ সম্রাটকে তাহার নিকটে ধরিয়া আনিল। গুপ্তধনাগারের সন্ধান দিবার আদেশ দিলে সম্রাট বলিলেন, "বাদসাহ কখনও মিথ্যা কথা বলেন না, প্রাসাদমধ্যে কোন গুপ্তধনাগার নাই।" ক্রোধোন্মত্ত গোলামকাদের গর্জ্জন করিয়া তখ্‌ৎ হইতে লাফাইয়া পড়িল, ও ক্রুরকর্ম্মা রাক্ষসের ন্যায় সম্রাটকে আক্রমণ করিয়া প্রবলবেগে ভূপাতিত করিল। পিশাচ সর্দ্দারের যমদূত সদৃশ অনুচরবর্গ হতভাগ্য বাদসাহকে ধরিয়া রাখিল, এবং দুরাচার স্বয়ং কটিদেশ হইতে ছুরিকা উন্মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে দৃষ্টিশক্তিহীন করিয়া দিল!

অতঃপর গোলামকাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট আহ্মদসাহের পুত্র বিদার বখ্‌তকে বাদসাহ করিয়া সিংহাসনে বসাইল। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে দিল্লীদুর্গে বাদসাহ সে নিজেই হইয়া রহিল। প্রতিদিন তাহার ক্রীড়া পুত্তলিকা সদৃশ 'বাদসাহে'র সহিত সে নিজে তখ্‌তে বসিত এবং মধ্যে মধ্যে আকবর ও ঔরঙ্গজেবের মহাগৌরবময় পদের অধিকারীর প্রতি তাহার অবজ্ঞা দেখাইবার অভিপ্রায়ে তাম্রকূট সেবন করিয়া তাহার মুখবিবর মধ্যে নিজ মুখনিঃসৃত ধূমরাশি পরিত্যাগ করিত! এই দৃশ্য তাহার অনুচরমণ্ডলী মহানন্দে উপভোগ করিত এবং পিশাচদের অট্টহাস্যে ও তাণ্ডবনৃত্যে দেওয়ান-ই-আম গৃহ মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হইত। একদিন সে "সম্রাট"কে তাহার সম্মুখে নাচিতে বাধ্য করিয়াছিল।

* আলি বাহাদুর পেশবা বাজি রাওয়ের মস্তানী নাম্নী মুসলমানী রমণী গর্ভজাত পুত্র সমসের বাহাদুরের পুত্র।

গোলামকাদেরের অত্যাচারের কাহিনী এখানে সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। অতঃপর যাহা ঘটিল তাহাই বলা যাইতেছে। তাহার কার্য্যাবলী ইস্মাইল বেগের পছন্দ না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে মনান্তর আরম্ভ হইল। অনন্তর রাণ খাঁর সহিত যুদ্ধবিরতির সর্ত্তে সম্মত হইয়া ইস্মাইল বেগ অন্যত্র গমন করিলেন। ইহাতে গোলামকাদেরের বলক্ষয় হইল। এদিকে চারিদিক হইতে মারাঠারা দিল্লী অধিকারে অগ্রসর হইতেছিল; এ অবস্থায় তথায় আর অধিকদিন থাকা রোহিলাসর্দ্দার নিরাপদ বোধ করিল না। ১১ই অক্টোবর তারিখে প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিয়া গোলামকাদের মীরাটে পলায়ন করিল। সৌভাগ্যবশতঃ রাণখাঁর সৈন্যগণ শীঘ্র আসিয়া উপনীত হওয়ায় দিল্লীতে আর এক লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হইল না। প্রাসাদের অগ্নিনির্ব্বাণ করিয়া তাহারা অন্ধ বাদসাহ এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিল। বিদার বখ্‌তকে বন্দী করিয়া রাণখাঁ অতঃপর মীরাটদুর্গ অবরোধ করিলেন। নয় সপ্তাহব্যাপী অবরোধের পর আর দুর্গরক্ষা করা সম্ভব নহে দেখিয়া এক অন্ধকার রাত্রে গোলামকাদের নিজ অত্যাচারলব্ধ মণিরত্নাদি লইয়া গোপনে দুর্গ ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহাকে আর অধিকদূর যাইতে হইল না। অন্ধকারে এক গর্ত্তে স্খলিতপদ হইয়া তাহার অশ্ব পঞ্চত্ব পাইল, সে নিজে পতনের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া তথায় পড়িয়া রহিল: তদীয় অনুচরমণ্ডলী সে কথা না জানিয়া চলিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে গ্রামবাসিগণ আসিয়া তাহাকে ভূপতিত অবস্থায় দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ ধরিয়া রাণখাঁর হস্তে সমর্পণ করিল। সিন্ধিয়ার আজ্ঞায় কয়েকদিনব্যাপী নিদারুণ যন্ত্রণা সহকারে গোলামকাদেরের প্রাণবধ করা হইল। এক এক করিয়া তাহার হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণ, ওষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া অন্ধ বাদসাহের নিকট পাঠান হইয়াছিল। সাহ আলমের আদেশে বিদার বখ্‌তকে হত্যা করা হইল। (ক্রমশঃ)

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

টুক্‌টুক্

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

তনু দেহ শ্যাম তার, শ্যাম আঁখি-নীলিমার
বিজলীতে কিরণ তরল
দেখিয়া মরিতে ধাই, বাঁচিয়া দেখিতে চাই
সে মিলাল অমিয়, গরল
লোভন অধরে লেখা, যে শোভন রাঙা রেখা
দেখেছি, তা মুছিয়া না যায়
হাসিতে চুমিল চাঁদ, কালো চুলে এলো ফাঁদ
কলঙ্কেরে ধরিল হিয়ায়।

* * * *

সে কোন্ পাগল করা সুরে তার বাণী ভরা
ভারতীর বীণা যাহে চুপ্
কল্পলোক-রাজকন্যা, স্বামী বহ্নিশিখা-বন্যা
অবয়বে ফেটে পড়ে রূপ
শ্যামের বরণ হরি', বসুধার ব্যথা স্মরি'
রমা যেন ত্যজিল গোলোক
চোখের কাজল দিয়া, গেল লিখি কে আসিয়া
নীলোৎপলে সুষমার শ্লোক।

* * * *

চোখে তারে দেখিলাম, শ্যাম—আঁখি-অভিরাম
মনে তারে দেখিলাম রাঙা
আর যমুনায় যাই, ডুব নাহি দেয় রাই
নিমেষে সে ভুল হোল ভাঙা
তারি নিরুপমা ছবি শোণিতে আঁকিয়া কবি
হৃদিমাঝে রাখে জাগরুক
শ্যামিকার সীমা নাই, চিরদিন তবু তাই
আমি তারে বলি 'টুক্‌টুক্'।

বাঙালীর মেয়ে

শ্রীমতী শান্তিময়ী দত্ত

১

ঝুপ্, ঝুপ্, ঝুপ্! অফুরন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় বাদল ঝরিয়া পড়িতেছে। টিনের ছাউনী-দেওয়া কাঠের বাড়ীগুলির ছাদের উপর যেন সহস্র মাদল বাজিতেছে। আশে-পাশের আম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি বড় বড় গাছের শাখাদল বাতাসের ধাক্কা খাইয়া মত্তহস্তীর মত সবেগে মাথা দোলাইয়া যেন কাহাকে তাড়া করিতে চাহিতেছে। প্রকৃতির এমন উদ্দাম নৃত্যের কোলাহলে মানুষের কণ্ঠস্বর চাপা পড়িয়া গিয়াছে। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। দূরে দূরে দুই চারিটি ধনীগৃহের সার্সী-আঁটা জানালার বৃষ্টি-জলে-ধোয়া কাঁচের মধ্য দিয়া ঝাপ্সা আলো অন্ধকারময় পথে বিপন্ন পথহারা দুই একটি পথিকের পথ চলার কিছু সাহায্য করিতেছে।

তখনও রাত্রি বেশী হয় নাই, সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। যদিও আকাশের কালোমেঘের ঘন-ঘটাচ্ছন্ন অন্ধকার এবং বিরাট স্তব্ধতা দেখিলে রাত্রি দ্বিপ্রহরই মনে হয়।

সুরমা তিন বৎসরের পুত্র সমরেন্দ্রকে পাশে শোয়াইয়া ঘুম-পাড়ানি গান গাহিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। অদূরে একখানি তেপায়ার উপরে একটি বাতি জ্বলিতেছে। ঘরে আস্‌বাবের বাহুল্য নাই। একখানি খাট, একটি কাপড়ের আলমারী, একটি ড্রেসিং টেবিল্, তাহার সম্মুখে একখানি চেয়ার। খাটের অতি নিকটেই একখানি তেপায়ার উপর দু'চারখানি পুস্তক এবং সংবাদপত্র। পাশের ঘরখানিও শয়নগৃহ। দুইখানি ঘরের মাঝখানে একটি দরজায় একখানা গাঢ় সবুজ রংয়ের পরদা ঝুলিতেছে। সেই ঘরে গৃহস্বামী সুরেন্দ্রনাথ একখানি ছোট সেক্রেটারিয়েট টেব্‌লের সম্মুখে বসিয়া অধ্যয়নে নিমগ্ন। ঘরের মাঝখানে একখানি ছোট লোহার খাটে গৃহস্বামীর শয্যা। এঘরে আসবাবের মধ্যে আর একটি বইয়ের আলমারী ও দুইখানি চেয়ার।

পুত্র ঘুমাইয়াছে বুঝিয়া সুরমা পাশ ফিরিল এবং হাত বাড়াইয়া তেপায়া হইতে একখানি সংবাদপত্র টানিয়া পড়িতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে অনুচ্চস্বরে ডাকিল, "শুনছ, ওগো, তুমি কি কাজে বড় ব্যস্ত এখনও?" বাহিরের ঝড়বৃষ্টির আন্দোলন তখন পুরোদমে চলিতেছে, বৃষ্টি পড়ার শব্দে সুরমার কণ্ঠস্বর পার্শ্বস্থ গৃহে পৌঁছিল না। দু'একবার ডাকিয়াও যখন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন সুরমা উঠিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বামী গভীর মনোযোগে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পাঠ করিতেছেন, কখনো বা অস্পষ্টস্বরে পঠিত অংশ আপন মনে পুনরাবৃত্তি করিতেছেন, পত্নীর উপস্থিতি কিছুমাত্র টের পান নাই। সুরমা অধৈর্য্য হইয়া স্বামীর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল "উঃ! কি মনোযোগ! দরকার নেই তোমার ওকালতী পাশ ক'রে, সারাদিন স্কুলের খাটুনী, আবার রাতদুপুর পর্য্যন্ত এত পড়া, শরীর ভেঙে যাবে যে? কখন্ থেকে ডাকছি, এমন ডুবে আছ যে কানেও শুনতে পাচ্ছনা!" সুরেন্দ্রনাথ পত্নীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন "তোমার কথা কি না শুনে পারি সুরো? দেখ না, কি প্রচণ্ড শব্দ! চালের ওপর যেন দুন্দুভি বাজ্‌ছে!"

সুরমা বলিল, "ও ঘর থেকে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি, পাঁচ মিনিট পুরো, তবু গায়ে হাত না দেওয়া পর্য্যন্ত টের পাওনি।" সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "সত্যি, আজ অনেকখানি পড়া এগিয়েছে, বর্ষার সময়টা কাজকর্ম্ম নিয়ে থাকলে সময় কাটেও ভাল, কাজও হয় দেখি বেশ। যে বর্ষা এদেশে দেখ্‌ছি, বেরোবার তো যো নেই, ঘরেও ভিজিটরের উৎপাত নেই। এই ক'টা

মাস পড়ে নিতে পারলে এবছর পাশ করবই ঠিক্ দেখ্ছি।"

সুরমা স্বামীর চেয়ারের হাতলে বসিয়া স্বামীর গলা দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "আমি যে পারিনে আর একা একা টিকৃতে। কাঁহাতক্ সারাদিন রাত বই মুখে ক'রে বসে থাকা যায় বলো ত? একটি কথা কইবারও লোক নেই, কোথাও বেড়াতে বেরোবারও যো নেই এই বর্ষার জালায়, কি দেশেই এসে পড়েছি!" সুরেন্দ্র বলিলেন "তাই ত বল্ছিলাম তুমি না হয় এই সময় বেসিনে তোমার বন্ধু শৈলজার কাছে গিয়ে মাসকয়েক থেকে এসো। অক্টোবরের ছুটিতে গিয়ে তোমাদের আবার নিয়ে আসব।" সুরমা রাগের ভাণ করিয়া বলিল "তুমি ত আমাদের কেবল এখানে সেখানে পাঠাতে পারলেই বাঁচো। এই ঘোর বর্ষায়, মাঠের মাঝখানে এই নির্জ্জন বাড়ীতে তোমাকে নির্ব্বাসন দিয়ে আমি ফূর্ত্তি করতে যাই আর কি! তোমার তাহ'লে খুব ভাল লাগ্বে বুঝি? তা' ছাড়া বেসিন যায়গাটা তো বিশ্রী শুনেছি, শৈলরাই চলে আস্তে পারলে বাঁচে। রমেন্বাবুকে তোমাদের স্কুলে বদ্লি ক'রে আনা যায় না? এখানে আমাদের মতন আর একটি পরিবার থাকৃত যদি তা' হ'লেই বেশ থাকা যেতো"।

সুরেন্দ্র স্ত্রীর গাল টিপিয়া বলিলেন "তোমার স্বামী তোমার সংসারের কর্ত্তা হোতে পারে, ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা ত নয়? সংসারে যা চাওয়া যায়, তাই কি পাওয়া যায়? নিজের মনের মতন লোকই যে সব সময় পাবে, তা' আশা করাই ভুল। প্রবাসে এসেছ, প্রবাসী বাঙালী, অ-বাঙালী বিদেশী কত রকম লোকের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পাবে, কত রকম অভিজ্ঞতা বাড়বে, মন্দ কি? আচ্ছা, এখানকার মেয়েদের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় হয়েছে? কি রকম এঁরা?"

সুরমা উৎসাহে চেয়ারের হাতল ছাড়িয়া টেব্লের খাতা বই সরাইয়া স্বামীর সম্মুখে বসিয়া বলিল "ওহো, তোমাকে বল্তে ভুলে গেছি, আজ একজন লোক এসে বলে গেল 'কাল বিকেলে আমাদের ঘরের আম্মা আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসবেন, আপনি কি ঘরে থাকবেন? আমি বলে দিয়েছি যখন ইচ্ছা আস্তে ব'লো, এই বর্ষায় ঘরে না থেকে যাব কোথায়? আজই দু'টোর সময় দুটি বউ এসেছিলেন। একজনের স্বামী উকিল, একজনের স্বামী ওভারসিয়ার। বেশ মিষ্টি স্বভাব, পর্দ্দানসীনও ঠিক্ ন'ন তাঁরা। বললেন পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ী হেঁটে যাওয়া আসা করেন, তবে এটাও বল্লেন 'রাস্তায় বেরুলে বাঙালী পুরুষের সাম্নে পড়লেই মুস্কিল, ঘোমটা টেনে সরে পড়তে হয়, অন্যজাতির লোকের সাম্নে তো আর লজ্জা নেই? ব্যবহারে, কথায়বার্ত্তায় তো বেশ লাগ্লো তবে কথা বলে যা বুঝলুম, পরচর্চ্চা, রান্নাবান্না আর তাস-পেটানো এই হ'ল তাদের জীবনযাত্রার তিনটি সরঞ্জাম। আমাকে ত যেতে বল্লেন তাঁদের বাড়ী, বার বার কোরে অনুরোধ করলেন। আমার কিন্তু তাঁদের একটা ব্যবহারে মনটা কেমন হ'য়ে গেল। একটি বউ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কল কোথায়? একটু জল খাব।' আমি বল্লাম 'কলের জল কেন খাবেন, বর্ষার জল ত ভাল না, আমরা জল ফুটিয়ে ছেঁকে খাই, সেই জল এনে দিই।' আমি খাবার জল আন্তে গিয়েছি, এঁর মধ্যে তাঁরা স্নানের ঘরে ঢুকে প'ড়ে কল থেকে হাতে ক'রে জল খেলেন। আমি ত অবাক, আমার ঘরের জল খাবেন না বুঝিয়ে দিলেন। মহাত্মা গান্ধী তো ছুঁৎমার্গ উঠিয়ে দেবার জন্য উপোস ক'রে মরছেন, আর আমাদের ঘরে ঘরে বাঙালী মেয়েরা কি ভাবে জাত বাঁচিয়ে চল্ছেন দেখ। এইভাবে পরস্পরকে দূরে রাখ্লে কখনো আত্মীয়তা জন্মতে পারে? তাই ভাব্ছি, কালকে যে 'আম্মা' আস্বেন বোলে নোটীশ পাঠিয়েছেন, তিনি আবার কি রকম হবেন, কে জানে?"

সুরেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে স্ত্রীর সব কথা শুনিয়া বলিলেন "ওসব কিছু মনে রেখো না। বহুকাল যাঁরা বাংলা দেশ এবং ভারতবর্ষ ছেড়ে এই বর্ম্মা দেশে বাস করছেন, তাঁরা খবর রাখেন না দেশ কত এগিয়ে চলেছে। নব্য সমাজ আর ওসব ছোটখাট বিচার নিয়ে পড়ে নেই। বিয়ে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বড় অনুষ্ঠানেই যা' একটু আচার মেনে চলে। তুমি তোমার ব্যবহারে ওদের কিছুমাত্র বুঝতে দিয়ো না যে তুমি দুঃখিত হ'য়েছ। তোমার ব্যবহারে, আদর অভ্যর্থনায় যদি

ত্রুটি না হয় তবে তোমার প্রতি ক্রমশঃ স্নেহের আকর্ষণ হ'বে। বিদেশে এই কয়টি বাঙালী আছি, পরস্পরের বন্ধন না থাক্‌লে চল্‌বে কি করে?"

স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনকে ছাপাইয়া ভীষণ জোরে সদর দরজার কড়া ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বাজিয়া উঠিল। উভয়ে চম্‌কাইয়া উঠিয়া একত্রে বলিয়া উঠিলেন "ও কি! এই দুর্যোগে, এত রাত্রে কে?" সুরেন্দ্র উঠিয়া সিঁড়ির জানালা একটি খুলিয়া দেখিলেন, বাহিরের ঝড়বৃষ্টি একটু কমিয়াছে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জ্জন এবং বিদ্যুতের চকমকি জানাইয়া দিতেছে, আর একবার রণসজ্জায় সাজিয়া শ্রাবণের মেঘদূত ঝড়ের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে আসিতেছে। সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে?' উত্তর নাই—আবার কড়ার ঝন্‌ঝনানি!

সুরেন্দ্র দুইচার ধাপ নামিয়া আবার বলিলেন 'কে ডাকছেন?' বামা-কণ্ঠে উত্তর আসিল "অতিথি, স্ত্রীলোক, দরজা খুলুন।" সুরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া সুরমাকে ডাকিবেন মনে করিতেছেন, ইতিমধ্যে সুরমা উপরের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকের গলা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল এবং স্বামীকে বলিল 'তুমি সঙ্গে এসো, আমার একা দরজা খুলতে কেমন ভয় করছে।' সুরেন্দ্র স্ত্রীর পশ্চাতে নামিতে নামিতে ডাকিলেন "এ রামস্বামী, দরওয়াজা খোল্‌কে দেখো, কোন্‌ আদ্মীলোক বোলাতেঁ হেঁ।"

মাদ্রাজী চাকর রামস্বামী তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে। দরজা ভাঙাভাঙির শব্দে যার ঘুম ভাঙে নাই, বাবুর একটা ডাকে কি তার সাড়া পাওয়া যায়? অগত্যা সুরমা দরজা খুলিল, সুরেন্দ্র সিঁড়িতে দাঁড়াইলেন। একটি কোরঙ্গী ছোক্‌রা-চাকর লণ্ঠন হাতে এবং আম্মার মাথায় ছাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া শীতে ঠক্‌ঠক করিয়া কাঁপিতেছে আর তার আম্মা—একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক, পরণে একখানি লাল পেড়ে তসর, গায়ে একটি ছোট হাতার জামা। এক-ফেরতা শাড়ী, গায়ে ও মাথায় জড়ানো কিন্তু কাঁধের অনেক নীচে, বুকের কাছ ঘেঁসিয়া একটি সেফ্‌টিপিনে বাঁ দিকের কাপড়গুলি জড় করিয়া আঁচলটির সঙ্গে আবদ্ধ। আঁচলের কোণে এক গোছাচাবি পিনের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মাথার কাপড় কপাল প্রায় ঢাকিয়া পড়িয়াছে, ডান দিকের কাঁধের জামার সহিত মাথার কাপড় এমন ভাবে একটি প্রকাণ্ড পিন্‌ দিয়া আঁটা যে ভদ্রমহিলা যেন স্বেচ্ছায়, সহজভাবে নিজের ঘাড় ফিরাইতে পারিতেছেন না।

মহিলাটি ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিলেন "অ-ঠাকুরণ তোমার বাবুকে একটু পেছন ফিরে দাঁড়াতে বল, আমি ঘরে ঢুকে যাই।" কথাটুকু এমন জোরে বলা হইল যে সুরেন্দ্রের কানে বেশ পরিষ্কার ভাবেই পৌঁছিল। সুরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন এবং সুরমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "তোমরা নীচের বৈঠকখানায় ব'স তা'হলে।"

সুরমা মহিলাটির আপাদমস্তক একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এই দুর্যোগে রাত্তির বেলা আপনি বেরিয়েছেন, বিশেষ কোনো দরকারে বুঝি? আসুন, এই ঘরে বসি" বলিয়া একতলার একখানি ঘরে হ্যারিকেন্‌টি হাতে লইয়া প্রবেশ করিল।

মহিলাটি ছোক্‌রা চাকরটিকে বলিলেন "এই আপপানা, তোম্‌ ঘর্‌মে চলা যাও, বাবু আনে সে ফির্‌ ইধার আকে হাম্‌কো লে যাও, মালুম?" সুরমা মনে মনে হাসিয়া বলিল এদেশের দেখি সবই কোরঙ্গী আর মাদ্রাজী চাকর, আর সবাই আমারই মতন হিন্দীর পণ্ডিত। চাকরটি বাহির হইয়া গেলে সুরমা দরজায় খিল্‌ বন্ধ করিয়া ঘরে আসিয়া বসিল। মহিলাটি সুরমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন "তুমি দেখ্‌ছি, ছেলেমানুষ নিতান্ত। বাঙালী মেয়ের মতনই কথা কইছ, আমাদের মতনই কাপড় পরেছ।" সুরমা হাসিয়া বলিল "আমি যে বাঙালীরই মেয়ে, আপনি কি তা' জান্‌তেন না?"

"তবে যে শুনলুম, তুমি বুট পায়ে দিয়ে পুরুষদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াও, সাহেবদের বাড়ী, বর্ম্মাদের বাড়ী যাও, তাদের ছোঁয়া খাও?"

"বুট পায়ে দিইনা, তবে জুতো, চটী পরি, আমার স্বামীর সঙ্গে রাস্তায় হেঁটে বেড়াতেও যাই, সাহেবরা কি বর্ম্মারা নেমন্তন্ন করলে তাদের বাড়ী গিয়ে খাই, তা' বলে আমি বাঙালী নই, একথা কে বল্‌লে?"

বৈশাখ ৩৪

গাধূলি
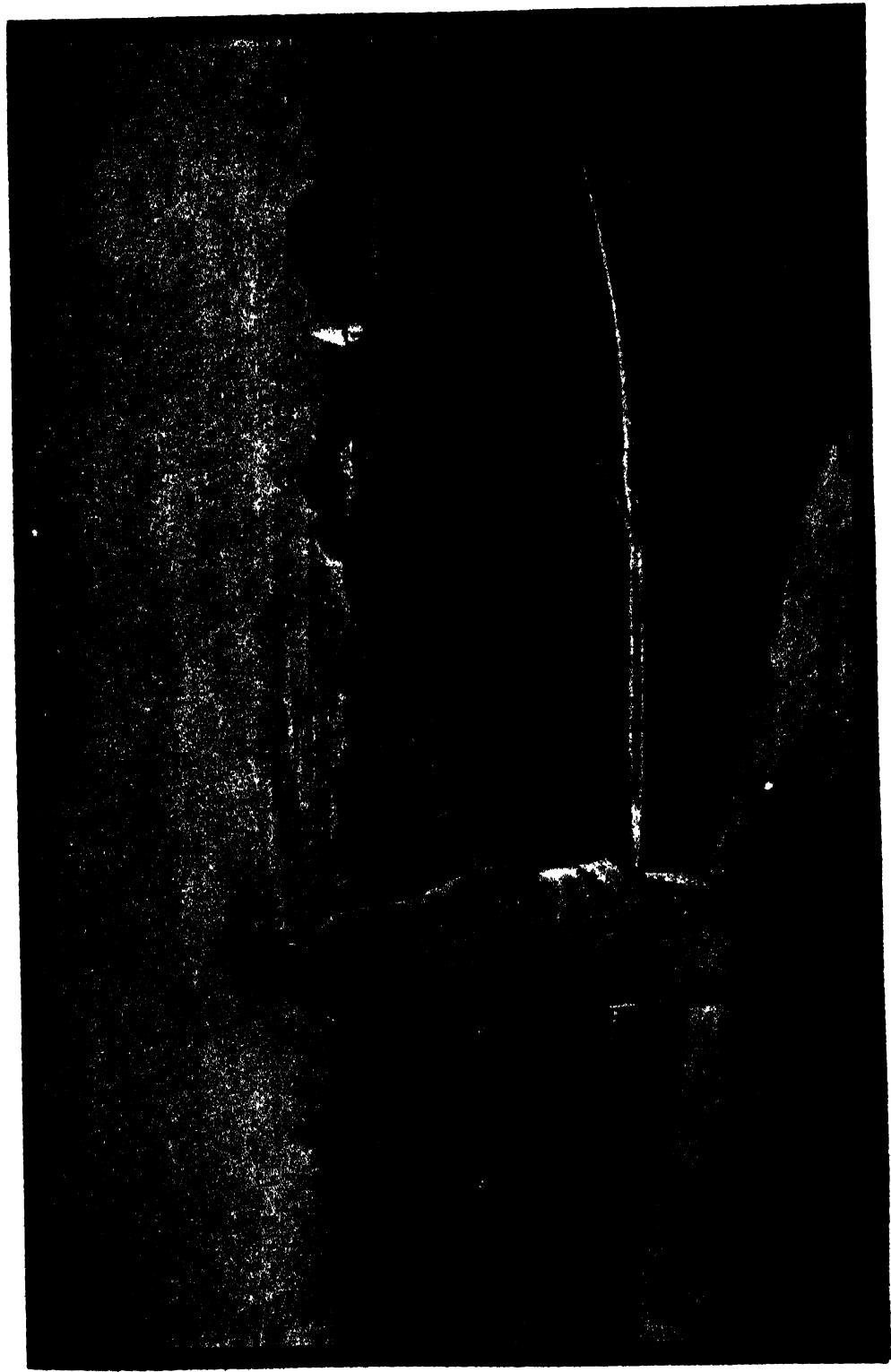
শিল্পী—শ্রীশান্তি দেবী

"না বাপু, আমাদের বাঙালীর মেয়ে কি ওরকম চালে চলে? তুমি তা' হোলে খৃষ্টান্ হয়েছ বুঝি?"

"না, আমি ক্রিশ্চানও নই।"

"তুমি ইংরিজীতে কথা কইতে পার? ক'টা পাশ দিয়েছ?"

"দরকার হ'লে ইংরিজীতে কথা বলি বই কি!"

আমি বি-এ পাশ করেছি।"

"ও বাবা, তিন তিনটে পাশ করে ফেলেছ এই বয়সে? তবে তোমার স্বামীর সমানই বিদ্যে বল। আচ্ছা, কি ক'রতে বিয়ে করলে বলত? চারটি ভাতের জন্যেই তো বাপের ঘর ছেড়ে এসে এত দুঃখ করা? আমাদের না হয় উপায় নেই, তুমি ত মাষ্টারী করলে ঢের রোজগার করতে পারতে। কেন, মিছে গলায় শেকল বাঁধলে?"

সুরমা তাহার জীবনে এ পর্য্যন্ত এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন কখনও শোনে নাই। সে যে ইহার কি উত্তর দিবে অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না। শেষে বলিল "শুধু ভাতের জন্যে কি কেউ বিয়ে করে? বিয়ে করার কি আর কোনো উদ্দেশ্য বা সার্থকতা নেই?"

"এই নাও, আরম্ভ করলে বক্তৃতা! ওসব বড় বড় কথার মানে বুঝি না আমরা। আচ্ছা, শোন বলি, তুমি স্বামীর ঘর না ক'রে যদি দেশে দেশে বক্তৃতা করেও বেড়াতে, তাহলেও কত নাম হোতো, কেমন স্বাধীনভাবে থাকতে পেতে, তা' না ক'রে মুখ্যু মেয়ে মানুষের মতন একটা ল্যাজ জুটিয়ে সহস্র বাঁধনে বাঁধা পড়লে! বছর বছর ছেলে বিয়োবে, আর হাঁড়ি, কড়া নাড়বে। আর দশ বছরের ভেতরে অকালে বুড়ী সেজে নানা রোগ, অশান্তি ভোগ করবে। এই ত লাভ! অমন সুন্দর কচি মুখখানি কি আর থাকবে অমন সুন্দর, পাঁচ বছর পরে?" এই কথাগুলি শেষ করিয়া মহিলা স্বগত বলিতে লাগিলেন "আঃ, এমন দুর্ব্বুদ্ধিও এমন মেয়েদের হয়? তবে আর লেকাপড়া শেখার মূল্য কি?"

সুরমা এসব আলোচনায় বাধা দিয়া বলিল "আপনার বাড়ী কি কাছেই? খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছেন বুঝি?"

মহিলাটি কপাল চাপড়াইয়া বলিলেন "হাঁঃ! এখুনি খাওয়া? রাত বারোটার এক মুহূর্ত্ত আগে কোনোদিন পাতে বসিনি এ বর্ম্মা মুলুকে। তবে আর বলছি কেন সংসারের দুঃখের কথা।"

"এখন ত ন'টা বাজল প্রায়, এখনও বাবু ঘরে আসেননি?"

"তবে আর আমি বেরিয়েছি? ছেলেপিলেদের আটটার সময় খাইয়ে ঘুমপাড়িয়ে শুয়েছিলুম, জানি ত বাবু এগারটার আগে ফিরবে না। একা একা ভাল লাগে না, রোজই এ সময় একবার ঘুমিয়ে পড়ি, বাবু এলে উঠে ভাত দিই। আজ আমার দুধওয়ালার কাছে শুনলুম, একজন নতুন বাবু এসেছেন, দু'মাস হ'ল, তাঁর গিন্নী একেবারে মেম সাহেব। সরকারী ইস্কুলের মেম সাহেব মাষ্টারদের সঙ্গে বসে চা খায় আর ফুটফাট ইংরেজী বলে, সে নিজে দাঁড়িয়ে শুনে এসেছে। তাই দুপুরবেলা খবর পাঠালুম, কাল তোমার কাছে আসব বলে। ভাবলুম, বাবুকে একবার ব্যাপারটা জিজ্ঞেস্ কোরে তবে আসব। তা, বাবু আজ আফিস্ থেকে ফিরলেই না, কখন আসবে, কে জানে? তাই মনে করলুম এক্ষুনি একবার দেখে আসি। আর বর্ষার কথা বলছিলে? এ ত ভালদিন দেখছ। এখানে বছরের মধ্যে ছয়মাসই পুরো বর্ষা, ভিজে না বেরিয়ে উপায় কি বল? ছ'মাস ত আর ঘরে বসে পচা যায় না?"

সুরমা এবং সুরেন্দ্র দরজা ধাক্কার শব্দে অনুমান করছিলেন, নিশ্চয়ই কোনো বিপদগ্রস্ত পথিক। তাহারা কল্পনা করিতেই পারেন নাই যে এমন ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া, ভীষণ মেঘগর্জ্জন এবং বিদ্যুতের চকমকি পথের সাথী করিয়া কোন ভদ্রমহিলা তাহাদের মত লোককে শুধু দেখিবার উৎসাহে এমন সময় আসিতে পারেন।

মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বুঝি ছেলেপিলে হয়নি এখনও?"

"হাঁ৷ আমার একটি ছেলে সে ঘুমোচ্ছে ওপরে।"

"তোমার বয়স কত?"

"ঢের হ'য়েছে, এই চব্বিশ বছর পূর্ণ হোলো সেদিন।"

মহিলা বিস্মিত হইয়া বলিলেন "চ-ব্বি-শ ব-ছ-র? দেখে ত মনে হয় সতেরো, আঠারো, বিয়ে হ'য়েছে কতদিন?"

"চার বছর।"

"নিশ্চয়ই বেশ মনের সুখে আছ, তাই এমন কচি চেহারাটি আছে। আমার দশ বছর পার হ'তে না হ'তে বিয়ে হ'য়েছে, বারো বছরে ছেলের মা হ'য়েছি, এখন তিরিশ বছর বয়সে এগারোটি সন্তানের মা হ'য়েছি, জরাগ্রস্ত হ'য়ে মহা অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছি।"

সুরমা মহিলার চওড়া টাক্-জোড়া মোটা সিঁদুর এবং বার্দ্ধক্যের রেখাচিহ্ন ভরা মুখখানা দেখিয়া ইঁহার বয়স অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ হইবে অনুমান করিয়াছিল, যদিও ভদ্রতার রীতি অনুসারে বয়স জিজ্ঞাসা করে নাই। এখন তাহার অনুমান একেবারে ভুল হইয়াছে দেখিয়া বিস্ময়ে মহিলাটির মুখের দিকে চাহিয়া অস্পষ্ট স্বরে নিজের মনে উচ্চারণ করিল "উঃ, তিরিশ বছরে এগারোটি ছেলের মা!"

"আশ্চর্য্য হোচ্ছ, হবারই কথা। দুঃখের কথা কি বল্‌ব? আমি বাপ্-মায়ের অতি আদরের মেয়ে ছিলাম, কিন্তু হ'লে কি হবে? কুলীনের ছেলে, ভাল বংশ-মর্য্যাদা দেখে মা বাপেরও জিভে জল সর্‌ল, তাঁরা আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। দশ বছরেই "গৌরীদান"(?) করে দিলেন। মেয়ের ভবিষ্যৎ দেখলেন না। যার হাতে দিলেন সে তখন একুশ, বাইশ, বছরের ছেলে, লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা—চাল নেই, চুলো নেই, ছিল তার কেবল বংশ আর কুলের অহঙ্কার। এমন অপাত্রে না পড়্‌লে আজ এই মেয়ের কি এ হেন দুর্দ্দশা হয়? তুমি যে এল-এ, বি-এ পাশ করেছ, সে ত তোমার বাপমায়েরই যত্নে? আমায় লেকা পড়া শেখালে কি আমিও দুটো একটা পাশ করতে পারতুম না? আমার ছেলে বেলায় খুব বুদ্ধি ছিল, আমার বাবা আমার নাম রেখেছিলেন 'বসন্ত'। কেন জান? সবাই বলত আমাকে কলেজে পড়ালে আমিও ঐ যে কে এক অ্যানি বসন্ত, না কে খুব বক্তৃতা ক'রে বেড়ায়, মেমসায়েব বাঙালী সেজেছে, হিন্দুর ধর্ম্ম নিয়েছে তার সমান বিদুষী হ'তে পার্‌তাম। তুমি জাননা গো সে মেমের নাম?"

সুরমা বলিল "আপনি কি মিসেস্ অ্যানি বেশান্তের কথা বল্‌ছেন?"

"ওগো হাঁ্যা, মেমসায়েবী নাম উচ্চারণ হয় না আমার। সে ত বাঙালীর মত নাকি নাম নিয়েছে? 'বাসন্তী' না 'বসন্ত' কি যেন লেখে সে? ঐ তার নামে নাম মিলিয়েই বাবা আমার নাম দিয়েছিলেন 'বসন্ত'। কত আশাই ছিল বাবার মনে? কোথায় ভেসে গেল সব ঐ মুখ্যু কুলীনের ছেলেটাকে দেখে।"

স্বামীর সম্বন্ধে এরকম অশ্রদ্ধাসূচক ভাষা বারবার প্রয়োগ করাতে সুরমার বড় অস্বস্তিবোধ হইতেছিল, সে বাধা দিয়া বলিল, "হাজার হোক্ তিনি আপনার স্বামী, আপনার সন্তানদের পিতা, আপনি ওরকম ভাষায় তাঁর কথা বলছেন কেন?"

মহিলা নাক মুখ সিঁটকাইয়া অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলেন, "জাননা ত সে কি গুণের স্বামী আমার? ছেলেপিলেরা ত বাপ্‌কে সম্মান ক'রে উল্টে যাচ্ছে! সে যেমন, তার প্রাপ্যও ত তেমনি হবে?"

সুরমা কেবল বাহিরের দিকে তাকাইতেছিল, কখন সেই আপ্পানা নামধারী চোকরাটি আসিয়া এই মহিলাটির হাত হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে! এমন সময় বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে একটি লণ্ঠনের আলো দেখা গেল, সুরমা হাঁফ্ ছাড়িয়া বলিল "ঐ আপনার চাকর আস্‌ছে।" ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল "সাড়ে দশটা বাজে!"

আপপানা আসিয়া পৌছাইতেই মহিলাটি সপ্তমস্বরে গলা চড়াইয়া বলিলেন "এত্‌না দেরীসে তোম্‌রা বাবু ঘরমে আয়া"? যেন বাবুর দেরী ক'রে আসাটার অপরাধটা এ বেচারীরই! আপপানা আধা হিন্দী, আধা তেলেগু ভাষায় জানাইয়া দিল বাবু এখনও আসেন নাই, ছোট খোকাবাবু উঠিয়া ভয়ানক কান্নাকাটি করিতেছে, দিদিরা কেহ রাখিতে পারিতেছে না। মহিলাটি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। সুরমার চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন "তবে আসি বোন্, তোমায় দেখে আমার বেশ লাগ্‌লো, আর একদিন আস্‌ব, অনেক গল্প কর্‌ব। দেখ্‌লে ত আমার কপাল? এখনও কর্ত্তা বাড়ী ফেরেননি। কত রাত এম্‌নি ক'রে একা ঘরে

কাটাতে হয়। যদি বা ঘরে ফেরে, মদে চুর হোয়ে এসে সবাইকে মারবে ধরবে। এই হ'ল আমার সুখের ঘরকন্না।" বলিতে বলিতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে ছোক্‌রার পিছনে পিছনে বাহির হইয়া গেলেন।

তখন রাস্তায় জনমানব বা গাড়ীঘোড়ার চিহ্নমাত্র নাই, নিস্তব্ধ তমসাচ্ছন্ন রাত্রি, আকাশে নিবিড়-পুঞ্জীভূত মেঘ, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ! সুরমা দরজার একটি কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া মহিলাটির জীবনের ইতিহাস ক্ষণকাল চিন্তা করিল, সহানুভূতিতে মনটা তাঁহার প্রতি সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। আস্তে দরজাটি বন্ধ করিয়া উপরে আসিয়া দেখিল স্বামী তাহারই অপেক্ষায় উপরের ড্রয়িংরুমে একখানি ইজিচেয়ারে নিদ্রিত, বুকের উপর একখানি বই খোলা পড়িয়া আছে। সুরমার পদশব্দে সুরেন্দ্র উঠিয়া বলিলেন, "উঃ এগারটা বাজল, এতক্ষণ কি গল্প করলে তোমরা?" সুরমা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঙ্গালী মেয়ের জীবনের দুঃখভরা ইতিহাসের একটু ভূমিকা কেবল শুনলাম, আর বেশী শোন্‌বার আগ্রহ যদিও নেই, তবু মহিলাটি আর একদিন আসবেন বল্লেন, আমাকে নাকি তাঁহার ভাল লেগেছে।"

সুরেন্দ্র সুরমার মুখখানি দুইহাতে ধরিয়া মুখের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "এ মুখখানা কি কেউ ভাল না বেসে পারে?"

স্বামীর আদরে, গর্ব্বে সুরমার বুকখানা ভরিয়া উঠিল।

২

"মা, মাগো, ওমা! তুমি কই? দ্যাখ, দ্যাখ, কেমন খুকু আর একজন মাসীমা এসেছেন।" সুরমার শিশুপুত্র সমরেন্দ্র অতিকষ্টে সদর-দরজার সিঁড়ির শান-বাঁধানো ধাপ দুইখানি বাহিয়া দৌড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে খাবার ঘরে আসিয়া আধআধ ভাঙাভাঙা উচ্চারণে মাকে এই সংবাদটি দিল। সুরমা তখন গ্যাস-ষ্টোভ জ্বালাইয়া গজা ভাজিতেছিল। বেলা সাড়ে তিনটা বাজিয়াছে, স্বামীর গৃহে ফিরিবার সময় প্রায় হইয়াছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি জলখাবার প্রস্তুত করিতেছিল, এমন সময় মহিলা-বন্ধুদের আগমনী সংবাদ পাইয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। এখনই কত শত মন্তব্য তাঁহাদের মুখ হইতে শুনিতে হইবে। তাহার ঘরকন্না এবং চলাফেরা সম্বন্ধে অপ্রয়োজনীয় কত কথার উত্তর তাহাকে দিতে হইবে, তাহা সে বেশ ভাল করিয়াই জানিত। ছোট খুকু লইয়া কোন্ "মাসীমার" শুভাগমন হইয়াছে সে কল্পনা করিয়াও অনুমান করিতে পারিল না, ছেলেকে বলিল "যা সমু, তুই মাসীমাদের উপরে নিয়ে গিয়ে বস্‌তে দে, আমি যাচ্ছি।"

"কেন গো গিন্নী, আমরা কি এঘরে ঢুক্‌তে পারিনে? মেয়েমানুষের রান্নাঘরই বৈঠকখানা। একখান চাটাই, মাদুর কিছু নেই? বিছিয়ে দাও না, এইখানেই বসি।" বলিতে বলিতে প্রবীণা বাঁড়ুযো গৃহিণী একটি যুবতী বধূকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুরমা ষ্টোভ হইতে কড়াটি নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘর হইতে একখানি জাপানী মাদুর আনিয়া বিছাইয়া দিয়া বলিল, "এখানে গরমে কষ্ট হবে আপনাদের, তাই বলছিলাম।" তরুণী মহিলাটি কোলের খুকীটিকে মাদুরে শোয়াইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "না দিদি, কষ্ট কি আর? আপনার বাড়ীখানি ত বড় সুন্দর, কেমন আলো, বাতাস খটখটে। নীচের তলাই এমন, ওপরের ঘর আরও ভালো নিশ্চয়।"

বাঁড়ুযোগৃহিণী ঠোঁট বাঁকাইয়া সুর করিয়া বলিলেন, "ওগো সরকারী বাড়ী, ভাল হবেই বা না কেন? একি আমরা, যে দু'পয়সা শস্তার জন্য এঁদোগলি বেছে দশ টাকা ভাড়ার ঘর খুঁজবো? বিনিপয়সায় এমন ঘর পেলে ছাড়বে কেন বলত?" সুরমা চিনির রস নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সরকারী বাড়ী বটে, তবে বিনিপয়সায় পাইনি, আমাদের ভাড়া দিতে হয়।" বাড়ুয্যেগৃহিণী গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা কি বলছ গো তুমি? সরকারী ঘরে আবার কেউ ভাড়া দিয়ে থাকে, এমন কথা ত কখনও শুনিনি। কথায় বলে, 'কোম্পানীকা মাল দরিয়ামে ঢাল্'; সরকারের টাকার কি মা-বাপ আছে যে কেউ খোঁজ হিসাব করবে? বাড়ীভাড়া লাগে না, একথাটা লুকোবার দরকার কি? আমরা ত আর ব'লে বেড়াতে যাচ্ছি না।"

সুরমা এরকম অসঙ্গত ইঙ্গিতে বেশ বিরক্ত বোধ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "লুকোবার প্রশ্ন ত নয়, সরকারী বাড়ী হ'লেই যে সবাই বিনাভাড়ায় পায়, এ-ধারণা আপনার ভুল। এ-বাড়ী আমাদের প্রাপ্য নয়, খালি ছিল ব'লে আমরা অন্য বাড়ী না পাওয়া পর্য্যন্ত ভাড়া দিয়ে থাকবার অনুমতি পেয়েছি। সরকারের দরকার হ'লেই ছেড়ে দিতে হবে।"

মহিলাটি একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া তরুণীর দিকে ফিরিয়া চোখ টিপিলেন। সুরমা ষ্টোভের উপর গরমজলের কেটলী তুলিয়া দিয়া বলিল, "চলুন আমরা এখন উপরে যাই।" বাহিরের দরজায় জুতার শব্দ পাইয়া মহিলাদ্বয় মাথার ঘোমটা আরও আধহাত টানিয়া দিলেন এবং বাড়ুয্যেগৃহিণী উঠিয়া দরজার একটি কপাট বন্ধ করিয়া তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া ঘোমটার কাপড়টি একটু ফাঁক করিয়া আগন্তুক পুরুষ মানুষটির আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন এবং সুরমার দিকে ইসারায় চাহনি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইনিই তাহার স্বামী কিনা। সুরমা একটু হাসিয়া বলিল, "উনি নীচের বৈঠকখানায় এখন একটু বিশ্রাম করবেন, আমরা ওপরেই যাই, চলুন"

শিশুটিকে ঘুমন্ত অবস্থায় মাদুরে রাখিয়াই তরুণী সুরমার পশ্চাতে উপরে চলিলেন। সমু তাঁহার আঁচল ধরিয়া বলিল, "মাসীমা, ছোটখুকুকে আমাদের দিয়ে দিলে?" তরুণী সমুকে কোলে তুলিয়া চুমো দিয়া বলিলেন, "বেশ ত, তুমি ওকে রেখে দিও, কেমন?"

সুরমা অতিথিদের ড্রয়িংরুমে বসাইয়া বলিল, "আপনারা একটু বসুন, আমি এখুনি আস্‌চি।" নীচে আসিয়া স্বামীকে চা, জলখাবার দিয়া বলিল, "ওগো, সেই বাড়ুয্যে-গিন্নী একটি ছোট বউকে নিয়ে আজ আবার এসেছেন। কতক্ষণে উঠ্‌বেন জানি না, তোমার কিছু দরকার হ'লে রামস্বামীকে পাঠিয়ে দিও ওপরে।" সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সারাদিন পরে ঘরে এলাম, তোমাকেই ত দরকার এখন আমার। এত পপুলার হওয়া ভাল নয়; রোজই দেখি দলে দলে ভিজিটার্স আসছেন, নিত্যি নতুন। বাড়ুয্যে-গিন্নী আবার কে?"

"বাঃ এরি মধ্যে ভুলে গেলে? ঐ যে সেদিন রাত্তির বেলা এসেছিলেন ঝড়বৃষ্টির মধ্যে?"

"ও হোঃ, তিনিই যে বাড়ুয্যে-গিন্নী, তা কি ক'রে জানব আমি? আর ঐ বউটি কে?"

"ওঁর পরিচয় এখনও পাইনি। আচ্ছা যাই এখন, ওঁরা কি ভাববেন?" সুরেন্দ্রনাথ সুরমার আঁচল টানিয়া বলিলেন, "আর আমি কি ভাব্‌ব, তা ভাব্‌লে না?"

সুরমা স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি যে আমায় চেনো।"

সুরমা দুইখানি রেকাবীতে কয়েকখানি গজা এবং দুই পেয়ালা চা একটি ট্রে-তে সাজাইয়া লইয়া উপরে গেল এবং মহিলাদের সম্মুখে একটি তেপায়ার উপরে সেটি রাখিয়া বলিল, "একটু চা খান।" বাড়ুয্যে-গৃহিণী নাকে কাপড় দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া জানালার নিকট সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মধুসূদন! আমি খাব চা, আবার তোমার ঘরে? কুরুঙ্গীর দেওয়া জলে রাঁধ খাও তোমরা!" সুরমা অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "এখানকার সব বাড়ীতেই ত ঐ রকম চাকরই দেখি।" তরুণীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনিও খাবেন না?" বাঁড়ুয্যে-গিন্নী বলিলেন, "উষা কেন খাবে না? ওদের ঘরে ছত্রিশ জাতের সমাবেশ। ওর স্বামীর একটি বউ কুরুঙ্গিনী, একটি বউ বর্ম্মিনী আর দু'টি বাঙ্গালী। একই বাড়ীতে, একই রান্নাঘরে তিনটি উনুন, তিনটি হেঁসেল। ওর আর কি জাত আছে? বাঙ্গালী বউ একটি এ সব অনাচার সহ্য করতে না পেরে দেশে চলে গেছে। ও ছেলেমানুষ, স্বামীর মায়া ছাড়তে না পেরে টিঁকে আছে কোন রকমে।" এক নিঃশ্বাসে উষার সংসারের সকল বৃত্তান্ত বলিয়া ফেলিয়া বাঁড়ুয্যে-গিন্নী হঠাৎ অনুভব করিলেন যেন এতটা ওর সামনে বলাটা ঠিক হয় নাই; তাই সমবেদনার সুরে আবার বলিয়া উঠিলেন, "তা বাছা, কি আর করবে? বর্ম্মাদেশে সব বাঙ্গালী বউয়েরই প্রায় এই দশা! পনেরবছর বয়সে দু'টি ছেলে কোলে নিয়ে যে দিন এই সহরে পা দিলুম, সেদিন ঘরে ঢুকে দেখি এক বর্ম্মিনী মাগী ঘর সংসার করছে দিব্যি আরামে! মুখ ভার ক'রে, কেঁদেকেটে কর্ত্তার পায়ে ধরে কত কষ্টে সে বর্ম্মিনীকে তাড়িয়ে গোবর জল ছিটে দিয়ে,

হাঁড়িকুড়ি ফেলে তবে নতুন সংসার পাত্‌লুম। আমি বাবু, তারক মুখুজ্জোর মেয়ে, যার পৈতের তেজে এই জাত-খোয়ানর দিনেও বর্দ্ধমান জেলার লোক ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপে। আমাকে খাওয়াবে বর্ম্মিনীর ছোঁয়া জল? এত বড় আস্পর্দ্ধা ঐ ভ্রষ্ট কুলীনের ছেলের নেই! তেজ দেখিয়ে বর্ম্মিনীকে নিয়ে আর একটা ঘর ভাড়া ক'রে রাংগে। থাকো বাপু, আমার কি? আমার জাত আগে, না স্বামী আগে? সেই অবধি আমার কর্ত্তা ঘরছাড়া! সকাল, সন্ধ্যে আসে যায়, যখন তার মর্জ্জি হয়। মদ খেয়ে বর্ম্মিনীর ঘরে গেলে মার খায় কিনা তাই তখন আসে আমার খোসামোদ করতে। দুই সংসার নিয়ে সে আছে বেশ! তা' এমন রূপকে কোন্ ব্যাটা-বেটি ছেরদ্দা করবে, তুমিই বল না গো বি-এ পাশ করা মেয়ে? তুমি সেদিন বলছিলে, স্বামীকে কেন গালমন্দ করি? এই পনের বছর ধরে কত সইছি ব'ল ত? লাথি-ঝাঁটা ছাড়া পাইনি কিছু মনে রাখবার মত, ছেলেমেয়েগুলো পেটে ধরেছি, সেগুলোকে কোথায় ভাসিয়ে দেব বল? তাই এত জ্বালা পোড়া সয়েও এদেশে পড়ে আছি, নইলে কবে বাপের বাড়ী পালিয়ে যেতুম। এমন পোড়াকপাল দেশেও মানুষ আসে?" বলিতে বলিতে চোখের জল তাঁহার বুক ভাসাইয়া ঝরিতে লাগিল।

সুরমা এবং উষা স্তব্ধ হইয়া গালে হাত দিয়া এই বাঙ্গালীর মেয়ের আত্মকাহিনী অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। উষার অতি অল্পকালের বিবাহিত জীবনও সুখের ছিল না, অনেক দুঃখ-লাঞ্ছনার সঙ্গেই তাহার ইতিমধ্যে পরিচয় হইয়াছিল। বাঁড়ুয্যে-গৃহিণীর জীবনের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল—না জানি তাহার জীবনেও এমন কত অজানা অত্যাচার অপেক্ষা করিতেছে। হঠাৎ, খুকীর কান্নার সুর শুনিয়া উষা নীচে নামিয়া গেল। নীচে গিয়া দেখিল খুকীকে সুরেন্দ্রনাথ কোলে লইয়া বাগানে দাঁড়াইয়া আছেন। সে রামস্বামীকে বলিল, "এই ছোকরা, হামারা বাচ্চাকো লে আও, বাবু কো পাস্ মাৎ।" সুরেন্দ্র শুনিতে পাইয়া রামস্বামীর নিকট খুকীকে দিয়া সস্ত্রর হাত ধরিয়া বাগানে বেড়াইতে গেলেন।

উষা উপরে আসিয়া বলিল, "দিদি, আপনার স্বামী বুঝি ছেলেপিলে খুব ভালবাসেন? এর মধ্যে খুকীকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন।" সুরমা এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া ছিল; বর্ম্মাদেশে বাঙ্গালীর সংসারের যে সব চিত্রের নমুনা সে পাইতেছিল, তাহাতে সে ক্রমশঃই নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল। কি করিয়া এমন সমাজের সহিত সে নিজেকে পরিচিত করিবে? উষার কথায় তাহার চমক ভাঙিল; সে বলিল, "আপনিও ত কিছু খেলেন না, চা-টা ত জুড়িয়েই গেছে।" উষা দুইখানি গজা তুলিয়া লইল এবং চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলিল, "বর্ম্মায় আসবার আগেই আমার জাত গেছে, আমার বাবা বরাবর বিদেশে চাকরী করতেন, আমাদের পরিবারে ওসব ছোটখাট বিষয়ে কোনো বিচার-আচার নেই। বাবা বলতেন, "আদর ক'রে যে যা দেবে, তাই খাবে।"

বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী একটি বইয়ের শেল্‌ফের নিকট দাঁড়াইয়া বইগুলি দেখিতেছিলেন, একটি বই খুলিয়া খুব আগ্রহের সহিত সুরমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার নাম সুরমা দেবী? তোমরা ব্রাহ্মণ?" সুরমা বলিল, "আমরা ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মণ নই।"

—"তবে যে "দেবী" লিখেছ?"

—আমরা সকলেই দেবী লিখতে পারি, মেয়েদের নামের পিছনে পদবী না লিখে দেবী লিখলেই ভাল মানায়, না?

—ব্রাহ্মণ ছাড়া কারও দেবী লেখবার অধিকার নেই, তা জান? তোমরা জোর ক'রে লিখে পাপের ভাগী হচ্ছ। আচ্ছা, এ হাতের লেখা তোমার?

—হাঁ।

—নিজে লিখেছ, না স্বামী ইংরেজীর বানান্‌টা ব'লে দিয়েছে?

মহিলাটির অদ্ভুত অজ্ঞতা দেখিয়া সুরমা না হাসিয়া পারিল না। সে বলিল, "বি-এ পাশ ক'রেও নিজের নামটা ইংরেজীতে লিখতে শিখিনি?"

—কে জানে বাবা, পাশ করেছ কি না করেছ? পাশ যদি সত্যিই করতে তবে কি আর স্বামীর ঘর করতে আসতে? ঐ ত বোস্-সাহেবের মেয়ে ইংরেজী ইস্কুলে পড়ে

কি পাশ করেছে, ফিরিঙ্গীদের মতন ফুটফাট ইংরেজী বলে। তাকে তার বাপ বিয়ে দিলে জোর ক'রে। স্বামীটা এম্-এ পাশ করেছে কে বলবে? একেবারে আকাট মুখ্যুর মতন জংলী চেহারা। সাহিবীর 'স'ও জানে না। কি কথায় দু'জনের ঝগড়া বাধ্‌লো, বোস্-সাহেবের মেয়ে নেলী পায়ের 'ফানা' (বর্ম্মা-চটি) খুলে দিলে পটাপট্ স্বামী-বেটার পিঠে। সে চোরের মতন সেদিনই বিকেলের জাহাজে কল্‌কাতা ফিরে গেল। এখন ত নেলী কত দেশ-বিদেশে ইংরেজীতে বক্তৃতা ক'রে বেড়ায়, কত বাহবা, হাততালি পাচ্ছে, কত চোমড়া-চোমড়া সাহেব-সুবো তাকে মোটরে ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কে বলবে তাকে বাঙ্গালীর মেয়ে? তার স্বামীর মতন একশো টা ছেলেকে চরিয়ে বেড়াতে পারে সে—এম্নি তার ক্ষমতা!"

সুরমা অবাক হইয়া বাঁড়ুয্যে-গৃহিণীর শিক্ষিতা মেয়ের বর্ণনা শুনিতেছিল আর ভাবিতেছিল 'উঃ কি সাংঘাতিক উৎকট ধারণা এঁদের।' এমনি সময় একটি ঠিকাগাড়ীর মাথায় চাপরাশ-আঁটা এক আর্দ্দালী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল এবং রামস্বামীকে দেখিয়া বলিল, "এই ছোক্‌রা, আম্মালোক কো বোলো, গাড়ী লায়া, অভি ঘরমে যানে হোগা, সাহেব বহুৎ গোসা হুয়া।" আরদালীর গলা পাইয়া ঊষা বলিল, "সর্ব্বনাশ দিদি, উনি বাড়ী এসেছেন। না ব'লে এসেছি আপনার সঙ্গে এখানে খবর পেয়েছেন বোধ হয়, তাই আর্দ্দালীকে দিয়ে গাড়ী পাঠিয়েছেন। জানি না আজ কপালে কি আছে!" সুরমা ঊষার হাত ধরিয়া বলিল, "আসবেন আর একদিন।" বাঁড়ুয্যে-গৃহিনী বলিলেন, "তুমিও যেয়ো, নইলে আমরা আর আসব না।"

৩

সমরেন্দ্র ওরফে 'সমু' এখন Young Roy নামে পরিচিত হইয়া কিণ্ডারগার্টেন ক্লাসের ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তাহাকে শুধু "রয়" বলিয়া ডাকে। স্কুলের নীচের ক্লাসগুলিতে প্রায় সবই (Anglo-Burman) এংগ্লো-বর্ম্মণ শিক্ষয়িত্রী পড়ান। তাঁহারা সকলেই সমুকে খুব ভালবাসেন এবং Young Roy বলিয়া ডাকেন। একদিন সমু স্কুল হইতে টিফিনের সময়ে ঘরে আসিয়া বলিল, "মা আমাদের টিচার Miss Wolley তোমাকে দেখতে চান, চল না আমাদের স্কুলে এখন সব টিচাররা টিফিন খাচ্ছেন, এখন গেলে সবাইকে দেখতে-পাবে।" সুরমা বলিল, "দূর বোকা ছেলে, দেখতে চাইলেই বুঝি দৌড়ে যেতে হয়? ওদের দেখতে ইচ্ছা হ'লে ওরা আমাদের বাড়ী আসলেই পারে, আমি কেন যাব?" সমু এই কথায় একটু দমিয়া গেল এবং কিছু না বলিয়া স্কুলে ফিরিয়া গেল।

সুরমা পুত্রকে টিফিন খাওয়াইয়া স্কুলে পাঠাইয়া একটি সেলাই লইয়া বসিল। এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ আসিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমার অনেক লেডী ভিজিটরস্ আসছেন, একটু চায়ের যোগাড় কর শীগ্‌গীর।" সুরমা সেলাইয়ের কল চালাইতে চালাইতে বলিল, "হাঁা, আবার চা দেবো এখানকার মেয়েদের? সেদিন বাঁড়ুয্যে-গিন্নী যা শোনালেন"! সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এ তোমার কোন গিন্নীর দল নয়, আমাদের স্কুলের লেডী টিচাররা সবাই এংগ্লো-বর্ম্মণ।"

সুরমা তাড়াতাড়ি সেলাই ফেলিয়া উঠিয়া নিদ্রিত রামস্বামীকে জাগাইয়া বলিল, "এই রামস্বামী জল্‌দি চা কো পানি বানাও।" নিজে তাড়াতাড়ি খাবার টেবিলে চাদর বিছাইয়া চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করিয়া ফেলিল।

মেমসাহেবী গলার সরু সুর এবং কায়দা-দুরস্ত হাসি শুনিয়া সুরমা বাহিরের দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেই ছয় সাতজন ইউরোপীয় পোষাক পরিহিতা মহিলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়সী একজন অগ্রসর হইয়া সুরমার দিকে হাত বাড়াইয়া "Mrs Roy, I believe" বলিয়া করমর্দ্দন করিলেন। সুরমা একে একে সকলের সহিত পরিচিত হইল, Miss Wolley, Miss Irons, Miss Shepherd, Miss Raven, Mrs Bailey প্রভৃতি। প্রত্যেকের মুখে বর্ম্মী ছাপ মারা, ছোট চোখ, খাঁদা নাক, উঁচু এবং বিশাল কপাল। গায়ের রং ইংরেজের মতন ফর্সা কারও নয়, বরং কেউ কেউ রীতিমত ময়লা। সুরমা ভাবিল ইহাদের নাম যদি মা-তিন্, মা-এ... মা-ভিঙ্কি, মা-খিমা, মা-পু, প্রভৃতি হইত এবং ঘাঘরা পরিবর্ত্তে লুঙ্গী এবং এঙ্গি পরা থাকিত আর টুপীর বদলে মাথার উপর টোপরের মতন খোঁপা বাঁধা হইত তবে বে...

মানাইত।' সুরেন্দ্রনাথ উপর হইতে নামিয়া আসিয়া চায়ের টেবিলে সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সুরমা চা ঢালিয়া নিম্‌কি, রসবড়া প্রভৃতি বাঙ্গালী খাদ্য পরিবেশন করিয়া সযত্নে সকলকে খাওয়াইল। সকলেই বিশেষ কৌতুক-দৃষ্টিতে সুরমার ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং বিশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া পরদিন টিফিনের সময় তাহাদের 'কমনরুমে' চা খাইবার জন্য সুরমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সুরমা ভদ্রতা রক্ষা করিবার জন্য পরদিন সমুর স্কুলের টিচারদের কমনরুমে যথাসময়ে উপস্থিত হইল। প্রথমে শিষ্টাচারজনিত করমর্দ্দনের পর প্রত্যেকের সম্মুখে এক এক পেয়ালা কফি পরিবেশন করা হইল। সুরমা বলিল, "মিস উলি যদি আমাকে এক পেয়ালা চা দিতে পারেন তবে খুসী হ'ব, আমি কফি-পানে বিশেষ অভ্যস্ত নই।" Miss Raven তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া একটি চায়ের ষ্টল হইতে এক পেয়ালা চা আনিয়া সুরমাকে দিল। Miss Irons সকলের অপেক্ষা বয়সে ছোট, সে এতক্ষণ কেবল সুরমাকে খুব দেখিতেছিল, হঠাৎ বলিয়া বসিল, "Mrs. Roy, তুমি ত বেশী গহনা পর না? তোমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা খুব গয়না ভালবাসে, না? আমার এক সমপাঠিনী বন্ধু একজন খুব ধনী বাঙ্গালীকে বিয়ে করেছে, তাকে তার স্বামীর আত্মীয় মহিলারা কী ভীষণ ভারী ভারী গয়না দিয়েছে, সে সব এক সঙ্গে পরলে নিশ্চয় দম আটকে মারা যাবে।" সুরমা বলিল, "হাঁ বাঙ্গালী মেয়েরা গয়না ভালবাসে। সকলের পছন্দ ত সমান নয়। কেউ কেউ ভারী গয়নাও পরে বটে, কিন্তু তাতে মরবার কোনও আশঙ্কা নেই।"

Miss Shepherd বলিলেন, "তুমি কি শীল বাবুকে চেন না? তিনি খুব বড় জমিদার। তাঁর চারপাঁচখানা মোটর আছে, rice mill আছে। তিনি ত একটি এংগ্লো-বর্ম্মণ মেয়েকে বিয়ে করেছেন, আমাদের বন্ধু সে, কত হীরের গয়না আছে তার।" সুরমা চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কি জবাব দিবে ঠিক্ করিতে পারিতেছিল না। ইতিমধ্যে Miss Irons আবার বলিল, "সেদিন মিসেস শীল এত বড় একটা গার্ডেনপার্টি করলো, সেখানে ত তোমায় দেখলাম না। বাঙ্গালী মেয়েরা নাকি পুরুষের সামনে সামাজিক নিমন্ত্রণে যায় না, কিন্তু তুমি ত পর্দ্দানশীন নও, তোমাকে কেন নিমন্ত্রণ করে নি?"

সুরমা বলিল, "আমি শীলবাবুদের বাড়ী কখনও যাই নাই, বিশেষ আলাপও হয়নি।"

Miss Irons অবাক হইয়া বলিল, "তোমাদের বাঙ্গালী সমাজের এত বড় ধনীলোক, এর সঙ্গে আলাপ করনি এখনও? আমার সঙ্গে একদিন যাবে সেখানে?"

সুরমা সংক্ষেপে বলিল, "শীলবাবু যদিও বাঙ্গালী এবং ধনী, তবু শিক্ষাদীক্ষা এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারে তাহারা আমাদের দেশের অনেক নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গণ্য। লেখাপড়া না শেখার দরুণ বংশপরম্পরায় ইহারা অতিহীন আদর্শের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, সেজন্য ইহাদের সহিত শিক্ষিত সমাজের বেশী মেলামেশা নাই। তাছাড়া আমি জানি এই এংগ্লো-বর্ম্মণ মেয়েটি শীলবাবুর বিবাহিতা পত্নী নন। তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী বাঙ্গালী মেয়ে, তাঁকে আমি দেখেছি, বড় দুঃখিনী। এই সব কারণে আমি তাঁ'দের বাড়ী যাওয়া-আসা করাটা পছন্দ করি না।" সুরমার কথা খুব মনোযোগ দিয়া শুনিয়া প্রবীণা Miss Wolley বলিলেন, "কিন্তু মিসেস রায়, ক্ষমা করবেন, আপনাদের বাঙ্গালীবাবুরা ত অনেকেই নিজের বিবাহিতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বর্ম্মিনী অথবা এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে উপপত্নী রাখেন, এবং সেজন্য আপনাদের কোনো সামাজিক শাসন আছে ব'লে মনে হয় না। ধনী বলে বোধ হয় শীলবাবুর বাঙ্গালী সমাজে খুব খাতির দেখতে পাই। তিনি যখন তাঁর বাড়ীতে বড় বড় ভোজ পোয়ে (pwe) নাচ প্রভৃতির আয়োজন করেন তখন অনেক বাঙ্গালীই ত সেখানে আমোদেও আহারে যোগ দেন। তিনি যাকে উপপত্নী রেখেছেন তাকে স্বতন্ত্র বাড়ী তৈরী ক'রে খুব আরামেই ত রেখেছেন এবং প্রকাশ্যভাবে তার সঙ্গে একত্রবাস করছেন। এ'তে কি করে বুঝা যাবে যে আপনারা তাঁর আচরণকে নিন্দনীয় মনে ক'রছেন?"

সুরমা বলিল, "Miss Wolley আপনি যাহা বলিলেন তা ঠিক্ কিন্তু ব্রহ্মদেশের মফঃস্বলবাসী দুই-চারিটি বাঙ্গালীর আচরণ, চালচলন দেখিয়াই যদি আপনারা এত বড় একটা

জাতির বিচার করিয়া বসেন, তবে বড় অবিচার করা হবে। আপনাদের ফিরিঙ্গী সমাজের দু'চারটি পরিবারকে দেখে যদি আমি একটা মন্তব্য প্রকাশ করি, তবেই কি আপনারা সন্তুষ্ট হবেন?"

একটু অপ্রস্তুত বোধ করিয়া Miss Wolley ঢোক গিলিয়া আবার বলিলেন, "আমরা ম্যুরিয়েল-এর (Muriel) কাছে শুনেছি শীলবাবু এবং ম্যুরিয়েল পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করতেই চেয়েছিল, কিন্তু আপনাদের বাঙ্গালী সমাজই তাদের বিয়ে করতে দেয় নাই। আপনাদের সমাজের পাণ্ডারাই নাকি একজোট হ'য়ে শীলবাবুকে পরামর্শ দেন বিয়ে করবার দরকার কি? মেম রাখতে ইচ্ছা হয়, কি বর্ম্মিনী রাখতে চাও দশটা রাখ না কেন, সবাই রেখে থাকে বিশেষতঃ তোমার মত ধনীর পক্ষে এসব দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তা' ব'লে অজাতের, বিধর্ম্মীর একটা মেয়ে বিয়ে ক'রে বংশে কালি মাখ্‌বে কেন?' শীলবাবুর ভাইয়েরা নাকি তাঁকে সম্পত্তিচ্যুত করবার ভয়ও দেখিয়েছিলেন। এ কি রকম আদর্শ বলুন ত আপনাদের?"

পুনঃপুনঃ এইরূপ অপমান সূচক কথা বলাতে সুরমা একটু চড়াসুরে বলিল, "আচ্ছা, বাঙ্গালীরা না হয় হীন-আদর্শ জাতি, আপনাদের ম্যুরিয়েল শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে হয়েও কেন একজন ইংরাজী-অনভিজ্ঞ-অশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের উপপত্নী হ'য়ে থাকতে রাজী হোলেন?" ম্যুরিয়েলের পরম বন্ধু মিস্ আয়রনস্ বন্ধুর পক্ষাবলম্বন করিয়া মিহিসুরে বলিলেন, "শুধু ভালবাসার খাতিরে !! সে ত জান্‌ত না শীলবাবু তাকে এত ভালবেসেও শেষে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ ক'রবেন না। তা'ছাড়া এদেশে ত যারাই পরস্পরকে ভালবেসে কিছুদিন একত্রে বাস করে, তাদেরই লোকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া মনে করে।" সুরমা এই সব অপ্রিয় আলোচনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য উঠিয়া বলিল, "Miss Wolley, তোমার কিণ্ডারগার্টেন ক্লাস আর একদিন দেখতে আসব, কি বল?"

ইতিমধ্যে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া সকলকে সচেতন করিয়া দিল। সুরমা সকলকে যথোচিত অভিবাদন এবং করমর্দ্দন করিয়া আপন গৃহের দিকে চলিল। পশ্চাতে Miss Shepherd দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, "মিসেস রায়, আমাদের সকলের বড় অন্যায় হয়েছে আজকেই এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা তোলা, তোমার কাছে সেজন্য সকলের হয়ে ক্ষমা চাইছি। আমরা কিন্তু তোমাকে অপমান করবার বা তোমার মনে দুঃখ দেবার উদ্দেশ্যে এসব কথা বলিনি, তা' বিশ্বাস কোরো। বাঙ্গালী সমাজ সম্বন্ধে অনেক অস্পষ্ট ধারণা আমাদের রয়েছে, আমরা ত কখনও ইণ্ডিয়া যাইনি, তাই তোমাকে এখানকার বাসিন্দা বাঙ্গালীদের চেয়ে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের দেখে তোমাদের জাতের সম্বন্ধে কিছু জানবার কৌতূহল হ'য়েছিল। কিন্তু এ ভাবের আলোচনাটা অসতর্কভাবে এসে পড়েছিল, সেজন্য আমরা সত্যিই খুব দুঃখিত।" সুরমা হাসিয়া বলিল, "ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে জানতে চাইলে আমি যে কিছু ভাল রকম খবর দিতে পারব তা নয়, কারণ ইণ্ডিয়া কত বড় একটা দেশ, এর মধ্যে কত বিভিন্ন জাতি কত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বাস। আমি বাঙ্গালাদেশ থেকে আসছি, বাঙ্গালীর সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা দিতে চেষ্টা করবো যদি জানতে চাও।"

সুরমা বাড়ী আসিয়া স্বামীর নিকট সব কথা বলিয়া বলিল, "বাঙ্গালী হয়ে অন্যের কাছে নিজের জাতের সম্মান রক্ষা করতে চেষ্টা ত করি কিন্তু যখন দেখি বাঙ্গালীরা এই বিদেশীদের কাছে এমনি ভাবে আত্ম-পরিচয় দিচ্ছে তখন মনটা যে কত ছোট হয়ে যায়! বাঙ্গালী মেয়ে বল্‌তে ঘোমটা-টানা অন্দরের পর্দ্দানশীল মেয়েই এরা জানে, যারা কখনও খোলা বাতাসে বের হয় না, অন্য কোন জাতের ছোঁয়া জিনিষ খায় না, আর বর্ম্মা, ফিরিঙ্গী, মুসলমানদের ঘৃণা করে। তাই এরা সব চেয়ে বিস্মিত হয়, যখন দেখে যে, যে বর্ম্মিনীকে বাঙ্গালীর মেয়ের এত ঘৃণা, উঠান মাড়ালে গোবর জল দিয়ে শুদ্ধ করে, সেই বর্ম্মিনীরাই তাদের বাবুদের পরম পিয়ারীরূপে ঘর সংসার করছে, এবং কত প্রকার অখাদ্য, অশাস্ত্রীয় দ্রব্য রান্না করে অতি যত্নে বাবুদের প্রতিদিন খাওয়াচ্ছে। সেই বাবুরাই আবার বাঙ্গালী গৃহিনীর শুদ্ধ, পবিত্র অন্দর মহলের রান্নাঘরে বসে আহার করে কিছু প্রসাদ ফেলে যান এবং গৃহিনী পরলোকে পুণ্যলাভের আশায় পরম পরিতোষে স্বামীর পাতের প্রসাদ খান।"

৪

"ওগো সমুর মা, শীগ্‌গীর দরজা খোল, বড় বিপদ আমাদের!" বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী বেলা দুইটার সময় উস্কো-খুস্কো চুলে, ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত দেহে, সুরমার দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন। সুরমা দোতলার শয়ন ঘরে আপন মনে সেলাই করিতেছিল, কলের ঘড়ঘড়ানির শব্দে দরজা ধাক্কার শব্দ তাহার কানে পৌঁছায় নাই। দুয়ার-গোড়ায় রামস্বামী তাহার দড়ির খাটিয়ায় অঘোরে ঘুমাইতেছিল। বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী চীৎকার করিয়া, দরজা প্রায় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াও যখন কাহারও সাড়া পাইলেন না তখন এক গাছা বাঁশেরকঞ্চি বাগান হইতে কুড়াইয়া লইয়া কাঠের জাফরি বেড়ার ফাঁক দিয়া রামস্বামীর কানে এক খোঁচা দিতেই নিদ্রিত রামস্বামী দুইহাতে কান ঘসিতে ঘসিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কোন্ হায়?" বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী অসহিষ্ণু হইয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "আ-মর ব্যাটা, আবার কোন্ হায়? আম্মা লোক এত না চিল্লাতা, তবু উল্লুক শোন্‌তা নেই? রামস্বামী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সুরমা গোলমাল শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই রামস্বামী কোন আয়া?" বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী সপ্তমে গলা চড়াইয়া বলিলেন "ওগো গিন্নী, নীচে নামো একবার, আমার বড় সর্ব্বনাশ হয়েছে, তুমি কাছে আছ, হাজার হলেও বাঙ্গালীর পেটে জন্ম ত তোমার; প্রাণে ধরে পেটের বাচ্চাগুলোকে বর্ম্মিনী মাগীদের হাতে দিতে পারব না, তুমি যদি দয়া করে আমার বাছাদের মুখে একটু জল দাও, আর আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত তোমার ঘরে রাখ, তবে বড় উপকার হয়।"

সুরমা নীচে আসিয়া দেখিল তিন চারিটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী তাহার খাবার ঘরের চৌকাঠে বসিয়া চীৎকার করিতেছেন। সুরমা নিজের মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "একটু আস্তে: চারদিকে সাহেবদের বাড়ী, এত চেঁচামেচি শুনলে ভাববে কি ওরা? ব্যাপার কি বলুন ত?"

"ব্যাপার তোমার মাথা, আমরা অত মেমেলি সুরে কথা কইতে পারিনে। কাল সন্ধ্যে থেকে জলস্পর্শ করিনি, ছেলেপিলেগুলোর পেটে এত বেলা পর্য্যন্ত একটা দানা পড়েনি। কর্ত্তা কোন্ মজলিসে পোয়ে নাচ দেখতে গিয়ে মদে চুর হয়ে কোন্ নর্দ্দমায় পড়েছিলেন। রাত ১টার সময় পুলিশেরা একখানা গাড়ী করে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেছে, ভাগ্যিস্ মুখখানা তাদের চেনা ছিল, ম্যাজিষ্ট্রেরের আফিসের বড় কেরাণী ত, সবাই চেনে। সারারাত কখনও অজ্ঞান বেহুঁস, কখনও হোঃ হোঃ করে অট্টহাস্যে ঘর ফাটিয়ে দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে ডার্লিং, না ফার্লিং সব বক্‌ছে। বোধ হয় কোনো ফিরিঙ্গী মাগীর সঙ্গে নেচেছে। চেহারাখানাও সুন্দর আর একেবারে বিলিতি-কেতা দুরস্ত চালচলন কিনা তাই মেম-মহলে খুব নাম তার। আমি ত তার কাণ্ড দেখে হাসব না কাঁদব, ভেবে পাইনে। চীৎকার হাঙ্গামে ছেলে মেয়েগুলো জেগে গিয়ে কান্নাকাটি করে, বলে "বাবার কি হলো?" একবার তাদের থামাই, আবার মাতালকে সামলাই। ভোর রাতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙ্গতেই আমাকে পায়ের কাছে দেখে এক লাথি মারলে আমার কোমরে, গড়িয়ে পড়ে গেলুম। সে টলতে টলতে কোথায় বেরিয়ে গেল। বেলা ১১টা অবধি বিছানায় পড়ে কোঁকাচ্ছি, ওঠবারও ক্ষমতা ছিল না......"

"আম্মা সেন্ সাহেবকো ঘরমে আভি যানে হোগা, সব আম্মালোক ওঘরমে গিয়া, সেন-সাহেবকো আউরৎ কো কেয়া হুয়া মালুম নেই, হাম মটর লে কে আয়া।" বাঁড়ুয্যে-গৃহিণীর অফুরন্ত দুঃখের কাহিনী বর্ণনায় বাধা দিয়া লাল পাগড়ী-পরা এক দরওয়ান এই সংবাদ দিল। বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "পোড়া কপাল, এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। এই হ'ল বাঙ্গালী মেয়ের অদৃষ্ট। উঁহাকে সেদিন তোমার ঘরে নিয়ে এসে-ছিলুম না? তারই কি হ'ল আবার কে জানে? ওর স্বামীটাও বেজায় মাতাল, বদরাগী। হয়ত মেরেই ফেলেছে, আহা, মেয়েটা আবার পোয়াতি!" সুরমা বলিল, "আপনি কাল থেকে উপোস করছেন, এখন আবার সেখানে গেলে আজ ত আর নাওয়া খাওয়া হবে না!" বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী সজোরে বুক চাপড়াইয়া বলিলেন, "এ বুকের জোর কি কম ভাবছ? বেঁকবে তবু ভাঙ্গবে না। খাওয়া চুলোয় যাক্, ভেবেছিলাম মেয়েগুলোকে তোমার কাছে রেখে একবার সে মিনসের খবর নিতে যাব ঐ বর্ম্মিনী মাগীর বাড়ী। সে অনেক

দূর ! কতক্ষণে ফিরতুম কে জানে ? সেখানে সে আছে, না কোন্ নর্দ্দমায় পড়ে আছে, খোঁজ নিতে ত হবে ? তা আর এখন হ'ল না, সেন-সাহেবের বাড়ীই আগে গিয়ে দেখি সে মেয়েটার কি দুর্গতি হ'ল, বেচারী বড় ছেলেমানুষ !" মাকে মোটরে চড়িতে দেখিয়া ছেলেপিলের দল সব চেঁচাইতে লাগিল, "ওমা, আমরাও মোটরে চড়ব, আমাদের নিয়ে যাও।"

সুরমা তাহাদের আদর করিয়া বলিল, "ছিঃ মায়ের সঙ্গে যেতে হয় না, এখানে স্নান খাওয়া কর, মা পরে এসে তোমাদের নিয়ে যাবেন।" ছেলেমেয়েরা সুরমার হাত ছাড়াইয়া দরজার বাহিরে ছুটিয়া গিয়া কান্না ধরিল। বাঁড়ুয্যে-গৃহিনী মোটরের দরজা খুলিয়া বলিলেন, "আয় পোড়ারমুখোর দল, সেখানে যেন আমি নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি ! পেটে ক্ষিদেও নেই তোদের, সেখানে কিন্তু খেতে-টেতে পাবে না কিছু।" সুরমা মোটরের সম্মুখে গিয়া বলিল, "ওদের সেখানে না নিলেই তো ভাল ছিল, ছেলে মানুষরা ওসব না শোনাই ত উচিত।" ছেলেরা কিছু বলবার আগে তা'দের মা উত্তর করিলেন, "পোড়াকপালীদের সুখ সইবে কেন ? চলুক, আমার সঙ্গেই।" মোটর চলিয়া গেলে সুরমা নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইল। বাঁড়ুয্যে-গৃহিণীর সাতকাণ্ড রামায়ণের গল্প না শুনিয়া সে যদি ছেলেমেয়েগুলিকে কিছু খাওয়াইয়া দিত তবেই তাহার কর্ত্তব্য করা হইত। কিন্তু এমন সব দুঃখের জীবনের মর্ম্মান্তিক ইতিহাস শুনিতে শুনিতে মন আপনা হইতেই কেমন উন্মনা হইয়া যায়।

*

* *

"বল হরি, হরি বোল"—একি ! বর্ম্মাদেশে এ ডাক্ ত একেবারেই অপরিচিত ! "নিশ্চয় কোন বাঙ্গালী মরেছে," বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ জানালায় দাঁড়াইলেন। প্রকাণ্ড দুইটি বাঁশের তলায় ঘাড় পাতিয়া দিয়া জনআষ্টেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক খালি পায়ে, গামছা কাঁধে একটি স্ত্রীলোকের শবদেহ বহিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। বাঁশের কঞ্চিদ্বারা বোনা চাটাই দিয়া মোড়া মৃতদেহখানি কয়েকটুকরা কাঠ জোড়া-দেওয়া একখানি তক্তার উপর শোয়াইয়া বড় দুইটি বাঁশের সঙ্গে উত্তমরূপে দড়ি দিয়া বাঁধা হইয়াছে। কেবল মাথার চুলগুলি ও সিঁথির চওড়া সিঁদুর দেখিয়া বোঝা যায় যে দেহখানি সধবা স্ত্রীলোকের। সুরেন্দ্রনাথ পত্নীকে ডাকিলেন, সুরমা দেখিয়া বলিল, "ওহো, সেই উষা মেয়েটি নয়ত ?" সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে আবার কে ? এ বোধ হয় মিঃ সেনের পরিবারের কেউ। ঐ ত মিঃ সেন খালি পায়ে সব আগে আগে যাচ্ছেন আর রুমাল দিয়ে চোখ মুছ্ছেন।" সুরমা বলিল, "এই ত দুটোর পরে সেন-সাহেবের স্ত্রীর কি হয়েছে বলে বাঁড়ুয্যে-গিন্নীকে মোটর পাঠিয়ে নিয়ে গেল। নিশ্চয়, তাহ'লে উষাই মারা গেছে। আহা, কি সুন্দর মেয়েটি, ষোল-সতেরো বছর বয়স হবে, কি কপাল বেচারীর ! যাক্ বেঁচেছে ঐ পাষণ্ড স্বামীর হাত থেকে।" সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখ আমিও যাই ওদের সঙ্গে, বাঙ্গালীর বিপদে বাঙ্গালীর দাঁড়ান উচিত।" সুরমা বলিল, "সত্যিই ত, যাও তুমি, ফিরতে হয়ত রাত হবে ঢের, বেশী রাত হ'লে আমার বড় ভয় করবে। যে মেঘ সেজেছে, বৃষ্টি নামল বলে। শ্মশান কতদূর ?" সুরেন্দ্রনাথ নামিতে নামিতে বলিলেন, "উঃ সে অনেক দূর, ঐ পাহাড়ের ওপারে ! সেখানে না আছে নদী, না আছে পুকুর ! কুয়োর জল তুলে আগুন নেবাতে হয়। এদেশে মরলেও বড় কষ্ট, বাঙ্গালীকে পোড়াবারও সুবিধামত ব্যবস্থা নেই।"

সুরমা একলাটি সন্ধ্যার অন্ধকারে জানালায় দাঁড়াইয়া কত কথাই ভাবিতেছে ! কলিকাতায় জন্ম তার, কলিকাতায়ই লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছে, নিজেদের বন্ধুবান্ধব, নিজেদের কলেজের গণ্ডীর বাইরের কোন বাঙ্গালী মেয়ের জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। এসম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই তার ছিল না। কোনো দিন সে ভাবে নাই ভূগোলে-পড়া সুদূর ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীর তীরে আসিয়া তাকে বাসা বাঁধিতে হইবে আর এমন সব অপূর্ব্ব বাঙ্গালী পরিবারের সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচয় হইবে ! বাঙ্গালী মেয়ের কি জ্বালাময় জীবন ! তবু এমনি আশ্চর্য্য যে, যে স্বামীর হাতে

তার এত লাঞ্ছনা, সেই দুশ্চরিত্র মাতাল স্বামীর জন্য কত টান! স্বামী মাতাল হইয়া লাথি মারিয়া স্ত্রীকে ফেলিয়া রাখিয়া বর্ম্মিনী উপপত্নীর বাড়ী গেল কি রাস্তায় পড়িয়া রহিল, তার খোঁজ করিবার জন্য ছেলে মেয়েকে পর্য্যন্ত অনাহারে রাখিয়া নিজের ভগ্ন দেহ মন লইয়াও বাড়ীর বাহিরে আসিয়াছে। একি প্রাণের টানে? না, নিরাশ্রয় বোধে? স্বামীকে ছাড়িয়া যাইবার তার পথ কোথায়? এতগুলি সন্তানের জননী না হইলে হয়ত সে আত্মহত্যা করিয়াই নিষ্কৃতিলাভ করিত।

সাত পাঁচ কথা ভাবিতে ভাবিতে সুরমা ক্লান্ত মনে ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমি আর শেষ পর্য্যন্ত গেলাম না আমাকে তাঁরা মৃতদেহ ছুঁতে দিলেন না, মিছিমিছি আর বৃষ্টিতে ভিজে সারাপথ যাই কেন? তোমাকেও একা ফেলে বেশী রাত করলে ভয় পাবে, এই ভেবে চলেই এলাম। হ্যাঁ, মেয়েটি সেন-সাহেবের স্ত্রীই বটে। একটি ভদ্রলোক গোপনে ব্যাপারটি আমায় বল্লেন। সেন-সাহেবের তিন-চারটি পরিবার, বিবাদ অশান্তি প্রায়ই হ'ত। এই বাঙ্গালী মেয়েটি বড় নিরীহ ছিলেন, শুনলাম। সেন-সাহেব মদ খেয়ে এসে এক একদিন সে বেচারীকে খুব মারতেন। অন্য উপপত্নী দু'টি উহার নামে নাকি অনেক মিথ্যা দুর্নাম করত। আজ সেন-সাহেব লাল-পানিতে একটু বেশী রসিক হয়ে এসে "বুটের লাথি দিয়ে স্ত্রীকে অভ্যর্থনা করেন। স্ত্রী অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল, কেউ খবরও নেয়নি। দুপুরে তাকে রান্না খাওয়া করতে না দেখে বর্ম্মিনীটি তাকে দেখতে আসে। দরজা ভেজান ছিল, ঘরে ঢুকে দেখে গলায় একখানি কাপড়-পাকান দড়ির ফাঁসপরা, ঘরের সিলিংয়ের একটি হুক হ'তে উহার দেহখানি ঝুলে রয়েছে। সমস্ত অঙ্গ বিবর্ণ এবং হিম। সে চীৎকার করিয়া সেন-সাহেবকে ডাকিয়া আনে। সেন-সাহেব চালাক লোক, চাকর বাকর দেখ্‌বার আগেই মৃতদেহখানি চাদর চাপা দিয়া খাটে শোয়াইয়া দেন এবং সকলের কাছে প্রকাশ করেন যে তাহার হার্টের ব্যারাম ছিল, আজ সকালেও সে ভাল ছিল হঠাৎ হার্ট ফেল করেছে। বর্ম্মিনী গোপনে অনেকের কাছে আসল কথা বলে ফেলেছে। তবে পুলিশের ভয়ে কেউ আর তা প্রকাশ করতে সাহস করেনি। সেন-সাহেবের ভয় নেই, টাকা থাক্‌লে লোকের মুখ বন্ধ করতে কতক্ষণ?"

সুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আহা তার ছোট্ট দেড় বছরের মেয়েটির কি হ'ল কে জানে? পেটেও ত একটি ছিল! তবু সে বেচেছে! হায়! বাঙ্গালী মেয়ের অদৃষ্ট!!"

শান্তিময়ী দত্ত

'আর্য্যকন্যা মহাবিদ্যালয়।"

শ্রীসুধেন্দু মুখোপাধ্যায়

সে বেশী দিনের কথা নয়। বিগত আট বৎসর পূর্ব্বে ইং ১৯২৫ সালে আর্য্য সমাজভুক্ত বরোদাবাসী কয়েকটি

ছোরার কৌশল

শিক্ষিত যুবক, সনাতন ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের ছেলে মেয়েদের মধ্যে নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক ব্যায়াম প্রচার কল্পে, আর্য্যকুমার মহাসভা নামে একটি সঙ্ঘ তৈরী করেন। এই আর্য্যকুমার সঙ্ঘ, কোলাহলময় বরদা সহর হইতে দূর নির্জ্জন পল্লীর সুশীতল, শ্যামল স্নিগ্ধছায়ায় ঘেরা, ইতোলা গ্রামে মাত্র বারটি বালিকা লইয়া আর্য্যকন্যা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন।

নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য কর্ম্মীদের প্রথমে নানা অসুবিধা ও বহুবাধা বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মহাবিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সুবন্দোবস্ত এবং বালিকাদের মানসিক ও শারিরীক শক্তির দ্রুত উন্নতির কথা অল্পদিনে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে। তৎপরে জনসাধারণের অনুরোধে, বরোদা সহরের উপকণ্ঠে সুবিস্তীর্ণ উন্মুক্ত স্থান কারেলীবাগে, মহাবিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করা হয়। তদবধি আর্য্যকন্যা মহাবিদ্যালয়টী নানাভাবে প্রসার

লাঠি খেলা

লাভ করিয়া বরোদা দেশের সহৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তি সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতেছে।

সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যের উপর মেয়েদের শিক্ষার ভি

প্রতিষ্ঠিত করাই বিদ্যালয়ের পরিচালকগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে কারণ ভারতের পুরাতন আশ্রমের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা, আর্য্যকন্যা মহাবিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাকে সছাত্রীবাস আশ্রম-বিদ্যালয় বলিতে পারা যায়। শিক্ষালাভ করিবার জন্য সমস্ত বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসেই অবস্থান করিতে হয়। মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিতে মোট ১৩ বৎসর সময় লাগে। প্রথম দশ বৎসর নিম্নস্তরের শিক্ষা (স্কুলের মত) এবং তিন বৎসর উচ্চস্তরের শিক্ষা (কলেজের মত) দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

আর্য্যকন্যা বিদ্যালয়ের ছাত্রী-মণ্ডলী

সাধারণতঃ ৬।৭ বৎসর বয়স্ক বালিকারা এখানে ভর্ত্তি হইয়া থাকে। ভর্ত্তি হইবার সময় অভিভাবকদের নিকট এই সর্ত্ত লিখিয়া নেওয়া হয় যে ১৬ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে নিম্নস্তরের শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বালিকা আশ্রম ত্যাগ করিতে পারিবে না।

প্রথম ভর্ত্তি সময় এককালীন ৩০৲ টাকা দিতে হয়। এবং মাসিক খরচ বাবদ ১৪৲ টাকা করিয়া বালিকাদিগকে দিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রীর বাসস্থান, আহার, পোষাক পরিচ্ছদ, পুস্তকাদি ক্রয়, ঔষধ ও ভ্রমণ ব্যয় প্রভৃতি খরচ ঐ টাকা হইতে সঙ্কুলন হয়।

বর্ত্তমানে মোট ১৮০জন কুমারী মহা-বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে। ৫টি নিঃস্ব, দরিদ্র বালিকার সমস্ত ব্যয়ভার আশ্রম বহন করেন। ১৩টি ছাত্রীর ব্যয়ের অর্দ্ধেক টাকা পরিচালকগণ দিয়া থাকেন। ইহাছাড়া আর কয়েকটি বালিকা আশ্রম হইতে নানাপ্রকারে সাহায্য পাইয়া থাকে।

মহাবিদ্যালয়ে ১৪ জন শিক্ষক এবং ১১ জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। ছাত্রীদের বাসভবনের তত্ত্বাবধানের কার্য্য সম্পূর্ণ শিক্ষয়িত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত

মুগুর লইয়া ব্যায়াম

হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী ভারতের প্রাচীন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হইলেও শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বর্ত্তমান যুগোপযোগী

বিষয় সমূহও শিক্ষা দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মেয়েদের ব্যায়াম শিক্ষা এখানে বাধ্যতামূলক। ছাত্রীদের
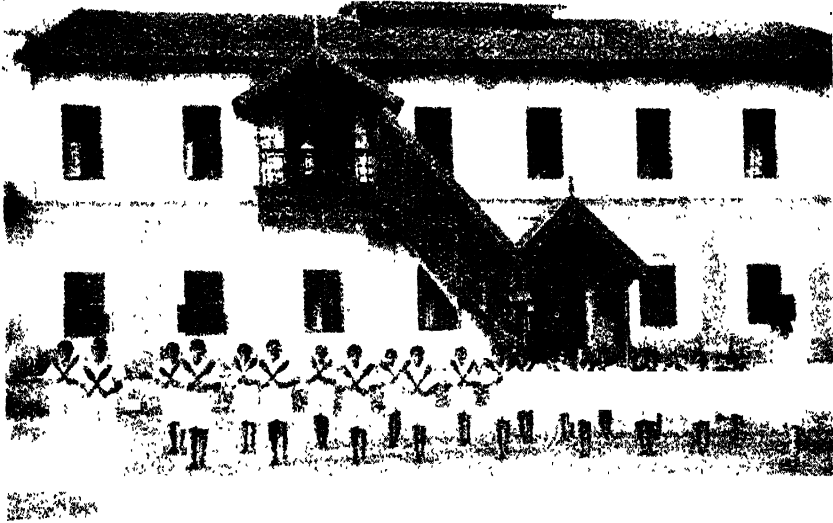
মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীবাস ছাত্রীরা মুগুর ভাঁজা শিখিতেছে

আশ্রমের প্রাঙ্গণে ছাত্রীরা লাঠি খেলা ও 'গরবা' নৃত্য শিক্ষা করিতেছে

দুই প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথম শক্তি উৎকর্ষের জন্য মেয়েরা সাধারণতঃ দেশীয় প্রণালীতে নানাপ্রকার ব্যায়ামচর্চ্চা করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত আত্মরক্ষার জন্য বালিকাদের লাঠি খেলা ও ছোরা খেলা, বর্শাচালনা এবং তলোয়ার খেলা অভ্যাস করিতে হয়।

গুজরাটী, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষা প্রত্যেক ছাত্রীকে নিয়মিত ভাবে শিখিতে হয়। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা ছুঁচের কাজ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা

দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। উচ্চস্তরের (কলেজের) মেয়েদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্মপুস্তক, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াইবার এবং শিল্পকলা ও গৃহস্থালীর কাজ শিখাইবার সুবন্দোবস্ত আছে। দেশগুরু মহাত্মাজীর প্রচারিত বাণী, আদর্শরূপে এখানে প্রতিপালিত হয়। প্রত্যহ কিছু সময় মেয়েদের চরকায় সূতাকাটা, তুলাধুনা ও তাঁতে বয়ন কাজ শিক্ষা করিতে হয়। বালিকারা নিয়মিতভাবে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, বেদস্তোত্র পাঠ, সন্ধ্যাবন্দনা, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত সমাজ-সেবা শিক্ষার জন্য ছাত্রীদের মধ্যে সেবিকা সঙ্ঘ আছে।

প্রাত্যহিক পাঠ শিক্ষার কোন কঠোর নিয়মের ব্যবস্থা এখানে নাই। ধর্ম্মপরায়ণা স্নেহবতী শিক্ষয়িত্রীগণের সঙ্গে থাকিয়া এবং জ্ঞানী, সুদক্ষ শিক্ষকগণের আদর্শ শিক্ষায় বালিকারা আনন্দে নিজেদের জীবন নূতন ধারায় গঠন করিতেছে। আর্য্যকন্যা মহাবিদ্যালয়ে সুশিক্ষার ফলস্বরূপ ছাত্রীরা লাভ করেন—আত্মবিশ্বাস, নিজের ধর্ম্মের উপর

আশ্রমের সম্মুখে ছাত্রীরা লাঠিখেলার নানা কৌশল দেখাইতেছে

আর্য্যবিদ্যালয়ে সঙ্গীতশিক্ষার ক্লাস

প্রগাঢ় আস্থা, স্বজাতি ও স্বদেশ-জাত জিনিষের প্রতি প্রাণ ঢালা ভালবাসা।

বিদ্যালয়ের খ্যাতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ক্রমশঃ প্রচার হইতেছে। সুদূর আফ্রিকাদেশ হইতে আগত অনেক ভারতীয় কন্যা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। দেশের কয়েকজন লক্ষপতির মেয়েরাও নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আশ্রমের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনে থাকিয়া সংযম শিক্ষায় জীবন গঠিত করিতেছে। বিদ্যালয়ের পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে!

মহাবিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয় ও কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী ২৬টি ছাত্রী লইয়া গত ৺দুর্গাপূজার ছুটিতে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। প্রায় দীর্ঘ একমাস কাল কলিকাতার বিভিন্নস্থানে বালিকারা তাঁহাদের শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চার নানারূপ কলা কৌশল প্রদর্শন করেন। ছাত্রীদের ছোরা খেলা, অসি খেলা, মুগুর ভাজা, লাঠি খেলা, আসন ক্রীড়া ও লেজিম যন্ত্রবাদ্য সাহায্যে 'গরবা' নৃত্য প্রভৃতি ক্রীড়ানুষ্ঠান দেখিয়া অনেকেই আনন্দলাভ করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ে ব্যায়ামচর্চ্চার, সুন্দর ব্যবস্থা থাকায় প্রত্যেক বালিকার দেহশ্রী যেরূপ কমনীয় ও বলিষ্ঠ হইয়াছে এবং তাহাদের সাহস, আত্ম নির্ভরতা, নিঃসঙ্কোচক স্বাধীনভাব ও ব্যায়ামে পটুত্ব, বাঙলার ছাত্রীদের নিকট অনুকরণের বিষয়।

আর্য্যকন্যা মহাবিদ্যালয়ে মেয়েরা যেভাবে দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষালাভ করিতেছে সেরূপ শিক্ষাপ্রণালী বাঙলা দেশের পল্লীবালাদের মধ্যে দ্রুত প্রচলিত হওয়া নিতান্ত দরকার। ঐরূপ শিক্ষায় দেশের, সমাজের এবং সর্ব্বোপরি অবলা মাতৃজাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন হইতে পারে।

সুধেন্দু মুখোপাধ্যায়

"আবাহন"

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়

আজি মোর জীবন-আঙণে
আসিয়াছে পাগল যৌবন,
ক্ষুব্ধ কালবৈশাখীর মত
উড়াইছে দিকে দিকে
ঝরাপাতা যত,
চারিদিক তোলপাড় করি'
অট্টহাসে ভরিছে গগন—
আজি মোর জীবন-আঙণে
আসিয়াছে পাগল যৌবন।
আজি মোর জীবন-আঙণে
আসিয়াছে মাতাল যৌবন,
রসে ঢুলু ঢুলু আঁখি
নিরুদ্দেশ দিগন্তের পানে
চাহে থাকি থাকি,
আবেশের অবশ আলসে
টলমল করিছে চরণ—
আজি মোর জীবন-আঙণে
আসিয়াছে মাতাল যৌবন।

আজি মোর জীবন-আঙণে
আসিয়াছে প্রেমিক যৌবন,
আজি কল্পলোক হ'তে
মানসীর অভিসার
মোর যাত্রাপথে,
ওষ্ঠপুট ম্লান—তৃষাতুর
দেহ মাগে অনন্ত মিলন—
আজি মোর জীবন-আঙণে
আসিয়াছে প্রেমিক যৌবন।
আজি মোর জীবন-আঙণে
আসিয়াছে ভাবুক যৌবন
রুক্ষকেশ বায়ু'ভরে
উড়িতেছে আলুথালু
ভাবনার ঘোরে,
সুন্দরের নেশা লেগে
প্রসারিত আকুল নয়ন
ভাব লয়ে, প্রেম লয়ে, পাগলের মত
আসিয়াছে মাতাল যৌবন!

নদী

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ভোরবেলা ট্রেণ বদল করিয়া সাকৃরেগলি ঘাটে ফেরি নিলাম। তখন শীত প্রায় পড়িয়া গেছে, কুয়াসার অন্তরালে প্রত্যুষটি প্রচ্ছন্ন, দিঙ্মণ্ডল আড়ষ্ট ও নিদ্রানির্জীব। দূরে-দূরে এখানে-সেখানে বিচ্ছিন্ন স্তূপাকারে পাহাড়ের একটি অনতি-স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। উন্নতানত রেখার কোমল ও ক্রমলীনায়মান নসীময়তা একটি পলাতক, উড্ডীন পাখীর বিদায়ের সঙ্কেতের মতো ভারি বিষণ্ণ মনে হইল। এই ঘাটে লোকজন বেশি নামা-উঠা করে না, তাই ঘাটটি ভারি নিরীহ ও নির্জ্জন, বাণিজ্যের ভরণ-পোষণ হইতে ভারমুক্ত বলিয়া ভারি পরিচ্ছন্ন। গঙ্গা এখানে আসিয়া অনেকটা গা মেলিয়া দিয়াছে, এখানে সে প্রায় নিরভিভাবিকা বালিকার মতোই প্রগল্ভ। এমন একাকিনী গঙ্গা কখনো দেখি নাই। জনবসতিবিরল বালুকাস্তীর্ণ দুই তীরের শ্যামল সীমাশূন্যতার মাঝে তার এই পরিত্যক্ত, প্রচ্ছন্ন রূপটি চোখে বড়ো করুণ লাগিল।

জলস্রোতের যে একটি অন্তর্লীন, নিগূঢ় ভাষা আছে তাহা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনার বলিয়া মনে হয়। চাকায় রাশি-রাশি ঢেউ ভাঙিয়া ষ্টিমার যখন যাত্রা করে তখন সেই চূর্ণ-চূর্ণ উর্ম্মিমালার বিহ্বল কাতরোক্তি আমি স্পষ্ট শুনিতে পাই, ভঙ্গুর বাহুবন্ধনের মতো জলের সেই অসহায় পরাভব আমাকে চঞ্চল, শোকাকুল করিয়া তোলে। সমুখের জল নীলাভ, শান্ত, প্রতীক্ষমান চক্ষুর মতো নিষ্পলক; কিন্তু পিছনের জল প্রত্যাখ্যানের বেদনায় ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে। এখন যাহা সমুখে, তাহা আবার কখন পিছনে পড়িবে, এখন যাহা অতি সন্নিকট, অতি ঘনিষ্ঠ, অতি প্রত্যক্ষ তাহা কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বিচ্ছিন্ন, দূরস্খলিত, স্তিমিত হইয়া যাইবে —এই সহজ সত্যটি স্বচ্ছ জললাবণ্যে স্পষ্ট উদ্ভাসিত হইতেছে। নদীর সমগ্র রূপটিই এই বেদনার রূপ। ষ্টিমারেই যেন তাহা আরো উজ্জ্বল আরো ব্যক্ত হইয়া উঠে। নোঙর তুলিয়া ঘাটের আশ্রয় ছাড়িয়া গভীরতরের উদ্দেশে যখন সে অগ্রসর হয় তখনই জলের অস্ফুটকণ্ঠে প্রথম বেদনার উচ্চারণ শুনি, ষ্টিমারের দুরন্তরতার সঙ্গে-সঙ্গে জলও প্রবলতর বেদনায় উচ্ছল হইতে থাকে। আশ্রয় বিচ্যুতির মাঝেই প্রচ্ছন্ন একটি বিষাদের সুর আছে—যে-তীর ছাড়িয়া আসিলাম তাহা পুত্রের বিদেশগমনের মুহূর্ত্তে দ্বারাক্তবর্ত্তিনী মাতার স্নেহশান্ত দৃষ্টিটির মতো স্থির, উদাসীন—যতই কেন না অগ্রসর হই তীরের সেই অবাঙ্ময় উদাস দৃষ্টিটি জলের সঙ্গে সমস্তক্ষণ পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, মন হইতে কিছুতেই তাহা মুছিয়া ফেলা যায় না। ট্রেণ ছাড়িবার সময় একটা বিশালব্যাপ্ত আনন্দময় মুক্তির আভাস পাই, সমস্ত দেহ-মনে ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ, ও অবারিত একটা চাঞ্চল্য বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, কিন্তু ষ্টিমার যখন ছাড়ে তখন যেন আমরা অলক্ষ্যে মৃত্যুর সম্মুখীন হই, কোথায় যে গিয়া ঠিক পৌঁছাইব কাঁটা-কম্পাসে তাহার যেন কোনো নির্ভুল হিসাব থাকে না, যাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত্ত মন্থর, ম্লান, মুহ্যমান হইয়া আসে। ট্রেণে যে-দৃশ্য আমরা ছাড়িয়া আসি তাহা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়া ত্যাগ করিয়া আসি, কিন্তু ষ্টিমারে কিছুই আমরা হারাই না, কিছুই আমরা ফেলিতে পারি না,—সমস্ত অপসৃত অতীত ম্রিয়মাণ জলের উপর বিষণ্ণ চোখে চাহিয়া থাকে। এই জন্য ষ্টিমারের উপর হইতে নদীর এই সমগ্র, উন্মীলিত চাহনিটি আমার চোখে ভারি করুণ লাগিল। তাই ঘাটের আশ্রয় ছাড়িয়া ষ্টিমারের প্রথম যাত্রার মুহূর্ত্তটি জগৎ ব্যাপারে আমার কাছে বেদনার একটা বড়ো উদাহরণ বলিয়া মনে হয়।

ষ্টিমারের যন্ত্রেও যেন এই জলের বেদনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। নীল-কুর্ত্তা-পরা এক খালাসী জলে কাছি ডুবাইয়া ঢেউ মাপিতেছে, আর সুর করিয়া জলের মাপতা

পড়িতেছে, ঐ দিক হইতে আরেক কণ্ঠে তাহার সমস্বরিক প্রতিধ্বনি উঠিতেছে—ভোরবেলাকার কুয়াসার সঙ্গে সেই তন্দ্রাস্তিমিত ঝাপ্‌সা কণ্ঠস্বর যেন জলকল্লোলের মতোই বেদনার্ত্ত মনে হইল। ষ্টিমারের গায়ে যে থাকিয়া-থাকিয়া ঢেউয়ের ঝাপটা লাগিতেছে তাহা ছেলেকে ঘুম পাড়াইবার সময় তাহার গালের উপর মায়ের ছোট-ছোট মৃদুল চাপড়ের মতোই বিষণ্ণ। বিষণ্ণ ঐ রঙিন পাল তুলিয়া ক্ষীণকায় নৌকাটির মন্থর অপস্রিয়মানতা। কোথায় যে সে যাইতেছে কেহ বলিতে পারিবে না—তাহার এই পথহীন যাত্রার অনির্দ্দেশ্যতাই নদীর বেদনার ছবিতে একটি রেখা আনিয়া দিল। আমাদের ষ্টিমারই বা যে ঠিক কোথায় চলিয়াছে সমুচ্ছ্বসিত জলের মধ্যে আসিয়া তাহা যেন আর নির্ণয় করিতে পারি না,—কোথায় যেন চলিয়াছি,—এই অনির্দ্দিষ্ট ও নিঃসঙ্কেত রহস্য সহসা সমস্ত নদীকে করুণ ও অবাস্তব করিয়া তোলে। চলিয়াছি তো আর ফিরিয়া আসিব কি না এমনি একটা ব্যাকুল জিজ্ঞাসা তাহার সুদূরায়ত দৃষ্টিতে নিরন্তর উৎসুক হইয়া আছে। শুধু নদীতে নয়, ষ্টিমারেও যেন এই ভীতিবিহ্বল বেদনার পরিচয় পাইতেছি। খালাসীদের ব্যস্ত, সতর্ক চলা-ফেরা, যাত্রীদের অশ্রুতিগম্য অর্দ্ধস্ফুট কথাবার্ত্তা, বিরাট যন্ত্রের সেই একঘেয়ে চাপা, গম্ভীর সশব্দতা ষ্টিমারের মধ্যেও একটি বিষাদের ঊর্ণনাভ রচনা করিয়াছে। সমতল জায়গায় ট্রেণে চাপিয়া স্থলের একঘেয়েমি দেখিতে দেখিতে কঠিন ক্লান্তি আসে বটে, কিন্তু প্রতি পলকে অভাবনীয়ের জন্য একটি তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষাও সেখানে জাগিয়া থাকে; নদীর বেলায় জলের সেই বিস্তৃত একঘেয়েমির আর একবিন্দু অবকাশ থাকে না, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নিরাপদে তাহার পৌঁছানো ছাড়া সেখানে আর কিছুরই প্রতীক্ষা করিবার নাই। মাটির একঘেয়েমি হইতে জলের একঘেয়েমি অনেক বিষণ্ণ; সে-জল ঝড়ে বা জোয়ারে উদ্বেজিত হইয়া উঠিলেও তাহার সেই শীতল প্রশান্ত বিষণ্ণতাটি রূপের অন্তরালে বিশীর্ণ কঙ্কালের মতো চিরকাল ঘুমাইয়া আছে।

চলিয়াছি তো গঙ্গার ঐ পারে, মণিহারি-ঘাটে,—সাক্‌রেগলি হইতে তাহা কয় ঘণ্টারই বা পথ। কিন্তু ঘুমন্ত জলে দোলা দিয়া ষ্টিমার যখন প্রথম রওনা হইল, সমস্ত দেহে যেন পৃথিবীর সেই আদিম, দুঃসাহসী নাবিকের নবীন পুলকাঞ্চ অনুভব করিলাম। প্রত্যহ দুই ঘাটের যাত্রী পারাপার করিয়া নদীর প্রত্যেকটি জলকণা হয়তো এই ষ্টিমারের মুখস্থ হইয়া আছে, তবু সেই যে কলম্বাস তাহার Santa Maria-য় প্রথম আট্‌লাণ্টিকে ভাসিয়া পড়িয়াছিল ঠিক তাহারই সেই অনির্দ্দেশ ও অলক্ষ্যাভিমুখী যাত্রার শিহরণ আমার সমস্ত স্নায়ু-শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল। ঘাট হইতে যখনই প্রথম ষ্টিমার ছাড়ে তখনই যেন সে নূতন করিয়া এই নির্দ্দেশহীনতার সন্ধান পায়। জলের উপর আসিয়া আমারও তাহাই মনে হইতে লাগিল, জলের কোথাও যেন বন্ধন নাই, পরিচয় নাই, আশ্রয় নাই—কোথা হইতে কোথায় যেন ভাসিয়া চলিয়াছি! হয়তো কোথায় যাইতে কোথায় আসিয়া উঠিব, জল যেন আমাদের ডাকিয়া-ডাকিয়া কোথায় টানিয়া নিবে। এই অনির্ব্বচনীয় ভয়-ভাব চিহ্নহীন জলের উপর অনির্দ্দেশ্যতার একটি রমণীয় রহস্য বিস্তার করিয়া দিয়াছে। যেখানে যতো বেশি ভয় বা স্নেহ, সেইখানেই ততো বেশি রহস্য। জানি, সারেঙের হাল মণিহারির দিকেই হেলিয়া আছে, তবু, বুদ্ধিতে নিশ্চিন্ত হইলেও হৃদয়ে একটি পথভ্রান্তির ভয় যেন সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে, মনে হয়, হয়তো সেই নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়া আর পৌঁছিতে পারিব না। মনে হয় যেন কোনো বিধিবদ্ধ পথে নির্দ্দিষ্ট নীড়ের অভিমুখে যাইতেছি না, যাইতেছি জলযাত্রার অদম্য আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া, যাহা কিছু অনির্দ্দিষ্ট যাহা কিছু অমীমাংসিত, যাহা কিছু নিষেধ-নিবারিত তাহারই আবিষ্কারে অভিযান করিয়াছি, হয়তো কোনো কালে স্থির ও শুকনো মাটি দেখিতে পাইব না, হয়তো 'সাইরেন্'-এর গানে মৃত্যুর পরমতম আহ্বান শুনিব। জল ছাড়া আমাদের জীবনের এই অলৌকিক তত্ত্বকথাটি আর কোথাও শুনিতে পাই নাই। এই জলের উপরেই আমার প্রথম মনে হইল, আমরা এই পৃথিবীতে সত্যই বাস করি না, কতোক্ষণের জন্য প্রবাসযাপন করিতে আসিয়াছি। আমাদের যাত্রা নিরন্তর সেই অনবধারিত রহস্যের দিকেই প্রবাহিত হইতেছে।

মানবহৃদয়ের একটি অস্পষ্ট ভয় নদীকে আমাদের কাছে আরো রহস্যমণ্ডিত ও অতএব আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। ট্রেণে মাটি আমাদের অনেক সন্নিহি-

চারিদিকে আমাদের পরিচিত পরিবেশ, তাই আমরা সব সময়েই একটা সুলভ নিশ্চিন্ততা অনুভব করি—সেই নিশ্চিন্ততা জলের এই অনিশ্চয় হইতে কতো বিস্বাদ, কতো জলীয়! ষ্টিমারে মাটি আমরা কখন কতোদূরে ছাড়িয়া আসিয়াছি, যেইদিকে তাকাই সেইদিকেই উদ্বেল ও উদ্বিগ্ন জল ছাড়া কিছুই দেখিতে পাই না, ক্ষণকালের জন্যও জীবনকে বিপথগামী ও বিপন্ময় মনে করিতে পারি বলিয়া জীবনের কী তীব্র ও গভীর আস্বাদ লাভ করি। এবং এই বিপন্ময়তার জন্যই জীবন মূল্যবান হইয়া উঠে। ট্রেণের আকস্মিক সঙ্ঘাতে বা দুর্ঘটনায়ো একটা কুৎসিত ক্ষিপ্রতা আছে, কিন্তু ষ্টিমারে জলের উপর মৃত্যুর মন্থর আবির্ভাবটি সূর্য্যাস্তের মতোই রমণীয়। এইখানে, এই জলের উপর, আমরা মৃত্যুকে জীবনের নিকটতম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি, সে আসিলে আমরা তাহার জন্য সসমারোহে প্রস্তুত হইতে পারিব। তাহার দক্ষিণমুখের দিকে আমাদের দুই চক্ষু নিবদ্ধ হইয়া আছে।

এই বিপন্ময় দুঃসাহসী জীবন যাপন করিবার দুঃসহ প্রেরণা এই প্রবল জলস্রোতে লুক্কায়িত আছে। মৃত্যুর বিশ্বব্যাপী বিরাজমানতার উত্তরে, 'আমরা আছি' এই দৃপ্ত বিদ্রোহবাণী ঘোষণা করিতে হইবে। আমাদের আদর্শের মাস্তুল যদিও ভাঙিয়া গিয়াছে, জীবনযানে যদিও অনেক ছিদ্র অনেক অসংস্কৃতি, তবু আমরা মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিব না, লবণাক্ত শাণিত স্রোতে ভাসিয়া পড়িব—জলকণ্ঠে যৌবনের এই ঔদ্ধত্য যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। পকেটমার হইতে চিরকাল যাহারা স্ফীতকায় মণিব্যাগটি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়া চলে, জীবনে কোনোদিন ছাতা হারায় নাই বলিয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়ায় বা সকালে উঠিয়া যাহারা এক বাটি গরম দুধ খায় ও পেন্‌সান্ লইয়া সঞ্চিত অর্থে বাড়ি তৈরি করে তাহাদের সেই স্থূল বৈচক্ষণ্য হইতে এই দিক্‌হীন দুরন্ত অভিযানের বিপন্ময়তায় অনেক বেশি ঐশ্বর্য্য। যৌবনের সেই সুন্দর উচ্ছৃঙ্খলতা, সেই সুন্দর অবিবেচনার একটি অনুপম প্রতীক এই জলে জাজ্জ্বল্যমান আছে। যে লোক দিনে উপবাস করিয়া রাত্রের জন্য ক্ষুধা সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহার প্রৌঢ়ত্বকে আমরা সম্বর্দ্ধনা করি না, যে আকাশের নাগাল পাইবার জন্য অঙ্গুলি উত্তোলন করে তাহার মহান অবিবেচনাকেই আমরা অভিনন্দিত করি। সাফল্যই হইতেছে জীবনের একমাত্র কলঙ্ক যাহা মানুষকে কুৎসিত, অবর করিয়া তোলে। যৌবন সেই সুলভ পারিতোষিকের লোভে অভিযান করে নাই, সিদ্ধান্তের তীর ছাড়িয়া সন্ধানের খরস্রোতে ভাসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু ঐ বুঝি মণিহারি আসিয়া পড়িল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রায় জানা ছিল

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

ভাঙ্গন মুখর পদ্মার তীরে ছোট একটি গ্রাম। সম্বলের মধ্যে তাহার বাজার, আর ষ্টীমার ষ্টেশন। তবে গ্রাম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বাজার ও ষ্টেশন হইতে একটু দূরেই। কিন্তু হইলে কি হয়—ষ্টেশনটিই গ্রামের বহির্ব্বাটী বাজারটি বৈঠকখানা আর অন্দরের মাঝামাঝি।

সমস্ত দিনে চারখানি ষ্টীমার ষ্টেশনের ফ্ল্যাটে আসিয়া লাগে, আবার বিদায়ের করুণ বাঁশী বাজাইয়া দূরে চলিয়া যায়। গ্রামের বুকে তাহারই স্পন্দন জাগে—কোনদিন হয়ত গ্রামে নূতন অতিথি আসে কোনদিন আবার আসেও না—যাহারা আসে তাহারা হয়ত' দূর গ্রামে চলিয়া যায়। গ্রামের বুকে এই যাতায়াতের সামান্য হইলেও রেখাপাত একটু হয়ই।

নিত্য নূতন মুখ, নিত্য নূতন ভাষা, নিত্য নূতন রঙ্-বেরঙ্ খবরের আমদানি রপ্তানির বেশ একটি ছোটখাট বন্দর! আমার কিন্তু ভালই লাগে। গ্রামের চেয়ে গ্রামের বহির্ব্বাটীতে তাই-দিবারাত্রের বেশী সময় কাটাইয়া দিয়াও আমার তৃপ্তি হয় না।

ষ্টেশন মাষ্টার ত্রিলোচনবাবু হইতে সুরু করিয়া ফ্ল্যাটের কুলি জিকির আলি পর্য্যন্ত আমাকে একটু সমীহ করিয়া চলে।

ত্রিলোচনবাবুর একবার চোখ পড়ার অপেক্ষা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পুরাতন ষ্টীল ফ্রেমের চশমাটি খুলিয়া হুঁকাটি ত্রস্তে বাড়াইয়া ধরিয়া বলেন, এই যে আসুন।

সাগ্রহে হুঁকাটি হাত বাড়াইয়া লইয়া বলি, পূজো আসছে, তাইত', কাজের হিড়িক যে খুব দেখচি।

ত্রিলোচনবাবু গোলাকার গ্লোবের মত মুখটি তুলিয়া সামান্য একটু হাসেন আর তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী রোগা ছিপ্‌ছিপে ছোক্‌রা ক্লার্ক মহেন্দ্র বেশ একটু ভারিক্কি চালে চোখমুখ আকাশে তুলিয়া বলে, মরবার ফুরসুত্ নেই দেখচেন না? আমরা বলে তাই কোন রকমে—

ত্রিলোচন বাবু মহেন্দ্রের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া বলেন, মহেন্দ্র মরবার ফুর্‌সুত্ না হোক্ বক্‌বার ফুর্‌সুত খুব পাবে, কিন্তু আগে 'টোটাল'টা দিয়ে দাও ভাই, বুঝচ' না, ষ্টীমার এসে গেলে যে হাঁকপাঁক করতে হবে।

মহেন্দ্র কানের কলমটা নামাইয়া লইয়া মনে মনে কি যেন হিসাব করিয়া আবার আমার দিকে ফিরিয়া বলে, স্কুলে কোন দিন অঙ্ক রাইট্ করেছি বলে মনে পড়ে না কিন্তু এমনই কর্ম্মের ফের যে ত্রিশ টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে সেই ছেলেবেলার ঋণ এখন সুদ শুদ্ধু আদায় করে' নিচ্ছে। এত' আর রাইট্ না করে' উপায় নেই, নইলে দাও নিজের গাঁট থেকে। আর এ পর্য্যন্ত দিয়েচিও কি কম?

ত্রিলোচনবাবু হাসিয়া বলেন, বেশী বক' বলে'ই না হিসেবে ভুল হ'য়ে যায় মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র হাতের খাতার উপর হইতে মুখ তুলিয়া বলে, ওছাই বকলেও ভুল হবে, না বকলেও ভুল হবে। কিন্তু তা বলে'—

মহেন্দ্রের কাজের ক্ষতি হইতেছে বুঝিয়া বলি, আচ্ছা আসি তবে মহেন্দ্র।

আরে না, না, এরই মধ্যে যাবেন কি!—বলিয়া মহেন্দ্র আগাইয়া আসিয়া আমার একটা হাত চাপিয়া ধরে। তারপর আবার বলিয়া চলে, যাহা বাহার তাহা তিপ্পান্ন—আরে ভুল ত' আমার হ'তেই হবে—তাবলে' এমন জমান আসরটা·· বুঝচেন না ষোড়শীবাবু।

হাসিয়া বলি, তা আর বুঝি না।

ত্রিলোচনবাবু বিরক্ত হইতে জানেন না, তাই সস্নেহে বলেন, মহেন্দ্র, তাইত'—

মহেন্দ্র চট্ করিয়া একটা মালের বস্তার উপর চাপিয়া বসিয়া সামনের আর একটা বস্তার উপর হাতের খাতাটা পাতিয়া ধরিয়া বলে, এইত' শেষ ক'রে দিলাম বলে'…… ওরে জিকির, বাবুকে একটা চেয়ার এনে দেনা……রোজ না বল্লে তোদের হুঁস হয় না, না ?

জিকির আলি সবিনয়ে বলে, চেয়ার কোথায় পাব বাবু। আপিসের টুল দু'খানা—তাও আট্‌কে রয়েচে।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, নিন ষোড়শীবাবু তবে আমার চেয়ারটাতেই বসুন। হিসেবটা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেরে নি।

উপস্থিত সকলেই মহেন্দ্রের দিকে চাহিয়া হাসিতে থাকে। মহেন্দ্র চতুর্দ্দিকে একবার চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে সকলের হাসির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলে, ও হরি, না, টাকা পয়সার যোগ মিলিয়ে মিলিয়ে মাথায় আর কিছু নেই দেখচি। মালের বস্তার ওপর বসেই সেটাকে চেয়ার ঠাওরালাম, এমন চাকরিও মানুষে করে আবার ! কি বলেন ষোড়শীবাবু ? না, চলুন আপিস ঘরেই যাওয়া যাক্।

ত্রিলোচনবাবু হাসিয়া বলেন, হিসেবটা করে' রাখতে ভুলো না মহেন্দ্র। ষ্টীমার আসার আগেই আমার চাই কিন্তু।

তা, তা দেখবেন, দেখবেন, ধরব আর শেষ করব বইত' না। বলিতে বলিতে মহেন্দ্র আপিস ঘরের দিকে চলিয়া যায়। আমাকেও সঙ্গে যাইতে হয়।

কারণ, মহেন্দ্র এত সহজে যে আমাকে রেহাই দিবে না তাহা ভাল করিয়াই জানি।

কথার পরে কথার জাল বুনিয়া চলিতে পাইলে মহেন্দ্র আর সব ভুলিয়া যায়। শেষে জালের মধ্যে এমনই জড়াইয়া পড়ে যে আর কিছুরই জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ থাকে না। এমন কি, চাকরি বজায় রাখিবার কথাও তাহার আর মনে থাকে না।

অল্পপরেই আপিস ঘরের জানালায় বহুলোকের ভিড় হয়। জানালার খোকর দিয়া একসঙ্গে অনেকগুলি হাত টিকিট পাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। মহেন্দ্র সে সব অগ্রাহ্য করিয়াই বলে, সবাই আমরা ভবঘুরে ষোড়শীবাবু। বাবাত' জীবনের আদ্ধেকই যত সব বন জঙ্গল আর পাহাড় পর্ব্বতে কাটিয়ে দিলেন। শেষ বয়সে ক্লান্ত হ'য়ে শেষে কাশীবাসী হ'লেন। তাও বরাতে বেশীদিন সইল' না।……বড়দার ত' পাত্তাই নেই। সেই যে কবে ঘরছাড়া হলো, আর কোনদিন ফেরার নামটিও করলে না। এখন মার্কিন দেশের কোন্ একটা ইউনিভর্সিটির প্রফেসার শুনি, মার্কিন একটা মেয়েকে বিয়ে করে' সেখানেই নাকি ঘর কন্না সুরু করেচে,—হবেও বা। চিঠি পত্তর ত' লেখে না আর। মেজদা'ত নিকোবরেই শেষে ঘর তুলতে হলো বাধ্য। ওহো, সেকথা বলিনি বুঝি আপনাকে ষোড়শীবাবু? মেজদারও একদিন কোন পাত্তা মেলে না; শেষে বছর দশেক নিরুদ্দেশে কাটিয়ে একদিন হঠাৎ একটা নিকোবরের মেয়েকে সঙ্গে করে' একেবারে দেশে হাজির। আমাদের ত' চক্ষুস্থির। গ্রামের লোক ছি ছি করতে লাগলো। কিন্তু মেজদা ত' চিরকালই বেপরোয়া কিনা। তারপরে একদিন খুব হেসে আবার বিদায় নিয়ে চলে' গেল। যাবার বেলা শুধু আমাকে বলে' গেল 'মহেন্দ্র, চল্লাম ভাই। দেশের বুকে আমার আর স্থান নেই। মঞ্জুর সঙ্গে তোর পরিচয় হয়নি, নইলে বুঝতি দেশকে আজ আমি ছেড়ে যেতে চাই কেন।' নিকোবরের ঐ মেয়েটার নাম মঞ্জু ষোড়শীবাবু। ওর রূপের পরিচয় পেয়েছিলাম কারণ, রূপকে আমাদের মত ওরা ঢাকা দিয়ে বিকৃত করে' তোলে না। আর যা পরিচয় তা ঐ মেজদার কথাতেই। তারপর সেজদা'র কথাত' সবাই জানে—দেশের জন্যে হাসিমুখে গেল ফাঁসি কাঠে। আমিই শুধু অভাগা ষোড়শীবাবু। নইলে, জীবনপাত করলাম এই ফ্ল্যাটে বসে' অঙ্ক কষে কষেই। কিন্তু বিশ্বাস করবেন না ষোড়শীবাবু আমারও মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়, ভাবি,………আঃ আপনারা পাগল করে' ছাড়বেন দেখচি ম'শাই। বলি ষ্টীমার আসতে এখনও ঢের দেরী, এরই মধ্যে টিকিট ! টিকিট পেলেই কি সব নদী সাঁতরাবেন নাকি ?

একজন ঘর্ম্মাক্ত বেঁটে লোক জানালার সামনে বিশ্রী কতকগুলি দাঁত বাহির করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলে,

টিকিট ত' দিন ম'শাই তা'পর নদী সাঁতরাই কি না সে আমরা বুঝব।

মহেন্দ্র সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ভুলিয়া যাওয়া কথার খেই আবার ধরিতে চেষ্টা করে। আমি তাহার বিফল চেষ্টা দেখিয়া হাসিয়া বলি, মতিভ্রম না হবে কেন মহেন্দ্র, রক্তের সম্পর্ক ত' বড় সোজা জিনিষ নয়।

তা যা বলেচেন ষোড়শীবাবু। আমাদের বংশের রক্তের গুণই এমন যে, ভবঘুরে না হ'য়েই আমাদের উপায় নেই। তাই ভাবি, কবে না জানি আপনাদের সব সঙ্গত্যাগ করে' যেতেই হয়।—বলিয়া মহেন্দ্র আদ্র চোখ দুইটি আমার পানে তুলিয়া ধরে।

মহেন্দ্রের ব্যথা যে কোথায় তাহা যদি বা বুঝি তো তাহাকে সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। বলি, তোমার মা'র কথা মনে আছে মহেন্দ্র?

নেই, নেই আবার! বলেন কি ষোড়শীবাবু। তাকে একবার যে দেখেচে সে আর কখনও ভুলতে পারেনি, ভোলা অসম্ভব। এক সময় আমাদের বাড়ীতে খুব ঘটা করে' দোল-দুর্গোৎসব হ'তো। দুর্গোৎসবে কম্‌সে কম একশ' পাঠা'ত' বলি হ'তোই—আজই না হয় ভিটেমাটির চিহ্নটি পর্য্যন্ত নেই। শুনেচি মা নাকি বলি বন্ধ করেন। কেমন করে' বন্ধ করেছিলেন শুনলে চম্‌কে যাবেন ষোড়শীবাবু, আর কেউ হ'লে কখনই পারত' না। শ্বশুরবাড়ী প্রথম দুর্গোৎসবে এসে কোন মেয়েই অতটা পারে না ষোড়শীবাবু। কাঠগড়ার পাশে বলির ছাগগুলোকে দেখে মা আর ঠিক থাকতে পারলেন না, ছুটে গিয়ে কাঠগড়ায় নিজের গলা পেতে দিয়ে পড়ে' রইলেন, বল্লেন, 'আগে আমাকে বলি দেওয়া হোক, তারপর ঐ নিরীহ বেচারাদের বলি দেওয়া হবে।' সেই থেকে ঠাকুর্দ্দা আর কখনও মা'র মুখ দেখতেন না, কিন্তু বলি দিতেও আর কখনও তিনি সাহসী হননি। মা'কে আজও কেউ ভোলেনি ষোড়শীবাবু, আমি কি ভুলতে পারি কখনও।—বলিয়া মহেন্দ্র চোখের সিক্ত পাতা কাপড়ে মুছিয়া লইয়া হঠাৎ টিকিটের খোপকরা আল্‌মারিটির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলে, কই, চট্‌পট্ বলুন সব—কি, আপনার কোথাকার?……আরে সুরেশবাবু যে, কোথায়, কল্‌কাতা চল্লেন নাকি?

—রানাঘাট একখানা।

—আমার তিনখানা নৈহাটী দেবেন ত' মশাই।

—আমার কিন্তু কল্‌কাতা……একখানা।

বহুলোকের একত্রিত কলরবের মধ্যে সুরেশবাবুর ক্ষীণকণ্ঠ চাপা পড়িয়া যায়।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি একটা ধমক দিয়া বলে, আঃ একজন একজন করে' হাত বাড়ান না ম'শাইরা।

কিন্তু কে তাহার কথায় কর্ণপাত করে।

বাড়ী ফিরিবার পথে প্রতিদিনই সূর্য্য মাথায় উঠিয়া পড়ে। মাঠঘাট তাতিয়া উঠিয়া পথ চলা অত্যন্ত ক্লান্তিকর করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে গাছের ছায়া গ্রাম্য পথের বুকে পাওয়া যায় বলিয়াই যেটুকু শান্তি। কিন্তু তাহা না থাকিলেও আমাকে ষ্টেশনে যত কষ্ট স্বীকার করিয়াই হউক না কেন যাইতেই হইত। নদীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া কোনদিন মুগ্ধ হই নাই, প্রকৃতির প্রতি আমার কোন মমতাই নাই শত অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াও পৃথিবী আমাকে কোনদিন ভুলাইতে পারে নাই,………কিন্তু মানুষের সামান্য সুখ-দুঃখের কাহিনী, হাসি-অশ্রুর আভাস আমাকে ব্যাকুল করে, মুগ্ধ করে, কাঁদাইতেও পারে। মহেন্দ্রের জন্য কতদিন গৃহে বসিয়া না জানি ভাবিয়াছি, সময় পাইলেই তাই ষ্টেশনে ছুটিয়া যাই—মহেন্দ্রকে ভাল লাগে, ওদের ছন্নছাড়া সংসারটির জন্য বুকে ব্যথা জাগে।

মহেন্দ্রের কথার অন্তরে লুক্কায়িত মূল সুরটিকে সে নিজেও চিনিতে পারে নাই। সে সম্বন্ধে তাহাকে সজাগ করিয়া দেওয়াও আমি কোনদিন প্রয়োজন মনে করি নাই।

ওর সমস্ত অন্তর চায়—বড়দা, মেজদা তা'দের বিদেশিনী জীবন সঙ্গিনীদের সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসুক, আবা[র] ঘর বাঁধুক……ছন্নছাড়া সংসারটি আবার নূতন করি[য়া] জোড়া লাগুক। ও তাহা হইলে যেন বাঁচিয়া যায়। মহে[ন্দ্র] নানাভাবে জীবনের এই দৈন্যকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা পা[য়]।

মাঝে মাঝে, রক্তে তাই তাহারও ছন্নছাড়ার গান বাজিয়া উঠে।......ভাঙ্গাঘর নূতন করিয়া আবার গড়ার এতবড় আগ্রহ আর কাহারও মধ্যে আমি দেখি নাই। কিন্তু তাহা আর হইবার নয় জানিয়াই জীবনের প্রতি মহেন্দ্র নিরাসক্ত। অকারণ-কথার ফেনিল সাগর গড়িয়া তাহাতে নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ডুবাইয়া দিয়া সে শান্ত হইতে চায়।......

বহুদিন এমনও হইয়াছে যে, আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্নান সমাপনান্তে আহারে বসিয়াছি এমন সময় মহেন্দ্র ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির। সারাদেহে তাহার ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে। বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিতেই সে বলে, 'কাজ কর্ম্ম নেই তাই ত্রিলোচনবাবুকে বলে' ঝাঁ করে' চলে' এলাম। ও হট্টগোলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। আপনার বাড়ীটি কিন্তু ভারী চমৎকার ষোড়শীবাবু।'

শেষের কথাটি মহেন্দ্রের মুখে বহুবার শুনিয়াছি, কিন্তু কোনদিন বিরক্তি আসে নাই। কথাটিও সমস্ত প্রাণ দিয়া বলে বলিয়াই হয়ত'।

মহেন্দ্রকে অদূরের একটি আসনে বসিতে বলিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলি, মহেন্দ্র এসেচে।

আর কিছুই আমার বলিতে হয় না। দেখিতে দেখিতে এক গেলাস জল ও থালায় সাজানো ভাত আসিয়া উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র মৃদু একটু হাসিয়া শুধু বলে, আপনার ওপর ভারি অত্যাচার করচি কিন্তু। ওদিকে কুকারে নিজের রান্নাও চাপিয়ে এসেচি।

—তা হলোই বা।

—না, আজ ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়েই খাব 'খন।

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আমার স্ত্রী ঘোমটাটি প্রায় সম্পূর্ণ তুলিয়া দিয়াই বলে, তা হবে না ঠাকুরপো। ক'দিন না বলেচি কুকারটা পদ্মার জলে ডুবিয়ে দিতে? মহেন্দ্র ছোট একটি 'কিন্তু' বলিয়া আহার্য্যে হাত দেয়।

আমি খুসি হইয়া বলি, মহেন্দ্র, তোমরা যেমন কুকুর ওরা আবার ঠিক তেমনি মুগুর। কেমন, এক ঘায়েই শায়েস্তা!

মহেন্দ্র প্রাণ ভরিয়া হাসে।

পরদিন ভোরের কথাই বলিতেছি—আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। কি একটা পাখী অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশ্রী কর্কশ কণ্ঠে ভোরের আলোকে বীর রসাত্মক অভিনন্দন জানাইয়া সবে মাত্র ক্লান্ত হইয়া একটু থামিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিলে আর কথা নাই ননটা একছুটে ষ্টেশন ঘাটার গোলমালের মধ্যে গিয়া হারাইয়া যায়। তারপরে দেহটাকেও কষ্ট স্বীকার করিয়া সেখানে লইয়া যাইতে হয়—না হইলে মন বিকল হইয়া পড়িবে—এই ভয়েই।

ঘরের বাহিরে আসিয়াই ষ্টীমারের সিটি শুনিলাম। শুনিতে বেশ লাগে। কলের মজুরদের কাজে যাইবার তাগিদ লইয়া এ সিটি বাজে নাই, কি কেরাণীর ছুটি শেষের প্রত্যাবর্ত্তনের পরওয়ানা লইয়াও এই ষ্টীমার আসিয়া সময়ের মূল্য বুঝাইয়া বিশ্রী সুরে অন্তরে ঘা মারে নাই, ইহা সম্বলহীন প্রৌঢ়ের কর্ম্মহীন ক্লান্ত দিনটিকে নানা রূপে রসে ভরিয়া দিবার সুন্দর মোহন ইঙ্গিত। মুগ্ধ না হইয়া তাই থাকিতে পারি না।

দূরে ফাঁকা আর ফাঁকা, নীচে অতল জলরাশি, উপরে সীমাহীন আকাশ, দূরে, আরও দূরে সর্পিল একটি নীল রেখা আকাশের গা ঘেঁসিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, ওপারের বৃক্ষশ্রেণী এপারের কাছে সীমার নিশানা তুলিয়া ধরিতে গিয়া একটি মাত্র রেখায় আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

দু' একখানা নৌকা ভাসিতেছে।

আকাশে চিলও ভাসিতেছে।

সূর্য্যের ঠিক নাবোয় ধোঁয়া ছড়াইয়া সূর্য্যকে ম্লান করিয়া তুলিয়া ষ্টীমারখানা ছুটিয়া আসিতেছে।

হঠাৎ মহেন্দ্রের কল্যকার কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। সে বলিয়াছিল, আর বেশী দিন নয় ষোড়শীবাবু, ডাক শীঘ্‌গিরই এলো বলে'......ব্যাস, তা'সেই উড়নচণ্ডী ভবঘুরে...... দিবিব, কি বলেন?

কথাটার কোন উত্তর তখন দেওয়া প্রয়োজন মনে করি নাই, ভাল করিয়া কিছু জানিতেও চাহি নাই। কোথা হইতে ডাক আসিবে? কেন?.........কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই।

এখন মনে হইল, সত্যই মহেন্দ্র যদি এমনই একদিন

চলিয়া যায়। আর তাহার শরীরে যে রক্ত বহিতেছে তাহাতে তাহার চলিয়া যাওয়াটা খুব আশ্চর্য্য কি? মনটা দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়া আসে। আরও দ্রুত, আরও সরব পাদবিক্ষেপে ষ্টেশনের দিকে আগাইয়া চলি।

ত্রিলোচনবাবুর সঙ্গে ফ্ল্যাটের সিঁড়ির মুখেই দেখা হইয়া যাইতে তিনি ম্লান একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলেন, মহেন্দ্র চল্‌লো......বাঃ ও বুঝি কিছু বলেনি আপনাকে? ছোক্‌রাকে ভালবাসতেম কিনা, তাই আমাকে না জানিয়েই গোপনে গোপনে এমন কাণ্ডটি ক'রে বসল। পারলে ধবে' রাখতেম, কিন্তু এখন আর নাকি......যাক্‌গে, ওরা বংশ পরম্পরায় এম্‌নি উড়নচণ্ডীই চিরদিন শুনি।

মনটা বিষাইয়া উঠে। বলি, চল্‌লো মানে? কোথায় চললো আবার? ওর যে মরবারও কোথাও জায়গা নেই শুনি?

ত্রিলোচনবাবু আর্দ্র কণ্ঠ সহজ করিতে চেষ্টা করিয়া বলেন, হুঁ, দেশে ওর মরবার জায়গা জুটলো না বলেই হয়ত বিদেশে মর্‌তে চল্‌লো। ও বলেনি বুঝি, ও যে যুদ্ধে চল্‌লো, এডেন না মেসোপটেমিয়া কোথায় যাবে শুনি। এই ষ্টীমারেই কল্‌কাতা চল্‌লো।

—এঁ্যা সত্যি?

কথাটা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অন্ততঃ, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

ষ্টীমারের সিটি বিকৃত হইয়া বাজে।—

দূরে চলিয়া যায়। বড় পরিচিত মহেন্দ্র ষ্টীমারের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া—ইচ্ছা করে, জোর করিয়া উহাকে ফিরাইবার জন্য হাঁক ছাড়িয়া ডাকি; ষ্টীমারের গতি রুদ্ধ করি......না থাক্।

ত্রিলোচনবাবু ডাকিয়া বলেন; চলুন, আপিস ঘরে বসে' একটু গল্প গুজব করা যাক্।

রাজী না হইলেও তাহার সঙ্গ লই।

জিকির আলি আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া বলে, মহিন্দের বাবু তা হ'লে গেলেনই আজ? অনেকদিন ধরেই যাব যাব করছিলেন।

মাঠের পথ ধরিয়া আর বাড়ী ফিরিতে পারি না। মনে হয় দূরে, বহুদূরে আমার ঘর পড়িয়া আছে।

এমন ঠাঁটা পড়া রৌদ্র ত' রোজই মাথার উপরে থাকিত কিন্তু পথ এত দীর্ঘ বলিয়াত কোনদিন মনে হয় নাই।

'আমারও মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়, ষোড়শীবাবু'—মহেন্দ্র বলিয়াছিল।

মহেন্দ্র চলিয়া গিয়াছে......কেহ তাহার জন্য চোখের জল ফেলিবে না......সেকি হইতে পারে?

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
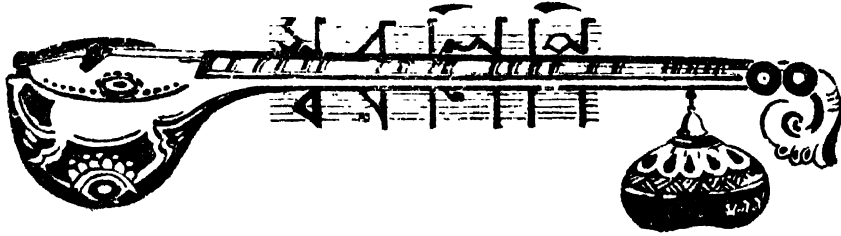
বহার—তীব্রা

আইল আজি বসন্ত মরি মরি,
কুসুমে রঞ্জিত কুঞ্জ মঞ্জরী ;
অলি আনন্দিত নাচে গুঞ্জরি
পিক পুলকিত ডাকে কুহরি'।
নৃত্য করে কত বাল' বালিকা,
কণ্ঠে শোভে নব কুন্দ-মালিকা ;
আনিছে সুন্দরী শূন্য গাগরী
সুখে লহে প্রেম-বারি ভরি' ভরি'।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন বার্-এট্-ল   স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

\+ ২ ৩

II মণা ধণা পা । মপধা -মপা । মজ্ঞা মা I মণধা -ণধা না । র্সা র্রা । র্সনা র্সা I
আ ই ল আ • • • • জি ব সন্ • ত ম রি ম রি

পর্সা র্সা পণা । পা -া । মা পা I মজ্ঞা -মজ্ঞা মজ্ঞমা । রা -া । সা সা I
কু সু মে র ঞ্ জি ত কু ঞ্ • জ ম ঞ্ জ রী

সা -মা মা । মা পা । মজ্ঞা মা I ণধা -ণধা না । নর্সা না । র্সা র্সা I
অ লি আ ন ন্ দি ত না • চে গু ঞ্ জ রি

র্সা -র্মা র্মা । র্মর্রা র্সা । না র্সা I র্সণা -ধা না । র্সা -না । র্সর্রা র্সা II
পি • ক পু ল কি ত গা • হে কু • হ রি

+ ২ ৩
|| মজ্ঞা -মজ্ঞা মা । মণা ধা । না না | র্সা -া না । নর্সা র্রা । র্সনা র্সা |
নৃ • ত্য ক রে ক ত বা • ল বা • • লি কা

না র্সা র্রা । র্সনা র্সা । পণা পা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা । রা -া । সা সা |
ক ণ্ ঠে শো ভে ন ব কু ন্ দ মা • লি কা

সা -মা মা । মা পা । মজ্ঞা মা | ণধা ণধা না । নর্সা -না । র্সা র্সা |
আ নি ছে সু ন্ দ রী শূ • না গা • গ রী

র্সা -া র্মা । র্মর্রা র্রা । র্সনা র্সা | র্সণা -ধা না । র্সা না । র্সর্রা র্সা ||||
সু • খে ল হে প্রে ম বা • রি ভ রি ভ রি

বহার রাগ পরিচয়

বহার রাগ কাফী ঠাঁঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্যম বাদী ষড়জ সম্বাদী। গাহিবার সময় মধ্যরাত্র কিন্তু বসন্তকালে সব সময়ই গাওয়া যায়।

আরোহী— ণ্ সা, জ্ঞা মা, পা জ্ঞা মা, ধা, ণা র্সা

অবরোহী—র্সা, ণা পা মা পা, জ্ঞা মা, রা সা

পকড়—মা পা জ্ঞা মা, ধা, না র্সা

"রিধ তীবর কোমল নিগম উতরত ধেবত ঠার।
সম সংবাদী বাদি হৈ সমঝো রাগ **বহার**॥"

"রাগচন্দ্রিকাসার"

প্রভাব

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল

পুকুরটা মস্ত, কিন্তু মজা। ঢোল-কলমির বনে, আর বাঁশের পাতায় পরিপূর্ণ,—সহজে জল চোখে পড়ে না,—কুকুর-মাছি ভণ্ ভণ্ করে।

মাছ ধরার ভাণ করিয়া নির্ম্মল সেই পুকুরেই একদিন চার ছড়াইল। সঙ্গে তিনটি সঙ্গী, ও সুরাপানের সরঞ্জাম।

বেলা খানিক বাড়িলে, দলটি হঠাৎ কিলবিল্ করিয়া উঠে: চাঁদমারির বাঁকা পথের সীমান্তে একটি মেয়ে আসিতেছিল, বয়স সতের আঠার।

শম্ভু চোখ উলটাইয়া বলিল—হ'ল হে, জমিদার? একেবারে মৎস্য-গন্ধা, নয়?

এ-কথায় পঙ্কুর আপত্তির ভঙ্গি বর্ণনা করা সুকঠিন।

আপত্তিটা এই—ঘোষের বুদ্ধি কি-না! টলটলে সরোবর, তা' না মৎস্য-ফৎস্য যাচ্ছে তাই!

ঠোঁটে ঠোঁটে একটা শব্দ করিতে গিয়া শম্ভু বমি করিল।

পরে বলিল—উলুকের উপমা শুনে বমি হয়ে গেল। জল কই! কোথায় বা পদ্ম! কোথায় মাছ! অমনি সরোবর!

—রা-স-ভ! লাবণ্য-লীলা জল, মুখ হ'ল পদ্ম, চপল—কি বলে—চোখ না? হ্যাঁ—হ্যাঁ, চোখ মাছ—

নির্ম্মল ধমক দিল—আরে দুর কচু! কি ঝগড়া লাগালে! মেয়েটি এতক্ষণে পুকুরের কাছে আসিয়াছে।

স্বরে কতখানি কোমলতা দিয়া, নির্ম্মল ডাকিল—দেখ, একটু উপকার ক'রবে আমাদের?

অন্য গুণ বিশেষ না থাক্, চেহারাটা নির্ম্মলের সুন্দর।

জোনাকী থমকিয়া দাঁড়ায়। দেহে কোমল মধুরিমা, চোখে আত্ম-নির্ভরতার দীপ্তি।

নির্ম্মল কথা খুঁজিয়া পায় না। বলে—তোমাদের গাঁয়ে মাছ ধ'রতে এসেছি, আমাদের মাছ ক'টা ভেজে দেবে?

—তা' দো'ব। কিন্তু আমি থাকি অনেক দূর। আমার কাজও একটু বেশী। আপনারা কেউ গিয়ে যদি নিয়ে—

শম্ভু লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—আমি! আমি!—

নির্ম্মল বলে—তোমার বাড়ীতে এ-বেলাটা যদি আমরা অতিথি—

জোনাকী উত্তর দিল—আমার বাড়ী প্রতিষ্ঠান। জায়গা নেইত সেখানে।

—তবে একবার তোমায় আসতে হবে। সঙ্গে অবশ্য আমি যাচ্ছি। কষ্ট ক'রে আমাদের আয়োজন ক'রে দেবে, একটু ভাগ নেবে না,—এ-রকম উপকার নিতে আমরা রাজি হ'ব কেন?

জোনাকীর কণ্ঠে একটু কুণ্ঠা আসে। অপরিচিতের সুন্দর আত্মীয়তা ত!

বলে মাছ আমি খাই না, ভাগ নেওয়ার উপায় নেই। আপনি আসুন তবে

শম্ভু বলিল—যদি জন্মাতেই হয়, এবার মরে জমিদারের ছেলে হ'ব, বাবা।

নির্ম্মল একটু হাসে, গর্ব্বেই বোধ হয়।

দুইজনে পাশাপাশি চলে।

জনহীন মেঠো পথ, নিকটে বসবাসের সঙ্কেতও নাই, চারিধারে ক্ষেত।

নির্ম্মল বলিল—তোমার নাম জানলুম না ত।

—জোনাকী।

খানিকটা পরে জোনাকী জিজ্ঞাসা করে—আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন বুঝি?

এ-রকমই একটা প্রসঙ্গের নির্ম্মল অপেক্ষা করিতেছিল।

বলিল—শিমুরালি থেকে। তোমাদের জমিদারই আমার বাবা। আসি না, কাজেই চেনো না।

পরিচয় দেওয়ার আশানুরূপ ফল ফলিল না। জোনাকীর মুখে ভয় ভক্তির রেখা মাত্র নাই। স-মান সহজ ভঙ্গিতেই সে চলে, সাহায্য-প্রার্থীটি গ্রামের জমিদার পুত্র জানিয়াও তাহার মাথা ঝুলিয়া পড়ে না।

সাহায্য-প্রার্থীই নয়, নির্ম্মল ঘনিষ্ঠতা-প্রার্থী। প্রশ্ন করিল—তোমার বাড়ী, অ-ই প্রতিষ্ঠানে কে-কে থাক?

জোনাকী বলে—প্রতিষ্ঠানের মেয়েরা, আমি আর একুশ জন।

—তোমার বাপ-মা?

—তাঁরা কেউ নেই। ছোট একটি ভাই আছে শুধু।

—মেয়েরা?

—গাঁয়ের। আমার মতই অনাথা, প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী সব।

নির্ম্মল ভাবিল—অভিভাবকহীন মেয়েব গাঁধি! গ্রামের ছেলেদের সময় কাটাবার চমৎকার জায়গা ত!

উৎসাহিত হইয়া সে বলে—এত কম বয়েস, পথেঘাটে একা ঘুরতে তোমার ভয় করে না?

জোনাকী হাসিয়া উত্তর দিল—কর'ত প্রথম-প্রথম। এখন আমার সাহস দেখে পাজিরাই ভয় পায়।

—বিয়ে করনি কেন? সকল কাজের সঙ্গী পেতে একজন। পুরুষের সঙ্গ পছন্দ কর না বুঝি?

নির্ম্মলের চোখে চোখ পড়িতে জোনাকী একটু হাসে।

সেখানটায় পথের দুইধারে কসাড় বন। পাশাপাশি চলা যায় না। জোনাকী আগে চলে।

নির্ম্মলের মনটা উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল—আমরা এমন ভাবে যাচ্ছি, লোকে দেখলে কি ভাববে।

জোনাকী ইঙ্গিত বুঝে নিশ্চয়, কথা কহে না।

তাহার পিঠে দোদুল আঁচলটা ধরিয়া নির্ম্মল বলিল—খারাপ ভাবতে পারে ত?

নূতন মানুষ যেন জোনাকী! তাহার চীৎকারে কসাড়-বন কাঁপিয়া উঠে—কি হাঁাংলামি আপনার!

নির্ম্মল থতমত খাইয়া যায়। হন্‌হন্ করিয়া জোনাকী চলে। প্রতিষ্ঠানে যাইতে নির্ম্মল আর সাহস পায় না।

স্ত্রী-চরিত্রজ্ঞতার, মেয়েদের সঙ্গে সহজে ঘনিষ্ঠ হওয়ার যশ নির্ম্মলের ছিল। কত মেয়ের সঙ্গে সে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিয়াছে ত! অপমানটুকু তাহার মনে বিঁধিয়া বিঁধিয়া, জয়ের প্রবল একটা আকাঙ্ক্ষা আনে।

বত্রিশ সালের ওলাউঠা-মড়কে পায়রাডাঙ্গা পল্লীটিকে ছন্নছাড়া ও দুর্ভিক্ষের রঙ্গভূমি করিয়া দেয়। প্রায় সংসারই অভিভাবকহীন হইয়া পড়ে। তখন থেকে গ্রামটায় মেয়েই বেশী। কলিকাতা, ব্যারাকপুর, রাণাঘাটের সঙ্ঘ-সমিতির স্বেচ্ছা-সেবকেরা কিছুদিন অসহায়দের সেবা-শুশ্রূষা, অন্ন-বস্ত্র-দান করে। কিন্তু, বয়স্থা মেয়েদের কাছে দুই একজন দাবী করে—প্রতিদান, কলঙ্কও রটে। মড়কের হাত এড়াইয়া যে-পুরুষেরা সরিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, তাহারা স্বেচ্ছা-সেবকদের আসা বন্ধ করে। আবার দুর্ভিক্ষ আসে।

জোনাকী তখন বছর পনেরর মেয়ে। মা' আছেন, আর একটি ছোট ভাই। অবস্থা ভাল না হইলেও, একেবারে খারাপ নয়।

অনাথা মেয়েরা, ছোট ছেলে-পুলে ক্ষুধায় কাঁদিয়া সারা হইত, ঘাসপাতা চিবাইত, ধূলায় উবুড় হইয়া পড়িয়া থাকিত, হৃদ্‌পিণ্ড নড়ে কি-না। সে গোপনে মরাই হইতে ধান লইয়া এ-পাড়া ও-পাড়ায় বিতরণ করিত। দুঃস্থদের ভরসা ছিল সে।

মা' একদিন বলে—ভাল ক'রে সাবান ঘষে নেয়ে আয় এক দৌড়ে। দেখতে আসবে এখুনি।

সে বলে—কেন? বিয়ে? বারণ ক'রে পাঠাও, মা। শ্বশুর বাড়ী গেলে ফিরে গাঁয়ের একজনকেও দেখতে পাব না হয়ত।

মা ধমক দেয়—উকি কথা রে! একঘরে করবে যে!

জোনাকী বলিয়াছিল—তাদের একঘরে করবে, ছেলে যাদের চিরকুমার থাকে? কথাটার তা' হ'লে মানে থাকে. নইলে একচোখো ছাড়া—

মা মেয়েতে রীতিমত ঝগড়া বাধে।

কলহের মীমাংসা হওয়ার আগেই একদিন জোনাকীর মা তাহাকে অনাথা করিয়া গেল। 'নারী-প্রতিষ্ঠানের' সূত্রপাত এই।...

শম্ভুর কাছে ইতিহাস শুনিয়া, নির্ম্মল হাসিয়া উঠিল: যে দেশে ঘরে ঘরে ছেলে মেয়ে কিল্‌বিল্‌ করে, তিন বছর বয়স থেকে বর-বৌ খেলে, দশ বছরের মেয়ে-ও মা হয়, সেই বাঙলার সামান্য গেরস্তের মেয়ে বলে, বিয়ে করবে না! মেয়েলি ন্যাকামি!—ভাল, ভাল—এ-ধরণের মেয়েরাই বেশী বেটাছেলে-ঘাঁসা হয়।

জোনাকীকে সে লিখিল—

আলে হোঁচট্ খেয়ে তোমার আঁচলে হাত ঠেকেছিল ব'লে, তুমি ভৎ'সনা বড় নির্দ্দয়ভাবে করেছ। পুরুষের মনেও ব্যথা লাগে এ-টা ভোলা তোমার মত মেয়ের উচিৎ নয়। যা'হোক, ক্ষমা ভিক্ষা কর'ছি।

কিছুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণের হোলি-উৎসব।

পায়রা-ডাঙায় অভিনব আয়োজন দেখিয়া সকলে নির্ম্মলের জয় গান করে: এই না হ'ল জমিদার! নিরানন্দ প্রজাদের অবস্থা দেখে গিয়ে উৎসবের ব্যবস্থা করেছেন।

সত্যই মনোরম। মাঠের মাঝে ছোট মেলা। সেখানে ক্ষীর-লুচির গাছ, দধি-সরোবর, টাকার বাড়ী, রসগোল্লার ক্ষেত; দেশ-বিদেশের পুতুল—শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের লীলা, শ্রীরাধার মান-ভঞ্জন—এই সব; নির্ম্মল একধারে 'প্যারিস্-কোপে ছবি দেখায়; এক পাশে কুমারীদের আলতা-পরাণ'র কাপড়-মিষ্টাদি দেওয়ার ব্যবস্থা; ছোট নাগর দোলা একটা একদিকে।

সমস্ত গ্রামটা যেন সেখানে উঠিয়া আসিতেছে, এত ভিড়।

কত তরুণী-কুমারী, বাড়ন্ত-বিধবা, বুড়াবুড়ি আসে, জোনাকীকে কিন্তু দেখা যায় না।

বিকালে একদল ছোট ছেলে মেয়ে আসিয়া ছবি দেখিবার জন্য নির্ম্মলের কাছে কাকুতি মিনতি করে।

গায়ে তাহাদের জামা নাই, পরণে ছেঁড়া তেল চিটা কাপড়, ন্যাকড়া বলিলেও চলে। চুল কপিল-বর্ণ, চামড়ায় ধূলার একটা পুরু প্রলেপ, মুখ-হাত-পা ফাটিয়া মাছের আঁশের মত হইয়াছে। দরিদ্রের দূত যেন সব।

নির্ম্মল তাহাদের তাড়াইয়া দিল। তাহার ভৎ'সনা-বিশ্রী মুখে সজল মিনতিভরা দৃষ্টি রাখিয়া ছেলে মেয়েগুলি নীরবে সরিয়া যায়।

একটি খোকা কিছুদূর হইতে ব্যাপারটা দেখিতেছিল। মাথায় তাহার টুপি, গায়ে সার্ট।

কয়েক-পা' সামনে আসিতে নির্ম্মলের আনন্দ হইল বৈকি। ছেলেটির টুপিতে লেখা 'নারী-প্রতিষ্ঠান,' মুখের আদল জোনাকীর মত। তাহার ভাই হওয়া অসম্ভব নয় ত!

থর-পদে গিয়া সে খোকাকে বুকে টানিয়া লয়।

জোনাকী না আসায় সবই যেন তাহার চোখে রঙহীন ঠেকিতেছিল—মানুষের মুখ, নীল আকাশ, মধু-মাসের কিশলয়। খোকাকে কাছে পাইতে দৃষ্টির ম্লানিমা তাহার অনেকটা মুছিয়া গেল। জোনাকীর কত খবর তাহার কাছে পাইবে সে, তাহার আদর-যত্নের কথাও খোকা দিদির কাছে বলিবে ত!

সে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি, খোকা?

খোকা বলে—বুলটু।

—তোমার দিদি আছে ত?

—হাঁা।

—তার নাম জান?

—দিদির? শ্রীমতী জোনাকী।

বুলটুকে সে বুকের উপর চাপিয়া ধরে।

ক্ষীরলুচির গাছ ভাঙ্গিয়া তাহাকে খাওয়াইল, সিল্কের রুমাল দিল, আদর করিয়া পাউডার মাখাইল, চুল আঁচড়াইয়া দিল, ছবি দেখাইল।

বিতাড়িত বালকবালিকা কয়টি জুল্ জুল্ করিয়া দেখিতেছিল। আরও কি করিবে, জোনাকী কোন্ কাজে মনে মনে তাহাকে প্রশংসা করিবে, সে ভাবে।

জিজ্ঞাসা করিল—বুলটু, তোমার দিদি কোথায়?

খোকা বলিল—দিদিরা কুস্তি ক'রছে।

হাসিয়া সে বলে—কুস্তি!

—হাঁা। ঐ যে এমনি ক'রে ওঠে-বসে, উপুড় হয় হট ধ'রে আবার ওঠে, লাঠি নিয়ে দু'জনে ঠোকাঠুকি করে—

—সকালে কি করছিল?

খোকা বলিল—দিদিরা তৈরী করে, তারপর চিল্‌মারি কেউটের বউরা তৈরী করে রুটি-বিস্কুট, জামা, রুমাল, আচার,

আমসত্ত্ব, মোজা, আসন—এই সব লোকেরা কিনতে আসে,—সকালে তারা এসেছিল।

রূপকথা যেন! বাঙলার কয়টি তরুণী চালায় এমন একটা প্রতিষ্ঠান! নির্ম্মলের চোখে খানিক বিস্ময় তির্‌তির্ করে।

সে জিজ্ঞাসা করিল—কে এ-সব কাজ-কর্ম্ম চালায়, বুলটু?

—সবাই মিলে।

—না, কর্ত্তা কে?

—কর্ত্তা? দিদি—আর সন্ন্যাসী সেই—

পলকে—নির্ম্মলের মুখে একরাশি গভীর রেখা ফুটিয়া উঠে।

সে বলে—আমার মতন, ছোক্‌রা মতন না?

—না বুড়ো।

—চল', অন্ধকার হয়ে এল।

প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি আসিয়া নির্ম্মল বলে—এটুকু একলা যেতে পারবে?

সে বলে—হাঁ।

পরের দিন দুপুর বেলা।

চালা ছাউনি একটিও নাই, মেলা ভাঙিয়াছে। আছে নির্ম্মলের তাঁবুটা। সাম্‌নে ধাদ্‌কি ফুলের বন, টুনটুনিরা খেলে সেখানে।

নির্ম্মল তাহাই দেখিতেছিল বুঝি। এমন সময় জোনাকী ও তিনটি মেয়ে ফিরিতেছিল।

একজনের কাঁধে একগাট গামছা, এক ঝাঁকা হাতপাখা একজনের মাথায়। জোনাকীর হাতে অনেকগুলি ক্যান্‌ভাস্ ও ভেল্‌ভেটের জুতা।

নির্ম্মল বিনতির সঙ্গে ডাকিল—ও, জোনাকী!

সাম্‌নে আসিয়া সে বলিল—কি বলছেন?

—বলছি, তিনদিন মেলা হ'ল, তুমি ত এ-ধার মাড়ালেও না! এখনও আমার ওপর চটে আছ বুঝি?

জোনাকী একটু হাসিয়া বলিল—আপনার ওপর রাগ করা অন্যায় হয়েছিল, আস্‌তে পারিনি সেই লজ্জাতেই ত।

উত্তরের প্রতি বর্ণটি নির্ম্মলের মনে হয়, নিশীথরাতের মিলন-সঙ্গীত।

সে বলে—সত্যি আর রাগ নেই? একটু পরে একবার আসবে?

—আসব। এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি আমাদের। চললুম।

মৃদু হাসিতে জোনাকীর গালে একটা টোল পড়িল।

আপন অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ম্মলের অনাস্থা আসে। ছিঃ! জোনাকী তাহার উপর একছিটাও রাগ করে নাই একথা ত সে বুঝিতে পারে নাই!

হাসিতে হাসিতে আবার তাহারা পথ চলে। তৃপ্তিতে নির্ম্মলের বুক ভরিয়া উঠে।

মুখে হেজ্‌লীন ঘসিয়া, চুল আঁচড়াইয়া নির্ম্মল জোনাকীর প্রতীক্ষায় বসে। ভাবে—শম্ভুটার চোখ আছে। চমৎকার মেয়ে। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার পরিশ্রম সার্থক।......

তিনটার পর সে আসিল—একা।

বলিল—কি বলবেন আমায়, বলুন।

নির্ম্মল বলে—বোস' না। বাঘ নই, আমি বাঘ নই।

মনোরম হাসিটি জোনাকীর ঠোঁটে মাখান যেন।

সে বলে—আমি তাই বললুম? বললুম, বলুন।

নির্ম্মল বলিল—দোলের মেলায় তুমি এলে না, প্রসাদ নিলে না, যা' অবশিষ্ট আছে নাও। না, না, এ লজ্জা তোমার শোভা পায় না, এমন একটা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছ তুমি।

জোনাকী ধামাটা টানিয়া লয়। অনেকগুলি চিনি-মঠ, কেক্, চকোলেট, ক্ষীরের লুচি তাহাতে।

হাসিয়া নির্ম্মলের দিকে চাহিতে, সেও হাসিল।

ষ্টোভে কেট্‌লি বসান ছিল। চা ঢালিতে ঢালিতে নির্ম্মল বলিল—আমার হাতের চা হয়ত ভাল লাগবে না।

জোনাকী বলে—চা বড় একটা খাইনা ত।

—ছোটই একটা খাও না।

জোনাকী হাসিয়া ফেলিল।

নির্ম্মল বলিল—তোমার মত রঙ যদি হ'ত চায়ের, তা' হ'লে বুঝতুম হাঁ। চা করলুম।

জোনাকীর গাল লাল হয়।

গরম চা'য়ে জোনাকীর ঠোঁট পুড়িতে কতক্ষণ! হাসাহাসি।

চলে। তারপর নির্ম্মল আঙুলে একটু মাখন লাগাইয়া তাহার ঠোঁটে দিতে চায়।

জোনাকী বলিল—চায়ের ছ্যাঁকা লেগেছে একটু বৈ-ত নয়। কিছু দিতে হবে না।

সে বলে—হ্যাঁ, এ থেকেই ধনুষ্টঙ্কার পর্য্যন্ত—

—অত সহজে মেয়ে মানুষ মরে না।

নির্ম্মল বলে—ভুগতে ত পারে? জোর ক'রে চা খাওয়ালুম, ভুগলে দোষটা কার?

উত্তরে সে বলিল—তা' আপনি আঙুল এঁটো করবেন কেন? দিন আমি লাগাচ্ছি।

—বেশ তর্ক আরম্ভ করলে ত! নিজের ঠোঁটে আঙুল যদি দিতে পারি, তোমার ঠোঁটে দিলে এমন এঁটো নিশ্চয়ই হবেনা যে আঙুলটাকে কেটে ফেলতে হবে!

নির্ম্মল মাখন লাগায়। পুরুষের পরশে জোনাকী চোখ বুজাইয়া ফেলে। সুন্দর লাগে তাহার নির্ম্মলের ব্যবহার।

টাকার একটা তোড়া রাখিয়া নির্ম্মল বলিল—তোমার প্রতিষ্ঠানকে দিলুম, জোনাকী।

সে বলিল—রাগ করবেন না। স্বাবলম্বী হব আমাদের উদ্দেশ্য।

—সন্ন্যাসীর সাহায্যটা?

—তিনি আমাদের জিনিষপত্র বেচা কেনার ব্যবস্থা ক'রে দেন শুধু।

নির্ম্মল বলে—আমারই অন্যায়। চেনা নেই, শোনা নেই, আমাকে পর পর ভাবে দেখাই স্বাভাবিক।

—দেখুন, রাগ করছেন!

—কই?—প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে চাওয়ার আমি কে? আমারই ত অন্যায়।

জোনাকী হাসিয়া বলে—টাকা আমাদের সাহায্য খুব করবে না, সত্যি। অন্য সাহায্য দরকার হ'লে বলতে পারি।

নির্ম্মল বলে—বেশ। সকলকে ছবি দেখিয়েছি, তোমায় না দেখালে খুঁত থেকে যায়। দেখতে হবে।

স্নেহ-ভরা কথায় প্রতিবর্ণটি। নির্ম্মলকে ভাল লাগে জোনাকীর।

সঙ্গে সঙ্গে মনে তাহার ভাবনা আসে—তবে না-কি রক্ত-মাংসের ব্যাধি তাহার শরীরে নাই, হইবেও না? পল্লী আর প্রতিষ্ঠানই না-কি তাহার সব? হাঁ, তাই ত। নির্ম্মলকে সে আপন করিয়া পাইলে, সর্ব্বাঙ্গীন লাভ ত প্রতিষ্ঠানের। ছি! পাগলের মত কি যা' তা' কথা! লাভটা কি? নির্ম্মল মাতাল, দীন-দুঃখীর জন্য সে ভাবিবে কেন? ভাবিবেই বা না কেন? তাহাকে ভাল করাও অসম্ভব না-কি?

শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসার একটা দোলা তাহার মনে রহিয়া গেল।

নির্ম্মল 'প্যারিস্কোপ' ও তিন-চার 'এ্যাল্বাম্' ছবি আনিয়া বলিল—অন্যায় আব্দার আরম্ভ করেছি, জোনাকী। তুমি চটছ, না?

অনেক কুণ্ঠা তাহার স্বরে।

হাসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য জোনাকী চোখ বুজাইয়া ফেলে, ও মাথা নাড়িয়া জানায়—'না'।

কাচের সামনে ছবি দিয়া নির্ম্মল বলে—অনেক কষ্টে এ সব সংগ্রহ করেছি। যে-টা বুঝ'তে পারবে না, জিজ্ঞাসা কোরো।

কত ছবি দেখিয়া, সে দুইটি নারী চিত্রের পরিচয় চায় চাঁদবিবি, আর 'জোয়ান্ অফ আর্কে'র।

'প্যারিস্কোপ' দেখা কিছুক্ষণ চলে। প্রত্যেক ছবি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে জোনাকী। মাঝে নির্ম্মল একটি নগ্ন-প্রায় ফরাসী নারীর চিত্র পরাইয়া আশঙ্কিত দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে তাকাইল।

সে কোন প্রতিবাদ করিল না ত! কেবল মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, বুক-পা-এর কাপড় টানিয়া সুসংযত করিল।

নির্ম্মল উৎসাহিত হয়। ভাবে—মেয়েরা স্বভাবতঃই চাপা, তাই সে হাসিটুকু চেপেছে।

এবার নির্ম্মল উলঙ্গ এক সাহেবের ছবি লাগাইল।

জোনাকী ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার মুখে খানিক আতঙ্ক, চোখে ঘৃণাও বুঝি।

সে বলে—ডেকে এনেছেন এই রকম ক'রে অপমান

করতে ? ভদ্রলোক না আপনি! ছি! এই পৌরুষ আপনার, ছি!

নির্ম্মল বলে—এ ছবিটা কেমন ক'রে এ 'এ্যালবামে' এসেছে! ইস্! এই জন্যে কারুকে এ-সব ঘাঁটতে দিতে চাই না। তুমি বাগ—

তর্-তর্ করিয়া জোনাকী পথে নামে।

নির্ম্মলের হাওয়া-প্রাসাদ চুরমার হইয়া যায়। এখন তাহার ধারণা হইল এই—মেয়েটা বেয়াড়া, কাট্‌খোট্টা, রস-গ্রাহিতা একছিটা তাহার নাই।

রাত্রিতে জোনাকীকে সে মনে মনে ঘৃণা করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু শেষে হয় বিপরীত। এই কথাই তাহার মনে ওঠে: সামান্য একটা প্রভাব মেয়ে, এত আদর যত্ন পেয়েও এই অপমানটা ক'রে গেল, চোরের মত বাড়ী ফিরব? কেন?

ফেরার পথে জোনাকীর একবার ভয় হইয়াছিল: প্রতিষ্ঠান নির্ম্মলের কোপে টিঁকিয়া থাকিবে ত?

ভয়টা কিন্তু ক্ষণিক।

পরদিন অপরাহ্ন শেষে দুর্দ্দান্ত একটা জেদ লইয়া নির্ম্মল 'প্রতিষ্ঠানে' আসিল।

দরজাটা ভেজান ছিল। সে ঢুকিয়া দেখে, কেহ নাই। ঘরের আস্‌বাব-পত্রে সে চোখ বুলাইতে থাকে। একটা তাঁত, একপাশে কয়েক হাত শাড়ী বোনা হইয়াছে; একখানা টেবিলে কতকগুলি ঝুড়ি—পাঁউরুটী-বিস্কুটের; একপাশে তক্তাপোষ, দেয়ালে মাত্র তিনটি ছবি—মা-দুর্গা, অহল্যাবাঈ ও রাণী স্বর্ণময়ীর, তাহাদের নীচে দুইটি টাট্‌কা লেখা নাম—'চাঁদবিবি' 'জোয়ান অফ্ আর্ক'।

এই ঘরই জোনাকীর নিশ্চয়। বুলটু বলিয়াছিল, দিদি একা শোয়।

নির্ম্মল এ-দিক ও-দিক পায়চারি করে।

একটা বিড়াল-কোলে ঘরে ঢুকিয়া, জোনাকী অবাক হইয়া বলিল—একটু লজ্জা নেই আপনার? এখানে পর্য্যন্ত এসেছেন, অ-ই অপমানটা ক'রে!

সে উত্তর দিল—পৌরুষ হচ্ছে জোরে। ডেকে নিয়ে গিয়ে জোর-করাটা ঠিক মনে করিনি। তোমার বাড়ীতে এসেছি পৌরুষের পরিচয় দিতে, জোর করতে। এই দেখ—তোমায় সময় দিচ্ছি।

নির্ম্মলের হাতে বড় ছুরি একখানা।

জোনাকী বলে—আপনি ছুরি ধর'তেও জানেন না, আর একা আপনি। আমরা এখানে বাইশজন থাকি। আমাদের জমিদার আপনি, মানে-মানে—

—অপমান কর'তে এসে, অপমানিত হওয়াটা-ও অসম্ভব নয়। তা' জেনেই এসেছি।

নির্ম্মলের সাহস দেখিয়া, জোনাকী একটু আনন্দ বোধ করে কিন্তু, তাহার জোর হইতে জোরতর গলায় একটা কুৎসা-রটনার সঙ্কেত পায়।

খানিক ভাবিয়া সে বলে—অপমান-টা যদি আমি-ই হই, আপনি সুখী হ'য়ে ফির'বেন ত?

দৃঢ়-কণ্ঠে নির্ম্মল জবাব দিল—অপমান ক'রে সুখী না হই জয়ের জন্যে সুখ পাব' বই কি।

—একটু আস্তে কথা বল'বেন? জয়টা কি? আমাকে? যে-টুকু বুদ্ধি আছে মনে হয়েছিল, তাও নেই আপনার।

—কেন বল-দিকি?

—শরীরের জোরে যদি আপনি জেতেন-ই, আমার মন ত আরও মাথা বেঁকিয়ে দাঁড়াবে আপনার বিরুদ্ধে। দেহ-ই আমার সবটা নয় ত। আচ্ছা, আপনি একটু বসুন, আস'ছি আমি। ছুরি মুড়'বেন না যেন।

তক্তাপোষে বসিয়া নির্ম্মল এলোমেলো ভাবে।

ঘরে একজন যুবক আসিয়াছে, নির্ম্মলের চীৎকারে কেহ জানিল কি-না, জোনাকী দেখিয়া ফিরিল।

দুইজনেই পরস্পরের হাতের দিকে চায়।

জোনাকী বলে—কই, আপনার ছুরি?

সে বলে—তোমার ছুরি আন'লে না?

—খালি হাতেই পার'ব আমি। কেড়ে কেমন নিই দেখুন না।

শোন, একটা কথা বল'ব বলেই বসে আছি। মনটা ই তোমার নেই, আর সব আছে, জোনাকী।

নির্ম্মলের কণ্ঠে কাতরতা প্রকাশ পায়।

জোনাকী বলিল—নিজের মনটা-কে কুমতিতে ছেয়ে, আছে, তাই আমার মনের খোঁজ পাননি।

সে বলে—তা' হ'লে আমায় অপমান কর'তে না, ভুল বুঝ'তে না।

—আপনার দেওয়া অপমানটা আপনাকে ফেরৎ দিয়েছি, এই ত! কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া নির্ম্মল বলিল—এ-যুগের সাধারণ বাঙালী-মেয়ের মত তোমাকে ভেবেই ভুল করেছি।

হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা করে—এখন কি ভাব'ছেন?

—আর ভুল হবে না। তুমি অনুপম জোনাকী।

—সঙ্গে সঙ্গেই ত ভুল কর'লেন আবার। লক্ষ লক্ষ মেয়ে আছে আমার মত বাঙলায়। শোনেন ত বঁটি-জাতি নিয়ে মান-বজায় রাখে তারা? ঢাকায় দু'বোনের কথা জানেন ত?

জোনাকীর হাতটা হঠাৎ ধরিয়া নির্ম্মল বলিল—ক্ষমা কোরো, আমি বুঝেছি। তোমার প্রতিষ্ঠানকে—বড়-করবার কথা বাবাকে বল'ব।—চল'লুম।—

সর্ব্বাঙ্গ শির্-শির্ করিয়া উঠে জোনাকীর।

পুরুষের পরাজয়ে হয়ত মেয়েরা আনন্দ পায়, পরাজিতের ব্যথায় কিন্তু ব্যথা বোধ করে।

নির্ম্মলের ছল্-ছল্ দৃষ্টি, তল্-তলে নারী-চিত্তে আকর্ষণ জাগায়।

জোনাকী বলিল—উঠ'বেন না, বসুন।

—না, যাই। আজই বাড়ী ফির'ব। কয়েকটা কাজ আছে।

—মেলার ক'দিন, না আজ সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মনে ছিল না বুঝি কাজের কথা?

নির্ম্মল বলিল—না একলা থাকা, খাবার অসুবিধে হয়।

সে বলে—বাড়ীতেও ত একলা থাকেন? বিয়ে ত আপনার হয়নি, শুনেছি।

তাহার চোখে নির্ম্মল চোখ তোলে—সুকরুণ শ্রদ্ধা-ভরা সে চাহনি। লম্পটের দৃষ্টি গিয়াছে।

জোনাকীর বুঝি আকর্ষণ বাড়ে। বলে—এখানেই নয়—খাজ খেলেন?

—না।

—কেন?

—মান-অপমান-বোধ-টা মেয়েদেরই একচেটে নয়।

—মেয়েরা জানে, পুরুষের অই বোধটা তাদের চেয়ে বেশী। অকারণেও অপমান বোধ করে পুরুষ।

নির্ম্মল বলে—তা' হবে! এটা অকারণ-ই, আমি এত ক'রে মেলার শেষ দু'টো মঠ দিলুম—

—তাই এখানে খাবেন না? কাল সকালে ধামাশুদ্ধু নিয়ে আস'ব। খেয়ে ফেলেন নি ত?

—আমি লোক দিয়ে এখানে পৌছে দো'ব। তুমি যেও না, কয়েক-ঘণ্টার জন্তে মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই।

জোনাকী স্মিত-মুখে বলে—চির-দিনের মায়াই হ'তে পারত, কিন্তু—আপনি সুরা-ভক্ত যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে।

সর্ব্ব-শরীরে নির্ম্মল একটা আলোড়ন অনুভব করে। —জোনাকীর ইঙ্গিতটা বিবাহেরই না? কিন্তু বিবাহের সন্ধানে ত সে মেলা বসায় নাই!—তবে?

জোনাকী জিজ্ঞাসা করে—অপমানের কারণ ঘটেছে বোধ হয়, না?

নির্ম্মল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। বলে—সেরা-সুরা চিরদিন পেলে, সস্তা-সুরায় আপনি বিতৃষ্ণা হ'তে পার'ত, জোনাকী।—

প্রশংসিতার গালে রক্তের রঙ লাগে।

'বসুন, আসছি'—বলিয়া জোনাকী বাহিরে গেল।—

অমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

নিরক্ষতার বিরুদ্ধে অভিযান *

কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম্, এল্, সি

ভারত-গৌরব রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানের শত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আপনারা এই সভা আহ্বান করিয়াছেন। যে মহাপুরুষদের আবির্ভাবে হুগলী জেলা ধন্য হইয়াছে রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পরই রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আবির্ভাব। তাঁহাদের গৌরবে জেলাবাসীগণ গৌরবান্বিত হইলেও এত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাদের স্থান নহে, তাঁহারা বিশ্ববিশ্রুত মহাপুরুষ—সমগ্র ভারত তাঁহাদের মহিমায় মহিমান্বিত। রাজা রামমোহন রায় অজ্ঞানান্ধকার বিদূরণের অগ্রদূতরূপে আবির্ভূত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা চির-কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ—সে ঋণ অপরিশোধনীয়। জ্ঞানবিস্তার কল্পে তাঁহার আজীবন প্রচেষ্টা তাঁহাকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার তিরোধানের শত বর্ষ পরেও যদি আমরা তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া দেশে জ্ঞানবিস্তারে বদ্ধপরিকর হই তবেই তাঁহার উদ্দেশে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে।

প্রবন্ধ লেখক

উপরকার দশজন লইয়া বা দু'লাখ দশলাখ ইংরাজী শিক্ষিত লোক লইয়া দেশ নহে—দেশের মেরুদণ্ড হইতেছে আপামর সাধারণ। তাহাদের নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচন করিতে না পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই।

যে নিজ ভাষায় কোনও রকমে জোড়া তাড়া দিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে পারে censusএ তাহাকেই literate বলিয়া গণ্য করা হয়—কাজেই census report দেখিয়া আমাদের দেশের literateএর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে গেলে আমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইব। literateএর সংখ্যা শতকরা ৫ জন" বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। কেবল নাম স্বাক্ষর করিতে পারে সেরূপ literateদের বাদ দিলে শতকরা ৩ জনের বেশী literate হইবে কি না সন্দেহ। ইহা অপেক্ষা আর কলঙ্কের কথা কিছু নাই।

* কোন্নগর পাঠচক্রের উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিক উৎসব সভায় পঠিত। সভাপতি ছিলেন "বিচিত্রার" সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

গত পৌষের "প্রবাসী" ১৯২১ ও ১৯৩১ এই দুই সনের census report হইতে অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন বিগত দশ বৎসরের মধ্যে বাংলার নিরক্ষরদের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে। "১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে ব্রিটিশ শাসিত বাংলা দেশের লোকসংখ্যা ৫,১০,৮৭,৩৩৮। ইহার মধ্যে পাঁচ বৎসর বা তাহার অধিক বয়সের মোট ৪৭,৪৩,২৮১ জন লিখিতে পড়িতে জানে, বাকী ৪,৬৩,৪৪,০৫৭ জন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। ইহার

মস্কো লাইব্রেরী

মধ্যে ৫ বৎসরের কম বয়সের শিশু কিছু আছে, যাহাদের লিখন পঠনক্ষম হইবার কথা নহে। ১৯২১ সালের অর্থাৎ দশ বৎসরের আগেকার সেন্সস অনুসারে ব্রিটিশ শাসিত বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ৪,৭৫,৯২,৪৬২ এবং লিখন পঠনক্ষমদের সংখ্যা ছিল ৪৩,২২,৬৪৫। সুতরাং তখন নিরক্ষরদের সংখ্যা ছিল ৪,৩২,৬৯,৮১৭। ইহার দশ বৎসর পরে নিরক্ষরদের সংখ্যা হইয়াছে ৪,৬৩,৪৪,০৫৭। অতএব দশবৎসরে ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গে ৩০ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৪০ জন নিরক্ষর লোক বাড়িয়াছে। ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক।

আমরা যে সব পাশ্চাত্য দেশকে সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি সে সব দেশও আমাদেরই মত এককালে নিরক্ষর ছিল। গণশিক্ষা বা mass education সে সব দেশে আরম্ভ হইয়াছে বিগত উনবিংশ শতাব্দী হইতে। দাস ব্যবসা উঠাইয়া দেওয়ার পর হইতে গণ-শিক্ষার দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জনহিত আন্দোলনের (Humanitarian movement) এর সূত্রপাত হয় সেই সময় হইতে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র আন্দোলন (democratic movement) উদ্ভূত হয়। এখন শ্রমশিল্প আন্দোলনের যুগ (industrial movement) আসিয়াছে। এখন নিরক্ষরতাকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা দিকে দিকে চলিতেছে।

Prussiaতে গণশিক্ষা বাণী প্রথম প্রচারিত হয়,—সে আজ বিরাশী বৎসর পূর্ব্বে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জানুয়ারী রাজকীয় আদেশে সেখানে বিস্তৃতভাবে গণশিক্ষা (mass education) প্রথম আরম্ভ হয়।

তারপর ফরাসী দেশ। ফরাসী দেশ স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীর বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইলেও বড় কড়া নিয়ম কানুনের ভিতর দিয়া সেখানে জনশিক্ষার ব্যবস্থা ঠিক একইভাবে এখনও চলিয়া আসিতেছে, সেখানে শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের আদৌ স্বাধীনতা নাই। পুস্তক নির্ব্বাচন

হইতে আরম্ভ করিয়া পঠনীয় বিষয় নির্ব্বাচন এমন কি কোন্ শ্রেণীতে কোন্ দিন পাঠ্য পুস্তকের কোন অংশ শিক্ষা দেওয়া হইবে, শিক্ষা বিভাগ তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এরূপ ধরা বাঁধা শিক্ষার ব্যবস্থা জগতে আর কোথাও নাই। প্যারিতে যান, বুলোনে যান, মার্শেলীতে যান—সকল স্থানের বিদ্যালয়ে দেখিবেন একই পড়া পড়ান হইতেছে—সমগ্র দেশের শিক্ষার গতি একই পদবিক্ষেপে চলিয়াছে।

আমেরিকার মধ্যে Canada'র গণশিক্ষার ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য আছে। Quebec ছাড়া আর সকল বিদ্যালয়ে ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলকেই গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত elementary স্কুলে ছয় বৎসরকাল পড়িতেই হইবে; তাহা সকলের পক্ষে বাধ্যকর। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে শিক্ষা বাধ্যকর; তবে সব federal stateএ বয়স একরূপ নহে,—কোথাও ১২, কোথাও ১৪, কোথাও ১৬, কোথাও ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাধ্যকর। যুক্তরাজ্যে elementary educationএর পরেও অন্ততঃ ১৮ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত secondary education বাধ্যকর ও free। বিনা খরচায় সকলেই শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া থাকে। তবে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা শিক্ষার্থী ইচ্ছামত যে কোন বিভাগে পাইতে পারে—শিল্পশিক্ষা বা অন্য কোন রকম হাতে কলমে কার্য্যকরী শিক্ষা (vocational or industrial) লাভ করিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই। আমেরিকার public school হইতে ধর্ম্ম একেবারে বর্জ্জিত। ডিগ্রীর standard য়ুরোপ অপেক্ষা অনেক অংশে নিম্নস্থানীয়।

মস্কো লাইব্রেরীর প্রধান পাঠ কক্ষ

বহুকাল ইংলণ্ড গণশিক্ষায় সভ্য-জগতে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যকর করা হয় এবং গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেও শিক্ষা অবৈতনিক করিতে আরও বিশ বৎসর লাগে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে (Mr. Balfour) মিঃ ব্যালফোরের মন্ত্রিত্বকালে গণ-শিক্ষা দস্তুর মত বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যা শিক্ষা বাধ্যকর করা হয়, এমন কি দৈহিক ও মানসিক বিকলাঙ্গদেরও (defectives) জন্য শিক্ষার ভালরূপ ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষা বিষয়ে কোনরূপ ওজরে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় রাখা হয় না। গবর্ণমেণ্টের ব্য

বিকলাঙ্গদের বিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়।

য়ুরোপের মধ্যে ডেনমার্ক রাজ্যের Folk Schule এর শিক্ষার ব্যবস্থা অভিনব। ফোক্ স্কুল এবং সাধারণ পাঠাগারের বিশেষ পার্থক্য নাই। সাধারণ পুস্তকাগারে কেবল লাইব্রেরীয়ান থাকে; এখানে শিক্ষক বা অধ্যাপক থাকেন। শিক্ষার্থীরা ইচ্ছামত পুস্তক পড়ে, যেখানে আটকায় বা বুঝিতে না পারে সেই সেই স্থান শিক্ষক বা অধ্যাপকের নিকট বুঝাইয়া লয়। সেখানে পাঠ্যের শ্রেণী বিভাগ নাই, পরীক্ষা নাই, ডিগ্রীর জন্য আকুলতা নাই।

বালক বালিকাদের পাঠ-কক্ষ

ঘরে মাতার নিকট অক্ষর পরিচয় ও প্রাথমিক শিক্ষার পর শিক্ষার্থীরা এই সব ফোক্ স্কুলে (Folk Schule) আসিয়া তাহাদের ইচ্ছামত জ্ঞান আহরণ করে। ডেনমার্কে স্বল্পব্যয়ে গণশিক্ষার প্রচেষ্টা বস্তুতঃই অভিনব।

আধুনিক সভ্যজগতের শিক্ষার ধারা কিরূপ চলিতেছে তাহা বলিবার জন্য আজ আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালীর অতীত গৌরবের কথা আজ আমি শুনাইব না। নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলা প্রভৃতির অতীত গৌরব-কথা শ্রুতিসুখকর তো বটেই তা ছাড়া মনে উদ্দীপনার উদ্রেক করে, অনুপ্রেরণা আনিয়া দেয়। আমি আজ তাহাদের যশো-গাথা গাহিব না। নিতান্ত আধুনিক কালের কথা বলিব। য়ুরোপের মহাযুদ্ধের পর বিগত ১০।১৫ বৎসর ধরিয়া নবজাগরিত কয়েকটি জাতি নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যে মহাযুদ্ধ বাধাইয়াছেন আমি তাহার কথা বলিবার জন্য আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে নিরক্ষরতা বিদূরণকল্পে কলিকাতায় একটি সভা আহূত হইয়াছিল। স্কুল কলেজের ছাত্রদের সাহায্যে নিরক্ষরতার বিদূরণের প্রচেষ্টা ছিল সভার উদ্দেশ্য। যথাযথভাবে পরিচালিত হইলে সভার উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হওয়া বিচিত্র নহে। য়ুরোপের নানাস্থানে বিশেষতঃ সোভিয়েট রাশিয়ায় এই ভাবের প্রচেষ্টা বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছে। তাহার একটু বিস্তৃত পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। পনর বৎসর পূর্ব্বে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর, বিপ্লবের পর হইতে নব্য রাসিয়া গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এখন যাঁহারা রাশিয়ার ভাগ্যবিধাতা সেই সময় হইতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভার তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়ে। অনেক বাঁধা বিপত্তি তাঁহাদের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই নূতন সাধারণ তন্ত্রটীকে নষ্ট করিবার জন্য নানাদিক হইতে ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল। বহির্বাণিজ্য বন্ধ ও অন্তর্বিপ্লব ঘটাইবার জন্য শক্তিশালী ধনিক পরিচালিত রাজ্যগুলি সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। এত প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও তাঁহারা নিরক্ষরতা বিদূরণে ও শিক্ষা বিস্তারকল্পে যে বিপুল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে বস্তুতঃই বিস্মিত হইতে হয়। রাশিয়ার সম্রাট (czar) ছিলেন জগতের মধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূভাগের অধীশ্বর—এত বড় একটা সাম্রাজ্য জনতন্ত্রের শাসনে আসিয়া পড়িল। জারের (czar) হাত হইতে শাসন স্খলিত হওয়ার পর Finland, Esthonia, Latavia ও Luthania, Poland প্রভৃতি কয়েকটি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি রাশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক সত্তা রক্ষা করে।

সাম্রাজ্যের বাকী থাকিল রাশিয়া, উক্রেন, হোয়াইট রাশিয়া, ট্রান্স ককেসিয়া আজার বাইজান, জর্জ্জিয়া ও আর্মেনিয়া। এই সব প্রদেশ পৃথক সত্তা ও শাসনতন্ত্র বজায় রাখিয়া এক সমষ্টিগত সাধারণ তন্ত্রের সহিত যুক্ত থাকিল—সেই সমষ্টির নামকরণ হইল The Union of

পুস্তক তালিকা কমিটির চেয়ারম্যান্
পরলোকগত A. I. KALISHEVSKY

Socialist Soviet Republics। এতগুলো জাতি এক কথায় মিলিত হয় নাই। রাজ্যবিপ্লবের ফলে যাহা হয়—এক্ষেত্রেও তার ত্রুটি হয় নাই। এতকাল বনিক সম্প্রদায় তাহাদের দাবাইয়া রাখিয়াছিল, বিপ্লবীদের যত আক্রোশ পড়িল তাহাদের উপর। লাঞ্ছনার ভয়ে তাহাদের অনেকেই সরিয়া পড়িয়াছিল—পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিল বহুমূল্য শিল্প-সম্ভার-পূর্ণ তাহাদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের চিত্রকলা, নিপুণ শিল্পীর অঙ্কিত মর্ম্মর মূর্ত্তি, আরও কত অমূল্য জিনিস। বিজয়ী বিপ্লবীরা সে সব ভাঙিয়া চুরমার করিয়া পদদলিত করিতে লাগিল। শত শত বর্ষের সঞ্চিত শিল্প সম্পদ ধূলাবলুণ্ঠিত হইল, অবাধে লুঠতরাজ চলিতে লাগিল। আর বুঝি কিছু রক্ষা পায় না। এমন সময় বিপ্লবী নেতাদের কাছ হইতে কড়া হুকুম আসিল আর্টের জিনিস যেন কোনও মতে নষ্ট করা না হয়। এসব রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন কে জানেন? শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা Luna Charsky। তিনি যেমন শুনিলেন Kremlinএ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সব Artএর জিনিষ সঞ্চয় করা হইয়াছিল বিপ্লবীরা সে সব ধ্বংস করিতেছে অমনি তিনি ছুটিয়া গিয়া সজল নয়নে Leninকে বলিলেন, এই নিন আমার পদত্যাগ-পত্র। আমি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা থাকিতে এ বীভৎস ব্যাপার দেখিতে পারিব না। লেনিন বলিলেন, আপনাকে পদত্যাগ করিতে হইবে না, আমি কড়া হুকুম পাঠাইতেছি। এসব রক্ষা করিবার ভার আপনার উপর দিলাম। তখনই অধ্যাপক ও ছাত্রেরা দল বাঁধিয়া গিয়া ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ হইতে যাহা কিছু রক্ষা করিবার যোগ্য সব উদ্ধার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজ্য বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছিল। বিপ্লবীরা ধর্ম্মমন্দিরকেও রেহাই দেয় নাই, তবে সেখানকার সঞ্চিত আর্টের জিনিষ বহন করিয়া আনিয়া নিরাপদ স্থানে রাখা হইতে লাগিল। বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মহামারীর প্রবল প্রকোপ, ঘরে ঘরে টাইফয়েড রোগী, রেল লাইন তছনছ হইয়া গিয়াছে, সে সবে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অধ্যাপকেরা ছেলেদের সহিত দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আর্টের সামগ্রী বাঁচাইবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কত যে অমূল্য গ্রন্থ, চিত্র ও ভাস্কর্য্যের দ্রব্য উদ্ধার হইল তাহার সংখ্যা করা যায় না। সামান্য গৃহস্থের ঘর হইতেও কত অমূল্য আর্টের জিনিষ যাহা অবজ্ঞায় অনাদরে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, সংগ্রহ হইতে লাগিল। অবজ্ঞাত লোক—সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীত সমাদর পাইতে আরম্ভ করিল।

এই সব জিনিস সংগ্রহ করিয়া কৃপণের ধনের মতো আবদ্ধ রাখা হয় নাই। সে সব সাজাইয়া গুছাইয়া লোক-শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে রক্ষা করা হইয়াছে। সাহিত্য বিজ্ঞান চিত্রকলা সঙ্গীত এ সবেরই উপাদান এই সব মিউজিয়ামে পাইবেন। রাশিয়ার সাধারণ লোকের অবস্থা আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরই সমতুল্য ছিল, নব নব প্রণালীতে লোকশিক্ষার গুণে দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।
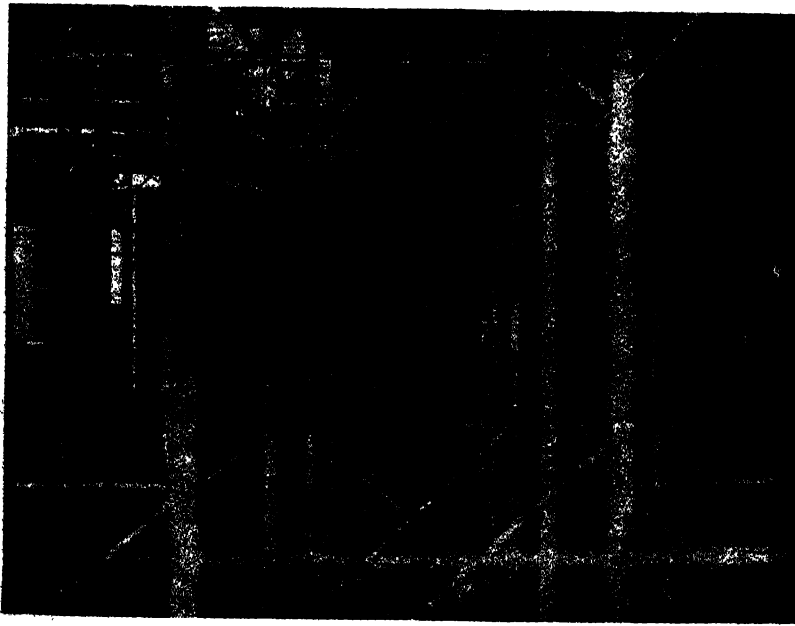
নূতন ষ্টেক্ রুম্

Alexandriaর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার যে যুগে ধ্বংস হইয়াছিল তখনকার দিনে তাহা মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু আধুনিক যুগে সেরূপ ঘটনা অমার্জ্জনীয়। খুব বেশীদিনের কথা নয়। Boxer বিপ্লব উপলক্ষে চীনের [illegible] পিকিনের বসন্তপ্রাসাদ যখন য়ুরোপের সভ্যতাভিমানী সাম্রাজ্যবাদীরা ধ্বংস করে সেই সময়ে [illegible] ভাণ্ডারে যুগ যুগ ধরিয়া যে সব অমূল্য শিল্প-[illegible] হইয়াছিল সব নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহার [illegible] নাই। সে রকমের জিনিষ জগতে দ্বিতীয় আর নাই, আর কখনও সে রকম হইতে পারিবে কি না তাহাও সন্দেহ। Luna Charskeyর মত শিল্প-রসিক ও স্বদেশপ্রেমিক না থাকিলে রাশিয়াতেও চীনের দশা ঘটিত, দেশের এত দ্রুত উন্নতি হইত না, কত পিছাইয়া যাইত তাহা বলা যায় না। এখনও Luna Charsky সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা, গ্রন্থাগার মিউজিয়াম্, শিল্পকলা ভবন, বিজ্ঞান মন্দির, রঙ্গালয়, সঙ্গীতালয়, সিনেমাগৃহ প্রভৃতি শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিষ্ঠান তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে।

Leninএর বিধবা পত্নী Krupskaya দেশের শিক্ষা বিস্তারকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। Leninএর মৃত্যুর পর Congress of Soviets সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন "Do not pay external respect to Lenin's personality. Do not build statues in his memory. He cared for none of these things in his life. Remember there is much poverty and ruin in this country. If you want to honour the name of Lenin, build children's homes, Kindergartens, Schools, libraries, ambulatories, hospitals, homes for cripples and other defectives." অর্থাৎ লেনিনের ব্যক্তিত্বের উপর বাহ্যিক সম্মান দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন না। জীবিতকালে তিনি এসব গ্রাহ্য করিতেন না। দেশে দারিদ্র্য ও ধ্বংসের কথা স্মরণ রাখিবেন। যদি

লেনিনের নামে সম্মান দেখাইতে চান তাহা হইলে, শিশুরক্ষার আশ্রম, কিণ্ডারগার্টেন, স্কুল, গ্রন্থাগার, রোগীবাহক শকট, হাঁসপাতাল, খঞ্জ ও বিকলাঙ্গের জন্য আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠা করুন।

নূতন ব্যবস্থার পূর্ব্বেকার অবস্থা

লেনিন্-পত্নীর নির্দ্দেশমত তাঁহারা কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। সোবিয়েট শাসনের পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মস্কো সহরে লেনিনের নামে একটি প্রকাণ্ড পাঠাগার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। গত নভেম্বরে তাহার দ্বারোদ্ঘাটনের দিন ছিল। গ্রন্থাগারটি কিরূপ হইবে Library journal-এ তাহা এইরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে:—The size of the library will be 250,000 C U. M. and it will have space for eight million volumes. There will be seven large ...ling rooms to accommo date 2000 ...ns, twenty four scientific research rooms, an institute for library research, a training school, and a printing shop and binding. The great square in front of the library will be paved with granite. Wide marble stairs will lead to the main reading room, and all corridors and reading rooms will be faced with real and artificial marble. V. L. Nevski is the Director of the library. It has now four million volumes and a large duplicate file.

আমি সোভিয়েট রাশিয়ার কথা একটু বিস্তৃত করিয়া বলিতেছি বলিয়া আপনারা মনে করিবেন না আমি তাহাদের সকল কার্য্যের অনুমোদন করি। ইতালীর ফ্যাসিষ্টদের মতো সমষ্টিকে বড় করিতে গিয়া ব্যষ্টির উপর তাহাদের নিদ... ব্যবহার বস্তুতঃ পীড়াদায়ক। দুর্ব্বল করি...

বইগুলি ষ্ট্যাকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে

শিল্প-সঙ্ক

সমষ্টি কি করিয়া প্রবল হইতে পারে তাহাতো আমি বুঝিতে পারি না। তবে তাহারা শিক্ষার যে ধারা অবলম্বন করিয়াছে তাহার প্রশংসা বার বার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। অন্যান্য সকল বিষয় মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে মিউজিয়াম, লাইব্রেরী, সিনেমা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া কঠোর বিষয়ও অনায়াসে আয়ত্ব করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতি সাধারণ জনগণ মধ্যে জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য সহজে বোধগম্য করিবার এরূপ ভাবের প্রচেষ্টা আর কোথাও দেখা যায় না। শিক্ষার আরও একটা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে—দেশ ভ্রমণ। পুঁথিগত ধরাবাঁধা বিদ্যার সহিত প্রকৃতির পরিচয় দেহ ও মনের উন্নতি সাধনে কম সহায়ক নহে। এ ক্ষেন মণিকাঞ্চনের যোগ। আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া তীর্থস্থান। পূর্ব্বে পদব্রজে তীর্থে যাইতে হইত। পথকষ্ট বিপদ আপদ সত্ত্বেও তাহাতে শিক্ষার উপকরণ যথেষ্ট পাওয়া যাইত। ইহাও কতকটা সেই ধরণের শিক্ষা—তবে প্রণালীটা আধুনিক।

লেনিন্ ষ্টেট্ লাইব্রেরী—এক্জিবিশন্ হল্
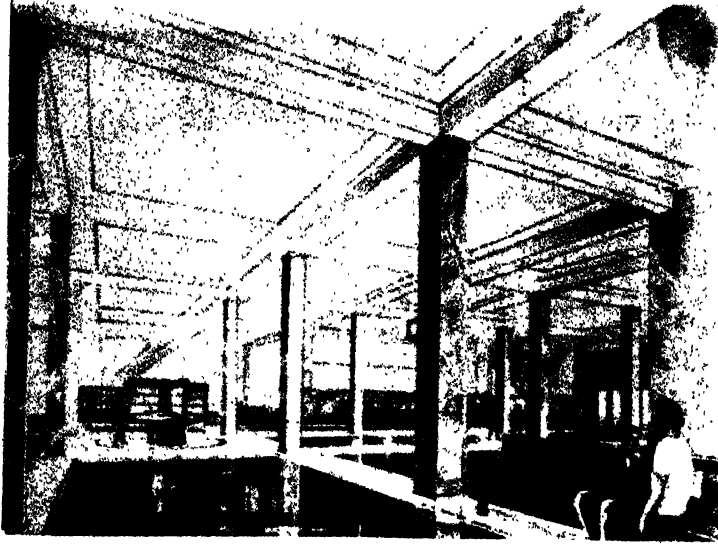
সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট লোকশিক্ষার জন্য কি বিরাট আয়োজনই না করিয়াছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল সে পাঁচ বৎসর সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাহারা লক্ষ লক্ষ লোকের নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচন করিয়া নিশ্চিন্ত হয় নাই তাহাদের মনুষ্যত্ব উন্মেষণের পথ খুলিয়া দিয়াছে। শিক্ষাবিষয়ে তাহাদের উদারতা অসীম; কোনও গণ্ডীতে তাহা সীমাবদ্ধ নয়। সুবিশাল রাশিয়া রাজ্যে কত বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী আছে তাহাদের সকলের শিক্ষোন্নতির জন্য সমান প্রচেষ্টা চলিয়াছে।

অল্ ইউনিয়ান্ লেনিন মেমোরিয়াল্ লাইব্রেরী

তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও অভিনব। নিরক্ষরতা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে চোখে দেখিয়া শিক্ষা লাভের নানারূপ
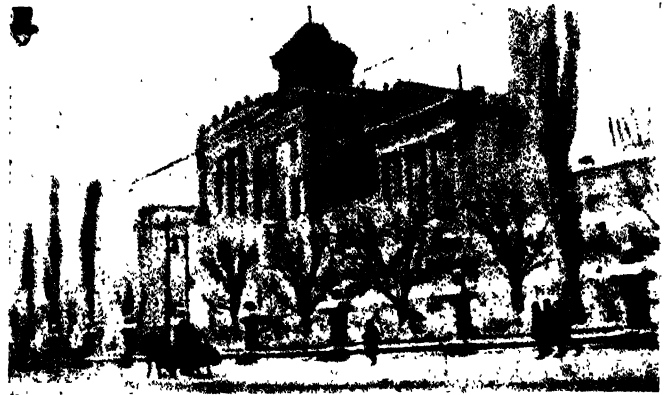
জনশিক্ষায় যাঁহাদের অনুরাগ আছে তাঁহারা দেশভ্রমণের জন্য বহুবিধ সুযোগও সুবিধা করিয়া দিতেছেন। পথে মাঝে মাঝে নানারূপ শিক্ষাদানের জন্য নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান স্থাপন

করা হইয়াছে—শিক্ষার্থী পথিকদের আহার নিদ্রার ও জ্ঞাতব্য বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য ব্যবস্থা আছে। ধরাবাঁধা পুঁথিগত বিদ্যার বাহিরে আসিয়া সচল মন শিক্ষণীয় বিষয়কে সহজেই আয়ত্ত করিতে পারে। প্রত্যক্ষ অনুভব মনে একটি স্থায়ী ছাপ্ বসাইয়া দেয়। যেখানে যে বিশেষ বিষয়ের শিক্ষার উপযুক্ত স্থান সেখানে সেই ধরণের পান্থশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। যে প্রদেশ নৃতত্ত্ব শিক্ষার উপযোগী সেখানকার জন্য নৃতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক আছেন। ককেশীয়

রাশিয়ায় backward বা অনুন্নত শ্রেণীর সংখ্যা ছিল আমাদের দেশেরই মত; কিন্তু শিক্ষার সুব্যবস্থায় তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ নগণ্য হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের শিক্ষার জন্য কিরূপ টাকা ব্যয় করা হইতেছে ৫ বৎসর পূর্ব্বের বাজেট হইতে তাহার পরিমাণ বলিতেছি। য়ুক্রেন প্রদেশের জন্য ৪০ কোটী ৩০ লক্ষ রুবল ব্যয় করা হইয়াছে। আমাদের ২।৷৹ টাকায় এক রুব্‌ল্ হয়। সেই হিসাবে ব্যয় একশত কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা। অতি ককেশীয় প্রদেশে
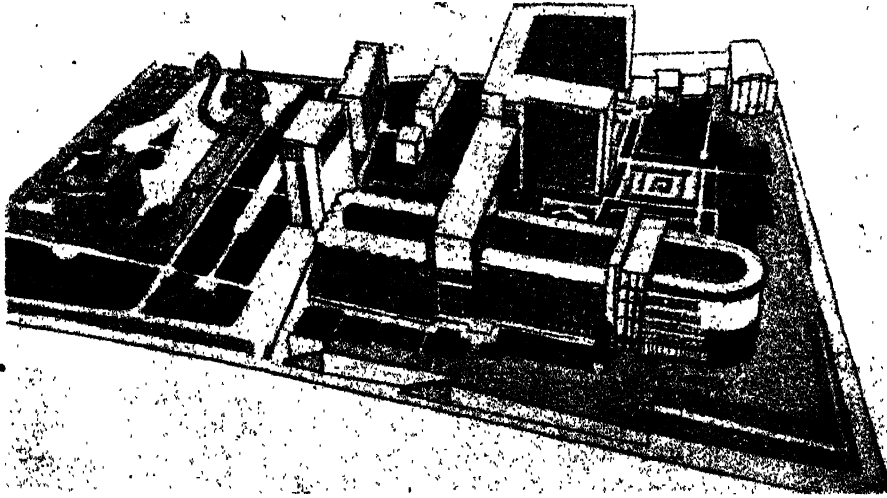
মস্কো লাইব্রেরীর মডেল্—ভবিষ্য সম্প্রসারণ প্রদর্শিত

প্রভৃতি প্রদেশে ভূতত্ত্বের উপদেশকের ব্যবস্থা আছে। দেশ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় বিষয়টি গুরুতর হইলেও শিক্ষার্থী সহজেই তাহা আয়ত্ত করিতে পারে।

এদেশে বহু যাযাবর (nomads) পরিবার আছে। তাহাদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইঁদারার কাছে কাছে বহু পরিবার একত্রে বাস করিয়া থাকে সেই সকল স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। তাহাদের শিক্ষার জন্য সংবাদ পত্রও বাহির করা হয়।

১৩ কোটী ৪০ লক্ষ রুব্‌ল্ অর্থাৎ সাড়ে তেত্রিশ কোটী টাকা উজবেকিস্থানে ৯ কোটী ৭০ লক্ষ রুব্‌ল্ অর্থাৎ প্রায় চব্বিশ কোটী টাকা তুর্কমেনিস্থানে ২ কোটী ৯ লক্ষ রুবল্ অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ কোটী টাকা। আর আমাদের বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকল্পে দুই কোটী টাকা মাথা খুঁড়িয়াও মিলিতেছে না। ইহা অপেক্ষা আর দুর্দ্দশার কথা কি আছে?

সোভিয়েট রাশিয়ায় বহুস্থানে নিরক্ষরতা একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। যদি আপনারা ধৈর্য্য ধরিয়া শুনেন

তবে তাঁহার একটু বিস্তৃত বিবরণ শুনাইতে পারি। কেন শুনাইতে চাই তাহাও বলি। রাশিয়ায় বিশেষতঃ রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশে নিরক্ষরতা আমাদের অপেক্ষা কম ছিল না। কিরূপ কার্য্যপ্রণালীতে তাহা দূর হইতেছে ইহা হইতে তাহার কতকটা আভাস পাইবেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নিরক্ষরতা বিদূরণ সমিতি (Society for combating Illiteracy) রাশিয়ায় স্থাপিত হয়। সভার উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে রাশিয়াতে কোন লোক অশিক্ষিত না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। উত্তর ককেশিয়ান প্রদেশে ১৯২৯-৩০ সালে ৯,০০,০০০ লক্ষ লোককে অক্ষর পরিচয় করাইয়া লেখাপড়া শিখান হয়। ১৯৩০-৩১ সালে ১১,৫০,০০০ লোককে লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেন্ট্রাল ব্ল্যাক সয়েল (Central Black Soil Region) প্রদেশ হইতে নিরক্ষরতা একেবারে দূর করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কুরস্ক (Krusk) অরিয়েল (Oriel) এবং উসমান (Usman) জেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উরাল (Urals) প্রদেশের অনেকগুলি জেলা একেবারে নিরক্ষরতা [illegible]। নিরক্ষরতা বিদূরণের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বস্তুতঃই শিক্ষণীয়। শিক্ষা-বিস্তার কল্পে (Oriel) ওরিয়াল প্রদেশে ১০,০০০ শিক্ষা-সৈনিক প্রেরণ করা হয়। স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর বালকদের লইয়া এই সেনা গঠিত হয়। শিক্ষকগণ সেনাপতিরূপে সৈনিকগণের শিক্ষাদিবার প্রণালী সম্বন্ধে সপ্তাহকাল উপদেশ দেন। প্রতি গ্রামে গ্রামে শিক্ষাসৈনিকগণকে প্রেরণ করা হয়। রাজনৈতিক প্রতিনিধি অগ্রদূত রূপে শিক্ষাসৈনিক আগমনের বার্ত্তা জ্ঞাপন ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থাই পূর্ব্বাহ্নে করিয়া রাখেন, তৎপরে পল্লীগ্রামে সভা আহ্বান করিয়া শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতগণকে পৃথক করেন এবং সকলের লেখাপড়া শিক্ষা বাধ্যকর তাহা জানাইয়া দেন। তারপর শিক্ষাসৈনিকের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমেই অক্ষর পরিচয় করান হয়, তাহার পর যোগ্যতানুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ করা হয়।

সাধারণের পাঠাগার—LIASKOVETZ

গ্রামের প্রধান প্রধান স্থানে দেওয়ালে খবরের কাগজ আঁটিয়া সন্ধ্যাকালে গ্রামের লোকদিগকে ডাকিয়া তাহা পড়িয়া শুনান হয় ও তাহাদের মধ্যে পড়িবার আগ্রহ উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। কৃষক রমণীগণের পাঠের সময়ে তাহাদের শিশুসন্তানদের একটি পৃথক বাড়ীতে উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। অর্দ্ধশিক্ষিতের জন্য শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা করা হয়। কৃষি এবং রাজনীতি সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

সমগ্র রাশিয়াকে পাঁচ বৎসরের মধ্যে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার বিপুল প্রচেষ্টা চলিতেছে সেইজন্য সর্ব্বত্র লাইব্রেরী

প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং চলন্ত লাইব্রেরীও প্রবর্ত্তিত করা হইতেছে। রাশিয়ার নবগঠিত লাইব্রেরীগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে পাঠক আকর্ষণ, পাঠেচ্ছাবর্দ্ধন এবং মানবজীবনের উপর পুস্তকের প্রভাব বিস্তার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ায় শিক্ষার ধারায় আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই সময় লাইব্রেরীর কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ জন্য মিঃ এন্ রুবাকিন (N. Rubakin) বলেন, "এখন হইতে লাইব্রেরীতে পুস্তকের দোকানের মত কেবল মাত্র বই সাজাইয়া রাখিলে এবং লাইব্রেরীয়ান কলের পুতুলের মত বই যোগাইয়া দিলে চলিবে না। এই লাইব্রেরীগুলিকে এখন হইতে বিজ্ঞান। সমাজ রাজনীতি প্রভৃতির শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে। কেবল পুস্তকপ্রীতি নহে, পাঠশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। লাইব্রেরীয়ানগণ যেন অনুধাবন করেন যে কেবল পুস্তক পাঠ লাইব্রেরীর মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, মনুষ্যত্বের দিক দিয়া পুস্তকের মূল্য বুঝিতে হইবে—জগতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু সুন্দর এবং যাহা অবিকৃত সত্য তাহাই লাভ করা চরম লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক।"

আমেরিকার লাইব্রেরীর কার্য্যপদ্ধতি এল্, হেবকিন (L. Havkin) মস্কৌ সহরে সেনিয়াভাস্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে (Shaniavasky University) এবং রাশিয়ান লাইব্রেরী সোসাইটিতে প্রথম প্রচার করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাজ-বিপ্লবের পর আমেরিকার লাইব্রেরীর কার্য্য প্রণালী রাশিয়ায় গৃহীত হয়। তখন হইতে রাশিয়ায় লাইব্রেরী আন্দোলনের একটি বিপুল সাড়া পড়িয়া যায়। লেনিন (Lenin) স্বয়ং লাইব্রেরার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি লাইব্রেরীগুলিকে রাজনৈতিক ও সমাজ-নৈতিক এবং দেশের কল্যাণকর সর্ব্ববিধ কার্য্যের কেন্দ্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে কৃতসংকল্প হন। সোভিয়েট সাধারণ তন্ত্র (Soviet Republics) আপামর সাধারণকে লাইব্রেরীর দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য অবহিত হন—নূতন নূতন লোক নবশক্তিতে উদ্দীপিত হইয়া লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে একরূপ মাতিয়া উঠেন। অন্ধকারময় খনির শ্রমিক হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনৈতিক বক্তাগণ লাইব্রেরীগুলিকে এক নবীন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করেন।
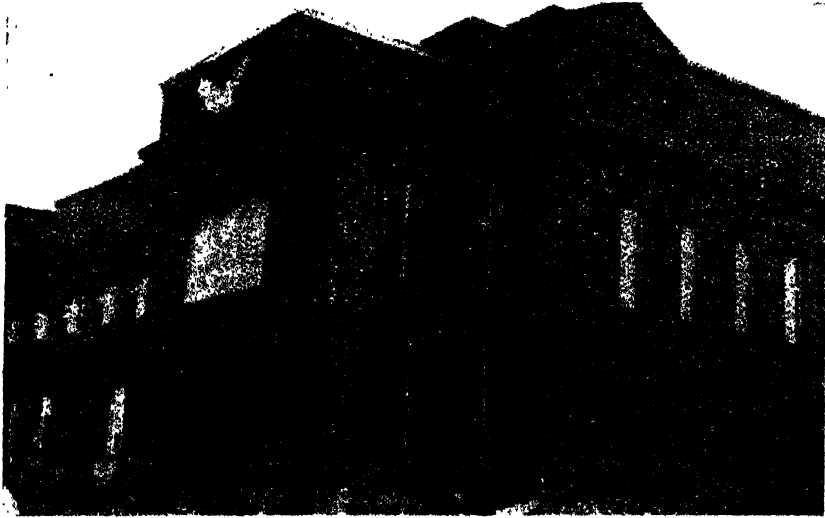
সাধারণের পাঠাগার—সামোকোর

দেশের জন্য যুদ্ধে যাহারা প্রাণ দিয়াছিল তাহাদের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ এই লাইব্রেরীটি স্থাপিত হইয়াছে।

তাহাতে লাইব্রেরীগুলি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানের আকার ধারণ

করে। সেই সময় হইতে লাইব্রেরী এবং ক্লাব অচ্ছেদ্য হইয়া উঠে। শ্রোতাদের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে পুস্তকপাঠ, জনশিক্ষা-কল্পে চিত্তরঞ্জক অনুষ্ঠান লাইব্রেরীর অঙ্গীভূত করা হয়। রাশিয়ার কমিসেরিয়েট অব এডুকেশন নির্দ্দেশ করেন যে "পাঠকের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিও না, তাহার নিকট যাও, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর, তাহাকে ডাকিয়া পড়িতে বসাও। পাঠক ধরিবার জন্য সন্ধ্যাকালে সমস্বরে আবৃত্তির ব্যবস্থা কর, রাস্তায় ভেঁপু বাজাইয়া নূতন নূতন

সাধারণের পাঠাগার—সামকোর (অন্তদিকের দৃশ্য)

পুস্তকের নাম ঘোষণা কর, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুস্তক প্রচার কর, পাঠ প্রণালী শিক্ষা দাও, আত্মশিক্ষার পদ্ধতি প্রভৃতি যে উপায়ে পার জাহির কর।" স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবল শিক্ষিত পাঠকের জন্য পুস্তক নহে। যাহাদের অক্ষর পরিচয় আছে বা আদৌ নাই উচ্চৈস্বরে পুস্তক পাঠ দ্বারা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে হইবে। শ্রমবিভাগ অনুসারে যাহাদের পড়ার অভ্যাস নাই তাহাদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য পল্লী এবং শ্রমিক লাইব্রেরী, কুটীর লাইব্রেরী এবং চলন্ত লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। বড় বড় মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী কেবল শিক্ষিত শ্রমিক ছাত্র এবং সোভিয়েটের জ্ঞানবান লোকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

বর্ত্তমান সময়ে সকল শ্রেণীর লোকের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তক সরবরাহ সম্ভব না হইলেও সোভিয়েট লাইব্রেরী এই কয়েকটি কার্য্যে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছে—সহরের শ্রমিক, যান বাহনের কর্ম্মী প্রভৃতির জ্ঞানোন্মেষণ দ্বারা রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি করা, রেডসৈন্যের জন্য পুস্তক সরবরাহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা, রাজনৈতিক এবং সাধারণ বিষয়ে কৃষকের অজ্ঞতা বিদূরণ, নবগঠিত সোভিয়েটের শ্রীবৃদ্ধি উপযোগী শিক্ষা দেওয়া।
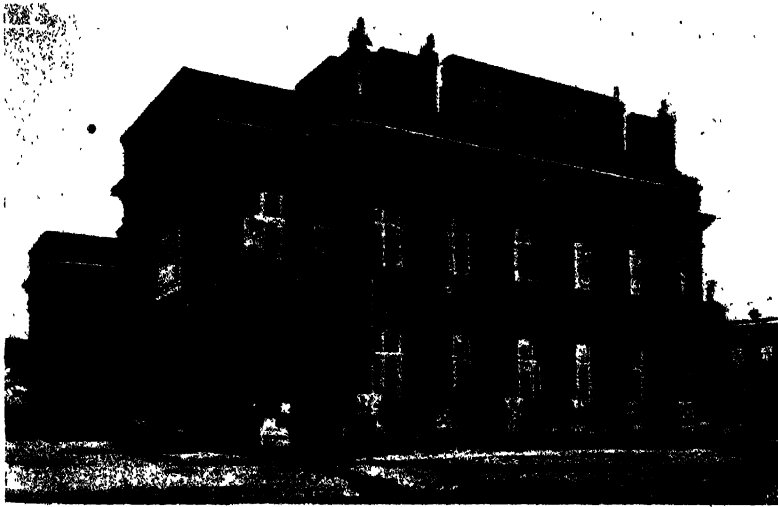
সোভিয়েট লাইব্রেরী অন্য সামাজিক বিভাগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিয়া থাকে। লাইব্রেরী এবং স্কুল, লাইব্রেরী এবং ক্লাব, লাইব্রেরী এবং ব্যবসা সমিতি, লাইব্রেরী এবং সমবায় সমিতি, লাইব্রেরী এবং ব্যবসা বাণিজ্য, লাইব্রেরী এবং সাধারণের স্বাস্থ্য এই সকল প্রত্যেক সামাজিক বিভাগ লাইব্রেরীর সহিত অঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া লাইব্রেরীর সাহায্যে ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য রাশিয়ায় বিপুল আয়োজন চলিয়াছে। এখন Librarianএর উপরেই লাইব্রেরীর সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

মস্কো সহরে একটি অভিনব আরামবাগ আছে তাহার নাম Moscow Park of Education and Recreation। এই বাগানের মধ্যে একটি বড় মণ্ডপ আছে সেখানে প্রদর্শনী বসিয়া থাকে। সেখানে রাজ্যের যত খবর এক জায়গায় পাইবেন। সহরে যেখানে যত উন্নতিকর কাজ হইতেছে সেখানে তাহার তালিকা আছে। নাগরিক সভা কতগুলি নূতন বাসা বাটী নির্ম্মাণ করিলেন,

স্কুলের সংখ্যা কত বাড়িল, নূতন নূতন লাইব্রেরী কতগুলি প্রতিষ্ঠিত হইল, কতগুলি নূতন ডিসপেন্সারী খোলা হইল, সব খবর সেখানকার দেওয়ালে টাঙ্গান আছে। রং তামাসা, ক্রীড়া কৌতুক মেলার যা কিছু অঙ্গ সব সেখানে একাধারে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথাও আছে,—আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে শাক সব্জী ফুল কি করিয়া ভাল রকমে উৎপাদন করিতে হয়, পূর্ব্বেকার পল্লীগ্রাম কিরূপ ছিল বর্ত্তমান কালের পল্লীগ্রাম কিরূপ উন্নত হইয়াছে, নূতন নূতন যে সকল যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইতেছে তাহার নমুনা কি প্রকার, পূর্ব্বে কিরূপে রুটী তৈয়ার হইত Creche। এখানে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য ধাত্রী থাকে। শিশুদের মা বাপ যখন পার্কে ঘুরিয়া বেড়ান তখন এই সব ধাত্রীদের নিকট শিশুদের রাখিয়া যান। Clubএর জন্য একটা মণ্ডপ আছে, তাহার দোতালায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত। দেওয়ালে নানাপ্রকার মানচিত্র টাঙ্গান আছে ও খবরের কাগজ আঁটা আছে। তাহার আশেপাশে কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় খাবারের দোকান। সেখানে মদ বিক্রী বন্ধ। আরামের সহিত শিক্ষার উপকরণ যোগান এই পার্কের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যান্য সহরে এইরূপ আদর্শের পার্ক খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

সাধারণের পাঠাগার—ষ্টারা জাগোরা

এখনই বা কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা মত কিরূপ রুটী তৈয়ার হইতেছে ইত্যাদি লোকশিক্ষার সকল প্রকার প্রয়োজনীয় কথা সেখানে জানিতে পারা যায়।

পার্কের একটি অঞ্চল ছোট ছেলেদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ছোট ছেলে ভিন্ন সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। সেখানে ছেলেদের খেলাধূলার আগার আছে। ছেলেদের রঙ্গমঞ্চ আছে। সেখানে ছেলেরা থিয়েটার করে, এসব পরিচালনার ভার ছেলেদের উপরই।

ইহার অনতিদূরেই শিশুরক্ষার গৃহ, তাহার নাম

সোভিয়েট রাশিয়ার পল্লী এবং কুটীর লাইব্রেরীগুলি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষক সমাজের জ্ঞান বিস্তারকল্পে পৃথক বাড়ীর ব্যবস্থা আছে। সেখানে তাহাদে উপযোগী কতকগুলি পুস্তক, বহু পুস্তিকা, খবরের কাগ এবং পোষ্টার (Poster) রাখা হয়। এই পোষ্টারগুলি দ্বারাই সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা হয় এই সব পোষ্টার গভর্ণমেণ্ট এবং নানাবিভাগ হইতে প্রচারিত হইয়া থাকে। এগুলিতে নানা শিক্ষণীয় বিষয় যথা, সন্তান পালন, সংক্রামক ব্যাধি নির্ণয়, মাছি, মশ এবং ছক কীট প্রভৃতি সংক্রামক রোগবাহকদের পরিচ

এবং তাহার প্রতিষেধক উপায় বড় বড় অক্ষরে লিখিত থাকে। আবার কতকগুলি পোষ্টারে কৃষির উপযোগী কলবলের পরিচয়, বীজ বাছাই করিবার উপায়, কোন জমীতে কিরূপ সার দেওয়া প্রয়োজন এবং চাষ সংক্রান্ত নানারূপ উপদেশ লিখিত থাকে। আবার কতকগুলিতে মাদক সেবনের অপকারিতা এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা, অপর রাজ্যের সহিত কোথায় কিরূপ সম্বন্ধ এবং সাম্যবাদের নীতি প্রভৃতি লিখিত থাকে। এই কুটীর লাইব্রেরীগুলিতে গ্রামের কৃষকেরা সন্ধ্যার সময় মিলিত হয়। এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে মস্কৌ সহর হইতে রেডিও সাহায্যে সংবাদাদি

পাঠাগার—SUILENGRAD

প্রেরিত হইয়া থাকে। অনেকগুলিতেই অভিনয়ের জন্য ছোট রঙ্গমঞ্চ আছে, সেগুলি কৃষকদের চিত্তবিনোদনের জন্য [illegible] হয়। এই রঙ্গমঞ্চগুলির উদ্দেশ্য আমোদ প্রমোদের [illegible]চার ও জনশিক্ষা দেওয়া।

এই কুটীর লাইব্রেরীগুলি স্থানীয় কমিটির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিভাগের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যের জন্য পৃথক পৃথক কমিটি আছে। জনগণের সাধারণ [illegible] এবং শিক্ষা বিস্তার এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য [illegible] সংবাদ উপলক্ষ্য করিয়া নাটকাভিনয় বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে পল্লীর সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধায়ক কমিটি মিলিত হইয়া থাকে। সাধারণের স্বাস্থ্য, কৃষি, স্কুল, রাস্তা, কাউন্টি বা জেলা গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়, সাম্যবাদ শিক্ষা এবং প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের অজ্ঞতা বিদূরণের জন্য সমগ্র রাশিয়ার কর্ম্মীদের কংগ্রেসে লেনিন ঘোষণা করেন "তোমরা স্মরণ রাখিও যে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোক কখনও জয়যুক্ত হইতে পারে না। সাধারণ লোক শিক্ষিত না হইলে তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব—সহযোগিতা অসম্ভব এবং খাঁটি রাজনৈতিক জীবনও অসম্ভব।" ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়ার শতকরা ৬৮ জন লোক নিরক্ষর ছিল। এই নিরক্ষরতা বিদূরণ জন্য গভর্ণমেণ্ট কৃতসঙ্কল্প হন। মস্কৌ গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ঘোষণা করেন, "সোভিয়েট রাজ্যে প্রত্যেক অধিবাসী যাহাতে লিখিতে এবং পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। কমিসেরিয়েট অব এডুকেশন জনশিক্ষার এই গ্রহণ করিয়া নিরক্ষরতা বিদূরণ জন্য বহু কেন্দ্র স্থাপন করেন। রাজনীতি চর্চ্চার ক্লাব, পাঠগৃহ (Lenin corners), কর্ম্মী এবং কৃষকদের গৃহ, স্থায়ী এবং চলন্ত লাইব্রেরী, আত্মশিক্ষার কেন্দ্র এবং মাসিক পত্র প্রচার কার্য্যের জন্য চিত্তবিনোদন অভিনয়াদির ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাদিকে তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্ম-তৎপরতা নিযুক্ত করেন।

এই সব অনুষ্ঠান দ্বারা এত উৎসাহ বাড়িয়া যায় যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্যার্থী স্থূলবুদ্ধি শিক্ষার্থীকে সাহায্য করিতে থাকে, অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোক নিরক্ষরকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিলে নিরক্ষর ব্যক্তিদিগকে স্থানীয় কুটীর পাঠাগারে (Isba) কিংবা ক্লাবে এবং তাহার পরে লাইব্রেরীতে যাইবার জন্য উৎসাহিত করা হয়, এই ভাবে ছয় মাস কার্য্য চলিলে পর সেই সেই স্থানে যোগ্যতর ব্যক্তি প্রস্তুতের জন্য স্কুল (Rabfac) স্থাপিত হয়।

রাশিয়ায় দশ বৎসর ব্যাপী শিক্ষা অভিযানের ফলে কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা অক্টোবর রাজবিপ্লবের দশমবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আলোচিত হয়। তাহাতে জানা যায় যে প্রায় দশ কোটী লোককে লেখাপড়া শেখান হইয়াছে। স্থায়ী লাইব্রেরীর সংখ্যা ৪,৬৪০ হইতে ৬,৪১৪ বৃদ্ধি হইয়াছে। চলন্ত লাইব্রেরী ৩,১৬৭ হইতে ৪,৩৪৩ দাঁড়াইয়াছে। রাশিয়ার সাধারণ তন্ত্রে ৭২৫০টী কেন্দ্রে ১,২০,০০০ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইত এখন নিরক্ষরদের স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৬,৭৫৯ এবং চলন্ত লাইব্রেরীর সংখ্যা ৫০,০০০ হাজারে পৌঁছিয়াছে।

জাতীয় চরিত্রগঠনে পাঠাভ্যাস অল্প সহায়ক নহে। যুবকদের জ্ঞান ও বুদ্ধি স্ফুরণের সুযোগ দিবার জন্য মস্কো সহরে শিশুদের জন্য একটি গৃহ আছে সেখানে পুস্তক পড়িয়া নাটক তৈয়ার করিতে হয়। ছেলেদের সুবিখ্যাত লেখকগণের জন্মভূমি পরিদর্শনে লইয়া যাইয়া তাহাদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে।

রাসিয়ার প্রত্যেক সিনেমার সহিত একটি করিয়া লাইব্রেরী সংযুক্ত থাকে। মধ্যে মধ্যে যবনিকা পতনের অবসরে এই সব লাইব্রেরী দর্শকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিরক্ষরতার ধ্বংস হউক "Down with Illiteracy" নামক সচিত্র মাসিক পত্র সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেক নগরে এবং পল্লীতে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়া থাকে। সোভিয়েট ইউনিয়ানের পুস্তক প্রকাশ বিভাগের কার্য্য কুশলতার বস্তুতঃই অভিনবত্ব আছে। এতকাল আপামর সাধারণ জগতের বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক বিষয়ের চিন্তার ধারার সহিত বিচ্ছিন্ন ছিল। ক্রমশঃ সেই অভাব দূরীকরণার্থে প্রতি পল্লীগ্রামে সোভিয়েট ইউনিয়ান "পল্লী-পুস্তক-পত্র-প্রেরক সমিতি" (Village Book Correspondents) গঠন করিয়াছেন। কৃষকদের জন্য সহজবোধ্য ভাষায় গুরুতর বিষয়ে কিরূপ পুস্তক প্রণয়ন এবং প্রকাশ আবশ্যক, ছেলেদের জন্য কিরূপ পুস্তক প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের ছাপাখানা আপিসে সমিতিকে জানাইতে হয়। এই ভাবে সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার জ্ঞান বিস্তারের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে তাহার সাফল্য ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

নব্য রাশিয়ার পাঁচসালা বন্দোবস্তের ভিতর যতই জুলুম জবরদস্তি থাকুক তাহার অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ইংলণ্ডেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আজ সেখানেও পাঁচসালা বন্দোবস্তের প্রশংসা ও অনুকরণ হইতেছে।

রাশিয়াতে নিরক্ষরতা বিদূরণের জন্য যেরূপ বিপুল প্রচেষ্টা চলিতেছে তদ্রূপ আর কোথাও হয় নাই সেজন্য এত বিস্তৃত ভাবে তাহার কথা বলিলাম। ব্যাপকভাবে যে যে দেশে নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা চলিতেছে তাহাদের মধ্যে নব জাগরিত ও নব গঠিত জাতিগুলির কথা উল্লেখযোগ্য। তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে, সেজন্য তাহাদের মধ্যে ২।১ টির কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। Czecho-Slovakia রাজ্যটি ক্ষুদ্র হইলেও নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচন এবং জ্ঞান বিস্তার কল্পে তাহাদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ গ্রন্থাগারের সাহায্যে তাহারা সঙ্কল্প সিদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছে। আইনানুসারে প্রত্যেক গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন বাধ্যকর হইয়াছে। ১৯২০ সালে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৩৪০০, ১৯২৬ সালে ৬ বৎসরের মধ্যে তাহা ১৬,২০০ দাঁড়াইয়াছে। বুলগেরিয়া প্রাচীনকালের চিতালিষ্টাগুলিকে উপলক্ষ করিয়া নিরক্ষরতা বিদূরণ ও জ্ঞান বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছে। চিতালিষ্টাগুলি একাধারে থিয়েটার, সিনেমা, গ্রন্থাগার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। Finland, Poland, Yugo-Slovakia প্রভৃতির নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান বস্তুতঃই প্রশংসনীয়।

আর একটি নবজাগ্রত জাতি প্রাচীন স্পেন রাজ্য। স্পেনের সাধারণ তন্ত্র জনশিক্ষা করে সম্প্রতি ২৫৮০ টি নূতন স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। সেখানকার শিক্ষা মন্ত্রী Don Fernando de los Rios দেশের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নূতন আইনে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটী স্কুলের জন্ত স্থান সংস্থান এবং এক চতুর্থাংশ ব্যয় বহন করিতে বাধ্য। গরীব মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আবার Bilbaoর ন্যায় ধনী মিউনিসিপ্যালিটী স্কুলের জন্ত শতকরা ৬০৲ টাকা

পাঠাগার—CHOUMEN

পর্য্যন্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছে। নূতন শিক্ষা নিয়মে পল্লী লাইব্রেরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে। ইতিমধ্যে ১১৪৩টি নূতন পল্লী লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে, তাহার পুস্তক সংখ্যা লক্ষ ৪৬ হাজার। সেই সব লাইব্রেরীতে চারিশত বেতার যন্ত্র (wireless set), বহু গ্রামোফোন রেকর্ড এবং বিলি করা হইয়াছে। চিত্ত বিনোদনের সঙ্গে শিক্ষার জন্য মিউজিয়াম ও থিয়েটারের এখানে বেশী রকম। এইগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও মেয়েরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কাজ করিয়া অভিনয় এত সুন্দর হইয়াছে যে তাহারা অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, প্যারিস, বোরদো এবং অন্যান্য বড় সহরে অভিনয় করিবার জন্ত নিমন্ত্রিত হইয়া যশ অর্জন করিয়াছে। স্পেনে secondary স্কুল অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহুল্য ছিল। এখন দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিয়া সেখানে Technical college খোলা হইয়াছে। Pantandara নূতন ধরণের একটী আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একজন রাজদূত (ambassador) সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ টি Scholarship প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উত্তর আমেরিকা হইতে দুইশত ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আসিতেছে। ভাষা সঙ্কট বিমোচন জন্ত নানাভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্পেনের বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্মশিক্ষা আইনবলে একেবারে বন্ধ করা হইয়াছে। ধর্ম্মই না কি দরিদ্রের উন্নতির পরিপন্থী।

আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক নিরক্ষর থাকিলেও তাহাদের জ্ঞানলাভের জন্ত পূর্ব্বকালে নানারূপ ব্যবস্থা ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি সদ্গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা, কথকতা, যাত্রা নিত্য নৈমিত্তিক পূজা পার্ব্বণ, তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতির দ্বারা জ্ঞানলাভের নানারূপ উপায় ছিল

তাই নিরক্ষরতা জ্ঞানলাভের পথ রোধ করিত না। তাহাতে লোকে নিরক্ষর থাকিয়াও ধর্ম্মভীরু হইত এবং সেই ধর্ম্মভিরুতা রক্ষা কবচের মত তাদের অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি নিরোধ করিত। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে পূর্ব্ব ব্যবস্থা ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। এখন আর জনসাধারণকে নিরক্ষর রাখা চলিবে না। সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইচ্ছা থাকিলে আন্তরিকতা থাকিলে অল্পকাল মধ্যে নিরক্ষরতা বিদূরণ একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। নব্য রাশিয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাতে বস্তুতঃই অবাক হইতে হয়।

নিরক্ষরতা বিদূরণ (Liquidation of illiteracy) বড় সহজ কথাও নয়। একাজে শুধু সরকারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এ গুরুভার আমাদিগকে লইতেই হইবে। স্কুল কলেজের ছেলেদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এ কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। একার্য্যে শিক্ষক ও অধ্যাপকদের ঐকান্তিকতা চাই। অল্পকালের মধ্যে কিভাবে নিরক্ষরতা দূর করা যায় ছাত্রদের তাঁহারা সেইভাবে শিখাইয়া লইবেন এবং গ্রীষ্মাবকাশ, পূজাবকাশ ও বড়দিনের বন্ধে তাহাদের গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া চাষা ভূষা সকল শ্রেণীর লোকদের একত্র করিয়া অক্ষর পরিচয় হইতে সর্ব্ববিধ সাধারণ জ্ঞান দিবার ব্যবস্থা করিবেন। এ কার্য্যে একটু ব্যাপক ভাবে organisation আবশ্যক। যেখানে গ্রন্থাগার আছে সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে। প্রত্যেক লাইব্রেরীর সহিত নৈশবিদ্যালয় ও আলোকচিত্র সহযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দশজনকে একত্র করিয়া সংবাদ পত্র পাঠের দ্বারা দেশের ও দশের খবর জানাইতে হইবে। তবেই দেশ জাগিবে।

ভারতবর্ষ ভোগভূমি নয়—কর্ম্মভূমি। কর্ম্মেই সিদ্ধি, সাধনায় সিদ্ধি। সাধনা ভিন্ন, কর্ম্ম ভিন্ন কখনও কি সিদ্ধিলাভ হয়? এখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সময় আসিয়াছে। আসুন আমরা বদ্ধপরিকর হই। যাহার যতটুকু সাধ্য নিরক্ষরতা বিদূরণের ব্যবস্থা করি। শীঘ্রই দেশে নব রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রবর্ত্তন হইবে। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে দেশকে সচেতন করিতে হইবে। সে চেতনা আসিবে কোথা হইতে? অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া থাকিলে কখনও কি সে চেতনা আসিবে? যুগ যুগান্তর কাটিয়া যাইবে ছায়াবাজী মরীচিকার পিছনে ঘুরিতে হইবে, প্রকৃত স্বরাজ লাভ হইবে না। দেশের পনের আনা লোক জ্ঞানপঙ্গু থাকিতে কখনই কোনো আশাই নাই। আসুন আমরাও ঘোষণা করি—"Down with Illiteracy"। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন যে উপায়েই হউক দেশের নিরক্ষতার কলঙ্ক ঘুচাইতে হইবে।

শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়

যাত্রা সুরু

শ্রীসুবোধ রায়

যে-কথা বলার ছিল বুঝি আর হ'ল নাকো বলা,
সে-পথে চলার ছিল বুঝি আর হ'ল নাকো চলা।
ভুল—দেখি, পদে পদে ভুল,
জীবনের স্রোতধারা খরবেগে ভাসাইল কূল,
কোথা পথ, কোথা তা'র দিশা?
জ্যোছনা-শর্ব্বরী কোথা, এযে ঘোর অন্ধ অমানিশা।
আঁধারের ঢেউ
ভুবন প্লাবিয়া আসে রহিল না কেউ;
নিবে গেল সূর্য্য-চন্দ্র-বাতি,
ঘুমাইয়া পড়ে সৃষ্টি, জাগে শুধু প্রলয়ের রাতি!

ধীরে, ধীরে, ধীরে,
আলোর স্পন্দন জাগে এ নিস্পন্দ আঁধারের তীরে,
জাগে প্রাণ, জাগে পুন আশা,—
লুপ্তশক্তি হতবাক জীবগণ ফিরে পায় ভাষা,
হারানো পথের চিহ্ন চোখের সমুখে পুন উঠে যেন ভেসে,
আত্মহারা আনন্দেতে সুরু হয় যাত্রা পুন অসীম উদ্দেশে।
এইমত এজীবনে দেখি বারবার,
আসিয়াছে মহানিশা, নবারুণ হেসেছে আবার
সেই হ'তে ভেবেছিনু হাসি-কান্না-মেলা,
এই সত্য, চিরন্তন,—জীবনের আলো-ছায়া-খেলা।
কেন জানি আজি মনে হয়
এই দ্বন্দ্ব চিরন্তন নয়।
দ্বন্দ্ব চাই,—তাই এই দ্বন্দ্ব জেগে থাকে,
মিথ্যা আবরণ চাই, তাইতো যে অন্ধকার ঢাকে।

কামনা, বাসনা আছে, দুর্নিবার লোভ,
আছে ক্রোধ, ব্যর্থ চিত্ত ক্ষোভ,—
এ হীন সজ্জায়
আপনারে প্রকাশিতে মরি যে লজ্জায়!
তাই করি অন্ধকার সাথী,
স্নেহ-আবরণ সম চাই অমারাতি।

দূর কর মিথ্যাচার, গোপনতা, বহুরূপী-রীতি,
প্রেমের আড়ালে নিত্য কামের পীরিতি।
তুমি যাহা নও, যাহা নহেক তোমার
ত্যজ সেই মিথ্যা অধিকার।
কিবা পেলে, কি হারালে, ভোলো তাহা ভোলো,
চিত্ত-দ্বার খোলো,
কেবা আসে, কেবা যায়,—কোরোনা বিচার,
বাঁধিতে চেয়োনা কা'রে, করিওনা বন্ধন স্বীকার।
কহ সত্য, লহ সত্য, হও সত্যকাম,
সহজ সত্যেরে নিত্য করহ প্রণাম;
দূরে যাবে অন্ধকার রাতি
অন্তরে বাহিরে নিত্য দীপ্ত-আলো-ভাতি
রবে জাগি' উজ্জ্বল বর্ত্তিকা,
জীবন-আকাশে চির ধ্রুবজ্যোতি-শিখা।

দেখিবে তখন
অন্তহীন আনন্দে মগন,—
যে-কথা বলার ছিল সেই কথা সুরু হ'ল বলা
যে-পথে চলার ছিল সেই পথে সুরু হ'ল চলা।

প্রাচীন কাব্যে অবসর

শ্রীনবেন্দু বসু এম-এ

কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে কালকেতুর অন্নচিন্তার দৃশ্য পড়ছিলুম। ভাবছিলুম কতক্ষণে ডালিমগাছের তলায় গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে মহামায়া কালকেতুর দুঃখ হরণ করবেন। তার আয়োজনও হ'ল। "অভয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ" করলেন। কিন্তু ধনের সন্ধান দিতে বিলম্ব হ'তে লাগলো। দেবী "পরিয়া পাটের শাড়ী ষোল বৎসরের হৈলী বামা"—ফলে সে বয়সের যা দোষ তাই ঘটতে লাগলো; কাযে আর মন গেল না; ষোড়শী বিলাসে মন দিলেন। তা যদি বা সম্পূর্ণ হ'ল, "অবশেষে পড়ে মনে হৃদয়ে কাঁচুলী আচ্ছাদন।" তার কিন্তু কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাই কাঁচুলী নির্ম্মাণ করতে বিশ্বকর্ম্মার প্রতি আদেশ হ'ল। তারপর কৌতুহলী পাঠক দেখতে পারেন সে কাঁচুলী নির্ম্মাণের কি সুদীর্ঘ বর্ণনা। কোথায় রইল কালকেতু, কোথায় বা ফুল্লরা—বেড়াক তারা পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে ক্ষুদকুঁড়ো ধার করে। এমন কি অতক্ষণ দেবী নিজে কোথায় রইলেন তারও ঠিকানা নেই। ত্রিপদী আটাশপদী গীতে বিশ্বকর্ম্মার কাঁচুলী নির্ম্মাণের বর্ণনাই চললো। প্রথমে তাতে দশ অবতারের কীর্ত্তিকলাপের ছবি। পরে "ডানদিকে লিখে মুনিগণ।" বামদিকে জটায়ু আদি করে' বিশ্বের যাবতীয় পাখী। তা এঁকেও স্থান বাকী রইল কেননা পাখীগুলি "সংক্ষেপে" লেখা হয়েছে। তাই বিশাই "লিখে পশুগণ।" প্রকৃতির সমগ্র পশুশালা তার মধ্যে স্থান পেলে। এইভাবে "চারিদিকে নানাচিত্র করিল নির্ম্মাণ।" তারপর জলচর জীব—সে কত। পড়ে' চলি—একবার মনে হয় না যে একটা কাঁচুলীতে এতস্থান হ'ল কোথা থেকে, যদি না খুব ছোট ছোট করে' লেখা হয়ে থাকে। এ প্রশ্ন করতে ইচ্ছা যায় না যে বিশাই পাখীগুলো সব সংক্ষেপে লিখলে কেন (সত্যিই সংক্ষেপে লেখে নি যদিও) আর জলচরের বেলা কেন "লিখিল বিস্তর"। একথা একবারও ভাবি না যে ডানদিকে যদি মুনিদের লেখা হ'ল, বামদিকে পাখীদের, মধ্যভাগে বৃন্দাবন, পূর্ব্বভাগে দোলমঞ্চ, তাহ'লে দশ অবতার কাঁচুলীর কোন্ ভাগে গেলেন। এ চিন্তা আমাদের মোটেই পীড়িত করে না যে কাঁচুলীতে "রাধা আদি গোপকন্যা" আর "বৃন্দা বিপিনবিহারী"র পাশে তুলারু, ঘোড়ারু, কৃষ্ণসার, ঢোলকাণের ছবি মানাল কতটা। তখন যা দেখি তাই বিশ্বাস করি। তাই আবারও কাঁচুলীর পানে চেয়ে দেখি—

> লিখিল আবর্ত্তশালী যমুনা নিকট
> তালের কানন লেখে ভাণ্ডীরক বট।
> অশোক কিংশুক শাল পিয়াল রসাল
> শিংসপা আসব ধব অর্জ্জুন তমাল।
> অশ্বত্থ কপিত্থ জম্বু জম্বীর পনস
> টগর তুলসী দোনা নারঙ্গ বেতস।
> রঙ্গন চম্পক পারিজাত কুরুবক
> নেহালী বান্ধুলী কবরীর কুরণ্টক।

সুন্দর বর্ণনা! শব্দমুখর! বর্ণবহুল!

এ কাব্যে বিশেষ করে' কি চোখে পড়ে যেটা স্মরণ করিয়ে দেয় এর চারশো বৎসর বয়সের কথা? সেটা এ ভিত্তিতে একটা অবসরের মনোভাবের পরিচয়। যা বর্ণনার যত্নেই সে ভাবের পরিচয় দিতে পারা যেত কেনন যা সযত্নে মনোমত ভাবে করা হয় সেটা অবসরেরই কাজ আর কবিকঙ্কণের কাব্যে সযত্ন বর্ণনা অল্প নেই। বর্ণনার রঙে প্রায়ই ঝঙ্কার বাজে, তার রেখায় প্রায়ই ছন্দ জাগে। শুধু ফুলের বর্ণনা নয়, পর পর নেহালী বান্ধু বললে তবে বুঝি যে "লী" এ "লী" এ নেহালী বান্ধুলী মালাগাঁথা হ'ল—linked sweetness long-draw out। কিন্তু কলাকৌশল, পারিপাট্য, সৌষ্ঠব ভাবে

চিরকালীন লক্ষণ। কাজেই এদিক থেকে প্রাচীন কাব্য সম্বন্ধে আমাদের বলবার কিছু নেই। সাময়িক লক্ষণ হিসাবে কবিকঙ্কণের কাব্যে অবসরের পরিচয় বর্ণনার তথাকথিত অবান্তরতায়।

আজকের তুলনায় কবিকঙ্কণের দিনে জীবনের স্রোত অল্প কয়েকটি মূল ধারায় বইত তার প্রাচুর্য্য আর প্রবলতায়। শত বিরোধী আকর্ষণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত না। অর্থাৎ সামাজিক আর ব্যক্তিগত জীবনে সেদিন সংগ্রাম আর প্রতিযোগীতার দিকটা আজকের প্রসার আর বৈচিত্র্যে ফুটে ওঠে নি। এই কালধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া সেদিনের জীবনে দুদিক থেকে হয়েছিল। প্রতিযোগীতার ক্ষিপ্রতা ছিল না বলে' জীবনের গতিতেও ক্ষিপ্রতা ছিল কম। জয় পরাজয়ের দায়িত্ব না থাকায় ব্যস্ততার বদলে একটা শান্তি আর স্থৈর্য্যের ভাবই বেশী ছিল। মানুষের মন যেন হ'ত অপেক্ষাকৃত শিথিল বা অনাসক্ত। তাই সময়ের অতিবাহনে দিনগুলোতে থাকতো অপেক্ষাকৃত কম "ত্বরা"। সেগুলো হ'ত "মন্থরতায় ভরা।" কোথা দিয়ে দিন বয়ে গেল এ ভাবটা তখন জাগতো না। মানমন্দিরে সূর্য্যের ছায়া যথারীতি এগিয়ে গেলেও মনোমন্দিরে বেলা কেবলই গড়াতো। দ্বিতীয়তঃ প্রতিযোগীতার সংকীর্ণতা ছিলনা বলে' ব্যক্তিগত জীবনের সংরক্ষণেও একটা ক্লিষ্ট কঠিন সঙ্কুচিত ভাব ছিল না। তাই তার ক্ষুদ্রতর দিকটা চোখে না পড়ে' সেটা একটা বৃহত্তর জীবনের অঙ্গীভূত বলে' মনে হ'ত। নিজের জীবনকে অন্য পাঁচজনের জীবনের সঙ্গে এক করে' বহির্জগতের একটা স্থূল বস্তুর মতন অনুভব করা চলতো।

উপরোক্ত দুদিক থেকেই সেদিনের জীবন সেদিনের কাব্যকে প্রভাবিত করেছিল। দুয়েরই ফল হয়েছিল অবান্তরতা। সময়ের গতিমন্থরতার দরুণ যে অবান্তরতা সেটা দেখা যেত কাব্যের বিস্তৃতিতে। পঙক্তিগণনার দিক থেকে সেদিনের কবি আজকের কবির চেয়ে বৃহদাকার কাব্য লিখতে পারতেন, আর সেই দীর্ঘ পঙক্তিমালার মধ্যে [illegible] বর্ণনা সহজেই প্রশ্রয় পেত। সে বর্ণনার [illegible] কোন নিয়ম ছিল না। উপলক্ষ হয়ত [illegible] আবির্ভাব। কিন্তু সেই সূত্র ধরে তাঁর বিলাস-বর্ণনা আর তার মধ্যে আবার সুদীর্ঘ কাঁচুলী বর্ণনা আরম্ভ হ'ত। মূল চলাপথ ত্যাগ করে' এইভাবে আশে পাশে ইচ্ছামত বিক্ষিপ্ত বিচরণ অবসর সাপেক্ষই বটে। কবিকঙ্কণকে ছাড়িয়ে আরো দূরে গিয়ে দেখি—মহাভারত, বৌদ্ধযুগ, কালিদাসের কাল, দেশ এবং বিদেশ—এই অবসরের পরিবেষ্টনই প্রাচীন শিল্প আর কাব্যকে ঘিরে রেখেছিল। বিদেশে Vulcan এর দ্বারা Æneas এর ঢালে নানাচিত্র আর দৃশ্য রচনার কথা মনে করি।

জীবনকে বাস্তবরূপে অনুভব করার অভ্যাস কাব্যকে "অবান্তর" করেছিল বর্ণনার মধ্যে ন্যায় যুক্তির লঙ্ঘনকে প্রশ্রয় দিয়ে। বাস্তবজীবনের ঘটনাপারম্পর্য্যে যেমন সব সময়ে ন্যায়ের শৃঙ্খলা বা যুক্তির ভিত্তি থাকে না বা শিথিল হয়, কাব্যের বর্ণনাতেও তারই প্রতিরূপ ইচ্ছায় বা অজ্ঞাতে সঞ্চারিত হ'ত। বাস্তবজীবনের অপ্রত্যাশিত আর অসমঞ্জস ঘটনা ধারার মতন কাব্যেও কিসের পর কি আসতো তার সব সময়ে ঠিক থাকতো না। যা আসতো হঠাৎই আসতো। প্রাকৃতের পাশে অতিপ্রাকৃতের সমাবেশ হ'ত সহজেই। নির্ব্বাচনের প্রয়োগ সেদিনের কাব্যে কম ছিল। আজকের কাব্যে চিন্তার ভিত্তি দৃঢ়। স্বাভাবিকতার অবতারণায় বাস্তব-সাদৃশ্য আর ঐক্যের বন্ধন প্রয়োজন। প্রাসঙ্গিকতা এখন একটা বড় জিনিষ। কাব্য বা শিল্পের গঠন এখন বাহুল্যবর্জ্জিত। রূপরচনায় আজ মিতাচার আশা করি। সেদিনের রূপের বিকাশ ছিল তার বিক্ষিপ্ত বস্তুশ্রীতে। ফলে, "সংক্ষেপে" পাখী লিখে "বিস্তর" জলচর লেখা চলতে পারতো। বৃন্দা বিপিনবিহারীর পাশে কৃষ্ণসার চোলকাণ এসে দাঁড়ালে আপত্তি হ'ত না।

প্রাচীন কাব্যে এই অবসরের পরিচয় সম্বন্ধে আজ হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সেদিনের কাব্য যদি অবান্তরতার ফলে আঙ্গিক সামঞ্জস্য না পেল তাহ'লে তাতে শিল্পগ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হ'ল কেমন করে'? কিন্তু সেদিন সম্ভবতঃ রূপ দরশনের চোখ অন্য ছিল। কবিকঙ্কণের সমকালীন পাঠক হয়ত বলতো যে হোক এলানো ছড়ান, তাতে ক্ষতি নেই। রেখা আর বর্ণে উজ্জ্বল হ'লেই হবে। সৌন্দর্য্যের পুঞ্জমূর্ত্তিই যথেষ্ট। বন্ধনহীন বাহুল্য আর

অতন্ত্রতাই চাই—তার fine irrelevancies ! আকৃতির তখন তেমন প্রয়োজন হ'ত না। সুন্দরকে তখন রসিক দেখতো তার আদিম আবেষ্টনের মধ্যে। তার সন্ধানে কোন সংস্কার বা আদর্শের প্রত্যাশা ছিল না আর তার গ্রহণেও তাই কোন পরীক্ষা ছিল না। আজকের কবিতা দেখে সেদিনের পাঠক হয়ত আজকের কবির ভাষাতেই ব্যঙ্গ করতো যে—

> যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে
> একদিন এসে নাম্‌ল কবিতা,—
> সেইটেই পড়ে' রইল পিছনে।
> নিশীথ রাতের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে
> যদি হার গাঁথা যায় ঠেসে,
> বিশ্ববেনের দোকানে
> হয়ত সেটা বিকোয় মোটা দামে,
> তবু রসিকেরা বুঝতে পারে যেন কমতি হ'ল কিসের।
> যেটা কম পড়ল সেটা ফাঁকা আকাশ,
> তৌল করা যায় না তাকে,
> কিন্তু সেটা দরদ দিয়ে ভরা।

রুচি আর ধারণার পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু সেদিনের অবসরময় অবান্তর কাব্য যে আজও আমাদের মুগ্ধ করে তার কারণ এই যে সুন্দরের .উপলব্ধির সব পথগুলিই সত্য কেবল কালধর্ম্মে কোনটা কখন প্রভাবশালী। তাই সৌন্দ... গ্রহণের একটা বিশেষ দৃষ্টি জেগে থাকলেও অন্যগুলি সুপ্ত... থাকে লুপ্ত হয় না; অনুকূল আহ্বানে সহজেই জেগে ওঠে আমার আজকের প্রত্যাশা আর প্রবৃত্তির শাখা প্রশাখা... মূল সেদিনে নিহিত। আজও তা থেকে রস সঞ্চার হয়। আমার চারশো বৎসরের সরল বিশ্বাসী পূর্ব্বপুরুষ আমা... মধ্যে মরে নি। তার আবেগ, কামনা আর তৃপ্তি আমা... আজকের চেতনাকে চঞ্চল করে। তাই আজকের স... প্রকাশিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পাতা খুলতে পৈতৃক আমলে... চন্দন কাঠের সিন্দুকের মৃদু সৌরভ মনকে বিহ্বল করে। স্থান কাল সরে' গিয়ে গত দিনের আবেষ্টন নিবিড় ছায়ার মতন ঘিরে আসে; সম্পূর্ণ নির্ভরে পড়তে পারি—

> জলচর মকর লিখিল সাবধান
> চারিদিকে নানা চিত্র করিল নির্ম্মাণ।
> শুশুক কুম্ভীর লিখে ঘড়াল হাঙ্গর
> রোহিতাদি মৎস্য বিশাই লিখিল বিস্তর।
> কাঁচুলীর মধ্যভাগে লিখে বৃন্দাবন
> পূর্ব্বভাগে দোলমঞ্চ কদম্ব কানন।

নরেন্দু বসু

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ছেলেমেয়েদের একত্র শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়

ছেলেমেয়েদের একত্র শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মতামত যুক্তিসহ গত সংখ্যা 'বিচিত্রায়' লিখিয়াছিলাম। সংবাদ পত্রের সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া ইহাও লিখিয়াছিলাম যে, কয়েকটি স্কুলের ঐ প্রকার আবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মতি দান করিয়াছেন।

সম্প্রতি বাংলা-কাউন্সিলের ঐ সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে জানা গেল যে, বিশ্ববিদ্যালয় এক সময়ে এই সমস্যা সম্বন্ধে বিচারের ভার, স্কুলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের উপর কতকগুলি সর্ত্তে ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিলেও, নানাস্থান হইতে, দশ বৎসরের অধিক বয়স্কদের একত্র শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রাপ্ত হওয়ায়, এই সিদ্ধান্ত তাঁহারা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

সর্ব্ব-প্রকার পরিবর্ত্তন এবং নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক চিরদিনই থাকিবেন, ও প্রতিবাদ করিবেন। তাঁহাদিগকেই জনমতের প্রকৃত প্রতিনিধি মনে করিয়া কাজ করিলে, দেশের প্রতি সব সময় সুবিচার করা হইবে না। দেশের প্রকৃত জনমত বিশেষ করিয়া শিক্ষিত জনমতের গতি কোন্‌দিকে, এরূপ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে পৌছিবার পূর্ব্বে তাহা ভালভাবে নির্ণীত উচিত ছিল।

এমন হইতে পারে, যে সকল স্কুল এই জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, সেই সকল স্কুলের সীমানাভুক্ত কোনও লোকই আপত্তি বা প্রতিবাদ করেন নাই। এ ব্যাপারে [illegible] স্থানীয় অবস্থা এক প্রকারের নহে; [illegible] বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব সিদ্ধান্ত বিশেষ বিবেচনা এবং বিজ্ঞতা প্রসূত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। কোনও বিশেষ স্থানের লোকের এ বিষয়ে মতামত কি এবং অভিভাবকেরা মেয়েদের কোনও শিক্ষা না দেওয়া অপেক্ষা, ছেলেদের সহিত একত্র পড়িতে দেওয়া ভাল মনে করেন কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার ভার, স্থানীয় স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই সব দিক দিয়া সঙ্গত হইত। যাহাতে কোনও প্রকার গোলমাল না হয়, তাহার জন্য, কোনও স্কুল এই প্রকার আবেদন করিলে, নির্দ্দেশ দিবার পূর্ব্বে, বিশ্ববিদ্যালয় কোনও দায়িত্ব সম্পন্ন উপরিতন লোককে, স্থানীয় অভিভাবকদিগের প্রকৃত ইচ্ছা জানিবার নিমিত্ত পাঠাইতে পারিতেন।

এই ব্যাপারের ভার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের উপর ছাড়িয়া দিলে নানাপ্রকার গোলমালের সৃষ্টি হইবে; এবং ইহা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুল সমূহ গড়িয়া উঠিবে, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের এই আশঙ্কা নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নীতির ফলে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে বাধা উৎপাদিত হইবে, মৌলভী হাসান আলির এই কথার উত্তরে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, এইরূপ কোনও আশঙ্কার কারণ নাই; বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ব্যবস্থানুসারে বালিকাদের কোনও বিদ্যালয়ে পড়িবার দরকার হয় না; তাহারা গৃহে পড়িয়া যে কোনও পরীক্ষা দিতে পারে।

বালিকাদের জন্য যে ব্যবস্থা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, বালকদিগের শিক্ষার জন্যও যদি ঠিক ততটুকু মাত্র সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা কি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা হইবে? যদি না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বালিকাদের জন্যও বর্ত্তমান ব্যবস্থার অতিরিক্ত কিছু করিবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

যাঁহারা বিরুদ্ধবাদীদের কথার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছেন, তাঁহাদের মনে রাখা দরকার যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তনের সময়, বিরুদ্ধ বাদীরা খুব প্রবল এবং শক্তিশালী ছিলেন ; স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তকদিগকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সহিত লড়িতে হইয়াছিল এবং বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

স্ত্রীপুরুষের একত্র মেলামেশা বা একত্র অবস্থানকে আমরা যে এতটা ভয়ের চক্ষে দেখি, তাহার পশ্চাতে আমাদের দুর্ব্বলতা এবং আত্ম-বিশ্বাসের অভাবের পরিচয় আছে। ইহা আমাদের গৌরবের বস্তু নহে, লজ্জার কথা।

দেশ-প্রেমিক, চিন্তাশীল মনীষি ও লেখক, পরলোকগত নেতা, লালা লজপত রায়ের এ সম্বন্ধীয় একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বালক বালিকাদিগকে পৃথক না রাখিয়া, পরস্পরের সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত। আমার বিবেচনায়, তাহাদিগকে মিশিতে দিলে যে ক্ষত হয়, পৃথক রাখিলে তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি হয়।......"

"অন্যান্য জাতির অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভবান হইতে না পারিলে, আমাদের উদ্যমের অনেক অপব্যয় হইবে। আমাদের নীতি ও শীলতা সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, তাহার পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। সঙ্কোচহীনতা, স্বাধীনতা ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের বালক-বালিকাদিগকে বাড়িতে দিতে হইবে ; তাহাদিগকে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করিলে চলিবে না। সন্দেহ বা অবিশ্বাস, ভণ্ডামি, চাটুকারিতা এবং রুগ্নতা উৎপাদন করে।"

[ভাষান্তরিত : The Problem of national education in India. Page 52, 53]

বাংলা কাউন্সিল ও পুনা-চুক্তি

পুনা-চুক্তি সংশোধনের জন্য, প্রধান-মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট অনুরোধজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত জে-এন-ব্যানার্জ্জী মহাশয় কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হইয়া ৩৬—২১ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব এবং ইহার সমর্থক আন্দোলন দেশের ভবিষ্যৎ সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে ও হিন্দু-সমাজের দুই প্রান্তের মধ্যে অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও কলহের সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি।

এই মতের অনুবর্ত্তীরা প্রধানতঃ যে সকল কারণে ইহার সমর্থন করিতেছেন তাহার আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। তাহারা বলিতেছেন, পুনাচুক্তিতেও প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সমাজকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে বলিয়া, ইহা হিন্দু-সমাজের অখণ্ড ঐক্যকে বিনষ্ট করিয়া তাহাকে শক্তিহীন করিয়া ফেলিবে এবং কতকগুলি লোককে অত্যন্ত অধিক সুবিধা দিয়া, এই অবস্থাকে চিরস্থায়ী করিবার অনুকূলে একটি প্রবল দল সৃষ্টি করিবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের যে ব্যবস্থার প্রতিবাদ-স্বরূপ মহাত্মাজীর উপবাস এবং পুনাচুক্তির উৎপত্তি ইঁহারা মনে করেন, সেই ব্যবস্থা অপেক্ষা বর্ত্তমান ব্যবস্থা নিকৃষ্টতর, এবং বাংলার বর্ণ-হিন্দুদের পক্ষে ইহার ভাবী ফল বিশেষভাবে মারাত্মক। বাংলায় অস্পৃশ্যতা-সমস্যা বিশেষ প্রবল নহে এবং প্রকৃত অস্পৃশ্যদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। ইহাদের জন্য ৩০টি সদস্যপদ রক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা অবিচার মূলক এবং বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে ইহার প্রণেতাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। এই চুক্তি বাংলার বর্ণহিন্দুদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য না হইবার আরও একটা কারণ এই দেখান হইয়াছে যে, এই সিদ্ধান্তে পৌছিবার সময় বাংলার প্রতিনিধি-স্থানীয় কোনও ব্যক্তি এখানে উপস্থিত ছিলেন না এবং বাংলার পক্ষে ইহাতে কেহ স্বাক্ষরও করেন নাই।

এই সকল কথা অল্পাধিক পরিমাণে সত্য হইলেও, ইহা পুনাচুক্তির ত্রুটির দিকটার অতিরঞ্জিত কথা মাত্র। ইহার অন্যদিকেও যে সকল কথা আছে, তাহা উপেক্ষা করিবার মত নয়।

নির্ব্বাচন সম্বন্ধে দ্বৈত-ব্যবস্থা এবং সদস্যপদ সংরক্ষণ হিন্দু সমাজের সংহতি কিছু পরিমাণে যে নষ্ট করিবে তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু, কি অবস্থায়, এবং কি কি ঘটনার সমবায়ে এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইবার মত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ভাল ভাবে বিচার না করিয়া, ইহার বিরুদ্ধে কোনও প্রকার আন্দোলন চালান, এইজন্য উচিত

হইবে না যে, তাহা হিন্দু সমাজে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং আত্ম-কলহের সৃষ্টি করিতে পারে, এবং বর্ত্তমানের মিলন ও বন্ধুত্বের আবহাওয়াকে নষ্ট করিতে পারে; অথচ, এই প্রকার আন্দোলনের ফলে, ইহা প্রত্যাহৃত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না।

বাংলার হিন্দু সমাজে বাস্তবিক পক্ষে দুইটি দল আছে কিনা? কোনও কাল্পনিক বিরোধকে অযথা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে কিনা?

সত্যের খাতিরে আমাদের একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমে প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সাম্প্রদায়িক মীমাংসায়, হিন্দু সমাজের অনুন্নত স্তরের লোকদের কতকাংশকে বিশিষ্ট সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইলেও, অনেক পূর্ব্ব হইতেই সমাজে এই ভেদজ্ঞান ও বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষার জন্য ও বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য দেশময় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং দেশের সর্ব্বত্র দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষুদ্র-বৃহৎ ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়া ও স্থানে স্থানে মন্দির সত্যাগ্রহ বা সভাসমিতির অধিবেশনের ন্যায় সমবেত এবং জন-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। দেশের ভিতরের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা জানেন, হিন্দু-সমাজ দুইটি বিরুদ্ধ সামাজিক-স্বার্থ-বিশিষ্ট দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং এই দুই দলের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করিতেছিল।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যের সাম্প্রদায়িক অনৈক্য যেমন অনেক সময় কাল্পনিক কারণে এবং বাহিরের লোকের প্ররোচনায় ঘটিয়া থাকে, আলোচ্য ক্ষেত্রে অসন্তোষের কারণ সেরূপ ভিত্তিহীন বা অলীক নহে। সমাজের বহুসংখ্যক লোকের নিতান্ত স্বাভাবিক অধিকার এখানে অস্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে অসম্মানে হীন করিয়া রাখা হইয়াছে।

বাংলাদেশে অস্পৃশ্য কাহারা? এখানে অস্পৃশ্যতার স্বরূপ এবং অনুন্নতদের অভিযোগের কারণ কি?

বাংলাদেশে অস্পৃশ্যতা বিশেষ তীব্র অথবা ব্যাপক নহে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা দক্ষিণ ভারতের ২।১ স্থানে ইহার তীব্রতার সহিত বাংলাদেশের তুলনা করিয়া, এবং যে সকল জাতির লোকের স্পর্শ অশুচি বলিয়া মনে করা হয়, মাত্র তাহাদিগকে অস্পৃশ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া বর্ত্তমান অসন্তোষের মূলসূত্রটি ভুলিয়া যান।

যাহাদের স্পর্শ অশুচি বলিয়া গণ্য করা হয় না, এমন বহু সম্প্রদায়ের জল বর্ণহিন্দুদের নিকট গ্রহণীয় নহে। অন্য সর্ব্বপ্রকারেও এই সকল সম্প্রদায় সমাজ পরিত্যক্ত এবং সমাজের বহির্ভূত হইয়া রহিয়াছে। দেশের সাধারণ রীতি অনুসারে, এই সকল শ্রেণীর লোক, তথাকথিত উচ্চ-জাতিদের সহিত একাসনে বসিতে পারে না, খাবারের দোকানে অথবা হোটেলে ঢুকিতে পারে না, ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির সহিত এক মেসে থাকিতে পারে না, দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং অনেকে বিদ্যা ও গুণ থাকিলেও উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হয় না। নাপিত ইহাদের ক্ষৌরকার্য্য করে না, ধোবা বস্ত্র পরিষ্কার করে না এবং বেহারা বহন করে না এই সকল ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া অনেক সময় আবার বিশেষ অপমানকর ব্যাপার সকল ঘটে এবং নিদারুণ মনক্ষোভের কারণ উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে এই সকল লোকের মনে অসন্তোষ বা বিদ্বেষের ভাব জাগা এবং যাহারা তাহাদিগকে নিতান্ত স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার সমূহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা, মনে আসা অসম্ভব নহে। মাদ্রাজে ইহাদের সমশ্রেণীস্থ লোকদের অবস্থা আরও খারাপ, ও এই দেশেরই আর কতকগুলি লোকের অবস্থা এতদপেক্ষাও হীন, এই কথা মনে করিয়া অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা আশ্বস্ত হইবেন বা সন্তুষ্ট থাকিবেন, যদি কেহ এরূপ মনে করিয়া থাকেন, তবে মানবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের প্রশংসা করা যায় না।

বর্ত্তমান যুগ, আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে সর্ব্বদিক দিয়া নিঃসন্দেহ জাগরণের যুগ। কোনও একটি বিশেষ স্থানের অন্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য আলো প্রজ্জ্বলিত করিলেও, তাহা যেমন চারিপাশের সকল স্থানের অন্ধকার দূর না করিয়া ক্ষান্ত হয় না, কোনও দেশে মানব-চিত্তের যখন উদ্বোধন হয়, তখন তাহা, তেমনি কোনও একটা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। মানুষকে সকল দিক দিয়া তাহা সজাগ এবং সচেতন করিয়া তুলে। যাহারা অনেকদিন ধরিয়া লাঞ্ছনা এবং অপমান সহ্য করিতেছিল, আমাদের রাজনীতিক অধিকার লাভের চেষ্টা তাহাদের মনে আত্মসম্মান ও সামাজিক অধিকার লাভের ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিয়াছে। এই ইচ্ছা সুপরিচালিত হইলে, সকলের সাহায্য এবং সহানুভূতি পুষ্ট হইলে, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইতে পারিত। কিন্তু, দেশের অগ্রবর্ত্তীরা একদিকে নিজেদের চিন্তা, কথা ও কার্য্য এবং অন্যদিকের আচরণ এবং কার্য্যের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করিতে না পারায়, সামাজিক জীবনে একটা বিশৃঙ্খলা সম্ভব হইয়াছে।

রাজনীতিক পরাধীনতা আমাদের যে সকল দুঃখ বা হীনতার কারণ হইয়াছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাহার স্পর্শ অপেক্ষাকৃত পরোক্ষ; কিন্তু, আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায়, সামাজিক অসম্মানের গ্লানি, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং তীব্র। কাজেই, আমাদের রাজনীতিক অধিকার লাভের চেষ্টায়, স্বভাবতঃই কতকগুলি লোকের মন, তাহাদের সর্ব্বপ্রধান দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। এই অবিচার দূর করিবার জন্য এবং এই সকল লোকের সঙ্গত দাবী মিটাইবার জন্য, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কিছু কিছু উদ্যম এবং চেষ্টা বরাবর অবশ্য দেখা গিয়াছে। কিন্তু, এই চেষ্টা সাধারণ সমাজজীবনকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের সকল প্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকারের দাবীকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা প্রাণপণে অস্বীকার করিয়া ও বাধা দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের এই সহানুভূতিহীন ব্যবহার এবং অপরিবর্ত্তিত মনোভাব সমাজের নিম্নস্তরের মনের উপর কি প্রকার প্রতিক্রিয়া করিয়াছে, এই সকল লোককে তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের উপর কি প্রকার বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে তাহার সন্ধান, যাঁহারা এই সকল লোকের নিকট সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই রাখেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে এই সমস্যা কি করিয়া আসিয়া পড়িল?

সামাজিক এই দলাদলিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টানিয়া আনা অবশ্য কোনও ক্রমে আমরা সঙ্গত মনে করি না। কিন্তু ইহা যে গণতান্ত্রিক নীতির কথা, ভারতীয় রাষ্ট্র গঠনে সে নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কল্পিত স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত এবং অপরকে বিশ্বাস করিতে অসম্মত। এরূপ ক্ষেত্রে অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুদের মনে যদি এই সন্দেহ জাগিয়া থাকে যে, যাহারা চিরদিন তাহাদিগকে অবহেলা ও উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, কখনও তাহাদের মঙ্গলকে নিজেদের মঙ্গল বলিয়া মনে করে নাই, তাহাদের দ্বারা ইহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে না; অথবা আর একটু অগ্রসর হইয়া যদি একথা ভাবে যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে যে আর্থিক, মানসিক এবং প্রতিপত্তি-জাত ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহা এই সকল লোকের রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা হইলে তাহা বিশেষ কিছু অন্যায় বা অসঙ্গত হইবে না। এই প্রকার সন্দিগ্ধ মনোভাব হইতেই রাজনীতি ক্ষেত্রে পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবী এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে থাকে।

প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার সাম্প্রদায়িক মীমাংসায় যদি তাঁহাদের এ দাবী স্বীকার করিয়া না লইতেন, এবং বর্ণহিন্দুরা কার্য্যক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত মনোভাব এবং সম্প্রীতির পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এই অসন্তোষ এবং অবিশ্বাসের ভাব হয়ত দূর হইত। তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধিত অসন্তোষ এবং অন্য দিকে মুসলমান সমাজের অটুট সংহতি হইতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও এতদিনে সম্ভবতঃ এ শিক্ষাটুকু লাভ করিয়াছিলেন যাহাতে, হিন্দুসমাজের সঙ্ঘবদ্ধতা এবং স্বার্থ-সমন্বয়ের জন্য তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু, প্রধান মন্ত্রী

মহাশয়ের সাম্প্রদায়িক মীমাংসা, অবস্থার গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। তখন, ব্যাপার এই দাঁড়াইল যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অপর পক্ষ স্বতন্ত্র রাজনীতিক অধিকার লাভ করিলেন। ইহাতে অসন্তোষ এবং বিরুদ্ধতা বাড়িয়া যাইত, আরও বেশী অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন চলিত এবং একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পরে পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা উঠিয়া যাইবার যে বিধি ছিল আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি না হইলে, তাহা কখনও কার্য্যে পরিণত হইত না। রাষ্ট্রিক কোনও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার পরিণতি, সম্পূর্ণরূপে ভবিষ্যতের অবস্থার উপর নির্ভর করে; অবস্থার বিরোধী হইলে পূর্ব্বনির্দ্দেশ অচল এবং অর্থহীন হইয়া পড়ে।

কাজেই, রাজনীতিক্ষেত্রে এই সমস্যা আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসিয়া পড়িয়াছিল, এবং অনেকটা বাধ্য হইয়াই, বৃহত্তর অমঙ্গলকে রোধ করিবার জন্য ইহাকে কতক পরিমাণে স্বীকার করিয়া লওয়া অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

পুনা চুক্তিতে আমাদের লাভ কি হইয়াছে?

পুণা চুক্তিতে দ্বৈত-ব্যবস্থা রহিয়া গিয়াছে এবং অনুন্নতদের অধিকসংখ্যক সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই, এ ব্যবস্থা কিসে উৎকৃষ্টতর হইল, একথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। অস্পৃশ্যদের অধিক সংখ্যক সদস্যপদ দেওয়ায় লাভালাভের কথা, উত্থাপন করা এইজন্য অন্যায় যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের দাবীর উত্তরে বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, ইঁহাদের সমগ্র সদস্যপদ ছাড়িয়া দিতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। বস্তুতঃও আপত্তির সত্য কারণ নাই। কারণ, রাজনীতিক দলের সৃষ্টি হইয়াছে এখানে ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া। হিন্দুদের ধর্ম্মগত স্বার্থ যেখানে ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকিবে, সকল হিন্দুই সেখানে তাহাতে প্রাণপণে বাধা প্রদান করিবে। অন্যপ্রকার স্বার্থের যেখানে সংঘাত বাধিবে, সেখানে, অন্যপ্রকার দলের সৃষ্টি হইবে এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণও স্বার্থানুসারে একত্রে কোনও ব্যাপারের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যাইবেন।

৩০টি পদ রক্ষিত থাকায়, এই ৩০টি পদের সুবিধা হইতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বঞ্চিত হইলেন, অথচ অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য ৩০টি পদের বিশেষ ব্যবস্থা ত থাকিলই এবং অবশিষ্ট ৫০টি পদও তাহাদের নিকট অবরুদ্ধ রহিল না। এই দিক দিয়া ইঁহারা অতিরিক্ত সুবিধা কিছু যে পাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এসম্বন্ধে মহাত্মাজী বারবার বলিয়াছেন, এবং আমাদেরও তাহাই দৃঢ়বিশ্বাস যে, যাহাদের পাপে সমাজ দেহে এই ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই মাত্র তাহার আরোগ্য বিধান হইতে পারে। বাধ্য হইয়া কিছু ছাড়িয়া দেওয়া এবং ইচ্ছা করিয়া কিছু ত্যাগ করা, এতদুভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেকখানি রহিয়াছে এবং মানুষের মনের উপর তাহার ফলও বিভিন্ন প্রকারের। এই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ত্যাগ বহুদিনের সঞ্চিত অবিশ্বাস এবং অসন্তোষ অনেক পরিমাণে দূর করিয়া, হিন্দুসমাজকে ক্রত ঐক্যের দিকে লইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু, পুনাচুক্তিতে, আসল ত্রুটি যাহা রহিয়া গিয়াছে, তাহা হইতেছে, ইহার দ্বারা দ্বৈত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। কিন্তু, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহা নানাদিক দিয়া এমন অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, এটুকু স্বীকার করিয়া লওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। ইহা দ্বারা পরোক্ষ লাভ যাহা হইয়াছে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যদি উদ্যমের সহিত তাহা কাজে লাগাইতে পারেন, তবে, বর্ত্তমানের ত্রুটি শীঘ্রই সংশোধিত হইবার আশা আছে। যদি তাঁহারা নিজেদের কার্য্য এবং আচরণের দ্বারা বর্ত্তমানের অবিশ্বাস এবং সন্দেহের ভাব দূর করিয়া বিশ্বাস উৎপাদন এবং মৈত্রী স্থাপন করিতে পারেন, সকল হিন্দুর মনেই গোটা হিন্দুসমাজের প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে পারেন, তাহা হইলে, উপসাম্প্রদায়িক স্বার্থ অপেক্ষা সমগ্র হিন্দু সমাজের কল্যাণ সকলেই বড় করিয়া দেখিবেন এবং হিন্দুসমাজকে দ্বিধা বিভক্ত হইতে দেখিয়া বর্ত্তমানে বর্ণ হিন্দুরা যেরূপ বিচলিত হইয়াছেন, অন্যেরাও সে সময়ে তদ্রূপ হইবেন।

বাংলাদেশে মন্দির-প্রবেশের অধিকার কাহাদের আছে

বাংলাদেশে মাত্র কয়েকটি সাধারণ দেবমন্দির আছে, এবং সেখানে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে; কাজেই, মন্দির প্রবেশে অধিকার না থাকাকে যদি অস্পৃশ্যতার মাপকাঠি ধরিতে হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশে অস্পৃশ্যতা নাই, শ্রীযুত জে-এল-ব্যানার্জ্জী মহাশয় এই প্রকারের কথা বলিয়াছেন। কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অনুন্নতদের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত। এই বিভাগানুযায়ী একদলভুক্তদের স্বার্থ যে এক প্রকারের নহে এবং অনেক স্থলে একদলভুক্ত দুই সম্প্রদায় অপেক্ষা দুই শ্রেণীভুক্ত দুই সম্প্রদায়ের স্বার্থের সম্বন্ধ যে অধিকতর ঘনিষ্ট তাহা, ফাল্গুন সংখ্যা বিচিত্রায় দেখান হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তিতে সাধারণের মধ্যে কিছু ভুল ধারণার উদ্ভব হওয়া সম্ভব।

সাধারণ বলিতে নিশ্চয়ই 'বিখ্যাত' বুঝায় না। যদি না বুঝায়, তাহা হইলে, বাংলাদেশের অনেক সহরে এবং অনেক পল্লীতে বহু সংখ্যক সাধারণ দেবালয় আছে, তদপেক্ষাও অনেক অধিক সংখ্যায় সাময়িক সাধারণ পূজাদি হইয়া থাকে। এই সকল মন্দিরে এবং পূজাগৃহে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও নবশাখ শ্রেণীর হিন্দু ব্যতীত অন্য কেহ প্রবেশ করিতে পারেন না। ইহাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়েরই স্পর্শ অশুচি নহে। সাধারণ ব্রাহ্মণেরাও ইহাদের পৌরোহিত্য করেন না; করিলে পতিত বলিয়া গণ্য হন।

তাহার পর, কোন সম্প্রদায়ের মন্দির প্রবেশে অধিকার আছে কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য, 'সাধারণ,' 'ব্যক্তিগত', 'বিখ্যাত' বা 'অবিখ্যাত', মন্দিরের এইরূপ কোনও শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সমগ্র দেশের ব্যক্তিগত মন্দির সমূহে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকের যদি প্রবেশাধিকার না থাকে, অথচ অন্য কোনও কোনও সম্প্রদায়ের লোকের যদি এই সকল স্থানে প্রবেশের বাধা না থাকে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের লোকের মন্দির প্রবেশে যে অধিকার নাই, এই তথ্য হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ দুই একটি মন্দিরে প্রবেশ অধিকারকে ব্যতিক্রমস্থল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাষ, শুধুমাত্র সভাসমিতি বা সাধারণ স্থানের জন্য নহে; ইহাকে যে আমাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনেও সত্য ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে, একথাটা আমাদের বিশেষভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

নব গঠিত উড়িষ্যা প্রদেশ

উড়িয়াভাষী অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার সংকল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং এই প্রস্তাবিত নূতন প্রদেশের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উড়িষ্যার নিজস্ব সাহিত্য, সভ্যতা, জাতীয়তা এবং বৈশিষ্ট্য আছে। উড়িয়াভাষীর সংখ্যা বর্ত্তমানে ১,১১,৯৪২৬৫ ইঁহাদিগকে এতদিন বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখায়, জাতীয় প্রগতির বিভিন্ন দিকে ইঁহাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। উড়িষ্যার বর্ত্তমান পশ্চাদ্বর্ত্তিতার ইহাই প্রধানতম কারণ। বিলম্বে হইলেও ইঁহাদের এই একান্ত সঙ্গত অধিকার যে এতদিনে প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা বিশেষ সুখের বিষয়। আশা করা যায়, উড়িষ্যা এবার দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে; বিশেষ করিয়া এতদিন একটি হিন্দীভাষী প্রদেশের সহিত যুক্ত থাকায়, তাঁহার ভাষা ও সাহিত্য যে, সম্মান ও উৎসাহ হইতে বঞ্চিত ছিল, এইবার তাহা দূরীভূত হইবে।

ইহাতে বাংলারও একটা পরোক্ষ লাভ হইবে। বাংলার সহিত উড়িষ্যার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়াও এই সম্পর্ক রহিয়াছে। বহু সংখ্যক উড়িয়া বাংলা বলিতে পারেন এবং অনেকে লিখিতেও পড়িতেও পারেন; বাংলা ভাষার সহিত উড়িয়া ভাষার আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও খুবই নিকট। এই সম্বন্ধ বর্ত্তমানে আরও দৃঢ়ীকৃত হইবে, আশা করিতে পারা যায়। উড়িয়ারা তাঁহাদের ভাষার উন্নতি এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য স্বভাবতঃই বাংলার দিকে তাকাইবেন। ইহাতে যেমন একদিকে বাংলা সাহিত্য একটি নূতন ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবে

অন্যদিকে তেমনি, উভয় প্রদেশের মধ্যে ভাব ও চিন্তাগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কিন্তু, গোড়া হইতেই উভয় প্রদেশের মধ্যে যাহাতে বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এইরূপ প্রকাশ, মেদিনীপুর জেলার কতকাংশকে এই নবগঠিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা এখনও চলিতেছে। এই প্রকারের চেষ্টা বাংলার পক্ষে ও উভয় প্রদেশের সম্বন্ধের পক্ষে সবিশেষ ক্ষতিকর। বাংলা ভাষী অনেকটা অঞ্চলকে অন্যায় করিয়া বর্তমান বিহার উড়িষ্যার মধ্যে রাখায় এই সকল স্থানের বাঙ্গালীর নানা স্বাভাবিক সুবিধা নষ্ট করা হইয়াছে, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে এবং গোটা বাঙ্গালীজাতির শক্তিকে খর্ব্ব করা হইয়াছে। আসামের সহিত যে সকল বাঙ্গালীকে যুক্ত রাখা হইয়াছে, তাঁহাদের দুর্দ্দশা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও, সমস্ত বাংলা ভাষী অঞ্চলকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বাঙ্গালীরা বরাবর আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন, এবং একাধিকবার সরকারের নিকট হইতে আশ্বাসও পাইয়াছেন। কিন্তু, ইহার অধিক এ ব্যাপার আজও অগ্রসর হয় নাই। ইহার পরও যদি বাংলাকে আরও কর্ত্তিত করা হয়, তবে, বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ মনক্ষোভের কারণ হইবে।

কোনও প্রদেশের ভাষিক সীমানা

কোনও দুইটি ভাষার একই সীমান্ত প্রদেশের ভাষা অনেকটা এক প্রকারের। এই স্থানগুলি কোন্ ভাষার অধিকারভুক্ত তাহা স্থির করা বাস্তবিক পক্ষে দুরূহ। কাজেই, উভয় প্রদেশের লোকেরাই এইরূপ স্থানগুলিকে নিজ নিজ প্রাপ্য বলিয়া দাবী করেন এবং সেই প্রকার বিশ্বাসও করেন। আবার উভয় প্রদেশেরই মধ্যাস্থলবর্ত্তী এবং অপর প্রান্তবর্ত্তী লোকেরা এই সকল স্থানে আসিয়া বাস করিয়া এবং নিজ নিজ ভাষা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যাপারটিকে জটিলতর করিয়া তুলেন। কাজেই, এই সকল স্থানের স্থানীয় অধিবাসীদের প্রকৃত ভাষা কি, তাহা ভাষাবিদ্‌দিগের একটা কমিশন নিয়োগ করিয়া স্থির করা উচিত। তাঁহাদের সমাজবন্ধন কোন্ দেশের সহিত, জাতিহিসাবে তাঁহারা কোন্ প্রদেশের লোক, দেশের ভৌগলিক সীমানা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহাদের এ বিষয়ে ইচ্ছা কি, তাহা ভালভাবে নির্ণয় করিয়া কোন্ স্থান কোন প্রদেশের অন্তর্গত হইবে তাহা স্থির করা উচিত।

যুদ্ধবিরোধী মনোভাব

মানুষের সভ্যতার ও সার মনুষ্যত্বের সব চেয়ে বড় শত্রু যুদ্ধ। যুদ্ধে এপর্য্যন্ত মানুষের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার যত অমূল্য সঞ্চয় নষ্ট হইয়াছে, এমন আর কিছুতে হইতে পারে নাই। এখনও যুদ্ধ এবং যুদ্ধের আয়োজনে সমগ্র পৃথিবীতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা যদি মানবের হিতকর কার্য্য সমূহে ব্যয়িত হইতে পারিত, তাহা হইলে এতদিনে মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বাড়িয়া যাইত। যুদ্ধে বহু ব্যাপক ভাবে এমন সব নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতার অনুষ্ঠান হয়, যাহা ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ অনেকদিন হইতে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সভ্য মানুষের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা যে, জাতিগত বা সমষ্টিগত জীবনে আজও সে এসকল কাজকে গৌরবের বলিয়া মনে করে। সমস্ত মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল যাঁহারা কামনা করেন, পৃথিবী ব্যাপিয়া যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ।

ইউরোপে একশ্রেণীর লোকের মন যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাঁহারা সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য যে দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আশার কথা।

বিলাতের যুদ্ধ-বিরোধী জাতীয় সঙ্ঘ, ছেলেদের মনের উপর, Empire day উৎসবের অবাঞ্ছনীয় ফলের দিকে, ইংলণ্ডের স্কুল সমূহের কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং ঐ দিনে স্কুল হইতে ছেলেদের সরাইয়া লইবার ভয়ও দেখাইয়াছেন। হাউস্-অফ-কমন্সে নৌ-সম্বন্ধীয় আলোচনা কালে একজন যুবক ও একজন যুবতী যুদ্ধ-বিরোধী পত্রিকা ছড়াইতে থাকেন ও একজন মহিলা দর্শকমঞ্চ হইতে যুদ্ধ-বিরোধী চীৎকার করিতে থাকেন।

ইঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি সকলের অনুমোদন যোগ্য না হইলেও, ইঁহাদের আদর্শ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়মাবলীর প্রস্তাবিত সংস্কার—প্রবেশিকার বর্ত্তমান পাঠাপদ্ধতির সংস্কার, বিশেষ করিয়া শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত সংস্কার অনেকদিন গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষা করিয়া আছে। এইরূপ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কার্য্যের গতি একটু দ্রুত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু, গভর্ণরের উপাধি-বিতরণী সভার বক্তৃতা হইতে বুঝা গেল, এ সম্বন্ধে সরকার এখনও মতিস্থির করেন নাই। এবিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার জন্য লাট সাহেব একটি কন্‌ফারেন্সের পরামর্শ দিয়াছেন।

বাঙ্গালীর অকৃতকার্য্যতা—উক্ত বক্তৃতায়, গভর্ণর বাঙ্গালী যুবকদের নিখিল-ভারতীয় প্রতিযোগিতা পরীক্ষাগুলিতে অসাফল্যের কথা এবং আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষামানের অপকর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানের বাঙ্গালী যুবকেরা প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় যে তাঁহাদের পূর্ব্বগামীদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছেন না, ইহা সকল বাঙ্গালীই লক্ষ্য করিতেছেন এবং এজন্য পীড়া অনুভব করিতেছেন।

অন্যান্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা-মান উচ্চতর এবং শিক্ষাপদ্ধতি উৎকৃষ্টতর হওয়া সম্ভব।

অন্য যে কোনও দুই প্রদেশের স্কুলের একত্রিত সংখ্যা অপেক্ষা, বাংলায় স্কুলের সংখ্যা অধিক। কাজেই স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা ও অর্থ কম এবং তাহার ফলে শিক্ষাদান নিকৃষ্ট। বিগত পাঁচ বৎসরে বাংলায় কলেজের সংখ্যা ৭ বাড়িয়াছে, (৪৪—৫১) অথচ ছাত্রসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার কমিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন চেষ্টা—সার ডেনিয়েল হ্যামিল্‌টনের পরিকল্পনানুসারে, সমবায় প্রচেষ্টা, গ্রাম সংগঠন, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি কার্য্যে, ভদ্রশ্রেণীর কিছু সংখ্যক যুবককে নিযুক্ত করিবার কি করা যায়, সে বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমিতি নিয়োগ করিয়াছেন। এই চেষ্টা বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়।

ছাত্রদের মধ্যে ক্ষয়রোগের প্রসার—মেডিক্যাল-কলেজ-হাসপাতালে যে সকল রোগীর যক্ষ্মা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি ছয়জনের মধ্যে একজন ছাত্র, এবং এই ছাত্রদের শতকরা ৭৫ জন কলিকাতার ভিন্ন কলেজে অধ্যয়ন করে। এসংবাদ বাস্তবিকই অতিশয় ভয়াবহ। ছাত্রদের স্বাস্থ্য-হীনতার নানাপ্রকার কারণ আছে। কিন্তু, দারিদ্র্য এবং পুষ্টিকর খাদ্য-সংগ্রহে অক্ষমতাই সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

বাঙ্গালীদের স্বাস্থ্য—বাঙ্গালী এবং অন্যান্য ভারতীয়দের শারীরিক অবনতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় লিখিয়াছেন :—

"লর্ডমিণ্টো গত শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি বাঙ্গালীদের শরীর সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, আমি এমন সুন্দর জাতি কখনও দেখি নাই। মাদ্রাজীদের গঠনেরও আমি প্রশংসা করিয়াছিলাম; কিন্তু, তাহাদের অপেক্ষা ইহারা অনেক অধিকতর উৎকৃষ্ট; ইহাদের আকৃতি দীর্ঘ ও বীরোচিত, শরীর পেশীবহুল, গঠন নিখুঁত এবং মুখাবয়বাদি সাতিশয় শ্রী ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন। হায়! বাঙ্গালীদের সাধারণ বর্ণনায় ইহার বিপরীত কথাই বর্ত্তমানে সত্য হইবে!

এইরূপ সুস্পষ্ট শারীরিক অবনতি লোকের লক্ষ্য এড়াইতে পারে নাই। পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু, ইহাকে তাঁহার অভিজ্ঞতার একটি প্রধান ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরও আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে যাঁহারা ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ইউ-এন মুখার্জ্জী, রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল কান্তপ্রসাদ, আই-এম্‌-এস্‌, বলেন 'যাঁহারা এই বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিমত এই যে, আমাদের শিক্ষিত যুবকদের শতকরা ৫০ জনের উপর ক্ষয়রোগের সম্ভাবনাযুক্ত, এবং ইহারা কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহারা এই ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পায়, তাহারা ৪০এর পূর্ব্বেই বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হয়, এবং ৬০ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মারা যায়।' এই লেখক আরও বলেন, 'যাঁহারা ভারতবর্ষ ও তাহার অধিবাসীদের সম্বন্ধে সম্যক তথ্য অবগত আছেন, তাঁহাদের মত এই যে, ভারতবর্ষের যোদ্ধৃ-জাতিদেরও অবনতি ঘটিতেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতের প্রত্যেক জাতি দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চি কমিয়া গিয়াছে'।" [মর্ম্মানুবাদ]

পৃথিবীর অন্য সকল জাতিই যে সময়ে শারীরিক দৈর্ঘ্যে ও ওজনে বাড়িয়াছে, আয়ুষ্কাল বাড়াইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার সংক্রামক এবং অন্যবিধ নিবারণযোগ্য ব্যাধি দূর করিয়াছে, তখন, ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের অবস্থা এই!

সুশীলকুমার বসু

—০—

পুস্তক পরিচয়

আবদুল্লাহ—কাজী ইম্‌দাদুল হক্‌ বি-এ, বি-টি প্রণীত; দাম দুই টাকা। ১১।৫, কড়েয়া বাজার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক মুসলমান্‌ লেখক বাংলা ভাষায় লিখিয়া নাম করিয়াছেন ও বাংলা ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। এই উপন্যাসখানিও মোটের উপর খুবই ভালো হইয়াছে। আবদুল্লার চরিত্র অতি সুন্দর ও সহজভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাষা ও ভাব বেশ ঝরঝরে। আশা করি পাঠকদের নিকট বইখানির সম্যক আদর হইবে।

শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস

WHAT IS MUSIC? DOES IT HELP EDUCATION? by Opendra Chandra Singh, Published by the author, from 13, Bechu Chatterjee Street, Calcutta, Price As -/4/- only.

এই পুস্তিকাখানিতে দুইটি প্রবন্ধ আছে। প্রথম প্রবন্ধে সঙ্গীত কাহাকে বলে, সাধারণ শব্দের সহিত সঙ্গীতের পার্থক্য, সঙ্গীতের ধর্ম্ম এবং বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে সঙ্গীত আমাদের শিক্ষার সৌকর্য্য বিধান করিতে পারে কিনা সে বিষয়ে সম্যক্‌ আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ভাগলপুর সঙ্গীতালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায় লেখক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। শাস্ত্রে আছে "ধ্যান হইতে জপ শ্রেষ্ঠ এবং জপ হইতে গান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু গানের উপর কিছুই নাই।"—সঙ্গীতে পারদর্শী হওয়া সহজ-সাধ্য নয়; বহুদিনের সাধনা ও একাগ্রতা না থাকিলে তাহা হওয়া যায় না। আজকাল গলিতে-গলিতে, বৈঠকখানায়, চায়ের আড্ডায়, হারমোনিয়ম নামক শ্রুতিকটু যন্ত্রের ধ্বনি সহযোগে যে বিচিত্র স্বরলহরী শুনিতে পাওয়া যায় তাহাকে সঙ্গীত না বলিয়া ভারবাহী চতুষ্পদ জন্তু বিশেষের কণ্ঠস্বরের সহিত অথবা অশরীরী আত্মা-বিশেষের অনুনাসিক স্বরের সহিত তুলনা করা যায়। প্রাচীন ভারতে সঙ্গীতের যে কি পরিমাণ উন্নতি হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। গ্রন্থকার সেই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের কথা এবং শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে তাহার স্থান কোথায় হওয়া উচিত তাহা নানা প্রকার মূল্যবান ও সারগর্ভ প্রমাণ এবং যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। যে কোনও সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি যে তাঁহার সম-মতাবলম্বী হইবেন একথা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করি। পুস্তকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

স্বপন খেয়া—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বিরচিত। ১০।১ বি নেবুতলা রো, কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বড়াল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

এখানি একটি গান এবং স্বরলিপির বই। নির্ম্মলবাবু বাঙলা দেশের একজন খ্যাতনামা গীত-রচয়িতা। তিনি নিজে সুগায়ক, রাগরাগিণীর সহিত তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ, সুতরাং তাঁর গানগুলির মধ্যে কথা এবং সুরের যোগ সুসমঞ্জস এবং সুমধুর হয়। স্বপন-খেয়ার অনেকগুলি গানই আমাদের খুব ভালো লেগেছে। তাঁর অন্যান্য স্বরলিপির বইগুলির মতো এ বইখানিতেও পূর্ব্ব যশ অক্ষুণ্ণ রইল। সঙ্গীতরসিকগণ এ বইখানিতে আনন্দের সন্ধান পাবেন।

মনের খেলা—শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীভুবনমোহন মজুমদার বি-এস-সি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

এখানি একটি ছোট উপন্যাস—পত্র এবং প্রত্যুত্তরের আকারে লিখিত। আধুনিক শিক্ষিত দুইটি তরুণ তরুণীর সহসা সংস্পর্শ, পরে সংঘর্ষ, তৎপরে সুকঠোর বিরোধের মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রতি প্রসক্তি;—এবং সর্বশেষে সেই প্রসক্তির পরিণাম পরিণয়ের সুরঞ্জিত সম্ভাবনায়। সুতরাং গল্পটি যে কথা-সাহিত্যের নিত্যকালের সনাতন প্লট তা নিঃসন্দেহ। তথাপি সরল সাবলীল ভাষা, এবং ষ্টাইলের সুনিবদ্ধ সংযমের গুণে বইখানি উপভোগ্য হয়েছে। দুইটি ভুল-বোঝা মনকে অবলম্বন করে প্রতিদিনের ছোট ছোট ট্র্যাজেডি গুলি পাঠকের কৌতূহল এবং বেদনার আনন্দকে নিরন্তর জাগিয়ে রাখে। বইখানির অবতরণিকায় প্রকাশ এই বইখানি লেখকের 'সাধনার প্রথম ফল'। সুতরাং পরবর্তী ফলগুলি যে অধিকতর সুমধুর হবে সে আশা আমাদের রইল।

বইখানিতে অনেকগুলি অনুপেক্ষণীয় বানান ভুল চোখে পড়ল,—এমন কি প্রকাশকের নামের মধ্যেও। এ বিষয়ে ছাপাখানার এতটা শৈথিল্য অমার্জ্জনীয়।

দুপাতা—শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনীরেন্দ্র প্রসাদ সিংহ, ৬০ বি মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ছেলে মেয়েদের জন্য লিখিত এ বইখানি প'ড়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি। গদ্যে এবং পদ্যে গ্রন্থকর্ত্রী একজন শক্তিশালিনী লেখিকা। তাঁর অন্যান্য বইগুলি পাঠকসমাজে যেমন আদৃত হয়েচে এ বইখানিও তেমনি আদৃত হবে ব'লে আমরা বিশ্বাস করি। 'পৃথিবীর ডাক' নাটিকাটি অভিনয় ক'রে ছেলেমেয়েরা শুধু আনন্দই পাবে না—তাদের কল্পনা-বৃত্তিও উদ্বুদ্ধ হবে।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীরমেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত অনেকগুলি চিত্রের দ্বারা সুশোভিত হয়ে বইখানির মূল্য আরও বর্দ্ধিত হয়েচে।

সঁীথি-মৌর—শ্রীরাধারাণী দেবী প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

৩৪টি সনেটে গ্রথিত এই সঁীথি-মৌর কাব্যবইখানির বহিরাবরণ দেখলে বিবাহ-রাত্রের বধূর প্রসাধন সঁীথি-মৌর ব'লেই ভ্রম হবে। এর প্রচ্ছদের সম্মুখ পৃষ্ঠাখানি সঁীথি মৌরের অনুকরণে রাঙতা দিয়ে রচিত। বধূর মাথায় পরিয়ে দেবার জন্যে আসল সঁীথি-মৌরের অনুকরণে ইহাতে একটি বেষ্টনীও সংলগ্ন আছে। সুতরাং এরূপ প্রসাধনে সজ্জিত হয়ে এ বইখানি যে উপযোগিতায় বিবাহরাত্রের উপহারের অপর সকল বইকে পরাস্ত করেছে তা অসংশয়ে ব্যক্ত করা যায়।

এই ত গেল বহিরাবরণের কথা। কিন্তু ভিতরে যখন প্রবেশ করি তখন ৩৪টি সনেটের অনাবিল মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে যাই। 'প্রাণ-তীর্থযাত্রী' হয়ে কবি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন,—পথে কত বাধা কত বিঘ্ন কত গ্লানি কত নিন্দা,—তারই আঘাতে সংঘর্ষে এই কবিচিত্তকুসুমগুলি ফুটে উঠেচে। জীবনের যথার্থ স্বরূপ যার চক্ষে প্রতিভাত সে-ই বলতে পারে

> পঙ্কই দেখিতে পেলে !—পেলে শুধু গ্লানি
> ফুটেছে পঙ্কজ তাহে দেখিলেনা ভাই !
> দিলে মিথ্যা অপযশ,—শুনে লজ্জা পাই !
> সত্য আজি মূল্যহীন—কেমনে তা মানি ?

এই ৩৪টি কাব্যকুসুমের সৌরভে এবং সৌন্দর্য্যে কাব্যরসিকের চিত্ত সরস হবে। সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।

স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম—শ্রীবিধুভূষণ জানা প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅহিভূষণ চন্দ্র, তমলুক, মেদিনীপুর। মূল্য ১৵০ টাকা।

আমাদের এই হীনস্বাস্থ্য এবং দুর্ব্বল-দেহর দেশে এমন একখানি উপকারী এবং অতি প্রয়োজনীয় বই দেখলে মন উল্লসিত হয়। ইংরাজিতে যে একটি প্রবচন আছে, Health is Wealth, সেটির সত্যতা প্রমাণ করছে বিপরীত দিক দিয়ে আমাদের এই নিৰ্জ্জীব এবং নির্বীর্য্য বাঙলা দেশ। আমাদের সকল দৈন্যের মূলে স্বাস্থ্যের অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের Health Report থেকে বাঙলার ছাত্র-সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা অবগত হ'লে মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। বিচার্য্য বইখানি পাঠ ক'রে আমরা অতিশয় আনন্দিত হয়েচি। স্বাস্থ্য ব্যায়াম এবং আহার সম্বন্ধে এর উপদেশাবলী পালন করলে আমাদের ক্ষোভের কারণ বহুল পরিমাণে লাঘব হবে ব'লে আমরা মনে করি। পুস্তকের শেষে সন্নিবদ্ধ বাঙলা দেশের ব্যায়ামবীরগণের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয় এবং ফটোগ্রাফগুলি প্রাণে আশার সঞ্চার করে।

আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নানা কথা

"বঙ্গীয় শব্দকোষ"

বাংলা ভাষায় এই সুদীর্ঘ অভিধানখানি সঙ্কলিত করে শান্তিনিকেতনের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালী মাত্রেরই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সাতাশ বছরের কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার ফল এই অভিধানখানি বাংলাভাষার একটি অমূল্য গ্রন্থ। বাস্তবিক পক্ষে এমন বিরাট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান বাংলাভাষায় এই প্রথম। প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠায় এই বৃহৎ অভিধানখানি সম্পূর্ণ হবে। বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক বর্ত্তমান বৈশাখ মাস থেকে আরম্ভ করে ইহা খণ্ডাকারে প্রতিমাসে যতদিন না সম্পূর্ণ হয় ততদিন পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকবে। প্রত্যেক খণ্ড ডিমাই আট ফর্ম্মা বত্রিশ পৃষ্ঠা। দাম আট আনা ও ডাকমাশুল এক আনা। প্রতিমাসে নগদ আট আনা দামে জনসাধারণ এই অভিধানের এক এক খণ্ড ২১০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বিশ্বভারতী পুস্তকালয় থেকে কিনতে পারবেন; তা ছাড়া মাসিক ন' আনা হিসাবে ত্রৈমাসিক ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক গ্রাহক হবারও ব্যবস্থা আছে। শান্তিনিকেতন, জেলা বীরভূম এই ঠিকানায় লেখকের নিকট দাম পাঠালে গ্রাহকগণ বৈশাখ মাস থেকেই বই পাবেন।

অভিধানখানিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়েছে।

১। বাংলা ভাষায় প্রচলিত ও প্রয়োগযোগ্য সংস্কৃত শব্দ

২। প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা শব্দ।

৩। সংস্কৃত শব্দের পাণিনি ও ব্যুৎপত্তি ও সমাস।

৪। বাংলা তদ্ভব শব্দের মূল সংস্কৃত থেকে পালি ও প্রাকৃতের রূপ এবং বাংলা শব্দে অনুরূপ হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, সিন্ধী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার শব্দ।

৫। জমিদারী, মহাজনী, আদালত ও চিঠিপত্র প্রভৃতিতে ব্যবহৃত আরবী ও পার্শী শব্দ।

৬। ইংরেজী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি ভাষার বাংলায় প্রচলিত শব্দসমূহ ও ঐ সকল ভাষার শব্দের বিশুদ্ধ মূল রূপ।

৭। সংস্কৃত এবং প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার প্রচুর শিষ্ট প্রয়োগ।

৮। বাংলা প্রবচন অর্থ ও প্রয়োগসহ সংস্কৃত ধাতুর রূপ ও গুণ নির্দ্দেশ এবং মূল সংস্কৃত ধাতু ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ধাতুর সহিত বাংলা ধাতু ও তাহার প্রয়োগ সহ অর্থ।

৯। সংস্কৃত বিদ্যার্থীর জন্য সংস্কৃত কাব্যাদিতে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি সমাস ও অর্থসহ প্রয়োগ।

১০। সংস্কৃত শব্দের আবেস্ত ভাষায় আকৃতি ও গ্রীক্ ল্যাটিন প্রভৃতি প্রতীচ্য ভাষায় তুলনীয় সমপর্য্যায় শব্দ ইত্যাদি

এই রকম আরো নানা প্রয়োজনীয় বিষয় এই অভিধানে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এই বইএর বহুল প্রচার এবং এই বিরাট কর্ম্মে দেশবাসীর সহৃদয় সহানুভূতি কামনা করি।

প্রথম সবাক চিত্রশিল্পী

ঢাকার শ্রীবিনয়েন্দ্র সেন পাশ্চাত্য দেশ হ'তে সবাক চিত্রশিল্প শিক্ষা ক'রে কিছুদিন হ'ল দেশে ফিরে এসেছেন। এ দেশের সবাক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষিত। বেলজিয়মে Film Universityতে শিক্ষা

শ্রীবিনয়েন্দ্র সেন

সমাপন ক'রে তিনি সেখানে শিল্প ও শিক্ষা বিষয়ক (Industrial & Educational) প্রায় এক শত ছবি তুলেছেন। বেলজিয়মের প্রথম সবাক চিত্রে তিনি

সহকারী পরিচালক ও চিত্রশিল্পী (Technician) রূপে সুনামের সহিত কাজ করেছিলেন। জার্ম্মান দেশীয় বিখ্যাত UFA, AFA, Emilcar ইত্যাদি Studio পরিদর্শন ক'রে ও সেখানে কিছুকাল যাপন ক'রে বিনয়েন্দ্র তথাকার ছবির বিশেষত্বগুলি আয়ত্ত করেছেন। জার্ম্মান দেশ হ'তে বেলজিয়মে প্রত্যাবর্ত্তন করেই তিনি ফরাসীদেশের Phototone Studioতে চিত্র ও শব্দশিল্পীর পদ লাভ ক'রে প্যারী সহরে যান এবং তথায় দুই বৎসর উক্ত কার্য্য করেন। ফরাসী দেশীয় কয়েকটি চিত্রে অভিনয় করেও তিনি সম্মান লাভ করেছিলেন। চার বৎসরে সেখানকার শিক্ষা সমাপন করার পর কিছুদিন সেখানে চাকরী ক'রে সম্প্রতি তিনি দেশে ফিরে এসেছেন।

আমেরিকা ও ইয়োরোপের বিখ্যাত সবাক চিত্রগুলির তুলনায় আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সবাক চিত্রগুলিও নিন্দার্হ। অনেক দোষ অনেক ত্রুটি সেগুলিতে এখনো বর্ত্তমান। আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত সেন তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষার নৈপুণ্যে নূতন নূতন দেশী চিত্র তুলে দেশী সবাক চিত্রের অপযশ মোচন করবেন।

"সাঁতার"

গত ফাল্গুন সংখ্যা বিচিত্রায় সাঁতার সম্বন্ধে শ্রীমনোজ বসুর যে প্রবন্ধ আমরা প্রকাশ করেছিলাম সেই প্রসঙ্গে সন্তরণ জগতের আরো কিছু কিছু তথ্য পাঠকেরা আমাদের জানিয়েছেন। দুখানি চিঠি নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল।

বহরমপুর বন্দী শিবির

গত ফাল্গুন মাসের বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত মনোজ বসু মহাশয়ের 'সাঁতার' শীর্ষক প্রবন্ধে একটি কথা বোধহয় তাঁর অজ্ঞাতসারে বাদ পড়িয়াছে। গত ১০ই সেপ্টেম্বর ৩২ সালের ষ্টেট্‌সম্যানে দেখিয়াছিলাম: আলিগড়ে এলাহাবাদের রবিন চাটার্জ্জী ৭১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সাঁতার দিয়া জগতের সমস্ত দীর্ঘকালব্যাপী (endurance) সাঁতারের রেকর্ড নষ্ট করিয়া জগতে নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। আশা করি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আগামী মাসের বিচিত্রায় উক্ত ভুলটি সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন।

ইতি বিনীত—
সুকুমার মুখোপাধ্যায়

বিগত "বিচিত্রা" ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনোজ বসু মহাশয় তাঁহার 'সাঁতার' শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "অতঃপর মিসেস্ ক্যাথারাইন্ নেহয়া সাঁতার দিয়াছিলেন ৭২ ঘণ্টা ২১ মিনিট। এর চেয়ে বেশী কেহ সাঁতার দিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।" বস্তুতঃ পক্ষে তাঁহার চাইতেও বড় সন্তরণ-বীর আছেন—যিনি সত্য সত্যই বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ব-বিজেতা। তাঁহার নাম নরিস্ কেলাম্; বাড়ী মিশরের অন্তর্গত টেনিসির বিখ্যাত শহর মেম্ফিসে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তিনি রাজধানী কাইরোর বৃহৎ খালে সাঁতার দিতে নামেন এবং ইলিনইস্ ছাড়াইয়া ৫ই নভেম্বর তারিখে ঠিক ২২৭ মাইল দূরবর্ত্তী মেম্ফিসে উপস্থিত হন। এই সুদীর্ঘ পথ সাঁতার দিতে কেলামের ঠিক ৯৫ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল—একেবারে ২ ঘণ্টা ২৪ মিনিটই বেশী! Tennins and Sport Illustrated, December, 1931). তাক লাগিবারই কথা বটে। আমার মনে হয়, খুব শীঘ্রই পূর্ণ সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া জলে ভাসিবার পাল্লা চলিবে এবং খুব সম্ভবতঃ তখন লোক সিন্ধুবাদ নাবিকের গল্পগুলিও বিশ্বাস করিবে।

শ্রীসমরেন্দ্রকিশোর বসু

নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসিওর্যান্স কোং লিমিটেড্

জীবন বীমার এই অসঙ্গত প্রতিযোগিতার দিনে একটি সত্যিকার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের উন্নতি দেখলে সত্যই আনন্দ হয়। আমরা নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর ৩১শে মার্চ ১৯৩২ সাল তামামী বিবরণী ও আয়ব্যয়পত্র পেয়ে পরীক্ষা ক'রে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েচি। এই দারুণ অর্থ সঙ্কটের দিনে বীমার সকল বিভাগে সমান উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর নয়—এ কোম্পানীরও তা হয় নি; কিন্তু জীবন বীমা বিভাগে ইঁহাদের বিস্ময়জনক উন্নতি দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় এই কোম্পানীটির উপর জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস কত প্রবল। বিচার্য্য বৎসরে (জীবন-বীমার তৃতীয় বৎসরে) ইঁহারা মোট ৩৮৬৩টি পলিসির চুক্তি সাধন করেছেন। তার মোট অর্থমূল্য ৮৮,৩৭,২৫০৲ টাকা এবং বাৎসরিক প্রিমিয়াম আয় ৫,০৯,১০০।০ টাকা। বিচার্য্য বৎসরের পূর্ব্ব বৎসরে চুক্তি-করা পলিসির মোট অর্থমূল্য ছিল ৭১ লক্ষ টাকা এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরে, অর্থাৎ প্রথম বৎসরে, ছিল ৩৯ লক্ষ টাকা। এই তিনটি সংখ্যা থেকে কোম্পানীর অতি-দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হবে।

আমরা এই উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানটির কুশল কামনা করি।

Edited dy Upendranath Ganguli. Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works
259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

বিচিত্রা

দাসখত

শিল্পী—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

আষাঢ়, ১৩৪০

ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০	৫ম সংখ্যা

সাজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই যে রাঙা চেলি দিয়ে তোমায় সাজানো
ঐ যে হোথায় দ্বারের কাছে সানাই বাজানো,
অদৃশ্য এক লিপির লিখায়
নবীন প্রাণের কোন্ ভূমিকায়
মিলচে, না জানো ॥

শিশুবেলায় ধূলির 'পরে আঁচল এলিয়ে,
সাজিয়ে পুতুল কাটল বেলা খেলা খেলিয়ে,
বুঝতে নাহি পারবে আজো
আজ কী খেলায় আপনি সাজো,
হৃদয় মেলিয়ে ॥

সাজ

শিল্পী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

অখ্যাত এই প্রাণের কোণে সন্ধ্যাবেলাতে
বিশ্ব-খেলোয়াড়ের খেয়াল নাম্‌ল খেলাতে
দুঃখ সুখের তুফান লেগে
পুতুল-ভাসান চল্‌ল বেগে
ভাগ্য ভেলাতে ॥

তার পরেতে ভোলার পালা, কথা কবে না,
অসীম কালের পটে ছবির চিহ্ন রবে না।
তার পরেতে জিৎবে ধূলো,
ভাঙা খেলার চিহ্নগুলো
সঙ্গে লবে না ॥

রাঙা রঙের চেলি দিয়ে কন্যে সাজানো
দ্বারের কাছে বেহাগ রাগে সানাই বাজানো,
এই মানে তার বুঝতে পারি
খেয়াল যাঁহার খুসি তাঁরি
জানো না জানো ॥

গল্প লেখার বস্তু ও আর্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বরানগর

কল্যাণীয়াসু,

তোমার এবং দিলীপের একখানি চিঠি নীরেনের যোগে আমার হাতে এসে পৌঁছল। যে আখ্যান-বস্তুটি তোমার মনে এসেচে গল্প লেখার পক্ষে তার উপযোগিতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু এহ বাহ্য। বাজার থেকে যদি ভালো রুই মাছ জোটে তবে ভালো কালিয়া রাঁধা যেতে পারে সন্দেহ নেই কিন্তু যে রাঁধে তার হাতের জাদুটা নিয়েই আসল কথা। যতক্ষণ রান্না না হয়েচে ততক্ষণ কিছুই বলা যায় না। ভালো নিরামিষ তরকারীও যে যথেষ্ট ভালো তার প্রমাণ করবার জন্যে তার অন্তর্গত আলু কাঁচকলার তালিকা করা অনাবশ্যক, ভোজের ক্ষেত্রে তা কেউ করেও না। গল্প জিনিষটা গল্প হয়েচে কি-না এইটেই একমাত্র বিচার্য্য। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য মহাদেশে মনোবিজ্ঞানের সমস্যাগুলি প্রবল পরিমাণে আলোড়িত হচ্চে। সেখানে সামাজিক যুগসন্ধিকাল। চিরাচরিত প্রথাগুলির ভিত্তি নড়ে যাচ্চে, মানুষের চিত্তে ঋতু-পরিবর্ত্তন হওয়াতে প্রচণ্ড অস্থিরতা এসে পড়েচে। এই চাঞ্চল্য এত বেশি বেগে তাদের মনে আঘাত করচে, যে এর থেকে নিজেকে অসংসক্ত ক'রে আর্টিষ্ট্ আপনার রচনাকে সৃষ্টির কোঠায় তুলতে পারচে না— উপাদানগুলোই পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠ্‌চে। আধুনিক অধিকাংশ অতিকায় নভেলগুলো সমস্যার বোঝা বহন করবার মালগাড়ি হয়ে উঠেচে। তাতে প্রবল ঔৎসুক্য বোধ করচে তারা, যারা এই সমস্যাগুলিতেই একান্ত ঔৎসুক্যবান। যে মানসিক অবকাশের মধ্যে মানুষ গল্প শুনতে ভালোবাসে আজকের দিনে সেই অবকাশ পুঞ্জ-পুঞ্জ-চিন্তাবস্তুতে চাপা প'ড়ে গেছে। যারা এই চিন্তাবস্তুকেই চায় তারা এতে ক্ষতি বোধ করেনা। আমিও চিন্তাবস্তুকেই চাই কিন্তু তার নিজের হাটে, রসের হাটে নয়। ম্যুনিসিপাল মার্কেটে যাব যে উদ্দেশে, ভোজের নিমন্ত্রণে সে উদ্দেশে যাব না।

মানুষের মনোরাজ্যে আজকাল নতুন নতুন আবিষ্কার চলচে,—এই দিকে যে সব মানুষ ঝুঁকেচে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন অধিকার। কেউবা বৈজ্ঞানিক, কেউবা সমাজ সংস্কারক, কেউ বা ভাবুক, কেউবা আর্টিষ্ট্। তাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু নিজ নিজ অধিকারের সীমার মধ্যে তাদের লোভ সম্বরণ করা চাই। আধুনিক কালে যে উপকরণের বাজার দর বেশি তাদের ভূরি পরিমাণে জমা করে' সহজেই হাটের লোকের মন ভোলাবার কাজ অন্তত আর্টিস্‌টের নয়। মনস্তত্ত্বগুলো ব্যবহারে লাগাতে হবে কিন্তু সেগুলো হবে গৌণ, সৃষ্টিটা হবে মুখ্য। সেগুলো মনস্তত্ত্বরূপেই যদি অতি প্রকট হয়ে থাকে তাহ'লে

বুঝব সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির জাদু দিয়ে আমাদের মনোহরণ করতে চান না অথবা পারেন না, তিনি আহরিত বস্তুর পরিমাণ দেখিয়ে আমাদের তাক্ লাগাতে চান।

বিজ্ঞানে সত্যবস্তুর মূল্যভেদ নেই। সেখানে একমাত্র দর আছে, সত্যের দর। কিন্তু আর্টে সত্যের বাছাই আছে। সেখানে কী পাওয়া গেল সেটা মুখ্য কথা নয়, কী ভোগ করা গেল সেইটে নিয়ে বিচার। যারা পাওয়ার লোভী তারা অত্যন্ত বেশি ভিড় করে বাজারে মাটি করলে যারা ভোগরসিক তাদের বিপদ ঘটে। এই বস্তুলুব্ধ যুগে সেই বিপদ ভয়াবহ। বস্তুলুব্ধ যুগে মানুষের বিপদ ঘটচে জীবন যাত্রার সকল বিভাগেই। রাষ্ট্রে বাণিজ্যে সমাজে মানুষের যে আইডিয়ালিজ্‌ম্ ভালো মন্দ উচ্চনীচের মধ্যে বাছাই ক'রে চলে' জীবনকে সার্থক করে সেটা খেলো হয়ে যাচ্চে বস্তু উৎপাদনের প্রভুত্বে। হাটের লোকে বলে বেড়াচ্চে এক সময়ে যেটাকে ভালো বলেচি অন্য সময়ে দেখা গেছে সেটা ভালো নয়—অতএব ভালো-মন্দের প্রভেদ নেই। এই বিপ্লবের সময় মানুষ যখন ভিটে বদল করতে বসেচে তখনো তার একথা জানা চাই ভালোমন্দ সুশ্রী কুশ্রীর স্থানান্তর ঘটলেও তাদের প্রাণান্ত ঘটেনি। তারা আছে। সাহিত্যে সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দের বাছাই চলবেই। যারা ভুলচে সে কথা, আজ বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায় তাদের যতই আধিপত্য থাক কাল তাদের টিকি দেখা যাবে না। আমাদের পরিবারের এক প্রবীণ বন্ধুর মত ছিল এই যে, সকল প্রকার পথ্য অপথ্য এক সঙ্গে মেলালে যে খাদ্য প্রস্তুত হয় সেটা সেরা জিনিষ। একদিন তার প্রমাণ দিতে এলেন। পলতা রসগোল্লা মাংস চিংড়িমাছ কাঁঠাল নারকেল ইচড় ক্ষীর ছানা সমস্ত এক ক'রে রান্না চড়িয়েছিলেন। জিনিষটা দামী হয়েছিল, ভোগ্য হয়নি সে কথা বলা বাহুল্য। সাহিত্যের প্রধান কারিগরি তার বাছাই কাজে, তার পরিমাণে, তার সংস্থান-নৈপুণ্যে, তার সমগ্রতার সংঘটনে। উপকরণের মূল্যে বা নির্ব্বিকার আড়ম্বরে যে লোক ভোলাতে চায় তার আভিজাত্য বোধ নেই। বিজ্ঞানের আভিজাত্য সত্যের বিশুদ্ধিতে, সাহিত্যের আভিজাত্য রসের বিশুদ্ধিতে। রসসৃষ্টি মুখ্যত বস্তুর উপর নির্ভর করে না, করে যে নৈপুণ্যের উপরে তাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় না।

পরিষ্কার বলতে পারলুম কিনা জানিনে, তুমি যে পরামর্শ পেতে চেয়েছিলে তা দেওয়া হ'ল কি না তাও জানিনে। আমার সময় অত্যন্ত কম। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ১মে ১৯৩৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী আশালতা দেবীকে লিখিত পত্র।
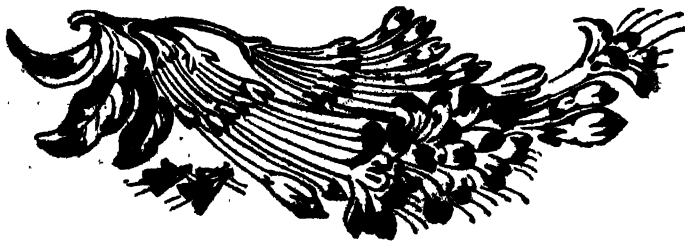
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০

বিপ্রদাস আসনে বসিয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল, সত্যিই আবার স্নান করে' এলে নাকি? অসুখ করবে যে?

তা' করুক। কিন্তু হাতে না-খাবার ছল-ছুতো আবিষ্কার করতে আপনাকে দেবোনা এই আমার পণ। স্পষ্ট কোরে বল্‌তে হবে তোমার ছোঁয়া খাবোনা, তুমি ম্লেচ্ছ-ঘরের মেয়ে।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, বইয়ে পড়োনি যে দুরাত্মার ছলের অভাব হয়না?

বন্দনা বলিল, পড়েচি, কিন্তু আপনি দুরাত্মাও ন'ন, ভয়ানকও ন'ন,—আমাদেরই মত দোষে-গুণে-জড়ানো মানুষ। তা' না' হলে সত্যিই আজ ও-বেচারাদের ডিনার বন্ধ করতে যেতুমনা।

কিন্তু সত্যি কারণটা কি?

সত্যি কারণটাই আপনাকে বলেচি। আপনাদের পরিবারে ওটা চলেনা। না দেশের বাড়ীতে, না এখানে। কিসের তরে ওকাজ করতে যাবেন?

কিন্তু জানোত, সবাই ওঁরা বিলেত-ফেরৎ,– এম্‌নি খাওয়াতেই ওঁরা অভ্যস্ত।

বন্দনা কহিল, অভ্যাস যাই হোক্‌, তবুও বাঙ্গালী। বাঙ্গালী-অতিথি ডিনার খেতে না পেয়ে মারা গেছে কোথাও এমন নজির নেই। সুতরাং, এ অজুহাত অগ্রাহ্য। ওটা আপনার বাজে কথা।

বিপ্রদাস কহিল, তবে কাজের কথাটা কি শুনি?

বন্দনা বলিল, সে আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু বোধহয় যা আপনি মুখে বলেন তার সবটুকু ভেতরে মানেননা। নইলে মাকে লুকিয়ে এ ব্যবস্থা করতে কিছুতেই রাজি হতেননা। লোকে আপনাকে মিথ্যে অতো ভয় করে। যাঁকে করা দরকার সে আপনি নয়, আপনার মা।

শুনিয়া বিপ্রদাস কিছুমাত্র রাগ করিল না, বরঞ্চ হাসিয়া বলিল, তুমি দুজনকেই চিনেছো। কিন্তু ব্যাপারটা যে মাকে লুকিয়ে হচ্ছিলো এ খবর তুমি শুনলে কার কাছে?

বন্দনা নাম করিল না, শুধু কহিল, আমি জিজ্ঞেসা করে জেনে নিয়েচি। সে এত বড় দুর্ঘটনা যে, মেজদি আমাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেননা, চিরদিন অভিসম্পাত করে বলবেন বন্দনার জন্যেই এমন হোলো। তাই কিছুতেই এ কাজ করতে আপনাকে আমি দিতে পারিনে।

বিপ্রদাস কহিল, তুমি পরম আত্মীয়, কুটুম্বের মধ্যে সকলের বড়। এ তোমার যোগ্য কথা। কিন্তু লুকোচুরি না করে' তোমার হাতে আমার খাওয়া চলে কি না এ কথা সে লোকটিকে জিজ্ঞেসা করেছিলে? বরঞ্চ জেনে এসো গিয়ে, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করে রইলাম, এই বলিয়া সে হাসিয়া খাবারের থালাটা একটুখানি ঠেলিয়া দিল।

বন্দনার মুখ প্রথমে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, পরে সামলাইয়া লইয়া কহিল, না, একথা তাকে জিজ্ঞেসা করতে আমি যেতে পারবোনা, আপনার খেয়ে কাজ নেই।

বিপ্রদাস বলিল, কিন্তু মুস্কিল এই যে নিজের বাড়ীতে তোমাকে উপবাসী রাখ্‌তেও তো পারিনে, এই বলিয়া সে আহারে প্রবৃত্ত হইল।

বন্দনা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এর পরে কি করবেন?

বাড়ী ফিরে গিয়ে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত কোরব, এই বলিয়া সে হাসিল। কিন্তু তাহার হাসি সত্ত্বেও ইহা সত্য না পরিহাস বন্দনা নিশ্চিত বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, মায়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া একটা হবেই, কিন্তু তোমার বোনের শাস্তি থেকে যে পরিত্রাণ পাবো এটা তার চেয়েও বড়। বলিয়া পুনশ্চ সহাস্যে কহিল, বিশ্বাস হোলো না? আচ্ছা আগে বিয়ে হোক, তখন মুখুয্যে মশায়ের কথাটা বুঝ্‌বে, এই বলিয়া সে খাবারের পাত্রটা নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এদিকে ডিনার বাতিল হইল বটে, কিন্তু অন্যান্য রুচিকর আহার্য্যের আয়োজনে অবহেলা ছিলনা। সুতরাং পরিতৃপ্তির দিক দিয়া কোথাও ত্রুটি ঘটিলনা। কিন্তু সর্ব্বকার্য্য সমাধা করার পরে বিছানায় শুইয়া বন্দনা ভাবিতেছিল তাহার সম্বন্ধে বিপ্রদাসের আচরণ অপ্রত্যাশিতও নয়, হয়ত অন্যায়ও নয়, এবং আপনার জন হইয়াও যে জন্য এতকাল ঘনিষ্ঠতা ও পরিচয় ছিলনা তাহাও এতদিনের প্রাচীন কাহিনী যে নূতন করিয়া আঘ্রাত বোধ করা শুধু বাহুল্য নয়, বিড়ম্বনা। প্রণাম করিতে গেলে বিপ্রদাসের মা স্পর্শ-দোষ বাঁচাইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদে বন্দনা না খাইয়া রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। শিক্ষা-বিহীন নারীর উদ্ধত ধর্ম্ম-বোধ তাহাকে আঘাত করে নাই তাহা নয়, তথাপি এই মূঢ়তাকেও একদিন বিস্মৃত হওয়া সহজ, কিন্তু বিপ্রদাস যাহা করিল তাহার প্রতিবাদে কি করা যে উচিত বন্দনা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার হাতের-ছোঁয়া ফল-মূল-মিষ্টান্ন সে খাইয়াছে সত্য কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়, দায়ে পড়িয়া। পাছে বলরামপুরের কদর্য্য-কাণ্ড এখানেও ঘটে এই ভয়ে। এ যেন পাগলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে।

কিন্তু এই অনাচার বিপ্রদাসের লাগিয়াছে, বাড়ী ফিরিয়া সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে এই কথাটা কেমন করিয়া যেন নিশ্চয় অনুমান করিয়া বন্দনার চোখে ঘুম রহিলনা। অথচ, একথাও বহুবার ভাবিল ব্যাপারটা এত গুরুতর কিসে? তাহাদের চলার পথ তো এক নয়,—সংসারে উভয়ের জন্যই প্রশস্ত স্থান যথেষ্ট রহিয়াছে। দৈবাৎ সংঘর্ষ যদি একদিন বাধিয়াই থাকে বাধিলই বা! এ প্রশ্নের মুখোমুখী হইবার ডাক এ জীবনে তাহাকে কে দিতেছে? এমন করিয়া সে আপনাকে আপনি শান্ত করিবার অনেক চেষ্টাই করিল, কিন্তু তথাপি এই মানুষটির নিঃশব্দ অবজ্ঞা কোনমতে মন হইতে দূর করিতে পারিলনা।

ভাবিতে ভাবিতে কখন এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু অসুস্থ বাধাগ্রস্ত নিদ্রা অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। তখনও ভোর হয় নাই, অসমাপ্ত নিদ্রায় অবসন্ন জড়িমা দুই চোখ আচ্ছন্ন করিয়া আছে; কিন্তু বিছানাতেও থাকিতে পারিলনা, বাহিরে আসিয়া বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল উপরের কালো-আকাশ নিশান্তের অন্ধকারে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে, দূরে বড় রাস্তায় ক্বচিৎ-কদাচিৎ গাড়ীর শব্দ অস্ফুটে শোনা যায়, লোক চলাচলের তখনও অনেক বিলম্ব, সমস্ত বাড়ীটাই একান্ত নীরব, সহসা চোখে পড়িল দ্বিতলে মায়ের পূজার-ঘরে আলো জ্বলিতেছে, এবং তাহারই একটা সূক্ষ্মরেখা রুদ্ধ জানালার ফাঁক দিয়া সম্মুখের থামে আসিয়া পড়িয়াছে। একবার মনে করিল চাকররা হয়ত আলোটা নিবাইতে ভুলিয়াছে কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল হয়ত এ বিপ্রদাস,—পূজায় বসিয়াছে।

কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। বুঝিল, হঠাৎ দেখা হইয়া গেলে লজ্জা রাখিবার ঠাঁই রহিবেনা, এই রাত্রে ঘর ছাড়িয়া নীচে আসার কোন কারণই দেওয়া যাইবেনা, কিন্তু আগ্রহ সম্বরণ করিতে পারিলনা।

ধ্যানের কথা বন্দনা পুস্তকে পড়িয়াছে, ছবিতে দেখিয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখনো চোখে দেখে নাই। নিঃশব্দ রাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকারে সেই দৃশ্যই আজ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। বিপ্রদাসের দুই চোখ মুদ্রিত, তাহার বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ আসনের পরে স্তব্ধ হইয়া আছে, উপরের বাতির আলোটা তাহার মুখে, কপালে প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছে,—বিশেষ কিছুই নয়, হয়ত আর কোন সময়ে দেখিলে বন্দনার হাসিই পাইত, কিন্তু তন্দ্রা-জড়িত চক্ষে এ মূর্ত্তি আজ তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। এইভাবে কতক্ষণ সে যে দাঁড়াইয়াছিল তাহার হুঁস নাই, কিন্তু হঠাৎ যখন চৈতন্য হইল তখন পূবের আকাশ ফর্সা হইয়া গেছে, এবং ভৃত্যের দল ঘুম ভাঙিয়া উঠিল বলিয়া। ভাগ্য ভালো যে ইতিমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া কেহ তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে নাই। আর সে অপেক্ষা করিলনা, ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িতেই গভীর নিদ্রামগ্ন হইতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলনা।

দ্বারে করাঘাত করিয়া অন্নদা ডাকিল, দিদি, বড্ড বেলা হয়ে গেল যে,—উঠ্‌বেন না?

বন্দনা ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, বাস্তবিকই বেলা হইয়াছে, লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা বোধ হয় আজও অপেক্ষা করে আছেন? একটু সকালে আমাকে তুলে দিলেনা কেন? স্নান করে' তৈরি হয়ে নিতে তো একঘণ্টার আগে পেরে উঠ্‌বোনা অন্নদা।

তাহার বিপন্ন মুখের পানে চাহিয়া অন্নদা হাসিয়া বলিল, ভয় নেই দিদি, আজ আর ওঁরা সবুর করতে পারেননি,—শেষ করে নিয়েছেন—এখন যতক্ষণ খুশি স্নান করুনগে কেউ পেছু-ডাক্‌বেনা।

শুনিয়া বন্দনা যেন বাঁচিয়া গেল। সেও হাসিমুখে কহিল, তোমাদের অনেক জিনিসই পছন্দ করিনে সত্যি, কিন্তু এটা করি। সকলে দল বেঁধে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে যে গেল্‌বার পালা নেই এ মস্ত স্বস্তি।

অন্নদা বলিল, কিন্তু সকালে কি আপনার ক্ষিদে পায়না দিদি?

বন্দনা কহিল, একদিনও না। অথচ, ছেলেবেলা থেকে নিত্যই খেয়ে আসচি। আচ্ছা যাই, আর দেরি কোরবনা—এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরে নীচে বিপ্রদাসের সহিত তাহার দেখা হইল। সে কাছারি ঘর হইতে কাজ সারিয়া বাহির হইতেছিল। বন্দনা নমস্কার করিল।

চা খাওয়া হোলো?

হাঁ।

ওঁরা অপেক্ষা করতে পারলেননা, কিন্তু তোমারই—

বন্দনা থামাইয়া দিয়া কহিল, সে জন্যে তো অনুযোগ করিনি মুখুয্যে মশাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, মেজাজের বাহাদুরী আছে তা' অস্বীকার কোরবনা, কিন্তু দু-বোনের মধ্যে প্রভেদটি যেন চন্দ্র-সূর্য্যির মতো। শুন্‌লাম না কি শীঘ্রই যাচ্ছো বিলেতে শিক্ষাটা পাকা করে নিতে। যাও,—ফিরে এসে একটা খবর দিয়ো, গিয়ে একবার মূর্ত্তিটা দেখে আস্‌বো।

শুনিয়া বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বিপ্রদাস কহিল, সে দেশে শুনেছি, বেলা বারোটা পর্য্যন্ত লোককে ঘুমুতে হয়। কঠিন সাধনা। তোমাকে কিন্তু কষ্ট করে সাধ্‌তে হবেনা,—এ দেশ থেকেই আয়ত্ত হয়ে রইলো।

বন্দনা এবারও হাসিল, কিন্তু তেম্‌নিই চুপ করিয়া বিপ্রদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিতান্তই সাদাসিধা সাধারণ ভদ্র চেহারা। হাস্য-পরিহাসে স্নেহশীল, তাহাদেরই একজন। অথচ, কাল রাত্রির নীরবতায়, নির্জ্জন গৃহের মধ্যে স্তব্ধ-মৌন এই মূর্ত্তিটিকে কি যে রহস্যাবৃত মনে হইয়াছিল এই দিবালোকে সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহার কৌতুকের সীমা রহিল না।

মুখুয্যে মশাই, এঁরা কোথায়? কাউকে তো দেখ্‌চিনে?

বিপ্রদাস কহিল, তার মানে তাঁরা নেই। অর্থাৎ শ্বশুর মশাই এবং সস্ত্রীক ব্যারিষ্টার মশাই—তিনজনেই গেছেন হাবড়ার রেলওয়ে ষ্টেসনে। গাড়ী রিজার্ভ করতে।

বন্দনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সস্ত্রীক ব্যারিষ্টার মশাই করতে পারেন, কিন্তু বাবা করতে যাবেন কেন? তাঁর ছুটি শেষ হতে এখনো ত আটদশ দিন বাকি আছে। তা'ছাড়া আমাকে না বলে?

বিপ্রদাস কহিল, বলবার সময় পান্‌নি, বোধকরি ফিরে এসেই বলবেন। সকালে বোম্বাইয়ের আফিস থেকে জরুরি তার এসেছে,—মুখের ভাব দেখে সন্দেহ রইলোনা যে না-গেলেই নয়।

কিন্তু আমি? এত শীগ্‌গীর আমি যেতে যাবো কেন?

বিপ্রদাসও সেই সুরে সুর মিলাইয়া কহিল, নিশ্চয়ই যেতে যাবে কেন? আমিও তো ঠিক তাই বলি।

বন্দনা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, বোন্‌টিকে একটা তার করে দাওনা,—দেওরটিকে সঙ্গে করে এসে পড়ুন। তোমাদের মিল্‌বেও ভালো,—অতিথি সৎকারের দায় থেকে আমিও অব্যাহতি পেয়ে বাঁচবো।

বন্দনা সভয়ে ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, সে কি সম্ভব হতে পারে মুখুয্যে মশাই? মা কি কখনো এ প্রস্তাবে রাজী হবেন? আমাকে তিনি তো দেখ্‌তে পারেননা।

বিপ্রদাস কহিল, একবার চেষ্টা করেই দেখোনা। বলো ত তার করার একটা ফর্ম পাঠিয়ে দিই,—কি বলো?

বন্দনা উৎসুক চক্ষে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া শেষে কি ভাবিয়া বলিল, থাক্‌গে মুখুয্যে মশাই,—এ আমি পারবো না।

তবে থাক্।

আমি বরঞ্চ বাবার সঙ্গে না হয় চলেই যাই।

সেই ভালো। এই বলিয়া বিপ্রদাস চলিয়া গেল।

খাবার টেবিলের উপর পিতার টেলিগ্রামটা পড়িয়াছিল, বন্দনা খুলিয়া দেখিল সত্যই বোম্বাই আফিসের তার। অত্যন্ত জরুরি,—বিলম্ব করিবার যো নাই।

বন্দনা ঘরে গিয়া আর একবার তোরঙ্গ গুছাইতে প্রবৃত্ত হইল।

বাবা তখনও ফিরেন নাই, ঘণ্টাকয়েক পরে অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আপনার নামে একটা টেলিগ্রাফ এসেছে দিদি, এই নিন্।

আমার টেলিগ্রাম? সবিস্ময়ে হাতে লইয়া বন্দনা খুলিয়া দেখিল বলরামপুর হইতে মা তাহাকেই তার করিয়াছেন। সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন পিতার সহিত সে যেন কোনমতে ফিরিয়া না যায়। বউমা দ্বিজুকে লইয়া রাত্রের গাড়ীতে যাত্রা করিতেছে।

১১

রাত্রের গাড়ীতে আসিতেছে মেজদি এবং সঙ্গে আসিতেছে দ্বিজদাস। বন্দনার আনন্দ ধরে না। সেদিন দিদির শ্বশুর বাড়ীতে নিজের আচরণের জন্য সে মনে মনে বড় লজ্জিত ছিল অথচ, প্রতীকারের উপায় পাইতেছিল না। আজ অত্যন্ত অনিচ্ছাতেও তাহাকে পিতার সঙ্গে বোম্বাইয়ে ফিরিয়া যাইতে হইত, অকস্মাৎ অভাবিত পথে এ সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। টেলিগ্রামের কাগজখানা বন্দনা অনেকবার নাড়াচাড়া করিল, অন্নদাকে পড়িয়া শুনাইল এবং উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিল পিতার জন্য—এই

ছোট্ট কাগজখানি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে। বিপ্রদাস বাড়ীতে নাই, খোঁজ লইয়া জানিল কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি বাহিরে গেছেন। এ ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন সুতরাং তাহাকে জানাইবার কিছুই নাই,—তবু একবার বলিতেই হইবে। অথচ এই বলার ভাষাটা সে মনে মনে আলোচনা করিতে গিয়া দেখিল কোন কথাই তাহার মনঃপূত হয় না। আনন্দ প্রকাশের সহজ রাস্তাটা যেন কখন্ বন্ধ হইয়া গেছে। বহু-নিন্দিত জমিদার-জাতীয় এই কড়া ও গোঁড়া লোকটিকে তাহার সুরু হইতেই খারাপ লাগিয়াছিল, এখনো তিনি যথেষ্টই দুর্ব্বোধ্য, তথাপি ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। সে দেখিতে-ছিল এই মানুষটির আচরণ পরিমিত, কথা স্বল্প, ব্যবহার ভদ্র ও মিষ্ট, তবু কেমন-একটা ব্যবধান তাহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করা যায়। সকলের মাঝখানে থাকিয়াও সে সকলের হইতে দূরে বাস করে। আশ্রিত পরিজন, দাসী চাকর, কর্ম্মচারীবর্গ সকলে ইহাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশি করে ভয়। তাহাদের ভাবটা যেন এইরূপ,—বড়বাবু অন্নদাতা, বড়বাবু রক্ষাকর্ত্তা, বড়বাবু দুর্দ্দিনের অবলম্বন, কিন্তু বড়বাবু কাহারও আত্মীয় নয়। পিতৃবিয়োগে তাঁহাকে দায় জানানো যায় কিন্তু পুত্রের বিবাহ উৎসবে আহারের নিমন্ত্রণ করা চলে না। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটুকু তাহারা ভাবিতে পারেনা।

কাল বন্দনা রান্নাঘরের দাসীটিকে সরল ও কিঞ্চিৎ নির্ব্বোধ পাইয়া কথায় কথায় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিল কিন্তু অনেক জেরা করিয়াও কেবল এইটুকুই বাহির করিতে পারিল যে সে ইহার হেতু জানে না, শুধু সকলেই ভয় করে বলিয়া সে-ও করে। এবং অপরকে প্রশ্ন করিলেও বোধকরি এই উত্তরই মিলিত। মুখুয্যে পরিবারে এ যেন এক সংক্রামক ব্যাধি। সেদিন ট্রেণের মধ্যে দৈবাৎ সেই ক্ষুদ্র ঘটনাটুক্ অবলম্বন করিয়া বিপ্রদাসের বলিষ্ঠ প্রকৃতি বন্দনার কাছে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার সম্পূর্ণ আত্ম-গোপন করিয়াছে। গাড়ীর মধ্যে সেদিন কাছে বসিয়া হাস্য পরিহাসের কত কথাই হইয়া গেল কিন্তু আজ মনেই হয় না সেই মানুষটিই এ বাড়ীর বড় বাবু।

হঠাৎ নীচে হইতে একটা গোলমাল উঠিল, কে-একজন ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল তাহার পিতা রায়-সাহেব ষ্টেসন হইতে ফিরিয়াছেন খোঁড়া হইয়া। বন্দনা জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল পঞ্জাবের ব্যারিষ্টার ও তদীয় পত্নী দুইজনে দুই বগল ধরিয়া সাহেবকে গাড়ী হইতে নীচে নামাইতেছেন। তাঁহার এক পায়ের জুতা-মোজা খোলা ও তাহাতে খান দুই তিন ভিজা রুমাল জড়ানো। প্ল্যাটফর্মে ভিড়ের হুড়া-মুড়িতে কে নাকি তাঁহার পায়ের উপর ভারী কাঠের বাক্স ফেলিয়া দিয়াছে। লোকজনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল,—দরওয়ান ছুটিল ডাক্তার ডাকিতে,—ডাক্তার আসিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঔষধ দিল,—বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তাঁহার চলা-হাঁটা বন্ধ হইল।

পরদিন বিকালে সতী আসিয়া পৌঁছিল, বন্দনা কলরবে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল মোটর হইতে অবতরণ করিতেছে শুধু মেজদি নয়, সঙ্গে আছেন শাশুড়ী,—দয়াময়ী। উচ্ছ্বসিত আনন্দ কলরোল নিবিয়া গেল, বন্দনা আড়ষ্টভাবে কোনমতে একটা প্রণাম সারিয়া লইয়া একধারে সরিয়া

দাঁড়াইতেছিল কিন্তু দয়াময়ী কাছে আসিয়া আজ তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভালো আছোত মা?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া সায় দিল,—ভাল আছি। মা, হঠাৎ আপনি এসে পড়লেন যে?

দয়াময়ী বলিলেন, না এসে কি করি বলোত? আমার একটি পাগলী মেয়ে রাগ করে না খেয়ে চলে এসেচে তাকে শান্ত করে বাড়ী ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে নিজে শান্তি পাই কই মা?

বন্দনা কুণ্ঠিত-হাস্যে কহিল, কি করে জানলেন আমি রাগ করে এসেচি?

দয়াময়ী বলিলেন, আগে ছেলে-মেয়ে হোক, আমার মতো তাদের মানুষ কোরে বড় করে তোলো তখন আপনিই বুঝবে মেয়ে রাগ করলে কি করে মায়ে জানতে পারে।

কথাগুলি তিনি এমন মিষ্ট করিয়া বলিলেন যে বন্দনা আর কোন জবাব না দিয়া হেঁট হইয়া এবার তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বাবা বড় অসুস্থ মা।

—অসুস্থ? কি হয়েছে তাঁর?

—পায়ে আঘাত লেগে কাল থেকে শয্যাগত, উঠতে পারেননা। এই বলিয়া সে দুর্ঘটনার হেতু বিবৃত করিল।

দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন,—চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি ত? চলোত কোন্ ঘরে তোমার বাবা আছেন আমাকে নিয়ে যাবে। আগে তাঁকে দেখে আসিগে তারপরে অন্য কাজ। এই বলিয়া তিনি সতীকে সঙ্গে করিয়া বন্দনার পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া রায়-সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার পায়ের বেদনা বিশেষ ছিল না, ইঁহাদের দেখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিলেন। দয়াময়ী হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বেই-মশাই, পা ভাঙ্‌লো কি করে, কোথায় ঢুকেছিলেন?

সতী ও বন্দনা উভয়েই অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, রায়-সাহেব নিরীহ মানুষ, প্রতিবাদের সুরে বুঝাইতে লাগিলেন যে কোথাও ঢুকিবার জন্য নয়, ষ্টেসন প্ল্যাটফর্ম্মে বিনাদোষে এই দুর্গতি ঘটিয়াছে।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, যা হবার হয়েছে এখন থাকুন দিনকতক মেয়েদের জিম্মায় ঘরে বন্ধ। পাছে একটা মেয়ে শাসন করে না উঠতে পারে তাই আর একটিকে টেনে আনলুম বেয়াই। দুজনে পালা করে দিনকতক সেবা করুক।

রায়-সাহেব তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং এই অনুগ্রহ ও সহানুভূতির জন্য বহু ধন্যবাদ দিলেন।

আবার দেখা হবে,—যাই এখন হাত-পা ধুইগে, এই বলিয়া বিদায় লইয়া দয়াময়ী নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় মোটরে আসিয়া পৌঁছিল দ্বিজদাস ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র—বাসুদেব। মেজদির ছেলেকে বন্দনা সেদিন দেখিতে পায় নাই। সে ছিল পাঠশালায় এবং তাহার ছুটির পূর্ব্বেই বন্দনা বাড়ী হইতে চলিয়া

আসিয়াছিল। পিতামহীকে ছাড়িয়া বাসু থাকেনা তাই সঙ্গে আসিয়াছে এবং তাঁহারি সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া যাইবে।

কাকা পরিচয় করাইয়া দিলে বাসুদেব প্রণাম করিল। বন্দনার পায়ে জুতা দেখিয়া সে মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। আট-নয় বছরের ছেলে কিন্তু জানে সব।

বন্দনা সস্নেহে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে চিনতে পারলে না বাসু?

—পেরেচি মাসিমা।

—কিন্তু তুমি ত ছিলে তখন পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে,—মনে থাকবার ত কথা নয় বাবা?

—তবু মনে আছে মাসিমা,—তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম। আমাদের বাড়ী থেকে তুমি রাগ করে চলে গেলে আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে দেখতে পেলুম না।

—রাগ করে চলে যাবার কথা তুমি কার কাছে শুনলে?

—কাকাবাবু বলছিলেন ঠাকুরমাকে।

বন্দনা দ্বিজদাসের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাগ করার কথা আপনিই বা জানলেন কি করে?

দ্বিজদাস কহিল, শুধু আমিই নয়, বাড়ীর সবাই জানে। তাছাড়া আপনি লুকোবার ত বিশেষ চেষ্টা করেন নি।

বন্দনা বলিল, সবাই আমার রাগ করাটাই জানে, তার কারণটা কি জানে?

দ্বিজদাস বলিল, সবাই না জানুক আমি জানি। রায়-সাহেবকে একলা টেবিলে খেতে দেওয়া হয়েছিল বলে।

বন্দনা বলিল, কারণটা যদি তাই-ই হয় আমার রাগ করাটা আপনি উচিত বিবেচনা করেন?

দ্বিজদাস কহিল, করি। যদিচ তাঁদেরও আর কোন উপায় ছিল না।

—আপনি আমার বাবার সঙ্গে বসে খেতে পারেন?

—পারি। কিন্তু দাদা বারণ করলে পারিনে।

—পারেন না? কিন্তু আপনাকে বারণ করার অধিকার দাদার আছে মনে করেন?

দ্বিজদাস বলিল, সে তাঁর ব্যাপার আমার নয়। আমার পক্ষে দাদার অবাধ্য হওয়া আমি অনুচিত মনে করি।

বন্দনা কহিল, যা কর্ত্তব্য বলে বোঝেন তা করার কি আপনার সাহস নেই?

দ্বিজদাস ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দেখুন, এ ঠিক সাহস অ-সাহসের বিষয় নয়। স্বভাবতঃ আমি ভীতু লোক নই কিন্তু দাদার প্রকাশ্য নিষেধ অবজ্ঞা করার কথা আমি ভাবতে পারিনে। ছেলেবেলায় বাবার অনেক কথা আমি শুনিনি, দণ্ডও পাইনি তা নয়, কিন্তু আমার দাদা অন্য প্রকৃতির মানুষ। তাঁকে কেউ কখনো উপেক্ষা করেনা।

—উপেক্ষা করলে কি হয়?

—কি হয় আমি জানিনে, কিন্তু আমাদের পরিবারে এ প্রশ্ন আজও ওঠেনি।

বন্দনা কহিল, মেজদির চিঠিতে জানি দেশের জন্যে আপনি অনেক-কিছু করেন যা দাদার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। সে সব করেন কি করে?

দ্বিজদাস কহিল, তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও তাঁর নিষেধের বিরুদ্ধে নয়। তাহলে পারতুম না।

বন্দনা মিনিট দুই-তিন নীরবে থাকিয়া কহিল, দিদির চিঠি থেকে আপনাকে যা ভেবেছিলুম তা' আপনি নয়। এখন তাঁকে ভরসা দিতে পারবো তাঁদের ভয় নেই। আপনার স্বদেশ সেবার অভিনয়ে মুখুয্যে বংশের বিপুল সম্পদের এক কণাও কোনদিন লোকসান হবেনা। দিদি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

দ্বিজদাস হাসিয়া বলিল, দিদির লোকসান হয় এই কি আপনি চান?

বন্দনা বিব্রত হইয়া কহিল, বাঃ—তা' কেন চাইবো। আমি চাই তাঁদের ভয় ঘুচুক,—তাঁরা নির্ভয় হোন।

দ্বিজদাস কহিল, আপনার চিন্তা নেই তাঁরা নির্ভয়েই আছেন। অন্ততঃ দাদার সম্বন্ধে একথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি ভয় বলে কোন বস্তু তিনি আজও জানেন না। ও তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, তার মানে ভয় জিনিসটার সবটুকু বাড়ীর সকলে মিলে আপনারাই ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর ভাগে আর কিছুই পড়েনি—এই ত

শুনিয়া দ্বিজদাসও হাসিল, কহিল, অনেকটা তাই বটে। তবে আপনাকেও বঞ্চিত করা হবেনা, সামান্য যা অবশিষ্ট আছে সেটুকু আপনিও পাবেন। তিন চারদিন একসঙ্গে আছেন এখনো তাঁকে চিনতে পারেননি?

বন্দনা কহিল, না। আপনার কাছ থেকে তাঁকে চিনতে শিখবো আশা করে আছি।

দ্বিজদাস বলিল, তা'হলে প্রথম পাঠ নিন্। ঐ জুতো জোড়াটি খুলে ফেলুন।

চাকর আসিয়া বলিল, মা আপনাদের ওপরে ডাক্‌চেন।

চলিতে চলিতে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ মা এসেছেন কেন?

দ্বিজদাস বলিল, প্রথম, কৈলাস-যাত্রা সম্বন্ধে মামীদের সঙ্গে পরামর্শ করা, দ্বিতীয়, আপনাকে বলরামপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। দেখবেন যেন না বলে বসবেননা।

বন্দনা বলিল, আচ্ছা, তাই হবে।

দ্বিজদাস কহিল, মা'র সামনে আপনাকে মিস্ রায় বলা আমার চলবে না। আপনি আমার বয়সে ছোট—বৌদিদির ছোট বোন—অতএব নাম ধরেই ডাকবো। যেন রাগ করে আবার একটা কাণ্ড বাধাবেন না।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, না রাগ করবো কেন। আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন। কিন্তু আপনাকে ডাকবো কি বলে?

দ্বিজদাস বলিল, আমাকে দ্বিজুবাবু বলেই ডাকবেন। কিন্তু দাদাকে মুখুয্যে-মশাই বলা মানাবেনা। তাঁকে সবাই বলে বড়দাদাবাবু,—আপনাকেও ডাকতে হবে বড়দাদা বলে। এই হলো আপনার দ্বিতীয় পাঠ।

—কেন?

দ্বিজদাস বলিল, তর্ক করলে শেখা যায়না, মেনে নিতে হয়। পাঠ মুখস্ত হলে এর কারণ প্রকাশ করবো,—কিন্তু এখন নয়।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যে মশাই কিন্তু নিজে আশ্চর্য্য হবেন।

দ্বিজদাস বলিল, হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু মা, বৌদিদি এঁরা বড় খুসি হবেন। এটা সত্যিই দরকার।

—আচ্ছা, তাই হবে।

সিঁড়ির একধারে জুতা খুলিয়া রাখিয়া বন্দনা দয়াময়ীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। পিছনে গেল দ্বিজদাস ও বাসুদেব। তিনি তোরঙ্গ খুলিয়া কি-একটা করিতেছিলেন এবং কাছে দাঁড়াইয়া অন্নদা বোধকরি গৃহস্থালীর বিবরণ দিতেছিল। দয়াময়ী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গা ধোয়া কাপড় ছাড়া হয়েছে মা?

—হাঁ মা হয়েছে।

তা'হলে একবার রান্নাঘরে যাও মা। এতগুলি লোকের কি ব্যবস্থা বামুন ঠাকুর করচে জানিনে,—আমিও আহ্নিকটা সেরে নিয়েই যাচ্চি।

বন্দনা নীরবে চাহিয়া রহিল, তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না, বলিলেন, দ্বিজুর শরীরটা ভালো নেই সকালে ও কিছু খেয়ে আসেনি। ওর খাবারটা যেন একটু শীগ্‌গির হয় মা। এই বলিয়া তিনি অন্নদাকে সঙ্গে করিয়া পূজার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন বন্দনার উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করিলেননা।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ করলো?

দ্বিজদাস কহিল, সামান্য একটু জ্বরের মতো।

—কি খাবেন এবেলা?

দ্বিজদাস বলিল, সাগু বার্লি ছাড়া যা দেবেন তাই।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, রান্না-ঘরে যাবো শেষকালে কোন গোলযোগ ঘটবেনা ত?

দ্বিজদাস বলিল, না। অন্নদাদিদি সেই পরিচয়ই বোধহয় আপনার দিচ্ছিলো। ওঁর কথা মা কখনো ঠেলতে পারেননা,—ভারি ভালোবাসেন। ম্লেচ্ছ অপবাদটা বোধকরি আপনার কাট্‌লো।

বন্দনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, খুব আশ্চর্য্যের কথা।

দ্বিজদাস স্বীকার করিয়া বলিল, হাঁ। ইতিমধ্যে আপনি কি করেছেন, অন্নদাদিদি কি কথা মাকে বলেছে জানিনে কিন্তু আশ্চর্য্য হয়েছি আপনার চেয়েও ঢের বেশি আমি নিজে। কিন্তু আর দেরি করবেন না যান খাবার ব্যবস্থা করুনগে। আবার দেখা হবে। এই বলিয়া দুজনেই মায়ের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

স্বপ্ন, বাস্তব, স্মৃতি

শ্রীলীলাময় রায়

১

সুধীর মুখে তার স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে মিস্ মেল্‌বোর্ণ হোয়াইট তর্জ্জনী চালনা করে বল্লেন, "নিশ্চয় এর কোনো অর্থ আছে, সুধী। আমার এক বন্ধু স্বপ্নতত্ত্ববিদ্, তাঁকে তোমার হয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি, যদি চাও।"

"না, আণ্ট্ এলিনর", সুধী স্মিত হেসে বল্ল, "চাইনে। ওসব ফ্রয়ডীয় কেঁচো খোঁড়া আমার জুগুপ্সা উদ্রেক করে।"

আণ্ট্ এলিনর তাকে অভয় দিলেন। ফ্রয়ডীয় বিশ্লেষণ নয়, মেটারলিঙ্কীয় মর্ম্মোদ্‌ঘাটন। তবু সুধী সম্মতি দিল না। দৃঢ়ভাবে বল্ল, "কি দরকার!"

তখন মিস্ মেল্‌বোর্ণ হোয়াইট উদ্দীপ্তকণ্ঠে বল্লেন, "স্বপ্নকে তুমি উপেক্ষণীয় ভেবো না সুধী। স্বপ্নের মূল্য আছে। আমরা যাকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বলি সেটা আমাদের মনগড়া কাল-বিভাগ। ইকুয়েটর বলে বাস্তবিক কোনো ভূপৃষ্ঠরেখা আছে কি? নেই, কিন্তু থাকা উচিত, সেইজন্য ইকুয়েটর আমরা এঁকে দেখাই। যখন ইংলণ্ড থেকে নিউ জীলণ্ডে যাই তখন আমাদেরই কপোলকল্পিত ইকুয়েটরকে চাক্ষুষ না করতে পেয়ে কেমন নিরাশ হই তা আমার প্রথম যৌবনের দিকে দৃষ্টি ফিরালে দেখ্‌তে পাই।" তিনি বোধ করি তাঁর প্রথম যৌবনের স্মৃতিতে অবগাহন করলেন। কিছুক্ষণ আন্‌মনা থেকে সুধীর পাতে আর এক টুক্‌রা কেক্ তুলে দিলেন (সুধী দুই হাত উঠিয়ে আপত্তি ব্যঞ্জনা করল, তিনি তর্জ্জনী উচিয়ে প্রতিরোধ করলেন) ও বল্লেন, "আমার প্রথম যৌবন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে বটে, কিন্তু খুব শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে সুদূর নক্ষত্র বিশেষ থেকে সেদিনকার পৃথিবীর দৃশ্য যাঁরা দেখ্‌ছেন তাঁরা আমার প্রথম যৌবনকে লক্ষ্য করছেন সন্দেহ নেই। কোনো মন্ত্রবলে আমি যদি সেই নক্ষত্রলোকে আজ উপস্থিত থাকতুম তবে আমিও এই চর্ম্মচক্ষুতে যন্ত্র লাগিয়ে আমার পার্থিব অতীতকে প্রত্যক্ষ করতুম।"

সুধী চুপ করে শুন্‌ছিল। চায়ের পেয়ালা পিরিচ ঘাসের উপর রেখে বল্ল, "প্রত্যক্ষ করলে ত আর ফিরে পেতেন না। ফিরে পাওয়া যায় না বলেই তা অতীত।"

"ফিরে পেতে চায় কে? পুনরাবৃত্তিতে কিই বা সুখ? কিন্তু আয়নায় নিজেকে দেখা কি কোনোদিন ফুরাবার? আয়নায় যে দেখা দেয় না তাকে আর একবার দেখ্‌তে নক্ষত্রযাত্রা করতে পারতুম ত বেশ হত—কিন্তু যে মোটা হয়ে পড়েছি, বাপ! এ পৃথিবীর মাটী থেকে কার সাধ্য আমাকে নড়ায়।"—তিনি শব্দ করে হাস্‌লেন। সুধীও। তারপর—

"জাপানীদের একটি উপকথায় এক আয়নার বর্ণনা আছে, শিশু তার মধ্যে মৃত জননীর ছায়া নিরীক্ষণ করত। তেমন আয়না আছে আমারও। তার নাম স্মৃতি। জাগ্রতাবস্থায় আমাদের চৈতন্য আমাদের স্মৃতিকে যথেচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করে। সেই জিনিষই যখন নিদ্রিতাবস্থায় উচ্ছৃঙ্খল হয় তখন তাকে বলি স্বপ্ন।"

একথা শুনে সুধী লজ্জায় সংকুচিত হল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "না, না, না, না, না।"

আণ্ট এলিনর মুচ্‌কি হেসে বল্লেন, "আগে ভাল করে বলতে দাও আমাকে। সমস্তটা না শুনেই না, না, না। Guilty mind!"

"আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে এই," তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন, "যে, স্বপ্ন যদিও স্মৃতিরই নামান্তর, তবু স্মৃতির মত সদা সর্ব্বদা বিষুবরেখা বাঁচিয়ে চলা তার ধর্ম্ম নয়। উচ্ছৃঙ্খল অশ্বের মত লাফাতে লাফাতে সে বিষুবরেখা ডিঙিয়ে যায়। অতীত ও ভবিষ্যতের ব্যবধান মানে না।

হাজার হোক কাল ত এক ও অবিভাজ্য। উদারা মুদারা তারা তিন স্বরগ্রামের উপরই স্বপ্নের আঙুল খেলে, তবে সমানে নয়। তোমার স্বপ্ন সম্ভবত ভবিতব্যের। মিষ্টার রেবীকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌তে দোষ কি?"

"না, না, না।" সুধী তথাপি অস্বীকৃত হল। বল্ল, "ভবিতব্য অজ্ঞাত থাকাই ভাল। যার উপর কর্তৃত্ব খাটবে না তার কথা দুদিন আগে জেনে কোন পরমার্থ পাব? মরতে একদিন হবে। কোনদিন, তার খবর নিয়ে কেন স্বস্তি ও স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দেব?"

সুধীর মুখশ্রী মলিন দেখাচ্ছিল, সুনিদ্রার অভাবে। তার কণ্ঠস্বর ফাটা কাঁসির মত খন খন শোনাচ্ছিল। সুধীর মত প্রশান্ত সৌম্য পুরুষ—মানব বনস্পতি—সামান্য আঘাতে বিচলিত হয় না, হলে কিন্তু কারুণ্য সঞ্চার করে। আণ্ট এলিনরের চক্ষু সমবেদনায় সজল হল। জল-কজ্জল তাঁর নয়নপত্রে অঙ্কিত হল। সুধী যে মনে মনে ঐ স্বপ্নের কি ব্যাখ্যা করেছে তা তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন ও সুধী যে ঐ স্বপ্নের ঘটনাকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছে তাও তিনি আন্দাজে বুঝেছিলেন। শেষেরটাতে তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি সুধীর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বল্লেন, "যা ঘট্‌তে পারে অথচ ঘটা উচিত নয় তাকে ঘট্‌তে দিও না। বাস্, ফুরিয়ে গেল।"

সুধী তাঁর প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে তিনি স্নেহার্দ্র-স্বরে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "যে ত্যাগ তোমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, যাকে স্বীকার কর্‌তে তুমি স্বাভাবিক আনন্দ বোধ কর্‌ছ না, তেমন ত্যাগ নাই বা কর্‌লে। কোন্ সার্থকতার জন্য তুমি বৈরাগ্য বহন কর্‌বে? উজ্জয়িনী তোমার কেউ নয়।"

"উঁহু", সুধী ঘাড় নাড়্‌ল। বল্ল, "উজ্জয়িনী আমার আত্মীয়া। কেমন আত্মীয়া তা অন্তর্যামী জানেন। সে যদি বিরাগিনী হয়ে যায় তা হলেও আমি অসার্থক হব, আণ্ট্ এলিনর। পৃথিবীতে এত মেয়ে আছে। এত সম্ভাবনা-সত্ত্বে কে ওর মত হতভাগিনী! তার ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারি যদি, তবে আমার বঞ্চিত জীবন মাধুরী বর্জ্জিত হবে না।"

মিস্ ডব্‌সন্ চায়ের সরঞ্জাম স্থানান্তরিত কর্‌লে আণ্ট এলিনর আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "কিন্তু গোড়ায় গলদ, উজ্জয়িনী যে বিরাগিনী হবেই এই ধারণার ভিত্তি কোথায়?"

"বাদলের ব্যবহারে।"

"বাদলের ব্যবহার পরিবর্তনসাধ্য নয় কি?"

"না। আর আমার সে ভরসা নেই। তা ছাড়া বাদল ত নিরুদ্দেশ।" সুধী দীর্ঘশ্বাস ছাড়্‌ল।

আণ্ট এলিনর সোজা হয়ে উঠে বস্‌লেন। বল্লেন, "ওর খোঁজ কর। অমন করে হাল ছেড়ে দিও না। আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করব। স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হতে পারে, কিন্তু বন্ধুর দিকে মুখ তুলবে।"

"বাদল যদি আমার উপর অনুগ্রহ করে উজ্জয়িনীকে গ্রহণ করে তবে উজ্জয়িনীর প্রতি কর্‌বে অন্যায়, আমাকেও ক্ষমা কর্‌বে না। তা ছাড়া আমি ত বাদলের বন্ধু—আর সে ত আমার বন্ধুর অধিক। আমি এতদিনে নিঃসন্দেহ জেনেছি যে উজ্জয়িনীর সঙ্গে ওর আন্তরিক সামঞ্জস্য হবার নয়। বোধ হয় কোনো মেয়ের সঙ্গে ওর সাবর্ণ্য হবে না। নারীর সান্নিধ্য ওর অনুপভোগ্য নয়, নারীর রূপশ্রী ওকে চঞ্চল কর্‌তে পারে। কিন্তু নারীর অস্তিত্বের অর্থ সম্বন্ধে ওর না আছে অন্তর্দৃষ্টি, না আছে জিজ্ঞাসা। পুরুষ হিসাবে সে যদি শিশু প্রকৃতি হয় তবে ব্যক্তিহিসাবে সে বে-দরদী।" কথাটা উচ্চারণ করে সুধী জিব্ কাট্‌ল। অবিচার কর্‌ল না ত? তাড়াতাড়ি শুধ্‌রে নেবার জন্য বল্ল, "না, না, স্বার্থপর নয়। সজ্ঞানে নিষ্ঠুর নয়। অনুভূতির ক্ষমতা ওর মধ্যে বিকশিত হয়নি। আমি যদি ওর জীবনে কিছু আগে আস্‌তুম তবে হয়ত ওর গায়ে চিম্‌টি কেটে ওর অসাড়তা ধ্বংস কর্‌তুম। এসে দেখি গণ্ডারের মত পুরু চামড়ায় বর্শার প্রহারও ব্যর্থ। তবে আমার আসা একেবারে নিরর্থক হয়নি। কেউ যে কিছু জানে কিম্বা বোঝে কিম্বা ভাব্‌তে পারে বাদল সেকথা বিশ্বাস কর্‌ত না। শিক্ষকদের প্রতি অবজ্ঞা ও সহপাঠীদের প্রতি অনুকম্পা—এই নিয়ে তার সতের বছর বয়েস হল। বাপের সঙ্গে কথা বলে না, পাছে তর্কে জিতে তাঁকে গোরু কি গাধা বলে বসে। বাড়ীতে বইয়ের মৌচাক তৈরি করে তায় তারই মধ্যে বুঁদ

হয়ে রয়েছে। আমি এসে তার চরিত্রে বিশ্বাসের বীজ বপন করলুম। সে মনে মনে মানল যে ভারতবর্ষে একটি মানুষ একটু বোঝে।"

মিস মেলবোর্ণ-হোয়াইটের হাসিতে সুধীও যোগ দিল। সে-সব দিনের স্মৃতি সুধীর অন্তঃকরণকে আলোড়িত করছিল। স্মৃতিমাত্রেরই একটি স্বকীয় রস আছে—কেমন এক উদাস করুণ রস। পিছু হটবার হুকুম নেই, পিছু ফিরে দেখছি কি যেন জামা থেকে খসে মাটীতে পড়ল। হয়ত প্রিয়ার পরিয়ে দেওয়া ফুল, হয়ত বোনের হাতের ফুল-তোলা রুমাল। পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সৈনিকেরা মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। মার্চ!

"না, আণ্ট", সুধী সাম্‌লে নিয়ে বলতে লাগল, "বাদলকে আমি স্বমার্গচ্যুত হতে পরামর্শ দেব না। প্রত্যেক নক্ষত্রের স্বতন্ত্র কক্ষ, নিজস্ব লক্ষ। মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েছে বলে মানবীকে নিয়ে ঘর করতে বাধ্য নয় সে। তার বিয়ের সময় আমিই তাকে যুক্তি দিয়ে প্রবর্ত্তিত করেছিলুম। ভাল করিনি। আমার বোঝা উচিত ছিল।"

"বেশ, না হয় তোমারই দোষ। কিন্তু বাদলের অনাদরে উজ্জয়িনীর যে বৈরাগ্য তোমার বৈরাগ্যের দ্বারা তার প্রতীকার হবে কি করে?"

আণ্ট এলিনর এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে একটু রসিকতার আশ্রয় নিলেন। বল্লেন, "যদি তুমি বৈরাগী না হয়ে অনুরাগী হতে তবে তোমার চিকিৎসায় ফল হত, সুধী।"

সুধীও রসিকতায় অপ্রস্তুত হবার পাত্র নয়। বল্ল, "আপনার মতে সেইটে হত বন্ধুকৃত্য। না, আণ্টি?"

"বন্ধুকৃত্যই বটে। বাদল তোমার প্রতি ঈর্ষাসম্পন্ন হয়ে স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হত আর এত বড় একটা সমস্যা সাধারণ একটা তামাসায় পর্য্যবসিত হত। তুমি বলবে বাদল ঈর্ষালু হতে পারে না। কিন্তু আমি কি ও কথা বিশ্বাস করব ভাবছ?" মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট্ তাঁর বাগানে সমাগত ষ্টার্লিং পাখীদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

সুধী লজ্জিত হয়ে মৌনতার দ্বারা স্বীকার করল যে ওকথা সে নিজেও বিশ্বাস করে না। কিন্তু উক্ত প্রকার বন্ধুকৃত্য তার পক্ষে অসাধ্য।

দুজনে অনেকক্ষণ নীরব থাকবার পর মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট্ আবার সেই কথা পাড়লেন। বল্লেন, "তোমাকে বৈরাগী হতে দেখে উজ্জয়িনীর কি লাভ, কেন সে গৃহস্থাশ্রমে ফিরবে, ফিরলেও কাকে নিয়ে ঘর করবে?"

"এক নিঃশ্বাসে তিন তিনটে প্রশ্ন?" সুধী হাসল। "আমি যদি বৈরাগী হই—না, না, যদি বৈরাগ্য সাধন করি—তবে উজ্জয়িনী জানবে যে পৃথিবীতে তার একজন ব্যথার ব্যথী আছে, তার জন্য একটা ত্যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সে নিতান্ত সামান্য প্রাণী নয়, তার জীবনের মূল্য আছে। জীবনের মূল্যবোধ থেকে একে একে গৃহস্থোচিত যাবতীয় গুণ উপজাত হবে। আপনি যেমন আপনার ভাইকে নিয়ে ঘর করছেন সেও তেমনি ঘর করবে,—হয়ত আমাকে নিয়ে।"

আণ্ট এলিনর হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লেন। "হো হো হো হো হো। এই তোমার স্বপ্নের অর্থ?...হো হো হো। কিন্তু তোমার নিজের বৈরাগ্যের স্বরূপ কি শুনি?"

সুধী এতক্ষণে সত্যিই অপ্রস্তুত হয়েছিল। সে আমতা আমতা করে যা বল্ল তার মর্ম্ম এই যে বৈরাগ্যের আদর্শ সকলের পক্ষে এক নয়। সুধী সাধনা করবে নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টির। নিষ্ক্রিয় কেন? কারণ কর্ম্ম হচ্ছে গৃহস্থের ধর্ম্ম। পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপণ অনুচিত। তাতে প্রতিযোগিতার আশঙ্কা আছে। প্রতিযোগিতাকে প্রাচ্য সমাজ ভয়াবহ জ্ঞান করেছেন বলে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা করেছেন। নিরাসক্ত কেন? যেহেতু আসক্তি থেকে আসে একদেশদর্শিতা। সেটাতে কর্ম্মীর ক্ষতি করে না; বরঞ্চ কর্ম্মীমাত্রেই একদেশদর্শী। কিন্তু দ্রষ্টার পক্ষে সেটা মারাত্মক। সে চায় ভাগবত দৃষ্টি। ভগবানের চোখে এ বিশ্ব যেমন দেখায় তাই তার জ্ঞেয়। গৃহস্থের মুক্তি কর্ম্মে, বৈরাগীর মুক্তি বিশ্বরূপ দর্শনে।

"নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টি।" আণ্ট এলিনর গোটা গোটা

করে উচ্চারণ কর্‌লেন। "তার সাধনা বোধ করি আমার অজানা নয়। তোমার আর্থার খুড়োর কল্যাণে হাড়ে হাড়ে জানি। তুমি যেন অতটা নিষ্ক্রিয় হোয়ো না বাপু—উজ্জয়িনী ত তোমার বোন নয় যে পড়ে পড়ে সহ্য কর্‌বে সারা

শেষের কথাটায় একটু আহত হয়ে সুধী বুড়ীকে ক্ষেপিয়ে দেবার জন্য বল্ল, "আর্থার খুড়ো ত বলেন তিনি ইচ্ছা করে নিষ্ক্রিয় হন নি, হয়েছেন কর্ম্মৈষণায় ক্রমাগত বাধা পেয়ে।"

বুড়ীর কানে ওকথা পড়া যেন বোমার রঞ্জকে আগুন ধরা। দপ্ করে উঠ্‌ল তাঁর চোখ, ফট্ করে ফাট্‌ল তাঁর মুখ। "বটে? বলেছে আর্থার ও কথা?" বাষ্পাকুল কণ্ঠে বল্লেন, "অকৃতজ্ঞ। মি—মি—মিথ্যাবাদী।···না, না, আমি কি বল্‌ছি! I am sorry! Oh, I am sorry!" তিনি এলিয়ে পড়্‌লেন। সুধী ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌তেই তিনি আবার উঠে বস্‌লেন। "না, না, তোমার কি দোষ!"

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর তিনি ধীরে ধীরে সুরু কর্‌লেন, "খানিকটে যখন শুনেছ এক পক্ষের, অপরপক্ষের বাকীটা শোন।···আমরা দুই ভাই শৈশবে মাতৃহারা হই। শোক ভুল্‌বার জন্য বাবা নিউ-জীলণ্ডে চলে যান। সেখানে তিনি প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে যখন দেশে ফির্‌লেন সে শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য। আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু দিদিমার অনুরোধে নিবৃত্ত হলেন। দিদিমা আর্থারকে পাব্‌লিক্ স্কুলে পাঠালেন না; তিনি শুনেছিলেন পাব্‌লিক্ স্কুলে রোগা ছেলেদের উপর ষণ্ডা ছেলেরা নির্বিঘ্নে অত্যাচার কর্‌তে পায়। ফলে খেলাধূলার দিকে আর্থার্ একেবারেই মন দিল না। রাত জেগে পড়্‌ল, স্কলার্‌শিপ্ পেল ও স্বাস্থ্যের মাথাটি খেল। আর্থার্ যখন ইউনিভার্‌সিটীতে ভর্ত্তি হয়েছে তখন দিদিমার কাল হল। আমি নিলুম আর্থারকে দেখাশুনার ভার। পড়াশুনায় নিবিষ্ট থেকে সে সংসার সম্বন্ধে একেবারে অচেতন ছিল। অথচ আমি ছিলুম রঙিন প্রজাপতি। ওর উপর এমন রাগ হত; কিন্তু ওকে ওর নিজের হাতে কিম্বা কোনো ল্যাণ্ড্‌লেডীর কোলে ছেড়ে দিতে প্রবৃত্তি হত না। ওর মনীষায় আমার বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ। ওর কর্ম্মপটুতায় আমার সন্দেহ ছিল, সে সন্দেহ কি মিথ্যা বল্‌তে চাও?" (সুধী উত্তর কর্‌ল না।) "মাঝে মাঝে ওকে ছেলেমানুষীতে পেত। বল্‌ত সিংহ শীকার কর্‌তে আফ্রিকায় যাব। যে মানুষ একটা খরগোস কিম্বা খ্যাঁকশিয়ালী মারে নি, মার্‌তে চায়নি, যে মানুষকে লণ্ডনের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে হলে মালগাড়ীতে তুলে দেওয়াই নিরাপদ, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগ্‌লে যার হাঁকডাকে পাড়াশুদ্ধ হাজির হয়—তার আফ্রিকা যাত্রায় সম্মতি দিলে সে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছে ভুল গাড়ীতে উঠ্‌ত ও ফোকষ্টোনে ভুল জাহাজে চড়ে বুলোনে উপনীত হত। এই ত?"

সুধী মনোযোগপূর্ব্বক শুনছিল। হাঁ, কিম্বা না বল্ল না।

"নিউ জীলণ্ডে যাবার জন্য বহুদিন থেকে বাবার আমন্ত্রণ ছিল। আর্থারকে সঙ্গী করে পাড়ি দিলুম। না-মরা সিংহের শোকে সমস্ত পথ তার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হল না। আমি কিন্তু নাচি, খেলাকরি, রাক্ষসের মত খাই। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দর্শন করা আমার নিত্যকর্ম্ম। ডেকের উপর অবাধ হাওয়ায় আমি হরিণীর মত চঞ্চলচরণে দিশাহারা হয়ে ছুটি। আহা, প্রথম যৌবনের সেই প্রাজাপত্য জীবন কি অনাবিল আনন্দের আকর ছিল।···

"জাহাজের আলাপ আদবকায়দার অপেক্ষা রাখে না। আমার প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন; তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদের একজনের প্রতি আমিও আকৃষ্ট হলুম। নিউ জীলণ্ড দেশটি ছোট। সেখানে যে কয় মাস ছিলুম, তাঁর সঙ্গে নানা ছলে সাক্ষাৎ ঘটত। একদিন বাবার অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে বাগ্‌দানও হয়ে গেল। ইংলণ্ডে ফিরে আর্থারের গৃহস্থালীর পাকারকম বন্দোবস্ত করে বছর দুই তিন বাদে নিউ জীলণ্ডে বিয়ে কর্‌ব এই স্থির হল। আর্থার্ মুখ ভার করে থাক্‌ল, বোধহয় সিংহের শোকে। অভিমত জানাল না। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌লুম।

"ইংলণ্ডের বাইরে মাত্র একটি ইংলণ্ড আছে। সেটি

নিউ-জীলণ্ড। সেদেশের প্রশস্ত নিভৃত পল্লীতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিচিত্র মালঞ্চে যার সঙ্গে আমার এন্‌গেজমেণ্ট্‌ তিনি অপেক্ষা করতে থাক্‌লেন আমার আশায়। আর আমি অপেক্ষা করতে থাক্‌লুম আর্থারের যদি কারুর সঙ্গে বিবাহ হয় তার আশায়। আর্থারকে কত মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম; একলা ছেড়ে দিলুম; নাচের আসরে পাঠালুম। কিছুতেই সে কারুর কাছে ঘেঁষ্‌ল না। কথাবার্ত্তার মাঝখানে অন্যমনস্ক হল। চায়ের টেবিল থেকে পালিয়ে গিয়ে বই খুলে বস্‌ল। নাচের মজলিশের এক কোনে পেঁচার মত মুখ ভার করে চিন্তামৌণ রইল। বছরের পর বছর যায়। ওর বিয়ে হয় না। আমারও হয় না। আর্থার বোঝেও না যে ওর জন্য আমার কতটা আসে যায়। ও ধরে নিয়েছে যে আমি সারাজীবন ওর রক্ষণাবেক্ষণ কর্‌ব।"

সুধী তাঁর ক্ষণবিরামের অবকাশে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ওকে খুলে বল্লেন না কেন?"

"যতবার ভাবি খুলে বল্‌ব ততবার ভয় হয় পাছে সে আফ্রিকায় কি উত্তর মেরুতে কি কোথাও চলে যায়। মনটাকে শক্ত কর্‌তে পারলে উভয়ের শেষ পর্য্যন্ত কল্যাণ হত, কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক্‌ জিনিষটি করা কয়জনের দ্বারা ঘটে ওঠে? তাঁরাই বিজ্ঞ যাঁরা এর সূত্র জানেন। হয়ত তুমি তাঁদের একজন, একটা স্বপ্ন দেখে কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেছ। আমি গড়িমসি করতে থাক্‌লুম। ইংলণ্ড থেকে নড়্‌তে আলস্য বোধ হচ্ছিল। অকস্মাৎ একদিন সংবাদ এল তিনি মোটর উল্টে মারা গেছেন।"

মিস্‌ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট্‌ রুমাল দিয়ে চোখ মুছ্‌লেন। মুছ্‌তে মুছ্‌তে লাল করে ফেল্লেন। তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হল। তখন সুধী তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল।

৩

আণ্ট্‌ এলিনর প্রকৃতিস্থ হয়ে সুধীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বল্লেন, "দেখ্‌লে ত তোমার নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টির উৎপাত! তার সাধনা যে করে সে হয় পরাসক্ত জীবের মত আশ্রয়দাতার অহিতকারী। তবে উজ্জয়িনীর ক্ষতি যা হবার তা হয়েই গেছে, তুমি আর বেশী কি কর্‌বে?"

সুধী প্রতিবাদ কর্‌তে পার্‌ত, বল্‌তে পার্‌ত যে দোষটা আপনার নিজের, আপনি আর্থার খুড়োকে তৈজস পত্রের মত অপদার্থ জ্ঞান না করলে তিনি হয়ত নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখ্‌তেন। কিন্তু দোষ যারই হোক দুঃখ ত তাঁর। সুধী সান্ত্বনাচ্ছলে বল্ল, "কত বড় একটা জিনিষ এই নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টি। এর জন্য এমনি বড় ত্যাগের দরকার ছিল। আপনি না কর্‌লে আর্থার খুড়োকে যিনি বিয়ে কর্‌তেন তিনি কর্‌তেন।"

আণ্ট্‌ ঘাড় নেড়ে বল্লেন, "কেউ কর্‌ত না, কেউ কর্‌ত না, নিজের বোনের মত নিঃস্বার্থ কোনো মেয়ে নয়। আর্থার্‌কে ওরা কেউ বুঝ্‌ল না, তার সাধনায় ওদের কারুর বিশ্বাস জন্মাল না। আর্থার যে ওদের একজনকে মনোনয়ন করেনি এতে ওর আত্মরক্ষণেচ্ছার প্রমাণ পাই।" কথাগুলোতে অসূয়ার গন্ধ ছিল।

সুধী উঠ্‌বার উদ্‌যোগ কর্‌ল। "সে কি এরই মধ্যে উঠ্‌বে? বস। কি যেন বল্‌ব ভাব্‌ছিলুম।...না, মনে পড়্‌ছে না। আবার কবে আস্‌ছ?"

"বল্‌তে পার্‌লুম না। লণ্ডনের বাইরে ঘুরে আস্‌বার ইচ্ছা আছে।" আণ্ট্‌কে জিজ্ঞাসু দেখে সুধী বল্ল, "বাদল লণ্ডনে নেই।"

"য়্যাঁ। লণ্ডনে নেই? কোথায় আছে তা হলে?"

"আইল্‌ অব্‌ ওয়াইটে আজও আছে কি না বল্‌তে পারিনে, কিছুদিন আগে ছিল।"

"কি করে জান্‌লে?"

"ফাঁদ পেতে। উজ্জয়িনীর একখানি চিঠি ওর ব্যাঙ্কের ঠিকানায় পাঠিয়ে পড়া হয়ে গেলে ফেরৎ দিতে লিখেছিলুম। ফাঁদে পা দিয়েছে। ডাকঘরের মোহর থেকে বোঝা গেল ভেণ্ট্‌নরে সে ছিল এবং হয়ত আছে। ভেণ্ট্‌নর কি খুব বড় শহর?"

"না। যদি সেখানে থাকে তবে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে বেরবে, তখন পাকড়াও কোরো।"

"এইবার শার্লক্‌ হোমস্‌ হ'য় দাঁড়ালুম, আণ্ট্‌। মোটেই

নিষ্ক্রিয় বোধ করছিনে, যাই বলি না কেন।" সুধী হাসিমুখে আসন থেকে উঠল।

আণ্ট্ এলিনর তাকে গেট্ পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে চল্লেন। চলতে চলতে বল্লেন, "আমরা মেয়েরা বড় অবুঝ। উজ্জয়িনীর উপর আমার রাগ করাটা অবুঝের মত হচ্ছে। তবু রাগ না করে পারছিনে। কোন্ অধিকারে সে তোমার সর্ব্বস্ব দাবী করল—তোমার স্ত্রীর ভাগ্য, তোমার বংশধর, তোমার সপরিবারে ধর্ম্মাচরণ, তোমার হিন্দু গার্হস্থ্য আশ্রম, তোমার পিতৃপিতামহ অনুসৃত কৌলিক আদর্শ—এক কথায় তোমার ভারতবর্ষ ?"

সুধী লঘুতার ছলনা করে বল্ল, "গোড়াতে ভুল্ করছেন, আণ্ট্, যে, উজ্জয়িনীর সঙ্গে আমার চোখের দেখাই ঘটেনি, মুখে বা চিঠিতে বা টেলিগ্রামে বা টেলিফোনে সে আমার কাছে অমন প্রস্তাব করেনি এবং করবে বলে আমার মনে হয় না। আমার ঘরে আমার ঘুমের ঘোরে আমার স্বপ্নে সে যা বলেছে তাও আমার বাঞ্ছার উত্তরে। ভারতবর্ষ ? আধুনিক ভারতবর্ষ ত সে-ই। যার হাত ধরেছিল তার মন পায়নি, অভিমানে কটি বস্ত্র পরছে। আমার দেশপ্রতিমাকে আমি অভিমানের মূঢ়তা থেকে মুক্ত দেখলে সুখী হব। বিধাতা আমাদের এতটা পরনির্ভর করে সৃষ্টি করেননি যে অপরের দ্বারে ধর্ণা দিয়ে উপবাসে শীর্ণ ও শ্রীহীন হতে হবে। নিজের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হবার সংকল্প যদি থাকে তবে সিদ্ধির উপায়ও নিশ্চিত আছে।"

গেট্ খুলে যখন সুধী রাস্তায় পড়্ল তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠছে। আণ্ট্ এলিনর বল্লেন, "কিন্তু ভারতবর্ষের চেয়ে তুমি বড়, তোমাকে আমরাও নিজের বলে দাবী করি, তুমি যুগোত্তর জীবনশিল্পীদের দলে। আধুনিক ভারতবর্ষের দুর্দ্দশার অনলে আত্মাহুতী দিও না, সুধী। কথা রাখবে ?"

সুধী উত্তর দিল না। তার নিজেরই কত প্রশ্ন ছিল। সে কি উজ্জয়িনীর জন্য স্বমার্গত্যাগী হচ্ছে ? বিশ্বের চিরকালের জীবনশিল্পীদের কাছে কি তাকে জবাবদিহি করতে হবে ? বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা সে যাই করুক না কেন, বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রতা কি তন্দ্রারা চাপা পড়ে ? সৃষ্টি ? সৃষ্টি নিয়ে সে করবে কি, যদি সৃষ্টি না করতে হয় ? সৃষ্টিকার্য্যে যোগ না দিলে সৃষ্টির আভ্যন্তরিক রহস্য দৃষ্টিগম্য হবে কেমন করে ? বিধাতার trade secret নেই কি ?

প্রশ্ন করতে হচ্ছে বলে সুধী নিরতিশয় লজ্জিত হল। প্রশ্ন করে কি সত্যের পাত্তা পাওয়া যায় ? যে জানে সে আপনি জানে। চিত্তকে যে মুকুরের মত মার্জ্জিত রেখেছে সত্য তার চিত্তে বিনা আহ্বানে প্রতিফলিত হয়। নিরাময় ও নিয়মানুবর্ত্তী যার দেহ, দর্শন-শ্রবণ-মননাদি ইন্দ্রিয় যার সুতীক্ষ্ণ ও সতর্ক, সত্য তার দ্বারে প্রবেশপ্রার্থী হলে সংশয়ের "হুকুমদার" শুনে থতমত খাবে না, "ফ্রেণ্ড্" না বলতে পারলে গুলির চোটে পঞ্চত্ব পাবে না। কাল রাত্রের চিত্তবিক্ষেপ, দৈহিক অস্বস্তি, সুষুপ্তির অভাব সুধীর প্রত্যক্ষ সত্যানুভবকে প্রশ্নসাপেক্ষ, পরোক্ষ করেছিল। তার ইন্‌টুইশন্, তার সহজাববোধ, পথিকহীন পথের মত আকাশের দিকে চেয়ে চিৎ হয়ে চুপ করে পড়ে রয়েছিল।

তার মানসিক প্রদাহ প্রশমিত হবে না, যদি সে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ না পায়। উজ্জয়িনীর দিদি কৌশাম্বী এসেছেন লণ্ডনে, বিভূতি নাগ দিতে পারবে তাঁর ঠিকানা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় না ? বিভূতিকে সুধী ফোন করল। বিভূতি বল্ল, রোস। আমি ফোন করে খবর নিই। বিভূতি জেনে জানাল কাল দুপুরে হোটেল রাসেলে গেলে দেখা হতে পারে।

শরীরকে প্রসন্ন করবার জন্য সুধী সে রাত্রে যথাসময়ের আগে ঘুমতে গেল। স্বপ্ন দেখলে অগণন। কিন্তু সকল স্বপ্নই উজ্জয়িনীবিরহিত। একটি স্বপ্নে মার্সেল হয়েছে তার মেয়ে, অশোকা হয়েছে তার স্ত্রী, মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট হয়েছেন তার শাশুড়ী !

৪

কৌশাম্বী তার শাড়ীর আঁচলটাকে বিদেশিনীদের বেরে (beret)-র অনুকরণে মাথার উপর কোণাকুণি ভাবে সংলগ্ন করেছিল, আর শাড়ীর নিম্নাংশকে স্কার্টের অনুকরণে হ্রস্ব করে পরেছিল। সুধীর দিকে এগিয়ে গিয়ে আসন নেবার সময় ডান হাত তুলে মধুর হেসে বল্ল, "না, না, দাঁড়াতে হবে না। আপনি মিষ্টার চক্রবর্ত্তী ?" (ইংরেজীতে) সোফার

উপর সমাসীন হয়ে রাণীর মত গৌরবে সুধীর মুখে তাকিয়ে ডান হাতের উপর মাথাটিকে কাত করে রাখ্‌ল। এর ফলে তার শাড়ীর বেরে (beret) সুধীর চোখে অপূর্ব্ব রমণীয় লাগ্‌ল। তারপরে শাড়ীর স্কার্টটাকে চোখের নিমিষে গুছিয়ে নিল, নামিয়ে দিল। তাঁর বাঁ হাত সুধীর দৃষ্টির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে নিরীহ ভালমানুষটির মতন যেখানে ধরা পড়্‌ল সেইখানে অর্থাৎ বাম উরুর উপর অনড় ভাবে ন্যস্ত রইল।

সুধী উত্তর কর্‌ল, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই।" (বাংলাতে)

যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সহিত কৌশাম্বী যত রাজ্যের মামুলী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় সমস্তই করে গেল। যথা "ইংলণ্ডে আপনি কতকাল আছেন?" "ইংলণ্ড কেমন লাগ্‌ছে?" "কি পড়্‌ছেন?" সবই রাজভাষায়। সুধী ভুলেও ইংরেজী বল্ল না। তখন কৌশাম্বী ইংরেজী ভাঙ্গা বাংলাতে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "আমার সঙ্গে কি বিশেষ কোনো কাজ ছিল?" অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে।

"আজ্ঞে হাঁ।" সুধী নিঃসঙ্কোচে বল্ল, "আপনি উজ্জয়িনীর দিদি। আমি তার স্বামীর বন্ধু। উজ্জয়িনীর খবর অনেক দিন পাইনি। আশা করি আপনার কাছে পাব।"

কৌশাম্বী সহসা কঠিন হয়ে বল্ল, "আমাকে মাফ করবেন, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। আপনাকে পর মনে কর্‌ছি বলে নয়; আপনার অধিকার অস্বীকার কর্‌ছি বলে নয়; কিন্তু আমার মায়ের ও উজ্জয়িনীর শ্বশুরের নিষেধ আছে বলে আমি উজ্জয়িনীর সম্বন্ধে যা জানি তা তার স্বামীর কাছেও প্রকাশ কর্‌ব না।" সুধীর হতাশা লক্ষ করে একটু নরম হয়ে বল্ল, "Dear Mr. Chakraborti, please—please don't be cross!"

কাষ্ঠহাসি হেসে সুধী বল্ল, "আপনার অপরাধ কি? গুরুজনের নিষেধ।" নিজের মনে কি ভাব্‌ল।

"আচ্ছা আপনাকে কি দিতে পারি বলুন ত? আপনি অবশ্যই স্মোক করেন।" সুধীর মাথা নাড়ার দিকে নজর না দিয়ে নিজের পার্স্‌ খুল্ল। তাতে তাঁর সোনার পাতে মোড়া রূপার সিগ্‌রেট কেস ছিল। মিষ্টি হেসে সুধীর সাম্‌নে মেলে ধর্‌ল।

সুধী বল্ল, "দয়া করে ক্ষমা কর্‌বেন। আমি খাইনে।"

ভুরু কপালে তুলে চক্ষু বিস্ফারিত করে কৌশাম্বী কিছুক্ষণ চুপ করে থাক্‌ল। তারপর নিজেই একটি তুলে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে চাপ্‌ল। সুধী তৎক্ষণাৎ দেশলাই জ্বালিয়ে সন্তর্পণে তার সিগ্‌রেট ধরিয়ে দিল। টান না দিয়ে কৌশাম্বী সেটাকে দুই আঙ্গুলের মাঝখানে ভঙ্গীর সহিত লট্‌কে রাখল এত আল্‌গোছে যে সুধীর আশঙ্কা হল পাছে কখন পড়ে গিয়ে কার্পেটে অগ্নিসংযোগ করে।

কৌশাম্বী সুধীর সৌজন্যে প্রসন্ন হয়েছিল। বল্ল, "মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে কথাটা বাদলের কানে তুল্‌বেন না তবে আমি নিষেধ অমান্য কর্‌লেও আমাদের বংশমর্য্যাদা হানি হবে না।"

"আপনি বোধ করি জানেন না, মিসেস্‌ মিত্র," সুধী করুণ হেসে বল্ল, "যে, বাদল আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। ইচ্ছা করে তার কাছে কোন কথা গোপন কর্‌তে পারিনে। তবে ঘটনাচক্রে এমন হতে পারে যে বাদল এই ব্যাপারের কিছুই আমার কাছ থেকে জান্‌বে না। আপনি ভাব্‌ছেন, সে কেমন? আপনাকে বল্‌তে আপত্তি নেই যে বাদল কয়েক মাস থেকে নিরুদ্দেশ এবং যদিও আমি এবার সখের ডিটেক্‌টিভ্‌ হয়ে তার অনুসন্ধানে বেরব তবু আমার ভরসা হচ্ছে না যে তার নিভৃত চিন্তানিবাসের ঠিকানা পাব।"

কৌশাম্বী বিস্ময় দমন না কর্‌তে পেরে বল্ল, "বাদল লণ্ডনে নেই? আপনি ঠিক জানেন?"

"না, ঠিক্‌ জানিনে, মিসেস্‌ মিত্র। আমি ত বলিনি যে সে লণ্ডনে নেই। তবে আমার অনুমান সে লণ্ডনে নেই। সেইজন্য 'বেরব' শব্দটি ব্যবহার করেছি।"

"তবে আপনি উজ্জয়িনীর সংবাদ কেন চান্‌, কার জন্য?" কৌশাম্বী এই প্রশ্নের রূঢ়তাকে ঢাক্‌বার জন্য গলার সুরে মাধুরী ঢেলে দিল।

"এমনি। উজ্জয়িনী আমার স্নেহের পাত্রী। তার সঙ্গে আমার পত্র বিনিময় হয়ে থাকে।"

কৌশাম্বী চম্‌কে উঠ্‌ল। থর্‌ থর্‌ করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "আপনার আগু নামটি কি আমাকে বল্‌তে বাধা আছে কি?"

"কিছুমাত্র না। সুধীন্দ্রনাথ।"

"সুধীন্দ্রনাথ!" কোশাম্বী উচ্ছ্বাসিত স্বরে বল্ল, "তা হলে অপেনি—পৃথিবীতে একমাত্র আপনি—জানেন কি ঘটেছে!" কৌশাম্বীর 'বেরে' খসে পড়েছিল, সে নিজেই সোফার উপর থেকে খসে পড়ে আর কি!

"দোহাই আপনার মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, আর পরীক্ষা করবেন না আমাকে। আমি শুধু এই টুকু জানি যে পাটনায় উজ্জয়িনীর কাগজপত্রের ভিতর যতগুলি চিঠি পাওয়া গেছে বাবার খানকয়েক ছাড়া বাকী সমস্ত আপনার। বলুন, বলুন, শেষ চিঠিতে কি লিখেছে সে—আত্মহত্যা, না, ইলোপ্‌মেণ্ট?"

সুধী চমৎকৃত বোধ করল। উজ্জয়িনীও নিরুদ্দেশ! তবে তার সেটা আত্মহত্যা কিম্বা ইলোপ্‌মেণ্ট নয়—বৈরাগ্যবরণ। সুধীর স্বপ্নলব্ধ ইঙ্গিত সত্যেরই ইঙ্গিত। আর কি জান্‌বার আছে? খবর ত সুধীর কাছে, কৌশাম্বীর কাছে নয়। সুধী উঠ্‌ল। বল্ল, "আপনি যা অনুমান করেছেন তা নিতান্ত ভুল নয়। তবে চিঠিতে জানায়নি, জানিয়েছে স্বপ্নে। আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছিলুম স্বপ্নের সত্যতা পরীক্ষা করতে। আর আমার সন্দেহ নেই যে উজ্জয়িনী বৈষ্ণবী হয়ে তীর্থযাত্রা করেছে। তার গৃহত্যাগে কোনো কলুষ নেই।"

সুধী লক্ষ করল যে কোশাম্বী তার কথা বিশ্বাস করল না। বল্ল, উজ্জয়িনীর বোন হয়ে জন্মেছেন এই ত আপনার অধিকার। এই অধিকারে তাকে বিচার করবেন? ওকে আমি ফিরিয়ে আন্‌ব গৃহস্থাশ্রমে। জানিনে এতদূর থেকে তা কেমন করে সম্ভব!" এই বলে সুধী অত্যন্ত চিন্তাকুল ভাবে কৌশাম্বীকে বিদায় সম্ভাষণ করে নিষ্ক্রান্ত হল।

৫

উজ্জয়িনী তীর্থযাত্রী হয়েছে কল্পনা করতেই সুধীর স্মৃতি নব জীবন লাভ করল। সেও একদিন ভারতবর্ষের প্রতি পল্লীকে তীর্থ জ্ঞান করে পদব্রজে পরিক্রমা করেছে।

উনিশ শ' কুড়ি সাল। গান্ধীর মধ্যে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছেন আপন আত্মা, তাই তাঁকে নাম দিয়েছেন মহাত্মা। একটা বিপুল আনন্দপ্রবাহ সমগ্র দেশের অন্তরের কন্দরে আকাশগঙ্গার মত অদৃশ্য বেগে সঞ্চারিত হচ্ছে। সুধী থাকে একটি ক্ষুদ্র সহরে, পড়ে সেখানকার অখ্যাত হাই-স্কুলের ফার্ষ্ট ক্লাসে। বৃহৎ সংসারের বিচিত্র ধ্বনির অতি মৃদু প্রতিধ্বনিও সেখানকার লোকের কাণে পৌঁছাত না। কিন্তু এই মহাবার্ত্তা তাদের নিভৃত জীবন যাত্রার অজ্ঞতা ভেদ করল। তারা উন্মনা হয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করতে লাগ্‌ল, "কে এই মহাত্মা?"

সুধীর বন্ধু বাবাজি লছমন দাস সংস্কৃত টোলের ছাত্র। বয়সে সুধীর দুইগুণ বড়, আকারেও। প্রকাণ্ড এক আলখাল্লাই বোধ করি তার একমাত্র পরিধান। মাথায় জটা নেই, পাগ্‌ড়ীও নেই। রুক্ষ চুল, রুক্ষ দাড়ি একাকার হয়ে গেছে।

লছমন দাস সুধীকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "তুই ত ইংরেজী খবরের কাগজ পড়িস্। মহাত্মা গান্ধারী কে রে? পুরাণে ত ওঁর নাম নেই!"

"জ্যান্ত মানুষের নাম পুরাণে কি করে থাকবে, বাবাজি?" সুধী হেসে জবাব দিল।

"যাঃ! আবার শাস্ত্রে সন্দেহ। তোরা বাঙ্গালীরা কোন্ নরকে যে জায়গা পাবি তাই কেবল ভাব্‌ছি আমি!

কেন হনুমান কি জ্যান্ত নয়, বিভীষণ কি এখনো রাজত্ব করছে না—"

"হনুমান যে জ্যান্ত ওকথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। পালে পালে লাফ দিয়ে বেড়াচ্ছে যত্র তত্র।"

"ছিঃ। ঠাকুর দেবতা নিয়ে ইয়ার্কি ভাল নয়। বিশেষত তোর মত সোনার ছেলের মুখে। তুই হলি আমাদেরই একজন। বল্ না আমাকে গান্ধারীর কথা। কলিযুগে কল্কী ছাড়া অন্য অবতার হতে পারে না। তবে যে লোকে বলছে রামজির অবতার? পূর্ণাবতার না অংশাবতার?"

সুধী গুরুত্বের সহিত বল্ল, "দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যে নির্য্যাতন সয়ে অহিংসা ব্রতে নিষ্ঠাপর থেকেছেন, উৎপীড়িতদের প্রতি তাঁর যে মমতা ও উৎপীড়কদের প্রতি তাঁর যে করুণা, তাতে তাঁকে মহাত্মা আখ্যায় অভিহিত

করা দেশের কোনো একজন মানুষের কিম্বা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ঘটেনি। সারা দেশ ঐ উপাধি ঘোষণা করেছে আপন আত্মার মহিমা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু গান্ধারী নয়, বাবাজি। গান্ধী। গন্ধবণিক।"

বাবাজি তার খাঁদা নাক কুঁচ্‌কে বল্ল, "ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য! রামজির অবতার বলে প্রত্যয় হচ্ছে না। তারপর তাঁর অহিংসানীতি যদি মান্‌তে হয় তবে আমার সেই তেল চুক্‌চুকে ডাণ্ডাটিকে পূজা না দিয়ে নিজের সর্ব্বদেহে চর্ব্বি লেপ্‌তে হয়। ধ্যেৎ! রাখ্ তোর গান্ধী!" —বাবাজি হন্ হন্ করে চলে গেল। সেদিন আখড়ায় গান্ধীকে ব্যঙ্গ করে সে একশ চৌষট্টিবার ডন ফেল্ল, দুশ নিরনব্বুই বার বৈঠক করল, মুগুর ভাঁজল বিরাশীবার ও আড়াই ঘণ্টাকাল মাটী মাখ্‌ল।

গান্ধী সম্বন্ধীয় কৌতূহল নিরাকরণ মানসে বাবাজি কলকাতা গেল। তখন কলকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশন। লালা লাজপত রায় সভাপতি। বাবাজি যখন ফিরল তখন সে যেন অন্য মানুষ। সুধীকে বল্ল, ও কি মানুষ রে! রামজি বুদ্ধাবতারে কিছু কাজ বাকী রেখে গেছ্‌লেন, তাই কল্কীর আগে এসে শেষ করে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যদি কাল যুগে থাক্‌ত তবে কি তিনি বৈশ্য বংশে জন্মগ্রহণ করতেন? আর জানিস্ কল্‌কাতায় ওরা আমাকে শাস্ত্র খুলে দেখিয়ে দিল ছাপার হরফে লেখা আছে অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। বুদ্ধাবতারে রামজি নাকি সেই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবতারভেদে তত্ত্বও ভিন্ন হয়ে থাকে, যে যুগের যা ধর্ম্ম।"

বাবাজি আখ্‌ড়া ছেড়ে দিল। লাঠিখানা কাকে বিলিয়ে দিল। ছেলেদের খেলার মাঠে মঞ্চ বেঁধে অসহযোগ প্রচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হল। তারই মত কত মানুষ দেশের নানা স্থানে নিজেরা ক্ষেপ্‌ল ও অপরকে ক্ষেপাল। বয়কট—বয়কট—বয়কট। ইস্কুল বয়কট, আদালত বয়কট, কাউন্সিল বয়কট, বিদেশী কাপড় বয়কট। বুড়ারাও মাথা ঠিক রাখ্‌তে পারল না, ছেলেরা ত চিরকাল মাথাপাগ্‌লা।

পড়াশুনায় সুধীর মন লাগ্‌ছিল না। দেশময় কি যেন একটা ঘট্‌ছে—"Swaraj within a year." ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটি একটি চিরস্মরণীয় বর্ষ। বছরে যেমন একটা দিন আসে, সেদিন অনধ্যায়, বহু শতাব্দীতে এও তেমনি একটা বছর। অসহযোগ নীতিতে সন্দিগ্ধ সুধী পড়াশুনায় অমনোযোগী হল। পরীক্ষা দিতে গিয়ে আশা করতে থাক্‌ল যে কেউ না কেউ তার পায়ে পড়্‌বে, হাত ধরবে, তাকে বল্‌বে 'আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যান, যদি গোলামখানা এতই ভাল লেগে থাকে।' সে-জাতীয় কোনো বিঘ্ন না ঘটায় সুধীর পরীক্ষায় সিদ্ধি তার সাধনার সদৃশ হল। অর্থাৎ টায়টোয় পাস।

এমন সময় লছমনদাস এল জেল থেকে ঘুরে। "সুধী, তুই এখনো বিজাতীয় শিক্ষার মোহ কাটাতে পারিসনি? চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল বছরে তিন লাখ টাকার পসার ছাড়্‌লেন। তোর পড়াশুনা কি তোকে ওঁদের চেয়ে বেশী টাকা রোজগার করাতে পারবে? হবি ত কেরাণী! ছাড়্ তোর ভবিষ্যৎ কেরাণীগিরি। আয় আমার আশ্রমে।"

সুধীর অভিভাবক ছিলেন তার মামা। সুধীর নাবালক অবস্থায় তার পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি তিনিই দেখাশুনা করতেন। তিনি সুধীকে নিষেধ করলেন নিজে সরকারী চাকুরে বলে। নইলে তাঁর নিষেধ করবার কোনো নিঃস্বার্থ হেতু ছিল না। তাই সুধী ঐ নিষেধ লঙ্ঘন করল ও লছমন দাসের স্বরাজ আশ্রমে ভর্ত্তি হল। সেখানে তারই মত অনেকগুলি বালক, কয়েকজন পসারত্যাগী উকীল মোক্তার, একজন কি দুজন চাকুরীত্যাগী মাষ্টার। কাজের মধ্যে দুই, চরকা কাটা ও ভিক্ষা করা। ভিক্ষার চাল চুলোয় চড়াবার জন্য মাইনে দিয়ে বামুন রাখা হয়েছে।

সুধী বল্ল, "ভিক্ষার চাল ফুটাবার জন্য ভাড়াটে বামুনের দরকার নেই। আমি রাঁধ্‌ব।"

আশ্রম-সচিব চোখ কপালে তুলে বল্লেন, "বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের রান্না বেহারের লোক খাবে!" (ক্রমশঃ)

লীলাময় রায়

কাউণ্ট দি বইন

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌, পি-আর-এস্‌

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গোলাম কাদেরের মৃত্যু হইল। ইস্মাইল বেগকে বাদসাহের কর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করিয়া সেবাৎ এবং হরিয়ানা জনপদের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। আবার মহাদজী হিন্দুস্থানের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আবার মহা-সমারোহে অন্ধ সম্রাটের অভিষেক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। আবার তিনি পেশবা ও সিন্ধিয়াকে পূর্ব্ব প্রদত্ত উপাধি পুনঃপ্রদান করিলেন। দি বইনের কিন্তু এসকল ব্যবস্থা মনঃপূত হইল না। মহাদজী তাঁহাকে পূর্ণভাবে প্রত্যয় করিতেছেন না বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। দি বইন সিন্ধিয়াকে তাঁহার সেনাদল বর্দ্ধিত করিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে ব্যাটালিয়নদ্বয় সাহায্যে দুই একটী যুদ্ধ জয় করা সম্ভব হইলেও রাজ্যরক্ষার্থ তাহাদের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত নহে। সুতরাং তৎপরিবর্ত্তে এক কোর (Corps) গঠন করা আবশ্যক। মহাদজী স্পষ্টতঃ না বলিলেও প্রস্তাবে সে সম্মত হইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

De Boigno

তাহার কারণ কয়েকটী ছিল বলিয়াই মনে হয়। প্রথমতঃ শত্রুর অবর্ত্তমানে একেবারে অতগুলি টাকা খরচ করিতে সহজে স্বীকৃত না হওয়াই স্বাভাবিক; তদ্ভিন্ন অপরাপর মারাঠানায়কের ন্যায় মহাদজীরও তখন জাতীয় বার্গীসেনার উপর পূর্ণ নির্ভর ছিল। সুতরাং তাঁহার কর্তৃত্বের বাহিরে বিদেশী সেনাপতির সম্পূর্ণরূপে বশীভূত দুর্দ্ধর্ষ এক সৈন্যদল সৃষ্টি তিনি তখন যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। মহাদজীর প্রদত্ত উত্তরে দি বইন সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার মনে হইল সিন্ধিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাসের অভাববশতঃ এপ্রস্তাবে রাজী হইলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ দীর্ঘ অবসর লইয়া অথবা প্রকৃত-প্রস্তাবে বলিতে গেলে কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াই লক্ষ্ণৌনগরে পূর্ব্ববন্ধু ক্লাদ মার্টিনের নিকট গমন করিলেন। যাত্রাকালে সিন্ধিয়া তাঁহাকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি পুরস্কার দিয়াছিলেন। নীলের চাষে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা দেখিয়া অতঃপর বন্ধুযুগল ঐ ব্যবসারে লিপ্ত হয়েন। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের গোলাপজল, আতর, রেশমি-বস্ত্র, স্বর্ণরৌপ্যাদিরও কারবার ছিল।

এই স্থানে লেস্তিনোর (Lestineaux or Lestenau) কথা বলা প্রয়োজন। এই ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। ১৭৮৮ সালে ভরতপুররাজ রণজিৎ সিংহের একদল নিয়মিত পদাতিক সেনার অধিনায়করূপে ইহার প্রথম দেখা পাওয়া যায়। লালসাতের পরাজয়ের পর মহাদজী জাঠদের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইলে রণজিৎ সিংহের সেনাদল মারাঠা-দের সাহায্যে প্রেরিত হইয়াছিল। চাকসানার যুদ্ধে লেস্তিনোর ব্রিগেডের বীরত্বের কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, সমরে পরাজিত হইয়াও যদি কিছু যশের ভাগী হওয়া যায়, তবে ঐ যুগে দি বইন এবং লেস্তিনোর সিপাহীগণ তাহা

লাভ করিয়াছিল। আগ্রার যুদ্ধের পর লেস্তিনো নিজ সৈন্যদল লইয়া রাণখাঁর সহগামীরূপে দিল্লী গমন করিয়াছিল এবং তথা হইতে গোলাম কাদেরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মীরাট অবরোধে ব্যাপৃত ছিল। গোলাম কাদের ধরা পড়িয়া প্রথম এই লেস্তিনোর হস্তেই অর্পিত হইয়াছিল। দিল্লী প্রাসাদ হইতে লুণ্ঠিত ধনরত্নাদি তাহার জিন সংলগ্ন থলির মধ্যে লুক্কায়িত আছে, সে সংবাদ পাইয়া ভাগ্যান্বেষী ফরাসীসৈনিক উহা হস্তগত করিল। ইহাকেই বলে 'চোরের

মহাদজী সিন্ধিয়া

উপর বাটপাড়ী'। রণজিৎ সিংহ কর্ত্তৃক সেনাদলের আট মাসের বেতন জন্য প্রদত্ত দেড়লক্ষ টাকা এবং ঐ সকল মণিরত্নাদি লইয়া লেস্তিনো অতঃপর গোপনে পলায়ন করিল! বহু আয়াসে ইংরাজ রাজ্যে আশ্রয় লইয়া তথা হইতে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বলা বাহুল্য অবশিষ্ট জীবন তাহার স্বদেশে খুবই সুখে কাটিয়াছিল।

লেস্তিনোর অন্তর্দ্ধানের পর তাহার গঠিত ব্রিগেড দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। প্রবীণতম কর্ম্মচারীরূপে অতঃপর কাপ্তেন পিলে (Pillet) নামক একজন ফরাসীসৈনিক সেনাদলের অধিনায়কত্ব লাভ করে। লেস্তিনো তাহাদের প্রাপ্য বেতন লইয়া পলায়ন করিয়াছে জানিতে পারিয়া সিপাহীগণ অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নবনিযুক্ত সেনানায়ক কোন মতেই তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারিল না। তখন বাধ্য হইয়া রণজিৎ সিংহ উহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া ব্রিগেড ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহার পর পিলে জয়পুরের রাজার সেনাদলে প্রবেশ করে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজ্যের আর্থিক সম্পদ সম্বন্ধে প্রকাণ্ড এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া পিলে ইংরাজ কোম্পানীকে পাঠাইয়াছিল। জয়পুরাধিপতির সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে ইংরাজদিগের কিরূপ লাভের সম্ভাবনা তাহা প্রদর্শন করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল। মারাঠাদের বিপক্ষে ইংরাজদের সাহায্য লাভ করাই পিলে এবং তাহার প্রভুর অভিপ্রায় ছিল। জয়পুরাধিপতির অর্দ্ধলক্ষ সৈনিক লইয়া গঠিত একটী বিশাল সৈন্যবাহিনী থাকিবে এবং তাহার যাবতীয় ব্যয়ভার কোম্পানী বহন করিবে প্রস্তাবিত সন্ধির ইহাই প্রধান সর্ত্ত থাকায় উহা কার্য্যে পরিণত করিতে ইংরাজদের কোনই আগ্রহ লক্ষিত হয় নাই! সিন্ধিয়ার সহিত জয়পুররাজের যুদ্ধে পিলে দি বইনের বিরুদ্ধে সেনা পরিচালন করিয়াছিল কিনা জানা যায় না।

এই সময়ে হিন্দুস্থানের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নবযুগের সূচনা করিল। বলিতে গেলে মহম্মদ সাহই শেষ মোগল সম্রাট। তাঁহার পর যাঁহারা তখ্‌তে বসিয়াছিলেন তাঁহারা আকবর ও ঔরঙ্গজেবের নিতান্তই অযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। সাম্রাজ্যের আনুগত্য স্বীকার করা দূরের কথা তাঁহাদের রাজপ্রাসাদ মধ্যেই পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ছিল না। তাঁহারা প্রায়শঃই কোন না কোন পরাক্রান্ত উজীর বা আমীরের হস্তের ক্রীড়নক মাত্র থাকিতেন। ঐ আমীরের দল বাদসাহের উপর ক্ষমতা উপভোগের জন্য পরস্পর কলহ বিবাদে লিপ্ত হইত এবং নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে নামে মাত্র সম্রাটগণকে সিংহাসনে বসাইত বা তথা হইতে, এমন কি অনেক সময় ধরাধাম হইতে অপসারিত করিত।

মহম্মদ সাহের মৃত্যু হইতে দিল্লীতে মহাদজী সিন্ধিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা (১৭৪৮-৮৮), এই চল্লিশ বৎসর কালের দিল্লীর ইতিহাস বড়ই করুণ। ইহাতে আছে শুধু স্বার্থপর, বিবাদপ্রিয় আমীরদের বাদসাহের উপর আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নামে ক্ষমতা অপব্যবহারের চেষ্টার কথা, পরাক্রান্ত মোগল সেনাদলের অধঃপতনের শোচনীয় কাহিনী, দুর্ব্বলচিত্ত ভীরু প্রকৃতিক বাদসাহের মন্ত্রিমণ্ডলীর হস্তের খেলার পুতুল হইয়া থাকা এবং সময় সময় হীন কাপুরুষোচিত ষড়যন্ত্রের দ্বারা নিজ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের বৃথা চেষ্টার বিবরণ। বড়ই দুঃখের বিষয় এযুগে তৈমুরবংশে একজনও প্রকৃত বীর বা কর্ম্মঠ ব্যক্তির আবির্ভাব হয় নাই। বাদসাহদের কেহই নিজের প্রকৃত মুক্তিপথ বুঝিতেন না; যখনই কোন হিতৈষী ব্যক্তি সাম্রাজ্যের মঙ্গলকল্পে চেষ্টা করিয়াছেন তখনই মূর্খ সম্রাট চাটুকার ও স্তাবকদলের এবং আত্মোদরস্ফীতিকামী অমাত্যমণ্ডলীর সাহায্যে তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন! ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে?

দেশের অবস্থা এই সময় নিতান্তই শোচনীয় দাঁড়াইয়াছিল। শান্তি ও শৃঙ্খলার নাম মাত্রও কোথাও ছিল না, সামাজিক জীবন একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছিল। রাজধানী মহানগরী দিল্লী লুণ্ঠনের বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। পারসিক, আফগান, রোহিলা, মারাঠা, জাঠ, শিখ সকলকারই লুব্ধ-দৃষ্টি দিল্লীর প্রতি প্রসারিত ছিল। যে যখন সুবিধা পাইয়াছিল নির্ম্মমভাবে নগর লুণ্ঠন করিয়াছিল। ধনীর দল দিল্লী ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। যাহাদের সে সুযোগ ছিল না তাহারা নিজ নিজ ধনসম্পত্তি যথাসম্ভব লুকাইয়া রাখিয়া সদাই আতঙ্কে দিন যাপন করিত। রাজপথে সর্ব্বদাই গোলযোগ; বেতন না পাইয়া বিদ্রোহী সিপাহী, বদমায়েস ও গুণ্ডার দল সদাই লুঠের গন্ধে লোলুপ; সুবিধা পাইলেই হইল। দোকান পসার সব বন্ধ। বিভিন্ন সৈন্যদলের অনবরত যুদ্ধ ও অভিযানের ফলে শস্যক্ষেত্রগুলি উৎসাদিত, গ্রামসমূহ জনহীন, রাজপথ সমূহ পরিত্যক্ত, সংস্কারাভাবে বিধ্বস্ত, হিংস্র পশু বা ততোধিক হিংস্র দস্যু তস্করের নিবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। কৃষককুল আর নিজ নিজ প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্যোৎপাদনে যত্নবান ছিল না। কেনই বা হইবে? প্রাণপাত করিয়া উৎপন্ন পক্বশস্যশোভিত ক্ষেত্রসমূহ যুযুৎসু সৈন্যদলের দ্বারা বিমর্দ্দিত হইয়া যাইতেছে অথবা অপরে আসিয়া তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ ধন লুঠিয়া লইতেছে এদৃশ্য কাহার ভাল লাগিতে পারে? ফলে খাদ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইত। এ অবস্থায় যদি পর্জ্জণ্য বারিদানে কার্পণ্য করিতেন তখন আর রক্ষা ছিল না। ইহাই হইল সংক্ষেপে এ যুগের হিন্দুস্থানের ইতিহাস এবং ইহার চরম পরিণতি হইল গোলামকাদের কর্ত্তৃক দিল্লীপ্রাসাদে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং রাজপরিবারের সকলকার প্রতি অকথ্য অত্যাচার এবং স্বয়ং বৃদ্ধ সম্রাট সাহআলমের চক্ষুরুৎপাটন!

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থানের দুঃখের রজনী প্রভাত হইল। মাৎস্যন্যায় বিদূরিত করিয়া দেশে শান্তি সুখ প্রতিষ্ঠা করিবার উপযুক্ত লোক তখন হিন্দুস্থানে সুধু একজনই ছিলেন, তিনি সিন্ধিয়া কুলগৌরব প্রখ্যাতনামা মহাদ। আজ তাঁহার নাম অনেকেরই নিকট নূতন ঠেকিবে। কিন্তু এমন একদিন গিয়াছে যখন অদ্ধ ভারত তাঁহার তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়াছিল। অন্ধ বাদসাহকে তদীয় নাম সর্ব্বস্ব অধিকারে প্রতিষ্ঠা করিয়া অতঃপর মহাদজী তাঁহার রক্ষকরূপে দিল্লীতে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং হিন্দুস্থানে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। ইতিপূর্ব্বে মারাঠারা আর কখনও প্রত্যক্ষভাবে দিল্লী অধিকার করে নাই। এইরূপে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটী নবযুগের সূচনা করিল। কিন্তু বাহ্যতঃ কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। যদিও সম্রাটের সবই গিয়াছিল, তথাপি তখনও তিনি নামে সমগ্র ভারতবর্ষের অধীশ্বর। প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ দিল্লীর অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া স্বাধীন নৃপতিতে পরিণত হইলেও বাস্তবে তখনও কেহই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই; নামে সকলই সম্রাটের অধীন। হায়দ্রাবাদের অধিপতি চিরদিন "নিজাম" রহিয়া গিয়াছেন। অযোধ্যার অধীশ্বর সুদীর্ঘকাল "নবাব-উজীর" উপাধিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। মাত্র ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম গাজিউদ্দীন হাইদার এই আখ্যা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী

ধরণে King of Oudh নাম লইয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই অযোধ্যার নবাবগণ ইংরাজের আশ্রিতমধ্যে পরিণত হইয়াছিলেন। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর হইলেও সিন্ধিয়া ছিলেন নামে পেশবার একজন কর্ম্মচারী মাত্র। পেশবা ছিলেন আবার তাঁহার নাম সর্ব্বস্ব প্রভু শিবাজীর বংশধর সাতরাধিপতির প্রধান মন্ত্রী। সাতারার রাজা ছিলেন আবার মোগল বাদসাহের একজন সামন্ত নরপতি! *

কিন্তু সেই হৃতসর্ব্বস্ব বাদসাহ ছিলেন সিন্ধিয়ার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র! সিন্ধিয়াও কোন নূতনত্বের পক্ষপাতী হইলেন না। তিনি নিজের পূর্ব্বের পদমর্য্যাদা লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। অন্ধ বাদসাহ নিয়মিত ভাবে তখ্‌তে বসিতেন, দরবার করিতেন; আর তাঁহার নামে মহাদজী শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

মহাদজীর সুশাসনে হিন্দুস্থানে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। জনপদসমূহ আবার শস্যক্ষেত্রে সুশোভিত হইল, আবার দেশের লোকে কৃষিবাণিজ্য শিল্পকর্ম্মে মনোনিবেশ করিল, আবার দেশে সুখ সমৃদ্ধি দেখা দিল। হিন্দুস্থানে সিন্ধিয়ার আধিপত্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। মাত্র ১৫ বৎসর পরে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহাদজীর উত্তরাধিকারী দৌলৎরাও সিন্ধিয়া তাঁহাদিগকে উত্তরাপথের আধিপত্য প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই সিন্ধিয়ার সুশাসনে এবং দি বইনের কর্ম্মদক্ষতায় দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, অধিবাসীবৃন্দ সত্যই সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইংরাজগণও তাঁহাদের নবলব্ধপ্রদেশে সিন্ধিয়া অনুসৃত শাসন প্রণালীই মূলতঃ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। মারাঠা শাসন অন্তর্হিত হইবার অর্দ্ধশতাব্দী কাল পরেও হিন্দুস্থানের অধিবাসীবৃন্দ কোম্পানীর আমলের সহিত তখনকার দিনের তুলনা করিয়া দুঃখের নিশ্বাস ফেলিত। একথা অপর কেহ বলেন নাই; বলিয়াছিলেন স্বয়ং একজন ইংরাজ লেখক, যিনি জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল হিন্দুস্থানের বিভিন্ন স্থানে কাটাইয়াছিলেন। *

সিন্ধিয়া হিন্দুস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার অবস্থা তখন খুব সুখের ছিল না। বিপদের ঘনমেঘ তখনও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল। বিদ্রোহী মোগল আমীরদের প্রতাপ তখনও সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হয় নাই। ইস্মাইল বেগের নবলব্ধ রাজভক্তি যে দীর্ঘস্থায়ী হইবে না তাহা মহাদজীর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। আফগানিস্থানে আমীর তৈমুর হিন্দুস্থান আক্রমণের অভিপ্রায়ে যুদ্ধ সজ্জা করিতেছিলেন। তৈমুরের ভারতে আগমন মাত্রেই মুসলমান আমীরের দল যে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবেন তাহা সিন্ধিয়া জানিতেন। রাজস্থানের রাজন্যবৃন্দের সহিত বিরোধের তখনও অবসান হয় নাই। পুনা হইতে নানা ফড়ণাবীশ বিগত সমরের শেষভাগে সেনা সাহায্য করিলেও তিনি যে সিন্ধিয়ার সৌভাগ্যোদয়ে সন্তুষ্ট নহেন তাহা সকলেই জানিত। হোলকর এবং আলি বাহাদুর যে তাঁহাকে পূর্ণভাবে সাহায্য করিবেন না, কতকটা তাঁহাকে দমনে রাখিবার জন্যই প্রেরিত হইয়াছেন একথা মহাদজীর অজানা ছিল না।

শীঘ্রই ইস্মাইল বেগের সহিত বিরোধ বাধিল। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা মুসলমান বীরের পক্ষে দীর্ঘকাল মারাঠা অধীনে যাপন করা সম্ভব হইলনা। তিনি আবার মহাদজীর

* মোগল কারাগার হইতে মুক্তিলাভকালে ছত্রপতি শিবাজীর পৌত্র সাহু বা দ্বিতীয় শিবাজী সম্রাট বাহাদুর সাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়া মোগল সম্রাটের অধীনে রাজ্যসুখভোগের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। শিবাজী এবং শম্ভুজীই শুধু মোগল সংস্পর্শশূন্য পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

* "About the middle of the ninteenth century, old man still regretfully spoke of those days. The introduction of British rule, with its sure and inflexible methods, had for sometime the effect, however unintentional, of interrupting this welfare and producing a contrast. When land became a complete security for debt, and when ancestral acres were brought to the hammer for default of government dues, it was not to be wondered at if the people sighed for the days of Sindhia and his French officers. Better tiimes have since ensued the reign of law has been tempered by sympathetic amoderation But perhaps even now there may be yet something to be learnt from the records of a ruder administration more agreeable to the habits of a simple rural community."

H. G. Keene—Hindusthan under Free Lances, PP. 42-3.

বিরুদ্ধে আর একটী মোগল বিদ্রোহের নায়ক হইলেন। জয়পুর এবং যোধপুরের নৃপতিদ্বয় তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেন। তৈমুরকে হিন্দুস্থান আক্রমণের জন্য উৎসাহিত করা হইতে লাগিল। চারিদিকে শত্রুর সমাবেশ দর্শনে মহাদজী উৎকণ্ঠিত হইলেন। বিগত সমরে দি বইন ও লেস্তিনো পরিচালিত সিপাহীগণ যে সুশৃঙ্খল রণচাতুর্য্য ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে অন্যান্য সেনাদলের সহিত পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত পদাতিকবাহিনীর বলবৃদ্ধি করা একান্তই আবশ্যক তাহা তিনি সম্যকরূপেই উপলব্ধি করিলেন। দি বইনকে তিনি সেনাদলের ভার লইবার জন্য পুনরায় আহ্বান করিলেন। এবার সিন্ধিয়া তাঁহাকে যে সকল সর্ত্ত প্রদান করিলেন তাহা খুবই ভাল। সেনাবিভাগের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। এতকাল পরে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের অভীষ্টলাভ হইল। তিনি যাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তজ্জন্য লখনৌ নগরে যে সকল কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন সে সকল বন্ধ করিতে লাগিলেন। যে সকল কার্য্য আশু নিষ্পত্তি করা সম্ভব হইল না সেগুলির ভার সুহৃদ্বর ক্ল্যদমার্টিনের প্রতি সমর্পণ করিয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বেনোয়া মথুরা নগরে মহাদজীর নিকটে আসিয়া সেনাদল গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

দি বইন অবসর লইলে পরে তাঁহার পূর্ব্বগঠিত সেনাদল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। যথাসময়ে বেতন না পাইয়া সিপাহীগণের অসন্তোষ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রয়োজন মত ভয় দেখাইয়া ও মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া, বক্রী বেতন কতকাংশে পরিশোধ করিয়া ও নিতান্ত অবাধ্যদের কর্ম্মচ্যুত করিয়া তিনি সেনাদল মধ্যে বশ্যতা পুনরানয়ন করিতে সমর্থ হইলেন। পূর্ব্বতন চুক্তি হইতে মুক্তি দিয়া সিপাহীগণকে নূতনতর সর্ত্তে পুনর্গ্রহণ করা হইল। যাহারা এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইল না বলা বাহুল্য তাহারা অবসর লাভ করিল। মহাদজী তাহাকে দশ ব্যাটালিয়ন সৈন্যসম্বলিত একটি ব্রিগেড গঠনের ভার দিয়াছিলেন। দি বইনের পূর্ব্বেকার দুই ব্যাটালিয়ন ত ছিলই। লেস্তিনোর অন্তর্দ্ধানের পর রণজিৎসিংহ বিদ্রোহাপরাধে তাঁহার পদাতিক ব্যাটালিয়ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সিপাহীগণকে দি বইন কর্ম্মে গ্রহণ করিলেন। ইহারাই হইল তাঁহার তৃতীয় ব্যাটালিয়ন। এতদ্ভিন্ন আরও সাতটী নূতন ব্যাটালিয়ন গঠিত হইল। তজ্জন্য সমর-ব্যবসায়ী উৎকৃষ্ট যোদ্ধজাতিসমূহ হইতে সিপাহী সংগৃহীত হইল। দি বইন নিজে তাহাদিগকে সামরিক ড্রিল, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে এ দেশে তরবারী বিক্রয়েচ্ছু ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষের অভাব ছিল না। সিন্ধিয়া প্রদত্ত বেতনে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই তাঁহার অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিল। এইদলে ইউরোপের সকল দেশের লোকই ছিল। তন্মধ্যে বৃটিশজাতীয় সৈনিকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যেই দি বইন সিন্ধিয়ার জন্য উৎকৃষ্ট এক ব্রিগেড গঠন করিলেন।

ইস্মাইল বেগ এবং তাঁহার সুহৃদ সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে আর একটি মোগলবিদ্রোহের সৃষ্টি করিলেন, সে কথা বলিয়াছি। মহাদজীর আধিপত্য স্বীকারে অসম্মত বহুসংখ্যক আমীর সদলবলে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আফগানদের আগমনের পূর্ব্বেই জয়পুর এবং যোধপুরের রাজন্যদ্বয় হামদানীর সাহায্যকল্পে অগ্রসর হইলেন। সিন্ধিয়াও পূর্ব্বপরাজয়ের কালিমা মুছিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে গোপাল রাও ভাও এবং লকুবা দাদার নেতৃত্বে নিজ ফৌজ রাজপুতানায় পাঠাইলেন; সঙ্গে চলিল দি বইনের ব্রিগেড। মথুরা হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া মারাঠারা দেড়মাসে গোয়ালিয়রে আসিয়া পৌছিল (মে ১৭৯০)। শত্রুর সন্ধানে প্রেরিত চর ১০ই মে তারিখে সংবাদ আনিল যে জয়পুর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত পাটন নামকস্থানে ইস্মাইলবেগ সসৈন্যে অবস্থান করিতেছেন। তখন মারাঠারা পাটনাভিমুখে অগ্রসর হইল। ২৫শে মে তারিখে তাহারা পাটনসমীপে আসিয়া নগরাবরোধে প্রবৃত্ত হইল; উহার প্রায় সমসময়েই মারবার হইতে রাঠোরগণও আসিয়া জয়পুরের কচ্ছবাহগণের সহিত সম্মিলিত হইল। সুচতুর মহাদজী সামদানভেদদণ্ড সকল নীতিতেই সমভাবে পারদর্শী ছিলেন। ছলে বা কৌশলে যে কার্য্যসাধিত হইতে পারে তজ্জন্য বলপ্রয়োগের তিনি একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। লকবা দাদার

চক্রান্তে জয়পুরাধিপতি প্রতাপসিংহ তাঁহার রাজ্য উৎসাদিত করা হইবে না আশ্বাস পাইয়া সমরে অংশমাত্র গ্রহণ না করিয়া উদাসীনবৎ নিশ্চেষ্ট থাকিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পক্ষান্তরে সিন্ধিয়াব বাহিনীর সহযোগী হোলকরের সেনাদলও যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিল, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাদজীকে কতকটা দমনে রাখিবার জন্যই নানা হোলকরকে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাকে পূর্ণভাবে সাহায্য করা তাঁহার একেবারেই অভিপ্রায় ছিল না।

জয়পুরীদের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা নাই দেখিয়া এবং অবরোধজন্য নিজ শিবিরে আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্যবশতঃ অসন্তোষ সৃষ্টি দেখিয়া পরিশেষে ২০শে জুন তারিখে হামদানী শত্রুর সহিত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। দশসহস্র রাঠোরবীরও তাঁহার সহগামী হইল। মোগলরা শত্রুর দক্ষিণ ও রাঠোররা বামবাহু আক্রমণ করিল। তুর্য্য ও দামামাধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া আপাদমস্তক-লৌহবর্ম্মাবৃতদেহ ইস্মাইল বেগের অশ্বারোহীদল ঘোররোলে প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মতই শত্রুসেনার উপর নিপতিত হইল। দি বইনের গোলন্দাজদল তাহাদের গতিরোধের জন্য অনবরত কামান হইতে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ঘোররবে ভীষণদর্শন আগ্নেয়াস্ত্র সমূহ একসঙ্গে শতমুখে অনল উদ্গিরণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখবর্ত্তী অশ্বারোহী দল ছিন্নভিন্নদেহ বিগতপ্রাণ হইয়া স্তূপাকারে ধরাশায়ী হইল। পশ্চাদ্বর্ত্তী মোগলবীরগণ ইহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া সহযোগীগণের মৃতদেহের উপর দিয়াই সবেগে অশ্বপরিচালন করিয়া অগ্রসর হইল এবং গোলন্দাজ দল পুনরায় কামানে গোলা পুরিবার পূর্ব্বেই খড়্গাঘাতে তাহাদের বিনাশসাধন করিল। সে বেগ রোধ করার সাধ্য অপর কোন সৈন্যদলের ছিল না। কিন্তু দি বইনের নিজের হাতে গড়া সিপাহীসেনা আর পূর্ব্বেকার সে জিনিস ছিল না। সাগরোর্ম্মির প্রচণ্ড তাড়নেও তটভূমি যেমন অচঞ্চল থাকে, উহারাও তেমনই অচল অটলভাবে দৃঢ়পদে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া মোগলগণের গতিরোধ করিল। সঙ্গীণের কণ্টকাঘাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া অশ্বসমূহ পশ্চাৎপদ হইলে স্থিরলক্ষ্যে দৃঢ়মুষ্টিতে বন্দুক ধারণ করিয়া সিপাহীগণ শ্রাবণের ধারাপাতের ন্যায়ই তাহাদের প্রতি গুলিবৃষ্টি করিল। এবার আর অশ্বারোহীরা তিষ্ঠিতে পারিল না, তাহারা পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। এইরূপে তিনবার হামদানীর মোগলসেনা শত্রুর তোপখানা অধিকার করিলেও প্রত্যেকবারই দি বইনের পদাতিক সেনা তাহাদের প্রতিহত করিল। ক্রীমিয়সমরে ব্লাকলাভা রণক্ষেত্রে লাইটব্রিগেডের চার্জ্জের কাহিনী এদেশে সুপরিচিত, কিন্তু পাটনের যুদ্ধে মোগল ও রাঠোরসেনার বীরত্বের সন্ধান কয়জন রাখেন?

পরিশেষে দি বইনের আদেশে তাঁহার সিপাহীগণ সুশৃঙ্খলভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইল। মারাঠাবাহিনীর কেন্দ্রদেশে একদল বাদসাহী ফৌজ অবস্থিত ছিল, তাহারা এ যাবৎ যুদ্ধে অংশমাত্র না লইয়া চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান ছিল। রাঠোরদের প্রচণ্ড আক্রমণে যখন বামপ্রান্ত বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল, তখন তাহাদের সাহায্যকল্পে অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদত্ত হইলেও ইহারা সে আদেশ পালনে তৎপর হয় নাই। এবারও তাহারা অপর সকলের সহিত অগ্রসর না হইয়া যথাস্থানে দণ্ডায়মান রহিল। হামদানী নিজে একজন সুদক্ষ অসমসাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত নিজ সেনাবল স্থাপন করিয়াছিলেন। পরস্পর সমান্তরাল তিন সারি পরিখার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার পদাতিকদল যুদ্ধ করিতেছিল। আক্রমণের প্রথম বেগেই মারাঠারা প্রথম শ্রেণী অধিকার করিয়া লইল। তখন অবশিষ্ট দুইটির জন্য উভয় পক্ষে ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাত্রি আটঘটিকার সময় দ্বিতীয় লাইন অধিকৃত হইলে মোগলসেনা তৃতীয় পরিখায় পলায়ন করিয়া তাহাদের শেষ আশ্রয় রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু শত্রুর পরাক্রমের নিকট সকলই বিফল হইল। আরও একঘণ্টা পরে মারাঠারা এ পরিখাটিও অধিকার করিয়া যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিজয়লাভ করিল। তখন মোগলরা রণে ভঙ্গ দিল। হামদানী প্রায় একক অবস্থায় কোনমতে জয়পুরে পলায়ন করিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদে ভীত প্রতাপসিংহ মনে মনে প্রমাদ গণিলেও তাঁহাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হইলেন।

ইস্মাইল বেগের সকলই গেল। তাঁহার বাহিনী

সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল; তাঁহার যাবতীয় সমরসম্ভার, শিবিরস্থ যাবতীয় ধনরত্ন, রসদাদি সবই শত্রুর করায়ত্ত হইল। যুদ্ধের পর বহু মোগলসৈনিক বিজেতৃপক্ষের করে আত্মসমর্পণ করিল। দি বইন পরাজিত শত্রুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পরম সমাদরে তাহাদের নিজ সৈন্যদলে গ্রহণ করিলেন। তিনদিন পরে পাটন নগর অধিকৃত হইল।

ইহার কিছুকাল পরে দি বইন কলিকাতার একটি সংবাদপত্রে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি হামদানীর অশ্বারোহীসংখ্যা পঞ্চাশসহস্র ছিল বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার নিজের সিপাহী ছিল দশহাজার এবং যুদ্ধে তাঁহার সর্ব্বসমেত সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল ৬০১ জন, এবং বিপক্ষের ১০৭টী তোপ, ৫০টী হস্তী এবং ২০০ পতাকা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

যুদ্ধের সংবাদে রাঠোররাজ বিজয়সিংহ ভীত হইলেন। কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণার্থে তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারবর্গকে দরবারে আহ্বান করিলেন। শত্রুকে আর বাধাদানের চেষ্টা বৃথা; এ অবস্থায় আজমীর প্রত্যর্পণ এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কর পুনঃ প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়া মারাঠাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করাই যুক্তিসম্মত বলিয়া রাজা স্বয়ং মতপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু বীর রাঠোরগণ এ হীনতাস্বীকারে সম্মত হইলেন না, তাঁহারা আর একবার বলপরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিলেন। তাঁহাদের বীরোচিত বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া বিজয়সিংহও উৎসাহিত হইলেন এবং নিজ রাজ্যমধ্যস্থ তাবৎ অস্ত্রধারণসক্ষম পুরুষমাত্রকেই মেড়্তার উন্মুক্ত প্রান্তরে তদীয় সমুন্নত কেতনতলে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। *

বিজয়সিংহ শুধু নিজের প্রজাদের যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াই নিবৃত্ত হইলেন না, তিনি জয়পুরীদের সাহায্যলাভেও সচেষ্ট হইলেন। হামদানীকে আশ্রয় দিয়া প্রতাপসিংহ যে অপরাধ করিয়াছেন তজ্জন্য সিন্ধিয়া তাঁহাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবেন না সুতরাং এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে মারাঠা বিতাড়ন-কার্য্যে রাঠোরদের সহযোগিতা করাই কর্ত্তব্য, ইত্যাদি বুঝাইয়া বিজয়সিংহ তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিতে সচেষ্ট হইলেন। একথা জানিতে পারিয়া মহাদজী তাঁহার বিজয়ী সেনাপতিকে জয়পুর রাজ্যমধ্যে অভিযান করিতে আদেশ দিলেন। সাতসহস্র সৈন্যমাত্র সম্বলে দি বইন জয়পুরে প্রবেশ করিলেন। এ সংবাদে প্রতাপসিংহের সকল সাহস বিলুপ্ত হইল। তিনি আর সিন্ধিয়ার বৈরাচরণে সাহসী না হইয়া ইস্মাইলবেগকে তাঁহার রাজ্যসীমা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে আদেশ দিলেন।

অতঃপর দি বইন আজমীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ২২শে আগষ্ট ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে আজমীর নগর তাঁহার করায়ত্ত হইল। বিজয়সিংহ প্রেরিত দূত আসিয়া আজমীরে তাঁহার সাক্ষাৎ করিল। পাটনযুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া যোধপুরাধিপতি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে যদি তিনি মারাঠাপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া রাজপুতপক্ষ অবলম্বন করেন তবে তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপে আজমীর প্রদেশ দিবেন। দি বইন রাজদূতকে যথেষ্ট সৌজন্যসহকারে জানাইলেন যে তাঁহার প্রভু সিন্ধিয়া মহারাজ তাঁহাকে জয়পুর এবং যোধপুর দুটি রাজ্যই জায়গীর দিয়াছেন। এ অবস্থায় সামান্য আজমীর লইয়া সন্তুষ্ট থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে!

ইহার পর দি বইন তারাগড় দুর্গ অবরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। তারাগড় বিখ্যাত দুর্গ, আজমীর নগরের ঠিক পার্শ্বে অবস্থিত। তারাগড় অধিকারে না থাকিলে আজমীরের কোনই মূল্য নাই। পক্ষকাল পরে চরমুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে বিজয়সিংহ তারাগড়ের উদ্ধারসাধন-মানসে মেড়্তা হইতে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতেছেন। কিছু সৈন্য দুর্গাবরোধে ব্যাপৃত রাখিয়া সিন্ধিয়া তাঁহার বাহিনীর অধিকাংশ রাঠোরদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। লকবা দাদা, জীব দাদা, সদাশিব রাও প্রমুখ মারাঠা সেনানায়কবৃন্দ অশ্বারোহীসৈন্যদলসহ যাত্রা করিবার একদিন পরে দি বইন নিজ ব্রিগেড এবং আশীটি কামান লইয়া তাঁহাদের অনুগমন করিলেন।

* মেড়্তা আজমীরের ৩০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত সুরক্ষিত একটী নগর। আধুনিককালে রাজপুতনার রেলপথে "মেড়্তা রোড" অন্যতম প্রধান রেলষ্টেশন। মেড়্তা সহর রেললাইন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

মেরতানগরপ্রাকারের বহির্ভাগে উন্মুক্ত প্রান্তরে রাঠোর সেনা শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। ক্রমে মারাঠারা উক্ত স্থান হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী নিত্রিয়া নামক গ্রামে আসিয়া দেখা দিল। দি বইন তখনও আসিয়া পৌছেন নাই। লুর্ণি নদীর তটবর্ত্তী বিস্তীর্ণ বালুকারাশি-মধ্যে তাঁহার কামান সমূহের চক্র প্রোথিত হইয়া যাওয়ায় তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া আসিতে তাঁহার সেনাদলের বিলম্ব হইতেছিল। এই সময় মারাঠাদের আক্রমণ করিলে রাঠোরগণ নিশ্চয়ই বিজয়লাভ করিত; কারণ বীর অশ্বারোহী রাজপুত যোদ্ধায় ও মারাঠা বার্গীসেনায় কোন তুলনাই হইত না। বার্গীরা ছিল চরের কাজ করিতে, দেশলুণ্ঠন করিয়া শত্রুকে বিব্রত রাখাকাযে৷ সুদক্ষ; সম্মুখ সমরে তাহারা একেবারেই পটু ছিল না। কিন্তু এ সুযোগ তাহারা হেলায় হারাইল।

সিকতারাশি হইতে কামান উদ্ধার করিয়া বীরগমনে ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে দি বইন মেরতা সন্নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। রাঠোরদের সেনাসংস্থাপন পর্যাবেক্ষণ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে তাহারা যুদ্ধার্থ যে স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছে তাহা সত্যই দুর্ভেদ্য। পশ্চাতে প্রাচীরবেষ্টিত নগর এবং সম্মুখে ক্রমোচ্চ ভূখণ্ড, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সুরক্ষিত ভাবে শত্রুসেনা অবস্থিত। যুদ্ধে যথেষ্ট সাবধানতা প্রয়োজন, হঠকারিতায় পরাজিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। গোপালরাও তৎক্ষণাৎ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু দি বইন তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন; বলিলেন "এখন বেলা গিয়াছে, সৈনিকরাও পরিশ্রান্ত; তাহাদের আহার ও বিশ্রামের প্রয়োজন। কাল সকালে দেখা যাইবে।" সেদিন অনেক রাত্রি অবধি রাঠোরশিবিরে পানভোজন ও আমোদোল্লাস চলিয়াছিল।

অতি প্রত্যুষে, তখনও ভোরের আলো ভালো করিয়া ফুটে নাই,—গভীর রাত্রি অবধি প্রমোদরত রাঠোরগণ তখনও সুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন,—দি বইনের আদেশে তাঁহার সিপাহীগণ শত্রুকে আক্রমণে অগ্রসর হইল। ঘন ঘন অগ্নিবর্ষণের ফলে নিদ্রোত্থিত অতর্কিত রাজপুতগণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। চারিদিকে গোলযোগ,—বিশৃঙ্খলা,—শত্রুকে বাধা দিবার জন্ত কেহই দাঁড়াইতে চাহে না। গোলন্দাজদল তোপ লইয়া নগরপ্রাচীরাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে পশ্চাৎপদ হইল। আক্রমণকারীদলের বামপ্রান্ত কর্ণেল রোহান এবং দক্ষিণপ্রান্ত মেজর বাওয়ার্স নামক দুইজন ফরাসী সৈনিক পরিচালনা করিতেছিলেন। বিপক্ষদলমধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা দেখিয়া তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে দি বইনের আদেশ ব্যতিরেকেই রোহান নিজ তিন ব্যাটালিয়ন সিপাহীসহ দল ছাড়িয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন।

রাঠোর সর্দ্দারগণের শিবির কতকটা দূরে অবস্থিত ছিল। আহবার শিবসিংহ এবং আসোপের মহিদাস ইঁহারা দুইজনেই ছিলেন তন্মধ্যে প্রধান। কামানের বজ্রনাদও সমরকোলাহলে সুপ্তিভঙ্গ রাঠোর বীরগণ ক্ষিপ্রহস্তে বর্ম্মধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মহিদাস একটু অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিতেন। কাজেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইয়াছিল। আর সকলেই শিবির হইতে পলায়ন করিয়াছে, শুধু তাঁহারা দুইজনেই পড়িয়া আছেন, শিবসিংহের নিকট হইতে এ কথা শুনিয়া মহিদাস বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রদর্শন না করিয়া ধীরভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "ভাল; চল ভাই এবার অশ্বে আরোহন করা যাউক।" বাইশজন রাঠোরসর্দ্দার একত্রে শেষ বারের মতই অহিফেন সেবন করিলেন। পার্শ্বেই অশ্বসজ্জিত ছিল, সকলে এক এক উল্লম্ফনে নিজ নিজ বাহনপৃষ্ঠে আসীন হইলেন। সংখ্যায় প্রায় চারি হাজার রাঠোর বীর মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও মহোৎসাহে শত্রু আক্রমণে ছুটিল। শিবসিংহ সকলকে সম্বোধন করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা কোথায় পলায়ন করিব? রাঠোরদের কাছে ইজ্জৎ অপেক্ষা প্রবলতর বিষয় আর কিছু আছে কি? যাহার নিকট আত্মসম্মান অপেক্ষা স্ত্রীপুত্রের মূল্য অধিক সে যেন না আসে।" কেহই কোন কথা কহিল না। তখন সর্দ্দার সকলকে সম্মুখে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। সকলে ললাটদেশে যুগ্মকর স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জানাইল। তাহার পর রাঠোর-বীরগণ অগ্রসর হইল।

উঁহাদের অগ্রসর হইতে কর্ণেল রোহান পশ্চাৎপদ হইতে

আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেদের পংক্তিমধ্যে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্বেই রাঠোর সৈনিকগণ তাঁহার সিপাহীগণের উপর ভীমবেগে নিপতিত হইল। রোহাণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াই দি বইন বুঝিয়াছিলেন তাঁহার এই হঠকারিতার ফলে কি ভীষণ বিপদপাৎ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতিকারের উপায় অবলম্বনে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিপক্ষের অশ্বারোহীবৃন্দের প্রচণ্ড তাড়নে রোহাণের সিপাহীদল বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে বুঝিয়া তিনি তাহাদের রক্ষার্থ মারাঠাবার্গীদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইবার আদেশ দিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষিপ্রতার সহিত নিজ বাহিনী শূন্যগর্ভ চতুষ্কোণাকারে বিন্যস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দি বইন বুঝিয়াছিলেন মারাঠা অশ্বারোহীরাও রাঠোরদের প্রতিহত করিতে পারিবে না; রোহাণের পদাতিক সেনা ও বার্গী অশ্বারোহীদিগকে বিতাড়িত করিয়া রাঠোররা একসঙ্গে চারিদিক হইতে তাঁহার সেনাদলকে আক্রমণ করিবে। তিনি যাহা মনে করিয়াছিলেন ঠিক তাহাই ঘটিল। রোহাণ কোন মতে প্রাণে রক্ষা পাইয়া বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নিজেদের দলে ফিরিয়া আসিলেন। রাঠোরদের সম্মুখে বার্গীসেনা তিষ্টিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া অতঃপর রাজপুতগণ দি বইনের ব্রিগেডকে আক্রমণে ছুটিল। পূর্ব্বকৃত ব্যবস্থানুসারেই যেন রাঠোররা শত্রুসেনার সম্মুখে আসিয়া যুগপৎ দক্ষিণে ও বামে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল এবং অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়া গিয়া তাহাদের একেবারে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। কামানের গোলা, বন্দুকের গুলি সমস্তই বালকের ক্রীড়াকন্দুকের মত অগ্রাহ্য করিয়া, "পাটন মনে রাখিও" এই ভৈরব হুঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া রাঠোরবীরগণ প্রলয়ের প্লাবনের ন্যায় ভীমবেগে ব্রিগেডের উপর নিপতিত হইল। কিন্তু দি বইনের রণকৌশল এবং তাঁহার নিজ হাতে গঠিত সুশিক্ষিত সিপাহীসেনার সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্ত্তিতা ও অসমসাহসের জন্য সকল দিক রক্ষা পাইল। অবস্থানুসারে ক্ষিপ্রতার সহিত তিনি উহাদের শূন্যগর্ভ চতুষ্কোণ ব্যূহ রূপভাবে সজ্জিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন; মধ্যে মধ্যে কামানবর্ত্তী কামান সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাঠোররা মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টন করিয়া একসঙ্গে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলেও চতুষ্কোণাকারে অবস্থিত দি বইনের সৈন্যগণের পৃষ্ঠদেশ আক্রমণের অবকাশ কোন দিক হইতে পাইল না। বীর সেনাপতির সাহসে ও কৌশলে অনুপ্রাণিত সৈনিকগণ অটল দৃঢ়তার সহিত তাহাদের সকল আক্রমণ প্রতিহত করিল। তিন তিনবার রাঠোরগণ গোলন্দাজ পংক্তি ভেদ করিয়া গমন করিলেও প্রত্যেকবারই পদাতিকগণ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল।

এদিকে যে রাঠোরদল পলাতক বর্গীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহারা মহা উৎসাহে তাহাদের বহুদূর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া চলিল। কিন্তু ইহার ফলে তাহারা এমন একটী গুরুতর ভুল করিল যে তজ্জন্য তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। ছত্রভঙ্গ হইয়া মারাঠা অশ্বারোহীরা পলায়ন করিলে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন মানসে দীর্ঘপথ দ্রুত ধাবনের ফলে আরোহী ও বাহন উভয়েই সমধিক পরিশ্রান্ত হইয়া রাঠোররা আসিয়া দেখিল যে তাহাদের সহযোগীদল এদিকে পরাজিত হইয়াছে; শত্রুসেনা তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। যে পথে তাহাদের ফিরিতে হইবে তাহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ ভূখণ্ড বিপক্ষের অধিকৃত। রাঠোরদের আর রক্ষা নাই। সাক্ষাৎ যমপুরীর দ্বারসদৃশ সেই সঙ্কীর্ণ পথ তাহাদের অতিক্রম করিতে হইবে। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব, ফিরিলেও রক্ষা নাই। ইহাকে আর যুদ্ধ বলা চলে না। অতঃপর যাহা ঘটিল তাহা শুধুই হত্যাকাণ্ড। মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও রাজপুতবীরগণ সবেগে সেই রন্ধ্রপথেই অশ্ব পরিচালন করিলেন; এক প্রাণীও পশ্চাৎপদ হইল না। এ বীরত্ব জগতের ইতিহাসে সুদুর্লভ। বলা বাহুল্য তোপের-মুখে এক প্রাণীও রক্ষা পাইল না।

তখন দি বইনের আদেশে তাঁহার সিপাহীগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইল। বেলা নয় ঘটিকার সময় রাজপুতেরা পরাজিত হইয়াছিল বলা চলে। আরও এক ঘণ্টা পরে তাহাদের শিবির শত্রুর হস্তগত হইল। পরাজিত রাঠোরসেনা নগরপ্রাচীর মধ্যে পলায়ন করিল। অতঃপর দি বইন নগর অধিকারে সচেষ্ট হইলেন। বিকাল তিনটার সময় মেরতার পতন হইলে সমর কোলাহলের নিবৃত্তি হইল।

এই যুদ্ধে দি বইনের বাহিনীর বামপ্রান্তের অধিনায়ক মেজর বাওয়ার্স নিহত এবং লেফটেনাণ্ট রবার্টস নামক জনৈক ইংরাজ জাতীয় সৈনিক সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছিলেন।

মেরতা যুদ্ধে জয়লাভের ফলে দি বইনের যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। থাইবার গিরিসঙ্কটে সমাগত আমীর তৈমুর এসংবাদে প্রমাদ গণিলেন। হিন্দুস্থান আক্রমণে তাঁহার সকল উৎসাহ বিলুপ্ত হইল। পুণা দরবারে উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না। হোলকর ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর তিনিও ইউরোপীয় সেনাধ্যক্ষগণের দ্বারা পাশ্চাত্য যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত বাহিনী গঠনে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সেনাদলের কথা শ্বেভালিয়ে চার্লস দি ডুদ্রেনেক প্রসঙ্গে বলা যাইবে।

কর্ণেল টডের "রাজস্থান" গ্রন্থে রাজপুত-মারাঠাদের মধ্যে সংঘটিত এই সকল যুদ্ধের বিবরণ কতকটা অন্যভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। টড রাজপুতজাতির প্রতি ঘোর সহানুভূতি-সম্পন্ন ভক্তলেখক। মারাঠাদের প্রতি তিনি নিতান্ত বিদ্বেষ-সম্পন্ন ছিলেন এবং নিজগ্রন্থে স্থানে অস্থানে নানাভাবেই তিনি তাহাদের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে চারণ মুখে গীত কাহিনী অবলম্বনে প্রধানতঃ লিখিত "রাজস্থান" প্রকৃত ইতিহাস নহে। রাজপুতদের পক্ষ লইয়া লিখিত এই সকল যুদ্ধের বিবরণ দেখিতে হইলে "রাজস্থান" * দ্রষ্টব্য। টড টোঙ্গা বালালসাতের যুদ্ধ প্রাচীন রাজপুতবীরত্বের জলন্ত নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং যুদ্ধ জয়ের সব কৃতিত্বটাই তাঁহার প্রিয় রাজপুতজাতিকে সমর্পণ করিয়াছেন। মোগল সেনার বিশ্বাস-ঘাতকতা বা ইস্মাইল বেগের বীরত্বের কোন প্রসঙ্গ তাঁহার লেখার মধ্যে নাই। টডের মতে কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক ছড়া-ই পাটনযুদ্ধে রাজপুতদের পরাজয়ের কারণ। লালসাতের যুদ্ধে রাঠোরদের বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করিয়া উহাদের চারণেরা যে গান রচনা করিয়াছিল তাহাতে কচ্ছবাহগণের প্রতি অপমানজনক বাক্যের প্রয়োগ থাকায় প্রতিহিংসা পরায়ণ জয়পুরীগণ গোপনে মারাঠাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে নির্লিপ্ত ছিল। রাঠোরদের পরাজয়ের পর তাহারাও বিদ্রূপ করিয়া ছড়া বাঁধিয়া প্রতিশোধ লইয়াছিল। টডের অর্থাৎ রাজপুতদের মতে মেরতা যুদ্ধেও স্বজাতির বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই আবার রাঠোরদের পরাজিত হইতে হইয়াছিল। রাজপুতদিগের মধ্যে নিয়ম ছিল যে রাজা স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিতে অসমর্থ হইলে একজন মন্ত্রী তদীয় প্রতিনিধিরূপে সেনাদলসহ যাইতেন। সেনানায়কবর্গ সকলেই তাঁহার আদেশ পালনে বাধ্য থাকিতেন। মেরতা ক্ষেত্রে বিজয়সিংহ বা তাঁহার প্রধান মন্ত্রী খুবচাঁদ সিঙ্গি উভয়ের কেহই যাইতে না পারায় গঙ্গারাম ভাণ্ডারী ও ভীমরাজ সিঙ্গি নামক দুইজন অমাত্য সেনাদলে উপস্থিত ছিলেন। ভীমরাজের সহিত খুবচাঁদের শত্রুতা ছিল। মন্ত্রিবরের ভয় হইল, যদি ভীমরাজ রণস্থল হইতে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া আসেন, তবে তাঁহার সকল প্রভাব প্রতিপত্তি এককালে তিরোহিত হইয়া প্রতিদ্বন্দীকে আশ্রয় করিবে। এই ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত হইয়া তিনি ভীমরাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন যেন ইস্মাইলবেগ আসিয়া না পৌছান অবধি যুদ্ধারম্ভ করা না হয়। সেজন্য যখন দি বইনের কালানলবর্ষী তোপখানা আসিয়া উপস্থিত হয় নাই একথা জানিতে পারিয়া সর্দ্দারগণ শত্রুকে আক্রমণে সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন ভীমরাজ প্রধান মন্ত্রীর পত্র দেখাইয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করেন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর নাগোরে পলাতক ভীমরাজকে বিজয়সিংহ তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভীমরাজ বিষপানে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু সকল সর্ব্বনাশের মূল কারণ যিনি সেই প্রধান মন্ত্রীবরের কোনও শাস্তি হইয়াছিল কিনা সেকথা টড সাহেব উল্লেখ করেন নাই।

অতঃপর সমগ্র রাজস্থান বিজয়ী বীরের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। মেরতা যুদ্ধের পরদিন ইস্মাইলবেগ তাঁহার নব সংগৃহীত সৈন্যগণসহ বিজয়সিংহ সকাশে আগমন করেন এবং পুনর্ব্বার বল পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেও রাঠোররাজের কিন্তু আর সে সাহস হইল না। তিনি আজমীর প্রদেশ প্রত্যর্পণ এবং ৬০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিবার অঙ্গীকার করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। তারাগড়ের তখনও পতন হয় নাই। প্রভু কর্ত্তৃক শত্রুকরে দুর্গ সমর্পণে

* Vol I, pp 467-68, 470 ; 799-805 ; Vol II 146, 414, 466.

আদিষ্ট দুর্গেশ দুমরাজ আত্মহত্যা করিয়া এ অবমাননার জ্বালা হইতে রক্ষা পাইলেন। এই প্রসঙ্গে কবিবরের "পণরক্ষা" শীর্ষক কবিতাটির কথা বোধ হয় অনেকেরই মনে পড়িবে।

বিজয়সিংহের নগদ ৬০ লক্ষ টাকা দিবার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু তজ্জন্য তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না। মণিরত্ন, স্বর্ণরৌপ্যময় তৈজসপাত্র, অন্তঃপুরিকাগণের গাত্রালঙ্কারাদি সমর্পণ করিয়া এবং বক্রী অর্থের জন্য যথোচিত জামীন দিয়া তিনি পরিত্রাণ পাইলেন। অপরাপর রাজন্যবৃন্দের অবস্থাও তাঁহার অপেক্ষা কোন অংশে সুখের হয় নাই। অতঃপর রাজপুতদিগের নিকট হইতে মুক্তিপণ এবং রাজকর সংগ্রহের জন্য দি বইনকে ঐদেশে রাখিয়া সিন্ধিয়া দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। স্থির হইল রাজপুতানা হইতে সংগৃহীত অর্থে সিন্ধিয়া ও হোলকর উভয়েরই অধিকার থাকিবে। পাটন ও মেরতা যুদ্ধে অংশমাত্র গ্রহণ না করিলেও একার্য্যে হোলকরের সৈন্যদল সিন্ধিয়ার সেনাদলের সহযোগিতা করিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিল না। রাজকর আদায়ের জন্য দি বইনের সৈন্যদলকে কয়েকটী খণ্ড যুদ্ধে ও দুর্গাবরোধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কারণ তখনকার দিনে বাধ্য না হইলে কেহই রাজস্ব প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করিত না। তন্মধ্যে মেজর ফ্রেমণ্ড কর্ত্তৃক ৬ই আগষ্ট ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বলহারীর পার্ব্বত্য দুর্গাধিকারই সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধে কাপ্তেন শাম্বো (Chambaud) এবং লেফটেনাণ্ট বকলে (Buckley) নামক তাঁহার দুইজন সেনানী নিহত হয়। রাজপুতানায় অবস্থিতিকালে সেনাদলে রক্তাতিসার রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। দি বইনের বন্ধু ক্ল্যাদমার্টিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লেফটেনাণ্ট মার্টিন ঝাঝারে এবং ষ্টুয়ার্ট নামক একজন ইংরাজসৈনিক রোহটকে ঐ রোগে দেহত্যাগ করে। দি বইনও রোগাক্রান্ত হইয়া কোনমতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

হিন্দুস্থানে শান্তিপ্রতিষ্ঠিত হইলে মহাদজী গোপাল রাওকে সুবেদার পদে নিযুক্ত করিয়া পেশবাকে বাদসাহী সনন্দ প্রদান করিবার নিমিত্ত পুণা গমন করিলেন। পাটন যুদ্ধের পর সাহআলম তৃতীয় বারের মত পেশবাকে "বকীল-ই-মুৎলুক" পদ দিয়াছিলেন। তবে এক হিসাবে পূর্ব্ববর্ত্তী সনদদ্বয় হইতে এবারকার সনদে পার্থক্য ছিল। এবার উক্ত পদ পেশবাকে এবং তদীয় সহকারীর পদ সিন্ধিয়াকে বংশানুক্রমিক ভাবে অর্পিত হইল। তদ্ভিন্ন সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র গোহত্যা নিবারণের আদেশও প্রচারিত হইয়াছিল। সম্রাটের অবস্থা বাস্তবে যাহাই হউক না কেন তাঁহার নামের মহিমা তখনও হ্রাস হয় নাই; নামে তখনও প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষই তাঁহার সাম্রাজ্যান্তর্গত ছিল। এত বড় সম্মান, ঔরঙ্গজেবের বংশধরের উপর এত বড় প্রভাব, মহারাষ্ট্র রাজধানীতে সাড়ম্বরে না জানাইলে চলে কি? মহাদজী পেশবাকে জানাইলেন যে তাঁহার শ্রীহস্তে বাদশাহ প্রদত্ত নূতন সম্মানের সনদ প্রদান করিবার জন্যই তাঁহার আগমন, তদ্ভিন্ন তাঁহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। সন্দেহ অপনয়নের জন্য তিনি সঙ্গে অধিক সৈন্যসামন্ত লইলেন না। শুধু কর্ণেল মাইকেল ফিলোজ নামক একজন ইটালী দেশাগত সৈনিক-পুরুষ পরিচালিত এক ব্যাটালিয়ন সিপাহী এবং কর্ণেল জন হেসিঙ্গের অধীনে তাঁহার "খাসরিশালা" বা দেহরক্ষী সেনাদল তাঁহার সঙ্গে চলিল।

মহাদজী কোন গুপ্ত অভিসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া পুনায় যাইতেছেন না, সে কথা বারবার বলিলেও বাস্তবিক কিন্তু তাহা সত্য নহে। পুণাদরবারে নানাফড়নাবিশের ক্ষমতা বিলোপ করিয়া আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বলাবাহুল্য সুধু নানা কেন, সে কথা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। সুতরাং তাঁহার আগমন সংবাদে সকলেই চিন্তিত হইল। ফড়ণাবিশের উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না। মহাদজী নিজেও যেন স্বরাজ্য হইতে অতদূরে যাওয়া কতদূর যুক্তিযুক্ত হইবে তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি নিতান্তই ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যাত্রারম্ভ করিয়া ১১ই জুন তারিখে তিনি পুণা নগরোপকণ্ঠে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

সিন্ধিয়া আনীত উপাধি এবং সম্মানরাজি যাহাতে পেশবা গ্রহণ না করেন তজ্জন্য ফড়ণাবিশ সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু চতুর মহাদজী পেশবাকে উহা গ্রহণ করাইবার জন্য তাঁহার নামসর্ব্বস্ব প্রভু ছত্রপতি

শিবাজীর বংশধর সাতারার রাজার নিকট হইতে অনুমতিপত্র আনাইয়া ফেলিলেন। সুতরাং পেশবার সম্মত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। সিন্ধিয়ার আগমনের নয়দিন পরে নানা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। মহাদজী তাঁহাকে পরম সমাদর প্রদর্শন করিলেন, এমন কি তাঁহার সম্মুখে নিজে আসন পরিগ্রহ না করিয়া বরাবরই দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরদিবস তিনি পেশবাকে সম্মান দেখাইতে গেলেন এবং হিন্দুস্থান হইতে সমানীত বহুমূল্য দ্রব্যরাজি তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেন।

তাহার পরদিন অর্থাৎ ২২শে জুন প্রাতঃকালে মহাসমারোহে পেশবার অভিষেকক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। মহাদজী অনুষ্ঠানের কিছুই ত্রুটি রাখিলেন না। এরূপ ধূমধাম পুণানগরে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। পেশবা বাদসাহী-উজীর পদ মহাড়ম্বরে গ্রহণ করিলেন। জরির কাজ করা শিবির মধ্যে স্থাপিত অনুপস্থিত বাদসাহের প্রতীক স্বর্ণসিংহাসনোপরি তৎপ্রদত্ত খিলাৎ ও ফরমাণ রক্ষিত ছিল। পেশবা সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাদসাহের উদ্দেশ্যে তিনবার কুর্নিশ করিলেন এবং একশত একটী স্বর্ণমুদ্রা নজর দিয়া বামপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সিন্ধিয়ার ফারসী ভাষাভিজ্ঞ মুন্সী বাদসাহপ্রদত্ত ফরমাণ জলদগম্ভীরস্বরে পাঠ করিলেন। পরওয়ানা মধ্যে যেখানে গোবধ নিষেধের আদেশ ছিল যখন সেই অংশ পঠিত হইল তখন সমবেত জনমণ্ডলীর আর আনন্দোল্লাসের অবধি রহিল না। অনন্তর পেশবা বাদসাহপ্রদত্ত মূল্যবান খিলাৎ পরিগ্রহণ করিলেন,—যথা নয়প্রস্থ পরিচ্ছদ, পাঁচপ্রস্থ মণিময় আভরণ, অসি, চর্ম্ম, লেখনী, মস্যাধার, সিলমোহর, শিখিপুচ্ছের দুইটি চামর, নালকী, পালকী, অশ্ব, গজ, ধ্বজপতাকা এবং আসাসোঁটা প্রভৃতি প্রভুত্বনির্দর্শক দ্রব্যাদি। পার্শ্ববর্ত্তী এক শিবির মধ্যে গমন করিয়া বাদসাহ প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া পেশবা দরবারে পুনরাগমন করিলেন। তখন সভাসদবর্গ নিজ নিজ পদমর্য্যাদানুসারে একে একে আনুগত্যস্বীকার করিয়া তাঁহাকে নজরাণা প্রদান করিলেন। সভাভঙ্গের পর পেশবা বাদসাহদত্ত নালকী আরোহণে মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চারিদিকে কি আনন্দ, কি উল্লাস! মনুষ্যের চীৎকার, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহতি, বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি, কামানের সুগম্ভীর নির্ঘোষ—সবে মিলিয়া আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল! তখন কি কেহ স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে মাত্র দশবৎসর পরে মারাঠাদের সকল প্রতাপ চূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহারা ইংরাজের পদানত হইয়া পড়িবে এবং পঞ্চবিংশতি বর্ষমাত্র পরে ঐ পেশবার রাজ্য অতীতের কথায় পরিণত হইবে?

পেশবার প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সিন্ধিয়া তাহার সহকারীপদে বৃত হইলেন। এই সময়ে মহাদজী পেশবার প্রতি তাঁহার বংশগত আনুগত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে যতই সম্মান দেখাইতে চায় ততই তিনি তাঁহার পেশবার ভৃত্যত্বের পরিচয় দিতে সচেষ্ট হইলেন। সকলের মধ্যে নিকৃষ্টতম আসনে উপবেশন, পেশবার শিবিকার সহিত চামর ধরিয়া পদব্রজে গমন, উপবিষ্ট পেশবার পার্শ্বে পাদুকাকরে দণ্ডায়মান থাকা ইত্যাদি দ্বারা তিনি প্রকাশ করিলেন যে অত উন্নতির মধ্যেও তিনি ভুলিয়া যান নাই যে আসলে তিনি পেশবার একজন সামান্য ভৃত্যমাত্র। মহাদজীর এত বিনয় নম্রতা এবং কৃতজ্ঞতা সবই কি বাহ্যিক ছলনা, স্বীয় গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য ধৃত ছদ্মাবরণ? ইউরোপীয় লেখকবর্গ সেকথা বলিলেও আমরা ভারতবাসীরা কিরূপে তাহা মনে করি? ভারতবাসীর প্রভুভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা যে কত আন্তরিক এবং গভীর তাহা সকলকার পক্ষে দুর্ব্বোধ্য।

মহাদজী আর হিন্দুস্থানে ফিরিয়া যান নাই। পুণাতেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। মারাঠাচক্রের অধিনায়ক পেশবার প্রধান পরামর্শদাতারূপে মারাঠা রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রিত করাই ছিল তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ। এ কার্য্যে পেশবার প্রধানমন্ত্রী নানা ফড়নাবীশ তাঁহার বিরোধী হইলেন। মহাদজীর অবশিষ্ট জীবনের ইতিহাস পুণাদরবারে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লইয়া এই দুই মারাঠা দিকপালের বিবাদের ইতিহাস। সে বিস্ময়কর দ্বন্দ্বের পূর্ণবিবরণ আমরা পাই শ্রীগোবিন্দ সখারাম সর্দেশাই রচিত "মরাঠী রিয়াসৎ" গ্রন্থে ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে। যতদিন জগতে ইতিহাসের আলোচনা

থাকিবে ততদিন এই বিশাল প্রামাণিক গ্রন্থরচনার জন্য সর্দ্দেশাইয়ের নাম অমর হইয়া থাকিবে। মারাঠা জাতির উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষার্দ্ধ হইতে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সময়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠেচ্ছুর পক্ষে এ গ্রন্থ অপরিহার্য্য। সর্দ্দেশাই কৃত নানা ও মহাদজীর চরিত্রচিত্রণ এক নূতন সৃষ্টি। ইংরাজলেখকগণের রচনা পড়িয়া যাঁহারা এই দুইজনকে ধারণা করিয়াছেন, সর্দ্দেশাই সংগৃহীত নূতনতর তথ্যের সমাবেশে এবং পুরাতন তথ্যে নূতন আলোক সম্পাতের ফলে তাঁহাদের ভ্রম টুটিবে। নানার তুলনায় মহাদজী যে কত বিচক্ষণ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক ছিলেন তাহা উভয়ের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া সর্দ্দেশাই সুন্দররূপে প্রকট করিয়াছেন। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য উঁহারা দুইজনে দেশের মঙ্গলকল্পে একযোগে কার্য্য করিতে পারেন নাই। নতুবা হয়ত দেশের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত। মহাদজীর আকাঙ্ক্ষা ছিল যে ইংরাজেদের বিরুদ্ধে সকল দেশীয় রাজন্যবৃন্দকে এক পরাক্রান্ত চক্রে সমবেত করেন। একার্য্য সুধু তাঁহার দ্বারাই হয়ত সাধিত হইতে পারিত যদি তিনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিতেন। কিন্তু পুণায় আসিবার অনতিবিলম্বেই নগরোপকণ্ঠবর্ত্তী বনৌলী নামক স্থানে ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হইল। দেশের সেদিন প্রকৃতই দুর্দ্দিন।

মহাদজীর সৌভাগ্যদর্শনে তদীয় অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী তুকোজীরাও হোলকর ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নানা এবং সিন্ধিয়ার বিরোধে তিনি পরম উল্লসিত হইলেন এবং মহাদজীর আর্য্যাবর্ত্ত হইতে অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে তথায় আবার একটি বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিলেন। এই সময়ে কনৌন্দ দুর্গে নজফ কুলি খাঁর মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার বিধবা পত্নী, গোলামকাদেরের ভগিনীকে বাদসাহের নামে দুর্গ সমর্পণ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। তুকোজীরাও জানিতেন যে ইস্মাইল বেগ আপাততঃ সিন্ধিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিলেও প্রথম সুযোগেই ইসলামের জয়পতাকা উত্তোলনের প্রচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। তিনি এজন্য তাঁহাকে বন্ধুর বিধবা পত্নীকে সাহায্য করিবার জন্য কনৌন্দ গমন করিতে বলিলেন। সিন্ধিয়ার বিরোধিতাচরণ করিতে ইস্মাইলবেগ কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না; হিন্দু আধিপত্যে অসন্তুষ্ট মোগল যোদ্ধৃবৃন্দ তাঁহার আদেশ পালনে সদাই তৎপর ছিল। বিশহাজার সৈন্য এবং কুড়িটা কামান লইয়া হামদানী কনৌন্দ অভিমুখে ছুটিলেন। নজফ কুলি খাঁ মৃত্যুকালে স্ত্রীকে বলিয়া যান যে যদি দি বইন দুর্গ আক্রমণে আসেন, তবে যেন তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে দুর্গরক্ষার চেষ্টা না করিয়া আত্মসমর্পণ করেন। অপর কোন সেনাপতি আসিলে বেগম তাঁহাকে সাধ্যমত যেন বাধা দেন। ইহা হইতেই তখনকার দিনে দি বইনের নাম কি প্রকার ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল তাহা কতকটা বুঝা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবিতা

(নাটিকা)

শ্রীসুবোধ বসু

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

[সবিতার পড়ার ঘর। এক কোণায় একটা টেবিলের উপর কটা বই ছড়ানো। টেবিলে একটা নীল-ডোমের বিজ্‌লী আলো। পাশে একটা হাল্কা-গোছের চেয়ার। টেবিলের পিছনে একটা জানলা খোলা। সেটা দিয়া একটা ঝুমকা-লতা চোখে পড়ে। টেবিলের উল্টা দিকে একটু সরিয়া একটা সোফা। তার পিছনেই পিতলের বাসনে একটা পাম্। সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিতেছে।

সবিতা টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া খোলা ও ছড়ান বইগুলিকে গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে কি একটা গানের কলি গুঞ্জরণ করিতেছে। সমুখ হইতে শুধু তার বেণীটা চোখে পড়ে, আর তনুদেহ। জান্‌লাটা দিয়া সে একবার বাহিরে তাকাইল। তারপর হাত বাড়াইয়া একটা ঝুমকা-ফুল ছিঁড়িয়া খোঁপাতে গুঁজিতে যাইতেছিল।

ঠিক এই সময় উল্টা দিকের দরজা খুলিয়া একটা অসংযত ছন্দের মত, অভাবনীয় ভাবে অরিজিৎ প্রবেশ করিল। চুল রুক্ষ, চোখ দুটী দীর্ঘ কিন্তু অস্বচ্ছ। লম্বা ধরনের মুখটা, আভিজাত্যের ছাপ তাহাতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেন রক্ত-হীন, যেন নিজের দোষে তাহার মহিমা হারাইয়াছে। ভুরুগুলো এক কালে হয়ত টানা ছিল কিন্তু এখন একটু কুঞ্চিত। বয়স সাতাশ আটাশ।

চোখ উঠাইয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়াই সবিতা শিহরিয়া উঠিল। তার দুই চোখে একটা আশঙ্কা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

সবিতা। [আশঙ্কিত কণ্ঠে] তুমি? তুমি অরুদা?

অরিজিৎ। হ্যাঁ আমিই। চিন্তে কষ্ট হওয়া তো উচিত নয়। অনেক দিনের পরিচয়, অত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে চল্‌বে কেন রাণী?

সবিতা। কি চাও তুমি এখানে? কেন আবার তুমি এখানে এসোচো।

অরিজিৎ। তোমাকেই দেখ্‌তে এলুম। লোক পরম্পরায় শুন্‌তে পাওয়া গেল তুমি স্বয়ম্বরা হয়ে বর ঠিক করেচো, বাড়িতে একটা বিবাহ ব্যাপারও আসন্ন। এমন সময় তোমায় দেখ্‌তে না এসে থাকি কি ক'রে? জানতো, জ্ঞাতি- পড়্‌সী, না এলে পাপ হয়।

সবিতা। [একটু ক্ষণ অরিজিতের ব্যঙ্গোশ্লেষোচ্ছ্বসিত মুখের পানে চাহিয়া কঠিন হইয়া] বাড়ির ভিতর না ঢুকে বাইরের বস্‌বার ঘরে অপেক্ষা করলেও শুভাধ্যায়ীর কাজের কোনো ব্যাঘাত হ'তো বলে মনে হয় না।

অরিজিৎ। অর্থাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলচো, তাই না। সেটা আজ নতুন কোনো একটা কথা নয় যে রাগ করবো, কিম্বা অভিমান ক'রে বেরিয়ে যাবো। তোমার অভিভাবকেরা দেখলেও যে বিশেষ আপ্যায়িত করবে না তাও জানি,—সে রকম আপ্যায়ন তো কম পাইনি যে এরই মধ্যে ভুলে যাব। খোঁজ করলে পিঠে তার দাগ এখনো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি ঠিক এই ঘরটীতেই এই মানুষটীর কাছে ঠিক সময়েতে আস্‌ব ঠিক ক'রেই এসেচি,—কোন মতেই নড়্‌ব না। অতএব তোমার বেরিয়ে যেতে বলায়ও কোনো লাভ হবে না যতক্ষণে না আমার কাজ শেষ হয়। তোমার কাছে আমার দরকার আছে।

সবিতা। [ভীত হইয়া] বেশ ঐ ঘরে সবাই বসে,

সেইখানেই তোমার কি দরকার বল্‌বে এসো [চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল]

অরিজিৎ। [দরজার সুমুখে আসিয়া পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া] রাণু, খুকীতো আর নও, সব দরকারের কথা যে সবার সম্মুখে বলা যায় না তাও কি আবার শিখিয়ে দিতে হবে নাকি ?

সবিতা। [সশঙ্ক ভাবে] পথ ছাড় অরু দা, নইলে আমি চীৎকার করব বলে দিলুম।

অরিজিৎ। চীৎকার করবে ? জানতো বস্‌বার ঘরে যারা বসে তাদের মধ্যে কে আছে ? তোমার নিজের পছন্দ করা ভাবী স্বামীটি গো ! হাঁক ডাক করলে সে এসে যদি দেখে এই অন্ধকার-প্রায় ঘরে তোমার গায়ে ঘেসে দাঁড়িয়ে আছি তবে আমার পিঠে যাই পড়ুক না কেন তোমার পছন্দটাও বিয়ে অবধি সফল হবে না। [সবিতা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লুব্ধ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া অরিজিৎ একটা সিগার জ্বালাইল] তার চেয়ে বরঞ্চ একটু শান্ত হয়ে অপেক্ষা করো, আমার কথাগুলি চটপট সেরে ফেলি। তোমারও সময় বেশী ক্ষতি হবে না [সিগারেটে টান দিয়া ধুঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে] আমারও পিঠটা অক্ষত থাক্‌বে।

[সবিতা নিরুপায় ভাবে সোফাটাতে বসিয়া পড়িল। অরিজিৎ সরিয়া আলো জ্বালাইয়া আসিয়া তাহার সমুখে দাঁড়াইল।]

অরিজিৎ। দেখ, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। কথাটা বড় সহজ। কিন্তু সেই জন্যেই ঠিক কি ক'রে যে বলব তা ভেবেও উঠ্‌তে পারচি না। আচ্ছা ধর আমি যদি বলি রাণু, তোমাকে আমি ভালোবাসি তবে তুমি কি তার জবাব দাও।

সবিতা। [রাগিয়া] অরুদা, তুমি জানো আমার বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে। তবে এসব কথা তুমি আমায় কোন্ অধিকারে শোনাচ্ছ ?

অরিজিৎ। অধিকার না থাক্‌লে গড়ে' নিতে হয়। জান তো সেইটেই বীরের রীতি,—সেটাকেই আমি চিরকাল মেনে থাকি।

সবিতা। সেই বীরের রীতি অনুসরণ করেই বুঝি একজন ভদ্রমহিলার ঘরে চোরের মত ঢুকে প্রণয় জানাচ্ছ। তুমি যে এতটা মন্দ হয়ে গেছ আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

অরিজিৎ। [হাসিয়া] মন্দ আমি যে এর চেয়ে ঢের বেশী হয়েছি তা স্বপ্নে তুমি না দেখে থাক তার সম্বন্ধে তর্ক করতে পারবনা কিন্তু অনেক খবর বাস্তব পেয়েছো তা জানি। আর চোরের রীতি অনুসরণ করতে হয় তোমারই জন্য। নইলে প্রকাশ্যভাবে প্রেম নিবেদন করতে আমার আপত্তি কিছুই নেই।

সবিতা। আমাকে প্রেম জানান তোমার ধৃষ্টতা।

অরিজিৎ। [মৃদু হাসিয়া] তা আমি মানিনে [দৃঢ়স্বরে] ধৃষ্টতা কেন ? যদি জগতে কারো তোমাকে প্রেম জানাবার অধিকার থাকে সে শুধু আমার। আর কারুর নয়। তোমার মা যখন বেঁচে ছিলেন আমার কৈশোরেই তার মেয়ের জন্য আমাকে পাত্র ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। [হাসিয়া] মাতৃভক্তি যদি তোমার কিছুটা থাকত তবে আর বিকাশ-বাবুকে পছন্দ করে বসতে না। অতএব অধিকারের কথাটা আর তুলোনা।

সবিতা। [নির্মম ভাবে] ওঃ মায়ের কথা তুলে তুমি আমার মন গলাতে চাও। কিন্তু মা যে কিশোরের সঙ্গে আমার বিয়ের কল্পনা করেছিলেন বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পার, তোমার ভেতর তাকে শত খুঁজ্‌লেও আজ সামান্য একটু টুকরো পাওয়া যাবে। তুমি কতটা মন্দ হয়ে গেছ,—তুমি অধঃপাতের পথে কতটা যে এগিয়ে গেছো তার খবর কি আর আমি রাখিনা মনে কর।

অরিজিৎ। [নির্বিকার ভাবে] মোটেই তা মনে করিনা,—সে কথাটাই তো তোমাকে একটু আগে বলছিলাম যে আমার ভয়ানক মন্দ হবার খবর স্বপ্নে না হ'ক বাস্তবে তুমি পেয়েছ। আর সে খবরের পরিমাণও যে কম নয় তাও জানি, তার রূপ যে নানাভাবে বিকাশ পেয়েছে তাও আমার অজ্ঞাত নয়।

সবিতা। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে তোমার সম্বন্ধে যে সব কথা শুনেচি সে সব পল্লবিত আর বাড়িয়ে-তোলা কিন্তু আমি—

অরিজিৎ। [বাধা দিয়া] না তা আমি বলিনে।

কিন্তু এই কথাটাই আমি বলি, [থামিয়া] যে তোমাকে আমার একান্তই চাই সবিতা, তোমাকে না হ'লে চলবে না। কোথাকার একটা অজানা লোক এসে যে আমার চিরদিনের সাথীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাবে,—সে আমি সহ্য করতে পারি না। রাণু, হুকুম কর তোমার অনুরঞ্জনের ভার আজ থেকে আমার উপর হো'ক।

সবিতা। চুপ কর বলছি। একটা অসংযত মাতালের মাতলামি শুনতে আমার কোনো ইচ্ছে নেই। অরুদা, তোমাকে একশো বার বলেছি আর আজও ফের বলছি একটা চরিত্রহীন মাতালকে স্বামী করবার কল্পনা জীবনে কোনো-দিনও করতে পারব না। তোমাকে আমি ঘৃণা করি। তোমার চেয়ে অযোগ্য কাকে ভাবতেও পারিনা। [সবিতা দাঁড়াইয়া উঠিল]

অরিজিৎ। [মুখটা বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেছে। বুকটা একবার সে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু তারপর সে সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। জোর গলায় কহিল] হ'তে পারে, কিন্তু তোমাকে আমার চাই-ই। তুমি আমায় ঘৃণা করতে পার, তোমায় আমি ভালোবাসি, তোমাকে আমার পেতেই হবে। [একটু থামিয়া মরীয়ার মত] মানুষকে যদি তার জন্য খুন করতে হয় ভয় পাবো না [সবিতা শিহরিয়া উঠিল] জমিদারীর শেষ কপর্দক যদি ব্যয় করতে হয় তাতেও কুণ্ঠা হবে না। যদি আমার জীবন দিতে হয়,—হ্যাঁ জীবনও দেব। ভিক্ষা ক'রে না পেয়েছি জোর করে নেবো।

[অরিজিৎ প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। দরজার পাশে গিয়া কি ভাবিয়া সবিতার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এক মিনিট নিস্তব্ধতা। তারপর সে মাথা নীচু করিয়া ফিরিয়া আসিল]

অরিজিৎ। রাণু, রেগে গেলে তোমাকে কী চমৎকারই দেখায়, চলে যেতে আমার ইচ্ছাই হচ্চে না। দয়া করো না? প্রসাদ দাও একটু [অকস্মাৎ সবিতার হাতটা নিজের হাতে টানিয়া লইল। বিদ্যুতের বেগে উঠিয়া সবিতা হাত ছাড়াইয়া ঝড়ের মত ঘরের বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় দ্রুত আসিয়া বিকাশ ঘরে ঢুকিল। উত্তেজনায় সবিতার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। অস্ফুটে "বিকাশবাবু", "বিকাশবাবু" বলিয়া সে ধপাস্ করিয়া চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িল]

বিকাশ। আপনি শান্ত হোন্ সবিতাদেবী, জানোয়ারটাকে তার উচিত শাস্তি দিচ্চি। [আগাইয়া গিয়া যেখানে অরিজিৎ স্তব্ধ মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়াছিল সেখানে দাঁড়াইল কি হে চিন্তে পারচ, আমার বড় শুভাধ্যায়ী হ'য়ে এ বিয়ে থেকে নিবৃত্ত হ'তে সেদিন অযাচিতভাবে উপদেশ দিয়ে এসেছিলে।

অরিজিৎ। [মাথা নীচু করিয়া স্তব্ধ রহিল]

বিকাশ। তখন তার মানে বুঝতে পারিনি। কিন্তু মেয়ের অন্য প্রেমিক আছে যখন বারবার ক'রে বলছিলে তখন কেমন সন্দেহ হয়েছিল। ব্যাপারটা এসে আজ মনোহরবাবুকে খুলে বলি। তার কাছ থেকে তোমার পরিচয় পেয়েছি।

অরিজিৎ। [ব্যঙ্গের সুরে] তারপর আমাকে নিয়ে কি করতে চান্ সেটাই আজ্ঞা করুন।

বিকাশ। কি করতে চাই? উল্লুক, প্রশ্ন করতে লজ্জা হ'লো না? চেনোনা আমাকে তুমি, একজন ভদ্রমহিলার অপমানের যা চিরদিনকার পুরস্কার [হাতের বেতটা জোরে ধরিয়া] দিয়ে এসেছি, তাই তোমাকে অজস্রভাবে দিতে চাই।

অরিজিৎ। তার জন্য আক্ষেপ নেই, একাধিকবার সে সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু ওস্মান যখন নিজের ইচ্ছেয় চলেই যাচ্ছে তখন জগৎ সিংহের বিক্রমটা কি না দেখালেই হয় না? [চলিয়া যাইবার জন্য ধীরে ধীরে দরজার সম্মুখে অগ্রসর হইল। বিকাশ আগাইয়া গিয়া বেত উঠাইতেই অরিজিৎ মরীয়ার মত ঘুষি উঠাইল]

সবিতা। [চেচাইয়া উঠিয়া] বিকাশবাবু নিন্ নিন্ আমার অপমানের শোধ। চিরদিনের জন্য বর্বরটাকে শিক্ষা দিয়ে দিন্।

[অরিজিৎ উদ্যত ঘুষিটা নামাইয়া বেদনাতুর মুখে সবিতার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর অকস্মাৎ]

অরিজিৎ। বেশ মারুন্ মারুন্, অপমানের শোধ নিন আমার দেহ রক্তাক্ত না হ'লে সবিতার অপমানের পরিশোধ হবেনা। [বিকাশের বেতটা সপাঙ্ করিয়া তাহার উপর

পড়িতেই] আরো আরো, আবার আবার, আমার দেহের রক্ত ছুটে বেরিয়ে সবিতার অপমানের কালিমা ধুয়ে দিক, তাতে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে, আর হবে সবিতার তৃপ্তি। হবেনা ?

[সবিতা নির্ব্বাক মুখে অরিজিতের ব্যথা-বিকৃত মুখের দিকে ও নিশ্চেষ্ট ঔদাসীন্যের দিকে চাহিয়াছিল। সহসা তাহার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল]

সবিতা। বিকাশবাবু, বিকাশবাবু, আর না, আর না। যথেষ্ট হয়েছে, এবার এখান থেকে ওকে তাড়িয়ে দিন্।

বিকাশ। [অরিজিৎকে ঠেলিয়া] দূর হয়ে যা বর্ব্বর।

অরিজিৎ। [ধীরে ধীরে দরজা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গেল। তারপর একটু ভাবিয়া এদিকে ফিরিয়া চাহিল]

সবিতা, যা অন্যায় করেছি তা কেন করেছি তোমার তা একেবারে অজানা নয়। কিন্তু জগৎটাই এমন, লোকের মন বুঝ্তে পেরেও তার শুধু কাজ দেখেই শাস্তি বিধান করে। কোন্ অভাগা সব খোয়াবার দ্বারে এসে মরীয়া হয়ে কি কাণ্ডজ্ঞানহীন কায ক'রে ফেলেছিল সে হিসেব কারই বা নেবার প্রয়োজন। [একটু থামিয়া] প্রহার ক'রে অপমানের শোধ তুলেচ। আমি নিজেও তোমার কাছে মাথা নত ক'রে ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি। এই শেষ।

[প্রস্থান।]

[একটা সুদীর্ঘ মিনিট নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। ও-দ্বার দিয়ে তখন সবিতার মামা মনোহরবাবু প্রবেশ করিল। প্রৌঢ়, মোটা শরীর। ময়লা রঙ্। গোঁফ দাড়ি কামানো। দেখিলেই ধূর্ত্ত লোক বলিয়া মনে হয়।]

মনোহর। এ-ঘরে ভারি গণ্ডগোল শুনতে পারছিলাম মাযে সবি। কে এসেছিল আর ? [সবিতা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল]

বিকাশ। সেই যে ছোড়ার কথা বলেছিলুম আপনাকে,—সেই আপনাদের অরিজিৎ না কি,—তিনিই আগমন ক'রেছিলেন।

মনোহর। [প্রায় চীৎকার করিয়া] অরিজিৎ এসেছিল এই বাড়িতে। কার কাছে এসেছিল ?

বিকাশ। সবিতাদেবীরই কাছে।

মনোহর। [প্রায় বদ্ধ নিঃশ্বাসে] এঁ্যা সবিতার কাছে ? আবার। তারপর, তারপর তুমি কি করলে ?

বিকাশ। বিশেষ কিছু নয় [বেতটা তুলিয়া লইয়া] এটা দিয়ে পিঠটা একটু নেড়ে চেড়ে দিয়েছি। কিছুদিন আর দরকার হ'বে না। কি বলেন সবিতাদেবী ? [সবিতা কোনোও জবাব দিল না।]

মনোহর। ঠিক করেচো। উপযুক্ত কাজ করেচো। কম জ্বালাতন করেছে এই হতচ্ছাড়া আমাদের। নিজে চরিত্রহীন মাতাল, বাপের পয়সা দু'হা'তে উড়াচ্ছে। তিন তিন বার বি-এ ফেল করে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে এখন জাহান্নামের পথে চল্‌ছে,—ওর সাধ কিনা সবিতাকে বিয়ে করে [সবিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল]। রায়মশায় যেমন ভালো-মানুষ, তাতেই রাজী হন আর কি। না, ছোটবেলার থেকে দুজনে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছে ! বলি, তার জন্য একটা লম্পটের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে নাকি ? আমি না থাক্‌লে মেয়েটা জলে পড়্তো নির্ঘাত।

বিকাশ। [গর্ব্বিতভাবে] বি-এ ও পাশ করতে পারেনি বুঝি। তাইত বলি, মেয়েদের অতটুকু সম্মান দেখাতেও শিখ্লো না কেন। কাল্‌চার কতটা পেয়েছি বলতে পারি না, কিন্তু যা পেয়েছি লেখা-পড়া শেখার দরুণই পেয়েছি।

মনোহর। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমাদের অফিসে আমার জামাইটার যে চাকরী ক'রে দেবে বলেছিলে তার কি হ'লো।

বিকাশ। লিখে দিন না তাকে আসতে। চাকরী না থাকে তার জন্যে নতুন চাকরী বানাবো।

মনোহর। আর মনে থাকে যেন, ঘটক বিদায়ের জন্য কাশীর তোমার ঐ ছোট্ট বাড়িটা আমায় বাস করতে দিতে হবে। সংসারের আবর্জ্জে মন আর ভালো লাগে না, বিশ্বেশ্বরের পদাশ্রয়ে গিয়ে জীবনের বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে দিতে চাই। তোমার তো অর্থের আর অভাব নাই, তার উপর রাজকন্যার সাথে অর্দ্ধেক রাজত্বও আসছে। মনে থাকবে তো ? অনুদারতার জন্য অরিজিৎটাকে আমি দেখতে পারতুম না। ছোট বয়সে মন কেন অমন হবে ?

[দরজাটা খুলিয়া গেল। ধীরে ধীরে সৌম্য শান্ত এক

বৃদ্ধ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বয়স ষাটেকের কাছাকাছি। গৌরবর্ণ দেহ, চুলগুলি সব পাকিয়া গেছে। বড় বড় দুটী চোখ, তাহাতে সবিতার চোখের আদল আসে]

নীরোদ। [প্রশান্ত হাসিয়া] এই যে বাবা বিকাশ এসেচো। কতক্ষণ ধরে এয়েচ আমিতো জানি না কিছু। [নীরদবাবু ঘরে ঢুকিতেই তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল] বসো বসো।

মনোহর। শুনুন রায়মহাশয়, এই একটু আগে আপনার ছোটবেলাকার বন্ধুর সেই অসচ্চরিত্র ছেলেটা এসে সবিতার কাছে এই পড়ার ঘরে ঢুকেছিল।

নীরোদ। [একটু অবাক হইয়া] কে অরিজিৎ? আবার এসেছিল সে। তারপর কখন গেল।

মনোহর। স্বেচ্ছায় যাবার মত ছেলেই সে। মদ খেয়ে এসে মাতলামি সুরু ক'রে দিয়েছিল, তারপর বিকাশ এসে রীতিমত কিছু [বেতটা তুলিয়া] পুরস্কার দেওয়ার পরে তার চৈতন্য ফিরে আসে। তখন লেজ গুটিয়ে সুড় সুড় করে বেরিয়ে গেলো।

নীরোদ। [প্রায় স্বগত] কত মারই যে হজম করতে পারে লক্ষীছাড়াটা! [জোরে] এও বলি মনোহর ওকে মেরে আর লাভ নেই। যে বয়সে পিটিয়ে শোধরান যায় সে বয়স ওর চ'লে গেছে। মাথার উপর না আছে একটা অভিভাবক, না আছে দেখ্‌বার শোনবার একটা লোক। আমাদেরই তো দেখাশোনা করা উচিত, তা পারচি কোথায়। দলে পড়ে মন্দর চেয়ে মন্দ হয়ে চলেইচে,—অথচ শাসন করবার কেউ নেই, শোধরাবারও কেউ নেই, এমন কি উপদেশ দেবার লোকেরও ওর অভাব।

মনোহর। তা বলে গুরুতর অন্যায় করলে তার শাস্তি দিতে হবেনা এমন কথা কোথাও শুনিনি। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে ভদ্রতা জ্ঞান যার একটু মাত্র নাই, অসচ্চরিত্র হ'য়েও ভদ্রলোকের বাড়ীতে যে ঢুক্‌তে আসে, জুতিয়ে সমান করলে পরে তার উচিত পুরস্কার দেওয়া হয়।

নীরোদ। না, অন্যায় করলে শাস্তি তাকে পেতেই হবে। [আন্‌মনা হইয়া] কিন্তু বলছিলাম তাতেও শোধ্‌রাবেনা। [সবিতা ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সাজসজ্জা করিয়া সে ফিটফাট হইয়া আসিয়াছে। বিকাশ মুগ্ধ চোখে তাহার দিকে চাহিল]

সবিতা। চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে বাবা, তোমরা শীগ্‌গীর এসো। [প্রস্থান]

নীরোদ। [বিকাশের দিকে] যাও বাবা বিকাশ। আমিও একটা চাদর নিয়ে এলুম বলে। [বিকাশ বাহির হইয়া গেল] শোনো মনোহর, ওদিকটাতে এগিয়ে এসো। [বিস্মিত ভাবে মনোহর আগাইয়া গেল] তোমার কাছে অনেক কথা বলবার আছে।

মনোহর। বলুন।

নীরোদ। অরিজিতের বাবা আমার বন্ধু ছিলেন তা হয়ত জানো। ওরা ছিল মস্ত জমিদার। অবিনাশ যখন বি-এ পাশ করলো তখন ওর বাবা পাবনার এক জমিদারের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করলেন। কলেজ জীবনে অবিনাশ প্রতিবেশী এক দরিদ্র কেরাণীর মেয়েকে ভালোবেসেছিল,—তাদের আশ্বাস দিয়েছিল জীবনে যদি কাউকে সে বিয়ে ক'রে তবে তাদের মেয়েটীকেই করবে। [একটু চুপ]

মনোহর। তারপর?

নীরোদ। তারপর তার সাথে বিয়ে হ'লোনা। কুল ও বংশের দোহাই দিয়ে, সম্পত্তি-চ্যুতির ভয় দেখিয়ে, দরিদ্র কেরাণীকে দেশ-ছাড়া ক'রে, পাবনার জমিদার-কন্যার সাথেই অবিনাশের বাবা তার বিয়ে দেওয়ালেন। তখন থেকে ওর অধঃপতন আরম্ভ। মদ ধরলে, সঙ্গে সঙ্গে তার উপসর্গ আসতেও দেরী হ'লোনা। নিরপরাধ এক নববিবাহিতার চোখের সমুখে অবিনাশ হু-হু ক'রে অধঃপতনের পথে পিছ্‌লে চল্ল। অরিজিতের ভেতর যে অসংযম, যে চাঞ্চল দেখতে পাচ্ছ এটা ওর রক্তের ঋণ। পিতার বিপুল জমিদারীর উত্তরাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ওটা ও পেয়েছে।

মনোহর। [আপত্তি করিয়া] কিন্তু উত্তরাধিকারে পাক্ আর যেমন করেই পাক, অপরাধ তাতে বিন্দুমাত্র কমেনা।

নীরোদ। না, তা কমেনা বটে। কিন্তু আমি অরিজিতের মায়ের মৃত্যুশয্যা পাশে [illegible] ছিলাম, একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তার ছেলের [illegible] তিনি নিজের

কাঁধে তুলে নিলেন। ওকে তিনি মানুষ ক'রে তুলবেন,—ওর বাপের পাপ যাতে ওর না লাগে সে দেখার ভার তারই। [এক মিনিট গভীর নিঃস্তব্ধতা] তারপর সেও একদিন চ'লে গেল। [গাঢস্বরে] যাবার সময় অবিজিৎকে দেখার ভার আমাকেই দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাজের ভিড়ে সে কর্ত্তব্য আমি অবহেলা করেচি। আর সে অবহেলায় কতটা ক্ষতি যে হয়েছে মনোহর তা তুমি দেখ্‌তেই পাচ্ছো। অবিজিতের অবনতির জন্য নিজেকে অনেকটাই যে দায়ী মনে হয়।

মনোহর। এখন তবে আপনি কি করতে চান্‌?

নীরোদ। কি যে করতে চাই সেটা বলা সহজ নয় মোটেই। তবে মনে হয়, এখনো সুযোগ পেলে হয়ত ছোঁড়াটা ভালো হ'তে পারত, হয়ত শোধরাতে পারত। [খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া] সবিতার বিয়ের পরে ওটা যে আরো নষ্ট হয়ে যাবে সেটা একেবারে ধ্রুব, মনোহর। যত মন্দই হো'ক সবিতাকে ও প্রাণ দিয়ে ভালোবাস্‌ত তাতো অজানা নয়।

মনোহর। [প্রায় রাগিয়া] কিন্তু তাই বলে একান্ত অসচ্চরিত্র জেনে মেয়েটাকে তার হাতে তুলে দেওয়া চলে না তো। চরিত্রই জীবনের পরম ধন। ধর্ম্মের পথই প্রশস্ত পথ।

নীরোদ। [কূল না পাইয়া] তা বটে মনোহর, তাও বটে! [সবিতার প্রবেশ]

সবিতা। বাঃ রে, তোমরা চা খেতে আস্‌বেনা নাকি? চা ঠাণ্ডা হয়ে যে জল হয়ে গেল।

নীরোদ। চলো মা, চলো যাচ্ছি। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সবিতার শুইবার ঘর। একটা সিঙ্গেল খাট একধারে পাতা। একদিকে একটা ড্রেসিং টেবল্‌, তাতে প্রসাধনের নানা জিনিষ সাজানো রহিয়াছে। খাটের মাথার দিকে একটা জানালা। উপর তলার জানালা বলিয়া শিক নাই। খোলা জানালা দিয়া গাছের শীর্ষ, গির্জ্জার চূড়া চোখে পড়ে।]

সবিতা ড্রেসিঙ্‌ টেবিলের সম্মুখ হাতল-হীন চেয়ারটাতে বসিয়া। আর পাশে দাঁড়াইয়া আয়ীবুড়ি। আয়ীবুড়ি বেহারী ঝি কিন্তু বাঙ্‌লা দেশে বহুদিন থাকিয়া প্রায় বাঙালী হইয়া গেছে। সবিতার খোলা চুলগুলি সে বাঁধিয়া দিতেছিল।

রাত নটা হইবে।]

আয়ী। বিকালে কেন চুলটা বেঁধে নিলে না দিদিমণি? রোজই শোবার আগে তোমার চুল বাঁধা। এমন অযত্ন কর্‌লে চুল কি বাড়্‌তে পারে।

সবিতা। তবে তুই এসেই বেঁধে দিলি নে কেন? না ডাক্‌লে বুঝি কখনো আসতে নেই। মেড়ো বুদ্ধি কিনা।

আয়ী। [সস্নেহ স্মিত হাসিয়া] মেড়োর যখন আমার মধ্যে আর কিছু নেই তখন বুদ্ধিটাই কি আর মেড়োর আছে। এটা একেবারে বাঙালী। তুমি পড়ছিলে দেখে সাহস ক'রে আর ডাকতে পারিনি।

সবিতা। তবে আমিই বা কি করব। পড়া ছেড়ে উঠ্‌তেই তো যত রাজ্যের [সহসা থামিয়া গেল। একটু পরে।] আচ্ছা আয়া বু'ড, অরুদাদের বাড়ি আর যাস্‌ না এখন তুই।

আয়ী। তা মাঝে মাঝে যাই বৈকি। তবে কর্ত্রীমা বেঁচে থাক্‌তে যতটা যেতাম ততটা কি আর যাই। তখন এই দুই বাড়ির মধ্যে কি ভাবই ছিল। তোমরাই বা কতক্ষণ আর বাড়িতে থাক্‌তে। তোমাকে কর্ত্রীমা যে ঠিক তার আপনার মেয়ের মতোই ভালোবাসত।

সবিতা। আচ্ছা আয়ী বুড়ি?

আয়ী। কি দিদিমণি?

সবিতা। অরুদাদের বাড়িতে এখন কে কে আছে রে?

আয়ী। কে আর থাক্‌বে। দাদাবাবুর আপনার বলতে এখন আর কে বেঁচে আছে। বাবু নিজে, এক পাল চাকর বাকর, আর ক'দিন হলো দূর সম্পর্কের কোন এক পিসী এসেছে। তার সাথে একটা বড় সংসার, ছেলে-মেয়ে নাতী-নাতনী। তারাই বাড়িটাতে জমিয়ে বসেছে।

সবিতা। আর অরুদা? পিসী আসাতে তার অনেকটা সুবিধে হয়েছে নিশ্চয়, নইলে দেখবার শোনবার কেউই তো তার ছিলনা।

[আয়ী]। তা জানিনা, তবে পিসী আসাতে তিন তলা

থেকে নেমে বাবুকে দু-তলায় আসতে হয়েছে দেখতে পেলাম। আর বসবার ঘরে তার শোবার জায়গা পড়েচে।

সবিতা। ওঃ

আয়ী। আর তেমনি চারদিকে অগোছাল ভাব। পিসী তার ছেলেপুলেদের নিয়েই ব্যস্ত, তাদের খাওয়া-পরা দেখতে দেখতেই সময় কাটে, দাদাবাবুর খোঁজ করবার সময় তার কোথা। তেমনি তার জামার বোতাম ছেঁড়া, কাপড়-জামা কোথায় কোন্‌টা তার হিসেব নেই, মাথার তেল আনা হয়নি তো সেদিন তেল দেওয়াই হ'লো না, এমনি চল্‌ছে। [সবিতা নিঃশব্দে আয়ীর কথাগুলি শুনিয়া যাইতে লাগিল] আর খাওয়ার কথা ছেড়েই দিলাম,—মদ ছাড়া আর কোনো কিছু যে পেটে যায় তাই যেন মনে হয়না। একটা বেয়ারা আছে, সোডা ভাঙ্‌ছে, মদের বোতল খুলছে আর দাদাবাবু সেই বিষ গ্লাসের পর গ্লাস গিলে ফেলছেন [সবিতার ক্ষণিকের কোমলতা সহসা অন্তর্হিত হইল]

সবিতা। [নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল] একদম একটা পশু হ'য়ে গেছে! মনুষ্যত্বের একটুকুন কি আর তার বাকী নেই! কিন্তু ওর পিসী কিছু বলেন না তাতে?

আয়ী। পিসী বল্‌লেই কি আর শুনতো। আর পিসীই বা বলতে যাবে কেন, এতে তার লাভ ছাড়া তো লোকসান নেই, দিদিমণি। দাদাবাবু মদের বিষে যদি বিভোর হয়ে থাকে পিসীর তো তাতে সুবিধে। এমন কি হয়ত অনেক দিনের আগেই মস্ত বড় একটা জমিদারী তার ছেলেদের হাতেও আসতে পারে।

[সবিতা স্তম্ভিত হইয়া আন্‌মনার মত চাহিয়া রহিল। বুকের ভিতর কি একটা বেদনা যেন একটু বাজিতেছে]

আয়ী। কিন্তু নিজেই নিজেকে নষ্ট করছে দাদাবাবু! মদে মদে দেহ বিষিয়ে গেছে, তবুও নিরস্ত নেই। একদিনও রাতে বাড়ি থাক্‌বেনা,—মানুষের দেহ তো, কত অত্যাচার সয়। তেমনি স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ছে। পেটে ব্যথা, মাঝে মাঝেই জ্বর,—কি বিশ্রী যে তার চেহারা হয়ে গেছে হঠাৎ দেখ্‌লে চিন্‌তেই পারা যায়না।

সবিতা। [অত্যন্ত আহত হইয়া] এতটা মন্দ হয়ে গেছে,—এতটা খারাপ হয়ে গেছে অরুদা তা তো আমি জানতাম না আয়ীবুড়ি। আর, ছিঃ ছিঃ, নিজেকে এতটা হীন এতটা মন্দ জেনেও আজ এসেছিল আমাদের বাড়িতে! [নিজে নিজে] আর সে যে কত বড় স্পর্দ্ধা নিয়ে এসেছিল তা ভাবতেও অবাক্ হয়ে যাই।

আয়ী। [কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া] আর আমাদের বাড়ির কর্ত্রী মা যখন বেঁচে ছিলেন ঐ দাদাবাবুরই সাথে তোমার বিয়ে দেবেন ঠিক ক'রে রেখেছিলেন।

সবিতা। [প্রায় চীৎকার করিয়া] বিয়ে! ঐ জানোয়ারটার সাথে? মা বেঁচে থাক্‌লে লাথি মেরে ওকে দূর করে দিতেন। অসচ্চরিত্র! মাতাল! [ব্যর্থ আক্রোশে সবিতা যেন ফুলিয়া উঠিতেছিল। একটু পরে আয়ীকে বলিল] আচ্ছা তুই এখন যা আয়ীবুড়ি, আমি ঘুমুবো। [আয়ীর প্রস্থান]

[কিছুক্ষণ সবিতা স্তব্ধ হইয়াই সেখানে বসিয়া রহিল। তারপর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ালের একধারে তার মৃতা মায়ের একটা বড় ছবি টাঙ্গানো ছিল। তার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় বিশ্বাসে মাতার ছবিটীকে নমস্কার জানাইয়া]

সবিতা। মা, মাগো, তুমি জানো তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনদিনই সবিতা কিছু করেনি। আর আমার জীবনের সবার চাইতে গুরুতর এই সন্ধিক্ষণে করুণাময়ী মা তোমার ইচ্ছা আমি আমার জীবন দিয়ে পালন করতে কুণ্ঠিত হতাম না। কিন্তু আমি জানি, যে অরিজিতের সাথে তুমি তোমার মেয়ের বিয়ে ঠিক ক'রে গিয়েছিলে সে অনেক দিনই মরে গেছে। এখন তারই মূর্ত্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক চরিত্রহীন শয়তান,—জীবনে যাদের তুমি সবার চাইতে ঘৃণা করতে। মাগো, আমার একান্ত বিশ্বাস, অরিজিৎকে প্রত্যাখান করার মাতৃ আশীর্ব্বাদ সবিতা আজ যুক্তই লাভ করেচে। [সবিতা আবার গভীর শ্রদ্ধায় মাতাকে নমস্কার করিল। তারপর কিছুক্ষণ নির্ব্বাক মুখে ছবিটার পানে চাহিয়া থাকিয়া মাথা নীচু করিয়া ড্রেসিঙ্‌ টেবিলটার কাছে ফিরিয়া আসিল। তারপর অকস্মাৎ চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া টেবিলের উপর ঝুকিয়া হাতে মুখ গুঁজিল।]

[দরজা ঠেলিয়া হরসুন্দরীর প্রবেশ। হরসুন্দরী

[সবিতার মামীমা। বেঁটে ধরণের। কিছু স্থূলকায়। এই বয়সেও সৌখীনতা যায় নাই। জামদানী শাড়ি পরা, পানের রসে ঠোঁট রাঙা।]

হরসুন্দরী। সবি মা আমার কি করে দেখ্‌তে এলাম।

সবিতা। [চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া] এসো মামীমা। ঘুম আসছিল না তাই টেবিলে ঝুঁকে পড়ে তাকে ভুলিয়ে আনবার জোগাড়ে ছিলাম।

হরসুন্দরী। [খাটেতে বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া কহিলেন] টেবিলে ঝুকে পড়লে ঘুমকে কি ভুলিয়ে আনা যায় নাকিরে, পাগলী।

সবিতা। হ্যাঁ মামীমা তুমি জানো না। ঠিক যায়। রাত্রে খেয়ে দেয়ে যখনই পড়তে বসি তখনই চোখ ঢুলে আসে। কিন্তু যেদিন গিয়ে সরাসর বিছানায় শোবো শত সাধ্য সাধনায় তাকে যদি দুঘণ্টার আগে আনা যাবে। ভাবছিলাম পড়ার ছুতো করে ঘুম এনে তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ব।

হরসুন্দরী। তা লক্ষ্মীটি এখন রাত-জাগার অভ্যেস করাই তো তোমার দরকার [হাসিয়া] বরটী কি আর শীগগীর করে ঘুমোতে দেবে ?

সবিতা। [লজ্জিত ভাবে হাসিয়া আধুনিকার অপ্রতিভতার সহিত] সেটা তোমাদের সময় দরকার ছিল মামীমা,—বরের সাথে যখন রাতে ছাড়া আর দেখা হ'তো না। আমাদের তো দিনরাতের কোনোও তফাৎ নেই,—রাত জাগার তালিম—[হাসিয়া কথাটা সমাপ্ত করিল]

হরসুন্দরী। তা মা তোর ভাগ্য আছে, কন্দর্পের মতো বর পেয়েছিস্। রূপে গুণে চমৎকার ছেলে ঐ বিকাশ। যেমন স্বভাব, তেমনি চরিত্র,—জানিতো ছোট বেলা থেকেই। এই তো কর্ত্তা ওর বাবার কাছ থেকে দুহাজার টাকা যে ধার করেছিলেন একটী পয়সা তার নাকি সে ফিরিয়ে নিবে না। কর্ত্তা বলছিলেন, ও-বাড়ির ঐ অরুর সাথে [সবিতা যেন একটা শিহরিয়া উঠিল] নাকি একসময় তোর বিয়ের কথা চলছিল। শুনে গা আমার শিউরে উঠ্‌ল। মা গো মা, কি সর্ব্বনাশই হ'তো তা হ'লে। পরে জেনে শুনে ওর থেকে ঠাকুরঝিই সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েচে। তার একমাত্র মেয়ের এ সর্ব্বনাশ সে দেখ্‌তো কি ক'রে! [থামিয়া] আচ্ছা সবি ?

সবিতা। কি মামীমা ?

হরসুন্দরী। তোকে আজ এই কদিন ধরে এত বিমর্ষ দেখছি কেনরে ?

সবিতা। [শিহরিয়া] বিমর্ষ ? কই, আমি তার কিছুই টের পাইনি তো। যেমন সাধারণতঃ দিন যায় তেমনি চলছিল।

হরসুন্দরী। আমি ভাবলাম হয়ত কিছু হয়েছে বা।

সবিতা। [অন্যমনস্কভাবে] না মামীমা কিছুই হয়নি। কি হ'তে যাবে আবার [লক্ষ্মী এমন সময় ঘরে ঢুকিল। লক্ষ্মী মামীমার ছোট মেয়ে, বয়স তেরো-চৌদ্দ। এখনো বিবাহ হয় নাই। সবিতার দিকে আসিতে আসিতে যে কথা সুরু করিল]

লক্ষ্মী। আমি ভাব্‌লাম সবি দি হয়ত এতক্ষণ নাক ডাকিয়ে ঘুম দিয়েছে। স্বপ্নে এতক্ষণে হয়ত বা বরকেও দেখ্‌তে পাচ্ছে। কিন্তু এখান দিয়ে যেতে-যেতে শুনি খুব গল্প চল্‌ছে এই ঘরে। আরেকটু হ'লেই বাদ পড়ে গিয়েছিলাম। [হাসিয়া লক্ষ্মী দাঁড়াইল। তারপর সবিতার বেণী দোলাইয়া কহিল] বিয়ে ক'রে আমাদের কিন্তু একদম ভুলে যেয়োনা সবি দি।

সবিতা। [হাসিয়া] নিশ্চয়ই যাব। বিয়ে করে যদি লক্ষ্মী পাগ্‌লীটাকে ভুলতেই না পারলাম তবে সে আবার কি একটা বিয়ে হ'লো।

লক্ষ্মী। [মাকে] জানো মা, আজ বিকাশবাবু ও-বাড়ির অরিজিৎকে কেমন শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় মাতালটা এসে সবিদির ঘরে ঢুকেছিল। বিকাশবাবু বেত পিটিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। মাগো, শুনে আমি ভয়ে মরি। [সবিতাকে] বিকাশবাবু বল্লেন, মাতালটা নাকি তোমার হাত টেনে ধরে ছিল, [হরসুন্দরী অস্ফুট আতঙ্কের চীৎকার করিয়া উঠিল] সত্যি নাকি ?

সবিতা। বিকাশবাবু বুঝি এই কথাই সবাইকে ব'লে বেড়াচ্ছেন ? এ একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যে কথা লক্ষ্মী,—নইলে একজন ভদ্রমহিলাকে অপমান করবে এত মন্দ সে নয়।

লক্ষ্মী। মন্দ নয়, তুমি বলো কি সবিদি ?

হরসুন্দরী। সেটার পক্ষে কোনো কিছু করাই অসম্ভব নয় সবি-মা। লজ্জা-পিত্তি ভদ্রতা-অভদ্রতা ধর্ম্মাধর্ম্মর কোনো বালাই কি আর ওর আ !

লক্ষ্মী। ও-বাড়ির সন্ধ্যাদি কি বলে জানো মা। রোজ নাকি ভোর রাত্তিরে কে একটা মেয়ে মানুষকে মোটর করে অরিজিতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে। সে দিন নাকি—

সবিতা। [আহত ভাবে] তুই চুপ করতো লক্ষ্মী। এতটুক খানি মেয়ে তোকে অত কথাতেই বা কেন পায়। যার ইচ্ছে যা করুক তাতে তোর কি এসে গেলো।

হরসুন্দরী। মেয়েটার সব তাতেই পাকামো। [লক্ষ্মী দমিয়া চুপ করিল]

[নেপথ্যে] তোরা কি মিটিঙ বসিয়েছিস্‌রে এখানে [মনোহরবাবু কাছা গুঁজিতে গুঁজিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। হরসুন্দরীর ঘোমটাটা পড়িয়া গিয়াছিল। মাথায় একটু তুলিয়া দিল]

মনোহর। এত রাত অবধি মিটিঙ কিসের ?

হরসুন্দরী। অমনি গল্পগুজব হচ্ছিল। ও-বাড়ির অরুটা যে কি বয়ে গেছে সে কথাই বলছিলাম।

মনোহর। কেবল বয়ে গেছে ? অধঃপাতে গেছে। সেটা একটা অতিশয় পাষণ্ড, ওর নাম মুখে আনলেও পাপ হয়। তা সে সব আলোচনা ক'রে সবির ঘুমে ব্যাঘাত করে আর লাভ নাই। কিন্তু সবির মামার এই গর্ব্ব আছে যে ভাগ্নীকে একটা নরাধমের হাত থেকে সে বাঁচিয়েছে। জীবনে ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছু ভালোবাসেনা তোর এই মামা, এই কথাটাই মনে রাখিস্‌,—নইলে টাকা পয়সাও কি আর দশবিশহাজার করতে পারতাম না। কিন্তু যেই দেখ্‌লাম ধর্ম্ম পথে অর্থ নেই অমনি মনোহর মিত্তির সে পথ ছেড়ে ফির্‌লো। [স্ত্রীর প্রতি] নাও এবার ওঠো তোমরা, মেয়েকে একটু ঘুমুতে দাও।

[তাহারা প্রস্থান করিল]

[সবিতা ব্লাউজটা খুলিয়া ফেলিল। শুধু সেমিজ পরিয়াই শোয়। বিজ্‌লী আলোর সুইচ টিপিয়া আলোটা নিভাইল। তখন মুক্ত বাতায়ন পথে অজস্র রূপালী জ্যোৎস্না আসিয়া পুষ্পশুভ্র বিছানায় ও ফ্লোরে লুটাইয়া পড়িয়াছে। বালিশের উপর একটা গাছের ছায়া কাঁপিতেছে। একটুক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া সবিতা একটা চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে একসময় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে জানালার নীচে একটা বেহালার সুর শোনা গেল। তারপর সেটা থামিল। অল্পক্ষণ পরেই খোলা জান্‌লার উপর আসিয়া বসিল অরিজিৎ,—তার সাথে একটা বেহালা। লম্বা চুলগুলি বাতাসে উড়িতেছে,—গায়ে একটা পাঞ্জাবী,—তার দুইটা বোতাম খোলা।

নিঃশব্দে বসিয়া সে স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল সুপ্তা সবিতার দিকে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্না তাহার সারা গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—তাহার অনাবৃত বাহুতে, তাহার নিদ্রিত পুষ্প কলিকার মত স্নিগ্ধ আননে, তার বালিসে, চাদরে।

একটা মিনিট এই রকমই কাটিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস অরিজিতের বুক হইতে বাহির হইয়া আসিল। ক্ষণকাল দ্বিধা করিয়া বেহালাটা উঠাইয়া লইয়া ছড় টানিতেই তাহা হইতে অতিশয় সুমিষ্ট সুর ঝরিয়া পড়িল।

নিদ্রার ঘোরে চোখ মেলিয়াই সবিতা একবারে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ভয়ে বিস্ময়ে তাহার মুখ দিয়া কথাটী ফুটিল না। তখন জান্‌লা হইতে নামিয়া অরিজিৎ কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।]

অরিজিৎ। ব'লে গিছ্‌লাম শেষ, রাণু, কিন্তু শে[ষ] হবার যা নয় আমার মুখের কথায় তা শেষ হবে কি ক'রে। য[া] চিরন্তন—[হঠাৎ সবিতার ভয়-পাংশু মুখ আবিষ্কার করিয়া] তুমি খুব ভয় পেয়েচো, তাই না। কিন্তু তোমার কোনে[া] অনিষ্ট করতে আসিনি। আজকে আমার এই কথাটী তুমি বিশ্বেস করো।

সবিতা। [কথা বলিবার ক্ষমতা খানিকটা ফিরিয়া পাইয়া বিকৃত কণ্ঠে] তুমি কি চাও এখানে ? কোন্ সাহসে তুমি আমার শোবার ঘরে ঢুকলে ?

অরিজিৎ। দুঃসাহসিক কাজ করেছি বৈকি, কিন্তু

উপায়ান্তর না দেখেই তা করেচি। তুমি ভয় পেয়োনা লক্ষ্মীটি, না হয় [নীচের পকেট হইতে একটা রিভলবার বাহির করিয়া] এইটে কাছে রাখো [সবিতার পাশে রাখিয়া দিল] কোনো অন্যায় আচরণ যদি করি, কাজে লাগাতে কোনো দ্বিধা ক'রো না। আইনের দিক থেকে তাতে কোনো বাধা নেই, আমার দিক থেকেও না।

সবিতা। [সাহস পাইয়া] বেশ, কি চাও তুমি, আমার শেষ জবাব তোমাকে তো দিয়ে দিয়েচি।

অরিজিৎ। [একটুক্ষণ চুপ থাকিয়া পরে গাঢ় স্বরে] কিন্তু জবাবটা কি আর বদলাতে পারো না ?

সবিতা। [দৃঢ় স্বরে] না।

অরিজিৎ। [গাঢ় স্বরে] তাতে যদি একটা জীবনের শেষ হয় তবু কি কোনো মতে বদলাতে পারো না, রাণু ?

সবিতা। সবাইকার জীবন বাচাবার দায় তো আমার উপর নয়,—আমি কি করতে পারি ?

অরিজিৎ। [উচ্ছ্বসিত ভাবে] তুমি কি করতে পারো ? তুমি কাঙালকে সম্রাট করতে পারো, তুমি অন্ধকে আলো দিতে পারো, তুমি অর্দ্ধমৃতকে নব-জীবন দান ক'রে তাকে মানুষ করতে পারো। তুমি কি যে পারো আর কি যে পারো না তা তুমি নিজেই জানো না রাণি। আমার উপরে তোমার মন্ত্র-অভিষেক সুরু হোক সবিতা। আমাকে তুমি প্রাণদান করো।

সবিতা। মিথ্যে আমাকে প্রেম জানিয়ে নিজেকে শুধু-শুধু ছোট করে তোমার লাভ কি অরুদা। তুমি জানো, এ হবার নয় তোমার উপর কোনো প্রেমও নেই, কোনো শ্রদ্ধাও নেই।

অরিজিৎ। কিন্তু সবিতা তোমার জন্য প্রেমে আমার সমস্ত মন ছেয়ে আছে,—আমার নিঃশ্বাসের সাথে তার ঘন-সুগন্ধ বেরিয়ে এসে বাতাসকে সুরভি করে তোলে। আর শ্রদ্ধা ? তোমাকে যদি শ্রদ্ধা না করি জানি না তবে কাকে আর শ্রদ্ধা করি।

সবিতা। [একটু গর্ব্বিত] কিন্তু তুমি নিজে যে কি তাতো তুমি জানো; তবে কোন্ স্পর্দ্ধায় একজন ভদ্রমহিলাকে প্রেম-নিবেদন করতে এসেচ।

অরিজিৎ। হ্যাঁ, সবিতা আমি জানি আমি কি। সেই জন্যই তো তোমার কাছে এসেছি, নিবেদন জানাচ্ছি, দেবী, তোমার মন্ত্র-অভিষেকে আমার সমস্ত কলুষ ধুয়ে দাও, আমার সমস্ত পাপ দূর করো, আমাকে নব-জীবন দান ক'রে নতুন করে যাত্রা করতে দাও।

সবিতা। [একটু নরম হইয়া] কিন্তু অরুদা, তুমি যা, তারপর কোনো মেয়েই কি তোমাকে শ্রদ্ধা করতে পারে বলে মনে করতে পারো।

অরিজিৎ। [একটু ভাবিয়া] রাণু, শ্রদ্ধাটা আসে ভালোবাসার থেকেই। আমাব ভালোমন্দ নিয়ে কেউ যদি আমায় ভালোভাসতে পারে তবে শ্রদ্ধাটা খুব পেছনে পড়ে রইবে না। আর, [গাঢ় স্বরে] আর তার শ্রদ্ধার উপযুক্ত হবার জন্য অরিজিতের দিকে থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটী হবে না। যদি কোনো দিন সময় হয়—

সবিতা। [বাধা দিয়া] সে হয় না অরুদা,—আমি তা পারি না। প্রার্থনা করি তুমি ভালো হও,—কিন্তু [কঠিনভাবে] আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

অরিজিৎ। [আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল] উঃ! [তারপর গাঢ়স্বরে] কিন্তু এমন কি একদিনও ছিল না সবিতা যেদিন জগতে সবার চাইতে আমাকেই তোমার একান্ত আপনার বলে জানতে।

সবিতা। [না দমিয়া] কোনো দিন সে রকম আমার মনোবৃত্তি ছিল কিনা আজ তার হিসেব নিকেশ নিয়ে কোনো লাভ আছে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু যদি ধরেও নেই তেমন একদিন সত্যি ছিল, তবু নিজের বুকে হাত দিয়ে বলোতো সে অধিকার তুমি নিজেই নষ্ট করোনি !

অরিজিৎ। সবিতা, আমি মাতাল, আমি মন্দ সে-কথাটা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারচ না, তা আমি বুঝি না এমন নয়। কিন্তু এত মন্দও তো আমি ছিলাম না সবিতা। [একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া] ছোটবেলায় মা মারা গেলেন। বাপের স্নেহও কোনোদিন পাইনি। কী স্নেহ-কাঙাল হয়ে যে আমি বড় হলাম তা তোমাকে কেমন ক'রে বুঝাবো ! তোমার মা নিজের সন্তানের মত ক'রে মাতৃ-হারা আমাকে টেনে নিয়েছিলেন, এ অভাগার ভাগ্যে তাও সইল না।

তিনিও স্বর্গে চ'লে গেলেন। [অরিজিৎ একটু চুপ করিয়া] হ্যাঁ, এক সময় তুমিও আমাকে স্নেহ করতে রাণু, সেই স্নেহ আমার বুকে অমৃত হয়ে আছে! [বিরতি) তারপর জানি না একদিন কি দোষে তুমিও হতভাগাকে ঠেলে দিলে। [সবিতা নির্ব্বাক নত মুখে শুনিতে লাগিল] সেই যে ঠেলা তারই আঘাতে, চলেছি সর্ব্বনাশের পিছল পথ দিয়ে, তলার থেকে আরো তলায়, মন্দের আঘাতে মন্দ হয়ে,—অধঃপতনের একেবারে শেষের ধাপের দিকে চলেচি যে চলেইচি। [উচ্ছ্বসিত ভাবে] তোমার হাতটা একেবার বাড়িয়ে দাও, রাণু. আমি বাঁচি।

সবিতা। [রাগিয়া] তোমার অধঃপতনের জন্য আমাকে বুঝি শেষে দায়ী করচ?

অরিজিৎ। হ্যাঁ, কিছুটা করচি বৈকি। আমার রক্তের মধ্যে যে চাঞ্চল্য আমি উত্তরাধিকারের সাথে পেয়েচি তোমার স্নেহ দিয়ে তাকে তুমি জয় করতে পারতে। কিন্তু তুমি তা করোনি। স্নেহ-বুভুক্ষুকে বঞ্চিত ক'রে তুমি তাকে সর্ব্বনাশের পথে বের ক'রে দিয়েচো। স্নেহের লোভে, ভালোবাসার লোভে জগতে ঘুরে বেড়ালাম। পেলাম না। তখন পয়সা-দিয়ে কেনা স্নেহ-প্রেম কুড়িয়ে বেড়িয়েছি। আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন?

সবিতা। [রাগিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া] কি পয়সা-দিয়ে কেনা প্রেমের কথা তুমি আমাকে শোনাতে এসেছ! নির্লজ্জ মাতাল কোথাকার! দূর হও এক্ষুণি। নইলে আমি চীৎকার করব, বলে দিলুম।

[অরিজিৎ বজ্রাহতের মত ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল। চোখটা একটু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সহসা তাহা জ্বলিয়া উঠিল]

অরিজিৎ। [সহসা রূঢ় কণ্ঠে প্রায় চীৎকার করিয়া] ভুল করেচি! ভুল করেচি! মেয়েমানুষের করুণার কাছে আবেদন ক'রে যে কোনো লাভ হয় না সে কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। উদারতার যাদের প্রকৃতিতে এত অভাব তাদেরই কাছে গিয়েছিলুম ভিক্ষে চাইতে। মেয়েমানুষকে নিতে হয় জোর ক'রে,—পশুবলে,—তাই নেবো।

সবিতা। রাতদুপুরে আমার ঘরে তুমি বিস্তর চেঁচামেচি করো না বলচি। শীগ্‌গীর যাও আমার ঘর থেকে বেরিয়ে।

অরিজিৎ। তা যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে বলে যাই, আজ তোমার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ বটে কিন্তু বেশী দিনের আগেই নিজের ঘরে নিয়ে ঘর আলো করব, রাণু। তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে তাতে, তোমার অভিভাবকেরা—অর্থাৎ তোমার মামা—যদি সেটা না পছন্দ করেন তবু সেটা আট্‌কাবে না। কারণ আমার সেটা চাই,—তোমাকে না পেলে কোনো রকমেই আমার চল্‌বে না।

সবিতা [গর্ব্বিতভাবে] অমন স্পর্দ্ধার কথা, এ তোমার নতুন নয় আর এর দাম যে কতটা তাও আমার অজানা নয় অরুদা।

অরিজিৎ। বেশ তো তা যদি অজানা না থাকে, সেটাতো তোমার মঙ্গলেরই কথা। কিন্তু এ-কথাও মনে রেখো আমার নামকরণ একবারে ভুলও হয় নি। শত্রুকে কি করে জয় করতে হয় জানি। আচ্ছা, চল্লুম [ধীরে ধীরে জান্‌লার দিকে অগ্রসর হইল] হাতে যদি তোমার রিভল-বারটা না থাকতো, রাণু, তবে ভাবী সম্বন্ধের কথা স্মরণ করে আজিই একটা চুমু খেয়ে যেতাম।

[তাড়াতাড়ি গিয়া জান্‌লায় উঠিল। তারপর বিদায় সূচক হাত নাড়িয়া নীচে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সবিতা ত্রস্ত উঠিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর রিভলবারটা নীচে অরিজিতের কাছে ফেলিয়া দিয়া স্তব্ধ হইয়া বাহির পানে চাহিয়া রহিল। এক ঝলক জাগর-পাণ্ডুর জ্যোৎস্না তাহার চোখে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

অকস্মাৎ সবিতা সেখান হইতে টলিতে টলিতে আসিয়া বালিসে মাথা গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অরিজিতের বাড়ির একটা ঘর। মাঝখানে একটা বড় সেক্রেটারিয়েট টেব্‌ল্। তার একদিকে গদীমোড়া কতগুলি চেয়ার। অন্যদিকের চেয়ারে অরিজিৎ বসি-

দেওয়ালে অরিজিতের মা য়ের একটা ছবি টাঙ্গানো। টেবিলের উপর একটা টেবল্-ল্যাম্প। একটা কাচের কাগজ চাপা কতকগুলি কাগজ চাপা। একধারে একটা কলিঙ-বেল্। অন্যধারে একটা মশলার প্লেট। মশলার সাথে কতগুলি সিগার ও একটা দেশলাই।

বেলা গোটা নয়েক।

অরিজিৎ এক হাতে মাথার ভর রাখিয়া অন্য হাতের মুঠি ক্ষণে-ক্ষণে টেবিলে আঘাত করিতেছে। কি যেন ভাবিতেছে,—কিন্তু কুলকিনারা পাইতেছেনা। একবার কলিঙ-বেলটা টিপিল। তৎক্ষণাৎ বেহারা আসিয়া হাজির]

অরিজিৎ। জল।

বেহারা। [সেলাম করিয়া] হুজুর। [বাহির হইয়া গেল]

[তেমনি করিয়া অরিজিৎ টেবিলে ঘুষি দিতেছে। এমেন তার ব্যর্থতার অভিব্যক্তি। হুইস্কি সোডা লইয়া বেহারা প্রবেশ করিল]

অরিজিৎ। [ধমকাইয়া] মদ কে চেয়েছেরে? আমি কি জল খাইনে। শুধু জল। [বিস্মিত হইয়া বেহারার সে সব লইয়া প্রস্থান] [অকস্মাৎ উঠিয়া অরিজিৎ কি ভাবিতে-ভাবিতে ঘরের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করিতে লাগিল। এমন সময় দারোয়ান ঘরে প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল]

ক্যা খবর পাঁড়ে?

পাঁড়ে। হুঁজুর বালিষ্টর সাহেবকো বাড়ি সে মনোহর বাবু আয়া।

অরিজিৎ। [বিস্মিত হইয়া] কোন্ মনোহরবাবু? মামাবাবু?

পাঁড়ে। হুঁজুর।

অরিজিৎ। [চেয়ারে গিয়া বসিয়া] ভেজ দেও ইধার।

[একটু পরেই মনোহরবাবু প্রবেশ করিলেন]

অরিজিৎ। [বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া] এই যে মামাবাবু, আসুন আসুন। আজ্‌কে আমার কম সৌভাগ্য বলতে হবে না, নইলে বছরখানিকের ভেতর এ-বাড়িতে আপনার পায়ের ধূলো পড়েছে ব'লেও তো মনে হয় না। বসুন [বসিয়া পড়িল]

মনোহর। [একটু বিব্রত হইয়া] না-না কাজে কর্ম্মে সময় আর—

অরিজিৎ। তাতো বটেই। আপনারা কাজের লোক, ঘর সংসার দেখতে হয়,—মদ খেয়ে আমার মত দিন কাটানোও তো কাজ নয়। কি বলেন?

মনোহর। তোমার কাছে একটু কাজ আছে বাবা। আজ সময় পেলাম, ভাবলাম সেরেই যাই।

অরিজিৎ। বিলক্ষণ! কাজ না থাকলে কে কার কাছে আর আসে বলুন। এই যে আপনাদের বাড়িতে আপনাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে যেতে হ'তো সেও কাজের জন্যই। নইলে প্রহার খেতে [থামিয়া]—না থাক সে কথা, নইলে আপনি ভাববেন বাড়িতে পেয়ে আপনাকে খোঁটা দিচ্ছি।

[বেহারা জল হইয়া প্রবেশ করিল। তাহার হাত হইতে গ্লাসটা লইয়া সমস্তটুকু জল পান করিয়া অরিজিৎ গ্লাসটা ফিরাইয়া দিল। বেহারার প্রস্থান]

মনোহর। মানুষ মানুষের নামে কত অপবাদই যে দিতে পারে অরিজিৎ বাবা তাই শুধু ভাবি। পাড়ায় রটে গেছে মদ ছেড়ে সাদা জল তুমি নাকি কখনই ছোঁও না। অথচ নিজের চোখেই—

অরিজিৎ। যা শুনেচেন সেটা মিথ্যে নয়,—সাদা জল বছর খানিক হয় ছেড়ে দিয়েচি। আর এখন যে খেলাম সেটাও মদ ফুরিয়ে গেছে বলে,—আনিয়ে নিতে হবে।

মনোহর। কিন্তু এটা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না মানুষই মানুষের বড় শত্রু। নইলে তোমাকে তো ছোটবেলা থেকেই চিনি,—মন্দ মন্দ বলে এই যে একটা রব উঠেচে তার নব্বুই ভাগই যে গড়া তাকি আর আমরা জানিনা! কিন্তু দেখ এই মনোহর মিত্তির, জীবনে লোকের ভাল গেয়েছে বিস্তর কিন্তু ভুলেও কারুর অখ্যাতি কোনো দিন গায় নাই।

অরিজিৎ। [মুচকিয়া হাসিয়া] হ্যাঁ, সে কথা তো

পাড়ার সব লোকেই জানে। সে কথা আমাকে আর বলতে হবে না।

মনোহর। মদ না খেয়ে থাকতে যদি অসুবিধা হয় তা বাবা আমাকে দেখে লজ্জা ক'রো না। মদ্যপান বড় জঘন্য অভ্যাস কিন্তু সে অভ্যাসও রয়ে সয়ে ছাড়তে হয়,—নইলে অসুখ বিসুখ হয়ে যেতে পারে।

অরিজিৎ। [কৌতূহলী চোখে প্রৌঢ়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া] আজ্ঞে। আপনার উদারতাও সর্ব্বজন বিদিত।

মনোহর। [একটু গুছাইয়া লইয়া] সেদিন রায়মশাইয়ের সাথে তোমার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। তিনি বলেন এমন অসচ্চরিত্র যুবার সঙ্গে তিনি কোনো রকমেই তার মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। কত বুঝালাম, অরিজিৎ বাবা সত্যি সত্যি আর অত মন্দ নয় শুধু দলে পড়েই নষ্ট হচ্চে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। সেই একই কথা।

অরিজিৎ। মামাবাবু, আপনার উপর শ্রদ্ধায় যে আমার মন ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়ে উঠেচে। অবশ্য একথাও জানতাম যে মামাবাবুর মত সাধু ব্যক্তি যেখানে আছে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রাণপণে না লড়ে তিনি ছাড়বেনই না।

মনোহর। [ব্যঙ্গ না বুঝিয়া গর্ব্বিতভাবে] তোমার টাকাকড়ির তো আর অভাব নেই বাবা,—যত ইচ্ছে ব্যয় কর তার হিসেব নিকেশের ও দরকার নেই। তোমার অভাব হয়েচে প্রকৃত হিতৈষীর। সদুপদেশ না পেয়ে একটা মহান জীবন নষ্ট হয়ে যাবে এই কথাটাই কত দিন হ'তে আমার বড় লাগ্‌ছে।

অরিজিৎ। [কৌতূহলী ভাবে] তা সত্যি কথা মামাবাবু। তা আপনারাই তো উপদেশ দেওয়ার মত লোক,—আরনারাই যদি দূরে সরে থাকেন তবে আর সে সব পাই কোথা। সে যে বড় আক্রা জিনিষ,—পয়সা খরচ করলেও মেলেনা।

মনোহর। [খুসী হইয়া] হেঁ হেঁ! তোমার কথা আমি অনেকদিন ভেবেচি বাবা। ডব্‌কা বয়সে একটু এদিক-ওদিক সবাই হয়,—বড় লোকের কথাই বড় হ'য়ে ওঠে। আবার বিয়ে থা করলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

অরিজিৎ। ঠিক কথা তো! এমন করে তো জিনিষটাকে কক্ষনো ভেবে দেখিনি,—অথচ আপনি যেই বল্লেন সমস্ত ব্যাপারটা এখন খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। একেই বলে উপদেশ।

মনোহর। তোমারও বাবা এখন বিয়ে থা করা দরকার হয়ে পড়েছে। বিয়ে করলেই আপনা আপনিই সংসারী হয়ে পড়্‌বে। সিজিল মিছিল, একটা শৃঙ্খলার জীবন। তার উপর ধর্ম্ম পথ। জানো তো ধর্ম্মের পথই প্রশস্ত পথ।

অরিজিৎ। তা সে কথা অতিশয় সত্য-কথা মামাবাবু। কিন্তু বিয়ে করবার একটা পাত্রী খুঁজেই যে পেলুম না,—প্রশস্ত পথ দিয়ে চলা আমার ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠেচে। এই তো আপনার ভাগ্নীর কাছে পর পর প্রেম জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এলাম। নইলে বিয়ে করতে আপত্তি আমার—

মনোহর। তা সবির সাথে বিয়ে হয়নি ভালই হয়েছে। মেমের কায়দায় যারা শিক্ষা পেয়েচে বিবাহিত জীবন তাদের নিয়ে কদাচ সুখী হয় না। তোমার বিয়ের জন্য পাত্রীর অভাব কি বাবা। বলো তো আমার ছোট মেয়ে লক্ষ্মীর সাথেই [অরিজিৎ অদম্য হাসি গোপন করিয়া স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল],—লক্ষ্মীর সাথেই—। বড় ভালো মেয়ে, যে ঘরে যাবে সে ঘরই সুখী করবে। এই মনোহর মিত্তিরের চেষ্টায় ফিরিঙ্গী শিক্ষা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। তা রঙ্‌টা না হয় ফিট্ গৌরবর্ণ নাই হ'লো, রঙ্‌ ধুয়ে তো আর খাবে না। কেমন কিনা? [অরিজিৎ কি ভাবিতেছিল]

অরিজিৎ। [চমকিয়া] সে কথা একশোবার সত্য। ধর্ম্ম বিবাহ তো আর ভোগের জন্য নয়।

মনোহর। এই তো বাবা, ঠিক বুঝেচো। তবে এ বিষয়ে তোমার মতামত কি জানতে পারলে—

অরিজিৎ। তা মামাবাবু আমার বিশেষ অমত নেই। আমার পিসীমা এখানে আছেন কিনা, তার হুকুমটা মাত্র একবার নিয়ে দু-একদিনের মধ্যেই আপনাকে একটা পাকা কথা দিয়ে দেব। ঠিক বলেছেন আপনি, বিয়ে এখন একটা আমার করা দরকার। আর শীগ্‌গীর তার [illegible] ব্যবস্থা করতে [illegible] হবে না।

মনোহর। [খুসী হইয়া] দীর্ঘজীবী হও বাবা। এমন সোনার চাঁদ চমৎকার স্বভাবের ছেলে তার নামে কিনা,—[ছাতি উঠাইয়া লইয়া] এখন তবে আসি [হাঁটিয়া দরজা দিকে চলিল]

অরিজিৎ। [ডাকিয়া] মামাবাবু!

মনোহর। [ফিরিয়া] কি বাবা?

অরিজিৎ। আজ একটা, উপকার করতে হবে আমাকে?

মনোহর। [সাগ্রহে] বলো বলো কি করতে হবে। আমার সাধ্য থাক্‌লে তোমার জন্য না করতে পারি এমন কিছুই নেই।

অরিজিৎ। না ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। হয়েছে কি, আমার দু'দুটো গাড়ির কলই বিগ্‌ড়ে অচল হয়ে বসে আছে। এদিকে দুপুরে এক সাহেবের সাথে দেখা করতে না বেরুলেই নয়,—হাজার পঁচিশ টাকা ক্ষতি। ট্যাক্সি করে যেতে ভালো দেখায় না, যদি দুপুর বেলায়,—

মনোহর। তা আর বলতে হবে না,—ক'টার সময় গাড়িটা পাঠাতে হবে তাই বলো। দুপুরে তো গাড়িটা পড়েই থাকে তোমার যদি কাজে লাগে তবে তো ভালই।

অরিজিৎ। তবে একটা দেড়টার সময় একবার পাঠিয়ে দেবেন।

মনোহর। বেশ, বেশ। পাঠিয়ে দেবো।

[প্রস্থান]

[বাহিরে দেখিয়া আসিয়া অরিজিৎ একলা একলাই হো হো করিয়া হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। সে হাসি যেন আর থামিবেই না।

এমন সময় অরিজিতের এক-গ্লাসের বন্ধু মোসাহেব উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল]

উমেশ। ব্যাপার কি অরুদা, ভারী খুসী দেখা যাচ্ছে।

অরিজিৎ। [গম্ভীরভাবে] এই তো উমেশ। তোমার [illegible] ছিলাম।

উমেশ। কেন খুসীর ভাগ নিতে নাকি?

অরিজিৎ। না ভায়া অতটা সৌভাগ্যবান নিজেকে [illegible] না,—এসেচ যখন দুঃখেরই ভাগ নিতে হবে, হাসি দেখে আনন্দিত হয়ে উঠে যদি থাক তো ঠকেচ। লোকে বলে, বড় দুঃখেও হাসি পায়,—সেই অভিজ্ঞতায় এই মাত্র লাভ করলাম।

উমেশ। [বিস্মিত] তার মানে।

অরিজিৎ। ব্যস্ত হয়ো না, বলচি। এই মাত্র সবিতার মামা এসেছিলেন।

উমেশ। কে? সেই রাস্কেল বুড়োটা? জুতিয়ে তাড়ালে না কেন?

অরিজিৎ। না ভায়া, আমি যিশুখৃষ্টের ভক্ত লোক, অমন চণ্ডালের মত ব্যবহার কি আমার দ্বারা আর সম্ভবপর। বরঞ্চ তার কন্যাকে বিবাহ-পাশে আবদ্ধ করতে আমার কোনো মাত্র অমত নেই এই আশ্বাস দিয়ে বিদায় করলুম।

উমেশ। বলোকি? সত্যি নাকি?

অরিজিৎ। একটু আগে হঠাৎ বুড়ো এসে উপস্থিত। আমার নাকি উপদেশ দাতার একান্তই অভাব তাই দয়া পরবশ হয়ে অযাচিত সেইটেই আমাকে দান করতে এসেছিলেন। তারপর নানা আলোচনা বিলোচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে তাহার মেয়েটার পাণিপীড়ন করলেই আমার ঐহিক আর পারমার্থিক মুক্তির দরজা একেবারে পটাপট খুলে যাবে। আমিও চটপট রাজী হয়ে গেলুম এক রকম,—কম লোভের কথা নয়ত।

উমেশ। এত ভণ্ডও লোক হ'তে পারে! তোমার কুৎসা বোধ হয় এমন দুমুখে আর কেউ ছড়াতে পারে না।

অরিজিৎ। টাকাতে শত্রু মিত্র হয়ে যায় তা বুঝি জানোনা ভায়া। শিখে নাও। কিন্তু ধর্ম্মধ্বজ এই মামাটার ভণ্ডামী দেখে আমিও তখন প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিছলুম। [উচ্ছসিত ভাবে] অথচ এই মামারই পরামর্শে সবিতাকে আজ আমি হারাতে বসেচি উমেশ। নইলে জেঠামশায় যত মন্দ বলেই জানুন আমাকে চিরদিন আমার মঙ্গল কামনা ক'রে এসেচেন, আমাকে সুখী দেখ্‌তে চেয়েছেন [একটু চুপ করিয়া] নিজের স্বার্থের জন্য লোকটা আমার কত বড় ক্ষতি করেছে, উমেশ, তা ও ধারণা করতে পারে না, হয়ত তুমিও পারো না জগতে আর কেউ পারে না। [একটু

থামিয়া তারপর অকস্মাৎ] আমার আজ বিয়ে হচ্চে জানোতো ?

উমেশ। [হাসিয়া] কি মামাবাবুর কন্যার সাথে নাকি ? এরই মধ্যে প্রেমে পড়ে গেলে।

অরিজিৎ। [গম্ভীরস্বরে] ঠাট্টা নয় উমেশ, আজ আমার ঠাট্টা করার মত দিন নয়। হাঁা, আজই বিয়ে হবে, - আজ রাত্তেই। সমারোহ কিছুমাত্র নেই, আয়োজনও কিছু এপর্য্যন্ত করা হ'লোনা কিন্তু সে ভার তো তোমার ওপর উমেশ। ভাগ্যে থাকে, [উচ্ছ্বসিত ভাবে] আমি আজ সম্রাট হ'য়ে যাবো,—জগতের সবার চাইতে ধনী, দেবতার ঈর্ষার বস্তু, সুখীর চাইতেও সুখী, ভাগ্যমন্তের চাইতেও ভাগ্যমন্ত। নইলে হয়ত,—[প্রায় স্বগত] হয়ত এবারের মত অরিজিতের খেলা শেষ হ'লো।

উমেশ। [একান্ত বিস্মিত হইয়া] তুমি কি-সব বল্‌চ অরুদা আমি যে এর বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারচি না। কি তুমি করতে চাও, কি তোমার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলো।

অরিজিৎ। আজ আমার বিয়ের দিন, তোমাকে তার আয়োজন করতে হবে।

উমেশ। পাত্রী ?

অরিজিৎ। [হাসিয়া] পাত্রী ? তা পাত্রী একজন আছে বৈকি,—বিয়ের জন্য সেটাই যে সবার চাইতে বেশী অপরিহার্য্য। আর তার রূপগুণ ও মন্দ নয়,—যে কোনো ঘর সে উজ্জ্বল করতে পারে।

উমেশ। তাইতো মনে হচ্চে। কিন্তু এমন অকস্মাৎ।

অরিজিৎ। অকস্মাৎ না ক'রে উপায় নেই ভায়া নইলে বিয়েতে ঘটা করতে কে আর না পছন্দ করে। কিন্তু ঘটা করতে গিয়ে বিয়েটাই যদি শেষে না হয় সেটাও খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে না।

উমেশ। তারপর ?

অরিজিৎ। বিয়ের আয়োজনটা আমাদেরই করতে হবে। পাত্রী নির্ব্বান্ধব অতএব দায়ের ভাগ সমস্তটাই পড়্‌বে তোমার ওপর। তাই বলে ভয় পেয়ো না ভায়া, ভারটা পরিশ্রমের দিক থেকে বিশেষ গুরুতর হবে বলে মনে হয় না। [একটু চুপ থাকিয়া] আচ্ছা উমেশ, আমি যদি এই মুহূর্ত্তে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিই তুমি আমার জন্য একটু কষ্ট করতে পারো না ?

উমেশ। [অবাক্ হইয়া গেল] পাঁচ হাজার টাকা !

অরিজিৎ। হাঁা, পাঁচ হাজার টাকা।

উমেশ। [সলোভে] বন্ধুর জন্য অমনি জীবন দিতে পারি, তবে পাঁচ হাজার টাকায় আর সামান্য একটু উপকার করতে পারব না একি একটা আবার কথা হ'লো। পাঁচ হাজার কি সোজা কথা।

অরিজিৎ। কিন্তু সে কাজে বিপদ আছে।

উমেশ। পাঁচ হাজার টাকার জন্য লোকে ফাঁসি কাঠে ঝুলতে পারে আর বন্ধুর জন্য একটু বিপদ মাথায় নিতে কুন্ঠিত হ'বো এত কাপুরুষ আমি কেনোদিনই নই। এখন কাজটা কি সেইটেই বলে ফেল অরুদা, তার সমাধানে কিছুমাত্র দেরী হবে না।

অরিজিৎ। পাত্রীকে গিয়ে তোমার নিয়ে আসতে হবে।

উমেশ। সে তো সোজা কথা। কোন্ গাড়িটা নিয়ে যাবো বলো তো, তোমার নতুন ঐ যেটা কিনেচ ?

অরিজিৎ। [গম্ভীরকণ্ঠে] সবিতার মামার কাছ থেকে চেয়ে দুপুরের জন্য তাদের গাড়িটা ধার নিয়েচি। ভাব্‌চি তাতে করেই পাত্রীকে আনা হবে।

উমেশ। আর তোমার গাড়ি ? তোমার গাড়ির কি হ'লো।

অরিজিৎ। বিয়ের আগে বরের বাড়ির জিনিষ কনের ভোগ করতে নেই তাও বুঝি জানো না ভায়া। তোমার দেখি সংসারের অনেক কিছুই শিখ্‌তে হবে। [একটু চুপ থাকিয়া] কিন্তু কি জানো ব্যাপারটা একটু গুরুতর,—সবটা না বললে বুঝ্‌তে পারবেনা। এসো আমার শোবার ঘরে [চলিতে চলিতে] সবটা খুলেই বলি।

[প্রস্থান]

[নীরোদবাবুর ঘর। ঘরের মধ্যখানে বড় একটা রাইটিং টেবল্। গোটা পাঁচেক নানা আকারের চেয়ার চারিদিকে ছড়ান। একটা ইজিচেয়ার ও একটা সোফা। টেবিলের

উপর একটা টেলিফোন-রিসিভার্। তলার ওয়েষ্ট-পেপারের ঝুড়ি।

দেওয়ালের বড় ঘড়িটাতে রাত সাড়ে আটটা বাজিয়াছে।

যবনিকা উঠিলে দেখা গেল নীরোদবাবু টেলিফোনে কি শুনিতেছেন। তারপর যে খবর চান তাহা না পাইয়া সজোরে সেটা রাখিয়া দিলেন। মাথায় হাত দিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন তারপর অশান্তের মত বৃদ্ধ ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিল।

উৎকণ্ঠিত ভাবে হরসুন্দরী প্রবেশ করিল]

হরসুন্দরী। [উৎকণ্ঠিতস্বরে] পাওয়া গেল কোনো খবর রায়মশায়, কোনো সংবাদই কি জানতে পারলেন।

নীরোদ। [হতাশ ভাবে] নাঃ।

হরসুন্দরী। [প্রায় কাঁদিয়া উঠিয়া] একী সর্ব্বনাশের কথা গো! মা গো মা, আমার যে মূর্চ্ছা যাবার মত হয়েচে।

নীরোদ। কলেজের লোকেরাও কোনো খবর জানে না, বন্ধুবান্ধবদের বাড়িও যায়নি: হাসপাতালেও খপর নিলুম, তবে কোথায় যে গেল আমি তার কোনো কূল কিনারাই করতে পারচি না। অথচ কলেজ ছুটী হ'লে এক মূহুর্ত্ত সে কোথাও দেরী করে না।

হরসুন্দরী। [ক্রন্দনের সুরে] দশটা বাজ্‌তে মা আমার খেয়ে কলেজে গেল। আর রাত বাজে নটা, তার না আছে কোনো এতালা না আছে কোনো খবর। ভয়ে আমার হাত পা যে সেঁধিয়ে যাচ্চে। [নীরোদবাবু উঠিয়া জানালা দিয়া একবার বাহিরে চাহিয়া ব্যর্থ হইয়া আসিয়া বসিয়া পড়িল।] কোন্ সাত সকালে মা আমার চারটি মুখে দিয়ে গেছে, দুপুর না যেতেই তাড়াতাড়ি উঠে খাবার তৈরী ক'রে রাখলুম এদিকে ড্রাইভার এসে খবর দিল, দিদিমণি তো কলেজে নেই, আগেই নাকি চলে এয়েছে।

নীরোদ। [গাঢ় স্বরে] এখন তাকে পাওয়া গেলেই বাঁচি। আমার মাথার মধ্যে কী গুরুভার যে চেপে বসেচে তা তোমাকে বুঝাতেই পারব না বৌ। সেই আমার একমাত্র সন্তান,—মনোহরের স্ত্রীর একমাত্র স্মৃতি চিহ্ন। তার যদি একটু মাত্র অকল্যাণ হয় পরপারে গিয়ে তার কাছে আমি কি জবাব দেব!

হরসুন্দরী। [আশ্বাস দিয়া] আপনি অত উতলা হবেন না রায় মশাই। জীবনে কারুর আপনি অমঙ্গল করেন নাই, মা কালী কি আপনার অকল্যাণ হ'তে দেবেন। কোথাও বেড়াতে গেছে এক্ষুনি এসে পড়্‌বে মা আমার। এলে কিন্তু তাকে ভারি বক্‌বো আমি। কী চিন্তাই আমাদের হয়েছিল।

নীরোদ। কিন্তু সেই যে কখন মনোহরকে পাঠিয়েছি, অবিনাশকে পাঠিয়েছি হেমন্ত, সুন্দরলাল, তারা তো কেউই ফিরলো না। কেমন একটা আশঙ্কায় আমার বুকটা কেবলই টিপ টিপ্ করচে বৌ।

হরসুন্দরী। বিকালে এসে কিছুই মুখে দেন নি তাই দুর্ব্বলতার থেকে অমন হচ্চে। খাবার এনে দিই, একটু মুখে দিন্।

নীরোদ। [আপত্তি করিয়া] না, না, সে ফিরে না এলে আমি জলস্পর্শ করব না। তার খবর না পেয়ে মুখে কি আমার খাবার উঠ্‌বে মনে করো তুমি। [হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে] না না আমি আর পারি না, আমি নিজেই বেরুবো এবার। অন্য কারুর হাতে এ ভার দিয়ে আমার নিশ্চিন্তি নেই।

হরসুন্দরী। বুড়ো মানুষ আপনি এই রাত্তিরে কোথা যাবেন। তাছাড়া গাড়িটাও যে ওরা নিয়ে বেরিয়েছে। আপনি বসুন, মাকে নিয়ে ওরা এলো বলে। [বৃদ্ধ নীরোদবাবু মাথার চুল টানিতে লাগিলেন।]

[কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মীর প্রবেশ]

লক্ষ্মী। [কাঁদিয়া] মাগো, সবিতা-দি যে এখনো এলোনা গো। আমাদের কি হবে গো।

হরসুন্দরী। [ধম্‌কাইয়া] মিছিমিছি কাঁদতে বসিস্ নি বলছি লক্ষ্মী। কেন সবিতাদির কি হয়েছে। কলেজেরই কোন্ বন্ধুবান্ধবের বাসায় গেছে, খাইয়ে দাইয়ে তারা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবে। রাত নটা বাজ্‌লো না এরই মধ্যে বাড়িতে কান্না সুরু হয়ে গেছে।

লক্ষ্মী। [একটু সংযত হইয়া] কিন্তু তার যে আজ তিনটেয় বাড়ি ফিরবার কথা ছিল মা,—সে যে আমার

কাছে দিব্যি ক'রে গিয়েছিল। [বৃদ্ধ নীরোদবাবু একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল]।

হরসুন্দরী। যা যা তোর আর বাজে কথা বলতে হবে না। যা এখান থেকে এখন,—গণ্ডগোলের সময় জ্বালাসনি।

[কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষী চলিয়া গেল]

নীরোদ। [একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া] তাকে জীবন্তে ফিরে পাবো বলে তোমার কি মনে হয় বৌ।

হরসুন্দরী। [আশ্বাস দিয়া] আপনি এসব বলছেন কি ? মা দয়াময়ীর আশীর্ব্বাদে আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে ফিরে আসবে বল্লুম। [বাহিরে মোটর থামার শব্দ হইল। পরে সিঁড়িতে লোকের পদধ্বনি শোনা গেল। মামীমা উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া] ঐ তো তাকে নিয়ে বুঝি ফিরে এসেচে।

নীরোদ। [প্রায় পাগলের মত ছুটিয়া বাহিরে যাইতেছিল। তাহার আগেই বিরস মুখে মনোহর প্রবেশ করিল] কি, কি খবর ? [তাহার কণ্ঠ আগ্রহ ও আশঙ্কায় কাঁপিতেছে] এনেছো তাকে ? নিয়ে এসেছ।

মনোহর। না, কোনো খবরই পেলাম না [নীরোদবাবু ক্লান্ত ভাবে পাশের চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িলেন] সম্ভব-অসম্ভব সকল জায়গায় খুঁজে খুঁজে মনোহর মিস্তির একেবারে হয়রান হয়ে গেছে তবু কোনো হদিসই যদি পেলাম। [বসিয়া পড়িয়া] গিয়েছিলুম অনাদিবাবুর বাড়িতে,—তার মেয়ের কাছে খবর জান্‌তে।

নীরোদ। তারপর ?

মনোহর। খবর শুনে মেয়েটীতো আশ্চর্য্য। বল্লে, কেন সে তো গোটা দুয়েকের সময় বাড়ি চলে গেছে,—আমি তো অবাক্।

নীরোদ। তারপর, তারপর।

মনোহর। যে-যে যায়গায় ওর যাওয়ার কোনো মাত্র সম্ভাবনা আছে মনোহর মিস্তির তার কোন জায়গা দেখতেই আর বাকী রাখে নেই। যায়, মোটা সেই প্রিন্সিপাল বেটীর কাছেও গিয়েছিলাম। কিন্তু হ'লে হবে কি। তখন যেমন অন্ধকারে ছিলাম—

[সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া মনোহরকে শেষ না করিতে দিয়াই নীরোদবাবু তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আগাইয় গেলেন। মামার মতই মুখ করিয়া বাড়ির ক্লার্ক অবিনা[শ] প্রবেশ করিল। তাহার মুখ দেখিয়া খবর জিজ্ঞাসার আ[র] প্রয়োজন ছিল না। তবু নীরোদবাবু প্রায় কাতর ক[ণ্ঠে] কহিলেন]

নীরোদ। কিছু জান্‌তে পেলে অবিনাশ।

অবিনাশ। না, কর্ত্তা।

নীরোদ। [হতাশ সুরে] কোনো খবরই পেলে না ?

অবিনাশ। খবর সামান্য কিছু পেয়েছি কিন্তু তা[তে] কিছুই তো বুঝা যাচ্ছে না। অরুণবাবুর মেয়ে বল্লেন দুপুর প্রায় দুটোর সময় তাকে বাড়িতে চলে আস[তে] দেখেছেন। আমি বল্লুম, কৈ না বাড়ি তো যায় নি। [সে] আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, যায়নি কি রকম, ওদের মোটর[ই] তো দুপুরে এসে সবিকে নিয়ে গেছে। তারপর অনুসন্ধা[ন] ক'রে আর কোনো খবরই পেলুম না।

[হরসুন্দরী চলিয়া গেলেন

[নীরোদবাবু কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর]

নীরোদ। [অকস্মাৎ] অবিনাশ, ডাকো ড্রাইভারকে [অবিনাশ বাহির হইয়া গেল।]

[নীরোদবাবু উঠিয়া অশান্তভাবে ঘরের ভিতর হাঁটি[তে] লাগিলেন। মনোহর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল]

[ড্রাইভারকে লইয়া অবিনাশ প্রবেশ করিল]

নীরোদ। [ড্রাইভারকে] সুন্দরলাল, দিদিমণিকে আজ কটায় সময় আনতে গিয়েছিলে ?

সুন্দর। সাড়ে তিনটার সময়।

নীরোদ। [কঠিন ভাবে] মিথ্যে কথা বলচো, দুটো[র] সময় গিয়েছিলে।

সুন্দর। না, হুজুর, আমার কাছে ঘড়ি আছে,-আমি ঠিক স' তিনটার সময় বাড়ি থেকে রও[না] হয়েছিলাম।

নীরোদ। [একটুক্ষণ চুপ থাকিয়া] দুপুরে [কো]থাও বেরোও নি।

সুন্দর। এক বার বেরিয়েছিলাম, হুজুর।

নীরোদ। [কঠিন স্বরে] কোথায় বেরিয়েছিলে ?

সুন্দর। মামাবাবু ঐ বাড়ির ছোটবাবুর কাছে গাড়ি পাঠিয়েছিলেন,—সেইখানে তিনটে অবধি ছিলাম।

নীরোদ। [বিস্ময়াভিভূত হইয়া] অরিজিতের কাছে গাড়ি পাঠিয়েছিলেন? মনোহরবাবু?

সুন্দর। আজ্ঞে হাঁ।

নীরোদ। [কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া] বেশ, অরিজিত বাবুর সঙ্গে তুমি কোথায় কোথায় গিয়েছিলে।

সুন্দর। আজ্ঞে, ছোটবাবু আমার থেকে গাড়ি নিয়ে নিজেই বেরিয়েছেন। তিনটের সময় এসে আমায় ফেরত দিলেন। তখন আমি দিদিমণিকে আনতে যাই।

নীরোদ। [চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া তারপর] আচ্ছা, তোমরা যাও, মনোহরবাবুকে পাঠিয়ে দাও গে।

[অবিনাশ ও সুন্দরলালের প্রস্থান]

[বৃদ্ধ যে অস্থির হইয়া গেছে তাহা তাহার ব্যবহারে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় ধীরে ধীরে মনোহর প্রবেশ করিল]

নীরোদ। মনোহর, আজ দুপুরে অরিজিৎকে তুমি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলে।

মনোহর। [আম্‌তা আম্‌তা করিয়া] গাড়ি? হ্যাঁ গাড়ি আমি,—ঠিক পাঠানোও নয়,- সে ছোঁড়া নিজেই বাড়ি এসে, অত্যন্ত প্রয়োজনের কথা ব'লে—তা একরকম জোর করেই নিয়ে গেছে। বাড়িতে মাতালটা হল্লা না করে তার জন্য বিশেষ আপত্তি আর করতে পারলাম না। [হঠাৎ জোরে] কিন্তু পাষণ্ড যে এতটা নরাধমের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'তে পারে তা, তা—

নীরোদ। [একটু চুপ থাকিয়া] তবে তুমিও অরিজিৎকে সন্দেহ কর।

মনোহর। [প্রায় চীৎকার করিয়া] সন্দেহ? সন্দেহ আর একটু মাত্র নাই। সেটা মহাপাপিষ্ঠ, ধর্ম্মহীন মত্তপ [প্রায় প্রহসনের মত] আমি,—আমি দেখতে পেলে ওকে হত্যা ক'রে তবে ছাড়ব, মনোহর মিত্তিরকে জানে না,—শুধু দেখেচে তো—

[বাধা দিয়া] অরিজিতের ওখানে খোঁজ নিয়ে এলেন?

মনোহর। নিই নাই? এইমাত্র তো নিয়ে এলাম। কোথায় যে অন্তর্দ্ধান করেচে কেউ তার বিন্দু বিসর্গও জানে না। [উত্তেজিতভাবে] চলুন রায় মশায়, চলুন আমি পুলিসে খবর দিতে। পাষণ্ডকে ফাঁসিতে যদি না ঝুলোতে পারি তো আমার নাম— [প্রস্থানোদ্যত]

নীরোদ। দাঁড়াও। [মনোহর দাঁড়াইল]

নীরোদ। ব্যাপারটা আগে নিঃসন্দেহ ভাবে জেনে নাও তারপর যা হয় ক'রো। নইলে পুলিশকে ভিতর টেনে আনলে সহজ ব্যাপারেও জট পড়ে যায়। উতলা আমিও কম হইনি মনোহর, কিন্তু একটা কূল পাব বলে যেন ভরসা হচ্চে। শোনো—[বিকাশের প্রবেশ] এই যে বাবা বিকাশ। বিপদের কথা শুনেচো তো বাবা?

বিকাশ। বিপদ? কিসের বিপদ? আমি শুনিনি তো কিছু।

নীরোদ। [সহজভাবে] সবিতা মা কলেজ থেকে কোথায় যে চলে গেছে খুঁজে খুঁজে তার কোনো খবরই আমরা পাচ্চি না। উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায় সাড়া হয়ে গেলাম,- রাত বাজে ন'টা, কি যে করি, কোথা যে যাই কিছুই যে ভেবে পাচ্ছি না।

বিকাশ। সে কি কথা! কোথায় গেছে তাও কি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন না। তিনি তো আর ছোট্টটি নন।

মনোহর। [ক্রুদ্ধ স্বরে] আন্দাজ? আন্দাজের আর কি বাকী আছে। ঐ বাড়ির এই নরাধম পাষণ্ড ছোঁড়া—

নীরোদ। [বাধা দিয়া] আঃ কি যা-তা বলে মনোহর।

বিকাশ। [কথা লুফিয়া] ওঃ, তবে এ সেই অরিজিৎ দত্তেরই কাণ্ড! [প্রায় স্বগত] ওরে বাবা, এযে ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু,—এতটা তো জানতাম না।

নীরোদ। [উৎকণ্ঠিত ভাবে] তবে চলো বাবা, চলো মনোহর, বেরিয়ে পড়া যাক্।

বিকাশ। আমার কিন্তু এখন যাওয়ার উপায় নেই। আমার একজায়গায় নিমন্ত্রণ আছে,—সেখানে একবার না গেলেই নয়। [দরজার দিকে হাঁটিয়া চলিল। যাইতে যাইতে

করিল] তা এরই ভেতর একদিন এসে পাওয়া গেল কিনা একবার খোঁজ নিয়ে যাব। আসি তবে, নমস্কার [প্রস্থান]

[বৃদ্ধ নীরোদবাবু ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত সেদিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া]

নীরোদ। আর এরই সঙ্গে সবিতার বিয়ে তুমি ঠিক করেছিলে মনোহর।

মনোহর। পাত্র হিসেবে এমন ছুটী মেলে না রায় মশায়, তবে একটু ধর্ম্মভীরু কিনা—

নীরোদ। সেই জন্যই অধর্ম্মের স্পর্শ এড়িয়ে চলেন! এই তো বলতে চাও। উপযুক্ত কথা হয়েচে। [ডাকিয়া] সুন্দরলাল। [কাঁদিতে কাঁদিতে আয়ীবুড়ির প্রবেশ]

আয়ী। [কাঁদিয়া] না বাবু, দিদিমণিকে আমার কোথাও খুঁজে পেলুম না। এ-পাড়া সে-পাড়া কত যে ঘুরলাম কিন্তু কোথায় কে। দিদিমণি আমার নটার সময় খেয়ে গেছে ক্ষিধেতে হয়ত আর এখন দাঁড়াতে পারছে না। মাগো আমার—

নীরোদ। [নিজের চোখটা মুছিয়া] কেঁদে আর লাভ কি আয়ী তার চেয়ে সুন্দরলালকে ডেকে দে, আমি একবার খুঁজতে বেরুই। অবিনাশকে আর হেমন্তকেও শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ক'রে নিতে বল্।

আয়ী। ছোটবাবুদের বাড়ি যখন খুঁজ্‌তে গিছ্‌লাম গিরধারী তখন এই চিঠিটা [বাহির করিয়া] দিলে [চিঠিটা দিয়া] ছোটবাবু আপনাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য ওকে দিয়ে গিছ্‌ল।

[নীরোদ ক্ষিপ্র ভীরু হস্তে খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। পত্রটা একটু পড়িয়াই তাহার চোখ ছুটী দীর্ঘ হইয়া উঠিল]

মনোহর। [ব্যস্ত ভাবে] কি কি খপর রায় মশায়?

নীরোদ। [আয়ীকে] তুই যা [আয়ীর প্রস্থান] অরিজিতের চিঠি।

মনোহর। কি কি লিখেচে পাপিষ্ঠ? ওকে ফাঁসিকাঠে না ঝুলাতে পারিতো তো আমার নাম—

নীরোদ। [চিঠিটা চোখের সমুখে ধরিয়া] শোনো

মনোহর। পড়ুন।

নীরোদ। [চিঠি পড়িয়া] "জেঠা মশায়, আপনাকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভারি চিন্তায় ফেলেচি কিন্তু সেটা না ক'রে উপায়ান্তর ছিল না বলেই করতে হয়েচে নইলে আপনার উদ্বেগের কারণ হ'তে হয়েছে বলে লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি। সবিতাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি অপহরণ করে নিয়ে গেছি এমনি এক জায়গায় শত খুঁজলেও তার খোঁজ আপনারা পাবেন না। কিন্তু জেঠা মশায় আপনি যদি আমাকে একটু মাত্র স্নেহ করে থাকেন তবে এই কথাটি আপনি আমার অবিশ্বাস করবেন না তার ওপর, মরে গেলেও, কোনো অন্যায় আচরণ হবে না। জানিনা তাকে আমার চেয়ে বেশী জগতে কে আর শ্রদ্ধা করে। [মনোহর যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।]

তাকে চির জীবনের জন্য হারাব, সবিতা আমার চিরদিনের জন্য পর হয়ে যাবে,—তা আমি সহ্য করতে পারিনি জেঠা-মশায়। এমনি করে গোপন করা ছাড়া আর আমার উপায়ান্তর ছিল না। আমার বিশ্বাস সবিতা বাইরে যাই কেন না বলুক মনে মনে আমাকে সে ভালবাসে। কিন্তু আমার কলঙ্কের অংশটা এত বড় হয়ে আমার সত্যিকারের রূপ তার কাছে আচ্ছন্ন করে রেখেচে যে জোর করে সেটা করতে হবে,—অতএব বিয়েটা হয়ত তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়ে যাবে। [উত্তেজনায় মনোহর ছটফট করিতে লাগিল]

আজি রাতে বিয়ে। জেঠামশায়, আপনি এ অভাগাকে ক্ষমা করবেন,—কত বড় ক্ষতির আশঙ্কায় যে এমন দুঃসাহসিক কাজ করতে পেরেচি সে শুধু আমিই জানি আর জানেন আমার অন্তর্য্যামী। পারেন তো মনে মনে সামান্য একটু আশীর্ব্বাদও নব-জীবনের প্রারম্ভে অরিজিৎকে পাঠিয়ে দেবেন। ক্ষমাপ্রার্থী অরিজিৎ।"

মনোহর। [চীৎকার করিয়া] আশীর্ব্বাদ! আশীর্ব্বাদ লজ্জাহীন পাষণ্ডকে আমি ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে জলস্পর্শ করব না। কোথায় লুকাবে সোণার চাঁদ,—মাটীর তলায় গেলে মনোমিত্তির মাটীর নীচ থেকেই টেনে বের করবে। [ডাকিয়া] সুন্দরলাল! সুন্দরলাল!

[নীরোদবাবু দুই হাতে মাথা গুঁজিয়া স্তব্ধ হইয়া সোফার উপর বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল]

তৃতীয় অঙ্ক

[একটা প্রশস্ত ঘর] দেওয়ালে আগে রঙ্ করা ছিল এখন প্রায় উঠিয়া গেছে। দু-এক জায়গায় চুন-কালি ও খসিয়া পড়িয়া, বাড়িটা যে বহু পুরাতন তাহাই জানাইয়া দেয়।' সিলিঙে টানা-পাখা টাঙ্গানো। কয়েকটা বড় বড় বিলাতী ছবি দেওয়ালে। উপর হইতে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিতেছে।

ঘরের বড় বড় দরজাগুলি সব কটা বাহির হইতে আটকানো। দুটো জানালা খোলা। তাহার ফাঁক দিয়া গাছ-পালার শীর্ষ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনা। চারিদিকে প্রশস্থ বাগান। আর অন্ধকার।

ঘরের ভিতর ঝাড়-লণ্ঠন না জ্বলিয়া বিজ্লী-আলো জ্বলিতেছে। এত বড় ঘরে আসবাবের একান্ত অভাব। একধারে একটা দামী পুরাতন প্যাটার্ণের খাটের উপর শুধু মাত্র একটা সতরঞ্চি পাতা। পাশেই আর একটা মাত্র শুধু চেয়ার,—সারা ঘরে তাছাড়া আর কিছু নাই। মাটীতে বসিয়া সেই চেয়ারে মাথা উপুড় করিয়া একটী মেয়ে। কে তাহা চেনা যায় না।

টুঙ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। একটা বড় দরজা খুলিয়া গেল। সেই পথে একটা ট্রে-তে চা ও খাবার সাজাইয়া একজন বেহারা প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে মেয়েটীর কাছে আসিয়া সে উপস্থিত হইল]

বেহারা। মা জী! [মেয়েটী মুখ উঠাইল। দেখা গেল সে সবিতা]

সবিতা। ফের্ ফের এসেচিস্। একশোবার বলেছি এখানে আমি জলস্পর্শও করব না তবু কেন বারবার এসে জ্বালাতন।

বেহারা। মাজী আপনি না খেলে পরে বাবুজী আমার উপর গোসা করবে।

সবিতা। [সক্রোধে] তোর বাবুজীকে আমি চিনিনা কিন্তু তার এতটা দয়া দেখানর কোনো মাত্র প্রয়োজন নেই।

বেহারা। [ট্রে-টা আগাইয়া দিয়া] থোড়া লিয়ে লিন্।

সবিতা। [সক্রোধে ধাক্কা দিয়া ট্রে-টা বেহারার হাত হইয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল] মরে গেলেও এখানকার এককণা আমি ছোঁব না। [তারপর অকস্মাৎ আর্ত্ত-ক্রন্দনে] মা, মাগো [চেয়ারটার উপর সবিতা অদম্য কান্নার উপুড় হইয়া পড়িল। হতভম্ব বেহারা ট্রে-টাতে জিনিষ-পত্রগুলি তুলিয়া লইয়া দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণে দরজা বন্ধ হইবার শব্দ হইল।

এক মুহূর্ত্ত নিঃস্তব্ধ। তারপর আবার দরজা খোলার শব্দ হইল।]

সবিতা। [মুখ না উঠাইয়া কঠিনস্বরে] খাবনা, খাবনা, খাবনা বলচি আমি, [অরিজিতের প্রবেশ] ম'রে গেলেও খাবোনা।

অরিজিৎ। [ধীরে ধীরে সবিতার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া] ঐইতো উপযুক্ত কথা, বিয়ের দিনে মেয়েকে আবার খেতে আছে নাকি!

[সবিতা এই কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। ক্ষণস্তব্ধ ভাবে সহাস্য অরিজিতের দিকে চোখ মেলিয়া রহিল। তারপর]

সবিতা। [বিরাগে] ওঃ তুমি। তুমিই এসেচো!

অরিজিৎ। পরিচিত লোক দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছ, তাই না? তা অজানা-অচেনা লোকে চুরী ক'রে নিয়ে এলে ভাবনার কথা বৈকি! কিন্তু কাল রাত্রে তো চলে এসেছিলাম, তবু সন্দেহ হয়নি?

সবিতা। [সক্রোধে] সন্দেহ কেন, আমি নিশ্চিত জানতাম। তবু আশা ছিল তুমি [উচ্ছ্বসিত ভাবে] তুমি এত নীচ ও হীন হবে না।

অরিজিৎ। [গম্ভীর ভাবে] নীচ? তা নীচ যদি হয়ে থাকি তবে তুমিই তা করেচো, [সাধারণকণ্ঠে] নইলে উপরেই তোমাকে লাভ করতে আমার কোনো মাত্র আপত্তি ছিলনা। তা আমার আতিথ্যের বিশেষ কোনো ত্রুটী হয় নি তো-রাণু?

সবিতা। [গম্ভীরস্বরে] ব্যঙ্গ তুমি যত ইচ্ছে করতে পার কিন্তু জবাব না দেওয়া আমার ইচ্ছা।

অরিজিৎ। বিকাল বেলা তোমার খাওয়া হয়নি যথাসাধ্য খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো তাও ব্যঙ্গ? আর এই যে

গদী আঁটা চেয়ারটা ছেড়ে মাটীতে বসে শাড়িটা নষ্ট ক'রে ফেলচো সেও কি আমার ব্যঙ্গ নাকি। রাণু, তোমাকে ব্যঙ্গ করতে আনিনি এনেচি এমন কিছু করতে জগতে যা আমার কাছে সবার চাইতে সত্যি,—সবার চাইতে কাঙ্খনীয়।

সবিতা। [নিরুপায় ভাবে] এখন তবে তুমি আমাকে নিয়ে কি করতে চাও।

অরিজিৎ। কি করতে চাই ? তোমাকে নিয়ে ? হাসি পায় রাণু, কাল যা বলে এসেছিলাম এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছ ? না আমার এমন বড়াই অনেক শুনেচো বলে মনে রাখা দরকার মনে কর নাই ? [সবিতা নখ খুটিতে লাগিল] আমার সুখের জন্য তোমার সুখকে আজ বিসর্জ্জন দিতে হবে বুঝেচ [একটু থামিয়া] জানো এটা একটা বাগান-বাড়ি। বাগানবাড়ি কাকে বলে জানো তো ? হয়ত এই ঘরের ভিতরই কত অবৈধ প্রেমের কত পাপের অভিনয় হয়ে গেছে [সবিতা শিহরিয়া উঠিল] তাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস কাণ পাতলে এখনো হয় ত শোনা যায়। বুঝেচ ?

সবিতা। [ভয়-পাংশু মুখে প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া] অরুদা তুমি কি আমার মানসম্ভ্রম একেবারে নষ্ট ক'রে দিতে চাও নাকি ?

অরিজিৎ। [এতক্ষণ পরে সহসা হাসিয়া উঠিল] খুব ভয় পেয়েচ না ? তুমি কি বিশ্বেস করতে পার অতটা ছোট আমি হতে পেরেচি। [গম্ভীর ভাবে] তা নয়। যে যাকে ভালবাসে তার কোনো অমঙ্গলই কি সে করতে পারে।

সবিতা। তবে ? তবে, কেন এনেচো আমাকে এখানে।

অরিজিৎ। [আহত হইয়া] আমার উপর তোমার কী নীচু ধারণাই হয়ে গেছে ভাবতে আমার নিজের কাছেই নিজের লজ্জা হচ্চে। অথচ নিজে তোমার উপর কোনো অ-যথা আচরণ করতে পারি তা কল্পনাও করতে পারিনি। [এক মিনিট গম্ভীর নিঃশব্দ থাকিয়া] আমাদের আজ বিয়ে হবে রাণু।

সবিতা। [আশঙ্কিত] কাদের ?

অরিজিৎ। [হাসিয়া] বুঝতে পারচো না ? বলো কি, আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম যে। দশ বছরের ছোট খুকীটিও অনায়াসে যা বুঝতে পারত, কলেজে লেখা-পড়া শিখে সেই জ্ঞানটা অর্জ্জন করতে পারোনি ? সাধে আজ মনোহর মামা বলেছিলেন যে বিলাতী শিক্ষা পেয়ে,—না থাক্,—সে সব আবার ব্যাখ্যা করতে হবে,—। বিয়ে আমাদের গো,— আমার আর তোমার [সবিতা শিহরিয়া উঠিল] ?

সবিতা। [কাতর ভাবে] বিয়ে ? আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বে ? তুমি জোর ক'রে আমায় বিয়ে করবে অরুদা ?

অরিজিৎ। অন্য উপায়ে সে ব্যাপারটা যখন সম্ভবপর হ'লোনা তখন অগত্যা শুভকর্ম্মে খানিকটা জোর না এনে আর কিছু করা যাবে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু তাই বলে জোরের দরকার বলে শুভ কর্ম্মটা বাদ যাবে এমনটা ঘট্‌তে দিতে পারিনে।

সবিতা। [হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িয়া] [করুণ সুরে] আমার জীবনটা ব্যর্থ ক'রে তোমার লাভ কি অরুদা ?

অরিজিৎ। [ক্ষণকাল মুগ্ধ-করুণ চোখে সবিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর] আমার জীবনটা নইলে ব্যর্থ হয় যে রাণু।

সবিতা। তুমি এত স্বার্থপর অরুদা, তোমার নিজের সুখের জন্য আমায় অমনি করে বিসর্জ্জন দেবে তুমি ?

অরিজিৎ। [হাসিয়া] রাণু, নিজের জালে যে নিজেই আটকা পড়লে। তোমার সুখের জন্য তবে আমার জীবনটাকে ব্যর্থ করতে চাও নাকি, তুমি ? কিন্তু তাই বা কেন হবে, আমার সুখে কি তোমার সুখ হয় না, [উচ্ছ্বসিত] কোনো মতেই হয় না রাণু ?

সবিতা। [দৃঢ় কণ্ঠে] না, তা হয় না।

অরিজিৎ। [একটা ব্যথায় তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তারপর অকস্মাৎ কঠিন কণ্ঠে] বেশ, তা যদি না হয়, আমার সুখ যাতে সম্পূর্ণটা আসে তার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটীই হবে না। আমাকে বিয়ে করলে জীবন তোমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমাকেও না পেলে, [বেদনাতুর কণ্ঠে] হা পাষাণি, তোমাকে না পেলে আমারও জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে। এ-পক্ষে না হোক ও-পক্ষে, ক্ষতির মাত্রা সে একই। [জোরে] আমার জোর আছে, সে ক্ষতি আমি গ্রহণ করব না।

সবিতা। [ভাঙা গলায়] এমন শয়তান তুমি !

অরিজিৎ। তা কি আর তুমি জানো না রাণু। শয়তানিতে হাত পাকাতে পাকাতে একেবারে ওস্তাদ হয়ে গেছি যে। কিন্তু তোমাকে যখন আমার পাওয়া চাইই, আর শয়তানি করে যদি সেটা সুলভ হয় তবে নির্ব্বিচারে বেচারাকে অস্পৃশ্য ক'রে দেব তোমার মামার মতন এতটা ধর্ম্মধ্বজ আমি এখনো হয়ে উঠিনি। [একটু হাসিয়া] বিকাশ বাবুর জন্য ভারি কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?

সবিতা। তোমার ব্যঙ্গ রাখো।

অরিজিৎ। [হাসিয়া] ব্যঙ্গ! তবে বিকাশ বাবুর জন্য কষ্ট তোমার মোটেই নেই ! তবে সেটাতো আমার পরম লাভের কথা। তোমার বিরহ-ব্যথা শুধু আমারই জন্য সঞ্চিত থাকুক রাণু, আর কারুর অভাবেই তোমার চোখে যেন জল না ভ'রে আসে।

সবিতা। [কাতর ভাবে] তোমার বিয়ের পাত্রীর তো অভাব নয় আমাকে তুমি ছেড়ে দাও অরুদা।

অরিজিৎ। বিয়ের পাত্রীর অভাব নয় ? তুমি জানো না সবিতা, বিয়ের পাত্রীর জগতে আমার একান্তই অভাব। শুধু একজন, [উচ্ছ্বসিত ভাবে] শুধু একজন আছে সমস্ত বিশ্বসংসারে। আমার সেই অনিচ্ছুক বধূ শুধু দূরে আরো দূরে পালিয়ে বেড়ায়। তাকে যখন একবার হাতে পেয়েছি তখন কি আর প্রাণ ধরে ছাড়তে পারি।

সবিতা। তোমার সাথে বিয়ে হ'লে আমি আত্মহত্যা করবো।

অরিজিৎ। [কিছুক্ষণ সবিতার দিক চাহিয়া রূঢ় স্বরে] তা হোক, কিন্তু অন্তত কিছু দিনের জন্য আমার আত্মহত্যাটা বাঁচবে। আমার কাছে সেইটের দাম অনেক বেশী। [একটু চুপ থাকিয়া] যুক্তি-তর্ক, ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা কোনো কিছু বলেই আর কোনো লাভ নেই। একশোবার বলেচি আবারও বলি, তোমাকে আমার চাই, তোমাকে আমি পাব। ভিক্ষে ক'রে পাইনি তাই জোর ক'রে নেবার ব্যবস্থা করেছি।

[সবিতা হতাশায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।]

অরিজিৎ। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] তোমার সাথে আর আমি তর্ক করতে পারিনে রাণু। আমার মনের অবস্থা তর্ক করবার মত নয় আর দেহের অবস্থা ও যে বেশ ভাল তাও বলতে পারিনে। সারাদিন জল ছাড়া তো আর কিছু পেটে যায়নি।

সবিতা। [আশঙ্কিত] সারাদিনে শুধু মদ খেয়েচ ?

অরিজিৎ। [আহত] না, মদ আজ আমি ছুঁইনি, হয়ত আর কোনো দিন ছোঁবও না। কিন্তু আজ উপোস না করলে যে অমঙ্গল হয়,—শাস্ত্রের অনুশাসনটা মানাই ভালো। তুমি যখন সেটা আর করবে না তখন অন্তত আমাকেই করতে হয়েচে।

সবিতা। [ব্যঙ্গস্বরে] কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন মানার কি বিশেষ দরকার ছিল। তুমি তো বেশ জানো, তুমি কি করচো।

অরিজিৎ। জানি। [গম্ভীর ভাবে] তোমার পক্ষে এটা অন্যায় অনুষ্ঠান হ'তে পারে কিন্তু, সবিতা, আমার জীবনে এটা সবার চাইতে সত্য ঘটনা,—আমার জীবনে এটা সবার চাইতে স্মরণীয় দিন। তাতে কোনো অনুশাসনের ত্রুটী ঘটতেই আমি দিতে পারিনে। [একটু থামিয়া] ব্যবস্থা সব উমেশ ভায়াই করচে, তবু একটু দেখতে শুনতে হয়। চল্লুম [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] বিয়েটা এই ঘরেই হবে কি বলো ? [সবিতা কোনো জবাব করিল না] [অরিজিৎ দরজার দিকে আগাইয়া গেল। তারপর থামিয়া] ভেবে দেখো রাণু স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে পারো কি না, নইলে সেটা সম্পূর্ণ জোর করেই অনুষ্ঠিত হবে।

সবিতা। [চীৎকার করিয়া] স্বেচ্ছায় ? এ জীবনে নয়।

অরিজিৎ। বেশ তো তবে অন্য ব্যবস্থাটাই রইল। [দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। আবার সেটা বন্ধ হইল। তখন হতাশায় ভয়ে বেদনায় সবিতা মেজেয় লুটাইয়া পড়িল। একটু পরে দুই তিনটা কাগজের বাক্স হাতে ও বগলে করিয়া উমেশের প্রবেশ। সবিতা তেমনি উপুড় হইয়া। পায়ের শব্দ পাইয়াও মুখ উঠাইল না। উমেশ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

উমেশ। [বিনীত ভাবে] অনুগ্রহ ক'রে একটু শুনুন।

[অরিজিতের গলায় নয় বুঝিয়া সবিতা চমকিয়া মুখ উঠাইল।]

সবিতা। [চাহিয়া দেখিয়াই] ওঃ আপনি? আপনিই না সুন্দরলালের ভাই সেজে আমাদের মোটর নিয়ে কলেজে গিয়েছিলেন?

উমেশ। [লজ্জিত ভাবে] সে কথা অস্বীকার করে আর কি হবে। কিন্তু আপনার সাথে যদি ছলনা করে থাকি তবে সেটা না করে আর কোনো উপায় ছিলনা। সে জন্য আমি একান্তই দুঃখিত। কিন্তু অরুদার কাছে যখন প্রতিজ্ঞা করেচি তখন না ক'রে ও উপায় ছিল না, বিশেষতঃ, আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই, এই কাজটুকুর জন্য পাঁচ হাজার টাকা পেয়েচি।

সবিতা। [বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া] পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছেন? [পরে] কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার জন্য আপনি ধর্ম্মকে এমনি করে জলাঞ্জলি দিলেন তাতে আপনার একটু মাত্র বাজ্‌ল না।

উমেশ। দেখুন, ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা উঠ্‌লেও পাঁচ হাজার টাকার লোভে কি যে করতে পারতাম না বলতে পারিনে কিন্তু আমি তো জানি অরিজিৎদা আপনাকে কতটা শ্রদ্ধা করেন, কতটা ধর্ম্মভাবে আপনাকে পেতে চান্। আপনাকে না পেলে যে ওর জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেত সেটাও খুব ধর্ম্মের কাজ হ'তো আমার, ভাবেন।

সবিতা। উঃ আপনারা সব সমান্! [কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রায় কাতর ভাবে] আমাকে দিন্ না, দিন্ না ছেড়ে। আপনিও ভদ্রলোকের সন্তান, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বে আমায় বিয়ে করে তিনি যদি আমার চরম সর্ব্বনাশ করেন তবে কি আপনার বুকে একটুকুও বাজ্‌বেনা?

উমেশ। উপায় নেই সবিতা দেবী, আমাকে অনুরোধ করবেন না, আমি তা পারিনা। [হাতের ও বগলের বাক্সগুলি খাটে নামাইয়া রাখিতে রাখিতে] দেখুন তো, এই বেনারসী শাড়িগুলোর কোন্‌টা আপনার পছন্দ হয়।

সবিতা। [আর্ত্তস্বরে] শাড়ি? শাড়ি দিয়ে কি হবে, আমার চিতায় যাবার জন্য কোনো শাড়িরই দরকার নেই।

উমেশ। ছি ছি ও কি কথা? আপনি জানেন না আপনার জন্য কতটা ভালোবাসা ওর বুকে সঞ্চিত হয়ে আছে। আমি তো দেখেছি কতটা আগ্রহ, কতটা বেদনা—

সবিতা। [বাধা দিয়া] আপনি থামুন,—সে সব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে। তার প্রশংসা ক'রে আমার মন ভুলাতে পারবেন না।

উমেশ। [আহত ভাবে] আপনার মন ভুলাবার জন্যই তার কথা বলছিলাম এই কি আপনি মনে করেন? মোটেই নয়। শুধু এই জন্য বলছিলাম যে আপনি জানুন কতটা নিবিড় ভাবে, গভীর ভাবে সে আপনাকে চায়,—আপনাকে না পেলে তার জীবনটা কতটা নষ্ট হয়ে যাবে। [সবিতা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।] শাড়িগুলো রেখে গেলুম, একটা পছন্দ করবেন এই অরুদার অনুরোধ। [বাহির হইয়া গেল। সবিতা স্তব্ধ হইয়া সেখানেই বসিয়া রহিল।]

[একটু পরে দরজা খুলিয়া গেল। উমেশ, পুরোহিত ও বেহারার প্রবেশ]

পুরোহিত। [সবিতার দিকে বক্র কটাক্ষে একবার চাহিয়া] এই ঘরেই তবে আয়োজন করি উমেশ বাবু। প্রশস্ত ঘর,—এই প্রকার একটী মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের জন্য এবম্বিধ ঘরই বিশেষ উপযোগী।

উমেশ। করুন্ করুন শীগ্‌গীর সেরে ফেলুন। লগ্ন কাল তো প্রায় হয়ে এলো [সবিতা অশেষ বেদনায় মুখ ঢাকিল]

পুরোহিত। গণেশ ভট্‌চাযের এসব কর্ম্মে গৌণ হয় না। [বেহারাকে] আন্ আন্ বেটা কোষাকুষি বাসন-কোসন গুলি রাখ্ এখানে। পিঁড়ি নেই বুঝি উমেশবাবু?

উমেশ। পিঁড়িতো এখানে একটাও নেই পুরুত মশাই। কার্পেটের আসন পেতে দিলে চল্‌বে না?

পুরুত। খুব চল্‌বে, খুব চল্‌বে। শাস্ত্রে অনেকবিধ ব্যবস্থার কথা আছে। যেইখানে একটী প্রযোজ্য নহে সেখানে অপর একটী প্রযোজ্য।

[দ্রুত ব্যবস্থা হইতে লাগিল। দুটী আসন পাতা হইল কোষাকুষি, আজস্র ধুপ, চন্দন। দ্রুত হস্তে পুরোহিতমশাই কাজ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। উমেশ বাহির হইয়া গেল।]

বেহারা জিনিষ আনিতে একবার বাহিরে গেল একবার ভিতরে আসিল। দু একবার অপাঙ্গে সেদিকে চাহিয়া সবিতা আবার মুখ গুঁজিল।]

পুরুত। [বেহারাকে] ব্যাটা তামাক খাওয়া। অর্দ্ধ-ঘণ্টাধিককাল ধূম্রপান না ক'রে কোনো সদ্‌ব্রাহ্মণের চলেনা, ছোটলোকের ব্যাটা সেটাও আবার তোকে শিক্ষা দিতে হবে নাকি। অজ্ঞানতার অন্ধকার অমাবস্যা-সম অন্ধকার!

বেহারা। বামুনের হুঁকো তো নেই ঠাকুর মশায়, হামাদের হুঁকোতে তো আপনি পিবেন না তবে কি শুধু কল্কে—

পুরুত। [চটিয়া] আমি কি গেঁজা টান্‌ব যে শুধু কল্কেতে টান্‌ব। জল বদ্‌লে তোদের হুকোতে নিয়ে আয় ব্যাটা, তাতে' দোষ নেই। না হয় দুটো-ফুল বেল-পাতা ফেলে, দুটো মন্ত্র উচ্চারণ করে' শুদ্ধ করে নেওয়া যাবে [বেহারার প্রস্থান]

[সহসা সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ চুপ। পুরুত তাহার দিকে হাতের কাজ ফেলিয়া তাকাইয়া রহিল।]

সবিতা। [সহসা] আচ্ছা, পুরুত মশায় আমার অনিচ্ছা সত্বে জোর ক'রে যদি আমার বিয়ে হয় তবে সে কি শুদ্ধ হ'তে পারে?

পুরুত। তা পারে বৈকি! তবে সে কিছু ব্যয়সাপেক্ষ। শাস্ত্রে আছে, বর যদি পুরোহিতকে তিন স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে তবে অনিচ্ছুক পাত্রীর সাথে বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

সবিতা। [কাতর হইয়া বসিয়া পড়িয়া] কী ভণ্ড! কী ভণ্ড!

পুরুত। [কৃপা-ভরা সুরে] দু-পাতা ম্লেচ্ছ ভাষা শিখে শাস্ত্রে যাদের ভক্তি নাই তাদের আর কি বল্‌ব! [illegible] গণেশ ভট্টাচার্য্যের—

[সহসা শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। এবং সাথে সাথে একটা [illegible] দরজা উন্মুক্ত হইয়া গেল। সেই খোলা দরজা দিয়া [illegible] উমেশ আর তাহারই পিছনে চন্দন চর্চ্চিত [illegible] মুকুট পরিয়া, অরিজিৎ। তার পরণে গরদের [illegible] গায়ে শুধু একটা গরদের চাদর। পুরুত সত্বর হইয়া উঠিল। অরিজিৎ উমেশের হাতে মুকুটটা দিয়া আগাইয়া আসিল।]

অরিজিৎ। একী, রানু, সাজ-পোষাক তোমার কিছুই হয়নি দেখ্‌তে পাচ্চি। কিন্তু সকল দিনের মধ্যে বিয়ের দিনই বেশ-ভূষায় এতটা অবহেলা করবে সেটা ও তো ভাল দেখায় না। যাও, যাও, ঐ ঘরে গিয়ে শীগ্‌গীর একটা শাড়ি বদ্‌লে এসো লক্ষ্মীটি। [সবিতা কোন কথা বলিল না] কোন্‌ রঙটা পছন্দ তোমার? সেই রঙের শাড়ি কি এর মধ্যে একটাও পেলে না? [সবিতা নিরুত্তর] তবে আমার পছন্দ-রঙের শাড়িই একটা পর আজ, রাণু। নীল রঙের।

সবিতা। আমার নিজের শাড়ি ছাড়া আমি পরি নে।

অরিজিৎ। [একটু পরিহাস-তরল কণ্ঠে] দেখো, তোমার নিজের শাড়ি আনিয়ে নেবার এখন আর সময় হবেনা। তার চেয়ে আমার সাথে তোমার ভাবী সম্বন্ধের কথা স্মরণ করে নিজের ভেবে এই শাড়িগুলোরই একটা পরে নাও। আর আধঘণ্টার তো ব্যবধান, রাণু, তারপর তোমার আর আমার সব এক হ'য়ে যাবে।

সবিতা। [আর্ত্ত ভাবে] এ জীবনে তা হবেনা।

অরিজিৎ। [দৃঢ় ভাবে] এ জীবনে হবেনা? কি যে বলো তার ঠিক নেই। বেশীক্ষণ নয় আর এক ঘণ্টার ভিতরই হয়ে যাবে। তারপর সেটা জন্মজন্মান্তরের,— শাস্ত্রকারেরা তো তাই বলে। [পুরুতকে] কি বলেন পুরুত মশাই?

পুরুত। তা অতীব সত্য কথা।

অরিজিৎ। [সবিতাকে] কোথায় ওঠো। আর দেরী করোনা। লগ্নকাল প্রায় এসে পড়েছে এরপরে শুধু-শুধু বিলম্ব করে আর লাভ নেই। শুভ কাজ শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সেরে ফেলতে হয়, জানো তো?

সবিতা। শুভ কাজ! শুভ কাজ! [দৃঢ় কণ্ঠে] মরে গেলেও তোমার দেওয়া শাড়ি আমি পরবনা।

অরিজিৎ। [কঠিন ভাবে] পরবেনা? তা নাই পরলে। ভবিষ্যতে একদিন বেনারসী শাড়ি পরা তোমাকে দেখতে পাবো সেই সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে আজ না হয়

আটপৌরে শাড়িতেই তোমাকে গ্রহণ করলুম। আর তাছাড়া শাড়িটাই তো আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য সবিতা তুমি। আর সাধারণ শাড়ি পরলে রূপ যে তোমার কমে যাবে এ অপবাদ তোমায় মহা শত্তুরেও দিতে পারেনা।

সবিতা। [ভাঙা গলায়] আমি মরে গেলেও তোমায় বিয়ে করবনা।

অরিজিৎ। [মৃদুস্বরে দেখো] রাণু, এতসব লোকের মধ্যে আর ঢলাঢলি ক'রোনা। তোমার ওসব ফাঁকা কথার কোনো সার্থকতা নেই। তুমি মরে গেলেও বিয়ে না করতে পার কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে, এক্ষুনি, বিয়ে করব। আর তোমাকেই বিয়ে করব। [পুরুতকে] পুরুত মশায়, আপনার সব ঠিক আছে তো।

পুরুত। সম্পূর্ণ প্রস্তুত। গণেশ ভট্চাযের কোন ব্যবস্থারই ত্রুটী—

অরিজিৎ। [বাধা দিয়া] তবে আসুন। আর দেরী ক'রে কোনো লাভ নেই [উমেশের হাত হইতে মুকুট লইয়া মাথায় পরিয়া একটা আসনে গিয়া বসিয়া পড়িল। পুরুত মশায় দাঁড়াইয়া সবিতার অপেক্ষা করিতেছিল।]

অরিজিৎ। [সবিতাকে] চলে এসো রাণু, শুভলগ্ন বয়ে গেলে বিয়ে হওয়া কোনো কাজের কথা নয়। [সবিতাকে নিরুত্তর নিশ্চল দেখিয়া কঠিন স্বরে] এসো বলচি, অমন ক'রে বসে থেকে কোনো সুবিধে হবেনা। [নিশ্চল সবিতাকে আহ্বান করিয়া] এসো, এসো,—

পুরুত। [সবিতাকে] আঃ বাবু ডাকচেন তবু শুনতে পাচ্ছনা—[হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে যাইতেই]

অরিজিৎ। [গর্জ্জন করিয়া] খপরদার পুরুত ঠাকুর। [পুরুত সভয়ে পিছাইয়া গেল। ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া] একজন ভদ্রমহিলার হাত বামুন হয়ে তুমি টানতে গেলে আমি তো বিস্ময়ে একবারে অবাক হয়ে গিয়েছি। ভবিষ্যতে এতটুকু ভদ্রতার যদি তোমার অভাব হয় সেটা মঙ্গলের হবেনা এই কথা যেন মনে থাকে। [উঠিয়া সবিতার দিকে আগাইয়া গিয়া] চলো রাণু. [পুরুত নিজের আসনে গিয়া বসিল]

সবিতা। [কান্নার সুরে] আমি যাবোনা, কিছুতেই যাবোনা।

অরিজিৎ। তোমার উপর অযথা আচরণ করতেআমাে বাধ্য করোনা। তোমাকে হাত ধরে টানবার অধিকার আ কাউকে না দিতে পারি কিন্তু সে অধিকার আমার নিজে আছে সেটা ভুলোনা। [উমেশকে] উমেশ সবিতার মুকু ওকে দাও [উমেশ সেটা আনিয়া সবিতার পাশে রাখি দিল। সবিতা সেটাকে ছুঁলেওনা। অরিজিৎ ফিরি গিয়া আসনে বসিল। তারপর সবিতাকে আহ্বান করিয়া এসো এসো। সবিতা তুমি সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছো এইবার শেষবারের জন্য ডাক্‌চি—এসো এসো—

[সবিতা মড়ার মত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপ টলিতে টলিতে আসনের সম্মুখে আসিয়া বসিতে বসিতে]

সবিতা। [একান্ত আর্ত্ত চীৎকারে] মাগো, মাগে আমার সর্ব্বনাশ হ'লো গো!

[এই করুণ চীৎকার অরিজিতের বুকের ভিতে একেবারে বহ্নির শলা হইয়া গিয়া প্রবেশ করিল। এ নিমেষে তাহার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত অন্তর্হিত হইয়া গেল বেদনা-বিদগ্ধকণ্ঠে সেও করুণ ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল]

অরিজিৎ। [বেদনা-বিদীর্ণকণ্ঠে] তোমার,—তোমা সর্ব্বনাশ হ'লো সবিতা? তাতো আমি চাইনি, তাতো আ চাইনি। [চক্ষের পলকে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষ মাথা হইতে মুকুটটা খুলিয়া লইয়া মেঝেতে প্রাণপণ জো ছুঁড়িয়া ফেলিল।] সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ শুধু আমার হোক।

পুরুত। [হৈ চৈ করিয়া] আহা হা করেন কি কে কি। এতে যে শুভকর্ম্মের অমঙ্গল সাধিত হয়।

অরিজিৎ। [আর্ত্তস্বরে] শুভকর্ম্ম! শুভকর্ম্ম! গঙ্গা জলে ভাসিয়ে দাও [অধীর অশান্ত হইয়া উঠিল।] উমে উমেশ দূর করো সব আমার পরাজয়ের চিহ্নগুলি, পারো আমার স্মৃতিরও বাইরে ফেলে দিয়ে এসো। [পা দি পুষ্প চন্দন, কোষাকুষি এবং অনুষ্ঠানের অন্যান্য দ্রব্য সম্ভা বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিল। তারপর পুরুতের দিকে চাহি পাগলের মত ভাবে] তুমি, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রইলে যাও এই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখ থেকে [illegible] যা [উদভ্রান্তের মত চুলগুলি টানিতে লাগিল।] [সবিত

বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া সেইখানেই স্থাণুর মত য়া রহিল]

পুরুত। [প্রস্থানোদ্যত] কিন্তু দক্ষিণাটা আমার প্রাপ্য—

উমেশ। আচ্ছা আচ্ছা সে হবে। আপনি এখন য়ে যান্

[পুরুতের প্রস্থান।]

অরিজিৎ। [হতাশ ভাবে] উমেশ, হেরে গেছি, হেরে ছি ভাই। সম্রাট পথের কাঙাল হয়ে গেল, তার নষ্ট রাজ্য উদ্ধারের কোনো আশা নেই, তার আর কোনো তিকারই রইলনা। আশা যা ছিল তাও গেল,—এবার— হসা থামিয়া একবার সবিতার দিকে চাহিয়া] হ্যাঁ মেশ, শীগ্গির যাওতো, সবিতাদের বাড়িতে একটা কোন্ রে দাও যে সে এখানে আছে।

উমেশ। কিন্তু—

অরিজিৎ। এতে আর কিন্তু ক'রো না। তারা এর তরই যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হয়েছে,—তাদের আর কষ্ট দিয়ে নো লাভ নেই। বলে দাও এখানকার এই বাগান বাড়ি কে আমি অরিজিৎ সবিতার সংবাদ দিলুম। ধরা পড়্বার য় তোমাদের কিছুমাত্র করতে হবে না। খবরটা পাঠিয়ে র তোমরা দেরী ক'রোনা।

উমেশ। আর তুমি অরুদা?

অরিজিৎ। [করুণ ভাবে] আমি? আমি? আমি মেশ? প্রকাণ্ড লাভের আশায় প্রকাণ্ড দুঃসাহসের কাজ রেছিলুম, তার ক্ষতির দায় এখন আর আমার এড়ান বে না। তোমরা যাও উমেশ, আমার হারের ভাগ মার মাথা পেতে নিতে দাও। যাও, যাও ভাই, আর রী ক'রো না। [একটু ইতস্ততঃ করিয়া উমেশ প্রস্থান রিল। সবিতা তেমনি নির্ব্বাক মুখে আসনে বসিয়া। শুধু রিজিৎ পাগলের মত ঘরের একপ্রান্ত হ'তে অন্যপ্রান্ত র্যন্ত টলিতে টলিতে বেড়াইতে লাগিল]

[একবার থামিয়া সবিতার কাছে আসিয়া]

অরিজিৎ। অনেকবার ঠকেও শিখ্তে পারিনি, যে মানুষের বাইরেটাকেই পাওয়া যায়, ভিতরটাকে না। অন্তরের যে দেবতা অলক্ষ্যে বসে থাকেন মানুষের কোনো জোরই তার উপর খাটে না সেটা যে একেবারে জানতুম না তাও তো নয়, তবে মানুষ এমনি যে লোভের বশে সেই জানা কথাটা ভুল ক'রে অসম্ভবের আশায় মেতে ওঠে। আমিও মেতে উঠেছিলাম। জোর ক'রে যখন পেতে গেলুম, দেখ্তে পেলাম, ঠকে গেছি, একদম ঠকে গেছি। আমার পরাজয় হ'লো সবিতা?

[রাণু নিস্তব্ধ; তেমনি করিয়া বসিয়া রহিল। অরিজিৎ আবার তেমনি শান্ত ভাবে পায়চারি করিতে লাগিল। একটু পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া]

অরিজিৎ। তা ছাড়া হয়ত একটু ক্ষীণ আশা ছিল, যত মন্দই আমি হ'য়ে গিয়ে থাকি তোমার বুকের এক কোণে হয়ত একটু স্নেহ আমার জন্য এখনো সঞ্চিত আছে। কৈশোরে তোমার স্নেহ দিয়ে আমার চিত্ত তুমি সুধায় ভ'রে দিয়েছিলে, ভেবেছিলাম হয়ত তার ধ্বংসাবশেষ এখনো তোমার মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি। জীবনে যা কিছু করেচি সবই ভুল করেচি,—এবারও ভুল করলাম।

[নিঃশব্দ নতমুখী সবিতার কাছ ছাড়িয়া আবার সে চলিয়া গেল। জান্লা দিয়া একবার বাহিরে তাকাইল। তারপর আবার সবিতার কাছে ফিরিয়া আসিল।]

অরিজিৎ। সবিতা, আমার জীবনের শনিগ্রহকে আমি উপেক্ষা করতে গিয়েছিলাম তার শোধ সে এম্নি ক'রে নিল যে তার চেয়ে বেশী আর কিছুই হ'তে পারত না। স্নেহ-তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে গিয়েচে একবিন্দু তবু কোথাও পাইনি। মরুভূমির মত যেখানে হাত বাড়িয়েছি সমস্ত রস শুকিয়ে বালু হয়ে গেছে [একটু থামিয়া ক্ষমা চাওয়ার সুরে] সবিতা, তোমার উপর যে কতটা অন্যায় আমি করেচি তার হিসেব নিকেশ নেই। কিন্তু [গভীর সুরে] কিন্তু যদি পারো এই হতভাগাকে মনে মনে ক্ষমা ক'রো। [একবার থামিয়া] তোমার জীবন-নাট্যর নায়ক হ'তে চেয়েছিলুম, হ'তে পারলুমনা চিরদিনের জন্য দুষ্মন্ সেজে রইলুম। [ধীরে ধীরে হাঁটিয়া জানালার পাশে চলিয়া গেল। ক্ষণকাল বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া অদম্য কান্না কোন রকমে রোধ করিতে চেষ্টা করিল।

সবিতা বিহ্বলের মত সেদিকে তাকাইয়া রহিল। তার যেন জ্ঞান নাই। এমন সময় বাহিরে অনেক লোকের পদধ্বনি শোনা গেল।

পরক্ষণে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নীরোদ, মনোহর, অবিনাশ, হেমন্ত ও সুন্দরলাল প্রবেশ করিল।

অরিজিৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ নত করিল। সবিতা ছুটীয়া গিয়া পিতার বুকে মুখ লুকাইল।]

মনোহর। [চীৎকার করিয়া] পাষণ্ড! মদ্যপ! নরাধম! তোমাকে যদি আমি ফাঁসিতে না ঝুলাই তবে মিছাই এতদিন জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবী করে এসেচি। মনোহর মিত্তিরকে চেনো না,—ঘুঘু দেখেচ তো [আগাইয়া আসিয়া অরিজিতের ঘাড় ধরিতেই অরিজিৎ সজোরে ধাক্কা দিয়া দিল। পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া উঠিয়া সুন্দরলাল প্রভৃতির প্রতি]

মনোহর। তোরা কি হাঁ করে দেখ্‌চিস্ হারামজাদারা,—বাঁধ, বাঁধ না পাষণ্ডের হাতে পায়ে [অবিনাশ প্রভৃতি অগ্রসর হইল]

সবিতা। [সহসা স্পষ্ট ও আজ্ঞা দেওয়ার কণ্ঠে] দাঁড়ান্।

[সকলে থমকিয়া দাঁড়াইল। অরিজিৎও স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল]

সবিতা। [নীরোদবাবুকে] বাবা?

নীরোদ। কি মা?

সবিতা। তুমি তো কোনোদিন আমার কোনো সাধ অপূর্ণ রাখোনি বাবা! আজ একটা সাধ আমার পূর্ণ করবে বলো।

নীরোদ। বলো মা বলো কি সাধ তোমার। বুড়োর সাধ্য থাকে তবে সে সাধ তোমার অপূর্ণ থাকবে না মা

সবিতা। তবে, তবে ঐ অরুদার সাথে আমার বিয়ে দাও।

[ঘরে বজ্র পড়িলে লোকে যেমন স্তব্ধ হয় ক্ষণকাল সবাই তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিল।] [নীরোদবাবু সবিতার মাথায় ডানহাতখানা রাখিলেন]

অরিজিৎ। [অশ্রু-বিকৃতগলায়] সবিতা! [কান্নায় ভাঙিয়া তাড়াতাড়ি নিজের হাতে সে মুখ গুঁজিল।]

যবনিকা

সুবোধ বসু
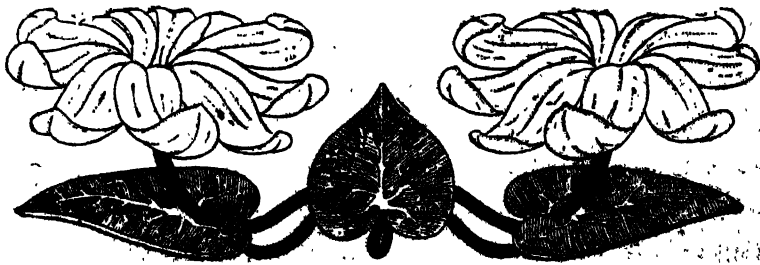
প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅপ্রকাশ রায়

The art itself is nature—Shakespeare.

প্রকৃতির সেবানিপুণ হাত চিরদিনই কবিদের অন্তরে মঙ্গল পরশ বুলিয়ে দিয়েচে। কবি যখন প্রাণধারণের নানারকম গ্লানিতে আর 'leaden-eyed despairs'এ ব্যথিয়ে উঠেচেন, তখনই প্রকৃতি বেদনাহর আস্তরণটির তিরস্করিণী তাঁর হৃদয়ের উপর মেলে ধরেচে। জ্যোছনার উচ্ছল তরঙ্গ তাঁর মনে মদির আবেশ আনে, দিগঙ্গনাদের নৃত্য তাঁর শিরা উপশিরায় অনুরণন জাগিয়ে তোলে। নক্ষত্রের পাথার স্পন্দনে, আলোর ক্রন্দনে অন্ধকার চমকে ওঠে; আকাশের ভালে কে অলিম্পন এঁকে দেয় আর সোনার ভ্রমর অরুণ-পক্ষ প্রসারণ ক'রে বুকে এসে পড়ে—এসব কবির ভুলের শূন্যতায় সুর ভ'রে দেয়, তাঁর নিঃশ্বাসবায়ু সুমধুর ক'রে তোলে। কোন না কোন সৌন্দর্য্য তাঁ'র মনের গ্লানিমা সর্ব্বদাই মুছে নিয়ে শান্তিসিক্ত করে।

'Some shape of beauty moves away the pall
From our dark spirits' (Keats)

জীবনের অবসাদ, বিপদের রথের চাকায় আত্মার নিষ্পেষণ—সবই ত' জলন্ত সত্য। তবু কবিতায় pessimism এর স্থান খুব কম। প্রাচুর্য্যে আর্টের জন্ম—আর প্রাচুর্য্যের ভেতর দুঃখবাদ থাকতে পারে না। কবিতায় আমরা দেখি আশার দক্ষিণাবাতাস আকাঙ্ক্ষার জয়যাত্রা, প্রীতির হিল্লোলিত সুষমা। কিন্তু দুঃখবাদী পৃথিবীর বস্তুবাহুল্যের ভেতর ফাঁক দেখেন—সে ফাঁক হাহুতাশ দিয়ে ভরা বাসনা—সে ফাঁক নিরেট করতে হ'লে চাই আনন্দ। কেননা, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' যে cosmic unityর বৃন্তে এ বিশ্ব বিধৃত রয়েছে, দুঃখবাদী তার সন্ধান পাননা। তিনি এ জগতের খুঁজে পাননা আর হার্ম্মোনি না হ'লে কবিতায় কাণাকড়িও মূল্য নেই। জগতে আনন্দের বান ডেকেচে—এ কথাটা রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্বানন্দের মুখ দিয়ে ব'লেচেন, 'আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ ক'রচে। বড় সহজে ক'র্‌চেনা, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে করচে। সেই জন্যেই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ ঐশ্বর্য্যে ভ'রে উঠেচে, বেতসিনীর নির্ম্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই জন্যেই এত ঐশ্বর্য্য।' চাঁদ সমস্তটুকু মধু পৃথিবীর উপর ঢেলে দিচ্চে—

"ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা,
কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা।"

রাত্রি তার ঘনকৃষ্ণ যবনিকার ঐশ্বর্য্য উন্মুক্ত ক'রে দিচ্চে—এ কী pessimismএর? পৃথিবীর এ ছন্দের শিহর কি আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে শান্তি এনে দেয়না? রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ সুখবাদী। তাঁর মতে pessimism মনের বিকারেরই পরিণতি।* তিনি জীবনের দুঃখকে আনন্দের অবতরণিকার সোপান হিসেবেই বরণ ক'রে নিয়েচেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সুখবাদকে ছাপিয়ে আসচে তিন্তাজিলের মরণে Igraine এর ব্যথাহত চীৎকার, দৃষ্টিহীনদের (The Sightless—Maeterlinck) অরুন্তুদ আর্ত্তনাদ "we want to know where we are." কবির সুখবাদ তবুও বিচলিত হয়নি। তিনি বলেন, যে ফুল না ফুটেই ঝ'রে প'ড়েচে, যে নদী মরুপথে পথ খুঁজতে খুঁজতে একদিন নিঃসাড় হ'য়ে গেচে তা' কিছুই মিথ্যে হয়নি। মানুষের অনাগত আর অনাহত অসীমের বীণাতারে বাজচে। অগীত গান, অফোটা

* Pessimism is the result of building theories when mind is suffering. Nationalism: Tagore.

১

ভাষা, কিছুই হারায়নি—'পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পারে।'

রবীন্দ্রনাথের মন সুখবাদের আওতায় পরিপুষ্ট হ'য়েচে ব'লে কোনোরকম দ্বন্দ্বের গ্লানি তাঁর কবিতার উপর রেখাপাত করতে পারে নি। 'সর্ব্বানুভূতি'র সুরে তাঁর মন পরিপূর্ণ হ'য়ে র'য়েচে

"জগৎ জুড়ে উদার-সুরে
আনন্দ-গান বাজে
সে গান কবে গভীর-রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে?
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয় সভা জুড়িয়া তা'রা
বসিবে নানা সাজে।"

এ ধরার প্রতিটি অণুপরমাণুর স্পন্দন গানের সঙ্গে তাঁর বুকের রক্ত নাচ্‌চে। তিনি ব'লেচেন, "My pride is from the life-throb of ages dancing in my blood at the present moment" (Sadhana) এই যে 'বিশ্বাত্ম চেতনা' তা রবীন্দ্র কাব্য-জিজ্ঞাসায় একটা বড়ো কথা। বাস্তবিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিল্পিপ্রাণ একাত্ম না হ'লে কোন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ঘট্‌তে পারে না। আত্মবিস্মৃতি থেকেই শিল্পীর ভাবাবেশ ঘটে এবং শিল্পী অন্যান্য বস্তু থেকে আপনাকে সরিয়ে এনে নিজের চেতনাকে বিষয় বস্তুর মধ্যে সংহত করেন। সে জিনিষটার সৌন্দর্য্য তিনি উদ্‌ঘাটন ক'র্‌বেন, তাকে তিনি বলেন

'Be thou spirit fierce,
My spirit, be thou me, impetous one.'
(Shelley)

যখন আত্মার বিস্মৃতি ঘটে এবং আত্মার সঙ্গে অন্যেতর বস্তুর যোগসম্মিলন সুষ্ঠু হয়, যখন অন্তর্জীবন বহির্জীবনের সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই আর্টের জন্ম। প্রকৃতির বহুধা অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে শতপাকে বেড়েচে—তাঁর আত্মা সেই অভিব্যক্তির সঙ্গে মিশে গেচে আর সেই আত্মবিস্মৃতির আনন্দ থেকেই তিনি সৃষ্টি ক'রেচেন। সব কিছুই তাঁর চারদিকে মায়াজাল বুনে রেখেচে—সকলের হাতছানি তাঁর চোখে এসে লাগচে।

"বিশাল বিশ্বে চারিদিক হ'তে,
প্রতিকণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে।"

কবিদের এই বিশ্বৈকাত্মানুভূতি 'হংসমালা শরদিব গঙ্গাম্‌' আপনিই এসে পড়ে। এই ভাববিহ্বলতা intellect-গ্রাহ্য নয়, intuition বেদ্য। রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন হংসবলাকার মতন 'রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া' জানা হ'তে অজানায় পাড়ি দিচ্চেন, অন্যদিকে তেম্‌নি শরতের লঘু মেঘভার, প্রভাতের জ্যোতিষ্কন্মেষ, বসন্তের পুষ্পপর্য্যাপ্তি কবি তাঁর মনে চিরন্তন বাণী ব'য়ে আনুচে।

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।"

বার্গসঁর গতির ফিলজফির সঙ্গে কালিদাস-বার্ডস্বার্থের রূপব্যঞ্জনার এই যে সুসমঞ্জস পার্ব্বতী-পরমেশ্বরীয় মিলন—এ রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়। তিনি গ্যেটের বচন 'eternal urge and unceasing exertion' (ewig strebend sich bemühen) যেমন নিজের জীবনে সত্যি ক'রে তুলেচেন কর্ম্মের কড়া মদে মত্ত হ'য়ে প'ড়েচেন, তেম্নি আবার তিনি সেই ভাবে আত্মহারা, যে ভাব নিয়ে কালিদাস ব'লে উঠেছিলেন,

"কার্য্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্‌॥"

বাতাস-আলোছায়ার খেলায় মেতে ওঠে, নূপুর[illegible]ধ্বনি চরণা, প্রিয়, বধূদের [illegible] খোলা দেয়, কবি এদে

সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে দিতে চান—রোমান্টিসিজ্‌ম্ পরিপূর্ণ প্রাণের ছোঁয়া লেগে মূর্ত্ত হ'য়ে দাঁড়ায়।

"নীলিমা এই নিলীন হ'লো
আমার চেতনায়।
সোণার আভা জড়িয়ে গেলো
মনের কাননায়।"

*   *   *

কবিতা ব্রাউনিংয়ের ভাষায় effluence। এই কথার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে বটে, কিন্তু সত্যিকারের কবিতা ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। আমাদের মন যখন কোন ভাবের বন্যায় চেতিয়ে উঠে, তখন ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় *—আর ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রকাশেই আর্টের জন্ম। কবিতা ইমোশনের plethora নয়, কল্পনার transfiguration নয় অথবা কেবল জীবনের সমালোচনাও নয়—কবিতা personalityর চরম ব্যঞ্জন। মনের বিচিত্র অনুভাবনা ব্যক্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে অনুরঞ্জিত হ'য়ে শিল্পের আবির্ভাব ঘটায়। কবি তাঁর ব্যক্তিত্বের angle of visionএ পৃথিবীকে দেখেন, তাই whitman যে ব'লেছিলেন, 'who touches this, touches a man' তা' সকল কবি সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর খাটে। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে ব'লেছিলেন, "ন বা ,আর পুত্রস্য কামায় পুত্র: প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি ; ন বা আর বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।" পিতা পুত্রকে পুত্রের জন্যে ভালোবাসেন না, নিজের জন্যেই পুত্রকে ভালোবাসেন। শিল্পীর সৃষ্টিতেও সেই রকম শিল্পিপ্রাণের স্পর্শ সজীব হ'য়ে উঠে—কবি যেন তাঁর কবিতায় কবিতর হ'য়ে উঠেন। রবীন্দ্র সৃষ্টি সম্বন্ধেও তাই বল্‌তে পারি যে, সে সৃষ্টিতে রবীন্দ্রসত্বা প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেচে—তাঁর প্রাণের [illegible] ছন্দ কবিতায় পরতে পরতে অনুধ্বনন তুল্‌চে। তাঁর [illegible] যত আকুতি, তাঁর তুরীয় দৃষ্টিতে যতো কল্পনা [illegible]—তারি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি কবিতায়।

সৌন্দর্য্য 'শরচ্চন্দ্র মরীচিকোমল।' সকলের ভেতরেই সৌন্দর্য্য চেতনা কিছু না কিছু পরিমাণে আছে। কবি তাঁর কাব্যের সোণার কাঠি ছুঁইয়ে মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য্যদেবতাকে জাগিয়ে দেন। ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে তাঁর philosophy of spiritএ মানুষের valueকে চার ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন। চারটের একটা হ'চ্চে intuitive অথবা aesthetic value অর্থাৎ যা' সুন্দর। সুন্দর তাই যা' আমাদের ব্যবহারিক জগতের বহিঃপ্রদেশস্থ অথচ যা' আমাদের মনোজগতের নিকটতম। (The only beautiful things are the things that do not concern us—Oscar Wildie) মানুষের এই aesthetic value আমাদের দৈনন্দিন কোনো আবশ্যকে আসে না সত্য কিন্তু তবুও এটা প্রয়োজনের বাড়া কেননা এটা মনের সৌন্দর্য্য ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করে রসের জোগান দিয়ে। ম্যাথু আর্ণল্ড শেলীকে ব'লেচেন 'ineffectual'। মানুষের aesthetic value ও ineffectual. রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রীতিকে প্রয়োজনের লাগাম কষে' ধ'রে রাখ্‌তে হয় না আর সেই জন্যেই স্বাধীনতার আনন্দে তা' রসনিগূঢ়। প্রকৃতি প্রেমকে ঘিরে যে ভাবরসের পরিমণ্ডল তা' যেমনি নিরর্থক তেমনি সৌন্দর্য্যে ভরপুর। জগৎ ব্যাপে যে আনন্দের স্রোত তার সঙ্গে কবির প্রাণের স্রোতোধারার নিবিড় যোগ।

"জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দ-গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে ?
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো
হৃদয় সভা জুড়িয়া তা'রা
বসিবে নানা সাজে।"

গোটে বলেছেন,

'The ever womanly
Draws us above' (Chorus Mysticus)
(Das Ewig—weibliche
Teicht uns hinan),

* When our heart is fully awakened in love or in other
ns, our personality is in its flood-tide—Personality :

প্রেম মানুষকে উচুতে নিয়ে যায়—মানুষের ললাটে মহিমার রাজটীকা পরিয়ে দেয়—নন্দন সৌরভে মানুষের ক্লেদগ্লানি মুছে নেয়। বিয়েত্রাইচের প্রেমে দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়া, লরার প্রেমে পেত্রার্কের সনেটের নির্ঝর—রাধিকার প্রেমে ললিতকোমলকান্ত পদাবলীর সৃষ্টি—আর প্রকৃতিপ্রেম রবীন্দ্রনাথকে মহত্তর সৌন্দর্য্যের সন্ধান দিয়েচে। অমুত্র যে আভা, তাই দিয়ে তিনি তাঁর রচনাকে মণ্ডিত ক'রেচেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ভাবাত্মক যোগটা স্বভাবতঃ প্রকট। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কাব্যগত পরিবেষ্টন থেকে বাইরে আন্‌লে তা' ঠিক সুন্দর ও শ্রীসম্পন্ন হয় না। তিনি আপনাকে আকাশের নীলিমা, অরণ্যের ছায়ার সঙ্গে ব্যাপ্ত ও বিকশিত ক'রেচেন। এ বিশ্বের সবি তাঁর প্রাণের সঙ্গে একসুরে বাঁধা।

"ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই ;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো ; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে, পুলকে
প্রবাহিয়া, চ'লে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যপর্য্যাপ্তির ভেতর আপনাকে হারিয়ে ফেলেও উৎসমুখকে বিস্মৃত হ'ন্‌নি। কীট্‌সের sensousnessকে তিনি অসীমের রসাভাসে মণ্ডিত ক'রেচেন। এই হিসেবে তাঁকে কালিদাসের চেয়ে ব্রাউনিংএরি সগোত্র বলা যেতে পারে। তবে রবীন্দ্রনাথ ব্রাউনিংএর মতন কেবল ভাবকেই স্বয়ং সর্ব্বস্ব ক'রে নেননি—আবার তাঁর সৃষ্টি রূপ-সর্ব্বস্বও নয়। রবীন্দ্রনাথে ভাব হ'তে রূপে আর রূপ হ'তে ভাবে অবিরাম আবর্ত্তন বিবর্ত্তন। কালিদাস মেঘদূতে ব'লেচেন 'কামার্ত্তা হি প্রকৃতি কৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।' ভাববিহ্বলরাও যে চেতনাচেতনে প্রকৃতিকৃপণ তা' তিনি দেখিয়েচেন শকুন্তলায়। শকুন্তলার মন জীব-জড় সকলকেই স্নেহের গ্রন্থিতে বেঁধে রেখেচে। সে তপোবন-তরুদের মঙ্গলামঙ্গল আপনার উপর গ্রহণ ক'রেচে। বহিঃপ্রকৃতি শকুন্তলার অন্তর-রসের পাত্র 'with deaded bubbles winking at the brim' ক'রে রেখেচে। আশ্রমবিশ্লিষ্টা শকুন্তলা আধখানা শকুন্তলা। কিন্তু কালিদাসের কল্পনা বিশ্বাত্মচেতনাতীত জগতে উপনীত হয়নি। মেঘদূতে আমরা আলেখ্যর পর আলেখ্য চ'লে যেতে দেখ্‌চি। ভ্রূ-বিলাসানভিজ্ঞা জনপদবধূরা তাদের কৃষ্ণপক্ষ ধূমজ্যোতি-সলিলমারুতের সন্নিপাত মেঘের দিকে উৎক্ষিপ্ত ক'র্‌চে; পুষ্পলাবীদের কর্ণোৎপল ঘন ঘন ঘর্ম্মপীড়িত ; উজ্জয়িনীর অভিসারিনীর দল কনকনিকষস্নিগ্ধ বিদ্যুদালোকে পথ চিনে নিচ্চে ; গঙ্গা গৌরীবক্ত্রভ্রূকুটিরচনাকে উপেক্ষা ক'রে যেন পরিহাসচ্ছলে চন্দ্রশেখরের জটাজাল নিয়ে খেলা ক'র্‌চেন। আবার কুমারসম্ভবে দেখি ভ্রমর প্রিয়ার পীতাবশিষ্ট মধু পান ক'র্‌চে, রথাঙ্গনামা অর্দ্ধভুক্ত মৃণাল জায়াকে খেতে দিচ্চে। কালিদাসের এই রূপপ্রাধান্য ভাবপ্রাধান্যকে ছাপিয়ে উঠেচে। ভারতীয় আর্ট সব সময়েই রূপের ভেতর দিয়ে ভাবের উত্তুঙ্গ শৈলে আরোহণ করে।* রবীন্দ্রনাথ sensousnessকে super sensousness এর আলোকপাতে প্রোজ্জ্বল ক'রে তুলেচেন, transcendental-এর ছায়া তাঁর প্রকৃতি বর্ণনাতেও এসে পড়েচে। ইন্দ্রিয়ের ভেতর নিরিন্দ্রিয়ের ভাবন রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। তা'র মধ্যে ক্লাসিসিজ্‌ম্‌ আর রোমান্টিসিজ্‌ম্‌, ফাউষ্ট আর হেলেনা, প্রমিথিয়ুস আর এশিয়া বাগর্থের মতো সমৃক্ত হ'য়ে বিরাজ ক'র্‌চে।

"চারিদিকে সুধাভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা

* Indian art is not concerned with the conscious striving after beauty as a thing worthy to be sought after for its own sake ; its main endeavour is always directed towards the realisation of an idea, reaching through the finite to the infinite, convinced always that through the constant effort to express the spiritual origin of earthly beauty, the human mind will take in more and more of the perfect beauty of divinity.

—Havell : Ideals of Indian Art,

কাঁদায় রে অনুরাগে
দেখা নাই পাই
ব্যথা পাই
সেও মনে ভালো লাগে।"

রূপ চিত্রিত ক'রতে গিয়ে তিনি আধ্যাত্মিকতার ভাবচত্বরে এসে প'ড়েচেন। এখানেও তাঁর তীক্ষ্ণ মিষ্টিক অনুভূতি প্রকাশ পাচ্চে। "O to drink the mystic delivia deeper than any other man." (whitman). তিনি সব কিছুই দেখেচেন subjective ভাবে objective ভাবে নয়। তাই শব্দ রূপরসগন্ধ সবি তাঁর কাছে স্বর্গীয় ছন্দে নর্ত্তন ক'রে ওঠে। পল্লবমর্ম্মরে, চূতমুকুলের রাজ্যে অরাজকতায়, 'mute insensate things' এর সাথে মোকাবিলায়, রবীন্দ্রনাথ অসীমের ছোঁয়া অনুভব করেন।

"আজি আম্রমুকুল-সৌগন্ধ্যে
নব পল্লবমর্ম্মর-ছন্দে
চন্দ্র কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রুসরস মহানন্দে,
আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধ বিধুর সমীরণে।"

তিনি প্রকৃতিকে স্পিনোজার মহাবাক্য Sub specie aeternitatis—অনন্তের ভাব দিয়ে দেখেচেন, তাঁর কাছে এ ধরার কণাটাও অসীমের বিভাব—'through it the philosophic eye looks into Infinitude itself.' (Carlyle) অসীম সীমার সঙ্গ নিবিড় ক'রে পেতে চাইচে, সীমাও অসীমের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলার জন্মে উতলা। এই রসঘন চেতনাটা রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্তরতম সুর। তাঁর প্রকৃতি প্রেমেও এর অন্যথা হয়নি।

"কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে,
তা'র বর্ণে তোমার নামের রেখা
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা
সেই মালাটি বেঁধেচি মোর কপালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।"

সীমার সঙ্গে অসীম মিলিত হবে ব'লেই এত উৎসব, এত হাস্য, এত গন্ধ, এত গান। অনাদিস্রোত বেয়ে এ মিলন-আশা-তরী চ'লেচে—সেই জন্মেই উষা এসে দিনের দুয়ারে করাঘাত করে, আনন্দ গান অনুদাও উদাও স্বরিতে তরঙ্গিত হ'য়ে চলে।

"তোমায় আমায় মিলন হ'বে ব'লে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হ'বে ব'লে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।"

রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক অনুভূতির সঙ্গে আইরিশ মরমী জর্জ্জ রাসেলের অনুভূতির অনেকটা মিল আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের চেতনার উৎসটা যেমন স্পষ্ট, রাসেলের তা' নয়। রাসেলের অনুভূতি ভাবের নীহারিকা-সমাচ্ছন্ন এবং সেইজন্মেই অধিকতর মিষ্টিক।

'Through the drowsy lull, the murmur,
the stir of leaf and sleepy hum,
We can hear a gay heart beating,
hear a magic singing come"
(A. E.)

Gay heartটা যে কী বা কে, সে সম্বন্ধে সবি কুহেলী-মাখা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন যে, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সব কিছুই 'অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ভূমার স্পন্দন-মুখর।

অপ্রকাশ রায়

মায়া

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস্

১

মানুষ ত জীবনে কত জিনিসই দেখে। দেখে, আবার ভুলে যায়, আবার দেখে। কিন্তু এক একটা এমন জিনিস নজরে পড়ে, এক একটা এমন অনুভূতি আসে, যার দাগ কখনও মোছে না। সুন্দর ফুল বললে মনে পড়ে কবে কোন্ সুদূর অতীতে এক দীঘির নীলজলে দেখেছিলাম একটী শ্বেত শতদল। শারদ প্রভাতের মৃদু বায়ে নাচ্ছে। তেমনটী আর কখন দেখলাম না। সেই রঙ্গ, সেই ঠাম, সেই নাচ হৃদ্‌যন্ত্রের তারে যে ঘা মেরেছিল, তার ঝঙ্কার আজও থামে নেই।

সুপুরুষ অনেক দেখেছি। কিন্তু সুপুরুষ বললেই আমার দৃশ্যপটে এসে দাঁড়ায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, কালো, বিশালকায়, আমার এক ডাকাত মক্কেল। নাম তার ছিল মুরাদ। জজ তাকে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু সে মোতীর মত দুপাটি দাঁত বের ক'রে হেসে বললে,

"তুম্‌হি ত আমায় বেকসুর খালাস দিলে, সাহেব বাহাদুর, কিন্তু হারাম খোররা ছাড়বে না এবার।"

হলও তাই। আদালতের বাইরেই সে আবার গেরেপ্তার হল। পরদিন শুনলাম যে পথে যেতে যেতে এক প্রহরীর বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল ব'লে তারা তাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছে। এতে আমার দুঃখ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু সে রাত্রি ঘুমোতে পারি নেই।

এই রকম কত বলব? তবে স্ত্রীলোক বললেই যে এসে হেসে আমার চোখের সামনে দাঁড়ায় তার গল্পটা সবাইকে শোনাব। সে আমার সুদীর্ঘ একঘেয়ে জীবনে একবার চপলার চকিত চমক এনেছিল। সেই চমক, সেই ক্ষণিক দীপ্তি, আমার মনটাকে চিরদিনের জন্য দিব্য আলোকে আলোকিত করে দিয়ে গেছে। সে আলোতে কখনও কোন খদ্যোত খেলা কর্‌তে আসে নেই।

২

আমি আজ তিরিশ বছর এলাহাবাদে ওকালতী করছি। কিন্তু আমার জন্মস্থান বহুদূরে, বাঙ্গলা দেশের নুরপুর ব'লে এক ছোট শহরে। জেলার সদর হলেও শহরটী ছোট, বড় জোর হাজার বারো লোকের বাস। তার ভেতর আবার অনেকে সেখানের স্থায়ী বাসিন্দা নয়। কর্ম্মসূত্রে আসে যায়। আমরা জাতিতে কায়স্থ। আমার পিতামহ জজের আদালতে পেয়াদা ছিলেন। পিতাও প্রথমে পেয়াদা-গিরি করতেন। কিন্তু পরে চেষ্টা ক'রে মোক্তারী পাশ দিয়ে আইন ব্যবসায় সুরু করেন। বুদ্ধি কি অধ্যবসায়, কিছুরই অভাব ছিল না। তাই অল্প দিনে ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছারীতে বাবার বেশ পসার জমে গেল। টাকাকড়িও কিছু সঞ্চয় করতে লাগলেন। কিন্তু পেয়াদার ছেলে ব'লে শহরের অভিজাত সমাজে তাঁর প্রবেশ ঘটল না। সেই সমাজের নেতা, ডেপুটী সদরালাদের ত কথাই নেই। বড় দরের আমলারাও বাবাকে দেখলে নাক উঁচু করত। সকলের এই হেনস্তার দরুণ বাবার মনটাও বড় তেতো হয়ে গেছল। আভিজাত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু দেখাতে চাই যে বাবার এই মনোভাব আমার মনে কতকটা প্রবেশ করা অবশ্যম্ভাবী। সেই কারণে আমি অল্প বয়স থেকেই কারো বাড়ী বড়ো একটা যেতাম না। ইস্কুলেও বন্ধু বান্ধব কম ছিল। নিজের উপর নির্ভর করা অভ্যাস হয়ে গেছ্‌ল। আর মনে মনে এটা স্থির করেছিলাম যে, লেখাপড়া ভাল করে শিখে কলকাতায় বাস করব। জন্মস্থানের উপর কোন মায়া ছিল

না। কলকাতায় ব্রাহ্ম মুরুব্বি ও বন্ধুবান্ধবের অভাব হবে না, কেননা বাবা দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হলেও ঐ সমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

আমার যে দুচারজন বন্ধু ছিল, তার মধ্যে প্রধান সুরেশ। সে বয়সে কিছু ছোট হলেও আমার সহপাঠী ছিল। আমার ভেতর কি দেখেছিল জানিনা, কিন্তু পড়াশুনোয়, আমোদ, আহ্লাদে, খেলাধূলোয়, কিছুতেই সে আমার সঙ্গ ছাড়ত না। আমাদের দুজনের চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের ছিল। আমার কথা ত বলেছি। সব কাজ ভেবে চিন্তে আরম্ভ করা, নিজের উপর নির্ভর করা, অন্য লোকের মতামত সম্বন্ধে উদাসীনতা আমার চরিত্রের সঙ্গ হয়ে গেছল। সুরেশ কখনও অগ্রপশ্চাৎ ভাবত না। যখন যা মনে হল তখনই তা করা চাই এই তার ধারা ছিল। আজ যেটা তার মত কাল সেটা নয়। আজ যেদিকে ঝোঁক, কাল সে সম্বন্ধে উদাসীন।এক আমি তার প্রতি মুহূর্ত্তের মনের গতি জানতাম, কেন না তার যখন যেটা মনে হত তখনই আমাকে বলত। শুধু বলত তা নয়, আমাকেও সেই দিকে প্রাণপণ চেষ্টায় টানত।

হয়ত পড়া মুখস্থ করছি, সুরেশ ঝড়ের মত এসে টানাটানি আরম্ভ করলে "চল না নরেশদা, কালকের সেই নীল পাখীটার বাসার সন্ধান ক'রে আসি।"

আমি বললাম, "না, কিছুতেই যাব না। এই পড়াটা আজ মুখস্থ করার কথা না? আর পাখীর বাসা থেকে ছানা চুরি করবি কেন? তোর কি অধিকার?"

"নাই বা গেলি, বয়ে গেল। তোরই বা আমায় ধমকাবার কি অধিকার?"

আধ ঘণ্টা পরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে এল। আমি বললাম, "কি হল রে? অত লাগল কি করে?"

"ভাই নরেশদা, এক কাঁঠাল গাছে পাখীর বাসাটা ছিল। সন্ধান পেয়ে গাছে চ'ড়ে প্রায় একটা ছানা ধরেছি, এমন সময় পা গেল ফস্‌কে। ধপ্ ক'রে নীচে প'ড়ে গেলাম। ভাই, তুই রাগ করিস না। আর কখন তোর কথা অমান্য ক'রে কোথাও যাব না।"

আমি তাড়াতাড়ি জলপটী বেঁধে দিলাম। পরে প্রয়োজন মত গল্প রচনা ক'রে তার বাপ মার রাগ থেকে তাঁকে বাঁচালাম। এ রকম কতবার হত!

আমাদের সহরটীকে তিন দিকে ঘিরে ছিল তমসা ব'লে এক ছোট নদী। ফাগুন চৈতে হেঁটে পার হওয়া যেত। তখন আমরা চরের উপর সন্ধ্যার সময় খেলাধূলো করতাম, বেড়াতাম। হাত চল্লিশেক চওড়া ফটিকের মত পরিষ্কার জল কুলকুল ক'রে বয়ে যেত, বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে। চারিদিক শান্ত সুন্দর। চাঁদ উঠলে ত কথাই নেই।

কিন্তু বর্ষা যখন তার কালো চুল আকাশে এলিয়ে দিত তখন তমসা পাগলী হয়ে উঠত। তার জলের তোর দেখে মনে হত যেন একপাল বুনো হাতীকে সহজেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সেই ঘোলাজলের কি স্রোত, কি ভীষণ ঘুর্ণী, কি উন্মাদের মত পাড়ভাঙ্গা, যেন পদ্মানদীর ছোট বোন। সেই সময় দূর দেশ থেকে বড় বড় নৌকা মাল নিয়ে এসে নুরপুরের ঘাটে ঘাটে লাগত। রেল বহু দূরে। এই নৌকাগুলোই বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ যোগ। পারে বসে বসে আমরা দুই বন্ধু জলের তাণ্ডব আর নৌকার দোলন দেখতাম। মাঝিদের কাছে কলকাতার ঢাকার চাটগাঁয়ের কত গল্প শুনতাম। সুরেশ কেবলই বলত, "চল্ নরেশদা, ডিঙ্গায় চ'ড়ে পালাই।"

আমি বলতাম, "পালাবি কেন? আর কবছরই বা দেরী। পাশ হলেই ত দুজনে বিদেশে লেখাপড়া করতে যাচ্ছি।"

"সে বিশ বাঁস জলে। এখনও কলেজে যাবার অনেক দেরী। আর যদি পাস করতে না পারি ত তাও হবে না।" আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাকে ঠাণ্ডা করতাম।

একদিন টিফিনের সময় কাছে এসে সুরেশ আমায় কানে কানে বললে, "নরেশদা ভাই, কাউকে বলবি না বল্। আমি বদরুদ্দিন মাঝির নৌকায় চাকরী ঠিক ক'রে এসেছি, তোর আর আমার। তারা আজ রাত্রে খেয়েদেয়ে যেতে বলেছে। খুব ভোরেই নৌকা ছেড়ে দেবে।"

আমি অনেক বোঝালাম, কিন্তু তাতে সুরেশের জিদ যেন আরও বেড়ে যেতে লাগল। শেষ আমি রাগ ক'রে বললাম, "চুলোয় যা। আমি যাব না। একলা তোর যা খুশী করগে যা।"

সেও রেগে উত্তর দিলে, "যাবই ত। তোর সাহস হবে না আমি জানতাম। নাই বা গেলি, বয়ে গেল। ভেবেছিস্ তুই না হলে আমার চলে না।"

সেদিন দুই বন্ধুর আর কোন কথাবার্ত্তা হল না। ইস্কুলের পর সুরেশ আমার কাছে এলও না। আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে শেষে একলা বেড়াতে গেলাম। বদরুদ্দিনের নৌকার কাছ বরাবর যেতেই নজর পড়ল যে সুরেশ আর বদরু ঘাটে ব'সে ফিস ফিস ক'রে কি কথা কইছে। আমি একটু দূরে লুকিয়ে রইলাম। সুরেশ চ'লে যাওয়ার পর বদরুর কাছে উঠে গেলাম। সে আমায় দেখে মুখ বিকৃত ক'রে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কি চাও হে, বাবু?"

আমি আস্তে আস্তে তাকে বললাম, "মাঝি, এ রাগের কথা নয়। তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিতে এলাম। সুরেশ বাবু বড় লোকের ছেলে। হাকীম পুলিশ ওর বাপের হাত ধরা। খবরদার, কিছু চালাকী করতে যেও না।"

"বাঃরে, চালাকী কি করলাম আমি? ও চাকরী চায়, আমি চাকরী দেব বলেছি। এই ত কথা। এতে পুলিসের বাপের কি? তোমরা দরকার হয় ওকে বেঁধে রাখ। আমার কাছে ফের আসেত আমি মেড়ে তাড়িয়ে দেব।"

বদরু সুরেশকে সন্ধ্যাবেলা গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। সে গাল খেয়ে আমার কাছে এসে কাঁদাকাটি আরম্ভ করলে, "দোহাই তোমার নরেশ দা, বাবাকে বলে দিও না। আমি আর কখনও এরকম করব না।" আবার দুজনের ভাব হলো। পরদিন সকালে উঠেই ঘাটে গিয়ে দেখে এলাম বদরুদ্দিনের নৌকা চলে গেছে। তখনকার মত নিশ্চিন্ত হলাম।

পাঠক, সুরেশের আর আমার প্রকৃতিগত পার্থক্য বুঝলেন ত? সুরেশ যেন আমাদের ভাদ্রমাসের ভরা তমসা। আর আমি চৈত্রমাসের শান্ত ক্ষীণ জলস্রোত।

সুরপুরে এক ছোট ইংরেজী ইস্কুল ছিল। ছেলেদের ভেতর আভিজাত্যের বড়াই প্রায় ছিল না। তবু এক আধবার গোলযোগ হয়েছিল। একটা ঘটনা মনে আছে। যখন আমরা নীচের ক্লাসে পড়ি, একদিন ডেপুটী বাবুর ছেলে যদু খেলার মাঠে খামকা আমায় পেয়াদার নাতি ব'লে ডাকলে। আমি একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিছু জবাব জোগাল না। কিন্তু সুরেশ তৎক্ষণাৎ "তবে রে, হতভাগা" ব'লে বাঘের মত যদুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। তাকে চিৎ ক'রে ফেলে টুঁটি টিপে ধরলে। আমি না সুরেশকে টেনে সরিয়ে দিলে একটা ভীষণ কাণ্ড হয়ে যেত। এতটা বাড়াবাড়ি আর কখন হয় নেই। যাই হোক আমি সব জিনিস থেকে দূরে দূরেই থাকতাম।

ইস্কুলে পড়াশুনোয় সুরেশ ও আমি সমান সমান ছিলাম। কোন ক্লাশে বা সে প্রথম স্থান নিত, কোন ক্লাশে বা আমি। কিন্তু এতে আমাদের কিছু এসে যেত না। প্রথম দুটো জায়গা আমরা দুজনে নিলেই হল। তাহলেই আমরা খুশী। খেলা ধুলোয় দুজনেরই সমান ঝোঁক ছিল। তবে ক্রিকেটই আমরা বেশী খেলতাম। কিন্তু run আমরা দুজনে মিলে কত করলাম তারই হিসেব থাকত। একজন কত run করলে তাতে আমাদের কিছু এসে যেত না। মোটের উপর সুরেশ ভাল ব্যাট ধরত, আমি ভাল বল দিতাম। কাজেই আমাদের দুজন না হলে কোন খেলা জমত না। এই ভাবে আমরা বড় হচ্ছিলাম। একজনের যেটার অভাব অন্যজন সেটার পূরণ করত। আমাদের এই সখ্য সকলের ঠাট্টার জিনিস ছিল। পণ্ডিত মহাশয় ঠাট্টা করতেন সংস্কৃত ভাষায়। বলতেন, "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং।"

হেডমাষ্টার মহাশয় বলতেন, "ওহে ড্যামন পিথিয়াস্, তোমাদের পরীক্ষায় সমান নম্বর পাওয়ার উচিত্। তা হয় না কেন?"

সুরেশ উত্তর দিত, "তা হলেই বা, স্যার। ড্যামন পিথিয়াস্ ছাড়া আর কেউ ফার্ষ্ট না হলেই হল।"

সহপাঠীরা ঠাট্টা ক'রে বলত, "তোরা শেষ দুজনা মিলে এক কনে বিয়ে করবি দেখছি।"

সুরেশ চুপ ক'রে থাকবার পাত্র নয়। সে বলত,

"তা করলেই বা কি? পাণ্ডবরা ত পাঁচ জনে মিলে দ্রৌপদীকে বিয়ে করেছিল। মহাভারত পড়েছিস্ ত?"

৩

সুরেশদের বাড়ী আর আমাদের বাড়ী পাশাপাশি ছিল। সুরেশের বাবার নাম ডাক্তার যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তাঁরাও আমাদের মত ঐ জেলার আদিম বাসিন্দা। ডাক্তার কাকা কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ হয়ে অবধি এইখানেই ডাক্তারী করছিলেন। পসার খুব জমেছিল, সরকারী ডাক্তারদের চেয়ে অনেক বেশী। তাঁর আত্মীয় স্বজন বেশীর ভাগ অধ্যাপক ব্রাহ্মণ। তিনি নিজে ও ডাক্তার কাকীমা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। আমার বাবার কথা ত বলেছি। তিনি ছেলেবেলা থেকেই ব্রাহ্মসমাজ ঘেঁসা। তা সত্ত্বেও কাকার আর তাঁর পুরানো বন্ধুত্ব চিরদিন একই রকম চ'লে আসছিল। কাকা বাবাকে দাদা ব'লে ডাকতেন আর বড় ভাইয়ের মতই শ্রদ্ধা করতেন। দুজনে রোজ সন্ধ্যাবেলা দাবা খেলতেন আমাদের বৈঠকখানা ঘরে। দুজনেই খুব উৎসাহী কংগ্রেস পন্থী ছিলেন। তাঁদের উৎসাহ বছরে একবার মহাসভায় উপস্থিত হয়ে খতম হয়ে যেত না। দেশের কথা গ্রামে গ্রামে প্রচার করবার জন্য তাঁরা রীতিমত পয়সা খরচ করতেন। দুজনে মাঝে মাঝে তর্কও হত।

বাবা বলতেন "আমাদের সামাজিক গলদ গুলো দূর করতে না পারলে কংগ্রেসের কাজ কখনও এগোবে না।"

কাকা বলতেন "দেশ স্বাধীন করতে হলে সবাইকে সাহেব সাজতে হবে এমন কোন কথা নেই। যখন আমরা স্বাধীন ছিলাম তখনও ত এই সব সামাজিক প্রথা ছিল।"

তাতে বাবা জবাব দিতেন, "তা ত ছিল না, ভাই। আজ আমাদের যে অসূর্য্যম্পর্শ্যা কুলবধূরা আছেন, তাঁদের মত মেয়ে কি দ্রৌপদীর আমলে ছিল, না সীতার আমলে ছিল, না অহল্যা বাই হোলকরানের আমলে ছিল?"

কাকা হেসে বলতেন "তা ত ছিলই না। কিন্তু তাঁরা ত আর ইংরেজী ব্লাউস আর উঁচু খুরো দেওয়া জুতো পরে পার্টিতে যেতেন না।"

তর্ক শেষ পর্য্যন্ত এই রকম হাসি তামাসাতেই শেষ হত। তখন কংগ্রেসওয়ালারা এখনকার লিবারেলদের চেয়েও নরম প্রকৃতির ছিলেন। তবু কংগ্রেস ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদিতে যোগ দিতেন বলে বাবা কাকা দুজনেই সহরের গণ্যমান্য লোকের নজরে নামকাটা সেপাই ছিলেন। আর ঠিক এই কারণেই তাঁরা আমাদের ছাত্র মহলের শ্রদ্ধাভক্তি পুরো মাত্রায় পেয়েছিলেন।

সুরেশ আবার সবরকমে বাবার ভক্ত ছিল। ছেলেবেলা থেকেই সে জ্ঞাতিবর্গের বাড়াবাড়ি দেখে ছুঁৎমার্গে বিশ্বাস হারিয়েছিল। পৈতা হওয়ার পরেও জ্যাঠাইমার (আমার মার) রান্না খাওয়ার উৎসাহ কমে নেই। কাকা কাকীমা সব জানতেন কিন্তু কড়াকড়ি করতেন না।

কাকীমা বলতেন "বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। যতটা সয় তাই করাই ভাল। তুই কারো সামনে নরেশদের বাড়ী না খেলেই হল।"

আমি বলতাম, "কাকীমা, আমাদের বাড়ী আর কে খেতে আসছে? সেখানে কারো দেখবার সম্ভাবনা নেই।"

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমার, কে জানে কেন, বেশী উৎসাহ ছিল না। সত্যি বলতে কি, আমার চেয়ে সুরেশের আগ্রহ ঢের বেশী ছিল সমাজে যাওয়ার বিষয়ে। তার বাপ মার এতেও মোটে আপত্তি ছিল না। বরং তাঁরা বলতেন, "ভগবানের নাম শুনতে যাবে, সে ত সুখের বিষয়।"

আসল কথা কি কর্ত্তাদের দুজনেরই গোঁড়ামির একান্ত অভাব ছিল। একবার খুব ধুম ক'রে ইস্কুলে সরস্বতী পূজা হল। হেডমাষ্টার মহাশয় বললেন, ছেলেরা সবাই মিলে অঞ্জলি দেবে আর সন্ধ্যাবেলা সবাই একত্র ব'সে খাওয়া দাওয়া করবে। বাবা, কাকা এ বিষয়ে অনেক পরামর্শ করলেন। শেষ ঠিক হল যে আমাদের নিজেদের যা প্রবৃত্তি সেই রকম করব। আমার অঞ্জলি দেওয়াতে বাবা আপত্তি করলেন না, আর সুরেশের পংক্তি ভোজনে কাকা আপত্তি করলেন না।

আমার মার কথা এতক্ষণ বলা হয় নেই। তিনি বাবার মত ব্রাহ্মপন্থী ছিলেন না। দেব দ্বিজে ভক্তি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাবার প্রভাব তাঁর হিঁদুয়ানিকে ঘ'সে

মেজে এমন মোলায়েম ক'রে দিয়েছিল যে আমার চোখে আমার মার ধর্ম্মভাবই ঢের বেশী লোভনীয় মনে হত।

যখন আমরা ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ি পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন আমাদের সহরে বক্তৃতা করতে এলেন। ইস্কুলের রীতি ছিল যে কোন দেশবিখ্যাত বড় লোক এলেই আমরা তাঁর পিছু পিছু ঘুরে কদিন খুব হৈচৈ করতাম। সুরেশ ও আমি পরিব্রাজকের সেবায় লেগে গেলাম। একদিন মস্ত বড় সভা বসল। ডাক্তার কাকা সভাপতি। কৃষ্ণপ্রসন্ন হিন্দু পূজা-পদ্ধতি ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নানা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করলেন আর সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের অনেক নিন্দাবাদ করলেন। বক্তৃতার পরে সুরেশ দাঁড়িয়ে উঠে খুব উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করলে আর বললে, "শিক্ষিত প্রত্যেক লোকই জানে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভবিষ্যৎ ভারতের একমাত্র ধর্ম্ম।"

এত হিংস্রভাবে সুরেশ সনাতন ধর্ম্মের নিন্দা করলে যে আমার পর্য্যন্ত ভাল লাগল না। বাবা কাকার মত উদার চরিত্র লোকের নিশ্চয় ভাল লাগে নেই। যাই হোক, আমরা বাড়ী ফেরার পর ডাক্তার কাকার সামনে আমাদের দুজনের তলব হল। খুব গম্ভীর ভাবে তিনি বললেন।

"সুরেশ, তোমার জানা উচিত যে তুমি বালক, অল্পবুদ্ধি, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কিছু বোঝ না। প্রকাশ্য সভায় নিজের মূর্খতা প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। একটা কথা তোমায় আমি এই সময়েই বলতে ইচ্ছা করি যে যদি কোনদিন তুমি তোমার স্বধর্ম্ম ছাড় ত আমি তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করব। আমার কথার অন্যথা হবে না।"

কাকা অত্যন্ত রাশভারী লোক। সুরেশের মনে যাই হোক সে কিছু বলতে সাহস করলে না। আমি খুব নম্রভাবে বললাম, "কাকা, আপনি রাগ করবেন না। ও ছেলেমানুষ, মনে যা এসেছে না ভেবে চিন্তে বলে ফেলেছে।"

বাইরে যাওয়া মাত্র সুরেশ মুখ লাল ক'রে আমায় ধমকে উঠল, "আমি যা বিশ্বাস করি তাই বলেছি। তুই সেজন্য মাপ চাইতে গেলি কেন? সব বিষয়েই আমার নিজের একটা মতামত হওয়ার বয়স হয়েছে।" বয়স তখন তার পুরো পনের বছর। আমার হাসি পেলে, কিন্তু চুপ ক'রে গেলাম।

এই ঘটনার ফলে সুরেশের মাথায় ভূত চাপল। সে ঠিক করলে যে সবাইকে দেখাবে এক হাত। আমি বাপ মার এক ছেলে। আমার এক বোন ছিল সরলা। সে আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। ছেলেবেলায় আমাদের সঙ্গে সমানে ছুটোছুটি করত। সুরেশ তাকে ক্রিকেট পর্য্যন্ত শিখিয়েছিল। কিন্তু ইদানীং মা তাকে ছেলেদের সঙ্গে খেলতে যেতে মানা ক'রে দিয়েছিলেন। সে মেয়ে ইস্কুলে পড়ত, তার নিজের সখী সাথী জুটেছিল, তাই সেও আর আমাদের সঙ্গে বড় একটা মিশত না। সরলা দিন দিন বড় সুন্দরী হয়ে উঠছিল। তার হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা চুল, টুকটুকে মুখে মৃদু হাসি, কালো কালো দুটী ডাগর চোখ, কপালে কাচ পোকার টিপ, যত দেখতাম ততই ভাবতাম "কোন্ বাঁদরের হাতে পড়বে, কে জানে?" সরলার এই সৌন্দর্য্য কখন সুরেশের চোখে পড়েছে ব'লে মনে হত না। কেন না সে তাকে দেখলেই বাঁদরী তাড়কা রাক্ষসী, এই সব ব'লে ডাকত, কাঁচি দিয়ে কুচ ক'রে একদিন বেণীটা কেটে দেবে ব'লে শাসাত। কখনও এতটুকু সঙ্কোচ কি লজ্জা দেখি নেই তার ব্যবহারে।

বাপের কাছে বকুনি খাওয়ার পরদিন সকালে সে আমার কাছে এসে গম্ভীরভাবে বললে, "তোদের সনাতন হিঁদুয়ানীর মুখে ঝাড়ু। আমি সরলাকে বিয়ে করতে চাই। আজই জ্যাঠামশয়কে বলব। তিনি খুশী হবেন। তিনি ত আর টিকির ধার ধারেন না।"

আমিও ত ছেলে মানুষ। একবার ভাবলাম যে সুরেশের স্ত্রী হ'লে আর সরলার জন্য কোন ভাবনা থাকে না, বলুক না বাবাকে। কিন্তু তখনই মনে হল কাকা কাকীমার কথা। অনেক কষ্টে সুরেশকে তখনকার মত চুপ করালাম। ফল কিছু হল না। তার পাগলামি বেড়ে চলল রোজ রোজ এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন সে সরলার জন্য চিরদিন পাগল। আমি স্থির বুঝলাম এটা জিদমাত্র আর সে

জিদের চোটে ওর মাথায় ভূত চেপেছে। কিন্তু সে কথা ওকে বলবার জো ছিল না। বললেই ফোঁস ক'রে উঠত। যাত্রার ভাষায় বলত, "এ ছার প্রাণ আর রাখব না।" পড়া শুনোও করে না, খেলাধুলোও ছেড়ে দিলে। একদিন ডাক্তার কাকীমার কাছে কি ব'লে ফেলেছিল কে জানে, কিন্তু তার ফলে কাকা আমাকে ডেকে পাঠালেন। বাবাও সেখানে ছিলেন। কাকা ভয়ানক ধমকালেন।

"তোদের বাঁদরামি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। সুরেশকে সাবধান করে দে। ভাল ক'রে পাশ না চলে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে পাঠিয়ে কোন ফল নেই। আর চালচলন ভাল না দেখলে, মাথা ঠাণ্ডা আছে না বুঝলে, কলকাতার মত সহরে তোদের রাখা হবে না। যা পারবি এইখানেই লেখাপড়া করতে হবে।"

আমি বললাম, "আমরা ত যথাসাধ্য পড়ছি, কাকা।"

"আমার মাথা করছ। সুরেশ ওর মার কাছে আগামীকের মত কি কথাবার্ত্তা কয়েছে, জিজ্ঞেস করিস্। একটা কথা পরিষ্কার ক'রে বলছি। দাদা জাত না মানলেও সমাজ ছাড়েন নেই। আমি গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ। বিবাহ সম্বন্ধে কোন অনাচার আমি বরদাস্ত করব না। আজও নয়, দশ বছর পরেও নয়। সুরেশ যেন এ কথা বেশ ক'রে বোঝে। একটু বোঝবার মত বয়স তোদের হয়েছে।"

আমি সব কথা সুরেশকে বললাম। বেশ রঙ্গ চড়িয়েই বললাম। "কলকাতায় পড়তে যাওয়াটা মাটি করলি? এখন এই সুরপুরেই সারা জীবন প'চে মর।"

সুরেশ যেন আকাশ থেকে পড়ল, "বাবা! একটা কথা কইবার জো নেই। মাকে ঠাট্টা ক'রে কি বললাম, তাই থেকে এত কাণ্ড। এখন থেকে একটি কথা কইব না। ভাই নরেশদা বড় রগ ঘেসে গেছে। আর সময় নষ্ট নয়। কাল থেকে জোর পড়া আরম্ভ করব।"

তারপর দিন সকাল বেলা কাকাদের বাড়ীতে ব'সে দুজনে খুব বেগে সংস্কৃত শব্দের রূপ মুখস্থ করছি, এমন সময় সরলা এল। বেচারা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে,

"ছোটদা, একবার আমার এই অঙ্কগুলো দেখে দেবে, ভাই?"

ছোটদা, চেঁচিয়ে উঠল, "তাড়কা রাক্ষসী, বাঁদরী, পালা এখান থেকে। তোকে অঙ্ক ব'লে দিয়ে আমি বকুনি খাই আর কি? ভাগ্, নইলে এখনই কাঁচি দিয়ে টিকিটা কেটে দেব।"

সরলা বেচারা হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। আমি বললাম, "তুই বাড়ী যা ভাই। আমি এখনই গিয়ে তোর অঙ্ক দেখে দেব। তোর ছোটদার ভয়ানক পড়ার চাড় হয়েছে, দেখছিস্ না?"

সুরেশের উন্মত্ত প্রেমের অভিনয়ে এই রকম করে হঠাৎ যবনিকা পতন হল। প্রেম একেবারে উবে গেল, চিহ্নমাত্র রইল না। আমার মনে কিন্তু একটা দাগ রয়ে গেল। মাঝে মাঝে মনে হত, সুরেশ কি বড় হয়েও এই রকম খামখেয়ালী থাকবে?

যথা সময় পরীক্ষা দিতে বসা গেল। দুজনেই বেশ ভাল লিখলাম। কয়েক সপ্তাহ পরে ফল যখন বের হল, দেখা গেল হেড মাষ্টার মহাশয়ের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। দুই ভাইয়ে ঠিক একই নম্বর পেয়েছি। দুজনেই পনের টাকা জলপানি পেয়েছি। কলকাতা যাওয়ার পথে আর কোন বাধা রইল না।

৪

পরীক্ষার পর লম্বা ছুটিটা বাবা সঙ্গে ক'রে আমাদের বিদেশ ভ্রমণে নিয়ে গেলেন। কাশী গিয়ে প্রায় এক মাস রইলাম। সেখানকার আব হাওয়ায় দিন কয়েকের মধ্যে সুরেশচন্দ্র হঠাৎ সনাতন হিঁদুয়ানীর দিকে ঝুঁকে পড়ল। একেবারে টিকি রাখবার তিলক কাটবার জোগাড়। শুধু বাবার ভয়ে সেটা হয়ে উঠল না। কিন্তু মণিকর্ণিকায় স্নান করলে। আমরা থাকতাম এক বাঙ্গলায়, সিকরোলে। আর আমাদের আহার বিধি ঠিক ধর্ম্মানুমোদিত ছিল না। পাচক ব্রাহ্মণ ছিল জাতে দোসাদ। সুরেশ খেত সবই, কিন্তু হিন্দুয়ানী বজায় রাখত খাওয়ার পরে এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল পান ক'রে। কাশীর দৃশ্য ঘুরে ঘুরে দেখার আগ্রহ আমারও কম ছিল না। তবে শহরের গলি ঘুঁজিতে কোথায় কত রকম জাগ্রত দেবতা আছেন, সুরেশ তার

তথ্য সংগ্রহ ক'রে আনত আর সেই সব জায়গায় আমায় ধরে নিয়ে যেত। এতে আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল তা বলতে পারি না। বাবা রোজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, কি কি দেখলাম। একদিন বললেন,

"সুরেশ যে ভীষণ পৌত্তলিক হয়ে দাঁড়াল! ও সব তোরা কি সত্যি বিশ্বাস করিস্?"

আমি বললাম, "না বাবা, ওর ও সব বেশী দিন থাকবে না। একটা খেয়াল হয়েছে দিন কয়েকের জন্য। ধর্ম্মের অত খুঁটিনাটি আমরা শিখলাম কবে, যে বিশ্বাস করব। তবে এখানে এসে একটা জাতীয় গৌরব হয় সেটা সত্যি। হিঁন্দুয়ানী কত কালের ধর্ম্ম, কত রকমের লোক এই ধর্ম্ম মানে এটা আমি নুরপুরে ঠিক বুঝতে পারতাম না। তা ছাড়া একটা জলন্ত ধর্ম্মভাব অনেকের দেখতে পাচ্ছি এখানে যা সেখানে বড় একটা দেখতে পেতাম না।"

বাবা বললেন, "কিন্তু মনে রাখবি নরেশ, যে ধর্ম্ম মানে একটা অন্ধ বিশ্বাস নয়।"

"তা ত নয়ই বাবা। আমরা আজ একজন মস্ত সাধুর কাছে যাচ্ছি। তাঁর সঙ্গে কথা কইলে নিশ্চয়ই অনেক জিনিস শিখতে পারব। হয়ত সুরেশের এই গোঁড়ামির ঝোঁকটাও কেটে যাবে। ভাস্করানন্দ স্বামীকে আপনি দেখেছেন কি?"

"হ্যাঁ বাবা, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তিনি একজন যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ। দেশ বিদেশের বিদ্বান লোক তাঁর কাছে আসে।"

পরদিন আমরা স্বামী সন্দর্শনে গেলাম। সুরেশের খুব উৎসাহ। লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের অলি গলিতে প্রবেশ আমাদের মত ছেলের পক্ষে অসম্ভব। আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি এমন একটা জিনিস যা হিন্দুধর্ম্মও বটে, অথচ যাতে গোলমেলে কথা নেই। আমাদের আশা যে কোন সাধু সন্ন্যাসী আমাদের এ পদার্থ দিতে পারবেন। ভাস্করানন্দজী তখন থাকতেন আমেথীর রাজার বাগানে এক কুঁড়ে ঘরে। ফটকে বন্দুক হাতে প্রহরী। সে আমাদের জানিয়ে দিলে যে স্বামীজী নিতান্ত হায়রান হয়ে রাজা বাগাচরের বাগানে আশ্রয় নিয়েছেন, এখানে কাউকে দর্শন দেন না। ফটকের কাছেই এক আনকোরা নূতন মন্দিরে স্বামীজীর এক শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি ছিল। প্রহরী আমাদের সেই খানে প্রণাম জানিয়ে চলে যেতে হুকুম করলে। সুরেশের আপত্তি ছিল না, কেন না তখন তাঁর মূর্ত্তিমাত্রের প্রতি অসীম ভক্তি। আমি রাজী হলাম না। সেপাইকে বললাম, "ও সব নকলে চলবে না। আসল সাধু না দেখে আমি যাব না।"

ঠিক এই সময় দেখি যে দিগম্বর স্বামীজী তাঁর কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে হাত ছানি দিয়ে আমাদের ডাকছেন। সেপাই পথ ছেড়ে দিলে, বললে "জাইয়ে আপলোক, বাবুজী।" আমি সুরেশকে বললাম, "দেখলি জাগ্রত দেবতা? এ ত আর তোর কাঠ পাথর নয়।" স্বামীজীর ব্যবহার দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তাঁর পায়ের ধূলো নিতেই তিনি আমাদের পায়ের ধূলো নিলেন। আমাদের চেটাই বিছিয়ে দিলেন বসবার জন্য আর নিজে বসলেন মেজের উপর। বসেই আমি আমাদের দুই মহা সমস্যা তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, জাতিভেদ আর মূর্ত্তি-পূজা। হিন্দু হতে হলে কি এ দুটো জিনিষই দরকার? তিনি হেসে বললেন,

"আমি কি হিন্দু না হিন্দু নয়? অথচ আমার জাতও নেই, কোন মূর্ত্তির পূজাও করি না।"

তারপর আরও অনেক কথা বললেন। কিন্তু আমরা যে সব বুঝতে পারলাম তা নয়। সুরেশের মনে কিন্তু স্বামিজীর উপদেশের প্রত্যক্ষ ফল হল। উপদেশের দুই একটা কথা যা মনে আছে বলি।

"জাত ত সকলের থাকে না। আমার কাছে কি? আসল কথা, যে জাত মানে তার আছে, যে মানে না তার নেই।"

"মূর্ত্তিপূজা! পূজাই প্রধান জিনিস, মূর্ত্তিটা নয়। তোরা কি ঐ মন্দিরে আমার মূর্ত্তি দেখে সন্তুষ্ট হতে পারলি? অথচ অনেক লোক ঐখানেই পূজা দিয়ে খুশী হয়ে চলে যায়।"

ঘণ্টাখানেক পরে আমরা প্রণাম ক'রে বাড়ী রওয়ানা হলাম। পথে সুরেশ একেবারে চুপচাপ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কিরে, কেমন দেখলি?"

সে হতাশভাবে বললে, "ভাই, সব তাহলে মিথ্যা, কিছুই নেই! শুধু শুধু, দেখ দেখিনি অলিগলি ঘুরে মন্দির দেখে বেড়াচ্ছিলাম। মাথাটা একেবারে গুলিয়ে গেছল। চল্ পালান যাক্। আর কাশীতে থাকা নয়।"

সেইদিন থেকেই বাবাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, "জ্যাঠামশায়, চলুন না, এইবার দার্জ্জিলিঙ্গ ঘুরে বাড়ী যাওয়া যাক্।"

বাবা হেসে বললেন, "এর মধ্যেই তোর সব মন্দির দেখা হয়ে গেল?" কিন্তু পাহাড়ে যেতে তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন, কেন না কাশীতে বেজায় গরম পড়ছিল। তাঁর ইচ্ছা যে আমাদের সব রকম জিনিস দেখিয়ে নিয়ে যান। কাশী ছাড়বার আগে স্বামিজীকে প্রণাম করতে গেলাম, প্রণাম ক'রেই সুরেশ বললে, "মহারাজ, আপনার উপদেশ শুনে আমার মনের অন্ধকার একেবারে কেটে গেছে। আর জাতও মানব না, পুতুল পূজাও করব না।"

স্বামিজী একটু হেসে সুরেশের পিঠ চাপড়ে বললেন, "একদিনের উপদেশেই সব বুঝে নিলি? আমি ত তাহলে যথার্থ পরমহংস।" তারপর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর কি হল রে বেটা?"

আমি জোড় হাত করে নিবেদন করলাম, "আমার কিছুরই সমাধান হয় নেই। আপনার জাত নেই, মূর্ত্তিপূজা নেই সেটা বুঝেছি। কিন্তু আমার আছে কি না আছে তা ত বললেন না।"

সুরেশ চেঁচিয়ে উঠল, "কেন চালাকী মারছিস, নরেশদা? স্বামীজী ওরা, চুপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের লোক। জাতও মানে না, মূর্ত্তিপূজাও জানে না।"

স্বামিজী উপাহাস করে বললেন, "তবে ত ঠিকই হয়েছে। তুই তোর ভাইকে দিক্ষা দিয়ে দিস্।"

প্রণাম করে বিদায় নিলাম। পথে সুরেশ বললে, "নরেশদা তোর কি সব বিষয়েই ঠাট্টা।"

আমি বললাম "ঠাট্টা কোথায় দেখলে বল। আমার মাথায় গোবর ভরা। কোন কথা সহজে ঢোকে না। বাবার ধর্ম্ম বিশ্বাস, মার ধর্ম্ম বিশ্বাস, কোন্টাই মিথ্যা মনে করতে ইচ্ছা হয় না। অথচ একটা অন্ধ ভক্তি মনে আসতে চায় না। আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে ভাই।"

"তুই স্বামীজীর কথা মেনে নে না। তিনি ত বলে দিয়েছেন জাতও নেই, মূর্ত্তি পূজাও কোন কর্ম্মের নয়।"

কাশী থেকে দার্জ্জিলিং। আকাশ পাতাল তফাৎ। তবু আমাদের কাছে দুই নূতন। বিশ্বনাথের মন্দির, জয়সিংহের মানমন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাট এও আমাদের চোখে যেমন আশ্চর্য্য লেগেছিল, শিলিগুড়ার খেলা ঘরের রেল, পাগলা ঝোরা, কাঞ্চনজঙ্ঘাও তেমনি আমাদের স্বপ্নের অতীত জিনিস লাগল। যখন দেখলাম যে পেঁজা তুলোর মত সাদা সাদা মেঘগুলো আসে পাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকছে তখন মনে হত পৃথিবী ছাড়িয়ে উপরে উঠলাম না কি? তার পর সাহেব মেম। এত সাহেব মেম যে বিলেতের বাহিরে আছে তা জানতাম না। হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাজার করছে, সাধারণ লোকের মত।

আমরা গিয়ে উঠলাম সেনিটেরিয়মে, সেখানে সব বাঙ্গালী। বাবা সুরেশকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"তোমার ত হিন্দু মতে খাওয়া পছন্দ। কি করা যাবে? Orthodox departmentএ, গোঁড়া হিন্দুদের দিকটায়, থাকার ব্যবস্থা করি?"

"না জ্যাঠামশায়, সে দিন কয়েক আমার মতি ভ্রম হয়েছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছি। সাহেবী খানাই এই ঠাণ্ডা দেশে ভাল লাগবে।"

সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা হল। খাওয়ার নূতনত্ব ও আমাদের খুব ভাল লাগল। সুরেশ কেবলই বলত, "ভাগ্যিস্ স্বামীজীর কাছে নিয়ে গেছলি। নইলে এখানেও শাক চড়চড়ী খেয়ে প্রাণ যেত।"

বাজার অঞ্চলে এক ছোট ব্রাহ্ম মন্দির ছিল। সুরেশ রবিবার দিন বাবার সঙ্গে সেখানে যেত। দ্বিতীয় রবিবারে সেখান থেকে ফিরে এসে সে মহা চেঁচামেচী করতে লাগল।

"নরেশদা হাটে তুই কি করতে যাস্ বলত?"

"মায়েদের জন্য, সরলার জন্য পাথরের কণ্ঠী কিনতে গেছলাম।"

"ভারী কাজ করেছিলি! আজ সমাজে কত লোক এসেছিল, দেখতে পেলি না। কলকাতার বিলেত ফেরত মেম গাদা গাদা এসেছিল। কি চমৎকার সব কাপড় প'রে এসেছিল, ও রকম কখনও দেখিস্‌ নেই। জ্যাঠা-মশায়, সেই যে একজন পঞ্জাবী মেয়ে সুন্দর বাঙ্গলা গান করলে।

বাবা বলেলন, "পঞ্জাবী কেন হতে যাবে। ওরা পঞ্জাবে থাকে, বাঙ্গালী। সে মেয়েটীর নাম মায়াময়ী। অমৃতসরের ডাক্তার রামকৃষ্ণ মুখুয্যের মেয়ে। তাঁরা সবাই ত এসেছিলেন। চমৎকার লোক। যাবি তোরা তাঁদের বাড়ী একদিন ?"

সুরেশ লাফিয়ে উঠল, কিন্তু আমি লাজুক ছেলে ছিলাম, বললাম "কাজ কি, বাবা ? ওরা সাহেব লোক। আমাদের তেমন কাপড় চোপড় নেই।"

নেমে আসবার আগে দুই একবার মুখুয্যেদের দেখলাম। বড় সুন্দর লাগল মায়াকে। সরলার চেয়ে রঙ ময়লা, কিন্তু মুখে চোখে যেন বুদ্ধি ফুটে বের হচ্ছে। চেহারাবে যেমন লালিত্য বেশভূষাও তেমনি সুন্দর। লজ্জায় ভাল ক'রে চেয়ে দেখতে পারতাম না। কেবল মনে হত, বাবার সঙ্গে গিয়ে আলাপ ক'রে এলে কেমন হত ! (ক্রমশঃ)

চারুচন্দ্র দত্ত

শ্রান্ত আমি*

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শ্রান্ত আমি, দুঃখ ভারে মানবের অশ্রু বরষায়,
এজীবন মহাভীতি, স্বপ্ন যেন নৈশতমসায়—
পলাতক—নগ্নদেহ, চারিধারে তীক্ষ্ণ-অস্ত্র ধায়।
শ্রান্ত আমি, প্রণয়ের নিরন্তর প্রমত্ত আবেগে
দীপক-দহন-শ্বাসে, শিখা যার দিবা রাত্রি জেগে,
অন্তর আঁধার করে' ধূম্রজালে অগ্নিময় মেঘে।
ধুয়ে ধরণীর ধূলা, স্নিগ্ধ এই শ্যামল ধারায়
দুই সাগরের মাঝে, সুকুমার কান্তার ছায়ায়,
ঊর্ম্মি-শ্যাম বিজনতা দিল দেখা সুচারু শোভায়।
হেথায় অপ্সর লোকে দুই মহাপারাবার মাঝে,
মায়া-বিহগের স্বরে, কি রাগিণী কাণে এসে বাজে,
ধরার দুর্লভ শান্তি, অনাহূত হৃদয়ে বিরাজে।

* Arther Symons হইতে অনুবাদ।

পুরীতে

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

এই শ্রীক্ষেত্রে প্রকট তোমার ঐশ্বর্য্যের বিশ্বরূপ,
কর মোরে তব পরম ভক্ত, পূর্ণ কর এ শূন্য কূপ।
বিনাশি' মিথ্যা বিকাশ' সত্য, সবিতার মত সুপ্রকাশ,—
সিন্ধুর তীরে হৃদ্‌মন্দিরে হিন্দুর প্রাণে কর নিবাস।
হে দারু-ব্রহ্ম ধারণা-অতীত, হে জগ'বন্ধু করুণাময়,
জড় পথধূলি সচেতন হ'য়ে গাহিছে হেথায় তোমারি জয়।
জ্ঞানে অজ্ঞানে এই দেহ-মনে সকল কলুষ কর গো দূর,
হর' অশান্তি অ-প্রেম মম, হও অনুকূল হও ঠাকুর।
স্মৃতির গুহায় চির জাগ্রত অতীতের লীলা বৃন্দাবনী,
এস যুগে-যুগে নিত্য-কিশোর বাজাও বাঁশরী-চিরন্তনী ;
ব্রজসুন্দরী মধুপান করি' জলকেলি-রত তোমার সাথে,
হাস' গোপীজন-বল্লভ প্রভু রাসের মিলন-পূর্ণিমাতে।
নীল কমলের চেয়েও শ্যামল তব ত্রিভঙ্গ তনূৎসব,
নমো বাসুদেব মদন-গোপাল,—সব সম্ভব অসম্ভব,
সব সংশয় অ-সংশয়ের ঊর্দ্ধে তোমার সিংহাসন,
অনন্ত তুমি, বেদ-বাণী তুমি, নূপুর শুনিয়া ভুলেছে মন।
যমুনার কূলে যুগল-মাধুরী,—রাধার বিরহ-বেদন-সুরে
চাঁদের আলোতে ছায়াময় পথে শ্রীমূরতি তব সতত ঘুরে।
রাখাল-রাজার উজ্জ্বল সাজে ধরিলে আকাশে গোবর্দ্ধন,
অ-তীর্থ হ'ল মহান তীর্থ, গোকুলে গো-লোক হ'ল রচন।
সীমাহীন তুমি মূরতি ধরিয়া ছিলে ভুবনের নয়ন-আলো,
মানুষ না হ'লে কেমন করিয়া মানুষে তোমায় বাসিবে ভালো ?—
খেতে ননী-সর, মুছিতে শ্রীকর তমালের কালো পাতার পিঠে,
মুখে তুলে দিত সখারা তোমার এঁটো ফল যদি লাগিত মিঠে।
ছিলে দুরন্ত নন্দ-দুলাল, লুকাতে সহসা—পাইলে ছাড়া ;
কেহ কি পেয়েছে নাগাল তোমার ? খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়েছে সারা।
কদম্ব-বনে বিজন-বিহারী, মেঘের ছায়ায় শুনিতে কেকা,—

চিনেছি চিনেছি চির-বাঞ্ছিত রাতুল-চরণ-চিহ্ন-রেখা।
ভরসা কেবল তোমারি করুণা, দাও অন্ধকে হারানো চোখ,
তব দরশন্ পুলকানন্দে এ জীবন-মন বিভোর হোক্।
হেথায় তোমার রথের সমুখে নাচিল পাগল গৌর-হরি,—
শেষ কর মম পুনর্জনম, হে বামন-রূপী প্রণাম করি।
সত্ত্বগুণের স্বরূপ জানাতে সৃষ্টি করেছ রজস্তমঃ,
চিত্ত তাহার বুদ্ধি লইয়া, নিরূপিতে নারে হে প্রিয়তম।
অশনি-দগ্ধ তাল-তরু সম ভিতরে-ভিতরে জ্বলিছে নাথ,
পরমার্থের ভিখারী এসেছি, সার্থক হোক্ এ প্রণিপাত।
রূপ ও রূপার লালসা হইতে কর গো মুক্ত, বিমল কর,
নিঃশ্বাসে তার বিষাক্ত হিয়া, এই দরিদ্র অধমে তর'।
যশের লিপ্সা নিশাচরী সম গ্রাস করে মোরে সুখের বেশে,
দাও খসাইয়া কপট মুখোস্, ঘুচাও দম্ভ সর্ব্বনেশে।
এই নারায়ণ-চক্র-তীর্থে কোন্ মানুষের সাধন-ফলে
উদয় হ'য়েছ হে নীল-মাধব, ভাসিয়া এসেছ অথই জলে?
নিশীথের তারা ডাকিছে তোমায় নীরব ধ্বনিতে ভরিছে দিক্,
নেহারি আঁধারে সাগর-লহরে জ্বলজ্জ্যোতির সাঙ্কেতিক।
সব চেয়ে তুমি আপনার জনা, আছ তুমি আছ, কই গো কই?
দুঃখের ঢেউ-এ ঘুর-পাক খেয়ে এই-আমি আর সে-আমি নই।
আমি মাটি আমি ছাই হ'য়ে যাব, কেহ না জানিবে গোপন মন,
ভাল হইবার পিয়াসা আমার, দিবানিশি তব নাম-স্মরণ।
নাম ও নামীতে নাই ভেদ নাই, জপ' সদা রাম-কৃষ্ণ-নাম,
শিথিল হইবে মোহের বন্ধ, সিদ্ধ লইবে সর্ব্বকাম।
মহামঙ্গল-প্রসাদ বিলাতে খুলেছে এ দান-সত্র-দ্বার,—
মার্জ্জনা চাহি অন্তর্যামী, মর্ত্ত্যের ব্যথা দি'ওনা আর।
তব বিচ্ছেদ-শাস্তি যে আর পারিনে সহিতে, দাও চরণ,
এসেছে পঙ্গু বড় দুর্ব্বল, কেমনে করিবে আলিঙ্গন।—
সবারে খাওয়ায়ে তৃপ্তি তোমার, যোগাও ক্ষুধিতে অমৃত-ফল,
হও প্রসন্ন, তোমারি জন্য গলিছে আর্ত্ত-আঁখির জল।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্লার আদি ধর্ম্ম

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এম্-এ

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্ সাঙ্ ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের বিভিন্ন প্রদেশে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল (৬৩০-৬৪৪) পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানা যায়। পূর্ব্বভারত তথা বাঙ্লাদেশের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন এস্থলে তাহার প্রধান কথাগুলি সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।—

১। বৈশালী—এই রাজ্যটি বর্ত্তমান বিহারের উত্তরাংশে তিরহুত বিভাগে অবস্থিত ছিল। মুজঃফরপুর জিলার হাজিপুর মহকুমার অন্তর্গত বর্ত্তমান বেসার নামক পল্লীতে প্রাচীন বৈশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত আছে। হিউ-এন্ সাঙ্-এর বিবরণ হইতে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে এখানকার অধিবাসীরা বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ ছিল এবং বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধরা এক সঙ্গেই বাস করিত। এখানে কয়েক শত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু তৎকালে তিন চারিটি ব্যতীত আর সকলগুলিই ধ্বংসদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যাও খুব কম ছিল। পক্ষান্তরে দেবমন্দিরগুলির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল এবং তাহাদের সংখ্যাও কম ছিল না (there are some tens of Deva temptes)। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও বহু সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু দিগম্বর নির্গ্রন্থদের (অর্থাৎ জৈনদের) সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি ছিল বলিয়া মনে হয়।

২। মগধ (বর্ত্তমান পাটনা ও গয়া জিলা)—এই স্থানের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত ছিল। এখানে *পঞ্চাশটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল এবং তাহাতে দশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিত। ভিক্ষুদের অধিকাংশই মহাযানপন্থী। দেবমন্দির এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যাও কম ছিল। মগধের জৈন সম্প্রদায় সম্বন্ধে হিউএন্ সাঙ্ স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিবরণ হইতেই জানা যায় যে, প্রাচীন রাজগৃহ বা গিরিব্রজ (পাটনা জিলার অন্তর্গত আধুনিক রাজগির) নগরের অদূরবর্ত্তী 'বিপুল' নামক পর্ব্বতের উপরে একটি স্তূপ ছিল এবং ঐখানে বহু দিগম্বর জৈন বাস করিত ও তপস্যাদি করিত। তাহারা উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যের প্রতি মুখ ফিরাইয়া ধর্ম্ম সাধনা করিত (Beal II, 158; Walters II, 154-55)। তাহা ছাড়া, নালন্দাতেও (পাটনা জিলার বিহার মহকুমার অন্তর্গত বড়গাঁও নামক স্থান) দিগম্বর জৈনদের গতিবিধি ছিল বলিয়া অনুমান করিবার হেতু আছে (Beal II, 168)।

৩। ঈরণ-পর্ব্বত (মুঙ্গির জিলা)—মগধ হইতে পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ অরণ্য অতিক্রম করিয়া হিউএন্ সাঙ্ আনুমানিক ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈরণ পর্ব্বত নামক দেশে প্রবেশ করেন (Walters II 178 and 335)। এখানে তিনি দশ-বারোটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম এবং চারি সহস্রের অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিতে পান। ইহাদের অধিকাংশই হীনযান সম্প্রদায়ের সম্মিতীয় শাখাভুক্ত। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বারোটি দেবমন্দিরও তিনি দেখিতে পান। এইখানে হিউএন্ সাঙ্ এক বৎসর বাস করেন।

৪। চম্পা (ভাগলপুর জিলা)—ঈরণ পর্ব্বত হইতে তিনি চম্পা দেশে আসেন। এখানেও অনেকগুলি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। কিন্তু অধিকাংশই ধ্বংসদশাপ্রাপ্ত এবং এবং উহাদের অধিবাসী ভিক্ষুদের সকলেই হীনযানপন্থী) সংখ্যাও মাত্র দুই শতাধিক ছিল। দেবমন্দির ছিল প্রায় কুড়িটি। জৈনদের সম্বন্ধে তিনি কিছুই লিখিয়া যান নাই।

কিন্তু তৎকালে চম্পায় জৈন ধর্ম্মাবলম্বী কেহ ছিল না, এমন মনে করা যায় না। হিউএন্থ্ সাঙ্ বৌদ্ধ ছিলেন। তাই তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথা বিশেষ ভাবে বলিয়া অন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র করিয়া গিয়াছেন। এমন অবস্থায় তাঁহার নীরবতা হইতে কোনো সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হইবে না। মনে রাখা উচিত যে, আধুনিক কালেও ভাগলপুর সহরে একটি প্রসিদ্ধ জৈন মন্দির আছে।

৫। কজঙ্গল (আধুনিক রাজমহল)—হিউএন্থ্ সাঙ্ চম্পা হইতে কজঙ্গলে আসেন। এখানে তিনি ছয়-সাতটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, তিন শতাধিক ভিক্ষু এবং দশটি দেবমন্দির দেখিয়াছিলেন। জৈন সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই।

৬। পুণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তর বঙ্গ)—হিউএন্থ্ সাঙ্ কজঙ্গল হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসেন। এখানে তিনি কুড়িটি সঙ্ঘারাম ও তিন হাজারের অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিতে পান। ইঁহাদের অনেকে হীনযানপন্থী ও অন্যরা মহাযানপন্থী। দেবমন্দির ছিল প্রায় একশত এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। কিন্তু দিগম্বর নির্গ্রন্থদের (অর্থাৎ জৈনদের) সংখ্যাই ছিল সব চেয়ে বেশি।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর হইতে কিছুদূরে একটি স্তূপ অবস্থিত ছিল। হিউএন্থ্ সাঙ্ লিখিয়াছেন, এই স্তূপটি সম্রাট অশোক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ তথাগত বুদ্ধ এই স্থানে তিন মাস অবস্থান করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

৭। কামরূপ (আসামের অন্তর্গত গৌহাটি-অঞ্চল)—চৈনিক পরিব্রাজক পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পূর্ব্বদিকে যাত্রা করেন একটি বৃহৎ নদী (করতোয়া) অতিক্রম করিয়া কামরূপ রাজ্যে উপনীত হন। তিনি বলেন, কামরূপের অধিবাসীরা সকলেই দেবোপাসক। কামরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম কখনও প্রসার লাভ করে নাই এবং কামরূপে একটিও বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হয় নাই; যে সব বৌদ্ধরা কামরূপে বাস করিত তাহারা গোপনেই ধর্ম্মোপাসনাদি সমাপ্ত করিত। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রত্যেক সম্প্রদায়েই বহু লোক ছিল এবং দেবমন্দিরও ছিল কয়েক শত। জৈন ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। সম্ভবত' বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় জৈন ধর্ম্মও কামরূপে তখন পর্য্যন্ত বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

৮। সমতট (শ্রীহট্ট ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চল)—কামরূপ হইতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া হিউএন্থ্ সাঙ্ সমতটে আসেন। এখানে বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বাস ছিল। বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল ত্রিশটির অধিক এবং তাহাতে প্রায় দুই হাজার ভিক্ষু বাস করিত। এই ভিক্ষুরা ছিল সকলেই স্থবির-সম্প্রদায়-ভুক্ত। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবমন্দির ছিল প্রায় একশত। কিন্তু দিগম্বর নির্গ্রন্থদের সংখ্যাই ছিল সব চেয়ে বেশি।

সমতটের রাজধানী (কর্ম্মান্ত, কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী বড়কামতা) হইতে অদূরে একটি স্তূপ অবস্থিত ছিল। হিউএন্থ্ সাঙ-এর মতে এটি সম্রাট অশোকের নির্ম্মিত এবং এইস্থানে বুদ্ধদেব সাতদিন ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

৯। তাম্রলিপ্তি (মেদিনীপুরের অন্তর্গত আধুনিক তমলুক)—সমতট হইতে পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া হিউএন্থ্ সাঙ্ তাম্রলিপ্তিতে উপনীত হন। এখানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল দশটি এবং তাহাতে প্রায় এক হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিত। দেবমন্দির ছিল পঞ্চাশটির অধিক। তাম্রলিপ্তি নগরীর নিকটেই একটি স্তূপ ছিল এবং হিউএন্থ্ সাঙের মতে এটিও সম্রাট্ অশোকের নির্ম্মিত।

১০। কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জিলা)—সমতট হইতে উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া তিনি কর্ণসুবর্ণে আসেন। এখানে দশটি সঙ্ঘারামে দুই সহস্রাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিত। ইহারা সকলেই হীনযান সম্প্রদায়ের সম্মিতীয় শাখাভুক্ত ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবোপাসকদের মন্দির ছিল প্রায় পঞ্চাশটি।

কর্ণসুবর্ণ নগরের নিকটেই "রক্তমৃত্তিকা" নামে একটি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল এবং এই সঙ্ঘারামটির নিকটে কয়েকটি স্তূপ অবস্থিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকের মতে এই সব স্থানে বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন এবং সম্রাট্ অশোক পরবর্ত্তীকালে ঐ স্থানগুলিতে একেকটি করিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১১। ওড্র (উড়িষ্যা)—কর্ণসুবর্ণ হইতে পরিব্রাজক ওড্রদেশে যান। সেখানে একশতাধিক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও দশ সহস্র মহাযানপন্থী ভিক্ষু ছিল। দেবমন্দিরের সংখ্যা তিনি দিয়াছেন পঞ্চাশ। তা-ছাড়া, যেসব স্থানে বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন ঐসব স্থানে দশটি অশোক-স্তূপও অবস্থিত ছিল।

১২। কঙ্গোদ (গঞ্জাম জিলা)—এখানকার অধিবাসীরা সকলেই ছিল দেবোপাসক। এদেশে বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল না। দেবমন্দির ছিল শতাধিক।

১৩। কলিঙ্গ (উড়িষ্যার দক্ষিণে)—এখানে বৌদ্ধের সংখ্যা ছিল খুবই কম। মাত্র দশটি সঙ্ঘারাম ও পাঁচ শত মহাযানপন্থী ভিক্ষু তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। অবৌদ্ধের সংখ্যা ছিল খুব বেশি এবং তাহাদের মধ্যে দিগম্বর নির্গ্রন্থরাই ছিল সংখ্যায় গরিষ্ঠ। দেব মন্দিরের সংখ্যা দিয়াছেন এক শত।

ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্ব্ব ভারতে (তথা বাঙলায়) পৌরাণিক হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মই সমানভাবে প্রচলিত ছিল। তখন বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের দুইটি শাখাই অর্থাৎ হীনযান ও মহাযান এই দুইটি শাখাই বিদ্যমান ছিল, একথাও চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ হইতেই স্পষ্টরূপে জানা যায়। কিন্তু এই সময়ে বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমেই ক্ষীণবল হইয়া আসিতেছিল, এরূপ অনুমান হয়। কারণ হিউএন্থ্‌সাঙ্‌ নিজেই বলিয়াছেন যে, কোনো কোনো স্থানে (যথা বৈশালী ও চম্পা) বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলির অধিকাংশই ধ্বংসদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিউএন্থ্‌সাঙ্‌-এর পূর্ব্ববর্ত্তী চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তি নগরীতে দুই বৎসরকাল (৪০৯-৪১১) বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সে-সময়ে তাম্রলিপ্তি জনপদে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং উক্ত জনপদে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল বাইশটি। কিন্তু হিউএন্থ্‌সাঙ্‌-এর সময়ে ছিল মাত্র দশটি। সুতরাং দেখিতেছি দুইশত ত্রিশ বৎসরের (৪০৯-৬৩৯) মধ্যে তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেকখানি অবনতি ঘটিয়াছিল। হিউএন্থ্‌সাঙের বিবরণীতে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকেও কামরূপ, কঙ্গোদ ও কলিঙ্গ এই তিনটি জনপদে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব্ব ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈন ধর্ম্মের মধ্যে বহু শতাব্দী-ব্যাপী প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। তাহারই ফলে উক্ত তিনটি জনপদে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই এবং ঐ প্রতিযোগিতার ফলেই তাম্রলিপ্তিতেও ফাহিয়ানের সময় হইতে হিউএন্থ্‌সাঙ্‌-এর সময় পর্য্যন্ত এই প্রায় আড়াই শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এতটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

হিউএন্থ্‌সাঙ্‌-এর বিবরণ হইতেই জানিতেছি, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকেও পূর্ব্ব ভারতে জৈন ধর্ম্ম যথেষ্ট প্রবল ছিল। উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকছিলেন বৌদ্ধ। তাই তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধেই বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। জৈন বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াই কাজ সারিয়াছেন। তথাপি দেখিতেছি বৈশালী, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট এবং কলিঙ্গ এই চারিটি জনপদে দিগম্বর জৈন-সম্প্রদায়ই ছিল সংখ্যায় গরিষ্ঠ। মগধেও বহু জৈন ছিল। তা-ছাড়া, অন্যান্য জনপদগুলিতেও যে যথেষ্ট-সংখ্যক জৈন ছিল না এমন মনে করা সঙ্গত বোধ হয় না। ঐসব জনপদগুলিতে জৈনরা সংখ্যাগৌরবে অপেক্ষাকৃত হীন ছিল, বলিয়াই হিউএন্থ্‌সাঙ্‌ সে বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধেও তিনি নীরব। কোন্‌ জনপদে কতগুলি দেবমন্দির ছিল তিনি শুধু সে কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কোন্‌ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কত এবং কোন্‌ সম্প্রদায়ের কয়টি মন্দির ছিল সেবিষয়ে তিনি কিছুই বলেন নাই। তথাপি সে সময়ে বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কোন্‌ কোন্‌ সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদ অবগত হইবার উপাদান আমাদের আছে। এস্থলে সে বিষয়ে বেশি আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। সুতরাং সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা বলিয়াই নিরস্ত হইব। আমরা জানি কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক ছিলেন শৈব এবং তাঁহার পরম শত্রু কর্ণসুবর্ণ বিজেতা কামরূপরাজ

ভাস্কর বর্ম্মন্‌ও ছিলেন শিবোপাসক। কিন্তু কর্ণসুবর্ণপতি জয়নাগ ছিলেন পরম ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব (E. P. Ind. XVIII, p. 63)। বাঙ্‌লায় যে গুপ্ত সম্রাটরা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন বৈষ্ণব। তাঁহাদের রাজত্ব কালে বাঙ্‌লায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল, এরূপ মনে করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ ঐ সময়ের তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের রাজত্বকালে বাঙ্‌লা দেশে বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দামোদরপুরে প্রাপ্ত দুইখানি তাম্রশাসন (চতুর্থ ও পঞ্চম) হইতে জানা যায় যে, সম্রাট্ বুধগুপ্ত (৪৭৭-৪৯৬) এবং তৃতীয় কুমার গুপ্তের (৫৪৩) আমলে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিতে কোকামুখ স্বামীর জন্য একটি এবং শ্বেত বরাহ স্বামীর জন্য দুইটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন্থ্ সাঙ্‌ এই সব দেবমন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। শুশুনিয়া পর্ব্বতলিপি (E. P. Ind. XIII. p. 133) হইতে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পুষ্করণার (বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বর্ত্তমান পোখরণ নামক গ্রাম) অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মন্ ছিলেন চক্রস্বামীর (অর্থাৎ বিষ্ণুর) উপাসক।

গুপ্তযুগে (খ্রীঃ ৩১৯—৫৫০) বাঙ্‌লা দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল অর্থাৎ কোন্ কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দির নির্ম্মাণ ও উপাসনা হইত সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। সে-সময়ে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মও যথেষ্ট প্রবল ছিল এবং সম্ভবত' সপ্তম শতাব্দী অপেক্ষা প্রবলতরই ছিল, ফাহিয়ানের বিবরণ হইতে এই অনুমান হয়। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ফাহিয়ান (৪০৫-৪১১) বাঙ্‌লা দেশের ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া যান নাই। তিনি শুধু চম্পা (ভাগলপুর) এবং তাম্রলিপ্তির সামান্য কিছু বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন (Legge p. 100)।

গুপ্তযুগে বাঙ্‌লা দেশে জৈন-সম্প্রদায়ের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে বিষয়েও সবিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ সময়ও বাঙ্‌লায় নিশ্চয়ই জৈন ধর্ম্মের প্রভাব খুব বেশি ছিল। নতুবা হিউএন্থ্ সাঙ্‌-এর সময়ে বাঙ্‌লায় জৈনদের এতখানি প্রভাব থাকা সম্ভব হইত না। পাহাড়পুরে (রাজসাহি জিলায়) প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, ৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নাথশর্ম্মা এবং রামী নামে ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুণ্ড্রবর্দ্ধনের (বগুড়া জিলার অন্তর্গত বর্ত্তমান মহাস্থানগড়) নিকটবর্ত্তী "বটগোহালী" (আধুনিক গোয়াল ভিটা, পাহাড়পুরের নিকটে) নামক স্থানের জৈন বিহারের পূজার্চ্চনাদি কার্য্যের সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে কিছু জমি দান করিয়াছিলেন। তৎকালে উক্ত বিহারে শ্রমণাচার্য্য নির্গ্রন্থ গুহনন্দীর শিষ্য-প্রশিষ্যরা অধিষ্ঠিত ছিলেন (E. P. Ind. XX. pp. 61-63)। ইহা হইতে বোঝা যায়, গুপ্তযুগে বাঙ্‌লা দেশে জৈন ধর্ম্ম শুধু যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তা নয়, সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণরাও জৈনধর্ম্ম ও জৈন আচার্য্যদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিত এবং কাষ্যত' ভূমিদান করিয়া সহায়তা করিত। ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, বটগোহালীর এই জৈন বিহারটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল এবং সপ্তম শতকের প্রথমভাগে হিউএন্থ্ সাঙ্‌ পুণ্ড্রবর্দ্ধন জনপদে বহু দিগম্বর নির্গ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৩০০ অব্দে পাটলিপুত্র নগরে জৈন-সম্প্রদায়ের একটি সভা আহূত হয় এবং ঐ সভাতে জৈনদের ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ যথাযথ ভাবে বিভক্ত ও বিন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ঐ শাস্ত্রসমূহ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। তাই গুপ্ত সম্রাটদের অভ্যুদয়ের চরম সময়ে ৪৫৪ খৃষ্টাব্দে গুজরাতের অন্তর্গত বলভী নগরীতে জৈনদের আরেকটি সভা আহূত হয় এবং ঐ সভাতে জৈন শাস্ত্রসমূহ নূতন ভাবে বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ হয়। এই শাস্ত্র গ্রন্থসমূহই বর্ত্তমানে জৈন ধর্ম্মের ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকদের প্রধান অবলম্বন। এই গ্রন্থগুলি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু এগুলি ঐ সময়ে রচিত হয় নাই। তাই এই গ্রন্থসমূহ হইতে বহু প্রাচীন তথ্য জানিতে পারা যায়। অবশ্য স্থানে স্থানে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের প্রভাবও এই গ্রন্থগুলিতে দেখা যায়।

যাহা হোক্, এই শাস্ত্রসমূহের অন্যতম প্রধান গ্রন্থের নাম কল্পসূত্র। এই গ্রন্থখানি হইতে জৈন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার নাম জানিতে পারা যায়। এই শাখাগুলির মধ্যে এস্থলে তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া এবং (দাসী) কর্ব্বটিকা বা খর্ব্বটিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাম্রলিপ্তি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুকের প্রাচীন নাম। প্রাচীন কোটীবর্ষ নগর দিনাজপুর জিলায় অবস্থিত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বগুড়া জিলার অন্তর্গত মহাস্থানগড় নামক স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে কর্ব্বট জনপদের উল্লেখ পাই। বরাহ মিহিরের (মৃত্যু ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) 'বৃহৎ সংহিতা' নামক গ্রন্থেও কর্ব্বট জনপদের উল্লেখ আছে। এই জনপদটি রাঢ় অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে তাম্রলিপ্তির নিকটেই অবস্থিত ছিল। যাহা হোক্, তাম্রলিপ্তি, কর্ব্বট, কোটিবর্ষ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন এই চারিটি স্থান গুপ্তযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পূর্ব্বোক্ত জৈন কল্পসূত্র গ্রন্থখানিও খ্রীষ্টীয় ৪৫৪ অব্দে সম্রাট্ কুমারগুপ্তের রাজত্ব সময়ে (৪১৫-৪৫৫) লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে বাঙ্লা দেশে তাম্রলিপ্তি, কোটিবর্ষ প্রভৃতি চারিটি স্থানে জৈনধর্ম্ম বিশেষ প্রবল ছিল। পূর্ব্বোক্ত পাহাড়পুর তাম্রশাসন হইতে বটগোহালী নামক স্থানে অবস্থিত যে জৈন বিহারের কথা জানা গিয়াছে তাহা পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর হইতে খুব দূরে ছিল না। সুতরাং একথা মনে করা যাইতে পারে যে, বটগোহালী-বিহারের অধিবাসী নিগ্রর্ন্থ অর্থাৎ জৈনরা পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই সময় হইতে কিছু পরবর্ত্তী কালে হিউএন্থ্সাঙ্ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে যে-সমস্ত নিগ্রর্ন্থদিগকে দেখিয়াছিলেন তাহারাও এই শাখাভুক্তই ছিল। ফা হিয়ান এবং হিউএন্থ্সাঙ্ উভয়েই তাম্রলিপ্তি নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহাদের কেহই তাম্রলিপ্তির জৈন সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। অথচ দেখিতেছি তাম্রলিপ্তি জৈনদের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। সেজন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিউএন্থ্সাঙ্-এর নীরবতা হইতে কোনো সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয় এবং যে-সব জনপদের বর্ণনায় তিনি জৈনদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই সে-সব জনপদেও অল্পবিস্তর জৈন ছিল বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে।

অতএব আমরা দেখিতেছি, গুপ্তযুগে বাঙ্লা দেশে জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও শৈব এই চারিটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ই বেশ প্রতিপত্তির সহিত বিদ্যমান ছিল। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই ধর্ম্মগুলি কিরূপে ও কোন্ সময় বাঙ্লা দেশে বিস্তার লাভ করিল এবং কোন্ ধর্ম্মটি সকলের আগে এদেশে প্রাধান্য লাভ করে। দুঃখের বিষয় বাঙ্লাদেশের প্রাক্-গুপ্তযুগের ইতিহাস বড়ই তমসাচ্ছন্ন। নানাস্থান হইতে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া উপাদান সংগ্রহ করিয়া যে ইতিহাসটুকু রচনা করা যায় তাহাও ধর্ম্ম বিষয়ক নয়। কাজেই গুপ্তযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক শতাব্দীর ধর্ম্ম বিষয়ক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বৃথা। অথচ এই সময়ে যে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি বাঙ্লায় অবিরাম প্রসার লাভ করিতেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাচীন নাম ভাগবত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মটির উৎপত্তি অতি প্রাচীন কালেই হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক্‌দূত মেগাস্থিনিস্ মথুরা অঞ্চলে এই ধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে তক্ষশিলার গ্রীক্‌রাজ Antialcidas পঞ্চম শুঙ্গরাজ ভাগভদ্রের বিদিশাস্থিত রাজসভায় হেলিওডোরাস্ নামক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই যবন (অর্থাৎ গ্রীক্) দূত ভাগবত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পরম ভাগবত যবন হেলিওডোরাসের প্রসঙ্গে পরবর্ত্তীকালের পরম বৈষ্ণব যবন হরিদাসের কথা স্বভাবতই মনে আসে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মগধের গুপ্তসম্রাটরা সকলেই ছিলেন ভাগবত সম্প্রদায় ভুক্ত। অতএব খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভাগবত ধর্ম্ম বাঙ্লায় ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মন্ ছিলেন চক্রস্বামীর উপাসক, এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাই বাঙ্লায় ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম নিদর্শন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে 'কোকামুখ' নামক দেবতার জন্য একটি মন্দির নির্ম্মিত

হুইয়াছিল। এই কোকামুখ সম্ভবত' শিবের একরূপ। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাকেই বাঙলায় শৈবধর্ম্মের প্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। পরবর্ত্তী কালে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক ও কর্ণসুবর্ণ বিজেতা ভাস্করবর্ম্মন্ উভয়েই শৈব ছিলেন। শৈবধর্ম্ম বাঙলায় কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিল তাহা বর্ত্তমানে বলা দুষ্কর। এই ধর্ম্মটি ভারতবর্ষের একটি আদিম ধর্ম্ম। সিন্ধুদেশের অন্তর্গত মোহেঞ্জোদড়ো নামক স্থানে শিবলিঙ্গ, শিবমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক শৈব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদের দেবতা রুদ্রকেও অনেকে শিব হইতে অভিন্ন মনে করেন। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন বাঙলার প্রাচীনতম অধিবাসী অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি tribe বা জনগুলির মধ্যে তান্ত্রিক লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। এই লিঙ্গপূজার সহিত প্রাগৈতিহাসিক শৈবধর্ম্মের যোগ থাকা বিচিত্র নয়। যদি তাহাই হয় তবে বলিতে হইবে শৈব ধর্ম্ম বাঙলার আদি ধর্ম্ম। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে যে শৈবধর্ম্মের প্রচলন দেখিতে পাই তাহা অনেকাংশেই আদিম শৈবধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র। এই পরবর্ত্তী শৈব ধর্ম্মকে নব-শৈবধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই নব-শৈবধর্ম্মের সুস্পষ্ট প্রাচীন নিদর্শন পাই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কুষাণ রাজাদের মুদ্রায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও শিবোপাসনার উল্লেখ আছে। ঐ সময়ের কত পূর্ব্বে বা কত পরে এই নূতন শৈবধর্ম্ম বাঙলায় প্রবেশ করে তাহা বলা সম্ভব নয়।

এই কুষাণ যুগেই মহাযান ও হীনযান এই দুইটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। আমরা দেখিয়াছি হিউএন্থ্সাঙ্-এর সময়ে বাঙলা দেশে হীনযান ও মহাযান এই উভয় সম্প্রদায়ের বৌদ্ধই ছিল। কুষাণযুগে বৌদ্ধদের মধ্যে যে নূতন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় তাহারই নাম মহাযান। এই মহাযানী বৌদ্ধরা প্রাচীনপন্থীদিগকে হীনযান আখ্যা দান করে। সুতরাং হিউএন্থ্সাঙ্-এর সময়ে বাঙলায় যে হীনযান সম্প্রদায় ছিল সেটিই বাঙলার প্রাচীনতর বৌদ্ধ সম্প্রদায়, একথা মনে করা যাইতে পারে। মহাযান সম্প্রদায় অবশ্যই কুষাণযুগের পরে বাঙলায় প্রসার লাভ করে। কিন্তু কিভাবে বাঙলায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিল সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

গুপ্তযুগে বাঙলাদেশে শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্ম্ম ছাড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মও প্রচলিত ছিল। আমরা গুপ্তসম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের (৪১৫-৪৫৫) সময়ের দুইখানি (৪৪৩ এবং ৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দের) তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে, ঐ সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে (অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে) ব্রাহ্মণরা অগ্নিহোত্র, পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম করিত। এই বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বাঙলায় কোন্ সময় প্রবেশ লাভ করিল সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভাগবত, শৈব প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া একথা মনে করিবার হেতু আছে যে, খ্রীষ্টের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক শতাব্দীতেও বাঙলায় জৈন, বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম (অপরমতে দ্বিতীয়) শতকে কলিঙ্গাধিপতি খারবেল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতিগুম্ফা লিপি হইতে জানা যায়, তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং জৈন-সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। স্বীয় রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে তিনি কলিঙ্গনগরে জৈন-সম্প্রদায়ের একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ঐ সভায় জৈন শাস্ত্রসমূহ আলোচিত হইয়াছিল। ঐ বৎসরই তিনি জৈনদিগকে বহু শ্বেতবস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ব বৎসরে তিনি নন্দরাজ কর্ত্তৃক কলিঙ্গ হইতে নীত একটি জিনমূর্ত্তি মগধ হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সমস্ত তথ্য হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, ঐ সময়ে কলিঙ্গ রাজ্য জৈন সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, কলিঙ্গের সঙ্গে বঙ্গের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং যে সময়ে কলিঙ্গে জৈনধর্ম্মের এতখানি প্রাধান্য ছিল সে সময়ে বাঙলাদেশেও যে ঐ ধর্ম্মের অনেকখানি প্রভাব ছিল এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, হিউএন্থ্সাঙ্ও কলিঙ্গদেশে জৈন সম্প্রদায়ের প্রভাবই সব চেয়ে বেশি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন

এবং তৎকালে বাঙ্‌লাদেশের নানাস্থানেও জৈন প্রভাব খুব বেশি ছিল। উক্ত হাতিগুম্ফা লিপি হইতেই আরও জানা যায়, সম্রাট্ খারবেলের রাজত্বকালে কলিঙ্গে ব্রাহ্মণেরও অভাব ছিল না এবং সম্রাট্ নিজে জৈন হইলেও তিনি ব্রাহ্মণদের প্রতিও যথেষ্ট দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিতেন। হাতিগুম্ফা লিপিতে বৌদ্ধদের কোনো উল্লেখ নাই।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের (২৭২-২৩২) সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি স্বীয় রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে (২৬০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ) কলিঙ্গ রাজ্য জয় করেন (Rock Edict XIII)। বঙ্গদেশ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা এ বিষয়ে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বঙ্গদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট পরোক্ষ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ অশোক নিজেই দুইটি অনুশাসনে (R. E. II, XIII) স্বীয় সাম্রাজ্যের বহির্ভূক্ত প্রত্যন্ত রাজ্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত প্রত্যন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্রপর্ণী (অর্থাৎ সিংহল) এই পাঁচটিই দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত ছিল। অন্যান্য প্রত্যন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে কোনোটিই ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল না। সকলগুলিই ভারতবর্ষের বাহিরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। লক্ষ্য করার বিষয় দুইবারের একবারও অশোক প্রত্যন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে পূর্ব্ব ভারতের (তথা বাঙ্‌লার) কোনো জনপদের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং স্বভাবতই অনুমান হয় যে, বাঙ্‌লাদেশ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্তই ছিল। আর ইহাই স্বাভাবিক। কারণ মগধের অব্যবহিত প্রান্তবর্ত্তী হইয়া বাঙলাদেশের পক্ষে বিরাট্ শক্তিশালী মৌর্য্য সাম্রাজ্য হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউএন্থ্‌সাঙ্‌ পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও ওড্র এই স্থানগুলিতে কয়েকটি বৌদ্ধ স্তূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎকালে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, এই সব স্থানে বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাই পরবর্ত্তীকালে অশোক ঐ সব স্থানে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর এই প্রচলিত ধারণা কতদূর সত্য অর্থাৎ বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন কিনা এবং ঐ সব স্তূপ সত্যই অশোকের নির্ম্মিত কিনা, তাহা বর্ত্তমান সময়ে নিঃসংশয় রূপে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু তথাপি বাঙ্‌লাদেশে অশোকের রাজত্ব ও স্তূপ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সপ্তম শতকের প্রচলিত ধারণা একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না। তাহার প্রথম কারণ এই যে, অশোক স্বীয় সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে বাঙ্‌লার কোনো জনপদের উল্লেখ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, দিব্যাবদান গ্রন্থে অতি স্পষ্টরূপেই পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরকে অশোকের রাজ্যভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়। উক্ত গ্রন্থে অন্যত্র বলা হইয়াছে, পূর্ব্বদিকে "পুণ্ড্রবর্দ্ধন" নামক নগর, তৎপূর্ব্বে "পুণ্ড্রকক্ষ" নামক পর্ব্বত, তৎপরে প্রত্যন্ত। এই প্রত্যন্ত কিসের ও কোন্ সময়ের সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই। কথাটি অবশ্য বুদ্ধদেবের মুখে বসানো হইয়াছে। কিন্তু মনে হয় ঐ "পুণ্ড্রকক্ষ" পর্ব্বত অশোকের সাম্রাজ্য ও তৎকালীন বৌদ্ধ প্রভাবের সীমান্ত বলিয়া গণ্য হইত। যদি তাহাই হয় তবে অনুমান করিতে হইবে যে, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী কামরূপ অশোকের সাম্রাজ্যের ও বৌদ্ধজগতের সীমার বাহিরে ছিল এবং এই জন্যই সপ্তম শতকেও হিউএন্থ্‌সাঙ্‌ কামরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পান নাই। পুণ্ড্রবর্দ্ধন যে অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহার প্রমাণ অশোকাবদান প্রভৃতি অন্যান্য বৌদ্ধ রচনা হইতেও পাওয়া যায়। সিংহলের মহাবংশ নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তাম্রলিপ্তিও অশোকের রাজ্যভুক্তই ছিল। অশোকাবদানেও তাহার অনুকূল প্রমাণ আছে। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় বাঙ্‌লা দেশে যে অশোক রাজত্ব করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এখন দেখা যাক্, অশোকের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৭২-২৩২) বাঙ্‌লা দেশে কোন্ কোন্ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। প্রথমত, বৌদ্ধধর্ম্ম যে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও বহু দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সে কথা এখন আর কাহারও

অজানা নাই। সুতরাং বাঙ্‌লায়ও তাঁহার প্রচারকার্য্য চলিয়াছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের সময়েই কলিঙ্গ দেশে বহু ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তাহা ছাড়া, অশোক নিজেই বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে একমাত্র যবন-জনপদ ছাড়া এমন কোনো জনপদ নাই যেখানে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ নাই এবং যেখানকার অধিবাসীরা কোনো না কোনো সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল না। সুতরাং কলিঙ্গের ন্যায় বঙ্গেও বহু ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ (বৌদ্ধ ভিক্ষু) ছিল। সিংহলের মহাবংশ ও দ্বীপবংশ নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে জানা যায়, অশোক পূর্ব্বদিকে সুবর্ণভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মদেশেও ধর্ম্ম প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সময়ে যে বাঙ্‌লা দেশের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং হিউএন্থ সাঙ্‌-এর সময়ে বাঙ্‌লার পূর্ব্বতম প্রান্ত সমতটেও বহু বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, বৌদ্ধভিক্ষু এবং অশোক স্তূপ বিদ্যমান থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু অশোকের প্রচারের ফলে বাঙ্‌লায় বৌদ্ধধর্ম্ম কতখানি প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। অন্যান্য জনপদের ন্যায় কলিঙ্গেও তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কলিঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। আমরা দেখিয়াছি জৈন সম্রাট্ খারবেল এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ সাঙ্‌-এর সময়েও কলিঙ্গে জৈন ধর্ম্মেরই প্রাধান্য; সপ্তম শতকে সেখানে বৌদ্ধদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আমরা পরে দেখিব অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগেও কলিঙ্গে জৈনধর্ম্মের প্রভাবই বেশি ছিল। কলিঙ্গের ন্যায় বঙ্গেও অশোকের প্রচারের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বেশি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। হিউএন্থ সাঙ্‌-এর সময়ে বাঙ্‌লার পূর্ব্বতম প্রান্তে অর্থাৎ সমতটে বহু বৌদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু দিগম্বর জৈনদের সংখ্যাই ছিল সব চেয়ে বেশি। সমতটের ন্যায় পুণ্ড্রবর্দ্ধনেও জৈনরাই ছিল সংখ্যায় গরিষ্ঠ। পূর্ব্বে দেখিয়াছি গুপ্তযুগেও বাঙ্‌লায় জৈনদের প্রভাব খুব বেশি ছিল এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কোটিবর্ষ, তাম্রলিপ্তি ও কর্ব্বট ছিল তাহাদের প্রধান কেন্দ্র।

সুখের বিষয়, অশোকের সময়েও যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে জৈনদের বিশেষ প্রভাব ছিল তাহার প্রমাণ আছে। দিব্যাবদান, অশোকাবদান, সুমাগধাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ সাহিত্য হইতেই জানা যায়, অশোকের রাজত্বের সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে নির্গ্রন্থদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং নির্গ্রন্থ ও সদ্ধর্ম্মী (অর্থাৎ বৌদ্ধ) সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। আমরা পরে দেখিব পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি জায়গায় জৈন ধর্ম্মের প্রসার অশোকের বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল।

এস্থলে বিশেষ ভাবে বলার কথা এই যে, অশোকের রাজত্বকালে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে শুধু যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মই প্রচলিত ছিল তা নয়, গোসাল মস্করিপুত্রের (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০-৪৮৪) প্রবর্ত্তিত আজীবিক ধর্ম্মও এই সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে প্রচলিত ছিল। শুধু তাহাই নয়। দিব্যাবদানের একটি উপাখ্যান হইতে দেখা যায়, সে সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আঠারো হাজারেরও বেশি আজীবিক ছিল। অশোকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আজীবিক ধর্ম্মের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে অন্য স্বতন্ত্র প্রমাণও আছে। একটি অনুশাসনে (Pillar Edict VII) অশোক বলিয়াছেন, তিনি বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের উপকারার্থ ধর্ম্ম-মহামাত্রদের নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, আমরা আরও জানি, অশোক খলতিক (গয়া জিলার অন্তর্গত 'বরাবর') নামক পর্ব্বতে আজীবিকদের জন্য তিনটি গুহা নির্ম্মান করাইয়া দিয়াছিলেন। অশোকের পৌত্র দশরথও খলতিক পর্ব্বতের নিকটেই নাগার্জ্জুন নামক পর্ব্বতে আজীবিকদের জন্য আরও তিনটি গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অতএব খ্রীঃপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে মগধে আজীবিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐ সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি বাঙ্‌লার বিভিন্ন স্থানেও তাহাদের প্রতিপত্তি থাকা কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। বাঙলায় আজীবিক ধর্ম্ম কখন প্রবেশ করিল এবং ঐ সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব কি সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করিব। এস্থলে শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, পরবর্ত্তীকালে আজীবিক ধর্ম্ম কিরূপে ও কখন ভারতবর্ষ তথা বাঙ্‌লা হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল তাহা নিঃসংশয় রূপে জানা যায় না। তবে আজীবিক সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে জৈন সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল, এরূপ মনে করিবার পক্ষে কিছু কিছু প্রমাণ আছে।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩২২-২৯৮) ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের চেয়ে জৈন ধর্ম্মই প্রবলতর ছিল বলিয়া মনে হয় এবং চন্দ্রগুপ্ত নিজেও সম্ভবত জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে জৈন ধর্ম্ম দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত সুদূর কর্ণাটদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। জৈন সাহিত্যে দেখা যায়, চন্দ্রগুপ্ত চব্বিশ বৎসর রাজত্বের পর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া কর্ণাটে চলিয়া যান এবং সেখানে বর্ত্তমান মহীশূরের অন্তর্গত "শ্রবণ বেলগোলা" নামকস্থানে জৈন ভিক্ষুরূপে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই জৈন প্রবাদটী ঐতিহাসিকরা অবিশ্বাস করেন নাই। যাহা হোক, যে-সময়ে জৈন ধর্ম্ম সুদূর কর্ণাট পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় একচ্ছত্র সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল সে সময়ে ঐ ধর্ম্ম যে মগধের প্রান্তবর্ত্তী বাঙ্‌লা দেশেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তাম্রলিপ্তি, কোটিবর্ষ, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও কর্ব্বট এই চারিটি স্থানের নামে জৈন সম্প্রদায়ের চারিটি শাখা ছিল। এই সকল স্থানে জৈন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অশোকের পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা সঙ্গত। কারণ আমরা দেখিয়াছি অশোকের রাজত্বকালেও পুণ্ড্রবর্দ্ধনে জৈন (এবং আজীবিক) ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউএন্থ্‌সাঙ্‌-এর সময়েও পুণ্ড্রবর্দ্ধনে জৈন সম্প্রদায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের চেয়ে প্রবলতর ছিল; সুতরাং অশোকের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বাঙ্‌লা দেশে জৈন ধর্ম্ম বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

মৌর্য্যবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী মগধের নন্দরাজবংশও খুব সম্ভবত জৈন ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল (Oxford Hist, Smith—p. 75)। আমরা কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপি হইতে জানি, নন্দবংশীয় কোনো রাজা কলিঙ্গ হইতে একটি জিন-মূর্ত্তি মগধে লইয়া আসিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন এই নন্দরাজ পুরাণের 'সর্ব্বক্ষত্রান্তক' 'একরাট' মহাপদ্ম নন্দ ব্যতীত আর কেহই নহেন। মহাপদ্ম নন্দই সম্ভবত কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। যাহা হোক, হাতিগুম্ফা-লিপির ঐ উক্তিটুকু হইতে নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে মগধের নন্দ-রাজবংশ জৈন ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সে-সময়ে জৈন ধর্ম্ম বৈশালী ও মগধ হইতে সুদূর কলিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং সে সময়ে বাঙ্‌লা দেশও জৈন ধর্ম্মের প্রভাবের বাহিরে ছিল না, এমন অনুমান করিতে পারি। একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব, এই অনুমান একেবারেই অমূলক নহে।

নন্দবংশের পূর্ব্বে মগধের হর্য্যঙ্ক রাজবংশও জৈনধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী ছিল। এই বংশের সুবিখ্যাত রাজা বিম্বিসার (বা শ্রেণিক) এবং তৎপুত্র অজাতশত্রু (বা কূণিক) জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বৈশালীর বর্দ্ধমান মহাবীরের সহিত ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন (Camb. Hist. p. 157)। বিম্বিসার (৫৪৩-৪৯১) ও অজাতশত্রু (৪৯১-৪৫৯) ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত। কারণ ইঁহাদের রাজত্বকালেই মগধের বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ইঁহাদের রাজত্বকালেই বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ভারতবর্ষের এই তিনটি প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গৌতমবুদ্ধ (জন্ম ৫৬৩, নির্ব্বাণ ৫২৭, মৃত্যু ৪৮৩), জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বর্দ্ধমান মহাবীর (জন্ম ৫৪০, কৈবল্য ৪৯৮, মৃত্যু ৪৬৮) এবং আজীবিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গোসাল মস্খলিপুত্র (কৈবল্য ৫০০, মৃত্যু ৪৮৪) ইঁহাদের রাজত্বকালেই নিজেদের ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। বিম্বিসার এবং অজাতশত্রু বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং উভয়ের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতিই অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন বলিয়া বোধ হয়। তবে অজাতশত্রু সম্ভবত পরবর্ত্তী কালে জৈনধর্ম্মের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন (Camb. Hist. pp. 160-61 and 163)। অজাতশত্রুর পুত্র উদয় বা উদায়ীও (৪৫৯-৪৪৩) সম্ভবত জৈন ধর্ম্মাবলম্বীই ছিলেন (ঐ, p. 164)। অজাতশত্রু এবং তৎপুত্র উদয়ের সময় হইতেই জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের চেয়ে প্রবলতর হইয়া উঠিয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সময়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অশোকের পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জৈনধর্ম্মের প্রভাবই বেশি ছিল বলিয়া বোধ হয় এবং এই সময়েই জৈনধর্ম্ম বাঙ্‌লাদেশে প্রাধান্ত স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। সুখের বিষয়। এই অনুমানের অনুকূল প্রমাণও যথেষ্ট রহিয়াছে। এস্থলে সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

বুদ্ধদেব নিজে কিংবা তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যরা বাঙ্‌লাদেশে কখনও বিশেষ ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এমন কোনো নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। বস্তুত সমগ্র প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে বাঙ্‌লা দেশ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখই নাই বলিলে চলে। বাঙ্‌লা দেশ সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যের এই নীরবতা ঐতিহাসিকদের নিকট বিস্ময়কর বোধ হইয়াছে। বাঙ্‌লা দেশ সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে যে দুয়েকটি উল্লেখ আছে সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। বৌদ্ধ সংযুক্ত নিকায়ের তিন স্থলে বলা হইয়াছে, এক সময়ে ভগবান্ বুদ্ধ সুম্ভদের (অর্থাৎ সুহ্মদের) সেদক বা সেতক নামক নিগমে (অর্থাৎ নগরে) বিহার করিতেছিলেন। "তেলপত্ত" জাতকে আছে সুম্ভরট্‌ঠে অর্থাৎ সুহ্মরাষ্ট্রে দেসক নামক নিগমের নিকটবর্ত্তী কোনো বনে বাস করিবার সময় ভগবান্ বুদ্ধ জনপদকল্যানিসুত্ত সম্বন্ধে শিষ্যদের নিকট একটি উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। এই সেদক বা দেসক সম্ভবত একই। এই দুইটি উক্তি হইতে মনে হয় বুদ্ধদেব কোনো সময়ে সুহ্মদেশে অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ়ে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় বুদ্ধদেবের বাঙ্‌লা দেশে ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে আর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ পালিসাহিত্যে বঙ্গীশ এবং উপসেন বঙ্গন্তপুত্ত নামে দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর নাম পাওয়া যায়। বুদ্ধ ঘোষের মনোরথপূরণী নামক টীকায় বঙ্গন্তপুত্ত কথার অর্থ করা হইয়াছে বঙ্গন্ত-ব্রাহ্মণের পুত্র। কিন্তু বঙ্গন্ত-ব্রাহ্মণ বলিতে কি বোঝায় তাহা আমরা জানি না। সুতরাং বঙ্গীশ এবং বঙ্গন্তপুত্তের সঙ্গে বঙ্গদেশের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। অঙ্গুত্তর নিকায়ে সুবিখ্যাত ষোল জনপদের তালিকায় একবার মাত্র বঙ্গের নাম পাওয়া যায়। অন্য সর্ব্বত্রই কিন্তু ষোল জনপদের তালিকায় বঙ্গের পরিবর্ত্তে বংস অর্থাৎ বৎস জনপদের নাম দেখা যায়। তাহাতে মনে হয় অঙ্গুত্তর নিকায়ের তালিকায় ভ্রমক্রমে বংসের পরিবর্ত্তে বঙ্গ লেখা হইয়াছিল। অবশ্য ঐ সময়ে বঙ্গ জনপদ বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে বাঙলাদেশ সম্বন্ধে আর কোনো উল্লেখ নাই। সুতরাং মনে হয় বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পর প্রথম দুয়েক শতাব্দীতে ঐ ধর্ম্ম বাঙলাদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে জৈনসাহিত্যে বাঙলা দেশ খুব গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে। "ভগবতী" নামক পঞ্চম জৈন অঙ্গে যে ষোলটি জনপদের নাম দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে অঙ্গ ও বঙ্গের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, এমন কি মগধের পূর্ব্বে। এই তালিকায় রাঢ় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নামও আছে। তার পর প্রজ্ঞাপনা নামক চতুর্থ জৈন উপাঙ্গে ভারতবর্ষের আর্য্য অধিবাসীদিগকে নয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তার মধ্যে প্রথম ভাগে ক্ষত্রিয় জাতিগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রথম ভাগের মধ্যেই অঙ্গ (রাজধানী চম্পা), বঙ্গ (রাজধানী তাম্রলিপ্তি), কলিঙ্গ (রাজধানী কাঞ্চনপুর) এবং রাঢ়া (রাজধানী কোড়িবরিস অর্থাৎ কোটিবর্ষ) এই কয়টি জনপদের উল্লেখ আছে। সুতরাং দেখিতেছি জৈনসাহিত্যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং রাঢ় আর্য্য ও ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদা পাইয়াছে। তারপর আচারাঙ্গ-সূত্র নামক প্রথম জৈন অঙ্গ হইতে জানা যায়, রাঢ়দেশের তখন দুইটি ভাগ ছিল, একটির নাম সুব্ভ অর্থাৎ সুহ্মভূমি ও অপরটির নাম বজ্রভূমি এবং এই রাঢ় দেশে দিগম্বর সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিবার সময় বর্দ্ধমান মহাবীর বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বজ্রভূমির একটি অংশের নাম ছিল পণিত (বা প্রণীত) ভূমি। জৈন 'ভগবতী' গ্রন্থের মতে এই পণিতভূমিতে বর্দ্ধমান মহাবীর ও গোসাল মঙ্খলিপুত্র ছয় বৎসর বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থবির ভদ্রবাহু বিরচিত জৈন কল্পসূত্রের মতে বর্দ্ধমান এখানে মাত্র এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, বর্দ্ধমান নিজেই বাঙ্‌লাদেশে ধর্ম্মপ্রচারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে জৈনধর্ম্ম বাঙ্‌লায় বিশেষ

ভাবে আদৃত হইয়াছিল বলিয়াই বাঙ্‌লার জনপদগুলি জৈন সাহিত্যে এতখানি মর্যাদা লাভ করিতে পারিয়াছে।

লক্ষ্য করার বিষয়, খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকে রাঢ়দেশে অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম্মের আন্দোলন প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল এবং ঐ ধর্ম্মগুলির মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হইয়াছিল। রাঢ়ের অন্তর্গত সুহ্ম জনপদে সেদক (বা দেসক) নগরের নিকটে বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন বৌদ্ধধর্ম্ম এবং রাঢ়েরই অন্তর্গত বজ্রভূমিতে (বা পণিতভূমিতে) বর্দ্ধমান ও গোসাল নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম্ম হটিয়া গেল এবং জৈনধর্ম্ম জয়ী হইল বলিয়াই মনে হয় এবং এই জন্যই সম্ভবত বৌদ্ধসাহিত্য বাঙ্‌লাদেশ সম্বন্ধে এমন নীরব ও জৈনসাহিত্য এদেশের আর্য্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে এমন সচেতন। রাঢ়ের অন্তর্গত যে বজ্রভূমিতে বর্দ্ধমান ও গোসাল বাস করিয়াছিলেন সেই বজ্রভূমির অবস্থিতি সম্বন্ধে পণ্ডিতরা এখনও কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। আমরা দেখিলাম জৈন প্রজ্ঞাপনার মতে রাঢ়ের রাজধানী ছিল কোটিবর্ষ। কোটিবর্ষ ছিল আধুনিক দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত। সুতরাং তৎকালে রাঢ়ের বিস্তৃতি ছিল দিনাজপুর পর্য্যন্ত। পক্ষান্তরে আধুনিক রাঢ়ের অন্তর্গত তমলুক বা তাম্রলিপ্তি ছিল তৎকালে বঙ্গের রাজধানী। যাহা হোক, জৈন কল্পসূত্র হইতে দেখিতে পাই বর্দ্ধমান সাধারণত' চম্পা, বৈশালী, মিথিলা, রাজগৃহ শ্রাবস্তি প্রভৃতি জনপদের রাজধানীতেই বর্ষা কাটাইতেন। রাঢ়ের বেলায়ও যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে কোটিবর্ষের নিকটবর্ত্তী ভূখণ্ডই তখন বজ্রভূমি ও তদন্তর্গত পণিতভূমি নামে পরিচিত ছিল অর্থাৎ বর্ত্তমান দিনাজপুর জিলা তৎকালে পণিতভূমি বা বজ্রভূমির অন্তর্গত ছিল। অবশ্য এ বিষয়ে নিঃসংশয়রূপে কিছু বলার সাহস করা যায় না। কিন্তু যখন দেখি পরবর্ত্তী কালে কোটিবর্ষের নামে জৈন সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হইয়াছিল এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনে অনেক নিগ্রন্থ ও আজীবিকের বসতি ছিল, তখন মনে হয় যে-পণিত (বা বজ্র) ভূমিতে বর্দ্ধমান ও গোসাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় সে পণিতভূমি কোটিবর্ষের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী ভূখণ্ড হওয়া বিচিত্র নয়, বিশেষত যখন পণিত বা বজ্রভূমি ও কোটিবর্ষ উভয়ই রাঢ়ের অন্তর্গত বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

যাহা হোক, আমরা দেখিলাম খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকে বাঙ্‌লাদেশে বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্ম্মেরই প্রচার আরম্ভ হয়, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম্ম হারিয়া যাওয়াতে জৈন ধর্ম্মই সম্ভবত প্রাধান্য লাভ করে। এস্থলে স্বভাবতই প্রশ্ন মনে জাগে আজীবিক ধর্ম্মের কি গতি হইল। আজীবিক সম্প্রদায়ের কোনো স্বতন্ত্র সাহিত্য পাওয়া যায় নাই। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে ঐ সম্প্রদায় সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায় তাহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের প্রসাদে আমরা জানি গোসাল মঙ্খলিপুত্ত নালন্দায় বর্দ্ধমান মহাবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তদবধি কিছুকাল তিনি বর্দ্ধমানের অনুগামী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে উভয়ের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয় এবং গোসাল মহাবীরের সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। তিনি বর্দ্ধমানের দুই বৎসর পূর্ব্বেই (খ্রীঃ পূঃ ৫০০) কৈবল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। আজীবিকরাও নিগ্রন্থদের মতোই দিগম্বর সন্ন্যাসী ছিল। তবে তাহারা প্রত্যেকেই হাতে একটি করিয়া মস্কর অর্থাৎ বাঁশের লাঠি ধারণ করিত। এইজন্য তাহাদিগকে মস্করী বলা হইত (পাণিনি, ৬।১।১৫৪) এবং এই জন্যই গোসালকে বৌদ্ধ এবং জৈনেরা মস্করী-পুত্র বা মঙ্খলিপুত্ত বলিয়া অভিহিত করিত। আজীবিকরা জ্যোতিষী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে আজীবিক ও নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছিল (Camb. Hist. p. 162)। যাহা হোক্, আমরা দেখিয়াছি বর্দ্ধমানের সঙ্গে গোসালও অনেক দিন রাঢ় দেশে বাস করিয়াছিলেন। তাহা হইতে অনুমান করা যায়, তিনি রাঢ়দেশেও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বাঙ্‌লা দেশে আজীবিক ধর্ম্মের প্রসারের কিছু কিছু প্রমাণও আছে। যথা—জৈন আচারাঙ্গ-সূত্র হইতে জানি বর্দ্ধমান যখন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন

তিনি সেখানে অনেক যষ্টিধারী সন্ন্যাসী দেখিতে পান। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন এই যষ্টিধারী সন্ন্যাসীরা আজীবিক। বৌদ্ধ সাহিত্যের নানা স্থানে আজীবিক সন্ন্যাসী উপক এবং ব্যাধ কন্যা চাপা সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। এই গল্পটি হইতে জানা যায় বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থাতেই পশ্চিম বঙ্গে আজীবিক ধর্ম্ম বেশ প্রসার লাভ করিয়াছিল। গল্পটি সংক্ষেপে এই। মগধ রাজ্যে বোধগয়ার নিকটে নাল বা নালকগ্রামে উপকের জন্ম। তাঁহার গায়ের রং কালো ছিল বলিয়া তাঁহাকে 'কালো উপক' বলা হইত। একদা উপক গয়া হইতে পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্কহার (বাঁকুড়া ?) জনপদে ('পরমথ জোতিকা'র মতে বঙ্গ জনপদে) পৌছিয়া একটি ব্যাধের গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ব্যাধজ্যেষ্ঠ তাঁহাকে মাংসরস দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া নিজের গৃহেই স্থান দিল। ব্যাধ একদিন পুত্র ও ভ্রাতাকে লইয়া শিকারে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় নিজ কন্যা চাপার উপর আজীবিক সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যার ভার দিয়া গেল। সন্ন্যাসী কিন্তু ব্যাধকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লাভ না করা পর্য্যন্ত অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুপণ করিলেন। ব্যাধ শিকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া আজীবিক সন্ন্যাসী উপকের সহিত চাপার বিবাহ দিল এবং উপক ব্যাধের শিকারের মাংস বহন ও বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। সংবৎসরান্তে উপকের সুভদ্র নামে এক পুত্র জন্মিল। একদা পুত্র সুভদ্র কাঁদিতে থাকিলে চাপা "ওরে আজীবিকের পুত্র, ওরে মাংসবাহীর পুত্র কাঁদিস্‌নে" বলিয়া সুর করিয়া তাহার কান্না থামাইতেছিলেন। এই কথাগুলি শুনিয়া উপকের মনে অত্যন্ত ধিক্কার উপস্থিত হইল এবং তিনি কোনো অনুনয় বিনয় না শুনিয়া বঙ্কহার জনপদ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যদেশে চলিয়া গেলেন এবং শ্রাবস্তির নিকটে জেতবনে পৌছিয়া বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। চাপাও ইহার অনতিকাল পরেই পুত্রকে নিজ পিতার নিকট রাখিয়া শ্রাবস্তিতে গিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগ দেন এবং ভিক্ষুণীদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত গাথা বৌদ্ধ থেরী গাথা সমূহের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে এবং আজও আমরা তাহা পাঠ করিতে পারি। যাহা হোক, এই গল্পটি হইতেও বোঝা যায় মগধে এবং বঙ্কহার জনপদে তৎকালে আজীবিকের অভাব ছিল না। বঙ্কহার জনপদ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না ; ইহা বাঁকুড়ার প্রাচীন নাম হইতে পারে। তবে ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই জনপদটি মগধের পূর্ব্বদিকে এবং মধ্যদেশের বহির্ভূক্ত সুতরাং বাঙ্‌লাদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। যাহা হোক্, আমরা দিব্যাবদানগ্রন্থ হইতে নিঃসংশয়ে জানি অশোকের সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত আজীবিক ধর্ম্মের প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছিল এবং তৎকালে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আজীবিকদের সংখ্যা অন্তত আঠারো হাজার ছিল বলিয়া ঐ গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকের প্রারম্ভ হইতে তৃতীয় শতকে অশোকের রাজত্বের সময় পর্য্যন্ত এই কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর কাল বাঙ্‌লা দেশে জৈন ও আজীবিক ধর্ম্মের প্রাধান্যই চলিতেছিল। অশোক এবং তৎপৌত্র দশরথ আজীবিকদিগকে বরাবর ও নাগার্জ্জুনি-পর্ব্বতে (উভয়টিই গয়া জিলায়) যে ছয়টি গুহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। অতএব দেখিতেছি অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই শতাব্দী ধরিয়া কঠোর প্রতিযোগিতার ফলে বৌদ্ধধর্ম্মই হটিয়া গিয়াছিল এবং জৈন ও আজীবিক ধর্ম্মই টিকিয়া ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অশোকের পৃষ্ঠ-পোষকতার ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিল, জৈন ধর্ম্মও আত্মরক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু আজীবিক ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গেল। পূর্ব্বে একটু আভাস দিয়াছি যে, আজীবিক ধর্ম্ম কালক্রমে জৈন ধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয়। আজীবিক সম্প্রদায় ও দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠান-গত নানাপ্রকার সাদৃশ্য ছিল। সুতরাং একের পক্ষে অন্যের মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়ার বিশেষ বাধা ছিল না। এই দুই সম্প্রদায় যে কালক্রমে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল, এই অনুমানের পক্ষে দুই একটি প্রমাণও আছে। প্রথম প্রমাণ দিব্যাবদান। এই গ্রন্থে দেখিতে পাই একই ঘটনা উপলক্ষে বৌদ্ধ-বিরোধী সম্প্রদায়কে কখনও নির্গ্রন্থ, কখনও আজীবিক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে

বোঝা যায় দিব্যাবদান গ্রন্থ রচনার সময়েই নিগ্রন্থ ও আজীবিকের পার্থক্যটা তৃতীয় পক্ষের নিকট অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। দ্বিতীয়ত, পূর্ব্বে বলিয়াছি দিগম্বর আজীবিকরা জ্যোতিষী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। জাতকের প্রমাণ হইতে জানা যায় বুদ্ধের জীবিত কালেই আজীবিকরা জ্যোতিষী করিয়া বেড়াইত। দিব্যাবদানের মতে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের রাজসভায় পিঙ্গলবৎস নামে এক আজীবিক জ্যোতিষী ছিল। আবার খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউএন্থসাঙ্-এর সময়ে নিগ্রন্থ অর্থাৎ জৈনরাই জ্যোতিষী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল (Beal II, 168)। ইহাতেও মনে হয় আজীবিক সম্প্রদায় জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যেই মিশিয়া গিয়াছিল। যদি এই সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে হিউএন্থসাঙ্ বাঙ্লার নানাস্থানে বিশেষতঃ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে যে নিগ্রন্থদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহারা বস্তুত নিগ্রন্থ ও আজীবিক এই দুই দিগম্বর সম্প্রদায়ের মিলিত সম্প্রদায়ের তৎকালীন প্রতিনিধি।

আমরা বাঙলাদেশের ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির ইতিহাস অনুসরণ করিতে করিতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছি। বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্ম্মের আরম্ভ এইখানেই। ইহাদের ইতিহাসকে আর পেছনে লইয়া যাওয়া যায় না। কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আরম্ভ তো এইখানে নয়। এই ধর্ম্মের ইতিহাসকে তো আরও অনেক শতাব্দীর মধ্য দিয়া অনুসরণ করা যায়। তাই এস্থলে মনে প্রশ্ন জাগে যে-সময়ে বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্ম্ম-বাঙ্লাদেশে প্রাধান্যলাভের জন্য প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত ছিল সে-সময়ে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম কি করিতেছিল? সে-সময়ে কি এই বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বাঙ্লায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই? এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

বিদেহ, অঙ্গ ও মগধ পূর্ব্বভারতের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। সুতরাং মধ্যদেশের বৈদিক আর্য্যপ্রভাব স্বভাবতঃ এই তিনটি জনপদের উপরেই সর্ব্বাগ্রে পড়িয়াছিল। বাঙ্লায় আর্য্যসভ্যতা অপেক্ষাকৃত বিলম্বে আসার কথা। সুতরাং ঐ তিনটি জনপদে আর্য্যসভ্যতা কখন ও কতখানি প্রসার লাভ করিয়াছিল সংক্ষেপে তাহা দেখা দরকার। শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায় এক সময়ে সদানীরা (অর্থাৎ গণ্ডক) নদীর পূর্ব্ববর্ত্তী বিদেহ জনপদে আর্য্য বসতি ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বহু ব্রাহ্মণ ঐ জনপদে আর্য্যসভ্যতা ও ধর্ম্মের প্রতীক স্বরূপ যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। মিথিলার সম্রাট্ জনকের রাজত্বকালে বিদেহ আর্য্যসভ্যতা ও ধর্ম্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইত। সম্রাট জনক ছিলেন বুদ্ধদেবের (৫৬৩-৪৮৩) দুই পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং জনক খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতকের শেষ পাদে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং ঐ সময়ে বাঙ্লাদেশের অব্যবহিত পশ্চিম সীমায় আর্য্যদের সভ্যতা ও ধর্ম্মের শিখা অতি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল। কিন্তু তথাপি পরবর্ত্তী কালের স্মৃতিশাস্ত্রে দেখি বৈদেহ একটি মিশ্রজাতির নাম। অথর্ব্ব বেদে অঙ্গ ও মগধকে আর্য্যসভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'অঙ্গ বৈরোচন' নামে অঙ্গরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও দানশীলতার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতক) অঙ্গে অর্থাৎ বাঙ্লার প্রান্তেই আর্য্য বৈদিকধর্ম্ম রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অথচ ঐ ব্রাহ্মণগ্রন্থেই পুণ্ড্রদিগকে দস্যু অর্থাৎ অনার্য্য বলা হইয়াছে এবং বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে অঙ্গদিগকে মিশ্রজাতি (সংকীর্ণ যোনি) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তারপর, যজুর্ব্বেদে দেখিতে পাই, পুরুষমেধ যজ্ঞের সময় মগধের অধিবাসীদিগকে ধরিয়া বলি দেওয়া হইত। অথর্ব্ববেদে মগধকে আর্য্যগণ্ডীর বহির্ভূক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং এই বেদেই মগধকে ব্রাত্যদের অর্থাৎ বিধর্ম্মীদের কেন্দ্র বলা হইয়াছে। আরও পরবর্তী সময়ে দেখি ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞের দ্বারা মগধবাসী ব্রাত্যদিগকে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত করার ব্যবস্থাও হইয়াছে। কিন্তু তখনও মগদের ব্রাহ্মণকে 'ব্রহ্মবন্ধু' অর্থাৎ অপ-ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করা হইয়াছে। পুরাণেও তেমনি বিম্বিসার, অজাতশত্রু প্রভৃতি বিখ্যাত মগধের রাজাদিগকেও 'ক্ষত্রবন্ধু' অর্থাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয় বা অপক্ষত্রিয় বলিয়া তুচ্ছ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে কৌষীতকী বা সাঙ্খ্যায়ন আরণ্যকে মধ্যম ও প্রাতীবোধীপুত্র নামক দুইজন মগধবাসী ব্রাহ্মণকে

সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। উক্ত সাংখ্যায়ন আরণ্যক গ্রন্থখানি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। আবার বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে মগধবাসীদিগকে মিশ্রজাতি (সংকীর্ণ যোনি) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত তথ্য হইতে একমাত্র এই সিদ্ধান্তই করা যাইতে পারে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে আর্য্যরা বিদেহ, অঙ্গ ও মগধে অল্পবিস্তর বসতি স্থাপন করিয়াছিল বটে এবং এই তিন জনপদের অধিবাসীরা এই সময়ে আর্য্যদের সভ্যতা ও ধর্ম্ম মাত্র আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাই ইহারা মধ্যদেশবাসী আর্য্যদের দ্বারা 'ব্রহ্মবন্ধু,' 'ক্ষত্রবন্ধু,' বা 'সংকীর্ণযোনি' প্রভৃতি মিশ্রত্ববোধক বিশেষণে অভিহিত হইয়াছিল।

বিদেহ, অঙ্গ ও মগধে আর্য্যরা আসিয়া বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের বহু পূর্ব্ব হইতেই, এমন কি মাথব বিদেঘের পূর্ব্বেও বিদেহে বহু ব্রাহ্মণ বাস করিত বলিয়া শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়। তৎপরে মাথব বিদেঘ ও তাঁহার পুরোহিত গোতম রাহূগণ, অঙ্গ বৈরোচন ও তাঁহার পুরোহিত উদময়, রাজর্ষি জনক ও ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, মগধবাসী ব্রাহ্মণ মধ্যম ও প্রাতীবোধীপুত্র, ইঁহারা সকলেই খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম হইতে ষষ্ঠশতক পর্য্যন্ত বিদেহ, অঙ্গ ও মগধ জনপদে সসম্মানে বাস করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করা দরকার যে, বৌধায়নের ন্যায় অত্যন্ত গোঁড়া পণ্ডিতও এই সব জনপদে আর্য্যদের বাস নিষিদ্ধ বলেন নাই। অথচ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকেও এই সব জনপদের (এমন কি বিদেহেরও) আসল অধিবাসীরা মধ্যদেশের ধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যদের নিকট হইতে ব্রহ্মবন্ধু, ক্ষত্রবন্ধু, সংকীর্ণযোনি প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণই লাভ করিতেছিল।

সুতরাং যে-সময়ে বিদেহ, মগধ ও অঙ্গের অধিবাসীরাই মাত্র আংশিক ভাবে আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং যে-সময়ে ইহারা ধর্ম্ম ও সভ্যতাভিমানী আর্য্যদের নিকট শুধু অবজ্ঞাই লাভ করিতেছিল সেই সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে বিদেহ-মগধ-অঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্‌লা দেশে যে আর্য্যদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই একথা সহজেই অনুমান করা যায়। আর্য্যদের মধ্যে কেহ কেহ কিংবা অনেকেই হয়তো এই সময়ে বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের আকর্ষণে অথবা "ক্ষুন্নবৃত্তির" তাড়নায় (যেমন হরিবংশ হইতে জানা যায়) বিদেহ ও অঙ্গের পূর্ব্বসীমা অতিক্রম করিয়া বাঙ্‌লা দেশে প্রবেশ করিতেছিল, কেহ কেহ হয় তো বাঙ্‌লার জনপদগুলি দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল (যেমন বৌধায়ন হইতে মনে হয়) আবার কেহ কেহ বা ঐ সব জনপদে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করিতেছিল। কিন্তু একথা নিশ্চয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম হইতে ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত আর্য্যরা যদি বাঙ্‌লা দেশে প্রবেশ করিয়াও থাকে তাহাদের সংখ্যা ও শক্তি এত নগণ্য ছিল যে, ঐ সময়ে বাঙ্‌লা দেশে আর্য্য সভ্যতা ও ধর্ম্ম যথেষ্ট পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে করা যায় না। বস্তুত খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে বাঙ্‌লা দেশে বৈদিক ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এমন কথা মনে করিবার অনুকূল কোনো প্রমাণ বৈদিক আর্য্যসাহিত্যে নাই।

অথচ মনে রাখিতে হইবে ঐ ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগেই হর্য্যঙ্করাজ বিম্বিসার, গৌতম বুদ্ধ, বর্দ্ধমান মহাবীর, গোসাল মঙ্খলিপুত্ত প্রভৃতির আবির্ভাব এবং শেষোক্ত তিনজনের প্রচারিত বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বৈদিক ধর্ম্মাভিমানী আর্য্যরা বিদেহ, অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীদিগকে যে অবজ্ঞা করিতেন বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্ম্ম তাহারই প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন কি না তাহা ঐতিহাসিকগণের বিবেচ্য। এস্থলে আমাদের পক্ষে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। যাহা হোক্, আমরা যে-সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিলাম তাহা হইতে একথা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে-সময়ে বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্ম্ম বাঙলা দেশে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয় সে-সময়ে এদেশে আর্য্যরা সামান্য পরিমাণে প্রবেশ করিয়া থাকিলেও বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। অর্থাৎ কার্য্যত বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্ম্মই বাঙ্‌লা দেশে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরও পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

এই সিদ্ধান্তের অনুকূল আরও প্রমাণ আছে। সংক্ষেপে সেগুলিরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে

অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীদিগকে মিশ্রজাতি (সংকীর্ণ যোনি) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে অথচ ঐ দুই জনপদে আর্য্যদের প্রবেশ কিংবা বাস নিষিদ্ধ করেন নাই। আমরা অন্য প্রমাণ হইতেও দেখিয়াছি সে-সময়ে অঙ্গ ও মগধে আর্য্যরা সসম্মানেই বাস করিত। কিন্তু বৌধায়নের এই ধর্ম্মসূত্রেই বঙ্গ জনপদকে শুধু যে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা নয়, বঙ্গ ও কলিঙ্গ জনপদে আর্য্যদের প্রবেশই অবাঞ্ছনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি কেহ ঐ দুই জনপদে প্রবেশ করে তাহা হইলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে, এমন বিশেষ ব্যবস্থাও ঐ গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থখানি খুব সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের (সুতরাং বুদ্ধ, মহাবীর এবং গোসালেরও) পরবর্ত্তী সময়ে রচিত। সুতরাং ঐ সময়েও বাঙ্‌লায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। তবে একথা ঠিক্ যে, বঙ্গ ও কলিঙ্গে গিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা এই গ্রন্থে থাকিলেও অনেকেই ওই দুই জনপদে গিয়া কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিত না, ওই দুই জনপদে স্থায়ী ভাবেই বসতি স্থাপন করিত। কারণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট্ অশোকের অনুশাসন হইতেই আমরা জানি তাঁহার রাজত্বকালে (২৭২-২৩২) বৌধায়নের বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ কলিঙ্গেও বহু ব্রাহ্মণের বসতি ছিল এবং তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত কোনো জনপদেই, সুতরাং বঙ্গেও, ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। কিন্তু তথাপি শুঙ্গ-সম্রাট্ পুষ্যমিত্রের (১৮৫-১৪৯) পুরোহিত মগধবাসী ব্রাহ্মণ বৈয়াকরণিক পতঞ্জলি তাঁহার সুবিখ্যাত মহাভাষ্য গ্রন্থে বাঙ্‌লার জনপদগুলিকে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূক্ত বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। অবশেষে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে মনুসংহিতায় দেখিতে পাই বাঙ্‌লা দেশ আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না যে, বাঙ্‌লা দেশে বৈদিক আর্য্য ধর্ম্ম বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্ম্মের পরে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কাজেই বাঙ্‌লা দেশে সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় কোন্ ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্ম্মেরই নাম করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে আবার প্রথম দুই শতাব্দী কাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম বাঙ্‌লা দেশে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে নাই। সুতরাং জৈন ও আজীবিক ধর্ম্মকেই বাঙ্‌লার আদি ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি পরবর্ত্তী কালে আজীবিক ধর্ম্ম সম্ভবত জৈন ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তাই খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউএন্থ্ সাঙ্ বাঙ্‌লা দেশে আজীবিক সম্প্রদায় দেখিতে পান নাই, কিন্তু নির্গ্রন্থদের যথেষ্ট প্রভাব দেখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকে বর্দ্ধমান মহাবীরের সময় হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউএন্থ্ সাঙ্-এর সময় পর্য্যন্ত এই বারো শত বৎসর জৈনধর্ম্ম বাঙলা দেশে সফলতার সহিত নিজের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু হিউএন্থ্ সাঙ্-এর পরে বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজাদের আমলে এবং শান্তরক্ষিত, দীপঙ্কর প্রভৃতি শক্তিশালী ও সুবিখ্যাত বৌদ্ধ প্রচারকদের প্রভাবকালে বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল। এবং জৈন ধর্ম্ম ক্রমশ' ক্ষীণবল হইতে হইতে অবশেষে বাঙ্‌লা দেশ হইতে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। বাঙলা হইতে জৈন ধর্ম্মের বিলোপের ইতিহাস খুবই ঔৎসুক্যকর। কোন্ কোন্ কারণে এবং কি ভাবে এই প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী ধর্ম্মটি বাঙলা দেশ হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

প্রবোধচন্দ্র সেন

সাহায্য করে। শূন্য ঘরে মন্দার আর দিন কাটিতে চায় না। একটী বউ আসিলে ঘর ভরিয়া উঠে, কিন্তু দরিদ্রের সংসার বউ আসিলে খাইবে কি? তারপর দু'চারিটি অনাহূত শিশু···মন্দা আর ভাবিতে পারে না, মনের ভিতর একটা অব্যক্ত আনন্দের শিহরণ বহিয়া যায়। গরীবের ঘরে কি বউ আসে না, মা ছেলে হয় না? এবার ছেলে বাড়ী আসুক।

ছুটীতে ছেলে বাড়ী আসিলে, মা ছেলেতে অভিমান চলিতে থাকে। "বাছা আমি কবে আছি কবে নেই এইবার একটী ঘর আলো করা বউ আনি।" ছেলে রাজি হয় না। আঠারো বছরের ছেলে মিহির, মায়ের কথায় তার মনে হাসি পায়।

দিন কাটিয়া যায়, মন্দার যৌবনের উপর বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়িয়া গিয়াছে, কপালের উপরের কয়েক গাছা চুল শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, মনের ভিতর জীবনের অপরাহ্ণ উঁকি মারিতেছে। মিহির অর্থাভাবে পড়াশুনায় অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই, সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের ছেলের ন্যায় মধ্যম গোছের চাকুরী জুটিয়া গিয়াছে। এইবার বিবাহের পালা। মন্দার বেশী বড় আশা নাই। লেখা-পড়া জানা আধুনিক বউ সে কল্পনাও করে না। ঘরের বউ সে হইবে আটপৌরে কাপড়ের ন্যায়, সব রকমে নিজের ইচ্ছামত চলিবে। কিছুদিন পরে মিহির এক গোধূলি লগ্নে মধ্যবিত্ত ঘরের একটী বড়-সড়ো মেয়ে বিবাহ করিয়া ঘরে লইয়া আসিল। মন্দা সাদরে বধূ বরণ করিয়া লইল। হয়ত বা স্বামীর কথা মনে পড়িয়া সকলের অলক্ষ্যে দু ফোঁটা চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িল।

নূতন ঘরকন্না চলিতে থাকে। স্বামী বিদেশে সহরে থাকে পাড়াগাঁয়ের ভাঙ্গা বাড়ীতে বধূর মন ভরিয়া উঠে না। মায়েরও একলা বউ লইয়া তৃপ্তি হয় না, খালি বাড়ী আগ্‌লাইয়া আর কত কাল থাকিবে।

ঘরে তালা পড়িল, দুলে পাড়ার বংশী দুলেকে ঘর দোর দেখিতে বলিয়া মন্দা বউ লইয়া একদিন ছেলের বাসায় চলিয়া গেল।

মন্দাকিনী বিদেশে চলিয়া যায় শুনিয়া পাড়ার মেয়ের আসিয়া ভিড় করিল, "তাইতো আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?" "ও ভাই এবার আমাদের মায়া কাটালে?" মন্দার মন দোটানায় পড়িয়াছে। কৈশোরের সাজান ঘর-কন্না। যক্ষের ধনের মত দুঃখ দরিদ্রতার মধ্যেও যে ভিটা আগ্‌লাইয়া এতদিন কাটিয়াছে, আজ সে ভিটা ছাড়িতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। স্বামীর মৃত্যুর পর এই ভিটা ছাড়িয়া পিত্রালয়ে পর্য্যন্ত যাইতে চাহে নাই, আজ পুত্রের মমতায় সেই ভিটা ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় কে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে, সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে ধূপ জ্বালাইবে, স্বামীর ভিটায় প্রদীপ দিবে? অমঙ্গল আশঙ্কায় মন্দা চক্ষের জল ফেলিল না সত্য, কিন্তু বুকের ভিতর কান্না ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

৬

সহরের জীবন মন্দার নূতন অভিজ্ঞতা। এ যেন মুক্ত বিহঙ্গম পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে। পনর দিনেই মন্দার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। ভোরবেলা কলে জলপড়ার একঘেয়ে ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ, গাড়ী ঘোড়ার ঘড়্‌ ঘড়্‌, মোটরের ভোঁও ভোঁও ভোঁওত্‌ আওয়াজ মন্দার কানে তালা লাগাইয়া দিয়াছে। নীল আকাশ আর সবুজ গাছপালা অসংখ্য অট্টালিকার অন্তরালে কোথায় লুকাইয়া আছে জানা যায় না। বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া যায়। রান্না ঘরের কোণে বাতাবি লেবু গাছটায় প্রত্যহ ভোরে হুতুম পেঁচাটার ভুতুম ভুতুম ডাক এখনও যেন কানে বাজে, রোদ উঠার সঙ্গে সঙ্গে রায়েদের হাঁসের পাল প্যাঁক প্যাঁক করিয়া আমতলার এঁদো পুকুরে ঝাপাইয়া পড়ে, মুখুজ্জেদের ছোট বউ সেই ভোরে বাসনের বোঝা লইয়া মন্দার বাড়ীর উঠান পার হইয়া যায়। "কাকিমা এখনো উঠনি" বলে দোর গোড়ায় উঁকি দেয়...মন্দার আর ভাল লাগে না, মাসের পর মাস যায়··

এতদিনে আমের বোলে আম ধরিয়াছে, সজিনা গাছ হয়ত সজিনায় ভরিয়া গিয়াছে, পুকুর পাড়ের সিন্দুরে আম

গাছটীতে না জানি কেমন আম হইল…আর হইলেই বা কি, একটী আম কি আর পাইবার উপায় আছে, ও বাড়ীর ছেলেগুলো যা দস্যি, বোলই কি আর আছে?

বংশী রোজ রাত্রি বেলা আসে কিনা কে জানে? এসব অনিশ্চিত সম্ভাবনায় মন্দার মধ্য রাত্রির ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। প্রভাত তিক্ত হইয়া উঠে। নানা কথার পর সেদিন বলিয়াই ফেলে "হাঁরে মিহির, একবার আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দে, সব নষ্ট হয়ে যাবে যে…"

"কেন মা, তোমার কি কষ্ট হয় এখানে থাকতে? নষ্ট হয় হোক্, কিই বা আর আছে?"

বধূ অপরাধিনীর মত অনুযোগ দেয়, "মা, তোমার আম কাঁঠালই আমাদের চেয়ে বড়ো হলো?"

কি যে বলা ভাল মন্দাকিনী খুঁজিয়া পায় না।

গাঁয়ের গাছপালা এঁদো পুকুর পাড়াপ্রতিবেশী মন্দাকে যেন হাতছানি দিয়া ডাকে, দিন আর কাটিতে চায় না।

৭

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটে বহু যাত্রী সমাগম হইয়াছে। মন্দাও গঙ্গা স্নানে গিয়াছে। ডুব দিয়া উঠিতেই ভিজে কাপড়ে কাহার টান পড়িতে চাহিয়া দেখে, মোক্ষদা ঠাকরুণ, গাঁয়ের বিধবা মেয়ে।

মোক্ষদা ঠাকরুণ বিস্মিত হইয়া যায়। "তাইতো বউ যে? বলি দেশের কথা ভাই, একেবারে ভুলে গেলে?…"

"তা বই কি, কিন্তু মনে কর্‌লেই যাই কি করে, ছেলের যে চাকরি, ছুটী মেলে না।"

মোক্ষদা ঠাকরুণকে অগত্যা সুপারিশ করিতে হয়।

"ও মিহির বৌকে একবার আমাদের সঙ্গে দেনা পাঠিয়ে, এর পর কাউকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসবে।"

মিহির আপত্তি করে। মায়ের আগ্রহ-ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাসি পায়, "মা আর আমাদের চায়না দিদী, বাড়ী যাবার নামে পাগল।"

মন্দা দোটানায় পড়ে। একবার সস্নেহে ছেলের মুখের দিকে চায়, আবার কাতর দৃষ্টিতে মোক্ষদা ঠাকরুণের দিকে চায়, অকারণে চোখ জলে ভরিয়া উঠে।

অবশেষে ছেলে রাজী হয়। নূতন নামাবলী, কোষাকুষি আর পেতলের জলের ঘড়া লইয়া মন্দা বাড়ী ফিরিয়া আসে।

ভোর বেলাকার ঘুমে ভরা চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বংশী বলে, "ঠাকরুণ যে, পেন্নাম হই। বাবু কোথায়?"

মুখুজ্যেদের বৌ বলে, "কখন এলে কাকীমা? বৌকে রেখে এলে যে?" রায়দের বড় গিন্নী বলে, "ওকি বৌ, ছেলে-বৌ ফেলে তুমি একা চলে এলে?"

মন্দা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে; দুচার দিনের মধ্যে আগাছা কাটাইয়া বাড়ীখানা ঝাড়িয়া মুছিয়া সাফ করিয়া ফেলে। সেই চির পরিচিত পুকুর ঘাট, শ্যামল ছায়াশীতল আঙ্গিনা। কতকালের পরিচয় ইহাদের সঙ্গে, এই গাঁয়ের পথঘাট কত আপনার কত প্রিয়!

মন্দার অতি-আকাঙ্ক্ষার ঠাকুরদালান না উঠিলেও একখানা ছোট চণ্ডীমণ্ডপ উঠিয়াছে। প্রত্যহ নারায়ণ পূজা হয়। সন্ধ্যায় তুলসীতলায় হরির লুঠ দেয়, ছোট ছেলেমেয়েদের কলহাস্যে সন্ধ্যা কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠে। মন্দার অন্তর তৃপ্তিতে ভরিয়া যায়। দ্বিপ্রহরে রৌদ্র বাঁশঝাড়, কলার বাগ ছাড়াইয়া সমস্ত উঠানে ছড়াইয়া পড়ে, শুষ্ক পত্রের মর্ মর্ শব্দ গাছ-গাছড়ার ফাঁকে ফাঁকে করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত বহিয়া যায়। গ্রাম্য বধূরা জল নিতে আসিয়া মন্দার রোয়াকে বিশ্রাম করে, প্রবীণারা দ্বিপ্রহরের বিশ্রামে গল্পগাছা করেন।

মন্দা কান খাড়া করিয়া শোনে,—"তা' কি করবে বাছা, আজকালকার মেয়ে, শাশুড়ী নিয়ে আর কদিন থাকতে পারে?"

মন্দার মুখ শুকাইয়া যায়, ঠোঁট কাঁপে; বাহিরে আসিয়া বড় গলা করিয়া বলে, "ওসব মিছে কথা, তোমরা ভুল বুঝেচ।"

তাহার কথা শুনিয়া নবীনারা চোখ ঠারে, প্রবীণারা ভুরু কুচকায়। মন্দা হতভম্ব হইয়া যায়। প্রতিবেশীরা চলিয়া গেলে ছলছল চোখে বসিয়া থাকে।

উঠানের কোণে ফুলে ভরা বাতাবি লেবুর গাছটা, পুকুর পাড়ের বাঁশের আগাগুলি, শেওলা ঢাকা ভাঙ্গা কাছারী-দালানের বারান্দাটা যেন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলে, "আমরা ভুল বুঝি নি, আমরা জানি।"

কুসুমকামিনী সরকার

কাম্পালা-উগাণ্ডা

শ্রীভবেশ দাশগুপ্ত

কাম্পালা হিলের গায়ে আমাদের বাড়ী। রাস্তার ওপারে থাকে এক য়ুরোপীয় পরিবার। পাহাড়ের গায়ে বাড়ী সেজন্য

১। নেটিভগণ গৃহনির্ম্মাণ করিতেছে

আশে পাশে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। ভোরে উঠেই চোখে পড়ে অনন্ত শ্যামল শোভা, তার উপর পড়েছে ভোরের আলো। আমার ঘরের পূবদিকে বাতায়নের উপর একটা Golden shower-এর লতাকুঞ্জ একটা সৌন্দর্য্য, গোপনতা ও শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করে। ভোরে সোনালী আলো চোখে লেগে ঘুম ভেঙে যায়—উঠে গিয়ে দাঁড়াই জানালার ধারে। জানালা থেকে ৫।৬ মাইল দূরে ছোট ছোট পাহাড়গুলোর শ্যামল সৌন্দর্য্য দেখা যায়। দুটো পাহাড়ের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে যেন ফ্রেমে আঁটা এক টুক্‌রো আকাশ—সমস্ত আকাশ থেকে আলাদা করা। ওদিকে কোন বসবাস নেই। বসবার ঘরের সামনেকার পাহাড়টী চমৎকার। সামনের উপত্যকাটা ঢালু হয়ে চলে গেছে মাইল ছয়েক। সেই উপত্যকার ভেতর দিয়ে যে লাল মাটীর পথটা চলে গেছে সেটা এগিয়ে গেছে পাহাড়ের বুক চিরে। দুধারে শুধু বনজঙ্গল ঝোপ, রূপসীর সীমান্তের মত একসঙ্গে রাস্তাটার বহুদূর পর্য্যন্ত চোখে পড়ে। অথচ রাস্তার উপর গিয়ে সামনে ১০০।১৫০ গজের বেশী চোখে পড়বে না কারণ তার গতি উঁচু নীচু। এই নীচু জায়গাগুলো স্বভাবতঃই উর্ব্বর কিন্তু জল জ'মে নলখাগড়ার গাছ জন্মে জলাভূমি হয়ে গেছে। এই সব জায়গায় কিছু কিছু কৃষিও চলে। উঁচু জায়গায় মানুষের বসতি—বড় বড় রাস্তা। উগাণ্ডার এই এক বৈশিষ্ট্য যে এখানে অনেক রাস্তা আছে এবং এমন সুন্দর রাস্তা সারা ইষ্ট আফ্রিকাতে কোথাও নেই। রাস্তা যেমন সুন্দর পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিও তেমনি স্নিগ্ধ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোটরে করে বেড়ালেও মন ক্লান্ত হয় না। এদেশটা আশ্চর্য্য রকমের শ্যামল, ঠিক বাংলা দেশের মতন। তাছাড়া বর্ষা এলে তো কথাই নেই, সে সৌন্দর্য্য আরো মধুর, স্নিগ্ধ, এবং নয়নরঞ্জন হয়ে উঠে।

কাম্পালা সহর সমুদ্র থেকে চার হাজার ফিট উঁচু। সাতটি পাহাড়ের সমষ্টি নিয়ে এ সহরটি গড়ে উঠেছে। সহরের অধিবাসীদের মধ্যে হাজার চারেক ভারতীয়, পাঁচ ছয় শত ইউরোপীয়। সহরের বাড়ী ঘর সাধারণত Hill Stationএ যেমন হয়ে থাকে সেই রকম। ইটের দেওয়াল তার উপর করোগেটের টিনের চাল। ভিতরে কাঠের ছাদ। গ্রীষ্মে ধূলোতে সমস্ত বাড়ীঘর—সহর

গাছপালা গেরুয়া বরণ ধারণ করে। জানালায় দাঁড়ালে সামনে শুধু একটা বিরাট গেরুয়া রঙের দৃশ্য চোখে পড়ে।

২। কমুলী নেটিভ ব্যাণ্ড পার্টি

আমাদের বাড়ীর পিছনে কাম্পালা হিল। এই পাহাড়ের উপর এদেশের মিউজিয়ম। এখানকার সংগৃহীত বস্তু অধিকাংশই দেশীয়দের হাতে গড়া জিনিষ। এদের ঢাল বর্শা মাটির তৈরী নানা জিনিষ—এক কথায় কুটীর শিল্পের সমস্তই—তাছাড়া স্থানীয় পাখী, সাপ গিরগিটী প্রভৃতি। এই পাহাড়ের উপরেই প্রথম ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলিত হয়।

এখানকার ভিক্টোরিয়া হ্রদের জল একটু হাওয়া হলেই সমুদ্রের মতো ভীষণ হয়ে উঠে। ইহা দৈর্ঘ্যে ২৫৫ মাইল, প্রস্থে ১৫৫ মাইল। ষ্টীমার সার্ভিস আছে। এই হ্রদ কুমীর হিপো প্রভৃতিতে ভর্ত্তি। একবার এই হ্রদে হিপো দেখবার কেমন সুযোগ ঘটেছিল, এই প্রবন্ধে তারই কিছু বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে রবিবারের সঙ্গে সোম মঙ্গল এই দুটো দিন ছুটী মিলে যাওয়ায় স্থির হোল, এই সুযোগে আমরা জিঞ্জা দেখতে যাবো। কাম্পালা থেকে জিঞ্জা যদিও মাত্র ৫৭ মাইল, তবু এই ছ'মাসের ভেতর জিঞ্জা দেখবার সুযোগ ঘটে ওঠে নি।

ভোর সাতটায় কাম্পালা থেকে ট্রেণ ছাড়লো। গাড়ী চললো ঢিমে তে-তালায়। পাহাড়ে পথ—তাও আবার সব জায়গায় পাকা নয়, কাজেই এদেশে ট্রেণ মোটেই জোরে চলে না। ঘণ্টায় পনের মাইল, কুড়ি মাইল—সাধারণ গতি। সবচেয়ে বেশি পঁচিশ ত্রিশ মাইল।

বেলা সাড়ে আটটায় সময় কাম্পালা থেকে ২৫ মাইল দূরে Lugazi ষ্টেশনে পৌঁছলাম। Lugaziতে শেঠ নান্‌জি কালিদাস মেহতা নামে এক ভারতীয় ভদ্রলোকের চিনির কারখানা। শেঠজীই এদেশে প্রথম চিনির কারখানার প্রতিষ্ঠা করেন।

উগাণ্ডায় প্রচুর আগ জন্মে কিন্তু
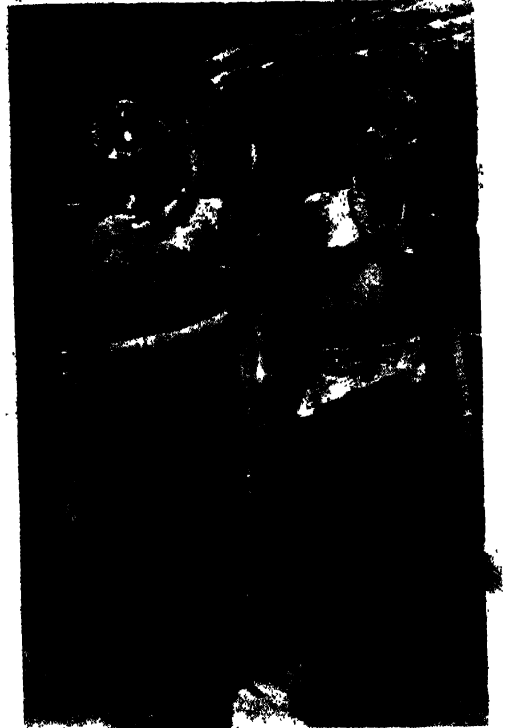
৩। অসভ্য লাঙ্গো জাতীয় নারী

এই চিনির কারখানা স্থাপনের আগে এখানে বিদেশ থেকে চিনি আমদানী কোরতে হোত। Lugazi Sugar Factory

৪। সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত লাঙ্গো জাতীয় নারী

সুরু হবার পর থেকে এখানে চিনির দাম আশ্চর্য্য রকম কমে গেছে এবং আরো কয়েকটী চিনির কারখানা স্থাপিত হয়েছে। Lugazi থেকে ৬।৭ মাইল দূরে থাকতে শেঠজীর আখের ক্ষেত চোখে পড়ল। পাহাড়ের পরে পাহাড়, নীচু জমি—সমস্ত কচি কচি আখের চারায় ঢাকা। রেলওয়ের একদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু দিগন্ত-বিস্তৃত আবাদ। এই বিস্তার ইক্ষু ক্ষেতই সারা বৎসর ধরে চিনির কারখানার খোরাক জোগায়।

আমাদের দেশের প্রচলিত কৃষি-প্রণালী, ছোট ছোট টুকরো টুকরো জমি দেখে এসে এদেশের এই large-scale cultivation দেখে সত্যই আশ্চর্য্য লাগে। শুনলাম বর্ত্তমানে ১০,০০০ হাজার একর (acre) জমিতে শেঠজীর ইক্ষু চাষ চলছে—ভবিষ্যতে হ'য়তো জমি বাড়াতে হ'তে পারে! ট্রেণ থেকে দূরে কারখানার চোঙাটা এবং ম্যানেজারের বাংলো মাত্র দেখা গেল। কারখানাটা ঘুরে দেখবার ইচ্ছা থাকলেও ভবিষ্যতের জন্যে স্থগিত রাখতে হোল। Lugazi ছাড়বার পর আবার ট্রেণ চোললো আগের মতই একঘেয়ে তালে। রেলওয়ের দুধারে চিত্তাকর্ষক এমন কিছু নেই যা মনের শ্রান্তি দূর করতে পারে। কেনীয়ার ট্রেণে চলতে অসংখ্য জন্তু জানোয়ার চোখে পড়ে কিন্তু এখানে শুধু চোখে পড়ে অফুরন্ত শ্যামল-শ্রী! উগাণ্ডার প্রাকৃতিক রূপ ঠিক বাংলার মতো—সারা বছর ধরে এখানকার দূর্ব্বা শ্যামল, গাছের পাতা ঘন-সবুজ। জমি সরস, উর্ব্বর। সর্ব্বত্রই ছোট বড় পাহাড়। ছোট ছোট

৫। সাজির্ভবা জলপ্রপাত

পাহাড়ে ও নীচু জমিতে লোকের বসতি। সমতল জমিতে সাধারণত নেটিভদের চাষবাস, ক্ষেত খামার। কিন্তু

চাষবাস, ক্ষেত খামার, পাহাড় বন গাড়ীতে নিশ্চল অবস্থায় বসে থেকে শুধু দেখে উপভোগ করা যায় না। পাহাড় বন

৬। রিপন ফল্‌স নীলনদের উৎপত্তি স্থল। বাঁয়ে লেক্ ভিক্টোরিয়া

উপভোগ করতে হলে দস্তুরমতো পাহাড়ী ও বুনো হওয়া দরকার—তাই নির্জীবের মতো গাড়ীতে বসে থেকে থেকে মনটা শুধু গুমরে মরতে লাগলো। অবশেষে প্রায় দশটার সময় আমরা জিঞ্জার কাছাকাছি পৌছলাম।

ট্রেণ থেকেই চোখে পড়লো দূরে বহুদূরে লেক ভিক্টোরিয়ার অনন্তব্যাপী নীল জলরাশি,—পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছে। যাঁরা লেক্ ভিক্টোরিয়া দেখেননি তাঁরা এর বিপুলতা ও প্রসারতা বুঝতে পারবেন না। ভিক্টোরিয়ার আয়তন ২৬,৮২৮ বর্গ মাইল। দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫৫ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ১৫৫ মাইল। কেনীয়া, উগাণ্ডা ও ট্যাঙ্গানিকা এই তিনটী প্রদেশ ভিক্টোরিয়াকে ঘিরে আছে। যে সব জায়গায় ভিক্টোরিয়া main land এ প্রবেশ করেছে সে সব জায়গার এর নাম হয়েছে bay ও gulf। ভিক্টোরিয়ার কূলে কূলে কেনীয়া, উগাণ্ডা ও ট্যাঙ্গানিকার অসংখ্য port আছে—এই সব port এ নিয়মিত ষ্টীমার সার্ভিস আছে। সারা ভিক্টোরিয়া ষ্টীমারে কোরে ঘুরে আসতে লাগে পনের দিন। জিঞ্জা উগাণ্ডার একটি প্রধান পোর্ট। লেক ভিক্টোরিয়ার যে শাখা এখানে main land এ প্রবেশ করেছে তার নাম Napoleon Gulf.

ট্রেণ আরো কাছে আসতে চোখে পোড়লো—নীলনদ! ছোট বেলায় জিয়োগ্রাফিতে মাত্র নীলনদ, লেক ভিক্টোরিয়া, রিপন ফল্‌স্ এর কথা পড়েছি আর মনে মনে কল্পনা করেছি—এদের কি রূপ! কে কবে ভেবেছিলো শৈশবের সেই স্বপ্ন এম্‌নিতর রূপ ধরে দেখা দেবে! আস্তে আস্তে আমাদের ট্রেণ ব্রিজের ওপর এসে পৌছুলো, নীচের দিকে চেয়ে নীলনদ দেখে চক্ষু সার্থক হোল। বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে সহস্র আবর্ত্ত সৃষ্টি ক'রে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত হ'য়ে নীলের তীব্র স্রোত বয়ে যাচ্ছে। নদীর বুকে অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়ের ঢিবি দ্বীপের মত মাথা উঁচু

৭। নীলনদের দ্বিতীয় প্রপাত—ওয়েন ফল্‌স্

ক'রে আছে, আর তারচারদিক ঘিরে জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে পাহাড়ের ঢিবিগুলো

সাদা ফেনায় ছেয়ে গেছে, তার উপর রোদ পড়ে সহস্র রামধনুর মায়া-স্বপ্ন রচনা করেছে।

৮। জিন্জা থেকে লেক্ ভিক্টোরিয়ার দৃশ্য

নাইল-ব্রীজ মাত্র তৈরী হয়েছে এই দেড় বছর। এর আগে পর্য্যন্ত কেনীয়া-উগাণ্ডা রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন ছিল জিঞ্জা। জিঞ্জা থেকে কাম্পালা আস্তে হ'লে ফেরীতে লেক্ পার হ'য়ে মোটরে আসতে হোত। কিন্তু এই ব্রীজ্ তৈরী হবার পর কাম্পালা পর্য্যন্ত রেল চলে এসেছে এবং মোম্বাসা থেকে একই ট্রেণে বসে কাম্পালা পর্য্যন্ত এই প্রায় এক হাজার মাইল ভ্রমণ করা চলে।

ব্রীজ পেরিয়েই আমরা জিঞ্জায় পৌঁছিলাম—কিন্তু সেখান থেকে সহর বোধ হয় আধ মাইল দূর হবে। ট্রেণ থেকেই ছুটো দিক বেশ দেখা গেল। কিন্তু রেললাইন গেছে সহরের তিন দিক ঘিরে এবং সহর থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে ষ্টেশন। অবশেষে বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় আমরা ষ্টেশনে পৌঁছলাম। জনবিরল, লাল মাটির কাঁচা প্ল্যাটফরম—মাঝে ষ্টেশনের shade—বুকিং অফিস্। তার দুধারে টুকরো ফুলের বাগান, খানিকটা দূরে মালগুদাম ও মাল অফিস্। আশে পাশের খোলা মাঠের মধ্যে এই রেল ষ্টেশনের ঐশ্বর্য্য! মাঠের ওপারে দূরে দূরে সহরের বাড়ী ঘর, গাছ পালা দেখা যায়।
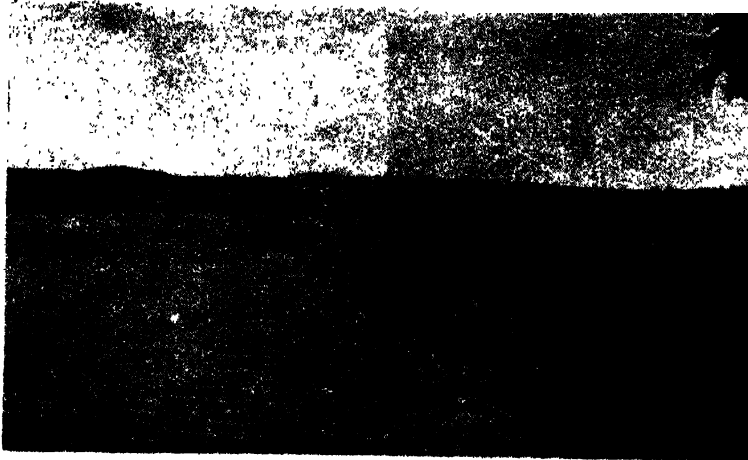
সকাল থেকে এক ফোঁটা চা জোটেনি, তারপর সাম্নে এই পাকা দু'মাইল পদব্রজে ভ্রমণ তৃপ্তিজনক হবে বলে মনে হোলনা। Sportsmanship এর দোহাই দিয়ে মনকে যতই বোঝাতে চাই, মন ততই মুচ্ড়ে পড়ে। রাতে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে—আশে পাশের মাঠ ময়দানের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও ভিজে-ভিজে লাগ্তে লাগ্লো। ক্ষীণভাবে একটা ট্যাক্সির সন্ধান দেখবার কথা বল্তেই, Mr. Shah ও Mr. Vyas দস্তুর মতো উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্লো! Mr. Shah সাতফুট লম্বা, জাতে পাঞ্জাবী—। সে পরিষ্কার

৯। নাইল ব্রীজ, উপরে রেলওয়ে নীচে মোটরের রাস্তা

বলেছিল দুমাইল পথ চল্তে আবার ট্যাক্সীর দরকার কি? Vyas-ও সেই মতের নীরব সমর্থন করল। অগত্যা

প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে হেঁটে যাওয়াই স্থির হোল। Mr. Shah কোনকালে নাকি কিছুদিন জিন্জায় ছিল, সেই পথ প্রদর্শক হোল—এবং সোজা পথ ছেড়ে, আমাদের শর্টকাট দেখিয়ে নিয়ে চল্ল। ভরসা দিল যে সেই পথে সহর মাত্র তিন ফারলং দূর হ'বে।

১০। জিন্জা সাধারণ দৃশ্য। পেছনের ব্যাক্ গ্রাউণ্ড—ভিক্টোরিয়া

'All roads lead to Rome' এ প্রবাদ রোমের বিষয়ে এবং অন্য যে কোন স্থানের বিষয়েই আসিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু পথ চল্‌তে গেলে আগে জানা দরকার through what it leads। গন্তব্যস্থলে যে কোন পথে পৌছন যেতে পারে বটে কিন্তু তাই বলে নিতান্ত দায় না থাকলে কেউ দুর্গম পথে রওনা হয় না। Mr. Shah আমাদের যে রাস্তায় নিয়ে চল্‌লে, তা একটা মেঠো পথ, সরু পথের দুদিকে বুক সমান উঁচু ঘাস পায়ের তলে ভিজে মাটী—স্থানে স্থানে কাদা! তবু দু মাইলের স্থলে মাত্র তিন ফারলং হাঁটবার আনন্দে সেই পথেই চল্‌লাম। দশ মিনিট পনের মিনিট কুড়ি মিনিট—সে তিন ফারলং আর ফুরোয় না। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি আমরা সে পথে অন্ততঃ দেড় মাইল চল্‌বার পর মিষ্টার শাহ্‌কে বল্‌লাম, "মিষ্টার শাহ্, তুমি রাস্তা ভুল করোনিতো? এযে আমাদের দেড় মাইল চলা হোল তবু তো তোমার তিন ফারলং ফুরোয় না।"

বিস্ময়ের সঙ্গে মিষ্টার শাহ্ উত্তর দিল, "বলো কি মিষ্টার গুপ্ত, আমরা মাত্র দুই ফারলং এসেচি।" প্রতিবাদ না কোরে মনে মনে যা ভাবলাম—ভাষায় তা অনুবাদ করলে রূঢ় শোনাবে। কিন্তু হবেই বা না কেন? পাঞ্জাবীর দেহ, পাঞ্জাবীর খোরাক সবই আমাদের চেয়ে ঢের বড় এবং বেশী, তাই ফারলংও বোধ হয় ওদের আমাদের চেয়ে ঢের বেশীই হবে। উড়িষ্যায়ও তো 'ডালভাঙা মাইল আছে!

১১। জিন্জা—বাজার রোড

এপর্য্যন্ত সহ্য করেছিলাম নীরবে—কিন্তু এর পরে যে পথ এলো তাকে ইংরাজীতে ঠিক-মত প্রকাশ করতে গেলে

বলতে হয়, 'a bit thick।' এ রাস্তায় সে পায়ে চলা পথ হারিয়ে গেছে ঘাসের ভিতর—পথের উপরেই হাঁটু সমান উঁচু ঘাস! জলে ভর্ত্তি! জলে কাদায় প্যাণ্ট্ জুতো হ'য়ে গেল নষ্ট! সযত্ন-রক্ষিত, সদ্য ইস্ত্রি করা প্যাণ্টের crease (ভাঁজ) গেল ভেঙে। রাস্তার অবস্থা দেখে মনে হোলনা সাতশো জন্মে কেউ এ পথে চলেছে। মিঃ শাহ্‌কে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল, সে যখন জিঞ্জায় ছিল তখন লোকে হরদম এখানে যাতায়াত করতো। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, "তুমি কদ্দিন আগে জিঞ্জায় ছিলে?" উত্তর পেলাম—দেড় বছর আগে! পথের অবস্থা দেখে Mr. Vyas রাগে গজ্ গজ্ করতে লাগ্‌লো। তার মুখে সারাপথ ধরে শুধু লেগে রইলো, "It is all your fault Mr. Shah."

লোকের নিতান্ত দুঃখের রাতও নাকি কেটে যায়,-তাই আমাদের পথও কাট্‌লো অবশেষে। মাঠ পেরিয়ে সহরের একপ্রান্তে এসে পৌঁছুলাম। পিছনের দিকে চেয়ে বুঝ্‌লাম যে আমরা শুধু ঘাসে ভর্ত্তি মাঠটাই সোজাসুজি পেরিয়ে এসেছি। পায়ে চলা পথ মাত্র মনের বিকার! মাঠের শেষে যেখানে আমরা এসে পৌঁছুলাম সেখান থেকে মিঃ শাহ'র বন্ধু মিঃ মালেকের বাড়ী বেশী দূর নয়। আগে থেকেই মিঃ মালেককে ফোন্ করা ছিল আমরা আস্‌চি, তাই অকূলে হাবুডুবু খেতে হল না।

মিঃ মালেকের বাড়ীতে পৌঁছনর পর আধ ঘণ্টার মধ্যেই চায়ের পালা শেষ করে সহর দেখ্‌তে বেরোলাম। সৌভাগ্যবশতঃ কাম্পালার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু মিঃ করিমও সেদিন জিঞ্জায় ছিলেন, তাঁর মোটর দখল করে আমরা অভিযানে বেরোলাম। মিঃ মালেক ছাড়া মিঃ আহ্‌মেদ নামে এক ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে জুটে গেলেন। মিঃ আহ্‌মেদ চমৎকার লোক! যেমন হাসি খুশী, তেমনি স্ফূর্ত্তিবান—ব্যবহারে অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক। মিঃ আহ্‌মেদ সঙ্গে না থাকলে আমরা বোধ হয় জিঞ্জা ভ্রমণের আনন্দ সবটা অনুভব করতে পারতাম না!

১২। ক্লিমেণ্ট্ হি ও ফেরী জিন্‌জা

জিঞ্জা সহর ভিক্টোরিয়ার উপকূলে একটা সমতল পাহাড়ের উপর অবস্থিত। সমস্ত সহরটাই plane, কোথাও উঁচু নীচু নেই। এদেশের পক্ষে এটা একটু আশ্চর্য্য। সহরের অধিবাসী সংখ্যা নিতান্তই কম। ফলে সহরের সর্ব্বত্রই ফাঁকা মাঠ, গাঢ় সবুজ ঘাসে ঢাকা—মাঝে মাঝে লাল মাটির পথ, দূরে দূরে এক এক সারি বাড়ী। চারদিক খোলা—আলো হাওয়ার ভরপুর। রাস্তার ধারে ধারে সারি সারি গাছ! সমস্ত সহরটা দেখ্‌লে মনে হয় যেন সযত্ন-রক্ষিত একটা

পার্ক! সহরের মাঝ দিয়ে গেছে 'বাজার রোড'। এই বাজার রোড্ই জিঞ্জার প্রধান রাস্তা। এই বাজার রোডের দুধারে যত দোকান, পশার, ব্যবসায়ীর অফিস্। জিঞ্জা উগাণ্ডার একটী প্রধান cotton buying centre; অধিকাংশ cotton companyর মালিকই ভারতীয়ের! এই 'বাজার রোড়ের দুধারে তাদের অফিস্!

মিঃ মালেকের বাড়ী থেকে মোটর নিয়ে আমরা সোজা বাজারের দিকে চললাম। বাজার অর্থে আমরা যা বুঝি এখানে ঠিক্ সে অর্থ বোঝায় না। আমরা ফল ফুলুরী, মাছ তরকারী, শাক সব্জী যেখানে বিক্রী হয়, তাকেই বলি বাজার। এখানে বাজার অর্থে কতকগুলি দোকানের সমষ্টি বোঝায়। ফল-ফুলুরী, শাকসব্জীর বাজারকে এখানে দেশীয় ভাষায় বলে 'সকনী'—তাই বাজারে যেতে হ'লে বোল্তে হবে 'সকনী'তে যাচ্ছি,' নইলে অন্য লোকের ভুল বুঝ্বার সম্ভাবনা আছে। এদেশের বাজারে বিক্রেতা শুধুই নেটিভ্—ক্রেতা অধিকাংশই ভারতীয়।

প্রকাণ্ড একটা খোলা জায়গায় বাজার বসেছে—মাঝে মাঝে ছোট এক একটা চালা—তার তলায় এদের মধ্যেই যে সব বড় দোকান তাদের আস্তানা। মাঝখানে টিনে-ছাওয়া একটা ছোট shed বাজারের পণ্য মাত্র টাট্কা শাক-সব্জী, মাছ, ফল এই জাতীয় জিনিষ—যা নেটীভ্রা উৎপাদন ও আহরণ কোরতে পারে। বাজারের দুটো ফটো নিলাম, কিন্তু দোকান্ ঠিক না থাকায় দুটো ছবিই দেখা গেল নষ্ট হ'য়ে গেছে।

বাজার থেকে ফিরে সহরটা একবার চক্কর দিয়ে আমরা জিঞ্জা 'pier' দেখতে গেলাম। লেকের কূল থেকে লেকের ভিতরে অনেক দূর পর্য্যন্ত এই 'pier' চলে গেছে। 'ক্লিমেণ্ট-হিল্' নামে যে ষ্টিমারখানা লেকের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় সেখানা তখন along-sideএ ছিল। ১২নং ছবিতে pier থেকে কিছু দূরে যে একখানা 'ষ্টীম্লাঞ্চ্ দেখা যাচ্ছে ও-খানাই আর বছর পর্য্যন্ত এখানে 'ফেরী' রূপে ব্যবহৃত হত। রেল ষ্টেশন থেকে pireএর উপর পর্য্যন্ত রেল লাইন চলেএসেছে—ফলে ষ্টীমার থেকে নেমেই ট্রেণে ওঠা যায়। pire থেকে ফিরবার পথে জিঞ্জার Indian school, Public Library, কোর্ট, ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনারের অফিস্ সব দেখে নেওয়া গেল। লেকের উপরেই ইউরোপীয়ানদের golf-link চৎমকার!

১৩। রিপন্ ফল্স্—নীলনদের উৎপত্তিস্থল

বাড়ী ফিরে দেখা দেল দেড়টা বেজে গেছে। চটপট্ স্নানাহার সেরে খানিকটা বিশ্রাম করে নিয়ে আবার মিঃ করিমের পুষ্পক রথ নিয়ে আমরা রিপন ফল্স্ দেখ্তে চললাম। টাউন থেকে মাইল দুয়েক দূরেই ফল্স্। ট্রেণ থেকে ফল্স্-এর মাত্র একবার আকস্মিক দর্শন পেয়ে ছিলাম—। প্রথমত দূর থেকে, দ্বিতীয়ত আকস্মিক glimpse মাত্র তাই মনে হয়েছিল বুঝি নিরাশ হতে হবে। নিরাশ হবার কথাও বটে—কারণ রিপন ফল্স্-এর বিষয়ে যতো কথা শোনা যায় তাতে মনে হয় নায়গ্রা বা ভিক্টোরিয়া ফল্স্এর মতো একটা কিছু হবে বুঝি।

সেখানে লেক ভিক্টোরিয়া ফল্স্ হ'য়ে ঝ'রে পড়ছে—সে জায়গাটা একটা খালের মতো। লেক ক্রমশঃ সরু হ'তে হ'তে নিস্তরঙ্গ নদীর মতো ৩।৪ মাইল বয়ে এসেছে—তারপর হঠাৎ আশে পাশের নীচু পাহাড়ের মধ্যে একটা

প্রকাণ্ড পুকুর সৃষ্টি করেছে। জায়গাটা খুব নিরিবিলি—পাড়ের কোলে কোলে অসংখ্য গহ্বর আছে, প্রচুর মাছ—তাই এ জায়গাটা কুমীরে ভর্ত্তি! ভোরে গেলে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে গায়ে, দ্বীপের ওপর অসংখ্য কুমীর রোদ পোয়াচ্ছে! সেই জন্যে এ জায়গাটার নামই হ'য়েছে 'Crocodile pool'। এই Crocodile poolএর শেষেই তার উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর লঙ্ঘন করে লেকের জলরাশি প্রায় ত্রিশ ফিট নীচে ঝ'রে পড়ছে! ফল্‌স্‌এর জল-স্রোতের ব্যাপ্তি প্রায় এক মাইল। মাঝে দুটো উঁচু পাহাড় থাকায় ফল্‌স্‌টা তিন ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গেছে। আমরা ফল্‌স্‌এর একেবারে কিনারে দাঁড়িয়ে যে ফটো নিলাম তাতে সামনের ফল্‌স্‌টির জলধারাই শুধু উঠ্‌লো—পাহাড় বন সমেত সমস্ত ফল্‌স্ উঠ্‌লো না। ১৩নং ছবিতে ফল্‌সের সম্পূর্ণ view পাওয়া যাবে। রিপন ফল্‌সে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬০০ টন জল লেক ভিক্‌টোরিয়া থেকে বয়ে যাচ্ছে—এবং এই জলই নীলনদ বহন করে চলেছে প্রায় ২৩০০ মাইল, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় তবুও ভিকটোরিয়ার water level একটুও নেমে যায়না। অবশ্য গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বর্ষণ অনুসারে জলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

ফল্‌স্ দেখে Mr. Vyas মোটেই খুসী হোলনা। তার ধারণা ছিল 'রিপন ফল্‌স্' একটা কিম্ভূত কিমাকার ব্যাপার হবে। তা নয় মাত্র ফুট ত্রিশেক উপর থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ছে! এ কী আবার একটা ফল্‌স্! শুধু Mr. Vyasই নয়, 'রিপন ফল্‌স্' দেখে বা তার বর্ণনা পড়ে অনেকেরই মনে হবে এর এতো কদর কেন? কিন্তু জলপ্রপাতের উচ্চতা, গতিবেগ প্রভৃতি সাধারণ মাপকাঠী দিয়ে যাঁরা 'রিপন ফল্‌সের' মূল্য যাচাই করতে বসবেন, তাঁরা মস্ত বড় ভুল করবেন। 'রিপন ফল্‌সের' গৌরব হ'চ্ছে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চ শতাব্দী থেকে গত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এই প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে নীলনদের উৎপত্তি স্থলের বিষয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলেছে—কিন্তু সে বিষয়ে কেউই কোন সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন নি। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চ শতাব্দীতে প্রথম আফ্রিকা-পর্য্যটক হিরোডোটাস্ নীলনদের উৎপত্তি স্থলের বিষয় লেখেন :—

"Respecting the nature of this river, the Nile, I was unable to gain any information, either from the priests or from any one else"*

হিরোডোটাস্ থেকে সুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নই ইউরোপ ও আমেরিকার পর্য্যটক ও ভৌগোলিক আবিষ্কারকদের মনে সহস্রবার উঠেছে—নীলের উৎপত্তি স্থলের বিষয়ে বহু বাদ-বিসম্বাদ ও থিওরী রচনা হ'য়েছে এবং লিভিংষ্টোন, স্পীক্, ষ্ট্যান্‌লী, গ্র্যাণ্ট প্রভৃতি অনেক পর্য্যটক এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে বেরিয়েছেন। কিন্তু ১৮৫৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রিপন ফল্‌স্‌এর অস্তিত্ব সভ্য জগতের কাছে অজ্ঞাত ছিল। ঐ বৎসরই ৩০শে জুলাই তারিখে ক্যাপ্টেন স্পীক্ প্রথম নীলের উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে স্পীক্ রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটীর পক্ষ থেকে নীলনদের উৎপত্তি স্থল অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হন্। উৎপত্তিস্থল আবিষ্কারের পর রয়াল জিয়োগ্রাফিক্যাল্ সোসাইটীর তদানীন্তন সভাপতি লর্ড রিপনের নাম অনুসারে স্পীক্ এ জলপ্রপাতের নামকরণ করেন 'রিপন ফল্‌স্'। স্পীক্ যখন তাঁর অভিযানে বেরোন সেই সময় 'প্যারিস জিয়োগ্রাফিক্যাল্ সোসাইটী' তাঁকে এক স্বর্ণপদক দানে সম্মানিত করে। সেই সম্মানের প্রতিদান স্বরূপ ভিক্‌টোরিয়ার যে শাখা থেকে 'রিপন ফল্‌স্' প্রবাহিত হ'য়েছে স্পীক্ তার নামকরণ করেন—"নেপোলিয়ন চ্যানেল"—বর্ত্তমানে এই শাখাটী নেপোলিয়ন গাল্‌ফ্ নামে পরিচিত।

নীলের এই রহস্যময় অতীত, দীর্ঘ শত শতাব্দীর আবিষ্কারের প্রচেষ্টা এবং বারম্বার ব্যর্থতাই নীলের তথা 'রিপন ফল্‌স্'এর এই খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। আজও জগতের সমস্ত দেশ থেকে লোকে মাত্র লেক ভিক্‌টোরিয়া ও রিপন ফল্‌স্ দেখতেই ইষ্ট্ আফ্রিকায় আসে। অবশ্য

* Through the Dark Continent—Stanley, PP. 8. Ch. II.

যাঁরা মনে কোন illusion নিয়ে আসেন তাঁরা Mr. Vyasএর মতই নিরাশ হন্।

ফল্‌স্ থেকে যেখানে নীল বেরিয়ে গেছে, তার দুধারে উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর। পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় ৩০০ ফিট্ মোটরের রাস্তা একেবারে ফলস্‌এর কিনারে এসে মিলেছে। তারপর লেকের কূল থেকে প্রায় ২৫।৩০ হাত দূরে ফল্‌স্ পর্য্যন্ত একটা সমতল পাহাড় বেরিয়ে গেছে। বছর ধরে এই ফল্‌স্ ঠিক এমনি ভাবেই বয়ে যাচ্ছে, এর ক্ষয় নেই, ক্লান্তি নেই, নিবৃত্তি নেই!

রিপন ফল্‌স দেখে আমরা 'ওয়েন ফল্‌স্' দেখ্‌তে চললাম। নীলনদ উৎপত্তিস্থল থেকে প্রায় তিন মাইল বয়ে এসে এই প্রপাতটী সৃষ্টি করেছে। ওয়েন ফল্‌স-এর ব্যাপ্তি রিপন্ ফলস্ এর চেয়ে বেশী। এ প্রপাতটী দেখলে মনে হয় যেন কেউ নদীর মাঝখান দিয়ে

১৪। ওয়েন্ ফল্‌স্ (একদিকের দৃশ্য) জিন্‌জা নীলনদের দ্বিতীয় প্রপাত

১৫। ওয়েন্ ফল্‌স্ (পূর্ণ দৃশ্য), জিন্‌জা

এই পাহাড়ের শেষ সীমানায় গিয়ে দাঁড়ালে পায়ের ওপর দিয়েই ফল্‌স্ এর জলস্রোত বয়ে যায়। ফল্‌স্ এর নীচে দুরন্ত স্রোত—তায় আবার নদীবক্ষে অসংখ্য পাহাড় দ্বীপ—তার ফলে নদীর বুকেই আরও অসংখ্য ফল্‌স্ তৈরী হ'য়েছে। জলের তীব্র ধারায় সঙ্গে অসংখ্য মাছ নীচে গিয়ে পড়ছে এবং লেকে ফিরে যাবার চেষ্টায় শূন্যে লাফিয়ে উঠে আবার সেই আবর্ত্তের মধ্যেই মিলিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত একটা বাঁধ বেঁধে দিয়েছে। আর সেই বাঁধ ভেঙেই জলধারা উপচে পড়ছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে 'ওয়েন ফল্‌স্' অনেক বেশী মনোহর। এখানে নদীর এপারে শুধু ঘাসে ঢাকা উঁচু প্রাচীর, ওপারে গভীর বন—সেই বনের গা ঘেঁসেই নদীর স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এখানেও প্রপাতের সংখ্যা ৩।৪টী। এখানেও প্রায় তিনশ' ফিট উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতে হয়। মোটরের

রাস্তা নেই—খাড়া পাহাড়। নামবার ও উঠবার অবলম্বন শুধু লম্বা লম্বা ঘাস। কিন্তু পাহাড়ের ঠিক নীচেই বেশ প্রশস্ত সমতল জায়গা! নাম না জানা কি একটা বড় গাছ দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করে আছে। পিক্‌নিকের পক্ষে চমৎকার জায়গা।

'ওয়েন ফলস্' থেকে আমরা চললাম জিঞ্জা 'এয়ারো ড্রোম' দেখতে। এদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই Air-mail service আছে। ফলে প্রায় প্রত্যেক সহরেই একটা করে landing ground আছে। জিঞ্জা এয়ারোড্রোমও তাই। নীলের উপরেই প্রশস্ত সমতল একটা মাঠ। আমরা যখন সেখানে

১৬। এয়ারোড্রোম্—জিনজা বাঁ দিক থেকে—গুপ্ত, ভিয়াস, শাহ,, মালেক

গিয়ে পৌছলাম তখন ছোট্ট একখানা Moth-monoplane দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। Mr. Vyas এর দারুণ আগ্রহে আমরা সবাই এয়ারোপ্লেনের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি নিলাম।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে বেলা শেষ হয়ে এলো। সারাদিন এক লজ্‌ঝড় মোটরকারে ঘুরে সর্ব্ব অঙ্গে ব্যথা ধরে গেছে, কিন্তু তাই বলে উৎসাহ একটুও কমে যায় নি। সেই সন্ধ্যার সময়েই হিপো ও কুমীর দেখতে রওনা হলাম। বাড়ী থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে Hippo-pool নামে নীলেরই এক অংশে অসংখ্য হিপো ও কুমীরের আমদানী হয় শুনে রওনা হয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন পৌছলাম তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এসেচে, দ্বিতীয়ার চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় মাত্র নদীর বুকে অলোর ঝিলিমিলি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। তাই নিরাশ হয়েই বাড়ী ফিরতে হোল। কিন্তু মিঃ আহমেদ ভরসা দিলেন যে, অনেক রাতে লেকের ধারে গেলেও হিপো দেখা যাবে। এদেশে হিপো দেখাটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। মোটরে করে চল্‌তে অনেকবারই আমাদের পথে হিপো পড়েছে, কিন্তু জিঞ্জায় যাবার আগেই আমরা শুনেছিলাম সন্ধ্যাবেলায় লেকের কূলে অসংখ্য হিপো দেখতে পাওয়া যায়। হিপোদের সেই সম্মিলনী এবং স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে স্বচ্ছন্দ গতিবিধি দেখবার জন্যেই আমার আগ্রহ হয়েছিল।

সন্ধ্যার পর থেকেই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়তে সুরু হোলো। আকাশ মেঘলা, রাস্তা কর্দ্দমাক্ত, হাওয়া তুহিন-শীতল না হলেও বেশ ঠাণ্ডা, তবুও ডিনারের পর হিপো দেখতে যাবো স্থির হোলো। রাত সাড়ে এগারটার সময় আমরা রওনা হোলাম হিপো দর্শন আকাঙ্ক্ষায়। তখন আকাশে মেঘ কিছু কিছু আছে কিন্তু তার মধ্য দিয়েই ক্ষীণ—জ্যোতি জ্যোছ্‌না পাওয়া যাচ্ছে। হাওয়ার দৌরাত্ম্য কমে আছে, তবু বেশ শীত! সুপ্ত সহরের মধ্যে দিয়ে মিনিট পনের চলিবার পর আমরা লেকের ধারে এসে পৌছলাম। আগ্রহে উত্তেজনায় সবার মন ভরে উঠ্‌লো। একটু শব্দ, একটা নড়াচড়া দেখ্‌লেই মনে হয় বুঝি হিপো আস্‌চে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে দেখি হিপোর শব্দ নয়—হাওয়ার শব্দ—কিম্বা গাছের পাতা নড়ছে। প্রায় আধ ঘণ্টা লেকের কূলে আমরা অপেক্ষা করলাম কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে লেকে কোন কিম্ভূত কিমাকার আবছায়া মূর্ত্তি বেরিয়ে এলো না। শুধু শুনতে পেলাম লেকের ভেতর থেকে হিপোর গর্জ্জন—কখনও কাছে, কখনও দূরে!

নিতান্ত নিরাশ হ'য়েই ফিরলাম সে রাতে। বোধ হয়

পরীক্ষার হল্ থেকেও কখনও এতোটা নিরাশ হ'য়ে ফিরিনি ; কারণ, পরীক্ষার ব্যাপারটা কতকটা দৈবের উপর নির্ভর করে, কিন্তু হিপো দেখার বিষয়ে এতো কথা শুনেছি যে সে বিষয়ে জগন্নাথ দর্শনের মতই নিশ্চিত ছিলাম।

পরদিন ভোরে উঠেই মনে হোল জিঞ্জার যেন আর কোন আকর্ষণই নেই। রিপণ ফল্‌স্ দেখা হ'য়ে গেছে, হিপো ও কুমীর দেখ্‌তে গিয়ে নিরাশ হ'য়েছি সুতরাং আর জিঞ্জায় থাকতে ভালো লাগ্‌লো না। আমাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী মাত্র ভিক্‌টোরিয়ায় জলভ্রমণ বাকী। তাই চায়ের শেষে আবার ভিক্‌টোরিয়ার দিকে চল্‌লাম। pier এর কাছে অনেক নেটিভ্ তাদের 'মুটুঙ্গী' (নৌকো) নিয়ে হাজির। তাদেরই একটা ভাড়া করে 'নেপোলিয়ান ক্যানেলে' বেরিয়ে পড়লাম। এখানে লেকের বিস্তার প্রায় দুই মাইল—নিস্তরঙ্গ লেকের দিকে তাকালে 'হৃদয় যমুনার' কথা মনে পড়ে। তার অতলস্পর্শী গভীরতা ও স্নিগ্ধতার মধ্যে মন ডুবে যায়। তার নিবিড়তার মধ্যে জগত সংসার সুখদুঃখ সব মিলিয়ে যায়! মিঃ মালেককে বোললাম, "what about a dip in the lake?" মিঃ মালেক হেসে জবাব দিলো, "yes, you can, but there are croes. They would tabe you down into the deep." যেন চাবুকের ঘা দিয়ে বাস্তবের রূঢ়তা আত্ম-প্রকাশ করলো! সৃষ্টির বৈষম্য—সৌন্দর্য্য ও সংহার, beauty and beast—এরাই তো চিরকাল সৃষ্টির আলো ছায়া রচনা করে এসেছে!

জল বিহার শেষ করে ফিরতে বাজলো প্রায় দেড়টা। ট্রেণের যাত্রীর মতো রুদ্ধশ্বাসে স্নানাহার সেরে নিলাম—কারণ মিঃ করিমের সঙ্গে স্থির হ'য়েছিল আড়াইটার সময় জিঞ্জা থেকে আমরা রওনা হবো। মিঃ করিম যথাসময়ে তাঁর পুষ্পক রথ নিয়ে এসে হাজির হলেন। জিঞ্জা পিছনে ফেলে আমরা কাম্পালার দিকে রওনা হলাম—সাথে নিয়ে এলাম একদিনের মধুর স্মৃতি।

ভবেশ দাশগুপ্ত।
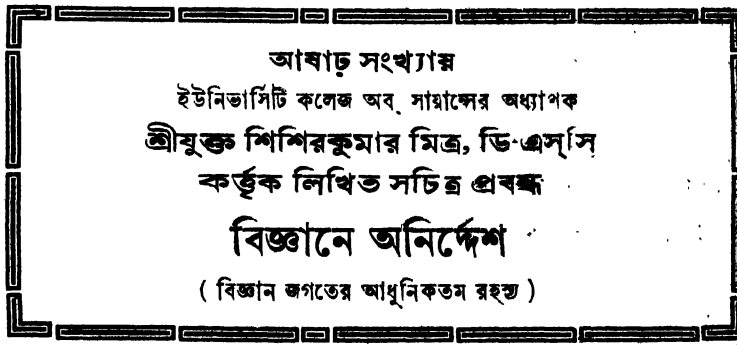
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস ও রজকিনী

শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম,-এ,

১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতা যুক্ত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলীর এক খণ্ডিত পুঁথির সন্ধান প্রাপ্ত হন: ঐ পুঁথি ১৩১৮ সালে তৎ-কর্ত্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য আহৃত হয়। পরে শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ঐ পুঁথি "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই নামটি সম্পাদকের প্রদত্ত, কারণ পুঁথি খানির নাম পত্র ও শেষাংশ (পুষ্পিকা সহিত) বিলুপ্ত। এই বহির প্রকাশের সময় হইতেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস ও আর তৎপূর্ব্বেই লোক প্রচলিত চণ্ডীদাস নাম সংসৃষ্ট পদাবলীর রচয়িতা এক ব্যক্তি কিনা এ সম্বন্ধে সমস্যার উদ্ভব। সম্পাদক এ সম্বন্ধে যুক্তি তর্কের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে দুই ব্যক্তির অভিন্নত্ব কল্পনার কোন বাধা নাই। এ সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের" মুখ বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমার মতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই। সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল—সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।"

কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয়ের মত জ্ঞান বুদ্ধি ব্যক্তির এই উক্তির পরেও ঐতিহাসিক গবেষকের কেহ কেহ সংশয়কে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন দোষ দেওয়া যায় না। সত্যান্বেষণে সকলের চেয়ে গোড়ার কথা হইল সংশয়। যাহা সংশয়িত লোকদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে তাহাই সত্য-পদ—বাচ্য হইবে। তাই শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছিন্নপত্র" প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসাকে প্রসংশা করিয়াছি; এবং তাহার প্রকাশিত "ধারণা" গুলির (দ্রঃ-বিচিত্রা ১৩৪০, বৈশাখ ৪৬৪ পৃঃ) একটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

চৌধুরী মহাশয়ের দুই নম্বরের ধারণাটিরই আলোচনা করা যাক। তিনি বলেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস ও পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস এক কবি নন্।" চৌধুরী মহাশয়ের এরূপ ধারণার প্রধান আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় আদিরসের অবাধ চর্চ্চা হেন তাঁহার বিবেচনায় মহাপ্রভু এ "অশ্লীল" গান শ্রবণ করিয়াছিলেন এরূপ কথা "অবিশ্বাস্য"। দেখা যাক্ চৌধুরী মহাশয়ের এই যুক্তি কতদূর সারবান। মহাপ্রভু কেবল যে চণ্ডীদাসের গান শুনিতেন তাহা নয় পরন্তু বিদ্যাপতির গান এবং শ্রীগীতগোবিন্দের গানও শ্রবণ করিতেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। চৌধুরী মহাশয় কি বলিতে চাহেন বিদ্যাপতি ও জয়দেব ঠাকুরের লেখায় যে আদি রস আছে তাহা খুব ভিন্ন শ্রেণীর? বিদ্যাপতির পাশ্চাত্য সমালোচকদের লক্ষ্য করিয়া স্যর জর্জ গ্রীয়ার সন্ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "They Cannot be judged by Europen rules of taste, and must not be condemned too hastity as using the language of the brothel to describe the soul's yearning after God" (An Introcduction to the Maithili Language, vol II. p. 36.) এই ত গেল বিদ্যাপতির কথা; যে জয়দেব কবি 'ঘটয় ভুজ বন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং ইত্যাদি লিখিয়া গিয়াছেন চৌধুরী মহাশয় তাহার সম্বন্ধেও কোন আপত্তি তোলেন নাই। অতএব এরূপ আশা করিতে

পারি কিনা তিনি তাঁহার ধারণাটি সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন? মহাপ্রভু যদি বিদ্যাপতি ও জয়দেবের গীত শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলেন তবে বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তাঁহার অরুচি হইবার কোন কারণ দেখি না। আর বিশেষত এই ঘটনার পোষক বৈষ্ণব মহাজনদের একটি সাম্প্রদায়িক মত চলিত আছে। তাহা এই যে, রসকীর্ত্তন অর্থাৎ আদি রসাশ্রিত লীলাকীর্ত্তন সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে, মহাপ্রভু ও কেবল তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে রসকীর্ত্তনের অনুমোদন করিতেন; অপর ভক্তসাধারণের জন্য ব্যবস্থা ছিল কেবল নাম সঙ্কীর্ত্তন। এই মত ও ঘটনা ঐতিহাসিক হইলে মহাপ্রভুর বিবেচনার প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে। আমাদের মনে হয় ইহা ঐতিহাসিক সত্য। চণ্ডীদাসের পদাবলীর আদিরসসিক্ত অংশ সর্ব্বসাধারণের বোধ্য বাংলা ভাষায় ছিল বলিয়া হয়ত চৈতন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ভক্তগণ তাহার অবাধ প্রচারে বাধা দান করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ্য অথবা কেবল পণ্ডিতজনের বোধ্য বিদ্যাপতির মৈথিলী ও জয়দেবের সংস্কৃত কাব্যকে তাঁহারা তাদৃশ বাধা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাই, চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব হইতে পারিয়াছে।

চৌধুরী মহাশয়ের সংশয়িত মন উপরের আলোচনা হইতে সংশয়মুক্ত হইবে কিনা জানি না, তবে 'কামগন্ধহীন' রজকিনীর চণ্ডীদাস তাঁহাকে যে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা নিশ্চিত। এবং ইহাই হয়ত তাঁহার মতে বড়ু চণ্ডীদাস হইতে তাহার পৃথকত্বের মস্ত প্রমাণ। দুঃখের বিষয় জিনিসটিকে তাঁহার দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ যাহা আন্দাজ করিয়াছেন তাহাই হয়ত সত্য হইবে। বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের মতে 'কামগন্ধ'-হীনা রজকিনী সংস্পৃষ্ট চণ্ডীদাসের নামে চলিত পদাবলী, বড়ু চণ্ডীদাস বা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসেরই শেষ বয়সের রচনা। খুব সম্ভব 'কামগন্ধ'যুক্ত কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলী রচনা করিয়া শেষের দিকে তিনি মত ও রুচি বদল করিয়াছিলেন; তাই 'পিউরিটান্' শ্রোতাদের সমঝাইয়া বলিতেছেন—

> "রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
> কাম গন্ধ নাহি তায়।"

অর্থাৎ এ আদি রসাশ্রিত 'রাহী' আর 'কান্হে'র লীলা নহে; এ হইতেছে আমার কামগন্ধহীনা রামী রজকিনী আর আমি স্বয়ং চণ্ডীদাসের বিশুদ্ধ প্রেমলীলা। ইহাতেও কি কল্পিত দুই চণ্ডীদাসের অভিন্নত্বের একটা আভাস পাওয়া যায় না? অন্ততঃ ব্যবসায়ী উকীলে পাইতে পারে।

চৌধুরী মহাশয়ের অন্য সংশয়িত ধারণাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কারণ সেগুলির উত্তর গত মাঘের (১৩৩৯) ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'চণ্ডীদাস সমস্যা' প্রবন্ধের ভিতর রহিয়াছে। চৌধুরী মহাশয় এবং তাহার অনুরাগী পাঠকগণকে ঐ প্রবন্ধ পড়িতে অনুরোধ করি। চৌধুরী মহাশয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক; এই জন্যই তাঁহার ধারণা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন মনে হইল; নচেৎ তাঁহার ধারণাগুলি পড়িয়া তাঁহার প্রদত্ত যুক্তির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কিছু পাইয়াছি বলিয়া বুঝিলাম না। উল্লিখিত প্রবন্ধটিতে মাঝে মাঝে কেবল তাঁহার চিরাভ্যস্ত ব্যঙ্গবিদ্রূপের ছিটে ফোঁটা বেশ রহিয়াছে এবং তাঁহার সাহিত্যিক temperature ও মনে হয় normal এর বেশ উপরে। আমরা Renan রচিত যিশুর জীবনী পড়ি নাই। চৌধুরী মহাশয়ের লেখাটি কি সেই আদর্শেই রচিত? অনেক পাঠকেরই মনে এই সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিতেছে।

মনোমোহন ঘোষ

কৈফিয়ৎ

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

খাতা চাহিয়াছি,—হেসনা বন্ধু,—কৌতুক কোরো নাকো
আমার মনের গোপন কথাটি চুপি চুপি শুনে রাখো,
কেন যে চেয়েছি?—জীবনের কত সন্ধ্যা সকাল বেলা
হাসি অশ্রুর কত অভিনয়—আশা নিরাশার মেলা,
সরমেতে যাহা ফোটেনি মুখেতে—শাসনে মেনেছে চুপ্
লেখনীর মুখে অজানিতে তারা—কখন ধরেছে রূপ!
লজ্জায় মরে যাই,—
লোকের চোখের আড়ালে তাইতো—লুকায়ে ফেলিতে চাই।

কাব্য কোথায়?—কবি নহি—এযে আপন কাহিনী লিখি'—
মনের মাঝারে বাজিছে যে সুর—তাহারি তালটি শিখি'
কর্ম্মের শেষে—সারা অবকাশে গোপনে গৃহের কোণে
দিবসের যত ব্যথা আনন্দ—লিখে চলি' আনমনে,
কি জানি কখন পড়ে' কার চোখে—কি অর্থ হবে তার—
লজ্জায় ভয়ে কাঁপে তাই বুক—ফিরে চাই বারবার,
সে শুধু আমার থাক্—
আমারি বুকের আঁচলের তলে চির-নির্ব্বাণ পাক্।

যা লিখি'—বিরলে চুপে চুপে রাখি—নয় এ সরম ছল
ছন্দোবিহীন মনের কাকলি কাহারে শোনাব বল?
সবাকার রুচি নয়তো সমান—নিঠুর বাক্য বাণে—
কে কোথা কখন বিঁধিবে মর্ম্ম—মরে যাবো অভিমানে,
আপন চিন্তাধারায় সকলে নয়নে ঝরায়ে স্নান
খুঁজে পেতে চায় বিশ্বে কেবল নিজেরি মনের তান,
তাই এ লজ্জা ভয়,—
আমার রচনা—সে শুধু আমারি আপনার পরিচয়!

জীবন অনির্দ্দিষ্ট—সে জানি,—জানি সে গভীর মেঘে
যদি ঘিরে আসে আকাশ আমার,—মৃত্যু ব্যাত্যা লেগে
যদি নিভে যায় নয়ন আলোক; অবশ এ বাহু হতে
সযত্নে ঢাকা এই ক'টি পাতা যদি পড়ে রয় পথে,—
ক্ষতি কি বন্ধু? শত বিদ্রূপ—শত নিন্দার গ্লানি
স্থির অচপল বক্ষ তখন—কাঁপাবেনা জানি-জানি,—
সেই সান্ত্বনা-সুখে—
আজো নির্ভয়ে মনের কাহিনী আঁকি' এ খাতার বুকে।

একদা সে কোন্ পথ কিনারায়—তরুর স্নিগ্ধ ছায়ে—
পথচারী কোনো—লভিতে বিরাম হয়তো বাজিবে পায়ে,
যদি আনমনে তুলে লয় কেহ—যদি খোলে তার পাতা
লিখে যাব তাই,—"নয় এ কাব্য—ছোট একখানি খাতা,
অপূর্ব্ব কিছু পাবে না বন্ধু, অতি সামান্য দান—
রহস্যময় মানব মনের—আলো ছায়া ভরা গান,
হে অপরিচিত প্রিয়—
পড়ে দেখো—যদি ভাল নাহি লাগে—চিতায় তুলিয়া দিয়ো।"

এ দু' এর রং আলাদা

শ্রীহিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

—এ তোমার বাড়াবাড়ি, নিভা !

—কী বাড়াবাড়ি ?

নিভা মুখ তুলে তাকালে। তার কালো, গম্ভীর চোখ-দুটি সোমেনের চোখের উপর প্রায় ফোকাস্ করে ফেল্লে।

অদ্ভুত ঐ চোখ দুটি, অদ্ভুত ! ও চোখের স্থির, অপলক দৃষ্টি সোমেন আর সইতে পারে না। একদিন যাতে ছিল যাদু, আজ তাতে জ্বালা। দুঃসহ, অপরিমেয় জ্বালা।

উষার আবছায়া অবগুণ্ঠনের তলে সোমেন ও চোখ দেখেচে,—সুনীল, সজল, স্নিগ্ধ। ও চোখের ফিনিক-মারা বিদ্যুৎ,—রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় সোমেন তাকে অনুভব করেচে। আর আজ এখন তাকে দেখচে,—স্তিমিত, গভীর, উদাস।

ঐ ত' চোখ ! কী ওর বিশেষ রূপ ! ঐ ত' চাহনি ! কী এমন বিশেষ ভঙ্গী ! সোমেন বুঝতে পারে না ; ভাবতে পারে না। তার সর্ব্বাঙ্গ যেন বিছুটির জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে।

চোখ ফিরিয়ে সোমেন বল্লে, বাড়াবাড়ি—আমাকে নিয়ে তোমার ছেলেখেলা !

এই ত' সে চায় ! আজ সে শক্ত হতে চায়, রূঢ়, কঠোর, নির্ম্মম ; সোমেন চায় তার জিব দিয়ে শুধু তীব্র, ঝাঁঝালো বিষ দানা বেঁধে বেরোয়।

নিভা বল্লে,—ছেলেখেলা !

—হাঁ, ছেলেখেলা, আমাকে নিয়ে তোমার ছিনিমিনি খেলা।

—বেশ !

—বেশ না, ভাই। এ অস্বীকার করে পাপের ভার আর বাড়িয়ো না। তুমি নিজেও বলতে বাধ্য যে এ-ই সত্যি। আমি ছিলুম তোমার আটপৌড়ে কাপড় যার দরকার ছিল, দাম ছিল না।

—সত্যি বিশ্বেস করো তুমি তা !

—হাঁ, করি। ভীষণ ভাবে করি। না করে উপায় নেই বলেই করি কারণ করতে আমার খুব স্ফূর্ত্তি হয় না।

নিভা বল্লে – ও ধারের ইলেক্‌ট্রিক আলোর একটা তীক্ষ্ণ তীর এসে নিভার ডান চোখের পাতার উপর কাঁপচে, পতঙ্গ যেমন আগুনের পাশে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাঁপে তেমনি—

নিভা বলতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুক্ষণ কিছুই বল্লে না। পরে র‍্যাপারটা গায়ে জড়াতে জড়াতে চেয়ারের উপর একটু হেলে পড়ে বল্লে,—যাক্ এ ভালোই হল সোমেন, যে বিধাতা তোমায় মুক্তি দিলেন।

—হাঁ, বিধাতার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমার কাছে আরও বেশী কৃতজ্ঞ। কারণ সত্যিকার মুক্তিদাত্রী ত' তুমিই। বিধাতাকে একটা জমকালো উপলক্ষ্য করে তুমিই ত' আমায় মুক্তি দিলে নিভা। অবশ্য ভাগিয়ে দিলেও বলা যায়। তা যাক্। আমার স্থূল, জীর্ণ, আসল চেহারাটা আজ তোমার কাছে ধরা পড়ে গেচে—আর কেন? এখন আমি সাধারণ, অতি সাধারণ। আজ আমার কোনও চার্মই নেই।

—সাধারণ !

—হাঁ, সাধারণ। তাতে আঁৎকে উঠো না। ভয় পাবার কিছু নেই। অসাধারণ হবার লোভও আমার নেই, শক্তিও আমার নেই। পথ-কুড়োনো একটা হাংলা ছেলেকে পাল্‌তে পাল্‌তে তার উপর যেমন খানিকটা মায়া বসে যায়, আমার উপরও আজ তোমার তেমনি একটা টান। হাসছো ?

—না।

–না হয় তার চাইতে একটু বেশীই টান। কিন্তু টাইপ একই, একই টাইপ। অসহ্য, এ অসহ্য !

—সহ্য করতে ত' কেউ তোমায় বলেনি। নিভা হাসলে। একটু শুষ্ক, পাণ্ডুর, জোর-করা হাসি।

নাঃ, অসহ্য এই নিভা! অসহ্য তার ভালমানুষী। সোমেনের দারুণ ইচ্ছে হলো, ইচ্ছে হলো—কী জানি কী এক ইচ্ছে হলো!

টুকরো টুকরো বিষ জিবের উপর আলগা হয়ে ছড়িয়ে পড়চে, কিছুতেই জমাট বাঁধচে না। কেন এমন হচ্চে? মুখে তার কথা ফুটচে না কেন? কথায় হুল ফুটচে না কেন? নিজের হাত থেকেই নিষ্কৃতি পেতে গিয়ে, সে—সোমেন মিত্র—এতক্ষণে ফের স্ক্রীনের দিকে তাকালে।

যাক্, বেমালুম ভুলে গিয়েছিল সে যে তারা সিনেমা দেখতে এসেচে। সে এবং নিভা—পাশাপাশি দু'জনা বসে আছে, নিরিবিলি, একক, নিজ নিজ ভাব নিয়ে মসগুল। একটি বক্সে মাত্র দু'জনা; পাশের বক্সগুলোতে লোক নেই। সিনেমা চলছে, দু'জনার গল্পও চলছে, কখন এ গল্প ভাঙ্গবে কেউ জানে না। সিনেমাটা হাইকেন, দু'জনাকে একবার জোড়া দিয়ে দিলে তার আর নিজের জন্যে স্রেফ কিছু করবার থাকে না।

এতে আর নূতনত্ব কী? এমন ত' কত দিনই হয়েচে। সিনেমা-ভাঙার শোরগোলে যখন চমক ভেঙ্গেচে, দু'জনাই যুগপৎ বলে উঠেচে,—বারে! নিভা হয়ত' বলেচে,—কী বোকা আমরা! সোমেন হয়ত' বলেচে—যা হোক্ একটা কিছু বলেচে। বলতে বলতে দু'জনাই এসে নিভার কারে উঠে পড়েচে।

আবার সেই একই ইতিহাস। সিনেমা ভাঙ্গতে নিভা বলেচে,—ভারি মজা হল কিন্তু। সোমেন বলেচে,—এমন আর কী?

এমন ত' কত দিনই হয়েচে! তবে আজ আর বৈশিষ্ট্য কোথায়? কালও সোমেন দয়া করে সিনেমাতে আসতে পারে, চাইকি—ইচ্ছে হলে পরশুও আসতে পারে, ভবিষ্যতে বহুবারই হয়ত' আসবে; তবে আজ এমন কী?

বিশেষ রাত—আজকার রাত একটি বিশেষ রাত। সোমেনের মন বলচে,—আজকার যে বিশেষ রাত, একটু বাদেই সে অগস্ত্য যাত্রা করবে - কারণ—

এর অত্যন্ত সরল, সংক্ষিপ্ত, সঠিক কারণ হচ্চে যে কাল গোধূলি লগ্নেই শ্রীমতী নিভা রায় মিঃ সলিল সরকারের কর স্পর্শে মিসেস সরকারে রূপান্তরিতা হবেন—সুতরাং—

সুতরাং তখন সোমেন মিত্র নিভা রায়ের সঙ্গে সিনেমাতে আসুন বা না আসুন—

বরঞ্চ আসাটাই তার বেকুবি।

সোমেন শুনলে, র‍্যামন নোভারো গাইচে। উদাস গান—চৈত্রের বন-মর্ম্মরের মত যার শেষ চরণটিতে বিদায়-রাগিণী শিউরে উঠ্‌চে।

—পূর্ণিমা এলো, আবার পূর্ণিমা এলো। একদিন এই পূর্ণিমায় চাঁদিমার লাবণ্য নিয়ে তুমি আমার বাহু-বল্লরীতে ধরা দিয়েছিলে, আর আজ—হায় মানবী, ক্ষীণ মানবী, Oh thou frail woman!

গানের রেশটুকু সোমেনের মনের তন্ত্রীতে অস্পষ্ট গুঞ্জন তুলেছিল।

নিভা বল্লে,—আশ্চর্য্য গলা ওর! হঠাৎ বাংলা গান বলে ভুল হয়।

সোমেন বল্লে,—ও! ছোট্ট একটু শ্লেষ, কিন্তু শেল তার তীক্ষ্ণ...

আরও কিছু নিভার বলা উচিত, নিতান্ত উচিত! কিন্তু তাড়াতাড়িতে সে এক মস্ত ভুল করলে। কিছুই খুঁজে না পেয়ে খানিকটা হতাশ এবং খানিকটা সকরুণ ভাবে সে সোমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে ফেল্লে।

—তাকিয়ে আছ কেন হাবার মত?

—দেখ্‌ছিলাম। এ রকম জবাব নিভা মাঝে মাঝে দেয়।

—কাকে, আমাকে? এ রকম প্রশ্ন সোমেন, কই, আর কোনও দিন করে নি।

—না, ভাবছিলাম তুমি কী ভাবচো।

—ভাবছিলাম তোমরা কী shallow! এ গানের যেন আর কোনও গুণই নেই, শুধু—

—না, না আছে, আরও অনেক আছে, কিন্তু—

ব্যস্, ঐ পর্য্যন্তই। নিজের অসমাপ্ত কথাগুলো নিজের কাণের ভেতর দিয়েই নিভার মস্তিষ্ককে গিয়ে এমন সজোরে ঘা মারলে যে সে একেবারে মট করে ভেঙে গেল। ছি, ছি! অবশেষে তার আত্মরক্ষার প্রয়োজন হল নাকি?

সোমেনের আজ জহ্লাদের মত উল্লাস হচ্চে, বেশ একটু জোর গলায় বল্লে (ভাগ্যিস্, পাশের বক্সগুলোতে লোক নেই),—আছে, কিন্তু তা তোমাদের জন্যে নয়, সাগর ছেঁকে যে মুক্তো তুলবে, সে ডুবুরী তোমরা নও। একটু হালকা ফ্যাশান, আলগা রং, ভাসাভাসা refinement, কথার একটু সস্তা কারচুপি—এ নইলে তোমরা বাঁচো না, এ-ই তোমাদের সব, এরই জয়জয়কার তোমাদের কাছে। তোমাদের চেয়ে বরং হাবাগোবা, অশিক্ষিতা, গাঁয়ের মেয়েরা ভাল। তাদের আর যাই থাক্, ভণ্ডামি নেই।

—সে ত' আমি অস্বীকার করি নি, সোমেন।

—তারা shallow, কিন্তু ভালমানুষ। এ্যাভারেজ্ এর উপরে তারা থাকতে চায় না, সে অহংকারও তাদের নেই। আর তোমরা?

নিভা ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লে,—বল।

—শুধু গর্ব্বই কর, মাটিতে পা পড়ে না, ফুঁ দিয়ে দিয়ে চল, অথচ কাল্‌চার্ কাকে বলে জানো না। জানবার ক্ষমতাও নেই। পলিশ্‌কে ভাবো কালচার, ম্যানার্সকে ভাবো taste। নিজেদেরও ভুলাও, পরকেও তোমরা ভুলাও।

নিজের কথাগুলোই সোমেনের মনের উপর হাতুড়ি পিটে পিটে তাকে আরও শক্ত করে দিচ্চে। মাঝে মাঝে দু' একটা আগুনের ফুলকিও ঠিকরে পড়চে বুঝি।

বেশ হল, এ-ই বেশ হল। সোমেন আজ চায় লোহার চেয়ে শক্ত হতে, ইস্পাতের চেয়ে ধারাল!

নিভা যেন আর পারছিল না। নেহাৎ কিছু বলতে হবে বলেই বল্লে,—আশ্চর্য্য তোমার কথার ঝাঁঝ সোমেন।

—আর আশ্চর্য্য তোমার মেকি সহনশীলতা, নিভা!

নাঃ, আর না। নিভার দম-আটকে আসছে। রুদ্ধদার, জন-বহুল প্রেক্ষাগারের গুমোট বাতাস ঠিক জগদ্দল পাথরের মত নিভার বুকের উপর চেপে বসেচে যেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বল্লে,—বড্ড গরম, বাব বাঃ! চলনা, বেড়িয়ে পড়ি!

—চল।

সোমেনের মন্তব্য যে সব তার সুচিন্তিত, সুপ্রতিষ্ঠিত অভিমত বলেই নিভা মনে মনে মেনে নিচ্ছিল তা' নয়। কিন্তু, তবু—

তবু, সেই সোমেন আজ এমন হল কেন? কোথায় গেল তার অপূর্ব্ব আত্ম-সংযম, তার সূক্ষ্ম রুচিবোধ, তার নিঃশব্দ, নিরলস, নিঃস্বার্থ ভালবাসা! এমনটি তার কেন হল?

নিভা ত' সোমেনকে জানে! সে যে তার চার বছরের সঙ্গী,—ঘনিষ্ট, অন্তরঙ্গ, বিশিষ্ট সঙ্গী! সেই সোমেন! নিভার বুক যেন দুরুদুরু কাঁপতে লাগল, শিকারীর হাতে ধরা পড়ে ঘুঘুপাখীর তুলতুলে বুকটা যেমন কাঁপে।...

বহুক্ষণ দু'জনাই চুপচাপ। নিভার গাড়ী ছুটচে। পাশাপাশি দু'জনা বসে আছে তাতে সোমেন এবং নিভা। কারু মুখেই কথা নেই।

সোমেন ভাবচে,—কত বড় বিরাট আহাম্মক সে, কী নিরেট প্রচণ্ড গাধা! কতগুলো স্বপ্নময়, আবেশময়, আশা-আশঙ্কা-তরঙ্গায়িত মদির মুহূর্ত্ত—যার ফেনিল উচ্ছ্বাস তিক্ত, বিস্বাদ মদের উপ্‌চে পড়া বুদ্‌বুদের মতই অসার—তাকেই সে ভেবে নিয়েছিল জীবন, চরম জীবন, জীবনের পরম সার্থকতা! বাঃ, কী চমৎকার অপদার্থ সোমেন! তোফা!

সোমেনের পার্শ্ববর্ত্তিনী নিভা তখন স্বপ্ন দেখছিল। সলিলের তপ্ত বুকের উপর মাথা রেখে সে বলছিল,—ইস্, তুমি কী!—অভিমানে তার চোখ ছলছল করে উঠ্‌ল, ধরা গলায় সে বল্লে,—চার বছর, দীর্ঘ চার বছর! রোজ ভেবেচি আজ তোমার চিঠি আসবে, আর রোজই—মাগো, কী করে যে দিন কাটিয়েচি! তুমি কি কিছু বুঝ না, কিছু না?

হঠাৎ সোমেন বল্লে,—শোন।

ধরা গলায় নিভা বল্লে,—বল।

—ধর, কাল যদি তোমার বিয়ে না-ই হয়!

কেন ?

কেন নেই, এমনি। ধর, হল না।

বেশ।

বেশ না, হলোই না। তা হলে একেবারে—যাকে বলে উদ্‌ভ্রান্ত—তাই হয়ে পড়বে, না ?

ছ্যাৎ !

ঠিক কী ভাবে যে সোমেন কথাটা পাড়বে, ঠাহর পাচ্চে না। অথচ না বলেও তার স্বস্তি নেই। বিপুল ঋণভার নিভার কাছে তার। সুদ দিয়ে দিয়ে সে ফতুর হয়ে গেল। আর না, আজই যা হোক তবু শোধ-বোধ হয়ে যাক্। আজই, এক্ষুণি !···

চৌরঙ্গীর উপর পড়তেই ড্রাইভার ব্রেক কসলে। নিভা বল্লে,—লেক।

গাড়ী ছুটচে। হোটেলগুলোর সাম্নে সারি সারি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। মাঠটা ক্রমশঃ পাক খেয়ে খেয়ে পিছিয়ে যাচ্চে। নিভার দু'এক গাছা চুল বাতাসে মুখের উপর পড়চে এসে ; গায়ের চাদরটা অবুঝ লোভীর মত সোমেনের একটা হাতের উপর ঢলে পড়লো। সোমেন বল্লে,—আমাকে সহ্য করা তোমার অন্যায় হয়েচে, নিভা।

আরও কিছুক্ষণ কাটলো। জগুবাবুর বাজারের দু'একটা দোকান বন্ধ হচ্চে। হাজরা পার্কের মোড়ে দু'টো রিক্স, তাদের ঘিরে একপাল লোক, দু' একটা লাল পাগড়ীও দেখা গেলো। সেখানে বেশ কলরব, বাকী পথ নিঝ্‌ঝুম হয়ে এসেচে। সোমেন বল্লে,—আমাকে আস্কারা দেয়া তোমার ঠিক হয়নি।

—কী আস্কারা ?

—সে তুমি নিজেই জানো। যে অন্তরঙ্গ ভাবে তুমি আমার সঙ্গে মিশেচো, তাতে শুধু আমি নই, আমার বয়সী যে-কোনও ছেলেই বিগড়ে যেতে পারে, মনে করতে পারে—

—কিন্তু তুমি ত' আমার সবই জানতে, সোমেন। 'সবই'টা একটু বিশেষভাবে চাপা গলায় বল্লে যাতে বুঝা গেল যে ওর বিশেষ এক রূপক অর্থ আছে।

—সব জানতুম না, তবে সলিল সরকারের খবরটা জানতুম। জানতুম, একদিন তোমরা—হাঁ, একদিন তোমরা পরস্পরকে ভালবেসেছিলে, তাই জানতুম। এ-ও জানতুম যে তোমাদের বিয়ে নাকি ঠিক হয়েই আছে। তবে—তবে আর কী ! একটু বোকামি করেচি এই যা'।

—বোকামি মানে ?

—এ-ও ত' দেখতুম যে চার বছর তুমি কলকাতায়, সলিল গ্লাশ্‌গোতে। খুব যে ঘন ঘন পত্র-বিনিময় চলতো তা'ও মনে হতো না, বরং তোমার কথা-বার্ত্তা, আভাসে-ইঙ্গিতে তার উল্টোই মনে হতো। অথচ আমরা ত' ক্রমশঃই—আমাদের আত্মীয়তা ত' ক্রমে বেড়েই চলেছিল বলে—অবশ্য ভুলও আমার হতে পারে।

—না, এ সত্যি। তবে এ সত্যি নয়—

—কী সত্যি নয় ?

—যে সলিলকে আমি ভুলতে বসেছিলুম। তাঁকে ভুলতে আমি পারি নে। সেটা অসম্ভব বলেই পারি নে।

—অসম্ভব বলো না, বল যে এখন পর্য্যন্ত তোমার অসম্ভব বলে মনে হয়।

—আচ্ছা, তাই। এখন পর্য্যন্ত ত' আমার অসম্ভবই বোধ হয়। কিন্তু—

সোমেন একটা অস্পষ্ট শব্দ করে জানালে যে নিভা বলে যেতে পারে।—কিন্তু তোমার কাছ থেকে যা পেয়েচি, তুমি যা দিলে আমায়, তাকেও ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে সম্মান না করেও আমি পারি নে।

—অসীম, অসীম তোমার দয়া, নিভা !

না, না, দয়া নয়, এ দয়া নয়। ছিঃ, সে কি ? এ কি কথা !—কী অদ্ভুত দুর্ব্বলতা তোমার নিভা ! দয়া—ভিখিরিকে ভিক্ষে দেয়া—যুগ যুগান্ত ধরে লোকে যার প্রশংসা করেচে, তা-ই তুমি সইতে পারচো না ? ভিখিরি হিসেবে আমারও এতে অপমান নেই আর তুমি ত' অন্নপূর্ণা, তোমারও কিছু সঙ্কোচ নেই। আমি ত' বরং কৃতজ্ঞই যে মুখ ফুটে না চাইলেও তুমি আমার স্বরূপ চিনেছিলে।

—হুঁ, চিনেছিলুম, সত্যিই আমি চিনেছিলুম।

নিভা থামলে। একটু ভেবে নিয়ে বল্লে,—আর

চিনেছিলুম ব'লেই আজ এখনকার তোমাকেও আমি সইতে পারচি। আমি জানি এ তুমি নও, এ রূপ তোমার নয়, এর সাথে তোমার অন্তরের কিছু যোগ নেই। আমি জানি তুমি কত বড়!

—ভুল জানো, নিভা। বেশ বড় রকমের ভুল জানো। আমার সুসভ্য আস্তরণের নীচে এক বিদঘুটে, স্বার্থপর, মাংসাশী দানব লুকিয়ে আছে। আজ তার মুহুর্মুহু দাঁত-কপাটির দু' একটা খিঁচুনি মাত্র দেখলে।

—কিন্তু আমি যে তোমার দেবতাকেও দেখেছি সোমেন। তার পাশে এ দানব যে কত ভুঁয়ো, কত ঠুন্‌কো. সে আর কেউ না জানুক, আমি ত' জানি, তাই তোমার উপর আমার শ্রদ্ধার—

—শ্রদ্ধা !! I feel flattered ! দয়া করে, দয়া করে আমায় রেহাই দাও নিভা।

—হাঁ, তোমার উপর আমার শ্রদ্ধার সীমা নেই। তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি।

সোমেন অস্ফুটস্বরে বললে,—good !

একটু চুপ দু'জনাই। পরে সোমেন বললে—অনেকটা নাটকীয় ভঙ্গীতে—সলিলবাবুর জন্যে আমার দুঃখ হচ্চে।

—তাঁর সঙ্গে তোমার তুলনা করো না সোমেন। এ দু' ভালবাসার তফাৎ আছে।

—ওঃ, তা-ই বল! বাঁচা গেলো যাহোক্। এক ভালবাসা সমুদ্রের মত গভীর, আর এক ভালবাসা গোষ্পদের মত—বল না, নিভা, just help me ভাষায় ত' তোমার কম দখল নয়।

—না, তা নয়। তবে ঠিক যে কী তা বুঝানোও মুস্কিল। তবে এটুকু বলা চলে যে এ দুয়ের রং আলাদা।

—সেকি, নিভা? এর মানে? উঃ! নিভা! এতক্ষণে তুমি আমায় হাসালে! রক্ত-করবী যে তোমার মুখস্ত, তার এর চেয়ে ভাল প্রমাণ আর নেই। আমার রঞ্জনের ভালবাসার রং রাঙা; আর কার রং—থাক্‌গে, থাক্ গে! হাঁ, থামাও। বাস।

—নাম্‌চো?

কিড্ ষ্ট্রীটের মোড়। নামচো বলতে গিয়ে নিভার গলাটা একটু কেঁপে গেলো। সে যেন বেশ অবাক হয়েচে।

—হাঁ, এই এস্‌প্ল্যানেড্ থেকে একটা বাসে উঠ্‌বো'খন। নেমে দু' এক পা এগিয়ে আবার ফিরে—

—ও, আর শোন। কাল বিয়েতে নেমন্তন্ন কল্লে' না।

- কাল সকালে যদি সময় পাও, একটিবার আসবে?

—সকালে? কি জানি! বলতে পারিনে। তবে সন্ধ্যায় চেষ্টা করবো আসতে। আচ্ছা।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো শেষ করে, সজোরে একবার ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে সটান মুখ ফিরিয়ে সোমেন যেন দৌড়াতে লাগল। নিভার মটর যখন কিড্‌ষ্ট্রীটের উপান্তে তার বাড়ীর দোরগোরায় গিয়ে দাঁড়ালো, তখন—কি তার একটু পরেই—সোমেনও এক শ্যামবাজার-গামী দোতালা বাসের উপর বেশ আয়াস করে চেপে বসলো।

সোমেনের মাথাটা অসম্ভব হাল্কা হয়ে গেছে। রাস্তার এক পাশে যতগুলো বিজ্ঞাপন পড়া যায় পড়তে পড়তে সে একেবারে তাদের মেসে পৌঁছে গেলো।

ভারি সুবিধে হলো তার, যেহেতু ঠাকুরকে বলাই ছিল যে সে রাতে খাবে না। সোজা তেতালায় লাফিয়ে উঠে সে তার ঘরের কবাটটা খুললে।

অবিন্যস্ত বইগুলো টেবিলের উপর ছড়ানো দেখে তার ব্যথিয়ে উঠল মনটা। ইস্. ধুলো জমে গেচে একেবারে! ইচ্ছে হলো তাদের সযত্নে ঝাড়ে, কিন্তু ঝাড়লে না। মনে মনে বল্লে,—কাল থেকে পড়ব, বইগুলো সিজিল মিছিল করে রাখ্‌ব, একটা অয়েল-ক্লথ কিনে এনে টেবিলের উপর বিছিয়ে দেব, খবরের কাগজে কি ভাল দেখায়? আর দেয়ালগুলোরই বা কী শ্রী! নাঃ, কয়েকটা ছবি টানাতে হবে। নন্দলালের তথাগত, রণদা উকীলের তাজ-নির্ম্মাণ-স্বপ্ন, রবীন্দ্রনাথের Dante আর—Beseeching না vision? মুকুলদে-র Selectionটা কি এখন পাওয়া যায়? না, কালই খোঁজ করতে হবে। টাকাও যে নেই ছাই। মুস্কিল।

মুস্কিলে পড়ে সোমেন ঘুমোনোই ঠিক করলে। আজ রাতটা বরং ঘুমিয়েই—ওকি?

সোমেন দেখলে অর্দ্ধোন্মুক্ত জান্‌লার ফাঁক দিয়ে এক টুক্‌রো জ্যোছ্‌না এসে আলসে এলিয়ে পড়েচে, ঠিক তার বালিসের উপর।

বাঃ, বাঃ!! বিবশা, বিহ্বলা, তন্বী জ্যোছ্‌না—আশা-আশঙ্কা-কামনায় পাণ্ডুর! নিটোল দেহের লাবণি বিছিয়ে সে যে তারই অপেক্ষা করচে! সোমেন আর থাকতে পারলে না। সস্নেহে, সাগ্রহে, আলগোছে নিজের গাল জ্যোছনায় গালের উপর রাখলে।

ধীরে নেমে এল তন্দ্রা।

জড়িমা যখন কাটলো, তখন বালিশ ভিজে গেচে। সোমেনের চোখের কোনে কোনে জল টস টস করচে তখনো।

ভারি ভালো লাগল তার। আঃ!

আঃ! অনেকদিন, অনেকদিন পর সে যেন তার একটি পোষা বিড়াল-ছানা খুঁজে পেয়েচে।

চোখের জল! তার হারিয়ে-যাওয়া চোখের জল। আঃ!—সোমেনের ইচ্ছে হলো তার ফিরে পাওয়া চোখের জলকে সে একটু Pat করে।

হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

"দুই পক্ষ"

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

সমগ্র জীবন ভরি' দু'টি দিক মানবেরে করিছে বন্ধন,
একদিকে বিজ্ঞতার লৌহ-ধর্ম্ম, আর দিকে অসহায় শিশুর ক্রন্দন
শুক্লা, কৃষ্ণ, দু'টি পক্ষ আবরিয়া আছে তা'র অন্তরের আনন্দ আকাশ,
একদিকে শুধু হাস্য,—আর দিকে জাগে শুধু অশ্রুর-উচ্ছ্বাস!
দিবস রুদ্রতা হ'তে সভয়ে বাঁচায়ে রাখি আপনার ভীরু প্রাণ খানি,
প্রাণের অম্লান রাগে, সে প্রচণ্ড উষ্ণতায়—নাহি মোরা টানি!
বিরাট বিহঙ্গ সম, এক পক্ষে ধরণীরে ছায়াতলে দিতেছি নির্ভয়,
আর পক্ষ পথ-ক্লান্ত, বিথারিয়া শীর্ণ দেহ খুঁজি কোথা মরিছে আশ্রয়!
দিনের আলোকে যারে তুচ্ছ করি দেখিয়াছি, অবজ্ঞায় করিয়াছি হেলা,
নিশীথের স্বপ্ন-মাঝে, আমার চেতনা বাহি' চলে তা'রি রূপোৎসব খেলা!

— ——

রাজমহলের পাহাড়িয়া ধর্ম্ম

শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

প্রস্তরযুগের একটি গুহায় কতকগুলি মনুষ্যাকৃতি বানরের ছবি পাওয়া যায়। অপর একটি গুহায় আর একটি ছবি পাওয়া যায়, তাহার মাথায় হরিণের মত শিং, পেঁচার মত মুখ, নেকড়েবাঘের মত কান, ঘোড়ার মত লেজ, ভাল্লুকের মত থাবা, আর মানুষের মত পা ও দাড়ি (চিত্র নং ১)। এই দুইটি গুহায় প্রস্তর-যুগের মনুষ্যের চিত্রকলার বহু নিদর্শন আছে;—কোথাও একটি গবয় মনের আনন্দে লাফাইতেছে, কোথাও বা একদল হরিণ নদী পার হইয়া যাইতেছে, কোথাও নাচের বিচিত্র ছবি, আবার কোথাও বা উন্মত্ত শিকারী বন্য পশুর পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি চিত্র যে কি নির্দ্দেশ করে তাহা লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে—আজিও হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মনুষ্যাকৃতির বানরগুলিকে মনুষ্যরূপী (Anthropomorphic) দেবতা আর ঐ বহুবেশধারী জীবটিকে ঐ গুহার ঐন্দ্রজালিক বলেন। প্রস্তরযুগের এই ইন্দ্রজালের কল্পনা আজিও প্রত্যেক ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায়।
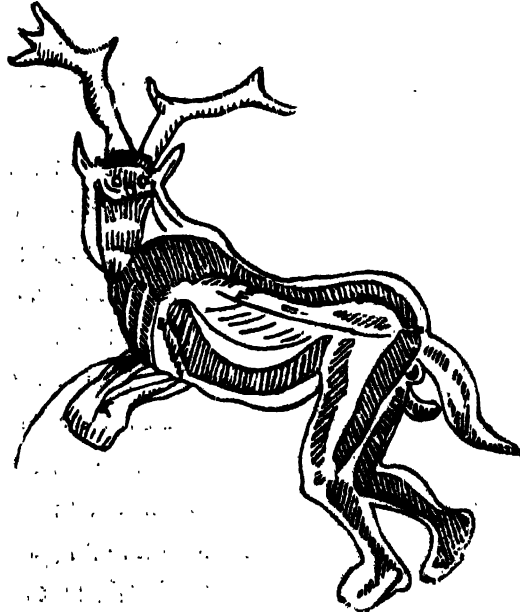
ফ্রান্সের প্রস্তর যুগের গুহার ঐন্দ্রজালিক

মানুষের উৎপত্তির যেরূপ ক্রমবিকাশ আছে ধর্ম্মের ও ঠিক সেইরূপ আছে। ধর্ম্মের জ্ঞান, ধর্ম্মের আবির্ভাব, ধর্ম্মের উৎপত্তির ইতিহাস এই নিম্নস্তরের ইন্দ্রজাল হইতেই সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়। মানুষ যখন প্রকৃতির উপর আপনার শাসন চালাইতে আরম্ভ করে তখন নিম্নস্তরের এই ইন্দ্রজালের উৎপত্তি হয়। কেহ কতকগুলি মন্ত্র পড়িয়া, কেহ কোনো জটিল ভৌতিক ক্রিয়ার দ্বারা, কেহ বা বিবিধ উপকরণের সাহায্যে পূজাপাঠের ন্যায় কার্য্য-পদ্ধতির প্রভাবে প্রকৃতির এক একটি প্রতিনিধিকে করায়ত্ত করার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। প্রকৃতির প্রতিনিধি বলিলে বুঝায় ঝড়, বাতাস, রৌদ্র, বৃষ্টি ইত্যাদি। আজিও বহু অসভ্য জাতির মধ্যে এই সকল প্রকৃতি-দেবতা-দিগকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বহু অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। মধ্য প্রদেশে গড়পাগড়ি নামে একটি জাতি আছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি শিলাবৃষ্টি বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে। ছোট নাগ-পুরের উপত্যকায় বীরহোর নামক একটি অসভ্য জাতি আছে— বৃষ্টি না হইলে তাহারা কিছুকাল ধরিয়া পাহাড়ের উপর হইতে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড গড়াইয়া দেয়; এই সকল প্রস্তর খণ্ড গড়াইয়া দিবার সময় যে ভীষণ শব্দ হয় তাহা প্রায় মেঘগর্জ্জনের

মত শুনায়। এই বর্ব্বরদিগের বিশ্বাস, এইরূপ করিলেই বৃষ্টি হইবে।

এইরূপ বিশ্বাসই ধর্ম্মের একটি প্রধান ভিত্তি। বৈদিক পুরাণতত্ত্বের মূলেও এই বিশ্বাস রহিয়াছে। মানুষের আশেপাশে যে সকল সামগ্রী এবং প্রকৃতির বিকার দেখা যায় তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকটাই সজীব ও ঐশ্বরিক—এই বিশ্বাসই বৈদিক ধর্ম্মের একান্ত ছিল। সজীব প্রাণীমাত্রই ভয়ের কারণ ছিল; তৎকালীন মানুষের বিশ্বাস ছিল, সজীব প্রাণীরও

হিন্দুদিগের বৃষকাষ্ঠের মত একটি দেবতা

আত্মা আছে এবং তাহারাও মানুষের শুভ ও অশুভ করিতে পারিত; সেজন্য তাহারা যে সদাই প্রশংসনীয় ছিল তাহা নহে—তাহাদের পূজা করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে হইত। বৈদিক ধর্ম্মে নিম্নস্তরের ধর্ম্মের প্রভাব অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বৈদিক দেবতারা গৌরবান্বিত মানববিশেষ (Glorified human beings)—তাহাদের মানুষের মতই উদ্দেশ্য ও উত্তেজনা ছিল—তাহারাও মানুষের মত জন্মিয়াছে কিন্তু তাহারা অমর। তাহারা এক একজন প্রকৃতির এক একটী দেবতারূপ প্রতিনিধি। এইরূপ বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ঈশ্বরে মনুষ্যরূপাদির আরোপ (Anthropomorphism) বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। Anthropomorphismএর সহিত পশুদেবতাদের প্রচলন কিছু পরিমাণে দেখা যায়। ইহাকে Theriomorphism বলা হয়—Theriomorphismএর দৃষ্টান্ত স্বরূপ মেঘের কথা বলা যাইতে পারে। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়—সামবেদে বৃষ্টিকে গোদুগ্ধের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

বর্ব্বর ধর্ম্মের একটী প্রধান স্তর হইল অচল পদার্থে চেতন প্রাণের বিশ্বাস। মানুষের আশে পাশে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই প্রাণ আছে এই ধারণাই অবশেষে সেই বাস্তব সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই একটীকে দেবত্বারোপ করিয়াছিল। অসভ্য জাতিদের মধ্যে এইভাবে তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের সামগ্রী—লাঙ্গল, মাদল, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতিতে দেবত্বারোপের নিদর্শন বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, ঝড়, বাতাস, নদী, পাহাড়, বন প্রভৃতি সকলেই এক একটি স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া পরিগণিত হয়। আপন আপন আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে অথবা নিজ গ্রামের মধ্যে কোন এক খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে ও সকলের পূজার্হ হইয়া উঠে। মৃত পূর্ব্বপুরুষরাও ভয়ের কারণ সেজন্য পূর্ব্বপুরুষদের পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পূর্ব্বপুরুষরা যে সর্ব্বদাই তাহাদের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এই বিশ্বাস অসভ্যজাতিমাত্রেই মানিয়া থাকে। এই সকল মৃত পূর্ব্বপুরুষদের বিশ্বাস, অচলপদার্থে চেতন প্রাণের ধারণা, প্রকৃতির এক একটী নিয়মের গতিবিধি অসভ্য সরল মানুষের মনে এরূপ ভীতি-উৎপাদন করে যে তাহারা তাহাদের নিকট মাথা নত না করিয়াই পারে না। চিরন্তন কালের বিশ্বাসের নিকট সভ্যতার পরিমার্জ্জিত রুচিও পরাজয় স্বীকার করে। ধর্ম্মের ব্যাখ্যা অনেকেই করিয়াছেন। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মধ্যে Sir Edward Tylorএর ব্যাখ্যা অতি সংক্ষিপ্ত—তিনি বলেন—"The minimum definition of religion

is the belief in spiritual beings." অশরীরী বস্তুতে বিশ্বাসকেই ধর্ম্ম বলে।

উপরে যে কয়টি কথা বলিয়াছে সেইগুলি একটি বিশিষ্ট অসভ্যজাতির ধর্ম্মের মধ্য দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। এই জাতিটির নাম সাউরিয়া পাহাড়িয়া। ইহারা সাঁওতাল পরগণার রাজমহল পাহাড়শ্রেণীর উপর বাস করে। আধুনিক সভ্যতার প্রবল প্রভাব হইতে ইহারা এখনও বহুদূরে সুতরাং কৃষ্টির পথে ইহারা এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রেতপূজাই সাউরিয়াদের ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি বলিয়া মনে হয়। এই প্রেতগণের মধ্যে এক শ্রেণী ইহাদের সমাজে হিতকর আর এক শ্রেণী অহিতকর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। হিতকারী প্রেতগণ বৃক্ষের উপরে ও বনে বাস করে আর অহিতকারীরা সর্ব্বদা মানুষের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়; যে সকল স্থানে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকেরা যাতায়াত করে, যেখানে গোমহিষাদি জল পান করে, যেখানে দুই গ্রামের সীমানা মিলিত হয় সেই সকল স্থানই শেষোক্ত প্রেতগণের আবাসভূমি।

সাউরিয়াদের মধ্যে কাষ্ঠেই অধিকাংশ দেবতার মূর্ত্তি গঠিত হয়। প্রস্তরও কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একবার একটি গ্রামে হিন্দুদের বৃষকাষ্ঠের মত একটি দেবতা (চিত্র নং ২) দেখিয়াছিলাম; কাষ্ঠফলকে কারুকার্য্যেরও কিছু নিদর্শন ছিল। নানাস্থানে নানাপ্রকারের দেবতার ঠাঁই দেখিয়াছি। একটির সহিত অপরটির সাদৃশ্য অতি বিরল। প্রস্তরে যে সকল দেবতা দেখিয়াছি তাহাতে কোন শিল্পকার্য্য আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড একত্র করিয়া দেবতার স্থান প্রস্তুত করা হয়। রাজমহল মহকুমার একটি গ্রামে একবার একটি প্রায় দুইহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ প্রোথিত প্রস্তর ফলক দেবতারূপে দেখিয়াছিলাম। প্রস্তর ফলকটি সরল নহে—কোনরূপ শিল্পকার্য্যেরও চিহ্ন তাহাতে নাই। হ্যাভেলের মতে যে বাংলায় প্রস্তর অভাবে দারুশিল্পের উন্নতি হইয়াছে তাহা এখানেও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজমহল পাহাড়ের উৎপত্তি আগ্নেয়গিরি হইতে; 'মরাপাহাড়' সর্ব্বত্রই দেখা যায়। শিল্পোপযোগী কঠিন প্রস্তর একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাউরিয়ারা তাহাদের দেবতার সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়া থাকে। প্রত্যেক কার্য্যের নিয়ন্তাই যেন তাহাদের দেবতারা। প্রত্যেক সাউরিয়া গৃহের সংলগ্ন প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে একটি করিয়া গৃহ-দেবতার স্থান থাকে।

জাওা গোসাই (গৃহ-দেবতা)

প্রায় প্রত্যেক গৃহের এক একটী স্বতন্ত্র গৃহদেবতা থাকে। কোন কোন গ্রামের মধ্যস্থলে মাত্র একটি দেবতার স্থান স্থাপন করা হয় ও তদধিষ্ঠিত দেবতা গ্রামের সাধারণ গৃহ দেবতা বলিয়া পূজিত হয়। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কোনো কোনো দেবতার পূজোপলক্ষে নানারূপ দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধান্তমদের ভাণ্ডার একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়; যে সকল পশু বলি দেওয়া হয় তাহাদের কেবলমাত্র হাড়গুলি এবং অন্যান্য অখাদ্য অংশ দেবতার ভোগে লাগে। পূজার উপকরণ অতি

অনাবৃষ্টির সময় চেপ্‌নাদ নামে একটি দেবতার পূজা করিলে বৃষ্টি হয়। অধুনা এই পূজার প্রচলন নাই বলিলে চলে। সকলে মিলিয়া ভিক্ষা করিয়া এই পূজার উপকরণ

গৃহদেবতা ও মাঝিথান

আহরণ করে। এই পূজা যে-কেহ করিতে পারে না। পূজারী ও পূজার স্থান উভয়ই অধুনা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সাউরিয়াদের মধ্যে রীতিনীতির নানারূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কিছু বা একেবারেই লোপ পাইয়াছে। যে দেবতাকে বৎসরের পর বৎসর পূজা করিয়াও কোন সুফল পাওয়া যায় না কতদিনই বা সেই দেবতার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা যায়? তাই আজ ইহাদের মধ্যে দেবতার স্থান এত শিথিল,—গত চারি বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহাদের মধ্যে একই দেবতার যে কত পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। ধনীর অর্থেই বৃক্ষতলের প্রস্তর মন্দিরে ঠাঁই পায়—যেখানে ধনেরই দারিদ্র্য সেখানে বৃক্ষতলের স্থানও পরিবর্ত্তনশীল হইয়া উঠে।

সাউরিয়াদের মধ্যে অধুনা দুইটিমাত্র দেবতার স্থান কিছু অটল দেখিতে পাই; গৃহদেবতা আর গ্রামদেবতা। কোথাও গৃহদেবতা আর মাঝিথান এক হইয়া গিয়াছে (চিত্র নং ৬); কোথাও চাল্‌নাদু আর গৃহদেবতা পৃথকভাবে পূজিত হয় না; কোথাও প্রত্যেক গৃহের বিভিন্ন গৃহদেবতার স্থলে সারা গ্রামে একটি দেবতার স্থান হইয়াছে, আবার কোথাও বা গ্রামদেবতা ও গৃহদেবতা (চিত্র নং ৪) এত সন্নিকটে অবস্থিত যে এক পূজায় উভয়েরই মনস্তুষ্টি করা হয়।

ভারতবর্ষে অন্যান্য অসভ্য জাতিদের মধ্যেও অধুনা অনুরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। সরলমনের প্রতিবন্ধক হইয়াছে যেন ইহাদের এই অকর্ম্মণ্য দেবতারা। মনের জয়ের সহিত পুরাতন দেবতাদের পরাজয় হইয়াই থাকিবে, তবে নূতন সভ্যতার নূতন দেবতাদের লোভ কিছুকালের জন্য নূতন পথে চালিত করে। তাই বর্ব্বর সমাজের মধ্যে এত বিভিন্ন কৃষ্টির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

শশাঙ্কশেখর সরকার

বাদল-স্বপ্ন

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

বর্ষা অপরাহ্ন। নিবিড় কালো মেঘের ছায়ায় দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে; শ্রাবণের পরিপূর্ণতা রূপ নিয়েছে আজকের এই শ্যামল অন্ধকারে। সিক্ত বাতাস যূথী ও কেতকীর গন্ধে মাতাল হয়ে উঠেছে। স্তর-বিহীন অখণ্ড ধূসর আকাশের দিকে উদাস-দৃষ্টি মেলে দিয়েছি

"কি ভাবচো?"

"কৈ, কিছু না তো!"

"বলো না!"

"তোমার চোখ দুটীতে ঐ মেঘমেদুর আকাশের রহস্যময় ছায়া ঘনিয়ে উঠ্‌চে। জানতে ইচ্ছে করচে, কি আছে ওর অন্তরালে। তুমি আজ কাছে থেকেও বড়ো দূরে সরে গেচ।"

"কী যে বলো! ঐ দেখ, বৃষ্টিটা আবার চেপে এলো। জানালাটা বন্ধ করে দিই, ছাট আসচে।"

"না থাক্।"

"ভিজবে বৃষ্টিতে? অসুখ করে যদি? ……তুমি অমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েচো কেন? কি দেখচো?"

"তুমি কি কোনো দিনই ধরা দেবে না? ভারি ইচ্ছে করে তোমার বাইরের খোলসটাকে টেনে ফেলে দিয়ে তোমার ভেতরের মানুষটার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াই। কী কঠিন প্রাচীর যে গড়ে রেখেচো নিজের চারিদিকে—কিছুতেই তোমার নাগাল পাই না!"

"কী চাও তুমি আমার কাছে? কী দিতে বাকি রেখেচি আমি?"

"সবই। তোমাকে তো আমি আজও পাইনি। তোমার দেহটুকু তো শুধু আমি চাই না—আমি যে চাই সম্পূর্ণ তোমাকে।"

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারি না

"তুমি আজ কাছে না থাকলেই বুঝি আমার এই বাদল-বেলা সার্থক হয়ে উঠতো—অন্ততঃ কল্পনার অবকাশ পেতাম। কল্পনায় তোমাকে পরিপূর্ণ করে পেয়ে আমারই আনন্দে আমার বুক ভরে যেতো।"

"আমায় পেয়ে তুমি সুখী হও নি।"

"এই দেখ! তোমার চোখ জলে ভরে এলো, এখুনি উপচে পড়বে। ঐ শ্রাবণ আকাশের অবিকল প্রতিবিম্ব তোমার চোখে। ঐ নারকেলগাছ-ঘেরা দীঘিটার সঙ্গেও তোমার ঘনপক্ষ্মাচ্ছন্ন চোখের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য—তেমনি কালো, তেমনি গভীর। কিন্তু তুমি আমায় ভুল বুঝলে। আমি অসুখী তোমায় পেয়ে নয়, তোমায় না পেয়ে।"

"সত্যি বলচি, তোমার কথা যদি আমি একটাও বুঝতে পারি! ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে।"

"আমার অশরীরি বোবা ব্যথাকে আমি ভাষা দিই কেমন করে? কর্ম্মমুখর রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সে ব্যথা হৃদয়ের কোন নিভৃত কন্দরে ঘুমিয়ে থাকে। আজ সে দুরন্ত আবেগে কেঁদে বেড়াচ্ছে সজল-মেঘে ঢাকা অন্ধকার আকাশ জুড়ে।"

"কী সে ব্যর্থতা? কেন এ বেদনা?"

"অনুভব করতে পারি, প্রকাশ করতে পারি না।…… তোমার চোখ ছলছল করচে। অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য্যে তোমার পাৎলা ঠোঁটদুটী অপরূপ হয়ে উঠেচে। কী সুন্দর তুমি! তোমার চোখে যে আমি চুমু দিলুম তাতে আমার মনে কামনার আগুন জ্বলে উঠলো না। আজ তোমায়

ভারি মিষ্টি লাগ্‌চে—একটী কোমল, সুন্দর, ছোট্ট শিশুর মতো। বড্ডো কচি, ভারি অসহায় মনে হচ্চে—আদর করতে ইচ্ছে করচে।"

*　　　　*　　　　*　　　　*

অভিরাম জল ঝরছে। বর্ষার জল পেয়ে চারা গাছ-পালাগুলো যেন অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে উঠেছে। মেঘের স্তর এখনও অত্যন্ত নিবিড়—বৃষ্টি থামতে বোধ হয় দেরী আছে।.........না-পাওয়ার বেদনাকে উপহাস করতে ইচ্ছে করছে। যার অস্তিত্ব কেবল-মাত্র মনে, কেমন করে তাকে আমি বাইরে থেকে পাবো? আমার অন্তরের যে প্রতি-চ্ছবিকে আমি সংসারে পেতে চাই, তা যে স্বপ্ন—অলীক মৃগতৃষ্ণিকা! কর্ম্মহীন বেলার মধুর কল্পনাকে হৃদয় দিয়েই উপভোগ করা যায়; তাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে রূঢ় জাগরণ এড়াবো কি করে?

সুবিনয় ভট্টাচার্য্য

প্রাণের কৌতুক

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

সরোবর বুকে মুদিত কমলকলি,
প্রদোষ স্বপনে ছিলে যবে নিমীলিত,
উতলা পবন গিয়াছে তাহারে ছলি
স্বপন-আবেশ বৃথা করি ব্যাকুলিত।
গাহিল আঁধারে, হে মোর গোপন-প্রিয়,
কোন্ পথে পথে লুটাও কাতর আঁখি,
কোন গগনেতে উড়াও উত্তরীয়,
ফুটিতে ফুটিতে ফোটা যে রহিল বাকি!
আজিকে আমার উদাসীন আঁখি পরে
তরুণ আলোর কৌতুক এল ছুটি,
দূর গগনের দুরন্ত সুখ তরে
চঞ্চল পাখী চমকায় ডানা দুটি।
প্রাণের পথিক আজ ফিরে এল ঘরে
গোপন ব্যথার ঘন আবরণ টুটি।

———

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বিদেশে ভারতের নিন্দা

যে যতই অন্যায় কাজ করুক, তাহার কাজের পশ্চাতে যে নীতির সমর্থন আছে, একথা নিজের বিবেককে শান্ত রাখিবার জন্য তাহাকে বিশ্বাস করিতে হয় এবং সুনাম রক্ষার জন্য অপরকে বিশ্বাস করাইতে হয়। আমাদের অশেষবিধ বঞ্চনার পরিবর্ত্তে যাহারা অশেষবিধ সুখসুবিধার অধিকারী হইয়াছে, নিজেদের এবং পৃথিবীর বিবেক তাহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া কোনোদিন এই সুখ সুবিধা ভোগের ব্যাঘাত না ঘটায়, এজন্য তাহাদের সদাজাগ্রতভাবে সচেষ্ট থাকিতে হয়।

ভারতবাসীরা যে অর্দ্ধনগ্ন অরণ্যবাসী অসভ্য নহে, তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, অন্যান্য দেশের ঐ অবস্থার লোকদের অপেক্ষা অধিকতর আত্মকলহে বা পরস্পরের নিন্দাবাদে নিযুক্ত নহেন, ইহাদের যে সর্ব্ববাদী সম্মত রাজনীতিক আকাঙ্খা ও দাবী আছে, এদেশের প্রতিভাবান মনীষিরা যে প্রাচ্য-সুলভ রহস্যের (?) ন্যায় দেশের জনসাধারণের সহিত সংযোগহীন দুর্ব্বোধ্য বিস্ময়ের পাত্র নহেন, এদেশের লোকেরাও যে অন্য যে কোনও দেশের লোকের সমকক্ষ হইতে পারেন, এদেশে যে সকল সামাজিক কুপ্রথা, দুর্নীতি ও বৈষম্য আছে, পাশ্চাত্য দেশগুলির ঐ সকল বিষয়সম্বন্ধীয় দোষের চেয়ে যে তাহা অধিকতর ভয়াবহ বা ব্যাপক নহে, এসকল কথা চাপিয়া রাখিবার জন্য ভারত-বাসীদের নামে মিথ্যা অপবাদ, বহুপ্রকার অর্দ্ধসত্য এবং দোষের অতিরঞ্জিত বর্ণনা প্রচারের প্রয়োজন হয়। দুই কারণে এই সকল কথা চাপিয়া রাখিতে হয়।

নিজের দেশে ইংরাজ স্বাধীনতার আবহাওয়া, সকল মানুষের অধিকার সাম্য, এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের মধ্যে মানুষ হইয়াছেন; সমগ্র পৃথিবীতে দুর্ব্বলের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরাজের ত্যাগ ও বীরত্বের কথা তাঁহারা সগৌরবে হৃদয়ে পোষণ করেন। এরূপক্ষেত্রে, ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থার কথা অধিক লোকে জানিতে পারিলে, ইংল্যাণ্ডের জনমত এই অবস্থার প্রতিকারেচ্ছু হইয়া উঠিতে পারে, ভারতের সহিত স্বার্থ-সম্পর্কিত লোকদের এরূপ মনে করা এবং ভারতের যথার্থ স্বরূপ গোপনের চেষ্টা করা অসম্ভব নহে। নিজেদের আত্মাভিমান ও বিবেককে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যও ইচ্ছা করিয়া এরূপ মিথ্যায় বিশ্বাস করিবার এবং ঠকিবার প্রয়োজনও কাহারও হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ দুর্ব্বলকে পীড়ন করা অপেক্ষা সমশ্রেণীর লোকের নিন্দা সহ্য করা কঠিন, তাহাতে জাগতিক ক্ষতি কিছু না হইলেও। বিশ্বের সহিত কারবার করিবার সময়ে অনেক স্থলে নীতি ও আদর্শের কথা আওড়াইতে হয়, অপরকে ইহার দোহাই দিয়া অন্যায় হইতে নিরস্ত করিতে হয় এবং পৃথিবীর বাজারে সম্মান রক্ষা করিতে হয়।

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যাপ্রচারের প্রতিবিধান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভি-জে-প্যাটেল মহোদয়ের লণ্ডনের উক্তি সমর্থন করিতে যাইয়া এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, বিশ্ব-রাষ্ট্র-নীতির সাধারণ প্রতিষ্ঠাভূমির উপর যে বর্ত্তমানে সকল দেশের সকল প্রকার রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত সেকথাটা আমাদের ভুলিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। যত শক্তিশালীই হউক পৃথিবীর কোনও গবর্ণমেণ্টই, বিস্তৃততর মানবজাতির নৈতিক সমর্থন ব্যতীত টিকিতে পারে না। এই জন্য মিথ্যার সাহায্যে বিশ্বের জনমত নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রবিদ্-দিগের রাজনীতিক চালের অন্তর্গত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে এই মিথ্যার অভিযান যে

সুপরিচালিত ও অর্থপুষ্ট সেকথাও কবিবর দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন।

যে সকল কারণে শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট সমূহ বিশ্বের জনমত উপেক্ষা করিতে পারেন না, সেই সকল কারণে কোনও পতিত দেশের লোকের পক্ষে বিশ্বমতের আনুকূল্য অনেক অধিক প্রয়োজনীয়। পতিত দুর্ব্বলের সর্ব্ব-প্রধান শক্তি হইতেছে বিচার, ন্যায় এবং ধর্ম্মের শক্তি। সমগ্র বিশ্বমানবের ধর্ম্মবুদ্ধির সমর্থনে এই শক্তি অনেকগুণে বর্দ্ধিত হইয়া ফলপ্রসূ হইবে। আমাদের উপর যে সকল অন্যায়ের অনুষ্ঠান হইতেছে, অবারিত প্রকাশ্যতা তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিবে। এবিষয়ে অতীত ঔদাসীন্য আমাদের অনেকটা ক্ষতির কারণ হইয়াছে; ভবিষ্যতের জন্য এখন হইতেই সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

কি প্রকারের ব্যবস্থার প্রয়োজন

বিদেশে এ পর্য্যন্ত ভারতের কথা প্রচারের যে সকল চেষ্টা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোনও প্রকারের ধারাবাহিকতা বা উদ্দেশ্যের পারম্পর্য্য নাই। অনেকেই বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য লইয়া বিশেষ কোনও কথা বলিবার জন্য গিয়াছেন এবং হৃদয়াবেগের সহিত ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাপেক্ষা অলঙ্কার বর্জ্জিত সত্যসংবাদের শক্তি অধিক এবং তাহা বিশ্বাসযোগ্য ভাবেও নিয়মিতরূপে প্রচারের ব্যবস্থা অধিকতর ফলদায়ক।

কি প্রকারের মিথ্যা প্রচারিত হয়

কোনও দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকদের চরিত্রকে ছোট করিবার চেষ্টা করা, বা, কোনও দেশের শ্রেষ্ঠ লোকদের মধ্যে শোচনীয় অনৈক্য আছে তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা, সেই দেশকে পৃথিবীর চক্ষে হেয় করিবার একটা অতি হীন উপায়।

রবীন্দ্রনাথ এসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফতে বলিয়াছেন, মহাত্মাগান্ধীর মহৎ নামের উপর চারিদিক হইতে কর্দ্দম নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাঁহার চরিত্রকে হীন প্রতিপন্ন করা হইতেছে এবং সংখ্যাতীত লোকের উপর তাঁহার প্রভাবকে উপেক্ষা করা হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে পরিপূর্ণ অনৈক্য বিদ্যমান আছে তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং এই কাল্পনিক বিরোধ লইয়া যথেষ্ট হৈচৈ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা তাঁহার নিজের চরিত্রকেও অপমান করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মার মধ্যে যে বিশেষ অনৈক্য আছে এবং কবি যে মহাত্মার নিন্দা করেন, এরূপ মিথ্যা কথা প্রচারের আরও একটা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। এটা রবীন্দ্রনাথের প্রতীচ্য ভ্রমণের সময়ের কথা। রবীন্দ্রনাথকে তখন ও দেশের লোক প্রত্যক্ষভাবে জানিতেছিল এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও বিরাটত্বের পরিচয় পাইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ যে-দেশের বড়লোকের নমুনা, সে দেশ যে ছোট নহে, তিনি যে লোকের বা যে আন্দোলনের প্রশংসা করেন, তাহারাও যে তুচ্ছ নহে, একথা লোকের বিশ্বাস করা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই, অনেক অনর্থের মূল এই গান্ধী লোকটা যে রবীন্দ্রনাথের সমস্থানীয় বা তাঁহার প্রশংসাভাজন কেহ নহেন, কোনও কোনও লোকের একথা বলিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময়, আর্জ্জেন্টাইনের একখানা বিখ্যাত পত্রিকায়, বাঙালী বালিকা বিক্রয়ের কলিকাতাস্থ এক দাসবিপণির বিবরণ বাহির হয়। কয়েকদিন পরে পার্শীদের টাওয়ার-অফ-সাইলেন্সের একটি ছবি বাহির হয়, এবং তাহার নীচে লেখা থাকে যে, এই প্রাসাদের উপরে হিন্দুরা, গোঁড়ামির বিরুদ্ধবাদীদের, শকুনি প্রভৃতি পক্ষীর নিকট জীবন্ত সমর্পণ করেন, এবং ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট এই প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বঙ্গে নারী নির্য্যাতন

দুর্ভাগ্যক্রমে, নারী-নির্য্যাতন বাংলাদেশে দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এসম্বন্ধে সুরক্ষিত সহর অঞ্চল

অথবা অরক্ষিত পল্লী অঞ্চলে কোনও পার্থক্য দেখা যাইতেছে না, এবং বাংলার বহু নারী হরণের ইতিহাসের সর্ব্বত্রই একটা ঐক্য লক্ষিত হইতেছে। সাধারণতঃ কোনও নিঃসহায় হিন্দু বিধবা এবং কোনও স্থলে সহায়-সম্পন্না সধবা কয়েকজন দুর্ব্বৃত্তের দ্বারা অপহৃতা হন; কিছুদিন ধরিয়া নানাস্থানে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখা হয় এবং সেই সময় বহুলোকে তাঁহার নিগ্রহ করে। কোনও প্রকারে মুক্তি পাইলেও, অনেকস্থলে দুর্ব্বৃত্তদের কোনও শাস্তিবিধান হয় না, মোকর্দ্দমা চলিবার সময়েও দ্বিতীয়বার অপহৃতা হইবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়, এবং অনেকের কোনও প্রকার খোঁজ পাওয়া যায় না ও উদ্ধারসাধনও হয় না। দেশের সাধারণ লোক যে কতটা নিঃসহায়, দুর্ব্বৃত্তদের করুণার উপর তাহাদের মান-মর্য্যাদা যে কতটা নির্ভর করে, আত্ম-রক্ষার অক্ষমতা তাহাদের যে কতটা শোচনীয়, এই ব্যাপারে তাহা ভালভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

এবিষয়ে রাজসরকারের কর্ত্তব্য

সমাজের আদিম অবস্থায়, মানুষকে ধন-প্রাণ ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নিজের শক্তির উপরই নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু, দেশে সুনিয়ন্ত্রিত রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার সহিত ক্রমেই অধিক পরিমাণে এই ভার রাষ্ট্রের উপর পড়ে। যদি নিজেদের অক্ষমতা, শক্তিহীনতা বা সংখ্যান্যূনতার দরুণ প্রবল বা সংখ্যাবহুল দলের দ্বারা পীড়িত হইতে হয়, গুণ্ডামিকে ভয় করিয়া চলিতে হয়, তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধীনে বাস করিবার সুবিধা আর কোথায় রহিল! কোনও অন্যায়ের প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য লোকে স্বভাবতঃই রাজশক্তির উপর নির্ভর করে। অথচ, এই প্রকার বহু ব্যাপক অন্যায় দমনের কোনও ফলদায়ক ব্যবস্থা রাজসরকার করিতেছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

ফৌজদারি আইনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং প্রমাণের সূক্ষ্মতর অসম্পূর্ণতায় এই ধরণের মোকর্দ্দমা প্রায়ই ফাঁসিয়া যায়। ইহাতে দুর্ব্বৃত্তদের সাহস ও অত্যাচার অনেক বাড়িয়া উঠে এবং আইনের চোখে ধূলা দিতে পারিয়া ইহারা এরূপ নিরঙ্কুশ হইয়া পড়ে যে, উৎপীড়িত প্রতিকারেচ্ছু ব্যক্তির উপর পুনরায় অধিকতর নির্লজ্জ ও নির্ভীকভাবে অত্যাচার চালাইতে থাকে; এমনকি মোকর্দ্দমার সময় সাক্ষ্য প্রভৃতি দিয়া যাহারা ইঁহাদের বিপক্ষতা করে, তাহাদেরও নিষ্কৃতি দেয় না। ইহার ফলে, লোকে সহসা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চায় না, এবং অভিযুক্তদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিবার ভয়ে, কেহ সাক্ষ্যও দিতে চায় না। সামাজিক গ্লানির ভয়েও অনেক সময় লোকে এই প্রকারের অত্যাচার চাপা দিতে চায়। কাজেই, অনেক ঘটনা আদালতের গোচরীভূত হয় না, এবং দেশের জনসাধারণও সে সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে না।

এই প্রকার অপরাধে শাস্তির সম্ভাবনা কম থাকায় আর একটি ফল এই হয় যে, অপেক্ষাকৃত অল্পসাহসী যে সকল দুষ্ট লোক পূর্ব্বে এই সকল কাজে যোগ দিত না, শাস্তির ভয় নাই দেখিয়া, পরে তাহারাও ইহাদের দল পুষ্ট করে।

এই সকল মোকর্দ্দমায় আসামীদের শাস্তি পাইবার পক্ষে আর একটা প্রধান বাধা হইতেছে যে অবস্থাগত প্রমাণ ব্যতীত, এই সকল ব্যাপারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে না। অবস্থাগত প্রমাণের প্রধান অসুবিধা এই দাঁড়ায় যে, সুবিধা বুঝিলেই, অপর পক্ষের সম্মতি ছিল বলিয়া আসামীরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে। সাধারণ আদালতের নিয়মানুসারে আসামীপক্ষ অনেক স্থলে সন্দেহের সুবিধা পায় অথবা লঘুশাস্তি পায়। এই অপরাধ দমনের জন্য অন্তত সাময়িক ভাবেও কোনও বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিবার সময় আসিয়াছে।

আমাদেরও ভাবিবার কথা

রাজসরকারের কথা ব্যতীত, আমাদের নিজেদেরও এ সম্বন্ধে ভাবিবার অনেক কথা রহিয়াছে। কোনও জাতি সভ্যতার কোন্ স্তরে অবস্থান করিতেছে, নারীর প্রতি তাহার মনোভাবের দ্বারা তাহা কতকটা পরিমিত হইতে পারে। নারীকে অসম্মান করিবার মত অসভ্য এবং নারীর প্রতি অত্যাচার করিবার মত পশু প্রকৃতির দুর্ব্বৃত্ত, সব দেশে সব জাতির মধ্যেই আছে। কিন্তু, যদি কোথায়ও নারীর

প্রতি অত্যাচার সাধারণ ঘটনার মধ্যে দাঁড়ায়, তবে সেখানকার লোকের পক্ষে তাহা দুরপনেয় কলঙ্কের কথা হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে নারীনিগ্রহের অতিবিস্তৃতি এবং নারীরক্ষায় আমাদের আংশিক অক্ষমতা ও আংশিক ঔদাসীন্য, বাঙালীর পক্ষে গভীর লজ্জার কথা হইয়া উঠিয়াছে।

হয়ত, আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যবস্থায় নারীর স্থান আশানুরূপ উচ্চ নহে বলিয়া নারীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে আমাদের মন কতকটা অসাড় হইয়া পড়িয়াছে।

কারণ যাহাই হউক, জাতি হিসাবে আমরা এতখানি হীন এবং কাপুরুষ হইয়া গিয়াছি, কোনও রকমে বাঁচিয়া থাকা এতই পরম শ্রেয় বলিয়া জ্ঞান করিতেছি যে, এত অনাচারের সংবাদের মধ্যে কোথায়ও এমন কথা শুনি না যেখানে মানুষের মত, পুরুষের মত, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, কেহ অত্যাচারীদের বাধা দিয়াছে। সংবাদপত্রে আমরা এই সকল সংবাদ পাঠ করি এবং তাহার পর বড় জোর ইহা আমাদের মজলিসি আলোচনার খোরাক হইয়া থাকে। এই লাঞ্ছনার গ্লানি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিবার এবং তাহার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হইবার মত মানসিক স্বাস্থ্য আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

আরও কয়েকটি কথা এ সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার আছে। এই শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তদের সাহায্য করিবার, পরামর্শ দিবার, পক্ষ-সমর্থন করিবার এবং জামীন হইবার লোকের কোথায়ও অভাব হয় না। তাহার পর, বহু স্থানেই অপহৃতা নারীদের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, একবাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে লুকাইয়া রাখা হয়, কাজেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহার সহিত বহুলোক জড়িত হইয়া পড়েন। যাঁহারা এই প্রকারে দুর্ব্বৃত্তদের প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের মনে রাখা দরকার, পাপ কখনও আত্মপর ভেদ করে না ; আজ সমাজ-শরীরে যে বিষ প্রবেশ করিতেছে, একদিন তাহা সমগ্র সমাজদেহ কলুষিত করিবে।

জাপানের হুমকি

বর্ত্তমানে জাতিতে জাতিতে মৈত্রী, রাজনীতিক স্বার্থ এবং বাণিজ্যিক সুবিধার উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক বিচার, বিশ্বমানবতা প্রভৃতি বড় বড় নীতির কথা, বিভিন্ন জাতি প্রাচীনকাল হইতেই আওড়াইয়া আসিতেছে এবং এই সকল কথায় নিজেদের স্বার্থমূলক কার্য্যের সমর্থন করিয়া আসিতেছে। চীনের সহিত জাপানের বিবাদ এবং জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকারের মূলেও, চীনে জাপানী-পণ্য বর্জ্জনের আন্দোলন রহিয়াছে। ভারতবর্ষে জাপানের বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাপান যে, এখানেও মাঞ্চুরিয়ার নীতি অবলম্বন করিতে পারে এবং ভারতবর্ষকে জাপানী নৌবহরের কবলে পড়িতে হইতে পারে, চীনের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র সচিব ইউগেনচেনের এই সাবধান-বাণী বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য।

ভারতীয় আইন পরিষদে গৃহীত আমদানী-প্রতিরোধক আইনের ফলে এবং ভারত ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য-সন্ধির অবসান ঘটায় জাপানী বণিক-সমিতি সমূহের মধ্যে যে অসন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় ভয় প্রদর্শনের যে সুর আছে, তাহা এই কথার পরিপোষক।

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার প্রগতি ও অর্থনৈতিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে তাহার শ্রমশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর। বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে শিশু-শিল্পগুলিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কোনও দেশের পক্ষেই অন্যায় বা অযৌক্তিক নহে।

জাপানের অবশ্য ক্রুদ্ধ হইবার কারণ আছে। জাপানের কার্পাসজাত রপ্তানি দ্রব্যের শতকরা ৩০ ভাগ ভারতে আসে, এবং ভারতের বাজার হাতছাড়া হইয়া গেলে জাপানের কাপড়ের কলের শতকরা ২০ ভাগ অচল হইয়া যাইবে ও লক্ষ লক্ষ জাপানীর জীবিকার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইবে।

আমাদেরও অবশ্য কিছু ভাবিবার কথা আছে। বিলাতী কারখানার মালিকেরা যাহাতে এই সুবিধা গ্রহণ করিতে না পারে, অথবা ভারতের দুই একজন কলওয়ালা যাহাতে এই সুযোগে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অযথা বাড়াইয়া দরিদ্র ক্রেতাদের শোষণ করিতে না পারে, সে বিষয়েও আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। দেশময় ছোট ছোট শ্রম-শিল্পের কারখানা গড়িয়া তুলিয়া এই প্রকার অনিষ্টের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

বঙ্গে কর্পোরেশন ও হিন্দী শিক্ষা

মিউনিসিপ্যাল স্কুলগুলিতে হিন্দীকে অবশ্য পাঠ্য করিবার জন্য বঙ্গে কর্পোরেশনে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়; প্রস্তাবটি অবশ্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। সারা ভারতবর্ষে হিন্দীকে চালাইবার একটা প্রবল চেষ্টা চলিয়াছে। হিন্দীভাষীদের পক্ষে এই প্রকার করা অন্যায় বা অস্বাভাবিক নহে বরং ইহা তাঁহাদের প্রশংসনীয় উদ্যম এবং অনুকরণীয় অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। কিন্তু শুধুমাত্র হিন্দীভাষী প্রদেশগুলি ব্যতীত অন্য কোথায়ও ইহা অবশ্য পাঠ্য করিবার চেষ্টা, অপরাপর ভাষা এবং অহিন্দী ভাষী বালকদের উপর সুবিচারের নিদর্শন নহে। মহাত্মা গান্ধী এবং ফলে কংগ্রেস হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্র ও সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালীরা সজাগ ও সচেষ্ট থাকিলে, বাংলাভাষা এই সম্মানের অধিকারী হইতে পারিত অন্ততঃ তাহার দাবী বিকল্পে হইবার সম্ভাবনা যে ছিল, তাহাতে সংশয় নাই।

হিন্দী যদি বাস্তবিক কোনও দিন ভারতের সাধারণ ভাষা বা রাষ্ট্র ভাষায় পরিণত হয়, তাহা হইলেও প্রদেশগুলি স্বশাসক হওয়ায় এবং এখানে প্রাদেশিক ভাষা চলিবার ঔচিত্য ও আবশ্যকতা থাকায়, হিন্দীশিক্ষার উপযোগিতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। তাহাও, কাহাদের কোন্ বয়সে, কতটুকু বাধ্য হইয়া শিখিতে হইবে তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে। যেটুকু শেখা অপরিহার্য্য, তাহার বেশী লোকে কোনও ভাষা শিখিতে চাহিবে কিনা, তাহা, সেই ভাষার উৎকর্ষ ও সাহিত্যিক সমৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

তদ্ভিন্ন যে কোনও অবস্থায় ইউরোপের সহিত সংযোগ রক্ষা করা যখন অত্যাবশ্যক হইবে, তখন সাধারণ ভাষা হিসাবে ইংরাজীকেই স্বস্থানে রাখা অধিকতর সুবিবেচনার কাজ হইবে কিনা, তাহাও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

নোয়াখালিতে কৃষক আন্দোলন

নোয়াখালিতে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কিত এবং জমিদার ও মহাজন প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগের উপর অনুষ্ঠিত নানা-প্রকার অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি ইহার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ হইয়াছে, তাহার সহিত সরকারি কোনও কোনও লোকের সংস্রব আছে মনে করিয়া সকলে তাহার প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। বাংলা কাউন্সিলে এসম্বন্ধে প্রেণ্টিসের উক্তি হইতেও, এ ব্যাপার যে কিছু পরিমাণে এবং কতক স্থানে সত্য এরূপ আভাষ পাওয়া যায়।

কৃষকদের যে নানাপ্রকারের দুঃখ আছে, জমিদার ও মহাজনেরা অনেক সময় যে তাহাদের পরে অত্যাচার করিয়া থাকে, এবং সঙ্ঘবদ্ধতা ব্যতীত ইহার প্রতিকারেরও যে কোনও উপায় নাই, সে কথা সত্য। কিন্তু কৃষকদিগের দুঃখ দূর করিবার কোনও চেষ্টা যাহাতে সংযমের সীমা অতিক্রম না করে, সমগ্র দেশের এবং কৃষকদের নিজেদেরও মঙ্গলের জন্য সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

জমিদার এবং মহাজনেরাও দেশের লোক, বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন; দেশের পূর্ব্বতন এবং বর্ত্তমান রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা এইরূপ ক্ষেত্রে এবং অবস্থায় তাঁহাদিগকে আনিয়া ফেলিয়াছে; কৃষকদের দুঃখ করিবার জন্য এবং বর্ত্তমান বৈষম্যের অবসান ঘটাইবার জন্য, সুবিধা ভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও চেষ্টা করিতেছেন, প্রভৃতি কথা এ সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে। গায়ের জোরের প্রতিষ্ঠা হওয়া অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদক কোনও উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। এই সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ ও শঙ্কার কথা এই যে বিরোধটা নাকি সাম্প্রদায়িক আকার গ্রহণ করিতেছে।

মহাত্মা গান্ধীর পুনরায় উপবাস

মহাত্মা গান্ধী ৮ই মে হইতে ২৯শে মে পর্য্যন্ত, এই ২১ দিন উপবাস করিবেন জানিয়া সমগ্র দেশবাসী বিশেষ বিচলিত হইয়াছেন। পৃথিবীর বর্ত্তমান প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবই অধিকতম সংখ্যক লোকের উপর কাজ করিতেছে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ এমন কেহ নাই, যিনি মহাত্মার নাম শুনেন নাই এবং জ্ঞান প্রসূত বুদ্ধি দিয়াই হউক অথবা তাঁহার অলৌকিকত্বের উপর

অজ্ঞতা-জাত বিশ্বাসের জন্যই হউক, তাঁহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করেন না।

তিনি শুধুমাত্র প্রখর-মনীষা-সম্পন্ন রাজনীতিক নেতা, উদার মতাবলম্বী সমাজসংস্কারক অথবা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন ধার্ম্মিক লোক নহেন। তাঁহার প্রভাবের মূলে এইরূপ কোনও কারণ মাত্র থাকিলে, তাহা কখনও এত সার্ব্বজনীন হইতে পারিত না।

তিনি সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ এবং সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জিত হইয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ চাহিয়াছেন। নিজের জাতির জন্য যাহা চাহিয়াছেন, তাহাও বিশ্বমানবের বৃহত্তর কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিবে বলিয়াই চাহিয়াছেন; তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা করিবার জন্য বিপদ, লাঞ্ছনা এবং মৃত্যু-ভয়কেও বার বার লঙ্ঘন করিয়াছেন, এজন্য নিজের সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থ এবং প্রতিপত্তি ত্যাগ করিয়াছেন, লোকে কি মনে করিবে, সেকথা কখনও ভাবেন নাই; কখনও আত্ম-প্রবঞ্চনা করেন নাই বা কথার চালবাজিতে পরকে ঠকাইবার চেষ্টা করেন নাই; কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা হিংসা পোষণ করেন নাই; অনেক বিরোধে লিপ্ত হইয়াও প্রতিপক্ষের প্রতি কখনও তাঁহার শ্রদ্ধার বা প্রীতির হ্রাস ঘটে নাই; বহুমানবের দুঃখকে তিনি নিজের দুঃখ বলিয়া মনে করিয়াছেন; এই সকল নানাকারণে সকল দলের, সকল মতের এবং সর্ব্বধর্ম্মের লোকের চিত্তজয় তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

বহু লোকের উপর তাঁহার এই প্রভাবের জন্য তাঁহার কোনও কার্য্যের ফল যতটা দুরপ্রসারী হইবে, এবং যে সত্যকে লাভ করিবার জন্য তিনি এই আত্ম-নিগ্রহ করিতেছেন, তাহাকে যতটা অগ্রসর করিয়া দিবে, আর কোনও একজন মানুষের কোনও প্রকার কাজের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইত না।

কাজেই, বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সংযত চিত্তে তাঁহার কার্য্যের বিচার করিতে হইবে ও তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিতে হইবে।

মহাত্মাজী বলিয়াছেন, তাঁহার বর্ত্তমান উপবাস আত্ম-শুদ্ধি এবং অধিকতর পবিত্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু, অস্পৃশ্যদের দুঃখই যে তাঁহাকে এই সঙ্কল্পে প্রণোদিত করিয়াছে, সে কথা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে বুঝা যাইবে।

"যে সকল কারণে আমার উপবাসের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাহা অতিশয় পবিত্র এবং উল্লেখের যোগ্য নহে। কিন্তু, তাহার সকলগুলিই হরিজন সম্বন্ধীয় মহৎ উদ্দেশ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট।...স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হরিজন এবং অন্যদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা করিতেছি এবং এ সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি পড়িতেছি; আমি এই পাপকে যত বড় মনে করিয়াছিলাম, ইহা তদপেক্ষা অনেক বড়।...যাঁহারা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে অপরিহার্য্য মনে করেন, তাঁহারাই আমাকে উপবাসের সময় বাঁচাইয়া রাখিবেন...আমি জীবিত থাকি অথবা আমার মৃত্যু হউক, যে উদ্দেশ্যে এই উপবাস গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা সার্থক হউক।"

সনাতনীদের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন: "আমার সনাতনী বন্ধুরা এবং অন্য অনেকে মনে করেন, এই আন্দোলন একটা বড় রকমের রাজনীতিক চাল। ইহা যে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মোদ্ভূত, এই উপবাসের দ্বারা তাঁহাদের সেই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিলে, আমি বিশেষ সুখী হইব।...আমার সনাতনী বন্ধুদের এই প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করি যে, যে সুবর্ণের আচ্ছাদন সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহা অপসারিত হউক।"

এই আন্দোলনের মধ্যে যে, অনেক ফাঁকি চলিতেছে এবং অনেক ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, তাহাই মহাত্মাজীকে বিশেষভাবে পীড়া দিয়াছে।

সুমহৎ দুঃখ ব্যতীত কোনও মহৎ সত্যকে লাভ করা যায় না। জানি না বিধাতার কি অভিপ্রায়। হিন্দু সমাজের বহু দিনের এই পাপকে দূর করিবার জন্য কি মহাত্মার ন্যায় মূল্যবান জীবনের প্রয়োজন হইয়াছে? তাহার চেয়ে অল্প দুঃখ কি আমাদের যথেষ্ট সজাগ করিবার মত আঘাত দিতে পারিবে না?

যাঁহাদের পাপের জন্য এই প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়াছে, তাঁহাদেরও আর একবার ভাবিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে।

জার্ম্মাণির আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা

জার্ম্মাণির শাসন ক্ষমতা নাৎসিদলের হাতে গেলে যে, সেখানে শক্তিশালী গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহার আভাষ পূর্ব্ব হইতেই পাওয়া যাইতেছিল। যুদ্ধের পরবর্ত্তী ফলে, ক্ষতিপূরণের টাকার চাপে, বাহিরের হস্তক্ষেপের জন্য আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায়, বাণিজ্যিক স্বার্থ ও শক্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট হওয়ায় জার্ম্মাণি, পূর্ব্বের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় (আমাদের তুলনায় নহে) বিশেষভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জার্ম্মাণির সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পতন ও তাহার শোচনীয় পরিণামের কথা অনেকেই আশঙ্কা করিতেছিলেন। এমন সময়ে, হেয়ার হিট্‌লারের অধীনে ন্যাশান্যাল সোসালিষ্ট দলের অভ্যুদয়ে, জার্ম্মাণির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু, ইহুদিদিগের উপর নানাপ্রকার অমানুষিক অত্যাচারের সংবাদে সমগ্র সভ্য জগৎ বিশেষভাবে বিচলিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে, এই অত্যাচারের সংবাদ মিথ্যা, অতিরঞ্জিত এবং জার্ম্মাণি হইতে পলাতক স্বার্থবিশিষ্ট লোকদিগের দ্বারা প্রচারিত বলিয়া, একপক্ষ প্রচার করিতেছেন। এমন হইতে পারে, এই অত্যাচারের সংবাদে পৃথিবীর জনমত যেরূপে জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যাইতেছিল, এবং জার্ম্মাণপণ্য বর্জ্জনের সম্ভাবনা দেখা দিতেছিল, তাহার ফলে, জার্ম্মাণির কিছু চৈতন্য হইয়াছে।

যাহা হউক, জার্ম্মাণিতে ইহুদি বর্জ্জন আন্দোলন যে বিশেষ শক্তিশালী তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সম্পর্কে কিছু কিছু অনাচারও যে ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। জার্ম্মাণ সরকারের সহিত এই সকল ব্যাপারের যাহাতে সংস্রব না থাকে, কোনও শক্তিহীন সংখ্যাল্প সম্প্রদায় যাহাতে কোনও প্রকারে নির্য্যাতিত না হন, কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে যাহাতে রাজসরকারে তাঁহাদের কোনও অসুবিধা বা সুযোগের অভাব না হয়, সেরূপ ব্যবস্থা দেরীতে হইলেও, সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

সাম্প্রদায়িক মীমাংসা ও বাঙ্গালী হিন্দু

সাম্প্রদায়িক মীমাংসায় বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রতি যে বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের মতামতের কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ তুলনামূলক হিসাবসহ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"মোট ২৫০ সদস্যপদের মধ্যে, ২টি ভারতীয় খ্রীষ্টানদের জন্য, ৪টি য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য, ১১টি ইউরোপীয়দের জন্য, ১৯টি বণিক, কারখানা, খনি ও বাগানের মালিকদের জন্য (ইহার মধ্যেও ১৪টি ইউরোপীয়দের জন্য) ৫টি জমিদারদের জন্য, ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, এবং ৮টি শ্রমিকদের জন্য রক্ষিত হইয়াছে। এই ৫১টি সদস্য পদের মধ্যে ৩১টি পদে হিন্দু বা মুসলমানের অধিকার নাই; এবং ইউরোপীয়দিগকে ২৫০টির মধ্যে ১১ + ১৪, অর্থাৎ ২৫টি পদ দেওয়া হইয়াছে।

খ্রীষ্টানেরা মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ০·৩৬ জন; জনসংখ্যার অনুপাতে তাহারা মাত্র ১টি পদের অধিকারী; ইহাদের জন্য ৩১টি পদের ব্যবস্থা থাকায়, হিন্দু এবং মুসলমানদের পক্ষে তাঁহাদের জনসংখ্যার উপযোগী সদস্যপদ প্রাপ্তি অসম্ভব হওয়াছে। খুব সহজেই বুঝা যাইতেছে, খ্রীষ্টানদিগকে যে ৩০টি অতিরিক্ত সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিকে হিন্দু এবং মুসলমানদের প্রাপ্যপদ হইতে লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

৩৪টি অসাম্প্রদায়িক পদের মধ্যে (১৯টি বণিক প্রভৃতি, ৮টি শ্রমিক, ৫টি জমিদার, এবং ২টি বিশ্ববিদ্যালয়) পূর্ব্বোক্তরূপে ১৪টি ইউরোপীয়দের জন্য রক্ষিত রাখিয়া, অন্যদের জন্য ২০টি রাখা হইয়াছে।

ইউরোপীয়ানেরা য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানেরা অথবা ভারতীয় খ্রীষ্টানেরা, ইহার একটিও অধিকার করিতে পারিবেন না ধরিয়া লইলে, নিম্নলিখিতরূপে এগুলি বণ্টিত হইতে পারিবে:—

	হিন্দু	মুসলমান
জমিদার ৫টির মধ্যে	৪টি	১টি
বিশ্ববিদ্যালয় ২টির ,,	২টি	
শ্রমিকদের ৮টির ,,	২টি	৬টি
বণিক প্রভৃতির ৫টির ,,	৩টি	২টি
	১১	৯

[হিন্দু বলিতে সব সময়েই হিন্দু ও অনুন্নতদের বুঝান হইতেছে।] কাজে কাজেই, মুসলমানেরা পাইবেন ১১৯+৯ অর্থাৎ ১২৮টি সদস্যপদ এবং হিন্দুরা পাইবেন ৮০+১১ অর্থাৎ ৯১টি পদ।

যদি এই মোট ২১৯টি পদকে (মোট ২৫০র মধ্যের, ইউরোপীয় ও খ্রীষ্টানদের ৩১টি বাদে) জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিতরূপ ফল দাড়ায়।

মোট জনসংখ্যার অনুপাতে :—

১২১, মুসলমান : ৯৮ হিন্দু।

পূর্ণবয়স্ক জন সংখ্যার অনুপাতে :—

১১৩ মুসলমান : ১০৬ হিন্দু।

এই অনুসারে, সমগ্র জন সংখ্যা ধরিলে মুসলমানেরা হিন্দুদের অপেক্ষা ২৩টি এবং পূর্ণ বয়স্কদের ধরিলে মাত্র ৭ পদ অধিক পাইতে পারেন।

তাঁহারা ৩৯টি পদ অধিক পাইয়াছেন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন ; তথ্যই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে। ২৫০টি পদের মধ্য হইতে ৫১টি বিশেষ পদ বাহির করিয়া লওয়ায় (ইহার মধ্যের ৩১টি পদ হিন্দু বা মুসলমানেরা স্পর্শ করিতে পারিবেন না) হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য মাত্র ১৯৯ পদ রহিল। কাজেই, ব্যাপারটি এই দিক দিয়া দেখাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত।

এই ১৯৯টি পদ জন সংখ্যার অনুপাতে ভাগ করিলে নিম্নলিখিতরূপ ফল দাঁড়ায়।

সমগ্র জন সংখ্যানুসারে :—

মুসলমানেরা ১১০টি : হিন্দুরা ৮৯টি।

সমগ্র পূর্ণবয়স্কদের সংখ্যানুসারে :—

মুসলমানেরা ১০২টি : হিন্দুরা ৯৭ টি।

প্রথম হিসাব অনুসারে মুসলমানদিগের ২১টি এবং দ্বিতীয় হিসাব অনুসারে মাত্র ৫টি পদ বেশী পাইতে পারেন।

তাঁহারা ৩৯টি পদ অধিক পাইয়াছেন। পুনরায় মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

উপরি উক্ত তথ্য হইতে নিম্নের কথাগুলি উঠিয়া পড়ে :—

(১) জনসংখ্যানুসারে ইউরোপীয়দিগের একটি পদ পাওয়া উচিত।

তাঁহারা ২৫টি পদ পাইয়াছেন ; তাঁহাদের অবস্থা, শিক্ষা এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ প্রভৃতি নিঃসন্দেহ ইহার কারণ।

(২) হিন্দুদের বেলায়, এসকল কথা বিবেচনা করা হয় নাই। হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, মস্তক গণনার নীতি অনুসৃত হইয়াছে ; কিন্তু, এই নীতি অনুসারেও হিন্দুরা তাঁহাদের প্রাপ্য অপেক্ষা অনেক কম পাইয়াছেন।

(৩) হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যদি মস্তক গণনার নীতিই অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানেরা ২১টি অধিক পদ পাইতে পারেন (শিশুদের মস্তকও এই গণনার অন্তর্গত হইলে)। আর পূর্ণবয়স্কদের মস্তক গণনায় ইঁহারা মাত্র ৫টি বা ৭টি পদ অধিক পাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের ৩৯টি অধিক সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছে।

(৪) ইউরোপীয়, য়্যাংলো-ভারতীয় এবং ভারতীয় এবং ভারতীয় খ্রীষ্টানদের পদগুলি ধরিয়া, সকল বিশেষ পদই হিন্দুদের প্রাপ্য অংশ হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। পুনরায় মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

(৫) খ্রীষ্টানদিগকে ৩১টি পদ দেওয়া হইয়াছে, যদিও তাঁহারা ১টি মাত্র পাইতে পারেন। সমগ্র জনসংখ্যার তাঁহারা মাত্র শতকরা ০.৪ জন।

খ্রীষ্টান দিগকে অতিরিক্ত পদ দিতে যাওয়ায় হিন্দুদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য (২৫০র মধ্যে) ১১২ হইতে ২১টি পদ বা শতকরা ১৮.৮ ছাড়িতে হইয়াছে এবং মুসলমানদের, ১৩৭ হইতে ৯টি পদ বা শতকরা ৬.৬ ছাড়িতে হইয়াছে।

আর খ্রীষ্টানদিগের ৩১টি পদ বাদ দিয়া হিসাব করিলে মুসলমানেরা শতকরা ৫৫.১ পাইয়াছেন (ইঁহারা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৫৪.৮), এবং হিন্দুরা সমগ্র জনসংখ্যার ৪৪.৮ হইয়াও শতকরা ৩৭টি পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রাপ্য অংশ অপেক্ষা ৭.৮ কম পাইয়াছেন।

মুসলমানদিগকে একটী পদও পরিত্যাগ করিতে হয় নাই ; খ্রীষ্টানদিগকে যে সকল অতিরিক্ত পদ দিতে হইয়াছে, তাহার সমগ্রটাই হিন্দুদের অংশ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমান প্রভৃতির নিম্নলিখিত তুলনামূলক হিসাব কৌতূহলোদ্দীপক হইবে। ব্যাঙ্ক, চিকিৎসা, আইন প্রভৃতি ব্যবসায়ে লিপ্তদের হিসাব ১৯২১ এর সেন্সাস্ হইতে গৃহীত, কারণ—৩১ এর ঐ সম্বন্ধীয় হিসাব বিশেষ ত্রুটিযুক্ত। এতদ্ব্যতীত সকল অঙ্কই ৩১ এর বিবরণী হইতে গৃহীত হইয়াছে।

তুলনামূলক হিসাব

মোট জন সংখ্যা

মুসলমান	...	৫৪·৮	শতকরা
হিন্দু	...	৪৩·১	,,
খ্রীষ্টান	...	০·৪	,,
অন্যান্য	...	১·৭	,,

পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যা

মুসলমান	...	৫১·৩	শতকরা
হিন্দু	...	৪৬·৬	,,
খ্রীষ্টান	...	০·৪	,,
অন্যান্য	...	১·৭	,,

২০-র নিম্ন বয়স্কদের ভুক্ত হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

অক্ষরজ্ঞান

মুসলমান	...	৩৩·৫	শতকরা
হিন্দু	...	৬৪·২	,,
খ্রীষ্টান	...	১·৫	,,
অন্যান্য	...	·৮	,,

ইংরাজী জানা (স্ত্রী পুরুষ)

মুসলমান	...	২৪	শতকরা
হিন্দু	...	৬৯·৬	,,
খ্রীষ্টান	...	৪·৯	,,
অন্যান্য	...	০·৬	,,

ছাত্র ও বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত

	হিন্দু	মুসলমান	খ্রীষ্টান	অন্যান্য
উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় (বালক ও বালিকা)	৭৯·৬	১৭·৯	১·৮	০·৭
ইন্টার মিডিয়েট কলেজ	৮৩·৬	১৩·৬	২·২	০·৬
ডিগ্রী শ্রেণীর ছাত্র	৮২·৮	১৪·২	১·২	০·৮
পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও রিসার্চ ছাত্র	৮৫·৭	১৩·০	১·২	০·১
মেডিক্যাল স্কুল	৮৬·২	১২·১	০·৮	০·৯
টেক্‌নিক্যাল ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ স্কুল	৬১·৩	১৯·৯	১৫·৭	৩·১
ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভে স্কুল	৮৫·৫	১৩·০	০·৬	০·৯
কমার্সিয়াল স্কুল	৮৬·০	৭·৮	৬·০	০·২
ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি কর্ম্মে লিপ্ত	৮৩·০	১৪·৯	২·১ একত্রে	
চিকিৎসা ব্যবসা	৭৯·৭	১৭·৯	২·৪ একত্রে	
আইন ব্যবসা	৮৭·৬	১১·৬	০·৮ একত্রে	
কৃষি	৩৩·৭	৬২·৭	২·৬ একত্রে	
ভিক্ষুক ও যাযাবর	৪৬·৭	৫২·৭	০·৬ একত্রে	

জেলের কয়েদী

মুসলমান	৫৩·১
হিন্দু	৪২·৭
খ্রীষ্টান	০.৪
অন্যান্য	৩·৮

এই হিসাবটি—৩১ সালের জেল-শাসনের বিবরণী হইতে গৃহীত; আইন-অমান্য-আন্দোলনের জন্য এ বৎসর হিন্দু বন্দীর সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ার বসু

স্মরণ

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

কাঁদনভরা মনকে সেদিন ভুলিয়েছি এই বলে—
পিছন ফিরে চাইব নাক এগিয়ে যাবো চলে।
হঠাৎ কখন খেয়াল হ'ল দেখি-
ভিন্ন পথের সুরু যেথায় দাঁড়িয়ে সেথায় একি!
শক্ত-বুকের বাঁধ ভেঙ্গেছে তপ্ত-আঁখি-জলে!!
তোমায় শুধু স্মরণ করি ভুলে যা'বার ছলে?

শারদ-প্রাতে রৌদ্র-রেখা মেঘের ফাঁকে এসে—
বনান্তরে ডাক দিয়ে যায় দীর্ঘ-মাঠের শেষে:
মালা-গাঁথার শেষ হ'লনা তোমায় ভালোবেসে
গর্ব্ব করি মনে?
ছিন্ন মালা লুকাই আজি ক্ষুণ্ণ-মনের কোনে!
শিউলী ফুলে লাগ্‌লে শিশির শিউরে উঠে মন
ঘনিয়ে আসে তোমার বুঝি বিদায় নেবার ক্ষণ!!

হাস্নুহানার লুটিয়ে সুবাস দখিন-দেশের হাওয়া
মিলন-স্বপন-সুখ-পিয়াসী-মনকে করে ধাওয়া;
সন্ধ্যাছায়ার কোলে
আরব রাতির দৈত্য এসে প্রাসাদ গড়ে' তোলে॥
আমার খোলা বাতায়নে তখন খবর আসে
দখিন হাওয়ার বুক ভেঙ্গেছে বিরহিণীর শ্বাসে!!
মিলন তিথি মলিন হ'ল বিদায় চোখের জলে
তোমায় শুধু স্মরণ করি ভুলে যা'বার ছলে?

তোমায় আমি পেয়েছিলাম শুধু দু'দিন তরে।
ছদ্ম ছিল মরণ-মধু পদ্মফুলের 'পরে॥
পরশ ক্ষুধা মিটলো নাক' লাগলো ঠোঁটে রেণু।
জীবন চেয়ে মরণ দেখে চম্‌কে ফিরে এনু॥
মনের ছবি মুছলো বুঝি উছল-চোখের জলে।
তোমায় শুধু স্মরণ করি ভুলে যা'বার ছলে?

হঠাৎ সেদিন কালবোশেখী মাতাল হল পথে।
ধুলার ঝড়ে চোখ বাঁচিয়ে চল্‌ছি কোন মতে॥
আশে পাশে ছিঁড়লো লতা আম্রমুকুল ঝরে,
বৃন্ত হ'তে ছিন্ন-কুসুম লুটলো ধুলার 'পরে'॥
বৃষ্টি ধারায় মন হারিয়ে ভাসনু চোখের জলে।
তোমায় শুধু স্মরণ করি ভুলে যা'বার ছলে'?

ভাবছি কভু কান দেবো না তোমার পিছু ডাকে।
থম্‌কে থামি চৈতী-হাওয়া যখন পথে হাঁকে!
শুক্‌নো পাতা খসে।
মনের কোনে তোমার মৃদু-পদধ্বনি পশে॥
কাঁদন ভরা মন্‌কে আজি প্রবোধ দিনু বলে
বাহুর বাঁধন ব্যর্থ, তবু রইলে বুকের তলে॥
অন্য মনায় খুঁজবো যখন স্বপন-সুখের সাথী
মনের কোনায় রাখবো তোমার স্বর্ণ-আসন পাতি॥
দৃষ্টি তখন ঝাপসা হবে, চোখ ভরিবে জলে।
তোমায় সদা কর্বো স্মরণ ভুলে যাবার ছলে॥

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

মার্কিণ সমাজ ও সমস্যা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ প্রণীত। শ্রীক্ষিতীন্দ্র কুমার নাগ, পি-এচ্-ডি কর্ত্তৃক ১০।১ ইন্দ্ররায় রোড ভবানীপুর কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম ২৲ দুই টাকা।

লেখক দীর্ঘকাল আমেরিকায় বাস করেছিলেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক বস্তুতন্ত্র সভ্যতার যে-চরম পরিণতি ঘটেছে,—বইখানিতে অনেক তথ্যের সাহায্যে নানা দিক দিয়ে তারই আলোচনা করা হ'য়েছে। আমেরিকার ন্যায় এমন একটি প্রাণবান জাতি,—যে জাতি আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রণী,—বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সাহায্যে শারীরিক জীবনযাত্রাকে উন্নততর ক'রে,—আমরা যাকে প্রগতি বা progress বলি,—তারই রাজপথে যে জাতির জয়-যাত্রা আজ সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছে,—সেই জাতিরও পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন যে কতখানি কলঙ্কিত ও কলুষিত হ'তে পারে,—পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে তারই বর্ণনা করে লেখক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন,—যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সুন্দরতর ও অধিকতর আনন্দময় করবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই বিজ্ঞান দিতে পারে বটে,—কিন্তু সেই উপাদানগুলির যথোচিত ব্যবহারের জন্য যে আদর্শ,—তার সন্ধান বস্তুর মধ্যে মিলবে না,—মিলবে আত্মার মধ্যে। সেই আদর্শের অভাবে লক্ষ্যহারা হ'য়ে মার্কিণ সমাজে আজ যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে,—পাশ্চাত্য-সভ্যতার অনুকরণ করতে গিয়ে আমরাও যেন আমাদের সমাজে সেই সব সমস্যার আমদানি না করি,—এই বিষয়ে লেখক তাঁর স্বদেশবাসিগণকে সাবধান করে দিয়েছেন। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ততটা না হো'ক,—দৈহিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার দান যে-সব ভাবরাজি তা বহুল পরিমাণে গ্রহণ না করে আমাদের উপায় নেই, অথচ এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণ-প্রক্রিয়ায় আমরা যেন লক্ষ্যহারা হ'য়ে না পড়ি সে-বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে এই বইখানির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে বলে আমরা মনে করি। যে উদ্দেশ্যে বইখানি লেখা,—এর বহুল প্রচারে সে উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হ'বে বলে আমাদের বিশ্বাস। লেখকের ভাষা চলন সই, এবং তাঁর পাণ্ডিত্য ও অনুধাবনাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় তিনি বইখানিতে দিয়েছেন আমরা এমন বই-এর বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

কৃষ্ণরাও—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। কলিকাতা। দাম ১।০।

বইখানা হাতে পেয়ে ভেবেছিলাম বুঝি কোন ঐতিহাসিক গল্প পড়ব, কেননা এ পর্যান্ত যত বাঙ্গালী তাঁদের গল্পের নায়ক নায়িকার অনুসন্ধান করেচেন বাঙলার বাইরে—সুদূর রাজপুতানা কিংবা মহারাষ্ট্রে, তাঁদের অধিকাংশই শুধুই যে তাঁদের দেশের বাইরে গিয়েচেন তা নয় তাঁদের কালের বাইরেও গিয়েচেন ইতিহাসের কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে। বর্ত্তমান লেখক কিন্তু সমসাময়িক মহারাষ্ট্র জীবন থেকেই তাঁর গল্পের বিষয়-বস্তু ও চরিত্রগুলি নির্ব্বাচন করেচেন। প্রস্তাবনায় তিনি বলেচেন তাঁর কর্ম্মজীবন যে দেশে কেটেচে সে দেশের সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করার উদ্দেশ্যেই এই বই লেখা, বাঙলা সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করার দুরাশা তাঁর নেই। যে উদ্দেশ্যে বইখানি লেখা সে উদ্দেশ্য তো সফল হয়েচেই অধিকন্তু বাঙলা সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ-দ্বার লেখককে নিঃসঙ্কোচে উন্মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। তাঁর এই গল্পগুলি পড়লে দূরের সঙ্গে নিকটের একটা নিবিড় যোগ সাধন হয়।

পাঠকের ব্যক্তিগত জগৎ একটা বৃহত্তর জগতের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। গল্প লেখার এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর যে কি হতে পারে তা জানি না। লেখকের সারা কর্ম্ম-জীবন কেটেচে প্রবাসে। যেখানে তিনি কাজ করতেন সেখানকার লোকদের সঙ্গে যে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশে গিয়েছিলেন তা এই গল্পগুলি পড়লেই বেশ বোঝা যায়। আপনার অন্তরের অনুভূতি দিয়ে তিনি তাদের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার মধ্যে নিবিড় ভাবে প্রবেশ করেছিলেন বলেই তাঁর কল্পনাকে তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে এমন সজীব ও প্রত্যক্ষ করে তুলতে পেরেচেন। তাই তাঁর গল্প পড়তে পড়তে মনে হয়—এতো গল্প পড়ছি না এ যেন প্রত্যক্ষ দেখচি।

গল্পগুলির চরিত্র চয়ন করা হয়েচে জীবনের উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে নানা স্তর থেকে এবং সর্ব্বত্রই লেখকের অন্তর্দৃষ্টি ও সমবেদনা জীবনের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে গভীরে গভীরে প্রবেশ করেচে। ঘটনার সমাবেশও সব জায়গায় সচরাচর ও সাধারণ নয় তথাপি কোথাও সম্ভবপরতার সীমা ছাড়িয়ে যায় নি। ভাষা ও বর্ণনার ভঙ্গি চমৎকার। 'শাঁখ' গল্পটি পড়লে হৃদয় একটা অভিনব ও অপরূপ রসে সিক্ত হয়। সমস্ত গল্পগুলিই লেখকের কল্পনার রঙে মানবজীবনের এক একটা সরস ও সজীব চিত্র হয়ে উঠেচে। তাছাড়া সমগ্র ভাবে দেখলে সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের একটা চিত্তগত ঐক্যও হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমরা অনেক সময় উত্তর ভারত পশ্চিম ভারত ইত্যাদি প্রদেশের চালচলন রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কল্পনা করে থাকি। এই বইখানি পড়লে সে সব ধারণা দূর হয়ে যায়। বোঝা যায় যে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেরই মানসিক বৃত্তি ও চরিত্রের মধ্যে বাইরের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও একটা নিবিড় ঐক্য রয়েচে। তথাপি প্রভেদ যেখানে আছে, যথা সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের নানা আচার ব্যবহারে, তার যদি একটা বিস্তৃত বর্ণনা বইখানিতে থাকতো তবে এই ঐক্যের উপলব্ধি আরো সমৃদ্ধতর হতো সন্দেহ নেই। আমরা আশা করি লেখক তাঁর পরবর্ত্তী রচনাগুলিতে এইদিকে তাঁর অভিজ্ঞতার ফল আমাদের দান করবেন।

শ্রীমতী স্নিগ্ধপ্রভা মিত্র

বালুচর :—জসীম উদ্‌দীন। ডি, এম, লাইব্রেরী—৬১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা। পৃঃ ৫৪।

কবিতার বই। মোট পনেরটা কবিতা আছে। এই কবির পরিচয় নূতন করিয়া দিবার দরকার নাই। বালির চরে বাঁশী হারাইয়া ফেলিয়া তিনি আর ঘরে ফিরিতে পারেন নাই।

বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে,
কেমনে পশিব গোধন লইয়া
গাঁয়ের ঘরে।

আমরা বলি, এ ভালই হইয়াছে যে ঘরে ফেরা তোমার হয় নাই। ঘরের গান গাহিবার অনেক লোক আছে। তোমার বালুচরের গুঞ্জন শুনিয়া ঘরের লোক আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ি।

ফোটা সরিষার পাপড়ির ভরে
চোরো মাঠখানি কাঁপে থরে থরে,
সাঁজের শিশির দুটি পাও ধরে
কাঁদিয়া ঝরে—
বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে।

ঘরে মন পড়িয়া থাকিলে প্রকৃতিকে এমন জীবন্ত রূপে দেখা যাইত না।

নিঃসীম চরের উপর দিয়া হু-হু করিয়া হাওয়া বহিয়া যায়, আবর্ত্ত রচিয়া বালুকা শূন্যে উড়ে, নদীজল ছল ছল করিয়া

নাচিতে থাকে, মনে হয় স্বপ্নালস বালুচর এবারে পাখা তুলিয়া উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে—

উড়ানীর চর উড়ে যেতে চায়
হাওয়ার টানে
চারিধারে জল করে ছলছল
কি মায়া জানে।

আবার রাত্রিবেলা নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে চাষীর বাঁশী কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতে থাকে, আর উড়ানীর চর "ব্যথায় ঘুমায় বাঁশীর সুরে।"

চরের ধারে ধারে চাষীদের ঘর। সেদিকেও কবির দৃষ্টি আছে—

জাঙ্‌লা ভরিয়া লাউ এর লতায়
লক্ষ্মী সে যেন দুলিছে দোলায়;
ফাগুনের হাওয়া কলার পাতায়
নাচিছে ঘুরি;
'উড়ানী চরে'র বুকের আঁচল
কৃষাণ-পুরী।

এই চরের উপর এক তরুণ-তরুণীর ভালবাসার খেলা জমিয়া উঠিয়াছে। বালুচর কাব্যখানা সেই অপরূপ প্রেমের কাব্য।

কবির কাছে হয়ত সুন্দরী কখনো ধরা দেয়—বলিয়া যায় 'কাল আবার আসিব'—হয়ত আবার আসে, কিম্বা আসে না—সেই মিলন সুখে, সেই বিরহ ব্যথায়, উল্লাসে, আবেশে, অভিমানে, প্রিয়ার হাসিটুকুতে প্রিয়ার ললিত গতি-ছন্দে কাব্যখানি ভরিয়া আছে। মাঝে মাঝে সুর কাটিয়া মনকে পীড়িত করিয়াছে সত্য কিন্তু শেষ কবিতায় যখন শুনিলাম—

আর একদিন আসিও বন্ধু—আসিও এ বালুচরে;
বাহুতে বাঁধিয়া বিজলীর লতা, রাঙা মুখে চাঁদ ভ'রে।
তটিনী বাজাবে পদ কিঙ্কিণী, পাখিরা দোলাবে ছায়া;
সাদা মেঘ তব সোনার অঙ্গে মাখাবে মোমের মায়া।

এই পথ দিয়ে আসিও সজনী,—প্রভাতে ও সন্ধ্যায়,
দিগন্ত-জোড়া ধানের ক্ষেতের গন্ধ মাখিয়া গায়।
—চরের বাতাস, বাতাস করিয়া শীতল করিছে যারে;
সেই পথে তুমি চরণ ফেলিয়া আসিও এ নদীপারে।

সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সেই সুন্দরীর লীলাচঞ্চল গমন-পথের দিকে চাহিয়া উন্মনা রহিলাম।

শ্রীমনোজ বসু

নানা কথা

মহাত্মা গান্ধীর অনশন ব্রত

মহাত্মা গান্ধী একুশদিনব্যাপী অনশন ব্রত গ্রহণ করেছেন। গত ৮ই মের দিবা দ্বিপ্রহর থেকে এ ব্রত আরম্ভ হয়েচে, ২৯শে মের দ্বিপ্রহরে এর শেষ। কোনো ব্যক্তি কিম্বা সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা বা অন্যায় আচরণের জন্য অভিমান-প্রসূত এ অনশন-সঙ্কল্প নয়, এ অনশন সঙ্কল্পে কোনো সর্ত্ত নেই, সুতরাং একুশদিন পূর্ণ হবার পূর্ব্বে কোনো অবস্থাতেই এর প্রত্যাহার নেই। এ সঙ্কল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মনিগ্রহের দ্বারা আত্মশুদ্ধি। তাঁর পূর্ব্বকৃত আত্মনিগ্রহ সম্পূর্ণ হ'তে পারে নি ব'লে দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা পাপ বিদূরিত হয় নি—এ কথা তিনি তাঁর অন্তরের গভীরতম প্রদেশে শুধু উপলব্ধিই করেন নি—এ বিষয়ে ঐশ প্রত্যাদেশও লাভ করেছেন। হরিজন সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত রাজ ভোজকে তিনি লিখেছেন,—"The sacrifice that began in September last is not complete. It will be complete only when untouchability is abolished—when no one is deemed touchable or untouchable, high or low by birth. * * * Through the grace of God

I shall eradicate that poison by hard labour and great sacrifice." গত ৩০শে এপ্রিল অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধিকে তিনি বলেছেন,— "A tempest has been raging within me for some days. I have been struggling against it. On the eve of Harijan Day the voice became insistent and said, 'Why do'nt you do it?' I resisted it. But the resistance was in vain. And a resolution was made to take an unconditional and irrevocable fast for twenty-one days."

মহাত্মাজীর এবারকার অনশনব্রত সঙ্কল্পের এই ইতিহাস—এই ইতিবৃত্ত। জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ বলছেন, আমার মধ্যে মালিন্যের যে অন্ধকার বর্ত্তমান তারই জন্যে দেশ নির্ম্মল হ'তে পারছে না, কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা আমি দেশ থেকে অস্পৃশ্যতার পাপ দূর করব!

কিন্তু যে অচলায়তনের মধ্যে এই পাপের বাসা সেই বিপুল জনসমষ্টি একেবারে অচেতন জড়পদার্থ! সংস্কারের অতলপ্রসারী শিকড়ে তার গতি নিরুদ্ধ. মনের মধ্যে তার হাজারো রকমের সংশয়, আত্মপ্রত্যয়ের কোনো বালাই-ই তার নেই, বর্ত্তমানের ডাক তারে কানে প্রবেশ করে না, তার দৃষ্টি সুদূর অতীতের মোহময় ছবিতে নিবদ্ধ। কথায় কথায় সে বলে, যা হয়ে গেছে তা ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না!

শুধু তাই নয়, সে তার অতিবুদ্ধির মূঢ়তায় মহাত্মাজীর মতো যুগপুরুষের কার্য্য এবং কার্য্যপ্রণালীকে পদে পদে বিশ্লেষণ করে, বিচার করে এবং সময়ে সময়ে উপহাসও করে। এমন কথাও সময়ে সময়ে বলে যে, দেশের মঙ্গল-কামনায় অথবা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে এই যে একুশদিন-ব্যাপী অনশনে যাপন, এর যে শুধু উপকারিতাই কিছু নেই তা নয়, এ একদম বাতুলতা! যারা ভদ্র যারা সহৃদয় তারাও এই অনশনের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয়িত, তাদেরও মনে এ ব্যাপার রহস্যের অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন। অথচ এই অনশন ব্রত গ্রহণ ক'রে যিনি মৃত্যুর একান্ত-সম্ভব সম্ভাবনাকে বরণ করেছেন তাঁর ইচ্ছার প্রতি আস্থার অন্ত নেই,—তিনি বলেন—

"My life has been made up of numerous occasions of fasting. It is the sincerest form of prayer. It has been with me for several years though it has come much into lime-light recently. It is not a thing altogether ill thought out. It does not mean coercion to anybody. It does, of course, exercise pressure on individuals as on Government; but it is nothing more than the moral result of an act of sacrifice. It stirs up sluggish consciences and it fires loving hearts to action. Those who have to bring about radical changes in human condition and surroundings cannot do it except by raising ferment in the society."

ইহাই মহাত্মাজীর অনশন-তত্ত্ব। সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার অনুরোধে গান্ধীজী এ কথা নিশ্চয় মনে মনে স্বীকার করেন যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, মহামানবসমাজের বর্ত্তমান সঙ্কট-কালে, তাঁর চেয়ে মূল্যবান জীবন ভারতবর্ষে আর নেই। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর সেই মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করতে উদ্যত হয়েছেন এই দীর্ঘকালব্যাপী অনশনের ভয়াবহ সম্ভাবনার মধ্যে। একুশ দিন শেষ হবার এখনো বহু বিলম্ব—কে জানে দেশের ভাগ্যে তখন কি আছে!

দেশের কল্যাণে আমাদের প্রার্থনার বস্তু অনেক আছে। কিন্তু সে সব পরে হবে। ভারতের ভাগ্য-বিধাতার অস্তিত্ব যদি এখনো লোপ না পেয়ে থাকে ত আপাতত ২৯শে মে পর্য্যন্ত তাঁর কাছে আমাদের এই একমাত্র প্রার্থনা যে, মহাত্মাজী যেন নিরাপদে সুস্থদেহে তাঁর অনশনব্রত উদ্‌যাপন করতে পারেন। এ ছাড়া উপস্থিত আমাদের আর অন্য কোনো প্রার্থনা নেই।

পরলোকগত সৈয়দ হাসান ইমাম

গত ৬ই বৈশাখ স্বনামধন্য সৈয়দ হাসান ইমাম পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হ'য়েছিল মাত্র বাষট্টি। মাত্র ছয় মাস আগে আমরা তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সার

আলি ইমামকে হারিয়েছিলাম। এই ছয় মাসের মধ্যেই আবার সৈয়দ হাসান ইমামের মৃত্যু দেশবাসীর প্রাণে বজ্রাঘাতের মতই লেগেছে।

হাসান ইমামের নিকট আমাদের দেশ এত বিষয়ে এত ঋণী,—যে তাঁর মৃত্যুতে যে কতখানি ক্ষতি হ'য়েছে তার পরিমাপ করা যায় না। বিশেষতঃ এই সময়ে যখন দেখা যাচ্চে হিন্দুমুসলমানের মিলন বিনা দেশের স্বাধীনতা লাভের অন্য কোনো পথ নেই,—ঠিক তখনি মহাপ্রাণ হাসান ইমামকে হারানো যে দেশের পক্ষে কতখানি দুর্ভাগ্য তা বলা যায় না। হাসান্ ইমামের মধ্যে সঙ্কীর্ণতার কোনো স্থান ছিল না। কি ধর্ম্মজীবনে, কি সামাজিক জীবনে, কি রাষ্ট্রীয় জীবনে, সর্ব্বত্রই তাঁর দৃষ্টি ছিল যেমনই তীক্ষ্ণ, তেমনি প্রশান্ত। জীবনের সমস্ত সমস্যাই তিনি দেখ্‌তেন সত্যের উচ্চতম স্তর থেকে তীক্ষ্ণ মেধার আলোক-সম্পাতে। তাই মুসলমান যেমন তাঁকে নেতা বলে দাবি করত, তেমনি করত হিন্দু।

হাসান ইমামের মত নির্ভীক, উদারচেতা, পরোপকারী তীক্ষ্ণধী মানুষ পৃথিবীতে কমই জন্মগ্রহণ করেছে। আমরা তাঁর পরোলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি,—এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের এবং দেশবাসীর গভীর সমবেদনা নিবেদন করি।

কৃতী বাঙ্গালী ছাত্র

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার লাহিড়ীর কৃতিত্বের কথা শুনে আমরা বিশেষ আনন্দিত হ'য়েছি। তিনি বিহারের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি-সি-ই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ বৃত্তি প্রাপ্ত হ'য়ে শিক্ষার্থ বিলাত গমন করেন। সেখানে তিনটি এঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা নিয়ে অনেকগুলি মৌলিক গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লিখে যশস্বী হ'য়ে দেশে ফিরেছেন। ডাগেন্‌হামের ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্‌সিলের এঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত টি-পি ফ্রান্সিসের নিকট তিনি অনেকদিন কাজ করেছিলেন.—তিনি যে প্রশস্তি-পত্র দিয়েছেন, তার থেকে এইখানে কিয়দংশ আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করে দিলাম।

"Mr. Lahiri is a person of outstanding ability and promise, inasmuch as he has shown that rare combination of sound theoretical equipment associated with a keen perception of practical work. I have never encountered yet in my now wide training experience an Indian Student who has shown quite the same breadth of ability combined with attractive personality as he—* * * I predict for him a brilliant future as an engineer."

শিশিরকুমার পুরীর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র। এ সংখ্যায় স্থানাভাবে আমরা তাঁহার ফটো প্রকাশ করতে পারলাম না, আগামী সংখ্যায় করবার ইচ্ছা রইল।

প্রতিবাদ

পাঠক-সাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে শ্রীবুদ্ধদেব বসুর লিখিত একটি চিঠি প্রকাশিত করলাম। চিঠিখানি থেকেই প্রতিবাদের মর্ম্ম এবং প্রসঙ্গ বোঝা যাবে।

ভবানীপুর
১ মে.

প্রীতিভাজনেষু,

শুনলুম, 'বঙ্গশ্রী' নামে যে-এক মাসিকপত্র আছে, তা'তে চৈত্রের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত আমার 'মণিকা' গল্পের সমালোচনাচ্ছলে এমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে গল্পটি মোপাসাঁ থেকে চুরি। মোপাসাঁ পড়েছি ছেলেবেলায়, ঠিক কোন গল্প থেকে চুরি করেছি, ভালো করে' মনে পড়ছে না। যদি কেউ আমাকে তা দয়া করে' জানান, বহুকাল পরে আবার মোপাসাঁ পড়ে' আনন্দলাভ করতে পারি।

এই চিঠিটি আপনাদের সম্পাদকীয় বিভাগে ছাপ্‌লে খুসি হবো। ইতি

বুদ্ধদেব বসু

Edited dy Upendranath Ganguli. Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

বিচ্ছেদ

-রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অঙ্কিত
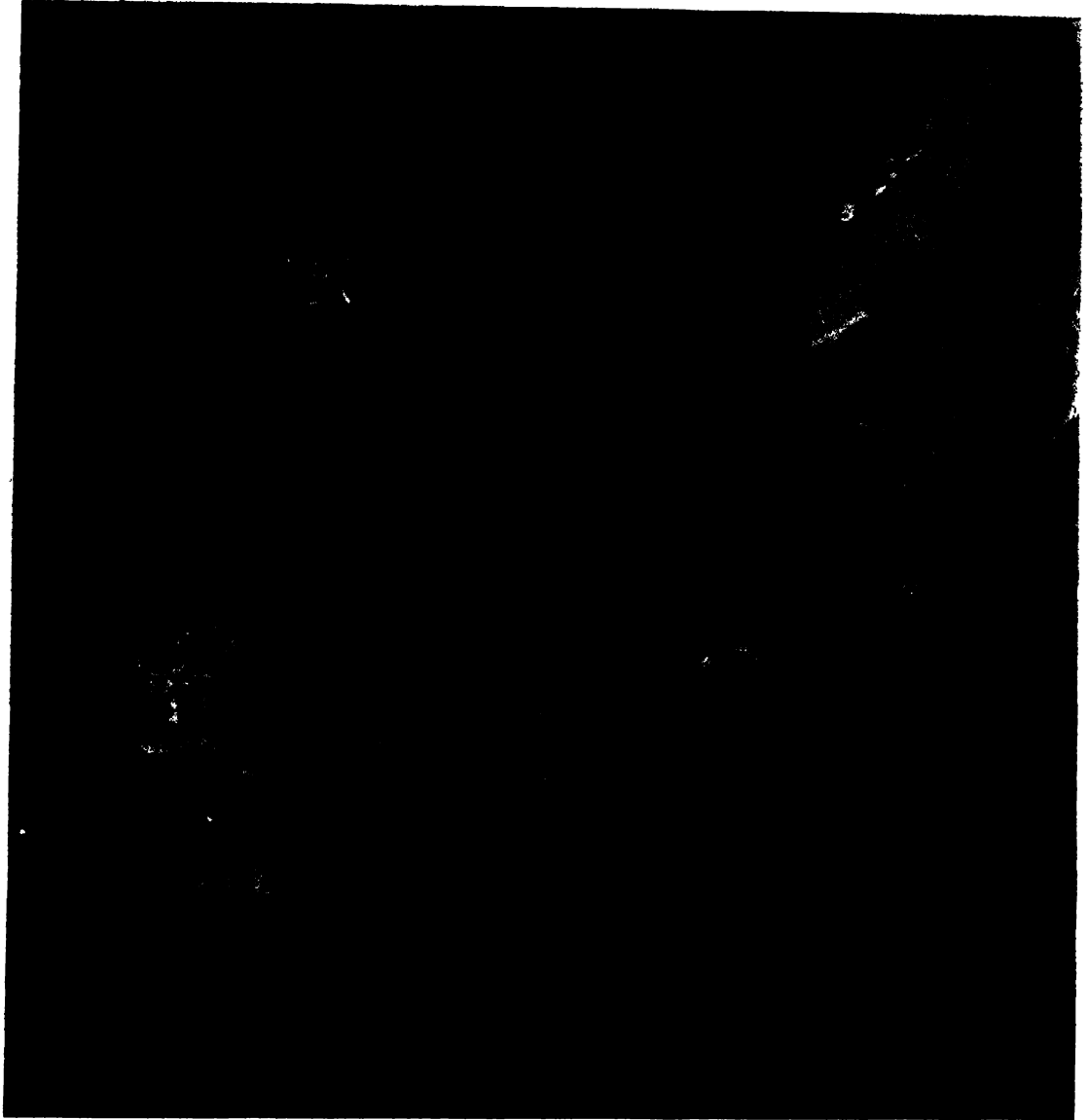
ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৪০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমাদের দুজনের মাঝে আছে কল্পনার বাধা ;
হোলোনা সহজ পথ বাঁধা
স্বপ্নের গহনে।
মনে মনে
ডাক দাও পরস্পরে সঙ্গহীন কত দিনে রাতে ;
তবু ঘটিল না কোন্ সামান্য ব্যাঘাতে
মুখোমুখী দেখা।
দুজনে রহিলে একা
কাছে কাছে থেকে ;
তুচ্ছ, তবু অলঙ্ঘ্য সে দোঁহারে রহিল যাহা ঢেকে।
বিচ্ছেদের অবকাশ হোতে
বায়ুস্রোতে
ভেসে আসে মধুমঞ্জরীর গন্ধশ্বাস :
চৈত্রের আকাশ
রৌদ্রে দেয় বৈরাগীর বিভাসের তান ;

আসে দোয়েলের গান,
দিগন্তরে পথিকের বাঁশি যায় শোনা ;
উভয়ের আনাগোনা
আভাসেতে দেখা যায় ক্ষণে ক্ষণে
চকিত নয়নে।
পদধ্বনি শোনা যায়
শুষ্কপত্র পরিকীর্ণ বন-বীথিকায়।

তোমাদের ভাগ্য আছে চেয়ে অনুক্ষণ
কখন দোঁহার মাঝে একজন
উঠিবে সাহস ক'রে
বলিবে "যে মায়া ডোরে
বন্দী হয়ে দূরে ছিনু এতদিন
ছিন্ন হোক্, সে তো সত্যহীন।
লও বক্ষে দুবাহু বাড়ায়ে,
সম্মুখে যাহারে চাও পিছনেই আছে সে দাঁড়ায়ে" ॥

১৬ জ্যৈষ্ঠ
১৩৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজ্ঞানে অনির্দ্দেশ

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র ডি-এস-সি

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে জড় বিজ্ঞান যে প্রসার লাভ করেছে তার মূলে আছে পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ। বহু পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে বৈজ্ঞানিক পরিদৃশ্যমান জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বের করেন। এই সম্বন্ধ বা সূত্রগুলি আপাতপ্রতীয়মান অসংলগ্ন ঘটনাবলীকে নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করে। বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত যে সূত্র যত বেশী ঘটনাবলীকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধতে পারে সেই সূত্রের মূল্য বৈজ্ঞানিকের কাছে তত বেশী। এক কথায় বলা যেতে পারে যে বৈজ্ঞানিক জড়জগতে **নিয়মের রাজত্ব** প্রতিষ্ঠা করতে চান। বৈজ্ঞানিক মনে করেন তিনি যে সব নিয়ম বের করেছেন সেগুলি অমোঘ, অলঙ্ঘনীয়। সে সব নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। নিয়মের প্রয়োগে বৈজ্ঞানিক দৈবজ্ঞের মত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। প্রত্যেক কার্য্যের একটি কারণ আছে, প্রত্যেক কারণের অপর একটি কারণ আছে। কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। কার্য্যকারণের এই সম্বন্ধের নাম Principle of Causality। একটা উদাহরণ দিলে এই কথার অর্থ সুস্পষ্ট হবে। পৃথিবী সূর্য্যের চারিধারে একটা সুনির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর কারণ কি? কারণ দুটি। প্রথম কারণ, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে টানাটানি চলছে ও দ্বিতীয় কারণ, একটা নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে পৃথিবী সূর্য্য হতে এতটা দূরে একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় অবস্থিত ছিল ও তার একটা নির্দ্দিষ্ট গতির পরিমাণ ছিল। আমি যদি কোনও এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর অবস্থান (position) ও গতির পরিমাণ (momentum) জানতে পারি তা'হলে মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের প্রয়োগে পৃথিবী ভবিষ্যতে কবে কোথায় অবস্থান করবে তা' বলে দিতে পারি। অর্থাৎ পৃথিবীর ভবিষ্যত অবস্থার কারণ আজ তার বর্ত্তমান অবস্থা; আবার, তার আজকের অবস্থার কারণ তার অতীতের অবস্থা। বর্ত্তমান ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত ছিল, ও ভবিষ্যত বর্ত্তমানের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান। পৃথিবীর চিরকালের গতি এইভাবে নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। পৃথিবীর এমন কোনও ইচ্ছাশক্তি নাই যাতে সে তার জন্য এই দৈব-নির্দ্দিষ্ট পথ হতে একচুলও এদিক ওদিক যায়।

আচার্য্য হাইসেনবার্গ

বৈজ্ঞানিকেরা এতদিন মনে করতেন যে সূর্য্য ও পৃথিবী যেমন নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রয়েছে তেমনি জড় জগতের

প্রত্যেক অনু-পরমাণুও পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। অনুপরমাণুগুলি পর মুহূর্ত্তে কোথায় কি ভাবে থাকবে তা নির্ভর করছে সেগুলি এমুহূর্ত্তে কোথায় কি ভাবে আছে তার উপর। অর্থাৎ, সূর্য্য ও পৃথিবীর বেলা যেমন, সমস্ত জড়জগতের বেলাও তেমন তার আজকের অবস্থা তার গতকালের অবস্থার জন্য হয়েছে ও তার আগামী কালের অবস্থা আজকের অবস্থার উপর নির্ভর করছে। জড়জগতের ভবিষ্যত পরিণতি কি হবে তা সবই আগে হ'তে ঠিক করা রয়েছে। সমস্তই আগে হতে pre-determined এখানে ইচ্ছা বলে কিছু নাই। মানুষ মনে ভাবে যে সে নিজের ইচ্ছায় কাজ করছে, কিন্তু সেটা তার ভুল ধারণা—তার ইচ্ছাটা প্রাকৃতিক নিয়ম হতে উদ্ভূত।

নিয়মের রাজ্যে অনিয়ম

জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের এই যে মত ও যুক্তি এ বুঝি আর টিঁকে না। সম্প্রতি বিজ্ঞান রাজ্যে এমন সব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে মনে হয় যে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ ও বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি যত অমোঘ যত কঠোর বলে মনে করা হ'ত তত বোধ হয় অমোঘ তত কঠোর নয়। নিয়মের রাজ্যে এদিক ওদিক হ'তে অনিয়ম উঁকি মারতে সুরু করেছে। এ অনিয়ম কোথা হ'তে এল বুঝবার চেষ্টা করা যাক্।

বৈজ্ঞানিকের মূর্ত্তিপূজা

নিয়ম আবিষ্কার ও নিয়ম প্রয়োগ করতে হলে বৈজ্ঞানিককে অনেক পর্য্যবেক্ষণ করতে হয়। বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ করেন যা' তিনি চোখে দেখ্‌তে পান, যা তাঁর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করে বৈজ্ঞানিক যে জ্ঞান সংগ্রহ করেন তাকে সুসম্বদ্ধ ভাবে সাজাবার জন্য, তার মধ্যে নিয়ম বের করার জন্য বৈজ্ঞানিককে অনেক সময় এমন সব বস্তুর কল্পনা করতে হয় যা' তিনি চোখে দেখ্‌তে পান না, যা তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল্‌তে পারি যে পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত জড় পদার্থ অনুপরমাণু দিয়ে গঠিত এটা বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন, যদিও তিনি অনুপরমাণু কখনও চোখে দেখেন নাই। অনুপরমাণুর অস্তিত্ব অনুমান করার কারণ এই যে এরূপ অনুমানে জড়জগতের অনেক ঘটনার অর্থ বেশ সুস্পষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিকের কল্পনা এখানেই ক্ষান্ত হয় না। বৈজ্ঞানিক অনু-পরমাণু কি দিয়ে কি ভাবে গঠিত তারও ছবি মনে মনে আঁকেন। এখানেও তিনি এমন ভাবে ছবি আঁকেন যে সে ছবি তাঁকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলী বোঝাবার সাহায্য করে। কিন্তু ছবি আঁকার সময় বৈজ্ঞানিককে সাহায্য নিতে হয় তাঁর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড়জগতের যে-রূপ তিনি চোখে দেখেছেন সেই রূপের। মানুষ যেমন ভগবানকে দেখ্‌তে পায় না বটে কিন্তু ভগবানকে পূজা আরাধনা করবার সুবিধা হয় বলে তার নিজের প্রত্যক্ষগোচর কোনও জড় কি জীবের মূর্ত্তির অনুরূপ তাঁর মূর্ত্তি কল্পনা ক'রে তার পূজা করে, বৈজ্ঞানিকও তেমনি অনুপরমাণু দেখতে পান্ না বটে তবুও জাগতিক ঘটনাবলী বোঝার সুবিধা হয় বলে অনুপরমাণুর মূর্ত্তি গড়ে, তা'তে তাঁর প্রত্যক্ষগোচর জড়জগতে যে সব নিয়ম চল্‌ছে সেই সব নিয়মের প্রয়োগ দেখার প্রয়াস করেন। বৈজ্ঞানিক ভাবেন,—

> "ওহে, জগতকারণ, একি নিয়ম তব ?
> ... ...
> গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে
> অনু অনুরে ডাকে চির অনুরাগে,"

মনে করেন, যে-নিয়ম প্রত্যক্ষগোচর গ্রহ উপগ্রহের বেলা খাটে ঠিক সেই নিয়ম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর তাঁর পরিকল্পিত অনুপরমাণুর অভ্যন্তরেও খাটে।

কিন্তু যে জিনিষ চোখে দেখা যায় না, যা কখনও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হবার সম্ভাবনা নাই তার রূপ, তার নিয়ম আমি যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে করি ও সেইটাকেই সত্যকার-রূপ বলে বিশ্বাস করতে সুরু করি তাহ'লে গোলে পড়তে হয়। মূর্ত্তিপূজা করে কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, কিন্তু মূর্ত্তিটাকে আসল ভাব্‌লে বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এতদিন এই ভ্রম করে আস্‌ছিলেন। তাঁরা অতীন্দ্রিয় বস্তুর কল্পিত রূপকে

সত্যকার রূপ বলে মনে করতেন। সম্প্রতি তাঁরা এই ভ্রম বুঝতে পেরেছেন।

হাইড্রোজেনের পরমাণুর রূপ কল্পনা করতে গিয়ে তাঁদের কেমন গোলে পড়তে হয়েছে সে কথা বল্‌ছি।

হাইড্রোজেন পরমাণুর রূপ

একটা কাচ নলে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে তাতে যদি বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেওয়া যায় তাহ'লে তা হ'তে রং বেরং এর আলো বের হয়। হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে কি প্রক্রিয়ার ফলে এই রকম আলো বের হয় তার অনুসন্ধান ক'তে গিয়ে বৈজ্ঞানিককে হাইড্রোজেন পরমাণুর একটা রূপ কল্পনা করতে হয়েছে। রূপটি এই।

হাইড্রোজেনের পরমাণু একটা ধনাত্মক বিদ্যুৎ কণা (proton) ও একটা ঋণাত্মক বিদ্যুতকণা (electron) বা বিদ্যুতিন দিয়ে গঠিত। বিদ্যুতিনটি প্রোটনের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে; প্রোটনটি যেন সূর্য্য ও বিদ্যুতিনটি যেন তার একটি গ্রহ। কিন্তু প্রোটনের চারধারে বিদ্যুতিনের ঘোরার সঙ্গে সূর্য্যের চারধারে পৃথিবীর ঘোরার একটু পার্থক্য আছে। পৃথিবীর একটা সুনির্দিষ্ট কক্ষা আছে, পৃথিবী সেই কক্ষা পথে ঘুরে বেড়ায়। বিদ্যুতিনের কিন্তু কক্ষা পথ একটা নয়। তার অনেকগুলি কক্ষা আছে; প্রোটনের সব চাইতে কাছের কক্ষাকে ১নং কক্ষা বলা যেতে পারে। তার পরেরটিকে ২নং কক্ষা, তার পরেরটি ৩নং ইত্যাদি। বিদ্যুতিন সাধারণত সব চাইতে কাছের ১নং কক্ষায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বাহির হতে কোন উপায়ে—যেমন বিদ্যুত-স্ফুলিঙ্গ দিয়ে—যদি হাইড্রোজেন গ্যাসকে উত্তেজিত করা যায় তা হ'লে বিদ্যুতিন বাহির হতে শক্তি আহরণ ক'রে ১নং কক্ষা থেকে লাফিয়ে দূরের ২, কি ৩, কি ৪নং কক্ষায় চলে যায়। কিন্তু দূরের—যেমন ধরুন হয়ত ৪নং কক্ষায়—বেশীক্ষণ থাকে না। আপনা হতেই কাছের কক্ষায় ফিরে আসে, আর এই ফিরে আসার সময় তার সঞ্চিত শক্তি আলোরূপে বিকীরণ করে। কিন্তু ৪নং কক্ষা হ'তে কাছের কোন্ কক্ষাটায় আসবে—৩, কি ২, কি ১, তার কিছু স্থিরতা নেই। মোটের উপর বলা যায় দূর হতে কাছের কক্ষায় আসবে, কিন্তু ঠিক কোনটায় আসবে তার কোনও ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। এইখানে যেন নিয়মের মধ্যে একটু বিশৃঙ্খলা আছে। হাইড্রোজেন পরমাণুর বিদ্যুতিনটার যেন একটু ইচ্ছাশক্তি আছে, সে দূরের কক্ষা থেকে ইচ্ছা করলে যে-কোন কক্ষাতেই লাফিয়ে পড়তে পারে।

রূপ না অরূপ?

আমি উপরের হাইড্রোজেনের পরমাণুর রূপের যে বর্ণনা দিলাম তাতে বুঝলেন যে হাইড্রোজেনের পরমাণুর যেন একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ নাই, পরমাণুটি যেন বহুরূপী। আগেই বলেছি একটা কাচনলে অল্প হাইড্রোজেন ভর্ত্তি করে তাতে বিদ্যুতস্ফুলিঙ্গ দিলে কাচনল হতে আলো বের হয়। আলো বের হওয়ার সময় পরমাণুর বিদ্যুতিনগুলি কক্ষা হতে কক্ষান্তরে লাফালাফি করে। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কোন্ পরমাণুর বিদ্যুতিনটা কোন্ কক্ষায় আছে আমি তা'র উত্তর দিতে পারব না। কিন্তু কাচনল হতে বিচ্ছুরিত আলো পরীক্ষা করে আমি বল্‌তে পারি মোটের উপর যে কোনও মুহূর্ত্তে শতকরা এতগুলি ৪নং কক্ষায় থাক্‌বে, শতকরা এতগুলি ৩নং কক্ষায় থাক্‌বে ইত্যাদি। প্রত্যেক পরমাণুটার অবস্থার আলাদা আলাদা হিসাব দিতে আমি অক্ষম। বীমা কোম্পানী যেমন বল্‌তে পারেন যে আমাদের দেশে ৩০ বৎসর বয়স্ক মানুষ গড়ে সাধারণতঃ ৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচে, কিন্তু ঠিক কোন্ লোকটি যে ৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচবে তা বলতে পারেন না, এও যেন কতকটা সেই রকম। হাইড্রোজেন পরমাণুর বিদ্যুতিনটা কোন্ কক্ষায় থাক্‌বে সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যেন একটু অসম্পূর্ণ।

আমার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার এইখানেই শেষ নয়। সম্প্রতি অসম্পূর্ণতার মাত্রা আরও বেড়েছে। এতদিন জানতাম যে বিদ্যুতিনটা কোন্ কক্ষায় থাকিবে শুধু সেই সম্বন্ধেই আমার জ্ঞান অপূর্ণ; কোনও একটা কক্ষায় বিদ্যুতিনটা কোন মুহূর্ত্তে কোথায় আছে তা আমি নিশ্চয় ভাবে নির্দ্দেশ করতে পারি। এখন কিন্তু নূতন মতবাদ উঠেছে যে প্রোটনের চারধারে বিদ্যুতিনের যে সুনির্দ্দিষ্ট কক্ষা কল্পনা

করতাম সে কক্ষাগুলিই ভুয়া। বিদ্যুতিন কোথায় আছে জান্‌তে হ'লে কল্পনা করতে হয় যে প্রোটনের চারধারে একটা ঢেউএর সমষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিদ্যুতিনটার অবস্থান সেই ঢেউ সমষ্টির মধ্যে কোনও জায়গায়। যেখানে ঢেউটা যত জোরাল, যেখানে ঢেউএর মাথা যত উঁচু সেইখানে বিদ্যুতিনের থাকার সম্ভাবনা তত বেশী। কক্ষাপথে বিদ্যুতিনের অবস্থানের জায়গা (position) অনিশ্চিত। ছবিতে হাইড্রোজেন পরমাণু পুরাতন রূপ ও নূতন রূপ (নূতন অরূপ বল্‌লেই বোধ হয় বেশী ঠিক হয়) বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক দ্যব্রগ্‌লি ঢেউএর পরিকল্পনা প্রথম করেন ব'লে ঢেউ কে দ্যব্রগ্‌লি ঢেউ বলে। এই পরিকল্পনা করে দ্যব্রগ্‌লি অনুপরমাণুর গঠন সম্বন্ধে গবেষণার একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছেন। দ্যব্রগলি এই পরিকল্পনার জন্য কয়েক বৎসর হ'ল নোবেল প্রাইজ লাভ করেছেন।

হাইড্রোজেন পরমাণুর রূপ ও অরূপ
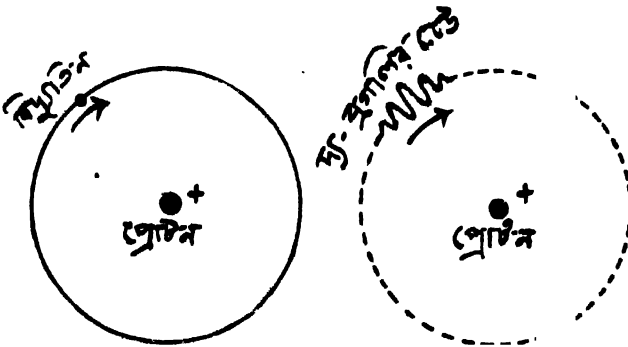
বাঁ-দিকের ছবিকে বর রাদারফোর্ড মূর্ত্তি (model) বলা হয়। এটি হ'ল হাইড্রোজেন-পরমাণুর পুরাতন ছবি। বিদ্যুতিন (electron) প্রোটনের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কোনও মুহূর্ত্তে বিদ্যুতিনের একটা সুনির্দ্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান (position) কল্পনা করা যেতে পারে। ডাইনের ছবিটি হাইড্রোজেন পরমাণুর আধুনিক রূপ (বা, অরূপ)। প্রোটনটি আছে, কিন্তু বিদ্যুতিনটি কোনও নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে কোথায় অবস্থান করবে তার কিছু নিশ্চয়তা নাই। কক্ষা পথে যে ঢেউ আঁকা আছে সেই ঢেউ প্রোটনের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐ ঢেউএর মধ্যে কোনও জায়গায় বিদ্যুতিনটি আছে। যেখানে ঢেউ যত জোরাল (উঁচু) সেইখানে বিদ্যুতিনের অবস্থানের সম্ভাবনা তত বেশী। এই অতি-আধুনিক মূর্ত্তিটি ফরাসী বৈজ্ঞানিক দ্য-ব্রগ্‌লির পরিকল্পনা।

অনিশ্চয়তা মতবাদ

হাইড্রোজেন পরমাণুর অতি-আধুনিক রূপের কথা যা বললাম তাতে স্বতঃই মনে হয় যে পরমাণুর আসল রূপটি যেন আমার কাছে অগোচর থাক্‌বে। পরমাণুর মধ্যে বিদ্যুতিনটি কখন্ কোন্ জায়গায় আছে, আর তার গতির পরিমাণ কি তা' যেন আমি শত চেষ্টাতেও জান্‌তে পারব না। আমাদের জ্ঞানের এই যে সীমানা, এই যে অনিশ্চয়তা, এটা শুধু হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠনের বেলা নয়, অন্য অনুপরমাণু ও তাদের সঙ্গে তেজকণার (quantum) ঘাত-প্রতিঘাতের বিষয় অনুশীলন করতে গেলেও এই অনিশ্চয়তার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। এই সব ব্যাপার নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা গুরুতর সমস্যায় পড়েছেন। ইহার নিরাকরণ করার জন্য হাইসেনবার্গ নামে এক তরুণ বৈজ্ঞানিক এক নূতন মতবাদ প্রচার করেছেন।

হাইসেনবার্গ গোড়াতেই স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে লন যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে নিয়ম বের করার জন্য মানুষকে যে পর্য্যবেক্ষণ করতে হয় সে পর্য্যবেক্ষণের প্রণালী এমন যে তাতে সামান্য একটু ভুল, সামান্য একটু অনিশ্চয়তা থেকে যায়, তা' সে যত সাবধানেই যত সূক্ষ্ম ভাবেই পর্য্যবেক্ষণ করা যাক্ না কেন। হাইসেনবার্গের এই মতবাদের ইংরাজি নাম হচ্ছে Principle of Indeterminacy, বাংলায় এর তর্জ্জমা হয়ত "অনির্দ্দেশের মতবাদ" হতে পাবে।

এই মতবাদের ফলে মনে হয় যে বৈজ্ঞানিকেরা যে মনে মনে অনুপরমাণুর গঠনের রূপ কল্পনা করেন সে রকম রূপ বা মূর্ত্তি গড়া বুঝি আর চল্‌বে না। অনুপরমাণুর রূপ কল্পনা করা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। রূপ ছেড়ে এখন অরূপের সন্ধানে বৈজ্ঞানিককে ছুটতে হচ্ছে।

হাইসেনবার্গের মতবাদ সহজ ভাষায় বোঝাবার চেষ্টা করছি।

নৈয়ায়িক ও বৈজ্ঞানিক

কোনও জড়বস্তু বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চল্‌ছে কিনা তা জান্‌তে হলে জড়বস্তুটার গতির পরিমাণ ও অবস্থান জানা দরকার।

যেমন ধরুণ আজ হঠাৎ আকাশে একটা ধূমকেতুর আবির্ভাব হ'ল। ধূমকেতু মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে সূর্য্যের চারধারে বৃত্তাভাসের (ellipse) পথে পাক খায়। ধূমকেতু ভবিষ্যতে কবে কোথায় কোন জায়গায় থাকবে জানতে হলে আমার দুইটা জিনিষ জানা চাই। প্রথম, এই মুহূর্ত্তে ধূমকেতুর অবস্থান (postion) কোথায়, ও দ্বিতীয় এই মুহূর্ত্তে ধূমকেতুর গতির পরিমাণ (momentum) কি? এই দুইটা জিনিষ আমি যদি মেপে বের করতে পারি তা হলে ভবিষ্যতে লক্ষ বৎসর পরেও ধূমকেতু কোন জায়গায় থাকবে তা আমি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রয়োগ করে বলে দিতে পারি।

আমি গণনা করে ধূমকেতুর অবস্থান যে বের করলাম, যদি পর্য্যবেক্ষণ করেও দেখি যে ধূমকেতু ঠিক সেই জায়গাতেই আছে তখন আমি অনুমান করি যে জড়পিণ্ডের গতি মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত; নিউটনের আবিষ্কৃত মধ্যাকর্ষণের নিয়ম ও গ্যালিলিও-নিউটনের Laws of Motion একেবারে ঠিক নির্ভুল।

আমার এই অনুমান কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে ঠিক টি'কে না। কূটবুদ্ধি নৈয়ায়িক আমার পর্য্যবেক্ষণের ফলে সন্তুষ্ট হন না। তিনি বলেন "তুমি যে ভাবে পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে গণনার ফল মেলালে তা'তে বৈজ্ঞানিক নিয়ম যে নির্ভুল তা ঠিক নিঃসংশয়ে প্রমাণ হ'ল না।"

আমি বিরক্ত হয়ে উত্তর করি "কেন? কত বৎসর বাদে সূর্য্যের সঙ্গে টানাটানির ফলে ধূমকেতু কোথায় থাকবে তা আমি গণনা করে বল্লাম, তুমি তাতেও সন্তুষ্ট নও? এর বেশী কি চাও?" নৈয়ায়িক কিন্তু এতেও দমেন না। তিনি আবার প্রশ্ন করেন "তোমার গণনার সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ কি নিখুঁত ভাবে মেলে? তুমি কি নিখুঁত ভাবে মেলাবার চেষ্টা করেছ? ধর, তোমার গণনায় বের হ'ল যে অমুক দিন বেলা ৮ ঘটিকা ১৫ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে ধূমকেতুটা অমুক জায়গায় থাকবে। তুমি তোমার ঘড়িতে মিলিয়ে দেখেছ কি যে ঠিক নিখুঁত ভাবে ঐ ৮ ঘটিকা ১৫ মিনিট ৬ সেকেণ্ডের সময় ধূমকেতু ঠিক সেই জায়গায় উপস্থিত হয়েছে?" আমি উত্তর করি "হাঁ, দেখেছি বৈ কি। ঠিক ৮টা ১৫ মিনিটের কাছাকাছি ধূমকেতু ঠিক নির্দ্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয়েছে। সেকেণ্ডটুকু মেলাতে পারলাম না তার কারণ যে-পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে আমাকে গণনা করতে হয়েছে সে পর্য্যবেক্ষণ ত নির্ভুল, নিখুঁত নয়। ধূমকেতু এখান হতে কত কোটি মাইল দূরে। দূরবীণের সাহায্যে তার অবস্থান ও গতি মেপেছি। এত দূর থেকে নিখুঁত ভাবে কি মাপ করা যায়? গোড়ায় মাপটা নিখুঁত হয় নাই বলে' গণনার ফলের সঙ্গে ধূমকেতুর অবস্থানটা ঠিক মিলছে না। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মটা তাই বলে ভুল নয়। নিয়মটা ঠিক্, গরমিলের কারণ আমার পর্য্যবেক্ষণ করার যন্ত্রের অপূর্ণতা।"

নৈয়ায়িক এবার সুযোগ পান। তিনি আমাকে চেপে ধরেন। প্রশ্ন করেন "তুমি ত বল্লে, যে নিয়মটা ঠিক; তোমার যন্ত্রের অপূর্ণতার সামান্য একটু গরমিল হবে। কিন্তু তোমার এ অনুমান ন্যায় শাস্ত্র অনুমোদিত নয়। তোমার গণনার ফলের যে সামান্য অংশটুকু পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে মেলাতে পারলে না সেটুকু যে নিয়মের একটু ভুলের জন্য হ'ল না তার প্রমাণ কি? তুমি যে মেলাতে পারলে না তা' যন্ত্রের অপূর্ণতার জন্য ত হ'তেই পারে। কিন্তু নিয়মের ভুলের জন্যও হওয়া অসম্ভব নয়।"

আমাকে এ'বার একটু মুস্কিলে পড়তে হয়। কিন্তু তবুও আমি নৈয়ায়িকের কূট প্রশ্নের বেশ সঙ্গত উত্তর দিতে পারি। আমি বলি, "গণনার সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ ঠিক নিখুঁত ভাবে মেলাতে পারছিনা এটা ঠিক। কিন্তু আমি অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে আমার মাপবার যন্ত্র যতই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করি ততই গণনার সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ ভালভাবে মেলে। সুতরাং, আমি অনুমান করি যে আমি যদি খুব শক্তিশালী দূরবীণ তৈয়ারী করি যার সাহায্যে ধূমকেতুটার গতি ও অবস্থান একেবারে নিখুঁত ভাবে মেপে নিতে পারি, তাহ'লে আমার গণনার ফলের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ আরও নিখুঁত ভাবে মিলবে। খুব বেশী শক্তিশালী দূরবীণ আপাততঃ আমার নাই বটে কিন্তু সেরূপ শক্তিশালী দূরবীণ তৈয়ারী করা অসম্ভব নয়। সুতরাং এ অনুমান আমার অসঙ্গত নয় যে আপাততঃ গণনা ও পর্য্যবেক্ষণে যে গরমিল হচ্চে সেটা আমার যন্ত্রের অপূর্ণতার জন্য, নিয়মের ত্রুটির

জন্য নয়।" আমার এই যে মত, যে, নিখুঁত নির্ভুল মাপ আপাততঃ দুঃসাধ্য হলেও একেবারে অসাধ্য নয় এইটাই ছিল এতদিন সাধারণ বৈজ্ঞানিকের মত।

জ্ঞানের সীমা

সম্প্রতি কিন্তু এই মতবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগতে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে যে বাস্তবিকই কি আমরা নিখুঁত ভাবে এমন পর্য্যবেক্ষণ করতে পারি যার দ্বারা বৈজ্ঞানিক সূত্রের অমোঘ অলঙ্ঘনীয়তা প্রমাণ হয়? শুধু আমাদের মাপবার যন্ত্র মোটা বলেই কি আমরা সূক্ষ্ম নিখুঁত মাপ পাই না? এখন যেন মনে হয় যে যন্ত্র যত শক্তিশালীই হউক না কেন একেবারে নিখুঁত নির্ভুল মাপ অসম্ভব। কোনও জড়বস্তু কোন জায়গায় কি অবস্থায় রয়েছে সে সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের যেন একটা সীমা আছে। মানুষ যতই চেষ্টা করুক, যত শক্তিশালী যন্ত্রই আবিষ্কার করুক, জড় বস্তুর অবস্থা সম্বন্ধে ঠিক নিখুঁত নির্ভুল খবরটি কখনও জান্‌তে পারবেনা। ইহাই হ'ল —

হাইসেনবর্গের মত

এই নূতন মতবাদের আবিষ্কর্ত্তা হাইসেনবার্গের নাম আগেই বলেছি। জড়বস্তুতে বিজ্ঞানের সূত্র প্রয়োগ কর্ত্তে হলে গোড়াতে যে কোনও একটা সময়ে জড়বস্তুর গতির পরিমাণ (momentum) ও তার অবস্থান (position) জানা দরকার। হাইসেনবার্গের মতে মাপবার যন্ত্র যত শক্তিশালী যত উন্নতই হোক্ না কেন কোনও জড় বস্তুর অবস্থান ও গতির পরিমাণ দুইটাই একসঙ্গে একই মুহূর্ত্তে নিখুঁত ভাবে মাপা অসম্ভব। একটা বিষয়, যেমন অবস্থান (position) হয়ত নিখুঁত ভাবে মাপ্‌তে পারি, কিন্তু তা হ'লে গতির পরিমাণ (momentum) মাপ্‌তে পারব না। আবার যে কোনও মুহূর্ত্তে হয়ত গতির পরিমাণ একেবারে নিখুঁত মাপ্‌তে পারি কিন্তু তা'হলে অবস্থান মাপ্‌তে পারবনা। একটা মাপ যে-পরিমাণে নিখুঁত হবে আর একটা মাপ সেই পরিমাণে ভুল হবে। একটার মাপ যদি একেবারে নিখুঁত হয় তবে অপরটা একেবারে ভুল হবে। একটাতে যদি একটু ভুল থাকে অপরটাতেও সেই অনুযায়ী একটু ভুল হবে। দুইটা বিষয়, অবস্থান ও গতির পরিমাণ এই দুইটা মাপে যে ভুল হয় তার পরস্পরের মধ্যে একটা নিয়ম আছে। একটাতে যদি ভুল বেশী হয় অপরটাতে তা' হ'লে ভুল কম হবে।*

হাইসেনবর্গের এই মতবাদে মনে হয় যে প্রকৃতি যেন তার ঘটনা পরম্পরার সব সংবাদগুলি আমাদের কাছে প্রকাশ কর্ত্তে নারাজ। একদিক দিয়ে যদি খাঁটি সংবাদ পেতে চেষ্টা করি তা'হলে আর দিক্ দিয়ে ভুল সংবাদ পাব। সব মিলিয়ে আমরা যে সংবাদ পাই সেটা একটা মোটামুটি গড়পড়তা সংবাদ মাত্র। সে সংবাদ যেন ঠিক সত্যকার খবর নয়। সংবাদে একটু, একচুল এদিক ওদিক সর্ব্বদাই আছে।

এতদিন আমরা বলে আস্‌ছিলাম যে, বৈজ্ঞানিক নিয়মের একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নাই। মনে হত যে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রয়োগ করে বলতে পারি অমুক জড়বস্তু অমুকটির টানাটানিতে অমুক সময় ঠিক অমুক জায়গায় থাক্‌বে ও সে মুহূর্ত্তে তার গতির পরিমাণ ঠিক এত হবে। এর একচুলও এদিক ওদিক হবে না। এখন কিন্তু হাইসেনবার্গের মতবাদ অনুসারে অত জোর দিয়ে কথা বল্‌তে পারি না। বলি বটে যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে ঐ জড়পিণ্ডটা ঐ সময়ে অমুক জায়গায় থাক্‌বে কিন্তু যে জায়গায় থাক্‌বে হিসাব করে বল্লাম তার যে একটুও এদিক ওদিক হবেনা তা বলতে পারিনা।

বৈজ্ঞানিক সূত্রের প্রকৃতি

এখন স্বতঃই প্রশ্ন উঠে যে এতদিন পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ফলে বৈজ্ঞানিক যে সব নিয়ম বা laws বের করেছেন সেগুলি কি সব ভুল? এ প্রশ্নের উত্তরে বল্‌তে হয় যে নিয়মগুলি নিখুঁতভাবে ঠিক কি ভুল তা জানবার

* নিয়মটা এই—

(গতির পরিমাণ মাপায় ভুল) × (অবস্থান মাপায় ভুল) = h (প্লাঙ্কের constant)। প্রথমটা কম হ'লে দ্বিতীয়টা বেশী হয়, দ্বিতীয়টা বেশী হলে প্রথমটা কম হবে। দুইটা ভুলের গুণফল সর্ব্বদা ঠিক থাক্‌বে।

কোনও উপায় নাই। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, বড় বড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়কণাতে যখন যে সব নিয়ম প্রয়োগ করি তখন হাইসেনবার্গীয় ভুলের বা অনিশ্চয়তার পরিমাণ এত সামান্য যে সে ভুল, সে অনিশ্চয়তা আমাদের মোটা পর্য্যবেক্ষণের যন্ত্রের ভুলে ঢাকা পড়ে যায়। সুতরাং মানুষের চল্‌তি কারবারে হাইসেনবার্গীয় ভুল থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। অনিশ্চয়তার ফল দেখ্‌তে পাওয়া যায় অনুপরমাণুর গঠন অনুশীলন করার সময়। তা' হলে কি বলব যে বৃহৎ জড়পিণ্ডে যে সব নিয়ম খাটে ক্ষুদ্র জড়কণা অনুপরমাণুতে সে সব নিয়ম খাটে না? একথাও ঠিক বলা চলেনা। নিয়ম আছে, কিন্তু নিয়মটা যেন একটু ঢিলা রকমের। একটা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে অনুপরমাণু যেন কঠোর নিয়মের শৃঙ্খল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ক্লাস ঘর হতে মাষ্টার মশায় বেরিয়ে গিয়েছেন—ছেলেরা ক্লাস ঘরের মধ্যে স্বাধীনতা পেয়েছে—কিন্তু ঘর হতে বাইরে যাবার স্বাধীনতা পায় নাই—বেত হাতে মাষ্টার মশায় বাইরে দাঁড়িয়ে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড় কণাগুলি একজোটে একসঙ্গে মোটের উপর নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রত্যেক জায়গায় ঠিক আইন মাফিক নাও চল্‌তে পারে।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

এই প্রবন্ধে উল্লেখিত ফরাসী বৈজ্ঞানিক দ্য ব্রগ্‌লি ও তাঁহার কল্পিত ঢেউ-এর প্রকৃতি সম্বন্ধে বর্ণনা ১৩৩৬ সালের পৌষ মাসের বিচিত্রায় বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের লিখিত "পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার" নামক নিবন্ধে পাওয়া যাইবে। বিঃ সঃ

চীনের স্মৃতি

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চীন জাপান সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় আজ অনেক কথাই মনে পড়ে। সে প্রায় ৩০ বছর পূর্ব্বের কথা। যখন ১৯০০ ফেব্রুয়ারীতে রুষ-জাপানে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন আমরা উত্তর চীনের টিন্‌সিনে উপস্থিত।

দুনিয়ার সব শ্বেত-জাতি ১৯০০ সালে বদ্ধপরিকর হয়ে চীনের বিরুদ্ধে অভিযান করেন,—যেহেতু তারা তাদের রাজ্যে বিদেশীর গন্ধ সইতে পারছিল না, ধর্ম্মপ্রচারকদের সদুপদেশ ও সদিচ্ছার কদর্য্যই করে' বসছিল। মহা রক্ষণশীল জাত তারা,—নিজের সনাতন আচার বিচার সংস্কার নিয়ে থাকতে চায়। অন্যের মোড়লী সইতে চায়না। তাদের ধারণা তাদের চেয়ে আবার বেশী বোঝে কে?—"তোমাদের কে ডেকেছে, আমাদের তরে তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেনো?" তারা বোঝেনা—জ্ঞান বিতরণ, আঁধার মোচন,—মহতের ধর্ম্ম। রোগী আর কবে অস্ত্রোপচারে রাজি হয়, কিন্তু অবোধের উপকারের জন্যে সেটা জোর করেই করতে হয়।

সহজে বাধা না দিতে পেরে, দুষ্টেরা ক্ষিপ্ত হয়ে শেষ খুন্‌খারাপি ক'রে বসে। তার পরিণাম,—সমগ্র শ্বেতজাতি রোষে রাঙা হয়ে চীন অভিযান করেন এবং অস্ত্রোপচারও আরম্ভ হয়।

সেই সূত্রে এই শিষ্টেদেরও ডাক্ পড়ে। অভিযানে জান দেবার মত প্রাণ নিয়ে নয়, বরং প্রাণটা যাতে ঘরে ফিরে আসে,—তাই কেউ রাম কেউ আল্লা কেউ দুর্গা কেউ কালীর কাছে সকাতর পিটিসন্ পেস্ করে পা বাড়াই। প্রাণ ভয়ে ডাকগুলো বোধ হয় বেসুরো বলেনি,—ঠাকুরদের কানে ধরেছিল। পৌঁছে দেখি, অষ্টবজ্র অনেক চীনেকে স্বর্গে পাঠিয়ে চট্‌পট্ বালাই মিটিয়ে ফেলেছে—স্থানে স্থানে পঞ্চভূত পচছে—একটু আধটু দুর্গন্ধ ছাড়ছে মাত্র। এখন কেবল লড়াই চলছে লেখা পড়ার অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে মাৎ করবার মত চালের ও ছলের।

CARTE POSTALE

K.N. Banerji. Esqr.
Indian Recreation Club.
West-Village, B. Y.
Prints in.
From.
Y. Okumura.
Newchwang.

ওকুমুরার নিকট হইতে প্রাপ্ত পোষ্ট কার্ডের ঠিকানার দিক

আমরা বিজয়ীর মত, উপস্থিত হয়ে, চীনেদের ফেলে-পালানো সাজানো বাড়ীতে আরামসে শয্যা পাতলুম।—তাসের খোঁজ পড়লো। আমরা রাজবাড়ীর আমলা, সাজ-সজ্জা আহার্য্যের অভাব নেই, প্রাচুর্য্যই সমধিক। আপিসের কাজ মামুলি, অভাব কেবল—জলখাবার ঘরে 'ভোলা' ব্যাটা নেই যে গুড়ুক খাওয়াবে আর মাসকাবারে হাসতে হাসতে হুঁকোটি হাতে দিয়ে—সাড়ে সাত টাকার সিঙাড়া আর রসগোল্লার ফদ্দটা শোনাবে!

ফাঁক্ পেলে পাছে বাড়ীর চিন্তা আসে,—কেউ তো আর পরিবার plus তিনটি কাচ্চা-বাচ্চার কম ফেলে আসেন নি,—বরং তদতিরিক্ত (অধুনা আশঙ্কা কমলেও) posthumous-এর দুশ্চিন্তাও ছিল।—তাই ফাঁক্ মারবার জন্যে club, টেনিস্ প্রভৃতিও ক্রমে অবলম্বনে দাঁড়ালো। এই 'ফাঁক্-ভরাট্' কল্পে সপ্তাহে সপ্তাহে টিপার্টিও চললো। ফলকথা লড়াই ক্রমে লাকসারিতে এসে গেল। কেবল অসুবিধা আরম্ভ হল 'ফলোয়ার' আর চাকর-বাকর নিয়ে। মদের ডিউটি না থাকায়, বাসায় ফিরে তার বিউটি দেখতে হত নিত্যই।—তারা হুইস্কি আর ছুঁতোনা,—সেটা তাদের কাছে তখন ছোটলোকের খাদ্য, সাতসিকের শ্যাম্পেন্ মেরে সব লাশ্। কাজেই চীনে-বয় (boy) রাখতে হয়।

যিনি পাঠশাল পেরিয়ে কোনোদিন এক পৃষ্ঠা বাংলা লেখেননি, তিনিও এখানে regular সাহিত্য চর্চ্চা করতে বাধ্য হন। চীনেরা মস্ত বাবু জাত, তাদের চিঠির কাগজ, নানা বর্ণে চিত্রে সুরঞ্জিত, roll হিসেবে বিক্রি হয়।—বড় বাড়ির মানতপ্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য সোনার-চাঁদ ছেলেদের সেকেন্দরী কোষ্ঠীও অত বড় হয় না। প্রতি সপ্তাহে (mail) মেল্ যায়। প্রত্যেকে সেই (Mailday) মেলডেতে ৩।৪ ঘণ্টা একাগ্র মনে সেই রোল মেলে সাহিত্য চর্চ্চায় নিবিষ্ট হন। তখন 'হতাশের আক্ষেপের' বিশিষ্ট লাইনগুলির খোঁজ পড়ে। 'ভগ্ন হৃদয়' নিয়ে স্মৃতি চর্চ্চা চলে। এবং "সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু" কাজে লাগে।

এই ভাবে দিনগুলি মন্দ কাটছিল না। এমন সময় অকস্মাৎ রুষ জাপান যুদ্ধের উৎপাত সকলকে চমকে দেয়। এত সুখ সইবে কেনো!

টিন্‌সিনে তখন জগতের সব লড়ায়ে-জাতগুলিই উপস্থিত। প্রত্যেকে বেশ খানিকটে করে যুৎসই জায়গা দখল করে বসে আছেন। কিন্তু ৭ই ফেব্রুয়ারী রুষের একটি প্রাণীকেও আর দেখতে পেলুমনা, শুনলুম রাতারাতি তারা কোথায় সরে পড়েছে। জাপানিরা ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে—শত্রু খুঁজে। আশা উত্তেজনা উৎসাহ তাদের সবার মুখে সুস্পষ্ট!

ওকুমুরার পোষ্টকার্ডের ছবির দিক

টাকু রোডেই (Taku Road) জাপানী দোকানদার ও ব্যবসাদারের আড্ডা; মণিহারী, ষ্টেসনারি, মিস্‌লেনিয়াস, ছবি, সিগারেট, রেশমীফুল, পাখা, মাগুর প্রভৃতির ব্যবসায়ই বেশী। আজ বেচা-কেনা বন্ধ, সেদিকে তাদের মনই নেই। কেহই চিন্তিত বা বিমর্ষ নয়, মুখে বরং ক্রুর হাসি।

কয়েক মাস পূর্ব্বে ওকুমুরাকে যেদিন আমাদের বাসায়

প্রথম দেখি,—তাকে অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন মলিন, দীন জাপানী যুবক (beggar boy বলাও চলে) ভাবেই পেয়েছিলুম। পরিচয়েও তাই পাই। রুমালে বাঁধা একটি কাগজের বাক্সে কতকগুলি সিগারেটের প্যাকেট্ নিয়ে এসে অভিবাদনান্তে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে—"আপনি সিগারেট ব্যবহার করেন কি !"

করি শুনে জিজ্ঞাসা করে—"কোন্ ব্র্যাণ্ড্ ?"

বলি—"জাপানের পিকক্ ব্র্যাণ্ড্।"

শুনে খুসি হ'য়ে বলে—"আমার কাছে নিতে আপনার আপত্তি আছে কি ? নিলে আমাকে সাহায্য করা হয়। আমি অত্যন্ত গরীব, এক দোকানদার বন্ধু আমাকে এই বাক্সটি বেচতে দিয়ে সাহায্য করেছেন, লাভ নেবেন না; বিক্রি করে তাঁর ন্যায্য দাম তাঁকে ফিরিয়ে দিলে, আবার মাল পাব ;" ইত্যাদি।

বাসায় আমি ও আমার অফিস্-বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার থাকতুম এবং দুজনে কম্‌সে কম মাসে দশ ডলারের (চীনের ডলার তখন ১৷৵০ করে) সিগারেট্ পোড়াতুম। উত্তর চীনের হাড়ভাঙা শীতে স্নানাহার আর নিদ্রার কয় ঘণ্টা ছাড়া—টানের বিরাম ছিলনা।

ওকুমুরা বড় খদ্দেরই পেলে। তিন চার মাস নিয়মিত নিজে এসে দিয়ে যেত, পরে টাকুরোড়ে একখানি ছোটখাটো দোকান খোলে। সেখান থেকেও বিস্কুট, মাখন, কাগজ, সিগারেট, এসেন্স প্রভৃতি নিতে আমরা বাধ্য হই ;—ছোকরাটির অনুনয় বিনয় এড়াবার উপায় ছিল না।

রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হবার সপ্তাহ তিন মধ্যে, সে একদিন তার বিধবা মাকে সঙ্গে করে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত।

কি খবর,—জিজ্ঞাসা করায় শুনলুম, সে যুদ্ধে যেতে চায় কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি, দুরপ্রসারী নয় ব'লে ডাক্তার তাকে পাশ করেনি। এই কথা বলতে তার চোখ ছলছলিয়ে এলো।

বললুম,—বেশতো দোকান করচ,'—ইচ্ছে করে যুদ্ধে যাওয়া কেনো ? সকলেরই কি যুদ্ধে যেতে হবে ? তোমার মা বৃদ্ধা—তাঁকেও তো দেখা চাই।

শুনে সে নিজে কিছু বললে না, আমার কথাগুলি মাকে শোনালে। মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে—আমার আর এক ছেলে আছে তার বয়স মাত্র ১৪, তাকে ওরা পাঠাবে না—সে দোকান দেখতে পারে। আমার উপযুক্ত ছেলে থাকতে সামান্য কারণে সে এই বিপদের সময় দেশের কাজে লাগবে না ? আমি মুখ দেখাব কি করে ? আপনি দয়া করে এমন ভাবে কিছু লিখে দিন যাতে ওকুমুরার যাওয়া হয় ; সে অন্য কেন্দ্রে গিয়ে দরখাস্ত দেবে।" ইত্যাদি বলে' কেবলই হাত জোড় করতে লাগলো।

যার মা এই কথা বলে, তার ছেলেকে আর বোঝাব কি ! সুরেশ ভায়া বললেন—"বাঁড়ুয্যে ওরা বাঙ্গালী নয় যে ২৫৲ টাকার কেরাণী হয়ে বেঁচে থেকে বাপের নাম বজায় রাখবার কথা নির্ল্লজ্জের মত মুখে আনবে, এখানে গয়াও নেই যে পিণ্ডি দেবার পরোয়ানা আছে। ওদের দেশ আছে,—দেশের জন্যে প্রাণ আছে, পারো উপায় করে দাও।"

১৮ বছর বয়স থেকে দরখাস্ত লেখার মক্সই করা হ'য়েছে। ফল হোক না হোক, মাথা ঘামিয়ে মুসুবিদে করে, লম্বা এক দরখাস্ত লিখে দিলুম।

দরখাস্ত হাতে পেয়ে ওকুমুরা বললে—Bless me Lama [বেশী পরিচিতেরা আমাকে Lama, 'লামা' বলতো]—তখন আমাদের মনের অবস্থা "এরা—গেলে বাঁচি।" যাক্—তারা খুসি হয়ে, হাঁটু গেড়ে অভিবাদন জানিয়ে 'বান্‌জাই' বলে চলে গেল।

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম,—দেশ কাকে বলে জানিনা কিন্তু এক ছটাক্ জমি নিয়ে খুনোখুনি মামলা মকর্দ্দমা করে থাকি,—এবং তার জন্যে ঘরের পয়সা পরকে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েও থাকি ! ১৯ বছরের ছেলে সাধ করে কাঁচা মাথা দিতে চায় ! পাঠায়নি বলে মা কাঁদে ! স্বপ্ন না গল্প না অভিনয় ?

সুরেশ ভায়া বললেন—"এতো ফ্যাসাদও জোটাতে পারো, কোনদিন তুমিই মজাবে বাঁড়ুয্যে···মরতে যাবে যাক্, আমাদের বাসায় ক্যানো ? মাথাটা খারাপ করে' দিয়ে গেল। ও-মাগী ওর মা নয়। তুমি উস্কুগুস্কু করে

দিলে,—এ-পাপ তোমাকেও অর্শাবে। রুষের এই তোড়ের মুখে ও গেছে কি—মরেছে—"

শুনে চমকে উঠলুম! এ সব আধ্যাত্মিক কথা তো আমার মাথায়ই আসেনি! সুরেশ তো সত্যি কথাই বলেছে, আমিই তো ওকে মরতে সাহায্য করলুম।

ব্যাপারটার গুরুত্ব, বেলার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চললো,—যেন কি মহাপাতক করা হয়েছে। এ কথা একবারও মনে এলোনা যে, সে নিজের দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, যেটা তার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের কাছে সে কর্ত্তব্য কোনো পুরুষে দেখা দিয়েছে কি—যে, তার সংস্কার spiritটা সহজে অনুভবে আসবে? সারাদিনটা মন-মরা হয়েই কাটলো।

আমাদের বাসাটা ছিল North China Indian Recreation Club-এর গায়েই। ক্লাবে আড্ডা দেবার পর বাঙ্গালী বাবুরা আমাদের বাসা হয়ে ফিরতেন। সে-রাতেও দু'জন এলেন।

রুষ-জাপানে যুদ্ধের কথাই চললো। জাপান জলে স্থলে ক্ষিপ্তের মত লড়াই লাগিয়েছে,—মরিয়ার মত এগুচ্ছে, কোনো বাধাই তাদের কাছে বাধা নয়। কোরিয়া ভেদ করে যাবে—তাদের আপত্তি শুনবে না। সব জাতই সাগ্রহে সেটা লক্ষ্য করছে।

সবার চেয়ে সমস্যা ইংরাজদের,—তাঁরা জাপানের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে ally,—বন্ধু ও বাধ্য। কি হোটেলে, কি আপিসে, কি ক্লাবে ওই কথা ওই প্রসঙ্গ—অবশ্য সন্তর্পণে ফিস্‌ফাস্। গেল বেঁধেছে—রুষ য়ুরোপের শ্বেত-জাতি হয়ে। জাপানীরা এশিয়ার লোক,—রংয়েও নিকৃষ্ট, তার এ ধৃষ্টতা কেনো। স্পর্দ্ধারও সীমা আছে! তাই তো,—...এই ভাব।

একে নবোদ্যম, তায় যুদ্ধের প্রথম মুখ,—জাপান উন্মত্তের মত ছুটেছে। দেখতে দেখতে সংগ্রাম জেঁকে উঠলো, দিন দিন ভীষণ আকার ধারণ করতে লাগলো। জাপান এগুচ্ছে এ সংবাদটা কারুর বড় উপভোগ্য হচ্ছে বলে টের পাওয়া যাচ্ছিল না।

যাই হোক,—আমাদের কিন্তু মুখ ও বুক দুই শুকুচ্ছিল, যেহেতু আমরা ally-দাস, পাশ্ কাটাবার পথ নেই। 'মরার বাড়া গাল নেই' বটে,—সেটা দেশে হলে সম্ভব হতেও পারতো, এখানে চাকরি ছেড়ে এক সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া চলে।

বেলঘর নিবাসী অমূল্যধন বাবুই টিকাটিপ্পনী সহ এই সব সংবাদ শোনাচ্ছিলেন। তিনি পেকিনে থাকতেন, মধ্যে মধ্যে টিন্‌সিনে আসতেন, কারণ হেড্ আপিস্ ছিল টিনসিনে। অমূল্যবাবু ছিলেন বেশ কাজের লোক; দশ জনকে নিয়ে চলতে জানতেন। লোককে সাহায্য করতে, সাহস, আশা ও সান্ত্বনা দিতে তৎপর। বিদেশে বিপদের মধ্যে এরূপ একটি লোক মেলা কম কথা নয়। ভয় লাগিয়ে দিতে যেমন, আবার তার কাটান-ছিড়েন বাতলাতেও তেমনি। পেকিনে Legation (দূতাবাস) গুলির অধিষ্ঠান, সুতরাং অমূল্যবাবুর কাছে সকলেই সঠিক সংবাদের আশা করতো। তিনিও গম্ভীর ভাবে বেশ মাতব্বরের মত শোনাতেন।

আজ 'চীনযাত্রীর' খ্যাতনামা চাটুয্যেও হাজির। সে ছিল মহা ভীতু লোক,—পরিবার কাছে না থাকলে সম্পূর্ণ অসহায়, একদম বে-কাম ও অচল। Clothing Store-এর (কাপড়ের গুদামের) ভার পড়েছিল তার উপর। লক্ষাধিক টাকার গরম পোষাক পরিচ্ছদের বিলি ব্যবস্থা তার হাতে। তায় সে বিষম সন্দিগ্ধচিত্ত, সর্ব্বদাই কে কি সরালে,—এই চিন্তা। চীনে কুলিরা ভয়ঙ্কর চোরও।—বলতো—"পরিবার কাছে থাকলে, আমাকে কিছু দেখতে হ'ত না,—কাপড় গোছাতে, কাপড়ের হিসেব রাখতে ওরাই ভালো পারে; একখানা রুমাল কেউ সরাক দিকি!" কথাটা অস্বীকার করতে বোধ হয় বাঙালী জজেরাও সাহস করেন না।

চাটুয্যে একপাশে চুপটি করে বসে—রাবণের চিতার মত জ্বলন্ত ষ্টোভটার দিকে হাঁ করে উদাস ভাবে চেয়ে অমূল্যবাবুর কথা শুনছিল। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাসও ছাড়ছিল। সেই সঙ্গে একবার 'মধুসূদন' নামটি কণ্ঠছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ায়, অমূল্যবাবু বললেন,—"এটা মধু-সূদনের এলাকার বাইরে চাটুয্যে, এখানে দেবতার নাম

নিত্য বদলায়, Brigade Orderএ যা বলে' দেয় সেইটি স্মরণ রাখা চাই, আজ···

অসময়ে সহসা গুড়ুম্ করে বন্দুকের আওয়াজ হওয়ায়, সকলে চমকে গেলুম,—কথা থেমে গেল। সত্রাসে চাটুয্যে দাঁড়িয়ে উঠে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বাঁড়ুয্যে মশাই? বন্দুক ছোড়ে কেনো?"

অমূল্যবাবুই জবাব দিলেন—"আজকাল বড় কড়াকড়, বোধ হয় কেউ Challenge-এর জবাব দিতে পারেনি—তাকে গুলি করলে···

চাটুয্যে কম্পিত কণ্ঠে বললে—"তাই একেবারে মেরে ফেলবে নাকি?"

"ফেলবে না? শত্রুপুরী, কে কি উদ্দেশ্যে চলেছে, কে জানে? তাই তো বলছিলুম—Watch-wordই এখানকার দেবতার নাম। আজকের মহামন্ত্র জানা আছে তো? মনে করে রাখ—Robbers···

চাটুয্যে আমার দিকে চেয়ে বললে—"আমি আজ এই খানেই থাকব বাঁড়ুয্যে মশাই···

"বেশ তো—সেই ভালো···"

অমূল্য বাবু দেখতেও যেমন হাতে বহরে, তেমনি সাহসী ও নির্ভীক। চাটুয্যেকে বললেন—"চলো না আমি পৌছে দিয়ে যাচ্ছি···"

সে গেল না।

অমূল্য বাবু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন—"বাঁড়ুয্যে মশায়ের কি শরীর ভালো নয়? তেমন কথা নেই, একটা সিগারেট টান্‌তেও দেখলুম না···

সুরেশ তাড়াতাড়ি বললে—"ও আপনি শোনেন নি বুঝি? উনি যে আজ একটি গর্হিত কাজ করে ফেলেছেন,—একটি ১৯ বছরের ছেলেকে যমের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।" এই বলে সকালের ঘটনা শোনালে।

রাত হয়েছিল—অমূল্য বাবু তার ওপর আর কারুকার্য্যের চেষ্টা না পেয়ে সংক্ষেপেই সারলেন; বললেন—"তাতে হয়েছে কি—তা হ'লে কুরুক্ষেত্র বাধাবার কর্ত্তার মহাপাতক রাখবার স্থান মিলতো না। দু'দিন অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবেন, ও জাতের মহিরাবণটি পর্য্যন্ত দেশের জন্যে প্রাণ দিতে ছুটবে—এখনি হ'য়েছে কি! ওদের প্রত্যেকটি বামন অবতার।" এই বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

চাটুয্যের দুঃখের কাহিনী ও বাড়ীর অবস্থাদি শুনতে এবং কর্ত্তব্য স্থির করতে অর্দ্ধেক রাত কেটে গেল।

সে বোধ হয় ঘুমুতে পারেনি, শুনলুম ভোর হতেই নিজের গুদোমে চলে গেছে।

ক্রমে একটা চিন্তার ও আতঙ্কের ভাব সকলের মনেই দিন দিন সুস্পষ্ট হ'তে লাগলো। জাপানের জয় প্রার্থনাটাও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলে তখন করতে লাগলেন,—পাছে allyর না টান ধরে। কাছে লোক মজুদ থাকতে দূরে তো আর খুঁজতে হবে না। তা ছাড়া জাপান তখন সমুদ্রময় 'মাইন' ছড়িয়ে ফেলেছে। ইনি জলচর বোমা—গা-ঢাকা দিয়ে ভাসেন। জাহাজ এর সংঘর্ষে এলেই উড়ে যায়। রুষ-জাপান যুদ্ধেই এঁর প্রথম পরিচয় পেলুম। সুতরাং জলপথ বিপদসঙ্কুল, জাহাজ চলাচল নিরাপদ নয়। হাতের পাঁচ নিয়েই এঁদের খেলতে হবে!

জলে স্থলে সংগ্রাম তখন তুমুল দাঁড়িয়েছে। এই বজ্র বাঁটুলের জাত রুষকে নিত্যই ঠেলে নিয়ে এগুচ্ছে,—সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে আছে। আপিসে কাজ কর্ম্ম 'নেম' রক্ষায় চলেছে, সারাদিনই সংবাদপত্র আর বুলেটিন বেরুচ্ছে, টেলিগ্রাম আসছে। উপরন্তু আমাদের 'রয়টার'—বাবুর্চ্চি, খানসামা আর প্যায়দা। তারা রিপোর্টগুলো এমন মুখ করে শোনায়,—পীলে চমকে দেয়, রক্ত শুকোয়। বড় সায়েবদের Table Talkই তাদের stock—শুনে আমরা তটস্থ!

জাপানীরা যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তারা ফেরবার জন্যে যায় না—জয়ের জন্যই যায়। তারা লোক বাঁচিয়ে লড়বার কায়দা কানুন মানে না, সে হিসেব রাখে না। যুদ্ধ জয় করতে হবে—এই মাত্র জানে ও মানে। সুতরাং তাদের হটাবে কে! Honourable retreat শুনলে ঘৃণাব্যঞ্জক হাসিই হাসে। কিন্তু সুসভ্য দেশের বড় বড় জেনারেলরা ও ধুরন্ধরেরা এটাকে মূঢ়তা বলেন। এই মূঢ়তাই রুষকে কোণ ঠাশা করেছিল।

কয়েকমাস তখন কেটে গেছে। এই মৃত্যুলীলা অনেকটা সয়ে সহজ হয়ে এসেছে। বড় বড় বীরের বীরত্ব-

কাহিনী এবং নগণ্য সাধারণের মহত্ত্ব তখন কিংকোডা কোম্পানীর সচিত্র মাসিকের মার্ফৎ সবিস্ময়ে পড়া যাচ্ছে, আর দেশ জিনিষটা কি ও দেশ-প্রাণতা কাকে বলে, দেশ-পূজার মন্ত্র ও উপচার-উপকরণ কি, দেখা যাচ্ছে। এই অদ্ভুত-কর্ম্মারা যা দেখাচ্ছে তাই অভূতপূর্ব্ব।

লড়ায়ে-জাতের অভিজ্ঞেরা বলচেন—"ট্রান্সভাল" যুদ্ধের বুয়োরদের রীতি নীতি এরা অত্যল্প সময়ে আয়ত্ত করে কাজে লাগাচ্ছে। শ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ই এদের প্রধান অস্ত্র ও মূল-মন্ত্র। অধিকন্তু এদের মধ্যে প্রাচীন সামরিক প্রবাদ ও ক্ষাত্রবীর্য্য বর্ত্তমান, তাই আজো···কিন্তু···ইত্যাদি।

অহরহ এই বিরাট হত্যাকাণ্ডের আলোচনার মধ্যে ওকুমুরার নাম মাথা থেকে মুছেই গিয়েছিল। তাদের টাকু-রোডের দোকানও উঠে গেছে।

একদিন আপিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি আমার নামে একখানা ছবি-কার্ড বা ছবি পোষ্টকার্ড এসেছে। সেটা বোধ করি আগষ্ট মাস। সামান্য দু'ছত্র লেখা। পড়ে দেখি ওকুমুরা লিখেছে—Oh—How pretty Japans Victory and lady from Y. Okumura

Newchang.

নিউচাং স্থানটি পোর্ট আর্থারের সন্নিকট।

যাক্—বাঁচলুম, ছেলেটা বেঁচে আছে। আরো দু'মাস পরে হারবিন্ থেকে আর একখানা পাই! তারপর আর পাইনি।

পত্র দু'খানি প্রায় ৩০ বছর আমার কাগজ পত্রের মধ্যেই পড়েছিল। দ্বিতীয়খানি আজ দেখতে পাচ্ছি না, প্রথম কার্ডের টিকিটখানিও ড্যাম্প লেগে কোথায় খসে পড়েছে।

আজ আবার সেই বিজয়ী বলদৃপ্ত জাপান জাতি-সংহার লীলায় লিপ্ত, "উপেনের" জমিটুকু তার চাই।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তীর্থের বাধা

শ্রীঅমিয়লাল মজুমদার

সংসার-মায়া তেয়াগিয়া গৃহী হইয়াছে উদাসীন,
তীর্থের দ্বারে কাটাইবে তার জীবনের বাকী দিন
বিদায়ের মুখে গৃহিণী তাহার ফুকারিয়া কাঁদি কহে,—
'সতীরে ছাড়িয়া পতির পুণ্য,—ধর্ম্ম কভু না সহে'।
গৃহীর চিত্তে জাগে বিস্ময়,—ভাবে একী জঞ্জাল,—
ধর্ম্মের পথে বাদ হানি' শেষে দাঁড়াইল পোড়াকাল?
বহু বিতর্ক, তীর্থ-কামীর তবু দশা শোচনীয়,—
নারীর অশ্রু পুরুষের মন জিনিতে অদ্বিতীয়!
পুণ্যের ভাগী পুত্র-কন্যা, সব কটি ল'য়ে সাথে,
তীর্থের বুকে নূতন করিয়া গৃহী সংসার পাতে।
তীর্থের দেবে ডাকিয়া সে যত পাশরিতে চায় মায়া,
শিশু পুত্রের ক্ষুধার্ত্ত মুখ তত চোখে ফেলে ছায়া!
বন্ধন যত এড়াইতে চাহে,—মন তবু দুর্ব্বল,
মূর্খ ত্যাগীর দু'হাত জড়ায়ে ভোগ বাঁধে শৃঙ্খল!

১২

কৈলাস তীর্থ-যাত্রায় পথের দুর্গমতার বিবরণ শুনিয়া মামীরা পিছাইয়াছেন, দয়াময়ীর নিজেরও বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়না তথাপি তাঁহার কলিকাতায় কাটিল পাঁচ-ছয় দিন দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট ও গঙ্গাস্নান করিয়া। কাজের লোকের হাতেই কাজের ভার পড়ে, এ বাটীর প্রায় সমস্ত দায়িত্বই আসিয়া ঠেকিয়াছে বন্দনার কাছে। সতী কিছুই করেনা সকল ব্যাপারে বোন্‌কে দেয় আগাইয়া, নিজে বেড়ায় শাশুড়ীর সঙ্গে ঘুরিয়া। তবু কোথাও বাহির হইতে হইলে তাহাকে ডাক দিয়া বলে, বন্দনা, আয়না ভাই আমাদের সঙ্গে। তুই সঙ্গে থাকলে কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেসা করতে হয়না।

বিপ্রদাসেরও আজকাল করিয়া বাড়ী যাওয়া ঘটে নাই, মা কেবলি বাধা দিয়া বলেন বিপিন্ চলিয়া গেলে তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাইবে কে? সেদিন সন্ধ্যায় তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, বিপ্রদাসকে ডাকাইয়া আনিয়া উত্তেজনার সহিত বলিতে লাগিলেন, বিপিন, তুই যাই বলিস্ বাবা, লেখা-পড়া জানা মেয়েদের ধরণই আলাদা।

বিপ্রদাস বুঝিল এ বন্দনার কথা। জিজ্ঞাসা করিল কি হয়েছে মা?

দয়াময়ী বলিলেন, কি হয়েছে? আজ মস্ত একটা লালমুখো সার্জেন এসে আমাদের গাড়ী আটকালে। ভাগ্যে মেয়েটা সঙ্গে ছিল ইংরিজিতে কি দু'কথা বুঝিয়ে বল্‌লে সাহেব তক্ষণি গাড়ী ছেড়ে দিলে। নইলে কি হতো বল্‌তো? হয়ত সহজে ছাড়তো না, নয়তো থানায় পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেতো,—কিঁ বিভ্রাটই ঘট্‌তো। তোর নতুন পাঞ্জাবি ড্রাইভারটা যেন জন্তু।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, কি করেছিলে তোমরা,—ধাক্কা লাগিয়েছিলে?

বন্দনা আসিয়া দাঁড়াইল। দয়াময়ী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, তোমার কথায় বিপিনকে তাই বলছিলুম মা, লেখা-পড়া জানা মেয়েদের ধরণই আলাদা। তুমি সঙ্গে না থাকলে

সবাই আজ কি বিপদেই পড়তুম। কিন্তু সমস্ত দোষ সেই মেম বেটির। চালাতে জানেনা তবু চালাবে। জানেনা—তবু বাহাদুরি করবে।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, লেখা-পড়া জানা মেয়েদের ধরণই ঐ রকম মা। মেম-সাহেব নিশ্চয়ই লেখা-পড়া জানে।

মা ও বন্দনা দুজনেই হাসিলেন, বন্দনা কহিল, মুখুয্যে মশাই, সেটা মেম-সাহেবের দোষ, লেখা-পড়ার নয়। মা, আমি রান্না-ঘরটা একবার ঘুরে আসিগে। কাল দ্বিজুবাবুর আটার রুটি ঠাকুর শক্ত করে ফেলেছিল, তাঁর খাবার সুবিধে হয়নি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দয়াময়ী স্নেহের চক্ষে সেইদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, সকল দিকে দৃষ্টি আছে। কেবল লেখা-পড়াই নয় বিপিন, মেয়েটা জানেনা এমন কাজ নেই। আর তেমনি মিষ্টি কথা। ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি—সংসারের কিচ্ছুটি চেয়ে দেখতে হয়না।

বিপ্রদাস কহিল, ম্লেচ্ছ বলে আর ঘেন্না করোনাত মা?

দয়াময়ী বলিলেন, তোর এক কথা! ম্লেচ্ছ হতে যাবে কিসের জন্যে,—ওর মা একবার বিলেত গিয়েছিল বলেই লোকে মেম-সাহেব বলে দুর্নাম রটালে। নইলে আমাদের মতোই বাঙালী ঘরের মেয়ে। বন্দনা জুতো পরে,—তা পরলেই বা। বিদেশে অমন সবাই পরে। লোক জনের সামনে বার হয়,—তাতেই বা দোষ কি? বোম্বায়ে ত আর ঘোমটা দেওয়া নেই,—ছেলেবেলা থেকে যা শিখেচে তাই করে। আমার যেমন বউমা তেমনি ও। বাপের সঙ্গে চলে যাবে বল্‌চে—শুনলে মন কেমন করে বাবা।

বিপ্রদাস কহিল, মন কেমন করলে চলবে কেন মা? বন্দনা থাক্‌তে আসেনি,—দুদিন পরে ওকে যেতে ত হবেই।

দয়াময়ী কহিলেন, যাবে সত্যি কিন্তু ছেড়ে দিতে মন চায়না,—ইচ্ছে করে চিরকাল ধরে রেখে দিই।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, সে তো আর সত্যিই হবার যো নেই মা,—পরের মেয়েকে অতো জড়িওনা। দুদিনের জন্যে এসেছে সেই ভালো। এই বলিয়া সে কিছু অন্যমনস্কের মতো বাহিরে চলিয়া গেল।

কথাটা দয়াময়ীর বেশ মনঃপূত হইলনা। কিন্তু সে ক্ষণকালের ব্যাপার মাত্র। বলরামপুরে ফিরিবার কেহ নাম করেন না, তাঁহাদের দিনগুলা কাটিতে লাগিল যেন উৎসবের মতো,—হাসিয়া, গল্প করিয়া এবং চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া। সকলের সঙ্গেই হাস্য-পরিহাসে এতটা হাল্কা হইতে দয়াময়ীকে ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনো দেখে নাই,—তাঁহার অন্তরে কোথায় যেন একটা আনন্দের উৎস নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছিল, তাঁহার বয়স ও প্রকৃতি-সিদ্ধ গাম্ভীর্য্যকে সেই স্রোতে মাঝে মাঝে যেন ভাসাইয়া দিতে চায়। সতীর সঙ্গে আভাসে-ইঙ্গিতে প্রায়ই কি কথা হয় তাহার অর্থ শুধু শাশুড়ী-বধূই বুঝে, আরও একজন

হয়ত কিছু-একটা অনুমান করে সে অন্নদা। সস্ত্রীক পঞ্জাবের ব্যারিষ্টার সাহেব এতদিন থাকিয়া কাল বাড়ী গেছেন, তাঁহাদের উভয়ের নামই বসন্ত, এই লইয়া দয়াময়ী যাবার সময়ে কৌতুক করিয়াছিলেন এবং প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছেন যে কর্ম্মস্থলে ফিরিবার পূর্ব্বে আবার দেখা দিয়া যাইতে হইবে। হয় কলিকাতায়, নয় বলরামপুরে। রায় সাহেবের পা ভালো হইয়াছে, আগামী সপ্তাহে তিনি বোম্বাই যাত্রা করিবেন, দয়াময়ী নিজে দরবার করিয়া বন্দনার কিছুদিনের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন, সে যে বোম্বাইয়ের পরিবর্ত্তে বলরামপুরে গিয়া অন্ততঃ আরও একটা মাস দিদির কাছে অবস্থান করিবে এ ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে।

মুখুয্যেদের মামলা-মকদ্দমা হাইকোর্টে লাগিয়াই থাকে, একটা বড়রকম মামলার তারিখ নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, তাই বিপ্রদাস স্থির করিল আর বাড়ী না গিয়া এই দিনটা পার করিয়া দিয়া সকলকে লইয়া দেশে ফিরিবে। নানা কাজে তাহাকে সর্ব্বদাই বাহিরে থাকিতে হয়, আজ ছিল রবিবার, দয়াময়ী আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, একটা মজার কথা শুনেচিস বিপিন?

বিপ্রদাস আদালতের কাগজ দেখিতেছিল, চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কি কথা মা?

দয়াময়ী বলিলেন, দ্বিজুদের কি-একটা হাঙ্গামার মিটিং ছিল আজ, পুলিশে হতে দেবেনা আর ওরা করবেই। লাঠা-লাঠি মাথা ফাটা-ফাটি হতোই, শুনে ভয়ে মরি—

—সে গেছে নাকি?

—না। সেই কথাই তো তোকে বলতে এলুম। কারও মানা শুনবেনা, এমনকি ওর বৌদিদির কথা পর্য্যন্তও না,—শেষে শুনতে হলো বন্দনার কথা।

খবরটা যত মজারই হোক মায়ের সুপরিচিত মর্য্যাদায় কোথায় যেন একটু ঘা দিল। বিপ্রদাস মনে মনে বিস্মিত হইল কিন্তু মুখে শুধু বলিল, সত্যি না কি?

দয়াময়ী হাসিয়া জবাব দিলেন, তাইতো হলো দেখলুম। কবে নাকি ওদের সর্ত্ত হয়েছিল এখানে একজন জুতো পরবে না, চাল-চলনে এ-বাড়ীর নিয়ম লঙ্ঘন করবে না আর তার বদলে অন্যজনকে তার অনুরোধ মেনে চলতে হবে। বন্দনা ওর ঘরে ঢুকে শুধু বললে. দ্বিজুবাবু সর্ত্ত মনে আছে ত? আপনি কিছুতে আজ যেতে পাবেন না। দ্বিজু স্বীকার করে বললে, বেশ তাই হবে, যাবোনা। শুনে আমার একটা ভাবনা ঘুচলো বিপিন। কি করে আসবে, কি ফ্যাসাদ বাধবে,—কর্ত্তা বেঁচে নেই,—কি ভয়ে-ভয়েই যে ওকে নিয়ে থাকি তা' বলতে পারিনে।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। মা বলিতে লাগিলেন, আগে তবু ওর ইস্কুল-কলেজ, পড়া-শুনা, একজামিন পাশ করা ছিল, এখন সে বালাই ঘুচেছে, হাতে কাজ না থাকলে বাইরের কোন্ ঝঞ্ঝাট যে কখন ঘরে টেনে আনবে তা কেউ বলতে পারে না। ভাবি, শেষ পর্য্যন্ত এত বড় বংশের ও একটা কলঙ্ক হয়ে না দাঁড়ায়।

বিপ্রদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কহিল, না মা, সে ভয় কোরো না, দ্বিজু কলঙ্কের কাজ কখনো করবে না।

মা বলিলেন, ধরো যদি হঠাৎ একটা জেল হয়েই যায়? সে আশঙ্কা কি নেই?

বিপ্রদাস কহিল, আশঙ্কা আছে মানি, কিন্তু জেলের মধ্যে ত কলঙ্ক নেই মা, কলঙ্ক আছে কাজের মধ্যে। তেমন কাজ সে কোনদিন করবে না। ধরো যদি আমারি কখনো জেল হয়,—হতেও তো পারে—তখন কি আমার জন্যে তুমি লজ্জা পাবে মা? বলবে কি বিপিন আমার বংশের কলঙ্ক?

কথাটা দয়াময়ীকে শূল-বিদ্ধ করিল। কি জানি কোন নিহিত ইঙ্গিত নাই ত? এই ছেলেটিকে বুকে করিয়া এতবড় করিয়াছেন, বেশ জানিতেন সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য বিপ্রদাস পারে না এমন কাজ নাই। কোন বিপদ কোন ফলাফলই সে গ্রাহ্য করে না অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে। যখন তাহার মাত্র আঠারো বৎসর বয়স তখন একটি মুসলমান পরিবারের পক্ষ লইয়া সে একাকী এমন কাণ্ড করিয়াছিল যে কি করিয়া প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিল তাহা আজও দয়াময়ীর সমস্যার ব্যাপার। বন্দনার মুখে সেদিনকার ট্রেনের ঘটনা শুনিয়া তিনি শঙ্কায় একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিজুর জন্য তাঁহার উদ্বেগ আছে সত্য কিন্তু অন্তরে ঢের বেশি ভয় আছে তাঁহার এই বড় ছেলেটির জন্য। মনে মনে ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিন, বিপ্রদাস কহিল, কেমন মা, কলঙ্কের দুর্ভাবনা গেল ত? জেল হঠাৎ একদিন আমারও হয়ে যেতে পারে যে।

দয়াময়ী অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, বালাই,—ষাট! ও-সব অলক্ষুণে কথা তুই বলিসনে বাবা। তারপরেই কহিলেন, জেল হবে তোর আমি বেঁচে থাকতে? এতদিন ঠাকুর-দেবতাকে ডেকেচি তবে কেন? এত সম্পত্তি রয়েছে কিসের জন্যে? তার আগে সর্ব্বস্ব বেচে ফেলবো তবু এ ঘট্‌তে দেবোনা বিপিন।

বিপ্রদাস হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল, দয়াময়ী সহসা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, দ্বিজুর যা' হয় তা' হোক্‌গে, কিন্তু তুই আমার চোখের আড়াল হলে আমি গঙ্গায় ডুবে মরবো বিপিন। এ সইতে আমি পারবো না, তা জেনে রাখিস। বলিতে বলিতে কয়েক ফোঁটা জল তাঁহার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

মা, এ বেলা কি—বলিতে বলিতে বন্দনা ঘরে ঢুকিল। দয়াময়ী তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন, বন্দনার বিস্মিত মুখের প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, ছেলেটাকে অনেক দিন বুকে করিনি তাই একটু সাধ হলো নিতে।

বন্দনা কহিল, বুড়ো ছেলে, আমি কিন্তু সকলকে বলে দেবো।

দয়াময়ী প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, তা' দিও কিন্তু বুড়ো কথাটি মুখে এনো না মা। এই ত সেদিনের কথা, বিয়ের কনে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছি, আমার পিস-শাশুড়ী তখনো বেঁচে, বিপিনকে আমার

কোলে ফেলে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার বড় ছেলে বউমা। কাজ-কর্ম্মের ভিড়ে অনেকক্ষণ কিছু খেতে পায় নি,—আগে খাইয়ে ওকে ঘুম পাড়াও গে তারপরে হবে অন্য কাজ। তিনি বোধহয় দেখতে চাইলেন আমি পারি কি না—কি জানি পেরেচি কি না! এই বলিয়া তিনি আবার হাসিলেন।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তখন কি করলেন মা?

দয়াময়ী বলিলেন, ঘোমটার ভেতর থেকে চেয়ে দেখি একতাল সোনা দিয়ে গড়া জ্যান্ত পুতুল, বড়-বড় চোখ মেলে আশ্চর্য্য হয়ে আমার পানে তাকিয়ে আছে। বুকে করে নিয়ে দিলুম ছুট। আচার-অনুষ্ঠান তখনো অনেক বাকি সবাই হৈ-চৈ করে উঠ্‌লো আমি কিন্তু কান দিলুম না। কোথায় ঘর, কোথায় দোর চিনিনে,—যে-দাসীটি সঙ্গে দৌড়ে এসেছিল সে ঘর দেখিয়ে দিলে, তাকেই বললুম, আনোত ঝি আমার খোকার দুধের বাটি, ওকে না খাইয়ে আমি এক পা নড়বো না। সেদিন পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েরা কেউ বল্‌লে বেহায়া, কেউ বল্‌লে আরো কত-কি, আমি কিন্তু গ্রাহ্যই করলুম না। মনে মনে বললুম বলুক্‌গে ওরা। যে রত্ন কোলে পেলুম তাকে ত আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না! আমার সেই ছেলেকে তুমি বলো কিনা বুড়ো!

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা স্মরণ করিতে অশ্রুজলে ও হাসিতে মিশিয়া মুখখানি তাঁহার বন্দনার চোখে অপূর্ব্ব হইয়া দেখা দিল, অকৃত্রিম স্নেহের সুগভীর তাৎপর্য্য এমন করিয়া উপলব্ধি করার সৌভাগ্য তাহার আর কখনো ঘটে নাই। অভিভূত চক্ষে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সে আপনাকে সামলাইয়া লইল, হাসিয়া বলিল, মা, আপনার দুটি ছেলের কোনটিকে বেশি ভালবাসেন সত্যি করে বলুন ত?

শুনিয়া দয়াময়ীও হাসিলেন, বলিলেন, অসম্ভব সত্যি হলেও বলতে নেই মা শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

বন্দনা বাহিরের লোক, সবে মাত্র পরিচয় হইয়াছে, ইহার সম্মুখে এই সকল পূর্ব্ব কথার আলোচনায় বিপ্রদাস অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, কহিল, বললেও তুমি বুঝবে না বন্দনা, তোমার কলেজের ইংরিজি পুঁথির মধ্যে এ সব তত্ত্ব নেই। তার সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করতে গিয়ে মায়ের কথা তোমার ভারি অদ্ভুত ঠেকবে। এ আলোচনা থাক্‌।

শুনিয়া বন্দনা খুসি হইল না, কহিল, ইংরিজি-পুঁথি আপনিও ত কম পড়েন নি মুখুয্যে মশাই, আপনিই বা তবে বোঝেন কি করে?

বিপ্রদাস বলিল, কে বললে মাকে আমরা বুঝি বন্দনা,—বুঝিনে। এসব তত্ত্ব শুধু আমার এই মায়ের পুঁথিতেই লেখা আছে,—তার ভাষা আলাদা, অক্ষর আলাদা ব্যাকরণ আলাদা। সে কেবল উনি নিজেই বোঝেন—আর কেউ না। হাঁ মা, যা বলতে এসেছিলে সে তো এখনো বললে না?

বন্দনা বুঝিল এ ইঙ্গিত তাহাকে। কহিল, মা এ-বেলার রান্নার কথা আপনাকে জিজ্ঞেসা করতে এসেছিলুম—আমি যাই, কিন্তু আপনিও একটু শীঘ্র করে আসুন। সব ভুলে গিয়ে আবার যেন ছেলে কোলে করে বসে থাকবেন না। এই বলিয়া বিপ্রদাসকে সে একটু কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে দয়াময়ীর মুখের পরে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধার কণ্ঠে কহিলেন, বিপিন, তুইত খুব ধার্ম্মিক, জানিস্ত বাবা মাকে কখনো ঠকাতে নেই—

বিপ্রদাস বলিল, দোহাই মা অমন কোরে তুমি ভূমিকা কোরোনা। কি জিজ্ঞেসা করবে করো।

দয়াময়ী কহিলেন, তুই হঠাৎ আজ ও-কথা বল্লি কেন যে তোরও জেল হতে পারে? কৈলাসে যাবার সঙ্কল্প এখনো ত্যাগ করিনি বটে কিন্তু আরত আমি এক পাও নড়তে পারবো না বিপিন।

বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কৈলাসে পাঠাতে আমিও ব্যস্ত নই মা, কিন্তু সে দোষ আমার ঘাড়ে শেষকালে যেন চাপিওনা। ওটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত,—দ্বিজুর কথায় তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলুম যে কেবল জেলে যাবার জন্যেই কারও বংশে কলঙ্ক পড়েনা।

দয়াময়ী মাথা নাড়িলেন, ওতে আমি ভুলবোনা বিপিন। এলো-মেলো কথা বলার লোক তুই নয়,—হয়, কি করেছিস, নয় কি-একটা করবার মতলবে আছিস্। আমাকে সত্যি করে বল্।

বিপ্রদাস কহিল, তোমাকে সত্যি করেই বলচি আমি কিছুই করিনি। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কত রকমের মৎলব আনাগোনা করে তার কি কোন সঠিক নির্দ্দেশ দেওয়া চলে মা?

দয়াময়ী পূর্ব্বের মতো মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না তাও না। নইলে তোকে দেখলেই কেন আজকাল আমার এমন মন-কেমন করে? তোকে মানুষ করেচি, আমি বেঁচে থাকতেই শেষকালে এতবড় নেমকহারামি করবি বাবা? বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চোখ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বিপ্রদাস বিপন্ন হইয়া বলিল, অমঙ্গল কল্পনা করে যদি তুমি মিথ্যে ভয় পাও মা, আমি তার কি প্রতীকার করতে পারি বলো? তুমি ত জানো তোমার অমতে কখনো একটা কাজও আমি করিনে।

দয়াময়ী কহিলেন, করোনা সত্যি, কিন্তু কাল দ্বিজুকে ডেকে পাঠিয়ে কেন বলেচো কাজ কর্ম্ম সমস্ত বুঝে নিতে?

—বড় হলো আমাকে সাহায্য করবেনা মা?

দয়াময়ী রাগ করিয়া বলিলেন, ওর কতটুকু শক্তি? আমাকে ভোলাস্‌নে বিপিন,—তুই আজ এত ক্লান্ত যে তোর প্রয়োজন হলো ওর সাহায্য নেবার? কি তোর মনে আছে আমাকে খুলে বল্?

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল, এ কথা বলিলনা যে তিনি নিজেই এইমাত্র দ্বিজদাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে তাহাকে বলিতেছিলেন। কিন্তু ইহারই আভাস পাওয়া গেল দয়াময়ীর পরবর্ত্তী কথায়। বলিতে লাগিলেন, আমাদের এ পুণ্যের সংসার, ধর্ম্মের পরিবার, এখানে অনাচার সয়না। আমাদের বাড়ী নিয়মের কড়াকড়িতে বাঁধা। তোর বিয়ে দিয়েছিলুম আমি সতেরো বছর বয়সে,—সে তোর মত নিয়ে নয়,—আমাদের সাধ হয়েছিল বলে। কিন্তু দ্বিজু বলে সে বিয়ে করবে না। ও এম-এ পাশ করেছে, ওর ভালো-মন্দ বোঝবার শক্তি হয়েছে, ওর ওপর কারো জোর খাটবে না। সে যদি সংসারী না হয় তাকে আমার বিশ্বাস নেই,—আমার শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তিতে সে যেন হাত দিতে না আসে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজু কবে বললে সে বিয়ে করবেনা?

—প্রায়ই ত বলে। বলে বিয়ে করবার লোক অনেক আছে তারা করুক। ও করবে শুধু দেশের কাজ। তোরা ভাবিস্ এখানে এসে পর্য্যন্ত আমি দিনরাত ঘুরে বেড়াই,—খুব মনের সুখে আছি। কিন্তু সুখে আমি নেই। এর ওপর তুই দিলি আজ জেলের দৃষ্টান্ত—যেন আমাকে বোঝাবার আর কোন দৃষ্টান্তই তোর হাতে ছিলনা। একদিন কিন্তু টের পাবি বিপিন।

বিপ্রদাস কহিল, ওর বৌদিদিকে হুকুম করতে বলোনা মা?

—তার কথাও সে শুনবেনা।

—শুনবে মা শুনবে। সময় হলেই শুনবে। একটু হাসিয়া কহিল, আর যদি আমাকে আদেশ করোত তার পাত্রীর সন্ধান করতে পারি। বন্দনা আসিয়া ঘরে ঢুকিল, অনুযোগের সুরে কহিল, কৈ এলেননা ত? আমি কতক্ষণ ধরে বসে আছি মা।

—চলো মা যাচ্চি।

বিপ্রদাস কহিল, আমাদের অক্ষয়বাবুর সেই মেয়েটিকে তোমার মনে আছে মা? এখন সে বড় হয়েছে। মেয়েটি যেমন রূপে তেমনি গুণে। আমাদেরই স্ব-ঘর, বলোত গিয়ে দেখে আসি, কথাবার্ত্তা বলি। আমার বিশ্বাস দ্বিজুর অপছন্দ হবেনা।

নানা, সে এখন থাক্, বলিয়া দয়াময়ী পলকের জন্য একবার বন্দনার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, সতীর ইচ্ছে,—না,—না বিপিন, বউমাকে জিজ্ঞেসা না করে সে সব কিছু করে কাজ নেই।

বন্দনা কথা কহিল। সুন্দর, শান্ত চোখে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তাতে দোষ কি মা? এইত কলকাতায়, চলুননা দিদিকে নিয়ে আমরা গিয়ে দেখে আসিগে।

শুনিয়া দয়াময়ী বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কি যে জবাব দিবেন ভাবিয়া পাইলেননা।

বিপ্রদাস কহিল, এ উত্তম প্রস্তাব মা। অক্ষয়বাবু স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতের অধ্যাপক। মেয়েকে ইস্কুল-কলেজ থেকে পাশ করাননি বটে কিন্তু যত্ন করে শিখিয়েছেন অনেক। একদিন তাঁদের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল সেদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞেসা করেছিলুম আমি অনেক কথা। মনে হয়েছিল বাপ সাধ করে মেয়ের নামটি যে রেখেছিলেন মৈত্রেয়ী তা অসার্থক হয়নি। যাওনা মা, গিয়ে একবার তাকে দেখে আসবে—তোমার বড়-বৌ অন্তত: মনে মনে স্বীকার করবেন তিনি ছাড়াও সংসারে রূপসী মেয়ে আছে।

মা হাসিতে চাহিলেন কিন্তু হাসি আসিলনা, মুখে কথাও যোগাইলনা,—বন্দনা পুনশ্চ অনুরোধ করিল, চলুননা মা, আমরা গিয়ে একবার মৈত্রেয়ীকে দেখে আসিগে? বেশি দূর ত নয়।

দয়াময়ী চাহিয়া দেখিলেন বন্দনার মুখের পরে এখন সে লাবণ্য আর নাই—যেন ছায়ায় ঢাকা দিয়াছে। এইবার, এতক্ষণে তিনি জবাব খুঁজিয়া পাইলেন, কহিলেন, না মা, দূর বেশি নয় জানি, কিন্তু, সে সময়ও আমার নেই। চলো আমরা যাই, এ-বেলায় কি রান্না হবে দেখিগে। এই বলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

নমস্কার

(মহাত্মা গান্ধীর প্রতি)

শ্রীরসময় দাশ

ধর্ম্ম-স্থাপন, দুষ্ট-দমন, সাধুর মুক্তি করিতে ভবে,
যে দেশের বুকে নিজে ভগবান্ যুগে যুগে আসি' জনম লভে ;
সে দেশে যখন ধর্ম্মের নামে দম্ভে মিথ্যা তুলিছে শির,
নির্য্যাতনের পদতলে লুটি' নিঃস্ব ঢালিছে নয়ন-নীর,
স্বার্থ-পিশাচ, শক্তি-অন্ধ অক্ষমে সদা মারিছে পিশি'
নিঃসহায়ের তপ্ত নিশাস শূন্য গগনে যেতেছে মিশি',
জাতির গর্ব্ব হীন পতিতেরে নিত্য করিছে অসম্মান,
ধনের পিপাসা দীনের রক্ত নিঃশেষে শুষি' করিছে পান ;
সে দেশের কোলে এ সময়ে তব সম্ভব তাহা বেশী কী আর ?
যুগ-অবতার ! আমরা তোমার চরণে করিছি নমস্কার !

একদা যে দেশে ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল অমর বাণী :
"শুন, অমৃতের পুত্র, আমরা মহান্ পুরুষে নিয়েছি জানি'।
যে দেশে একদা বোধিতরুতলে মন্ত্র উঠিয়া অহিংসার,
অর্দ্ধ এশিয়া হইতে মুছিয়া ফেলিল অপূত রক্ত ধার।
মূক পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ যে দেশে কখনো তুচ্ছ নয়,
হে ঋষি ! তোমার উদয় কেবল সে দেশেরি কোলে সম্ভবয় !

আজি যবে সারা বিশ্ব ভরিয়া জ্বলিয়া উঠেছে হিংসানল,
সুসভ্যতার মুখোস্ পরিয়া শক্তি প্রকাশে পাশব বল।
সহসা তোমার শান্তির বাণী বিস্ময়ে শুনে বিশ্ব-লোক,—
আত্মার বলে পশুবল জয় ! একি আনন্দ ! একি আলোক !

যে দেশে হেলায় রাজার দুলাল তুচ্ছ করিয়া বিত্ত রাশি,
মহাসুখ মানি ছিন্ন কন্থা স্কন্ধে তুলিয়া নিয়েছে হাসি',
সে দেশেই তব জন্ম, সে দেশ ধন্য তোমারে বক্ষে ধরি' ;
সর্ব্ব তেয়াগী সন্ন্যাসী, মোরা আজিকে তোমারে প্রণাম করি

যে দেশে জনমি নিজে ভগবান্ রাখালের সাথে করেছে খেলা,
নরের রথের রশ্মি ধরিতে করে নাই ঘৃণা, করেনি হেলা।
সে দেশেরি শ্যাম মাটির বক্ষে জন্ম তোমার যুগ মানব !
পথের ধূলিতে পতিতের সাথে তাইত তোমার মহোৎসব।

তুমি রহ নাই একাকী কখনো বসি' মহত্ত্ব সিংহাসনে,
এসেছো নামিয়া মাটির ধরায় মিলিয়া গিয়াছ সবার সনে !
তব দ্বার হতে দীন দরিদ্র আসেনি ফিরিয়া প্রহরী ভয়ে ;
রাখালের রাজা ! হাতে ধরি' মোরা করিয়াছি খেলা তোমারে লয়ে।
রাজপথে তুমি চলনি কখনো রাজার জমকে নয়ন ধাঁধি',
তুমি মিলিয়াছ সকলের সাথে বক্ষে সবারে নিয়েছো বাঁধি'।
দেবতা জানিয়া দূরে থাকি মোরা করিনি প্রণাম তোমার পায়,
তোমার লাগিয়া পূজার অর্ঘ্য সাজায়ে কখনো রাখিনি হায় !
বন্ধু জানিয়া ভালবাসি তোমা, আত্মীয় তুমি জানি সবার,
দীনের বন্ধু, হীনের বন্ধু, লহ আমাদের নমস্কার !

শ্রীরসময় দাশ

শিল্প কথা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ার প্রতিভা জীবনের সৃষ্টিতে। যে বস্তু তিনি গরেছেন তা, জীবন্ত হয়েছে কি? তাঁর রং রেখা, তাঁর ধ্বনি, তাঁর বাক্য এমন মূর্ত্তি পেয়েছে কি, মনে হয় যার অঙ্গে ছুরি চালালে টস্ টস্ করে রক্ত ঝরবে? মনে হয় কি, তিনি যে জিনিষ দিয়েছেন তা গড়া বা তৈরী করা কিছু নয়, তা যেন ভগবানেরই সৃষ্টি, বিশ্ব প্রকৃতির অঙ্গ—শিল্পী নিমিত্ত মাত্র হয়ে তাকে প্রকাশ করে ধরেছেন: যা ছিল যবনিকার অন্তরালে শিল্পী তাকে কেবল আবরণখানি সরিয়ে সকলের সম্মুখে ব্যক্ত করেছেন। তবে এই যে জীবন তার নানা ধারা হতে পারে—অন্তরের বাহিরের, স্থূলের সূক্ষ্মের, উপরের নীচের, দেহের প্রাণের মনের অধ্যাত্মের—দেবতার দানবের পিশাচের পশুর; তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। শিল্পী তাঁর রঙ্গমঞ্চকে যথাতথা স্থাপন করতে পারেন, তাঁর উপকরণ যেথা সেথা হতে আহরণ করতে পারেন—এদিক দিয়ে তিনি নিরঙ্কুশ। প্রশ্ন হল তার মধ্যে তিনি প্রাণ সঞ্চার করতে পেরেছেন কি না, তাঁর হাত সেই জীয়ন কাঠি কি না যার স্পর্শে সব কিছু বেঁচে ওঠে; জেগে ওঠে—মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তি। তা যদি হয়, তবেই শিল্পীর শিল্প সার্থক। শ্লীল বা অশ্লীল, আধ্যাত্মিক বা লৌকিক, তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক—সকলেরই মধ্যে জীবন সমান ভাবে জীবন্ত হয়ে ফুটতে পারে।

উপনিষদের

তমেব অন্তমনুভাতি সর্ব্বং

কিম্বা কালিদাসের

বসুধালিঙ্গন ধূসর স্তনী;

ছুটি ছুই লোকের কথা কিন্তু উভয়েই সমান জীবন্ত প্রাণবন্ত।

দান্তে যখন তত্ত্বকথা বলেছেন—

In la sua volonta e nostra pace (১)

কিম্বা নেকড়েবাঘের চেহারা এঁকে দেখাচ্ছেন—

di tutte brame

Sembiava cerca nella sua magrezza (২)

উভয়ত্রই অনুভব করি দান্তের নিজস্ব প্রাণসার।

জীবন অর্থ যে কেবল বাস্তব জীবন, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জীবন হতে হবে, এমন প্রয়োজন নাই। শিল্পী তাঁর চেতনার তাঁর প্রাণের সঞ্জীবনী শক্তি দিয়ে যে জিনিষ যতখানি সচেতন সজীব করে ধরেছেন, তাই তত সত্য তত বাস্তব—স্থূল ভৌতিক সত্যের বা বাস্তবের সাথে তার সম্বন্ধ, সংযোগ কি সাদৃশ্য কিছু নাই থাকুক। শিল্পীর মায়াবী শক্তিই হল সৃষ্টি শক্তি। এই বিশ্বজীবনকেও ত বলা হয় অদ্বিতীয় সৎপুরুষের মায়াশক্তির লীলা—যে শক্তির কল্যাণে অসত্য সত্য বলে প্রতিভাত এবং যাকে বলা হয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। শিল্পী তাঁর অন্তর থেকে, বাহির থেকে, এলোক থেকে ওলোক থেকে তাঁর জগৎটি নিয়ে আসতে পারেন—যে তাঁর মায়াবী শক্তির মর্জ্জি তাই ত কবি বলেছেন—

"কি এসে যায় তুমি কোথা হ'তে এসেছ, হে সুন্দর! স্বর্গ হতে কি নরক হতে"…*

জিজ্ঞাস্য শুধু, এজগৎ বাস্তবিক একটা জগৎ হয়েছে কিনা; একটা জগতেরই নিবিড় অভ্রান্ত উপলব্ধি দেয় কিনা— নিজের সত্যে তা জাগ্রত স্পন্দিত কি না।

(১) তাঁরই ইচ্ছায় আমাদের শান্তি।

(২) তার শীর্ণতায় পুঞ্জীভূত যেন বিশ্বের বুভুক্ষা।

* "Que tu viennes du ciel ou de l'enfer qu'importe, O Beaute" !—Baudelaire.

অন্য দিকে জীবনের কথা হলেই যে তা জী· হয়ে উঠবে এমন নয়। প্রত্যক্ষের বাস্তবের কর্ম্ম আয়তনের সকল দাপট মাপসাট থাকলেও তা নির্জীব প্রাণহীন হয়ে পড়তে পারে—যেমন ভলতেয়ার-এর "হেনরিয়াদ" (Henriade) গান্ধার শিল্পের বস্তুতান্ত্রিক জীবন-রূপায়ণ দেখিয়েছে কেবল আড়ষ্টতা—নটরাজের অ-লৌকিকতায় কিন্তু সকল জীবন যেন স্পন্দিত নন্দিত। তাই আমার বোধ হয়, আধুনিকের অতিবাস্তবতার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীনের রূপ কথা বেশি বাস্তব। শেক্সপীয়রের পরী, দান্তের এঞ্জেল সয়তান, কালিদাসের গন্ধর্ব্বকিন্নর বাল্মীকির যক্ষঃরক্ষ জাগ্রত জীবন্ত শক্তির প্রতিমূর্ত্তি সব।

পূর্ণ সত্য বা গভীরতম উচ্চতম সত্যকে দেখাতে শিল্পী বাধ্য নন। জ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে অনেক সময়ে মনে হতে পারে শিল্পীর সত্য সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শী—তা অজ্ঞানের অর্দ্ধজ্ঞানের বা বিকৃত জ্ঞানের প্রায় পাশাপাশি হয়ে চলেছে। কিন্তু তাতেও স্রষ্টা হিসাবে শিল্পীর ক্ষতি কিছু হয় না। সত্যের পূর্ণতা - উদারতা, গভীরতা উচ্চতা—নয়; শিল্পী দিতেছেন সত্যের প্রাণবত্তা। অবশ্য বলা যেতে পারে সত্য যেখানে পূর্ণতম, জীবনও সেখানেই সব চেয়ে সজীব। হতে পারে—কিন্তু তেমন জ্ঞানের কথা বললেই যে তা জীবন্ত হবে, তা নয়; তার অপেক্ষা অনেক ছোট সত্যও তার চেয়ে স্থানে স্থানে অনেক বেশি জীবন্ত হতে পারে—এরই নাম শিল্পীর হাতের গুণ।

প্রথমে হল জীবন। সজীবতা শিল্পের আদি লক্ষণ। কারণ শিল্পী হলেন স্রষ্টা। কিন্তু স্রষ্টা অর্থ রূপস্রষ্টা; তাই রূপ—সৌন্দর্য্য হল শিল্পের দ্বিতীয় গুণ। এই জন্যই শিল্পীকে বলা হয় রূপকার। শিল্পীর সৃষ্টি হবে সজীব, আকার হবে রূপবান। তবে জীবনের যেমন নানা ধারা, রূপেরও তেমনি নানা ছাঁচ। রূপ অর্থ অঙ্গ-সৌষ্ঠব হতে পারে—অঙ্গের গড়নে সমাবেশ একটা অনুপাত সাম্য; একে বলা যায় চারুতা শোভনতা। আর হতে পারে—অঙ্গের ভঙ্গীতে একটা ভাবগত দ্যোতনা-গত সুষমা—একে বলা যেতে পারে শ্রী, লাবণ্য। এক হল অঙ্গের আকারগত আর এক হ'ল প্রকারগত সৌন্দর্য্য। এক সীমায় গ্রীকদের সুঠাম সুষীম পরিমিতি, অন্য সীমায় আধুনিকের নিরঙ্কুশ উদ্দাম মুক্তগতি।

একদিকে প্রাক্‌সিতেলা (Praxiteles), আর একদিকে রোদিন (Rodin)। একদিকে সংযত ', সুসঙ্গত মার্জ্জিত মসৃণ দেহবন্ধ—যেমন মিলতনের

And where the River of Bliss through midst of Heaven
Rolls o'er Elysian flowers her amber stream

কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের

Ethereal ministrel! Pilgrim of the sky!

অন্যদিকে বাঁধন ছাদন হারা উন্মার্গ উচ্ছলতা যেমন হপকিন্‌সের (Hopkins)—

The flower of beauty. fleece of beauty, too,
too apt to, ah! to fleet,
Never fleets more, fastened with the tenderest truth
To its own best being and its loveliness of youth.

কিম্বা আরও আধুনিকের ইচ্ছাকৃত বিষমতা, রুক্ষ কর্কশতা, যেমন বট্রাল (Ronald Bottral)—

Is it worth while to make lips smile again,
To transmit that uneasiness in us which craves
A moment's monthing......

এক দিকে রবীন্দ্রনাথের -

অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মত

কি

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে—

আর অন্যদিকে, ধরুন বুদ্ধদেব বসুর

সুন্দর না হ'লে যদি জীবনের পাত্র হতে কোন ক্ষতি,
ক্ষয় নাহি হয় সুন্দর হবার গূঢ় দুরূহ সাধনা—
ক্লেশকর তপশ্চর্য্যা
কে আর করিতে যায় তবে?

কিম্বা চরমে যদি পৌঁছিতে চান, তবে প্রণব রায়ের মদের সঙ্গে নারী মাংস ও ঠুন্‌কো ভাড়াটে প্রেম যেখানে বিক্রী হয়

দরদাম করে টাকা দিয়ে কিনে তা—ই !

ফলত এক হিসাবে মোটের উপর বলা চলে যে আধুনিক শিল্পী সুরূপের কথা ভাবেন না—শিল্পের এ দিকটা অনেকে একেবারেই ছেঁটে দিতে চেয়েছেন। জীবন, জীবনের প্রকাশ, জীবনের সু-প্রকাশ—সুন্দর প্রকাশ নয়, সম্যক প্রকাশ—এই হ'ল শিল্পের আদি মধ্য শেষ। তবে জীবন বলতে আধুনিকেরা বুঝেন জীবনের এক খণ্ড অংশ, এক বিশেষ ধারা, বিশেষ ভঙ্গী। আগে জীবন ছিল একটা বৃহত্তর পূর্ণতর গভীরতর স্রোত—শুদ্ধতর না হলেও, কর্ম্মের ভোগের আবেগের—ভাল মন্দ নিয়ে, ষড়বিন্দু বা ষড়ৈশ্বর্য্য নিয়ে—একটা ভরাট সমর্থ লীলা। জীবন অর্থ তখন ছিল প্রাণশক্তিরই স্বরূপের প্রকাশ। বর্ত্তমান যুগে জীবন অনেকখানি সঙ্কীর্ণ ও অগভীর হয়ে এসেছে। আগে জীবন ছিল মনের কাছাকাছি জিনিষ, মনোময় পুরুষের দ্বারা প্রভাবান্বিত; এমন জীবন যতদূর সম্ভব দেহের সীমানায় টেনে আনা হয়েছে—জীবন হয়েছে অন্নময় পুরুষের একান্ত দাস। জীবন হ'ল রক্তে কোষে, শিরায় স্নায়ুতে, স্থূল ইন্দ্রিয়ে মগজে অণুর বা শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। জীবনের যে প্রাথমিক বা—আদিম অবস্থা—জড় যেখানে সবে প্রাণে পরিণত হয়ে চলেছে—সেই প্রত্যন্ত লোকের রহস্য আজকালকার চেতনাকে মুগ্ধ এবং মুহ্য করেছে।

অবশ্য এই সাফাই এখানে দেওয়া যেতে পারে যে সুরূপ বা কুরূপ নয়, শিল্পের কথা হ'ল রূপ বা স্বরূপ। জিনিষকে যথাযথ ব্যক্ত করা, প্রকাশ করে ধরা—এই হ'ল সমস্ত কারিগরী। সন্দেহ নাই। তবে পক্ষান্তরে আবার বলা যেতে পারে রূপ—শিল্পগত রূপ অর্থই সুরূপ—স্বরূপ আর সুরূপ অভিন্ন বস্তু। সুরূপ ছাড়া স্বরূপ হয় না।

একথা সত্য, রূপ—কি হ'লে সুরূপ হয় আর কি হ'লে হয় না, তার সীমানা নির্দ্দেশ সহজ নয়। গ্রীক আদর্শের সুরূপ আমাদের চেতনাকে এত খানি অভিভূত করে রেখেছে যে অন্য রকমের সুরূপ কল্পনা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু গ্রীকের সুরূপ আছে বলে ভারতীয় রূপে যে সুরূপের অভাব হয়েছে তা নয়। গ্রীকের রূপবন্ধে প্রধানত দেখি অঙ্গের ঢালাই—প্রত্যেক অঙ্গ সব দিক দিয়ে যাতে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে, দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ তিনটি মাত্রাই যাতে সমান মর্য্যাদা পায়, সর্ব্বত্র দেখা দেয় একটা পরিমিতি, অনুপাত, ক্রম, একটা মসৃণতা। ভারতীয় শিল্পী ঢালাই বা বলনকে প্রধান করেন নাই—তাঁর কাছে প্রধান হল চলন—বলনকে চলনের সহায়েই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। চলন অর্থ গতি ও স্থিতি দুইই। তাই বেধ—ইউরোপীয় শিল্পে যাকে বলা হয় perspective (পরিপ্রেক্ষা)—ভারতীয় শিল্পী তা বাদ দিয়ে রেখেছেন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এই দুটি মাত্রার উপর তিনি নির্ভর করেছেন—অঙ্গের পরিপূর্ণতা, পরিপুষ্টতা—সুডৌল দেখাবার জন্যও গ্রীকের মত বেধকে একান্ত প্রয়োজন মনে করেন নাই। পটের সমতল ক্ষেত্রকে সমতল হিসাবেই গ্রহণ করেছেন—তাকে প্রকৃতির অনুযায়ী অসমতল করে দেখাবার ছলা কলা তিনি আয়ত্ত করেন নাই। গ্রীক বা গ্রীক প্রভাবান্বিত চিত্রে তাই পাই ভাস্কর্য্যের রীতি। আর ভারতীয় ভাস্কর্য্যেরও মধ্যে পাই চিত্রের—পদ্ধতি। কিন্তু এখানে একটি রহস্যের কথা এই যে উভয়েরই মধ্যে রয়ে গেছে আবার—একটা প্রতিপূরক ধারা—গ্রীকের—কাব্যে বলনের সাথে সাথে, বলনকে ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে চলনের সুরূপ, ভারতের কাব্যে রূপ পেয়েছে ভাস্কর্য্যের বলন, নিটোল, আপূর্ণ আকার।

গ্রীকের রূপ, ভারতের রূপ ছাড়া রূপের আরও প্রকার ভেদ থাকতে পারে—এবং সে সব যে সুরূপ না হয়ে কুরূপ বা অ-রূপ হবে এমনও নয়।

কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারের গভীর জলে আর আমরা যাব না। সুরূপের সীমানা মরুমরীচিকার মত যতই সরে সরে দূরে চলে যাক না—তবুও সাধারণ বোধে আমরা অনুভব করি না কি রূপের ও রূপের অভাবের মধ্যে আছে কোথাও একটা রেখা? জীবনের সম্যক প্রকাশ মাত্রই সুরূপ নয়।

আধুনিকেরা এই রেখা হয়ত অস্বীকার করেছেন—কিন্তু স্বীকার করলেও তাঁদের মর্য্যাদাহানির কোন ভয় নাই। আমরা শিল্প সৃষ্টির যে প্রথম গুণটির কথা বলেছি তার

জোরেই অনেক শিল্পী অমর হয়ে আছেন। শেক্সপীয়রকে সুরূপের শিল্পী বল্‌তে অনেকেই ইতস্ততঃ করতে পারেন—কিন্তু তাঁর সৃষ্টি যে সজীব প্রাণোচ্ছল তাতে সন্দেহ করবার কোন অবকাশ নাই। মোটের উপর ইংরাজী কবি-প্রতিভা বোধ হয় এই প্রকৃতির। গ্রীক-লাতিন-ফরাসী ইহার বিপরীত। সেখানে বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে সুরূপের উপর—আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা বলা যেতে পারে। সুরূপকেই এখানে শিল্পের বৈশিষ্ট্য করে ধরা হয়েছে—এমন কি জীবনের সজীবতাকে হ্রাস করেও—একটা কৃত্রিমতাকে বরণ করেও অনেকে চেয়েছেন রূপকে সুষ্টুতর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে। তবে এই দুইএর সম্মিলন যেখানে সেখানেই সোনায় সোহাগা। শিল্পের এই উভয় অঙ্গকে সমান মর্য্যাদা যাঁরা দিয়েছেন,—যেমন বাল্মীকি হোমর—তাঁদের শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হবে বৈ কি!

নলিনীকান্ত গুপ্ত

সুন্দর আজ গিয়াছে কোথায়—

শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়

চারিধার আজ কুৎসিত কালো মলিনের হাত লাগি'
সুন্দর তাই গিয়াছে চলিয়া আপন দেউল ত্যাগি,'
তবু সাজি ভরি' সঞ্চিত করি' কুন্দ ও কুরুবক
চলিয়াছে কবি শঙ্কিত-চিত সুন্দর-উপাসক।

পরম দুখীর বক্ষ-সাগরে দুখ-কল্লোল সম
জাগিছে নিত্য অন্তরে তার সন্দেহ ঘনতম,
দেউলে দেউলে দেহলির মূলে প্রণতি জানায় তার,
তবু সুন্দর কোন রূপ ধরি' দেখা নাহি দেয় আর।

সাগরের বুকে লোনাজল কাঁপে উঠে নাকো উর্ব্বশী
ঢেউয়ের মাথায় বসন বিথারি' পরীরা রহে না বসি,'
স্নানের লাগিয়া স্বাতী বা বিশাখা নামে না তাহার নীরে
হতাশ হইয়া দাঁড়ায় পূজারী নিরালা বালুর তীরে।

আকাশের পানে চাহি' রহে কবি শ্বেতসুন্দর-সেবী
সাঁঝের গগনে প্রদীপ জ্বালিতে আনে নাকো কোন দেবী
চারু ছায়াপথ ধরি' সুন্দর কত দূরে গেছে চলি'
কোনো নীহারিকা গানে গুঞ্জনে সে-কথা দেয় না বলি'।

বাতাস যে আর ব্যথায় তাহার ফেলে না দীর্ঘশ্বাস
কোনো তরু আজ সমবেদনায় ত্যজে না পাতার বাস;
ধূলি-সুনিবিড় বন্ধুর পথে তবু কবি চলে একা
সুন্দর আজ গিয়াছে কোথায় মেলে না যে তার দেখা।

অফিসার

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

লোকটিকে আমি বহুবার দেখিয়াছি; পথে, ঘাটে, রেলে, ষ্টীমারে—কোথায় নয়? কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আমার মানুষকে জানিবার এবং বুঝিবার, এত বড় একটা উগ্র ক্ষুধা সত্ত্বেও, কোনদিন ঐ লোকটির সম্পর্কে আগ্রহ ত' হয়ই নাই, বরং একটা ঔদাসিন্যই ছিল।

যেদিন এই প্রশ্ন মনে উদিত হইয়াছিল সেদিনও আমি জানিতাম না যে, উহাকে পরিশেষে বিলক্ষণ ভাবেই জানিতে হইবে।

রাস্তার ঠিক উপরেই, আমার বসিবার ঘরের জানালার নিচে একটা কেশ-হীন মরুভূমির মত "টেকো" মাথা চলিয়া যাইতে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে, সেদিন আর নিস্তার নাই। সর্ব্বদাই, সর্ব্বত্র, উহাকে দেখা যাইবে সেদিন; এমন কি গাড়ি ছাড়িবার সময় হাওড়া ষ্টেশনে দেখাও আশ্চর্য্য নয়।

সাল-তামামি রিপোর্টটা বড় সাহেব আমাকে একবার দেখিয়া দিতে দিয়াছিলেন। শুধু দেখিয়া দিবার মধ্যে কাযের মানুষের অনেক লেঠা! কয়লার খনির সম্পর্কে কয়েকটা বিশেষ কথা না জানিলে, কিছুই বলা চলে না; বিশেষ করিয়া উপরিওয়ালাকে চমৎকৃত করা যায় না! সেইজন্য অচিরে সফরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। এবং সেইদিন রওনা হইবার কথা।

যথা সময়ে আপিসে গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সাহেবের তাগিদে, হাসিয়া উত্তর দিলাম; খনির বর্ত্তমান অবস্থা নিজের চোখে না দেখে, কোন কথাই বলা যায় না, সায়েব।

সাহেব চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, তুমি আবার টুরে যাবে?

হাসিয়া উত্তর দিলাম, মনে করছি, আজই!

সাহেব দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, এপ্রিলের ১৫ তারিখের মধ্যে ওটা যাওয়া চাই; নইলে ওরা একটা ভারি অপ্রীতিকর মন্তব্য ক'রে ব'সতে পারে; জানতো ওদের খামখেয়ালির শেষ নেই!

বলিলাম, যারা কায না ক'রে সমালোচনা করে—তারা চিরদিনই খড়্গ হস্ত। শীতের দেশের আর এদেশের তুলনা চলে? আমি কথা দিচ্ছি সায়েব, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ওটা চ'লে যাবেই যাবে···

সাহেব দাক্ষিণ্যের হাসি হাসিলেন; বলিলেন, অনেক ধন্যবাদ!

সেদিন ছিল শনিবার; অতএব সাহেবের মন ছিল ঘোড় দৌড়ের মাঠেই নিশ্চয়। জরুরি কাগজ-পত্রে সহি দিতে দিতে বাহিরে হর্ণ বাজিয়া উঠিতেই সাহেব উঠিয়া পড়িলেন। যেন,—আমার দেবতা আমারে চাহিলে কে মোর আত্ম পর!

সকাল-সকাল বাড়ি ফেরার মতলব আমারও ছিল; কিন্তু কাজেরও ছিল না অন্ত! পাঁচটা বাজে; ছয়টা দশে আমার গাড়ি; উঠি উঠি করিতেছি এমন সময় একটা প্রকাণ্ড মোটা ফাইল লইয়া বড়-বাবু আসিয়া উপস্থিত।

কি বড়-বাবু?

এই গোয়েঙ্কার ফাইলটা কি সঙ্গে দেব?

কেন? কিছু জরুরি আছে?

সে আপিসে এসেছিল, পিছনে পিছনেও যাবে বোধহয়; তার কেশটা আপনার জানাও দরকার—জরুরিও বটে!

কথার উত্তর দিবার সময় নাই। ফাইলখানা বগলে লইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

(২)

হরিরাম বিষুণরাম গোয়েঙ্কা ছিল ধনের কুবের। গোটা পাঁচ-সাত কয়লার খনি; তাহার উপর অব্রবের কারবার, চিনি, তো নারকল তেল—কত কি, তা' কে বলিতে পারে? কিন্তু প্রকাণ্ড বিস্ময়ের ব্যাপার যে, না আছে তার একটা বড় গোছের আপিস্ না আছে একটা দক্ষ, পাকা ম্যানেজার! কি ক'রে যে তার কায চলে সেই জানে! তার মুচ্ছুদ্দি গোছের জন দুই লোক আপিসে আসে বটে; কিন্তু হরিরামের টিকিটি পর্য্যন্ত এতদিনে দেখি নাই!

কয়লার দাম পড়িয়া যাওয়াতে বাজার বেজায় মন্দা চলিয়াছে। আমাদের তো দশ-বিশটা খাদে কায প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। হরিরামের দশাও তেম্নি। তাই, যে-রেট তাহারা পূর্ব্বে দিয়াছে তাহা দেওয়া আর কিছুতেই সম্ভব নয়, এই মর্ম্মের চিঠিতে ফাইলখানা একদম ভরা। চিঠির ইংরিজি নেহাৎ মামুলি কিন্তু সে-গুলোর বিষয়-বস্তুর বিন্যাস চমৎকার। অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মাথাওয়ালা মানুষ ইহার পিছনে শান্ত ধৈর্য্যে হাল ধরিয়া বসিয়া আছে যাহাতে কিছুতেই ভরা ডুবি হইবে না।

লোকটা কল্পনা দিয়া কায করে না; কোন থিয়োরির ধার ধারে না। হিসাব-পত্রের মধ্যে আন্দাজি কি গোঁজা-মিলের ছন্দাংশ খুঁজিয়া বাহির করিবার উপায় নাই।

বাড়িতে কয়েক মিনিট মাত্র থাকিয়া—ইষ্টিশানে আসিয়া সেই বিরাট ফাইল খুলিয়া নিজের রিজার্ভ বার্থের উপর বসিলাম।

আপিসের নোটগুলো সবই হরিরামের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। মনে মনে হাসিলাম; বুঝিলাম হরিরাম লোকটা চতুর্দ্দিক সামলাইবার আর্ট জানে; কিন্তু অফিসারদের ক্ষুর-ধার বুদ্ধিকে এড়াইবার উপায় আছে কি? বড় বাবুর কন্যাদায়ের ব্যাপারটা হরিরামের অজ্ঞাত ত নাই, বরং সেটা বিশেষ ভাবে কাযে লাগিয়াছে!

গাড়িটা কাঁপিয়া উঠিতে ঘড়ি দেখিলাম। ছাড়িবার সময়ের পাঁচ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়াছে। ষ্টেশনের প্রকাণ্ড ঘড়ির উপর হইতে দৃষ্টি নামাইতেই দেখি সেই লোকটা মাথায় নভোমণ্ডলের মত বিস্তৃত টাক্ লইয়া আমার দিকে প্রখর দৃষ্টি হানিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এ দৃশ্য কাহার ভাল লাগে? সাম্নের জানালার কপাটটা টানিয়া দিলাম। জানা ছিল, লোকটাকে দেখিবই; কিন্তু কেন ও আমার পেছনে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা ঘুরিয়া মরে? নোংরা কাপড় তেলচিটা একখানা ভাগলপুরী চাদর! মাথায় একগাছি চুল নাই; কিন্তু ভ্রূ-জোড়া যেন নদীর তটের প্রকাণ্ড বাঁশ-ঝাড়! চোখের ছুরির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

গাড়ি ছাড়িতে গাড়ির দোলে ঘুমে চোখ ভার হইয়া আসে; কিন্তু ফাইল ক্রমেই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিতেছে! হরিরাম ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার জন্য বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়াছিল। এ তো বড় বাবুর কারসাজি ভিন্ন আর কিছুই না! কিন্তু বেটারা আচ্ছা জব্দ হইয়াছে; বড় সায়েব হুকুম দিয়াছেন—আহা! সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে এক কাপ্ পালং-চায়ের মতই সুমধুর সেই হুকুম। সময়ের অভাব তো বড় সায়েবের ক্রনিক ব্যায়রাম—অতএব যা' কিছু করিব সেই আমি—আমি ছাড়া আর কেউ নয়! মনে মনে বড় সায়েবের কাছে কৃতজ্ঞ রইলুম। তাঁর বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, অবসর অতএব সেই কবরের মধ্যেই এক হইতে পারে!

তারপর?

পনর দিন চুপ্-চাপ্! বুঝিলাম হরিরাম আমাকে ভয় করে; আর বড় বাবু! ঐ চাণক্য পণ্ডিতের খুড়তুতো মামাটি! উনিও চেনেন শর্ম্মাকে! ইস্পাৎ কিনা! পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। আপনি খন্ খন্ করিয়া বাজিয়া উঠে!

আসান্সোল ইষ্টিশানে ডিনার খাইয়া গাড়িতে ফিরিতেছি তাড়াতাড়ি,—হঠাৎ একটা থার্ড ক্লাশ গাড়ির সাম্নে একটা লোক হুমড়ি খাইয়া আমাকে সেলাম করিল। চাহিয়া দেখি সেই টাক্!

মনে হইল গিয়া একটা ধমক দি; কিন্তু সে ট্রেনিং আমাদের নয়।

গাড়িতে ফিরিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম লোকটা কে হইতে পারে? হরিরাম স্বয়ং? রামো;—সে ক্রোড়পতি! এ শালা তার কার্পরদাজ হইবে!

এবার সঙ্গ লইয়াছে; শেষ পর্য্যন্ত ভারি জালাতন করিবে হয়ত'!

কাজের আর শেষ নাই; সমস্তদিন এ-খনি হইতে সে-খনি করিয়া বেড়াই, আর রাত্রে সারারাত ধরিয়া রিপোর্ট লিখিয়া সকালের ডাকে সাহেবের কাছে পাঠাই!

এদিকে ফিরিবার জন্য সাহেবের তাগিদের আর অন্ত নাই। কয়েকটা জরুরী চিঠির উত্তর সাহেব আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া দিতে পারিতেছেন না। অতএব আর দেরি করা চলে না, আজই কোন রকমে রওনা হইতে হইবে।

ম্যানেজারদের কন্‌ফারেন্স; চতুর্দ্দিকে লোকের গাঁদি লাগিয়া গেছে। এক জায়গায় খাওয়া-দাওয়া চলিয়াছে; এক জায়গায় আপিস, আবার কোথাও বা তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে ব্যাপারটা গিয়া ঘোর বিতণ্ডায় দাঁড়াইতেছে।

চারিদিকের চাঞ্চল্যের মধ্যে একটি কোণে সকাল হইতে সেই সটকে লোক্‌টি কোটরের মধ্যে পেঁচা যেমন করিয়া নিরুদ্বেগে দিন যাপন করে তেমনি করিয়া স্তব্ধ গম্ভীর হইয়া বসিয়া তাহার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে!

ক্রমে লোক পাতলা হইতে লাগিল, কিন্তু সে লোকটি—নড়েও না চড়েও না।

হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, কি চাই আপনার?

আপনার কথাটা কানের মধ্যে গিয়া লাঠির মত বাজিল। অফিসার আমরা যাহাকে তাহাকে আপনি বলাতে প্রেষ্টিজে বাধে। তখনি শোধরাইয়া লইয়া বলিলাম,

কি দরকার তোমার হে?

লোকটি এক লম্ফে আগাইয়া আসিয়া, হনুমানের ভঙ্গীতে সবিনয়ে জোড়হাত করিয়া এমন দাঁড়াইল যে বুঝিলাম তাহার কাজ ভিক্ষা ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না।

সময় নাই, অতএব প্রশ্ন করিলাম—কন্যাদায়?

লোকটার বয়স হইয়াছে, পিতৃ-মাতৃ দায়েব আর বয়স নাই; অতএব কন্যাদায় ছাড়া আর কি হইতে পারে?

উত্তর না করিয়া ছল্ ছল্ নেত্রে সে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বুক পকেট হইতে মণি ব্যাগ বাহির করিয়া—একটা টাকা—ঘষা এবং শব্দহীন যাকে অচল বলিয়া একপাসে সরাইয়া রাখিতে হইয়াছিল—বাহির করিয়া—ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, যাও—যাও, আমার সময় নেই!

লোকটি টাকাটা লইয়া নিরুত্তরে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

আঃ বাচিলাম, বোধ হয় লোকটা আর জালাতন করিতে আসিবে না।

কলিকাতায় পৌছিতে রাত হইবে: তাই বাড়ীতে তারে সংবাদ দিলাম। মেজাজটা যতই কেনন৷ সাহেবী করিয়া তুলি, ভিতরের সেই সনাতন আমিটি আছেই আছে। তাহার হোটেলের চেয়ে বাড়ীর রান্না সহস্রগুণে ভাল লাগে। বিশেষ করিয়া হোটেলের চাকচাক্যির নিচে বাবুর্চির সেই ক্লেদ-ক্লিন্ন গল্পটি কিছুতেই ভোলা যায় না। তাহাদের জলের বদলে থুথু দিয়া ডিস্ পরিস্কারের কাহিনী এখন ক্লাসিক্স হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তখনো ঠিক সন্ধ্যা হয় নাই: ট্রেনে চড়িয়া দেখিলাম একজন মাড়ওয়ারি তৃতীয় বেঞ্চে একটা অত্যন্ত দামী শাল আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। বেঞ্চের পাশে একজোড়া নাগরা জুতা বটে: কিন্তু তাহার সাঁচ্চা জড়োয়ার কাজ দেখিলে চক্ষু ফিরান মুস্কিল!

মাড়ওয়ারি, সেকেণ্ড ক্লাশে! লক্ষপতি নয়, ক্রোড়পতি নিশ্চয়!

খানিকটা গিয়া গাড়ি হঠাৎ থামিয়া গেল। লোকটা সেইখানে উঠিয়া আমাকে একটা প্রকাণ্ড সেলাম করিল।

আমারও বিস্ময়ের শেষ রহিল না। সেই স-টাক্ লোকটা—যাহাকে কন্যাদায়ের জন্য ঘষা টাকা দিয়া বিদায় করিয়াছি!

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল, তাহার পর প্রশ্ন করিলাম,

কোথায় যাবেন?

সে লোকটা এবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া বলিল, হুজুর, আমার নাম হরিরাম গোয়েঙ্কা।

আপনি? নিজে?

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটিল। গাড়ি চলার শব্দ যেন আমার কানে অট্টহাস্যের মত শুনাইতে লাগিল।

অবশেষে হরিরাম কথা কহিল, হুজুর, আমায় মাফ্ করবেন। তখন আমার পরিচয় দেবার ইচ্ছা ছিল : কিন্তু আপনার সময় ছিল না।……কিন্তু আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধহলো, আপনি কি ক'রে আমার মেয়ের বিয়ের কথাটি জান্‌লেন—সেই কাজেই আজ চলেছি। আসান্‌সোলে আমাকে নাম্‌তে হবে।

লজ্জায় আমার দুই কর্ণ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলাম, গোয়েঙ্কাজি, আমার টাকাটা ফিরিয়ে দাও—আমার ভারি…

গোয়েঙ্কা হাত জোড় করিয়া বলিল, সে হয় না সাহেব : ওটা আমার মেয়ের জীবনের সব চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ……

আসান্‌সোলে গাড়ি থামিলে গোয়েঙ্কাকে নামাইতে বহু মাতব্বর লোক আসিয়াছিল। তাহাদের সাজপোষাক দেখিবার মত বটে!

গোয়েঙ্কা নামিবার সময় লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, হুজুরের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো—সে পরম ভাগ্য—কিন্তু তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য যে আজকের শুভদিনে আমার একমাত্র কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন!

সেই অচল ঘষা মেকি টাকাটার কথা মনে হইলে আজো আমার সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চে ভরিয়া উঠে! টাক্‌রায় মাছের কাঁটা ফোটার অস্বস্তিতে সমস্ত দেহ-মন যেন ছট্‌-ফট্‌ করিয়া উঠে!

স্মরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কাউণ্ট দি বইন
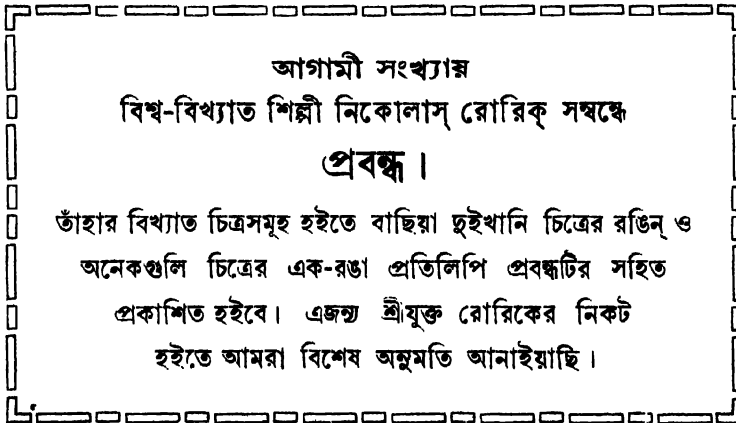
শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দি বইন তাঁহার অন্যতম অধস্তন সেনানায়ক কর্ণেল পের্ঁকে চারি ব্যাটালিয়ন সিপাহীসহ কনৌজ অধিকারে প্রেরণ করিলেন। পের্ঁ আসিয়া দেখিলেন যে মোগলরা ইতিপূর্ব্বেই তথায় আসিয়া পঁহুছিয়াছে এবং দুর্গ-প্রাকারের বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের আক্রমণ করিলেন। দুই ঘণ্টাব্যাপী তুমুল যুদ্ধের পর প্রায় দুই সহস্র সঙ্গীকে রণক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় শয়ান রাখিয়া পরাজিত মোগলসেনা দুর্গমধ্যে পলায়ন করিল। তখন পের্ঁ দুর্গ অবরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। হামদানী এবং বেগম নজফকুলি প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। দুর্গের মৃৎপ্রাচীর;—পের্ঁর গোলাবৃষ্টিতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। সম্মুখ আক্রমণে জয়লাভ করা সম্ভবপর নহে দেখিয়া অতঃপর কর্ণেল পের্ঁ দুর্গ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন, যাহাতে পরিশেষে খাদ্যাভাবে দুর্গরক্ষীরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এইভাবে চারি মাস কাটিয়া গেল। একদিন বেগম কামানের গোলার আঘাতে নিহত হইলেন। আহার্য্যাভাবে তাঁহার সৈন্যগণের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছিল। কর্ত্রীর দেহান্তের পর তাহারা তাহাদের সকল বিপদের মূল হামদানীকে ধরিয়া শত্রুর করে সমর্পণের চক্রান্ত করিল। গুপ্ত চক্রান্তের আভাষ পাইয়া ইস্মাইল বেগ তৎপূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণ বিনাশ করা হইবে না পের্ঁর নিকট এই আশ্বাস পাইয়া তদীয় হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। শুনা যায় মহাদজী তাঁহার মৃত্যুদণ্ড দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন এবং পের্ঁ প্রদত্ত অভয়বাণী মানিতে চাহেন নাই। শুধু দি বইনের জন্যই তিনি সে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মাসিক ৬০০৲ টাকা বৃত্তিতে অতঃপর হামদানী আগ্রা দুর্গ মধ্যে রক্ষিত হইলেন। এই খানে সিন্ধিয়ার কারাগারে ১৭৯৯ সালে তাঁহার দেহান্ত হয়।

এইরূপে মহাদজীর বিরুদ্ধে সিন্ধিয়ার হিন্দুস্থানে আর একটি বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া তুলিবার প্রয়াস আরম্ভেই ব্যর্থ হইল। ইহার কিছুকাল পরে উভয় নৃপতির সেনাদল রাজপুতনার যুদ্ধে মাতিল। পূর্ব্বকৃত ব্যবস্থা মত রাজস্থান হইতে সংগৃহীত অর্থে উভয়ের সমান অধিকার ছিল এবং উভয়ের ফৌজ একযোগে উক্ত জনপদে মুক্তিপণ এবং চৌথ আদায়ে ব্যাপৃত ছিল সে কথা আগে একবার বলিয়াছি। সংগৃহীত অর্থ ভাগ করা লইয়া উভয় পক্ষে বিবাদ বাধিল। আজমীরের অদূরে লাখৈরীর শোণিতরঞ্জিত রণক্ষেত্রে শোভালিয়ে দুদ্রেনেক পরিচালিত হোলকরের নবগঠিত ব্যাটালিয়ন সমূহ দি বইনের হস্তে সমূলে বিধ্বস্ত হইল। এ যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পরে উক্ত ভাগ্যান্বেষী সৈনিক প্রসঙ্গে বলা যাইবে। দি বইন নিজে বলিতেন যে তিনি যত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তন্মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর হইয়াছিল।

সিন্ধিয়া এবং হোলকরের বিরোধের সুযোগে জয়পুরাধিপতি আবার মহাদজীর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার শাস্তি কিছু অধিক হইল। দি বইন তাঁহার ৭০ লক্ষ অর্থদণ্ড করিলেন এবং তাহা আদায় করিবার জন্য লাখৈরীর রণক্ষেত্র হইতে জয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে বাধাদানের চেষ্টা নিষ্ফল বুঝিয়া ভীত প্রতাপসিংহ অদৃষ্টের করে আত্ম সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত

সকল সর্ত্তে সম্মত হইয়া তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। দি বইন জয়পুর নগর সমীপে উপনীত হইয়াছেন জানিয়া প্রতাপসিংহ কতকটা পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং নিজ হস্তিপৃষ্ঠে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া উভয়ে মহাসমারোহে রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন। দরবারে প্রতাপসিংহ দি বইনের প্রতি নিজের সমকক্ষবৎ আচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে যে একজন নৃপতি এবং দি বইন সিন্ধিয়া মহারাজের একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারীমাত্র সে কথা প্রাণের দায়ে প্রতাপসিংহ তখনকার মত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তখন কি দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা তাঁহাদের কাহারও মনে পড়িয়াছিল, যখন এই দি বইন জয়পুর রাজের অধীনে কর্ম্ম পাইয়া নিজেকে ধন্য বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং প্রসাদপ্রার্থীরূপে সমাগত বিদেশী সৈনিককে প্রতাপসিংহ কিছু অর্থদানে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন? ইহারই নাম অদৃষ্টের পরিহাস!

জয়পুর হইতে দি বইন নিজ সেনাদলের প্রধানকেন্দ্র আলিগড়ে ফিরিয়া গেলেন। পথিমধ্যে মচেরী বা আলোয়ার রাজ্যদিয়া যাইবারকালে তথাকার রাজার আমন্ত্রণে তিনি তাঁহার রাজধানীতে আগমন করেন। আলোরার-রাজ তাঁহাকে পরম সমাদরে সম্বর্দ্ধিত করিলেও তাঁহার অনুচর বৃন্দের মধ্যে দি বইনের শত্রুর অভাব ছিল না। রাজপুতানার স্বাধীনতাবিনাশকারীর প্রতি সকল রাজপুতের প্রীতিসম্পন্ন না হইবারই কথা। দরবারে দি বইন দেখিলেন একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী রাজার সিংহাসনোপরি ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার সহিত নিম্নস্বরে কি আলাপ করিতেছে। ভাবে বোধ হইল যেন ঐ ব্যক্তি রাজাকে কিছু বুঝাইতে চাহিতেছে এবং তিনি তাহাতে ঘোর অসম্মতি জানাইতেছেন। উঁহাদের কথোপকথন স্বয়ং একবর্ণ বুঝিতে না পারিলেও দি বইন দেখিলেন তাঁহার মুন্সীর যেটুকু কর্ণগোচর হইয়াছিল তাহাতেই তাহার মুখে আতঙ্ক চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উটিয়াছে। দরবার হইতে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দি বইন তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার পরামর্শ হইতেছিল! রাজার নিকট এজন্য অনুযোগ করা যে নিরর্থক হইবে তাহা বুদ্ধিমান দি বইনের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কালবিলম্ব ব্যাতিরেকে তিনি আলোয়ার পরিত্যাগ করিলেন এবং যথাকালে আলিগড়ে আসিয়া উপনীত হইলেন।

লাখৈরীর যুদ্ধের সহিত দি বইনের সামরিক জীবনের অবসান হইয়াছিল। অতঃপর যে কয়বৎসর তিনি এদেশে ছিলেন তাহার মধ্যে অপর কোন যুদ্ধ বা অভিযানে তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয় নাই। সেনাবিভাগের ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র-শাসন কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। বিগত তিন বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অল্প কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। তিনটি প্রধান এবং অপর কয়েকটী খণ্ড যুদ্ধে বিজয়লাভ, দুইটি সুদৃঢ় দুর্গাধিকার, তাঁহার প্রভু সিন্ধিয়া মহারাজকে হিন্দু-স্থানের আধিপত্য প্রদান এবং ভারতবর্ষের মধ্যে তখনকার দিনের সর্ব্বপ্রধান সামরিক শক্তিতে পরিণত করা—এ সকল কার্য্য তাঁহার নিজ হাতে গড়া সেনাদল সাহায্যে তিনি করিয়াছিলেন—পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন ব্যক্তি এতদনুরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইলে নিজেকে ধন্য বিবেচনা করিত। সৈনিক হিসাবে তাঁহার সিপাহীগণ যে প্রতি পক্ষ সৈন্যগণের তুলনায় অধিকতর সাহসী ও বীর বা দৈহিক বলে শ্রেষ্ঠ ছিল তাহা নহে। শুধু সেনাপতির শিক্ষার উৎকর্ষ, তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্য এবং অধস্তন সেনা-নায়কবর্গের কর্ম্মদক্ষতা ইহারই ফলে দি বইনের বাহিনী রণক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দি বইনের সেনাদল সম্বন্ধে এবারে কিছু বলা প্রয়োজন। মেজর লুই ফার্ডিনাণ্ড স্মিথ নিজ গ্রন্থে এ বিষয়ে দীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছা করিলে তাহা দেখিতে পারেন। মহাদজীর আদেশে দি বইন প্রথমে একটি ব্রিগেড গঠন করেন। পাটন এবং মেরতা যুদ্ধে তাহাদের কৃতিত্ব দর্শনে সন্তুষ্ট সিন্ধিয়া তাঁহাকে আরও দুইটি ব্রিগেড গঠনের আদেশ দেন। তদনুসারে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় ব্রিগেড গঠিত হয়। প্রতি ব্রিগেডে আট ব্যাটালিয়ানে সর্ব্বসমেত ছয় হাজার সিপাহী থাকিত। প্রতি ব্যাটালিয়ান আবার আটটি কোম্পানীতে

বিভক্ত ছিল। এক একটি কোম্পানী একজন সুবেদার দ্বারা পরিচালিত হইত। প্রতি কোম্পানীতে থাকিত ২ জন জমাদার, ১ জন কোট-হাবিলদার, ৩ জন হাবিলদার, ৪ জন নায়েক এবং ৫২ জন সিপাহী। প্রতি ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক ছিল কাপ্তেন-পদধারী একজন ইউরোপীয় বা ইউরেশীয় সৈনিক। তদ্ভিন্ন ঐ জাতীয় কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার অন্ততঃপক্ষে আরও দুইজন উহাতে থাকিত। প্রত্যেক ব্যাটালিয়ানে পদাতিক ও গোলন্দাজ উভয় বিধ সৈনিকই ছিল। শেষোক্ত দলে থাকিত,—

ইউরোপীয় সার্জ্জেণ্ট-মেজর	...	১
ইউরোপীয় গোলন্দাজ	...	৫
জমাদার	...	১
হাবিলদার	...	১
নায়েক	...	৫
দেশীয় গোলন্দাজ	...	৩৫
টিণ্ডাল	...	৫
খালাসী	...	৩৫
শকট চালক	...	৩০
মিস্ত্রি	...	২০
কামার	.	৪
ছুতার	...	৪

তদ্ভিন্ন দেশীয় শল্যচিকিৎসক, ভিস্তি ইত্যাদি অনেকেই এই সঙ্গে থাকিত। তোপ-খানার প্রত্যেক ব্যাটারীতে ৪টী মেঠোতোপ, ১টী হাউইট্জার, ৫টী গোলা-বারুদের গাড়ী, ২টী গো-শকট এবং এই সকল টানিবার জন্য ১২০টী বলদ থাকিত। দুর্গাবরোধোপযোগী কয়েকটী কামান এবং তজ্জন্য যথোচিত গোলন্দাজগণও ঐ সঙ্গে থাকিত। শত্রুর হস্ত হইতে তোপখানা রক্ষার জন্য প্রত্যেক ব্রিগেডের সহিত ৫০০ নিয়মিত এবং ২০০ অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈনিক সংশ্লিষ্ট ছিল।

কোম্পানীর ফৌজকে আদর্শ করিয়া দি বইন নিজ বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। পোষাক পরিচ্ছদ বা অস্ত্রশস্ত্র কোন বিষয়েই কোম্পনীর সিপাহী সেনা অপেক্ষা তাঁহার সেনাদল অপকৃষ্ট ছিল না। বরং অনেক বিষয়ে তাহাদের অবস্থা তদানীন্তন যুগের ইংরাজের সিপাহীদের অপেক্ষা ভাল ছিল বলিয়াই অনেকে লিখিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীগণের নিকটে সিন্ধিয়ার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ যে অধিকতর আকর্ষণের বস্তু ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যুদ্ধে আহত সৈনিকগণের জন্য বিশেষ পুরস্কার এবং অবসরপ্রাপ্ত বা বৃদ্ধ ও অক্ষম সৈন্যদের জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা দি বইন করিয়াছিলেন। চিকিৎসালয়ে থাকা কালে তাহাদের পূর্ণ বেতন দেওয়া হইত। তাঁহার সেনাদলের পাশ্চাত্য পদ্ধতির রণবাদ্য এবং পতাকার অভাব ছিল না। পাঠকগণ হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে শ্বেতক্রুশচিহ্নাঙ্কিত তাঁহার স্বদেশের পতাকাই দি বইন সিন্ধিয়ার সেনাদলের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৈন্যগণকে প্রদত্ত সামরিক আদেশাবলীও ফরাসী ভাষাতেই দেওয়া হইত।

সৈন্যগণের ব্যবহার্য্য যাবতীয় আগ্নেয়াস্ত্র মেজর জর্জ্জ স্যাঙ্গষ্টারের তত্ত্বাবধানে নিজস্ব কারখানাতে নির্ম্মিত হইত। মেজর স্যাঙ্গষ্টারের পূর্ব্ব-জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। দি বইন তাঁহাকে গোহদের পতনের পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রার তোপখানার ভার দিয়াছিলেন। স্যাঙ্গষ্টার একজন সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন; কামান ঢালাইয়ের কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। নব কার্য্যক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। একে একে দিল্লী, মথুরা, গোয়ালিয়র, গোহদ এবং কাল্পিতেও সিন্ধিয়ার সেনাদলের কামান বন্দুক বারুদের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল গুলির ভারই মেজর স্যাঙ্গষ্টারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। এ কার্য্যে তাঁহাকে কীদৃশ গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। গোয়ালিয়রের অদূরে ভাল লৌহ খনির অবস্থান থাকায় স্যাঙ্গষ্টার উক্তস্থানে গোলা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। বারুদ তৈয়ারী হইত আগ্রায়, তজ্জন্য বিকানীর হইতে গন্ধক ও সোরা আনা হইত। ইংরাজ কোম্পানীর বিলাত হইতে আনীত কামানসমূহ হইতে স্যাঙ্গষ্টারের নির্ম্মিত কামানগুলি কোনও অংশে অপকৃষ্ট ছিল না বলিয়া তখনকার দিনের অনেকেই লিখিয়া গিয়াছেন। মাত্র দশ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত তাঁহার এক একটী বন্দুক সত্যই উৎকৃষ্ট জিনিস হইয়াছিল।

দি বইনের পদত্যাগের পর আর মেজর স্যাঙ্গষ্টারের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ১৮০১ সালের একটি ফরাসী আথ্বার হইতে জানা যায় যে লকবা দাদা "স্যাঙ্গষ্টারের পুত্র"কে তাঁহার জন্য এক ব্যাটালিয়ান পদাতিক সৈন্য গঠনের ভার দিয়াছিলেন। Compton মনে করেন যে তৎকালে তাঁহার পিতা জীবিত ছিলেন, নতুবা "স্যাঙ্গষ্টারের পুত্র" বলিয়া ঐ ব্যক্তিকে উল্লেখ করিবার অপর কোন হেতু দেখা যায় না। এ অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ প্রাচ্য দেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে যাঁহার কোন জ্ঞান আছে তিনি জানেন যে ঐ সকল দেশে অনেক ক্ষেত্রে অমুকের পুত্র বলিয়াই লোকের পরিচয় হইয়া থাকে। "আসাই" যুদ্ধে (২৩।৯।১৮০৩) সার আর্থার ওয়েলেসলির হস্তে সিন্ধিয়ার সেনাদলের পরাজয়ের পর যে সকল ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক ইংরাজের করে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় তন্মধ্যে এনসাইন সঙ্গষ্টার (Songster) নামক এক ব্যক্তির নাম দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত "স্যাঙ্গষ্টারের পুত্র এবং এই ব্যক্তি অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়, নামের সামান্য প্রভেদটুকু লিপিকরপ্রমাদ বলিয়াই মনে হয়।

সেনা বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সিন্ধিয়া বেনোয়াকে আলিগড়ের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তীর্ণ জনপদ জায়গীর দিয়াছিলেন। তখন পর্য্যন্ত আলিগড় তাদৃশ প্রসিদ্ধি সম্পন্ন স্থান ছিল না, কোয়েল সহরের অদূরে ইহা তখন একটী দুর্গমাত্র ছিল। দি বইনের বাহিনীর কেন্দ্রস্থল হইবার পর হইতেই আলিগড়ের দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হইল। জায়গীরের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল বাইশ লক্ষ টাকা। সংগৃহীত রাজস্বের শতকরা দুই টাকা হিসাবে দি বইন কমিশন পাইতেন। সেনাদলের যাবতীয় আবশ্যকীয় ব্যয়সঙ্কুলানের পর যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত তাহাও তাঁহার প্রাপ্য ছিল। তদ্ভিন্ন সিন্ধিয়া তাঁহাকে মাসিক বেতন দিতেন দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা। প্রতি ব্যাটালিয়ানের দেশীয় অফিসর এবং সিপাহীগণের জন্য মাসিক সাড়ে চারিহাজার টাকা বেতন প্রদত্ত হইত। সুতরাং তিন ব্রিগেডে বৎসরে ১২,৯৬,০০০৲ টাকা বেতন প্রদত্ত হইত।

দি বইনের সেনাদল বহুসংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক ছিল। এক সময়ে উহাদের সংখ্যা প্রায় তিনশত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার ছিল ত্রিশজন। অপরাপর রাজন্যবৃন্দ সেনাদলভুক্ত ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত জেনারেল কর্ণেল, মেজর ইত্যাদি আখ্যায় নিজেদের অভিহিত করিত। কিন্তু দি বইনএ বিষয়েও কতকটা ইউরোপীয় সেনাদলের মত পদ মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট বেতন দানের ব্যবস্থা ছিল। সমগ্র বাহিনীর অধিনায়কই শুধু "জেনারেল" পদবীধারী হইতেন। দি বইনের অবর্ত্তমানে তাঁহার উত্তরাধিকারী পেরঁ এই পদ পাইয়াছিলেন। ব্রিগেডের অধিনায়কগণ কর্ণেল বা লেফটেনাণ্ট কর্ণেল পদ পাইতেন। অফিসারগণের মাসিক বেতন নিম্নোক্ত হারে প্রদত্ত হইত,—

কর্ণেল	৩০০০৲
লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল	২০০০৲
মেজর	১২০০৲
কাপ্তেন	৪০০৲
কাপ্তেন-লেফটেনাণ্ট	৩০০৲
লেফটেনাণ্ট	২০০৲
এনসাইন	১৫০৲

তদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্যে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাকালে অফিসারগণ শতকরা ৫০৲ টাকা হারে অর্থাৎ প্রাপ্য বেতনের অর্দ্ধাংশ ভাতা পাইত। এতদ্ব্যতীত কর্ণেল, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ও মেজরগণকে খোরাকী হিসাবে মাসিক একশত টাকা প্রদত্ত হইত। সিন্ধিয়ার বাহিনীতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃন্দের আধিক্য সম্বন্ধে কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে তথায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রশস্ততর এবং অভিজ্ঞতালাভের সম্ভাবনা অধিক ছিল বলিয়া ইউরোপীয়গণ তাঁহার কর্ম্মগ্রহণ করিত। তদ্ভিন্ন ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের নিকট অধিকতর লোভনীয় আরও একটী কারণের কথা অনায়াসে এইস্থানে নির্দ্দেশ করা যায়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সেনাদলের বেতনের তালিকা হইতে একাংশমাত্র এখানে উদ্ধৃত করা গেল। ইহা হইতে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ হইতে সমাগত ভাগ্যান্বেষী

সৈনিকবৃন্দ কি প্রকারে বেতনলাভ করিত তাহা বুঝা যাইবে।

১ম ব্রিগেডের অধ্যক্ষ মেজর ফ্রেমন্ত (ফরাসী)		১৪০০৲
২য় „ „ „	পেঁরর (")	১২০০৲
১ম „ ব্রিগেড-মেজর গার্ডনার (ইংরাজ)		৪৫০৲
২য়	ড্রুজিয়ঁ (সাভোয়ার্ড)	৪০০৲
(অফিসারগণ) কাপ্তেন লায়েনাইট (ফরাসী		৭০০৲
„	লে মার্শান্দ (")	৩০০৲
কাপ্তেন ফিলোজ (নিয়াপোলিটান)		৩০০৲
„ আলামণ্ড (ইংরাজ)		২০০৲
„ বটারফিল্ড (,,)		২০০৲
„ রবার্ট বেল (,,)		২৫০৲
„ পলমান (হানোভরীয়ান)		২০০৲
লেফটেনাণ্ট বুর্ক্‌য়্যা (ফরাসী)		২০০৲
,, সাদারলণ্ড (স্কচ)		২০০৲
,, এবট (ইংরাজ)		২০০৲
,, জুমিয়ন (ওলন্দাজ)		১৫০৲
,, রেণিক (আইরিশ)		২০০৲
,, এনসাইন হার্ভি (আইরিশ)		১২০৲

উত্তরকালে এই সকল সৈনিকের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী প্রবন্ধ সমূহে ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

জেনারেল পেঁরর অধ্যক্ষতাকালে সেনাবল আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি চতুর্থ ও পঞ্চম ব্রিগেড গঠন করেন। পেঁরর সাক্ষাৎভাবে অধীন এই পাঁচটী ব্রিগেড ব্যতীত সিন্ধিয়ার আরও তিনটী সেনাদল ছিল। কর্ণেল ফিলোজের ব্রিগেডে ছিল ৮ ব্যাটালিয়ান পদাতিক, ৫০০ অশ্বারোহী এবং ৪৫টী কামান। অম্বাজী ইঙ্গলিয়া নামক তাঁহার একজন মারাঠা সর্দ্দার কর্ণেল জেমস সেফার্ড নামক জনৈক ইংরাজ ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের দ্বারা এক ব্রিগেড সৈন্য গঠন করিয়াছিলেন। তাহাতে ৫ ব্যাটালিয়ান পদাতিক, ৫০০ অশ্বারোহী এবং ২৫টী কামান ছিল। তদ্ভিন্ন কর্ণেল সাল্যার পরিচালিত বেগমসমরুর বা সার্দ্ধানা ব্রিগেডে ছিল ছয় ব্যাটালিয়ান পদাতিক, ৫০০ অশ্বারোহী এবং ৩৫টী কামান। এইরূপে সিন্ধিয়ার পাশ্চাত্য রণ-পদ্ধতিতে শিক্ষিত সেনাদলে সর্ব্বসমেত ৬৮ ব্যাটালিয়ান পদাতিক, ৮০০০ অশ্বারোহী এবং ৪২৭ টী কামান ছিল।

রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারেও দি বইন অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। মাৎস্যন্যায়ের যুগে কোন নিয়মবদ্ধ শাসন-প্রণালীর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু যুদ্ধাবসানের পর উপক্রত জনপদ সমূহে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হইলে প্রধানতঃ তাঁহার জন্যই উহা সম্ভবপর হইয়াছিল। দি বইন নিজ বিস্তৃত জায়গীরের প্রকৃত অধীশ্বর ছিলেন। জনপদ সমূহে শান্তিরক্ষা, কৃষককুলের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত এবং তাহা সংগ্রহের ব্যবস্থা, অধিবাসীবৃন্দের কলহ বিবাদের মীমাংসা—এক কথায় আলিগড় প্রদেশের শাসন-সংক্রান্ত সকল কার্য্যই তাঁহাকে করিতে হইত। ইহার অনতিকাল পরে নানা ফড়নাবিশের সহিত চক্রান্ত করা অপরাধে গোপাল রাও ভাওকে পদচ্যুত করিয়া মহাদজী হিন্দুস্থানের সুবেদারী দি বইনকে দেন। তখন দি বইনের কার্য্যক্ষেত্র প্রকৃতপ্রস্তাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ দি বইন দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; ফারসী ও ফরাসী দপ্তর। প্রথমোক্ত বিভাগ হইতে সকল বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। পারস্য-ভাষাভিজ্ঞ মুন্সীর সাহায্যে ফারসীদপ্তরের যাবতীয় কাগজ-পত্র দি বইন নিজে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিতেন। ফরাসীদপ্তর সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে তিনি রাখিয়াছিলেন। প্রতি মাসে দিল্লীতে সিন্ধিয়ার মন্ত্রিসভার পর্য্যবেক্ষণের জন্য কার্য্যবিবরণ পাঠান হইত।

দি বইনের দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মেজর স্মিথের লেখা হইতে একাংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল। প্রত্যক্ষদর্শী লিখিত বলিয়া বিবরণটী সাতিশয় মূল্যবান। কিন্তু স্থানাভাববশতঃ সারাংশমাত্র এখানে দেওয়া সম্ভব হইল।—"সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া সমস্তদিনের মতই দি বইন কার্য্যে নিমগ্ন হইতেন। কারখানা সমূহ পর্য্যবেক্ষণ, সেনাদল পরিদর্শন নূতন রিক্রুটভর্ত্তি, তিনব্রিগেড সৈন্যের পোষাক, পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম, শিক্ষা-

দীক্ষা, বেতনাদি সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য্যের ব্যবস্থা তিনি একাই করিতেন। তদ্ভিন্ন বিভিন্ন রাজন্যবৃন্দ প্রেরিত দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ, দরবারে বক্তৃতা, রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ এবং তাহা আদায়ের ব্যবস্থা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-কানুনপ্রণয়ন, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত পত্রসমূহের মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া, প্রত্যেকটীর যথোচিত উত্তর প্রদান এবং তাহা যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা, আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষা, এবং জটিল রাষ্ট্রনীতির পরিচালন —এ সকল কার্য্যই তিনি নিজে করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজস্ব ব্যবসায়াদি এবং প্রাপ্ত ধন সম্পত্তির ব্যবস্থা করা ত ছিলই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমি তাঁহাকে এই ভাবে কঠিন পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি। সকল কার্য্যই তিনি যথাযথভাবে সমাধা করিতেন, কোনটিই অসম্পূর্ণ রাখিতেন না। এখানে বলা আবশ্যক যে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীবৃন্দের সুধু সামরিক ব্যাপারের সহিত সংস্রব ছিল; রাষ্ট্রশাসন কার্য্যে দি বইন তাঁহাদের নিকট কোন সাহায্য ইতেন না।"

মহাদজী সিন্ধিয়ার দেহান্ত হইলে উদার প্রকৃতি, গুণানুরাগী, আশ্রিতবৎসল নৃপতি এবং তাঁহার বিশ্বাসী প্রভুভক্ত বিদেশী সেনানায়কের মধ্যে যে মধুর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা ছিন্ন হইল। মহাদজীকে দি বইন সত্যই ভালবাসিতেন এবং তাঁহার পরলোক গমনে তিনি সত্যই ব্যথিত হইয়াছিলেন। মহাদজীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার ভ্রাতা পাণিপথের যুদ্ধে নিহত তুকোজীর তিন পুত্র ছিল কেদারজী, রাবলজী ও আনন্দজী। কনিষ্ঠ আনন্দজীর পুত্র দৌলতরাওকে মহাদজী নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি পঞ্চদশবর্ষীয় বালকমাত্র। মহাদজীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষে কি ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সাধারণতঃ প্রাচ্য জগতে রক্তপাতের মধ্য দিয়া নবীন নৃপতির রাজমুকুট লাভ ঘটিয়া থাকে; তায় আবার দৌলতরাও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। কিন্তু দি বইনের পরাক্রান্ত বাহিনীর জন্য শান্তিভঙ্গ হইল না;—নবীন ভূপতি নির্ব্বিবাদে গদীতে বসিলেন। সুধু দাতিয়া, নারবার এবং সোহাবলগড় এই তিনস্থানে সামান্য গোলযোগ দেখা দিয়াছিল; কিন্তু তাহা নিবারণ করিতে বিশেষ কোন আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। দি বইন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মেজর ফ্রেমন্ত, মেজর রবার্ট সাদারলণ্ড এবং মেজর জেমস গার্ডনার নামক সেনানীত্রয় যথাক্রমে উক্ত তিনস্থানের বিদ্রোহ দমন করিলেন। মহাদজীর পরলোক গমন এবং দি বইনের অবসর গ্রহণ এতদুভয়কালের মধ্যে ইহা ব্যতীত চম্বলনদের উত্তরে আর কোন যুদ্ধ বা অভিযান ঘটে নাই। দৌলতরাও সিন্ধিয়াও মহাদজীর মত পুণানগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিন্দুস্থানের শাসনভার পূর্ব্বের ন্যায়ই দি বইনের হস্তে ন্যস্ত রহিল।

সুকঠোর পরিশ্রমের ফলে বেনোয়ার ক্রমেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছিল। একাদিক্রমে অবসরবিহীন সুদীর্ঘ ষোড়শবর্ষ-কাল এদেশে অনলস কর্ম্মজীবন যাপনের ফলে এখানকার জল বায়ু তাঁহার সহ্য হইতেছিল না। এখনকার লাট বা জঙ্গীলাটের মত গ্রীষ্মকালে শৈলবাস অথবা ইচ্ছামত 'পূর্ণ-বেতনে অবসর লইয়া স্বদেশ গমনের ব্যবস্থা তাঁহার ছিল না। স্বাস্থ্যহানিবশতঃ তিনি কিছু কালের মত বিশ্রাম সুখ উপভোগের জন্য সমুৎসুক হইলেন। সিন্ধিয়া প্রথমটায় তাঁহাদের সকল উন্নতির মূল এই কর্ম্মঠ, বিশ্বাসী সেনা-নায়ককে সহজে ছাড়িতে না চাহিলেও, তাঁহার নির্ব্বন্ধাতি-শয্যে পরিশেষে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে দি বইনকে "অনির্দ্দিষ্ট কালের মত" অবসর দিয়াছিলেন। অতঃপর নিজ দেহরক্ষীগণ পরিবৃত হইয়া দি বইন তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র, তাঁহার নিজ হাতে গড়া আলিগড় নগর চিরকালের মতই পরিত্যাগ করিলেন (২৫।১২।১৭৯৫)। আলিগড়ে দি বইন যে বাটিতে বাস করিতেন তাহা "সাহেববাগ" নামে সাধারণে পরিচিত ছিল। দি বইনের পর তাহা জেনারেল পেরঁর আবাসভবন হইয়াছিল। আলিগড়ে পুরাতন "অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজে"র অদূরে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও জরাজীর্ণ অবস্থায় "সাহেববাগ" ভবন অবস্থিত ছিল। আলিগড়ে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর নব গৃহাদি নির্ম্মাণের ফলে "সাহেববাগ" বিলুপ্ত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না।

নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকল্পে দি বইন প্রথম লখনৌ নগরে আসিয়া বন্ধুবর জেনারেল ক্লাদ মার্টিনের আতিথ্যে কয়েক

মাস বাস করেন। নবাব আসফউদ্দৌলা তাঁহার "খাস-রিশালা" বা দেহরক্ষীসেনাদল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া উপযুক্ত অর্থ-বিনিময়ে তাহা গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু দি বইন তখন কোনমতেই উহা হস্তান্তর করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার "খাস-রিশালা" বাস্তবিকই জাঁকজমকে এক দর্শনীয় ও নৃপতিকুলের পক্ষে পরম লোভনীয় বস্তু ছিল। ছয়শত উৎকৃষ্ট পারস্য দেশীয় সৈনিকপুরুষ দি বইনের শরীর-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহাদের পোষাকপরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, বাজিরাজি, তুরীভেরী সবই তাহাদের পরম রমণীয় ছিল। উষ্ট্রারোহী সৈনিকের সংখ্যা ছিল একশত। পরিচ্ছদ, প্রহরণ এবং বাহনের উৎকর্ষে ইহারাও সহকর্ম্মীগণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না। তদ্ভিন্ন এক ব্যাটারী কামান লইয়া সুশিক্ষিত একদল গোলন্দাজসেনা সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে গমন করিত।

দি বইনের অবসর গ্রহণের কারণ অনেক বিভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন দি বইনের এখন অর্থের অভাব ছিল না; মহাদজীর কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া এই কয়বৎসরের মধ্যে তিনি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমেই তিনি প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিতেছিলেন। সুতরাং এ অবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আবার কাহারও মতে মহাদজীর বিশ্বাসী সেবক তাঁহার মৃত্যুতে সত্যই ব্যথিত হইয়াছিলেন। প্রভুর দেহান্তের পর তাঁহার আর এদেশে থাকিতে স্পৃহা ছিল না। শুধু দৌলতরাও তাঁহাকে বিদায় দিতে অসম্মত হওয়াতে তাঁহার কর্ম্মত্যাগে বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু এ সকল কথা যে সত্য নহে তাহা দি বইনের নিজের লেখা চিঠি হইতে জানা গিয়াছে। কর্ণেল রবার্ট সাদারলণ্ড দি বইনের অবসরগ্রহণের পর অস্থায়ীভাবে সেনাপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দি বইন কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। চিঠিগুলি উক্ত কর্ণেলের পৌত্র ষ্টুয়ার্ট সাদারলণ্ড সি-আই-ই, ভাগ্যান্বেষীদের অন্যতম ইতিবৃত্ত লেখক H. G. Keeneকে দিয়াছিলেন। সেগুলির সারমর্ম্ম উক্ত লেখকের গ্রন্থে পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। চিঠিগুলি হইতে বেশ বুঝা যায় যে দি বইনের চিরকালের মত অবসরগ্রহণের বাসনা একেবারেই ছিল না; প্রত্যেক পত্রেই তিনি নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর নিজ কর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন।

লখনৌ হইতে ১।৯।১৭৯৬ তারিখে লিখিত একপত্রে দি বইন লিখিয়াছিলেন,—"যদিই বা বাধ্য হইয়া আমাকে ইউরোপে যাইতে হয়—আমি আশা করি তাহা হইবে না—তথাপি তাহার জন্য আমার ১৮ মাসের অধিক বিলম্ব হইবেনা; কারণ আমি জানি যে আমার যেরূপ প্রকৃতি এবং শরীরের অবস্থা তাহাতে ইউরোপ আমার সহ্য হইবে না, হইতে পারে না।" এই পত্রে দি বইন আলিগড়ে পরিত্যক্ত দুইটি কন্যার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সাদারলণ্ডকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। চিকিৎসকগণের উপদেশে সাগরবায়ু সেবনে বহির্গত হইতে বাধ্য হইলে জলপথে কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাইবেন তিনি স্থির করিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে পুণা গিয়া তথা হইতে প্রিন্স অর্থাৎ দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে সঙ্গে লইয়া হিন্দুস্থানে ফিরিবার কথা এই চিঠি এবং কলিকাতা হইতে লিখিত চতুর্থ তোং ৭।১।১৭৯৭) এবং পঞ্চম তোং ১৫।১।১৭৯৭) সংখ্যক পত্রেও দেখা যায়। এই জলযাত্রায় যথেষ্ট উপকার না দর্শিলে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত তিনি যাইবেন এবং সে ক্ষেত্রে কোয়েলে ফিরিতে তাঁহার ৬।৭ মাস বিলম্ব হইতে পারে বলিয়া চতুর্থ পত্রে লিখিলেও তিনি আশা করিয়াছিলেন যে ভগবদাশীর্ব্বাদে তাহার কোন প্রয়োজন হইবে না। শেষপত্রে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"As for Europe I do not think of it, but as a last resource, am well aware that a single winter there would kill me."

ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ তিনি প্রথমটায় দূরে না গিয়া লখনৌ নগরে বিশ্রামসুখ উপভোগার্থ আগমন করেন। এখানে তিনি পাঁচমাসকাল অবস্থান করেন। কিন্তু ভাঙ্গা স্বাস্থ্য আর ভাল হইল না। তখন ক্লদ মার্টিনের হস্তে বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিয়া দি বইন কলিকাতায় আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া তিন লক্ষ টাকা মূল্য বিনিময়ে তিনি নিজ রিশালা কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর উহারা

গভর্ণর-জেনারেলের দেহ রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল। চিকিৎসকগণের পরামর্শমত অতঃপর দি বইন ইউরোপ যাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেন্মার্কদেশীয় পোত "ক্রোনবার্গ" আরোহণে তিনি চিরদিনের মতই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন (জানুয়ারী ১৭৯৭)। যথাকালে ইংলণ্ডে পৌছিয়া তিনি প্রথমে কিছুকাল লণ্ডননগরে বাস করিয়াছিলেন। পরে ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লবজনিত গোলযোগ কতকটা প্রশমিত হইলে পারীনগরে গমন করেন।

সমুদ্রযাত্রার ফলে দি বইনের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এবং অনতিকাল মধ্যেই তিনি নষ্ট স্বাস্থ্য অনেকাংশে পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনন্তর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন-মানসে তিনি তদুপযোগী আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভাগ্যচক্র তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপথে পরিচালিত করিল; তাঁহার আর ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাওয়া হইল না। একদিন এক সঙ্গীতের মজলিসে তিনি মার্ক্ইস অসমন্দ (Marquis d' Osmonde) নামক একজন ফরাসী অভিজাতের কন্যা এলিয়োনোরা এডেলা নাম্নী একটি বালিকাকে দেখিলেন। বালিকা অসামান্যা রূপবতী, তাহার বয়ক্রম তখন সপ্তদশ বৎসর মাত্র। তাহার সৌন্দর্য্যেও মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া দি বইন উভয়ের বয়সের ঘোর ব্যবধানসত্ত্বেও তাহাকে বিবাহ করিতে সমুৎসুক হইলেন। বালিকা বা তাহার অভিভাবকবর্গের কোন আপত্তি হইলনা, সম্ভবতঃ পূর্ব্বদেশ হইতে আনীত দি বইনের অগাধ অর্থই তাহার মূল কারণ। ১১ই জুন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। এবারে দি বইন ভারতবর্ষে ফিরিবার সঙ্কল্প চিরকালের মতই পরিত্যাগ করিলেন।

অতঃপর দি বইন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ জন্মভূমি শ্যাম্বেরী নগরে বসবাস আরম্ভ করিলেন। তবে পরিচিত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি পারীনগরে গমন করিতেন। সাভয়রাজ দি বইনকে আগমনের অনতিকাল পরেই কাউন্ট পদবী দিয়া অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম দি বইন সিন্ধিয়ার সহিত নিয়মিতভাবে পত্র বিনিময় করিতেন। ক্ল্যদ মার্টিনের মধ্যবর্ত্তিতায় এই কার্য্য সাধিত হইত। প্রতি পত্রেই দৌলতরাও তাঁহাকে ভারতবর্ষে তাঁহার সেনাপতিত্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেন। ১৭৯৯ সালে লিখিত একখানি পত্রে তিনি দি বইনকে জানাইয়াছিলেন যে তাঁহার যাবতীয় ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধানভার ক্ল্যদমার্টিন কর্ত্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিবৃন্দের হস্তে ন্যস্ত আছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় সেগুলি তখনও নিষ্কর রহিয়াছে। কে বলিবে হিমশীতল ইউরোপে জীবনের সায়াহ্নকাল অতিবাহিত করিবার কালে দি বইনের তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধিলাভের ক্ষেত্র রবিকরদীপ্ত ভারতবর্ষে অতিক্রান্ত মধ্যাহ্নদিনের কথা মনে পড়িত কিনা? তাঁহার নিজ হাতে গড়া বাহিনীর তাঁহার অবসরগ্রহণের মাত্র আট বৎসর পরে ইংরাজের হস্তে সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়ার সংবাদ দি বইনকে ব্যথিত করিয়াছিল কি না কে বলিবে!

দি বইন নেপোলিয়নকে ভারতবর্ষ আক্রমণে প্ররোচিত এবং আবশ্যকমত সর্ব্বদাই পরামর্শাদি দান করিতেন বলিয়া লর্ড ওয়েলেসলি লিখিয়াছিলেন। ইংরাজ লেখকবর্গের মধ্যে অনেকেই এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বা আবার ইহার উপর রং ফলাইয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষে ফরাসী অভিযানের অধিনায়কত্ব নেপোলিয়ন দি বইনকে প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন! কথাটা কিন্তু সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং উক্ত মার্ক্ইস মহাশয়ের ফরাসীজাতি ও নেপোলিয়নের প্রতি বিদ্বেষের অন্যতম নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে বলিয়া এক্ষণে জানা গিয়াছে। নেপোলিয়নের অভ্যুদয়কালে দি বইন ফ্রান্সে বড় বেশী যাইতেন না। তিনি মোটেই ইংরাজবিদ্বেষী ছিলেন না। সিন্ধিয়াকে তিনি বরাবরই কোম্পানীর সহিত সদ্ভাবরক্ষা করিয়া চলিতে পরামর্শ দিতেন। অবসর গ্রহণ করিবার পরও তিনি দৌলতরাওকে ইংরাজদের অসন্তোষজনক নিজ সেনাদল বৃদ্ধি করা হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ফরাসী দেশে বোর্ব্বোঁ বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে বেনোয়া আবার মধ্যে মধ্যে ফ্রান্সে আগমন করিতে থাকেন। অষ্টাদশ লুই দি বইনকে খুব সম্মান করিতেন এবং তাঁহাকে ফরাসীসেনাবিভাগে অবৈতনিকভাবে Marechal
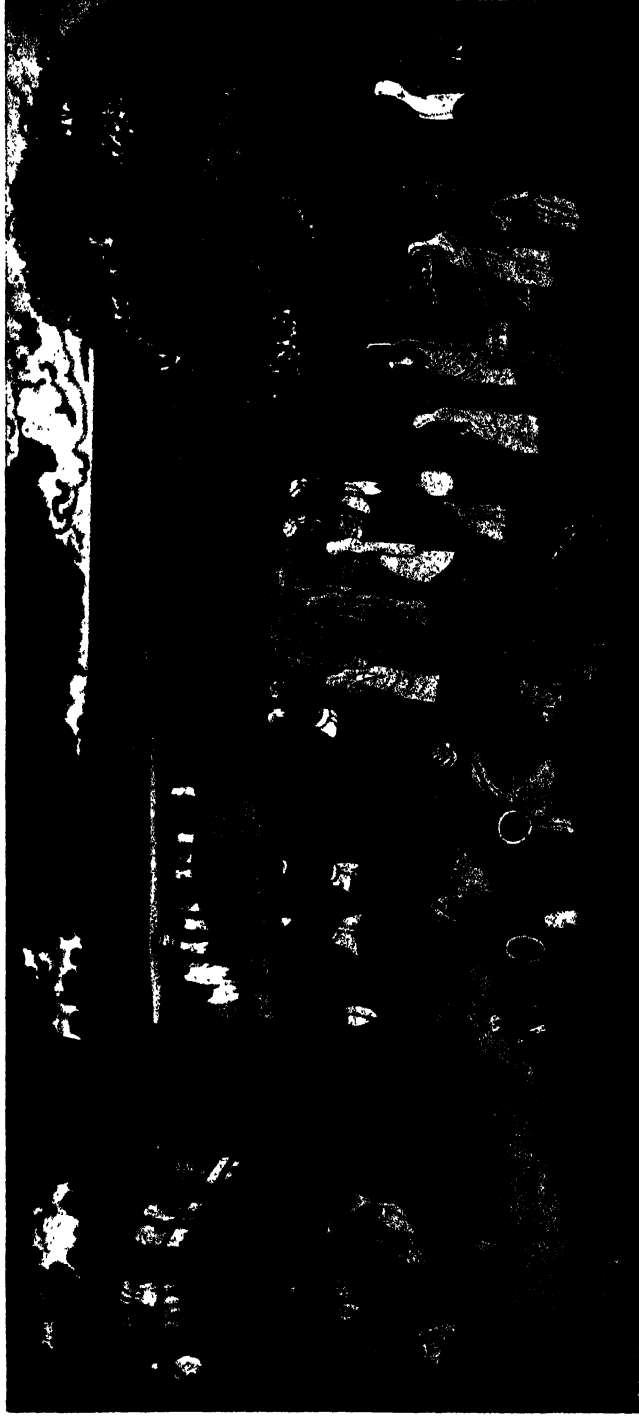
বিবাহান্তে

শিল্পী—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

de Camp অর্থাৎ মেজর-জেনারেল পদ প্রদান এবং Grand Cordona de la Ordre Royale Legion d'Honneur এবং Grand Cordon de la Ordre de St. Louis নামক মহাগৌরবময় রাজকীয় সম্মানে সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সঞ্চিত অর্থরাশির বহুলাংশ দি বইন শ্যাম্বেরীর দুঃস্থ অধিবাসীবৃন্দের কল্যাণকল্পে নানা সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। শুনা যায় ভারতবর্ষ হইতে তিনি ৪ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ তখনকার হারে ৪০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৩৪ লক্ষ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা বিভিন্ন সৎকর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে দান করিয়াছিলেন।* তাহার বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

দি বইনের দানশৌণ্ডে প্রীত স্যাভয়াধিপতি তাঁহাকে সৈন্যদলে লেফটেনান্ট-জেনারেল পদ এবং Grand Cross of the Order of St. Maurice and St. Lazarus নামক রাজসম্মান অর্পণ করিলেন। কৃতজ্ঞ শ্যাম্বেরীমিউনিসিপালিটি তাঁহাদের সভাগৃহে "নবাবের" মর্ম্মর মূর্ত্তি রক্ষা এবং নগরের একটি প্রধান রাজপথ তাঁহার নামে অভিহিত করিয়া নিজেদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। শ্যাম্বেরীনগরে Rue di Boigne এখনও অন্যতম রাজবর্ত্ম।

এইরূপে প্রথম যৌবনের সেই ভাগ্যান্বেষী, ভবঘুরে, দরিদ্র সৈনিক—ফরাসী, রুষ, গ্রীক, ইংরাজ সেনাদলের অধস্তন কর্ম্মচারী এবং তুর্ককারাগারের বন্দী—পরিণত বয়সে হিন্দুস্থান বিজয়ী এবং তাহার প্রকৃত অধীশ্বর, সিন্ধিয়ার পরাক্রান্ত বাহিনীর সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক, ফ্রান্স ও স্যাভয় দেশের সেনা-বিভাগের জেনারেল, উক্ত দুই রাজ্যের অত্যুচ্চ রাজ সম্মানভূষিত, কাউণ্ট পদবীর অধিকারী এক ধনাঢ্য অভিজাতে পরিণত হইলেন। যশ ও অর্থের উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হইলেও দি বইন কিন্তু খুবই নিরাড়ম্বর সরলভাবে জীবন যাপন করিতেন। শেষাবধি তাঁহার একটি ভিন্ন দুইটি পরিচারক ছিল না। ঐ ব্যক্তি আবার ভারতবর্ষীয় ছিল। প্রভুভক্তির আতিশয্যবশতঃ জন্মভূমির সকল মায়া কাটাইয়া প্রভুপরায়ণ ভৃত্য চিরদিনের মতই সুদূর প্রবাসে যাইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। দি বইনের সংসারের যাবতীয় ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। নিজে অনাড়ম্বর ভাবে বাস করিলেও কাউণ্ট দি বইন খুব অতিথি-পরায়ণ ছিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তি তাঁহার গৃহে পরম সমাদরে গৃহীত হইতেন; ঐ ব্যক্তি যদি আবার ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত হইতেন তবে ত আর কথাই ছিল না। মারাঠাজাতির ইতিহাসলেখক গ্রাণ্টডফ এবং রাজস্থানের ইতিহাসলেখক টড উভয়েই শ্যাম্বেরীতে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজপুত জাতির পরম ভক্ত লেখকের ঐ জাতির স্বাধীনতাবিনাশকারকের সহিত সাক্ষাতের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ জন্য তাঁহার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য (Vol. 1, p. 765)। পাটন এবং মের্‌তা যুদ্ধের প্রসঙ্গে দি বইন টডকে বলেন "সে সব কথা এখন স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়।" তখন তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর।

দি বইনের বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই ১৮০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে উভয়ে পৃথকভাবে বাস করিতে থাকেন। এলিয়োনোরা নিজ পিতৃভবনে

* ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের মধ্যে অনেকেই "মোটা টাকা" সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিতেন। দি বইন যেরূপ সুবিধা পাইয়াছিলেন তাহাতে ৪০ লক্ষ টাকা কিছুই নহে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাঁহার অনেক প্রকার নিজস্ব কারবার ও ব্যবসায় ছিল। পেষ্তিনোর কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। পেরঁ নয় বৎসরে যে অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা ঠিক কত বলা যায় না। সাড়ে সাত লক্ষ হইতে বিশ লক্ষ পাউণ্ড মধ্যে তাহা নানা জনে নানা ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার সবটাই তিনি দেশে লইয়া যাইতে পারেন নাই। পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড বা অর্দ্ধ ক্রোর টাকা লইয়া তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়াছিলেন। দি বইনের মত তাঁহার ব্যবসায় ছিল না। জেনারেল ক্ল্যদ মার্টিন নিজ জীবনের সঞ্চয় ৪০ লক্ষ টাকা মৃত্যুকালে উইলে এ দেশে বিভিন্ন সৎকার্য্যে, প্রধানতঃ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বালক বালিকাগণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে, দান করিয়া যান। বেগম সমরুর উত্তরাধিকারী ডাইস-সোম্ব্ তাঁহার নিকট হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কর্ণেল লুই বার্ণার্ড বুর্কুঁয়্যা সিন্ধিয়ার বাহিনীর একজন সাধারণ ব্রিগেড-নায়ক ছিলেন; তিনিও ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু সকলকে হার মানাইয়াছিলেন কর্ণেল ভানে নামক কোম্পানীর একজন ইংরাজ সৈনিক। দেনার দায়ে তিনি ইংরাজ রাজ্য ছাড়িয়া অযোধ্যারাজ্যে পলায়ন করেন, কারণ তথায় পাওনাদারগণের যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। নবাবের নিকট হইতে একদল সেনার অধিনায়কত্ব এবং তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভরাইচ এবং গোরক্ষপুর জেলাদ্বয় জায়গীরসত্ত্বে পাইয়া তিন বৎসর পরে ত্রিশ লক্ষ টাকা লইয়া তিনি অযোধ্যা পরিত্যাগ করেন (১৭৮১ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু জেলা দুইটি সম্পূর্ণরূপেই উৎসাদিত হইয়াছিল এবং তাহার পর হইতেই ভরাইচ জেলা বিরলবসতি হইয়া পড়িয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দি বইন তাঁহার আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সুপ্রচুর অর্থের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সাধারণতঃ বিবাহ-বিচ্ছেদ বলিতে যাহা বুঝায় তাঁহাদের মধ্যে তাহা সংঘটিত হয় নাই; উভয়ে পৃথকভাবে অবস্থান করিতেন মাত্র। কাউণ্ট যতদিন জীবিত ছিলেন প্রতিবর্ষে কয়েক সপ্তাহের জন্য এলিয়োনোরা শ্যাম্বেরীতে তাঁহার নিকটে আগমন করিতেন। দি বইনের মৃত্যুর ৩৬ বৎসর পরে ১৮৮৬ সালে কাউণ্টেসের দেহান্ত হয়। তাঁহার গর্ভে দি বইনের কোন সন্তান জন্মে নাই।

ভারতবর্ষে অবস্থান কালে দি বইন মুসলমান পদ্ধতি অনুসারে পারস্যদেশাগত একজন আমীরের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার গর্ভে দি বইনের একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রটীর নাম ছিল আলিবক্স; দিল্লী নগরীতে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাহার জন্ম হইয়াছিল। কন্যাটির নাম "বানু" বলিয়া সকলে উল্লেখ করিয়াছেন। ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন কালে দি বইন ইহাদের দুইজনকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় উভয়ের খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হইলে পরে আলিবক্সের নূতন নাম হইল চার্লস আলেকজান্দার এবং বানু হইল 'আনা'। ১৮১০ সালে পারীতে আনার মৃত্যু হয়। চার্লস বড় হইয়া এক ফরাসী অভিজাত নন্দিনীকে বিবাহ করে; উহাদের অনেকগুলি পুত্রকন্যা জন্মিয়াছিল। পিতার দেহান্তের পর চার্লস তদীয় কাউণ্ট পদবীর অধিকারী হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাউণ্ট চার্লস দি বইনের মৃত্যু হইয়াছিল।

২১শে জুন ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে শ্যাম্বেরী নগরে প্রায় আশী বৎসর বয়সে দি বইন পরলোক গমন করেন। যে ইউরোপের জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইবে না মনে করিয়া তিনি ভীত হইয়াছিলেন তথায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর তেত্রিশ বৎসর কাল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে যাপন করিয়াছিলেন। মহা-সমারোহে তাঁহার সমাধি কার্য্য সাধিত হইয়াছিল।

কি চরিত্রের উৎকর্ষে, কি কৃতকর্ম্মের সাফল্যে অপরাপর সমস্ত ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকপুরুষের তুলনায় দি বইনের স্থান অতি উর্দ্ধে। সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে,—অর্থাৎ সেনাবিভাগ গঠনে এবং রণক্ষেত্রে বাহিনী পরিচালনে তিনি খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। লুণ্ঠনলোলুপ মারাঠা অশ্বারোহী সেনাদলকে সুশিক্ষিত নিয়মিত পদাতিকে পরিণত করা এবং তখনকার দিনের যুদ্ধের কঠোরতা অনেকাংশে বিদূরিত করা তাঁহার অন্যতম কৃতিত্বের নিদর্শন। সমরা-বসানের পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দুস্থানের সুবাদার-রূপেও তিনি রাষ্ট্র শাসনে যথেষ্ট কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। উত্তরাপথের আধিপত্য লাভ করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও মূলতঃ তদনুসৃত শাসননীতির কোনও পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাজমহলের সংরক্ষণ জন্য দি বইন যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এমন কি মারাঠাদরবার এজন্য যথোচিত অর্থ মঞ্জুর না করায় তিনি নিজ তহবিল হইতে বক্রী অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এদেশে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত।

দি বইন মিতাচারী, লোকরঞ্জক, মধুর প্রকৃতিক ছিলেন। লেখাপড়ায়, বিশেষতঃ লাটিন সাহিত্যের অনুশীলনে, তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রথম জীবনে বহুস্থানে পরিভ্রমণের ফলে তিনি অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষা অনর্গল ভাবে বলিতে এবং লিখিতে পারিতেন,—ইটালীয়ান, ফরাসী, ইংরাজী, রুষ, জর্ম্মন এবং গ্রীক। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় উর্দ্দু, ফারসী, মারাঠী ভাষাতেও তাঁহার কতকটা জ্ঞান ছিল।

ফরাসী ভাষায় কাউণ্ট দি বইনের দুইখানি জীবনচরিত আছে। প্রথমটী "Memoire sur la Carriere militaire et politique de M. le General Come de Boigne" নামে Mon. G. M. Raymond কর্ত্তৃক ১৮২৯ সালে প্রকাশিত হয়। পরবৎসর উক্ত গ্রন্থের সংশোধিত সংস্করণ দি বইনের পুত্র চার্লসের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। এই ছোট বইখানি পড়িয়া কিন্তু হতাশ হইতে হয়। তাৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রধান অভি-নেতার জীবনীপ্রসঙ্গে যে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ আশা করা যাইতে পারে, তাহার কিছুই ইহাতে দেখা যায় না। অপরটির নাম "Une page inedite de l'histoire des Indes, le General de Boigne"; ইহা Mon. St.—Genis কর্ত্তৃক ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে

প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের ইতিহাসসমূহ মধ্যে H. Compton এর গ্রন্থে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ দেখা যায়। সমসাময়িক ইতিহাস এবং মহাদজী সিন্ধিয়া প্রসঙ্গে সরদেশাইয়ের "মারাঠী রিয়াসৎ," ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড অপরিহার্য্য। রাজপুতনার ইতিহাস জন্য পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার 'রাজপুতানেকা ইতিহাস' দ্রষ্টব্য। মারাঠাদের রাজ্যশাসনপদ্ধতি এবং সামরিক শক্তি প্রসঙ্গে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের "Administrative System of the Mahrattas" উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। অনেকাংশে পুরাতন হইয়া পড়িলেও সমসাময়িক ঘটনাবলীর জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি দেখা যাইতে পারে,—

Col. Todd—Annals and Antiquities of Rajasthan.

Grant Duff—History of the Mahrattas.

J. Mill --History of British India.

Col. Franklin—History of Shah Alam.

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্ত জিজ্ঞাসা

শ্রীকরুণাময় বসু

পদ্ম মাঝে সূর্য্যের আলোক মর্ম্মে যবে পশে ধীরে,
প্রস্ফুটিয়া দলগুলি জাগে।
সমুদ্রের অতল শয়নে মণি-মাণিক্যের তীরে
সপ্তবর্ণ কেমনে যে লাগে!

বসন্তের পুষ্পিত কাননে দক্ষিণা পবন গীতি
গন্ধলোভী অলি আনে ডাকি'।
দিগন্তের গায়ে গায়ে রূপায়িত অনন্তের স্মৃতি
সন্ধ্যা মেয়ে দেয় নিতি আঁকি'।

এই যে নিগূঢ় স্নেহ প্রকৃতির অন্তরে অন্তরে
উদ্বেলিয়া হ'তেছে প্রকাশ;
কল্লোলিত নদীজলে, অরণ্যের ইঙ্গিত-মর্ম্মরে
কা'র বাণী, কাহার আভাষ?

কেমনে বুঝিব তাহা? শুধু জানি প্রভাতের তীরে
পদ্ম তা'র মেলিছে পাপড়ি:
সঞ্চরিয়া ফুলবনে অলি তা'র পাখা দু'টি ঘিরে
মধু-স্মৃতি লয় যে আহরি।

শুধু এইটুকু বুঝি, ঊর্দ্ধাকাশে উঠিলে কৌমুদী,
নদীজল উঠে যে চঞ্চলি'।
অরূপের ছোঁয়াটুকু পেতে রূপ তা'র আঁখি মুদি'
যাহা কিছু দেয় যে অঞ্জলি।

তাই তো প্রভাত জাগে, ফুল জাগে, জাগে মোর প্রাণ;
কেন জাগে কিছু নাহি জানি।
শুধুই রহস্যতলে মণি-মুক্তি মাণিক্য সমান
বিচ্ছুরিছে বিচিত্রার বাণী।

এই বাণী আসে কোথা হ'তে? চাঁদ কোথা আলো লভি'
ভরিতেছে নিখিল ভুবন।
কোন্ ধ্বনি চিত্তে লাগে? যার প্রতিধ্বনি খুঁজি' কবি
বিশ্বে বিশ্বে মাগিছে জীবন।

বঙ্গীয় কলাপদ্ধতির আধুনিক রূপ

শ্রীমণিলাল সেন শর্ম্মা

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে যে-শিল্প-পদ্ধতি গড়ে উঠেছে এবং ত্রিশ বৎসর ধরে যে-নতুন ধারায় ছবি আঁকা চলেছে, সে-সব ছবির অভিনবত্বে আজ এই বঙ্গীয় পদ্ধতি শিল্প জগতে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। শিল্প কলার ইতিহাসে দেখা যায় যে, এক একজন বড়ো শিল্পীকে অবলম্বন করেই এক-একটা শিল্পকলার ধারা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বাজার—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বঙ্গীয় পদ্ধতি দেশে প্রচারিত হবার আগে লোক-শিল্প (folk art) ও রাজপুত এবং মুঘল পদ্ধতিতে আঁকা মৃত সংস্করণের ছবিই ছিল আমাদের নিজস্ব চিত্রকলা। পরবর্ত্তী যুগে রাজা রবিবর্ম্মা বিদেশীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। তার পরেই রচিত হয়েছে আধুনিক বঙ্গীয় পদ্ধতি।

ছবিকে জলে ভিজানো বা ছবির উপর তুলির সাহায্যে জল দিয়ে ছবিকে মুছে (wash) মসৃণ করা বঙ্গীয় পদ্ধতির এখনকার একটি প্রধান বিশেষত্ব। এ-পদ্ধতি জাপানের। বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গীয় ওকাকুরা ও অন্যান্য জাপানী শিল্পীগণ যখন কলিকাতায় এসে ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির অনুশীলন

করছিলেন, তখন থেকে এ-প্রথা তাঁদের নিকট হ'তে আমাদের ছবিতে এসেছে। রাজপুত ও মুঘল ছবি জলে ধোয়ানো প্রথায় আঁকা হয় না। তা' সম্পূর্ণ আলাদা পদ্ধতি, তাকে tempara painting বলা হয়।

দেশীয় উপাদান নিয়ে দেশীয় বিষয় বস্তুর ছবি আঁকা আরম্ভ হবার পর অজন্তা গুহার দেওয়াল চিত্রের (fresco) প্রভাবেও আধুনিক বাঙ্‌লার চিত্রকলা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। কয়েকটি পদ্ধতির সুকুমার রেখা ও বর্ণ-সম্পদ গ্রহণ করে তাদের অপূর্ব্ব মিশ্রণে এবং আমাদের দেশীয় বিষয়-বস্তু ও উপাদানের সমাবেশে এ-পদ্ধতির গোড়াপত্তন হয়েছে। রাজপুত ও মুঘল পদ্ধতিতে ছবি আঁকা আরম্ভ করে জাপানী জল-ভিজানো-প্রথা নিয়ে আর অজন্তার চিত্রকলার প্রভাবে এবং সর্ব্বোপরি অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভায় এই বঙ্গীয় পদ্ধতির সৃষ্টি।

উচ্চ সঙ্গীত বুঝ্‌তে হ'লে যেমন তার ধ্বনিতত্ত্বও কতক আয়ত্ত করা দরকার হয় তা না হলে যেমন সঙ্গীতের সম্যক রস উপভোগ করা যায় না তেমনি চিত্রকলা বুঝ্‌বার জন্যও কতগুলি রেখাপাতা ও বর্ণ-সুষমার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে যার পরিচয় নেই তার পক্ষে দেশীয় ছবির ভাষা বুঝা কঠিন। কিন্তু বুঝ্‌তে পারিনি বলে গান ভাল হয় নি বা ছবিটা বিশ্রী এ কথা বলা চলে না। ফরাসী ভাষা আমার কাছে অবোধ্য বলে সে-ভাষায় লিখিত সাহিত্য মোটেই ভালো সাহিত্য নয় বল্‌লে কি প্রকাশ পাবে তা না বলাই ভালো। প্রত্যেক দেশের চিত্রকলারই একটা পৃথক ভাষা আছে এবং প্রত্যেক দেশের সঙ্গীতেরও একটা পৃথক রূপ আছে। সে-সবের সঙ্গে পরিচয় না থাক্‌লেই আমরা অকারণ ললিতকলার অসম্মান করে থাকি।

অনেকেই একটা ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, ভারতীয় পদ্ধতিতে দেহের গঠনতত্ত্ব (anatomy) নেই বা না থাক্‌লেও চলে, কিন্তু এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক দেহের গঠনতত্ত্ব এবং তার চুল-চেরা মাপ ভারতীয় রেখায় আছে। অবনীন্দ্রনাথ প্রথম যুগে ইটালীয় শিল্পী সাইনর গিলহার্ডি (Signor Gilhardi) ও ইংলণ্ডের শিল্পী পামারের (Mr Palmer) নিকট ইয়ুরোপীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা পেয়েছিলেন বলেই তাঁর শিক্ষার গোড়া-পত্তন অতি সুদৃঢ়। তাঁর ছবি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবার এটাও একটা বড়ো কারণ সে কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না।

প্রাচ্য কলাবিদ্‌গণ দৈহিক গঠনের এক-একটা কাঠামো (form) করে নিয়েছেন তাঁদের ছবি আঁকা সহজ করে নেবার জন্য। কিন্তু এ-সব কাঠামোতে এনাটমী নেই এ কথা বলা চলে না। একই ডৌল হয়ত অনেক ছবিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে কিন্তু বহুবার ব্যবহৃত হলেই যে

গঙ্গার ঘাট—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ডৌলটির মাপে ভুল আছে তা বলা যায় না। এ সব কাঠামো-গুলির সাহায্যেই প্রাচ্য কলাবিদ্‌গণ ছবিতে আসল রূপ দিতে সমর্থ হয়ে থাকেন। গানের সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে যে সুর সৃষ্টির সুবিধার জন্য এক একটা রাগ রাগিণীর কাঠামো প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞগণ রচনা করেছেন। সেসব সুর বিন্যাসের সাহায্যে সুরের কারুকাজ করা চল্‌বে অজস্র ভাবে। আবার না ধি ধি না ইত্যাদি চতুর্মাত্রিক ছন্দ বাদ্য যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়

কেবল বাজনায় সুর সৃষ্টির সুবিধার জন্য আর এ-কারণেই বাদ্যযন্ত্রে সুরের ঝঙ্কার অসীমতা প্রকাশ করতে পারে।

সহজ জীবন যাপন ও মহৎ চিন্তা করাই আমাদের একটা সুন্দর রীতি। সে-প্রথা অনুসারেই ছবি আঁকবার বেলায়ও বেলায়ও এ কথা খাটে যে এনাটমী না হ'লে চলে না কিন্তু এনাটমীই সব কিছু নয়। তার চেয়ে এমন অনেক কিছু আছে তাকে ছবিতে দেখাতে পারাই আসল শিল্পীর কাজ। তা বলে এনাটমীকে বাদ দিলে চলে না। কাজেই কতগুলি

পদ্মার চর—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

একটা সহজ কাঠামো প্রাচীন কলাবিদ্‌গণ গঠন করে নিয়েছেন। ভাত খাওয়া আমাদের দরকার হয় কিন্তু তা বলে ভাত খাওয়াই এ জগতে সব চেয়ে বড়ো নয়। ছবির সুন্দর কাঠামো করা আছে যা' নিয়ে ভারতীয় ছবি রচি হয়ে এসেছে।

ভারতীয় চিত্রকলায় পারিপ্রেক্ষিক (perspective

বিবাহান্তে—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

খেয়া-ঘাট—শ্রীঅজিত গুপ্ত

নেই বলে অনেকে অনুযোগ করে থাকেন। পারিপ্রেক্ষিক কেবল জ্যামিতিতেই দেখানো সম্ভবপর হয়। ভারতীয় শিল্পী-

গণ এরূপ বিজ্ঞান দেখাতে চেষ্টা করেন নি। উপরোক্ত অজন্তার বা রাজপুত ও মুঘল পদ্ধতির ছবিতে শিল্পীগণ

এবং একই উপাদান নিয়ে হাজার হাজার ছবি রচিত হচ্ছে তাতে এই হয়েছে যে বহু-লাঞ্ছিত এবং নিন্দিত বঙ্গীয় পদ্ধতির উপর একদল শিল্পী ও কলারসিক, যাঁরা আগাগোড়াই "ওরিয়েণ্টাল আর্টের" লম্বা হাত-পা'র নিন্দা করে এসেছেন, তাঁদের তর্কের খোরাক দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ঢেঁকি—শ্রীইন্দু রক্ষিত

আর একটা অনুতাপের বিষয় এই যে, ওরিয়েণ্টাল আর্টের নামে অনেক মেকী ছবি বা'র হচ্ছে যা সাধারণের মনে বঙ্গীয় পদ্ধতির উপর বিতৃষ্ণার ভাব এনে দিচ্ছে। এরূপ হবার কারণ শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। সম্পূর্ণ শিক্ষা না পেয়েই ছাত্র যখন স্বাধীন ভাবে কাজ আরম্ভ করে তখন তার স্বরূপ প্রকাশ পায় এবং সে-সময়ের আঁকা ছবিই মেকী সংস্করণের হয়ে থাকে।

ছবি নীরব কবিতা। কিন্তু কবিতাকে বিশেষ করে বুঝাবার জন্য যখন ছবি আঁকা হবে তখন তা মৌলিক ছবি হবে না। অবশ্য তারও একটা স্বার্থকতা আছে কিন্তু তা, ছবি আঁকার উদ্দেশ্যে করা হয় না বলেই সে-সব ছবি অন্য পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। ভাবুক শিল্পী একটা ভাবকে তাঁর ছবিতে রচনা করবেন আর ছবি তার নিজস্ব ভাবটুকু দর্শকের মনে ধরিয়ে দিবে। যেমন চীনা শিল্পীর "শরৎকালে ভেসে যাওয়া একটা পাতা ও পোকা" ছবিটি একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করে।

প্রসাধন—শ্রীসত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কি কি বস্তুর সমাবেশ হলে ভাবটুকু ধরা পড়বে আর কি ভাবে আঁকলে যথার্থ রূপটি প্রকাশ পাবে ও ভাবটি আরো প্রাঞ্জল হয়ে ফুটে উঠবে তারই চিন্তা করবে শিল্পী। কোনো একটা বিশেষ পথ নেই যা অবলম্বন করে আঁকলেই হবে ভারতীয় ছবি। দেশীয় উপাদানে দেশীয় বিষয় বস্তু রচিত হবে ছবিতে। শিল্পীর প্রকাশ ভঙ্গীতেই ছবি সুন্দর হয় আবার অসুন্দরও হয়ে থাকে। কাজেই কি আঁকব তা চিন্তে না করে কি ভাবে আঁকব তারই চিন্তা করবে বিশেষ করে শিল্পী, তবেই তার নিজস্ব পথ খুঁজে নিতে দেরী হবে না।

বর্ত্তমানে বঙ্গীয় কলাপদ্ধতির ছবিতে বিষয় নির্ব্বাচনে একটা অতি আধুনিক নতুন পথের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। এই নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে শিল্পীশ্রেষ্ঠ নন্দলালের শিষ্য ও নাতি-শিষ্যদের ছবিতে। তাঁদের ছবির বিষয় বস্তু নির্ব্বাচিত হচ্ছে সাধারণ জীবনচিত্র হতে এবং উপাদান সংগ্রহীত

নতুন নতুন ছবি আঁকতে হবে নতুন পথ ধরে। ছবি যদি গতানুগতিক হয়ে পড়ে তবেই বিপদ। দেবদেবীর বিষয় ও পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়েই কেবল ছবি লেখা এতদিন চলেছিল। এক সময়ে বাঙলা সাহিত্যেও এরূপ হয়েছিল যখন কৃষ্ণপ্রেম ছাড়া কবিতা লেখা হতে পারে সেকথা তখনকার কবিরা ভাবতে পারতেন না। বর্ত্তমানে কবিতার কত নতুন নতুন উৎস সৃষ্টি অবিরাম চলেছে। বাঙলা সাহিত্যের মত বাঙলার চিত্রকলারও নতুন নতুন পথ ধরে চলতে হবে। সে-পথ প্রবর্ত্তনের মত প্রেরণা চাই এবং সর্ব্বোপরি চাই সত্যিকারের শিক্ষা।

শিল্পীর মৌলিকতায় বিষয় বস্তু নির্ব্বাচিত হবে এবং

কম্বকার—শ্রীকৃপাল সেন

জাহাঙ্গীরের শিকার—শ্রীআবদুল মৈন

হচ্ছে প্রাত্যহিকদিনকার গৃহস্থালী সামগ্রী থেকে। যে-সব বিষয় সাধারণতঃ বিশেষ কোনো ভাবব্যঞ্জক নয় বলে সাধারণের নিকট ধরা পড়্‌ত না সে-সব বিষয়কেই তাঁরা লোক চক্ষুর 'পরে তুলে ধরেছেন ছবি এঁকে। এরূপ ছবিরই কতক নমুনা এখানে দেওয়া হল।

শিল্পী রমেন্দ্রনাথের যে-চারটি ছবির প্রতিলিপি দেওয়া গেল এর সব কয়টিই আমাদের প্রতিদিনকার জীবনধারার অতি পরিচিত রূপ। 'বাজার' ছবিতে মাছের বাজারের এবং গঙ্গার ঘাটে মেয়েদের স্নান ও আনুসঙ্গিক বৈষয়িক আলাপ-আলোচনার ছবিতে মধুর দৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। পদ্মার চর ছবিটি বর্ষাকালের নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের একটি মনোরম চিত্র। ষ্টীমার দেখবার কৌতূহল এবং মাঝির ব্যতিব্যস্তভাব আর সর্বোপরি মাচার উপর মাত্র একটি ঘরে সমস্ত পরিবারের বাস বাঙ্‌লার অতিশয় মনোরম এবং সকরুণ দৃশ্য। বিবাহান্তে (এই ছবিটির একটি ত্রিবর্ণ প্রতিলিপি এই সংখ্যায়ই প্রকাশিত হইল) ছবিটি আলঙ্করিক (decorative) এবং দেওয়াল-চিত্র (fresco) পদ্ধতিতে আঁকা বাঙ্‌লার একটি মাঙ্গলিক উৎসবের চিত্র।

দুস্থ বাঙ্‌লার আর একটি দৃশ্য আমরা দেখ্‌তে পাই অজিতগুপ্তের খেয়াঘাট ছবিতে; নদীর ওপারের হাটে নানাবিধ জিনিস বিক্রী করবার জন্য মেয়েরা নৌকোয় চলেছে। তাঁর কামাখ্যা ছবিটি বাঙ্‌লার মেয়েদের বহু ঈপ্সিত তীর্থযাত্রার একটি সুন্দর অভিব্যক্তি।

পূর্ববঙ্গের নীচু জায়গার ছবি এঁকেছেন বিশেষ করে নলিনীকান্ত অতি মনোরম ভাবে। তাঁর বাবা ছবিটি পূর্ববঙ্গের শরৎকালের একটি আলঙ্করিক দৃশ্য। এই ছবিটি সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাঙ্‌লার রঙ্‌ ও রূপ' প্রবন্ধে লিখেছেন—"সেকালের একদল পটো বাঙ্‌লার পট লিখে গেছে কিন্তু বাঙ্‌লা দেশ কিম্বা বাঙালীর ঘর কেমন,

মসজিদের পথে—শ্রীআবদুল মৈন

কোন্ সুখ দুঃখের সুর বাজ্‌ছে সেখানে—নদীর জলে, আকাশের আলোয়, দিনে রাতে, তার খবর সেকালের

হিমালয় দুহিতা—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

পটে ধরা নেই—রাম, রাবণ সব আছে, মকরবাহিনী মা গঙ্গাও আছেন, কিন্তু গাঁয়ের ধার দিয়ে যে নদী ঘরের মেয়েটির মতো কলধ্বনি করে চলেছে সেকালের পটোদের স্বপ্নেও ধরা দেয়নি সে! বাঙ্‌লার রঙ্ ও রূপ আজ্‌কের এই নবীন পটোর কাছ থেকেই পেলাম আমি—এই জন্যেই শ্রীমান নলিনীকান্তকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারিনে।"

(বিচিত্রা, পৌষ, ১৩৩৯)

ইন্দু রক্ষিতের 'দুপুরের বাঁশী' ও 'ঢেঁকি' ছবিতে বাঙ্‌লার মাঠের এবং ঘরের অতি সুন্দর বিষয় বস্তুর সমাবেশ পাওয়া যাচ্ছে। মাঠে ছেলেদের এবং ঘরে মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের অতি সুপরিচিত সুর এই ছবি দু'টিতে পাওয়া যায়। ফাঁকা মাঠে ভরা দুপুরে গাছের ছায়ায় মোষের পিঠে চড়ে বাঁশী বাজানো আর অপরদিকে ঘরের কোণে সেই দুপুরে ঢেঁকিশালে কাজের সঙ্গে সঙ্গে

উমার তপস্যা—শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার

নাত্‌নীদের নিয়ে ঠাকুরমার রূপকথা বলার এমন ছবি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সেইরূপ সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রসাধন' ছবিটিতে

মেয়েদের অপরাহ্ণ কালের ঘরের দাওয়ায় বসে নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ভাব, আর সুশীল সেনের 'কর্মকার' ছবিটিতে পুরুষদের প্রতিদিনকার পরিশ্রমের ছাপ অতি সুন্দর ফুটে উঠেছে।

আবদুল মৈনের 'জাহাঙ্গীরের শীকার' ছবিটি মুঘল পদ্ধতির একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা। তাঁর আঁকা "মসজিদের পথে" ছবিখানি দিল্লীর দৈনন্দিন জীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ছবিখানিও মুঘল পদ্ধতিতে আঁকা।

এ ছবিগুলির প্রায় সব কয়টিই বাঙ্‌লার

নদীর ঘাট—শ্রীসুশীল সেন

নলিনী মজুমদারের 'উমার তপস্যা' ও সুশীল সেনের 'নদীর ঘাট' ছবি দু'খানিও নৈসর্গিক চিত্রের অতি সুন্দর নমুনা।

তারক বসুর 'হাট' ছবিখানি একটি বাজারের পরিকল্পনা। এটিকে Institute of health and hygieneএর hall-য়ের দেওয়ালে ২৯ ফুট লম্বা ও ১৩ ফুট উঁচু করে fresco করার জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছে।

বাঙ্‌লার ছবি আঁকার এই যে একটা নতুনত্ব দেখা দিয়েছে এ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

হাট—শ্রীতারক বসু

চিত্র। পাহাড়ীদের বিশেষতঃ হিমালয়ের পাদমূলের অধিবাসীদের জীবনচিত্র বিশেষ করে এঁকেছেন শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। এখানে তাঁর মাত্র একটি ছবির নমুনা দেওয়া গেল।

"প্রাচীন বাঙ্‌লার পটে প্রাচীন বাঙ্‌লার পটো অনেকখানি কারিগরি করে গেছে কিন্তু তাদের কৌশল দিয়ে গেছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস, আর এই যে আজকের

লেখা বাঙালীর হাতে বাঙ্‌লার নানা ছোট-খাটো ঘরাও ঘটনার ছবি'এ কত তফাৎ সেই শিব, দুর্গা, রাম, রাবণ, কৃষ্ণ, রাধা কিম্বা শাক্ত বৈষ্ণবের ঝগড়া, খোল কর্ত্তালের ঝনঝনানির মতো রঙ দিয়ে বানানো গাজীর পট প্রভৃতির সঙ্গে! * * * * * * এই যে শুভ দৃষ্টি হয়েছে আসল বাঙ্‌লার সঙ্গে বাঙালী শিল্পীর এইটেই দেবে শুভ ফল; আর জোর করে তাকে দেড়শো দু'শো বছরের আগেকার চিত্র বিচিত্র করে নক্সা কাটা জোয়ালে জুড়ে দিয়ে চালাতে গেলে ফল হবে বিপরীত রকম চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ব্যাপার। এই বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার আজ্‌কের শিল্পীদের এবং যাঁরা বাঙ্‌লার শিল্পের অভ্যুদয় চান তাঁদেরও।" (বাঙ্‌লার রঙ ও রূপ, বিচিত্রা পৌষ, ১৩৩৯)।

মণিলাল সেন শর্ম্মা

পুনর্ম্মিলন

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমার চলার পথের আগে
আমার এ মন রইবে।
হৃদয় মম নিত্য জেনো
তোমার স্মৃতি বইবে।
এই জীবনে সকাল-সাঁঝে
ফিরতে হবে নানান কাজে
মনটি তবু ভুল্‌বে না গো
তোমার কথা কইবে।
শ্রাবণদিনে, গহনরাতে
সজল মৃদু বাদলবাতে
আকাশ যবে ধরার কাণে
গোপন কথা কইবে,—

বুকের মাঝে সকল ব্যথা
স্তব্ধ হয়ে মর্‌বে, রাণী,
আঁখির তারা পলকহারা
বাহিরে চেয়ে রইবে।
তোমায় মনে পড়্‌বে বলে'
ভাস্‌ব না গো চোখের জলে,
পরাণ মম সকল ব্যথা
হাসিমুখেই সইবে।
একটি কথা জাগ্‌ছে মনে,—
ফাগুনদিনে ফুলের বনে
পাতার ফাঁকে তোমার সনে
হবেই দেখা দৈবে।

পলাশবনে, অশোকশাখে
মুহুর্ম্মুহু কোকিল ডাকে
সকল কিছুর সঙ্গে শুধু
তুমিই মিশে রইবে।
সেদিন আমার হৃদয়বনে
দখিন হাওয়া বইবে।

স্বপ্ন, বাস্তব, স্মৃতি

শ্রীলীলাময় রায়

৬

ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে একটি বড় দোতালা বাড়ী, একটি রাঁধুনি বামুন, রাশি রাশি চাল ডাল তরকারী, নেতাদের খাট পালঙ্ক কাঁসার বাসন ও নীম্নগণদের কলাপাতা, প্রত্যেকের একটা করে চরকা ও সর্ব্বমোট তিনটে তাঁত, কাপড় রং করার সরঞ্জাম, গণেশন ও নটেশন প্রকাশিত পুস্তকাবলী, ইংরেজী ইয়ং ইণ্ডিয়া ও হিন্দী নবজীবন—এরই নাম স্বরাজ আশ্রম। তার সঙ্গে একটি বিদ্যাপীঠ জুড়ে দিতে আশ্রমিকদের একটা দলের আগ্রহ। অপর দল বলেন, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন একমাত্র কর্ত্তব্য অগ্নিনির্ব্বাপণ। Education can wait. Swaraj cannot. যারা নিয়মনিষ্ঠ ভাবে চরকা কাটে ও রীতিমত খাটে তারা লেখাপড়ার একটু সুযোগ পেলে বর্ত্তে যায়, শুধু গণেশন ও নটেশন পড়ে কতটুক মস্তিষ্ক চর্চ্চা হয়? যারা ভিক্ষা করতে যায়, বক্তৃতা করে আসে, সাধারণের কাছে তাদেরই খাতির বেশী, কাগজে তাদেরই নাম ওঠে। তারা দেশোদ্ধার ব্রতে এতটুক শৈথিল্য সহ্য করতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দলে সুধী, শেষোক্ত দলে বাবাজি। দুই দলের দলাদলিই হল আশ্রমের আভ্যন্তরিক পলিটিক্স। সুধীর দল শাসিয়ে বলে, আমরা পৃথক হয়ে যাব। বাবাজির দল বিদ্রূপ করে বলে, সেই সঙ্গে আহারটা পৃথক আদায় কোরো।

খোরা[illegible] জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরা সুধীর দল, অর্থাৎ সুধী [illegible]একজন অপ্রধান সদস্য, আদৌ পছন্দ করে না। তারা জোট বেঁধে ধরল গিয়ে দেশের এক প্রসিদ্ধ দাতাকে। তিনি তাদের জন্য একটি বাগান বাড়ী ও কয়েক বিঘা জমি উৎসর্গ করে তাদের দিয়ে এই অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন যে কংগ্রেস যে দিন আদেশ করবে সেদিন জেলের দিকে পা বাড়িয়ে দিতে হবে, সেই তাদের গুরু দক্ষিণা।

জাতীয় শিক্ষার নামে দেশের দিকে দিকে তামাসা চলছিল। সরকারী ইস্কুলের কাঠামোর সঙ্গে সুধীদের বিদ্যাপীঠের কাঠামোর এমন কোনো প্রভেদ ছিল না। শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় হিন্দী ও চরকা জুড়ে দিয়ে, পাঠ্য পুস্তকের বেলায় ভিনসেণ্ট স্মিথের স্থলে ডিগ্‌বী নৌরোজী ও রমেশ দত্ত পাঠ্য করে সরকারী ইস্কুলের শিক্ষায় ও সংস্কারে লালিত অসহযোগী মাষ্টারগণ স্বজন পরিত্যাগী ও স্বজন পরিত্যক্ত উচ্চাশা বালকদের সন্তুষ্ট করতে পারছিলেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে আকারে এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়েছে তাতে কোনো সরলমতি বালকের আন্তরিক অনুমোদন থাকতে পারে না। ডিগ্রীর মোহে, লেটারের লোভে, জীবিকার সম্ভাবনায় এদের তীব্র নিরানন্দ সহনীয় হয়েছিল। যেই জাতীয় শিক্ষার কথা উঠল, দেশোদ্ধারের গৌরব তার সঙ্গে যুক্ত হল, অমনি এরা ধরে নিল যে এদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটবে; জ্ঞান পরিবেশন যাঁরা করবেন তাঁরা হবেন জ্ঞানান্বেষণে নিতারত; গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ অকৃত্রিম ও অব্যাহত হবে; শিষ্য যখন খুসী জিজ্ঞাসা করবে, "এটা জানতে চাই"; গুরু অযাচিত ভাবে কোনো কিছু চাপাবেন না, যাচিত হলে ফাঁকি দিয়ে বাসায় গিয়ে পাশা খেলবেন না। উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। অর্থাৎ ছাত্রের অনুরাগ রক্ষা করতে পারল না। দ্বিতীয়ত বছর পুরল, কিন্তু স্বরাজ মিলল না। স্বরাজ বলতে যে কে কি বুঝেছিল৹ তার হিসাব নিকাশের সময় এল। যারা একটা ধরাবাঁধা সংজ্ঞা চাইল নেতারা তাদের থামিয়ে দিয়ে বল্লেন, স্বরাজ! স্বরাজের কোনো সংজ্ঞা হয়? জাতির ভাবগত সত্ত্বার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ইত্যাদি ছেলে ভুলান বচন সুধীর কানে বিশ্রী বাজল। স্বরাজ বলতে গান্ধীজি যে ঠিক কোন জিনিষটি

বোঝেন তাঁর তাৎকালীন বক্তৃতা ও প্রবন্ধ থেকে তা প্রতীয়মান হল না। সুধী পড়্‌ল তাঁর পুরাতন রচনা 'হিন্দ্‌ স্বরাজ'। গান্ধীজির পরিকল্পনা তার কাছে স্পষ্ট হল। গান্ধীজির ভারত-ইংলণ্ডের রূপান্তর ব্ল্যাক্‌ ইংলণ্ড্‌ হবে না। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকে পৃথিবীর সব দেশে প্রতিমান বলে গণ্য করা হয়েছে, গান্ধীজি করেছেন তাকে বেশ্যার সঙ্গে তুলনা।

বিদ্যাপীঠ ধীরে ধীরে শূন্য হতে লাগ্‌ল। বেশীর ভাগ ছেলে ফিরে গেল 'গোলাম খানায়।' অন্যেরা গেল জেলে। সুধীর কর্ত্তব্য স্থির করতে সময় লাগে, সে চিন্তা কর্‌ছিল। এমন সময় এল বাবাজি। বল্ল, "বিলিতী কাপড় পোড়াতে হবে। স্বদেশের গাঁজাও শ্রেয়, পর বস্ত্র ভয়াবহ।"

সুধী বল্ল, "যা নিজে তৈরী করতে পারিনে তাকে পোড়ান হচ্ছে পরের প্রতি ঈর্ষা প্রণোদিত দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাপুরুষতা।"

বাবাজি চটে গিয়ে বল্ল, "মহাত্মাজির চেয়ে তুই ভাল বুঝিস্‌। না? সি-আর-দাসের চেয়ে তোর বুদ্ধি বেশী? না? তোর মত দো-মনা কর্ম্মীদের জন্যই ত স্বরাজটা ঘরে তুলতে পারা যাচ্ছে না, মাঠে মাঠে মারা যাচ্ছে। কই তোর সেই বিলিতী কাপড়ের পুঁটুলি, যা পরে তুই আশ্রমে প্রথম আসিস্‌। আমি নিজের হাতে পোড়াব।"

"সে আমি ম্যাঞ্চেষ্টারে ফেরৎ পাঠাব বলে রেখে দিয়েছি। হয়ত একদিন সাথে করে নিয়ে যাব। ওরাই যা হয় করবে।" সুধী বল্ল হেসে।

সুধীর হাসি বাবাজির বরদাস্ত হল না। অহিংস ক্রোধে সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কর্‌ছিল। ইংরেজকে ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করতে পার্‌ছে না। ইংরেজের তৈরী কাপড় পুড়িয়ে যদি শান্তি পায়। সুধীর ঘর খানতল্লাস করে সে ঐ কাপড়ের পুঁটুলিটি উদ্ধার কর্‌ল। তারপর সয়তানী হাসি হেসে একটি দেশলাইয়ের কাটি জ্বালাল। হঠাৎ কি ভেবে বল্ল, "না, এখানে পোড়ালে কে দেখ্‌বে? বাজারের চৌরাস্তায় আজ লঙ্কাকাণ্ড বাধাব।"

হনুমান!

৮

৭

শ্রীরতন ছিল সুধীর প্রিয় সতীর্থ। সুধীর সঙ্গে তার মত মিল্‌ল। এই আন্দোলনের একমাত্র সত্য হচ্ছে চরকা। চরকায় পার্লামেণ্টারী স্বরাজ হোক বা নাই হোক দেশের শতকরা আশীজন—দেশের কৃষককুল—যদি পরমুখানপেক্ষী হয় তবে সেই হবে গান্ধীজির স্বপ্নের স্বরাজ। ভারতবর্ষের আত্মা চায় অন্নবস্ত্রে আত্মবশ হয়ে, দেহ-ধারণে নিশ্চিন্ত হয়ে পরমার্থের অনুসন্ধান করতে, মুক্তিতত্ত্বের অনুশীলন করতে। রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে উকীল ব্যারিষ্টার যেমন স্বরাজ চান্‌ তাঁদেরকে তেমনি স্বরাজের, অর্থাৎ স্বপ্রভুত্বের, আশা দিয়ে গান্ধীজি কি ভুল কর্‌লেন! সত্যিকারের স্বরাজ যাদের জন্য ও যাদেরকে নিয়ে সেই জনগণ গান্ধীজির অনুগামী হতে পার্‌ছে কই!

সুধী বল্ল, "এস, চরকা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্‌। পল্লীর লোককে সুতা কাটা শেখাতে হবে।"

শ্রীরতন বল্ল, "চরকাটা গান্ধীজির পক্ষে নূতন, 'হিন্দ্‌ স্বরাজে' তার উল্লেখ আছে বলে মনে পড়্‌ছে না, আফ্রিকা থেকে ফিরে এই সেদিন ওর আর্থিক ও নৈতিক উপযোগিতা তিনি উপলব্ধি কর্‌লেন। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে চরকা হচ্ছে গোরুর গাড়ীর মত প্রাচীন ও সার্ব্বত্রিক। যারা চরকায় সুতা কাট্‌তে কাট্‌তে অশোক চন্দ্রগুপ্ত ও আকবর আওরংজীবের যুগ অতিক্রম কর্‌ল তাদেরকে তুমি আমি যাব শেখাতে।"

সুধী বল্ল, "তবে কেন তারা চরকায় সুতা কাটে না এই হবে আমাদের শিক্ষণীয়। এই উপলক্ষে আমাদের সনাতন স্বদেশের বিচিত্র জন মন অধ্যয়ন করব। পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাব, রাত কাটাব গাছতলায়, যে যা দেবে তাই খাব, জাতের বিচার করব না। হাজার হাজার বছর তাদের কি ভাবে কেটেছে ইতিহাসে তার বিবরণ নেই। ভূগোলে কেবল নদী পর্ব্বতের বর্ণনা থাকে, নগরের লোকসংখ্যা থাকে, আমরা পর্য্যটন করে পর্য্যবেক্ষণ করব কোথায় কাদের কি বৃত্তি, কি প্রথা, কি পার্ব্বণ।"

শ্রীরতন রাজী হল, কিন্তু বল্ল, "নিষ্কর্ম্মা পর্য্যটককে লোকে

সন্দেহ করে। হয় সাধু সেজে তীর্থযাত্রা করতে হবে নয় ব্যাপারী সেজে কেনাবেচা করতে করতে চলা যাবে। কোন্‌টা তোমার পছন্দ হয়, সুধীজি।"

"সাধু সাজলে," সুধী ভেবে বল্ল, "কত লোক হাত দেখাবে, মাদুলি মাগবে, পায়ে পড়বে। জটা বানিয়ে ভস্ম মেখে গাঁজার ছিলিমে টান দিয়ে ভয়ানক ভণ্ডামী করব। আসল সাধুরা আমাদের দেখতে পেলে রক্ষা থাকবে না, শ্রীরতনজি।"

"কিন্তু ব্যাপারী সাজলেও ঠেকা কম নয়। পায়ে পায়ে ঠকতে হবে সেয়ানা পাইকারদের কাছে। গাছতলায় রাত কাটাতে গিয়ে ডাকাতের হাতে কাটা পড়তে না হয়!" শ্রীরতন কথার সঙ্গে ভ্রূভঙ্গীর অনুপান দিল।

অবশেষে ওরা খদ্দরের দালাল হয়ে চরকার সুতার বাণ্ডিল মাথায় গ্রামে গ্রামে তাঁতীর বাড়ী খুঁজল। মজুরী দিয়ে ধুতী ও শাড়ী তৈরী করিয়ে নেয়। নিয়ে পথে যে শহর পড়ে সেই শহরে ফিরি করে।

তাঁতীরা বলে, "বিহি বিলিতী সুতা দিন বাবু: এমন উমদা চীজ বানাব যা দেখে আপনাদেরও আনন্দ হবে, আমাদেরও। এগুলা কি সুতা!"

কি অবজ্ঞা তাদের! কি আপত্তি! তারা এক শতাব্দী আগে চরকার সুতায় কাপড় বুনত কেমন করে, এ প্রশ্নের উত্তরে বলে, সে সব দিন গেছে। এখন ঘোর কলিযুগ।

তবু চরকার সুতায় খাদি বোনে ও সেই খাদি গ্রামের লোককে পরায় এমন তাঁতীরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মোটা লাল পাড়, সরল সতেজ নক্সা, গাছগাছড়ার রং— আভ্যন্তরীণ গ্রামের মেয়েরা এখনো এই শাড়ী পছন্দ করে। চরকাও তারা চালায়। সে সব চরকা কত কালের, হয়ত ইংরেজ আমলেরই নয়।

একে ব্রাহ্মণ, তার উপর অতিথি—সুধী ও শ্রীরতন প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই প্রচুর সিধা ও শোবার ঘর পেল। ব্রাহ্মণ হয়ে কাপড়ের ব্যবসা করে কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নাজেহাল হয়। বলে, আজকাল জাতধর্ম্ম কি রাখবার জো আছে রে ভাই। তোমাদেরই গ্রামের কত বামুন সিপাহী হয়েছে, কত ছত্রী কায়েতের কাজ করছে।—শ্রীরতন আড়াই ঘণ্টাব্যাপী আহ্নিকের দ্বারা সকলের তাক লাগিয়ে দিত। ব্যবসা যাই হোক, গায়ত্রীতে অধিকার ত আছে। সুধী ওসব মানে না, তাই সন্দিগ্ধদের কৌতূহল দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুলসীদাস খানা সুর সুর করে পড়তে লেগে যেত। এ স্থানে উল্লেখ করতে হয় যে হিন্দী লিখতে পড়তে ও বলতে সুধী হিন্দুস্থানীদের সমান পারত।

ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে গান্ধীর নাম রাষ্ট্র হয়েছিল। কেউ হাটে গিয়ে শুনে এসে সবাইকে শুনিয়েছে, কেউ আদালতে গিয়ে। গান্ধী যে মানুষ নন্, মানুষের বেশে নারায়ণ, এ নিয়ে তাদের কল্পনার অন্ত ছিল না। তিনি যেবার নিকটস্থ শহর দিয়ে রেলপথে যাচ্ছিলেন, সেবার রেলগাড়ীর প্রত্যেক কামরায় কেবল তিনি, তিনি, তিনি। তাঁকে ধরবার জন্য সরকার বাহাদুর কত চেষ্টা করছেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই ত তিনি, কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন।

কিন্তু গান্ধী যে ছত্রিশ জাতের লোককে জোলা হতে বলছেন এই অভিযোগ শ্রীরতন ও সুধী অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও সুচতুর গ্রামিকদের মুখে শুনল। তবে ত সব একাকার হয়ে যাবে। তিনি মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, এতেও অনেকে আতঙ্কিত। ওদের জাত নেই, এ ওদের এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কেউ কেউ শ্রীরতনকে ও সুধীকে জিজ্ঞাসা করেছে আপনারা একই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ত? এক পাকে খান যে। শ্রীরতন ভেবে জবাব দেয়, আমি হলুম কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ, আমার পাকে ভূভারতের যাবতীয় ব্রাহ্মণের চলে।

৮

সেই দিনগুলি মনে পড়লে সুধীর বয়সের ভার নিঃশব্দে নেমে যায়। সে তখন বাঁশী বাজাতে ভালবাসত। শুনেছিল একমাত্র ছেলের মায়েরা সাঝের বেলা বাঁশী শুনলে রাত্রে অভুক্ত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রয়াণের সঙ্গে এর কি একটা কল্পিত সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য তার বাঁশী

বাড়ানর সময় ছিল শেষরাত্রি। যে রাত্রে যে গ্রামেই থাকুক সে শেষরাত্রে উঠে বাঁশীর সুরে আপনাকে নিঃসীম শূন্যে প্রসারিত করে দিত; চিত্ত তার বিশ্বের ওপার স্পর্শ করে আসত। কখন এক সময় কোকিলের ঘুম ভেঙ্গে যেত, সে দ্রুতকণ্ঠে ডেকে উঠ্‌ত, একটানা কুবু কুবু কুবু কুবু। যেন কি একটা স্মার্ট পাখী, আমাদের চির চেনা কোকিলই নয়। অমনি অন্যান্য পাখীরা নিজ নিজ ভাষায় কলরব করে উঠ্‌ত। মিনিট পাঁচেক ধরে এই শব্দ-সঙ্গত অবিরাম চলে। তারপর মন্থর হয়ে মিলিয়ে যায়। পাখীরা ঘুমিয়ে পড়ে। মনে হয়না যে একটু পূর্ব্বে এই নিঃসাড় রাত্রি স্বপ্নে কথা কয়ে উঠেছিল। সুধীর বাঁশির সুর নিদ্রিতার নিবিড় কেশে মৃদুল ভাবে অঙ্গুলি চালনা করে।

এক ঘণ্টা পরে আবার সেই শব্দসঙ্গত। এবারেও প্রথম স্বর কোকিলের। সেই ধাবমান একটানা কুবু কুবু কুবু কুবু। পূর্ব্বের সেই পাখীরা মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করে ঝড়ের মত গর্জ্জে ওঠে। তাদের সঙ্গে জুটে যায় অপরাপর দীর্ঘঘুমী পাখী। পূর্ব্বাশার সীমন্ত সিন্দুরাক্ত হয়। নক্ষত্রদের স্বর্গ হতে বিদায়ের ক্ষণে দেহদ্যুতি ম্লান হয়ে আসে। শুকতারা অরুণের ললাটে রূপালী টিপের মত দীপ্যমান দেখায়। নহবৎ তখনও বাজ্‌তে থাকে। বাঁশীখানি কোলে রেখে সুধী একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে। করতে করতে ধ্যানমগ্ন হয়।

কাকের কর্কশ আহ্বানে ধ্যানভঙ্গ হয়। মেয়েরা ওঠে। বাসিকাজ সারে। জল আন্‌তে যায়। পুরুষরা ওঠে। হুকায় টান দেয়। হাল বলদ নিয়ে ক্ষেতে রওয়ানা হয়। সূর্য্যের তেজ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়্‌তে থাকে। গ্রামের পশুরা ও শিশুরা পাখীদের স্থান নিয়ে আসর সরগরম করে রেখেছে। মেয়েলি কোন্দল থেকে থেকে রসভঙ্গ করছে। মেয়েলি কান্না কিন্তু বিশুদ্ধ সঙ্গীত।

মেয়েদের বর্ণাঢ্য সজ্জা, ললিত গমন, নিত্যকর্ম্মের অবলীলা, অকপট আতিথ্য; পুরুষদের দাম্ভিক পাগ্‌ড়ি, গম্ভীর মুখমণ্ডল, স্বল্পবাক্ শ্রম, ঈশ্বরনির্ভর নির্ভাবনা সুধীকে প্রতিদিন নূতন বিস্ময়, অননুভূত আনন্দ জোগাত। এদের জন্য তার করবার কি আছে, এদেরকে তার শেখাবার কি আছে? তবে তাদের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে জমিদারের অত্যাচার, তাদের অদূরদর্শিতার সুযোগ নিয়ে মহাজনের মৃগয়া, তাদের কূপমণ্ডুকতার সুযোগ নিয়ে সরকারী আমলা ও পেয়াদাদের ঔদ্ধত্য—এসব সুধীর কানে শ্রীরতনের কানে পৌঁছলে তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে শ্রান্ত হত, কার্য্যত কোনো সাহায্য করতে প্রস্তুত হত না। সুধী বল্‌ত "ওরা যা করবে ওদের নিজেদের দায়িত্বে করবে। আমরা সে কাজ ওদের জন্য করে দিলে ওরা কোনো দিন আত্ম-দায়িত্ব-সচেতন হবে না; আমাদের তল্লাস করে যখন আমাদের পাবে না তখন কোনো টাউটের পাল্লায় পড়ে উকীলের কবলস্থ হবে।" শ্রীরতন বল্‌ত, "ওদের আতিথেয়তায় পুষ্ট হয়ে ওদের জন্য যদি কিছু করে না যেতে পারি তবে উকীলের চেয়ে আমরা কম কিসে?"

এমনি একটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে শ্রীরতন এক-সঙ্গে নায়েব দারোগা ও গ্রাম্য প্রধানকে প্রকুপিত করল। ঘটনাটা এই। কলুর ছেলে বাবুলাল বামুনের ছেলে রাঘোশরণকে শা—বলে সম্বোধন করল। রাঘোশরণ লাঠির চোটে বাবুলালের মাথা ফাঁক করে দিল। কলু চল্ল দারোগার কাছে দরবার করতে। যে সে কলু নয়। বঙ্গাল মুল্লুকে গিয়ে লাল হয়ে এসেছে, গ্রামে দালান দিচ্ছে। বামুন শ্রীরতনের কাছে নিবেদন করল, আপনি এর একটা সালিশ বিচার করুন। নইলে কলুর সঙ্গে আদালতে আমি লড়্‌তে পারব না। শ্রীরতন বিচার করল বটে, কিন্তু বামুনের ছেলেকে বল্ল তুমি বাবুলালের পায়ে ধরে ক্ষমা চাও। বামুন তাতে এমন অপমান বোধ করল যে সোজা চল্ল জমিদারের নায়েবের দরবারে। নায়েব দারোগা এক অপরের মাসতুত ভাই। নিজেদের মধ্যে একটা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে দুজনেই তলব দিল শ্রীরতনকে ও তার সঙ্গী সুধীকে। খদ্দর দেখে দারোগার চক্ষু স্থির। প্রধানকে হাঁক দিয়ে বল্ল, "কি রে বুদ্ধু, গান্ধীর লোককে এ গ্রামে ঠাঁই দেয় কেটা?" দারোগা যত বলে নায়েব বলে তার সাত গুণ। আকাশের দিকে চেয়ে বল্ল, "ঘুঘু ত দেখ্‌ছিনে? ভিটেতে চরাব কি?"

শ্রীরতন ও সুধী দুজনেই রাজদ্বারে চালান গেল।

ক্রিমিন্যাল প্রেসিডিওর কোডের একশ নয় ধারার আসামী। ওরা কে, ওদের ঘর-বাড়ী কোথায়, কি ওদের পেশা? শ্রীরতন বল্ল, "বল্‌তে বাধা নেই। ইংরেজের আদালতের সঙ্গে আমার অসহযোগ।" সুধী অমন মূঢ়তার পরিচয় দিল না। সমস্ত খুলে বল্ল। বণ্ড্ দিতে অস্বীকৃত হয়ে শ্রীরতন গেল জেলে। বেকসুর খালাস হয়ে সুধী পড়্‌ল একলা।

তার বিচারক ছিলেন রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন। তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বল্লেন, "তুমি কিসের অসহযোগী হে? স্বরাজ মন্দিরে যেতে পেছপাও হলে। এস আমার ছেলের সঙ্গে তোমার ভাব করিয়ে দিই।" খালাসের যথার্থ হেতু সুধী পরে জেনেছিল। তার পরলোকগত পিতা শম্ভুনাথ মহিমচন্দ্রের এক ক্লাস উপরে পড়্‌তেন ও মহিমচন্দ্রকে সংস্কৃত পড়া বলে দিতেন। "সংস্কৃতে আমি ছিলুম যাকে বলে গো-মূর্খ। আমার বিশ্বাস ছিল না যে 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র একটা বর্ণ আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ পাবে। শম্ভু আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিল। বল্ল, 'যে ময়রা সন্দেশের ভিয়ান জানে তার হাতে কাঁচাগোল্লাও ওৎরায়। তোর আসল ভয়টা কি তা আমি জানি। পাছে সংস্কৃত ভাল শিখ্‌লে ইংরেজী মন্দ শেখা হয়। অরে মূর্খ! যে মগজে বিধাতা স্বয়ং শান্ দিয়েছেন তার দ্বারা ইংরেজীও যেমন কাটে সংস্কৃতও তেমনি।' তারপর থেকে আমি ইংরেজীতেও ফার্ষ্ট, সংস্কৃততেও ফার্ষ্ট। কিন্তু আমার ছেলেটাকে দেখ্‌ছ ত? সংস্কৃততে প্রায় পাস মার্ক, ইংরেজীতে প্রায় ফুল মার্ক। হরে দরে সেই একই ফল— ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট।" গর্ব্বে তাঁর অশ্রুক্ষরণ হচ্ছিল।

প্রথম দর্শনে বাদল যেমন মুখচোরা তেমনি লাজুক। সুধীর সঙ্গে কথা বল্ল না। আন্‌মনে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। মহিমচন্দ্রই ৪০।০ আলাপ করলেন। পরিশেষে সুধীকে অনুরোধ করলেন তাঁর ওখানে দিন কয়েক থেকে যেতে। "আর অসহযোগ চালিয়ে কি হবে। তোমাদের মহাত্মা ত কারাগারে। দাশ যাচ্ছেন কাউন্সিলে, নেহরু যাচ্ছেন য়্যাসেম্ব্লীতে। উকীলরা সুড় সুড় করে গর্ত্তে ঢুকছে খদ্দরের ভেক ধরে। ছাত্ররা পিল পিল করে গর্ত্ত পানে ফিরেছে। জুলাইতে কলেজ খুল্‌লে দেখ্‌বে কেমন ভিড়। আমি বলি কি, সুধী, আমি তোমাকে রেকমেণ্ড্ করতে প্রস্তুত আছি, তুমিও বাদলের সঙ্গে পাটনা কলেজে নাম লেখাও।"

বাদলের সঙ্গে সুধীর প্রথম কথোপকথন এইরূপ।—

সুধী। আপনার বাবা বল্‌ছিলেন আপনি এখনই বিলেত যেতে চান।

বাদল। আমি ত এখনই যেতে চাই। কিন্তু বাবা বল্‌ছেন সবুর করতে।

সুধী। স্বদেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া বয়ঃসাপেক্ষ। তারপরে বিদেশ—

বাদল। স্বদেশ আপনি কাকে বলেন? অনিবার্য্য কারণে যে দেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছি সেই যদি আমার স্বদেশ হয় তবে কিপ্‌লিং-এর স্বদেশ এই ভারতবর্ষ।

সুধী। কিন্তু কিপ্‌লিং-এর বংশ যে বৈদেশিক।

বাদল। দেশের কথা থেকে বংশের কথা উঠ্‌ল। তর্কশাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ হল না কি?

সুধী। লজিক আপনি এরই মধ্যে পড়েছেন?

বাদল। শুধু কি লজিক! কিন্তু যাক্ ওকথা।

সুধী। দেখুন, আমার মনে হয় স্বদেশের শিক্ষা বেশ করে অন্তরে ধারণ করে তারপরে বিদেশের শিক্ষা বরণ করতে ইচ্ছা থাকে ত পারেন। বিলেত একদিন আমিও হয়ত যাব, কিন্তু দূর থেকে আপনার দেশকে আরো আপনার বলে জানতে।

বাদল। আমার স্বদেশ আমার স্বমনোনীত দেশ, আর আমার শিক্ষা আমার স্বভাবসম্মত শিক্ষা। তেমন দেশ ইংলণ্ড আর তেমন শিক্ষা হিউম্যানিষ্টিক। যাকে বাঙ্গে লোকে বলে মডার্ণ।

(ক্রমশঃ)

লীলাময় রায়

চৈতালী চিঠি

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী

ওরে তরু ! তোর তনুর তুলনে বুদ্ধি তেমন নয় তো সরু !
আইন জীবির জরু হয়ে তবু অরুটাও দেখি নেহাৎ গরু !
আমার বঁধুর মধুর চিঠিতে ছড়ানো আছেই অনেক ছড়া,
বিরহী বরের বর্ণনা মোর রসে ভরপুর মিঠে ও কড়া,—
এই ভেবে রোজ চিঠির জন্যে সকাল সন্ধ্যে জ্বালাও খালি
নিজেরাই কেন লেখোনা দুজনে অতি আধুনিকা তরুণী শালী !
যত বলি ওরে নেইকো সেদিন, আমরা এখন নেহাৎ বুড়ো !
পাবিনে চিঠিতে বিরহ-উতল প্রেম পরিমল একটু গুঁড়ো !
তোদের এখন নব-যৌবন আমরা দু'জন পুরাণো পচা !
যখন তখন প্রেমের লিখন এ বয়সে আর যায় কি রচা !
মধুবসন্ত যদিও এসেছে বনবনান্তে ছড়ায়ে ফুল,—
অন্তরে তবু লাগেনি সে ছোঁওয়া, অটল সেখানে শীতের হুল্ !
দেনা জমে গেছে দেদার দু'ধারে তারি তাগাদায় দিনে ও রাতে
টেঁকা হল দায় কি করি উপায়, একটি পয়সা থাকেনা হাতে !
কান্ত আমার প্রাণান্ত প্রায় দিনান্ত তাঁর হয় না যেন,
এই দেখ্ তিনি লিখেছেন,—"হ্যাঁগো ! বসন্ত আসে
এদেশে কেন ?
চৈত্র দুপুরে মরি ঘুরে ঘুরে পথে পথে ফিরি কাজের চাপে,
দারুণ গরমে হাজার করমে সিদ্ধ হতেছি রোদেরি তাপে।
কী যে অনুভূতি বোঝাবো কী করে ? তেতে-ওঠা পথে
কষ্টে চলা,—
ছাতাহীন এই মাথার উপরে সূর্য্য বেঁধেন্ অগ্নিশলা।
বিকট শব্দে লরী চলে যায় নাকে মুখে চোখে ঢোকে যা' ধূলো !
চাপা দেয়-দেয় চল্তি পথিকে এই ভাবে ছোটে ট্যাক্সিগুলো !
গরুর গাড়ীরা মন্থর গতি পথ জুড়ে দেয় পথিকে বাধা !
রিক্শা আলারা আছে তার মাঝে ট্রাম থেমে আছে
যেথানে গাদা।

নব বসন্তে নগরবাসীরে বসন্ত টীকা হতেছে নিতে,—
ফুলশর নয় বিভীষিকাময় মারীগুটী ভয় উদয় চিতে।
শীতলার এই উতলা আদর জানিনা শহর এড়াবে কবে !
কলেরা কখন কোলে নেয় ভেবে—ভয়ে ভয়ে কাল
কাটাই সবে
মেস্‌বাড়ী যেন মেষেরি গোহাল, করোগেট আর দর্ম্মা আঁটা ;—
গুমট্ গরমে গুমথুন্ রাতে, ঘুরেও ঘোরে না ঘড়ীর কাঁটা !
চারিদিকে যেন নীরেট গাঁথুনি ইটের কোঠার কোটরে থাকি
ছোট্ট একটি খড়খড়ি তারো তুলতে বারেক পাইনে পাখি !
দুটি 'রুম্‌মেট্' একের হাঁপানী অন্যে ভুগিছে গাঁটের বাতে,—
একশো পনেরো 'হিট্' যদি ওঠে, তবুও জানালা
খোলেনা রাতে
খাওয়ার ফন্দ চেয়েছো চিঠিতে, মেসের রান্না কেমনতর ?
তোমার হাতের চেয়ে ভালো কিনা ?—বলোতো কেমন
আশাটা কর
সজিনার ডাঁটা আজকাল তাকে কাঠি বলা ভালো ডাঁটি
না বলে
পাটের কাঠিও ভালো এর চেয়ে, বেতের বদলে চালানো চলে
এ হেন সজিনা ডাঁটা চচ্চড়ী, কাঁচ কলা ভাজা
(প্রায় সে পোড়া,
খেলো মোটা চাল, কলায়ের দাল, থোড়ের ছেঁচ্‌কি
মেলেনা জোড়া
চিংড়িমাছের বাবালোক ছেড়ে ঝোল রাঁধে যেন পুকুর পানি,
ডুব দিয়ে তাতে নেমে নেওয়া যায়, তাও পাতে পড়ে
একটু খানি
রান্নার ঘরে নিত্য নূতন 'মেনু' বদলানো বিশ্রী রীতি,
'ভদ্রলোকের এককথা' এই ভদ্রের মেসে হন্দ নীতি।

সন্ধ্যায় ফিরি বাসায় বাসাড়ে,—শূন্য পকেটে শুথ্নো মুখে,
ট্রাম বাস্‌গুলো ছুটে চলে যায় টিট্‌কারি দিয়ে আমারি দুখে।
ক্লান্তচরণ চায়না চলিতে, পাঁচটি পয়সা ট্রামের ভাড়া!
মনে ভাবি, দিলে, মাশুল অভাবে তোমার চিঠিটি হবেনা ছাড়া।
দৃঢ় করে নিয়ে শিথিল পা দুটো চালাই আবার দ্বিগুণ জোরে!
তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে আসে, পড়ন্ত রোদে মাথাও ঘোরে।
সাইকেল্ দেখে লোভ হয় বড় পেতেম যদি গো এমন দিনে!!
লটারীতে যদি টাকা পাই কিছু আগেই একটা রাখবো কিনে।
পথের ওধারে পানের দোকানে কত যে পানীয় সাজিয়ে রাখে,—
কাচের গেলাসে স্ফটিক বরফ দূর থেকে মন ভোলাতে থাকে!
বিবিধ ফলের রঙীণ সিরাপে নানা সরবৎ রয়েছে করা,
কচি কচি ডাব, সুশীতল ঘোল শোভে সারি সারি পাত্র ভরা।
চায়ের দোকানে ঠুং ঠাং ধ্বনি চুড়ি বা চাবির চেয়েও মিঠে,
রসনা সরস হয়ে ওঠে দেখে কাচের আধারে বিলিতি-পিঠে!
ফুটপাতে বসে মেড়ো ফল আলা পুঞ্জার পরে পরাত রেখে
বেচে সুরভিত আখের টিক্‌লি গাণ্ডেরী-প্রিয় পথিক ডেকে!
গোলাপী শাঁসেতে কালোবিচি আঁকা তরমুজ-ফালি সাজিয়ে
ডালা,
চুণারী শাড়ীতে আলো করে দিক্ হাসে পসারিণী যুবতী বালা।
কেউ বেচে ক্ষীরা খাসা খরমুজা লকেটগুচ্ছ অম্ল মধু!
'কাঁচা মিঠা আম—' হাঁকে মিঠস্বরে পশ্চিমা কোনো সুরূপা
বধূ।
শুনে বেগোনাক' ভেবোনা তা' বলে ফেরে এই ছলে এ
পরদেশী,
পসারিণী নয়, তোমার দিব্য!! পসরাই টানে মনটা বেশী।
বৈদ্য বামুন জানোতো পেটুক, চিরকাল লোভ টাটকা ফলে!
তোমার মতন নই কদাচন 'মা ফলেষু' আমি ত্যাগের বলে!

'মালাইবরফ—' 'পাণি পিনেকা—' ও হাঁকি ঘন ঘন
উচ্চ স্বরে,—
পথে পথে ফেরে বরফ বেপারী পিপাসী পথিকে বিদ্ধ করে।
স্নিগ্ধ শীতল সুপেয় পানীয় মরুভূমে মরীচিকারি সম
তৃষিত তাপিত অভাবগ্রস্তে করে পরিহাস কঠোরতম।
চিন্তাকাতর শ্রান্ত শরীর ক্ষুৎপিপাসায় শুষ্ক গলা,—
আয় নেই যার বেকার মানুষ বড় দায় তার রাস্তা চলা।
নিঃস্বজনের নিরুপায় মনে ধিক্কার গ্লানি ভরিয়ে দিতে
সুখ আরামের বিলাসঅঘা যেখানে যা আছে এ পৃথিবীতে
সুন্দর করে রয়েছে সাজানো দিকে দিকে এই নগরী তলে
অক্ষমতার দুঃখদহন তাই তো এখানে দ্বিগুণ জ্বলে!
তুমি যে কি করে আছো একা ঘরে কী ফল তা ভেবে আমি
কে জানি:
তবু এ প্রবাসে তোমারি ভাবনা ভরে আছে মোর হৃদয়
খানি।—"

মধু বসন্তে বঁধুয়া আমার কী মধুর লিপি লিখেছে বোন্—
নিশ্চয় আজ এ খবর জেনে পুলকে তোদের ভরেছে মন।
শুনলি তো তাঁর চৈতালীচিঠি? মিটেছে কি সখ হ্যারে ও
অরু?
চুপ্ মেরে গেলি কেন দুইবোনে? এ চিঠি নেহাৎ সাহারা-মরু!
তোদের চিঠির মতন মোটেই আমাদের চিঠি নয়কো বলি!
করবিনে তবু বিশ্বাস তোরা? ভাবিস্ তোদের মিথ্যে ছলি।
নব বসন্ত বর্ণনা শুনে বোবা হলি বুঝি ক্ষোভে ও লাজে?
আর কি জ্বালাতে আসবি দুজনে—"চিঠি দেখি"
বলে সকালে সাঁঝে?

অপরাজিতা দেবী
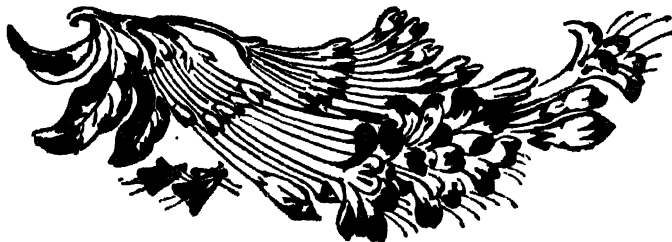
ধর্ম্ম বনাম Narcissism বা আত্মপ্রেম

ডাঃ শ্রীসরসীলাল সরকার এম-এ

পশুদের ব্যক্তিগত জীবন যাপন করিবার কতকগুলি সুবিধা ছিল। তাহাদের প্রধান কার্য্য ছিল, খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি; সেই সমস্ত কার্য্য-সাধনের জন্য তাহাদের দন্ত, নখ ও পেশীর বল ছিল, দ্রুতধাবন শক্তি ছিল। আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিক দিয়াও তাহারা আত্মরক্ষার পক্ষে অনেক সুবিধা পাইত, এবং সহজাত সংস্কার-লব্ধ শক্তি হইতেও তাহারা অনেক সুবিধা লাভ করিত।

মানুষ যখন ক্রমবিকাশে পশু হইতে মানবপদবীতে আরোহণ করিল তখন তাহাদের পশুদের মত দৈহিক অস্ত্র কিছুই রহিল না, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুযোগ এবং সহজাত সংস্কার-লব্ধ শক্তির সুযোগও তাহাদের অনেক পরিমাণে ত্যাগ করিতে হইল। এই সমস্ত পুরাতন জীবনের পথের সুবিধার বন্ধনগুলি ত্যাগ করিয়া তাহারা রিক্ত হইয়া ও মুক্ত হইয়া নূতন পথে জয় যাত্রায় অভিযান করিল। পশু-জীবনের প্রকৃতিদত্ত সুবিধা ছাড়িয়া তাহাদের যে নূতন অবস্থা হইল তাহাতে তাহাদের পক্ষে একক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব রহিল না, কাযেই তাহাদের পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া জীবন-যাত্রার প্রণালী গ্রহণ করিতে হইল। এইভাবে মানুষের সামাজিক জীবনের সূত্রপাত হইল।

এই মিলিয়া মিশিয়া জীবনযাত্রার প্রথম কথা জীবিকা-অর্জ্জন। পূর্ব্বের পশুজীবনে দৈহিক অস্ত্র ও পারিপর্শ্বিক অবস্থার সাহায্য এই দুইয়ের আনুকূল্যে তাহাদের আহার্য্য সংগ্রহ করা সহজ হইত। এখন প্রকৃতির শক্তি জয় করিয়া তাহা হইতে তাহাদের জীবন যাত্রার উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং সেইজন্য তাহাদের জয়লাভ করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে। এই জ্ঞান ও ক্ষমতা অর্জ্জনের জন্য তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় কথা,—সম্মিলিত জ্ঞান ও ক্ষমতায় যাহা সংগৃহীত হইল সেই সম্পত্তি সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। একজন মানুষের অপর মানুষের উপর প্রভুত্বের ইচ্ছা ও অধিকার স্থাপনের যে চেষ্টা তাহার মধ্যে আত্মপ্রেমের ভাব খুব প্রবলভাবে থাকে। মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের মতে এই যে আত্মপ্রেম ইহা অপরিবর্ত্তনীয় নয়, এই আত্মপ্রেমই পরিবর্ত্তিত হইয়া 'পরপ্রেমে' পরিণত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে।

এই সম্পত্তি-বিভাগ ব্যাপারে যাহাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতা অধিক তাহারা ভাগের বেলায় নিজেদের যাহাতে সুবিধা হয় সেইরূপ ভাবে ভাগ করিয়া লইলেন, এবং ক্রমশঃ ভাগ বাটোয়ারা সম্বন্ধে সেইরূপ নিয়মেরই প্রচলন হইয়া গেল। সমাজের মধ্যে যাঁহারা অধিক শক্তিশালী তাঁহারা নিজের আয়ত্তাধীনস্থ মানুষগুলিকেও নিজের সম্পত্তিরূপে গণ্য করিয়া লইলেন, এইভাবে দাস-প্রথার সৃষ্টি হইল এবং পুরুষেরা স্ত্রীলোক অপেক্ষা সাধারণতঃ অধিক বলবান ও অধিক শক্তিশালী বলিয়া স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইল।

মানুষ তার নিজের ছোট 'অহংকে' এমন একটি বড় 'অহং'-এ পরিণত করিতে পারে যে তাহার ব্যক্তিগত 'আমিত্ব' প্রসারিত হইয়া অন্য ব্যক্তিকে নিজের 'আমিত্বে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া নিজের ব্যক্তিগত আত্মপ্রেম তাহার উপর আরোপ করিতে পারে। অনেক সময় 'আত্মপ্রেমে'র জন্যই অর্থাৎ নিজের সুবিধার জন্যই এইরূপ অন্যকে ভালবাসা দরকার হইয়া পড়ে, কারণ নিজেকে লইয়াই কেহ জীবন যাপন করিতে পারে না, এবং করিয়া তৃপ্তি পায় না।

যাহাতে এই প্রসারতার ব্যাপার সামাজিক জীবনের পক্ষে সুবিধাজনক হয়, সেইজন্য এই আত্মপ্রেম প্রসারের

একটা পদ্ধতি দরকার হইয়াছিল, আদিমযুগের ধর্ম্মভাবের মধ্যে এই পদ্ধতির সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

মানুষের 'আত্মাদর' আছে আবার অন্যের উপর ভালবাসাও আছে, ইহার সামঞ্জস্যের জন্য আদিমযুগের ধর্ম্মভাবের মধ্যে এইরূপ একটি সিদ্ধান্তের ধারণা আসিল, যে 'অন্যকে আমি ভালবাসি। সে আমার অধিকারভুক্ত, সম্পত্তিস্বরূপ, সেইজন্যই আমি তাহাকে ভালবাসি।' এই যে ধর্ম্মবোধ ইহা আদিমযুগের প্রবৃত্তিজাত ধর্ম্মবোধ। আদিমযুগে মানুষের প্রবৃত্তি খুব বলবান ছিল সুতরাং ধর্ম্মবোধের মধ্যে এইরূপ ভাবই প্রবল ছিল। কিন্তু পরে যখন মানুষের মধ্যে যথার্থ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মবোধের বিকাশ হইল—তখন আদিমযুগের এই প্রবৃত্তির ধর্ম্মের স্তরের উপর আর এক নূতন ধর্ম্মভাবের স্তর গঠিত হইল, তাহাকে আমরা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের স্তর বলিতে পারি। প্রবৃত্তির ধর্ম্ম নিজের 'অহং' বোধকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়াছিল। আর আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম 'অহং' বোধকে ছাড়াইয়া এক বিশ্ব-চৈতন্যের উপলব্ধিকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল। এই ভাব যতই বিকাশ হইতে লাগিল মানুষের অন্য মানুষকে নিজ অধিকার ভুক্ত সম্পত্তি বোধের ভাব ততই দূর হইতে লাগিল, এবং সকল মানুষের প্রতি সমদৃষ্টি ভাবটাই যে যথার্থই নীতিসঙ্গত ও কর্ত্তব্য ইহা অন্ততঃ যুক্তির দিক দিয়াও মানুষ গ্রহণ করিল। কিন্তু তথাপি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া মানুষের যে আত্মপ্রেম আদিমযুগে আত্মতৃপ্তি উপভোগ করিত তাহা এ যুগের ধর্ম্মের আশ্রয়ও সহজে ত্যাগ করিতে চাহিল না। সেইজন্য ধর্ম্মের মধ্যে আত্মপ্রেমের ছদ্মবেশে অবস্থিতির দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেই পাওয়া যায়; হিন্দুধর্ম্ম হইতে সেই সম্বন্ধে গুটিকতক দৃষ্টান্ত দিবার জন্য আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা।

হিন্দু দর্শনের সার কথা এই যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ব্রহ্ম রহিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক মানুষই আমার সহিত সম অধিকার সম্পন্ন কেবল একথা মানিলেও হিন্দুদর্শনকে যথার্থভাবে মানা হয় না, প্রত্যেক মানুষই আমার ভালবাসার ও শ্রদ্ধার বস্তু আমাকে ইহাই মানিতে হইবে। এই যে অতিউদার শিক্ষা, ইহার সহিত হিন্দু সমাজের প্রচলিত শাস্ত্রীয় সমাজ-ব্যবস্থা যদি মিলাইয়া দেখি তাহা হইলে দেখিতে পাই অনেকস্থলে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। সে ব্যবস্থা মতে হিন্দুসমাজের একটি বড় অংশই অস্পৃশ্য এবং হেয়। হিন্দু সমাজের মধ্যে জন্মলাভ করা তাহাদের পক্ষে সৌভাগ্য তো নয়ই বরং চরম দুর্ভাগ্য। কারণ জন্মের সঙ্গেই যে হেয়ত্বের অধিকারী হইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা কোনরূপ পুরুষকার বা চেষ্টার দ্বারা মোচন করিবারও তাহাদের উপায় নাই। আর সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য এই যে শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইলে তাহাদের জ্ঞানের পথও রুদ্ধ হয়। কেননা অনেক অনুশাসনে সেইরূপই বিধি আছে। মনুর অনুশাসনে, "শূদ্রকে মতি (অর্থাৎ যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি হয় এরূপ শিক্ষা) দিবে না" এরূপ নিষেধও আছে। শাস্তি বিষয়েও নীচ জাতি ও উচ্চ জাতির মধ্যে যেরূপ ভেদ রাখা হইয়াছে সে বিধানগুলিকে ন্যায়ের বিধান বলিয়া মানিয়া লওয়া সুকঠিন; যেমন ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড একেবারেই নাই এবং শূদ্রের শারীরিক দণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং অল্প অপরাধেও ঐ দণ্ড হইত। শূদ্র দ্বিজকে গালি দিলে তাহার দণ্ড জিহ্বা ছেদন। নীচ জাতি যে অঙ্গ শ্রেষ্ঠবর্ণকে মারিবার জন্য তুলিত সেই অঙ্গ ছেদন করা হইত। শূদ্র উচ্চ বর্ণের সহিত দর্প করিয়া একাসনে বসিতে গেলে তাহার কটি দেশে তপ্ত লৌহশলাকার ছাপ দিয়া তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইত। ব্রাহ্মণের চুল ধরিলে বিনা বিচারেই তাহার দুই হস্ত ছেদন করা হইত। তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে অপরাধী শূদ্রকে নানা বিচিত্র দণ্ড দিয়া বধ করার নিয়মও ছিল।

অর্থ সম্বন্ধেও ন্যায় বিচার এইরূপ:—ব্রাহ্মণ টাকা ধার করিলে তাঁহাকে শতকরা দুই পণ সুদ, ক্ষত্রিয়কে শতকরা চার পণ এবং শূদ্রকে পাঁচ পণ সুদ দিতে হইবে। পুরাকালের এই সমস্ত সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অধিকার যাহাদের হাতে থাকে তাহাদের প্রবর্ত্তিত অনুশাসনের অনেক মিল দেখা যায়। জেতৃজাতির বিজিত জাতির উপর যে সমস্ত অন্যায় ব্যবহার সেইগুলি আইন ও ন্যায় বিচারের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। ভারতবর্ষে শূদ্রবর্ণের উপর দ্বিজজাতির শাস্ত্রীয়

অনুশাসনের নাম লইয়া যে অত্যাচার তাহার মূলেও আদিমকালের রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্থাৎ জেতার বিজিতের উপর অত্যাচারের ভাব আছে। কারণ ইতিহাসে দেখা যায় যে আর্য্যগণ যাঁহারা অনার্য্যগণকে জয় করিয়া নিজ অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠবর্ণ দ্বিজাতি হইয়াছিলেন এবং বিজিত অনার্য্যগণ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে যাঁহারা দ্বিজ তাঁহারাই যে আদিম যুগের বিজেতাগণের বংশধর এবং যাঁহারা শূদ্র তাহারাই যে বিজিতগণের বংশধর একথা অবশ্য বলা যায় না, কিন্তু সমাজের মধ্যে সেই অধিকারের ভাবটী এখনও প্রচলিত রহিয়াছে এবং বোধ হয় তাহার ফলেই সমস্ত জাতিকেই শূদ্রত্ব অর্থাৎ দাসত্ব বরণ করিতে হইয়াছে। পুরাকালের শূদ্রসম্বন্ধীয় বিধি বিধান আজকাল নাই বটে, কিন্তু অংশতঃভাবে এখনও আছে। যেমন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়—হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য জাতির কোন ছাত্রের পক্ষে, সে যতই মেধাবী হউক না, বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া কঠিন, এবং হিন্দুবোর্ডিংএ থাকিয়া পড়াশুনা করা তাহার পক্ষে প্রায় একরূপ অসম্ভব। হিন্দু-সমাজে এখন পর্য্যন্তও নীচবর্ণের উপর এই যে যুক্তিহীন অন্যায় ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে, এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বিশেষভাবে ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন না, তাহার মূল কারণ কি একথা যদি আমরা আলোচনা করি তাহা হইলে দেখি আদিমযুগে যে আত্মপ্রেম হইতে অন্যকে নিজের অধিকারভুক্ত সম্পত্তিবোধ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল আজিও সেই আত্মপ্রেমই সামাজিক নিয়মের নামে এই ভাবে সমাজের একশ্রেণীর লোকের গভীর মনের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। এই যে মানুষের আত্মাদর বা আত্মপ্রেম, যাহা তাহার মনের গভীর স্তরের এক প্রচ্ছন্ন অংশে শিকড় গাড়িয়া রহিয়া ধর্ম্মেরই ছদ্মাবরণে নিজেকে প্রকাশ করে, মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রে ইহাই Narcissism নামে অভিহিত হয়।

আদিম যুগে পুরুষের সহিত মেয়েদের যে সম্বন্ধ ছিল তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অধিকার পুরুষদিগের অপেক্ষা কম ছিল। পুরুষেরাই স্ত্রীলোকের প্রভু এবং স্ত্রীজাতি তাহাদের সম্পত্তি স্বরূপ ছিল। এইরূপ ব্যবস্থা ভারতবর্ষে মনুর সময়েও ছিল। মনুর মতে, "স্ত্রীলোক বালিকাই হউক, যুবতীই হউক বা বৃদ্ধাই হোক গৃহেতেও কোন কার্য্য স্বাধীন ভাবে করিবে না (অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যেই পুরুষের অনুমতি লইতে হইবে)। কখনও স্বাধীনতা গ্রহণ করিবে না।* স্ত্রীলোক দিবারাত্রি স্বামী পিতা প্রভৃতির বশে থাকিবে।" † স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম যে কেবল তাহাদের উপর স্নেহ ও সহানুভূতির জন্যই হইয়াছে সে কথা বলা যায় না, কারণ সমাজে স্ত্রীজাতির উপর ব্যবহার যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় স্নেহের আবরণে পুরুষ জাতির প্রভুত্ব ও স্বার্থপরতা সেই সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে বিশেষ ভাবেই আছে।

পূর্ব্বকালে রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে সম্ভ্রান্ত বংশে কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে অনেক সময় শিশু কন্যাকে বিষ খাওয়াইয়া মারা হইত, কেননা সেই কন্যা বড় হইলে যদি তাহাকে উপযুক্ত পাত্রে দেওয়া না যায় অথবা কন্যাদানের জন্য কন্যার পিতাকে পাত্র পক্ষের নিকট যদি নত হইতে হয় —কন্যার জন্য নিজেরও বংশের মর্য্যাদা হানির সেই সম্ভাবনা এইভাবে আগে হইতেই প্রতিবিধান করা হইত। কৃষ্ণকুমারীকে যে তাহার পিতা বিষপান করিবার জন্য বিষপাত্র দিয়াছিলেন ইহাও সেই কন্যাহত্যার মনোবৃত্তিরই আর এক রূপে প্রকাশ। জহরব্রতকে আমরা সকলেই সম্মান দিই, কেননা তাহার ভিতরে মেয়েদের দিক দিয়া একটি বিশেষ মহত্ত্ব আছে, কিন্তু জহর ব্রতের উদ্‌যোগী পুরুষের দিক দিয়া ইহা অসম্ভব না যে Narcissism জাত কন্যাহত্যার মনোবৃত্তি ইহারও মধ্যে ছিল।

ইহার পর সতীদাহের কথা বলা যাইতে পারে। যাহা ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। সতীদাহের মধ্যে অনেক স্থলে দুর্ল্লভ সতীত্ব-গরিমা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু অনেক সময়ে সতীদের বলপূর্ব্বক কিম্বা শোকের সময় যখন তাহারা বুদ্ধিহারা হইয়াছে তখন তাহাদের নানাভাবে প্ররোচিত করিয়াও যে

* মনু পঞ্চম অধ্যায় ১৪৭-৪৮ শ্লোক।
† নবম অধ্যায় ২ শ্লোক।

এই দাহকার্য্য করান না হইত এমন নয়। পুরুষেরা মুখে অবশ্য সতীদিগের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, কিন্তু তাহাদের মনে সেই আত্মত্যাগের মধ্যে যে মহিমা আছে তাহা বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিয়াছিল কি? ১৮১৬ হইতে ১৮২৩ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সতীদাহ হয় ৫৪২৫, আর মান্দ্রাজে হয় ২৮৭ এবং বোম্বাই প্রদেশে হয় ২৪৮। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ওক্লী সাহেব একটী সরকারী রিপোর্টে লেখেন যে "দারোগাদের হস্তক্ষেপনই সতীদাহ বৃদ্ধির প্রধান কারণ।" ঐ সনের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট চ্যাপ্‌ম্যান্ সাহেব লিখেন "সরকারী হস্তক্ষেপই সতীদাহ বৃদ্ধির প্রধান কারণ।" ইহার দ্বারা বুঝা যায় সতীদাহ ব্যাপার হিন্দুর ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বঙ্গদেশে পুলিশেরও তাহাতে সাহায্য ছিল। এইভাবে বাংলার 'সতীদাহ' ব্যাপারটা একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একদিকে এইরূপ সতীদাহ চলিতেছিল এবং অন্যদিকে পুরুষের বহু বিবাহ ও বৃদ্ধ বয়সে বিবাহও সমভাবে চলিতেছিল। উলা ও বিরনগরের ইতিহাস নামক গ্রন্থে এক সঙ্গে এক চিতায় ১৪টী সতীদাহনের কথা আছে, তাহার মধ্যে মৃতের ১৩টী পত্নী সহমৃতা হইতে আসিয়াছিলেন ও একটী স্ত্রী দাহকার্য্য দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন তাঁহাকেও বলপূর্ব্বক চিতায় নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। সতীদের মহিমা পুরুষেরা মুখে যতই কীর্ত্তন করুন কিন্তু তাঁহাদের গভীরতর মনের মধ্যে এই সতীদের তাঁহারা স্বামীর অধিকারভুক্ত সম্পত্তি ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতেন না, সতীদাহ-তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। আদিম যুগে অনেক দেশে এ রকম প্রথাও ছিল যে কোন বড়লোক মারা গেলে তাঁহাকে কবর দিবার সময় তাঁহার কতকগুলি স্ত্রী ও দাস ও ঘোড়া ও অন্যান্য পশু এক সঙ্গেই কবর দেওয়া হইত। সতীদাহের মধ্যে সেই আদিম যুগের প্রথার ধারা আমরা দেখিতে পাই। সতী হইলে সে জ্ঞাতির সম্পত্তি লইয়া আর বিবোধ করিতে পারিবে না, এবং সে নিজে যাঁহার সম্পত্তি ছিল তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহার আর অন্যের অধিকারে যাইবার সম্ভাবনাও রহিল না। হিন্দু ধর্ম্মে 'সতী হওয়া' অর্থাৎ স্বামীর সহিত অনুমৃতা হওয়া সম্বন্ধে একটা বিশেষ সম্মান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বাংলা দেশে এই যে অসংখ্য সতী আত্মাহুতি দিয়াছেন, আমি কার্য্য উপলক্ষে বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি সেই সঙ্গে তাহাদের কোন স্মৃতিচিহ্ন অথবা ইতিহাস আছে কিনা সংগ্রহ করিবার জন্য আমি সর্ব্বত্রই চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কোন স্থানেই সক্ষম হই নাই। এখনও হিন্দু জাতির এক শ্রেণীর সুশিক্ষিত পুরুষগণের মধ্যেও রমণীগণের উপর অধিকারভুক্ত সম্পত্তি বোধের ভাব যে স্পষ্টই রহিয়াছে তাহা সর্দার বাল্যবিবাহ-নিরোধ বিলের সময় প্রমাণিত হইয়াছে। সরদার বিলের বিরুদ্ধবাদীগণ হিন্দুর সমাজ ধর্ম্মকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্যই যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন উচ্চকণ্ঠে ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু সরদা বিলের পক্ষে মনুষ্যত্বের দিক দিয়া যে একটা যুক্তি রহিয়াছে যাহাকে লঙ্ঘন করা যায় না, এ কথা তাহাদের মনের মধ্যে একেবারেই স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এই না পারার কারণ যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে সেই ধার্ম্মিকতার ছদ্মাবরণে আবৃত আত্মপ্রেম বা Narcissism এর প্রসঙ্গেই আমাদের আসিতে হয়।

শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা "হিন্দু বিধবার স্বামীর সম্পত্তিতে অংশলাভ" সম্বন্ধে একটী বিল ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত এই বিলের বিরুদ্ধে এই বলিয়া প্রতিবাদ করেন যে, "বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবিশ্বাসীরূপে আমি এই বিল সমর্থন করিতে পারি না এবং প্রাচীন ঋষিদিগের পবিত্র অনুশাসনে হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই।" তিনি আরও বলেন "এই বিল গৃহীত হইলে হিন্দুর সমাজ গঠনের মূল-নীতিতে কুঠারাঘাত করা হইবে।" অর্থাৎ তাঁহার কথার ভাব এই যে তিনি হিন্দু বিধবাগণকে স্বামীর সম্পত্তির অংশ লাভে অনধিকারিণী করিয়া তাঁহাদের উপকারই করিতেছেন। এই রকম মনের ভাব Narcissism-এর একটা বিশেষ লক্ষণ। Narcissism গ্রস্তগণের নিজের আত্মপ্রেমকে মহা আত্মত্যাগ, ধার্ম্মিকতা বা আধ্যাত্মিকতা বলিয়া মনে হয়, এবং নিজের আত্মপ্রেমের জন্য যাহাদের অনিষ্ট করা হইতেছে, তাহাদের 'মঙ্গলই করিতেছি এবং মঙ্গলের উদ্দেশ্যে একটা সৎকার্য্য

করিতেছি' এইরূপ মনে হয়। Narcissism-এর আরও একটী বিশেষ রহস্য এই যে, Narcissism-গ্রস্ত বিধান-দাতাগণ পরের বেলায় বিধান খাটাইতে ব্যগ্র বটে কিন্তু নিজের বেলায় বিধান মানিয়া উঠা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। হয়তো সেই জন্যই বিধবাদের সম্বন্ধে ব্রহ্মচর্য্য ও সতীদাহের ব্যবস্থা এবং পুরুষদের জন্য বহু বিবাহ ও যথেচ্ছ আচরণের ব্যবস্থা।

আমাদের হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ সমূহে Narcissism বা আত্মাদর হইতেই যে বুদ্ধিবিকার ঘটে তাহা নানাস্থলে নানা ভাবে বলা হইয়াছে। আধ্যাত্ম রামায়নে শিখিধ্বজ রাজা ও তাঁহার মহিষী চূড়ালার উপাখ্যানে আছে যে, শিখিধ্বজ রাজা আশ্রমবাসী হইয়া সাধন ভজন করিতেন ও তাঁহার পত্নী চূড়ালা মধ্যে মধ্যে স্বামীকে দর্শন করিতে যাইতেন। একদিন চূড়ালা গিয়া দেখিলেন যে তাঁহার স্বামী এক হোমকুণ্ড জ্বালিয়া তাঁহার সমস্ত গ্রন্থগুলি তাহাতে আহুতি দিতেছেন। চূড়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রন্থগুলি এভাবে পুড়াইতেছেন কেন?" শিখিধ্বজ বলিলেন, "আজ আমার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তাই আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব হোমানলে আহুতি দিয়া সর্ব্বত্যাগী হইতেছি।" চূড়ালা একটু হাসিয়া বলিলেন—"আপনি তো গ্রন্থ পুড়াইয়া সর্ব্বত্যাগী হইতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে আত্মাভিমানের বশীভূত হইয়া আপনি গ্রন্থগুলি পুড়াইতেছেন সে আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে কি সমর্থ হইয়াছেন?" অর্থাৎ চূড়ালা বুঝিতে পারিয়াছিলেন শিখিধ্বজ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ তো করেন নাই বরং Narcissism গ্রস্ত হইয়াছেন।

গীতার প্রথমেই দেখিতে পাই শ্রীভগবান অর্জ্জুনের Narcissism যাহাতে দূর হয় সেইজন্য উপদেশ দিতেছেন। অর্জ্জুন তর্ক তুলিয়াছেন, "যাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছি তাহারা আমার গুরু ও পরমাত্মীয়। তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি আমার উচিত? তাঁহাদের হত্যা করিয়া যদি রাজ্যলাভ করি সেই রকম রাজ্যলাভ কি আমার শ্রেয়ঃ হইবে? তাঁহারা যেন লোভে হতচেতন হইয়া এ রকম যুদ্ধ করা যে পাপ কাজ তাহা বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমি যখন এ যে পাপ কাজ তা বুঝতে পারছি তখন কেন ইহা হ'তে নিবৃত্ত হব না?" এখানে অর্জ্জুন ধর্ম্মের দিক দিয়া খুব বড় বড় কথা বলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে দিক দিয়া তিনি বিষয়টী অনুভব করিয়াছেন সেটা যে তাঁর নিজেরই ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের দিক ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। শ্রীভগবান তাঁর মহা ধার্ম্মিকের মত এত বড় বড় কথার অতি সংক্ষেপে এক কথায় উত্তর দিলেন যে, "হে অর্জ্জুন ক্লৈব্যগ্রস্ত হইও না, এই সমস্ত ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর।" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন তুমি Narcissism গ্রস্ত হইও না, যথার্থ যাহা ধর্ম্ম, তাহার একটা অন্যদিক আছে।" তাহার পর ভগবান যথার্থ ধর্ম্ম যে কি সে সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে দুটী কথা ব্যবহার করিয়াছেন, একটী 'আত্মম্ভরি ভাব', ইহাকে স্থূল দৃষ্টিতে যদিও ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় কিন্তু যথার্থ ইহা ধর্ম্ম নয়, যথার্থ ধর্ম্মভাব হইতেছে 'সর্ব্বম্ভরি ভাব।'

বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে যে দুইজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব আছেন যাঁহাদিগকে আমরা ঋষির আসন দিতে পারি, তাঁহাদের একজন মহাত্মা গান্ধী ও অন্যজন কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ। এই দুইজনের লেখাতেই আমাদের Narcissism ত্যাগ করিয়া যথার্থ ধর্ম্মপথ গ্রহণ করার বিষয়ে উপদেশের ইঙ্গিত আছে। মহাত্মা গান্ধী শাস্ত্রের অনুশাসন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"I decline te be bound by any interpretation, however learned it may be, if it is repugnant to reason or moral sense. Scriptures cannot transcend reason and truth. They are intended to purify reason and illuminate truth." অর্থাৎ আমি অস্বীকার করি সেই সমস্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যার দ্বারা বদ্ধ হইতে, যাহা যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হউক না কেন, যদি যুক্তি ও নৈতিক জ্ঞানের পক্ষে বর্জ্জনীয় হয়। ধর্ম্মের মতবাদ যুক্তি ও সত্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। সেগুলির উদ্দেশ্য এই যে, সত্যকে তাহারা আলোকিত করিবে এবং যুক্তিকে বিশুদ্ধ করিবে।

রবীন্দ্রনাথ যাকে আমরা Narcissism বলে উল্লেখ

করছি তার এইভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন "যাঁরা আচারে অনুষ্ঠানে চিরজীবন অনন্ত শুচি হয়ে কাটালেন, ভাবরসে মগ্ন হয়ে রইলেন, তাঁরা তো নিজেরই পূজা করলেন—তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার,—তাঁদের রসসম্ভোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত, আর 'মুক্তি' বলে তাঁরা কিছু যদি পান তবে সেটাতো তাঁদেরই পারলৌকিক্ কোম্পানীর কাগজ।"

আর যথার্থ ধর্ম্মের সংজ্ঞা তিনি এইভাবে দিয়াছেন, "চিরন্তন বিরাট মানব আমি ধ্যানের দ্বারা আমার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি—নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিতে চাই তাঁর মধ্যে, অনুভব করতে চাই আমার মধ্যে সত্য যা কিছু জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমি আমার ছোট আমিকে ছাড়িয়ে যেতে চাই, সেই যিনি বড় আমি, মহান্ আত্মা তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি। সেই উপলব্ধির যোগে আমার পূজা আমার সেবা সত্য হয়। আত্মাভিমানের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়। য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন, যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধির দ্বারা তাঁদের কর্ম্মকে মহৎ করে তোলেন, তাঁরা দূরকালের জন্য প্রাণপন করেন, সর্ব্বদেশের জন্য। তাঁরা যথার্থ ভক্ত।"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে, যাহা যথার্থ ধর্ম্ম তাহা Narcissism হইতে মুক্ত এবং নাস্তিকতা ও আস্তিক্য বাদের মতামত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার মহান্ ধর্ম্মে এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষার মধ্যে তিনি 'ঈশ্বর' ও 'আত্মা'র কথা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন, কারণ এই সমস্ত ধরিয়াও Narcissismএর প্রকাশ হয়। একদা কোন পরিব্রাজক বুদ্ধের নিকট আসিয়া "মৃত্যুর পর পরলোক আছে কি না" "বোধিসত্ত্বগণ ইহলোক-ত্যাগের পর সূক্ষ্মশরীরে বর্ত্তমান থাকেন কি না" প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, বুদ্ধদেব সে প্রসঙ্গে কোন উত্তর না দিয়া মৌন রহিলেন। পরিব্রাজক উত্তর না পাইয়া চলিয়া যাইবার পর আনন্দ দুঃখিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, আপনি উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসুকে নিঃসংশয় করিলেন না কেন?" তদুত্তরে তথাগত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ইহাতে উত্তর দিবার কিছুই নাই। মৃত্যুর পর পরলোক নাই জানিলে এ ব্যক্তি জানিত ইহলোকই সার, এবং পরলোক আছে জানিলে পারলৌকিক সুখ দুঃখ কল্পনা করিয়া তাহাতেই বদ্ধ রহিত। কিন্তু জীবনের যাহা সারকথা সেই কর্ম্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝিত না।"

বুদ্ধদেব সর্ব্বভূতে মৈত্রী ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রেম জিনিসটা সকলের মধ্যে এমন ভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া চাই যাহাতে 'আত্ম' বলিয়া আর পৃথক্ কিছু থাকিবার দরকার থাকিবে না।

সরসীলাল সরকার

মৌন বীণা

শ্রীনবগোপাল দাস আই-সি-এস্

ষ্টেট থিয়েটার থেকে বার হ'য়ে অনুপম ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, ভাইত, রাত বারোটাও যে এখনও হয়নি,' এখ'ন হোটেলে ফিরে যাবে সুধীর ?

সুধীরের মনে তখনও ষ্টেজের ছবি ভাসছে। জার্ম্মাণ ভাসার সাথে তার পরিচয় খুব অল্পই, তবু Faust-এর যা' অভিনয় সে দেখেছে তাতে তার মন জাতটার সাহিত্য, কাল্‌চার ও রসজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছিল। হোটেলের নীরস প্রাণহীন আব্‌হাওয়ার মধ্যে তক্ষুনই ফিরে যাওয়ার জন্য তার মন একটুও উৎসুক ছিলনা, তাই সে অনুপমের প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লে, না ভাই—এখন একটুখানি বেড়ানো যাক্‌। হোটেলে গিয়ে সেই ঘুম ছাড়া ত আর কিছুই নাই

অনুপম সায় দিয়ে বল্‌লে, ঠিক বলেছ সুধীর, আজ রাতের ভিয়েনার শোভা একটু দেখে নেওয়া যাক্‌, কি বল ?

সুধীর হেসে বল্‌লে, ইউরোপের রাজধানী ত কম দেখা হ'লনা অনুপম·· লণ্ডন, প্যারিস, ব্রাসেল্‌স্‌, আম্‌ষ্টারডাম্‌, ভিয়েনা, মায় রোম পর্য্যন্ত ঘুরে এলাম! চমৎকার বেড়ানো হ'ল কিন্তু!

অনুপম বল্‌লে, হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছিলাম বলেই না এটা সম্ভবপর হ'ল! তুমি ত তোমার ফিজিক্সের রিসার্চ্চ নিয়ে মেতে ছিলে, বাইরের জগতের খবরটুকু পর্য্যন্ত রাখ্‌তে না! আমি যদি তোমার কাণটি ধরে না নিয়ে আস্‌তাম তাহ'লে তুমি সেই কুয়োর ব্যাঙ্‌ই হ'য়ে থাক্‌তে!

সুধীর একটু চিন্তিতভাবে জবাব দিলে, কিন্তু এক্টো মাস relativity সম্বন্ধে কত তথ্যই না বেরিয়ে গেল! আমি ত প্রায় back number হ'য়ে পড়্‌লাম!

তাচ্ছিল্যের সুরে অনুপম বল্‌লে, রেখে দাও তোমার ফিজিক্স! বাইরে এসে বাস্তবজগতে যে relativity দেখ্‌লে, তা' তোমার থীসিসে ব্যবহার করো, তোমায় অধ্যাপক তোমার মৌলিকতায় খুসী হ'য়ে আজই তোমার ডিগ্রী দিয়ে দেবেন!

রাতের ভিয়েনা। বারোটা বেজে গেছে, কিন্তু পথে জন কোলাহল একটুও কমেনি। ভিয়েনা লণ্ডন নয়—লোক দেখানো সুরুচির দোহাই দিয়ে তারা বারোটা বাজ্‌লেই আনন্দের পসরা গুটিয়ে নিয়ে চলে যায়না। সান্ধ্যপোষাক পরা তরুণতরুণীরা হাতধরাধরি করে চলেছে—মুখে তাদের তৃপ্তিভরা হাসি, তাদের গতিভঙ্গীতে আনন্দের লীলায়িত উচ্ছ্বাস।

অনুপম বেশ ভালোভাবেই এই যুগলদের নিরীক্ষণ কর্‌ছিল। একটুখানি দুঃখের সুরে সে বলে উঠ্‌লে, জার্ম্মাণ ভাষাটা না জানা থাকাতে কী অসুবিধাটাই হয়েছে ভাই! ভিয়েনার রহস্যমধুরা রূপসীদের মর্ম্মভেদ করবার সুযোগই পেলাম না!

সুধীর প্রতিবাদের সুরে বল্‌লে, ওই ত তোমার দোষ অনুপম! পুরাণো প্রেম নিত্যনতুন সাজে না দেখ্‌লে বুঝি তোমার তৃপ্তি হয় না?

সিগারেটে শেষবারটির মত টান দিয়ে ধোঁয়াটি ছেড়ে অনুপম জবাব দিলে, এর মধ্যে দোষের কী আছে ভাই? যৌবন বয়স, তরুণ চোখ—আর মনে তৃপ্তি, শান্তি ও আনন্দ; তার উচ্ছ্বলিত প্রকাশ যদি মাঝে মাঝে হয় তাহ'লে তা স্বাভাবিক ও সুন্দর ব'লে কোথায় তুমি আমার প্রশংসা করবে, না এখন তুমি নিন্দায় শতমুখ হ'য়ে উঠ্‌ছ!

—নিন্দা কর্‌ছিনা অনুপম। আমি বল্‌ছি এই যে যা' সুন্দর ও সুষ্ঠু তাকে বাইরে থেকে দেখেই তুমি তৃপ্ত হও না কেন? তোমার মর্ম্মভেদের অর্থ ত আমার কাছে অজানা নয়!

কলহাস্যে রাস্তাটা মুখরিত ক'রে অনুপম জবাব দিলে, তোকে আমার ভালো লাগে এই জন্যেই ভাই! তোর এই প্রতিবাদের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা, সুন্দরের প্রতি এমন একটা অবিচলিত শ্রদ্ধা আছে যে সময় সময় মনে হয় যদি তোরই মত চোখে পৃথিবীকে দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তাম তাহ'লে পৃথিবী না জানি কত বিচিত্র এবং অকূল-রহস্য-ভরা ঠেক্‌ত!

Mariahilferstrasse······ভিয়েনার শিল্প ও কারুকার্য্যের প্রদর্শনী বল্‌লেও চলে। বিদ্যুতের আলোতে দোকানের সো' কেস্‌গুলো উদ্ভাসিত। মাঝে মাঝে অনুপম আর সুধীর দাঁড়িয়ে নিবিষ্টমনে সেগুলো পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছিল, আর নানারকম অস্ফুট মন্তব্য প্রকাশ কর্‌ছিল।

খানিকদূর গিয়ে অনুপম বল্‌লে, এমনি ভাবে ভবঘুরের মত চলে আর কী হবে? এসো, কোন একটা নাচের জায়গায় যাই··

সুধীরের কাছে প্রস্তাবটা তত মনঃপূত হ'ল না। সে একটু আব্দারের সুরে বল্‌লে, নাচের হ'লের সেই বদ্ধ হাওয়া আর সিগারেটের ধোঁয়া ত? এসো, রাস্তায়ই আর একটু বেড়ানো যাক্‌···ভেবে দেখ দেখি আজ কী সুন্দর একটা অভিনয় দেখ্‌লাম!

অনুপম বল্‌লে, বাস্তবিকই সুধীর জার্ম্মাণ জাতটার ওপর আমার শ্রদ্ধা ভয়ানকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। চারদিকে এরকম দৈন্য, অবিচারের বোঝা—তবু এরা এদের শিল্পকলাকে কিরকম বাঁচিয়ে রেখেছে!

গভীর সুরে সুধীর জবাব দিলে, ঐখানেই ত এদের শ্রেষ্ঠতা ভাই! দৈন্য, অত্যাচার, পরাধীনতা এদের সুকোমল ও সুষ্ঠু বৃত্তিগুলো খর্ব্ব ক'রে দিতে পারেনি', এরা জানে যে জগৎসভায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হ'লে নিজেদের আর্টকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে, না খেয়েও!

একটুখানি হেঁসে অনুপম প্রশ্ন কর্‌লে, Gretchenকে কেমন লাগ্‌ল?

গভীর সুরে সুধীর বল্‌লে, ভারি চমৎকার লাগ্‌ল, অনুপম। সব চেয়ে চোখে ভাসছে আমার সেই শেষ Scenetা, যখন Faust এসে বল্‌ছে, এক্ষুনি চল, দেরি করলে আর চল্‌বে না, আর Gretchen আবেশ বিহ্বল চোখেই বল্‌ছে, প্রিয়তম, তুমি কি আমায় একটি বারও চুমু খেতে পারনা, এই কদিনের অদর্শনেই কি তোমার অনাদি-কালের উৎস শুকিয়ে গেল?······এ আর ভুলতে পারব না ভাই।

অনুপম একটুখানি কটাক্ষ ক'রে বল্‌লে, তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে দেখি!

—একি ভুল্‌বার জিনিষ, অনুপম, যে মুখস্থ হ'বে না? সেই আকুলতা, সেই করুণ আবেশবিহ্বল চাউনী, উদাসিনী Gretchenএর সেই কুন্তল-আকুল মুখ আর অশ্রুবৃষ্টিভরা অর্থহীন চোখ, এত' মনে দাগ না রেখে যেতে পারেনা, ভাই!

অনুপম হেসে বল্‌লে, দাগ রেখেছে Goethes, আর্ট না Gretchenএর ছবি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ভাই।

কপট রোষের সহিত সুধীর জবাব দিলে, ঠাট্টা কর্‌ছ বটে, কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে হ'লে বল্‌ব, দুটোই দাগ রেখেছে, কারণ আর্টের পরিণতি এবং ফুল্লবিকাশ হয়েছে ছবিতে।

এদিক-ওদিক ঘুরে রাত প্রায় একটার সময় দু'জনে একটা নাচের হ'লে গিয়ে উপস্থিত। ভিয়েনার সব চেয়ে বিখ্যাত নাচের জায়গা—Kursalon···তার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সজ্জার মধ্যে আভিজাত্য ও উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার নিখুঁত অভিব্যক্তি। অনুপম ও সুধীর ত জায়গা দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গেল।

Kursalonএ তখন বেজায় ভীড়—থিয়েটার এবং সীনেমাফেরতা সবাই বসে বিশ্রাম করছে এবং কফি বা শ্যাম্পেন খাচ্ছে। অনুপম এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথায় বস্‌বে ভাবছিল, এমন সময় সুধীরের অস্ফুট চীৎকার শুনে সে অবাক হ'য়ে প্রশ্ন কর্‌লে, কী হ'ল রে সুধীর?

সুধীর বললে, Gretchen এখানে এসেছে...

—বলিস্‌ কি রে, কোথায়?

সুধীর যেন আর কেউ না শুন্‌তে পায় এমনি ভাবে বললে, ওই যে ডানদিকে, থামটার পাশে।

অনুপম তাকিয়ে দেখে সুধীর ঠিকই বলেছে, দৃষ্টিবিভ্রম

তার হয়নি'। একটা টেবিলে এক কোণে শাদা fur-coat পরা একটী মেয়ে বসে কফি খাচ্ছে, তার সম্মুখে একটা কাগজ, পাশে আর কেউই নাই।

অনুপম কি করবে ভাবছে এমন সময় অবাক হয়ে দেখলে সুধীর গম্ভীরভাবে সেই মেয়েটির টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মুখচোখ লাল ক'রে মেয়েটির কাছে এসে অনেকটা হাস্যকরভাবে একটা অভিনন্দন জানিয়েই সুধীর প্রশ্ন ক'রে বসলে, মাপ করবেন, আপনি নিশ্চয়ই ইংরেজী বলতে পারেন?

অনুপম সুধীরের কাণ্ড দেখে খানিকক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়েছিল। এই কি সেই মুখচোরা সুধীর যে সারা সংসারে Relativityর সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছু জানেনা? অনেকটা কৌতূহলের বশে, অনেকটা বন্ধুপ্রীতির দাবীতে সেও এগিয়ে গেল।

মেয়েটি সুধীরের আচমকা প্রশ্নে একটু বিস্মিত হ'য়ে গিয়েছিল, একটুখানি পরে স্মিতমুখে জবাব দিলে, যৎকিঞ্চিৎ জানি বোধ হয়।

সুধীর আর কোন রকম ভদ্রতা বা শিষ্টাচারের অপেক্ষা না রেখে সেই টেবিলেই একটা চেয়ার অধিকার ক'রে বসে পড়ে বললে, আপনাকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাতে আমি এসেছি, আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না।

মেয়েটি এতখানি অবাক্ হয়ে গিয়েছিল যে জবাব দেবার মত কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। তা'ছাড়া কালো এই ভারতীয় ছেলেটির আচমকা সম্ভাষণ এবং শিষ্টাচারবিহীন ব্যবহার তার কাছে নতুনত্বের মাধুর্য্যে ভরা ঠেক্‌ছিল......

সুধীর তখন বলে যাচ্ছে, আপনার প্রতিভার কাছে আমার নতি জানাচ্ছি। Goetheর নাটকখানির যে অংশটুকু করুণ-কোমল আভায় দীপ্ত তার যে অভিব্যক্তি এবং ব্যঞ্জনা আপনি করেছেন তার তুলনা হয়না। বইখানা পড়ে আমি যতটা না মুগ্ধ হয়েছিলাম তার চেয়ে বেশী অভিভূত হয়েছি আপনার ব্রীড়াবনত চোখ, প্রশান্তবিশ্বাসভরা নির্ভর এবং মর্ম্মপাথরভেদী অশ্রুর নির্ঝর দেখে। ভিয়েনায় এসে এই আনন্দটুকু যে পেলাম এর জন্যে বিদেশী পথিকের ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা আপনি নিবেন।

মেয়েটি তখন ভালোভাবে সুধীরের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েছে। বিদেশী এই ছেলেটির চোখ ও মন নিবিড় শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত; এ শ্রদ্ধার মধ্যে কোন-প্রকার স্বার্থ বা কুটিলতা নাই...এ হচ্ছে আর্টের প্রতি শিল্পীর স্তুতি, সুন্দরের প্রতি সুন্দর-পূজারীর সরল প্রীতিনিবেদন। মধুর হেসে সে জবাব দিলে, আপনার এই প্রশংসার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার অভিনয় আপনাদের ভালো লেগেছে এর চেয়ে বড় গৌরবের কথা আর আমার পক্ষে কী হ'তে পারে?

ততক্ষণে সুধীর অনেকখানি আত্মস্থ হয়ে এসেছে। নিজের এই অস্বাভাবিকভাবে ব্যগ্র শ্রদ্ধানিবেদনে নিজেই একটু লজ্জিত হ'য়ে সে বললে, আপনি আমাকে না জানি কী অদ্ভুতই ভাবলেন!

ইতিমধ্যে অনুপমও সেখানে এসে জুটেছে। সে একটু হেসে বললে, আপনি কিছু মনে করবেন না · আমার বন্ধুটির মাথায় সময় সময় আজগুবি অনেক খেয়াল চাপে, এ তারই একটা উচ্ছ্বাস মাত্র।

সুধীর এতক্ষণ অনুপমকে দেখতেই পায়নি'। সে তাড়াতাড়ি উঠে বললে, ওঃ—আমাদের পরিচয়ই দেওয়া হয়নি, এ হচ্ছে আমার বন্ধু, অনুপম রায়, আর আমার নাম সুধীর গাঙ্গুলী...আমরা দু'জনেই ভারতবর্ষের বাসিন্দা।

মেয়েটি অভিনন্দনসূচক ভঙ্গী ক'রে বললে, আমার নাম বোধহয় আজ জেনেছেন, আমি মার্লিন ম্যুলার...

অনুপম বললে, আপনার নাম আগে যদিও বিশেষ জানতাম না তবু বন্ধুর কল্যাণে আমার মনে গাঁথা হ'য়ে রয়েছে। আজ প্রায় ঘণ্টাখানেক আপনার বিকচকুসুমসম মুখখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনছিলাম...

মিস্ ম্যুলার শুধু একটু হাসলে।

অনুপম বললে, আমার বন্ধুটি আজীবন বিজ্ঞানের গবেষণায় লিপ্ত আছেন; আর্টের আরাধনায় ইনি নতুন ব্রতী, কাজে আর্টের মদিরগন্ধ এবং ফুল্লবিকাশে যে ইনি অভিভূত হয়ে যাবেন তাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

এবার মিস্ ম্যুলার মুখ খুললে। একটু হেসে বললে, Goetheর আর্টকে বিশ্বের নরনারীর বিভিন্ন অনুভূতির

সামনে সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাকে ফুটিয়ে তোলায় যে কতখানি প্রতিভা আর ধৈর্য্যের দরকার হয় তা' আমি গত কয়েক মাস ধরে বেশ বুঝতে পারছি। Faust সব মানুষের মনকেই স্পর্শ করে এই জন্যে যে এর মধ্যে আছে মহামানবতার একটা করুণ সুর। সরলা Gretchenএর প্রথম ভালোবাসায় অতি-পুরাতন বিরহমিলনকথা Goethe যেমন প্রাণ দিয়ে ব্যঞ্জনা করেছেন আমি কিন্তু কত অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য নিয়োজন ক'রেও তার ছায়াটুকু পর্য্যন্ত ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌লামনা!

তার মধুর অধরে বিষাদের করুণ হাসি।

সুধীর চুপটি ক'রে উদগ্রভাবে তার কথা শুন্‌ছিল। সে বল্‌লে, কিন্তু আপনার অভিনয় দেখে ত আমরা তা' বুঝ্‌তেই পারি না, মিস্ ম্যুলার......

আগেরই মত ম্লান হাসি হেসে মিস্ ম্যুলার জবাব দিলে, আপনার মনকে স্পর্শ কর্‌তে পেরেছি এটা ভেবেও আমি পুলকিত বোধ কর্‌ছি মিঃ গাঙ্গুলী, কিন্তু নিজের মনে তৃপ্তি একটুও পাইনি' আমি। মনে হয়েছে যেন কলের পুতুলের মত কতকগুলো শেখানো বুলি মুখস্থ বলে যাচ্ছি! এত অনুভূতি নয়—এযে তার ছলনা।

অনুপম এবার প্রশ্ন করলে, আপনি যে রকম অনুভূতির কথা বল্‌ছেন সে অভিনয়ের মধ্যে কখনও আসে মিস্ ম্যুলার?

—সব সময় আসেনা হয়ত। কিন্তু যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরের গভীর পিপাসার তৃপ্তি হয়না, ভাষার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন থাকেনা, ব্যঞ্জনার মধ্যে চেতনার তীব্রতার অভাব হয়।

রাত দুটোর সময় সুধীর, অনুপম আর মিস্ ম্যুলার যখন Kursalon থেকে বার হ'য়ে এল তখন Goethe-Gretchen পর্ব্বের বড় এক অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। মিস্ ম্যুলার নিবিড় প্রীতির সহিত করমর্দ্দন ক'রে বিদায় নিতে নিতে বল্‌লে, আমার দুঃখ এই যে আপনাদের সাথে আর বেশীক্ষণ আলাপ কর্‌বার অবসর হলনা। কাল্‌কেই যদি আমাকে প্রাগে ছুটতে না হ'ত তাহ'লে আপনাদের সহজ অনাড়ম্বর প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তাম।

রাত্রে শুতে শুতে সুধীর অনুপমকে জিজ্ঞেস করলে, মিস্ ম্যুলারকে কেমন লাগ্‌ল ভাই?

অনুপম এই প্রশ্নটিরই অপেক্ষা কর্‌ছিল। সে একটুখানি চিন্তিতসুরে জবাব দিলে, বড্ড ভালো মেয়ে. কিন্তু বড় বিষাদ-ব্যথায় ভরা, মনে হয় যেন অতৃপ্তবাসনার ছবি—দুঃখভরা মৌনসুর একখানি......

ভোরবেলায় অনুপমের তখনও ঘুম ভাঙ্গেনি'। হঠাৎ সুধীরের ডাকে চোখ একটুখানি খুল্‌তেই সূর্য্যের প্রতিফলিত আলো এসে পড়ায় সে অস্বস্তিবোধ ক'রে আবার পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছিল, কিন্তু সুধীর তার শিয়র থেকে বালিশটা টেনে নিয়ে বল্‌লে, ওঠ্ ভাই শীগ্‌গীর, এক্ষুনি তৈরী হ'তে হবে...

অনুপম তখনও চোখ না খুলে অলসভাবে জবাব দিলে, ইম্পীরিয়াল্ প্যালেস্ আজ বিকেলবেলা দেখ্‌তে যাব সুধীর, এখন একটু ঘুমুতে দে......

সুধীর অস্থিরভাবে জবাব দিলে, তোমার প্যালেস্ চুলোয় যাক্—আমরা আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাগের দিকে রওনা হচ্ছি।

অনুপম সুধীরের কথাটা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে চোখ খুলে একটুখানি হতভম্বের মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লে, তার মানে?

—তার মানে আর কিছুই নয়। মিস্ ম্যুলার আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এখানে এসে হাজির হ'বেন, তুমি একটু চট্‌পট্ তৈরী হ'য়ে নাও ত ভাই!

অনুপমের মুখে খানিকক্ষণ রা সড়লনা। সুধীর যেন ভয়ানক একটা কাজ করেছে এম্‌নি উৎফুল্লভাবে বলতে লাগ্‌লে, এ ভাই ফিজিক্সের অপ্‌টিক্যাল ইলিউসন নয়, এ খাঁটি কথা...। মিনিট দশেক আগে ফোন ডাইরেক্টরী থেকে খুঁজে নম্বর বার ক'রে ফোন্ কর্‌লাম। প্রশ্ন হ'ল, কে? ...আমি জবাব দিলাম, কালকের সেই দুঃসাহসী কালো ছেলেটি। আবার প্রশ্ন হ'ল, তাই নাকি? তা কী খবর?...আমি অম্‌নি বলে বস্‌লাম, আমরাও আজ প্রাগে যাচ্ছি, যদি আপনি আমাদের গাড়ীতে আসেন তাহ'লে বেশ গল্প কর্‌তে কর্‌তে যাওয়া যায়। ..তারপর রেল আর রাস্তার আপেক্ষিক সৌন্দর্য্য এবং আরাম সম্বন্ধে এমন এক বক্তৃতা

দিলাম যে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শ্রীমতী জবাব দিলেন,

অনুপম হাঁ ক'রে সুধীরের কাগুখানার ইতিবৃত্ত শুনছিল। শেষ হ'লে বল্‌লে, এই কি তুই সেই মুখচোরা বিজ্ঞান-তপস্বী লণ্ডন মেয়েমহলে যার টিকিটুকু পর্য্যন্ত দেখা যেতনা?

সুধীর হেসে জবাব দিলে, There are many things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy!···এখন ওঠো, হাতমুখ ধোও দেখি।

মর্ণিং কফি শেষ ক'রে সুধীর একবার গাড়ীটার তদারক কর্‌তে বাইরে যাবে এমনি সময় ফুটন্ত গোলাপের মত একগাল হাসি নিয়ে মার্লিন ম্যুলার এসে হাজির। গোলাপী রঙের ফ্রক—মাথায় সাদা একটা beret, হাতে Goethe'র Faust; মিষ্টি প্রভাতী হাসিতে কুন্দদন্তপাতি উদ্ভাসিত ক'রে মার্লিন বল্‌লে, তোমার এই একগুঁয়েমি আব্দারমাখা নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবার সাহস হ'লনা, বন্ধু···

সুধীর তার সম্বোধনে পুলকিত হ'য়ে বল্‌লে, সাহস হ'বেনা এই বিশ্বাস ছিল বলেই ত আমার নিমন্ত্রণের মধ্যে ঐ আব্দারটুকু মিশিয়ে দিয়েছিলাম, মার্লিন···

মার্লিন বল্‌লে, ভাবলাম কাল্‌কের বিষাদের সুরটা আজ একটুখানি দূর ক'রে নেবার চেষ্টা করি।···তোমার বিজ্ঞান হয়ত আমায় এ বিষয়ে কিছু সাহায্য কর্‌তে পারে।

ততক্ষণে অনুপম এসে পড়েছে। সে হেসে বল্‌লে, আপনাকে সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব কিনা জানি না মিস্ ম্যুলার, কিন্তু ওর সাহস ও ধৃষ্টতা দেখে আমি সত্যিই একটু অবাক্ হ'য়ে গেছি।

তেমনি মধুর হেসে মার্লিন জবাব দিলে, আমিও তাই এসেছি এর সাহস পরখ ক'রে দেখ্‌তে। দেখ্‌ছেন ত হাতে কি বই?—একেবারে original Faust!

বেলা এগারোটার সময় তিনজন যাত্রী রওনা হ'ল ভিয়েনা ছেড়ে প্রাগের পথে। অনুপম গাড়ী চালানোর ভার নিলে, আর পেছনে সুধীর আর মার্লিন কোলের উপর Goethe খুলে বস্‌লে।

গল্প Goetheকে নিয়ে বেশী দূর চল্‌ল না। বই কোলের উপর পড়ে রইল, আর গল্পের ধারা চল্‌ল সাহিত্য ছেড়ে কল্পলোকের পথে, অজানা দেশের উদ্দেশে···

সুধীর বল্‌ছিল, কিন্তু তোমার সেই বিষাদী সুরের পেছনে একটা প্রচ্ছন্ন মর্ম্মবেদনা রয়েছে তা' তুমি অস্বীকার করতে পার না, মার্লিন··

মার্লিন জবাব দিলে, অস্বীকার করতে পারি কিনা সে কথা নিয়ে আলোচনা করে লাভ কি সুধীর? আমার ব্যথা আমার মাঝেই যদি লুকানো থাকে তাহলে কি তার মর্য্যাদার হানি হ'বে?

—মর্য্যাদার হানি হবে না মার্লিন, তবে আমার বন্ধুত্বের দাবীর প্রতি খানিকটা অত্যাচার করা হ'বে।

—তুমি আমায় বন্ধু ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছ তার জন্যে আমি ধন্য। কিন্তু দাবীকে আমি বড্ড ভয় করি—সে বন্ধুত্বেরই হোক আর প্রীতি-সাহচর্য্যেরই হোক্। দাবীদাওয়া এর মধ্যে এনো না—আমরা শুধু বন্ধু··

—কিন্তু বন্ধুত্বেরও ত একটা উৎস আছে, মার্লিন। সে উৎস যদি আগে থেকেই রোধ করে রাখতে চাও তাহ'লে তার প্রবাহ হ'বে কি করে?

—প্রবাহ কি শুধু একই ভাবে হয় সুধীর? আমার অতীতকে না টেনে আন্‌লে কি প্রবাহের অবকাশ হয় না? বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের উপর আমাদের বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপিত হ'লে ক্ষতি কি?

—আমার কোনই আপত্তি থাক্‌ত না মার্লিন যদি তোমার বর্ত্তমানের উপর অতীতের ছাপ না থাকত। তোমার বর্ত্তমান যে অতীতের এক বিষাদের সুরে ঢাকা!

মার্লিন এ-কথার কোন প্রতিবাদ কর্‌তে না পেরে বল্‌লে, আমায় প্রশ্ন ক'রোনা···মাপ ক'রো··

সুধীর একটুখানি ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্‌লে, বেশ···

আলোচনার ফোয়ারা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হ'য়ে গেল। অনুপম একবার পেছনে তাকিয়ে বললে, ব্যাপারখানা কী? দুজনেই যে চুপচাপ বসে আছেন?

মার্লিন বল্‌লে, আপনার বন্ধু আমার উপর অভিমান করেছেন।

সুধীর একটু তীব্রভাবে জবাব দিলে, অভিমান করে লোকে ভালোবাসার পাত্র-পাত্রীর সাথে, পথে দেখা সাথীর সাথে ত নয়!

অনুপম সুধীরের কথার ঝাঁঝে বিস্মিত হ'য়ে মিস্ ম্যুলারের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি ওর কথায় কাণ দেবেন না মিস্ ম্যুলার, আপেক্ষিকত্বের তথ্য অনুসন্ধান কর্‌তে গিয়ে সে ভদ্রতার নামগন্ধটুকু শিখেনি'।

মার্লিন কোন জবাব দিলে না, একটুখানি হাস্‌লে। অনুপম আবার গাড়ী চালানোর দিকে মন দিলে।

খানিকক্ষণ পরে মার্লিন হঠাৎ সুধীরের হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠলে, তোমায় ব্যথা দিয়েছি, মাপ ক'রো···

সুধীর তার এই উচ্ছ্বাসে একটুখানি আর্দ্র হয়ে বললে, রাগ ত' আমি করিনি' মার্লিন, আমার বন্ধুত্ব এবং প্রীতির গর্ব্বে একটুখানি আঘাত লেগেছে মাত্র!

মার্লিন আগেরই মত উচ্ছ্বসিত সুরে বল্‌লে, জীবনে যে কখনও নিবিড় শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পরিচয় পায়নি' চোখের সামনে হঠাৎ তার রেখা দেখে তার [illegible] চোখ একটুখানি ঝল্‌সে যেতে পারে, নয় কি?······কিন্তু এখন দেখছি আমি এসেছি খাঁটি সোণার সংস্পর্শে, এ[illegible] অবহেলা করাটা আমার স্বার্থের দিক দিয়ে অন্তত: [illegible]চিত নয়। [illegible]র?

সুধীর তার আগেকার ব্যবহারের জন্য একটু লজ্জিত হ'য়ে বললে, আমি বড্ড খেয়ালী বদ্‌মেজাজী ছেলে মার্লিন, ল্যাবোরেটারীর হাওয়া আমার স্নায়ুগুলোকে এমন ভীষণভাবে tense করে রেখেছে যে কী বলব!

ব'লে সে নিজের বাঁহাতটা মার্লিনের ডান হাতের মধ্য দিয়ে গলিয়ে তাকে একটুখানি কাছে টেনে এনে বল্‌লে, এখন বলো···

—বলবার যে বিশেষ কিছু আছে বন্ধু তা'ও নয়। এ সেই পুরাণো কাহিনী যার কথা সাহিত্যিক এবং কবিরা যুগে যুগে বলে এসেছেন। ষ্টেজে আমি এসেছি বছর দুই হ'ল···তখন আমার বয়স কুড়ি। রূপযৌবন খানিকটা আছে, বন্ধু এবং সহচরের অভাব কোন দিনই হয়নি' এ পর্য্যন্ত, কিন্তু আমার মর্ম্মের ব্যথা এই যে এ পর্য্যন্ত কারোর মধ্যেই একটুখানি আন্তরিকতা, একটুখানি মনের প্রীতি ও শ্রদ্ধা দেখতে পেলাম না! কৃত্রিম স্তুতি আর প্রশংসা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছি, বন্ধু···

—তুমি কৃত্রিম বলছ কেন? স্তুতি কি আর কখনও শ্রদ্ধার অর্ঘ্যেরই অভিব্যক্তি হ'তে পারে না?

—পারে হয়ত, কিন্তু কৃত্রিমতার মুখোস যেখানে আছে সেখানে তা' খুবই শীগ্‌গীর ধরা পড়ে যায়। বল্‌তে আমার নিজেরই লজ্জা হচ্ছে এই ভেবে যে আগে আমি এ কৃত্রিমতা নিজেই ধর্‌তে পারতাম না। তাই স্তুতি বা প্রশংসায় আবেশবিহ্বল হয়ে অনেক সময়ই অসতর্ক হ'য়ে পড়েছি···। একবার নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলিয়েও দিয়েছিলাম··· কিন্তু সে নেশা কাটল শীগ্‌গীরই, আমার নতুন বন্ধু আমার আত্মদানের মর্য্যাদা বেশ ভালোভাবেই রেখে হঠাৎ একদিন সরে পড়লেন!

সুরে তার শ্লেষমাখা তীব্রতা··

সুধীর একটুখানি রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে, তুমি শেষে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিলে বন্ধু, শুধু স্তুতিতে অভিভূত হয়ে?

—দিয়েছিলাম, সুধীর। তার জন্যে এখন সময় সময় অনুতাপ হয়, আবার সময় সময় ভাবি, অনুতাপ করব কেন? ···এত আমার জীবনে একটা অভিজ্ঞতা বই আর কিছুই নয়! অভিজ্ঞতা থেকেই যে অনুভূতির সৃষ্টি বন্ধু, তাই অভিজ্ঞতাকে আমি খারাপ চোখে দেখি না।

—এ অনুভূতির জন্যে যে তোমার অনেকখানি দাম দিতে হয়েছে, মার্লিন!

বিষাদমাখা কণ্ঠে মার্লিন বল্‌লে, ঐখানেই ত আমার দুঃখ, সুধীর। অভিজ্ঞতাও হ'ল, খানিকটা অনুভূতিও এল, কিন্তু পরিপূর্ণতা এল না। হেঁয়ালী মনে হচ্ছে, বন্ধু, কিন্তু আসলে এটা হেঁয়ালী নয়। আমার মনের বিকাশ যে এতে একটুও হ'ল না, যেন আলোছায়ার অন্তরালে একটা খণ্ড দৃশ্যের অভিনয় হয়ে গেল! এ স্মৃতিতে মাধুর্য্য একটুও নাই, আছে শুধু ব্যর্থতার একটা হাহাকার···

সুধীর নিশ্বাস রোধ করে মার্লিনের কথাগুলি শুন্‌ছিল। এই অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার জগৎ তার কাছে একেবারে নতুন, তাই সে মার্লিনের কথাগুলোর সাথে নিজের মনের

সামঞ্জস্য করে উঠতে পারছিল না। একটুখানি স্খলিত-কণ্ঠে সে বল্‌লে, তাহ'লে কি তোমার জীবন Gretchen এরই মত বিষাদমধুর, মার্লিন ?

প্রায় কান্না রোধ করতে করতে মার্লিন জবাব দিলে, Gretchen এর মত তীব্র ভালোবাসা বা অনুভূতি যদি আমার হ'ত তাহ'লে ত আমি বেঁচে যেতাম বন্ধু! আমার এ অনুভূতি যে ব্যথার দিক দিয়েও সম্পূর্ণ হয়নি'—ভালোবাসার তীব্রতা আমি উপলব্ধি করবার সুযোগই পাইনি' সুধীর...

বল্‌তে বল্‌তে তার নীলাভ চোখদুটি অশ্রুসজল হ'য়ে উঠল। সুধীর একটুখানি লজ্জিত হয়ে মার্লিনের মাথাটি নিজের বাঁ কাঁধের উপর রেখে তার কালো চুলগুলোতে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লে, আমি বুঝবার চেষ্টা কর্‌ছি, মার্লিন।

অনুপম পেছনে চাপা কান্নার শব্দ শুনে কৌতূহলী হ'য়ে একবার তাকিয়েছিল, কিন্তু মার্লিনের অশ্রুকলঙ্কিত মুখ এবং ছিন্নফুলের হাসি দেখে সে কোন মন্তব্য প্রকাশ না ক'রে গাড়ী চালানোর দিকেই মনোনিবেশ করলে।

সারা দিন তারা প্রাগের পথে চলেছে। সন্ধ্যার ধুসর আলোয় তারা যখন অষ্ট্রীয়ান্ সীমান্তে পৌছুল তখন অনুপম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এদিকে মার্লিন তার শিথিল মাথাটি সুধীরের কাঁধের উপর রেখে শুয়ে পড়েছে। সুধীর অতি সন্তর্পণে তার মাথাটি একটা বালিশে রেখে নিজে এবার ষ্টীয়ারিং হুইলের ভার নিতে যাবে এমন সময় হঠাৎ কী একটা শব্দে মার্লিনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে একটু লজ্জিত হ'য়ে চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে বললে, ওঃ মাগো, কী আল্‌সে মেয়ে আমি······এম্‌নি সাঁঝের বেলা ঘুমিয়ে পড়েছি!

অনুপম সহানুভূতিভরা কণ্ঠে বল্‌লে, আপনি বাস্তবিকই ক্লান্ত আছেন, মিস্ ম্যুলার। আমরা দু'জনে সাম্‌নে বসছি—আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোন দেখি।

আর কোন প্রতিবাদ না ক'রে মার্লিন শুয়ে পড়্‌লে। সুধীর গাড়ীর ষ্টার্ট দিলে।

ভোরবেলা তখনও বিশেষ আলো হয়নি' এম্‌নি সময় তারা প্রাগে পৌছুল। সুধীর জিজ্ঞেস্ করলে, তুমি কোথায় উঠ্‌বে মার্লিন ?

মার্লিন জবাব দিলে, ঠিক ত কিছুই করিনি'—এসো, কোন একটা হোটেলে যাওয়া যাক্।

তিনজনে খুঁজে খুঁজে সস্তাগোছের একটা হোটেলে গিয়ে উঠ্‌ল।

সন্ধ্যাবেলা সুধীর তার ঘরে একলা বসে বসে রাইন্‌ল্যাণ্ডের গল্প পড়্‌ছিল আর খোলা জানালা দিয়ে প্রাগের রাজপথে লোকের মেলা দেখ্‌ছিল, এম্‌নি সময় তার দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হ'ল। পরক্ষণেই তাকে উত্তরের অবসর না দিয়েই ঘরে ঢুক্‌ল হাস্যমুখী মার্লিন।

বল্‌লে, তোমার সাথে একটু গল্প করতে এলাম।

সুধীর বল্‌লে, এসো, আমিও একটি সাথীর কথাই ভাব্‌ছিলাম।

মার্লিন সুধীরের সোফাটার হাতের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে, কী পড়্‌ছ?···রাইন্‌ল্যাণ্ডের কাহিনী সব ?

সুধীর হেসে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, সেই ছলনাময়ী Lorelei-এর অচঞ্চল ছায়ার লীলাকাহিনী পড়্‌ছিলাম।

মার্লিন একটুখানি বিস্ময়ের সুরে বল্‌লে, তুমি দেখ্‌ছি আজকাল মেয়েদের ছলনালীলার প্রতি একটু অস্বাভাবিক-রকম অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছ!

চটুল হাসি হেসে সুধীর বল্‌লে, তাদের অন্তররহস্যটা উদ্‌ঘাটন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, দেখ্‌ছি এ ফিজিক্সের রিসার্চ্চের চেয়ে কম সুখদ নয়।

চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখানোর ভঙ্গীতে মার্লিন জবাব দিলে, আমাদের অন্তররহস্য বুঝ্‌বার চেষ্টা ক'রোনা, বন্ধু, তোমাদের কাছে এ ভয়ানক ভাবে নিষিদ্ধ ফল··

সুধীর একটুখানিও না হটে বল্‌লে, তাইত বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি একে সবাই নিষিদ্ধ ফল বল্‌ছে কেন!

কথার ধারাটা উল্‌টিয়ে নিয়ে মার্লিন জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা সুধীর, তুমি কখনও প্রেমে পড়েছ ?

সুধীর একটুখানি চিন্তা ক'রে জবাব দিলে, ঠিক পড়েছি বলে মনে পড়ছে না, তবে দু'একজনকে একটু আধটু ভালো লেগেছে, অনুভূতি আর তার বেশী এগোয়নি'। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কর্‌লে যে ?

—খেয়াল হ'ল তাই···

—বিজ্ঞানের গোলকধাঁধাঁয় পড়ে আমি এতখানি জড়বুদ্ধি হ'য়ে যাইনি' মার্লিন যে তোমার খেয়ালের দোহাইতে অমনি বিশ্বাস ক'রে বস্‌ব!

এবার একটুখানি গম্ভীরস্বরে মার্লিন বললে, আমায় মাপ ক'রো, তোমার বুদ্ধির অপমান করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি শুধু আমার জীবনের কাহিনীগুলোর কথা ভাব্‌ছিলাম এতক্ষণ বসে। ভাবতে ভাবতে কূলকিনারা দেখ্‌তে পেলাম না, তাই এলাম তোমার কাছে একটুখানি গল্প করতে···

সুধীর মার্লিনের হাতখানি ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে এনে স্নেহ ও সহানুভূতিমাখা সুরে বল্‌লে, বসো, আমি তোমাকে গুটিকয়েক কথা বলি···

মার্লিন সুধীরের স্নেহমাখা স্পর্শে পুলকিত হ'য়ে তার গা ঘেঁসে বস্‌লে। সুধীর তার মাথার কালো চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বল্‌লে, আমিও তোমারই কথা ভাব্‌ছিলাম মার্লিন। কাল গাড়ীতে তোমার কাহিনী শুনে প্রথমে একটুখানি চম্‌কে উঠেছিলাম, আবার সবুজমনে তোমার দুঃখের কথা যেন একটা আকস্মিক বিদ্যুৎস্পর্শের মত এসে পড়েছিল, তাই তখন বোধ হয় তোমাকে ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি', কিন্তু এখন বোধ হয় তোমাকে অনেকটা বুঝ্‌তে পার্‌ছি!

সুধীরের শান্ত দরদমাখা কথাগুলো শুনে মার্লিনের চোখ জলে ভরে উঠ্‌ল। সে কোনক্রমে অশ্রুরোধ করতে করতে বল্‌লে, তুমি যে আমায় বুঝ্‌তে পেরেছ, অন্ততঃ বুঝ্‌বার চেষ্টা করেছ, তা' শুনে আমার মন গর্ব্বে পুলকে কিরকম অভিভূত হয়ে যাচ্ছে যে কী বল্‌ব!···সত্যিকারের স্নেহ বা দরদ আমি কখনও পাইনি', অথচ তার জন্যে আমি বুভুক্ষু হয়ে আছি বহুদিন। তোমায় যে বলেছিলাম, ভালোবাসার লোভে আমি আমার সত্ত্বাকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম, তার ঠিক মানে বোধ হয় তুমি বুঝ্‌তে পারনি'। ভালোবাসার জন্যে আমার দেহটাকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম একদিন, কিন্তু তা' দিতে হয়নি'। তবু আমার মনে খেদ রয়ে গেছে এই যে যদি যথার্থ ভালোবাসার জন্যে তা' বিলিয়ে দিতেও পার্‌তাম তাহ'লে বোধ হয় তার সার্থকতা হ'ত।···এ নিষ্ঠুর সংসারে ভালোবাসারই দাম হয়না, বন্ধু, দেহটার আর দাম কি?

সুধীর খুব তলিয়ে মার্লিনের মনের ব্যথা বুঝ্‌বার চেষ্টা করছিল। সে মার্লিনের মাথাটি নিজের বুকের কাছে চেপে ধরে বল্‌লে, আমার ভালোবাসা কি তুমি গ্রহণ করতে পারবে মার্লিন?

সুধীরের এই প্রশ্নে ভয়ানকভাবে চমকে উঠে মার্লিন তার মাথাটি সুধীরের বুকের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে একটুখানি তীব্রকণ্ঠে বল্‌লে, আমার ব্যথাকে উপহাস না করলে কি চল্‌তনা সুধীর?

সুধীর দু'হাত দিয়ে মার্লিনকে নিজের কাছে টেনে এনে নিবিড় বাহুবন্ধনে বেঁধে বল্‌লে, তোমার ব্যথাকে উপহাস করছি না মার্লিন। আমি সত্যিই তোমায় আমার ভালোবাসা দিতে চাই, এর বিনিময়ে শুধু তোমার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই আমি চাই না।

নিতান্ত অবিশ্বাসের সুরে মার্লিন বল্‌লে, কিন্তু কেন? তোমার সবুজ মন, প্রথম যৌবন, মনে রঙীন্ আশা···তুমি কেন ব্যথাভারাক্রান্ত একটি মেয়ের ভালোবাসার জন্য লালায়িত হ'বে সুধীর?

সুধীর জবাব দিলে, তোমার ব্যথাই আমার মনে নতুন রাগিণী জাগিয়ে তুলেছে, মার্লিন। অনুভূতির দাম আছে, মার্লিন; তোমার জীবনের ব্যথার অনুভূতি তোমার চরিত্রকে যে কতখানি মধুময় ক'রে তুলেছে তা' তুমি নিজে বুঝ্‌তে পারছ না, কিন্তু আমি নিরপেক্ষভাবে বসে বেশ বুঝ্‌তে পারছি।

মার্লিন আর চোখের জল রোধ করতে পার্‌লে না। অসহায়া বালিকার মত সুধীরের কোলে মুখ চেপে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে, তোমার ভালোবাসার কণামাত্রও পাব এ আমি স্বপ্নেও আশা করিনি' সুধীর।

সুধীর তার অশ্রুসজল মুখখানি দু'হাতে তুলে ধরে তার নীল চোখদুটিতে চুম্বন ক'রে বল্‌লে, আমার যৌবনের প্রথম চুম্বন তোমায় দিলাম। ব্যথার কলুষ তোমার মন থেকে দূর হ'য়ে যাক্, তুমি আবার তোমার গর্ব্ব এবং আনন্দের অনুভূতি ফিরে পাও এই আশীর্ব্বাদ করি।

রাত্রিবেলা অনুপম সুধীরের কাছে সব কথা শুনল। একটুখানি চিন্তিতস্বরে বল্‌লে, শেষে এক অভিনেত্রীর প্রেমে পড়্‌লি ভাই ?

সুধীর হেসে জবাব দিলে, বহুদিন থেকেই আমার সাধ ছিল এদের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হ'বার। অবশেষে ভেবে দেখ্‌লাম তার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে প্রেমের পথ !

প্রাগে তারা দিন ছয়েক রইল। এই ক'দিন মার্লিন মুহূর্ত্তের জন্যেও সুধীরের কাছ ছাড়া হয়নি'। যে উদ্দেশ্যে তার প্রাগে আসা তা' সে একরকম ভুলেই রইল। আর বেচারী অনুপম একা একা তার গাড়ী নিয়ে প্রাগের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াত। সুধীরের সাথে তার দেখা হ'ত রাত্রে শুতে যাবার বেলায়, কিন্তু সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর পর সে এতখানি ক্লান্ত হয়ে থাকৃত যে সুধীরের সাথে বিশেষ আলোচনা করবার সুযোগও তার হ'ত না। আর সুধীর বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের স্বপ্নসৌধ গড়্‌ত আর ভাঙ্গত···

অনুপম মাঝে মাঝে বল্‌ত, দেখিস্‌ ভাই, প্রেমে পড়ে তোর জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো বিসর্জ্জন দিয়ে দিস্‌নে যেন !

সুধীর জবাব দিত, প্রেম যদি সুন্দর ও সহজ হয় তা হ'লে তা' সঞ্জীবনীশক্তির কাজ করে অনুপম, আশা আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হওয়া ত দূরের কথা, তাতে তার বৃদ্ধি এবং বিকাশ হয় অনেকখানি।

অনুপম সুধীরের এই কথায় একটুখানি সন্দিগ্ধহাসি হাস্‌ত।

সেদিন বিকালবেলা মার্লিন আর সুধীর ঘরে বসে গল্প করছিল। সুধীর বলছিল, তুমি তাহ'লে আস্‌ছে হপ্তায়ই লণ্ডনে আস্‌ছ ত মার্লিন ?

মার্লিন বল্‌লে, নিশ্চয়ই···এ অভিনয়ের জীবন আমার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সুধীর। লণ্ডনের কোলাহলের মধ্যে আমি তোমাকে আরও একটু নিবিড়ভাবে পেতে চাই।

সুধীর মার্লিনকে বুকের কাছে চেপে ধরে তার রক্তঅধরে চুম্বনবৃষ্টি করলে। মার্লিন নীরবে সুধীরের আদর উপভোগ করতে করতে বল্‌লে, কিন্তু আমার সান্নিধ্যে তোমার কাজের ব্যাঘাত হ'বেনা ত সুধীর ?

সুধীর হেসে তার গোলাপী গাল দুটিতে আঙ্গুলের টোকা দিয়ে বল্‌লে, পাগলী মেয়ে···প্রেমিকার সান্নিধ্যে কি আমার কাজের ব্যাঘাত হ'তে পারে কখনও ?···সারাটি দিন ল্যাবোরেটারীতে কাজ ক'রে যখন ফিরব তখন তোমার চুম্বন স্নেহ-আলিঙ্গনে আমার সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে যাবে !

সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে। সুধীর মার্লিনের হাতটি ধরে ঘরের balconyতে এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, চেকো-স্লোভাকিয়া দেখে শুধু আমার দেশের কথা মনে হয় মার্লিন...

মার্লিন বল্‌লে, তোমার দেশের কথা আমায় বলনা গো !

—এখানকার খালবিলের কালো জল, বিশাল মাঠ, শস্যের সবুজ ক্ষেত, এসবই আমার সোণার বাংলা দেশের মত। আর এই মেঘমুক্ত আকাশ, এও আমার দেশের আকাশেরই নীলিমার প্রতীক।

মার্লিন সুধীরের বুকের কাছে মাথাটি রেখে নিজের নীল চোখদুটি তার চোখের উপর ন্যস্ত করে, বল্‌লে, জানো আমার কী মনে হচ্ছে ?

—কী ?

—আকাশে ওই যে তারাটি জ্বল্‌ছে ওর কথা। ও যেন আলোর দূত, আগে আগে এসে বল্‌ছে, আমার এই শুভ্র আলোর রেখার দিকে তাকিয়ে থাকো, আমার পেছনে অগুনতি তারার মেলা দেখ্‌তে পাবে।···তুমি হচ্ছ আমার জীবনে এই তারাটির মত, স্বর্গের উদয়াচল থেকে এসে তুমি আমার ব্যথার অন্ধকারকে দূর ক'রে দিয়েছ··· তুমি হয়েছ আমার জীবনে নতুন এক সুরের দূত !

— কিন্তু জানো, দিনের আলোয় আর সব তারা যখন আকাশে মিশে যাবে তখন ওই সন্ধ্যাতারাটি শুধু আপন মনে জ্বল্‌বে···ও হ'বে তখন প্রভাতী তারা, ঊষার আগন্তুক···

—সে ত ভালোই। আমার জীবনের সব তারা যখন নিবে যাবে তখন শুধু তুমি জ্বল্‌বে, তোমার প্রভাতী সুর আর সব সুর ছাপিয়ে বেজে উঠ্‌বে !

সুধীর দু'হাতে মার্লিনের ঋজু দেহটি জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, সত্যি ক'রে বল দেখি, মার্লিন, তোমার মনের ব্যথা দূর হয়ে গেছে কি না ?

গম্ভীরভাবে মার্লিন জবাব দিলে, দুর হয়ে গেছে ত নিশ্চয়ই, তা'ছাড়া আমার মন যে কী আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে সে আর কী বলব! এ হচ্ছে অনুভূতির পুলক—শিশু যখন বহু খোঁজাখুঁজির পর তার হারাণো পুতুল ফিরে পায় তখন তার মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয় এ তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই সময় সময় আমার মনে হয় যদি এইখানেই আমাদের এই দেখাশুনোর শেষ হয় তাহ'লেও দুঃখ হ'বেনা, কারণ ব্যথার মৌনতার মধ্যেও পূর্ণতার আনন্দটুকু আমার থাকবে!

মার্লিনকে আগেরই মত জড়িয়ে রেখে সুধীর জবাব দিলে, তোমাকে ব্যথার আনন্দ দিয়ে আমার তৃপ্তি হ'বেনা—মিলনের পুলকটুকু সম্পূর্ণভাবে তোমায় দিতে চাই।

একটুখানি হেসে মার্লিন বল্লে, জানি···তাই ত' আমি মনে প্রাণে Gretchen এর মত বলি—

Denckt ihr an mich ein Angenblickgen nur,
Ich werde zeit genug an euch zu dencken
haben.*

সুধীর মার্লিনের চোখদুটিতে আবার চুমু খেয়ে বল্লে, আমি শুধু তোমার স্মৃতিটুকু নিয়ে তৃপ্ত হ'বনা, মার্লিন, আমি তোমাকে চাই, তোমার ছায়াকে নয়···

কথা ছিল বার্লিনের ঠিকানায় মার্লিন সুধীরকে চিঠি দিবে। প্রাগ থেকে বার্লিন পর্য্যন্ত পথটা সুধীরের কাছে মনে হচ্ছিল যেন অসীমের যাত্রা, যুগ-যুগান্তরের চলা। অনুপম বেশীর ভাগ সময়ই যেন একটু গম্ভীরভাবে ছিল। সুধীর তার মনের আনন্দে অনুপমের সাথে গল্পকৌতুক জমাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার গাম্ভীর্য্যের সাম্নে তার প্রয়াস সফল হয়নি'।

বার্লিনে পৌছেই সুধীর ব্যাঙ্কে মার্লিনের চিঠি আনতে যাবে এমন সময় অনুপম তাকে ডেকে বল্লে, একটা কথা শুনে যা ভাই···

সুধীর তার গম্ভীর মুখ আর ক্লিষ্ট চোখ দেখে বিস্মিত হ'য়ে বল্লে, ব্যাপারখানা কি অনুপম?

অনুপম তার হাতদুটি ধরে বল্লে, তোকে না জানিয়ে আমি বোধ হয় একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি।···তোর অবস্থা দেখে আমার এতখানি চিন্তা হয়েছিল যে আসার দিন ভোরবেলায় আমি তোর সবকথা মিস্ ম্যুলারকে না ব'লে পার্‌লাম না—তোর আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, তোর জীবনের কথা, দেশের কথা। মিস্ ম্যুলার এসব কিছুই ভালো ক'রে জানতেন না, তিনি নীরবে খুব মন দিয়ে শুনলেন, তারপর আমায় বল্লেন, আমি সুধীরের কাছে চিঠি লিখ্‌ব না, আর ভিয়েনা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাব, সে আমার খোঁজও পাবেনা···

সুধীর স্তব্ধ হয়ে অনুপমের কথা শুনছিল, তার কাণে বাজছিল প্রাগে তাদের শেষ সন্ধ্যার কথাগুলো···প্রভাতী সুর···ব্যথার পূর্ণতা···

রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস্ করলে, আর কিছু বলেছে?

—না, আর কিছু বলে নি' ভাই।···কিন্তু আমি তোর ভালোর জন্যেই এটা করেছি সুধীর, তুই আমায় ভুল বুঝিস্ না!···হ্যাঁ, আসার আগে আমার হাতে একটা মোড়ক দিয়ে দিয়েছিলেন, আমাকে বলে দিয়েছিলেন, বার্লিনে পৌছবার আগে যেন তোকে না দেই।

সুধীর উদগ্রীবকণ্ঠে বল্লে, দেখি, দেখি···

অনুপম মোড়কটা খুল্লে, একখানা বই···Goether সেই Faust খানি। হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায় সুধীর যন্ত্রচালিত পুতুলের মত Gretchen এবং Faust এর প্রথম প্রেমনিবেদনের দৃশ্যটি খুললে, দেখ্‌লে, লাল রঙ এর কালীতে দুটি লাইন্ দাগ দেওয়া শুধু—

Denckt ihr an mich ein Angenblickgen nur,
Ich werde zeit genug an euch zu dencken
haben.

অনুপম চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। সুধীর বইটা বুকের উপর চেপে ধরে বিষাদভরা চোখে অনুপমের দিকে তাকিয়ে স্খলিত কণ্ঠে বল্লে, তোর আন্তরিকতা ও সদিচ্ছায় সন্দেহ প্রকাশ করছিনা, অনুপম, কিন্তু তুই তোর অহমিকায় এটা ভুলে গেলি কেন যে তোরও ত ভুল হ'তে পারে?

নবগোপাল দাস

* অর্থ: তুমি যদি আমার একটি মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবো, তোমাকে মনে রাখ্‌বার প্রচুর অবসর আমার হবে। (Goethe : Urfaust).

মায়া

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস্

৫

সুরপুরে ফিরে গিয়ে সুরেশ সরলাকে ঠাট্টা করতে লাগল, "এই বাঁদরী, এদিকে আয়। বড় যে রূপের বড়াই করিস্! যা এবার দেখে এলাম, যদি দেখতিস্ ত বুঝতিস্। মনে করিস্ তোর মত ঐরকম ফ্যাসফেসে রঙ্গ না হলে রূপসী হয় না।"

"কে বল না, ছোটদা। আমাদের ছোটবৌদি হবে বুঝি।"

"অত ছোট বৌদি বড় বৌদি বুঝি না। সে যা চেহারা! নামটীও কি মিষ্টি, মায়াময়ী! তোর মত নয়। সরলা মানে ত নেকী?"

"সত্যি, ভাই, সুন্দর চেহারা? কে, বল না।"

"তোর দাদাকে জিজ্ঞেস কর না। দেখছিস্ না? অন্যদিকে চেয়ে রয়েছে।"

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "সুরেশ, কি বোকার মত কইছিস্? চল্, খেলার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি তাদের চিনি না রে, সরলা" ব'লে চ'লে গেলাম। সুরেশও পিছু পিছু এল, বলতে লাগল,

"নরেশদা ভাই তুমি মিছেমিছি রাগ ক'র না। আমি কি বলেছি?"

"না না, রাগ করি নেই। তুই খেলতে আয় দেখিনি এখন।"

সুরেশকে সরলা বোধ হয়, কুতুহলবশে পরে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। শেষ একদিন বাবাকে ধরলে।

"বাবা দার্জ্জিলিঙ্গে মন্দিরে কে একজন মেয়ে খুব ভাল গান করেছিল, ছোটদার তাকে বড় ভাল লেগেছে।"

বাবা হেসে বললেন, "তোর ছোটদার ভাল লাগার না লাগার বিশেষ মানে নেই।"

কাশীধাম, পর্ব্বত শিখর, মায়াময়ী, দিন কয়েকের মত আমাদের জীবনটাকে রাঙ্গিয়ে দিয়ে গেল। তারপর কলকাতা যাওয়ার বাঁধাছাঁদার পালা আরম্ভ হল। শেষ, যাওয়ার দিন এসে পড়ল। মায়েরা কাঁদলেন। সরলার চোখ ছল ছল করতে লাগল। আমারও মনটা খারাপ হয় নেই তা বলতে পারিনা। তবে, সুরপুর থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা ত বরাবরই ছিল। তাই আত্মীয়-বিচ্ছেদের কষ্টের চেয়ে রাজধানীর আকর্ষণ ঢের বেশী অনুভব করছিলাম। সুরেশ খুব কাঁদছিল। সরলা, বোধহয়, তাকে হাসাবার জন্য বললে,

"দেখো ছোটদা, সাবধান। সেখানে অনেক মায়া মুখুজ্যে আছে।"

সুরেশ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলে,

"না রে না। আমি লেখাপড়া করতে যাচ্ছি। মায়া টায়ার ধার ধারি না। সত্যি কিছু সে তোর চেয়ে সুন্দরী নয়। হিংসা করিস না।"

তারপর হেসে উঠে বললে,

"তা ছাড়া, আমার আরও জরুরী কাজ আছে। জ্যাঠাইমা ব'লে দিয়েছেন একজনের জন্য ভাল বরের সন্ধান করতে।"

সরলা আমার কাছে সরে এসে বললে,

"কথার ছিরি দেখ। দাদা, ছোটদাকে একটু দেখোশুনো। বড় ছেলেমানুষ।" বাস্তবিক সকলের মুখেই ঐ এক কথা, সুরেশকে দেখোশুনো। আমায় কে দেখে তার ঠিক নেই।

৬

আমাদের কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে এলেন বাবার মুহুরী। বিজয়দা। পটলডাঙ্গা অঞ্চলে এক ছোট বাড়ীর দোতলা

আমরা ভাড়া নিলাম। বামুন চাকর রেখে সব ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে তিনি সুরপুর চ'লে গেলেন। একে ত সুরপুরের খোলা হাওয়ায় এতকাল কাটিয়ে সেই সরুগলির ধোঁয়ার মাঝে প্রায় দমবন্ধ হয়ে যেত। তার উপর খাওয়া দাওয়ার বিভ্রাট। বামুনটি মন্দ লোক ছিল না। তবে পাচক হিসেবে নিতান্তই শিক্ষানবীশ। বাড়ীতে ছিল live to eat, অর্থাৎ পাঁচ রকম খাওয়ার লোভে বেঁচে থাকা। এখানের বাসায় হল eat to live, অর্থাৎ প্রাণটাকে ধড়ে রাখবার জন্য কোন রকমে চারটি গেলা। মা কাকীমা নানা রকম মুখরোচক বড়ী কাসুন্দী কুলের খাবার দিয়েছিলেন সেই-গুলোর উপরই আমাদের প্রধান নির্ভর ছিল। তবে খাওয়ার কষ্ট আমাদের বয়সের ছেলেরা কি পরোয়া করে? খিদে পেলে জলের মত দুধ, আধ সিদ্ধ ভাত, শুকনো তরী-তরকারী, বিস্বাদ মাছ তাই অমৃত মনে হত। আর খিদে ত হরদম পেত।

প্রথম প্রথম বাড়ীর লোকের জন্য বেজায় মন কেমন করত। বিজয়দা দুজনের দুটো আলাদা ঘর ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বন্দোবস্ত টিকল না একদিনও। বিজয়দা যেদিন চলে গেলেন সেরাত্রে সুরেশ বারটার সময় আমার ঘরে এসে উপস্থিত। "নরেশদা, ঘুমিয়েছিস্ ভাই?" ব'লে সটান আমার পাশে শুয়ে পড়ল। আমারও ঘুম হচ্ছিল না। ভালই হল। তার পরদিন সুরেশের তক্তাটাকে টেনে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। সে ছোকরা বিদেশে এসে আমায় আরও আঁকড়ে ধরতে লাগল। চব্বিশ ঘণ্টাই দুজনে একত্র থাকতাম। পরস্পরকে বোঝাতাম, "কদিনই বা? এই পুজোর ছুটী হলেই ত দেশে যাব।"

বিদেশের দুঃখ কষ্ট সয়ে যেতে কিন্তু বেশী সময় লাগল না। কলকাতার জীবনে রোজ রোজ এত নূতন জিনিষ পেতাম যে তাইতেই মশগুল হয়ে থাকতাম। কেল্লার কাছে গঙ্গা ও গড়ের মাঠের দৃশ্য দেখে আশ মিটত না। মনে হত, কি লাগে এর কাছে বেনারসের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গাপ্রবাহ, কি বা লাগে দার্জ্জিলিঙ্গের উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী। সুরপুরে দুই একখানা মালের নৌকা দেখে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকতাম, আর এখানে সাত সমুদ্র তের নদী পারের পাহাড় প্রমাণ জাহাজ কত শত আসছে যাচ্ছে। এখনকার ছেলেরা শুনলে হাসবে, কিন্তু দুটো ঘোড়া ট্রামে পঞ্চাশ ষাটজন লোক অক্লেশে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এ প্রায় ভেল্কী বাজীর মত লাগত। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, শিবপুরের সরকারী বাগান কতবার যে দেখলাম তার ঠিক নেই। বাঙ্গালীর ছেলে সেপাই সান্ত্রী, গড়কেল্লা, তোপ বন্দুক কখন দেখি নেই। কেবলই কেল্লার আসে পাসে ঘুরে বেড়াতাম। আজকালকার দিন হলে দুভাই নির্ঘাত পুলিপুলাও চালান হয়ে যেতাম।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুজনে বসে নানা জল্পনা করতাম। লেখাপড়া ত শিখব। কিন্তু তারপর কি করব? সুরেশ ভয়ানক গোল করত। একবার বলে প্রফেসর হবে, একবার বলে উকীল, একবার বলে হাকীম। শেষ একদিন যোট ধরলে যে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে কেল্লায় চাকরী নেবে! যখন বুঝলে যে বাঙ্গালীর ছেলের সেপাইগিরি করবার কোন সম্ভাবনা নেই তখন হাল ছেড়ে দিয়ে আবার কলেজের পড়ায় মনোযোগ করলে। আমার ছেলেবেলা থেকে এক ঝোঁক উকীল হব। উকীল হয়ে কলকাতায় মস্ত বাড়ী ঘরদোর ক'রে পাঁচজনের একজন হয়ে বসব। সুরেশ ঠাট্টা ক'রত, "টাকা পয়সা জমানই বুঝি সব হল? তার চেয়ে ঐ একটা বড় জাহাজের মাল্লা হয়ে দেশবিদেশ ঘোরা ঢের মজা।" কিছুদিন যেতে না যেতে সে কিন্তু বুঝলে যে ভাল মানুষের মত কলেজে পড়া বই গতি নাই।

কলেজ জীবনও আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। পড়া জিজ্ঞাসা করার বালাই নেই। মাষ্টার বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা টুকে যাচ্ছি। বন্ধু বান্ধব কেউ নেই। সুরেশ আর আমি, আমি আর সুরেশ। জাতিভেদ প্রবল। যারা গাড়ী চ'ড়ে আসে, তারা পায়ে হাঁটা লোকের সঙ্গে কথা কইতে চায় না। ব্রাহ্ম হিন্দুকে দেখলে নাক উঁচু করে, হিন্দু ব্রাহ্ম দেখলে দূরে স'রে যায়। যারা কলকাতা ইস্কুল থেকে পাস হয়েছে তারা বাঙ্গালদের কৃপা চক্ষে দেখে। আর সত্যি বলতে গেলে আমরা কৃপার পাত্র ছিলাম বই কি। বে-ঢপ কাপড় চোপড়, জেলে মালার মত চুল, কথাবার্ত্তায় নানাপ্রকার গ্রাম্যটান, আমাদের একটু অপরূপ বোধ হবে তাতে আশ্চর্য্য কি? গান্ধীজীর এত চেষ্টা সত্ত্বেও

এ জিনিস যায় নেই। তখনকার দেশনেতারা ত সাহেব লোগ ছিলেন। মোট কথা, এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে আমি যেন আরও কুনো আরও মুখচোরা হয়ে যেতে লাগলাম। সুরেশের প্রকৃতি অন্য রকম। প্রথম প্রথম একদিন সে প্রস্তাব করলে যে দুই একজন শহুরে বাবুর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে খুব ঠুকে দেওয়া যাক্। ঠুকে আমরা দিতে পারতাম, কারণ আমরা দুজনেই ভদ্র হলেও বেশ বলিষ্ঠ ভদ্র ছিলাম। কিন্তু আমার ত কারও উপর রাগ ছিল না। আমরা লোকের সঙ্গে মিশতে জানিনা বলেই তারা মেশে না। সুরেশকে কোন রকমে নিরস্ত করলাম। ভালই করেছিলাম কেন না দ্বিতীয় বছর নাগাদ তার বেশ কয়েকজন বন্ধু জুটল। তখন সে আমাকেও মুক্তি দিলে। কলকাতা দেখা শেষ হয়ে গেছে। এখন নিত্যকর্ম্ম হাওয়া খেতে বেরোন। তা সুরেশ অন্য বন্ধুদের সঙ্গেই বেশী যেত। আমি শারীরিক মানসিক দুরকমেই বেশী কোটরস্থ হতে লাগলাম।

প্রথম বছর যখন পূজায় দেশে গেলাম, তখনও এতটা হয় নেই। বাবা আমায় বলে দিলেন, "কেবল বাড়ী ব'সে থাকা বড় খারাপ। মাঝে মাঝে মন্দিরে যাবি। আর আমার দুই একজন ব্রাহ্ম বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাস্। তাহলেই লোকজনের সঙ্গে আলাপ হবে, কলকাতাটা একেবারে নির্ব্বাসনের মত লাগবে না।"

আদেশমত কলকাতায় ফিরে কয়েক রবিবার সমাজে গেলাম। কিন্তু ভাল লাগল না। আমার ছেলেবুদ্ধিতে কেবল মনে হতে লাগল, এ ত সাহেবদের গির্জ্জারই নকল, হিন্দু ক্রিয়াকলাপের ভড়ংএর বদলে আর একটা বিদেশী ও আধুনিক ভঁড়ং খাড়া করা হয়েছে মাত্র। বাবার বন্ধুদের নমস্কার ক'রে এলাম। তাঁরা দুপাঁচটা ব্রাহ্ম বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে কই, আমাদের বাড়ীর মত একটা জীবন্ত ধর্ম্মভাব দেখলাম না। নজরে পড়ল শুধু মেয়েদের উঁচু খুরো দেওয়া জুতো আর বিলেতী ঢঙের রঙ-বেরঙের জামা, পুরুষদের সাহেবী কলার টাই আর ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা। এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দেখলাম যে সাহেবী খানার বন্দোবস্ত, মায় মদ পর্য্যন্ত। এ রকম শিক্ষা ত পাই নেই। মনটা বড় বিগড়ে গেল। সুরেশ সমাজে দুই একবার গেছল আমার সঙ্গে কিন্তু কারও বাড়ী সে যেতে চাইত না। নিজের কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেই বেশী ভাল বাসত।

আমার একটা জায়গা জুটেছিল যেখানে গিয়ে বড় আনন্দ পেতাম। সে এক ব্রাহ্ম প্রচারক সেন মহাশয়ের বাড়ী। তিনি বাবার বন্ধু ছিলেন। সুরপুরেও এক আধবার গেছলেন মাঘোৎসব উপলক্ষে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমায় বড় যত্ন করতেন। তাঁরা দুজনেই সন্ন্যাসীর মত মানুষ, যথার্থ ধার্ম্মিক। কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা ছিলনা। আমি মাঝে মাঝে তাঁদের কাছে রবিবার দিনটা কাটিয়ে আসতাম। সেন মহাশয় বলতেন,—

"বুঝতে পারি না বাবা, সত্যধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্কীর্ণতা বা বিলাস কি ক'রে থাকতে পারে।"

তাঁরই মুখে শুনলাম যে দক্ষিণেশ্বরে এক মস্ত ভক্ত আছেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁর কাছে সর্ব্বদা যাওয়া আসা করতেন। সুরেশকে বললাম,

"চল্ না একদিন দেখে আসি। শহরের এত কাছে।"

সে তৎক্ষণাৎ রাজী হল। কাশীর স্বামীজীকে সে কখনও ভোলে নেই। কেবলই বলত,

"আমায় টিকির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, ভাই। একাজ তোদের অতি বড় ব্রাহ্মরাও করতে পারত না।"

পরদিন দক্ষিণেশ্বর গেলাম এক পানসী ভাড়া ক'রে। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া, দক্ষিণেশ্বরের কাছে সুন্দর দৃশ্য। মনটা স্বভাবতঃই হালকা হয়ে গেল। তার পর পঞ্চবটীর তলায় ঠাকুরকে দেখলাম। তাঁর চারিদিকে অনেক লোক তাঁকে ঘিরে বসে আছে। সৌম্যমূর্ত্তি। কখন চেয়ে দেখছেন, কথা কইছেন। কখনও বা চোখ বুজে রয়েছেন। পাগলের মত খোলা চোখ, কিন্তু যখন আমাদের দিকে চাইলেন, তখন তার কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! মনে হল যেন একেবারে ভেতর পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলেন,

"কি গো বাবুরা, তোমরা কি মনে ক'রে! এত কাশীর পণ্ডিত পরমহংস নয়, এ একটা ক্ষ্যাপা বামুন, বদ্ধ পাগল। তা যখন এসেছ, একটা কথা বলি ঐ ছোটবাবুকে, কেবল কি নিয়ে বেড়াবে দিতে শিখবে না? আর তুমি, বড়বাবু, ভাল ছেলে কিন্তু, সাবধান! মনে দেমাক আসতে দিও না। তুমি দিতে পারবে। সে শক্তি মা তোমায় দিয়েছেন।"

ব'লেই মা, মা, ক'রে চোখ বুজলেন। আমরা প্রণাম ক'রে চলে এলাম। পানসীতে সুরেশ জিজ্ঞাসা করলে,

"কি বললে, ভাই নরেশদা? সত্যি লোকটা পাগল। যাহোক, তোকে ত ভাল ছেলে বলে চিনতে পেরেছে। একবারে বুজরুক নয়।"

আমি কিছু উত্তর দিলাম না। আমার তখনও বুক দুড় দুড় করছে। আমার মনের মধ্যে যে একটা নির্ব্বাক্ দেমাক আছে, সেটা ঠিক ধ'রে ফেলেছেন। এখন থেকে চেষ্টা করব, মাথা নীচু করতে শিখব। একটু পরে সুরেশকে বললাম, "ভাই, ঠাকুর যা বলেছেন একটু ভেবে দেখিস্। উনি সহজ লোক নয়।"

এই মহাপুরুষ দর্শনের সাক্ষাৎ ফল এই হল যে আমি স্থির করলাম যে এখন থেকে মানুষ জনের সঙ্গে মিশব, আর ঘরের কোণে ব'সে থাকব না। সুরেশের সঙ্গে রোজ মাঠে খেলতে যেতে আরম্ভ করলাম। সে আজকাল খুব ক্রিকেটে মেতেছে। এতদূর যে বোধ হয় পড়াশুনোরও একটু ত্রুটী হচ্ছে। আমার ত কিছুতে মাতবার শক্তি নেই। তবে যথাসাধ্য উৎসাহ দেখাতাম। ফি শনিবার কলেজের Debating Societyর সভা হত। সেখানেও নিয়মিত যাওয়া সুরু করে দিলাম।"

সেন মহাশয় ঠাকুরের কথা শুনে বললেন,

"উনি একজন সিদ্ধপুরুষ। অদ্ভুত ওর অন্তর্দৃষ্টি। তোমার গর্ব্বের কথা যখন বলেছেন, বিনা কারণে বলেন নেই। নরেশ, তোমার সমবয়স্ক ছেলেদের প্রতি তোমার একটা অশ্রদ্ধা আছে এটা আমিও বুঝতে পেরেছি। সেটা তুমি ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা কর।"

ঝেড়ে ফেলবার আর একটা সুযোগ হল। সেই বছর কংগ্রেস বসবে কলকাতায় বড় দিনের সময়। শহরের বড় বড় লোক কোমর বেঁধে লেগে গেছেন। টিভলি বাগানে প্রকাণ্ড মণ্ডপ বাঁধা হচ্ছে। আমাদের সুরপুর থেকে হুকুম এল যেন আমরা যথাসাধ্য কাজের ভার নিই। আমার উৎসাহের অভাব ছিল না। তবে, কয়েক মাস পরেই পরীক্ষা, একেবারে লেখাপড়া বন্ধ করাটা ঠিক হবে না। তাই সেবক দলে নাম লেখান উচিত কি না সন্দেহ হচ্ছিল। এতে সুরেশ ভয়ানক চ'টে উঠল।

বললে, "এই রকম ক'রে তুমি দেশের কাজ করবে, নরেশদা? নিজের এগ্জামীনও ঠিক থাকা চাই, ভারত উদ্ধারও হওয়া চাই! এ হয় না। কর্ত্তাদের কাছে কি এতদিন এই শিক্ষা আমরা পেয়েছি?"

সে নিজে ক্রিকেট পড়াশুনো সব ছেড়ে টিভলী বাগানেই সারাদিন কাটাতে লাগল। আমার চিরদিনের প্রথামত তার পিছু পিছু ভলণ্টীয়ার দলে ভর্ত্তি হলাম। তবে তার মত সব ভুলে দেশ-সেবায় লেগে যেতে পারলাম না। আমার দ্বারা কখনও কিছু হবে না। এত যার অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা সে কোনদিন একটা বড় কাজ করতে পারে না। যথাসময় কংগ্রেসের বৈঠক আরম্ভ হল। বাবা কাকা সুরপুরের প্রতিনিধি হয়ে এলেন। এবার সভাপতি বোম্বাইয়ের ফেরোজ শাহ সাহেব। তাঁর অভিভাষণ শুনে আমারও ঠাণ্ডা রক্ত গরম হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল, যে দেশে এমন সব মানুষ, সে দেশ কি চিরদিন পতিত থাকতে পারে? সুরেশ ত কেঁদেই আকুল। অধিবেশন হয়ে গেল। আবার বিজয়ার পরদিনের পূজা-মণ্ডপের মত শহর নিঝুম হয়ে পড়ল। আমি পাঠ্য-পুস্তক নিয়ে লেগে গেলাম। কিন্তু সুরেশের দৈনিক জীবনে অভ্যস্ত হতে সময় লাগল।

৮

সে বছর পরীক্ষায় আমরা কেউ জলপানি পেলাম না। আমি প্রথম বিভাগে পাস হলাম। কিন্তু সুরেশ দ্বিতীয় বিভাগের বেশী পারলে না। খবর যখন এল আমরা সুরপুরে। ডাক্তার কাকা বড় ক্ষুণ্ণ হলেন। বাবা বললেন,

"যা হয়েছে তার আর উপায় কি? এবার দুজনে যাতে ভাল করে বি-এ পরীক্ষা পাস হতে পার, সেই চেষ্টা কর প্রথম থেকেই।"

আমাদের বুড়ো হেড্-মাষ্টার মহাশয়কে প্রণাম করতে যখন গেলাম তিনি বললেন, "সুরেশ, তুই নরেশের সঙ্গ ছাড়িস্ না। এবার দুজনে যাতে ঠিক এক নম্বর পাস, সেইটে এখন থেকে চেষ্টা কর।"

সরলা এই বছর মেট্রিক পাস হল। কিন্তু সে আর কলেজে পড়বে না, বাবা এই স্থির করলেন। মা বললেন যে তার এইবার ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম ভাল করে শেখা উচিত। আমাদের ব'লে দিলেন যেন আমরা কলকাতায় ভাল বরের সন্ধান করি, এইবার বিয়ে দিতে হবে ত।

কলকাতায় ফিরে গেলাম। সুরেশের মন বড় বিমর্ষ। কোথাও যায় না, বাড়ী ব'সে থাকে, আমায় রোজ বলে,

"ভাই নরেশদা, আর আমায় ছেড়ো না। তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।" আমি বললাম,

"সুরেশ ভাই, আমার চেয়ে তোর বুদ্ধি ঢের বেশী, তবে তোর সব জিনিসে গা ভাসিয়ে দেওয়া অভ্যাস। তাইতে পড়াশুনোর একটু ক্ষতি হয়েছে।"

পূজার ছুটী পর্য্যন্ত একই ভাবে কাটল। সুরেশ নিয়মিত পড়াশুনো করে। বিকেলবেলা দুজনে একসঙ্গে মাঠে খেলতে যাই। তার আগেকার বন্ধুরা রীতিমত বাবুলোক ছিল। তারা অনেকেই পাস হয় নেই। কেউ কেউ লেখাপড়া ছেড়েও দিয়েছে। তাদের আমোদ প্রমোদ ছিল ঘরে ব'সে। দেহটাকে ক্লেশ দেওয়াতে তাদের আস্থা ছিল না। কাজেই খেলার মাঠের কাছেও ঘেঁসত না। এই দলের কেউ কেউ এক আধ বার আমাদের বাসায় উকী মেরেছিল। কিন্তু সুরেশ তাদের এবার আমল দিলে না মোটেই। আস্তে আস্তে তারা আমাদের আকাশ থেকে অন্তর্দ্ধান হল। আগের মত আবার সুরেশ আর আমি, আমি আর সুরেশ। সেই পুরাণো বাসা। তবে দুজনেই এখন আধা শহুরে। তাই আসবাব-পত্র অনেক বেড়েছে। বাড়ীওয়ালাকে ধ'রে ঘরগুলোও ফিটফাট করে নেওয়া হয়েছে। দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি। তাকের উপর ইংরেজী বাঙ্গলা নভেল। ঘরের মাঝে টেবিলের উপর রবিবাবুর নূতন বই, সোনার তরী ও চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু সুরেশের মনে আনন্দ কিছুতেই আসে না। ভাল ক'রে পাস হয় নেই এটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তাই বাবা কাকাকে ধ'রে এবার পূজার ছুটীটা কোথাও বেড়াতে যাবার অনুমতি নিলাম।

আমরা গেলাম মধুপুরে। খুব ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলাম। অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তখনকার দিনে দুচার জন বাঙ্গালী একত্র হলেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ হয়ে যেত। একদিন সুরেশ খুব পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিচ্ছে এমন সময় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঠাট্টা ক'রে বললেন,

"তোমরা দুই ভাইয়ে একদিন সাধনানন্দজীর কাছ থেকে ঘুরে এস। এই পাঁচমাইল দূরেই থাকেন। অধিকারভেদের কথা তিনি বুঝিয়ে দেবেন।"

ভাল করে খবর নিয়ে জানলাম যে সাধুমহারাজ এক গুহায় বাস করেন, বাইরে কুঁড়ে ঘর বেধে চেলারা থাকেন, মধুপুরের অনেক ভদ্রলোকই সেখানে যাতায়াত করেন। দুবন্ধুতে পরামর্শ করে স্থির হল যে পরদিনই সাধুর আস্তানায় যাব, আর যদি তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী হন ত খালি দর্শন নয়, এবার দীক্ষা নেব। আমার দীক্ষা নেওয়ার কারণ যে এত চেষ্টা সত্ত্বেও অন্তরে নম্রতা আনতে পারছি না। যতই সংসার দেখি ততই মনে বার বার এই কথাটা জাগে,

"কেন এরা এত নীচ, এত দুর্ব্বল? কেন এরা জীবনটাকে আরও উঁচু করে বাঁধতে পারে না?" পরমহংসদেব ত সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবু এ ভাবটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। সুরেশের পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার পর থেকে সে কেমন মুষড়ে পড়েছিল। মনে করলে, মহাপুরুষের কৃপায় যদি মনে আবার উৎসাহ উদ্যম ফিরে আসে। আমাদের তখন এবুদ্ধি ছিল না যে টোটকা চিকিৎসায়, মুষ্টিযোগে, সব ব্যাধি সারে না।

যাহোক পরদিন স্বামীজীর আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি ভাঙ্গা বাঙ্গলায় খুব আদর অভ্যর্থনা করলেন। আদেশ

করলেন সেদিন যেন সেইখানেই প্রসাদ পাই। সুবিধা বুঝে আমাদের আর্জী পেশ করলাম। তিনি হেসে উঠলেন,

"খাও দাও, লিখাপড়া কর, এই ত তোমাদের মন্ত্র।"

আমরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সন্ন্যাসী এক অশ্লীল গালি দিয়ে বললেন,

"অধিকার বিনা দীক্ষা পাওয়া যায় না। তোরা দূর হয়ে যা।"

অগত্যা ফিরে যেতে হল। কিন্তু ছাড়লাম না মহারাজকে। রোজ হাজরে দিতে লাগলাম। দিন দশেক বাদ মহারাজের দয়া হল। দুজনকে আলাদা আলাদা ডেকে অনেক জিজ্ঞেস পড়া করলেন। তারপর আমাদিকে বিন্দুধ্যান আদেশ করলেন। ঘরের সাদা দেওয়ালের উপর একটা কাল বিন্দু এঁকে নিয়ে সেইটে মনে ধারণা করতে হবে, এই ব'লে দিলেন। মধুপুরে ফিরে দুজনে এই অভ্যাস করতে লাগলাম। আমার জিনিসটা অত্যন্ত কঠিন বোধ হল, কিন্তু সুরেশচন্দ্র তিন দিনের দিন বললে, "আমার হয়ে গেছে।" আমি বললাম, "যা, গুরুদেবকে জানিয়ে আয়। বলিস্ আমার কিছুই হয় নেই।"

সন্ধ্যাবেলা যখন ফিরে এল সুরেশ মহা উত্তেজিত। চেঁচাতে লাগল,

"তোর ও গুরুদেবটা humbug, ঠগ। আমি তাকে বললাম, ওসব বিন্দুর পূজা আমায় কি দিচ্ছ? আমি ছেলেবেলা থেকে ব্রাহ্মসমাজে নিরাকারের ধ্যান করছি। আমায় অন্ততঃ একটা ঠাকুর মূর্ত্তি ধ্যান করতে দাও।'

আমায় জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা তাই ভাল। কোন্ মূর্ত্তি তোর পছন্দ?"

আমি জানালাম যে হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে সরস্বতী মূর্ত্তিই আমার বেশী ভাল লাগে। তাতে জোচ্চোরটা কি বললে জান?

'আচ্ছা তুই দেবীর পায়ের একটা নূপুর পরা আঙ্গুলের ধ্যান কর দেখি, ঠিক ধারণা হয় কি না?'

আমি একটু চোখ বুজে ব'লে দিলাম, 'ঠিক দেখতে পাচ্ছি। তখন বললে কি না, 'আচ্ছা এইবার একটা নূপুর আর একটা কুণ্ডল একসঙ্গে দেখতে চেষ্টা কর দেখিনি।'

ব্যাটা যেন আমায় viva voce পরীক্ষা করছে। আমি চ'টে বললাম 'ও সব বুজরুকী আমি পারব না। আপনি আমায় ঈশ্বরের একটা গুণের ধ্যান করতে দিন।'

সাধু হেসে উত্তর দিলে, 'আচ্ছা, তোর যে গুণ ইচ্ছা নিতে পারিস। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এটা ধারণা করতে পারবি?'

আমি ব'লে এসেছি যে এক হপ্তা পরে গিয়ে বলতে পারব যে আমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

গল্প শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দীক্ষা নিতে গিয়ে গুরুর সঙ্গে এই রকম বেয়াদবী! একটা কিছু অঘটন হয়ে যাবে এই ভয় হল। ভাবতে লাগলাম, "গুরু কেন এ রকম ব্যবহার বরদাস্ত করলেন? কে জানে, হয়ত সুরেশের একাগ্রতা দেখে তাকে পরীক্ষা ক'রে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই অত বড় ধ্যানের আদেশ করেছেন।" আমি বিন্দু নিয়ে সুবিধা করতে পারছিলাম না। চোখ বুজলেই একবার আছে একবার নেই, কখন কালো কখন লাল, এই রকম হতে লাগল। তিন দিনে বুঝতে পারলাম যে সাধনানন্দ সুরেশের কঠিন দণ্ডবিধান করেছেন মাত্র। পূজায় বসলেই সে পাঁচ মিনিটে চেঁচিয়ে ওঠে,

"এই যে এখানে। না, ঐ ওখানে। ঐ দেওয়ালের উপর, ছাদে। না না, এই যে আসনের নীচে।" ব'লেই লাফিয়ে উঠে আসন উটকে ফেলে দেয়।

দুই একদিন পরে জ্বর হল। জ্বরের ঘোরেও ঐ চীৎকার,

"এই যে বালিশের নীচে। খাটের তলায় দেখ। মশারির চালে। সর্ব্বব্যাপী! কে? কে?"

তখন ভয় পেয়ে গুরুদেবের কাছে দৌড়ে গেলাম। তিনি আমায় দেখেই বললেন,

"কিছু বলতে হবে না। আমি জানি। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ডাক্তারের দাওয়াই কর। ভয় নেই।"

সেইদিনই সুরেশকে নিয়ে কলকাতা ফিরলাম। ডাক্তার কাকা ও কাকীমা আমার তার পেয়ে এলেন। কাকা নিজেই

চিকিৎসা করলেন। পনের দিন পরে ছেলে পথ্য পেলে তাকে সুরপুর নিয়ে যাওয়া হল। একমাস পরে সুরেশ আমায় চিঠি লিখলে,

"It was touch and go, যেতে যেতে বেঁচে গেছি, ভাই। সাধু ব্যাটারা সব চোর, ভণ্ড। কি বিষ খাইয়ে দিয়েছিল কে জানে। ভয়ানক কমজোর হয়ে গেছি। তাই বাবা ঠিক করলেন যে আমায় থার্ড ইয়ার ক্লাসে আর এক বছর থাকতে হবে। মিছেমিছি একটা বছর নষ্ট হল। তোর সঙ্গও ছাড়তে হল। একা একা কি আর কোনদিন পাস হতে পারব ?

ধর্ম্মের কাছ দিয়েও কিন্তু আর যাচ্ছি না এখন থেকে।"

৯

সুরেশ এল না, তাই আমাদের বাসাটা ছেড়ে দিয়ে এক মেসে আশ্রয় নিতে হল। একা বাসা রাখার মত অবস্থা আমার ছিল না। সেই মেসে সুরপুর অঞ্চলের ছাত্র কয়েকজন থাকত। তারা আমার চেয়ে বয়সে ছোট। বাহিরের লোকের সঙ্গে বাস করা আমার যে একটুও ভাল লাগত তা নয়। কিন্তু এতে আমার উপকার হল অনেক। দিবারাত্র কেবল নিজের চিন্তা না করে অন্য ছেলেদের পড়াশুনো দেখতাম, তাদের সঙ্গে নানা সুখ দুঃখের কথা কইতাম। সেন মহাশয়ের কাছে মাঝে মাঝে যেতাম। মাসীমার রান্না খেয়ে মুখ বদলে আসতাম। সেন মহাশয় আমার মেসে থাকাতে খুসী ছিলেন। তিনি বলতেন,

"বাবা, পরীক্ষা পাস করা ভাল জিনিস। কিন্তু তার চাইতেও বড় জিনিস পরের কাজ করতে পারা। মেসে থেকে পাঁচজনের দুঃখে দুঃখী হতে শিখবে।"

এইভাবে গ্রীষ্মের ছুটী অবধি কাটল। ক্লাস পরীক্ষার ফল ভালই হল। সুরপুরে এবার আমাদের বাড়ী সরগরম। সরলার বিয়ে হবে। বর রমেশ আমাদের ঐ দেশেরই ছেলে। সুরেশের সঙ্গে কলকাতায় তার একটু আলাপও ছিল। বি-এ পাস করেছে, শীঘ্রই বিলেত যাবে ব্যারিষ্টার হতে। ঘরে পয়সা কড়ি যথেষ্ট আছে। আমি যখন পৌঁছলাম সুরেশ বেশ সেরে উঠেছে। দিবারাত্র বিয়ে বাড়ীর কাজে ব্যস্ত। আমিও কোমর বেঁধে লেগে গেলাম। একটা কথা শুনে বড় আনন্দ হল, রমেশের মা নেই, তাই বাবা বলেছেন যে রমেশ ফিরে আসা পর্য্যন্ত সরলা আমাদের থাকবে আর রীতিমত পড়াশুনো করবে। সুরপুরে এক মিশন ছিল। সেখানকার মেম সাহেব সরলাকে বাড়ীতে পড়াচ্ছিলেন। এই বন্দোবস্তই থাকবে ঠিক হল। আমাকে দেখেই সুরেশ চেঁচিয়ে উঠল,

"নরেশদা, গ্রাণ্ড (জ্যাকাল) ব্যবস্থা হয়েছে। বাঁদরীর বিয়ে হবে, কিন্তু শ্বশুর ঘর করতে হবে না। এই সরলা! দাদা এয়েছে, দৌড়ে এসে মুখটা দেখিয়ে যা।"

সরলা মুখখানি লাল ক'রে এসে প্রণাম করলে। সুরেশ বললে, "নেকী! উনি আবার কলকাতায় কলেজে পড়তে যাবেন ব'লে ঘোট ধরেছিলেন। কেন, এখন বিয়ে করছিস্ কেন ?"

সরলা পালিয়ে গেল। আমি বললাম, "ন্যাকা তুই। মনে আছে সরলাকে বিয়ে করবি ব'লে খেপেছিলি একদিন ?"

"ছি নরেশদা, কি যে বল তার ঠিক নেই। ও যে আমার বোনটী। যেমন তোমার, তেমনি আমার।"

"তা ত বটেই ভাই। আমি ঠাট্টা করছিলাম। কিছু মনে করিস্ না। হ্যাঁরে, রমেশ কি রকম ছেলে ?"

"খুব ভাল ছেলে। বরাবর জলপানি পেয়ে এসেছে। তবে রসকস কিছু নেই। পরীক্ষার পড়াকেই সার ব'লে বুঝেছে।"

"তুই সঙ্গে না থাকলে তোর নরেশদাও তাই হত।"

"কখনই না। তোমার ছোট ভাইয়ের চিন্তা যে তোমার কাছে সব চেয়ে বেশী। পরীক্ষার চেয়েও বেশী। সে কি আমি জানি না। তোমার বিন্দুধ্যানের কি হল, দাদা ?"

"সময় পাই না। ওসব আমার দ্বারা হবে না।"

"তোমার দ্বারা হবে না ত আমার দ্বারা নিশ্চয়ই হবে না। আমি আর সাধু-সন্ন্যাসীর তেসীমানায় যাচ্ছি না। ব্যাটারা মহা চোর। ওদের চেয়ে আমাদের পুরুত ঠাকুর ভাল। গণ্ডা চারেক পয়সা দিয়ে যা করতে বলবে তাই করবে।"

"ভালমন্দ সবেরই আছে, সুরেশ। ধর্ম্মটাকে একেবারে ছেঁটে ফেলে দিলে ত আর চলবে না।"

যথাসময় সরলার বিয়ে হয়ে গেল। বর বরযাত্রী সব বাজনা বাদ্য নিয়ে রোশনাই ক'রে নৌকায় এল। ঘাট থেকে আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত আমাদের লোক মশাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ীর সামনে সালুমোড়া এক নহবৎখানা তৈরী হয়েছিল। সেখানে লক্ষ্ণৌয়ের রোশনচৌকী বাজছিল। খাওন দাওন, বাজী পোড়ান ইত্যাদি ধূম খুব হল। তারপর সম্প্রদান। সরলার হাত রমেশের হাতে দেওয়ার সময় বাবা অনেক কষ্টে কান্না চেপেছিলেন। রমেশকে অতি ভাল-মানুষ মনে হল। ও মানুষ বিলেতে তিন বছর একা একা কি ক'রে কাটাবে কে জানে। বিয়ের পরদিন সরলা বরেদের সঙ্গে চলে গেল নৌকায়। রমেশের বাবা সতীশবাবু বড় চমৎকার লোক। সরলাকে মা, মা, ক'রে কত আদর করলেন কত রকম কথা কয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গেলেন। সুরেশ আর আমি খানিকদূর ওঁদের এগিয়ে দিয়ে এলাম।

সাতদিন পরে সরলা ফিরল। তার হাসিমুখ দেখে সবাই বলাবলি করতে লাগল, "মেয়ের বর পছন্দ হয়েছে।"

সুরেশ কি ছাড়বার পাত্র? সরলাকে ধ'রে নিয়ে এল আমাদের পড়বার ঘরে। জিজ্ঞাসা করলে, "কি রে, জামাইবাবুকে কেমন লাগল?"

অনেকবার জিজ্ঞাসা করার পর আস্তে আস্তে জবাব দিলে, "মন্দ নয়"। কিন্তু তার মুখের লাল আভা, চোখের কোণে হাসি দেখে বুঝলাম সত্যি জবাব কি। মোটের উপর সরলার বিয়েতে আমরা খুব খুশী হলাম। রমেশ ভাল ছেলে, ঘরে পয়সা আছে, সরলাকে আদর যত্ন করেছে এ সবই আনন্দের কথা। তার উপর, সতীশবাবু অমন সুন্দর লোক, সরলাকে এখন মা বাবার কাছে রাখবেন এটাও কম কথা নয়। (ক্রমশঃ)

চারুচন্দ্র দত্ত

পাঁচ শ মাইল দূরে

শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত, বি-এ

পাঁচ শ মাইল দূরে
পরাণ আমার শুধু বার বার
সেথা মরে ঘুরে ঘুরে
পাঁচ শ মাইল দূরে।
সে দেশের বায়ু, সে দেশের জল
পরাণ আমার করেছে বিকল,
সে দেশের ক্ষেতে সোনার ফসল
রচিছে সম্মোহন,
সেই দেশে হায় মন যেতে চায়
যেতে চায় অনুখন।

পাঁচ শ মাইল দূরে
ভোরের আকাশ হাতছানি দেয়
প্রথম আলোর সুরে
পাঁচ শ মাইল দূরে।
মাধবী কুঞ্জে পিয়ালের শাখে
পাখী গায় গান কত লাখে লাখে,
হাসানুহানার বেড়াটির ফাঁকে
রোদ আসি মুরছায়;
সেথা বার বার পরাণ আমার
নিমেষ নয়নে চায়।

পাঁচ শ মাইল দূরে
একখানি আশা, ভীরু ভালবাসা
মনের গোপন পুরে,
পাঁচ শ মাইল দূরে।
দুটি চোখ তার কালো দুটি চোখ
পরাণে আমার রচে ধ্যান লোক,
উজ্জয়িনীর স্বপ্ন এ হোক
নবীন মেঘের স্মৃতি,
মোর মালবিকা মোর অনামিকা
আমার জীবন গীতি

রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনী

(সমালোচনা)

শ্রীপৃথ্বীসিং নাহার

কবিকাহিনী রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত রচনা। "বনফুল" ইহার এক বৎসর পরে গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়, যদিও উহা পূর্ব্বেই রচিত এবং "জ্ঞানাঙ্কুর" পত্রিকায় ১২৮২ সালে প্রকাশিত হয়। কবিকাহিনী ১৯৩৫ সম্বৎ অর্থাৎ ১২৮৫ সালে কলিকাতায় সরস্বতী যন্ত্রে শ্রীক্ষেত্র-মোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। এক বৎসর পূর্ব্বে ১২৮৪ সালে "ভারতী" পত্রিকার প্রথম বর্ষে ইহা বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথকে না জানাইয়াই তাঁহার এক বন্ধু শ্রীপ্রবোধ-চন্দ্র ঘোষ তাঁহাকে বিস্মিত করিবার অভিলাষে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। এই বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া "জীবন-স্মৃতি"তে কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন :—

"এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই "কবিকাহিনী" নামক একটা কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্ত্তিটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিতেছে ইহা সেই বয়সের লেখা। সেই জন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিৎ অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ, কবি বটে, ইহা সেই জিনিষটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ, ইহা শুনিতে খুব বড় এবং বলিতে খুব সহজ।

* * *

এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোন উৎসাহী বন্ধু এই বইখানি ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভাল করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না কিন্তু তখন আমার মনে যে ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনো-মতেই বলা যায় না। দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বই লেখকের কাছে নহে, বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায় সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।"

(১ম সংস্করণ, পৃঃ ১১০-১১১)

"কবিকাহিনী" যে বয়সের লেখা তখন মন যে স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ, কল্পনার রঙীনালোকে লীলায়িত—এ কথা আমরা অস্বীকার করিব না। কিন্তু এই বালকোচিত ভাবপ্রবণতার মধ্যেই আমরা দেখি কবির পরবর্ত্তী জীবনে যে সব ভাবধারার বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহারই পূর্ব্বাভাস। ইহা আমাদিগকে যথার্থই বিস্মিত করে। রূপস্রষ্টার সম্পূর্ণ সুসমাহিত প্রকাশ ইহার মধ্যে না থাকিতে পারে কিন্তু জীবনকে সত্যভাবে গ্রহণ করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা সংসারযাত্রা-পথের প্রারম্ভেই কবির মনকে কি গভীর-ভাবে নাড়া দিয়াছিল তাহার ইতিহাস এই ক্ষুদ্র উপেক্ষিত কাব্যটির ভিতরে পাওয়া যায় এবং সেই জন্যই ইহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

এই খণ্ডকাব্যটি চার সর্গে বিভক্ত। ইহার গল্পাংশটিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। গল্পের নায়ক কবির বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া নলিনীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহার প্রথম অংশ। নলিনীর মৃত্যুর পরে হিমালয়ে

কবির নির্জ্জনবাস এবং সম্পূর্ণ আত্মগত ঐকান্তিক জীবনযাপন ইহার দ্বিতীয় বা শেষ অংশ।

১

কোন এক কবি বাল্যকাল হইতেই প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত।—

"শুন কল্পনা বালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীর তলে। ছেলেবেলা হোতে
তোমার অমৃত-পানে আছিল মজিয়া।"

প্রকৃতির নানা সৌন্দর্য্যের মধ্যে, কাননে, প্রান্তরে, ঝিল্লি-মুখরিত রাত্রির মধ্যে, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পূর্ণিমায়, প্রভাতের সমীরণে, বিহঙ্গের গানে,—

"এইরূপে কি একটি সঙ্গীতের মত,
তপনের স্বর্ণময় কিরণে প্লাবিত
প্রভাতের একখানি মেঘের মতন,
নন্দন বনের কোন অপ্সরা বালার
সুখময় ঘুমঘোরে স্বপনের মত
কবির বালককাল হইল বিগত।"

কবি যখন যৌবনে পদার্পণ করিল, প্রকৃতি নিজের সমস্ত আবরণ উন্মোচন করিয়া, 'সঙ্গিনীর মত'—

"নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে।"

বহির্জগতের এই বিশাল আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া কবির হৃদয়ে অসীমের অনন্ত অবিচ্ছিন্ন বিরাট স্বরূপ সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল।

"হে জননী, আমার এ হৃদয়ের মাঝে
অনন্ত অতৃপ্তি তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই,
তাই দেবি পৃথিবীর পরিমিত কিছু
পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার।"

তাই কবি সুবিশাল প্রকৃতির বন্দনা-গানে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিল।

"তাই ভাবিয়াছি আমি হে মহাপ্রকৃতি,
মজিয়া তোমার সাথে অনন্ত প্রণয়ে
জুড়াইব হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা
তোমার বিচিত্র কাব্য-উপবন হতে
তুলিয়া সুরভি ফুল গাঁথিয়া মালিকা,
তোমারি চরণতলে দিব উপহার।
এইরূপে সুনিস্তব্ধ নিশীথ গগনে
প্রকৃতি বন্দনা-গান গাইত সে কবি।"

কিন্তু হায়! এতকাল প্রকৃতির একনিষ্ঠ সেবা করিয়াও হৃদয়ের দারুণ শূন্যতা ভরিল না। মানবমনের সাহচর্য্য লাভ করিতে না পারিলে বুঝি পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারে না।

"শুনিয়াছিলাম কোন উদাসী যোগীর কাছে—
"মানুষের মন চায় মানুষেরই মন,
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল,
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর
আঁধার সে পর্ব্বতের গহ্বর বিশাল:
তটিনীর কলধ্বনি, নির্ঝরের ঝরঝর
আরণ্যবিহঙ্গদের স্বাধীন সঙ্গীত,
পারে না পূরিতে তারা, বিশাল মনুষ্য হৃদি
মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।"

কবি পৃথিবীময় ভ্রমণ করিল। তাহার গান শুনিয়া অনেকে উচ্ছ্বাসভরে কাঁদিয়া ফেলিত, কিন্তু তাহার হৃদয়ের কথা কেহ বুঝিল না, সে মনের মত মানুষ পাইল না। তাই নিরাশায় সে আবার প্রকৃতির কোলে ফিরিয়া আসিল। সে একান্ত মুহ্যমান হইয়া থাকিত। সমস্ত বনানীটি তাহার শোকে সমবেদনায় কাতর। বনের হরিণগুলি পর্য্যন্ত করুণার্দ্র-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত।

যখন এইরূপ বিষাদচ্ছায়ায় তাহার জীবন ম্লান, এমন সময় একদিন অপরাহ্নবেলায় বৃক্ষতলে সে এক বনবালিকার দেখা পাইল।

"একদিন অপরাহ্নে বিজন পথের প্রান্তে
কবি বৃক্ষতলে এক রয়েছে শুইয়া,
পথশ্রমে শ্রান্ত দেহ, চিন্তায় আকুল হৃদি,
বহিতেছে বিষাদের আকুল নিশ্বাস।
হেনকালে ধীরি ধীরি শিয়রের কাছে আসি
দাঁড়াইল একজন বনের বালিকা,
চাহিয়া মুখের পানে কহিল করুণস্বরে
"কে তুমি গো পথশ্রান্ত বিষণ্ণ পথিক?"

বালিকার প্রশ্নের উত্তরে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কবি জানাইল, তাহার প্রাণের মধ্যে যে অসম্পূর্ণতার ব্যথা আছে, তাহা কিছুতেই যাইতেছে না। তাহার পরে একে একে তাহার রুদ্ধ হৃদয়ের সমস্ত কথা সে বালিকাকে নিবেদন করিল। তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া সেই বনবাসিনী বালিকার চোখে জল আসিল।

"বালার কপোল বাহি, নীরবে অশ্রুর বিন্দু
স্বর্গের শিশিরসম পড়িল ঝরিয়া
সেই এক অশ্রুবিন্দু, অমৃতধারার মত
কবির হৃদয় গিয়া প্রবেশিল যেন।"

যে শুষ্ক কঠিন হৃদয়ভার লইয়া সে পাগলের মত চারিদিকে ঘুরিতেছিল, মমতাময় সমবেদনার করুণ স্পর্শে তাহা কথঞ্চিৎ লঘু হইল।

"যে হৃদয় নিরাশায় মরুভূমি হোয়েছিল
সেথা হতে হল আজ অশ্রু উৎসারিত।"

সেই সরলা বনকন্যা কবির শ্রান্ত মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া কোমল করে অশ্রুবারিধারা মুছাইয়া দিল। কবির সেবায় নিজেকে সে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিবে জানাইল। কবির জন্য সে বন হইতে ফলমূল তুলিয়া আনিবে, ঝর্ণা হইতে জল আনিবে, শয়নের জন্য পাতার সুকোমল শয্যা রচনা করিয়া দিবে। তাহার বীণায় কবিকে সে কত গান শুনাইবে। বিজন বনে যেখানে তাহার কুটীর, তাহারই পাশে গাছের তলে এক হরিণশিশু কত খেলা খেলে, দূরে নদীতীরে মনোহর কুঞ্জবনে কত পশুপাখীর মেলা বসে, তাহার আপনার এক পাখী আছে, সে কত গান গায় ও তাহার নাম ধরিয়া ডাকে—"নলিনী! নলিনী!"—এমন তাহার আরও কত কি আছে, সবই সে কবিকে দেখাইতে চাহে। এই প্রকার নানাবিধ আলাপে তাহাদের দিনগুলি সুন্দরভাবে কাটিয়া যাইবে। তাই সে বেদনার্দ্র-হৃদয়ে করুণস্বরে কবিকে তাহার কুটীরে আসিতে আহ্বান করিল।

নলিনীর এই অনুরোধ কবি উপেক্ষা করিল না। সেই শান্ত বনভূমির মধ্যে অবস্থিত বিজন কুটীরে তাহার দিন খুব সুখেই কাটিত। এখন সে আর একা সঙ্গীহীন নহে। এখন তাহারা দুইজনে পরম সৌহার্দ্যে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত। নলিনীর ঐকান্তিক ভালবাসা কবিকে মুগ্ধ করিল। তাহাদের হৃদয় মিলনের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইল। কবি আর তাহার "মরমের প্রণয় উচ্ছ্বাস কথা" চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

"একদিন ধীরে ধীরে বালিকার কাছে গিয়া
অশান্ত বালক মত কহিল কত কি?
অসংলগ্ন কথাগুলি, মরমের ভাব আয়ো
গোলমাল করি দিল প্রকাশ না করি,
কেবল অশ্রুর জলে, কেবল মুখের ভাবে
পড়িল বালিকা তার মনের কি কথা!"

নলিনীও অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে, কবিকে নিজের ভালবাসা নিবেদন করিল।

"স্কন্ধে তার রাখি মাথা কহিল কম্পিত স্বরে
"আমিও তোমারে কবি বাসি নাকি ভাল?"
কথা না স্ফুরিল আর, শুধু অশ্রুজলরাশি
আরক্ত কপোল তার করিল প্লাবিত।"

এইরূপ প্রেমের মধুর মিলনে তাহাদের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল।

"অরণ্যে দুজনে মিলি, আছিল এমন সুখে
জগতে তারাই যেন আছিল দুজন,
যেন তারা সুকোমল ফুলের সুরভি শুধু
যেন তারা অপ্সরার সুখের সঙ্গীত।"

সেই চঞ্চলা বনবালিকা কবির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিল। কবির ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা, কবির সুখের সঙ্গে সে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিল। কখন অকারণ হাসির পুলকে, কখনও উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে, কখন প্রকৃতির উদ্দাম ছন্দবিলসিত নর্ত্তনের প্রবল গতিতে, কখনও বা প্রভাত-বায়ুর মত শান্ত নির্ম্মল মুখশ্রীতে—নানাভাবে, প্রেমের বহু বিচিত্র ললিত প্রকাশভঙ্গীতে, কবির কাছে সে সদাই মূর্ত্তমান ছিল।

কিন্তু হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় পাইয়াও কবির প্রাণের শূন্যতা ঘুচিল না।

সংসারে যাহা কিছু ভাল আছে, প্রকৃতির মধ্যে যেখানে যত শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য সঞ্চিত আছে, প্রণয়ের মধ্যে যত সুধা আছে,

কল্পনার মধ্যে যত 'তরল স্বর্গীয় গীতি' আছে—সব দিয়াও তাহার হৃদয়ের দাহ কিছুতেই প্রশমিত হইল না। কিন্তু নিজের স্বর্গীয় হৃদয়কে মানসিক এত দারুণ যন্ত্রণার ভিতরেও বিলাস-সুরায় বিহ্বল করিয়া, বিস্মৃতির অচৈতন্যে ডুবাইয়া রাখিয়া, জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে তাহার কিছুমাত্র লোভ হইল না।

কিন্তু কবির এই গভীর মর্ম্ম-বেদনা বালিকার কাছে অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

"কবির প্রণয়-সিন্ধু, ক্ষুদ্র বালিকার মন
রেখেছিল মগ্ন করি অগাধ সলিলে,
উপরে যে ঝড় ঝঞ্ঝা, কত কি বহিয়া যেত,
নিম্নে তার কোলাহল পেত না শুনিতে
প্রণয়ের অবিচিত্র, নিয়ত নূতন তবু
তরঙ্গের কলধ্বনি শুনিত কেবল,
সেই একতান ধ্বনি, শুনিয়া শুনিয়া তার
হৃদয় পড়িয়াছিল ঘুমায়ে কেমন!"

কবির ভালবাসায় সে এতই মোহাবিষ্ট হইয়াছিল যে তাহার আর কিছু ভাবিবার অবকাশই ছিল না। সে কবির গান শুনিত সেই শুনার অপর্যাপ্ত আনন্দের যেন বিরাম নাই। কবির দীপ্যমান নেত্রে সে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিতে পাইত—তাহাতেই তাহাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া তুলিত। তাহার অবশ মস্তক সে কবির কোলে রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে কত ভালবাসিত। প্রণয়ের নানা অর্থহীন কাকলীতে সে কবির কাছে তাহার হৃদয়ের গোপন কথা নিবেদন করিত। প্রেমের এই রঙীন্ ভাবময় গভীর বাহিরের জগৎ তাহার কাছে একেবারে অবাস্তবতায় পরিণত হইয়াছিল। তাই কবির হৃদয়ে যে অশান্তির প্রবল ঝড় বহিতেছিল, বালিকা তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই।

একদিন কবি নলিনীকে জানাইল, সে আবার একা পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইবে।

"আর একবার বালা, কাশ্মীরের বনে বনে
যাই গো শুনিতে আমি পাখীর কবিতা!
রুষিয়ার হিমক্ষেত্রে, আফ্রিকার মরুভূমে
আর একবার আমি করিগে ভ্রমণ,
এইখানে থাক তুমি, ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ—
ওই মধুমুখখানি করিব চুম্বন।"

এই কথা বলিয়া গোপনে নয়নের জল মুছিয়া কবি নীরবে চলিয়া গেল। যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত বন আচ্ছন্ন হইয়া গেল তখন সে দূর হইতে শুনিতে পাইল—নিস্তব্ধ বনান্ত হইতে এক নৈরাশ্যময় বিষণ্ণ সুর শূন্যে ভাসিয়া আসিতেছে।

"তখন বনান্ত হোতে সুধীরে শুনিল কবি,
উঠিছে নীরবে শূন্যে বিষণ্ণ সঙ্গীত,
তাই শুনি বন যেন রয়েছে নীরবে অতি
জোনাকি নয়ন শুধু মেলিছে মুদিছে।"

সে মাত্র একবার কুটীরপানে কাতর দৃষ্টিপাত করিল। তারপর বনদেবীর নিকট বিদায় লইয়া—

"নয়নের জল মুছি—যে দিকে নয়ন চলে
সে দিকে পথিক কবি যাইল চলিয়া।"

বালিকার মনে যে কি কঠিন আঘাত লাগিল কবি তাহার কিছুই জানিল না। নলিনী অনেকক্ষণ নিমেষহীন পলকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চাহিয়া থাকিল। তাহার পর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে নিজের জীবনের কথা মনে করিয়া শোকভরে বিলাপ করিতে লাগিল।

কতদিন সে একা একাই বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত। একেলাই ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিত, নিজ মনেই বীণায় গান করিত, হরিণশিশুটি তাহার পায়ের কাছে ও তাহার পোষা পাখীটি তাহার কাঁধে বসিয়া নীরবে সেই গান শুনিত। কতদিন এইভাবে তাহার দিন কাটিয়াছে, এমন সময় কবির আবির্ভাব হইল।

"তখন তোমারে কবি কি যে ভাল বাসিলাম
এত ভাল কাহারেও বাসি নাই কভু।
দূর স্বরগের এক, জ্যোতির্ম্ময় দেব সম
কতবার করেছি প্রণাম।
দূর থেকে আঁখি ভরি দেখিতাম মুখখানি,
দূর থেকে শুনিতাম মধুময় গান।"

পরে কবিকে জীবনসঙ্গীরূপে পাইয়া তাহার হৃদয় যেন খুলিয়া গেল। সে ক্ষুদ্র হইয়াও যে কবির ভালবাসা লাভ করিতে পারিয়াছে তাহাতেই সে পরম সৌভাগ্যশালিনী।

সে তাহার সব দিয়া কবিকে ভাল বাসিয়াছে, তাহাতেও যদি তাহাকে খুসি করিতে না পারিল তাহা হইলে তাহার আর কি আছে? সে যদি জানিত কি করিয়া করিব মন তৃপ্ত করিতে পারিবে তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে সে তাহাই করিত। এখন তাহার একমাত্র কামনা কবি যেখানেই থাক সে যেন সুখী হয়, ক্ষুদ্র কাঁটাটিও যেন তাহার পায়ে না বিঁধে।

"যেথায় যাওনা কবি, যেথায় থাক না তুমি
আমরণ তোমারেই করিব অর্চনা
মনে রাখ নাই রাখ, তুমি যেন সুখে থাক
দেবতা! এ দুখিনীর শুন গো প্রার্থনা।"

এদিকে কবি সারা পৃথিবীময় ভ্রমণ করিল। কত তুষারাবৃত পাহাড়, কত কণ্টকাকীর্ণ বন সে পার হইয়া চলিল। কিন্তু প্রকৃতির বিপুল সৌন্দর্য্যসম্পদও তাহাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আকৃষ্ট করিতে পারিল না। এমন এক দিন ছিল যখন কবি সঙ্গীহীন একেলাই যাহাই দেখিত তাহাই তাহার কেমন সুন্দর মনে হইত। কিন্তু এখন দেবতাহীন মন্দিরের মত নলিনীবর্জ্জিত প্রকৃতির শোভা কবির নয়নে শূন্যময় ঠেকিত। প্রকৃতি নীরবতার ভিতর দিয়া যে কি গভীরভাবে আমাদের অন্তরতম হৃদয় স্পর্শ করে তাহা কবি খুব ভাল করিয়াই জানিত কিন্তু উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যেও নলিনীর বিরহব্যথায় কবির চিত্ত একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত।

"স্নিগ্ধ রাত্রে গাছপালা ঝিমাইছে যেন,
ছায়া তার পড়ে আছে হেথায় হোথায়।
দেখিয়াছি নীরবতা যত কথা কয়
প্রাণের মরমতলে এত কেহ নয়।
দেখি যবে অতি শান্ত জোছনায় মজি
নীরবে সমস্ত ধরা রয়েছে ঘুমায়ে,
নীরবে পরশে দেহ বসন্তের বায়,
জানি না কি এক ভাবে প্রাণের ভিতর
উচ্ছ্বসিয়া উথলিয়া উঠে গো কেমন!
কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভুলিয়া যেন গিয়েছি সহসা,
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা,
প্রকাশ করিতে গিয়া পাই না তা খুঁজি!"

যখন সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়াও কবি কোন সান্ত্বনালাভ করিতে পারিল না তখন সে আবার তাহার কুটীর অভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

"মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যথা জ্বলিয়া পুড়িয়া পাখী
সন্ধ্যায় কুলায় তার আইসে ফিরিয়া।"

নলিনীও অতি মর্ম্মান্তিক দুঃখের মধ্যে নানারূপ বিলাপে তাহার বিষণ্ণমলিন দিনগুলি একান্ত নিরানন্দভাবে কাটাইতেছিল। সেই ঝোপে ঢাকা অরণ্যকুটীরে শোকাকুল-হৃদয়ে শূন্যদৃষ্টিতে সে আকাশপানে চাহিয়া পড়িয়া থাকিত। যে বালিকা কখন স্থির থাকিতে জানিত না, বনে গিরিশিখরে ঝর্ণার ধারে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত, কখন ফুল তুলিত, কখন মালা গাঁথিত, কখন গান গাইত, কখনও বা বীণা বাজাইত, সে এখন একেবারে নিস্পন্দ, নির্জ্জীব। ক্রমে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহা আর জোড়া লাগিল না। নিশ্চিত মরণের পথে সে তিলতিল করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। তাহার কোন সাধই রহিল না। কেবল মরণের আগে যেন সে একবার কবির দর্শন পায়, ইহাই তাহার একমাত্র ক্ষীণ কামনা অবশিষ্ট রহিল।

"একদিন দুইদিন, যেতেছে কাটিয়া ক্রমে
মরণের পদশব্দ গণিছে সে যেন।
আর কোন সাধ নাই, বাসনা রয়েছে শুধু
কবিরে দেখিয়া যেন হয় গো মরণ।"

এদিকে কবি বহুদিন পরে আবার সেই বনভূমিতে প্রবেশ করিল। এখানকার বৃক্ষলতা সবই তাহার অতি পরিচিত। সে দেখিল সেই বনস্থলীর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

"তেমনি সকলি আছে, তেমনি গাইছে পাখী,
তেমনি বহিছে বায়ু ঝরঝর করি।"

সে তাড়াতাড়ি কুটীর লক্ষ্য করিয়া চলিল। নিকটে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া অধীরস্বরে "নলিনী! নলিনী!" বলিয়া ডাকিল। কোন সাড়া শব্দ নাই। সে দেখিল কুটীর শূন্য। আকুলহৃদয়ে বনে বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সজোরে নলিনীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। কেহই কোন উত্তর দিল না। কেবল নিদ্রিত হরিণের দল সেই শব্দ শুনিয়া ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল। অবশেষে নলিনীর সাথে যেখানে

বসিয়া থাকিত সেই গিরিশৃঙ্গে আরোহন করিয়া সে দেখিল নলিনী শুইয়া আছে।

"দেখিল সে গিরিশৃঙ্গে, শীতল তুষার পরে
নলিনী ঘুমায়ে আছে ম্লান মুখচ্ছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল আঁচল।"

একটি হরিণশিশু খেলাচ্ছলে কখনও বালিকার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে, কখনও তাহার শিঙ্ দিয়া ঈষৎ ঠেলা দিতেছে, কখনও বা অবাক্‌নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে কিন্তু কিছুতেই নলিনীর ঘুম ভাঙ্গিতেছে না। সে একেবারে নীরব, নিস্পন্দ।

তাহাকে দেখিতে পাইয়া দূর হইতেই কবি তাহার নাম ধরিয়া ব্যাকুলভরে ডাকিতে লাগিল। তবুও কোন উত্তর নাই। নিকটে আসিয়া কবি দেখিল তাহার হৃদয় গতিহীন, নিশ্বাস রুদ্ধ। এক নিদারুণ আঘাতে কবি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া গেল।

"দেখিল না, ভাবিল না, কহিল না কিছু
যেমন চাহিয়াছিল রহিল চাহিয়া।
নিদারুণ কি যেন কি দেখিয়া তরাসে
নয়ন হইয়া গেল অচল পাষাণ।"

চেতনা পাইয়া—

দেখিল তুষার-শুভ্র নলিনীর দেহ,
হৃদয় জীবন-হীন জড় দেহ তার,
অনুপম সৌন্দর্য্যের কুসুম-আলয়,
হৃদয়ের মরমের আদরের ধন—
তৃণ কাষ্ঠ সম ভূমে যায় গড়াগড়ি।
বুকে তারে তুলে লয়ে ডাকিল "নলিনী,"
হৃদয়ে রাখিয়া তারে পাগলের মত কবি
কহিল কাতরস্বরে "নলিনী" "নলিনী"!
স্পন্দহীন, রক্তহীন, অধর তাহার
অধীর হইয়া ঘন করিল চুম্বন।

তার পরদিন হইতে কবিকে সে বনে কেহ আর দেখিতে পাইল না। লোকালয়ের সহিত বাহিরের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া সে কোথায় চলিয়া গেল কেহই জানিল না।

নলিনীর দেহ তুষারে সমাহিত হইল। ক্রমে সেই নিও নষ্ট হইয়া গেল। ধীরে ধীরে সে বনও লোকালয়ে পরিণত হইল। এইরূপে কালের করালগ্রাসে পুরাতন স্মৃতিচিহ্নগুলি একে একে সবই বিলুপ্ত হইল।

"সে কাননে কবির সে সাধের কাননে
অতীতের পদচিহ্ন রহিল না আর।"

২

এখন হইতে কবির জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। লোকালয়ের বহুদূরে হিমালয়ের এক গোপন নির্জ্জন গুহায় সে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বাহিরের দ্বন্দ্ব-কোলাহল হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া একমাত্র নলিনীর সুখময় স্মৃতিপূজায় সে নিজের জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। মৃত্যুর কঠিন আঘাত তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিলেও ক্রমে মৃত্যুর ভিতর দিয়াই সে অমৃতের আস্বাদলাভ করিল। তাহার মন্ এ কথা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিল না যে তাহার অতি আদরিণী চিরহাস্যময়ী নলিনী একটি ক্ষুদ্র পার্থিব নিশ্বাসের সঙ্গেই অনন্তে বিলীন হইয়াছে।

"সে বালিকা, সে নলিনী, সে স্বর্গ প্রতিমা
কালের তরঙ্গে শুধু বিম্বটির মত!
তরঙ্গের অভিঘাতে জন্মিল মিশিল?
না না, তাহা নয় কভু, তা যেন না হয়।
দেহ-কারাগার মুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে
আমারই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।"

প্রকৃতির প্রাণময় বিচিত্র প্রকাশধারার মধ্যে সে নিজের ক্ষুদ্র দুঃখ ভুলিয়া গেল।

"জগতের প্রকৃতির ফুল্ল মুখ হেরি,
আপনার ক্ষুদ্র দুঃখ রহে কি গো আর?

বিষাদ তাহাকে অবসন্ন করিতে পারিল না।

"বিষাদ যুঝিয়াছিল প্রাণপণে বটে,
কিন্তু এ হৃদয়ে মোর কি যে আছে বল,
এ দারুণ সমরে সে হইয়াছে জয়ী।"

প্রকৃতির সঙ্গে তাহার বাল্যকালের নিবিড় যোগ পুনরায় সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল। প্রকৃতির সুপ্রসন্ন মঙ্গলময় উজ্জ্বল
সে দেখিতে পাইল।

যৌবনের সীমানা ছাড়াইয়া কবি ক্রমে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইল। অযত্নলুণ্ঠিত শুভ্র জটাভার শোভিত কবির মুখমণ্ডলে এমন এক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব ছিল যাহা দেখিলে মন বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যাইত। তাহার নেত্র হইতে এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইত—মনে হইত যেন তাহা শান্তিধারায় সমস্ত বিশ্বকে স্নাত করিতেছে। তাহার দৃষ্টিও প্রসারতা লাভ করিল—দিগন্তও যেন তাহার সম্মুখে নিজের অভেদ্য অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া লইত।

মানবজীবনের নানা প্রশ্ন তাহার মনে উদয় হইত। হিমালয়ের ধ্যানময় প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার বিশেষ করিয়া মনে পড়িত মনুষ্যজগতের দারুণ অশান্তির কথা।

"রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানবমনে বিষ মিশাইয়া!"

সর্ব্বত্রই মানবধর্ম্ম দলিত হইতেছে। যে সব স্বাধীন জাতি তাহারা পরাধীন জাতিসকলকে নির্ম্মমরূপে নিপীড়িত করিতেছে—তাহাদিগকে অধীনতা-পাশ হইতে উদ্ধারে সাহায্য করা ত দূরের কথা। আর বারবার অত্যাচারে পরাধীন জাতিদের মন অবশেষে এতদূর নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে যে তাহারা অধীনতা-শৃঙ্খলকেই অলঙ্কাররূপে বরণ করিয়া লইয়াছে।

"স্বাধীন, সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু!"

সবল দুর্ব্বলকে আরও অধিকতর শোষণ করিতেছে। নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য কত দেশ ছারখার করিতেছে।

"সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য,
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার।"

কোথায়ও সহানুভূতি নাই। কোথায়ও যথার্থ ভালবাসা নাই। আছে কেবল প্রেমের নামে ইতর ইন্দ্রিয়সেবা। যেথানে মানুষে মানুষে যোগ নাই, হৃদয়ে হৃদয়ে মিল নাই, সেথানে যাহারা মন দিয়া ভালবাসে তাহারাই বিশেষরূপে নিগৃহীত।

"মানুষে মানুষে যেথা আকাশ পাতাল,
হৃদয়ে হৃদয়ে যেথা আত্ম-অভিমান,
সে ধরায় মন দিয়া ভালবাসে যারে
উপেক্ষা বিদ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদে
তারাই অধিক সহে বিষাদ যন্ত্রণা।"

নানাবিধ কৃত্রিম ভেদের দ্বারা মানুষ খণ্ডিত। ধনী দরিদ্রের প্রতি নির্ম্মম, রাজা প্রজার দুঃখে উদাসীন।

সমগ্র মনুষ্যজাতিই যেন দাসত্বের পূজারী।

"সহস্র পীড়ন সহি আনত মাথায়
একেবারে দাসত্বে রত অযুত মানব।"

এইরূপে মনুষ্যজগতে চারিদিকেই অশান্তি, অত্যাচার, অবিশ্বাস, সন্দেহ। এই সব দেখিয়া বৃদ্ধ কবির মন বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিত। মানবজাতির জন্য সুগভীর করুণায় তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত।

সে ধ্যান করিত, কবে এই পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি আসিবে, কবে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্য সংস্থাপিত হইবে, কবে কৃত্রিম ভেদাভেদ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কবে স্বার্থোদ্ধত অন্যায় অপসৃত হইবে, হিংসা দ্বেষ চলিয়া যাইবে।

"কবে দেব এ রজনী হবে অবসান?
স্নান করি প্রভাতের শিশির সলিলে,
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী।
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি!
নাইক দরিদ্র ধনী, অধিপতি, প্রজা,
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্য্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস!
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার!"

কিন্তু বর্ত্তমান জগতে এই সব নানা দুঃখ, অশান্তি থাকা সত্ত্বেও সে নৈরাশ্যের কোন কারণ দেখিল না। সুদূর

অতীতের ভিতর দিয়া সে জগতের মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ পরিণতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাইল।

"সেদিন আসিবে গিরি, এখনই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব হৃদয়।
প্রকৃতির সব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে,
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো,
কিন্তু এক দিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।
আবার বসি গো আমি হে প্রকৃতি দেবি,
যে আশা দিয়েছ হৃদে ফলিবেক তাহা,
এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
এ যে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সঙ্গীত দেবি শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষ চিতে ত্যজিতে জীবন!"

এইভাবে জগতের মঙ্গল কামনায় তাহার দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

এই বৃদ্ধ কবির প্রাচীন নেত্রে পৃথিবীর শোভা এখনও কিছু মাত্র ম্লান হয় নাই, এখনও সে হিমাদ্রির শিখরে শিখরে একেলা আপন মনে ভ্রমণ করিত। তাহার বিশাল শুভ্র জটামণ্ডিত, শ্মশ্রু শোভিত সৌম্য মুখ, তাহার প্রশান্ত ললাটদেশ, তাহার জ্যোতিপূর্ণ নয়ন, সমস্তই তাহাকে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যদান করিয়াছিল—দেখিলে মনে হইত যেন সে সাক্ষাৎ হিমালয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা।

"কবির প্রাচীন নেত্রে পৃথিবীর শোভা
এখনও কিছুমাত্র হয়নি পুরাণো!
এখনো সে হিমাদ্রির শিখরে শিখরে
একেলা আপন মনে করিত ভ্রমণ।
বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি গম্ভীর মুরতি,
প্রশস্ত ললাটদেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃ-দেব!"

কবির মনে আর কোন গ্লানি নাই। যতই সে মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী হইতেছিল, ততই যেন সে এক আনন্দময় সুখময় ভাব অনুভব করিত। মরণের পরপার হইতে সে যেন স্বর্গের কিরণ দেখিতে পাইয়াছে—যেন কোন দূর স্বর্গ হইতে নলিনীর সুমধুর আহ্বান সে শুনিতে পাইয়াছে।

কবির জীবন ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। একদিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে কবির অন্তিম শ্বাস অনন্তে বিলীন হইয়া গেল।

"হিমাদ্রি হইল তার সমাধি মন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলেনি নিশ্বাস!
প্রত্যহ প্রভাত শুধ শিশিরাশ্রু জলে
হরিত পল্লব তার করিত প্লাবিত।
শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস,
হু হু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিশ্বাস!
সমাধি উপরে তার তরুলতাকুল
প্রতিদিন বরষিত কত শত ফুল।
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান,
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান।"

কবির জীবনকাহিনীর এইখানেই পরিসমাপ্তি।

৩

এই কবিকাহিনী কাব্য বিশদভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কতকটা এই জন্যই একটু সুদীর্ঘভাবেই গল্পটির মর্ম্মাংশ দেওয়া গেল। এবং যাহাতে রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনারীতির সহিত সাধারণের কিছু পরিচয় হয় সেই উদ্দেশ্যে ইহা হইতে বহুলভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই কাব্য কবির ভাবী প্রতিভার সূচনা করিতেছে। এই বাল্য রচনা পাঠে দেখা যায় তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মের মূল কত গভীর, কত আত্মগত। তাহাতে বুঝা যায় যে নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া জীবনে তিনি যে সব সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার লেখায় যাহা বারেবারে বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আকস্মিক নহে, তাহা সূক্ষ্মানুভূতির দুর্লভ মুহূর্ত্তের মধ্যেই অবসান হয় নি, তাঁহার সমগ্র সচেতন জীবনের সঙ্গে তাহা অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত।

ইহার নায়ক 'কবির' চরিত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া লেখক রবীন্দ্রনাথ যে 'নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্ত্তিটাকেই বড়

করিয়া' দেখিয়াছেন, তাহা নহে—বরং যে সব প্রকাশ ব্যাকুল ভাবনা মনের মধ্যে অহরহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, ইহা তাহাকেই রূপ দেওয়ার চেষ্টা। খুবই স্বাভাবিক যে এইরূপ বালকোচিত মনোভাবের সহযোগে অথবা সুসংযত রসসৃষ্টির অভাবে কিছু অতিরঞ্জিত, কিন্তু বড় আশ্চর্য্য লাগে যখন দেখি যে ইহা অন্তরতম সত্যানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ফাঁকা কবিয়ানার অলীক কল্পনা-প্রসূত নহে।

কবিকাহিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের যে পরিচয় পাই, তাহার সহিত তিনি পরবর্ত্তী জীবনে নানা প্রয়াসের মধ্য দিয়া যাহা একান্তরূপে অনুভব করিয়াছেন তাহা অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই বিষয়ের সংক্ষেপে কিছু আলোচনা দরকার।

১। রবীন্দ্রনাথ আশার কবি। নৈরাশ্যের অন্ধ গহ্বরে নিজেকে হারাণো তাঁহার ধর্ম্ম নয়। দুঃখ কখনই তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে নাই।

"ভেবেছিনু একবার এই যে বিষাদ
নিদারুণ তীব্র স্রোতে বহিছে হৃদয়ে,
এ বুঝি হৃদয় মোর ভাঙ্গিবে চূরিবে,
পারেনি ভাঙ্গিতে কিন্তু একতিল তাহা,
যেমন আছিল মন তেমনি রয়েছে।"

(কবি-কাহিনী, পৃঃ ৪১)

"দুখসম্পদ্" কবিতাটিতে এই একই ভাব দেখিতে পাই।

"দুঃখ তব যন্ত্রণায় যে-দুর্দ্দিনে চিত্ত উঠি ভরি,'
দেহে মনে চতুর্দ্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেইক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হ'তে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে"—(পূরবী)

ব্যক্তিগত জীবনই হউক অথবা সমগ্র মানবজীবনই হউক, তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সংশয়, কোন দ্বিধা নাই।

"ব্যক্ত হোক্ জীবনের জয়
ব্যক্ত হোক্ তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়!"

(পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী)

যাও চলি রণক্ষেত্রে, লও শঙ্খ তুলি',
পশ্চাতে উঠুক তব রথচক্রধূলি,
নির্দ্দয় সংগ্রাম অন্তে মৃত্যু যদি আসি'
দেয় ভালে অমৃতের টীকা
জানি যেন সে তিলকে উঠিল প্রকাশি'
আমারো জীবন-জয়-লিখা।"

(মুক্তরূপ, মহুয়া)

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?" (৩৭ বলাকা)

কবিকাহিনীতেও—"সে দিন আসিবে গিরি এখনই যেন" প্রভৃতি পদের ভিতর দিয়া মানবজীবনের কল্যাণময় পরিণাম পরিষ্কাররূপে সূচিত হইয়াছে।

২। মৃত্যুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁহার কাব্যে বারে বারে প্রকাশ পাইয়াছে। মরণ শূন্যগর্ভ নহে। মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতের উৎস আছে, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই প্রেমকে অখণ্ডরূপে উপলব্ধি করা যায়, 'বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড় বন্ধনে'ই 'মিলন সম্পূর্ণ' হয়। জীবনের যত কিছু স্নেহ ভালবাসা জীবনের অবসানের সঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। ব্যক্তিত্বের সীমার মধ্যে যাহা আবদ্ধ ছিল, বিশ্বের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, মানবজীবনের মধ্যে তাহা সঞ্চারিত হইয়া যায়।

"—মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে চাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ গন্ধ হয়ে গেছে, গন্ধ বাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার
গৃহের বণিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়,—"

(মানস-সুন্দরী, সোনার তরী)

"আজি বিশ্বদেবতার চরণ আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।" (৬ স্মরণ)

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েচ যে ঠাঁই;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েচে তার অন্তরের মিল।" (৬ বলাকা)

কবিকাহিনী পাঠে বুঝা যায় বাল্যকাল হইতেই এই অনুভূতি তাঁহার হৃদয়ের কত গভীর স্তরে বিরাজিত ছিল।

দেহাবসানেই মানুষের সব শেষ হয় না কেন?—এই প্রশ্নের সুন্দর উত্তর পাওয়া যায় "কঙ্কাল" নামক একটি কবিতায়।

"আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবন মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুর-পুরে।
চিরকাল তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে?

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান। (পূরবী)

৩। প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের মনে বরাবরই গভীর আনন্দ দিয়াছে। তিনি বাল্যকাল হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে বহির্জগতের বিচিত্র রূপ ধারা পরস্পরের মধ্যে এক প্রেমময় সখ্যসূত্রে আবদ্ধ। এই মিলন-গ্রন্থি যদি কোথাও একটুও আলগা হইয়া যায়, তাহা হইলে এক ভীষণ সংঘর্ষে সমস্ত সৃষ্টিই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। শিশুর মতন এই অসংখ্য জগতকে আদিজননী প্রকৃতিদেবী সুগভীর মাতৃস্নেহে লালনপালন করিতেছেন। তাঁহার শাসনেই সমস্ত জগৎ নিয়মাবদ্ধ হইয়া চলিতেছে।

"শত শত গ্রহ তারা তোমারি কটাক্ষে
কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিঃশ্বাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্ব চরাচরে।
কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননি,
শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন!
সমস্ত জগৎ যবে আছিল বালক,
দুরন্ত শিশুর মত অনন্ত আকাশে
করিত গো ছুটাছুটি না মানি শাসন,
স্তনদানে পুষ্ট করি তুমি তাহাদের
অলঙ্ঘ্য সখ্যের ডোরে দিলে গো বাঁধিয়া।
এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এ জগতে,
কক্ষছিন্ন কোটি কোটি সূর্য্য চন্দ্র তারা
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া,
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে পড়ে হেথায় হোথায়;
এ মহান জগতের ভগ্ন অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হয়ে রহে অনন্ত আকাশে!"

(কবিকাহিনী, পৃঃ ৭-৮)

প্রকৃতি-বন্দনা-গানে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যই মুখরিত। অতি বাল্যকাল হইতেই প্রকৃতির গোপনতম কক্ষেও তাঁহার প্রবেশাধিকার ছিল। নদীর কলতান, বিহঙ্গের গান, "বসন্তের সুরভিত বাতাসের" অধীরতা, প্রকৃতির নানা রূপসম্ভার—সমস্তই তাঁহার চিত্তে বিপুল হর্ষ জাগাইয়া তুলিয়াছে।

"নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে,
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপি চুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।
নদীর মনের কথা বালক যেমন
বুঝিত, এমন আর কেহ বুঝিত না।
বিহঙ্গ তাহার কাছে গাইত যেমন,
এমন কাহারো কাছে গাইত না আর।
তার কাছে সমীরণ যেমন বহিত
এমন কাহারো কাছে বহিত না আর।"

(কবিকাহিনী, পৃঃ ৩)

বিশেষ করিয়া কবির হৃদয়কে আকুল করিয়াছে অন্ধকারময়ী নিশীথিনীর বিরাট নিস্তব্ধতার অসীম রহস্য।

"মোরে কর সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্ব্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা।

(রাত্রি, কল্পনা)

রাত্রির অনুপম রহস্য বালক-কবির মনকেও মুগ্ধ করিয়াছিল।

'কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-মন্ত্র
পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে
সকলি দেখায় যেন রহস্যে পূরিত ;
সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন,
ওই স্তব্ধ নদীজলে চন্দ্রের আলোকে
পিছলিয়া চলিতেছে যেমন তরণী,
তেমনি মৃণাল ওই আকাশ-সলিলে
ভাসিয়া চলেছে যেন সমস্ত জগৎ
সমস্ত ধরারে যেন দেখিয়া নিদ্রিত,
একাকী গম্ভীর-কবি নিশাদেবী ধীরে
তারকার ফুলমালা জড়ায়ে মাথায়,
জগতের গ্রন্থে কত লিখিছে কবিতা।"

(কবি কাহিনী, পৃঃ ৪—৫)

"অমানিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি, দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্ব্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর পরে
নীরবে রয়েছে চাহি পলকবিহীন,
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ আঁখি যথা
সুপ্ত বালকের পরে রহে বিকশিত।"

(কবি কাহিনী, পৃঃ ৯—১০)

"অসীমসুন্দর" পূর্ণিমা-যামিনীর উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্যরাশি তাঁহার চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে।

"যেমনি নিখিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্তদ্বারে, বাতায়নে চতুর্দ্দিক হ'তে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি'
ত্রিভুবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধা হাসি।
হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তরশায়িনী।—"

(পূর্ণিমা, চিত্রা)

বালক-কবিও আনন্দে গাহিয়াছেন।—

"কি হাসি হাসিতে জানে পূর্ণিমা-শর্ব্বরী,
সে হাসি দেখিয়া হাসে গম্ভীর পর্ব্বত,
সে হাসি দেখিয়া হেসে উথলে জলধি,
সে হাসি দেখিয়া হাসে দরিদ্র কুটীর।"

(কবি কাহিনী, পৃঃ ১০)

সূর্য্যের উদয়াস্তকালও বালক-কবির চিত্তে অসীম বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিল।

"কি সুন্দর রূপ তুমি দিয়াছ ঊষার
হাসি হাসি নিদ্রোত্থিতা বালিকার মত
আধ ঘুমে মুকুলিত হাসি মাখা আঁখি।"

(কবি কাহিনী, পৃঃ ১০)

"গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে ঊষাকাশ,
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি।"

(কবি কাহিনী, পৃঃ ১৩)

এইরূপ প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যধারা তাঁহাকে বরাবরই গভীর আনন্দ দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির শান্ত সংহত রূপই যে কেবল রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা নহে, প্রকৃতির রুদ্র-মূর্ত্তিও তাঁহার চিত্তকে কম আকৃষ্ট করে নাই। রুদ্রের বন্দনা তাঁহার কাব্য-বীণায় অসাধারণ নৈপুণ্যসহকারে বহুবার ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

"তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,—
তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ু গর্জ্জে আসে,—
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
বিদ্ধ করি' হানে,
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।"

(বর্ষশেষ, কল্পনা)

"মহাদেবের তপের জটা হ'তে
মুক্তিমন্দাকিনী এসো কূল-ডোবানো স্রোতে :
ব'লে আমার চিত্ত ঘিরে ঘিরে
ভস্ম আবার ফিরে পাবে জীবন-অগ্নিরে।

ব'ল্লে আমি সুরলোকের অশ্রুজলের দান,
মরুর পাথর গলিয়ে ফেলে ফলাই অমর প্রাণ।
মৃত্যু জয়ের ডমরু-রব শোনাই কলস্বরে,
মহাকালের তাণ্ডব-তাল সদাই বাজাই উদ্দাম নির্ঝরে।"

(ঝড়, পূরবী)

ঝড়ের রুদ্রলীলা বালক-কবিকেও মুগ্ধ করিয়াছিল।

"যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্ব্বত চূড়া করেছে কম্পিত,
সুগম্ভীর অম্বুনিধি উন্মাদের মত
করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে,
তখন একাকী আমি পর্ব্বতশিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব.
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
সুবিকট অট্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া,
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হোতে
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকা দেশে,
তুষার-সঙ্ঘাত-রাশি পড়েছে খসিয়া
শৃঙ্গ হোতে শৃঙ্গান্তরে উলটি পালটি।"

(কবি কাহিনী পৃঃ ৯)

৪। কিন্তু এই বিচিত্রময়ী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী প্রকৃতির রহস্যসুধা পান করিয়াও রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। জগৎকে ভাল বাসিয়াছেন বলিয়াই মানুষের সঙ্গ লাভের জন্য তাঁহার এত প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই মানবপ্রীতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে দেখা দিয়াছিল। কবি কাহিনীতেও এই ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার বহু রচনার মধ্যেই এই ভাব নিহিত আছে।

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।"

(প্রাণ, কড়ি ও কোমল)

"আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে;
প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেচে ভেসে;
অবশেষে
এক হ'য়ে গেচে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।"

(১৯ বলাকা)

তাঁহার একটি আধুনিক কবিতায় এই কথাই খুব সুন্দররূপে বলা আছে।—

"চেতনা-সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ-গর্জ্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্য সনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলরোল রোলে
উঠিতেছে রাশি রাশি, ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দ বেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সঙ্গীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি।
এই গীতি-পথ প্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে—একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম্ম বাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম॥

(কবি-পরিচিতি, ১৩৩৮)

৫। রবীন্দ্রনাথের এই মানবপ্রীতি স্বদেশ কিংবা স্বজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, তিনি সকল দেশের সকল মানুষকেই সমান ভাল বাসিয়াছেন, সমগ্র মানবের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্যের রূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশ্বমানবতা। স্বদেশের মধ্যেও তিনি বিশ্বদেবকে দেখিতে পাইয়াছেন—এই জন্যই স্বদেশ তাঁহার কাছে এত প্রিয়। তাঁহার এই স্বতস্ফূর্ত্ত গভীর বিশ্বপ্রেমের পরিচয় কবিকাহিনীতেও পাওয়া যায়। ইহাকে কেবল বালকোচিত ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। "তরুণ কবির পক্ষে ইহা খুব উপাদেয়" হইতে পারে এবং "বলাও খুব সহজ" হইতে পারে, কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বপ্রীতি একটি বিচ্ছিন্ন ভাবনা নহে,

অথবা তরুণের নিস্ফল স্বপ্ন মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় নি। এই ভাবধারা তাঁহার জীবনে বরাবরই প্রবহমান। বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনা তাঁহার মধ্যে যে সজীব রূপ পাইয়াছে তাহা আধুনিক কালের একটি প্রধান সম্পদ্। তাঁহার বহু রচনার মধ্যেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

"সেদিন আসিবে গিরি, এখনই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব হৃদয়।"

(কবি কাহিনী, পৃঃ ৩০)

"নিজের সে বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।"

(স্নেহগ্রাস, চৈতালি)

"সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি।"

(বঙ্গমাতা, চৈতালী)

"হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব হৃদয়ে মিশিতে।
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন অমৃত
কে দিবে গো এত তৃষিতে।

(বিশ্বনৃত্য, সোনার তরী)

"—স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।"

(এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা)

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর।"

(বিদায়, কল্পনা)

"হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর!
তপোবন-তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে এই বিশ্ব চরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য! সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি!——" (৫৭, নৈবেদ্য)

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে!
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।'

(১০৬ গীতাঞ্জলি)

'হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কি বেশে!
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে!"

(১৬ উৎসর্গ)

"যে নিশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে
তারে আমি ধরেছি বাঁশীতে।
যাঁহারা মানুষরূপে দেববাণী অনির্ব্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।'

(বর্ষ-শেষ, পরিশেষ)

৬। রবীন্দ্রনাথ সকল মানুষকেই ভাল বাসিয়াছেন বলিয়া স্বদেশকে যে কম ভাল বাসিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার দেশপ্রীতি একেবারে অকৃত্রিম, গভীর বেদনা-প্রসূত; কিন্তু তাহা স্বদেশের সঙ্কীর্ণতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে বা রাজনৈতিকের শূন্য আস্ফালন মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় নি। পরাধীনতার দুঃখ তাঁহাকে মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত করিয়াছে কেননা তিনি দেখিয়াছেন যে পরাধীনতা মানবাত্মার সহজ উজ্জ্বল প্রকাশকে পদে পদে ক্ষুণ্ণ করে। তাঁহার এই দুঃখ বোধ কেবল স্বদেশবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে;

যেখানেই মানুষ লাঞ্ছিত, অবমানিত, অধীনতার শৃঙ্খলে জর্জ্জরিত সেখানেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে। তাঁহার দেশাত্মবোধ বিশ্বমানবত্ব বোধের বিরোধী নহে। ইহাই তাঁহার স্বাদেশিকতাকে মহত্তর করিয়া এক বিরাট সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। স্বদেশ বিষয়ক বহু কবিতায় তাঁহার এই আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে।

"কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
অবশেষে মন এত হয়েছে নিস্তেজ,
কলঙ্ক-শৃঙ্খল তার অলঙ্কাররূপে
আলিঙ্গন করে তারে রেখেছে গলায়!
দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার কোরে
মাথায় বহন করে পর-প্রত্যাশীরা!
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন!
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।"

(কবিকাহিনী, পৃঃ ৪৭)

"এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা! ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্ম্মধামে!" (৬১ নৈবেদ্য)

আজি এ ভারত লজ্জিত হে।
হীনতা-পঙ্কে মজ্জিত হে॥
নাহি পৌরষ নাহি বিচারণা,
কঠিন তপস্যা, সত্য-সাধনা:
অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে
সকলি ব্রহ্মবিবর্জ্জিত হে॥ (গীত-বিতান, পৃঃ ২১০)

"যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কা-হরণ
দাও সে মন্ত্র তব॥"

(গান, ২য় সং পৃঃ ২২৩)

"ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল, ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই॥"

গান, ২য় সং পৃঃ ২১৩

৭। নিছক স্বাদেশিকতা যেমন রবীন্দ্রনাথের সত্য দৃষ্টিকে আবিল করিতে পারে নাই, তেমনি একেবারে আধুনিক হইয়াও বর্ত্তমান সভ্যতা যেখানে মানব ধর্ম্মকে হনন করিতেছে, তাহাকে তিনি একটুও ক্ষমা করেন নাই। প্রচণ্ড শক্তি মানুষের আয়ত্তে আসায় তাহার লোভও বিপুলাকার ধারণ করিয়াছে। এই আসুরিক সর্ব্বগ্রাসী লালসা মানব সভ্যতাকে একেবারে জীর্ণ করিয়া দিয়াছে। তাহারই সংঘাতে মনুষ্যসমাজ আজ শত খণ্ডিত, 'বহু অহেতুক শ্রেণীবিভাগ দ্বারা পীড়িত। ধনী নির্ধন, দাস প্রভু, রাজা প্রজা, স্বাধীন পরাধীন প্রভৃতি নানা গ্লানিকর, স্বার্থ সম্ভূত, অস্বাভাবিক ভেদসৃষ্টি তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছে। ধর্ম্মের নামেও নানারূপ কঠিন হিংসা, অমানুষিক অত্যাচার, সামাজিক নির্য্যাতন, মর্ম্মান্তিকরূপে তাঁহার প্রাণে আঘাত দিয়াছে। এই সব অসামঞ্জস্যের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদের মূল নিহিত আছে। তিনি সকল মানুষকেই এক অখণ্ড মৈত্রীর মধ্যে, বৃহত্তর জীবনের মধ্যে মিলিত দেখিতে চাহিয়াছেন।

এই সত্য তিনি অতি অল্প বয়সেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই কবিকাহিনীতেও দেখিতে পাই—

"অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি।
নাইক দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজা,
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্য্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস!
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার!

সকলেই আপনার আপনার লোয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে।
কেহ কারো সুখে নাহি দেয় গো কণ্টক,
কেহ কারো দুঃখে নাহি করে উপহাস!
দ্বেষ নিন্দা ক্রূরতার জঘন্য আসন
ধর্ম্ম-আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত!"

(কবিকাহিনী, পৃঃ ৪৯—৫০)

"—পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব . –
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,—
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন।"

(সভ্যতার প্রতি, চৈতালি)

"এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের।" (৬৬ নৈবেদ্য)

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান॥"

(১০৮ গীতাঞ্জলি)

"যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া,
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া,—
যে আনিবে প্রেম অমৃত উৎস হতে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে,
তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে॥
হে ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মবিকার নাশি
ধর্ম্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পুজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো, ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,
ধর্ম্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো॥"

(ধর্ম্মমোহ, পরিশেষ)

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার যে কয়েকটি মূল সূত্রের পরিচয় কবিকাহিনীর মধ্যে পাই এই প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য ছোট-খাটো আরও অনেক বিষয়ের মিল দেখা যায়। যেমন, কবি কাহিনীর সঙ্গে তাঁহার পরবর্ত্তী রচনা "মায়ার খেলা"র ভাবগত সাদৃশ্য। উভয় গ্রন্থেই নায়কের চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে মানুষের স্বভাবই এই যে সে সহজে হাতের কাছে যাহাকে পায় তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না, তাহাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারে না যতক্ষণ দূরের মধ্যে, বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড়তার মধ্যে সে তাহাকে পুনরাবিষ্কার না করে, তাহার যথার্থরূপ গভীরভাবে পূর্ণতর রূপে উপলব্ধি না করে।

"কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!"

(২য় দৃশ্য, মায়ার খেলা)

তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে এই প্রয়াস একেবারেই অর্থ-হীন, মরীচিকার মতই নিস্ফল। কেন না প্রেম জিনিষটা অন্তরের, বাহিরের নহে।

"মনের মত কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে!
সে ত রয়েছে মনে!
ওগো মনের মত সেই ত হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও!"

(২য় দৃশ্য, মায়ার খেলা)

কবি কাহিনীর একটু সুদীর্ঘ সমালোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রথম জীবনেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে সত্যের প্রখর অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল দীর্ঘকালব্যাপী অগণিত কর্ম্মের মধ্যেও তাহা মলিন হয় নাই। নিন্দা প্রশংসার দ্বন্দ্বে, সুখ দুঃখের উদ্বেলনে, নানারূপ ব্যর্থতায়, জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও তিনি সত্যের জ্যোতি অম্লান রাখিয়াছেন। যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, বিশেষ মানবের কাছে

অথবা বিশেষ কালের কাছে অপ্রীতিকর হইলেও তিনি তাহা অকুণ্ঠিত ভাষায় ঘোষণা করিতে কখনও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহাই তাঁহাকে এক বৃহত্তর জীবনের মহান্ গৌরবের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে এবং এই জন্যেই তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাস আমাদের কাছে এত মূল্যবান্।

এই সত্যশিবসুন্দরের উপাসক বিশ্বকবির আপনার অমর বাণীর মধ্যেই আমার প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করি।

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তা'রে নমো নমঃ।
তমিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধ্বংস করি তমঃ,
সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তা'রি উঠিছে গুঞ্জরি'
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চারি'
জীবন হিল্লোল॥ (সাবিত্রী, পূরবী)

পৃথ্বীসিংহ নাহার

প্রবাসীর দুঃখ

শ্রীশান্তি পাল

চ'লে গেছ তুমি সুদূর প্রবাসে
স্মৃতিখানি পিছে ফেলিয়া,
শূন্য দেউলে বসে থাকি শুধু
সজল নয়ন মেলিয়া!
দিকে দিকে চাহি কত কাল র'ব,
এ বিরহ ভার কত বল স'ব!
বিফল জীবন যাপিব কি শুধু
মরীচিকা সাথে খেলিয়া!

দিনের আলোক ম্লান হ'য়ে আসে
সুদূরের পথে চাহিয়া,
আসে ম্লানতর নিরাশা আঁধার
সে সুদূর পথ বাহিয়া!
নিশার তিমির দিবসে ভুলায়,
পাখী ফিরে চলে নীরবে কুলায়,
উতলা সমীর বহে বনানীর
আর্ত্ত বেদন গাহিয়া!

আকাশে আকাশে তারকার ছলে
তোমারি লিপি কি জ্বলিল?
যে-কথা তোমারে শুধাইতে চাই
সে-কথা কি তারা বলিল!
সমীরণ মাঝে শুনি কি তোমার
গুঞ্জন-গীতি বিরহ ব্যথার,
অভিমান তব দূর তটিনীর
কল্লোলে কলকলিল!

দানের মর্য্যাদা

শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

তিনটি প্রাণীর স্বচ্ছল সংসার।

বুড়ো মা, ছেলে উৎপল ও বধূ ছায়া।

শাশুড়ি বধূ, স্বামী স্ত্রীর ছোট গণ্ডিটুকুর ভিতর অভিনব স্নেহ বন্ধনের মাধুর্য্যটুকু তাহারা ভালো করিয়াই উপভোগ করিল কয়েক বৎসর ধরিয়া।

তারপর সেই একঘেয়েমি। একটু নূতনত্বের কামনায় তিনটি প্রাণী যেন উন্মুখ হইয়া থাকে। গোপনে তিনজনেই কোন নবাগতের প্রতীক্ষায় হাঁফাইয়া উঠিতেছিল।

ঠিক এই সময়টিতেই আসিয়া জুটিল কমলা।

ছায়ার দূর সম্পর্কের মাসীমা শেষ খেয়ায় পা দিয়া জগতের সমস্ত-সম্পর্ক-বিচ্যুতা আট বছরের এই দেওর-ঝি-টিকে ছায়ার হাতে দিয়া নিশ্চিন্তে চোখ বুজিলেন।

ফুটফুটে অনাথা মেয়েটিকে তিনজনেই পরম আগ্রহে বুকে তুলিয়া লইল।

চলার পথে একটু খোঁচা সবারই বাধে।

শাশুড়ি ভাবেন সুদীর্ঘ একুশ বছর বয়সেও বধূ যখন কুলদেবতার পূজায় কোন অর্ঘোপচার দিতে পারিল না তখন আর কোন আশাই নাই। শ্বশুরকুলের উচ্ছেদ-দুর্ভাবনায় তিনি মর্ম্মান্তিক অশান্তি ভোগ করেন।

উৎপল আর পাঁচজনার মতো পুত্রসন্তান কামনা করে তাহাকে মনের মতো করিয়া মানুষ করিবার বিলাসে।

আর ছায়া ঐ দুইটি প্রাণীর অভিলাষ সফল করিবার অক্ষমতাটুকু বিধাতার অবিচারের উপর চাপাইয়া দুঃখ করে; অভিমান করে। তাহার স্নেহকাঙাল মাতৃহৃদয় কমলাকে বুকে চাপিয়া শান্ত হয়না। চেতনার প্রথম প্রভাত হইতে সন্তানকে মানুষ করিবার যে দুঃখ মাখান আত্মপ্রসাদ সেটুকু ত সে পায় নাই। তাই তার চোখে ওইটুকুই জননীর গর্ব্বের বস্তু বলিয়া ধরা পড়ে। মা ত সে হয় নাই।

কমলাকে সে একান্ত আপনার করিয়াই লইয়াছে। তবু যখনই মনে পড়ে কয়টাদিন বাদে কমলা যখন পরের ঘরে চলিয়া যাইবে তখন তাহার নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে কোন অবলম্বনই থাকিবে না তখনই সে বেশী করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

কিন্তু এসব তাহাদের মনের গোপন কথা।

সকালে উঠিয়া উৎপল বলে—কমলা বই নিয়ে পোড়্‌তে বোস্—

ছায়া বলে—আগে আমার তরকারী কুটে দিয়ে যা—

আর তার শাশুড়ি বলে—ঠাকুর ঘর পরিষ্কার কোরে আমার পুজোর উয্যুগ্‌টা কোরে দে দিদি—

বিকালে আফিস থেকে ফিরিয়া উৎপল হাঁকে—কমলমণি চট্ কোরে একখানা কাপড় কুঁচিয়ে দিতে হবে—

ছায়া তাড়া দেয়—হালুয়ার কড়াটা নাবিয়ে লুচিগুলো বেলে দে' কম্‌লি—

বুড়ি আঁচল ধরিয়া টানে—ক'দিন ফাঁকি দিচ্ছিস, আজ পাকা চুলগুলো তুলে দে ভাই।

কমলা ত্রিশূলের মাঝে পড়িয়া কাজ যত করে, তার পাঁচ গুণ হাসে খিল্ খিল করিয়া।

তিনজনের মিলিত স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া কমলা যেন এক বৎসরের পথ এক শ্বাসে অতিক্রম করিয়া চলে।

মা বলেন—কমলার বর ছাখ্ উৎপল—

উৎপল চোখ কপালে তুলিয়া বলে—এর মধ্যে?

মা বলেন—হ্যাঁ, চোদ্দ পেরুলো।

উৎপল বলে—আচ্ছা দেখবো।

তারপর আড়চোখে কমলার দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলে—কেমন বর তোমার জন্যে দেখ্‌বো বলত কমলা?

কমলা উৎপলের কথা শুনিয়া আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। চোখে একটু ভৎর্সনার ভ্রুকুটিও যে খেলে না তা নয়।

সেদিন রাত্রে শুইতে আসিয়া স্বামীর গালটি দুই হাতে জড়াইয়া খুব আদর করিয়া ছায়া বলিল—আমার একটা কথা রাখ্‌বে?

উৎপল ঠাট্টা করিয়া বলিল—কিন্তু ভূমিকাতেই ভয় পাচ্ছি যে!

ছায়া বলিল—না গো না ভয়ের কিছু নয়। বল রাখ্‌বে?

উৎপল বলিল—তোমার অভয়েতেই তো ভয় বেড়ে যাচ্ছে—আচ্ছা বল, শুনি।

ছায়া উৎপলের বুকে মুখখানা চাপিয়া কহিল,—তুমি কম্‌লিকে বিয়ে ক'রো।

উৎপল লাফাইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া হাসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—এঁ্যা, তুমি নিজেই বোলছো? আমি যে ক'দিন থেকে তোমায় বোলবো ভাবছিলুম গো। মনের কথা তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছ তো! কি কোরে পার্‌লে বল ত? সত্যি, কমলাকে আমার ভারি পছন্দ হোয়েছে ছায়া—

ছায়া ব্যস্ত হইয়া একখানা হাত উৎপলের মুখে চাপিয়া ধরিয়া বলিল ওগো চুপ করো, তোমার পায়ে পড়ি, মা ও সবে রয়েছেন।

উৎপল মুখ হইতে ছায়ার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, থাকলেনই বা, এতো ভাল কথা। আমি মাকে বলছি—মা—

ছায়া করজোড়ে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, ঘাট হোয়েছে, আর কখনো কিছু বোল্‌বো না। তুমি চুপ করো!

কথাটা এই ভাবে উঠিল, তারপর ক্রমশঃ বাড়ীর সকলেই শুনিল।

ছায়া কিন্তু কথাটাকে সহজে ছাড়িল না।

শাশুড়ীকে বলিল—তোমার কিসের আপত্তি আমি ত বুঝ্‌তে পারছি না মা। একটি খোকার আমাদের নিতান্তই দরকার। আমি ত পারলুম না দিতে, দেখি কমলি যদি পারে। আর মা-বাপ মরা অভাগী মেয়েটাকে কোথায় কার' হাতে দেবো—কে মুখ চাইবে, চাইবে না—তার চেয়ে তোমার কাছেই থাক মা।

মনের মত কথা শুনিয়া শাশুড়ী অন্তরে খুসী হন। মুখে বলেন—সবই ঠিক, কিন্তু তোর মুখ চেয়ে আমি যে রাজী হোতে পারছি না মা। কাজ নেই ওসব হাঙ্গামে, তুমি আমার সংসারের লক্ষ্মী,—যেমন আছ তেমনি থাক।

ছায়া বলে—না মা, সংসারের সব ভার যখন আমার মাথায় তুলে দিয়েছ—এ ভারটাও দাও, আমার মনটাও হালকা হোক।

কাঁদিয়া-কাটিয়া সে উৎপলকেও রাজী করাইয়া তাহার হাতে সত্য সত্যই একদিন কমলাকে তুলিয়া দিল।

কমলাকে বলিল—দুঃখু করিসনি কমলি, শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর একটি খোকা আমাদের এনে দে, আমার স্বামী একেবারেই তোকে দিয়ে দেবো।

দিদির' কোলে মুখ লুকাইয়া কমলা অজানা কারণে কাঁদিয়া আকুল হয়।

মা ঘুমাইয়া পড়িলে উৎপল ছায়াকে টানিয়া নিজের বিছানায় আনিয়া বলিল—এখানেই শুতে হবে তোমায়—

ছায়া হাসিয়া চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—ওমা, সেকি কথা গো! কেন?—

উৎপল বলিল—কেন মানে? এতদিন কোথায় শুতে?

ছায়া বলে এতদিনকার কথা ছেড়ে দাও। যখন যেমন তখন তেমন!

ওদিকে—ঘোমটা ঢাকা কমলা চুপি চুপি খাট হইতে নামিতে যাইতেছিল, উৎপল খপ্‌ করিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—পালাচ্ছ কোথায়? সেটি হচ্ছে না। এ'ত আর সত্যিকার সতীন নয় যে আমায় আলাদা দু'টো মহলের ব্যবস্থা কোরতে হবে। দু' বোনকে মিলেমিশে এক বোনাইকে নিয়েই চালাতে হবে!

ধমক দিয়া ছায়া বলিল, কি ডেঁপোমী হচ্ছে রাত দুপুরে, শুয়ে পড়—

গম্ভীর ভাবে উৎপল বলে—না ছায়া, ডেঁপোমী নয়, এর একটা মীমাংসা করা দরকার।

ছায়া বলে—সে আমরা দু'বোনে কোরে নেব, তুমি ভেব না।

উৎপল বলে এখন ভাবছি না। কিন্তু দু'বোনকে এক সঙ্গে না পেলেই আমার ভাবনা বাড়বে।

তাহার পর ছায়া থপ্ করিয়া হঠাৎ এক সময়ে উৎপলের পাশে বসিয়া পড়ে গল্প-গুজব হাস্য-পরিহাস করিয়া ঘরের আবহাওয়াকে তাতাইয়া মাতাইয়া এক সময় সুট্ করিয়া সরিয়া যায়।

কমলা অকৃতজ্ঞ নয়। দেড় বৎসরের ভিতরই সে তাহাদের ছোট্ট সংসারে একটি নবাগতকে আনিয়া দিল।

শাশুড়ী আনন্দে আটখানা হইয়া রাজ্যের ঠাকুর দেবতার পূজার ফর্দ্দ করাইতে বসিলেন, আর একুশ দিনের পর ছায়া শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া কমলাকে বলিল—খোকাকে আমায় দিয়ে দে কমল!

হাসিয়া কমলা বলিল,—ওত আমার একার নয় দিদি,—তোমারও।

ছায়া শিশুকে বুকে ফেলিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ চুমায় ভরিয়া দিয়া বলিল, অতশত বুঝি না বাপু, আমি একে নিলুম একেবারে, স্বামীর ভাগ তোকে ছেড়ে দিলুম।

হাস্যোজ্জ্বল মুখে কমলা বলিল,—আচ্ছা।

উৎপল ডাকে, ওগো খোকার মা—

ছায়া জবাব দেয়, কিগো খোকার বাপ—

উৎপল বলে—ছেলে পেয়ে ছেলের বাপের আদর এতখানি কমিয়ে দিলে?

ছায়া বলে, কমাইনি, হাত বদল করেছি।

—মানে?

—ছেলের আদর আমার হাতে আর ছেলের বাপের আদর কমলের হাতে।

—ভাগাভাগি কবে হ'ল?

—একুশ দিনের পরই!

ছায়ার সেবা-পরায়ণ হাত দুইখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া উৎপল তাহাকে বুকের কাছটিতে আকর্ষণ করিতেই অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ছায়া বলিল, ওইটি মাপ কোরতে হবে।

আশ্চর্য্য হইয়া উৎপল জিজ্ঞাসা করিল,—কেন বলতো?

শান্ত কণ্ঠে ছায়া বলিল—ও অধিকারটুকু নিজের হাতে কমল্‌কে তুলে দিয়েছি। ছোট বোনের কাছে বিশ্বাস হারাবো না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উৎপল বলিল,—কিন্তু আমার অধিকার আমি যদি না ছাড়ি ছায়া?

ছায়া বলিল, আমি জানি, আমার মুখ চেয়ে তুমি ছাড়বে। আমি যে তোমাকে চিনি!

গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উৎপল বলিল,—তাহলে সত্যিই আমায় ত্যাগ কোরলে ছায়া—?

তাড়াতাড়ি উৎপলের মুখে একখানা হাত চাপা দিয়া ছায়া বলিল, ওগো অমন কথা বোলো না। তোমার বাইরেকার ভার কমলার হাতে দিয়ে ভেতরকার সব-ভারটুকুই যে আমি নিজের হাতে রেখেচি!

যা ভালো বোঝ করো—বলিয়া উৎপল পাশ ফিরিয়া শুইল।

উৎপলের কাঁধে হাত রাখিয়া নাড়া দিয়া ছায়া বলিল, রাগ করলে?

উৎপল বলিল,—রাগ তো করিনি ছায়া, যে-জিনিষটা আমি হারালুম তার জন্যে দুঃখুই করছি।

ছায়া বলিল—না, দুঃখু কোরতেও পাবে না। দুঃখু করবার কোন রাস্তাই তো তোমার রাখিনি।—যাই, খোকা কাঁদছে। এবার তোমার খাবার দিতে বলি।

ছায়া চলিয়া যায়। কি ভাবিয়া উৎপলের চোখ দুইটি সজল হইয়া আসে।

দিন তিনেক পরে রাত্রে উৎপলের পাশে শুইয়া শুইয়া হঠাৎ কমলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। উৎপল ব্যস্ত হইয়া কাছে টানিয়া যত তাহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করে কমলার কান্নার বেগ ততই বাড়িয়া চলে। অনেকক্ষণ

ধরিয়া আদর-অভিমান, সাধ্য-সাধনা করিবার পর অনেকটা শান্ত হইয়া কমলা বলিল, দিদি একবারো খোকাকে আমার কাছে দিতে চায় না।

উৎপল খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া লইল, তারপর বলিল—ভালোই তো, তোমায় ছেলে বইতে হয় না! আর তুমি তো আমার বদলে ছায়াকে ছেলে দিয়েছ।

কমলা বলিল—তা বোলে একবারো কোলে কোরতে পাব না এমন লেখাপড়া করিনি তো! একবার কোলে নিয়েছি তো দৌড়ে এসে কোল থেকে কেড়ে নিয়ে বোল্‌বে তুই কাজ কোর্‌গে যা!

উৎপল কমলার অন্তরের গোপন অংশটুকু চকিতে দেখিতে পাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। স্বল্পবাক্, হাস্যোচ্ছ্বলা কমলা ছায়ার বিরুদ্ধে এমন কথাও বলিতে পারে ভাবিয়া সে অবাক হইয়া গেল। তবুও তাহাকে জবাব দিতে হইল—অমন কোরে বোল্‌তে নেই কমল, শুনলে ছায়া একদণ্ডও বাঁচবে না।

তারপর যেন তাহাকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যেই বলিতে লাগিল—জান কমল, পরশু তাকে কাছে পাবার জন্যে ডেকেছিলুম। তোমার মুখ চেয়ে সে আমায় প্রত্যাখ্যান করেছে! সে কি বোল্‌লে জান? বোল্‌লে, ও অধিকারটুকু নিজের হাতে কমলকে তুলে দিয়েছি। ছোট বোনের কাছে বিশ্বাস হারাবো না।

নির্ব্বিকারভাবে কমলা বলিল—জানি।

কিন্তু এই জানিবার অভিজ্ঞতাটুকু কমলা কোথা হইতে সংগ্রহ করিল ভাবিতে গিয়া উৎপল চিন্তিত হইয়া উঠিল। সে শুধু বলিল,—জানো, তবু কাঁদছিলে?

একটুও অপ্রস্তুত না হইয়া কমলা বলিল,—হ্যাঁ, যদি মা হ'তে, তুমিও কাঁদতে!

সেদিন ভোর না হইতেই ছায়া খোকাকে কোলে করিয়া উৎপলের কাছে আসিয়া বলিল—দেখ, কাল রাত থেকে খোকার গা-টা কেমন ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করছে। আর সর্দ্দিও হয়েছে খুব, কেসে কেসে সারা হোয়ে গেল একেবারে! ডাক্তার বাবুকে না হয় একবার ডাকো।

হাসিয়া উৎপল বলিল—একটু সর্দ্দি হোয়েছে, ওম্‌নি ডাক্তার ডাকতে হবে!

ভুরু দুইটি উপরে তুলিয়া গম্ভীর মুখে ছায়া বলিল—না গো, তুমি বোঝ না; দিন কাল বড়ো খারাপ পড়েছে। সাবধানে থাকা ভালো। লক্ষীটি, তুমি যাও একবার।

তারপর দূরে কমলাকে দেখিয়া, তাহাকে ডাকিয়া বলিল—ওরে খোকাকে একবার ধর্ তো। আর এক কাজ কর্, আজ তুই ওকে নিয়ে ঘরেই থাক্। আমি রান্না ঘরে যাচ্ছি। সর্দ্দির ওপর বাইরে ঠাণ্ডা না লাগানোই ভালো।

এখন ঢের কাজ আমার, পারবো না—বলিয়া কমলা চলিয়া যাইতেছিল।

ছায়া ধম্‌কাইয়া উঠিল—এই বাঁদ্‌রী, চোলে যাচ্ছিস যে বড়ো! কথা গেরাহ্যি হচ্চে না—না? দেবো চুলের মুঠি ধোরে মাথা ঠুকে! ধর্—

দিদির কথার একেবারে অবাধ্য হইতে কমলা এখনো শেখে নাই। তাই খোকাকে কোলে লইয়া দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া রাগ জানাইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

হাসিয়া ছায়া স্বামীকে বলিল, পোড়ারমুখী ছেলে নিতে পায় না বোলে আমার ওপর ভয়ানক চোটে আছে। এখন নিক্ দিন কতক।

উৎপল তো সবই জানিত। তবু মুখে বলিল, না—না চোট্‌বে কেন? আর ছেলেও যদি ও নেয়, তুমি থাক্‌বে কি নিয়ে শুনি?

ছায়া বলিল, কেন চোট্‌বে তোমরা পুরুষ মানুষ বুঝতে না-ও পারো। আর কি নিয়ে থাক্‌বো?—

একটু অন্যমনস্ক হইয়া গভীর স্নিগ্ধ আঁখি দুইটি জানালার বাহিরে নীল আকাশের গায়ে তুলিয়া ধরিয়া ছায়া যেন উত্তরের জন্য নিজের অন্তরটা একবার হাতড়াইয়া লইল। তারপর বলিল—কেন, তোমাদের সকলকে নিয়ে।

উৎপল দেখিল ছায়ার দুইটি আঁখির পল্লবে পল্লবে শরৎ মেঘের সজলতা ঘনাইয়া উঠিতেছে। বোধ হয় তাহাকেই গোপন করিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল বোস, যাই—বেলা হ'চ্ছে।

উৎপল কি বলিতে গেল, কিন্তু ছায়া তখন ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে।

সাধ্যমত ছায়া খোকাকে কমলার দিকেই আগাইয়া দেয়। কিন্তু ওই একবছর দেড় বছরের যাদুকর শিশুটির যত হাসি, হাত-পা ছুঁড়িয়া কথা বলিবার অক্ষম প্রয়াস কি শুধু ছায়ারই কাছে! সাংসারিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে কমলার লুব্ধ আঁখি দুইটি খোকারই অনুসরণ করিয়া ফিরে। তাহাকে কোলে পাইয়া কমলা টিপিয়া চট্‌কাইয়া, ব্যগ্রোগ্র চুম্বনে সবটুকু রুদ্ধ স্নেহধারা উজাড় করিয়া দিতে চায়, কিন্তু অবুঝ শিশু তাহাতে সায় দেয় না। অস্থির ভাবে কাঁদিয়া মুখ ঘুরাইয়া, তাহার ছোট আঁখি দুইটির ব্যগ্র দৃষ্টি দিয়া ছায়ারই সন্ধান করিতে থাকে।

দুই বোনের এই স্নেহের অভিনয়-সমারোহের মধ্যে খোকার উপর ভাগ বসাইতে সাহস বা সুযোগ পায় না উৎপল এবং তাহার মা। তা না পাক, তাহারা দুঃখও করে না। উৎপল কিন্তু একটা অস্বাভাবিক কিছুর আশঙ্কা করিয়া মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

যাহাকে লইয়া এত কাণ্ড তাহাকে কিন্তু ধরিয়া রাখা গেল না। আগমনী গাহিতে গাহিতে, তালে তালে পা ফেলিয়া উৎসব-সমারোহের মধ্যে যাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, অমানিশার অন্ধকারে তাহার তিরোধান অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই ঘটিল।

দুই দিনের নিউমোনিয়ায় খোকাকে বাঁচান গেল না।

দুর্ঘটনা যেমন অকস্মাৎ ঘটে তাহার শোকটা কিন্তু তেমন সহসা অপসৃত হয় না। সংসারের কোলাহলে নানা কাজের ভিড়ে মানুষ দুঃসহকেও সহনীয় করিয়া তোলে একটু একটু করিয়া ক্ষমতা অনুযায়ী কেহ দুইদিনে, কেহ বা দুই বছরে।

মেঝে হইতে লুটাইয়া-পড়া কমলার দেহখানি সস্নেহে নিজের কোলে টানিয়া ছায়া ডাকে—কমল্ ওঠ ভাই, কদিন থাকবি এমন কোরে পোড়ে?

নিরুত্তরে কমলা শুধু ছায়ার মুখের পানে চাহিয়া থাকে।

ছায়া নিজের আঙুল কয়টি দিয়া তাহার রুক্ষ চুলগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া, তাহার অনাবৃত পিঠখানিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে—উঠে একটু কিছু মুখে দে। নিজের শরীরটাকেও তো বাঁচাতে হবে।

কি কোর্‌বো আর নিজের শরীরটাকে নিয়ে দিদি—বলিয়া কমলা ছোট মেয়েটির মতো উপুড় হইয়া ছায়ার কোলে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া উঠে।

সান্ত্বনার সুরে ছায়া বলে,—হাঁরে খোকা কি তোর একারই ছিলো! সে কি আমাদেরও বুকটা ভেঙে দিয়ে যায় নি?

ক্রন্দন-বিকৃত কণ্ঠে কমলা বলে,—কিন্তু তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমি তাকে রাখতে পারলুম না, এটা যে কিছুতেই ভুলতে পারছিনে দিদি!

ছায়া বলে, আমিই তো তাকে কেড়ে নিয়েছিলুম তোর কাছ থেকে। মা'র চেয়ে মাসী কি ছেলেকে বেশী ভালোবাসতে পারে রে।

রাগিয়া কমলা বলে—মিথ্যে আমাকে ভুলোতে চেয়ো না দিদি। তারপর আরো কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া সহসা দুই হাতে ছায়ার দেহ জড়াইয়া ধরিয়া একান্ত মিনতির সহিত বলে, স্বামীর ভাগ তুমি ফিরে নাও দিদি। আমার কেবলি ভয় হচ্ছে একা পেয়ে আমি তাকেও রাখতে—

নিমেষে ছায়া কমলার মুখে আঁচলের খানিকটা চাপিয়া ধরিয়া বলে,—ওরে হতভাগী চুপ্ কর্ বোলতে নেই ওকথা। তুই কি আমায় পাগল না কোরে ছাড়বিনে!

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কমলার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে অপরূপ স্নিগ্ধকণ্ঠে ছায়া বলে—কেন তুই ওসব ভাব্‌ছিস কমল। যে বস্তু স্বেচ্ছায় তোকে দান করেছি কোন কারণেই আর যে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না ভাই।

কমলা বলিল—কিন্তু আমি তো নিয়েছিলুম—

ছায়া বলিল—তোর যে গচ্ছিত জিনিষ ছিলো—।

কমলা থপ্ করিয়া ছায়ার পা দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—মনে মনে তোমার ওপর কত রাগ-অভিমান করেছি

দিদি, তুমি আমায় মাপ করো। আমি খালি ভাবছি তুমি থাকবে কি নিয়ে!

পা ছাড়াইয়া লইয়া সজল চক্ষে ম্লান হাসিয়া ছায়া বলিল, অন্যায় তো কিছু করিসনি তুই। অন্যায় করলে চুলের মুঠি ধোরে আমিই তোর মুখ ঠুকে দিতুম। আর কি নিয়ে থাক্‌বো?--তুই কি মনে কোরেছিস খোকা আর ফিরে আসবে না!

ঝাঁপাইয়া ছায়ার বুকে পড়িয়া দুই হাতে তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে কমলা বলিল--আসবে দিদি, আবার খোকা ফিরে আসবে? তুমি বোল্‌ছো?

কমলার মাথাটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ছায়া বলিল—আস্‌বে রে আস্‌বে। সে কি আমাদের ভুলে থাক্‌তে পারে?

সহসা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কমলা বলিল, তবে আমি ওঁকে বোলে আসি দিদি, যে তুমি আশীর্ব্বাদ ক'রে বোল্‌ছো খোকা আবার ফিরে আস্‌বে!

বলিয়া সে একরকম ছুটিয়াই ঘরের বাহির হইয়া গেল।

—আর ছায়া তার আশীর্ব্বাদের অসারতার ক্ষোভে শরাহত পাখীর মতো অস্ফুট আর্ত্তনাদে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

মুক্তি

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

শ্যামল পাদপহীন, শূন্য বারি লেশ,
রৌদ্র তেজে ধূ ধূ করে বালুকা-সাগর,
যতদূর দৃষ্টি চলে, নাহি তার শেষ
নিদারুণ অগ্নিস্রোত বহে নিরন্তর।
তেমনি আমার চিত্ত মরুভূমি সম,
নাহি মধুরতা, শোভা, নাহি আঁখিজল,
ব্যাপি আছে নিরাশার সুগভীর তম,
কি বিষম জ্বালা তার, উগরে গরল।
ওগো দেব, কোথা তুমি আছ অন্তরালে
কৃপা করি দেও দেখা ঘুচাও যাতনা,
খুলে ফেল মোহপাশ বদ্ধ মায়াজালে
নাহি ভক্তি নাহি জানি ধ্যান আরাধনা।
জগতের শতরূপে নেহারি তোমারে
অপূর্ব্ব আনন্দ লভি হৃদয় মাঝারে।

অসমাপ্ত

শ্রীমতী প্রকৃতি ঘোষ

২৫

অগ্রাণ মাসের মাঝামাঝি এক শনিবার সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই দাদার কথা মনে হ'তেই দাদাকে দেখবার জন্য বড় অস্থিরতা এল, মনে হোল আজ যদি দাদা আসে? আমি নিজের কাজ সেরে, ঘর-টর পরিস্কার করে রাখলুম। এসে যদি জিনিষ পত্র চারদিকে ছড়ানো দেখে তবে বড় রাগ করবে। দশটার গাড়ী এল, বাবা স্নান করতে গেছেন, আমি বাবার খেতে বসবার জায়গা করছি এমন সময় দাদা বাড়ী এল। এসেই দাদা মার কাছে গিয়ে বল্লে "মা, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে শিগগীর ভাত দাও।" আমি বল্লুন "কিছু খেয়ে আসোনি দাদা, রাস্তা থেকে জপ করছিলে বুঝি?" দাদা বল্লে "আমি কাল থেকে কিছু খাইনি, আজও নয়, স্নান করেই চলে এসেছি।" মা বল্লেন "কেন খাসনি অসুখ করেছিল কি?" দাদা বল্লে "না, এম্‌নি, আমি অমন মাঝে মাঝে কত দিন খাইনা।"

বাবা কাছারি চলে গেলেন। দু'পুরে আমরা কজনে মিলে গল্প আরম্ভ করলুম। দাদা বল্লে "আমি ভারি মুস্কিলে পড়েছি, আমার আর টুইশানি করতে ভাল লাগছে না, আমার দ্বারা অত নিয়ম মেনে চলা হ'বে না, আমার যেন হাত, পা, বাঁধা রয়েছে মনে হয়, বড় বিরক্তি লাগে।" আমি বল্লুম "নিয়ম মেনে না চললে জগতে কেউ বড় হতে পারে না, সংসারে থাকতে গেলে নিয়ম মেনে চল্‌তে হবেই।" দাদা বল্লে "হাঁ তা' জানি, আমিও চেষ্টা করি কিন্তু পেরে উঠিনা, আর আমার মনে হয় আমি পারবো না'।" আমি বল্লুম "দাদা তুমি তাহ'লে প্রফেসারি কি মাষ্টারি কি করে করবে?" দাদা বল্লে "না বাব্বা আমি কিছুতেই প্রফেসারি করছি না, প্রফেসারির যা' চমৎকার 'কাণ্ড' দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেছে, আমাদের কলেজের একজন ছোক্‌রা প্রফেসর আছেন তাঁর কথা একটু বল্‌লেই বুঝতে পারবি; কলেজে লেকচার দিতে দিতে মেয়েদের দিকে মুখ করে বল্‌ছিলেন, কতকগুলো ছেলে অমনি বলে উঠ্‌ল 'ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন, এধারে মুখ ফেরান' সে বেচারী মুখ ফিরিয়ে নিলে, কিন্তু সব সময়ে কি মানুষের খেয়াল থাকে কোন্ সময়ে ওদের দিকে মুখ ফিরিয়েছে একটু, ছেলেগুলো 'আবার' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল" "আমি বল্লুম ভয়ানক অভদ্র তো ছেলেরা, আমি হলে বাপু কিছুতেই অমন বেয়াদপী সহ্য করতুম না।" দাদা বল্লে "না করে উপায় কি একধারে এতগুলো ছেলে, আর একধারে কটা প্রফেসর।" তারপর একটু চুপ করে বল্লে "আমি মনে করছি 'ফিনান্স' দেবো, তোমরা কিন্তু এখন কাউকে কিছু বলো না।" আমি বল্লুম "তোমাদের কলেজে অনেকগুলো মেয়ে পড়ে, নয়?" দাদা বল্লে "হাঁ, অনেক-গুলো পড়ে বটে, কিন্তু আমাদের ক্লাসে যারা পড়ে তা'রা লেখা পড়ায় একটাও ভাল নয়।" আমি বল্লুম "আচ্ছা তোমাদের কলেজে যে সব মেয়ে পড়ে তারা কি রকম দেখ্‌তে?" দাদা বল্লে "তা'কি আমি অত দেখেছি, তবে যা দেখেছি তা'তে একজনও আমার চোখে ভাল ঠেকেনি।" মা আমায় বল্লেন "যা, যা, তোর যত সব উদ্ভট্ প্রশ্ন।" দাদা হাস্‌তে হাস্‌তে আমার দিকে চেয়ে বল্লে "জান মা, একজন ঠিক প্রকৃতির মত আছে, অবিকল, প্রকৃতি যেমন রোগা, যেমন দেখ্‌তে, যেমন রাতদিন আজে বাজে বকে; ঠিক তেম্‌নি মেয়েটি। আমি অবাক হ'য়ে বল্লাম "ঠিক আমার মত, কি নাম?" দাদা নাম বলে বল্লে,—"তাকে দেখ্‌লে, আমার তোর কথা মনে পড়ে যায়।" দিদি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে "তবে বোধ হয় প্রকৃতিই সেখানে গিয়ে পড়ে।" দাদা একটু হাস্‌লে তারপর বল্লে

"না সে প্রকৃতির চেয়ে বয়সে বড়।" গল্প করতে করতে ট্রেনের সময় এসে পড়ল। দাদা কল্‌কাতায় চলে গেল।

২৬

আজ ৮ই পৌষ! কাল বড়দিন, দাদার এই বড়দিনের ছুটীতে আস্‌বার কথা ছিল কিন্তু হ'বে না, মুর্শিদাবাদ যাবে। আমাদেরও যাবার কথা ছিল কিন্তু হোল না। মনে ভারি কষ্ট হোল—দাদা কেন আস্‌বে না?—ক'দিন ধরে আমি আশা করে আছি, তা'র উপর দাদাকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে হচ্ছিল। সাড়ে দশটা বাজে এমন সময় দাদা এসে হাজির। আমার মনে যে তখন কি আনন্দ হয়েছিল তা' কলমের আগায় কি জানাব? আমি ছুটে দাদার কাছে যেতে মা বল্লেন "ওর ভারি আনন্দ হয়েছে, ও আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই বলেছিল 'আজ বোধ হয় দাদা আস্‌বে'।" দাদা আমার দিকে চেয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল। আমি বল্লুম "তোমাকে এবারে অনেক দিন থাক্‌তে হবে।" দাদা বল্লে "তা' কি বলা যায় দুদিন থাক্‌তে পারি তিন দিন থাক্‌তে পারি আবার কালও যেতে পারি।" মাকে বল্লে "মা আমি টুইশানি ছেড়ে দিইছি তোমার কথা শুনে।" মা খুসী হ'য়ে বল্লেন "বেশ করেছ, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।" খানিকটা পরে আমায় পড়াশুনার কথা জিজ্ঞেস কর্‌লে, আমার ভালো হচ্ছে না শুনে বল্লে "আচ্ছা আমি যে ক'দিন থাক্‌ব তোকে পড়াব, তা'রপর শনিবারে, শনিবারে এসে তোর পড়ায় সাহায্য করবো।" খাওয়া দাওয়ার পর আমরা দুজনে বাইরের ঘরে বই নিয়ে বসলুম। দাদা খানিকটা পড়ালে। তারপর সামান্য দুটো একটা কথা বল্‌বার পর বল্লে "তুই তো আর ভাল করে লেখাপড়া শিখ্‌লি না, শিখ্‌লে ভাল হোত।" আমি বল্লুম "আমার আর সে সব হবে না, তবে ইংরেজিটা ভাল করে শেখবার ইচ্ছে হয়, ওটা শিখ্‌লে অনেক বই পড়তে পারতুম।" দাদা বল্লে "আচ্ছা দেখ্‌বো তুই কত বই পড়তে পারিস্, আমার ইংরেজি একখানি বইও আমি নষ্ট করছি না, সব রেখে দিইছি, তোকে কিন্তু পড়তে হবে।" আমি বল্লুম "আমি চেষ্টা করবো।" তা'রপর একটু চুপ করে থেকে দাদা বল্লে "আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে, কাল সারারাত ঘুম হয়নি, আমি একটু ঘুমোই।" দাদা একখানা সাদা চাদর আগাগোড়া মুড়ী দিয়ে লম্বা ভাবে শুয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুমিয়ে পড়লো। দাদা দিনকতক গড়পারে সেজ জেঠা মশায়ের বাড়ী, দিন কতক এখানে থেকে বড়দিনের ছুটীটা কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছিল। দাদা ঘুমোলে আমি আর দিদি ঠিক করলুম আজ দাদার সঙ্গে নদীর তীরে বেড়াতে যা'ব। আমি দাদার জন্যে বিছানা করলুম রাত্রে দাদা শোবে বলে। দাদার মুখের ওপর রোদ এসে পড়্‌ছিল, একটা কাপড় টাঙ্গিয়ে দিলুম যাতে মুখে আর রোদ না লাগে। তখন প্রায় তিনটে বাজে। এমন সময় রোহিতাশ্বদা' এলেন, দাদাকে দু'চার বার নাম ধরে ডাক্‌লেন। দাদা একবার 'উঁঃ' করে আবার ঘুমোতে লাগ্‌লো। রোহিতাশ্বদা' মার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে উঠে যাবার সময় দাদাকে বল্‌লেন "অচু তুমি তো এখন থাক্‌বে, আমি তোমার সঙ্গে পরে দেখা করবো।" দাদা জড়িত সুরে বল্লে "না আমি থাক্‌বো না, আমি চলে যাব আজ।" রোহিতাশ্বদা' বল্‌লে "সে কি! কেন চলে যাবে কেন?" দাদা বল্লে "হ্যাঁ আমি যা'ব, আপনি এখন বাড়ী যান।" রোহিতাশ্বদা' চলে গেলে দাদা বল্লে "তোরা আমার নামে রোহিতাশ্বদা'র কাছে খুব বল্‌ছিলি, না?" আমি অবাক হ'য়ে বল্লুম "ওমা কখন্ তোমার নামে আমরা লাগালুম ভাই, তুমি কি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে দাদা?" দাদা হাস্‌তে লাগলো। আমি বল্লুম "দাদা আজ আমরা তোমার সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে যাব।" দাদা বল্লে "না বাব্বা, আজ আমি কিছুতেই তোদের নিয়ে যেতে পারবো না, আজ আমাদের এক প্রফেসর ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে আস্‌বেন, তোদের নিয়ে গেলে কি মনে করবেন?" আমি রাগ করে বল্লুম "কি আবার মনে করবেন? আমরা আজ তোমার সঙ্গে যাবোই। দাদা বল্লে "না ভাই আজ যায় না, আমি ভারি লজ্জায় পড়বো।" মা বল্লেন "বোনকে নিয়ে যাবি তাতে আবার লজ্জা কিরে?" দিদি বল্লে "তোর লজ্জা করে করুক আমরা যাব আমাদের লজ্জা নেই।" আমি বল্লুম "আচ্ছা বেশ তুমি আলাদা যেও

আমরা আলাদা যাবো।" দাদা বল্লে তোদের আজ গিয়ে কাজ নেই।" আমি রাগ করে বল্লুম "আমাদের গায়ে কি তোমার বোন বলে লেখা আছে নাকি? আর তোমার এত ভয় কেন শুনি?"

বাবার সঙ্গে কথা কইতে কইতে গড়পারের কথা বল্লে, কোন বিশেষ কারণে বাবা গড়পারে থাকতে বারণ করলেন। আমরাও বারণ করলুম, দাদা বল্লে "তাহলে আজ আমায় কল্‌কাতায় চলে যেতে হয়, না হ'লে পড়ার বড় ক্ষতি হ'বে।" আমি বল্লুম "কেন এইখান থেকে পড়া করো না?" দাদা বল্লে "এখানে কোন লাইব্রেরি নেই, অথচ সেখানে দুটো লাইব্রেরিতে চাঁদা দিচ্ছি, গেল ক'মাস মোটে পড়া হয়নি, পড়তে হ'বে না?" আমার ভারি অভিমান হোল। আমি কোন কথা না বলে চুপ করে গেলুম। মা বল্লেন "বেশ, আজ থেকে, কাল যাবি।" দাদা বল্লে "যেতে হ'লে আজই যেতে হবে, কেননা আমাদের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কাল চলে যাবেন আজ টাকা জমা না দিলে থাকা হ'বে না।" বাবা মাকে বক্‌লেন "ওর যাতে সুবিধে হয় ও তাই করবে।" যাওয়াই ঠিক্ হোল, আমি দুর্জ্জয় অভিমানের বশে দাদার সঙ্গে আর কথা বল্লুম না। একটু পরে দাদা কি কাজের জন্যে আমায় ডাক্‌লে সেখানে আর কেউ ছিল না। দাদা কতকগুলো কথা আপন মনেই আমাকে বলে যেতে লাগ্‌ল আমি দু' একটা 'হুঁ হ্যাঁ' করে উত্তর দিলুম। দাদা আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে "তোর কি রাগ হ'য়েছে, কেনরে?" আমি বল্লুম "না আমার রাগ হয় নি।" দাদা বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছিল সেইজন্যে আবার নিজেই বল্লে "কি করবো না গেলে যে চলবে না।" আমার অভিমান তখনো একেবারে যায় নি, দাদার কথায় আমি চুপ করে রইলুম। মা দাদার জন্যে খাবার করে দিচ্ছিলেন, দাদা রান্নাঘরে মার কাছে বসে খাবার খাচ্ছিল, খেতে খেতে আমায় ডাক্‌লে "আয় প্রকৃতি খাবি আয়।" আমি বল্লুম "আমি পরে খাব তুমি এখন খাও।" দাদা বারবার ডাক্‌তে আমি দাদার কাছে বসলুম। দাদা খেতে খেতে হঠাৎ একখানা কচুরী আধখানা খেয়ে আমার হাতে দিয়ে বল্লে 'খা'। আমি একটু অবাক হ'য়ে গেলুম, কেননা দাদা কখন খেতে খেতে কাউকে কিছু দিতো না। বল্লুম "দাদা তুমি খাও আমায় মা দিচ্ছেন।" দাদা বল্লে "না তুই খা' আমি বলছি খাবি না?" আমি দাদার কথা শুনে হেসে বল্লুম "খাবনা বল্‌ছি না তো আমি।" খাওয়া হ'লে ঘরে এসে দাদা গল্প করতে লাগ্‌ল। আমি বল্লুম "দাদা আমি তোমার জন্যে কত কষ্ট করে বিছানা করলুম, তুমি মোটে শুলে না।" দাদা একটু দুঃখিত ভাবে বল্লে "কি করবো বল্, না গেলে তো চল্‌বে না, তুই আমার হ'য়ে শুবি এখন।" আমি বল্লুম "দাদা, আবার কবে তুমি আস্‌বে?" দাদা বল্লে "বড়দিনের ভিতর তো আর আস্‌তে পারবো না, সোমবার মুর্শিদাবাদ যাবো, যেদিন ইচ্ছে হ'বে সেইদিনই আস্‌বো।" কথা বল্‌তে বল্‌তে ট্রেনের সময় হ'য়ে আস্‌ছিল আমি চুপি চুপি একবার ঘড়িটা দেখলুম আর দু'চার মিনিট চলে গেলে দাদা ট্রেন ফেল হয়, তা'হলে বেশ হয়, এই সময় যেন সময়ের কথা কারুর না মনে হয়। ঠিক সেই সময় বাবা বল্লেন "ওরে অচু তোর মোটে আর সময় নেই, শিগ্‌গীর বেরিয়ে পড়্।" দাদা বল্লে "হোক না সময়, না হয় আটটার ট্রেনে যাবো।" দাদা তখন আমার সঙ্গে গল্প করছিল, বলছিল "আমার আর কিছু ভাল লোকে বলে সিনেমা দেখলে নেশা হয়, আমি ভাবলুম যে যদি ভাল লাগে, প্রথম প্রথম মন্দ লাগ্‌তো না কিন্তু এখন আর ভাল লাগেনা, আগে এত বই পড়্‌তে ভাল বাসতুম যে বই নিয়ে রাতদিন কাটাতে পারতুম কিন্তু এখন আর তাও ভাল লাগেনা, দিনকতক শুধু খেলা আর গল্প করে কাটালুম সেও আর ভাল লাগেনা, আমি আর কিছুতেই মন লাগাতে পারছিনা, আমার আর কোন্ কিছু ভাল লাগেনা, কিছুতে স্পৃহা আন্‌তে পার্‌ছিনা।" আমি অবাক হ'য়ে বল্লাম "বই তোমার আর পড়্‌তে ভাল লাগেনা এও কখন সম্ভব হয়।" বাবা বল্লেন "রাত্রির ট্রেনে আমি তোমায় যেতে দেবোনা।" দাদা উঠে মাকে প্রণাম করলে, বাবাকে হাত তুলে নমস্কার করে বল্লে "বাবা আমি তবে আসি" আমায় বল্লে "আসি তা'হলে" দিদিকে বল্লে "দিদি আমি আসি।" খানিকটা দূর অবধি আমরা দাদাকে দেখ্‌তে পেলুম। দাদা চলে যেতে মনের ভেতর কেমন যেন

হাহাকার করে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, মনে হোল কেন এমন হচ্ছে, কই দাদা এতবার কল্‌কাতায় গেছে কই একবারও তো এত কষ্ট হয়নি। অসহ্য কান্না যেন বুকের ভেতর হ'তে ঠেলে উঠ্‌ছে। চোখের জল কেন কিছুতেই থামাতে পারছিনা? মনে হচ্ছে সব যেন শেষ হয়ে গেল, চারদিক আমার কাছে যেন শূন্য হ'য়ে গেল। তখনো জানিনা এই শেষ দেখা, এই আমাদের চিরবিদায়। আর আমি 'দাদা' বলে ডাকবো না।

২৭

জামাইবাবু মুর্শিদাবাদ হ'তে বেড়িয়ে এসে খুব গল্প করলেন। আমায় বল্লেন "অচু কিছু বেড়াবার কথা লেখেনি?" আমি বল্লুম "না, লিখে দরকার কি? দাদার মুখে আমি সব শুনবো তা'র আগে শুনতে চাইনা।"

দাদা এবারে এসে বলেছিল "প্রকৃতি তুই এবারে কপির আচার করিসনি?" আমি বলেছিলুম "না দাদা, এবারে করিনি, কেউ খেতে চায় না।" দাদা বলেছিল "বাঃ আমি বুঝি ভালবাসি না, তুই করে রাখিস্ আমি এসে এবারে খাব।" আমি কপির আচার করবার জন্য যে দু'টো কপি এনেছিল বাজার হ'তে তা' থেকে একটা তুলে নিলুম। আমি আচার করছি আমাদের বুড়িঝি ঝুড়িখানেক উপদেশ দিতে বস্‌লো "অত তেল দিওনা, অত লঙ্কা দিওনা, কেউ খেতে পারবে না।" আমি ধমক দিয়ে বল্লুম "থাম বাপু তুমি, তোমাকে কানের কাছে বক্‌বক্ করতে কেউ ডাকেনি, আমি তোমাদের জন্য করছিনা, কেউ খেতে পারবে কিনা সে আমি বুঝবো।" বুড়িঝি খুব বক্‌বক্ কর্‌তে কর্‌তে চলে গেল।

দাদা প্রায় একমাস হ'তে চল্‌ল আমাদের কাছে আসেনি। মা একবার দাদাকে এখানে আসবার জন্য লিখ্‌তে চেয়েছিলেন কিন্তু বাবা বারণ করলেন, "বল্‌লেন 'এখন এখানে আস্‌তে গেলে তার কষ্ট হ'বে।" দাদার কষ্ট হ'বে শুনে আমরা আর লিখলুম না। এখানে দাদা এসে থাক্‌তে চাইতো না আমরাও বেশী বল্‌তুম না কেননা এখানের ছেলেরা দাদাকে বড় ঠাট্টা বিদ্রূপ কর্‌তো। সরস্বতী পূজোর আগের দিন মা দাদাকে আস্‌তে লিখ্‌লেন। ক'দিন ধরে আমার বড় মন কেমন কর্‌ছিল। মনে হোল প্রত্যেকবার আমার মন অস্থির হ'লেই দাদা এসেছে এবারেও নিশ্চয় আসবে। সরস্বতী পূজোর দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরে জিনিষ পত্র সব ঝেড়ে মুছে, গুছিয়ে রাখলুম। সাড়ে দশটায় ট্রেন, আমি সাড়ে নটা থেকে পথের দিকে চেয়ে জানালার ধারে বসে রইলুম। ছোট বেলার কথা কেবলি মনে আস্‌তে লাগ্‌লো। দিদি আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। দাদার কথা দু'জনে গল্প কর্‌তে লাগলুম। পথ দিয়ে দুটি ছেলে মেয়ে যাচ্ছিল মেয়েটি ছোট, ছেলেটি বড়, দু'জনে গলা জড়াজড়ি করে গল্প কর্‌তে কর্‌তে যাচ্ছিল। তা'দের বয়স বোধ হয় সাত আট হবে। তা'দের দেখে আমারছোট বেলার কথা মূর্ত্তি ধরে আমার সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল। দিদিকে বল্লুম "দেখ, চেয়ে দেখ দিদি, ঠিক এইরকম করে আমরাও ছোট বেলায় বেড়াতে যেতুম।" সাড়ে দশটার ট্রেন এল কিন্তু দাদা এলোনা।

১০ই মাঘ, আজও পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কই দাদা তো এলোনা? অতীতের কথা মনে হয়, আমি চঞ্চল হয়ে উঠি। সরস্বতী পূজো হয়ে গেছে কাল, আজ বিজয়া। সকলের ঘরে আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, শুধু আমিই নিরানন্দ। বুকে যে ব্যথা বাজে মুখে তা' প্রকাশ করবার উপায় নেই।

চন্দ্রমল্লিকার গাছের দিকে চোখ পড়তে দাদার কথা মনে হ'ল। আর বছরে দাদা রোহিতাশ্বদা'দের বাড়ী মাছ ধরতে গিয়েছিল। সেইদিন আস্‌বার সময় রোহিতাশ্বদা'র কাছ থেকে পাঁচটি চন্দ্রমল্লিকার গাছ নিয়ে আসে, সব কটি মরে গিয়ে এখন একটিতে ঠেকেছে। চন্দ্রমল্লিকা গাছের কাছেই দাদার নিজের হাতে পোঁতা "বনমল্লিকা" গাছ, দাদা গাছটি পোঁতবার সময় বলেছিল গাছ বড় হ'লে ওকে গেটের মত করে দেবো। এখন গাছটি খুবই বড় হ'য়েছে, ডালিম গাছকে সে তা'র আশ্রয় করে নিয়েছে, দু'টি একটি ফুলও ফুটতে আরম্ভ হয়েছে।

বিকেলে দিদি, আমি নদীর তীরে বেড়াতে গেলুম। বেশ মেঘ্‌লা করেছে। চারদিক থেকে বিসর্জ্জনের বাজ্‌না বাজ্‌ছে পথে যেতে যেতে আজকের দাদার কথা মনে এসে চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসছিল। খুব বাতাস হচ্ছিল; নদীর ঢেউ পায়ের কাছে আছ্‌ড়ে পড়ছিল। সন্ধ্যা নাম্‌ছে, খুব শান্ত গম্ভীর! আমরা উঠ্‌লাম। আমার সতের বছরের খেলা শেষ হ'য়ে গেল, আর কোনদিন যে এই মধুর দৃশ্য দেখ্‌তে পাবোনা তা' বুঝতে পারিনি। আজ বিজয়া, ঠিক আটদিন পরে ক্ষুদ্র সংসারের বিজয়া হবে, একথা তখন মনে আসেনি। পেছনে একবার চেয়ে দেখলুম, নিমেষের মধ্যে মনের ভেতর কত অতীতের কথা চপলার হাসির মত খেলে গেল।

সন্ধ্যের পর জামাইবাবু কল্‌কাতা থেকে এখানে এলেন, দাদা স্কলারসিপের কিছু টাকা জামাইবাবুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। জামাইবাবু বল্লেন "অচুকে বড় বিমর্ষ দেখলুম, অনেক করে জিজ্ঞেস করলুম কেন তোমার মন খারাপ হয়েছে তা' কিছু বল্লে না।" আমরাও কিছু কারণ খুঁজে পেলুম না। বার বার মনে হতে লাগ্‌ল কি জন্যে তা'র মন খারাপ হয়েছে?

১২ই মাঘ—ভোর বেলা উঠে পুকুরে স্নান করতে গেলুম, রাস্তা ও ঘাট দুইই জনশূন্য। জলে নেমে পূর্ব্বদিকে চেয়ে দেখলাম পূবের আকাশ লাল হ'য়ে উঠেছে; সঙ্গে সঙ্গে মনের মাঝে একটি দিনের কথা ভেসে উঠ্‌ল সেদিনও এম্নি নির্জ্জন গঙ্গার ঘাটে আমরা স্নান করেছিলাম, ঠিক এই সময়ে।

দশটার গাড়ীতে নতুনদা' আস্‌তে আমি জিজ্ঞেস্ করলুম "নতুনদা' দাদার মন কেন খারাপ হয়েছে?" নতুনদা' বল্লে "কই খারাপ তো হয়নি, সে বেশ ভালোই আছে?" মা জিজ্ঞেস করলেন "হ্যাঁ রে অচু অত টাকা কিসে খরচ করলে?" নতুনদা' বল্লে "বই কিনেছে।"

মা বল্লেন "আমার চিঠির উত্তর দিলেনা কেন?" নতুনদা' বল্লে "তা' জানিনা প্রকৃতিকে একখানা খামে চিঠি দিয়েছে।" আমি অবাক হয়ে গেলুম—এক তো নিজে থেকে দিচ্ছে তা'র উপর আবার খামে এতো কখন দাদা করে না। খুলে দেখ্‌লুম, বিশেষ কোন কথা নেই, অন্য বারে যা' মাকে কি বাবাকে লেখে তার চেয়ে বেশী কথা লিখেছে। আমার মনে খুবই আনন্দ হোল, বাবাকে বল্লুম "বাবা দাদা আমায় চিঠি দিয়েছে!" বাবা বল্লেন "তাই নাকি? কি লিখেছে রে?" আমি দাদা যা' লিখেছিল সব বলে বল্লুম "আপনাকে আর মাকে প্রণাম দিতে বলেছে।" চিঠিটায় কোন বিশেষ কথা না থাক্‌লেও চিঠিটা পড়ে মনে হোল এর ভেতরে অনেক কথাই বলা হয়েছে।

দাদা না আসাতে আমার মনে বড় অভিমান হোল। আর দাদাকে দেখবার জন্যে আমার ভেতরে ভয়ানক অস্থিরতা এল, সারারাত কেঁদে পরদিন আমার জ্বর হোল।

জ্বর মোটে ছাড়েনা বাবা আমায় ওষুধ খেতে বলে যেতেন, নিজের হাতেই আমি ওষুধ খেতুম কিন্তু এবারে জ্বর হ'তে আমি ওষুধ খেতুম না দাদার উপর অভিমান করে। —বেশ হয় যদি আমি মরে যাই দাদা তখন ভাব্‌বে কেন আমি সরস্বতী পূজোয় যাইনি। বাবা ভাবতেন ওষুধ আমি নিয়মিত খাচ্ছি। বাবা যত ওষুধ দিচ্ছেন কোন ওষুধে কাজ হচ্ছেনা দেখে ভাবনায় পড়লেন। দিদি বল্লে "তুই অচুকে চিঠির উত্তর দিবিনা?" আমি ভাবলুম উত্তর দেবার মত কিছু কথা তো খুঁজে পাচ্ছিনা, দিদিকে বল্লুম পরে দেবো। বৃহস্পতিবার দিন মনে হোল হ্যাঁ দাদাকে লেখবার অনেক কথা আছে সে কথাগুলো দাদাকে বল্‌তেই হবে—। আমার মনে হোল, আমি যদি আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি তবে আমার কিছু দুঃখ নেই শুধু একবার দাদাকে দেখ্‌বো দাদাকে না দেখ্‌তে পেলে মরেও আমি শান্তি পাব না। "ভগবান! শুনেছি তুমি দয়াময়, আমার এইটুকু প্রার্থনা পূর্ণ করো আমায় একটিবার আমার ভাইকে দেখ্‌তে দাও।" এক এক সময় এত অস্থিরতা মনের ভেতর হ'ত যে আমি ভাবতুম—আমি কি পাগল হ'য়ে যাব?—

শুক্রবার রাত্রে মনে হোল—আচ্ছা আমি যদি দাদার কাছে যাই? কে নিয়ে যাবে? কেউ আমায় নিয়ে যাবে না। আমি একলা গেলে কি হয়? পারবো না যেতে? খুব পারবো দাদার ঠিকানা আমি জানি, বাড়ী নাইবা চিনলুম। লুকিয়ে যেতে হয়; কিন্তু বাবা মা বড্ড পরে

বক্‌বেন। তা' হোক এর জন্যে বকুনি আমি খুব সহ্য করতে পারি। দাদা বক্‌বে? না দাদা কখনো বক্‌বে না, বরং খুসীই হ'বে। দাদা জিজ্ঞাসা করে যদি "শুধু শুধু কেন এলি?" আমি বল্‌বো "তোমার জন্যে বড্ড মন কেমন করছিল তাই এসেছি।"—মনে মনে ঠিক করলুম আমার অসুখটা সেরে যাক্ আমি ভাল হ'য়ে নিশ্চয় যাবো।

শনিবার দিন মা দাদাকে চিঠি দিলেন, আমি পেছনে একটু লিখে দিলুম "দাদা তুমি এসো তোমার জন্যে আমাদের বড় মন কেমন করে।" আরো দু চারটে কথা লিখেছিলাম। আমার মনে হোলো আমার চিঠি যদি পায় নিশ্চয় আস্‌বে। বিকেলের ডাকে সে চিঠি গেল। আজকাল কোন শব্দ হলেই মনে হয় ঐ বুঝি দাদা এল যে কোন ট্রেন আস্‌বার সময় হলেই পথের দিকে চাই—যদি দাদা আসে—মনে হয় না যে এখন তা'র কলেজ খোলা কি করে আস্‌বে? রাত্রে ঘুম চলে যায় কেবল মনে হয় দাদা এখন কি কর্‌ছে—দুপুর বেলা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেই দাদার কথা মনে পড়ে যায়,—একবার তোমায় দেখ্‌বো দাদা, একবার।—

দেখ্‌তে, দেখ্‌তে শনিবারের রাত্রি কেটে গেল। মাস ও সপ্তাহ শেষ হয়ে গেল। আমার আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব মিটে গেল।

আজ ১৮ই মাঘ রবিবার, ১লা ফেব্রুয়ারী। সকালে উঠে যে যার কাজ সার্‌তে লাগ্‌ল। আমি খানিকক্ষণ শুয়ে, বই পড়ে সময় কাটালুম। দশটা বাজে দেখে আমি উঠে দরজার কাছে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়ালুম—আজ বোধ হয় দাদা আস্‌বে—মাঠের উপর দিয়ে একজন পিয়ন একখানা টেলিগ্রামের খাম হাতে নিয়ে আস্‌ছে। আমি ভাবলুম কা'দের বাড়ীর টেলিগ্রাম যাচ্ছে। এমন সময় বাবা আমায় ডাক্‌লেন, আমি বাবার আইনের বই খাতা তুলে রাখ্‌ছি বাইরে থেকে পিয়ন ডাক্‌লে "বাবু টেলিগ্রাম।" টেলিগ্রাম শুনে সমস্ত শরীর যেন কেঁপে উঠ্‌ল। মা বল্লেন "ওরে বোধ হয় অচুর কি হ'য়েছে।" আমি মনে জোর এনে বল্লুম "তুমি কি যে বলো মা, বোধ হয় বাবার কোন মক্কেল করেছে।" বাবা টেলিগ্রামের খাম খুলে ফেল্‌লেন তা'তে শুধু লেখা ছিল "অচ্যুতের অবস্থা ভয়ানক শীঘ্র আসুন" টমোরী হোষ্টেল থেকে দাদার একজন বন্ধু করেছে। মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন "ওগো সে বোধ হয় কিছু খেয়েছে।" আমার বিশ্বাস হোলোনা ভাবলুম না তা কখনো হ'তে পারেনা, কিন্তু একি হোল। একি!

বাবা মা একটার গাড়ীতে কল্‌কাতায় চলে গেলেন। দিন যেন ফুরোতে চায় না। না এ কখন সম্ভব হয়না, এ হতে পারেনা। মনে হচ্ছে টেলিগ্রাম কেউ মিথ্যে করে করেছে।

রাত হয়েছে আমাদের বাড়ীতে আজ কোথাও আলো নেই, শুধু চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে, আজ চতুর্দ্দশী।

দিদি আর আমি সিঁড়ির উপর চুপ করে বসে আছি। রাত তখন বারোটা কি সাড়ে বারোটা। সদর দরজায় হঠাৎ খুব জোর কড়ানাড়ার শব্দ হোল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম 'কে?' বাইরে থেকে বল্‌লে "আমি রে আমি।" হঠাৎ আমার যেন মাথা ঘুরে গেল একি! এ কার গলা? —দিদি দরজা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র আলো এসে আমার চোখ বন্ধ করে দিলে; তা'রপর ভাল করে চেয়ে দেখলাম "ওঃ বড়দা আপনি?" বড়দা' বাড়ীর ভেতর আস্‌তে না আস্‌তে আমি অধীর আবেগে জিজ্ঞেস করলুম "বড়দা, আমার দাদা কেমন আছে?" বড়দা বল্লেন "আমায় কি তুমি বাড়ী ঢুক্‌তে দেবেনা ভাই?" আমি বল্লুম "আপনি আগে বলুন দাদার কি হয়েছে কেমন আছে?" দিদি আমায় ধমক দিয়ে বল্লে "থাম্‌না প্রকৃতি একটু পরে জিজ্ঞেস্ করবি।" আমি বল্লুম "না আমি এখুনি শুনবো।" বড়দা' বল্লেন "আমায় আগে একটু বস্‌তে দাও, তোমার জ্বর এখন কেমন?" বড়দা' ঘরে গিয়ে বস্‌লেন। অন্য অনেক কথা বলে আমাদের ভুলোতে লাগলেন। আমি বল্লুম "এইবার বলুন দাদার কি অসুখ।" বড়দা' বল্লেন "কি অসুখ যে তা' কেউ ধরতে পা'রছে না।" সারারাত একরকম ভাবে কেটে গেল। বড়দা আমায় বল্লেন "দেখ প্রকৃতি ভাই, এ জগতে সুখ দুঃখ দুইই আছে, সেটা সহ্য কর্‌তে হয়। যদি কিছু হয় তুমি বেশী অধীর হয়োনা, একবার মেসো-মশাই, মাসীমার কথা ভেবে দেখ, তাঁদের জন্য তোমাদের—" আমি বল্লুম "আমার ভাই ছাড়া জগতে

আমি কাউকে চাইনা, কিছুই চাই না। নিজের কোন সুখ কি কর্ত্তব্য কিছু আমার নেই, শুধু আমার ভাইয়ের মঙ্গল হোক্ এই আমি চাই।"

রাত শেষ হোল বড়দা যা' বল্লেন তাই লিখে যাচ্ছি। শনিবার দিন দাদা সন্ধ্যের পর মেজ্দা'র সঙ্গে কোন রেঁস্তরায় বসে খেয়েছে গল্প করেছে। মেজদা'কে জিজ্ঞাসা করেছিল "আমি এত পড়লুম কিন্তু কি পেলুম? আমার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে।" তারপর নটা অবধি দুজনে গল্প করেছে। হোষ্টেলে আসবার সময় দাদা মেজদা'কে বলেছিল, "আমাকে অমুক বইখানা দেবেন।" তা'রপর হোষ্টেলে এসে রাত সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে গল্প করেছে। তারপর বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে একটি ছেলেকে বলেছিল—'অমুক' ছেলের কাছে আমার টাকা পাওনা আছে তা'র কাছ থেকে তিনটাকা নিয়ে 'অমুক' ছেলেকে দিও।" ছেলেটি বল্লে "তুমি কি বাড়ী যাবে? তা বেশ তো তুমি এসেই দিও না।" দাদা বল্লে না তুমিই দিও।" রাত দেড়টার সময় দাদা সব কাজ শেষ করলে রোহিতাশ্বদা'র একটা বইয়ে কাগজের টুক্রোয় লিখ্লে "আমি শেষ রাতের অতিথি।" একটা ষ্টেট্মেণ্ট লিখলে তারপর ধীরে ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলে।" রোহিতাশ্বদা'র মুখে শুন্লাম একবছর আগে দাদা রোহিতাশ্বদা'কে বলেছিল "জানেন আমি 'আত্মহত্যা' করতে পারি।" রোহিতাশ্বদা' বলেছিল "কেন তুমি একথা বল্ছো?" দাদা বলেছিল "আমি আমার লক্ষে পৌছাতে পারছিনা তাই।" (এই কথাই রোহিতাশ্বদা' বলেনি)

* * *

আকাশ, বাতাস, সবাই একসুরে বল্ছে নেই, নেই, সে নেই, সে নেই। সত্যিই কি সে নেই?

শেষ।

প্রকৃতি ঘোষ

কোন একটি সন্ধ্যার প্রতি

শ্রীনবেন্দু বসু

দিগন্তে লিখিল তব আগমনী সুবর্ণ আখরে,
পাখীদল সমাপিল সায়াহ্নের বন্দনা গান,
আসর রচিত হ'ল দূরে, ওই নিরালা প্রান্তরে,
ধীরে সেথা নেমে এলে তুমি শান্ত মৌন সুমহান।
অঞ্চল ছায়া তব ঢাকি নিল দাহ ধরণীর,
তৃপ্তির নিশ্বাসে তার সমীরণ উঠিল সঞ্চলি,
চুমি গেল লঘু সুখে স্তব্ধ মূক বনস্পতিশির—
ধ্যান ভাঙে প্রস্তরীর—ক্ষণতরে উঠে সে চঞ্চলি।
জনতাবিমুখ আমি—দিবসের বহি জ্বালাভার—
পশেছিনু সেই ঠাঁই যাচি কোন শীতল পরশ,
আমারেও ঘিরে এল সে মন্থর ধূসর প্রসার—
পেনু সাড়া, মোর পানে প'ল তব গহন দরশ।
তোমার আনন খানি ভেঙে প'ল মোর মুখ পরে,
ঢাকি নিল মোরে ঘন ঐ তব কেশ-আবরণ,
ওই তব আঁখিতারা জেগে র'ল আমার শিয়রে,
স্তম্ভিত বিমূঢ় দূরে চেয়ে র'ল জীবন মরণ!

লুভ্‌র্ ম্যুজমের চিত্রশালা

শ্রীসুশীলকুমার দেব

যাঁরা ছবি আঁকেন ও ছবি-আঁকার ইতিহাসের খবর রাখেন তাঁদের কাছে পারির লুভ্‌র্ ম্যুজমের কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে—যেমন প্রেমিকদের কাছে বৈষ্ণবরস-তত্ত্ব। যাঁরা চিত্রাঙ্কন-রসে রসিক তাঁদের অনেকে এই ম্যুজমে বেড়াতেও যান—এমন বহু আগন্তুক যে পৃথিবীর নানাদেশ থেকে সেখানে প্রত্যহ সমবেত হয়ে থাকেন তা ফ্রান্স-ভ্রমণ-কারীর চোখে পড়বেই নিশ্চয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহা-যুদ্ধের সময় আর্টের চর্চ্চা ও প্রসার ফ্রান্সে একেবারে হয়নি বললেও চলে। এখন যেটা ম্যুজমের "লঙ্‌ গেলারী" নামে সুপরিচিত সেখানে যুদ্ধের সময় হাঁস-পাতাল করতে হয়েছিল। তারপর আর্মিষ্টিসের দু'বছরের মধ্যে লঙ্‌ গেলারীতে যুগান্তর উপস্থিত হ'ল: ছবি নতুন করে টাঙানো হ'ল, নতুন ছবিও এ'ল অনেক, আর ছবি সাজানোতেও ঢের পরিবর্ত্তন হ'ল। সেদিন থেকে আজ অবধি লুভ্‌রের শুধু উন্নতিই চলছে। ফরাসীরা কি রকম শিল্প-প্রিয় এই লুভ্‌র্ না দেখলে সেটা বোঝবার জো নেই। লুভ্‌রের মতন চিত্র-সংগ্রহ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই; তাই শিল্পীদের মহতী কীর্ত্তির এই বিরাট রূপ দেখে মন বিস্মিত ও পুলকিত হয়। অধিকন্তু, লুভ্‌রের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর্, এটাসি ও বিশেষতঃ কিউরেটর্‌রা স্তম্ভগুলো ভারী সুন্দর করে সাজিয়েছেন এবং দেয়ালে সাজাবার সময় ছবিগুলোর সাইজ, ফ্রেম ও রঙ-সমন্বয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। তাই লুভ্‌রের ছবির গেলারী এমন অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ।

টিটিয়ান—দস্তানা সহ ভদ্রলোক

(লুভ্‌র্ মিউজিয়ম)

অসংখ্য ছবি দেখে দেখে শেষে চোখ অন্ধকার হয়ে আসে। একদিনে অত ছবি দেখ্‌তে যাওয়াও ভুল। তারপর, সব ছবি ভাল করে অনেক দিন ধরে দেখলেও সব-কটা আবার সকলের মনঃপূত হয় না। আমারও অনেক ছবি ভাল লাগেনি। আর কারো কিন্তু তারি মধ্যিকার কোন-কোন ছবি খুব ভাল মনে হতে পারে। এই ব্যক্তিগত ভালো লাগা-না-লাগার কথা স্বীকার করে নিয়ে কয়েকটি বিশিষ্ট ছবি ও শিল্পীর কথা লিখ্‌ব।

* * * *

গেলারীতে ঢোকার প্রধান দ্বার হচ্ছে Porte Denon। এগিয়ে গেলেই Salon Carré—ছবির ঘর। ভেনিসীয় শিল্পী Veronese (১৫২৮-৮৮ ইং)-এর The Marriage

at Cana—সাইজের দিক থেকে দ্বিতীয় ও অলঙ্কারের (Pageantry) দিক থেকে সর্ব্বোত্তম ছবি এই সালোঁতে রয়েছে। প্রথমে ভেনিসে S. Giorgio Maggiore-এর ভোজনাগারের একপাশে ছবিখানি টাঙানো ছিল। নেপোলিয়ঁা এই ছবিখানা তাঁর যুদ্ধজয়ের চিহ্ন করে ভেনিস্ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর আর ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। এই প্রকাণ্ড ছবি আঁকতে ভেরোনিজের শুধু পনেরো মাস সময় লেগেছিল। ছবির ভিতরে রয়েছে প্রায় একশ মানুষের বিবাহ-উৎসবে যৌবনরসোচ্ছ্বাসিত গরিমা-পূর্ণ দেহ-ভঙ্গী। কন্যা—অষ্ট্রিয়ার ইলিনর; বর—প্রথম ফ্রান্সিস্। ইংলণ্ডের মেরী প্রভৃতি নিমন্ত্রিতা আগন্তুক। রাজ-ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ঐক্যতান দলের গরিমা খুব মিলেছে। সে-সময়কার চারজন শিল্পীও এই উৎসবে উপস্থিত—টিটিয়ান্, বাসানো, ভেরোনিজ নিজে এবং তাঁর বন্ধু টিন্‌টোরেট্টু। ছবির বিশেষত্ব এই: এত লোক তবু ভিড় মনে হয়না, কত রঙ তবু চাকচিক্য নাই; আছে মোলায়েম নীল, রূপালি ধূসর সাদাটে হলুদ—তাই সমস্ত ছবিখানির tone neutral। ভাবটি উৎসবময় হলেও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। শুধু এক জায়গায় একটু থিয়েটারি ঢং, একজন বুটদার কাপড় পরা পুরুষ পানপাত্র এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ভেরোনিজের ভাই। যোড়শ শতাব্দীর ছবি; কিন্তু না আছেন সেখানে যীশু বা তাঁর শিষ্যেরা বা মেডোনা অথবা জলকে মদে পরিণত করার মতো অনৈসর্গিক ব্যাপার। "হোলি ইনকুইজিসনের" কাছে একবার ভেরোনিজকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—কেন তিনি একটা ছবিতে যেখানে মেগ্‌ডেলিনের চিত্র থাকলে ভাল হ'ত সেখানে একটা কুকুর বসিয়েছেন? তিনি নাকি বলেছিলেন যে, "কবি ও অজ্ঞদের" একটা স্বেচ্ছাচারিতা আছে যার ওপর কোন বিচার থাকতে পারে না। ছবিটি এতবড়ো যে দূর থেকে দেখতে হয় এবং একসঙ্গে ছবির সবটুকু বেমালুম দেখা সম্ভব নয় বলে মাথাটা ডান বাঁ, ওপর-নীচ ঘুরিয়ে একটু কসরৎও করতে হয়। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

তবে, যোড়শ শতাব্দীর সব চেয়ে বড়ো ভেনিসিয় চিত্রকর হচ্ছেন Titien। তাঁর জন্মের তারিখ নিয়ে গোলমাল আছে। যাই হোক, প্রায় একশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন এবং সে-যুগের প্রতিভাকে তিনিই নিজের ছবিগুলিতে মূর্ত্তিদান করে গেছেন। তাঁর Allegory ছবি একবার দেখলে কিছুতেই ভোলা যায় না। ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল—কে একজন যোদ্ধা তার স্ত্রী বা প্রিয়ার কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে যাচ্ছে; আর তিনটে প্রাণী (তার মধ্যে কিউপিড্ একজন) তাকে প্রিয়-বিচ্ছেদ সময়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে। পরে জেনেছি পুরুষটি টিটিয়ান্ নিজে এবং প্রিয়াটি তাঁর স্ত্রী সিসিলিয়া। সিসিলিয়ার মাথার চুলের ভাঁজ ভারী সুন্দর, মাথার গড়নও চমৎকার। লুভ্‌র্ মুজিয়মের ফ্লোরেন্স্ হেয়্-উড্ (ইনি ইংরেজী ভাষা বিজ্ঞদের জন্য ইংরেজীতে আর্ট বিষয়ক বক্তৃতা করেন) বলেন যে সেক্সপীর যেমন যুগ-প্রতিভার বিকাশ সাধন করে বিশ্ব-কবি হয়েছেন, টিটিয়ান্‌ও তেমনি বিশ্ব-শিল্পী।

টিটিয়ান—সমাধি। (লুভ্‌র্ মিউজিয়ম)

২

ফ্লোরেন্টিয়দলের Leonardo (১৪৫২—১৫১৯ ইং) ও Raphel (১৪৮৩—১৫২০)-এর নাম সর্ব্বদেশে সুবিদিত। লিওনার্ডর Madonna of the Rocks, Last Supper, Monna Lisa-র নাম আগেই জানা ছিল। কিন্তু একেবারে সাদা চোখে মূল ছবিগুলো দেখে একটু কেমন অন্যরকম মনে হচ্ছিল। মেডোনা ছবির বিশেষত্ব হ'ল যে মেডোনা এখানে স্তম্ভ-মূলে আসীনা ন'ন—তিনি ধরাশ্রিতা; তাঁর চারদিকে সেণ্ট্‌রা পূজো কচ্ছেন

জ্যাঁ গ্রা—আরকোল্‌ ব্রিজে বোনাপার্ট (লুভ্‌র্‌ মিউজিয়ম)

এমনও নয়—সেণ্ট্‌রা একেবারেই নেই; তাঁর দৃষ্টি অপার্থিব ভাবপূর্ণ নয়—স্নেহময়। স্বর্গজ্যোতিঃ, ভগবৎপ্রতীক প্রভৃতির এই ছবিতে অভাব। তাই ছবিখানি সে-যুগে খুব নতুন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ Last Supperএর অরিজিনাল্‌ লুভ্‌রে নেই। নকলখানা একজন লিওনার্ড-ভক্তের আঁকা। অরিজিনাল্‌ তৈল-চিত্রখানা মিলানে ফরাসী সৈন্যেরা অনেকটা নষ্ট করে ফেলেছে। আজ পর্য্যন্ত যেটুকু আছে সে লিওনার্ডের অত্যদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিতে অসমর্থ। "সর্ব্বশেষের নৈশ-ভোজন" বিষয়ক ছবি এর আগেও আরো অনেক আঁকা হয়েছে। সেগুলিতে টেবিলের চারদিকে যীশুর অন্তরঙ্গরা আলাদা হয়ে বসতেন। এখানে কিন্তু তিন-তিনজনে এক-একটা 'গ্রুপ' করা হয়েছে। "আমার ওপর বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বে এমন একজন এখানে আছে"—যীশুর এই কথায় অন্তরঙ্গদের মুখে যে-যে বিভিন্ন ভাব-বৈরূপ্যের উদয় হয়েছে সেইটে দেখানই ছবির উদ্দেশ্য। কোন মহৎ চিন্তা বা অনুভূতি আলোছায়ার দ্বারা প্রকাশ করাই লিওনার্ডর বৈশিষ্ট্য। তাঁর যে শিষ্য গুরুর ছবির নকল করেছেন তিনি যথার্থ শিষ্যই বটেন। তবু দুধের সাধ ঘোলে মিটবে কেন?

কিন্তু, Monna Lisa?—দুধ ত নয়, একেবারে ক্ষীর দেখলুম! একজন ফরাসী চিত্রকর লিজাকে নিজের পটে এঁকে তুলছেন। আমরা—দর্শকরা—কিন্তু লিওনার্ডর ছবির দিকেই চেয়ে রইলুম। লিজার মুখের অবর্ণনীয় হাসি, গলার মসৃণতা, সুগঠিত হাত, হাতের কাপড়ের ওপর আলোক-পাত—সবই সুন্দর। রূপকার ছবিখানা নিয়ে চার বছর কাজ করেছিলেন; তবু ছবি অসমাপ্ত। তারপর ফরাসী রাজার কাছে ৪০০০ ক্রাউন্‌ মূল্য নিয়ে বিক্রী করেছিলেন। ভেসারী এ ছবি সম্বন্ধে বলেছেন—'এ ত ছবি নয়—জলজ্যান্ত মানুষ। গলদেশে জীবন-প্রবাহ টের পাওয়া যায়। অনিন্দ্যসুন্দর হাসিটি জীবন-লীলার চেয়েও বেশী অলৌকিক।"—খাঁটি কথা! হাসিখানা নিয়ে কি অনেক ভাষ্য হয়েছে; তবু আজ পর্য্যন্ত কেউ বলতে পার্‌বে না যে হাসির অর্থাবিষ্কার-ভাষ্যের একটা হেস্তনেস্ত হয়েছে। এখন, লীগ্‌ অব নেশনস্‌ এই ভাষ্য-কলহে সন্ধি স্থাপনের জন্য একটা রেজলুসন করতে পারেন বা ন্যূনপক্ষে একটা কমিশনও বসাতে পারেন।

ফ্লোরেণ্টাইন শিল্পীদের মধ্যে Raphelএর ছবি না দেখলেই নয়। লুভ্‌রে চারটে ভাগ করে রাফেলের শিল্প-বৈচিত্র্য বোঝাবার চেষ্টা করে হয়েছে। প্রথম বিভাগে আছে—যৌবনের চিত্রাবলী। দ্বিতীয়তঃ, Peruginoর প্রভাব তার চিত্রাঙ্কনে এত বেশী পাওয়া গেছে যে তাঁর নামের

অনেক ছবি ঐ নামে অনেকে চালাতে চান। এই রকম ছবি কতগুলো এই বিভাগে আছে। তৃতীয়তঃ, ফ্লোরেণ্টাইন্ বিভাগে তাঁর আধ্যাত্মিক মেডোনা চিত্র-সমষ্টি। সর্ব্বশেষে, কতকগুলো ছবি যেখানে মাইকেলেঞ্জেলোর প্রভাব রয়েছে এবং ভেনিসিয়রা যে-রকম ব্রুস্-সাহায্যে রঙ-এর বৈচিত্র্য করেন, তার অনুকরণ রয়েছে। রাফেল সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে তাঁর সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তীকরণের শক্তি-সামর্থ্য। এই জন্যে কোনটা যে রাফেলের আসল ধরণ তা'

আন্দ্রিয়া সোলারিও—শ্যামল কুশনের কুমারী।
(লুভ্‌র্ মিউজিয়ম)

চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো শক্ত। তাঁর একটা দোষ বরাবর ছিল: কখনো তিনি ব্রুস্-চালানো ব্যাপারে কৃতী হয়ে ওঠেন নি; তাই রঙ্-শিল্পী হিসেবে তিনি একেবারে যে-কে-সে না হলেও কেউ-কেটাও ন'ন। কল্পনা তাঁর ছিল প্রবল। তাঁর কল্পনা-মন্দিরে সুন্দর ও ধর্ম্ম এই দেবতা দু'জনের নিত্যপুজো হ'ত। "মোনালিজা" ছবির পাশে তাঁর St. George এবং St. Michel দু'খানা ছবি রয়েছে। দুটো ছবিরই প্রধান ভাব হচ্ছে—ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়। শিল্প সুন্দরের উপাসনা-মন্দির—এ বর্ত্তমান যুগের শিল্প-সুধীদের কথা। কিন্তু রাফেলের চিত্র-শিল্পের সমধিক সৌন্দর্য্য ধর্ম্ম-দেবতার পাদমূলে নিঃশেষিত। তাঁর Belle Jardinière চিত্র এই কথাই সবিশেষ প্রমাণ করে। ছবিতে ধর্ম্ম-প্রাধান্যর কারণ এই যে রাফেল রেনেসাঁস শিল্পীদের প্রতিনিধি। রেনেসাঁসের গ্রীসীয় অভ্যুত্থান রাফেলের চিত্রপটে ধরা পড়েছে, যেন মুকুরে সূর্য্য প্রতিফলিত—জ্বলজ্বল্ কচ্ছে। রাফেলের ফ্রেস্কো লুভ্‌রে খুব কম।

Michel Angelo যেন রবীন্দ্রনাথ। বহুমুখী প্রতিভা। শিল্পের নানা বিভাগে এঁদের কারুকার্য্য। তবে, কবির চিত্র যেমন তাঁর কবিতার কাছে আভূমি অবনমিত (Versification in lines এর এই অর্থ) তেমনি মাইকেলের ছবি তাঁর ভাস্কর্য্যের ছায়ামাত্র। তাঁর চিত্রের দেহীদের প্রতিমাবৎ (Statuesque) মনে হয়। লুভ্‌রে মাইকেলের ছবি মাত্র কয়েকখানা। তবে প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্কেচ্ রাখা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ ফ্লেমিস্ শিল্পী Peter Paul Rubens। ইনিই শুধু একমাত্র উত্তর য়ুরোপীয় চিত্রকর যিনি ইতালীয় চিত্রকলা শিখে নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে শিল্প-সাধনা করে গেছেন। ইনি ভেরোনিজের খুব ভক্ত। বড় পট না হলে যেন ছবি আঁকতে নেই—দু'জনেরি এম্‌নি ভাব। পটে অঙ্কনীয় বিষয়টি সাজিয়ে-গুছিয়ে ফিট্-ফাট করে তোলার মতো পরিচ্ছন্ন স্বভাব দু'জনেরি। রুবেন্সের চিত্র কিন্তু জাঁকালো হওয়া চাই-ই চাই—গতিভঙ্গীতে জাঁকালো, রঙ-এ জাঁকালো, রচনায় জাঁকালো। তাঁর চিত্রগুলি সহজ ওজস্বিতায় পরিপূর্ণ। যে সব ছবিতে তিনি মেয়ে এঁকেছেন, সেগুলোতে মেয়েরা কেমন সুবলিতা, সুগঠিতা, স্বাস্থ্যবতী, প্রসন্নচিত্ত, উজ্জ্বল গৌর—একেবারে নিছক ফ্লেমিশ টাইপ। রুবেন্স্ তাই অধিকন্তু একজন স্বদেশী শিল্পী। তাঁর ছবি সম্বন্ধে একটা মুস্কিল হ'ল যে অনেক সময় তাঁর ডিসাইনের ওপর শিষ্যদের আঁকা ছবি তিনি

রি-টাচ্ করে দিয়েছেন; ভক্তেরাও আবার সেগুলি গুরুর নামে চালিয়ে গুরুভক্তি দেখিয়েছেন। সেজন্য তাঁর খাঁটি ছবি বাছা সোজা নয়। যাই হোক্, তাঁর Portrait of Helen Fourment নিজের আঁকা চিত্র—লুভ্‌রের রুবেন্স্-সংগ্রহের মধ্যে একখানা সর্ব্বোত্তম ছবি: নিজের দ্বিতীয়া স্ত্রী ও দু'টি ছেলে-মেয়ে—দৈনন্দিন জীবনের সরল গৃহ-চিত্র। শিল্পী কি-করে এক পর্দ্দা রঙের ওপর অন্যান্য পর্দ্দা ধীরে ধীরে চড়িয়ে যেতেন সেইটে এই ছবিতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কারণ ছবিখানি অসমাপ্ত। রুবেন্সের

• পঞ্চদশ শতাব্দীর অভিঙ্‌ন" স্কুলের শিল্প—কুমারী কর্ত্তৃক খৃষ্টের মৃতদেহ বিধৃত (লুভ্‌র্ মিউজিয়ম)

জাঁকালো সজীবতার নিদর্শন রয়েছে ফ্রান্সের মেরী-ডি-মেডিচ-কে তিনি যে-সমস্ত ছবি এঁকে দিয়েছিলেন সে-গুলোতে। তাতে, রাজা-রাণী, আমীর-ওমরাহ, দেব-দেবী-কল্প-মূর্ত্তি অনেক-কিছু পৌরাণিক সমাবেশ আছে যা' আধুনিক বস্তুবাদী শিল্পাদর্শ পর্য্যন্ত এগোতে পারেনি। প্রথম চাউনিতে এগুলোই বেশ লাগে। কিন্তু শিল্পীর নারী-চিত্রের পাশে এগুলো বড্ড সেকেলে বলে মনে হয়

হলান্দ-চিত্রকরেরা বস্তুবাদী। ইতালীয় শিল্পের ধর্ম্মসেবার আদর্শকে নাকচ করে দিয়ে এঁরা নিজেদের দেশ, সমাজ ও গণতন্ত্র কর্পোরেশন্ প্রভৃতির আলেখ্যাঙ্কন করেছেন। সামাজিক উচ্চ-অনুচ্চ জীবন, প্রাকৃতিক দৃশ্য, রাস্তা-ঘাট, সামুদ্রিক যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত বস্তুপ্রধান ছবিগুলি হলান্দের নিয়ত চলমান জীবন-যাত্রার কাহিনী ঘোষণা করছে। এই ছবিগুলি ডাচ্‌দের জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। লুভ্‌রের Bay E তে এগুলো সাজানো। Rembrandt এঁদের সর্ব্বপ্রধান শিল্পী। তাঁর The Carcass of an Ox hanging in a Butcher's Stall ভারী চমৎকার ছবি। ছবির নাম শুনলেই বস্তু-প্রিয়তার কথা মনে পড়ে। তবে Rembrandt অন্যান্য দেশী শিল্পীদের থেকে একটু আলাদা: তাঁর ধর্ম্ম-চিত্রও আছে; কিন্তু তাতেও বাস্তবতার কিছুমাত্র হানি ঘটেনি—যেমন, আমষ্টার্ডামে য়িহুদী-দের তিনি যেমনটি দেখেছেন তেমনি তাঁর ধর্ম্মচিত্রগুলোতে এঁকেছেনও। তাঁর The Philosopher in Meditation ছবিটি যেন আমাদের ভারতীয় ভাবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। জানলা দিয়ে আলো গড়িয়ে এসে পড়েছে একজন ধ্যান-মগ্ন বৃদ্ধের গায়ের ওপর, মেজেয়, সিঁড়িতে। ঘরের ভিতরকার আগুন থেকে আরো কিছু আলো একটি জানুপবিষ্টা নারীকে আলোকিত করেছে। চারদিক্‌কার অন্ধকার ঘরের গভীর শান্তিকে আরো গভীরতর করে তুলেছে। [দার্শনিকদের যে ধ্যান-নিদিধ্যাসনের দরকার আছে তা' আমাদের প্রাচীন ব্যাস-বশিষ্ঠরা ও গ্রীসে প্লেটো-এরিষ্টটল্ খুব বলে গেছেন। আধুনিকেরা আবার সবাই একথা বলেন না। বারট্রাণ্ড রাসেল্ এই নিয়ে সেদিন Conquest of Happiness বই লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে ধ্যান করে আত্ম-সংজ্ঞ না হয়ে কাজের ভেতর আত্ম-ভোলা হয়ে যাওয়াই জীবনের পরম পুরুষার্থ। এখন, এই নিয়ে The philosopher

in Action নাম দিয়ে নবযুগোচিত দার্শনিক ছবি আঁকলে হয়!]

বস্তুবাদী চিত্রের একখানা চমৎকার নমুনা Bad company—শিল্পী ডাচ্ Jan Steen। শিল্পবিচার-পরীক্ষায় ছবিখানি যে শুধু ভাল পাশ করে গেছে তা' নয়—একখানা মাষ্টার-পিস্ হিসেবেও গণ্য হয়েচে। ছবিতে একটু সদুপদেশ দেবার চেষ্টা যে একেবারে নেই তা' বলা যায় না; তবে মূলের ব্যাপারটা সাধারণতঃ যেমন ঘটে তাই। একটি সুরা-মত্ত যুবকের পকেট থেকে একটি তজ্জাতীয়া প্রমত্তা মেয়ে ঘড়ি চুরী করে নিচ্ছে ও পেছনে আরেকটি বুড়ীর হাতে গছিয়ে দিচ্ছে। বুড়ী মেয়ে-চোরের সাকরেদ্।

বতিচেলি—কুমারী, শিশু যীশুখৃষ্ট ও সেন্টজন

ডাচ্‌দের আঁকা অনেক দৃশ্য চিত্রও লুভ্‌রে রয়েছে। প্রাকৃতিক বর্ণনা আগেকার সনাতন-ধর্ম্মী ছবির মধ্যে শুধু পটের কাজেই লাগ্‌ত: আসল অভিনয়টার মধ্যে প্রকৃতির স্থান নেই, তাই সে পেছনে। ডাচ্‌রা এই রীতি দিলে বদ্‌লে। তাদের কাছে প্রাকৃতিক অভিনয়টাই একটা মস্ত জিনিষ হয়ে উঠ্‌ল। ছবিতে তারা সেই অভিনয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলে। কিন্তু ছবি-রাজ্যের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, রঙ-চালনায় পারদর্শী না হলে প্রাকৃতিক দৃশ্য-রচনায় উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। ইংরেজ শিল্পী Constable, Turner প্রভৃতি প্রকৃতিতে রঙ-এর উজ্জলতা দেখে ছবির ভিতরে প্রকৃতিকে রঙীন করে এঁকেছেন। সেজন্যে তাঁরা প্রশংসনীয়। কিন্তু এঁদের গুরু ঐ ডাচ্ শিল্পীরা, এই কথা ভুল্‌লে ইংরেজ শিল্পীদের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হবে না।

৫

লুভ্‌রে ইংরেজ চিত্রকরদের খুব বেশী স্থান নেই। তবে Reynolds, Gainsborough, Romney, Wilson, Constable, Turner প্রভৃতি প্রথিতযশাঃ চিত্রকরদের ছবি আছে। অন্যান্য দেশে আর্টের যখন খুব অনুশীলন হচ্ছিল ইংলণ্ডে শিল্পীর মতন শিল্পী তখন কেউ ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বিদেশী শিল্পী রুবেন্স্, ভান্‌ডাইক্ প্রভৃতি ইংলণ্ডে আমন্ত্রিত হয়ে এসে রাজদরবারের জন্য ছবি এঁকে দিয়েছেন। পূর্ব্বগ ও সমসাময়িক ইতালীয়, ফ্লেমিশ্, ডাচ্ ও ফরাসী চিত্রকরদের আর্ট নিয়ে গবেষণা করে Sir Joshua Reynolds ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে "রয়েল একাডেমি" প্রতিষ্ঠা করেন। শিল্পকলার জ্ঞান তাঁকে চিত্রাঙ্কনেও প্রবৃত্ত করেছিল। তিনি বলেছেন—Genius is the child of Imitation। তদনুযায়ী তাঁর স্বকৃত চিত্রে পরকীয় প্রভাব সুপ্রচুর। বস্তুতঃ, পরমুখাপেক্ষী না হয়েও প্রতিভা টি‍ঁকিয়ে রাখা চলে। এমন কেউ-কেউ থাকেন যাঁরা শিষ্যোচিত তপস্যা না করেও গুরুর আসন নিতে পারেন। Gainsborough কোন শিক্ষামন্দিরে যথাযথ পাঠ না নিয়েই শুধু নিজ ক্ষমতাবলে একজন মস্ত চিত্রকর হয়েছেন। লুভ্‌রে তাঁর ছবি কয়েকখানা আছে—তাতে দৃশ্যচিত্র ও আলেখ্যাঙ্কন দুই পাওয়া যায়। Constable-এর View of the Hampstead

Heathটি বেশ লাগ্‌ল। লণ্ডনের উপকণ্ঠে এই 'হিথ্' বেড়িয়ে বেড়াবার প্রশস্ত স্থান—পার্ক, গাছ, বাগান, জঙ্গল' মেটে রাস্তা; প্রাকৃতিক দৃশ্যের সব মাল-মশলা সুলভ।

৬

ফরাসী শিল্পীদের লুভ্‌রে মর্য্যাদার অন্ত নেই। ১৪০০ খৃষ্টাব্দের Jean Malouel এবং সেই প্রাচীনযুগের শ্রেষ্ঠ

দা ভিঞ্চি—মোনা লেজা (লুভ্‌র্‌ মিউজিয়ম)

শিল্পী Jean Fouquet (মৃত্যু ১৪৮০ খৃঃ) থেকে আরম্ভ করে বহু আধুনিকদের ছবি রয়েছে। পারিই ছিল ফরাসী ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী-কুলের আদি পীঠস্থান। যখন Hundred years' War আরম্ভ হ'ল তখন পারি থেকে চিত্রাঙ্কন দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। তার মধ্যে বার্গাণ্ডি, তুরান্ ও প্রভঁাস রাজ-দরবারের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। রাজারাই সেকালে শিল্পের আদর করতেন; এবং তাঁদের দরবারে রাজ-শিল্পী হিসেবে গুণীর আদর-মর্য্যাদা হ'ত। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এইটেই দেখতে পাওয়া যায় যে, রাজদরবারের আদর্শ ও ফরমাস মাফিক চিত্র-শিল্পের চর্চ্চা চলেছে:—ত্রয়োদশ লুই ঠাণ্ডা প্রকৃতির ও অচতুর, তেমনি তাঁর সময়কার Vouet-এর চিত্র একটু যেন নিস্তেজ; চতুর্দ্দশ লুইর সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর তাঁর সময়কার ছবির আদর্শ—যেমন Le Brun এর ছবিতে দেখা যায়; পঞ্চদশ লুইর কৃত্রিমতা ও নিরঙ্কুশ তাচ্ছিল্য Watteau এবং Boucher-এর ছবিতে প্রতিফলিত; Greuze-এর ছবি ফরাসী বিপ্লবের তেজস্বিতায় আগাগোড়া ভরপুর।

সপ্তদশ শতাব্দীর সব চেয়ে বড় শিল্পী তু'জন—Poussin এবং Claude। তু'জনেই ইটালিতে চিত্র-বিদ্যা শিখেছেন, তু'জনেই ফরাসী রাজদরবারে আহূত হয়ে এসেছিলেন; কিন্তু পরে আবার তু'জনেই তাঁদের বিদ্যাস্থান ইটালিতে ফিরে গেলেন। পুসিঁর ছবি Time Rescuing Truth from the Attacks of Envy and Discord এর পেছনে একটু ইতিহাস আছে। রুবেন্সের মেরী-ডি মেডিসি-কে এঁকে দেয়া ছবিগুলির কথা আগে যা' বলেছি তাতে মেডিসির গৌরব-ব্যাখ্যানের একটু বাহুল্য ছিল। রিসেলো সে গৌরবের অংশ থেকে খুব বঞ্চিত হয়েছেন। তাই তিনি পুসিঁকে দিয়ে নিজের গৌরব-কাহিনী পূর্ব্বোক্ত ছবিতে আঁকিয়ে নিলেন—কালের দোহাই দিয়ে আত্ম-প্রসাদ লাভ করবার চেষ্টা! রাজা-রাজড়ার হিংসা-দ্বন্দ্ব শিল্পীর ভাল লাগ্‌বে কেন? তাই তু'বছরের মধ্যে চিত্রকর ইটালিতে ফিরে গেলেন। তাঁর Shepherds in Arcady ছবিখানা লোকে বেশী পছন্দ করে। ছবিটির ভাব আমাদের চিন্তার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। মেষ-পালক যুবকেরা একটা প্রস্তরনির্ম্মিত শব-মূর্ত্তির সাম্‌নে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে—বিদ্যুচ্চলং জীবিতম্, এই ভাব। পুসিঁর একটা দোষ বা গুণ যাই হোক, তিনি ভাব-প্রকাশের কাছে রঙের কারুকার্য্যকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করেন। আমরা যাকে বলি "সঙ্কেত" তারই একটু বাড়াবাড়ি। তাই তাঁর ছবি চোখকে যতখানি এড়িয়ে যায় মনকে ততখানি বেশী করে দেয় দোলা।

ক্লডের সঙ্গে পুসিঁর এই বিষয়ে মিল আছে। ক্লড

প্রকৃতিকে চোখে যা' দেখতেন তার নকল করেই কাজ শেষ করতেন না। মন ঐ দেখা-জিনিষের ভেতর দিয়ে কল্পনার নতুন রূপ গড়ে তুলত; অমনি তিনি তুলি দিয়ে তা' আঁকতে বসতেন। তাঁর দৃশ্য চিত্রগুলি তাঁর মানসী প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। ফরাসী দেশে ইনিই সর্ব্বপ্রথম-দলের সর্ব্বপ্রধান দৃশ্য চিত্রকর। তাঁর A Harbour at Sunset, Seaport at Sunrise দেখলে মনে হয়, যেন সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় সম্বন্ধে শুধু ছবি দেখছি না—এই

দা ভিঞ্চি—সেন্ট আন্ (লুভর্ মিউজিয়ম)

নিয়ে কবিতাও পড়ছি। কোন-কোন কবিতা যে রঙীন পোষাক পরে ছবি হয়ে চোখের আগে আসতে পারে তা রুডের দৃশ্য-চিত্রে প্রমাণিত হয়েছে। পুসিঁ ও রুডের মধ্যে একটা বিভিন্নতাও চোখে পড়ে—যদিও দু'জনেই সাঙ্কেতিক চিত্রকর তবু পুসিঁর সঙ্কেতে আমাদের মস্তিষ্কের চিন্তা জাগ্রত হয় মাত্র, হৃদয়টা তেমন সাড়া দেয় না; কিন্তু রুড্ একটুখানি ইঙ্গিতে আমাদের চিত্তকে আবেগ-পূর্ণ করে তোলেন। কবিতে ও চিত্রকরে তুলনা করায় যদি কোন ত্রুটি না ঘটে তাহ'লে বল্‌ব: পুসিঁ যেন ব্রাউনিং এবং রুড্ যেন কীট্‌স্।

চতুর্দ্দশ লুইর শেষ বয়সে Madame de Maintenon খুব সুকঠোর ধর্ম্মযাজকতা চালিয়েছিলেন। তার ফলে চিত্র-শিল্পে অধর্ম্মাচার বন্ধ হবে, সুনীতি-সুরুচি প্রবর্ত্তিত হবে, এমন কিছু হয়ত তিনি আশা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই আশা পূর্ণ হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখতে না দেখতে সনাতন চিত্রাঙ্কনে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। Watteau এই নব চিত্র-যুগের প্রবর্ত্তক। ছবিতে তিনি তাঁর খেয়াল, অলঙ্কার-প্রিয়তা ও কবিত্ব ফুটিয়ে তুলে পুরাতনের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করলেন। লুভরে তাঁর Embarkation for the Isle of Cyntheraর স্কেচ্ রক্ষিত আছে (ছবিখানা বার্লিনে)। ছবির অন্য একটি নামকরণ করাও চলে—"কবি-কল্পনার দ্বীপে চিত্রকরের যাত্রারম্ভ।" এই নূতন যাত্রায় ফরাসী শিল্পীর খেয়াল, হেঁয়ালি ও নষ্টামির যথেষ্ট পরিচয় আছে। পঞ্চদশ লুইর যুগে এমনি করে একদল সৌখীন শিল্পীদের অভ্যুদয় হ'ল। এঁরা চিত্রাঙ্কনের প্রাচীন রীতি মানতেন না। কোন বিশেষ টেক্‌নিক্ না মেনে শুধু প্রতিভার চাপে ছবি এঁকে যাঁরা আজো ফরাসীদেশে বরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে Chardin একজন। এঁর ছবির মধ্যে গার্হস্থ্যজীবন ভারী সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। ছবিগুলির নামেই তা' বোঝা যাচ্ছে:—The Busy Mother, The House keeper, Kitchen table ইত্যাদি। এই নবযুগের চিত্রকরেরা প্রতিভাবান্ ছিলেন ঠিক। তবু প্রতিভা এঁদের খুব-খানিকটা নির্লজ্জ করে ছেড়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি বিপ্লব-যুগের গ্রুজের আঁকা ছবি থেকে। ইনি অনেক নারী-চিত্র এঁকেছেন। সবগুলিতেই নারীদের বক্ষ নিরাবরণ, অধর ঈষন্মুক্ত ও ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত, চক্ষু অশ্রু ও লালসা-পূর্ণ।

এই রকম বেশিদিন চল্‌ল না। ষোড়শ লুইর সময় পুনর্ব্বার সনাতনী রীতি ফিরে এল। এবারকার আচার্য্য হলেন David। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ডেভিড্ একেবারে

একচ্ছত্র চিত্রশিল্পীরূপে পূজিত হয়েছিলেন। তাঁর কাঠ্‌-খোট্টা ছবির নমুনা Sabine Women। বিষয়টা এই—মেয়েরা স্বামিদিগকে ওদের ভাইদের কাছ থেকে আলাদা করে নিচ্ছে। তাতে ভাইদের মধ্যে মনোমালিন্য হলেও স্ত্রীরা বেশ উদাসীন পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। এই ছবির সমালোচনা এক কথায়—কৃত্রিম! তবু ডেভিড্‌ যে লুভ্‌রে পাত পেড়ে বসেছেন তা' এই রকম ছবির জন্য মোটেই নয়। যেখানটায় ইনি তাঁর সনাতন কায়দা-কানুন বিসর্জ্জন দিয়ে বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে এঁকেছেন সেখানেই সহজে তিনি ফরাসী-হৃদয় অধিকার করেছেন। লুভ্‌রে তাঁর Portrait of Pope Pius II এই রকম ছবি। কিন্তু তাঁর The Coronation of Napoleon ছবিখানা আরো ভাল। এখানা নতোরদামে সুরক্ষিত। পারি গেলে এই চার্চ্চ যেমন দেখতে হয়, তার সঙ্গে এই ছবিখানা না দেখলেও ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকে। ব্যাপারটি এই—পোপের সামনে নেপোলিঁয়ার রাজ্যাভিষেক হয়ে গেছে। সম্রাট্‌ মুকুট নিজের মাথা থেকে তুলে নিচ্ছেন যোসেফিনের মাথায় পরিয়ে দিতে। গুটিকয়েক সেনাপতিরা চারদিকে রয়েছেন। ছবির বাঁদিকে সম্রাটের ভাইরা; এবং বিচারমধ্যে সাম্রাটের মায়ের এক খানা আলেখ্য—যদিও তিনি উৎসবে দৈহিক অনুপস্থিত। জমকালো ফরাসী ছবির ভিতরে এই ছবিখানিই সমধিক বিস্ময়কর। যখন ছবিখানি নিয়ে ডেভিড্‌ সোৎসাহে কাজ করছিলেন তখন একদিন নেপোলিয়ঁ ছবি দেখতে এসে, ছবির সামনে এদিক-ওদিক আধঘণ্টা ধরে হেঁটে, তাকিয়ে, পরীক্ষা করে বললেন, "বাহাদুর ডেভিড, সাবাস হয়েছে। তুমি আমার চিন্তাগুলোকে ধরে ফেলেছ; তুমি আমায় ফরাসী বীরত্বের প্রতীক করে দেখিয়েছ। রাজ্যপরিচালনায় আমার দুশ্চিন্তার অংশ-ভাগিনী যিনি, তাঁর প্রতি যে অনুরাগ আমি প্রদর্শন করতে চেয়েছিলুম তারই নিদর্শন-চিহ্ন ভাবী কালের হাতে সঁপে দিয়েছ। তাই আমি ঋণী তোমার কাছে।"

ডেভিড্‌ উত্তর কর্লেন—"মহারাজ, নিখিল শিল্পী-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আমি আপনার অভিবাদন গ্রহণ করলুম। কিন্তু যে একজনকে আপনি অনুগ্রহ করে অভিনন্দন করলেন সে আমি। তাই আমি চরিতার্থ।"

সনাতনী ডেভিডের ক্লাসিসিজমের মূলে কুঠারাঘাত কর্লেন Baron Gros। তারপর থেকে যে বস্তুবাদিতা আরম্ভ হ'ল তার জন্য দায়ী Delacroix। লুভ্‌রে তাঁর যে ছবির দিকে চাইলেই প্রশ্ন ওঠে—এ কী? সেখানাই তাঁর সব চেয়ে বিখ্যাত ছবি—Sardanapalus, একজন রাজা।

দা ভিঞ্চি—সুন্দরী লৌহ বিক্রেত্রী—লুফেজিয়া ক্রিভেল্লির প্রতিকৃতি
(লুভ্‌র্ মিউজিয়ম)

কী বীভৎস, অথচ করুণ। শত্রুর কাছে পরাজয় স্বীকার করার আগে রাজা প্রাণত্যাগ করবেন এই পণ করে, নিজের অগ্নি-শয্যা রচনা করে, মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন—তাতে তাঁর ধন-সম্পত্তি, দাস-দাসী, উপপত্নীর দল সবাই পুড়ে ছাই হবে। রঙের প্রাচুর্য্য ও অ-প্রাচুর্য্যের ভিতর খেই না হারিয়ে রঙের বাহাদুরী করা এই ছবিতে বিলক্ষণ দেখানো হয়েছে। রঙের যে একটা বিশেষ সাধনা আছে ও এই সাধনায়

সিদ্ধিলাভ করারও যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে দেলাক্রোয়ার অনুবর্ত্তী Impressionistরা তা' দেখিয়েছেন।*

এই Impressionist বা ভাবচ্ছবিবাদীদের প্রধান তিনকর্ত্তা—Manet. Monet ও Renoir। রঙ-ব্যবহার সম্বন্ধে এঁদের থিওরি হচ্ছে আসল; তারপর ছবিতে থিওরিটি যত বেশী মূর্ত্তিমান্ হবে ততই ছবি হবে ভাল। চিত্রণীয় বিষয় নিয়ে এঁরা মাথা ঘামান না—তা' সে প্রকৃতিক দৃশ্যও হতে পারে, আবার একটা গির্জ্জা হলেও ক্ষতি নেই। তবে রঙ চালাতে হবে একটি বিশেষ নিয়মে। ভাঙ্গা বা অমিল রঙ একটার গায়ে আরেকটি রচনা করে যেতে হবে; একটা রঙ ধীরে ধীরে বদলে বেশ অলক্ষ্যে আরেক জাতের রঙের সঙ্গে মিশে যাবে—তা' হ'তে পারে না। বে-জাতি রঙেরা পাশাপাশি থেকে একে অন্যকে উজ্জ্বল করে রাখবে—তাই এঁরা প্রতিপূরক (Complementary) রঙ ব্যবহার করেন। এঁরা ভেজাল রঙের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না; বিশুদ্ধ রঙ দিয়ে রেখাপাত করে যান, যাকে এঁরা বলেন—des taches de couleur। নীল রঙ বসিয়ে পাশে হলুদের রেখা আঁকা হবে, যাতে দূর থেকে সজীব সবুজের ছাপ চোখে পড়ে। এঁরা বলেন, এই সবুজটি যদি রঙ-দানীতে নীল-হলুদে গুলে তৈরী করা হ'ত তা'হলে অত সজীব দেখাত না। অতএব বিশুদ্ধ ও প্রতিপূরক রঙ চাই।

একবার মোনে (১৮৪০—১৯২৬) একখানা সূর্য্যাস্ত-দৃশ্য এঁকে, নীচে "Une Impression" (একখানা ভাবচ্ছবি) নামকরণ করে লুভ্‌রের সাঁলোয় প্রদর্শনী-ভুক্ত করেন। দর্শক তথা সমালোচকেরা নামের ওপর টিপ্পনি করে বলেছিলেন "Ces Impressionnistes।" তারপর থেকে চিত্রকর ও তাঁর ভক্তদের ঐ নামেই পরিচয় বাহাল রইল।

মোনে বল্‌তেন, জিনিষের নিজস্ব কোন রঙ নেই। দিন, আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গেসঙ্গে আলোর যত রকমারি হচ্ছে, বিভিন্ন জিনিষও তত রঙ বদলাচ্ছে। রঙ বদলানোই প্রকৃতির স্বভাব; এবং ক্ষণে ক্ষণে দিন-আবহাওয়া-ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জিনিষের যে এক-একটা বিশেষ বিশেষ রঙ দেখতে পাওয়া যায় তাকে তিনি নাম দিয়েছেন envelope বা রূপ-পরিলেপ। এই রূপ-পরিলেপের ওপর নজর রেখেই তিনি Rouen Cathedral নামে অনেক গুলো ছবি এঁকেছেন। তার চারটে লুভ্‌রে আছে।

রাফেল সান্‌জিও—জেন্ আরাগনের প্রতিকৃতি।—(লুভ্‌র্ মিউজিয়ম)

দেখানো হয়েছে, একই গির্জ্জা কেন বিভিন্ন সময়ে আলাদা রকম দেখায়। তার কারণ—রূপ-পরিলেপ। তাঁর Houses of Parliament, London ছবিতে সূর্য্য ও কুয়াসার দ্বন্দ্ব ভারী চমৎকার। সূর্য্যের কিরণ কুয়াশাকে যেন ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে ফেল্‌ছে; অথচ প্রকাণ্ড ইমারতগুলো নীলাভ বায়ুমণ্ডলে কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়ে অস্পষ্ট-মূর্ত্তিতে বিলীন-প্রায়। আলো ছায়ার দ্বন্দ্ব-সম্পাতের কীর্ত্তি-কাহিনী চিত্রকরের তুলির লিখনে নিভুর্ল বাস্তবতার মধ্যে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। মোনের বিশেষত্ব—রঙকে ভেঙে

* গত আষাঢ়ের "প্রবাসীতে" শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু মহাশয় ভাবচ্ছবি-কারদের অঙ্কনরীতি সম্বন্ধে সবিশেষ লিখেছেন। প্রবন্ধঃ ফরাসী ইম্প্রেসনিষ্টদের কথা। পৃঃ ৩৮৪—৩৯৫।

দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলার অন্ততঃ এতটুকু সাহিত্যিক সমৃদ্ধি ও ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা হইয়াছে, যাহাতে বিদ্যালাভের জন্য নিরাপদে ইহার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে ও আবশ্যকানুযায়ী পাঠ্যপুস্তকও ইহাতে রচিত হইতে পারে। কাজেই, স্ত্রীশিক্ষায় শুধুমাত্র বাংলার উপর নির্ভর করা যায় কি না তাহা, ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

পুরুষদের শিক্ষার যে-সকল কারণে ইংরাজীর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইতেছে, বাহিরের সহিত যোগাযোগ ও চাকরির দ্বারা অর্থার্জ্জন তাহার মধ্যে প্রধান। এই প্রয়োজন নারীদেরও হয়ত সমানই হইবে। কিন্তু, সমাজে এই আদর্শ স্বীকৃত হইলেও এবং ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা চলিলেও, তাহার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমানে যে-সকল নারী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ মানসিক উৎকর্ষের জন্য ইহা করেন। বিস্তৃতভাবে নারী-শিক্ষার প্রচলন হইলে, যাঁহারা শিক্ষার দিকে ঝুঁকিবেন কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা এই উদ্দেশ্যেই শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। কাজেই, ইংরাজী শিক্ষার জন্য বর্ত্তমানে যতটা শক্তি ও সময় ব্যয় হইতেছে, তাহা নিতান্তই অপব্যয় হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন না হইলে, অনেক অল্প সময়ে অনেক অধিক প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ আয়ত্ত করা সম্ভব হইত। মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে শিক্ষা সমাপনের ব্যবস্থারও একটা বিশেষ মূল্য আছে। পরে যখন শিক্ষা বিস্তারের সহিত ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের সহিত, মেয়েদের অধিকতর সংখ্যায় বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদানের প্রয়োজন হইবে, আশা করা যাইতে পারে, ততদিনে বাহিরের কাজের পক্ষে ইংরাজী-জ্ঞানের অপরিহার্য্যতা অনেক কমিয়া যাইবে এবং শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে, পুরুষদের শিক্ষাব্যবস্থা হইতে ইংরাজীকে অনেকটা ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। যদি বাহিরের প্রয়োজনে ইংরাজীর আবশ্যকতা না কমে, অথচ, সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে, তখনকার সময়োপযোগী ব্যবস্থার কথা তখন ভাবা যাইতে পারিবে। আর বর্ত্তমানেই যে সকল মেয়ে, বাহিরের কর্ম্মোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা বর্ত্তমান পদ্ধতিতে পরিচালিত স্কুল কলেজেই তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার কার্ভে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, দেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিয়া সাফল্য লাভ করিতেছেন।

শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে ইংরাজী বাদ দিলে স্কুল চালাইবার খরচা অন্ততঃ অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রত্যেক স্কুলকে নির্দ্দিষ্ট একটা সাহায্য দান করিয়া এই প্রকার নূতন ধরণের স্কুল গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, তবে, স্থানীয় উৎসাহে অনেক স্কুল গড়িয়া উঠিতে পারিবে।

আমাদের রাজপুরুষেরা কোন্ শ্রেণীর লোকের পরিচয় পান ?

এ দেশের অনেক রাজ-পুরুষ দেশে ফিরিয়া সাধারণভাবে এ দেশের লোকের এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের নিন্দা করেন। তাঁহাদের এই কাজের পশ্চাতে অনেক স্থলে স্বার্থের সম্পর্ক আছে। অবশ্য নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে এই সকল মিথ্যার প্রতিবাদ করিবার মত ন্যায়নিষ্ঠ এবং সত্যপরায়ণ ইংরাজও আছেন, যদিও তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

কিন্তু, স্বার্থের সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কারণও কিছু পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্ত্তমানে দেশের লোক এবং গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আত্ম-সম্মান-জ্ঞান-সম্পন্ন অনেক গুণী লোকের পক্ষে, রাজপুরুষদের সংস্পর্শে আসিবার সম্ভাবনা অল্প। যাঁহারা আসেন, হয়, তাঁহাদের অনেকেরই কোনও স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন থাকে, না হয়, তাঁহারা দেশের ভাল লোকদের প্রতিনিধিস্থানীয় নহেন। বিদেশী রাজকর্ম্মচারীরা এই সকল লোকের বিদ্যাবুদ্ধি এবং মনোভাব হইতে, এ দেশের লোকের বিচার করেন এবং আমাদের সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করেন।

পূর্ব্বে যখন রাজসরকার ও দেশের লোকের মধ্যে সম্বন্ধ সহজ ছিল, তখন এ দেশের লোকের সত্য পরিচয় পাওয়া রাজকর্ম্মচারীদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধার ছিল।

গ্রামের মায়া

শিল্পী—শ্রীকেশবচন্দ্র খাঁ

রাজ-পুরুষদের, এদেশের আর যে শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়, তাঁহারা হইতেছেন, অধস্তন কর্ম্মচারী। এই শেষোক্তদের আত্ম-শক্তির পরিচয় দিবার, স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার নিজেদের চিন্তা ও কল্পনা কার্যে প্রয়োগ করিবার সুযোগ এবং সাহস থাকে না। ইঁহাদের অনেকে যোগ্যতা ও কর্ম্ম-কুশলতায় উপরিতন প্রভুদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু ইঁহাদের উপরের ইঙ্গিতে চলিতে হয়, এবং উপরিতন প্রভুরা ইঁহাদের কার্যে ও চরিত্রে প্রভুমতানুবর্ত্তিতার পরিচয় পাইলেও, শক্তি বা যোগ্যতার পরিচয় পান না, অথবা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারেন না।

তদ্ভিন্ন ইংরাজ রাজপুরুষদের সহিত আমাদের সকল কারবার কথাবার্ত্তা প্রভৃতি ইংরাজীতে চালাইতে হয়, এবং ইহা আমাদের অবাধ ও অসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ভাল ইংরাজী জানা না থাকায়, অনেক সময় প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিমান লোকদেরও কতকটা জড় প্রকৃতির স্থূলবুদ্ধি লোকের ন্যায় কাজ করিতে হয়।

এই সকল কারণে, অনেক ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারীই আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণের পরিচয় পান না; পক্ষান্তরে জাতীয় চরিত্রের অনেক নিন্দনীয় দিক অত্যন্ত, বর্দ্ধিত আকারে তাঁহাদের দৃষ্টি-গোচর হয়, ও, তাহাকেই তাঁহারা বাঙ্গালী-চরিত্রের স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন ও সেইভাবে চিত্রিত করেন।

আন্তর্জাতিক লেখক সঙ্ঘ

কোনও দেশের বড় লোকেরাই কোনও বিশেষ দেশ-বা জাতির লোক নহেন। সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির লোকেরাই তাঁহাদিগকে নিজের বলিয়া মনে করেন। যে কোনও দেশের এবং যে কোনও কালের শ্রেষ্ঠ লোকদের লেখা পড়িবার সময়, পাঠকের স্বভাবতঃই একথা মনে হইবে যে, পুস্তকখানি তাঁহার উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে এবং তাহাতে তাঁহারই মনের ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যেই যে, একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে, বাহিরের সহস্র পার্থক্য সত্ত্বেও যে মানুষ তাহার অন্তরের গভীর প্রদেশে এখনও এক আছে, ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সন্দেহ, বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের মূলে আমাদের জাগতিক স্বার্থ ও পরস্পরের সম্বন্ধে অজ্ঞতা রহিয়াছে। এই ব্যবধান দূর করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় হইতেছে, সকল জাতির শ্রেষ্ঠ লেখক ও মহৎ চরিত্রের লোকদিগের পৃথিবীব্যাপী পরিচয়ের ব্যবস্থা করা। ইহা বর্ত্তমান অবিশ্বাস ও ঘৃণার ভাব দূর করিয়া পরস্পরকে শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিবে।

পি-ই-এন-এসোসিয়েসন, কবি, সম্পাদক ও ঔপন্যাসিক-দের একটি আন্তর্জাতিক সংঘ। ১৯২৩ সালে ইহা লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্ত্তমানে ৩৫টি বিভিন্ন দেশে ইহার ৫০টি শাখা আছে। জন গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দী প্রথম হইতেই ইহার সভাপতি ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর এইচ-জি-ওয়েল্‌স্‌ এই সম্মান ভোগ করিতেছেন।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যদিও ভারতীয় প্রতিভা ও যোগ্যতার, বাহিরে প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন এবং মূল্য আছে, তবুও এতদিন ভারতবর্ষে ইহার কোনও শাখা ছিল না। অবশ্য ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার লণ্ডনস্থ শাখার সম্মানভোগী সভ্য ছিলেন।

যাহা হউক, ভারতবর্ষে ইহার একটি শাখা স্থাপনের কথা সম্প্রতি স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সভাপতি হইতে সম্মত হইয়াছেন। মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসী সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিখ্যাত দার্শনিক সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্তা নাইডু ইহার সহকারী সভাপতি হইবেন।

বিশ্বসভ্যতায় সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির দিক দিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের যে দান তাহা, প্রধানতঃ বাঙ্গালীর হাত দিয়াই হইয়াছে। কাজেই, এখানে বাঙ্গালীর প্রাধান্য রক্ষিত হওয়ায় বাঙ্গালীর প্রতি ন্যায় বিচার করা হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর একটি করিয়া সম্মিলন আহ্বান করেন, এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক দেশই পালাক্রমে এই গৌরবের অধিকারী হয়। এ বৎসর যুগো-শ্লাভিয়ায় ইহার অধিবেশন হইবে। ভারতবর্ষে শাখা স্থাপিত হইলে, আমরাও একদিন বিশ্বের মনীষিদের এই সম্মিলন আহ্বান করিতে পারিব।

ভিয়েনায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভিয়েনায়, সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে, বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নিকট হইতে, প্রধান ব্যক্তিদের নিকট হইতে এবং পৌর সভার নিকট হইতে সম্মান ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাংবাদিক, গ্রন্থকার, শিল্পসমালোচক রাজনীতিজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষক, সমাজ-সেবক প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোক তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বসুর মধ্যবর্ত্তিতায় কলিকাতা ও ভিয়েনার মেয়রের মধ্যে শুভেচ্ছার বিনিময় হইয়াছে। সুভাষবাবু এখানকার পৌর ব্যবস্থা অধ্যয়ন করিতেছেন; এবং প্রকাশ, এ সম্বন্ধে তিনি একখানি বই লিখিবেন। বইখানি সম্ভবতঃ তিনি ইংরাজীতে লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ একখানি বই বাংলায় লিখিলে, মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ সুবিচার করা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাঙ্গালীরা বিদেশের সমস্যা অধ্যয়ন করিবার জন্য, কদাচিৎ অন্যত্র গমন করেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা আরও কম লোকে মাতৃ-ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। বাংলাভাষায় শিক্ষাপ্রদ তথ্যপূর্ণ মৌলিকগ্রন্থের সেইজন্যই এত অভাব। ভিয়েনার একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

ভিয়েনা ও কলিকাতার মধ্যে এই চিন্তগত যোগাযোগে আমরা আনন্দিত।

বিদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য

ভিয়েনায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও এখানকার সহিত আমাদের যোগাযোগের উপায় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসুর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য:

"ইউরোপের এই অংশে সাধারণের মধ্যে, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও শিল্প সম্বন্ধে সবিশেষ ঔৎসুক্য আছে। সম্প্রতি, ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনও এঅঞ্চলে ব্যাপকভাবে কৌতূহল জাগ্রত করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী, কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও সার জগদীশচন্দ্র বসুর নামই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকে জানে। সার জগদীশচন্দ্র বসুর সহিত আমার সম্পর্ক আছে কিনা, সে সম্বন্ধে আমকে অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল।……এই প্রসঙ্গে আমি এ কথার উল্লেখ না করিয়া পারি না যে, ভারতবর্ষও ইউরোপের এতদঞ্চলের মধ্যে চিন্তগত বৃহত্তর যোগাযোগের সুযোগ রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় প্রবাসীরা হিন্দুস্থান একাডেমিক এসোসিয়েসন নামধেয় একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।·· ইঁহাদের এই চেষ্টাকে পূর্ণতা দান করিতে হইলে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ইউরোপের বিভিন্ন বিদ্যা-বিষয়ক বিশেষজ্ঞদিগকে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে। অধিক অর্থব্যয় না করিয়াও সহজে এই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।—উচ্চ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য আমাদের কয়জন অধ্যাপক বা ছাত্র আর ইউরোপে আসিতে পারেন? আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বক্তৃতা দিতে, ভিয়েনা হইতে বিশেষজ্ঞদিগকে নিয়মিতভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়। আমি এখানে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহা হইতে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির নিকট হইতে এইরূপ নিমন্ত্রণ, এখানকার পণ্ডিত ও অধ্যাপকদিগের দ্বারা আনন্দের সহিত গৃহীত হইবে। শান্তি-নিকেতনে বিদেশী মনীষিদিগকে নিয়মিত ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া এবং বসু গবেষণাগারে বিখ্যাত উদ্ভিদজ্ঞ অধ্যাপক মৌলিশ্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সার জে-সি-বসু যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসন শীতকালে ভিয়েনার কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তারকে ভারতে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন।

"অনেক অষ্ট্রীয়ান বন্ধু আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ভারতে আসিতে পারিলে, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ভালভাবে কি উপায়ে ভারতবর্ষকে দেখিতে পাইবেন। তাঁহারা আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ভারতে থস্ কুক্‌সের ন্যায় কোনও প্রতিষ্ঠান আছে কি না, যাঁহারা, বিদেশী পর্য্যটকেরা যাহাতে ইউরোপীয় হোটেলে থাকিতে বাধ্য না হইয়া এবং

অভারতীয়দের সাহায্যে পরিচালিত না হইয়া প্রকৃত ভারত-বর্ষের কতকটা দেখিতে পান, এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। বিদেশী হোটেলগুলির সমগ্র আবহাওয়াই ভারত-বিদ্বেষে পূর্ণ। আমাকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, বর্ত্তমানে এরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান নাই। যাহাতে এই অভাব শীঘ্র দূর হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে আমি, এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার দিকে আমার দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এই প্রসঙ্গে একজন অষ্ট্রীয়ান বন্ধু একদিন বলিতেছিলেন যে, ব্যবসা করিবার সঙ্গে সঙ্গে থস্ কুক্স্ ইংলণ্ডের পক্ষে কতটা প্রচার কার্য্য করিয়াছে, লোকে তাহা কল্পনাই করিতে পারে না।"

জার্ম্মানীতে ভারতীয়দের নিগ্রহ

জার্ম্মানিতে নাৎসিদলের হাতে কয়েকজন ভারতীয়ের বিশেষ নিগ্রহ হইয়াছে। তাঁহাদিগকে অকারণে ধরা হইয়াছে। দীর্ঘদিন আটক রাখা হইয়াছে, তাঁহাদের জিনিষ-পত্রাদি নষ্ট করা হইয়াছে, সঙ্গের অর্থাদি আটক থাকা কালে ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য নেওয়া হইয়াছে, পথের ভাড়া না দিয়া বাসস্থান হইতে দূরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আটক থাকা কালে তাঁহাদের উপর বর্ব্বরোচিত অত্যাচার করা হইয়াছে।

ভারতীয়েরা স্বাধীন দেশের লোক হইলে, তাঁহাদের উপর এই প্রকার নির্লজ্জ অত্যাচার চালান সম্ভব হইত না বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অপমানজনক উক্তি করাও সহজ হইত না।

কিছুদিন ধরিয়া ভারবর্ষ ও জার্ম্মানীর মধ্যে যে একটা সংযোগ সূত্র গড়িয়া উঠিতেছিল এবং জার্ম্মানীতে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা বাড়িতেছিল, ভারতীয়দের প্রতি বর্ত্তমান দুর্ব্ব্যবহার, তাহাকে বিশেষ রূঢ়ভাবে আঘাত দিবে।

বর্ত্তমান অভিযোগের যথোচিত অনুসন্ধান ও প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন ; না হইলে ভারতীয়েরা নিজেরা কি করিতে পারেন, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যক্রমে, শ্রমশিল্প প্রধান সকল দেশকেই নিজ নিজ দেশে, প্রস্তুত মালের অল্প বা অধিকাংশ বিক্রয়ের জন্ত ভারতে আসিতে হয়। ভারতবর্ষের সহিত জার্ম্মানির বাণিজ্যিক কারবার অতীতে অতিশয় বিস্তৃত ছিল, বর্ত্তমানে তদপেক্ষা কিছু কমিয়া গেলেও এখনও জার্ম্মানির প্রচুর জিনিষ ভারতে বিক্রয় হয়। আমরা এই প্রকার অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য জার্ম্মান-পণ্য বর্জ্জন করিয়া, জার্ম্মানির উপর ভারতীয় জনমতের চাপ দিতে পারি।

বিদেশে ভারতীয়দের ধনপ্রাণ নিরাপদ এবং সম্মান ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রবাসী ভারতীয়দের একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে এবং যেখানেই ভারতীয়েরা আছেন, সেখানেই তাহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইলে, সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি পশ্চাতে থাকায়, ভারতীয়েরা কতকটা নিরাপদ হইবেন। বিদেশে যাহাতে ভারতীয়দের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা কংগ্রেসেরও লক্ষ্য করিবার বিষয় ; কাজেই, এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যদি কংগ্রেসের সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে, দেশের জনমতের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ যোগ থাকিবে এবং ইহার শক্তিও বাড়িবে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জার্ম্মানির মনোভাব

বর্ত্তমান জার্ম্মান সরকারের সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং নাৎসি দলের সর্ব্বপ্রধান নেতা হেয়ার হিটলেয়ার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে যে বক্রভাব পোষণ করেন, জার্ম্মানিতে অত্যাচারিত অন্যতম ভারতীয় শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ার তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে বার্লিনে ব্রিটীস প্রেসের নিকট বর্ণনা প্রদান কালে তিনি ভারতের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় আন্দোলনকে, ভাল অথবা বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে ইংরেজের মুষ্টি বিন্দুমাত্র শিথিল হওয়াও দুর্দ্দৈবের পরিচায়ক।

হিটলেয়ারের এই উক্তি লণ্ডনের টাইম্‌স্ ও নাৎসিদিগের বার্লিনের প্রধান সংবাদ-পত্রে বাহির হয়।

ফেডারেশন-অব-ইণ্ডিয়ান-চেম্বার-অব-কমার্সের বার্লিনের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত চম্পকরামন ইহার বিরুদ্ধে মৃদু আপত্তি করেন, কিন্তু উত্তরে তাঁহাকে জানান হয় যে, হিট্‌লেয়ার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বমতে দৃঢ় আছেন।

এই উক্তি আজও প্রত্যাহৃত হয় নাই।

অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ আন্দোলনের শক্তি কোথায়?

আভ্যন্তরীণ বৈষম্য হিন্দু সমাজের নানাবিধ দুর্গতি ও দুর্ব্বলতার প্রধানতম কারণ এবং অস্পৃশ্যতা তাহার কদর্য্যতম রূপ। হিন্দুসভা, হিন্দু মিশন ইহা দূর করিবার জন্য অনেক দিন হইতে সচেষ্ট আছেন। বিবেকানন্দ ইহার বিরুদ্ধে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়াছেন, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের কার্য্য করিয়াছে, ইংরাজী শিক্ষা ইহাকে অনেকটা শিথিল মূল করিয়াছে এবং সমাজের নিম্নস্তরের জাগরণ বর্ণ-হিন্দুদের ইহার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে। কিন্তু, এই সংস্কারকার্য্য প্রত্যাশিত গতিতে অগ্রসর হয় নাই।

একমাত্র যুবকদিগের দ্বারা ইহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অভ্যুত্থান সম্ভব হইতে পারিত। দেশে যদি রাজনীতিক উত্তেজনার কারণ বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে এই স্বাভাবিক ব্যাপারই ঘটিত। কিন্তু, রাজনীতিক আন্দোলনে অধিক উত্তেজনা থাকায়, বিপদের সম্ভাবনা থাকায়, শক্তি, সামর্থ্য ও সাহস দেখাইবার বেশী সুযোগ থাকায় এবং রাজনীতিক পরাধীনতা আমাদের সকল দুর্গতির মূলীভূত কারণ হওয়ায়, যুবকেরা স্বভাবতঃই এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং দেশের শ্রেষ্ঠ লোকদের বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি এদিকেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যে-সকল লোক সমাজ সংস্কারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কর্ম্মী হিসাবে তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর লোক নহেন এবং তাঁহারা যেটুকু চেষ্টা করিয়াছেন, দেশের লোকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকায়, তাহাও আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই।

মহাত্মাজীও অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং ইহা কংগ্রেসেরও কার্য্যপদ্ধতির অন্তর্গত হইয়া আছে। কিন্তু, মহাত্মাজী এতদিন এজন্য তাঁহার সমগ্র প্রভাব এবং শক্তি প্রয়োগ করেন নাই। যদি করিতে যাইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার এরূপ সার্ব্বজনীন প্রভাব কখনই হইত না এবং তাঁহার চেষ্টাও ফলবতী হইত না। মহাত্মাজী ধার্ম্মিক ও সাধু চরিত্রের লোক, তাঁহার নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা অসাধারণ কিন্তু যে কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতেন, সেখানেই তিনি লোকের চিত্তজয় করিতে ও অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন ইহা সত্য নহে। তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, তখন দেশের লোকের মনের সঞ্চিত অসন্তোষ, কোনও প্রকার বিক্ষোভের মধ্যে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছিল এবং দেশের নবজাগ্রত যৌবন বিপদ ও ঝুঁকির মধ্যে শক্তিপরীক্ষার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই, তিনি যখন, শান্তিপূর্ণ হইলেও, সংঘর্ষমূলক কর্ম্মপদ্ধতির অবতরণা করিলেন, তখন নেতৃত্ব সহজেই তাঁহার হাতে গিয়া পড়িল।

সাধু চরিত্র এবং ধার্ম্মিকতার উপর, সাধারণভাবে মানবমনের এবং বিশেষভাবে ভারতীয় মনের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। রাজনীতিক নেতৃত্বের সহিত এই গুণগুলির সংযোগ ঘটায় তিনি এতটা শ্রদ্ধালাভে এবং প্রতিপত্তি সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছেন। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের পরে যখন, তিনি সংঘর্ষমূলক কর্ম্মপদ্ধতি পরিহার করিয়াছিলেন, তখন তাহার প্রভাবের যে হ্রাস ঘটিয়াছিল তাহা, এই কথাই প্রমাণিত করে। কাজেই, প্রথম হইতেই পূর্ণ উদ্যমে এই সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ফললাভ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু, বর্ত্তমানে, রাজনীতিক আন্দোলনের প্রথম উন্মাদনা আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পথে যে সকল স্থায়ী বিঘ্ন আছে এবং যাহা দূর করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত মৃদু প্রকৃতির দীর্ঘকালব্যাপী কার্য্যের প্রয়োজন হইবে, তাহার হিসাব লইবার, এবং সেজন্য আত্মনিয়োগ করিবার মত চিত্তস্থৈর্য্য যুবকদের আসিয়াছে। সমাজের নিম্নস্তরে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ায় এবং এই দাবী না মিটাইয়া রাজনীতিক আন্দোলনকে সাফল্য দান করা অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় এই সামাজিক আন্দোলন ও রাজনীতিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই সকল কারণে, মহাত্মাজীর বর্ত্তমান কর্ম্মপন্থা বিশেষভাবে সময়োপযোগী হইয়াছে এবং এতটা কার্য্যকারী হইয়াছে। মহাত্মাজীর প্রচেষ্টা সামাজিক অন্ধতাকে যে

ভাবে আঘাত করিয়াছে, এতবড় প্রচণ্ড আঘাত সমাজ আর কখনও পায় নাই।

অস্পৃশ্যদের মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

যে সকল প্রতিষ্ঠান অস্পৃশ্যতা দূর করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, নানা কারণে তাঁহাদের মধ্যে অস্পৃশ্য সেবক সমিতির অর্থ ও কর্ম্মশক্তি অধিক থাকিবার সম্ভাবনা। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত তৎপরতার সহিত এজন্য চেষ্টাও করিতেছেন।

অস্পৃশ্যতা দূর করিবার অন্যান্য উপায়ের সহিত তাঁহারা, অস্পৃশ্যদিগের মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে অন্যতম উপায় স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ অস্পৃশ্যদিগকে বর্ত্তমান হীনাবস্থা হইতে উন্নীত করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন আছে। শুধুমাত্র শিক্ষাদ্বারাই তাহারা অপরের নিকট হইতে মর্য্যাদা লাভে সমর্থ হইবে। কাহারও অনুকম্পা অথবা কোনও প্রয়োজনের মধ্য দিয়া যাহা লাভ করা যায়, তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না, অথবা গৌরবের পরিচায়কও হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের উচ্চ ও নিম্ন এই উভয় স্তরের মধ্যে বর্ত্তমানে কোনও প্রকার সংযোগসূত্র নাই। উচ্চস্তরে যে সদিচ্ছা ও প্রীতি জাগ্রত হইয়াছে, তাহার আন্তরিকতা ও অকপটতা সম্বন্ধে নিম্নপ্রান্তে বিশ্বাস উৎপাদন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী অত্যাচার ও প্রতিকূলাচারণে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য সময় ও স্বার্থ-বিরহিত সেবার প্রয়োজন হইবে। স্কুলগুলি এই প্রকার সেবার একটা ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারে।

কিন্তু, স্কুল স্থাপনের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে কিনা, তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার।

শিক্ষা যে মানুষের সকল উন্নতির গোড়ার কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা ফললাভ করিতে হইলে, তাহার জন্য বহুবিস্তৃত বিপুল আয়োজনের দরকার। বর্ত্তমানে যে আর্থিক সামর্থ্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে একটি জেলায় বড় জোর ৬০ বা ৭০টি স্কুল স্থাপন করা যাইবে। ২৫।৩০ মাইল অন্তর অথবা তাহার চেয়েও দূরে দূরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, জাতীয় জীবনে তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিবার আশা, নিতান্তই দুরাশা। এক রাজসরকার ব্যতীত ব্যাপকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের সাধ্যায়ত্ত নহে।

তদ্ভিন্ন, দেশময় অসংখ্য স্কুল স্থাপন করা যদিও বা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও, তাহার ফল পাওয়া যাইবে, এখন যে-ছেলেরা স্কুলে পড়িতেছে, তাহারা যখন বড় হইবে, তখনই মাত্র। অর্থাৎ অন্ততঃপক্ষে ১৫ বৎসর পরে।

ইহা ব্যতীত আরও কথা আছে।

অশিক্ষা, অস্পৃশ্যদিগের কোনও কোনও শ্রেণীর হীনাবস্থার কারণ হইলেও, অস্পৃশ্যতার কারণ কিনা; শিক্ষায় অগ্রসর হইলেই কাহারও অস্পৃশ্যতা দূর হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা; শিক্ষায় অগ্রসর এবং অন্যপ্রকারে উন্নত কোনও সম্প্রদায় এখনও অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় কিনা, প্রভৃতি কথা, এসম্পর্কে শিক্ষার উপযোগিতার বিষয় বিবেচনা করিবার সময় ভাবিতে হইবে।

বাস্তবিক পক্ষে, শিক্ষিত হইলেই, অস্পৃশ্যতা যে ঘুচিয়া যায় না, অনুন্নত শ্রেণীর ২১১টি সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। মেথর, মুচি প্রভৃতি ২১১টি জাতের কথা বাদ দিলে, অনুন্নতদের অধিকাংশ সম্প্রদায় শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকিয়াছেন ও দ্রুতগতিতে নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু, তাহাতে ত তাঁহারা স্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হন নাই।

[এখানে অবশ্য, যে-লোকগুলির স্পর্শ অশুচি মাত্র তাহাদের কথাই বলা হইতেছে না। কারণ, যে-সকল লোক সমাজের চক্ষে কোনও না কোনও প্রকারে হীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাদের সকলের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব্বপ্রকার হীনতা দূর না হইলে, কখনও হিন্দুসমাজ সংহত ও দৃঢ় হইবে না।]

অজ্ঞতা-জাত কুসংস্কার যদি অস্পৃশ্যতার কারণ হইত, তাহা হইলে, শিক্ষাবিস্তারকেই একমাত্র প্রতিকারের পন্থা

বলিয়া ধরা যাইত। কিন্তু, অস্পৃশ্যতার দায়িত্ব শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর এবং তাঁহারাই ইহাকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির মধ্য দিয়া সেবাকেন্দ্র সমূহ গড়িয়া তুলিয়া অস্পৃশ্যদের মধ্যে বিশ্বাস-উৎপাদন সম্ভব হইবে কিনা? স্কুল চালান যেরূপ ব্যয়সাপেক্ষ, তাহাতে অধিক স্কুল স্থাপন সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অল্প সংখ্যক স্কুলের সাহায্যে দেশময় একটা অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা যাইবে, এমন মনে হয় না।

যদি অধিক সংখ্যায় স্কুল স্থাপন করা সম্ভবও হয়, তাহা হইলেই বা ফল কি হইবে? যে সকল শ্রেণীর জন্য স্কুল স্থাপন করা হইবে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষকের উপযুক্ত লোক পাওয়া গেলে, প্রথম সুবিধা তাহাকেই দিতে হইবে,—না দিলে তাহাতে ক্ষোভ ও নানাপ্রকার অসুবিধার কারণ হইতে পারে। অধিকাংশ স্থানেই এইরূপ শিক্ষক পাওয়া যাইবে, এবং গেলে, বর্ণহিন্দুরা ইহার মধ্য দিয়া সেবা করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

যেখানে বর্ণ-হিন্দুদের কেহ শিক্ষকতা করিবেন, সেখানেও ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইবে যে, প্রথম কিছুদিন এই সকল বিদ্যালয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও, অল্পদিনের মধ্যেই ইহার নূতনত্ব নষ্ট হইয়া গিয়া ইহা আরও দশটি সাধারণ স্কুলের ন্যায় হইয়া যাইবে।

কেহ যেন মনে না করেন, লেখক অস্পৃশ্যদিগের শিক্ষার বিরোধী। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ কার্য্যে, বিদ্যালয় স্থাপন অপেক্ষা অন্যান্য উপায় অধিকতর ফলদায়ক হইতে পারে, ইহাই মাত্র বলিবার উদ্দেশ্য।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্পর্কে, একথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রয়োজন যেরূপ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আশুফলপ্রদ উপায় সমূহ তৎপরতার সহিত অবলম্বন করিতে হইবে"।

অস্পৃশ্যদিগের অশিক্ষা-সমস্যা, দেশের বৃহত্তর অশিক্ষা-সমস্যারসহিত সম্পর্কিত। তাহা ভালভাবে এবং যথার্থভাবে দূর করিতে হইলে, রাজ সরকারের মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অবশ্য শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা যতটুকু করা যায়, ততটুকুই লাভ, এবং তাহাতেই দেশের উপকার, একথা সর্ব্বতোভাবে সত্য; কিন্তু, তাহা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

বয়স্কদিগের কাজে লাগিতে পারে, ছায়াচিত্র যোগে স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে এমন সব উপদেশ দিবার ব্যবস্থা সার্ব্বজনীয় ধর্ম্মোৎসবাদির অনুষ্ঠান, বিক্ষোভ প্রদর্শন, কায়মনোবাক্যে জন্মগত অস্পৃশ্যতা অস্বীকার, অবনত শ্রেণীর লোকদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ, তাহাদের দুঃখের অংশগ্রহণ ও তাহার প্রতিকার চেষ্টা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা অস্পৃশ্য দূরীকরণ ও সমাজের বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে মৈত্রী স্থাপন, অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারে।

আয়ার্লণ্ড ও ভারতবর্ষ

গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য লণ্ডনে নিমন্ত্রিত ভারতীয় সদস্যগণের মনোভাব ও ব্যবহারের সহিত অনুরূপ ব্যাপারে লণ্ডন-সমাগত আইরিশ সদস্যগণের তুলনা করিয়া 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' Mrs. Guy Neth Joden যে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ আলোচনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"......আইরিশরা এখানে যখন নিমন্ত্রিত হইলেন, তাঁহারা আয়ার্লণ্ড ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই স্থির করিলেন যে, তাঁহারা কোনও ইংরেজের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না, অথবা কোনও প্রকার সামাজিক অথবা সাধারণ অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না। তাঁহারা এই সঙ্কল্পে দৃঢ়ভাবে অবিচলিত ছিলেন। ইহার সহিত ব্যক্তিগত কোনও সম্পর্ক ছিল না; তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য এত সমস্যা-জড়িত, এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এত প্রয়োজনীয় যে, কোনও সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহারের স্থান নাই। অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রেরিত সৈনিকের মনোভাব লইয়া, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহারা লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভালভাবেই জানিতেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ও ক্যাবিনেটের সদস্যদিগের বন্ধুত্বের প্রস্তাব সত্ত্বেও, ইংলণ্ড তাঁহাদের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন রহিয়াছেন। এই কারণে, তাঁহাদের রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বী-

দিগের দ্বারা, ভোজ প্রভৃতির আকারে প্রস্তুত মাকড়্সার জালের মধ্যে আকৃষ্ট হইতে তাঁহারা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, আত্ম-সম্মানের সহিত দূরে থাকিলেই, তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সহিত সামাজিক সম্পর্ক, তাঁহাদের কোনও কোনও লোককে অন্ধ করিয়া এবং বোকা বানাইয়া, তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইতে বিপথে লইয়া যাইতে পারিত। তাঁহারা জানিতেন ইংলণ্ডে এমন সব রাজনীতিক আছেন, যাঁহারা উচ্চাদর্শের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নহেন।

…ধস্তাধস্তি ব্যতীত, ইংরেজেরা তাঁহাদিগকে বাঞ্ছিত দ্রব্য দিবেন, এই আরামপ্রদ বিশ্বাস করিতে তাঁহারা সম্মত হন নাই। ইংরেজের রাজনীতিক কৌশল ও ছোট ছোট প্রশ্ন তুলিয়া মূল ব্যাপারটিকে ঢাকিয়া ফেলিবার চা'লের কিছু কিছু তাঁহারা জানিতেন।…

…একান্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, যে সকল ভারতীয় সদস্য রাত্রিতে ইংরেজদিগের সহিত পানাহার করিতেন, তাঁহারা আইরিশ সদস্যদিগের ন্যায় এসকল কথা চিন্তা করিতেন না। এই সময়ে ইঁহাদের স্বদেশবাসীগণ, দেশে কারাক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন। আইরিশ সদস্যগণ দিবসে সভাগৃহের সবুজ টেবিলের পাশে কাটাইতেন এবং সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া কর্ম্মচারী ও সহকারীগণের সাহায্যে পরদিনের কার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন।…তাঁহারা সংযত ও কঠিন জীবনযাপন করিতেন। পরস্পরের প্রতি এবং কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে কোনও প্রকারের ঝগড়া হইলে, বাহিরের লোকে তাহা জানিতে পারিত না।

আইরিশ সদস্যদিগের এই প্রকার আচরণ, তাঁহাদের গভীর স্বদেশ প্রীতি, অলৌকিক বীরত্ব, সুদৃঢ় নিষ্ঠা এবং প্রশংসনীয় শৃঙ্খলার পরিচায়ক। ইঁহাদের তুলনায় ভারতীয় সদস্যদের হাল্কা মনোভাব, কর্ত্তব্যে উদাসীনতা শোচনীয় অনৈক্য এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাব তাঁহাদের পক্ষে নিন্দা এবং সকল ভারতবাসীর পক্ষেই লজ্জার কারণ। অবশ্য যাঁহারা ভারত হইতে গিয়াছিলেন, ভারতীয় দেশপ্রীতির আদর্শস্থানীয় বলিয়া তাঁহাদের সকলকেই ধরা যাইতে পারে না। যদিও অবশ্য, বাহিরের জগৎ তাঁহাদের দিয়াই আমাদের যোগ্যতার পরিমাপ করিয়াছে।

প্রাচ্যদেশ ও গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালী প্রাচ্যদেশীয় লোকের প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং প্রাচ্যখণ্ডের কোথায়ও ইহা প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই দেশের এবং জগতের সমূহ অমঙ্গল ঘটিতে পারে এমন কথা সময়ে এবং অসময়ে অনেক বলিতেছেন। যদি কাহারও সত্য সত্য এরূপ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে, ইতিহাস ও মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ্যে তাঁহাদের মত ব্যক্ত করা উচিৎ নহে। আর যদি জগতের ও কোনও বিশেষ দেশের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে বক্তাদের মনে নিজেদের মঙ্গলের কথা থাকে এবং স্বার্থের খাতিরে অপর লোককে ধাপ্পা দিবার জন্য তাঁহাদের এই প্রকার কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বলিয়া তাঁহাদের উপর করুণা করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা এখনও জগতের লোককে এতটা অজ্ঞ এবং বোকা মনে করিতেছেন।

প্রাচ্যের অনেক দেশে সাফল্যের সহিত নানাপ্রকার গণতান্ত্রিকতার পরীক্ষা চলিতেছে। কাজেই, যাঁহারা এই প্রকার কথা বলেন, তাঁহাদের অধিকাংশের লক্ষ্য ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে দায়িত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে, যাঁহাদের অসুবিধা হইবে তাঁহাদের সংখ্যা বা প্রতিপত্তি কম নহে বলিয়াই, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সত্যবিরুদ্ধ কথা বলিতে পারেন।

গণতান্ত্রিকতা যে ইউরোপে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে, ইউরোপের একাধিক দেশে সর্ব্বময় কর্ত্তা নিয়োগই কি তাহার বিশিষ্ট পরিচয়? একদেশের গণতন্ত্র সম্বন্ধীয় ধারণা যাহাতে অপর দেশে ঢুকিতে না পারে, তাহার জন্যই বা এত সতর্কতা কেন? হের হিট্লেয়ারও কিছুদিন পূর্ব্বে অবাধ গণতান্ত্রিকতার নিন্দা করিয়াছেন।

ভারত সম্মিলন

ভারত সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সমিতির উদ্যোগে আগামী অক্টোবর মাসে প্যারীতে ভারত বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। অধ্যাপক আইনষ্টাইন্, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত বার্টরাণ্ড রাসেল্ এখানে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। কবির নিমন্ত্রণ কিছু আকস্মিক নহে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিদেশে এই প্রকার সম্মানের অধিকারী হইতেছেন দেখিয়া বাঙ্গালীমাত্রেই গৌরব বোধ করিবেন। লণ্ডনের প্রস্তাবিত সর্ব্বজন সম্মিলনেও শ্রীযুক্ত বসু সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

নিখিল ভারতীয় সকল ব্যাপারেই, বাঙ্গালীর স্থান বিশেষ নামিয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চাতে বাঙ্গালীর যোগ্যতার অভাব, বা বাঙ্গালীর প্রতি অন্যদের ঈর্ষা অথবা এতদুভয় কারণই রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে যাঁহারা বাঙ্গালীর যোগ্যতা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, বিদেশে বাঙ্গালীর সম্মান দেখিয়া, তাঁহারা কতকটা আশান্বিত হইতে পারিবেন।

ব্রহ্মদেশ

ব্রহ্ম-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে ব্রিটীশ সরকার কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন বলিয়া আজিও জানা যায় নাই, (৩রা জুন)। এই অনিশ্চিত অবস্থা এই প্রদেশের নেতৃবর্গ ও হিতৈষীদিগের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়া আছে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

নির্ভরতা

শ্রীমতী অনিমা বসু

দেখা যদি দাও
দিও প্রিয়তম
মরমে মরম পরশি

বুকে যদি নাও
নিয়ো প্রিয় নিয়ো
হৃদয় আমার সরসি

চোখ যদি চাও
চেয়ো চেয়ো বঁধু
আঁখির কোনেতে লুকায়ে

অধর পরশে
সরস করিও
যেন নাহি যায় শুকায়ে

দূরে ফেলে দাও
দিও তুমি সখা
তাহাতে ডরিনে কথন'

শত অবিচারে
তুমি যে আমার
সে কথা বুঝিব তখন'

এসো রূপবতী

শ্রীমনোজ বসু

এসো রূপবতী, রাত্রি গভীর হল !···

বাতায়ন শিরে পূর্ণিমা-চাঁদ ঝরে,
মাঠের বাতাস এসে হিম হাতে খুঁজে গেছে কতবার,—
এ রূপসী ধরা তন্দ্রা-শিথিল শ্রান্ত আঁচল 'পরে
মাথায় ঝরিছে ভালবাসা চাঁদিমার !

রূপবতী. আমি বসে আছি বাতায়নে
স্বপ্নের মতো এসো মোর চোখে—ভেসে এসো মোর পাশে—
আঁচল বহিয়া গড়াক নিখিলে স্বপ্নের পারাবার।

আজ রাতে সখি, সাজ কর যত খুসী—···

ঝাঁপিতে যে সোনা, তনুতে যে রূপ, যে মাধুরী আছে বুকে,
সোনার কাঁকন, সোনার কেয়ূর, মুক্তার সাতনরী,
লজ্জা সিঁদুর মুখে মাখামাখি, মুখ রাঙা টুকটুকে,
তনু-বিদ্যুতে জড়ানো নীলাম্বরী।

নূপুরে বাজিবে ভরা অন্তরে উথলিত যে গরব
পদনখ হ'তে এলোচুল জ্বলে একটি কনক দীপ
রূপ তরঙ্গ ছল-ছল-ছল ছোট্ট সুতনু ভরি'।

শোন শোন, ওই হারা পাখী আসে ফিরে—

সেই হাতে হাত চুপ করে থাকা, রাত্র জাগা অকারণ···
স্বপ্ন শিয়রে একটি পলক চুরি করে চোখোচোখি···
কথা বলতাম, পাছে শোনা যায় হৃদয়ের স্পন্দন—
বাতাসে পাখার ঢেউ তুলে তারা ওই আসে···শুনিছ কি ?

তুমি উহাদের প্রদীপ দেখায়ে ঘরে ফিরে ডেকে আনো—
যে পাখী পালালো কালের ওপারে—ফিরিছে এ নিশিরাতে,
এই ক্ষণে এই বাতায়ন-তলে দাঁড়াও রূপসী সখি।

পুস্তক-পরিচয়

ভারতীয় নারী—স্বামী বিবেকানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ মাত্র।

নারীজাতি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে-সমস্ত অভিমত পোষণ করতেন এবং বিভিন্ন সময়ে বাংলা ও ইংরাজিতে তিনি নারী ও নারীর আদর্শ সম্বন্ধে যে-সমস্ত উক্তি করে-ছিলেন, সেগুলিকে স্বামীজির বিবিধ গ্রন্থ থেকে সংকলন ক'রে যথা সম্ভব পরস্পর সংলগ্নভাবে এই পুস্তকে গ্রথিত করা হয়েছে। পুস্তকখানি পাঁচটি অংশে বিভক্ত। এই পাঁচটি অংশে 'হিন্দু পরিবার,' 'হিন্দু নারীর আদর্শ,' 'ভারতীয় নারী ও পাশ্চাত্য নারী', 'ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ ও সমস্যা সমাধান', 'স্বামীজির দৃষ্টিতে ভাবী নারী-সমাজের চিত্র' এই পাঁচটি প্রবন্ধ আছে। পঞ্চম প্রবন্ধটি ভগিনী নিবেদিতার রচিত। গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্যে এবং নারী জাতি সম্বন্ধে স্বামীজির আদর্শটিকে স্পষ্টতররূপে ফুটিয়ে তোল্‌বার উদ্দেশ্যে ভগিনী নিবেদিতার প্রবন্ধটিকে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া হয়েছে।

নারীজাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের উন্নতি সাধনই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের অন্যতম ব্রত। তিনি অনেক সময়ই বল্‌তেন, "কখনও ভুলিও না 'স্ত্রীজাতি এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতি সাধন'—উহাই আমাদের মূলমন্ত্র" (আলোচ্য পুস্তকের ১০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভারতীয় নারীর আদর্শ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজির মতা-মতের মূল্য যে খুবই বেশি সে-কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ, (প্রকাশকের ভাষায়) স্বামীজি "ছিলেন আমূল-সংস্কারক; সদা পরিবর্তনশীল সমাজের ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য তিনি সংস্কারের কৃত্রিম উৎস রচনা করিয়া বাহবা অর্জ্জন করেন নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন সমাজের জীবনীশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে।" আধুনিক নারী জাগরণের দিনে এই পুস্তকখানি আমাদের সমাজের চিত্তকে সজাগ ক'রে তুল্‌তে অনেকখানি সহায়তা করবে সন্দেহ নেই। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট চিন্তার উপাদান পাবেন। সংস্কারকদেরও অনেক ভাব্‌বার বিষয় এই পুস্তকে আছে। ভারতীয় নারীর আদর্শের অতি চমৎকার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। স্বামীজির ন্যায় অসাধারণ মনীষী ভারতের নারী-আদর্শ ও তার ভবিষ্যৎকে কি চোখে দেখ্‌তেন তা জানা প্রত্যেক স্বদেশ-বৎসল নর-নারীরই কর্ত্তব্য।

এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ইংরেজির বঙ্গানুবাদও বেশ সুষ্ঠু হয়েছে। পুস্তকখানি সমগ্রভাবে বেশ সুপাঠ্য এবং ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল। ছাপা এবং কাগজও সুন্দর; এবং পুস্তকখানির আয়তনের তুলনায় দামও বেশি হয়নি।

জয়ন্তী—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন রচিত। প্রকাশক—শ্রীবিমলাচরণ রায়চৌধুরী, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, কাজি বাজার—কটক। মূল্য আট আনা।

এখানি একটি কবিতার বই, তরুণ কবির প্রথম গ্রন্থ। এর মধ্যে কতগুলি কবিতা বিচিত্রা, বঙ্গলক্ষ্মী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাকিগুলি নতুন। গ্রন্থের সূচনায় লেখক বলেছেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে 'জয়ন্তী' আমার একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি মাত্র।" তাই গ্রন্থের নাম হয়েছে 'জয়ন্তী'।

বইখানির পরিচয় পত্র লিখে দিয়েছেন সুকবি ও কাব্য-সমালোচক শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। কালিদাস বাবু লিখেছেন, এই তরুণ কবি "তাঁহার কল্পলতার প্রথম পুষ্পটিই কবিগুরুর শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন। এই গ্রন্থখানিতে যে কয়টি কবিতা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সুরচিত। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এইগুলি কবিগুরুর শ্রীচরণের অযোগ্য নয়। * * * এই তরুণ কবি

কাব্যের বহিরঙ্গের দিক্‌টার আশাতীত চমৎকারিতা সম্পাদন করিয়াছেন—অনুশীলনে অবহিত হইলে কাব্যের অন্তরঙ্গের ঐশ্বর্য্যও তাঁহার অধিগত হইবে এ ভরসার আভাস-ইঙ্গিত কবিতাগুলির রসপুটের মধ্যেই বর্ত্তমান।" কালিদাস বাবুর এই মন্তব্যের পর আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবু এটুকু বলা প্রয়োজন যে, বইখানি প'ড়ে কবিতাগুলির ভাষা, ছন্দ ও রচনা ভঙ্গীতে তৃপ্তি লাভ করেছি। ভাব সৌন্দর্য্যেও এই কবিতাগুলি পাঠকদের আনন্দ দান করবে।

পদ্মরাগ—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে সৌরীন বাবুর নাম অপরিচিত নয়। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁর কবিতার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় ঘটেছে। সৌরীন বাবুর অনেক কবিতার মধ্যেই যথার্থ কাব্যরসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁর এই গ্রন্থখানির অধিকাংশ কবিতাই পূর্ব্বে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এবার ওই কবিতাগুলিকে একত্র পড়বার সুযোগ হ'লো। কবিতাগুলি প'ড়ে এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব-প্রত্যাশা বিফল হয়নি। গ্রন্থখানিতে বিষয়, ভাব ও রসের বৈচিত্র্য আছে। কাব্যের ভাষা ও ছন্দের উপর সৌরীন বাবুর বেশ অধিকার আছে। তাঁর ছন্দ-সম্পদ্ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু একথাও বলা প্রয়োজন যে, ভাষা ও ছন্দের বৈচিত্র্যের খাতিরে অনেক স্থলে কাব্য-সৌন্দর্য্য ব্যাহত হয়েছে। আশা করি গ্রন্থখানি কাব্য রসিকদের নিকট যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে।

প্রবোধচন্দ্র সেন

দীপশিখা—শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীতারাপদ দাশগুপ্ত এম্-এ, বেঙ্গল পাবলিশিং কোং, ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীনরতন দাশ এম্-এ, বি-এল্, এড্‌ভোকেট, খুলনা।

বিরহ-শতকের কবি কর্ত্তৃক এই কাব্যটি রচিত হইলেও ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির রচনা। ইহার তেতাল্লিশটি কবিতার মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটিই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও এবং দুই একটি কবিতা মামুলী ধরণের রচনা হইলেও অধিকাংশই সুপাঠ্য এবং সুন্দর—ভাবশূন্য ভাষা-সৌষ্ঠবহীন কথার চালাকী মাত্র নহে। বিশেষতঃ ব্যর্থ প্রেম ও প্রেম নিবেদন সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিল।

৮০, পৃষ্ঠায় "শেষ" শীর্ষক কবিতাটি Shelley'র 'Music, when soft voice die' কবিতাটিরই প্রতিধ্বনি।

কচ-দেবযানী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন রায় চৌধুরী বি-এ, "খালিয়া হাউস," ১২৭ নং হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কচ ও দেবযানীর কাহিনী অবলম্বনে লিখিত পৌরাণিক নাটক। উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষত্ব না থাকিলেও ইহা অভিনয়ের অনুপযোগী নহে।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

পঞ্চদল—অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা।

এখানি একটি কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থখানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রতিভাগে একটি ক'রে গল্প আছে। গল্পগুলি সবই বাঙালীর বিয়ে, বিয়ের পণ, বিয়ের আদর্শ প্রভৃতি সামাজিক বিষয় অবলম্বন ক'রে রচিত। গল্পচ্ছলে রচয়িতা আমাদের কতকগুলি সামাজিক সমস্যা ও দুর্ব্বলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সমাজসংস্কারের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। একস্থলে তাঁর একটি গল্পের নায়ক বলেছেন, "ভাঙিব এবার বৃদ্ধের-রচা সমাজের কারাগার" এবং অন্যত্র

কবি নিজেই বলেছেন, "বিবাহ-তন্ত্র হয় না সত্য মন যদি নাহি পায়।" এই দুইটি উক্তি থেকেই গ্রন্থখানির সামাজিক আদর্শের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

কবি দেবেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বেই "নূপুরের" কবি ব'লে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। 'পঞ্চদল' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই পুস্তকখানিতে 'নূপুর'-এর ন্যায় বিষয়-বৈচিত্র্য ও ছন্দ-কৌশল নেই। কিন্তু গ্রন্থখানিতে ভাব ও বিষয়বস্তুর ঐক্য আছে এবং তা থেকে লেখকের চিন্তাধারার একাংশের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলেছি গ্রন্থখানি পাঁচটি গল্পের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু এই গল্পগুলির মধ্যে বিষয়গত ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে। এগুলির মধ্যে আমাদের সমাজের অনেক গলদের প্রতি যথেষ্ট কটাক্ষ আছে। কিন্তু ওই কটাক্ষের মধ্যে জ্বালা বা তীব্রতা নেই, আছে ব্যঙ্গ ও কৌতুক। তাই গল্পগুলি উপভোগ্য হয়েছে। কবি এই গল্পগুলি উঁচুদরের কাব্য সাহিত্য হিসেবে রচনা করেন নি; রচনা করেছেন উপভোগ্য হাল্কা সাহিত্য হিসেবে এবং এবিষয়ে তাঁর প্রয়াস সফল হয়েছে। কারণ পাঠক-পাঠিকারা গল্পগুলি প'ড়ে খুসি হবেন। কবিতাগুলির ভাষা সুন্দর ও প্রাঞ্জল; ভাষা ও ছন্দের আড়ষ্টতা কোথাও নেই। রচনাগুলি প'ড়ে বোঝা যায় ছন্দোবদ্ধ ভাষায় অনর্গল গল্প ব'লে যাবার ভাষার উপর দেবেন্দ্র বাবুর বেশ ক্ষমতা আছে। আমরা তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরও উঁচুদরের রচনা পাব ব'লে আশা করতে পারি।

পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই বেশ মনোরম। বিয়ের উপহার হিসেবে গ্রন্থখানি খুবই উপযোগী। আশা করা যায় ঐ হিসেবে গ্রন্থখানির বহুল প্রচার হবে।

প্রবোধচন্দ্র সেন

মণি-দীপা—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড কলিকাতা কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য—চার টাকা।

লেখক বাঙলা সাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি—এ বইখানিও কবিতার বই। কিন্তু এই বইখানিতে কবি নিজের কল্পনাকে মুক্তি দিয়ে অপরের কল্পনাকে নিজের অপূর্ব্ব লাবণ্যময় ভাষায় মণ্ডিত করেছেন। বইখানি হিন্দি, সংস্কৃত, মারাঠী, মাদ্রাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা থেকে সরস ও সুন্দর কবিতা সঙ্কলিত ক'রে তার বঙ্গানুবাদ। মৌলিক বাঙলা কবিতা রচনায় হেমেন্দ্র বাবু যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এ বইখানিতেও তা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান—সরস পদলালিত্যে এবং সুললিত ছন্দে কবিতাগুলি ঝলমল্ করছে;—কে বলবে সে গুলি কবির নিজস্ব সৃষ্টি নয়। স্বরূপ একটি অতি ক্ষুদ্র কবিতা উদ্ধৃত করি—

কৃপণের দুঃখ

কৃপণা কহে ডাকি কৃপণ ওগো,
আনন দেখি তব কি হেতু ম্লান?
গাঁটের কড়ি কিছু হারিয়ে গেছে,
কোথাও কারে কিছু করেছ দান?
কৃপণ কহে না—না, যায়নি খোয়া,
দেওয়ার দুখ—তাও পাইনি আজ
অপরে দিল শুধু দেখেছি আমি,
মাথায় ভেঙ্গে তাই পড়েছে বাজ।

এর মধ্যে অনুবাদের কোনো গন্ধ নেই।

বইখানির অন্তরের সম্পদ যেমন মূল্যবান, বাহিরের সৌন্দর্য্যও তেমনি অপূর্ব্ব। সমস্ত বইটি পুরু নীলাভ বহুমূল্য কাগজে দুই রঙে ছাপা, ইমিটেশন্ মরক্কোয় স্বর্ণাঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্রে লিম্প বাইন্ডিং—সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয় অঙ্কিত ২৪ খানি সুদৃশ্য রঙিন ছবি বইখানির পাতায় পাতায় শোভা সম্পাদন করছে। সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান প্রেসের এ বইখানি বাস্তবিকই গর্ব্বের বস্তু। বন্ধু বান্ধব প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত এ ধরণের যতগুলি বই উপস্থিত মনে পড়ছে এ বইখানি তার কোনটিরই চেয়ে হীন নয়। বইখানির বহুল প্রচার হবে বলে মনে হয়।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নানা কথা

মহাত্মা গান্ধীর অনশনব্রত উদ্‌যাপন

মহাত্মা গান্ধীর একুশ দিন ব্যাপী অনশন ব্রতে দেশের চিত্ত একটা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়েছে। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত যে-পাপ দেশের সামাজিক জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে,—তাকে উৎপাটিত করতে হ'লে বোধ হয় দেশের চিত্তকে এই রকম নাড়া দেওয়ারই প্রয়োজন ছিল। যে-উদ্দেশ্যে মহাত্মাজি এতখানি আত্মনিগ্রহ করলেন, তা' অচিরেই কতখানি সিদ্ধ হ'বে এখনো বলা যায় না,—কিন্তু দেশের তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনা জাগ্রত হ'য়েছে,—তা' স্পষ্টই দেখা যায়।

মৃত্যুর সঙ্গে এই কঠোর সংগ্রামে যে মহাত্মাজি জয়ী হ'য়েছেন, এর জন্য আজ ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণিপাত করি। আশা করি যে শঙ্কাকুল সংশয় ও উদ্বেগে দেশবাসীর এই একুশটা দিন কেটেছে,—তার স্মৃতি একটুও ক্ষীণ হ'বে না, যতদিন না পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা একেবারে দূর হ'য়ে যাবে।

এই শঙ্কা ও সংশয়ের গভীরতা যে কতখানি তা' বেশ বোঝা যায়,—মহাত্মাজির প্রয়োপবেশনের আরম্ভেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে-চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে। চিঠিখানির কিয়দংশ এইখানে অনুবাদ করে দিলাম।

"আপনার এই কাজে আপনি যে বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, সেখানে যদি আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত হ'তে না পারি ত আপনি আমাকে দোষ দিতে পারেন না। আপনার অভিপ্রায় সঠিক বুঝতে হ'লে যে-সমস্ত ভাবনা ও ঘটনার সঙ্গে আপনার বিবেচনা মিলিয়ে দেখতে হ'বে, সেগুলো এখন আমার সুমুখে নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে সৃষ্টির আদি থেকেই এমন অনেক জিনিষ আছে যা' বিশ্রী এবং অন্যায়। সেগুলো সৎপদার্থের উল্টো দিক। সোজা দিক যা' তা হ'চ্চে আদর্শ,—সত্যের দূত যাঁরা তাঁদেরই মধ্যে রূপধারণ করবার জন্য চিরকাল অপেক্ষা করে আছে। তাই যাঁরা সত্যের দূত, তাঁদের কখনোই অধিকার নেই,—পারিপার্শ্বিক অবস্থার অশুচিতা ও অসম্পূর্ণতার জন্য নৈরাশ্যে বা বিরক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করে যাবার।

"* * * মৃত্যু যখন আস্‌বেই তখন সাহসের সঙ্গেই তার সম্মুখীন হ'তে হবে, কিন্তু তাই বলে আমাদের কারো স্বাধীনতা নেই তাকে ডেকে আন্‌বার যতক্ষণ জীবনের চরম অভিপ্রায়টি প্রকাশের জন্য অন্য পন্থা থাকে। আপনার বর্ত্তমান ব্রতের অত্যাবশ্যিকতা সম্বন্ধে আপনার ভুল হওয়াটা অসম্ভব নয়,—তাই যখন ভাবি যে একটা ভয়াবহ সম্ভাবনার মধ্যে এর অবসান হ'তেও পারে, তখনই শিউরে উঠি যে এমন একটা বিরাট ভ্রান্তি একবারের জন্যও সংশোধনের অবকাশ হয়ত পাবে না। তাই আপনাকে এই মিনতি না করে আমার উপায় নেই যে ভগবানের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এই আত্ম-নিগ্রহের চরম প্রস্তাব তাঁকে পাঠাবেন না। * * *

অবশ্য আমি স্বীকার করি, আপনার অন্তরের মধ্যে আপনি যে-দৃষ্টি লাভ করেছেন,—আমার তা নেই; এবং যে আহ্বান এসেছে শুধু আপনারই কাছে,—আমি তার সম্পূর্ণ মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারিনি। তাই যা-ই ঘটুক না কেন, আমি বিশ্বাস করতে চেষ্টা করব যে আপনার এই সঙ্কল্পে অন্যায় কিছু নেই,—এবং আমার উদ্বেগ শুধুই অজ্ঞানের ভীরুতা-জনিত।"

এই চিঠির মধ্যে কবিগুরু যে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন,—তা' সমস্ত দেশবাসীরই মনের ভাব, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। এখন আমাদের একমাত্র প্রার্থনা এই যে মহাত্মা অচিরেই সুস্থ ও সবল হ'য়ে উঠুন,—

এবং তাঁর এই আত্ম-নিগ্রহের দ্বারা দেশের সদ্য-জাগ্রত চিত্তের মধ্যে যে শক্তি উদ্বুদ্ধ ও প্রসারিত করেছেন, সেই শক্তি শীঘ্রই তার উদ্দেশ্য-সাধনের মধ্যে সার্থকতা লাভ করুক। সেই হ'বে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাত্মার যথার্থ জয়গান।

বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার

গত ২০শে মে বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীতে আশুতোষ স্মৃতি উপলক্ষে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়েছিল। উক্ত দিন আমরা নিমন্ত্রিত হ'য়ে সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভার কার্য্য আরম্ভ হবার পূর্ব্বে লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে লাইব্রেরীর পুস্তক সংগ্রহ, পাঠকক্ষ, লাইব্রেরীর পরিচালনার বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি পরিদর্শন করান। সমস্ত দেখে শুনে আমরা অতিশয় সন্তোষ লাভ করি।

বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯১ সালে এই লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সুদীর্ঘকাল সে শুধু নিজের অস্তিত্বই বাঁচিয়ে রেখে আসে নি, উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হয়ে নিজ গণ্ডীর মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের একটি বিশেষ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশকে শিক্ষিত করবার জন্যে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা অবিসম্বাদী। জনসাধারণের মধ্য হ'তে নিরক্ষরতা দূর করবার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া কর্ত্তৃক লাইব্রেরী একটি প্রধান উপায় ব'লে বিবেচিত এবং অবলম্বিত হয়েছিল। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তথায় নিরক্ষরতার অবসান হয়।

বাঁশবেড়িয়া লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি শিশু বিভাগ প্রবর্ত্তিত করে শিশু এবং বালকদের মনে জ্ঞান লাভের স্পৃহা এবং আনন্দ সঞ্চারিত করবার জন্যে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করেছেন। এর দ্বারা অপরিমেয় উপকার সাধিত হবে তা'তে সন্দেহ নেই। ইয়োরোপে সর্ব্বত্র শিশু লাইব্রেরীর প্রচলন আছে, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্যে Brownsville, Cleveland প্রভৃতি বিখ্যাত শিশু লাইব্রেরীগুলির অদ্ভুত কার্য্যপ্রণালী এবং সফলতা অবগত হ'লে বিস্মিত হতে হয়। আশুতোষ স্মৃতি সভায় সেদিন বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় "তরুণের জয়যাত্রা" নামে একটি অতিশয় সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি শীঘ্রই সচিত্র হয়ে বিচিত্রায় প্রকাশিত হবে। সে প্রবন্ধে শিশু লাইব্রেরী সম্বন্ধে সকল কথা বিশদ ভাবে জানা যাবে।

আমাদের মতে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যম এবং কার্য্যকারিতা বাঙলা দেশের অনেক লাইব্রেরীর পক্ষেই অনুকরণীয়। হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী অ্যাসোশিয়েশনের কার্য্যালয় বাঁশবেড়িয়াতে অবস্থিত এবং All Bengal Library Association এর উৎপত্তির সূত্রপাত বাঁশবেড়িয়াতেই হয় বল্লে বোধ করি বিশেষ কিছু অন্যায় বলা হয় না। লাইব্রেরী পরিচালনার দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের সম্বন্ধে বাঁশবেড়িয়ার এই গৌরবের অনেকখানি অংশ পূর্ব্বোক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম্-এল-সি, এবং Hooghly District Library Association এর এবং বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীর Hony. Secretary শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্ত অধিকার করতে পারেন। তাঁদের উদ্যম, অধ্যবসায় এবং আত্মোৎসর্গ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

Art Rebel Centre

কিছুদিন পূর্ব্বে ৪৯ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে উক্ত শিল্প সমিতির একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল। প্রদর্শনীর চিত্রগুলি দেখে আমরা সুখী হয়েছিলাম। চিত্র সংখ্যা খুব বেশী না হলেও অনেকগুলি ছবিই দর্শকদের প্রশংসা উদ্রেক করতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা আগামী সংখ্যায় এই নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাঁদের সমিতির উদ্দেশ্য আমাদের পাঠকবর্গকে জানাব। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীকেশবচন্দ্র খাঁ অঙ্কিত 'গ্রামের মায়া' নামে একবর্ণ Pen and Ink ছবিটি উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছিল। ছবিখানি Pen and Ink প্রণালীর একটি সুন্দর নমুনা। আগামী সংখ্যায় আমরা আরও কয়েকটি ছবির প্রতিলিপি দেবো।

কলিকাতা কর্পোরেশান ও গ্রন্থাগার আন্দোলন ঃ—

নিখিল ভারত গ্রন্থালয় সমিতির সহযোগী সম্পাদক ও বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস রায় মহাশয় গ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধে কলিকাতা কর্পোরেশানের কি পদ্ধতিতে কার্য্যপরিচালনা করা প্রয়োজন এ বিষয়ে আমাদের যে পত্র লিখেছেন, কর্পোরেশানের অবগতির জন্য তা' আমরা এইখানে প্রকাশ করলাম।

"একথা নিশ্চয়ই শিক্ষিত মাত্রেরই অবিদিত নাই যে বরোদাতে গ্রন্থাগার আন্দোলন ভারতবর্ষের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু এজন্য সেখানে বাৎসরিক ব্যয় হয় ৫২ হাজার টাকা। কলিকাতা করপোরেশান ও গ্রন্থাগারগুলির সাহায্যকল্পে বাৎসরিক সাড়ে ৪৮ হাজার টাকা খরচ করেন, কিন্তু তথাপি গ্রন্থাগার আন্দোলনের কোনো চিহ্নই এখানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। ইহার একমাত্র কারণ যে গ্রন্থালয়গুলির কর্ত্তৃপক্ষ ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের দ্বারা নিজ নিজ গ্রন্থালয়গুলির জন্য টাকা মঞ্জুর করাইয়া লইয়া ইচ্ছামত ব্যয় করেন, এবং গ্রন্থালয়গুলি চাঁদা দিয়া উপন্যাস পাঠের দোকান স্বরূপে ব্যবহৃত হয়, অথচ শিক্ষা বিস্তারের কোনো উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। সুতরাং গ্রন্থালয়গুলির সংরক্ষণ ও এই আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধির জন্য করপোরেশান যদি কতকগুলি বিশেষজ্ঞ কাউন্সিলার এবং এই বিষয়ে দুই একজন বাহিরের লোক লইয়া অবিলম্বে একটি শাখা সমিতি গঠন করেন এবং ঐ ৪৮ হাজার টাকা হইতে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া নাগরিকদের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার করে নানাপ্রকার প্রচার কার্য্যের জন্য অন্ততঃ ১৫ হাজার টাকা খরচ করিয়া অবশিষ্ট প্রয়োজনানুযায়ী বিচার ও পরামর্শ করিয়া সাহায্য দান করেন তাহা হইলে কলিকাতা সহরেও অচিরেই বরোদার অপেক্ষা গ্রন্থাগার আন্দোলনের কম পরিপুষ্টি সাধন হইবে না।"

শ্রীগুরুদাস রায়

বর্ষ শেষের নিবেদন

এই সংখ্যায় আমাদের ষষ্ঠ বর্ষ শেষ হোলো। আগামী শ্রাবণ থেকে সপ্তম বর্ষ আরম্ভ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, হিতৈষী বন্ধুবর্গ সকলকেই আমাদের আন্তরিক প্রীতি-সম্ভাষণ নিবেদন করি। গত দু' বৎসরের মধ্যে উত্তরোত্তর 'বিচিত্রা'র যে প্রসার ও প্রতিপত্তির বৃদ্ধি হ'য়েছে, তার মধ্যেই তাঁদের শুভকামনা সূচিত হ'য়েচে।

'বিচিত্রা' পরিচালনায় আমরা প্রধানতঃ দুটি জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখি। প্রথমতঃ সৎসাহিত্য প্রচারের দ্বারা পাঠকের মনোরঞ্জন ও জ্ঞান-বৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ জাতীয় মনের আত্ম-প্রকাশের জন্য একটা প্রকাণ্ড ক্ষেত্রের সৃষ্টি। তাই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেক অজ্ঞাতনামা অথচ শক্তিশালী নূতন লেখকের রচনা 'বিচিত্রা'র মধ্যে পাওয়া যায়।

"সাহিত্য" কথাটি একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হোলো। শুধুই ভাষায় নয়, রেখার মধ্যেও মানুষের মনের যে প্রকাশ,—তার সঙ্গে আমাদের পাঠক-পাঠিকার কিছু পরিচয় সাধনের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করি। নানা কারণে, বিশেষ করে বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের সময় ব্যয়-সাপেক্ষ আমাদের মাসিক চিত্রশালা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে বাধ্য হ'য়েছি, কিন্তু দেশের শিল্পকলা সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ প্রায়ই প্রকাশ করে থাকি। এ বৎসরে এই জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর "শিল্প পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখ-যোগ্য। বর্ত্তমান সংখ্যায় "বঙ্গীয় কলা পদ্ধতির আধুনিক রূপ প্রবন্ধে দেশের কয়েকজন শক্তিশালী চিত্রশিল্পীর কিছু পরিচয় আছে। আগামী শ্রাবণ সংখ্যায় (নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যায়) আমরা জগৎ-বিখ্যাত শিল্পী নিকোলাস রোরিকের একটি সচিত্র পরিচয় দেব। তাঁর কয়েকটি বহুবর্ণ ও একবর্ণ চিত্র বিচিত্রায় প্রকাশিত করবার অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-বিশ্রুত সচিত্র পারস্য-ভ্রমণ কাহিনী এ বৎসর বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকারা পড়েছেন।

এই ভ্রমণ-কাহিনী এখনো বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয়নি। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অনেক নূতন কবিতা ও প্রবন্ধ,—ছোট উপন্যাস 'দুই বোন' এ বৎসরের বিচিত্রায় প্রকাশিত হ'য়েছে। শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" (চতুর্থ পর্ব) শেষ হওয়া মাত্রই "বিপ্রদাস" আরম্ভ হয়েছে। আগামী বৎসর উপন্যাস ছাড়াও শরৎচন্দ্রের আরো দু'-একটি ছোট গল্প প্রকাশিত করবার আয়োজন করেছি। গত কয়েকমাস যাবৎ শরৎচন্দ্রের শরীর বিশেষ সুস্থ নেই। ভগবানের কৃপায় তাঁর শরীর একটু সুস্থ থাকলেই আমাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হ'বে। প্রমথ চৌধুরীর "অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি" শীর্ষক একটি নূতন ধরণের গল্প এ বৎসর প্রকাশিত হ'য়েছে। আগামী বৎসর তাঁর আরো অনেকটি ছোট গল্প প্রকাশ করবার আশা আছে। আধুনিক লেখকদের মধ্যে শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস, সুবোধ বসু প্রভৃতি অনেকের গল্প এবার প্রকাশিত হ'য়েছে। আগামী বৎসরে আরো বেশি করে হ'বার আশা আছে। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাস এখনো চল্‌ছে। খুব সম্প্রতি যাঁরা লিখ্‌তে আরম্ভ করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীনবগোপাল দাশের রচনা বিশেষ আশাপ্রদ। তাঁর দুটি গল্প এবৎসর প্রকাশিত হ'য়েছে।

কথা-সাহিত্য ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও আমাদের দৃষ্টি আছে। সাহিত্য ও শিল্পের সমালোচনা,—বিশেষ করে রবীন্দ্র ও শরৎ সাহিত্যের অনেক আলোচনা এ বৎসর প্রকাশিত হ'য়েছে, আগামী বৎসরে আরও হ'বে। ঐতিহাসিক দার্শনিক গবেষণা পূর্ণ অনেক প্রবন্ধ, সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী, দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রতিমাসেই প্রকাশিত হ'য়েছে। এই সব বিষয়ে এবৎসর প্রকাশিত রচনার মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র সিংহের "অর্থনীতির ধারা", কুমার মুনীন্দ্র দেবরায়ের "নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান" উল্লেখ যোগ্য। এই প্রসঙ্গে যশোর জেলার পাঁজিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার বসুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। "দেশের কথা" বিভাগে তিনি প্রতিমাসেই সাময়িক নানা বিষয়ে চিন্তাপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং আগামী বর্ষেও করবেন। তা ছাড়া আমাদের শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে ও সাহিত্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন।

তথাপি "বিচিত্রা" আমাদের আশানুরূপ হ'য়েছে,—এমন দাবী এখনো কিছুতেই করতে পারি না। আমাদের নানাবিধ ত্রুটি সম্বন্ধে আমাদের চেয়ে সচেতন বোধ করি কেহই নয়। শুধু এইটুকু বল্‌তে পারি আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই। এত বড় একটা ব্যয়সাধ্য পত্রিকার সফলতা নির্ভর করে আমাদের পাঠকবর্গের সহৃদয়তার উপর। তাঁদের নিকট উৎসাহ পেলে ভবিষ্যতে দিন দিন 'বিচিত্রা'র উন্নতি সাধন করতে পারব, এমন ভরসা রাখি।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.